ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

সূচীপত্র

ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ ১৩৫২—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচী

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত "আজাদ হিন্দের অঙ্কুর"—৩৲
শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটিকা "ভিটেমাটি"—১৷৷৹
শ্রীগৌরমোহন গাঙ্গুলী প্রণীত ভ্রমণ-কাহিনী "রূপান্তরিত যাযাবর"—২৷৹
শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত "বিশাল বাঙ্গলা"—১৲
শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য প্রণীত জীবনীগ্রন্থ "অন্তগৌরব"—১৲
শ্রীশিশির সেনগুপ্ত ও শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী প্রণীত "বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ"—২৷৷৹
সতীকুমার নাগ প্রণীত "কামালের গড়া দেশ"—৸৹
অমরেন্দ্রনাথ সাঁতরা প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "হে সূর্য্য"—৷৵৹
শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "তরুণের স্বপ্ন"—৩৷৷৹
শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "বি,এস্,এ ২০৫"-
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ধর্ম্ম ও সমাজ"—২৸৹
ব্রহ্মচারী পরিমল বন্ধু দাস প্রণীত "শ্রীশ্রীজগবন্ধুহরি লীলামৃত" (পঞ্চভাগ—১ম খণ্ড)—১৷৹

আগামী আষাঢ় মাসে ভারতবর্ষের চতুস্ত্রিংশ বর্ষ আরম্ভ

গত ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষকাল 'ভারতবর্ষ' কি ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছে, তাহা আমাদের পাঠকগণ অবগত আছেন। মহাযুদ্ধের জন্য নানা দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও আমরা ভারতবর্ষের চাঁদার হার বৃদ্ধি করি নাই। আশা করি, সকলে আমাদের সহিত পূর্ব্বের মতই সহযোগিতা করিয়া আমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন।

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৬৷৷৹, ভি পি ৬৸৵৹, যাণ্মাষিক ৩.৹, ভি-পিতে ৩৷৵৹। ভি-পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা **মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক।** ভি-পির টাকা অনেক সময় বিলম্বে পাওয়া যায়, ফলে পরবর্ত্তী সংখ্যা পাঠাইতেও বিলম্ব হয়। গ্রাহকগণের টাকা ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা আমরা ভি-পিতে পাঠাইব। পুরাতন ও নূতন সকল গ্রাহকগণই দয়া করিয়া মণিঅর্ডার কুপনে পূর্ণ ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে গ্রাহক নম্বর দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ 'নূতন' কথাটি লিখিয়া দিবেন।

মণিঅর্ডার পাঠাইবার ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ—**ভারতবর্ষ**

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



—নেতাজী



সঙ্গৎ

—অশোক মুখোপাধ্যায়



পৌষ—১৩৫২

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

একান্ন-পীঠের উৎপত্তি

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-আর-এস, পিএচ্-ডি

র্বভারতে একান্ন পীঠের তীর্থমর্য্যাদা কাহারও অবিদিত নাই। ৌরাণিক কিংবদন্তী এই যে, দক্ষকন্যা সতী পিতৃগৃহে অপমানিতা হইয়া াণত্যাগ করেন। সতীবিরহে উন্মত্ত মহাদেব মৃতা পত্নীর শব স্কন্ধে ্য়া উন্মাদনৃত্যে ত্রিভুবন বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণের ন্তা হইল, কি উপায়ে সতীদেহ শিবের স্কন্ধচ্যুত করা যায়। অতঃপর ৗা, বিষ্ণু ও শনি যোগবলে সতীর শবে প্রবিষ্ট হইয়া উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া তলে নানা স্থানে ফেলিয়া দিলেন। যে যে স্থানে দেবীর দেহাংশ ভিত হইল, সেই সেই স্থলে এক একটি পুণ্যপীঠ বা মহাতীর্থের উৎপত্তি ল। মতান্তরে, শিব যখন সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, ান বিষ্ণু শঙ্করের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনপূর্ব্বক শরদ্বারা (তন্ত্রচূড়ামণির ও চক্রদ্বারা) সেই শব খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে পাতিত করেন। যাহা ক, দক্ষকন্যা সতীর প্রাণত্যাগের উপাখ্যান অনেক প্রাচীন পুরাণে ীত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার শবাংশ ভূমিতলে পতিত হওয়ার ফলে ন্ত্র পীঠসমূহের উৎপত্তিকাহিনী কেবল দেবীভাগবত (৭ম স্কন্ধ, ৩০শ ্যায়), কালিকাপুরাণ (১৮শ অধ্যায়) প্রভৃতি কতিপয় অপেক্ষাকৃত ধুনিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। আবার পীঠস্থানের সংখ্যা সর্ব্বত্র রূপ নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পীঠের একপঞ্চাশৎ সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা একান্ন পীঠের উৎপত্তি বিষয়ক কিংবদন্তীর ক্রমবিকাশের ধারা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বৈষ্ণবের নিকট বিষ্ণু এবং শৈবের নিকট শিব যেমন সর্ব্বদেবমধ্যে প্রধান, শাক্তের নিকট আদ্যাশক্তিও তদ্রূপ। ভক্তের কল্পনায় অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার ইষ্টদেবতা কেবল সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ নহেন, অন্যান্যের উপাস্য দেবদেবী তাঁহারই ইষ্টদেবতার বিভিন্ন রূপমাত্র। এইরূপ সমন্বয়ের ধারণা হইতেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের অভেদাত্মক ত্রিমূর্ত্তি কল্পনা এবং হরি-হর ও শিব-পার্ব্বতীর অভিন্ন রূপ কল্পনার উদ্ভব। এমন কি, বাংলা বাউলের গানে রাম-রহিম ও খ্রীষ্ট-কৃষ্টের ন্যায় শিব-আলী ও কালী-ফতীমার অভিন্নত্ব-বোধক বাণীও প্রচারিত হইয়াছে। যাহা হউক, মৎস্য পুরাণের ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থেও আদ্যাশক্তির মাহাত্ম্যের এই বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। অনেকের মতে, এই পুরাণের সঙ্কলনকাল গুপ্তযুগের পরবর্ত্তী নহে। অবশ্য বৃন্দাবনস্থিতা রাধা ইত্যাদির উল্লেখ হইতে মনে হয় নিম্নোল্লিখিত অংশ আরও কিছু পরে পুরাণটিতে সংযোজিত হওয়া অসম্ভব নহে।

মৎস্যপুরাণে (১৩শ অধ্যায়) দেখিতে পাই, দক্ষ সতীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কোন্ কোন্ তীর্থে তোমার দর্শন মিলিবে এবং কি কি নামেই বা তোমার স্তব করা যাইবে?" আদ্যাশক্তি সতী উত্তর দিলেন

"জগতে সর্ব্বভূতে সর্ব্বদা আমাকে দেখিতে পাইবে। সর্ব্বলোকে কোথাও আমাব্যতীত কিছু নাই। তথাপি যে যে স্থলে আমাকে সিদ্ধিকামীরা ন করিবেন এবং ভূতিকামীরা স্মরণ করিবেন, আমি তত্ত্বানুযায়ী দর্শসেই স্থানসমূহের উল্লেখ করিতেছি।" অতঃপর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সতীর অষ্টোত্তরশত রূপের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু এই তালিকায় তীর্থ স্থানের সংখ্যা ঠিক একশত আটটি নহে; কারণ কতিপয় দেবীনামের সহিত প্রকৃত স্থানের নামের পরিবর্ত্তে "দেবলোক", "ব্রহ্মার মুখ" ইত্যাদি কাল্পনিকক্ষেত্র উল্লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই তালিকার তীর্থগুলিকে "পীঠ" বলা হয় নাই। নিম্নে আমরা মৎস্য পুরাণের তালিকা হইতে দেবীনাম ও তীর্থনাম সমূহ উদ্ধৃত করিলাম।—

১। বারাণসীতে বিশালাক্ষী; ২। নৈমিষে লিঙ্গধারিণী; ৩। প্রয়াগে ললিতা; ৪। গন্ধমাদনে কামাক্ষী; ৫। মানসে কুমুদা; ৬। অম্বরে বিশ্বকায়া; ৭। গোমন্তে গোমতী; ৮। মন্দরে কামচারিণী; ৯। চৈত্ররথে মদোৎকটা; ১০। হস্তিনাপুরে জয়ন্তী; ১১। কান্যকুব্জে গৌরী; ১২। মলয় পর্ব্বতে রম্ভা; ১৩। একাম্রকে কীর্ত্তিমতী; ১৪। বিশ্বেশ্বরে বিশ্বা; ১৫। পুষ্করে পুরুহূতা; ১৬। কেদারে মার্গদায়িনী; ১৭। হিমবৎপৃষ্ঠে নন্দা; ১৮। গোকর্ণে ভদ্রকর্ণিকা; ১৯। স্থানেশ্বরে ভবানী; ২০। বিল্বকে বা বিল্বলে বিল্বপত্রিকা; ২১। শ্রীশৈলে মাধবী; ২২। মহেশ্বরে বা ভদ্রেশ্বরে ভদ্রা; ২৩। বরাহশৈলে জয়া; ২৪। কমলালয়ে কমলা; ২৫। রুদ্রকোটিতে রুদ্রাণী; ২৬। কালঞ্জর পর্ব্বতে কালী; ২৭। মহালিঙ্গে কপিলা; ২৮। মর্কোটে মুকুটেশ্বরী; ২৯। শালগ্রামে মহাদেবী; ৩০। শিবলিঙ্গে জলপ্রিয়া; ৩১। মায়াপুরীতে কুমারী; ৩২। সন্তানে ললিতা; ৩৩। সহস্রাক্ষে উৎপলাক্ষী; ৩৪। কমলাক্ষে মহোৎপলা; ৩৫। গঙ্গায় মঙ্গলা; ৩৬। পুরুষোত্তমে বিমলা; ৩৭। বিপাশায় অমোঘাক্ষী; ৩৮। পুণ্ড্রবর্দ্ধনে পাটলা; ৩৯। সুপার্শ্বে নারায়ণী; ৪০। বিকূটে ভদ্রসুন্দরী; ৪১। বিপুলে বিপুলা; ৪২। মলয়াচলে (?) কল্যাণী; ৪৩। কোটিতীর্থে কোটবী; ৪৪। মাধববনে সুগন্ধা; ৪৫। গোদাশ্রমে বা কুব্জাম্রকে ত্রিসন্ধ্যা; ৪৬। গঙ্গাদ্বারে রতিপ্রিয়া ৪৭। শিবকুণ্ডে সুনন্দা, বা শুভানন্দা শিবানন্দা; ৪৮। দেবিকাতটে নন্দিনী; ৪৯। দ্বারাবতীতে রুক্মিণী; ৫০। বৃন্দাবনে রাধা; ৫১। মথুরায় দেবকী; ৫২। পাতালে পরমেশ্বরী; ৫৩। চিত্রকূটে সীতা; ৫৪। বিন্ধ্যে বিন্ধ্য-বাসিনী; ৫৫। সহ্যাদ্রিতে একবীরা; ৫৬। হরিশ্চন্দ্রে বা হর্ম্মচন্দ্রে চন্দ্রিকা; ৫৭। রামতীর্থে রমণী; ৫৮। যমুনায় মৃগাবতী; ৫৯। করবীরে মহালক্ষ্মী; ৬০। বিনায়কে উমা; ৬১। বৈদ্যনাথে অরোগা বা আরোগ্যা; ৬২। মহাকালে মহেশ্বরী; ৬৩। উষ্ণতীর্থে অভয়া; ৬৪। বিন্ধ্যকন্দরে অমৃতা; ৬৫। মাণ্ডব্যে মাণ্ডবী; ৬৬। মাহেশ্বরপুরে স্বাহা; ৬৭। ছাগলাণ্ডে প্রচণ্ডা; ৬৮। অমরকণ্টকে চণ্ডিকা; ৬৯। সোমেশ্বরে বরারোহা; ৭০। প্রভাসে পুষ্করাবতী; ৭১। সরস্বতীতে দেবমাতা; ৭২। সাগরতীরে মাতা; ৭৩। মহালয়ে মহাভাগা; ৭৪। পয়োষ্ণীতে পিঙ্গলেশ্বরী; ৭৫। কৃতশৌচে সিংহিকা; ৭৬। কার্ত্তিকেয়ে যশস্করী; ৭৭। উৎপলাবর্ত্তে লোলা; ৭৮। শোণসঙ্গমে সুভদ্রা; ৭৯। সিদ্ধপুরে লক্ষ্মী; ৮০। ভরতাশ্রমে অঙ্গনা; ৮১। জালন্ধরে বিশ্বমুখী; ৮২। কিষ্কিন্ধ্যাপর্ব্বতে তারা; ৮৩। দেবদারু বনে পুষ্টি; ৮৪। কাশ্মীরে মেধা; ৮৫। হিমাদ্রিতে ভীমা দেবী; ৮৬। বিশ্বেশ্বরে পুষ্টি; ৮৭। কপালমোচনে শুদ্ধি; ৮৮। কায়াবরোহণে মাতা; ৮৯। শঙ্খোদ্ধারে ধ্বনি; ৯০। পিণ্ডারকে ধৃতি বা ধারা; ৯১। চন্দ্রভাগায় কালা; ৯২। অচ্ছোদে শিবকারিণী; ৯৩। বেণায় অমৃতা; ৯৪। বদরীতে উর্ব্বশী; ৯৫। উত্তরকুরুতে ঔষধী; ৯৬। কুশদ্বীপে কুশোদকা; ৯৭। হেমকূটে মন্মথা; ৯৮। মুকুটে সত্যবাদিনী; ৯৯। অশ্বত্থে বন্দনীয়া; ১০০। কুবেরালয়ে নিধি; ১০১। বেদবদনে গায়ত্রী; ১০২। শিবসন্নিধিতে পার্ব্বতী; ১০৩। দেবলোকে ইন্দ্রাণী; ১০৪। ব্রহ্মাস্যে সরস্বতী; ১০৫। সূর্য্যবিম্বে প্রভা; ১০৬। মাতৃগণমধ্যে বৈষ্ণবী; ১০৭। সতীমধ্যে অরুন্ধতী; ১০৮। স্ত্রীমধ্যে তিলোত্তমা; ১০৯। চিত্তে ব্রহ্মকলা; ১১০। দেহীর শক্তি। দেখা যাইতেছে, এই তালিকায় দেবীর নাম অষ্টোত্তরশতের কিছু বেশী; কিন্তু তীর্থের নাম উহা অপেক্ষা কম। পুরাণের পাঠে যে কিঞ্চিৎ ভুলভ্রান্তি আছে তাহাও অত্যন্ত স্পষ্ট। এই তালিকার একটি আধুনিক অনুকরণ প্রাণতোষণীতন্ত্রে (বসুমতী সংস্করণ, ২৩৬-৩৮ পৃষ্ঠা) দেখিতে পাওয়া যায়।

দেবীভাগবত সংজ্ঞক মধ্যযুগীয় গ্রন্থে সতীর দেহখণ্ড পতিত হইবার ফলে ভূতলে নানা স্থানে পীঠ, দেবীপীঠ বা সিদ্ধপীঠ নামক তীর্থক্ষেত্রেয় উৎপত্তির বিবরণ পাওয়া যায়। প্রাচীন পুরাণের পাঠ হইতেই যে পরবর্ত্তী কালে এই বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই। কারণ, কিছু কিছু পাঠান্তর দেখা গেলেও, অনেকস্থলেই দেবী ভাগবতের শ্লোকসমূহের ভাষা মৎস্যপুরাণের শ্লোকের সহিত অভিন্ন। এখানেও দেবীর অষ্টোত্তরশতসংখ্যক রূপ পাইতেছি। পীঠস্থানে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে শিবের অবস্থানের কথাও ইহাতে পাওয়া যায়। অধিকন্তু দেবীভাগবতকার স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার তীর্থস্থানের তালিকায় সতীর অঙ্গসম্ভূত পীঠসমূহ ব্যতীত অপর কয়েকটি মুখ্য পীঠও স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সতীর কোন্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কোন্ ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ নাই। প্রকৃত পক্ষে আমরা মৎস্যপুরাণের তীর্থ তালিকাই দেবী-ভাগবতে পীঠতালিকারূপে পাইতেছি। সুতরাং এই তালিকা বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন।

দেবীভাগবতেরও পরবর্ত্তী গ্রন্থ কালিকাপুরাণে পীঠস্থানের সহিত সতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষের সম্পর্কের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা সূচনা মাত্র, কারণ দেবীর সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পতন সম্বন্ধে বিশিষ্ট আলোচনা ইহাতে করা হয় নাই। কালিকাপুরাণের ১৮শ অধ্যায়ে মাত্র সাতটি দেবীপীঠের কথা বলা হইয়াছে। ১। দেবীকূটে সতীর পদযুগল পতিত হইয়াছিল, এস্থলে দেবী মহাভাগা; ২। উড্ডিয়ানে উরুযুগল, দেবী কাত্যায়নী; ৩। কামরূপে কামগিরিতে যোনিমণ্ডল, দেবী কামাখ্যা ৪। কামরূপের পূর্ব্বভাগে নাভিমণ্ডল, দেবী দিক্করবাসিনী; ৫। জালন্ধরে স্তনযুগল, দেবী চণ্ডী; ৬। পূর্ণগিরিতে স্কন্ধ ও গ্রীবা, দেবী পূর্ণেশ্বরী এবং ৭। কামরূপ অঞ্চলে মস্তক, দেবী ললিতকান্তা। এই বিবরণ সম্প-

প্রধানতঃ দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার যোগ্য। প্রথমতঃ, দেবীর স্কন্ধ-গ্রীবা, পদদ্বয়, উরুযুগল ও স্তনদ্বয়কে এক একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে, অর্থাৎ এই পুরাণের রচনাকালেও যুগ্মাঙ্গ গুলিকে দুই দুই স্থানের সহিত সম্পর্কিত করিয়া অঙ্গপীঠের সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই বর্ণনা অনুসারে শক্তি উপাসনার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র কামরূপে অবস্থিত ছিল; কারণ সাতটি অঙ্গপীঠ মধ্যে তিনটির অবস্থান ঐ দেশে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তান্ত্রিক বা শাক্ত সাধনার কেন্দ্র হিসাবে আর যে চারিটি স্থানের উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা দেবীকূট, উড্ডিয়ান, জালন্ধর এবং পূর্ণগিরি। এই বিবরণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নহে। কিন্তু বর্ত্তমানে উহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কালিকাপুরাণের বিভিন্ন অংশে আরও দুই চারিটি পীঠের উল্লেখ আছে। ৬৪তম অধ্যায়ে চারিটি পীঠের বর্ণনা আছে।—১। পশ্চিমে ওড্র, দেবী কাত্যায়নী, শিব জগন্নাথ; ২। উত্তরে জালশৈল, দেবী জালেশ্বরী, শিব জালেশ্বর; ৩। দক্ষিণে পূর্ণশৈল, দেবী শিবা, শিব মহানাথ; ৪। চতুর্থ পীঠ কামরূপ।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বিরচিত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসার গ্রন্থে এবং উহা অপেক্ষা প্রাচীন জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে পীঠস্থানের একটি তালিকা পাওয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, জ্ঞানার্ণবতন্ত্র অনুসারে পীঠের সংখ্যা পঞ্চাশটি মাত্র। তন্ত্রসারেও এই সংখ্যা স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু জ্ঞানার্ণবের মেরু-গিরি পীঠনামটি তন্ত্রসারে মেরু এবং গিরি এই দুইটি স্বতন্ত্র পীঠ-নাম রূপে গ্রহণ করায় ইহাতে পীঠসংখ্যা একপঞ্চাশৎ হইয়া গিয়াছে। এই ভুল কৃষ্ণানন্দের স্বকৃত বলিয়া মনে করা কঠিন; সম্ভবতঃ ইহা তন্ত্রসার গ্রন্থের কোন উত্তরকালীন সংস্কারকের হস্তক্ষেপের ফল। কৃষ্ণানন্দের ন্যায় প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বোধ হয় পীঠের সংখ্যা পঞ্চাশ স্বীকার করিয়া একান্নটি নাম উদ্ধৃত করিতেন না।

জ্ঞানার্ণব তন্ত্রমতে (আনন্দাশ্রম সংস্করণ, ১৪শ পটল, ১১৪-২৪ শ্লোক তন্ত্রসারের বঙ্গবাসী সংস্করণ ৪২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) পঞ্চাশৎ পীঠস্থানের নাম—১। কামরূপ, ২। বারাণসী, ৩। নেপাল, ৪। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, ৫। কাশ্মীর, ৬। কান্যকুব্জ, ৭। পুরস্থিত, ৮। চরস্থিত, ৯। পূর্ণশৈল, ১০। অর্ব্বুদ, ১১। আম্রাতকেশ্বর, ১২। একাম্র, ১৩। ত্রিস্রোতঃ, ১৪। কামকোট, ১৫। কৈলাস, ১৬। ভৃগু, ১৭। কেদার, ১৮। চন্দ্রপুর, ১৯। শ্রীপীঠ, ২০। ওঙ্কার, ২১। জালন্ধর, ২২। মালব, ২৩। কুলান্ত বা কুপান্ত, ২৪। দেবকোট, ২৫। গোকর্ণ, ২৬। মারুতেশ্বর, ২৭। অট্টহাস, ২৮। বিরজ, ২৯। রাজগৃহ, ৩০। কোল্লগিরি, ৩১। এলাপুর, ৩২। কালেশ্বর বা কামেশ্বর, ৩৩। জয়ন্তিকা, ৩৪। উজ্জয়িনী, ৩৫। ক্ষীরিকা, ৩৬। হস্তিনাপুর, ৩৭। উড্ডীশ, ৩৮। প্রয়াগ, ৩৯। বিন্ধ্য, ৪০। মায়াপুর, ৪১। জলেশ্বর, ৪২। মলয়, ৪৩। শ্রীশৈল, ৪৪। মেরুগিরি, ৪৫। মহেন্দ্র, ৪৬। বামন, ৪৭। হিরণ্যপুর, ৪৮। মহালক্ষ্মীপুর, ৪৯। উড্ডীয়ান, ৫০। ছায়াছত্রপুর। তালিকাটিতে অনেক ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট কোন নগর বা গ্রামের পরিবর্ত্তে কোন বৃহৎ জনপদকে পীঠসংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। অবশ্য জনপদের অন্তর্গত তীর্থ বিশেষই ইহার লক্ষ্য। অন্যান্য তালিকার ন্যায় ইহাতেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত কতিপয় তীর্থস্থানের উল্লেখ আছে। উল্লিখিত সকল তীর্থেই শাক্তপ্রভাব প্রবল ছিল, এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। পীঠের কল্পনা অর্থাৎ ভারতের অধিকাংশ তীর্থক্ষেত্রের সহিত আদ্যাশক্তির সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা মূলতঃ পূর্ব্বভারতীয়; ভারতের অপরাপর অঞ্চলের অধিবাসীর উপর এই কল্পনা অতি গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তন্ত্রসারের পীঠন্যাস বর্ণনাপ্রসঙ্গে (বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৪২৬ পৃষ্ঠা) মেরুগিরি পীঠের স্থলে মেরু ও গিরি নামক দুইটি স্বতন্ত্র পীঠের গণনা করা হইয়াছে। ন্যাসকল্পে এই একপঞ্চাশৎ পীঠকে একান্নটি বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অবস্থিতরূপে উল্লেখপূর্ব্বক নমস্কারের ব্যবস্থা আছে। উহার সহিত সতীর দেহাংশপতন বিষয়ক কিংবদন্তীর সম্পর্ক থাকিতে পারে। তজ্জন্য আমরা নিম্নে যথাক্রমে ঐ একান্নটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তালিকা উদ্ধৃত করিলাম। ১। যোনি (?), ২। মুখবৃত্ত, ৩। দক্ষিণ চক্ষু, ৪। বাম চক্ষু, ৫। দক্ষিণ কর্ণ, ৬। বাম কর্ণ, ৭। দক্ষিণ নাসিকা, ৮। বাম নাসিকা, ৯। দক্ষিণ গণ্ড, ১০। বাম গণ্ড, ১১। ওষ্ঠ, ১২। অধর, ১৩। ঊর্দ্ধ দন্ত, ১৪। অধোদন্ত, ১৫। ব্রহ্মরন্ধ্র, ১৬। মুখ, ১৭। দক্ষিণ বাহুমূল, ১৮। দক্ষিণ কূর্পর, ১৯। দক্ষিণ মণিবন্ধ, ২০। দক্ষিণ অঙ্গুলিমূল, ২১। দক্ষিণ অঙ্গুল্যগ্র, ২২। বাম বাহুমূল, ২৩। বাম কূর্পর, ২৪। বাম মণিবন্ধ, ২৫। বাম অঙ্গুলিমূল, ২৬। বাম অঙ্গুল্যগ্র, ২৭। দক্ষিণ পাদমূল, ২৮। দক্ষিণ জানু, ২৯। দক্ষিণ গুল্ফ, ৩০। দক্ষিণ পাদাঙ্গুলিমূল, ৩১। দক্ষিণ পদাঙ্গুল্যগ্র, ৩২। বামপাদমূল, ৩৩। বাম জানু, ৩৪। বাম গুল্ফ, ৩৫। বাম পাদাঙ্গুলিমূল, ৩৬। বাম পদাঙ্গুল্যগ্র, ৩৭। দক্ষিণ পার্শ্ব, ৩৮। বাম পার্শ্ব, ৩৯। পৃষ্ঠ, ৪০। নাভি, ৪১। উদর, ৪২। হৃদয়, ৪৩। দক্ষিণ স্কন্ধ, ৪৪। ককুদ্, ৪৫। বাম স্কন্ধ, ৪৬। দক্ষিণ কর, ৪৭। বাম কর, ৪৮। দক্ষিণপাদ, ৪৯। বামপাদ, ৫০। উদর(?), ৫১। মুখ (?)। সম্ভবতঃ তান্ত্রিক পীঠন্যাসের কল্পনা হইতেই পরে সতীর দেহাংশসম্ভূত পীঠস্থান বিষয়ক পৌরাণিক কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছিল।

পীঠোৎপত্তি কাহিনীর চরম সংস্করণ দেখিতে পাই ষোড়শ শতাব্দীরও পরবর্ত্তীকালে রচিত তন্ত্রচূড়ামণি গ্রন্থে (শব্দকল্পদ্রুমের পীঠশব্দ প্রসঙ্গে এবং বসুমতী সংস্করণ প্রাণতোষিণী তন্ত্রের ২৩৪-৩৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পাঠ দ্রষ্টব্য)। এস্থলে পীঠ নামের সহিত সর্ব্বত্র দেবীনাম, দেবীর অঙ্গনাম এবং ভৈরবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। নিম্নে তন্ত্রচূড়ামণির পীঠ তালিকা প্রদত্ত হইল।—১। হিঙ্গুলায় ব্রহ্মরন্ধ্র, দেবী কোট্টরী, ভৈরব ভীমলোচন; ২। করবীর বা শর্করারে ত্রিনেত্র, দেবী মহিষমর্দ্দিনী, ভৈরব ক্রোধীশ; ৩। সুগন্ধায় নাসিকা, দেবী সুনন্দা, ভৈরব ত্র্যম্বক, ৪। কাশ্মীরে কণ্ঠদেশ, দেবী মহামায়া, ভৈরব ত্রিসন্ধ্যেশ্বর; ৫। জ্বালামুখীতে জিহ্বা, দেবী সিদ্ধিদা, ভৈরব উন্মত্ত; ৬। জলন্ধরে স্তন, দেবী ত্রিপুরমালিনী, ভৈরব ভীষণ; ৭। বৈদ্যনাথে হৃদয়, দেবী জয়দুর্গা, ভৈরব বৈদ্যনাথ; ৮। নেপালে জানুদ্বয়, দেবী মহামায়া, ভৈরব কপালী; ৯। মানসে দক্ষিণ হস্ত, দেবী দাক্ষায়ণী, ভৈরব অমর; ১০। উৎকলে বিরজাক্ষেত্রে নাভি, দেবী বিমলা, ভৈরব জগন্নাথ; ১১। গণ্ডকীতে গণ্ড, দেবী গণ্ডকী, ভৈরব চক্রপাণি; ১২। বহুলায় বাম বাহু, দেবী বহুলা, ভৈরব ভীরুক; ১৩।

উজ্জয়িনীতে কূর্পর, দেবী মঙ্গলচণ্ডী, ভৈরব কপিলাম্বর ; ১৪। চট্টলে দক্ষিণ বাহু, দেবী ভবানী, ভৈরব চন্দ্রশেখর ; ১৫। ত্রিপুরায় দক্ষিণ পাদ, দেবী ত্রিপুরা বা ত্রিপুরসুন্দরী, ভৈরব ত্রিপুরেশ ; ১৬। ত্রিস্রোতায় বামপাদ, দেবী ভ্রামরী, ভৈরব অম্বর ; ১৭। কামগিরিতে যোনি, দেবী কামাখ্যা, ভৈরব উমানন্দ ; ১৮। যুগাদ্যায় দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ, দেবী ভূতধাত্রী, ভৈরব ক্ষীরখণ্ডক ; ১৯। কালিপীঠে দক্ষিণ পাদাঙ্গুলি, দেবী কালিকা, ভৈরব নকুলীশ ; ২০। প্রয়াগে হস্তাঙ্গুলি, দেবী ললিতা, ভৈরব ভব ; ২১। জয়ন্তীতে বামজঙ্ঘা, দেবী জয়ন্তী, ভৈরব ক্রমদীশ্বর ; ২২। কিরীটে কিরীট, দেবী বিমলা, ভৈরব সম্বর্ত্ত ; ২৩। বারাণসীতে কুন্তল, দেবী বিশালাক্ষী, ভৈরব কাল ; ২৪। কন্যাশ্রমে পৃষ্ঠ, দেবী সর্ব্বাণী, ভৈরব নিমিষ ; ২৫। কুরুক্ষেত্রে গুল্ফ, দেবী সাবিত্রী, ভৈরব স্থাণু ; ২৬। মণিবেদকে মণিবন্ধ, দেবী গায়ত্রী, ভৈরব সর্ব্বানন্দ ; ২৭। শ্রীশৈলে গ্রীবা, দেবী মহালক্ষ্মী, ভৈরব শম্বরানন্দ ; ২৮। কাঞ্চীদেশে কঙ্কাল, দেবী দেবগর্ভা, ভৈরব রুরু ; ২৯। কালমাধবে নিতম্ব, দেবী কালী, ভৈরব অসিতাঙ্গ ; ৩০। নর্ম্মদায় বা শোণে নিতম্ব (?), দেবী শোণা বা নর্ম্মদা, ভৈরব ভদ্রসেন ; ৩১। রামগিরিতে নালা বা স্তন, দেবী শিবানী, ভৈরব চণ্ড ; ৩২। বৃন্দাবনে কেশ, দেবী উমা, ভৈরব ভূতেশ ; ৩৩। শুচিতে ঊর্দ্ধ দন্ত, দেবী নারায়ণী, ভৈরব সংহার ; ৩৪। পঞ্চসাগরে অধোদন্ত, দেবী বারাহী, ভৈরব মহারুদ্র ; ৩৫। করতোয়ার বামতটে তল্প, দেবী অপর্ণা, ভৈরব বামন ; ৩৬। শ্রীপর্ব্বতে দক্ষিণ গুল্ফ, দেবী সুন্দরী, ভৈরব সুন্দরানন্দ ; ৩৭। বিভাষকে বাম গুল্ফ, দেবী কপালিনী, ভৈরব সর্ব্বানন্দ ; ৩৮। প্রভাসে উদর, দেবী চন্দ্রভাগা, ভৈরব বক্রতুণ্ড ; ৩৯। ভৈরবপর্ব্বতে উর্দ্ধোষ্ঠ, দেবী অবন্তী, ভৈরব লম্বকর্ণ ; ৪০। জলস্থলে (জনস্থানে) চিবুক, দেবী ভ্রামরী, ভৈরব বিকৃতাক্ষ ; ৪১। গোদাবরী-তীরে গণ্ড, দেবী বিশ্বেশী, ভৈরব দণ্ডপাণি ; ৪২। সর্ব্বশৈলাস্থকে বামগণ্ড, দেবী রাকিণী, ভৈরব অমায়ী ; ৪৩। রত্নাবলীতে দক্ষিণ স্কন্ধ, দেবী কুমারী, ভৈরব শিব ; ৪৪। মিথিলায় বামস্কন্ধ, দেবী উমা, ভৈরব মহোদর ; ৪৫। নলাহাটীতে নলা, দেবী কালিকা, ভৈরব যোগেশ বা যোগীশ ; ৪৬। কর্ণাটে কর্ণ, দেবী জয়দুর্গা, ভৈরব অভীরু বা ক্রোধীশ ; ৪৭। বক্রেশ্বরে মনঃ, দেবী মহিষমর্দ্দিনী, ভৈরব বক্রনাথ ; ৪৮। যশোরে পাণিপদ্ম, দেবী যশোরেশ্বরী, ভৈরব চণ্ড ; ৪৯। অট্টহাসে ওষ্ঠ, দেবী ফুল্লরা, ভৈরব বিশ্বেশ ; ৫০। নন্দিপুরে হার, দেবী নন্দিনী, ভৈরব নন্দিকেশ্বর ; ৫১। লঙ্কায় নূপুর, দেবী ইন্দ্রাক্ষী, ভৈরব রাক্ষসেশ্বর ; ৫২। বিরাটদেশে পাদাঙ্গুলি, দেবী অম্বিকা, ভৈরব অমৃতাক্ষ ; ৫৩। মগধে দক্ষিণ জঙ্ঘা, দেবী সর্ব্বানন্দকরী, ভৈরব ব্যোমকেশ। এই তালিকায় প্রকৃতপক্ষে পীঠসংখ্যা একপঞ্চাশতের অধিক দেখা যায়। ইহা তন্ত্র-চূড়ামণিকারের গ্রন্থে উত্তরকালীন সংস্কারকগণের হস্তক্ষেপের ফল বলিয়া মনে করি। বিবিধ পাঠান্তর সৃষ্টিরও উহাই কারণ। যাহা হউক, বর্ত্তমান তালিকা সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে, ইহাতে বাংলা অঞ্চলের কোন কোন অখ্যাত গ্রামদেবতাকে পীঠদেবীর মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য পীঠ তালিকার ন্যায় এই তালিকাটিও প্রকৃতপক্ষে কাল্পনিক, কোনরূপ কিংবদন্তী-মূলক নহে। সুতরাং তন্ত্রচূড়ামণিকারের কল্পনার বৈশিষ্ট্য আছে, স্বীকার করিতে হইবে। কারণ তাঁহাকে এক্ষেত্রে জ্ঞানার্ণবতন্ত্র, কুব্জিকাতন্ত্র প্রভৃতি প্রাচীনতর তান্ত্রিক গ্রন্থের পীঠতালিকাকে অগ্রাহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা প্রাচীনতন্ত্রেও দেখিতে পাই। প্রাণতোষিণী তন্ত্রে (২৩৪ পৃষ্ঠা) কুব্জিকাতন্ত্রের সপ্তম পটল হইতে যে সিদ্ধপীঠের তালিকা উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার সহিত জ্ঞানার্ণবের তালিকার কিছুমাত্র মিল নাই। কুব্জিকাতন্ত্রের তালিকায় নিম্নলিখিত স্থানগুলিকে সিদ্ধপীঠ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।—১। মায়াবতী, ২। মধুপুরী, ৩। কাশী, ৪। গোরক্ষকারিণী, ৫। হিঙ্গুলা, ৬। জালন্ধর, ৭। জ্বালামুখী, ৮। নাগরসম্ভব, ৯। রামগিরি, ১০। গোদাবরী, ১১। নেপাল, ১২। কর্ণসুত্র, ১৩। মহাকর্ণ, ১৪। অযোধ্যা, ১৫। কুরুক্ষেত্র, ১৬। সিংহনাদ, ১৭। মণিপুর, ১৮। হৃষীকেশ, ১৯। প্রয়াগ, ২০। বদরী, ২১। অম্বিকা, ২২। অর্দ্ধনালক, ২৩। ত্রিবেণী, ২৪। গঙ্গাসাগর সঙ্গম, ২৫। নারিকেল, ২৬। বিরজা, ২৭। উড্ডীয়ান, ২৮। কমলা, ২৯। বিমলা, ৩০। মাহিষ্মতীপুরী, ৩১। বারাহী, ৩২। ত্রিপুরা, ৩৩। বাগ্‌মতী, ৩৪। নীলবাহিনী, ৩৫। গোবর্দ্ধন, ৩৬। বিন্ধ্যগিরি, ৩৭। কামরূপ, ৩৮। ঘণ্টাকর্ণ, ৩৯। হয়গ্রীব, ৪০। মাধব, ৪১। ক্ষীরগ্রাম, ৪২। বৈদ্যনাথ। সম্ভবতঃ এই তালিকাও পূর্ব্বভারতে রচিত ; কিন্তু ইহাতে পীঠসংখ্যা পঞ্চাশতের কম এবং কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার উল্লেখ নাই দেখিয়া মনে হয়, ইহা জ্ঞানার্ণবের তালিকা অপেক্ষা প্রাচীন। পণ্ডিতেরাও কুব্জিকাতন্ত্র গ্রন্থখানিকে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, ভারতীয় তীর্থসমূহে অবস্থিত বিভিন্ন দেবদেবীর সহিত আদ্যাশক্তির অভিন্নত্ব কল্পনাটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। পরে ঐ তীর্থগুলিকে আদ্যাশক্তির পীঠ অর্থাৎ অবস্থিতির আসন, বেদী বা স্থান স্বরূপ জ্ঞান করা হইত। আরও পরবর্ত্তীকালে উহার কতকগুলি স্থানে সতীর শবাংশ পতনের কল্পনা করা হয়। পীঠ স্থানের সংখ্যা প্রথমে ছিল একশত আট ; পরে উহা অনির্দ্দিষ্টসংখ্যক হয়। আরও পরবর্ত্তীকালে উহার সংখ্যা পঞ্চাশ নির্দ্ধারিত হয়। সর্ব্বশেষে অর্থাৎ ষোড়শশতাব্দীর পরে পীঠের সংখ্যা একান্ন স্থির হইয়াছে। পীঠ কল্পনার উৎপত্তি এবং বিকাশের সহিত বাংলা ও কামরূপ অঞ্চলের শক্তিসাধকগণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়।

পীঠস্থান সমূহের মধ্যে অনেকগুলির অবস্থিতি নির্ণয় অত্যন্ত সহজ। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে স্থাননির্ণয় কঠিন ; এমন কি অসম্ভবও বলা চলে। ইহার অন্যতম কারণ তালিকাগুলির পাঠের অশুদ্ধি। এই পাঠাশুদ্ধি তান্ত্রিক লেখকদিগের অনেকের ভাষাজ্ঞানের অভাব হেতু এবং বহুবারের সঙ্কলন, অনুকরণ, অনুলিখন প্রভৃতির মধ্য দিয়া আসার জন্য এরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে যে, অনেক স্থানের পাঠকে নিতান্তই কাল্পনিক এবং অস্বাভাবিক মনে হয়। যাহা হউক, বারান্তরে আমরা পীঠ-স্থানগুলির অবস্থিতি নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

এদের জীবন

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

এদের জীবন-আকাশে এখন যে শরতের পূর্ণ জ্যোৎস্না-ধারা, সেখানে মৃত্যুর কালো ছায়া নেই। এরা এখন সুখী—পায়ের তলার পৃথিবীকে এখন এরা গ্রাহ্য করে না। এই মায়া-ভরা রাত—মহুয়ার ঘন নেশায় এই রাতকে এরা উপভোগ করতে চায়—প্রাণভরে জীবনের সমস্ত মাধুর্য দিয়ে এরা চায় এই সুন্দর রাতটিকে উপভোগ করতে। পৃথিবী এখন এদের। দিবসের নগ্ন কোলাহল—বাস্তবের মলিন মৃত্যু-জীবনের ক্ষুধার্ত হাহাকার—প্রাণধারণের দৈনন্দিন গ্লানি—নাই বা এলো এদের জীবন আকাশে—এই পরিপূর্ণ সুখ-রজনীর মাঝে। তার চেয়ে এখন এরা বেঁচে থাকুক—জীবনের ঘুমন্ত পরমায়ু নিয়ে এরা এখন বেঁচে থাকুক! অলোক তন্দ্রাকে আরও কাছে টেনে নিলে। তন্দ্রার চক্ষে এখন জীবনের স্পন্দন। কে বলবে এদের দেখে যে দিবসের প্রখর সূর্যতাপে—দুর্যোগভরা সংগ্রাম মুখরতায় এরাই আবার মৃত্যুকামনা করে!

আবেশ বিহ্বলতায় তন্দ্রার আঁখিপল্লবে ঘন তন্দ্রার আমেজ জড়িয়ে আসে। অলোক তার হাতখানি টেনে নেয় তার স্পন্দিত বক্ষে—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জীবন মাধুর্য্যভরা আবেগে ডাকে—তন্দ্রা, তন্দ্রা, এই, ওগো!

কপট নিদ্রায় তন্দ্রা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। স্বামীর আহ্বানে বাইরে সাড়া না দিলেও অন্তর তার সাড়া দেয় অত্যন্ত সন্তর্পণে। সাগ্রহে সে অপেক্ষা করতে থাকে অলোকের জীবন ভরা, অন্তর ভরা এমনি বহু আহ্বানকে। অলোক বললে—দুষ্টুমি করা হচ্ছে? এইবার কিন্তু নাকে নস্যি দিয়ে দেবো।

নস্যির কথা শুনেই তন্দ্রা কিল্‌বিল্ করে ওঠে। নস্যিকে তার ভয় হয়। হেঁচে কেশে একাকার হয়ে যেতে হয়—অলক—তার স্বামী ওই বদ-নেশাটি করে কেমন করে নির্বিবাদে যেন আরও জীবন-আমেজকে অনুভব করে। তন্দ্রাকে জাগতে দেখে অলোক বলে—কেমন, ঘুমোও না দুষ্টু মেয়ে। কথায় যে সাড়া দেবে না?

তন্দ্রা কপট ক্রোধে উত্তর দেয়—রাক্ষস কোথাকার। মানুষের একটু সুখও যদি সহ্য হয়! সারাদিন খেটে খুটে কোথায় একটু ঘুম এসেছে অমনি দুষ্টুমি সুরু হোল!

অলোক প্রতিবাদ জানায়—আর একজন স্ফূর্তি করে বাড়ি ফিরেছে—ট্যাক্সি চড়েছে—সিনেমা দেখেছে, যে তার ঘুম না এলে কারুরই দুর্ভাবনা নেই!

—যার ঘুম না আসবে সে উঠানে পায়চারি করবে, কিংবা চৌবাচ্চার জল মাথায় ঢালবে।

—আর যার ঘুম আসবে সারা দুপুর ঘুমিয়েও, তার নাকে নস্যি দিয়ে জাগিয়ে দেওয়া হবে। আলবৎ—নিশ্চয়ই!

তন্দ্রা স্বামীর গালে মৃদু ঠোনা মেরে বলে—মিথ্যুক, দুপুরে ঘুমিয়েছি, ছেঁড়া জামা কাপড়গুলোতে তালি দিলে কে? রাজ্যের বিছানাপত্তরে সাবান মাখিয়ে কেচে দিলে কে? গুল্ পাকালে কে? খোকার পায়ে মালিশ করলে কে?

অলোক ঠোঁট উল্টে জবাব দিলে—ভারী কাজের ফিরিস্তি দেখাচ্ছেন? আসলে কেন বলো না, ডিটেক্‌টিভ্ নভেল পড়লে কে? পাড়া বেড়ালে কে? গঙ্গাজলের ঘরে গিয়ে রেডিও শুনলে কে?

তন্দ্রা ছিটকে সরে যায় স্বামীর কাছ থেকে—মিথ্যে কথা বললে মুখে পোকা পড়বে—

অলোক পাল্টা জবাব দিলে—সত্যবাদিনীর বিচার ভগবান করবেন।

—বেশ বেশ তাই; ভগবান যেন সত্যিই বিচার করেন, তন্দ্রা ওপাশ ফিরে শুলো।

অলোক চন্দ্রালোকের অস্পষ্ট ভাবছায়ায় তার ঘনসন্নিবেশে সরে এসে পিঠের ওপর হাতখানি রাখলে—লক্ষ্মীটি রাগ করো না, সোনা আমার, মাণিক আমার, শোন একটা কথা বলি—শোন, শুনছ; তন্দ্রা, এই!

তন্দ্রা কপট-নিদ্রায় অভিভূতা; পৃথিবীর স্বর্গ রাত্রির মাদকতায় আলোছায়ার রহস্য নিবিড়তায় তার কোলের কাছটিতে নেমে এসেছে, সে অনুভব করছে জীবনকে—মন্দাকিনীর সুধাধারা জীবন-মালিন্যকে তার ধুয়ে মুছে দিয়েছে।

মুহূর্তের পরমায়ু শিশির বিন্দুর মতন ঝরে পড়ে। রিকেটি ছেলেটার আত্মঘাতী কান্নায় এদের নেশা ছুটে যায়। অবসাদের মাঝে বিরক্তি ওঠে জেগে—ওরা পারে না—পারে না এমনি করে নিয়ত মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে জীবনের গ্লানি ভারবাহী গাধার মতন বহন করতে।

তন্দ্রা স্বামীর বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে জীবনের

রণক্ষেত্রে নেমে আসে। রুগ্ন ছেলেটার পিঠ চুলকে দিয়ে, গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে পাখার বাতাস দিয়ে পরিচর্যা করতে থাকে—লক্ষ্মী সোনা আমার; মাণিক আমার, যাদু আমার—ঘুমোও!

পৃথিবীর ঘুমকে জাগিয়ে দিয়ে খোকা আরও তারস্বরে চীৎকার করে ওঠে। তন্দ্রা আরও জোরে পাখা চালায়—পোড়ার মুখো আকাশ—কেমন ধবধবে জ্যোছ্না ছিল, আর তাতে তবু বেশ হাওয়া খেলছিল। আমরণ, কোত্থেকে কালোমুখো মেঘ এসে বাতাসটা একেবারে বন্ধ করে দিলে গা।

হাতের পাখাটাকে নাড়তে নাড়তে তন্দ্রা মৃদুস্বরে সুর ধরে—আয় চাঁদ আয়, খোকার কপালে টি দিয়ে যা।

ব্যর্থ প্রচেষ্টা তন্দ্রার। জ্যোৎস্নার পূর্ণচন্দ্র আষাঢ়ের ঘনমেঘে ঢাকা। হালদার-পাড়ার অন্ধগলির অন্ধকার একতলার বন্ধ ঘরের সঙ্কীর্ণ বাতায়ন পথে পৃথিবীর চাঁদকে এখন জাগান যায় না।

খোকার কান্না আরও চড়াসুরে রুদ্ধ বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে তোলে, তন্দ্রা নতুন সুরে ঘুমপাড়ানী গান ধরে রুগ্ন ছেলেটাকে বুকের মাঝে চেপে ধরে—

খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়োল বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে?

কিন্তু নাঃ, তন্দ্রা আর পারে না। কর্কশ কণ্ঠের কান্নার চীৎকারে তার সুরান্বিত কণ্ঠ বেসুরো হয়ে ওঠে—হতভাগা ছেলে কোথাকার! কি হয়েছে তোমার? পিঠ চুলকে দিচ্ছি, বাতাস করছি, আদর করছি, পোড়ার মুখো ছেলের কিছুতেই কিছু হয় না। আর কি করতে হবে শুনি?

খোকার কান্না আরও চড়া পর্দায় ঠেলে ওঠে—রোগা হাড়গিলগিলে চেহারা তার বিদ্রোহের তেজে বাঁকা ধনুকের আকার ধারণ করে—অতি কুৎসিৎ তার অঙ্গভঙ্গি, আরও কুৎসিৎ তার কান্নার কর্কশ কণ্ঠস্বর।

তন্দ্রা এবার ক্ষেপে ওঠে—মাতৃত্বের মাঝে সহনশীলতার এবং ধৈর্যের যে একটা সীমা আছে অবশ্যই খোকার কান্না সে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। ক্ষিপ্ত তন্দ্রা ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো—বাঁকা ধনুকের মতন হাড়গিলগিলে ছেলেটাকে সোজা করে শুইয়ে দিয়ে তার রুগ্ন বিশীর্ণ গালে গোটাকতক চড় বসিয়ে দিলে ঠাস্‌ঠাস্ করে। উত্তপ্ত অগ্নিকুণ্ডে যেন ঘৃতাহুতি অর্পণ করা হোল—আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তারস্বরে, রুগ্ন শিশুটা চীৎকার করে উঠলো—তার সরু কণ্ঠনালীটা বুঝি এইবারে কান্নার আক্রোশে ছিঁড়ে পড়ে।

অলোক এতক্ষণ চুপ করেই ছিল; কিন্তু জীবনে এখন তার বিস্বাদ লাগে।

বিরক্তিভরা কণ্ঠে সে বলে—আঃ, রাত দুপুরে আরম্ভ করলে কি, খোকাকে ছেড়ে দিয়ে বিদ্রোহিনী তন্দ্রা রণরঙ্গিণী রূপে অলোকের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিয়ে দিলে—খেলা করছি! যেমন বাপ তেমনি তার ছেলে! থাম্ বলছি—ফের যদি ওই শকুনির মতন গলার স্বর শুনি তো মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো!

অলোক লক্ষ্য স্থির করে শরবাণ নিক্ষেপ করলে—হাড় কি আর ওর আছে যে গুঁড়িয়ে দেবে? হাড়মাস ওর যে দুবেলা চিবিয়ে খাচ্ছো!

তন্দ্রার মনের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা অলোকের এই শ্লেষবাক্যে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো—ক্রন্দনরত শিশুটাকে স্বামীর শয্যার দিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো—যার পাপ সেই ভুগুক্—আমি পারবোনা—কক্ষণো পারবোনা এই পাপের বোঝা বইতে। সমস্ত দিন হাড়ভাঙা খাটনি খেটে রাতে না ঘুমিয়ে —তারপর লোকের এই দাঁত খিঁচুনি সহ্য করা—কেন আমি কি মানুষ নই? ভগবান, কত পাপই যে করেছিলাম! ভাঙা কান্নায় তন্দ্রা ভেঙে পড়ে।

অলোকই বা কি করতে পারে! সমস্ত দিন অফিসে হাড়ভাঙা পরিশ্রম, তারপর প্রাইভেট টিউসানি, বাজার হাট, অর্থ চিন্তা, সংসার চালানর ঝক্কি—পুরুষ বলে তার পরিশ্রম তন্দ্রার তুলনায় কম কিছু নয়। আর যে চিন্তার জটিলতা তার দেহমনকে নিষ্পেষিত করে, যে দুর্ভাবনা যে ঝড় ঝাপটার আঘাত তাকে সহ্য করতে হয় তন্দ্রার দায়িত্ব সেখানে কতটুকু? কতটুকু ভার গ্রহণ করতে হয় তন্দ্রাকে? ছেলেটা কাঁদছে—রুগ্ন ছেলে—আজন্ম রোগ ওর। ওকে সারাতে অলোক কিছু কর্তব্যের ত্রুটি করেনি। ডাক্তার দেখিয়েছে—ধার করে ওষুধ পথ্য জুটিয়েছে—তবু যদি ও না সারে—তবু যদি ও কাঁদে—অলোক তার জন্যে কি করতে পারে? তন্দ্রা ওকে মারছে—সে প্রহারের কতখানি অংশ অলোকের বুকে এসে আঘাত দিল সে হিসাব কি তন্দ্রা রাখেনা? কেন ওকে নিয়ে একটু বেড়ালেই তো হোত!

তেজস্বিনী তন্দ্রার বিদ্রোহ অজস্র চোখের জল আর ফোঁপানির মাঝে বিস্তার লাভ করে। শিশুটিও তেমনি তারস্বরে চীৎকার করতে সুরু করে দিয়েছে, অলোক রুগ্ন ছেলেটাকে বুকে নিয়ে ঘরের বাইরের দাওয়ায় এসে পায়চারী সুরু করে দেয়। তার পিঠ চাবড়ে ঘুম পাড়ায়—তাকে শান্ত করার নানা কৌশল খুঁজে বার করে।

ক্লান্তিতে তার অঙ্গ ভরে আসছে—বিরক্তিতে অন্তর পরিপুর্ণ হয়ে উঠছে, বিষাক্ত, তিক্ত, কটু লাগছে তার জীবনকে।

ভোর না হতেই আবার সুরু হবে জীবন সংগ্রাম। ছাত্র

পড়িয়ে বাড়ী ফিরবার পথে বাজার সেরে আসা। তারপর ঝড়ের গতিতে স্নানাহারের পর্ব শেষ করে অফিস্ যাওয়া।

আর তন্দ্রা, তার জীবনেই বা কি মাধুর্য্য আছে? রুদ্ধ অশ্রুর আবেগে নিশীথ অন্ধকারের মাঝে তার দুঃসহ জীবন ভার তাকে জর্জ্জরিত করে ফেলে! জীবনের প্রতি তার এতটুকু আর মায়া জাগেনা, এমনি ভাগ্যহত বিড়ম্বিত জীবনের কোন আস্বাদই সে আর খুঁজে পায়না এখন।

সকাল হতে না হতেই সুরু হবে তার জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া রান্নাবান্না, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, স্বামীর অফিসের ভাত, টিফিন, ঘর-সংসারের সহস্রবিধ কাজ—তার সঙ্গে আছে দারিদ্র্যের সংযোগ। পরিপূর্ণ উদর পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে নিত্য বলি দিয়ে এ বেঁচে থাকার কি স্বার্থকতা থাকতে পারে! আর কোথা থেকে এসেছে ওই মৃত্যুরূপী কালশিশুটি, কাদায় কাদায় সমস্ত দিনটিকে তার ভরিয়ে তুলবে অস্বাস্থ্যের অস্বাচ্ছন্দ্যে। তবু—তবু অলোক সুখী হতে পারে না তাকে নিয়ে। তন্দ্রাও চায়না অলোকের সংসারে একরত্তি বাস করতে—এদের দুজনেই এখন কামনা করে মৃত্যুকে।

ভোরের অস্ফুট আলোকের রহস্য নিবিড়তায় তন্দ্রা এবং অলোক দুজনেই জেগে ওঠে। রুগ্ন ছেলেটা সারারাত্রির দাপাদাপিতে এখন নিদ্রা-মগ্ন।

তন্দ্রা ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠতে গেলে অলোক তার আঁচল ধরে টান দেয়—এরই মধ্যেই উঠছো কেন? সকাল হতে এখনও দেরী আছে।

তন্দ্রা উত্তর দেয়—দেরী কোথায়? ওই তো কাক ডাকছে?

অলোক আপত্তি জানিয়ে বলে—ও কাক নয়, ও হচ্ছে রাতের পেঁচা। স্বামীর কথায় তন্দ্রা খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে।

অলোক তন্দ্রার কাছে সরে এসে আব্দার জানায়—মাথার চুলগুলি একটু আস্তে আস্তে টেনে দাওনা।

তন্দ্রা বলে—রান্নাবান্নার আজ আর দরকার নেই তো? অফিস যাবার সময় পান থেকে চুনটী খস্‌লে তো আবার কুরুক্ষেত্র বাধাবে।

অলোক বলে—আমি, না তুমি?

তন্দ্রা প্রতিবাদ জানায়—আমার মেজাজ তোমার মত হলে—তোমার সংসারে বেশীদিন আর থাকতে হতো না।

অলোক মিনতি প্রকাশ করে—ভোর বেলায় লক্ষ্মীটী ঝগড়া আর বাধিও না। দাও মাথার চুলগুলো একটু টেনে দাও!

তন্দ্রা বলে—সত্যি বলছি কাক ডাকছে—ভোর হয়ে গেছে ছাড়ো—উঠে পড়ি—রাজ্যের কাজ পড়ে আছে।

অলোক তন্দ্রার হাতখানি দৃঢ়বদ্ধ মুঠির পর টেনে নিয়ে আবেগের সুরে বলে—না ডাকছেনা।

তন্দ্রা বলে—তা হলে রান্নাবান্নার আজ দরকার নেই তো?

অলোক উত্তর দেয় না।

—আফিস্ যাবে না?

—না।

তন্দ্রা পরম প্রীতিভরে স্বামীর মাথার চুলগুলি টেনে দেয়। অলোক অনুভব করে জীবন মাধুর্য্যকে। পৃথিবীতে মালিন্য এখন কোথায়? মৃত্যুর কালোমেঘ প্রভাতের সূর্য্যালোকে ঢাকা পড়ে গেছে। তন্দ্রা আর অলোক এমনিই পরমায়ু নিয়ে যদি বেঁচে থাকে, তাতে পৃথিবীর কতটুকু ক্ষতি হতে পারে? কিন্তু এদের এ জীবনের পরমায়ু কতটুকু? প্রভাত সূর্য্যের প্রথম আলোটির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই এরা উঠে পড়ে। রান্নাঘরে তন্দ্রা হিম্-সিম্ খাচ্ছে—পোড়া কয়লা ধরতে যেন কিছুতেই চায় না। আর সেই রিকেটি ছেলেটার একটানা কান্নার সুর। বেলাও বেড়ে চলেছে হু হু করে—তন্দ্রা পারেনা এই মুহূর্ত্তের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে।

আর অলোক! ছাত্র পড়িয়ে বাজার হাতে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে আসছে সে—ন'টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী; এখনও তার স্নানাহার বাকী। অফিসের হাজিরা খাতায় আজ বুঝি লাল কালির দাগ পড়ে।

আলো

শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন

অনাদি অনন্ত হ'তে-সৃষ্টির প্রথম—
চাহে সবে "আলো, শুধু আলো"।
নর নারী—পশুপক্ষী—স্থাবর জঙ্গম,
কেবা চাহে অন্ধকার কালো?

ভারতীয় ইতিহাসের সূত্র

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্

২

ভারতীয় সভ্যতার বহিরঙ্গ ছাড়িয়া যখন অন্তর্লোকে দৃষ্টিপাত করি, তখন স্পষ্টই দেখিতে পাই, সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা প্রাক-আর্য্য সভ্যতাকে বহুল-পরিমাণ প্রভাবান্বিত করিয়াছে। এই খানেই ভারতের পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মবিশ্বাস ও পরবর্ত্তী দার্শনিক তত্ত্বাদির অনেক আদিম নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে; মাতৃকা পূজা, লিঙ্গ বা প্রতীক উপাসনা, নাগপূজা ও বিবিধ জীবজন্তুপূজার মূল সূত্রের উপাদান এখানে বর্ত্তমান। এইখানে যে ভূ-মাতার কল্পনা আছে—যাহাতে ইঙ্গিত করা হইতেছে জড় হইতেই প্রাণের প্রথম আবির্ভাবরূপ উদ্ভিদের সৃষ্টি—তাহার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিমাণ। এই মাতৃকা দেবতাই আদ্যাশক্তিরূপে উত্তরকালে ঋগ-বেদের "দেবী সূক্তে" আধ্যাত্মিক মহিমায় মণ্ডিত হইয়াছেন, কেনোপনিষদের "উমা-হৈমবতী" উপাখ্যানে মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মবিদ্যারূপে দেবগণের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছেন। যে শক্তিবাদ আগম ও নিগমের দুর্গম দুর্লভ শক্তিসাধনার রোমাঞ্চকর পথ দেখাইয়া তন্ত্রাদির ভিতর দিয়া পূর্ব্ব ও উত্তর ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, যাহা বাংলা ও আসামে শক্তি-সাধনার পীঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার বীজ যে সিন্ধু সভ্যতায় উপ্ত ছিল না তাহা কে বলিতে পারে? এইখানেই সর্ব্বপ্রথম যোগাসন-উপবিষ্ট মহাযোগেশ্বরের মূর্ত্তি দেখিতে পাই—যাঁহার নাসাগ্রবদ্ধদৃষ্টি, যোগাবিষ্টভাব, অঙ্গের ত্রিপত্র-চিহ্নিত উত্তরীয় প্রমাণ করিতেছে—যোগের মূলতত্ত্বগুলি সিন্ধু সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল দিনে ভারতে অজানা ছিল না, এমনকি আমাদের শিল্পকলার প্রকটিত চরম ও পরম আদর্শ ধ্যানীবুদ্ধমূর্ত্তি—যাহা ডাঃ কুশে হেলেনিক্-কুশান প্রভাব হইতে উৎপন্ন মনে করেন তাহা—যে এই প্রাচীন আদর্শ হইতে গৃহীত নয় তা কে বলিতে পারে—ব্রহ্মজালসূত্রে (দিগ্ নিকায়) বর্ণিত আছে—দেবতা মনুষ্য কেহই বুদ্ধের জীবনান্তে তাঁকে দেখিতে পাবেন না, তিনি লোকোত্তর অরূপাতীত অরূপব্রহ্মাতীত। যে শৈব দর্শনের পূর্ণ পরিণতি দেখি কাশ্মীরে ও দক্ষিণ ভারতে, যে শৈবকে হিন্দু বৈদিক সন্ধ্যার মন্ত্রে "ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম" রূপে ধ্যান করেন, সেই শিবতত্ত্বের সর্ব্ব-প্রথম ঐতিহাসিক নিদর্শন এইখানে পাওয়া গিয়াছে। শিবের আদিম রূপ সিন্ধুউপত্যকায় যোগীশ্বর, পশুপতি, ত্রিবক্ত্র মূর্ত্তিতে কল্পিত হইয়াছিল, ইহাই বেদের রুদ্রতত্ত্বের সঙ্গে মিশিয়া পরবর্ত্তী যুগে এক বিরাট শৈব সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এমনি ভাবে প্রাক-আর্য্য সভ্যতা আর্য্য-সভ্যতার ভিতর আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে যে সম্পূর্ণ প্রমাণাভাবে তাহার সম্যক্ বিচার-বিশ্লেষণ অসম্ভব।

ঋগ্ বেদ মূলতঃ এক উন্নত সভ্য সমাজের চিত্র দিতেছে। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে আসিয়া কি ভাবে যাযাবর আর্য্য-জাতির এক শাখা স্থায়ী-ভাবে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, কিম্বা কি পরিবেষ্টনের ভিতর ভারতীয় সাধনার মূলমন্ত্র বৈদিক সূক্তগুলি রচিত হইয়াছিল, তাহার সম্যক্ পরিচয় এখনো অজ্ঞাত। তাই কোন ঐতিহাসিক এই সভ্যতাকে বলিয়াছে—"It is like minerva born in panoply"—ঠিক যেন সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা মিনার্ভা দেবী বিশ্বপিতার মস্তক হইতে অকস্মাৎ আবির্ভূতা হইয়াছেন! কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? বোগজ্‌কুই শিলালেখ, তেল্-এল্-আমরণার পত্রাবলিতে, ব্যাবিলোনের কাশ-জাতির cassitesদের ইতিবৃত্তে, মিটানী জাতির লেখে, আসুর্ব্বানীপালের গ্রন্থাগারে রক্ষিত মৃৎপুস্তকে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, নাসত্য, সূর্য্য, মরুত, হিমালয়, দশরথ, অসুর প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান করা যায়—বৈদিক সংস্কৃতি এক মৌলিক প্রাচীনতর আর্য্য সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

প্রাচীন ইরাণের সঙ্গেও এই কৃষ্টিমূলক ঐক্য সূচিত হয়। অনেক বৈদিক আখ্যানের সঙ্গে আবেস্তা আখ্যানের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। স্যার আরেল্ ষ্টীনের মতে আধুনিক খনন্-কার্য্যও এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করে।

বৈদিক্ সভ্যতার সঙ্গে গ্রীসদেশীয় সভ্যতারও কতক সামঞ্জস্য দেখা যায়। স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ বলেন যে, উপনিষদের যুগেই ভারতীয় মূলতত্ত্বগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয়। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ সাংখ্য, যোগ, বেদান্তদর্শনে, সত্য পরিস্ফুট হইয়াছে প্রকাশের স্বরূপকে অতিক্রম করিয়া। ভারতবর্ষ উপলব্ধি করিয়াছিল—সত্যের নিরঙ্কুশ দৃষ্টি সব প্রকাশের অতীত, উহা মানস ও অতিমানস লোকেরও অতীত; সেইজন্যই উহাকে শান্তং বলা হইয়াছে—মন, বাক্, ও চিত্ত এখানে নির্ব্বাপিত; অন্যদিকে গ্রীক দর্শন ও তাহার উত্তরাধিকারী ইউরোপীয় দর্শন—সত্যকে বিশ্বপ্রকাশের মধ্যেই পাইতে চাহিয়াছিল। তবে ইহাও একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত যে পিথাগোরাস ও প্লেটো ভারতীয় মতবাদে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ভারতের ইতিহাসের কৃষ্টির সম্যক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "ভারতে আন্তরিক সাধনার ধারাবাহিক ইতিহাস যদি আমরা স্পষ্ট করে দেখতে পেতুম, তা'হলে ভারতের প্রাণবান্ ইতিহাস যে কোনখানে তা আমাদের গোচর হ'তে পারত, তা হ'লে জানা যেত যে—ভারতবর্ষ যুগে যুগে কী লক্ষ্য করে চলেছে এবং সেই লক্ষ্য সাধনে কি পরিমাণে সিদ্ধি।" কোন কোন চিন্তাশীল লেখক বলেছেন যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় জীবন-বিমুখীনতা a static application of a dynamic truth। বৌদ্ধ সংস্কৃতির রূপের কথা বিচার করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার বলিয়াছেন যে বুদ্ধদেবের চিন্তাতেও এই জীবনবিমুখীনতা প্রভাববিস্তার

ক[illegible]াছে। তবু তখনকার সমাজজীবনে বৌদ্ধমতবাদ এক মস্ত বড় বিপ্লবের সূচনা করিয়াছিল, যাকে প্রগতিশীলরা বলে থাকেন বস্তুনিষ্ঠ চেতনার আবিষ্কার, কেন্দ্রাভিমুখী সংগঠন, এক জনসমন্বয়ী ব্যবস্থার জীবননীতির (code of ethics) নিরীখ বদলান।

আলেকজেণ্ডারের ভারত অভিযান, প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোকের ধর্ম্ম বিজয় ও সৎধর্ম্ম প্রচারের ফলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্পর্শ ঘনীভূত হয়। ভগবান তথাগতের উপাসক মিনাণ্ডার, চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান্, ইৎসিন, ইওয়ান্ চোয়াং, গ্রীক রাজদূত মেগাস্থানিস্, শকক্ষত্রপ, রুদ্রদমন, বৈষ্ণব ভাগবৎ হেলিওডোরাস্, মহারাজ কনিষ্ক, কুচীর পণ্ডিত কুমারজীব, খোটানের শিক্ষানন্দ—এই ভাগবত, কৃষ্টিগত ও ধর্ম্মমূলক সমীকরণের প্রকাশ। এই ধারা পরবর্ত্তীযুগে অব্যাহত থাকিয়া এক বৃহত্তর ভারতের সৃষ্টি করিয়াছিল। স্থবির মহাকাশ্যপ, কবি অশ্বঘোষ, শীলভদ্র, দীপঙ্কর (অতীশ), পণ্ডিত নাগার্জ্জুন, দিঙনাগ, ভিক্ষুণী সংঘমিত্রা, ভিক্ষু উপালী, ঐতিহাসিক তারানাথ, বসুবন্ধু, চন্দ্রগোমী, ধীমান, বীতপাল এই কৃষ্টির অনির্ব্বাণশিখা দেশদেশান্তরে প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছিল। সুবিখ্যাত পণ্ডিত ৺কাশীপ্রসাদ জয়সোয়ালের মতে ভারতবর্ষ বলিতে প্রাচীন কালে বৃহত্তর ভারতবর্ষকেই বুঝাইত—ইহা উত্তরে তুষারশীর্ষ হিমকিরীটী পামীর ও হীরাট এবং দক্ষিণে সমুদ্রমেখলা দ্বীপময় ভারত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল পুণ্যভূমিই ভারতভূমি। বর্ত্তমান ভারতকে বলা হইত "কুমারী" বা "মানব দ্বীপ।"

ভারতীয় ঐতিহ্যের দরবারে ইসলামিক সংস্কৃতির দান অপূর্ব্ব। ভারতবর্ষে যখন ইসলাম আসিল, তখন নানা ঘাতপ্রতিঘাতে ভারতের প্রাণশক্তি—ইতিহাসের পুরোগামিনী গতি—নিরর্থক বাহ্যানুষ্ঠান ও নিশ্চল আচারপুঞ্জের মধ্যে অল্পাধিক ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিতেছিল। ইসলামের মতো একটা প্রচণ্ড বেগবান বিরুদ্ধ সংস্কৃতির আবির্ভাব ভারত ইতিহাসে মোটেই আকস্মিক নয়। যুগে যুগে ঠিক এই ভাবেই ঘাতপ্রতিঘাতে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা আপনাকে প্রব[illegible]ান করিয়া লইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তীকালে সূত্র-ব্রাহ্মণ-ক্রিয়াকাণ্ডের দিনে বৌদ্ধযুগের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক ছিল না, ইহাও ঠিক তেমনি। পরবর্ত্তীকালে পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিযানের অব্যবহিত পূর্ব্বেও ঠিক এইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়। যখনই ভারতের প্রাণশক্তি ক্ষীয়মান হইয়া আসে, তখনই যেন বাহিরের প্রচণ্ড শক্তি ভারতকে ধাক্কা দিয়া তাহার হারানো সম্বিৎ ফিরাইয়া আনে।

ইসলামের একেশ্বরবাদ ও দৃঢ়নিষ্ঠা ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে মিশিয়া ভারতকে দান করিল—এক অপূর্ব্ব সহজ ধর্ম্মবাদ, ভাবজগতে আনিল সুফী ও বৈদান্তিকের সমন্বয়। সুফী যখন বলেন আমার আল্লাহ আকাশের উপর সতের হাজার পর্দ্দায় ঘেরা থাকেন না—সেটা তখন শুধু ইসলামেরই কথা নয়—সবারই কথা। Christian mysticদের Holy grailএর সন্ধানে যাওয়ার ইতিহাসও এক Common মনের রহস্যের অতীত প্রকাশের [illegible] জানায়—যেখানে দ্বন্দ্ব নেই, সংঘর্ষ নেই। কবি ইকবাল যাকে [illegible] [illegible]নি খুদিবাদী, তিনিও বলেছেন ভগবান আসছেন আমাদের প্রোষিতভর্ত্তৃকার মত ; এই বিশ্বজগতের প্রতি রূপটি তিনি ভোগ করছেন, তাঁরি বাণী আমরা পাচ্ছি তরুলতার পত্রে পত্রে, পাখীর প্রতি কাকলীতে, যাহার প্রকাশ দেখি সাধু সন্ত সম্প্রদায়ের অমূল্য বাণীতে। ভক্তিবাদ ভারতে নূতন নয়, কিন্তু ইসলাম সংস্পর্শে ইহা এক বিচিত্ররূপ ধারণ করিল। শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন তাহার "ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা" নামক গ্রন্থে ইহার পরিচয় দিয়াছেন। রামানন্দ, দাদু, কবীর, নানক, মক্‌দুম, সৈয়দ আলি, এমন কি চৈতন্য পর্য্যন্ত এ হিন্দু মুসলিম সমন্বয় যুগের প্রতীক। এই দুই বিরাট ধর্ম্মের ভিতর যত বিভিন্নতা—সবই বাহিরের অনুষ্ঠান লইয়া, কিন্তু উভয়ের ভিতর অন্তর্নিহিত আছে যে পরম সত্যের শাশ্বতরূপ, তাহাই দাদুর অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা দিয়াছিল, তাই দাদু বলিয়াছেন—

"হিন্দু লাগে দেহুরৈ, মুসলমান মসীতি।
হামলাগে এক অলেখৈ সদা নিরংতর প্রীতি ॥"

কবীর সম্বন্ধে আওারহিল বলেন,—"তিনি ব্রহ্মণ না সুফী, বৈদান্তিক না বৈষ্ণব, তা বলা যায় না। তাঁর কাব্য সকল রকমেই মরমী লীলাময় চঞ্চল অমূর্ত্তের শ্রেষ্ঠতম উপলব্ধি। একাধারে তিনি আল্লারও সন্তান, রামেরও সন্তান।" আলবেরুণীর "তহকী—কাতুল—হিন্দ" (ভারতের সত্য পরিচয়), "কেতাবুল হিন্দ," সম্রাট আকবরের দীন—ইলাহি ধর্ম্ম স্থাপনের চেষ্টা, সাজাহানের প্রিয় পুত্র দারাসিকোর "মজমা—অল্—বহরইন" ও "সিবর—ই—আকবর" ভারতীয় সংস্কৃতির অর্জ্জনমূলক দিকেরই সূচনা করে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ভারতীয় পণ্ডিতগণ ইসলাম ধর্ম্মের তত্ত্বগুলি "আল্লোপনিষদের" মধ্য দিয়া ভারতের সনাতন ভাবধারার সঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছেন।

পারস্য ভাষা ও হিন্দি ভাষার সংমিশ্রণে ভারতবর্ষে যে উর্দ্দু ভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল—কবির, আমীর খসরু, গালিব, হালি ও বহু কাশ্মীরী পণ্ডিত যাহা সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন—তাহা এখন ভারতীয় সংস্কৃতির অপরিহার্য্য অঙ্গ। হিন্দু ও ইসলামিক চিন্তাধারার আপাত-দৃশ্যমান্ বিরোধ অন্তর্হিত করিবার জন্যই এই সাহিত্য ও ভাষার সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইসলাম ইহারই ভিতর দিয়া ভারতকে পরিবেশন করিয়াছে পারস্যসাহিত্যের উচ্চভাব ও মধুর রস। নিজেকে পারস্যসভ্যতার অঙ্গীভূত করিয়া নিয়াছে। ইসলামের সাহায্যে ও শক্তির আশ্রয়ে পারস্য চিত্রকলা ও সঙ্গীত ভারতীয় চিত্রকলা ও সঙ্গীতকে নূতন প্রাণ দিয়াছে। ভারতীয় সঙ্গীতে গজল, খেয়াল, ধ্রুপদ প্রভৃতির আবির্ভাব এবং রবাব, দিলরুবা, স্বরদ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র পারস্য সঙ্গীতের প্রভাবই সূচনা করিতেছে। মুঘল রাজ্যের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে রাজপুতানার কাঙ্গড়া রাজ্যে যে প্রাচীন চিত্রাবলী দেখা যায়, বৌদ্ধ আমলের চিত্রাঙ্কন রীতির সহিত পারস্য চিত্রকলার সংযোগ তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান। শিল্পী অসিতকুমার হালদার বলেন যে—"মুঘল ও রাজপুত চিত্রকলা, সূক্ষ্মত্ব হিসাবে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্প সম্পদ।" রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ভারত ইসলামের নিকট হইতে লাভ করিয়াছে ধর্ম্মমূলক রাষ্ট্রতন্ত্র (Theocratic state), সমাজ

ব্যবস্থায় শ্রেণীগত সাম্যবাদ। স্থাপত্যে পূর্ত্তবিদ্যায়, সঙ্গীতে সাহিত্যে ইসলাম ভারতীয় সংস্কৃতিকে বহুরূপে সমৃদ্ধ করিয়াছে। দেহের পোষাক, সমাজের রীতিনীতি, খেলাধুলা, আমোদ প্রমোদেও ভারত ইসলামের দান স্বীকার করিয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই বিরাট সমীকরণের চেষ্টা চলিয়াছে; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণভাবে সফল হয় নাই। কেন হয় নাই তাহারও নানা কারণ আছে; তবে সে বিষয়ে আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। Sir John Marshall বলেছেন—

Seldom in the history of mankind has the spectacle been witnessed of his civilisations so vast and so strongly developed, yet so radically dissimilar as the Mahomedan and Hindu meeting and mingling together. The very contrasts which exist between them, the wide divergence of their culture and their religion make the history of their impact peculiarly instructive,

ইসলামের প্রাণশক্তির অপ্রাচুর্য্যের দিনে যখন পশ্চিম দিগ্বলয়ে অস্তমান মুঘল সূর্য্যের বিলীয়মান আভা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল, সেই যুগসন্ধিক্ষণে প্রতীচী হইতে আর এক দুর্ব্বার স্রোত আসিয়া ভারতবর্ষকে সজোরে ধাক্কা দিল। তাহার প্রচণ্ড সংঘাত—আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী তাহার তরঙ্গ বিক্ষোভ—আমাদের চোখের সম্মুখেই ক্রিয়মান। বিধাতার কি অমোঘ ইচ্ছা জানি না—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার সংমিশ্রণে হয়তঃ জগতে এক মহত্তর সভ্যতা জন্মলাভ করিবে! এই সমন্বয়ের প্রথম হোতা রাজা রামমোহন। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী দয়ানন্দের অপূর্ব্ব সমন্বয়ী প্রতিভা ভারতে এক নবদৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের আজীবন সাধনাও মুক্তিহীন পীড়িত মানুষকে এই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবপ্রয়াগে আহ্বান করিতেছে। যোগী শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাধারা মানুষের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছে; দ্বন্দবিরোধ ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া মানুষ এক দুর্নিবার শক্তির প্রেরণায় দেবতাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাই মণীষী রোমাঁ রোলাঁ শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"He represents the completest synthesis of the genius of Asia and the genius of Europe." কবিগুরু, পরমহংসদেবের উদ্দেশ্যে যাহা বলিয়াছেন, ভারতের সনাতন আত্মাকেও তাহা বলা যায়:—

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা;
তোমারি জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ দিল এ জগতে।"

পশ্চাতের ধূলি

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু

একতলার সিঁড়ির নীচে সকলেরই দমবন্ধ হইবার উপক্রম হইল। তিনতলা বাড়ী "গোবিন্দ নিবাসের" তেতিশ [illegible] বাসী ঐ কয়ফুট স্থানটিতে আশ্রয় চাহিয়া বসিয়াছে এবং তাহাদের সকলেরই দাবী সকলে মিলিয়া নাকচ করিবার চেষ্টায় গলা ফাটাইতেছে। দোতলার পিসীমা তাঁহার দশ বৎসর বয়স্ক নাতিটিকে কোলে লইয়া সর্ব্বাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কাজেই তাঁহার পরে আর যাহারা আসিয়াছে তাহাদের সকলের কণ্ঠস্বরকে ধিকৃত করিয়া তাঁহার কথাগুলো গলির মোড় অবধি ত্রস্ত পথিকের গোচর হইতেছিল।

"হ্যালা, [illegible]নের মা, বলি আক্কেলের মাথা কি একেবারে খেয়েচিস্? [illegible] তে ক'রতে উঠে এলুম আর তুই কি না ধপাস্ ক'রে ঐ দা[illegible] ছোঁড়াটাকে গায়ের ওপর বসিয়ে দিলি? তোদের জন্যে জাতজন্ম কি একেবারে—"

তাঁহার কথা শেষ হইল না। একতলার নন্দরাণী ঠিক্ পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। সে ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "পিসীর কি ভিমরতি ধ'রলো নাকি গো? নবনের মার ঐ দেড় বছরের কচিটা হ'ল ছোঁড়া, ওর ছোঁয়া গেলে জাত যাবে! আর নিজের ঐ নাতিটি যে এতক্ষণ তিলিবৌএর ছেলেটার সঙ্গে ডাংগুলি পিট্‌ছিলো? ওকে কোলে বসিয়ে আহ্নিক ক'রলে উনি একেবারে সগ্‌গে যাবেন! হুঁ।"

নন্দরাণী বোধ করি প্রতিবাদটা পাকা করিয়া ঘোষণা করিবার জন্য ঘুরিয়া দাঁড়াইল। পিসীমা জ্বলিয়া উঠিলেন, "সগ্‌গে এইবার সবাইকেই যেতে হবে! এই তো ভেঁপু বেজেছে! অত তেজ!"

যে কোন প্রকারে মৃত্যুর প্রসঙ্গ উঠিলেই পিসীমা চটিয়া উঠেন। এমন কি, স্বর্গে যাওয়ার কথাটাও তাঁহার মনে ধরে না; কেননা, না মরিলে তো আর স্বর্গে যাওয়া যায় না। তাই সকল কথা ছাপাইয়া নন্দরাণীর ঐ স্বর্গগমনের অভিশাপটা তাঁহাকে বেশী করিয়া আঘাত করিল। পিসীমার এই উত্তা[illegible] হেতুটা কাহারও অগোচর ছিল না। একতলার [illegible] ঘর একটু দূরে রোয়াকের উপর দাঁড়া[illegible] অনাবশ্যক দাঁত

খুটিতেছিল। সে কহিল, "না গো পিসী বোমায় যদি মরো তো তুমি এই বাড়ীতেই থেকো। আমরা সগ্গো থেকে এসে তোমার হাতের বড়ি চচ্চড়ি খেয়ে যাবো।"

বাড়ীর প্রায় সকল ভাড়াটেকেই পিসীমাকে কয়েকটা করিয়া বড়ি দিতে হয়। বড়ি চচ্চড়ির উল্লেখে সকলেই হাসিয়া ফেলিল। পিসীমার পিছনে দাঁড়াইয়া কুসুম মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিতে হাসিতে হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

"ভাতারের কথায় যে একেবারে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিস্ লো? বলি, কটা বড়ি তোদের খেয়েচি যে অত খোঁটা দিচ্ছিস্?"

পিসীমা এইবার রীতিমত চটিয়া গিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাহার সহিত কেহ কোমর বাঁধিয়া কলহ করিবার পূর্ব্বেই উঠানের খোলা দরজা দিয়া একটা ছাগশিশু সবেগে এবং সরবে একেবারে উঠান পার হইয়া এইদিকেই ছুটিয়া আসিল এবং তাহার পিছু পিছু সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়া অমর রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিল।

অমর একটু দ্রুতপদে আসিতেছিল। সে সিঁড়ির তলায় সমবেত নারীকুলকে ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়া কহিল, "কৈ, তিনতলার যোগীনবাবু আর ভটাচার্য্য মশাইএর এঁদের দেখ্‌চি নে তো?"

নন্দরাণী কহিল, "তেনারা সব বীরপুরুষ। বোমার সঙ্গে লড়াই করবেন, তাই আর গতর খাটিয়ে নীচে নামলেন না।"

"আচ্ছা, আমি দেখ্‌চি।" বলিয়া অমর সিঁড়ির দিকে আগাইয়া গেল। সিঁড়ির প্রথম ধাপে কুসুমের বর তেমনই দাঁত খুঁটিতেছিল। অমর একবার তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইল। তাহার পর বিশেষ কাহাকেও উদ্দেশ না করিয়া কহিল, "দেখ্‌বেন, ঐ ছাগলটা রাস্তায় না বেরোয়। এখন জন্তু জানোয়ারকেও পথে ছেড়ে দেওয়া ঠিক্ নয়।"

ছাগলের পর্য্যন্ত মরণকাল উপস্থিত শুনিয়া পিসীমা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। অমরকে ডাকিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ বাবা, বাইরে কিছু পড়ছে নাকি?"

উদ্বেগে তাঁহার কণ্ঠস্বর কোমল শুনাইল। সকলে মিলিয়া আবার পিসীমাকে লইয়া পড়িল। অমর উপরে উঠিয়া গেল।

৮

দোতলার পশ্চিমদিকের বারান্দার শেষের ঘরখানা লইয়া যদুনাথ গাঙ্গুলী মহাশয় এ বাড়ীতে প্রায় বৎসরাধিক কাল বাস করিতেছেন। তিনি [illegible] বিপত্নীক। একমাত্র পুত্র অমরকে লইয়া তাঁহার সংসার। তিনি প্রত্যহ সকালে মক্কেলের সন্ধানে এবং দুপুরে কোর্টে বাহির হইয়া যান্। আজ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে একসঙ্গে দুইটার বেশী তিনটা কথা কহিতে দেখে নাই। অপরের খোঁজ রাখা দূরের কথা তিনি এখনও বাড়ীর সকলকে চিনিতে অবধি পারেন না; তিনতলার তর্কালঙ্কার মহাশয়কে দেখিয়া একতলার রমণীমোহন ঠাওরাইয়া বসেন। অমরকে এ বাড়ীতে আসিয়া অবধি কলেজে যাইতে দেখা যাইত। কিন্তু আজকাল সে বড় একটা বই খাতা লইয়া যথাসময়ে বাহির হয় না। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াও কেহ সদুত্তর পায় নাই। অমর হাসিয়া বলে, পড়াশুনো তো করছিই।

পিতা পুত্রে মিলিয়া সংসার হইলেও ঘরের মধ্যে রান্নার পাট নাই। যদুনাথবাবু বাড়ীর অন্য কোন পরিবারের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিয়া লন্। এতদিন পাশের ঘরের উমেশবাবুর ঘরেই তাঁহাদের দুইজনের ঠাঁই করা হইত। এখন উমেশবাবুর গৃহিণী পিত্রালয়ে অন্তর্দ্ধান করায় তিনতলার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘরে তাঁহাদের আহারের বন্দোবস্ত হইয়াছে। দুইবেলা দুই মুঠা পাইলেই খুশী, আর কোন খবর কেহ রাখে না। যদুনাথবাবু মাসে দুইবার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হাতে কুড়িটা করিয়া টাকা গণিয়া দেন। অমর সে সংবাদও রাখে বলিয়া মনে হয় না। তবে ভট্টাচার্য্য গৃহিণী যখন বেলা দুপুর অবধি হেঁসেল ধরিয়া বসিয়া থাকেন সেদিন অমর স্নান না করিয়া খাইতে বসিয়া অস্ফুটস্বরে অনুতাপ প্রকাশ করে এবং পরদিন নির্ব্বিকারচিত্তে সেই বেলা দেড়টায় আসিয়া রান্নাঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়।

ভট্টাচার্য্য গৃহিণী হইলেও হেমলতা ছেলেমানুষ বলিলেই হয়, বোধ করি অমরের সমবয়সী। প্রতিদিনই তাঁহার মুখখানি শুকাইয়া যায়। কিন্তু ঘোমটার ফাঁকে শুধু একটু হাসিয়া তিনি অমরের ঠাঁই করিয়া দেন। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী হইয়া প্রবীণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংসারে আসিয়া হেমলতার এই ছন্নছাড়া উদ্‌ভ্রান্তদৃষ্টি ছেলেটির জন্য অনাহারে বসিয়া থাকিতে কেমন যেন ভালোই লাগে।

দোতলার সব কয়টা ঘর ঘুরিয়া অমর তিনতলায় উঠিল। প্রায় সকল ঘরের কর্ত্তারা আপিস চলিয়া গিয়াছেন, সাইরেণ আর্ত্তনাদ করিতেই মেয়েরা শিশুদের লইয়া নীচে [illegible] তলায় কিংবা কলঘরে আশ্রয় লইয়াছে। সারা ব[illegible] একপ্রকার মৌন শঙ্কায় নিঃঝুম হইয়া আছে। অমর তিনতলায় উঠিয়া হেমলতার রান্নাঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে দাঁড়াইয়াই অমর ভিতরে হেমলতার উপস্থিতি অনুভব করিয়া কহিল, "সাইরেণ বেজেছে, আপনি নীচে নেমে আসুন।"

ঘরের ভিতর হইতেই মৃদুকণ্ঠে হেমলতা কহিলেন, "ভাতটা ফুটচে, ওটা নামিয়েই যাচ্ছি।"

"এখনই চলুন। এর মধ্যেই যে কোন অঘটন ঘটতে পারে।" অমর একটু অধৈর্য্য হইয়াই কহিল।

অমরের কথা শুনিয়া হেমলতা দরজার গোড়ায় আসিয়া হাসি মুখে কহিলেন,"কি ঘটতে পারে, মরণ ? মেয়েমানুষের অত চট্ ক'রে মরণ আসে না, ঠাকুরপো। তুমি যাও, আমি এখনি আস্‌চি।"

হেমলতা পুনরায় রান্নাঘরের কাজে মন দিলেন। অমর আর কিছু বলিতে পারিল না। কথা বলিবার সময় হেমলতার মুখে ঘোমটা ছিল না। এই প্রথম হেমলতা অমরের সঙ্গে কথা কহিলেন, ঠাকুরপো সম্বোধনটাও অমর প্রথম শুনিল। তথাপি ক্ষুণ্ণমনেই সে নীচে নামিয়া গেল।

নীচে তখনও কলরব বন্ধ হয় নাই। নবীনের মা তাহার সেই কোলের ছেলেটিকে লইয়া ভীড়ের মধ্যে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। ছেলের মাতৃস্তন্যে রুচি নাই, সে কোল হইতে নামিয়া ছুটিয়া বাহির হইবার জন্য ছটফট্ করিতেছে।

নন্দরাণী বলিতেছে, "দাও না বাপু, ছেড়েই দাও। উঠোনে খেলা ক'রলে আর দোষ নেই। ভ্যালা আপদ্ জুটেছে ঐ সাইরেণের বাদ্যি! কোথায় কি তার ঠিক নেই, যখন তখন পোঁ ধরবে। আর কি আয়োজন! শুনলে বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় দিতে থাকে। পোড়া ঐ এ আর পি ছোঁড়াগুলো তাই কি একটু থামাবে? ওদের যেন মচ্ছোব পড়ে যায়।"

নন্দরাণী উঠানের দিকে একটুখানি আগাইয়া আসিয়াছিল কিন্তু সম্মুখে অমরকে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল যেন ঐখানটা হইতে আর এক পা যাইবার ইচ্ছা তাহার নাই। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে অমর নন্দরাণীর কথাগুলো শুনিতে পাইয়াছিল। সে একবার ব্যথিত দৃষ্টিতে নন্দরাণীর দিকে তাকাইল, তাহার পর সদর দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

দরজার নিকটে গিয়া অমরের কানে গেল পিসীমা বলিতেছেন, "অমর ছোঁড়া বেরিয়েছে তো! এবার চল্ দেখি এই নরককুণ্ডু থেকে বেরিয়ে পড়ি। হুঁ, বোমা অম্‌নি প'ড়লেই হ'ল!"

অমর দ্রুতপদে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া আসিল। দরজার ঠিক্ বাহিরেই কুঞ্জমের বর সম্মুখবর্ত্তী প্রতিবেশীর সহিত রাজনীতি আলোচনা করিতেছে। "আমিও তো তাই বলি, মশাই। তারা বর্ম্মায় ফেলেছে বলে কি এখানেও ফেলবে! এদেশ দেব্‌তার দেশ, ফেললেই হ'ল? ধর্ম্মাধর্ম্মো নেই? তা কি কেউ বোঝে! যত ব্যাটা নচ্ছার—"

কোন দিকে না চাহিয়া অমর রাস্তায় নামিয়া পড়িল। কলিকাতার পথের রূপ বদ্‌লাইয়া গেছে। পথে জনপ্রাণী নাই কিন্তু পথের দুইধারে কাতারে কাতারে লোক জমিয়া গিয়াছে। বড় বড় বাড়ীর একতলায় সদর দরজার প্রবেশপথে পথচারীর দল আশ্রয় লইতে গিয়া বেশ গল্প জমাইয়া তুলিয়াছে। সকলেরই মুখে কৌতূহল অপেক্ষা কৌতুকের চাহনি; কৌতূহলও নাই, উৎকণ্ঠাও নাই, তথাপি দূরশ্রুত মৃত্যুকাহিনী শুনিয়া যেমন ভয় ধরে তেমনই একটা অবিশ্বাস্য অথচ আগতপ্রায় বিভীষিকা কল্পনা করিয়া এবং অপরের মুখে তাহার পুনরাবৃত্তি শুনিয়া সকলেই আশ্রয় লইয়াছে বটে কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটাই যেন মস্ত একটা ধাপ্পাবাজি এবং সেটা যে সকলেই ধরিয়া ফেলিয়াছে এমনিতরো আলাপ আলোচনা অবাধে চলিয়াছে।

অমর কিছুদূর অগ্রসর হইতেই নিরাপত্তাসূচক সাইরেণ বাজিয়া উঠিল। নিমেষে জনহীন রাজপথে বিপুল একটা সাড়া পড়িয়া গেল। কিন্তু এই কোলাহলের সহিত অমরের কোন যোগ নাই, সে আপন মনেই হাঁটিতে লাগিল।

শিয়ালদহ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইতেই—অমর সহসা চমকিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই ষ্টেশনের বিরাট কোলাহল ও বিপুল জনতার মধ্যে যেন নিজেকে হারাইয়া ফেলিল। ষ্টেশনের অভ্যন্তরভাগে আচ্ছাদনের নীচে পা ফেলিবার স্থান নাই। চারিদিকে যাত্রীদের উৎকণ্ঠিত তৎপরতা, আর তাহারই মধ্যস্থলে অসংখ্য শিশু ও তাহাদের জননীগণ বিছানা পাতিয়া বসিয়া একান্ত উদ্বেগবিহীন নিশ্চিন্ততার প্রতিমূর্ত্তির মতো। কেহ ঈষৎ লোকচক্ষুর অন্তরাল করিয়া সন্তানকে স্তন্যদানে ব্যাপৃতা, কেহ বা পার্শ্ববর্ত্তিনীর সঙ্গে ঘরকন্নার আলাপ জমাইতেছেন, আবার কেহ কলিকাতায় কি কি অমূল্য গৃহসামগ্রী ফেলিয়া যাইতেছেন সখেদে তাহারই বিস্তৃত ফর্দ্দ করিতেছেন। প্ল্যাটফরমের দিকে যাইতে যাইতে অমরের কানে ইহাদেরই কথার টুকরা আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল।

ষ্টেশনে লোকারণ্য বলিলে কিছু বলা হয় না। মানুষ যতো আসিয়াছে, লটবহর আসিয়াছে তাহার চতুর্গুণ। সকলেই আক্ষেপ করিতেছেন যাহা কিছু ছিল সবই নাকি কলিকাতায় রাখিয়া যাইতেছেন; কিন্তু প্রত্যেকের চতুর্দ্দিকে স্তূপীকৃত বাক্স পেট্‌রা ও পোঁটলা পুঁটলীর আকার ও আয়তন দেখিয়া তাহাদের হৃত সর্ব্বস্ব বলিয়া আর সহানুভূতি প্রকাশ করা চলে না।

অমর ষ্টেশনে আসিয়া অবধি অকারণে ভিড় ঠেলিয়া ঠেলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। প্রাণরক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী সহর ছাড়িয়া পলাইতেছে। ইহারা মৃত্যুকে ফাঁকি দিবে, বীভৎস ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে পড়িয়া যখন লোকে আশ্রয়হীন, সম্বলহীন হইয়া ধীরে ধীরে মৃত্যু বরণ করিবে তখন ইহারা সুখে বাঁচিয়া থাকিবে। তাহাই হউক,

ইহারা বাঁচুক,ইহাদের জীবন রক্ষার দায়িত্বও অবহেলা করিবার মত নহে ইহাদের লইয়াই আমাদের দেশ।

অমর ভাবিতেছিল কিন্তু ইহাদের মধ্যে কিসের যেন অভাব রহিয়া গেছে। পৃথিবীর বুকের উপর আগুন লাগিয়াছে তাহারই লেলিহান বিশ্বদাহন শিখা হইতে ইহাদের বাঁচাইবার জন্যই যে এই লোকাপসরণের বিপুল আয়োজন সে কথা ইহারা তো বুঝে না! যাহারা রহিয়া গেল তাহাদের সম্বন্ধে বেদনাবোধ নাই কেন? এ যেন সকলে মিলিয়া সহর হইতে পল্লীগ্রামে মেলা দেখিতে যাইতেছে। কেহ যাইতেছে দেশে যাইবার সুযোগ পাইয়া যাহাদের দেশ বলিয়া কিছু নাই তাহারা যাইতেছে স্বামী কিংবা অন্য অভিভাবকদের শাসনে, কেহ বা পলাইতেছে ভয়ে প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া। সে যাহাই হউক, পৃথিবীব্যাপী কোন্ আলোড়নের মধ্যে পড়িয়া যে আজ এ চাঞ্চল্য একথা কাহারও মনে আসে নাই। এই চলিয়া যাইবার মধ্যে কোন জাগ্রত বোধশক্তি কাজ করিতেছে না। সহরের জনস্রোত বহির্মুখী হইয়াছে, সেই স্রোতে সকলে মিলিয়া গা ভাসাইয়া দিল। তবু ইহারা যে যাইতেছে এইটাই অমরকে যেন আশ্বাস দিল, এই আশ্বাস সে চাহিয়াছিল।

প্ল্যাটফরমে একখানা গাড়ী পিছু হাঁটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে জনতার কোলাহল যেন বিপুল চীৎকারে ষ্টেশনের আচ্ছাদন বিদীর্ণ করিতে চাহিল। নিমেষের মধ্যে কুলিসহ বাবুরা নিজেদের মালপত্র টানাটানি সুরু করিল। যে পেট্‌রাটা পায়ের কাছে পড়িয়া আছে তাহারই সন্ধানে চল্লিশ গজ দূরে যে ভদ্রলোক নির্লিপ্ত মুখে ইহার পরের গাড়ীটার জন্য অপেক্ষা করিতেছে তাঁহার স্যুটকেশে টান পড়িল। সন্তানবতীরা কয়েকটি করিয়া বিভিন্ন বয়সের শিশু, খাবারের পুঁটুলী এবং ফিডিং বোতল লইয়া কোনরকমে স্বামী কিংবা অন্য কোন অভিভাবকের পিছন হইতে চলন ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া একপ্রকার ছুটিয়া যাইতেছে। গাড়ীর কামরায় উঠিবার সময় সকলেই কোন না কোন রেল কর্ম্মচারীর শরণ লইতেছেন। রেল কর্ম্মচারীরা একজন যাত্রীর সুবিধা করিতেছেন এবং অপর দশজনের সুবিধা করিবার মানসে ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছেন। অমর প্ল্যাটফরমের সেই উদ্বেলিত জনস্রোতে কখনো ডুবিয়া কখনো ভাসিয়া সাঁতার দিতেছিল। এতক্ষণ যাহা ভাবিতেছিল তাহাও হারাইয়া গেছে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

জ্ঞানারুণোদয়

শ্রীপিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্বসাধারণের কাছে বাংলা ভাষার আলোচনায় বাংলা বর্ণ-পরিচয় অথাৎ প্রথম পাঠগুলির কথা অনেকটাই নেপথ্যে থেকে যায়। ইতি কথকেরা নামোল্লেখ করলেও তাদের ক্রম-অভিব্যক্তির কথাটা বড় কেউ বলেন না। অথচ ভাষার প্রসারের পথ সুগম করে তারাই। বর্ণপরিচয়ের কথা উঠলেই মনে জাগে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের কথা, মনে পড়ে "জল পড়ে। পাতা নড়ে—গোপাল বড় সুবোধ…সদা সত্য কথা বলিবে।" তিনিই প্রথম সহজপাঠ্য বর্ণপরিচয়ে প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগ রচনা করে বাঙালীর ঘরে ঘরে বাংলা ভাষার মন্দাকিনী ধারা প্রবাহের পথ সুগম করে দেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগ এখনও আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য—শিশুশিক্ষার কাজে এ দু'টি না হলে আমাদের যেন মন ওঠে না।

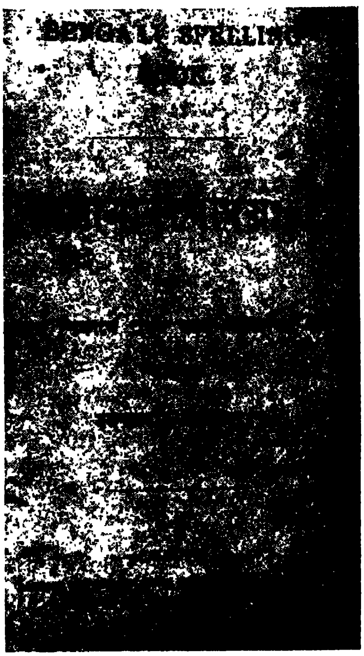
সন তারিখের হিসাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ণ-পরিচয় প্রথমভাগ রচনা করেন ১৮৫৫ সালের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ সম্বৎ ১৯১২)[১] আর দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়[১] প্রথম ভাগের এক মাস পরে অর্থাৎ আষাঢ় মাসে। ঐতিহাসিক কালক্রমে এর আগে বহু বাংলা বর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হয়েছিল। লঙ্ সাহেবের তালিকা[২] থেকে জানা যায় সর্বপ্রথম বাংলা লিপি প্রকাশিত হয় ১৮১৬ সালে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে মুদ্রিত "লিপিধারা" নামক বারো পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকায়। ১৮১৮ সালে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট, জে পিয়ার্স'ন সাহেবও এই ধরণের দু'টি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পূর্ণাঙ্গ বাংলা বর্ণ-পরিচয়ের প্রথম প্রকাশ হয় ১৮২০

১। বিজ্ঞাপন—বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ রিসিভার সংস্করণ

২। A descriptive Catalogue of Bengali works: By T. Long বঙ্গভাষা ও সাহিত্য দীনেশচন্দ্র সেন পৃ ৬৭২

মাপ ৫½"+৩½" ইঞ্চি। বইটিতে সরলবর্ণ এবং সংযুক্ত বর্ণ দুই-ই আছে এবং মোট পাঠ সংখ্যা হ'ল আঠারটি। প্রথম প্রথম কয়েকটি পাঠ ছাড়া বাইবেলোক্ত আখ্যান ভাগগুলি বাকী পাঠগুলিতে উদ্ধৃত হয়েছে। বইটির পুরো নাম হ'ল "BENGALI SPELLING BOOK জ্ঞানারুণোদয় অর্থাৎ বালক শিক্ষার্থ প্রথম সহজ উত্তরোত্তর কঠিন পাঠ যুক্ত বঙ্গ ভাষার বর্ণমালা।" কলিকাতা থেকে ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট ও বুক সোসাইটির জন্যে মুদ্রিত এবং তাদের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

সালে রাজা রাধাকান্ত দেবের রচনায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ'টি একটি স্মরণীয় তারিখ। লঙ সাহেবও এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ; ১৮২৫ সালে প্রথম সচিত্র বাংলা বর্ণ পরিচয় জন্ম নেয়। ১৮৩৪ সালে রোমান লিপিতে মুদ্রিত একটি বর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হয়। বিদেশী লিপিতে মুদ্রিত হওয়ায় বাঙালী পাঠকেরা এটি গ্রহণ করেন নি এবং স্বল্প প্রচারের ফলে এর অকালমৃত্যু ঘটে। ১৮৩৫-৩৬ সালেও দু' তিনটি বর্ণ পরিচয় বা বানানের বইয়ের আবির্ভাব ঘটেছিল। এর পর ১৮৩৯ সালে হিন্দু কলেজে পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে বাংলা ভাষা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে থাকে[৫] এবং তাদের চাহিদা মেটাবার জন্য ১৮৩৫-১৮৫৬ সালের মধ্যে সাত আটটি বর্ণ পরিচয় মুদ্রিত হয়েছিল।[৬]



জ্ঞানারুণোদয় পুস্তকের কভার

এই সময়ের একটি বর্ণ পরিচয় হ'ল 'জ্ঞানারুণোদয়' যার আলোচনায় বর্তমান নিবন্ধ ও ভূমিকার অবতারণা।

জ্ঞানারুণোদয়ের পঞ্চম সংস্করণ নিয়েই আলোচনার গোড়াপত্তন। এর পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ সালে এবং পাঁচ হাজার কপি মুদ্রিত হয়। পঞ্চম সংস্করণের মুখপত্র থেকে জানা যায় বইটির চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল আড়াই হাজার কপি। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭ এবং জ্ঞানারুণোদয়ের প্রথম পাঠে বর্ণমালা অর্থাৎ "ক, খ, গ ঘ, ঙ। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। ট, ঠ, ড, ঢ ণ। ত, থ দ ধ, ন। প, ফ, ব, ভ, ম। য, র, ল ব, শ। ষ, স, হ, ক্ষ।" এই চৌ-ত্রিশটি ব্যঞ্জন বর্ণ এবং হ ল অভ্যাসার্থ পাঠ অর্থাৎ "হ ল পড়। কলম ধর। সর। অনুশীলন দেওয়া আছে। বইটিতে বিদ্যাসাগরীয় বর্ণ সংস্কার অর্থাৎ ড়, ঢ়, য়, বিসর্গ, অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দুকে স্বতন্ত্র ব্যঞ্জন বর্ণ বলে ধরে নেওয়া এবং সংযুক্ত বর্ণ বলে ব্যঞ্জন বর্ণ থেকে "ক্ষ" কে এবং অতিরিক্ত অচল বর্ণ বলে দীর্ঘ ৠ-কার এবং দীর্ঘ ঐ কার স্বরবর্ণ থেকে বর্জনের নীতি অনুসৃত হয় নি। দ্বিতীয় পাঠে (২ পাঠে) "স্বরমালা" অর্থাৎ অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ ৠ, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ" এই চৌদ্দটি স্বরবর্ণ এবং স্বরাভ্যাসার্থ পাঠ অর্থাৎ...বন চল, ঔষধ আন। এক জন অমর। ঈশ ভজন কর। সরল আচরণ কর। ইত্যাদি ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণ মেশান ছোট ছোট কথা এবং পদ গঠন শেখান হয়েছে। তৃতীয় পাঠে হল যুক্ত স্বরাকার অর্থাৎ আ-কার, ই-কার, ঈ-কার সহযোগে ব্যঞ্জন বর্ণের ব্যবহার শেখান হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে কিছু তুলে দেওয়া হল—

৩য় পাঠ

া, ি, ী, কারাভ্যাসার্থ পাঠ
কা, ছা, টা, থা, পা, রা, লা, বা, শা, হা,
গি, ঘি, চি, জি, ঠি, ডি, দি, ধি, নি, মি,
খী, কী, ডী, লী, বী, ভী, রী, মী, ক্ষী,

মাতা পিতার সমাদর করা উচিত। কারণ তাহারা যতন করিয়া বালক রক্ষা করয়। ভাই আর ভগিনীর সহিত বিবাদ করিও না। কারণ যখন বিপদ সময় হয় তখন তাহারা বড় উপকারক।

চতুর্থ পাঠে উ কার, ঊ কার, ঋ-কার, ৠ-কার যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের ব্যবহার এবং পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ভৌগলিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে—যেমন ...পৃথিবীর চারিভাগ। একটার নাম ইউরপ তথাকার মানুষ বিলাতীয় বলা যায়। আর একটার নাম আশিয়া। তথায় আমরা সকল বাস করি আর এথয় চিন জাতি ও পারস জাতির বসতি।

আর একটার নাম আমেরিকা। এই ভাগ অতিদূর জাহাজবাহিয়া মহাসাগর পার হইয়া তথায় যাওয়া যায়। তথায় বড় নদী ও বড় বন ও বড় মাঠ।

আর এক ভাগ বাকী। তাহার নাম আফরিকা। তথায় অতি ভয়ানক জাতির বাস। তাহারা বসন হীন ও সদাধনু আর বাণধারী, ঐ জাতির চামড়া কালির মত কাল।

জ্ঞানারুণোদয় পৃ ৭-৮

এ-কার, ঐ-কার, ও-কার এবং ঔ-কার যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের ব্যবহার শেখান হয়েছে পঞ্চম পাঠে। বাইবেলের আখ্যান ভাগ প্রথম সুরু হয়েছে এই পাঠ থেকেই। বাইবেলের মতানুযায়ী পৃথিবীর উদ্ভব সরল এবং সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হয়েছে যেমন—আদি ঈশ আকাশ ও পৃথিবী সৃজন করিলেন। তখন পৃথিবীতে কোন জীব ছিল না আর পৃথিবী জলময় ও আলো রহিত ছিল। পরে ঈশ বলিলেন আলো হউক তাহাতে আলো হইল।..."(পৃ ৯)। আখ্যান ভাগটির নাম দেওয়া হয়েছে "পৃথিবীর সৃজন।"

খঙ-ত, (৭) হসন্ত ও দুই চিহ্ন (২) যোগে দিরুক্তির ব্যবহার এবং তাহাদের প্রয়োগযুক্ত বানান শেখান হয়েছে। আখ্যান ভাগে আছে "মুসার বিবরণ" অর্থাৎ মোজেসের গল্প। সপ্তম পাঠে সরল বর্ণের ব্যবহার শেষ করে সংযুক্ত বর্ণের ব্যবহার শেখান আরম্ভ হয়েছে, আর এর সুরু হয়েছে য-ফলার চিহ্ন ও তার প্রয়োগ যুক্ত কথা এবং বানানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে। আখ্যানভাগে আছে "নীতিশিক্ষা" শীর্ষকে বাইবেলের দশটি অনুশাসন—রচনারীতির দিক দিয়ে সরলতায় এই আখ্যান ভাগটি-দৃষ্টি আকর্ষণ করে সহজেই যথা…"তোমরা আমার নাম অকারণে লইবা না কারণ যে মনুষ্য আমার নাম অকারণে লয় তাহার শাজা আমি দিব। সাবথ দিকে মানিও। তুমি ছয় দিন সাংসারিক বিষয় সকল সাধন করিবা আর ছয়দিনের পর যে দিন সে সাবথ দিন, তাহাতে তুমি কি তোমার বালক কি তোমার কন্যা কি তোমার দাস কি তোমার দাসী কি তোমার ঘোড়া কি তোমার গাধা কি তোমার বলদ কি তোমার ঘরে নিবাসী বিদেশীকে কখন কোন কাজ করিবে না।

তোমরা আপন ২ পিতা ও আপন ২ মাতার আদর করিবা, তাহা করিলে তোমরা অনেকদিন দেশের মধ্যে কুশলে বাস করিতে পারিবা।

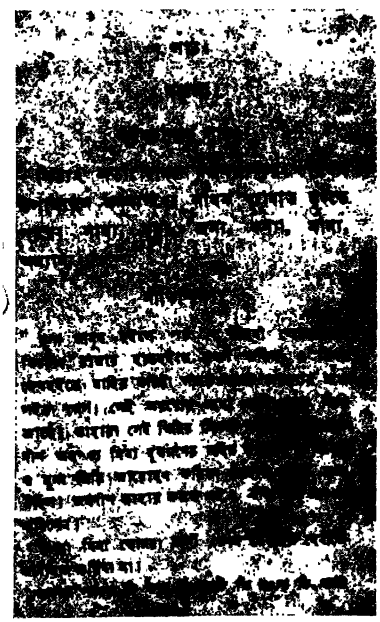
তোমরা নরহত্যা করিবা না।
তোমরা পরদার করিবা না।
তোমরা চুরি করিবা না।

তোমরা পরের বিপরীতে সাক্ষ্য দিবা না।

পরের ঘর কি তাহার গৃহিণী কি তাহার দাস, কি তাহার দাসী, কি তাহার বলদ কি তাহার গাধা কি তাহার যে কিছু আছে তাহা পাইবার জন্যে তোমরা লোভ করিবা না।" (পৃ ১৪)

এখানে 'কি' কথাটির বহুল প্রয়োগ, "করিবে" ও "করিবা" এবং জন্যর জায়গায় "জন্যে"র ব্যবহার লক্ষ্য করবার মত।

অষ্টম পাঠে শেখান হয়েছে র-ফলা ও রেফ যুক্ত বানানের প্রয়োগ-এবং আখ্যান ভাগে বর্ণিত হয়েছে অমালেকের "সহিত রা" শীর্ষক অমালেকের (Amalok) একটি বিবরণ। নবম পাঠে ণ-ফলা ল-ফলা, র-ফলা এবং ন-ফলা যুক্ত কথার যেমন যত্ন, সম্মতি, স্মরণ ইত্যাদির প্রয়োগ-দেখান হয়েছে এবং আখ্যান ভাগে আছে "য়িহুদী-লোকেদের কৃতঘ্নতা" শীর্ষক ...দের একটি উপাখ্যান। দশম পাঠ প্রধানত পরিচয় করান হয়েছে ...ষয়। যুক্তাক্ষরের" ব্যবহারের সঙ্গে অর্থাৎ পূর্ব্ব, কার্য্য সূর্য্য প্রভৃতি কথাগুলির মধ্য দিয়ে দেখান হয়েছে রেফ্-যুক্ত য-ফলা এবং রেফ্-যুক্ত ব-ফলার প্রয়োগ। আখ্যান ভাগে দেওয়া হয়েছে "কিনান দেশের বিবরণ"। একাদশ পাঠে ঙ, শু, রু, হু, হৃ এই ক'টি যুক্ত লিপির ...বহার দেখান এবং আখ্যান ভাগে "শিমুয়েলের জন্ম" বৃত্তান্ত দেওয়া হয়েছে। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ এবং ষষ্ঠদশ পাঠে যথাক্রমে শেখান হয়েছে "ক • বর্গ যুক্তাক্ষর" অর্থাৎ ক্ত, ক্র ক্ষ, ইত্যাদি, "চ • বর্গ যুক্তাক্ষর" অর্থাৎ চ্চ, চ্ছ, জ্ঞ, ঞ্চ ইত্যাদি, "ট বর্গ যুক্তাক্ষর" অর্থাৎ ট্ট, ণ্ট, ড্ড, ঠ ইত্যাদি "ত বর্গ যুক্তাক্ষর" অর্থাৎ ত্ত, ত্থ, দ্ধ, ন্ত, ইত্যাদি "প বর্গ যুক্তাক্ষর" প্ত, ব্দ, ম্ফ, ম্ভ ইত্যাদি সংযুক্ত বর্ণের প্রয়োগ যুক্ত কথার বানান এবং আখ্যান ভাগে দেওয়া আছে "জাল্‌তের সহি দায়ুদের সংগ্রাম," সুলেমানের সদ্বিচার, "এলিয়ের বিবরণ" "এলিয়ের বলিদান" এবং "শুনেমীয় নারীর পুত্র লাভ" এই কয়েকটি উপাখ্যান। সপ্তদশ পাঠে "অবর্গীয় সম্বন্ধীয় যুক্তাক্ষর" অর্থাৎ হ্ন, শ্চ, শ্ছ, ষ্ক, হ্ব, হ্ম, হু ইত্যাদি ভিন্ন বর্গীয় বর্ণের মিশ্র সংযোগ যুক্তবর্ণের বানানের যেমন পূর্ব্বাহ্ণ, গল্প, পুনশ্চ ইত্যাদির ব্যবহার দেখান হয়েছে। এর আখ্যান ভাগে আছে "নামানের সুস্থ হওন বিবরণ" শীর্ষক একটি গল্প। তিনটি বর্ণের চেয়েও বেশী বর্ণের সংযোগজাত যুক্তাক্ষরের ব্যবহার শেখান হয় নি। অষ্টাদশ পাঠে কোনও সংযুক্ত বর্ণের ব্যবহার বইটিতে দেওয়া নেই। "নবোতের



জ্ঞানারুণোদয় পুস্তকের পাঠ্যাংশ

মৃত্যু" শীর্ষক একটি গল্প দিয়েই পাঠটি এবং বইটি শেষ করা হয়েছে। বইটির শেষ অনেকাংশে ধর্ম পুস্তকের শেষের মত যেমন "…ইহাতে এই জানা যায় যে দুষ্ট ও দৌরাত্মকারি লোক চিরকাল কুশলে থাকে না তাহারা অবশ্য আপন আপন কুকর্ম্মের ফল ভোগ করে। এবং ঈশ্বরের বাক্য অমোঘ, তিনি যাহাই বলেন তাহাই ঘটে; স্বর্গ ও পৃথিবী বরং লুপ্ত হয় ঈশ্বরের বাক্য কখন লুপ্ত হয় না।

ইতি জ্ঞানারুণোদয় পুস্তক সমাপ্তঃ।"

লঙ সাহেব তাঁর তালিকায় জ্ঞানারুণোদয়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার থেকে জ্ঞানারুণোদয়ের আলোচ্য সংস্করণে কিছু পাঠ ভেদ দেখা যায় কিন্তু লঙ সাহেবের বর্ণনা এত সংক্ষিপ্ত যে এই পাঠভেদ গুরুতর কিনা জানবার

উপায় নেই। লঙ সাহেব লিখেছেন "200. Jyanarunaday, 1st Spelling Book, Hay and Co 3rded 1850 pp47, gives with each Spelling Exercise Scripture extracts, on the earth, Moses, Amalek: Jews: Cannan, Samuel: Daviue: Soldmon Elisha: Naman: Nabath,"

আমাদের আলোচ্য পঞ্চমসংস্করণে Hay and Coএর কোনও উল্লেখ নেই এবং 1st Spelling Bookটি রূপান্তরিত হয়েছে "Bengali Spelling Book"এ। লঙ সাহেবের বর্ণনায় ক্রিষ্টিয়ান ট্রাক্ট সোসাইটির জন্য যে বইটি মুদ্রিত হয়েছিল একথা জানা যায় না এবং পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ভৌগলিক বিবরণ নীতিশিক্ষা ও শুনেমীয় নারীর পুত্র লাভের কথাও বাদ পড়েছে। লঙ সাহেবের তালিকা অনুসারে জ্ঞানারুণোদয়ের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫০ সালে। নিবন্ধে আলোচ্য বইটি যদি লঙ সাহেবের বর্ণিত জ্ঞানারুণোদয় হয় তাহলে এর প্রথম প্রকাশ কালকে ফেলতে পারা যায় ১৮৪৮এর কাছাকাছি।

সমাজের তথাকথিত অপাংক্তেয়দের মধ্যে ভাষা পরিচয়ের সাহায্যে খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে যে জ্ঞানারুণোদয় প্রকাশিত হয়েছিল এই ধারণাই হয় জ্ঞানারুণোদয়ের আলোচনায়। কিন্তু উদ্দেশ্য কতদূর সফল হয়েছিল বলা বড় দুষ্কর। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে তুলনা করলে বক্তব্য আরও স্পষ্ট হবে। জ্ঞানের অরুণ উদয়ে মিশনারী সাহেবরা দেখালেন নরক ভয়—বললেন।

"...মন পরম ধন। রক্ষ তব মন।
নরক ভয় কর। মন সতত চপল
সরল জন বড়। মন দমন কর।
মরণ সময় ভয় জনক। নরক পথ সহজ।"

—জ্ঞানারুণোদয় পৃ ৪

বিদ্যাসাগর মহাশয় মিষ্ট কথায় মন ভোলালেন, বললেন—

"বড় গাছ। পথ ছাড়।
ভাল জল। জল খাও।
লাল ফুল। হাত ধর।
ছোট পাতা। বাড়ী যাও।"

—বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ পৃ ৬০

মিশনারী সাহেবরা বাস্তব উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করলেন—

"নদজ নল নত হয়। বলদ খড় ভক্ষক।
খড়ম পর চল। বন গমন কর।"

বিদ্যাসাগর মশায় সে জায়গায় বললেন—

"কথা কয়।
জল পড়ে।
মেঘ ডাকে।
হাত নাড়ে।
খেলা করে।"

ধর্ম প্রচারকের গুরু গম্ভীর আদেশ করলেন "আইস, আসন আন অক্ষর পড়।" বিদ্যাসাগর আদর করে বললেন "কাছে এস। বই দেখ। এ রকম বহু উদাহরণই দেওয়া যায় যাতে জ্ঞানারুণোদয়ের অচল ভাষ এবং অপ্রচলিত উদাহরণ পদে পদে ধরা পড়ে। কেবল জ্ঞানারুণোদ কেন, সমসাময়িক বহু বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের 'বর্ণপরিচয় দু'টি তুলনা করলে এ দোষটি হয়ত ধরা পড়বে।

তাহলেও এ কথা অনস্বীকার্য্য, মিশনারীরা ছিলেন বাংলা গদ্য ভাষায় পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারে অগ্র পথিক। তাঁদে কাছে আমরা অশেষ ঋণী। সাহিত্যের ইতিহাসে না হলেও প্রাথমি শিক্ষার ইতিহাসে খ্রীষ্টিয়ান প্রচারকগণের প্রচেষ্টার নিদর্শন হিসাবে জ্ঞানারুণোদয় আমাদের স্মরণীয়।

পথিক

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ, কাব্যভারতী

জীবন পথের পথিক আমি নিত্য নূতন আমার পথ
ভোরের আলোয় ঐ যে আসে—ঐ যে আমার সোনার রথ।
বনের তরু বনের লতা,
জানায় মোরে কোন বারতা,
নীরব নতি জানায় তারা দুলিয়ে মাথা প্রভাত বায়,
তরুণ রবির সোনার আলো নীল গগনে অসীম ছায়।

আমার অভিযানের পথে বনের বিহগ জানায় প্রীতি,
আমার পথের দুই পাশেতে ফোটায় কুসুম তাদের গীতি।
কখন চলি মেঘের বুকে,
কখন নামি ধরায় সুখে,
এমনি ক'রেই ওঠা নামায় জীবন চলে এই ধরায়,
দূর দরিয়ার কাণ্ডারী যে আমার তরী সেই চালায়।

হিমালয়ের দূর শিখরে কাহার ডাকে হেলায় উঠি,
মরুর বুকে, উষর বায়ে কোন আবেগে আবার ছুটি,
উর্ম্মিমুখর সাগর জলে.
পাতালপুরীর আঁধারতলে,
যাত্রা আমার এমনি ক'রেই জীবন ভরি' দিগ্বিদিক,
ভোরের আলোয় পাখীর গানে তাই তো ফোটে মাঙ্গলিক।

নৈমিষারণ্য

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ

মোগলসরাই হইতে কাশী দিয়া সাহারাণপুর পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে লাইন বিস্তৃত ঐ লাইনে লক্ষ্ণৌ হইতে প্রায় ৪০ মাইল পশ্চিমে বালামৌ জংশন নামক একটি ষ্টেশন আছে, ঐ ষ্টেশন হইতে সীতাপুর পর্য্যন্ত একটা শাখা রেলপথ বিস্তৃত। এই শাখা লাইনে বালামৌ হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূরে নিমসর নামক রেলওয়ে ষ্টেশন। ইহারই নিকটে প্রাচীন নৈমিষারণ্য তীর্থ। আমরা সকালে ৮।০টার ট্রেণে বালামৌ হইতে রওনা হই। শীতকাল। রেলওয়ে লাইনের উভয় পার্শ্বে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে গোধূম, যব, ছোলা প্রভৃতি রবিশস্য শোভা পাইতেছে। মধ্যে মধ্যে বৃক্ষপুঞ্জের মধ্যে ক্ষুদ্র গ্রাম। অর্সেনি ও বেণীগঞ্জ এই দুইটি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া গোমতী নদীর উপরে রেলওয়ে সেতু পার হইয়া বেলা প্রায় ৯।০টার সময় গাড়ী নিমসর ষ্টেশনে দাঁড়াইল। রেল হইতে নামিয়াই পাণ্ডার সহিত দেখা হইল। ষ্টেশনে কোনও প্রকার যানের ব্যবস্থা নাই। ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে এখানকার প্রধান তীর্থ—নাম চক্রতীর্থ। আমরা পদব্রজে চক্রতীর্থের নিকটে পাণ্ডার গৃহে আশ্রয় লইলাম এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া স্নান ও তীর্থ দর্শনার্থ বহির্গত হইলাম।

নৈমিষারণ্য এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে শিবপুরাণ বায়বীয় সংহিতায় দেখা যায় যে সত্যযুগে ঋষিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—পৃথিবীতে কোন্ স্থান তপস্যার সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী এবং পরম পবিত্র; ব্রহ্মা একটি চক্র সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীর অভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন, ঐ চক্র যেখানে পতিত হইল সেই স্থানই নৈমিষারণ্য অন্তর্গত চক্রতীর্থ(১)। চক্রের নেমি (অর্থাৎ বহির্বেষ্টনী) এই স্থানে পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছিল, এইজন্য তীর্থের নাম হইল নৈমিষারণ্য। এই স্থানে যত তপস্যা এবং দান করা হইয়াছে পৃথিবীর আর কোথাও সেরূপ হয় নাই। হিন্দুগণের মধ্যে যত গোত্র প্রচলিত আছে সকল গোত্রের প্রবর্ত্তক ঋষিগণ নৈমিষারণ্যে বাস করিতেন। সকল পুরাণ নৈমিষারণ্যেই রচিত হইয়াছিল। সত্যযুগে স্বয়ম্ভুব মনু, তাঁহার পত্নী শতরূপা এবং সহস্র ঋষিগণ এখানে অনেক যজ্ঞ ও তপস্যা করিয়াছিলেন। অযোধ্যা হইতে নৈমিষারণ্য মাত্র ৫০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী, এজন্য শ্রীরামচন্দ্র এই পবিত্র তীর্থে আসিয়া বহু যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। যে অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় সীতাদেবী পাতাল প্রবেশ করিয়াছিলেন সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশ নৈমিষারণ্য তীর্থেই হইয়াছিল(২)*। মহাভারতের প্রারম্ভে দেখা যায় যে নৈমিষারণ্যে মহর্ষি শৌনক দশ সহস্র মুনিগণের সহিত বাস করিতেন, সেই মুনি ঋষিদের নিকট সৌতি মহাভারত কথা বলিয়াছিলেন(৩)। শ্রীমদ্ভাগবত এবং অধিকাংশ পুরাণেও এই কথা বলা আছে যে সূত নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট এই সকল পুরাণ বলিয়াছিলেন(৪)।

চক্রতীর্থ একটি ষড়কোণাকৃতি (hexagon) জলাশয়। ইহার চারিদিকে বাঁধা ঘাট। এখানে নীচ হইতে অনবরত জল উঠিতেছে এবং চক্রের একপার্শ্বে অবস্থিত পয়ঃপ্রণালীর মধ্য দিয়া জল প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। এখানে পুরোহিত যাত্রীকে সঙ্কল্প মন্ত্র পাঠ করাইয়া স্নান বা মার্জ্জন করায়। আমরা এখান হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে গোমতী নদীতে স্নান করিতে গেলাম। এখানে ভাল বাঁধান ঘাট আছে—নাম দশাশ্বমেধ ঘাট। গোমতীর পবিত্র জলে স্নান করিয়া দেহ ও মন সুস্থ হইল। ঘাটের ধারে পুষ্পবাটিকাবেষ্টিত একটি আধুনিক আশ্রম দেখিলাম। ইহার অল্প দূরে প্রায় ১০০ হাত উচ্চ টিলা, তাহার উপর হনুমানজির বৃহৎ মূর্ত্তিযুক্ত মন্দির। টিলার উপর আর একটি পঞ্চপাণ্ডবের মন্দির।

(১) বিশ্বং সিসৃক্ষমাণা বৈ যত্র বিশ্বসৃজঃ পুরা।
সত্রমারেভিরে দিব্যং ব্রহ্মজ্ঞাঃ গার্হপত্যগাঃ॥
এতস্মনোময়ং চক্রং ময়াসৃষ্টং বিসৃজ্যতে।
যত্রাস্য শীর্য্যতে নেমিঃ স দেশস্তপসঃ শুভঃ॥
তদ্বনং তেন বিখ্যাতং নৈমিষং মুনিপূজিতং॥
—শিবপুরাণ, বায়বীয় সংহিতা

(২) * ততোঽভ্যাগচ্ছৎ কাকুৎস্থঃ সহ সৈন্যেন নৈমিষং॥
যজ্ঞবাটং মহাবাহুর্দৃষ্ট্বা পরমমদ্ভুতং।
প্রহর্ষমতুলং লেভে শ্রীমানিতি চ সোঽব্রবীৎ॥
—বাল্মীকি রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ৯২।২, ৩

(৩) বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে বৈশম্পায়ন মহাভারত আবৃত্তি করিয়াছিলেন, সৌতি সেখানে মহাভারত শুনিয়া নৈমিষারণ্যে শৌনক প্রভৃতি ঋষিদের নিকট বলিয়াছিলেন।

(৪) নৈমিশেঽনিমিষ ক্ষেত্রে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ।
সত্রং স্বর্গায় লোকায় সহস্রসমমাসত॥
—শ্রীমদ্ভাগবত ১।১।৪

এই টিলার নাম রাজা বিরাট কি টিলা। প্রবাদ এই যে পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসের সময় কিছুদিন এখানে বাস করিয়াছিলেন। টিলাটি জঙ্গলাবৃত। বহু বিক্ষিপ্ত ইষ্টকখণ্ড হইতে বুঝিতে পারা যায় যে অট্টালিকার ভগ্ন স্তূপের উপর এই টিলা স্থাপিত।

বিরাটের টিলা হইতে নামিয়া একটী ক্ষুদ্র স্রোত পার হইয়া আমরা প্রায় ৫০ হাত উচ্চ আর একটি টিলা আরোহণ করিলাম। ইহা ব্যাসগদী নামে পরিচিত। ইহাতে মন্দির মধ্যে পরাশর, ব্যাস ও শুকদেবের মূর্ত্তি আছে। প্রবাদ এই যে ব্যাসজী এইখানে বাস করিয়া পুরাণ সকল রচনা করিয়াছিলেন। ব্যাস গদীর উপর পূর্বতন মোহান্তদের সমাধি বিদ্যমান। নিকটে একটি অষ্টকোণ হবন কুণ্ড আছে, ইহা সপ্তঋষির স্থান নামে পরিচিত। দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী প্রাচীন মোহান্তজী তাঁহার ৬।৭ বৎসরের কন্যাকে গীতার অনেক অংশ মুখস্থ করাইয়া ছিলেন, পিতার নির্দেশ অনুসারে বালিকা কতকগুলি শ্লোক আবৃত্তি করিল।

চক্রতীর্থের নিকটবর্ত্তী আর একটি ছোট টিলার উপরিস্থিত মন্দির স্বতগঙ্গী নামে পরিচিত। মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ সেবিত হয়। ইহার নিকটবর্ত্তী একটি হবনকুণ্ডের নাম শৌনক আশ্রম।

নৈমিষারণ্য একটি পীঠস্থান। এখানে দেবীর হৃদয় পতিত হইয়াছিল। দেবীর নাম ললিতা দেবী। এখানে যতগুলি মন্দির আছে তন্মধ্যে ললিতাদেবীর মন্দির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। দেবীর প্রস্তরময় ক্ষুদ্র মূর্ত্তি—প্রায় এক হাত উচ্চ, মন্দির মধ্যে গৃহতল মর্ম্মরমণ্ডিত। চারিদিকে ইষ্টকাবদ্ধ প্রশস্ত প্রাঙ্গণ।

প্রতি মাসে অমাবস্যার দিন নৈমিষারণ্যে মেলা হয়, তখন প্রায় ৫০ হাজার যাত্রী এখানে স্নান করিতে আসে। ফাল্গুনের অমাবস্যায় নৈমিষারণ্য পরিক্রমা আরম্ভ হয়। এই পরিক্রমা চক্রতীর্থ হইতে আরম্ভ হয় এবং এখান হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী মিশ্রিক তীর্থ নামক স্থানে শেষ হয়। এই পরিক্রমান্তে ৮৪ ক্রোশ ভ্রমণ করিতে হয় এবং দশদিন সময় লাগে। নিমসরের পরবর্ত্তী ষ্টেশনের নাম মিশ্রিক তীর্থ। এখানে দধীচি মুনির আশ্রম এবং অন্যান্য মন্দির আছে। শুনিয়াছি ইহাও একটি রমণীয় তীর্থ। সময় অভাবে আমাদের দর্শন হয় নাই।

তীর্থস্থান সকল দর্শন করিয়া আমরা পাণ্ডাজির আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিলাম। শীত অপরাহ্নের স্নিগ্ধ সমীর আমাদের ক্লান্ত শরীর জুড়াইয়া দিতেছিল। সম্মুখে বাবা কালীকমলিওয়ালার বিশাল ধর্ম্মশালাতে যাত্রীগণ কেহ আহার করিতেছে, কেহ বিশ্রাম করিতেছে, কেহ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সুদূর অতীতে কত সহস্র ঋষি মুনি এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন তাঁহাদের পুণ্যজীবনের কথা মনে হইতেছিল। আর মনে হইতেছিল সীতাদেবীর কথা—যাঁহার পুণ্যজীবনের এখানে অবসান হইয়াছিল। মহর্ষি বাল্মীকির অমর লেখনীতে সে দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়া মহর্ষি কুশ লবকে লইয়া এখানে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষির নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞদর্শনার্থ সমাগত রাজা ও ঋষিদের কুটিরে কুটিরে কুশ লব রামায়ণ গান করিয়া বেড়াইতেছেন। শ্রীরামচন্দ্র সে গান শুনিয়া মোহিত হইলেন। বাল্মীকি বালকদের প্রকৃত পরিচয় দিয়া বলিলেন, তাঁহার আশ্রমেই লব কুশের সহিত সীতাদেবী বাস করিতেছেন। তখন রামচন্দ্র বলিলেন—সীতা এখানে আসিয়া মুনিদের সম্মুখে তাঁহার শুদ্ধতা প্রমাণ করুন। সীতাকে আনা হইল। তাঁহার পরীক্ষা দেখিবার জন্য বশিষ্ঠ বামদেব জাবালি কাশ্যপ বিশ্বামিত্র দুর্বাসা পুলস্ত্য ভার্গব মার্কণ্ডেয় গর্গ চ্যবন ভরদ্বাজ নারদ গৌতম প্রভৃতি মহামুনি উপস্থিত। সীতা দেবী ভাবিতে ছিলেন,—আবার পরীক্ষা। জননী ধরিত্রীদেবীকে স্মরণ করিয়া সীতাদেবী ধীরে ধীরে বলিলেন—

মনসা কর্মনা বাচা যথা রামং সমচয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎপরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।

"আমি মন কর্ম এবং বাক্যে যদি রামকেই পূজা করিয়া থাকি তাহা হইলে জননী পৃথিবী আমাকে অবকাশ দেন। আমি রাম ভিন্ন অন্য পুরুষকে জানি না। আমার এই উক্তি যদি সত্য হয় তাহা হইলে জননী পৃথিবী আমাকে অবকাশ দেন।"

বৈদেহী যখন এইরূপ শপথ করিতেছিলেন তখন পৃথিবী হইতে এক উৎকৃষ্ট দিব্যসিংহাসন উত্থিত হইল, সীতা সেই আসনে উপবিষ্ট হইলেন, সীতাকে লইয়া সিংহাসন রসাতলে প্রবিষ্ট হইল।

অপরাহ্নের ট্রেণে আমরা নিমসর হইতে ফিরিলাম। সুদূর অতীতে এই স্থানে যে দৃশ্য অভিনীত হইয়াছিল,—রবিবর্মার তুলিকাতে যে দৃশ্যের অপার্থিব সৌন্দর্য্য সাধারণের নয়নগোচর হইয়াছে,—সেই দৃশ্য আমার হৃদয়ে ভাসিয়া উঠিতেছিল। সীতা দেবীর ছলছল নয়ন, শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ, শ্রীরামের হতাশ ও ব্যাকুলভাব, দর্শকদের হাহাকার! সীতাদেবী আদর্শ সতীরমণী, স্বামীর আদর্শ চরিত্র, তথাপি এত দুঃখ! অসীম ধৈর্য্যের সহিত অপরিসীম দুঃখ সহ্য করিয়া লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতাদেবী যেন দুঃখজ্বালাপূর্ণ সংসারের নরনারীদিগকে বলিতেছেন,—সংসার দুঃখেরই স্থান, এখানে সুখের আশা করা ভুল—নির্বিকারচিত্তে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া কর্ত্তব্য সাধন করাই জীবনের নীতিরূপে গ্রহণ করা উচিত।

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ

(২)

পরদিন কলেজে যাইয়া অমল সমস্ত ঘরগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কিন্তু অপর্ণা আসে নাই। কাল সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সমগ্র অতীতকে সে ভুলিবে; কিন্তু আজ অপর্ণা কলেজে আসে নাই দেখিয়া একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার মন বার বার কাঁপিয়া উঠিতেছিল। অসম্ভব ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় সে পর্য্যায়ক্রমে শঙ্কিত ও দুঃখিত হইতেছিল। সারাটা দিন কলেজের ইটকাঠময় দালানটির মধ্যে ক্রৌঞ্চের মত পাখার ঝটপট করিয়া তাহার মন ক্লান্ত হইয়া পড়িল। বিকালে চা খাইতে খাইতে সে স্থির করিল,—অপর্ণার বাড়ীতেই সে যাইবে। আজ সে যেমন করিয়া হোক, তাহাকে সমস্ত কথা বলিয়া একটা হেস্ত নেস্ত করিয়া আসিবে—এমনি সংশয় দ্বিধা ও শঙ্কার মধ্যে দিন অতিবাহিত করা সম্ভব নয়।

অন্য কোন কথা চিন্তা না করিয়া, এমন ভাবে যাওয়াটা শোভন হইবে কিনা তাহা না ভাবিয়াই সে ট্রামে উঠিয়া পড়িল। অন্য সকল চিন্তার মধ্যে আর একটা চিন্তা ছিল—সেটা টাকার। আজ রাত্রি হইতেই সে সেই রোমাঞ্চকর উপন্যাস লিখিতে সুরু করিয়া দিবে. অতএব অর্থাভাব তাহার রহিবে না; সুতরাং হাতে যাহা আছে তাহা সে নিঃসঙ্কোচে খরচ করিয়া যাইতে পারে।

অপর্ণার বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া অমলের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল,—বাড়ীতে কাহারও সাড়া নাই, কেমন করিয়া কাহাকে সে ডাকিবে; কিন্তু সে যখন আজ সবই শেষ করিতে আসিয়াছে তখন সামান্য ভদ্রতা-অভদ্রতার কথা বিবেচনা করিয়া লাভ কি?

অমল সদর দরজা, বাড়ীর বৈঠকখানার দরজা অতিক্রম করিয়াও কাহাকে পাইল না। অকস্মাৎ সে আবিষ্কার করিল, অপর্ণা গৃহের কোণে একটা সোফায় জড়ের মত, মর্ম্মরমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া বসিয়া আছে। অমলের প্রবেশ, জুতার শব্দ কিছুই তাহার কানে যায় নাই। অমল ব্যথিত হইল,—যে অপর্ণার চটুল বাক্যবিন্যাস ও চঞ্চল গতিভঙ্গির কত প্রশংসা সে মনে মনে করিয়াছে আজ সে সামান্য একখানা শাড়ী পরিয়া, অত্যন্ত রুক্ষ কেশপাশকে পৃষ্ঠে এলাইয়া দিয়া বসিয়াই আছে। অমল ডাকিল—অপর্ণা!

অপর্ণা বলিল,—কখন এলে? হঠাৎ এলে যে!

দুইজনই অকস্মাৎ অবাক হইয়া গেল—তাহারা কবে কখন 'আপনি'র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তুমি'তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা তাহারা নিজেরাই বুঝিতে পারে নাই। তাই আজ উভয়েই অকস্মাৎ হাসিয়া ফেলিল।

অমল বলিল—কলেজে গেলে না যে!

অপর্ণা একটু হাসিয়া, ব্রীড়াভঙ্গি সহযোগে বলিল—নিত্য বারোমাস কলেজে যেতে হবে না কি? পড়ায় এত অনুরাগ এখনও আমার হয় নি—

—অকস্মাৎ বীতরাগই বা হ'লো কেন?

অপর্ণা জবাব না দিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল,—তুমি কলেজ থেকেই এলে ত? খাবে না? ক্ষিধে পেয়েছে ত—

অমল বলিল.—কলেজস্কোয়ারে ক্ষিধে পেয়েছে, তাই বালিগঞ্জে এসেছি খেতে—চমৎকার তোমার বুদ্ধি—

—খাবে না তা হ'লে? বেশ—তুমি মারমুখী হ'য়ে ঝগড়া ক'রতে এসেছ বলে মনে হয়—

—সত্যিই তাই।

করুণা আসিয়া পড়িল। অপর্ণা বলিল—খাবার, চা নিয়ে আয়।

করুণা রহস্য ব্যক্ত করিয়া ফেলিল—অমলবাবু, দিদি আজ বলেছে যে আপনি আস্‌বেন—

—সত্যি?

—হ্যাঁ।

অপর্ণা বলিল.—যা খাবার নিয়ে আয়। করুণার প্রস্থানের পর বলিল—কেন যেন মনে হ'ল আপনি আসবেন—কলেজে যাই নি বলেই হোক বা সমিতির সভায় যোগদানের কোন সংবাদ নিয়ে—অপর্ণা হাসিয়া ফেলিল।

অমল বলিল—হাসলে যে।

—আমার অনুমান সত্য হ'য়েছে বলে আর কি? অপর্ণা তবুও হাসিতে লাগিল।

অমল বুঝিয়া পায় না অপর্ণা আজ এমন করিয়া প্রগলভের মত কেবল হাসিতেছে কেন? সে অত্যন্ত অবাক বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

অপর্ণা বলিল—কাল সমিতির সভায় যাবে.ত?

—তুমি?

—যাবো, কলেজ থেকে একসঙ্গেই কেমন?

অমল ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—তোমার ত বেশ পরিবর্ত্তন. হ'য়েছে দেখছি—আগেকার লোকটাকে তোমার মাঝে আর চিনবার যো নেই দেখছি।

—তোমারও ত তাই।

—মানে।

—আমাদের বাড়ীতে বলে বলে আনতে পারিনি, আর আজ স্বেচ্ছায় খোঁজ নিতে এসেছ—আশ্চর্য্য!

—মিথ্যা কথা, আমাকে ব'লতে হ'য়েছে বটে, তবে বলে বলে আনতে হয়নি। না ব'লতেই আসা, বিশেষতঃ কোন মেয়ের বাড়ীতে কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

চা' পান করিতে করিতে অমল বলিল—যা হোক্ শুভকর্ম্ম কবে?

—যথা সময়ে নিমন্ত্রণ পত্র পাবে সন্দেহ নেই।

—নিশ্চয়ই, কিন্তু আমাদের মত লোকের একটু আগে জানা দরকার—তৈরী হ'তে হবে ত!

অপর্ণা আঁখি ভঙ্গি করিয়া বলিল,—অর্থাৎ? বিয়ে হবে আমার, আর তৈরী হবে তুমি—তার মানে—

অমল বলিল,—অত্যন্ত সহজ অর্থ, অতি পরিষ্কার,—একটা উপহার-টার কিছু দিতে হবে ত—গরীব মানুষ জোগাড় করতে কিছু সময় যাবে—

—ও, কি দেবে? একটি কবিতা, না একটি সোনার দুল, না আরও কিছু—

অমল চিন্তিত হইয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিল,—কি দেব তার জন্যে নয়, কি দেওয়া যায় তা ভেবে বের ক'রতেই ত যথেষ্ট সময় লাগ্‌বে।

অপর্ণা চা পান করিতে করিতে বলিল,—এখনই ভাবতে সুরু কর, কিন্তু দুশ্চিন্তা ক'রতে আমি বলি না,—দোকানে যেয়ে যা প্রথম চোখে পড়ে তাই কিনে নিয়ে আস্‌বে—

—ধর সেটা যদি একটা বাল্‌তি বা ঘটি হয়—অমল হাসিয়া উঠিল।

—ভালই হবে, গেরস্তের কাজে ভয়ঙ্কর উপযোগী।

—হ্যাঁ, তা বটে, সন্দেহ নেই।

দুইজনেই ক্ষণিক চুপ করিয়াছিল—অমল অনেক কিছু বলিবে ভাবিয়াছিল কিন্তু মুখোমুখি বসিয়া সে যেন বলার কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছিল না। অপর্ণাই তাহার কপাল হইতে অবলম্বিত এক গোছা কৃষ্ণকেশ অপসারিত করিয়া প্রশ্ন করিল,—হঠাৎ কি জন্যে এলে সত্যি ক'রে বল না।

—আসবার কারণটা ভেবে বের করে তারপর এসেছি এমন অনুমান তুমি কেন ক'রলে, অন্যরূপও ত হ'তে পারে। আসাটাই প্রয়োজন ছিল, কারণ অনুসন্ধান ক'রবার প্রয়োজন হয় নি।

—আমার অসুস্থতা মনে ক'রেছিলে—উদ্বিগ্নও হ'য়েছিলে সম্ভব!

—তাও সম্ভব, কলেজে যেয়ে তোমাকে না দেখেই কেমন মনটা খারাপ হ'য়ে গেল, ভেবে চিন্তে চলেই এলাম।

অপর্ণা হাসিয়া বলিল,—তুমি সত্যই মহৎ। যাক্ কাল সমিতিতে তোমার একটা কবিতা পড়া চাই—আছে ত?

—না।

—তার মানে, কবিতার খাতা নেই তোমার? একটা বেছে নিয়ে আস্‌বে।

—খাতায় খাতায় কবিতা লিখবার ক্ষমতা আমার নেই।

অপর্ণা বলিল,—মাটি ক'রেছ, তোমার কবিতা যে আমি দিয়েছি।

—রাতারাতি এত লোকে এত কাজ ক'রতে পারে, আমি কি একটা কবিতাই লিখ্‌তে পারবো না।

অপর্ণা খুশী হইয়া বলিল,—বেশ, একেই বলে সাধনা। কাল কলেজ থেকে একসঙ্গেই যাবো—ঠিক রইল।

—অবশ্যই ঠিক রইল।

অপর্ণা অকস্মাৎ একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিল,—বিবাহটা শুভকর্ম্ম বলে মনে হয়!

—অবশ্যই, বাঙালীর জীবনে অবশ্য কর্ত্তব্য।

—তবে, আমার জীবনে এমন একটা শুভকর্ম্মের সংবাদ পেয়ে তুমি ক্ষেপে গেলে কেন?

—ক্ষেপে গেলুম?

—হ্যাঁ।

—বল কি?

অপর্ণা প্রতিবাদ করিল,—অপ্রিয় হ'লেও সত্য। তুমি ব'লে গেলে মানুষকে বিয়ে ক'রতে, আমি এখন মানুষ পাই কোথা,—বিয়ে আমরা করি টাকাকে, ভালবাসি মানুষকে!

অমল আশীর্ব্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলিয়া কহিল,—জয়স্তু,—তোমার সাধনা সিদ্ধ হোক্।

—হোক্, আপত্তি ক'রবো কেন।

অপর্ণা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—বসো, আমি তৈরী হ'য়ে আসি,—একটু বেড়িয়ে আসা যাক্—কেমন?

অমল পুলকিত হইয়া নাটকীয় ভঙ্গিতে কহিল—তোমার অভিরুচি!

অমল বালিগঞ্জের পার্কে ঘণ্টাখানেক অপর্ণার সহিত ঘুরিয়া গল্প করিল,—অনেক কথাই হইল কিন্তু কি সমস্ত কথা হইল তাহা গোছাইয়া বলা যায় না, কারণ এ জগতে যাহারা ভালবাসিয়াছে তাহারা কোনদিনই গোছাইয়া কথা বলিতে পারে নাই,—অবান্তর, অর্থহীন কথার মধ্যেই প্রেমের প্রকাশ, কথা বলাই প্রয়োজন—তাহার অর্থের নহে।

অমল বাসায় ফিরিয়া দেখিল তাহার সঙ্কল্প সে সাধন করিতে

পারে নাই। একটা কিছু হেস্তনেস্ত করিবে বলিয়াই গিয়াছিল, স্পষ্ট যাহা হয় বলিয়া রহস্যময়ী অপর্ণাকে সে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিবে কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল—যাহা বলিবে ভাবিয়াছিল তাহা যেন কোন মায়ামন্ত্রে অপর্ণার সান্নিধ্যে মন হইতে উবিয়া গিয়াছে, যাহা বলিবে তাহার কিছুই বলা হয় নাই, যাহা বলিবে না তাহার সবখানিই বলিয়া আসিয়াছে। সে ভাবিয়াছিল—স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে সে তাহাকে ভালবাসে কি না এবং ভালবাসিলে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছে কি না। কিন্তু তাহার কোনটিই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

অপর্ণার কথা বিচার করিয়া সে দেখিল কিন্তু তাহার মাঝে তাহার মনের সন্ধান সে পাইল না, যতই সে বিচার করে ততই অপর্ণা তাহার কাছে দুর্ব্বোধ্য ও রহস্যময়ী হইয়া উঠে। অমল মনে মনে হাসিল,—কি বিচিত্র মানুষের মন, কি বিচিত্র এই মেয়েটি! তবে এটুকু সে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিল, যে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার উপস্থিতিতে সে খুশীই হইয়াছে।

ডলি মিত্রের বাড়ীতে আজ সমিতির সভা।

ডলি নিজেই অভ্যর্থনা করিতেছিল। অপর্ণা ও অমল যখন উপস্থিত হইল তখন সভার সময় আসন্নপ্রায়। অপর্ণা রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া বলিল,—তুমি ত বাড়ী চেনো না, আমি না এলে কি ক'রতে?

—আসতুম না।

—বাঃ সমিতির উপর ত তোমার খুব টান!

—তা নেই, তা তুমি জানো; তবে সভ্যাদের প্রতি যথেষ্ট মমতা আছে।

—সভ্যাদের—বহুবচন!

—হ্যাঁ।

—একটু একনিষ্ঠ হওয়া কি ভাল নয়!

—না। বিশ্বপ্রেমের যুগ—তা ছাড়া তোমার প্রতি নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখালেও ত লাভ নেই।

—কেন?

অমল কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—ওই যে সেই অজিতবাবু, বিলেত ফেরৎ—

অপর্ণা হাসিয়া বলিল,—তিনি বুঝি আমাকে গ্রাস করেছেন?

—না, সম্প্রতি মুখব্যাদান ক'রেছেন।

ডলি গেটের ওপার হইতে বলিল,—এই যে অপর্ণাদি, বাড়ী চিনতে পারেন নি বুঝি, না? আসুন অমলবাবু, কবিতা এনেছেন ত?

ডলি তাহাদের বিলম্বের জন্য অভিযোগ করিয়া সভাগৃহে অভ্যর্থনা করিল। সভাগৃহের মাঝে দুইজন নবাগতা মহিলাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল,—আসুন, পরিচয় করে দি। ইনি অপর্ণা রায় আমাদের সম্পাদিকা, আর ইনি স্বনামধন্য কবি অমল বন্দ্যোপাধ্যায়—ইংলিশের ভাবী ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট।

অমল মুখ তুলিয়া নমস্কার করিতে যাইয়া চমকিয়া উঠিল, —যাহাদিগকে নমস্কার করিতে হইবে তাহাদের একজন রমলা মিত্র ওরফে খোকার দিদি। অমল নমস্কার করিল, ডলি মিত্র বলিল, —ইনি রমলা মিত্র, ইনি মাধুরী সরকার, দুজনেই বেথুনের থেকে নবাগতা সভ্যা।

অমল রমলাকে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। রমলাও কেমন থতমত খাইয়া যেন চুপ করিয়া গেল, পূর্ব্বে যে কোনও প্রকার পরিচয় ছিল বা আছে তাহা প্রকাশ করিল না। একটা অজানা আশঙ্কায় অমল শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে কোনও মতে সংযত হইয়া বলিল,—যাহোক্ আমাদের সমিতির অসৎ উদ্দেশ্যের প্রতি আপনাদের সহানুভূতি আছে জেনে আনন্দিত হলাম। আশা করি ভবিষ্যতে—

অপর্ণা প্রতিবাদ করিল,—না, তোমাকে আর ভদ্রসমাজে চালু ক'রতে পারলাম না—অসৎ উদ্দেশ্যে কি ব'লছিলে—বল মহৎ—

অমল বলিল,—অসৎ বলে ফেলেছি নাকি? ওটা printing mistake—তবে যাহা মহৎ তাহাই অসৎ—

—তার মানে?

—ওই ভেদবুদ্ধি আছে বলেই তোমার মোহান্ধ আত্মার মুক্তি হবে না।

অপর্ণা ও অনেকেই হাসিয়া উঠিল। অপর্ণা বলিল,—যাক্ তোমার আধ্যাত্মিকতা একটু যেন বুঝেছি—তুমি মুক্তপুরুষ। তোমার কি!

প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পরে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

ডলি অমলের নামই প্রস্তাব করিল সভাপতিত্বের জন্য। সকলে সমস্বরে অনুমোদন করিল। জনৈক সভ্য বলিল,—অমল তোমার পা কাঁপবে না ত!

অমল কৃত্রিম করুণকণ্ঠে কহিল,—পা ত কাঁপে না, কাঁপে বুক। সেটা থামানোর কোন কৌশলই নেই।

অমলের সভাপতিত্বে সভা আরম্ভ হইল। অমলের পাশে বসিয়াই অপর্ণা কার্য্যসূচি দেখাইয়া দিল। অমল বলিল—আজ আমাদের এই সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রথম আনন্দদায়ক বস্তুই হবে—নতুন সভ্যা মিস্ রমলা মিত্রের কবিতা।

রমলা তাহার ভ্যানিটি-ব্যাগ খুলিয়া কবিতাটি বাহির করিল

এবং অত্যন্ত মৃদু ও অস্পষ্ট কণ্ঠে তাহা পড়িয়া গেল, কেহ কিছুই বলিল না, কেবলমাত্র অমল বলিল—চমৎকার।

অমলের প্রশংসাবাদে ডলি ও অপর্ণা একটু মৃদু হাসিল—এবং অন্যান্য সভ্য ও সভ্যা কেবলমাত্র চুপ করিয়া রহিল। রমলা মুখ নীচু করিয়া ছিল—সভাগৃহ মাঝে চাহিয়াও দেখিল না যে একটা অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন হাসি অত্যন্ত সংগোপনে তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

অমল এই ব্যঙ্গ লক্ষ্য করিয়াছিল এবং সেটাকে চাপা দিবার জন্যই তাড়াতাড়ি বলিল—দ্বিতীয় কার্য্য আপনাদের হ'চ্ছে সুধাকণ্ঠী শ্রীমতী ডলি মিত্রের একখানি কাব্য সঙ্গীত শ্রবণ।

ডলি বিলোল আঁখি কটাক্ষে অমলকে প্রতিবাদ করিয়া কহিল,—সুধাকণ্ঠী? ব্যঙ্গ?

অমল কৃত্রিম ক্রোধে কহিল,—এ সভাপতিত্বের কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব,—এটা সনাতন নিয়ম যে সভাপতি উপযুক্ত বিশেষণ দ্বারা বক্তা প্রভৃতিকে পরিচিত করে দেবেন; কিন্তু বক্তা বা গায়িকা যদি প্রতিবাদ করেন তবে আমি সভা পরিচালনা ক'রতে অক্ষম—যাক্ ভুল সংশোধন করে নি,—আপনারা এবার কাককণ্ঠী মিস্ মিত্রের একটা গান শুনুন। হ'য়েছে মিস্ মিত্র?

সকলে হাসিল। মিস্ ডলি মিত্র বলিল,—ওইটেই প্রাপ্য বিশেষণ।

ডলি গান করিল,—আধুনিক একখানা কাব্য-সঙ্গীত। গান থামিবার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই করধ্বনির সাহায্যে ডলির প্রশংসা করিল। কেবল একটি মাত্র ব্যক্তি সভাগৃহের কোণে বসিয়া নীরবে নতদৃষ্টিতে এই সঙ্গীতকে অভিনন্দিত করিল না। অমল সেই দিকেই চাহিয়া ছিল—দৃষ্টি মিলিত হইতেই রমলা ব্যথিত দৃষ্টিতে অমলের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। অমল কেন যেন তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিল না, চোখ ফিরাইতেই দেখে অপর্ণা তাহার দৃষ্টি ও এই দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া আপন মনেই একটু হাসিতেছে।

অমল পরবর্ত্তী অনুষ্ঠান উল্লেখ করিয়া দিয়া মৃদুকণ্ঠে অপর্ণাকে প্রশ্ন করিল,—তুমি হাসলে যে?

অপর্ণা পুনরায় হাসিয়া কহিল,—হাসি পেলে কি ক'রবো?

—চুপ ক'রে থাকবে। কেন হাসলে বল না?

অপর্ণা বলিল,—পরে, মিস্ মিত্রের সঙ্গে পরে আলাপ ক'রে নেব, কেমন?

অমল ব্যঙ্গ করিল,—এটা ত হাস্যকর প্রসঙ্গ নয়।

—তাই নাকি? জানতুম না। অপর্ণা স্মিতহাস্যে অমলকে কি যেন জানাইতে চাহিল কিন্তু অমল কিছু না বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিল।

এই সামাজিক অনুষ্ঠানের শেষ দফা ছিল, অমলের কবিতা। অপর্ণা অমনোযোগী অমলের হাতের উপর একটা চাপ দিয়া বলিল,—কি করছো? এবার তোমার কবিতা। বড্ডো আন মনা ত?

অমল বলিল,—ও, হ্যাঁ এবার স্বনামধন্য কবি শ্রীযুক্ত অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কবিতা আপনারা শুনুন।

সকলেই হাসিয়া উঠিল। অমল এমনভাবে কথা কয়েকটি বলিয়া ফেলিল যেন সে নেহাত অভ্যাসবশতঃই বলিয়াছে। অমল পুনরায় বলিল—আপনাদের নির্ব্বাচিত মাননীয় সভাপতির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা এর নিন্দা ক'রবেন না। নিন্দা যিনি ক'রবেন তাঁকে পরশ্রীকাতর বলা হবে—

অপর্ণা বলিল,—ভণিতা না ক'রে এখন পড়।

অমল বলিল,—আমি সভাপতি, এটা মনে রেখো। বয়স না মানো আমার পদবী মেনে চলো।

অমলের কৃত্রিম ক্রোধই যথেষ্ট উপভোগ্য হইয়াছিল তাই সভাস্থ সকলে করতালি দিয়া তাহাকে অভিনন্দিত করিল। অমল তাহার কবিতা পড়িল,—রবীন্দ্রনাথের "পঞ্চ শরে ভস্ম ক'রে করেছ একি সন্ন্যাসী" কবিতার প্যারডি। 'বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে' স্থানে "ক'লকাতাময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে" শুনিয়াই সকলে হাসিয়া উঠিল। অমল দৃষ্টির প্রান্তে রমলাকে লক্ষ্য করিল,—সে তেমনি নির্ব্বাকভাবে সভার কোণে বসিয়া আছে। সভার এ হাসি উৎসবের অনেক দূরে কোথায় যেন সে বিচরণ করিতেছে। এ সভায় তাহার এই পরাজয় অমলকে আজ কেন যেন ব্যথিত করিয়া তুলিল। (ক্রমশঃ)

পতন!

৺সত্যব্রত মজুমদার

ঝরে পড়ে দূর গগননিবাসী বরষার মেঘভার,
অম্বর ভাবে, হেন অধোগতি কোন্ পাপে হল তার!

ধরাপানে চাহি হর্ষ ঘনায় মেঘের নয়ন কোণে
তার সাফল্য নিশায় উড়িছে ধরণীর শ্যাম বনে।

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ-এস-এস, এফ-আর-ই-এস

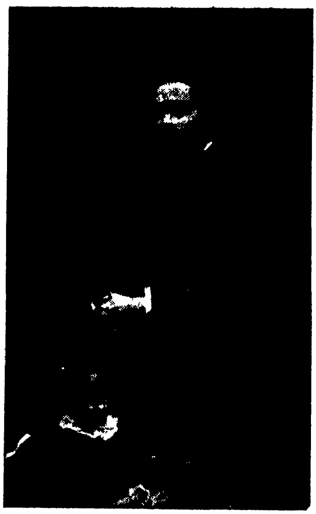
(১৮)

শোক প্রকাশ (ভারতবর্ষে)

২১শে জুলাই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্রের মৃত্যুর সংবাদ ইংলণ্ড হইতে বিদ্যুৎ-গতিতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র কলিকাতা হাইকোর্টে তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষের বিচারকক্ষে ২৩শে জুলাই মাননীয় বিচারপতিগণ, ব্যারিষ্টার, উকীল ও এটর্ণিগণ সমবেত হইয়া উমেশচন্দ্রের জন্য শোক প্রকাশ করিলেন।

ব্যারিষ্টারগণের পক্ষ হইতে তদানীন্তন এডভোকেট জেনারেল স্যর (পরে রায়পুরের প্রথম লর্ড) সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বলিলেন :—

"এই বিচারালয়ে যিনি বহুদিন ব্যারিষ্টারী করিয়াছেন সেই ডব্লিউ সি



উমেশচন্দ্র শিশুকন্যা সহ

বনার্জীর ইংলণ্ডে মৃত্যুর শোকাবহ সংবাদ গত কল্য প্রত্যূষে কালকাতায় পৌঁছিয়াছে এবং তাহা আপনাদের গোচরে আনিবার দুঃখময় কর্ত্তব্য আমাকে সম্পাদিত করিতে হইতেছে। মিঃ বনার্জী ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ১১ই জুন মিডল টেম্পল সমাজের ব্যারিষ্টার এবং তাহার প্রায় এক বৎসর পরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে এই বিচারালয়ের এডভোকেট শ্রেণীভুক্ত হন। সেই সময় হইতে প্রায় একাদিক্রমে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই বিচারালয়ে ব্যবহারাজীবের কার্য্য করিয়াছেন। ব্যবসায়ে তিনি অনন্যসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি প্রায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস আদিম বিভাগে, অন্ততঃ বহু বৎসর তাঁহার ন্যায় এমন কোন ব্যবহারজীব ছিলেন না যাঁহার প্রতি বিচারপতিগণের, এটর্ণীগণের এবং বাদী প্রতিবাদিগণের অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। আদিম বিভাগে সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করণান্তর মিঃ বনার্জী আপীল বিভাগে কায করিতে আরম্ভ করেন এবং এই বিভাগেও তিনি অনতিকালমধ্যে আদিম বিভাগের ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

বিচক্ষণ ব্যবহারাজীব, নিপুণ দলীল-লেখক, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সওয়াল-জবাবকারী, মিঃ বনার্জী আমাদের অনেকের নিকট এই বিচারালয়ের এডভোকেটদিগের আদর্শস্থানীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেন। তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভা জনসাধারণ এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল নিযুক্ত



প্রথম লর্ড সিংহ

হন এবং চারি বৎসর কাল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে দুই বৎসর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। জীবনের প্রতি কার্য্যে মিঃ বনার্জী তাঁহার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত করিয়াছিলেন। আমাদের নিকট তাঁহার নামের খ্যাতি ও আদর্শ রহিল—আমরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিব। তাঁহার পরিবারবর্গকে বার হইতে আমরা গভীর ও আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি।"

গবর্ণমেণ্টের প্রধান সরকারী উকীল রামচরণ মিত্র এবং প্রবীণ এটর্ণি

কালীনাথ মিত্র উকীল ও এটর্ণিগণের পক্ষ হইতে মর্ম্মন্তুদ ভাষায় তাঁহাদের শোক প্রকাশ করিলেন।

অতঃপর প্রধান বিচারপতি স্তর চন্দ্রমাধব ঘোষ বলিলেন :—

"আমার বলা অনাবশ্যক যে আমিও আমার সহযোগী বিচারপতিগণ মিঃ ডব্লিউ-সি-বনার্জীর মৃত্যুতে কিরূপ গভীর শোক অনুভব করিতেছি। ব্যক্তিগতভাবে বলিতে পারি আপনারা যাহা বলিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটি শব্দ আমার হৃদয়ে অনুরূপ ভাবের প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে। ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে তিনি অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন—আমি বলিতে পারি শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারসমূহের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, স্বাভাবিক পূর্ণাঙ্গতা, যাহার সহিত তিনি তাঁহার দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যসমূহ সম্পাদিত করিতেন, কি বিচারপতি, কি ব্যবহারাজীব, কি সাধারণ সকলেরই শ্রদ্ধা আকৃষ্ট



স্তর চন্দ্রমাধব ঘোষ

করিত এবং তিনি এই বিচারালয়ে ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে একটী অত্যুচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিলেন—যে আসন তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনও ভারতীয় অধিকৃত করিতে পারেন নাই। তিনি কয়েক বৎসর অত্যন্ত প্রশংসার সহিত গবর্ণমেন্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেলের পদও অধিকার করিয়াছিলেন। ভারতীয়গণের মধ্যে তিনি এক অপূর্ব্ব পদ লাভ করিয়াছিলেন। দেশবাসিগণ তাঁহাকে অসীম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিত এবং আমার স্থির বিশ্বাস যে তাঁহার তিরোধান আমাদের দেশবাসী একটী জাতীয় শোকের কারণ বলিয়া বিবেচনা করিবেন। এ দেশ হইতে অবসর গ্রহণানন্তর তিনি প্রিভি কাউন্সিলে কয়েক বৎসর ব্যারিষ্টারী করিয়াছিলেন এবং সেখানেও তিনি উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিলেন। প্রিভি কাউন্সিলে ওকালতী করিবার সময়েও তিনি ভারতবর্ষের কল্যাণকর বিষয়াদিতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা ইংলণ্ডে বিদ্যার্জ্জনের জন্য যাইতেন তাঁহাদিগকে পরিদর্শন করার কার্য্য আমার মতে বিশেষ মূল্যবান। বস্তুতঃ তিনি অনেক বিদ্যার্থীর সহৃদয় অভিভাবকস্বরূপ ছিলেন। আমার বিশ্বাস সকলেই তাঁহার মৃত্যুতে দুঃখিত হইবেন। আমি আমার নিজের পক্ষ হইতে এবং অন্যান্য বিচারপতি ভ্রাতৃগণের পক্ষ হইতে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি এবং স্বর্গগতের পরিবারবর্গের প্রত্যেককে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা ও সান্ত্বনা জানাইতেছি।"

স্তর চন্দ্রমাধব উমেশচন্দ্রকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন তাহা প্রবোধগোপাল বসু বিরচিত "স্তার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের জীবনী" পাঠে অবগত হওয়া যায়। উহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"১৮৮৪ খ্রীঃর মাঝামাঝি সময়ে হাইকোর্টে ৩৮জন অতিরিক্ত জজের আবশ্যক হইয়া পড়ে। বিলাত হইতে সেক্রেটারী অব ষ্টেট রাজপ্রতিনিধি বড়লাটকে সরাসরী টেলিগ্রাম করেন যে মিষ্টার ট্রেভেলিয়্যানকে ও মিষ্টার ডব্লিউ-সি-ব্যানার্জীকে জজীয়তীর পদে নিয়োগ করা হউক। হাইকোর্ট বলিয়া পাঠায় যে একজন সিভিলিয়ান, একজন ব্যারিষ্টার এবং একজন উকীলকে জজ করা হউক। লাটসাহেব এবং প্রধান বিচারপতি যখন ডব্লিউ-সি-ব্যানার্জীকে ডাকিয়া জজীয়তী দিতে চাহিলেন—তখন ডব্লিউ-সি-ব্যানার্জী ধন্যবাদের সহিত তাহা তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করেন। চন্দ্রমাধব বাবু বলিতেন—"W. C. Banerjeeর মত ব্যারিষ্টার কলিকাতা হাইকোর্টে কেহ হয় নাই। যদিও পরে এস-পি-সিংহ, এ-চৌধুরী, বি-চক্রবর্ত্তী ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন এবং পয়সাও অধিক উপার্জ্জন করিতেন, তথাপি দক্ষতা হিসাবে ডব্লিউ-সি-ব্যানার্জী অপেক্ষা সকলেই কম। ডব্লিউ-সি-ব্যানার্জী বলিতেন যে বি-চক্রবর্ত্তী, এস্-পি-সিংহ, এ-চৌধুরী এই তিনজন নব্য যুবক ব্যারিষ্টার শীঘ্র প্রাধান্য লাভ করিবে।

মিষ্টার ডব্লিউ-সি-ব্যানার্জীর সহিত চন্দ্রমাধববাবুর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহার পৌত্র (শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ রায় বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যোতিষবাবু) যখন বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়েন তখন মিষ্টার ডব্লিউ-সি-ব্যানার্জী তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিতেন ও খোঁজখবর লইতেন।"

স্মৃতিচিহ্ন

উমেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে কলিকাতার পৌরসভা তাঁহার দেশসেবার জন্য উৎসর্গীকৃত পৈত্রিক ভবনের সম্মুখস্থিত রাস্তার নাম তাঁহার নামানুসারে 'ডব্লিউ-সি-বনার্জী ষ্ট্রীট' রাখিয়াছিলেন। কংগ্রেস তাঁহার পৈত্রিক ভবনের সিংহদ্বারের নিকট এই বাক্যগুলি উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন Simla House. Here lived in his boyhood an illustrious son of India and the foremost jurist and Barrister Woomesh Chandra Bonnerjee, a Hindu Brahmin lawyer, the first President of the Indian National Congress in 1885 Re-elected in 1892 in Allahabad, যে বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন সেই ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে তাঁহার

একটি বৃহদায়তন তৈলচিত্র সংরক্ষিত হইয়াছে।* যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বহু বৎসর 'ল ফ্যাকাল্টীর ডীন'রূপে কার্য্য করিয়াছেন এবং যাহার প্রতিনিধিরূপে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় দেশবাসীর পক্ষ সমর্থন করিয়া তর্কযুদ্ধ করিয়াছেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাগৃহে তাঁহার তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হাইকোর্টের বারলাইব্রেরীতে উহার সর্ব্বজনস্বীকৃত নেতা উমেশচন্দ্রের একখানি প্রতিকৃতি রক্ষিত হইয়াছে। যিনি য়ুরোপীয় আচার-ব্যবহার অবলম্বন করিয়াও চিরদিন হিন্দুনারীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন সেই উমেশচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিচিহ্ন তদীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী পত্নীর শেষ অভিপ্রায়ানুসারে কলিকাতায় মেয়ো হাসপাতালে হিন্দুনারীদের জন্য উমেশচন্দ্র-হেমাঙ্গিনী ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কল্যাণকর কার্য্যের দ্বারা তিনি তাঁহার পরলোকগত

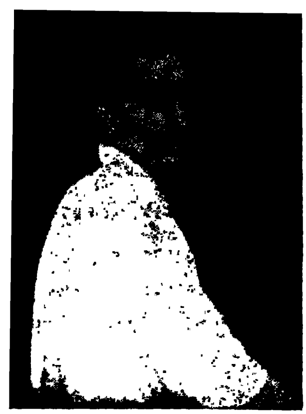


স্যর লরেন্স জেঙ্কিন্স

পতির আত্মার পরিতৃপ্তি সাধন করিয়াছেন। এই ওয়ার্ড উন্মুক্ত করিবার সময় (২৫শে আগষ্ট ১৯১১) বাঙ্গালার তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যর লরেন্স জেঙ্কিন্স বলিয়াছিলেন :—

"পঞ্চদশবর্ষাধিক কাল পূর্ব্বে আমি প্রথম মিষ্টার বনার্জ্জীর সহিত সাক্ষাৎলাভের সৌভাগ্য লাভ করি। তিনি তখন প্রতিষ্ঠার সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমারূঢ়, শক্তিশালী অথচ বিনয়নম্র ব্যবহারাজীব, রাজনীতিক চিন্তাজগতে প্রতিভাদীপ্ত নেতা, সাধু ও সত্যনিষ্ঠ পুরুষ, ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য নিয়ত উদ্যমশীল এবং স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর প্রতি গভীর ও অবিচলিত প্রেমে অনুপ্রাণিত।"

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগের সভাপতিত্বে ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারীতে এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে য়ুনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটে দুইটী স্মৃতি সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। উমেশচন্দ্রের পৌত্রী শ্রীযুক্তা সাধনা দেবী, পৌত্র প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং খুল্লতাতপুত্র ও উমেশচন্দ্রের চরিতকার



বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার পুত্র সম্প্রতি পরলোকগত সুলেখক বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির উদ্যোগে উভয় সভাই সাফল্য লাভ করিয়াছিল এবং মিঃ ডব্লিউ-সি, ওয়ার্ড-ওয়ার্থ, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু, স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বক্তা উমেশচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই শতবার্ষিকী স্মৃতিপূজা উপলক্ষে স্যর তেজবাহাদুর সাঁপ্রু, ডাক্তার সচ্চিদানন্দ সিংহ, স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি নেতারা যে বাণী প্রেরণ করেন তন্মধ্যে ভারত-মাতার সুসন্তান শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহার একাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করা দুঃসাধ্য। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারীর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী হইতে এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত অংশটী উদ্ধারযোগ্য :—

"গত বৎসরে ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারীর সভাপতি মিষ্টার ডব্লিউ-সি-বনার্জ্জীর অতি শোচনীয় মৃত্যু দুঃখের সহিত কার্য্যনির্বাহক সমিতি লিপিবদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার পরলোকগমনে বিদ্যালয় বন্ধ করা হইয়াছিল এবং পাঠাগারে তাঁহার একটি প্রতিকৃতি রক্ষা করিবার সংকল্প করা হইয়াছিল। বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর—বিদ্যালয়ের সেই যুগসন্ধিকালে, —মিষ্টার বনার্জ্জীর একাগ্র সহানুভূতি এবং সক্রিয় চেষ্টাতেই এই বিদ্যালয় *১৯০০ খৃষ্টাব্দে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ আইনানুসারে রেজিষ্ট্রিকৃত হয়, বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে ১৫,৫০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ উদ্ধার করা হয় এবং বিদ্যালয়টী বর্ত্তমানের ন্যায়

heirs and beneficiaries of his brave and noble labours should render due honour to this great patriarch of the national renaissance who brought to the service of his country the varied and splendid gifts of his vigorous intellect, his dominating personality and the breadth and clarity of his political vision, the course and sanity of his political wisdom,"

ভারতবর্ষের নানা স্থানে শোকসভা আহূত হইয়াছিল। মিঃ



শ্রীযুক্তা সরোজিনী নায়ডু

জি-এ-নটেশন লিখিয়াছেন যে মাদ্রাজে একটি সভায় ব্যারিষ্টার আর্ডলি নর্টন বক্তৃতা করিতে গিয়া অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে দাদাভাই নৌরোজীর সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে একটি প্রস্তাবে প্রাক্তন-সভাপতি ডব্লিউ-সি-বনার্জী, বদরুদ্দীন তায়েবজী এবং আনন্দমোহন বসুর জন্য শোকপ্রকাশ করা হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সদ্বিদ্বান স্যর রাসবিহারী ঘোষ তদুপলক্ষে বলেন :—

"উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের জন্মকালে নবজাতকের শয্যাপার্শে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং জনকের ন্যায় স্নেহ ও যত্নের সহিত উহাকে পালন ও পোষণ করিয়াছিলেন। যে কংগ্রেসকে তিনিই জীবনদান করিয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তাহা আজ প্রাপ্তবয়স্ক হইল, কিন্তু



স্যর রাসবিহারী ঘোষ

আমাদের সেই ভক্তিভাজন নেতা—সেই বিচক্ষণ ;সেই নির্ভীক নেতা আজ আমাদিগের এই আনন্দের অংশভাগী হইতে আমাদের মধ্যে উপস্থিত নাই। তাঁহার ভস্মাবশেষ বিদেশে সমাহিত আছে—কিন্তু একটি মহাজাতির শোক সমুদ্রপারে ইংলণ্ডে তাঁহার শেষ বিশ্রামস্থলে তরঙ্গায়িত হইয়াছে—যে ইংলণ্ডকে তিনি স্বদেশের পরেই সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন।"

(আগামী বারে সমাপ্য)

সনেট

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম-এ কাব্যরঞ্জন

সে কথা শোনেনি কেহ—শুনেছে কেবল
রাকাশশিমুশোভনা গতঘনা রাতি—
আর শুভ্র অভ্রতলে স্তব্ধ তারাদল !
তখন নিবিয়াছিল নিশীথের বাতি
শিয়রে মোদের ; শুধু চম্পক-সুবাস
ভাসিয়া আসিতেছিল বাতায়ন দিয়া ;
কণ্ঠলীন ছিল মোর বাহুপাশ—
মিশে যেন গিয়েছিল হিয়া সনে হিয়া ?
আজি কি ভুলেছ তুমি সেদিনের কথা—
সে কুণ্ঠিত লাজ-নম্র প্রথম ভাষণ—
রজনীর স্বপ্ন সবে ভুলে যায় যথা ?
কে কবে বুঝেছে হায়, রমণীর মন !
কী সে কথা ?—আজি তব যাই জানাইয়া—
"ভালোবাসি" মোরে তুমি ব'লেছিলে প্রিয়া !

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নয়

চর ইসমাইলের উপর দিয়া সূর্য উঠিল।

এক একটি রাত্রির কালো অন্ধকার দিগন্ত-প্রসারিত নদীর বুক হইতে নিজেকে বিকীর্ণ করিয়া দেয়—আবার প্রভাতের প্রথম আভাসে রহস্যময় অতলস্পর্শ জলের তলায় বিলীন হইয়া যায়। রক্ত-সমুদ্রে স্নান করিয়া নিজেকে প্রকাশিত করে প্রতিদিনের সূর্য—নবজাতক সূর্য। বিস্ময়-ব্যাকুল চোখ ফেলিয়া সেই সূর্য যেন নতুন করিয়া দেখিতে চায় পৃথিবীকে, যেন সত্তার মধ্যে অনুভব করিতে চায় বিস্মৃত আদিম কালের সেই প্রথম অগ্নিস্রাবী দিনগুলি, যেদিন মাটি ছিল না, জল ছিল না, শ্যামশ্রীর আনন্দিত বিস্তার ছিল না—প্রাণে-শব্দে সমুজ্জ্বল মানুষের উপনিবেশ ছিল না। আকাশ বাতাস, পঞ্চভূতের বুকের মধ্যে শুধু ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল সোনা, লোহা, গন্ধক, সোরা, লাক্ষা, লাভা, হাইড্রোজেন, কার্বন—আরো কত কি।

সূর্য স্বপ্ন দেখে, কিন্তু পৃথিবী সে স্বপ্ন ভুলিয়া গেছে বহুদিন আগে। তার মুগ্ধ চোখে আবিষ্ট হইয়া আছে আকাশের নীলাঞ্জন মায়া—তার সর্বাঙ্গে শ্যামলতার স্নিগ্ধ সৌকুমার্য উঠিতেছে হিল্লোলিত হইয়া, তার চেতনায় নব নব সৃষ্টির রোমাঞ্চকর স্বপ্নমাধুর্য। সূর্যের দিনে পৃথিবী আর ফিরিবে না, আদিম আগুনের নীল ধাতব শিখায় নিজেকে আর জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ছাই করিয়া দিবে না সে। তার ভবিষ্যৎ হিম-মজ্জিত কোন্ লক্ষ লক্ষ বৎসরান্তের শীতল তুষার শয্যায়, সূর্যহীন অন্ধকারে, রেডিয়াম ইউরেনিয়ামের ক্রম-ক্ষয়শীল অন্তর্দীপ্তিতে।

তবুও সূর্য ওঠে—নবজাতক সূর্য। সদ্যোজাগ্রত চোখ মেলিয়া তাকায় পৃথিবীর দিকে, তাকায় চর-ইসমাইলের দিকে। আর উপনিবেশের অর্ধপরিণত মৃৎ-স্তরের নীচে আদিম লাভা ফুটিয়া, ফুলিয়া, ফুঁসিয়া ওঠে—বৈষম্য কণ্টকিত, বিরোধ জর্জরিত অলস শান্তির তলা হইতে একটা উত্তাল আগ্নেয় আক্ষেপ যেন অমার্জিত মানুষগুলির শিরা-স্নায়ুতে নিজেকে সঞ্চার করিতে চায়।

উপনিবেশের বুকে মন্বন্তর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পদপাত। উনিশশো বিয়াল্লিশের আত্মঘাতী বিস্ফোরণ। অকাল বোধনের পূজায় ব্যর্থ বলির রক্তপাত। শতধাবিচ্ছিন্ন বিক্ষুব্ধ প্রাণশক্তি পথ খুঁজিয়া পায় না, পাষাণ প্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া নিজেকেই ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলে।

বিস্ময়-ব্যাকুল চোখ মেলিয়া তাকায় রক্তাক্ত সূর্য। আগ্নেয় অতীত আবার কি নিজেকে সঞ্চারিত করে ভবিষ্যতের মধ্যে? উপনিবেশের পেশীতে পেশীতে মত্ততার জোয়ার আসে। পর্তুগীজ জলদস্যুদের রক্তে ডাক আসে নতুন কালের ধারা বাহিয়া—কিন্তু সে কি দস্যুতার, না দস্যুর মতো সঞ্চিত মিথ্যাকে লুঠ করিয়া নিতে? আরাকানীর তলোয়ার আবার মাটির তলা হইতে ফিরিয়া আসে কি অত্যাচার করিবার জন্য, না অত্যাচারীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিবার জন্য?

সূর্য প্রতীক্ষা করে।

* * *

—বড় মিঞা, ও বড় মিঞা?

বড় মিঞার কাছারী বাড়ীর টিনের দরজাটা বাহির হইতে শক্ত করিয়া তালা-আঁটা। ধুলা জমিয়াছে, মাকড়সার জাল ছড়াইয়া আছে। লোহার তালাটা বহুদিন খোলা হয় না, অনেক রোদে পুড়িয়া এবং অনেক জলে ভিজিয়া সেটা যেন স্বর্গের তালার মতো কঠিন এবং সুদৃঢ় হইয়া আছে, তাহার অভ্যন্তরে নিহিত রহস্যের আবরণ ভেদ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। ভাবটা এই রকম, এখানে মানুষ নাই, এখানে কাহারো থাকিবারও কোনো প্রয়োজন নাই। যে জন্য তোমরা এখানে মাথা কুটিয়া মরিতেছ তাহা বৃথা—ধান চালের ব্যাপার বড় মিঞা বহুকাল আগেই ছাড়িয়া দিয়াছে, সুতরাং তাহা লইয়া এখানে দরবার করিতে আসা যেমন অনাবশ্যক তেমনিই অবান্তর।

কিন্তু মানুষগুলিও নাছোড়বান্দা।

—বড় মিঞা, ও বড় মিঞা।

বন্ধ কাছারী বাড়িটার ভিতরে কেমন যেন রহস্যময় একটা শব্দ পাওয়া গেল। কে যেন ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছে। মানুষ?—না, শেয়াল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

বাহিরে প্রায় পঞ্চাশজন লোক জুটিয়াছে। তাহাদের হাতে লাঠি এবং ধারালো নিড়ানি। চর ইসমাইল, কালুপাড়া এবং অন্যান্য আরো দশখানা গ্রামের একদল মুসলমান চাষা। দেশের চাল লোপাট হইয়া গিয়াছে—একটি দানাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না কোনোখানে। অথচ শোনা যায় রাত্রে যখন অন্ধকারে গাঙ থম থম করে, গ্রামের মানুষগুলি তো দূরে যাক, সদাসতর্ক প্রহরী কুকুরদের চোখও ঘুমে এলাইয়া আসে—তখন, ঠিক তখন—কাক-পক্ষীও যখন টের পায় না, আর সুপারীর পাতাগুলি পর্যন্ত নড়ে না, ঠিক সেই সময় দশ দাঁড়, পনেরো দাঁড়, বিশ দাঁড়ের পান্সী গাজীতলার হাট হইতে বাহির হইয়া গির্জাঘাটের নীচ দিয়া বড় নদীতে পড়িয়া শাঁ শাঁ শব্দে তীরের মতো অদৃশ্য হইয়া যায়।

কোথায় যায়? যায় ওপারের গঞ্জে। কেন যায়? লুকাইয়া লুকাইয়া দেশের প্রাণ, মানুষের পেটের খাবার বিক্রী করিয়া আসিতে।

এই কাজের চক্রী হইতেছে বলরাম ভিষক্‌রত্ন এবং তাহার দক্ষিণ হাত মজাঃফর মিঞা। সুতরাং চর ইসমাইলের রক্তে আগুন ধরিয়াছে। এ কলিকাতা নয় যে এখানকার মানুষ নির্বিবাদে ফুটপাথে পড়িয়া তিলে তিলে শুকাইয়া মরিবে, মাটির মাল্‌সা হাতে লইয়া দরজায় দরজায় 'ফ্যান্' 'ফ্যান্' করিয়া কাঁদিবে এবং কঁকাইবে, ডাষ্টবিনে হাত ডুবাইয়া পচা শস্যের কণিকার ব্যর্থ সন্ধান করিবে, অথবা সরকারী লরীর তলায় পড়িয়া দিব্যগতি লাভ করিবে। এরা দাবী করিতে জানে, নিজেদের প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠা করিতে জানে। এরা আইন গড়ে, আইন ভাঙে। আজ অবশ্য সহরের তৈরী অনেক বিষ বাষ্প আসিয়া এদের শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিয়াছে, কিন্তু মারিয়া ফেলিতে পারে নাই—সহজ স্বাভাবিক জটিলতাহীন সমবায় ও সাম্যবাদ এখনো ইহাদের সুস্থ কর্তব্যবোধকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে।

টিনের দরজায় ঠক ঠক করিয়া তাহারা লাঠি ঠুকিতে লাগিল।

—বড় মিঞা, বড় মিঞা—শুনছ?

তবু সাড়া নাই। মৃত্যুপুরীর মতো সব স্তব্ধ। শুধু সামনে নদীর সাদা জলে জোয়ার আসিয়াছে—উদ্দাম বাতাসে একটা তীব্র কলধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে?

—ও জমির ভাই, ব্যাপার কী?

—এখানে তো কেউ নেই মনে হচ্ছে।

জমিরের চোখে আগুন জ্বলিতেছিল।

—নেই মানে? সব চালাকি। এমন করে রেখেছে যে লোকে ভাববে ভেতরে কিছু নেই। আসলে সব লুকিয়ে রেখেছে এই গোলার মধ্যেই—রাতের বেলায় এর ভেতর দিয়ে ধান বেরিয়ে যায়।

—কিন্তু বড় মিঞা গেল কোথায়?

—আছে ভেতরেই। নিজের চোখে আসতে দেখেছি লাঠি ধরে, বাঁকা বাঁকা পা ফেলে। জিন পরী তো আর নয়—জলজ্যান্ত একটা মানুষ। হাওয়ায় নিশ্চয় উড়ে যায়নি।

একজন গর্জন করিয়া কহিল, ভাঙো দরজা।

—সে কি। বে-আইনি হবে যে।

—আইন!—জনতার মধ্য হইতে অনেকগুলি গোখ্‌রো সাপের রোষধ্বনির মতো একটা চাপা শব্দ উঠিল। আইন!

জমির আগাইয়া আসিয়া দরজায় প্রকাণ্ড একটা ঘা দিল: রেখে দাও আইন। ওই তো সার্কেল-অফিসারবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। কী করলে? কিছুই না। ও সব একদলের। করতে হবে ভাই, কারো মুখের দিকে তাকিয়ে হাত পেতে পড়ে থাকলে হা পিত্যেশ করাই সার হবে।

—ভাঙো দরজা।

দু একজন লাঠি উদ্যত করিল, কিন্তু বেশির ভাগই দাঁড়াইয়া রহিল দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া। ঘুণ ধরিয়াছে চর ইসমাইলের বিদ্রোহী শরীরে। সংশয় দেখা দিয়াছে, আইনের তর্ক উঠিয়াছে। অনর্থক ফ্যাসাদের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে কোথায় যেন বাধে।

জমির ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

—তোমরা মানুষ না!

জনতা শক্ত হইয়া উঠিল। চোখে চোখে আগুন চমকাইয়া গেল। কিন্তু এখনো মন তৈরী হয় নাই, চেতনার উপর হইতে নতুন শেখা ন্যায় অন্যায়ের ভারগ্রস্ত সংশয়টা কিছুতেই নামিয়া যাইতেছে না।

জমির বলিল, সামনে কী হচ্ছে দেখেও কি দেখতে পাও না? জমিরদ্দি মোল্লার পরিবার তিন দিন ধরে উপোস দিচ্ছে। মণিরুদ্দিনের ছেলেবউ বিনা চিকিৎসায় না খেয়ে মরে গেল। জেলেপাড়ায় মানুষ মরছে টপাটপ করে। কেন? দেশে কি চাল নেই। এত ধান হয়েছে আমাদের চরের জমিতে, আঁচলভরা সোনা ফলেছে। কোথায় গেল সে সব, কারা নিলে?

জনতা নড়িয়া উঠিল।

—ওই কবিরাজ, এই মজাঃফর মিঞা, ওই ওপাড়ার মুকুল গাজীর ব্যাটারা, জয়নাল ব্যাপারী। সব খবর এরাই জানে। দেশের লোককে প্রাণে মেরে পেট বোঝাই করছে। মাটির তলায় তলায় ধান, অন্ধকার গোলাঘরে ধান। রাতে ছিপ, নৌকোতে চালান দেওয়া ধান। আর তোমরা পড়ে পড়ে মরবে? মানুষ না গোরুর দল?

—কড়্—ঝনাৎ—ঝনাৎ—

টিনের দরজাটা যেন একটা বিরাট ভূমিকম্প অথবা প্রলয়ের আঘাতে নড়িয়া উঠিল। চর ইসমাইলের আকাশ ফাটাইয়া রণধ্বনি মুখরিত হইল: আল্লা—হু—আকবর। ভাঙো দরজা।

কাছে দূরে লোক জমিতে সুরু হইয়াছে। কতক বা ভীত-বিহ্বল চোখে চাহিয়া আছে, কতক বা লাঠি সোঁটা লইয়া ছুটিয়া আসিয়া এদের দলে যোগ দিল। অভাব সকলের, দুঃখ সকলের, নির্যাতনের অংশও সকলের সমান। তাই প্রতীকারের দায়িত্বও সকলেই এক সঙ্গে ভাগ করিয়া নিতে চায়।

—আল্লা হু আকবর—দরজা ভাঙো—

আকাশ কাঁপিতেছে, পায়ের তলায় মাটি কাঁপিতেছে, চর ইসমাইলের নিভৃত নিয়লোকে প্রচ্ছন্ন অগ্নিগিরির লাভা স্রোত ফেনাইতেছে। ধান কাটা লইয়া, জমি লইয়া লাঠালাঠি করা,

রক্তের ধারা বহাইয়া দেওয়া ইহাদের নিত্যনৈমিত্তিক ইতিহাস, কিন্তু এমন করিয়া এক হইয়া দাঁড়ানো, এমন করিয়া মাথা তুলিয়া সমস্ত অন্যায়কে চুরমার করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা—কোন্ নতুন যুগের হাওয়া আজ চর ইসমাইলের বুকে বহিয়া আনিল!

দূরে কাছে লোকগুলির মধ্যে নেশা লাগিতেছে। তাহারা আর নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র নয়, নিজেদের ভাগ্যও যে এর সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত, সেই সত্যটাকেও অনুভব করিতেছে।

—ভাঙো—ভাঙো—সাবাস্—

—মড়্—মড়্—মড়াৎ—

একটা প্রচণ্ড লাথিতে শক্ত হুড়কাটা দু টুক্‌রা হইয়া গেল—কপাটটা হাট আছড় হইয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে। সামনের লোকটি মুখ থুবড়াইয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইল, তারপর হু হু করিয়া জনস্রোত জলস্রোতের মতো ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

কাছারী ঘরে জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। কতগুলি বেঞ্চি এদিকে ওদিকে পাতা, একটা পুরাণো ভাঙা খাট। লাঠির মুখে সেগুলিকে চুরমার করিয়া তাহারা উঠোনে নামিয়া আসিল।

সামনে চার পাঁচটি গোলা সাজানো। মসৃণ করিয়া মাটি দিয়া তাহাদের দেওয়াল লেপা, তাহাদের মাথায় নতুন খড়ের সোনালি ছাউনি। সামনে দিয়া ধানের সরু সরু বিশৃঙ্খল রেখা পিছন দিকের ছোট দরজা বরাবর চলিয়া গেছে। ওই পথ দিয়াই তাহা হইলে ধান বাহির হইয়া যায়!

কিন্তু বিস্ময়ের বাকী ছিল তখনো।

ক্ষিপ্তের মতো মানুষগুলি ধানের গোলায় গিয়া চড়াও হইল। সেখানে যাহা চোখে পড়িল তাহাতে বাক্‌স্ফূর্তি হইল না কাহারো। ধান তো দূরের কথা, একটি তুষের দানাও পড়িয়া নাই সেখানে। পরিষ্কার করিয়া ঝাঁট দিয়া কে যেন শেষ শস্যকণাটি অবধি তুলিয়া লইয়া গেছে। শুধু একটি গোলাই নয়—সব কয়টির এক অবস্থা।

কয়েক মুহূর্ত অখণ্ড নীরবতা। কাহারো মুখে একটি মাত্রও শব্দ নাই।

যে অলক্ষ্য ইঁদুর মাটির তলায় থাকিয়া নীরবে দিনের পর দিন দেশের প্রাণসত্তার উজাড় করিয়া লুটিয়া খাইয়াছে, এ যাত্রাও তাহার হিসাবে ভুল হয় নাই। সময় থাকিতেই সে নিরাপদে এবং নির্বিঘ্নে তাহার কাজ গুছাইয়া লইয়াছে।

লোকগুলি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পরে আবার যেন প্রচণ্ড বন্যার বাঁধ ভাঙিল। হতাশার হাহাকার—নিরুপায় ক্ষোভের উন্মাদ গর্জন।

—ধান কই, ও জমির মিঞা, ধান কই?

—ফাঁকি দিয়েছে বুড়ো মিঞা, রাতারাতি সব সরিয়েছে।

—ধান লুকিয়েছে—সব চালাকি।

—ধান চাই, আমাদের ধান।

মার্ মার্ শব্দে সব তচনচ করিয়া গোলাগুলি সমস্ত গুঁড়াগুঁড়া করিয়া দিল জনতা। টিন, কাঠ, বাঁশ—যেখানে যে যা পাইল তুলিয়া লইল। তারপরে যেটুকু বাকী পড়িয়াছিল, একত্র করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল।

শুধু মজাঃফর মিঞার কাছারী বাড়িতেই আগুন লাগিল না—চর ইসমাইলেও আগুন জ্বলিল। আদিম পৃথিবীর আত্মপ্রাণী আগুন নয়, নতুন যুগের হোমাগ্নি। মাথার উপরে চর ইসমাইলের রক্তাক্ত সূর্য চাহিয়া রহিল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে।

গতিকটা অবশ্য আগেই বুঝিতে পারিয়াছিল মজাঃফর মিঞা।

রাতারাতি ধান সে সরাইয়াছিল—পাকা খবর যথাসময় পাইয়াই। কিন্তু এতটা যে ঘটিবে তা সে অনুমান করিতে পারে নাই। বাহিরের দরজা যখন প্রচণ্ড শব্দে ভাঙিয়া পড়িল তখন প্রমাদ গণিয়া সে হামাগুড়ি দিয়া খিড়কির পথে বাহির হইয়া আসিল।

কিন্তু পালানোর পথ নাই। মারমূর্তি মানুষ চারদিক হইতেই অন্ধ বেগে ছুটিয়া আসিতেছে, তাহাকে হাতে পাইলে আর আস্তো রাখিবে না। গুঁড়ি মারিয়া সে একটা ভাঁটফুলের ঝোপের মধ্যে বসিয়া পড়িল, তারপর ভয়ার্ত বন্যজন্তুর মতো চোখ মিটমিট করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল শ্রাদ্ধ কতদূর পর্যন্ত গড়ায়। বুকের মধ্যে ভয়ে সন্দেহে প্রাণপিণ্ড দুইটা হাপরের মতো শব্দ করিতে লাগিল, যদি একবার ওরা তাহাকে ধরিতে পারে—

কিন্তু ধরিতে পারিল না। মানুষগুলির নজর তখন মজাঃফর মিঞার দিকে নয়, ধানের দিকে। ব্যর্থ ক্ষোভে আর ক্রোধে গর্জন করিয়া তাহারা সব ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার করিল, তারপর মজাঃফর মিঞার চোখের সামনেই তাহার এত সাধের কাছারী বাড়িতে—

মজাঃফর মিঞার সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু উপায় নাই। সত্তর বছরের সীমানা ছাড়াইয়া পাড়ি দিয়াছে বয়েস। চলিতে পা কাঁপে, সর্বাঙ্গ টলিয়া ওঠে—নিজের উপরে নিজের কর্তৃত্ব নাই। দন্তহীন মুখের মাংসপেশীগুলি অনবরত নড়িয়া নড়িয়া যেন সে যা বলিতে চায় তাহারি প্রতিবাদ করে। সুতরাং ভাঁটফুলের জঙ্গলের মধ্যে সদ্য খোলস ছাড়া একটা বিষধর সাপের মতো বুক পাতিয়া সে স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল। শুধু মনে হইতে লাগিল, যদি আর দশবছর আগে হইত, তাহা হইলে—

আগুন জ্বলিতেছে, মাটির দেওয়াল ধ্বসিতেছে—শোঁ শোঁ করিয়া উড়িতেছে জলন্ত টিন। সঙ্গে সঙ্গে জনতার উৎকট উল্লাস।

প্রলুব্ধ করে সেখান থেকে ডেকে নিয়ে আসে। তারপরের দিন প্রভাতে সে চৌকিদারের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে। একটি ডোবার ধারে তার স্ত্রী ও ছেলে দুটির ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পাওয়া যায়। কোনো ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে মেয়েটিকে হত্যা করা হ'য়েছিল। মৃত্যুর পরেও আসামী মৃতদেহটিকে খণ্ড-বিখণ্ড ক'রে কেটেছিল।

আসামী নিজেই সব স্বীকার ক'রেছে।

জুরীদের প্রধান আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন। আমিও তাই ভেবেছিলাম। সুতরাং চরম দণ্ডদানে আর কোনো বাধা ছিল না। হত্যার অপরাধের শাস্তি প্রাণ-দণ্ড—বিচারের বিধান এই।

রাত্রে ড্রইংরুমে ব'সে ব'সে এই ঘটনাটি ভাবছিলাম। বিচারক হিসাবে প্রাণদণ্ডাদেশ এই প্রথম দিলাম।

হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ড। হত্যা—স্ত্রী-হত্যা, নিজের সন্তান হত্যা। কী নৃশংস বীভৎসতা!

কিন্তু…

এই অপরাধ কি আমিও করিনি? কই, আমার প্রাণদণ্ডাদেশ দেয়নি তো কেউ? প্রমাণাভাব, না?

দশ বছর আগে।

কোর্টে যাই এগারোটায়, বাড়ী ফেরার সময়ের ঠিক নেই। আমার বাংলোতে থাকে সুষমা; একমাত্র ছেলে ব্রতীন্দ্র কারশিয়াং-এ থাকে—সাহেবী স্কুলে পড়ে। আমার অবিদ্যমানে সুষমা কি ক'রে সময় কাটায়, সে সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞান ছিল না।

বাংলোর হাতাতে মোটর থাম্‌লেই সে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াতো। চাপরাশী-খানসামা তটস্থ হ'য়ে থাক্‌তো। এ সহরে ছিলাম তিন-বছর। কিন্তু এখানে আসার পর থেকেই দেখতাম—আমার আগমন প্রতীক্ষায় সুষমা থাকতো না।

"মায়জী কাঁহা রে?"

"কামরামে হ্যায় হোগা, হুজোর।"

প্রতিদিন এই ধরণের কথা শুনে শুনে অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিলাম।

গোমেজ্ ছিল আমারই এক চাপরাশী। যুবক, সুশ্রী, বলিষ্ঠ চেহারা। সুষমা এখানে আসার পর সকলের মধ্যে তাকেই বেছে নেয় নিজের ফায়-ফরমাশ খাটানোর জন্যে। গোমেজ ছিল নামে-মাত্র জজ-সাহেবের আরদালী, সরকারী পয়সা খেয়ে মেম-সাহেবের বে-সরকারী কাজ করাই ছিল তার দৈনন্দিন কর্ত্তব্য।

একদিন বাংলোয় ঢুকেই গোমেজকে ডাক দিলাম। উত্তর দিল ইয়াকুব:

"গোমেজ কামরেমেঁ হ্যায়, হুজোর।"

"কিস্ কামরেমেঁ?"

"মেম-সাবকা।"

সোজা সুষমার কামরায় ঢুকে দেখলাম—সে কুশনে শুয়ে আছে, গোমেজ পাশে একখান্ তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে।

"কি ব্যাপার, সুষি?"

"বড্ড মাথা ধ'রেছে; তাই একটু ওডি-কলোন দেওয়াচ্ছিলাম।"

"বরং একটা এস্‌পিরিন্ খাও।"—

ব'লেই বেরিয়ে আসি। কিন্তু মনে জাগে—মারি আর্ত্তঁনেৎ আর তার পেজ-বয়-এর কাহিনী। তেমন কিছু নয় তো?

সন্দেহ বুঝি পুরুষের মনে এইভাবেই পল্লবিত হ'য়ে উঠে। তারপর থেকে সুষমার সম্বন্ধে আমাকে সাবধান হতে হ'লো। চাকর-চাপরাশীকে গোয়েন্দাগিরির কাজে লাগানো আমার পছন্দ নয়।

সময়ে অসময়ে তাই নিজেই বাংলোয় ফিরে আসি। ব্যাপারটি চলে কলের মত। আপনার অজান্তে কখন গোমেজকে ডেকে ফেলি। কোনোদিন সে আসে, কোনো-দিন আসে না। সন্দিগ্ধ মনে সোজা সুষমার কামরায় যাই, আর দেখতে পাই গোমেজ মেম-সাহেবের কাছে দাঁড়িয়ে।

"কি করছিস্ এখানে?"

"মেম-সায়েব ডেকেছেন, হুজুর।"

"যা, আমার গাউনটা নিয়ে আয়।"

গোমেজ সেলাম ঠুকে বিদায় নেয়। প্রাত্যহিক হ'য়ে উঠেছিল এই দৃশ্য। তার ফলে সন্দেহ আমার মনে দৃঢ়মূল হ'য়ে ব'সেছিল।

অবশেষে একদিন সুষমাকে ব'লেই ফেলেছিলাম:

"বুঝতে পারি নে কী ব্যাপার ?"

"মানে ?"

"যেদিন যখনই আসি, দেখি গোমেজ তোমার কামরায়।"

তার উত্তরে সুষমা যে ভাবে আমায় অপমানিত ক'রেছিল, ভব্য ভাষায় সে দাম্পত্য কলহ রূপান্তরিত করা চলে না। সুষমাকে আদৌ বিশ্বাস করি না। কিন্তু মুখে প্রকাশ ক'রতে পারি নি সেই অবিশ্বাসের অগ্নিপ্রবাহ। সেদিন থেকেই সে আমার বিশ্বাস হারিয়েছিল সম্পূর্ণভাবে।

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল তারপর।

বেলা আড়াইটার সময় হেঁটেই বাংলোতে ফিরে আসি। চোরের মত সুষমার কামরার দিকে অগ্রসর হই। জুতোর শব্দ ঢাকতে পারি নি। পাশের দরজা দিয়ে কেউ যেন দ্রুত বেরিয়ে যায়। ঘরে ঢুকে দেখি, সোফার উপরে সুষমা শুয়ে আছে; শিথিল দেহ, অবিন্যস্ত পরিধেয় দেখে মনে হয় সে দিবানিদ্রায় অচেতন।

আচ্ছা, আমার ব্যবহারের সঙ্গে আজ যে হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ড দিয়ে এলাম, তার কোনো প্রভেদ আছে ? সে-ও সন্দেহ ক'রেছিল, সন্দেহ চেপে রাখতে পারে নি। আমি অনেকদিন সন্দেহ চেপে রেখেছিলাম, যদিও শেষ পর্য্যন্ত পারি নি।

অবশেষে একদিন সুষমা ধরা পড়ে গেল। আমার চোখের সামনে গোমেজকে তার হাত ধ'রে এমন অভব্য ভঙ্গীতে দেখেছিলাম, যে সেই সন্ধ্যাতেই এর শেষ ক'রতে আমি বদ্ধ-পরিকর হই।

সব চাকর-চাপরাশীকে ছুটি দিই—চারটি দিনের জন্যে। সুষমাকে ব'ললাম আমি দুদিনের জন্যে মফঃস্বলে যাচ্ছি—এক আধা-সরকারী কাজে। সংবাদ শুনে সে খুশী হ'য়েছিল কিনা জানি না। তবে সে সব চাকরকে ছেড়ে দিতে বারণ ক'রেছিল। আমি বলেছিলাম, ইয়াকুব থাকবে। সে উত্তর দেয়নি। যেদিন যাবার কথা, সেদিন হঠাৎ গোমেজকে দেখলাম।

"বাড়ী যাওনি গোমেজ ?"

"না হুজুর, রাত্রের গাড়ীতে যাচ্ছি আজ।"

যথাসময়ে মোটর নিয়ে যাত্রা করি। তারপর সারাদিন মফঃস্বলে ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যার আগে এক সহকারীর বাড়ীতে ফিরে আসি। সেখান থেকে একটু রাত্রে গোপনে



সুষমার হাতে পিস্তলটা জোর ক'রে সরিয়ে দিই

বাংলোতে ফিরে আসি। সুষমার ঘরে আলো জ্ব'লছিল। লুকিয়ে জানলার পাশে থেকে যা দেখেছিলাম, তা অভ্রান্ত হ'য়ে আছে আমার জীবনে। সুষমার কীর্ত্তি স্বচক্ষে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় খুন চেপে গেল। পকেট থেকে পিস্তলটা বার করে দ্রুত এসে পড়লাম সুষমার কামরায়। নীল-পর্দাটা নিমেষে সরিয়ে ফেলে দাঁড়াতেই গোমেজ চম্‌কে উঠলো। একটি সোফায় তারা পাশাপাশি ছিল ব'সে। আমাকে দেখে তড়িৎস্পৃষ্ট হ'য়ে গেল।

"গোমেজ !"

ভয়ে সে নির্ব্বাক হ'য়ে গিয়েছিল। বেশ দেখলাম, সে ঠকঠক্ ক'রে কাঁপছে। হাতে আমার পিস্তল। সুষমাও যেন পাথর হ'য়ে গিয়েছে।

"গোমেজ ! এখনি বেরিয়ে যাও···যাও !"

গোমেজ এক রকম ছুটেই পালাল।

"সুষমা ! এ আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য ক'রছি তোমার ব্যাপার। যাক, বেশী কথা বলার দরকার নেই। এই পিস্তল দিয়ে নিজের হাতেই তোমার জীবনের শেষ এখুনি ক'রতে পারি। কিন্তু তোমায় মেরে আমার হাত কলঙ্কিত ক'রতে চাই নে।···নাও পিস্তল, হয় আমায় মারো, নয় নিজে মরো।"

সুষমার হাতে পিস্তলটা জোর ক'রে ধরিয়ে দিই।

কয়েক মিনিট মাত্র। মাথাটা দুহাতে টিপে ধ'রে দাঁড়িয়েছিলাম। উঃ, কী তীব্র যন্ত্রণা ! হঠাৎ পিস্তলের শব্দে চমকে উঠি। চেয়ে দেখি···আঃ, বাঁচা গেল ! সাম্নে সুষমার—আমার বিশ্বাসঘাতিনী পত্নীর রক্তাক্ত মৃতদেহ। সে মরেছে। আমার সম্মান থাক্‌লো, মর্য্যাদা থাকলো, কিন্তু তার সঙ্গে চিরকালের মতো চ'লে গেল আমার প্রেম-ভালোবাসা।

তারপর ?·· বিচারকের স্ত্রী কোনো অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যা ক'রেছেন। সংবাদপত্রে এই খবর আপনারাও দেখে থাক্‌তে পারেন। বড় সরকারী কর্ম্মচারীদের ভিতরকার খবর নেওয়া সম্ভবও নয়। সুষমা আত্মহত্যা ক'রেছিল বটে, কিন্তু এ কি সত্যিই আত্মহত্যা ?

আজ যার প্রাণ-দণ্ডাদেশ দিয়ে এসেছি, হ'তে পারে—তার বিশ্বাস-ঘাতিনী স্ত্রীও সুষমার মতই মরেছে। কিন্তু সে সত্যাসত্য নির্ধারণে আমার দায়িত্ব কোথায় ? সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল অকাট্য, অতএব আইনের আমলে তাকে প'ড়তেই হবে। আর এ-কথাটা ভুললেই বা চলবে কেন ? আমি বিচারক, আইনের রক্ষক, দণ্ডমুণ্ডের মালিক। কোথায় সে আর কোথায় আমি !

আসামী পক্ষের উকীল লোকটাকে ব'লেছিলেন :

"তুমি অস্বীকার ক'রতেও তো পারতে ?"

"তা ক'রবো কেন বাবু ? আমি মেরেছি, তাদের সহ্য ক'রতে পারিনি বলে। আমার বেঁচে থাকার আগ্রহ নেই। তাদের মেরেছি, এবার নিজে মরবো।"

জীবনের প্রয়োজনীয়তা সে স্বীকার করে নি ; আমি করি। তাই তো বেঁচে আছি, ব'সে আছি—খ্যাতি-প্রতিপত্তির আসনে। তবু বুঝতে পারি না—আজ যার প্রাণদণ্ড দিলাম, তার সঙ্গে আমার পার্থক্য কোথায় ?

সিদ্ধিদাতা

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

মুক্তির পথ কণ্টকময়—নহে কুসুমাস্তীর্ণ—
সাধক ! জীর্ণশীর্ণ—
কঠোর তপশ্চরণে তোমার
কেন ও মৃত্যু-ভীতি ?
সুপ্তোত্থিত জাগ্রত আঁখি—
কোন্ ভয়ে তুমি রাখিয়াছ ঢাকি' ?
কেন থেমে যায় কণ্ঠে তোমার—
অমৃতের সেই গীতি ?
ব্যর্থ কি হবে—শঙ্কাবিহীন—
'আত্মাবদান'—শিক্ষা ?
নির্ম্মম মরু-প্রান্তরে করো
কাহার করুণা-ভিক্ষা ?
ঈশ্বর বহুদূরে !
তাঁর সাড়া কেহ পায়নি কখনো
কাঁদিয়া করুণ সুরে।
শুধু সংযম—শুধু নিগ্রহ—
দেহ-মন্দিরে জাগে বিগ্রহ !
প্রতিপদে তুমি তাঁর বাণী বহ
ওহে বীর নিঃশঙ্ক !
মরণ-মূল্যে কিনিতে হইবে—
জীবনে লভ্য-অঙ্ক।
ঐশ্বর্য্যের অধিকারী তুমি
—কেন চাও ঈশ্বরে ?
অবিনাশী তুমি—অবিকল্পিত—
আত্মা কি কভু মরে ?
কি চাও, বলিতে পার ? গাহি' মুক্তির গাঁথা—
মাথা নত করা পশুর বৃত্তি
মানব-জীবনে অতি অকীর্ত্তি !
মরণের পরে গড়িয়া ভিত্তি—
—জীবনে সিদ্ধিদাতা !
অতি অকরুণ, থাকে অলক্ষ্যে—
নির্ম্মম সে বিধাতা।

বস্ত্রসমস্যার একটি মুষ্টিযোগ

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এস্‌সি

মুষ্টিযোগ জিনিসটার সুবিধা এই যে উহা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য। উহার অসুবিধা ও এই যে উহা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য। চিকিৎসার ফ্যাসান আছে। অফ্যাসান জিনিসটাতে সাধারণের আপত্তি। "ঘটা করে চিকিৎসা" করাতে অনেকেরই ইচ্ছা। আমার এক পরিচিত ছোকরাকে তার বাপ একদিন বলিল—ভাইটের পড়াশুনা ভাল হচ্ছে না একটু দেখ না কেন? ছোকরা 'না আমি পারব না' বলিয়া চলিয়া গেল। এই ছোকরাটিই কিন্তু দরিদ্র শ্রমজীবী বালকদিগকে পড়াইবার জন্য সপ্তাহে তিন চার ঘণ্টা সময় দিত। প্রথম কাজটি অপেক্ষা শেষের কাজটি তাহার বেশী ফ্যাসনেবল বলিয়া মনে হইত।

আমার এক বন্ধু ডাক্তারী পাশ করিয়া কলিকাতায় পশার জমাইবার চেষ্টা আরম্ভ করেন। তিনি কিন্তু অতিমাত্রায় কনসেনসাস ছিলেন। সি-পিতে এক চাকরী লইয়া কলিকাতার পাট তোলবার আগে বলিলেন, আমার দ্বারা প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সুবিধা হবে না। এক বাটিতে রোগী দেখতে গেলুম—দেখলাম ব্যাপারটা খুব সামান্যই, কেন গৃহস্থের মিছামিছি খরচ করাই। বললাম, একটু তুলসী পাতার রস মধু দিয়ে খাইয়ে দিন—কাল সেরে যাবে। রোগী সারিয়া গেল বটে কিন্তু সে বাটিতে আমার পসার গেল। এখন চাকরী করিতে যাইতেছি।

এই বন্ধুটীর ডাক্তারী জীবনের একটি গল্প এ প্রসঙ্গের পক্ষে একটু অবান্তর হইলেও তাহা লিখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। "আম্বালায় তখন ছিলাম। হাসপাতালের সহসংলগ্ন আউটডোরে অনেক রোগী আসিত। গরীব দেশ। মেয়েছেলের অসুখ হইলে অর্থাভাবে পাল্কি করিয়া আসিতে পারিত না। কোন লোক আসিয়া রোগের বিবরণ বলিয়া ঔষধ লইয়া যাইত। এইরূপ বর্ণনা হইতে বুঝিলাম, বাসায় স্ত্রীর টনসিল ফুলিয়াছে একটা পেণ্ট দিবার ব্যবস্থা করিলাম। কম্পাউণ্ডার ঔষধ ও তাহার প্রয়োগপ্রণালী লোকটিকে বুঝাইয়া দিল। দিন ৪।৫ পরে লোকটি আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার স্ত্রী কেমন আছে। সে বলিল স্ত্রী ভাল হইয়া গিয়াছে হুজুর, কিন্তু আমার গলায় বড় বেদনা হইয়াছে। তাহার গলা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম বুদ্ধিমান স্ত্রীর জন্য ব্যবহার করিবার পেণ্টটি নিজের টনসিলের উপর লাগাইয়াছে। স্ত্রীর অসুখ আপনা-আপনি সারিয়া গিয়াছে।

মুষ্টিযোগ প্রয়োগকারীকে অনেকটা বাজে ভড়ং করিতে হয়। সামান্য শুলুঞ্চের রসে যে রোগ সারিবে তাহাতে উক্ত রসসহ এক কণা মকরধ্বজ বা ইষ্টকচূর্ণ ঝাড়িতে হয়। গল্পের প্রসিদ্ধ হাকিম বাদশাহের চিকিৎসার জন্য মহামূল্য ঔষধপূর্ণ মুগুর প্রস্তুত করিবার জন্য সময় লইয়াছিল। পরে উহা বাদশাহের হস্তে দিয়া প্রত্যহ ৩০০ বার ঐ মুগুর ভাঁজিতে উপদেশ দিলেন। বলিলেন—যখন ঘাম বাহির হইবে তখন মুগুরের অভ্যন্তরস্থ ঔষধ ঘামসহ শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আরোগ্য বিধান করিবে। এই অপূর্ব্ব ঔষধ ব্যবহারে বাদশাহের অসুখ সারিয়া গেল, লোকে চিকিৎসককে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

এই ভনিতাটুকুর পর আমার মুষ্টিযোগে আসিলাম। সংস্কৃত টীকাকার যেমন বলেন "শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য"।

পূর্ব্ববঙ্গে এক সহরে কিছুকাল ছিলাম। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বিশেষ আলাপ হইয়াছিল। একদিন একটী কথোপকথন মধ্যে তিনি বলিলেন—মশায় আমরা বাঙ্গাল আপনাদের পশ্চিমবঙ্গীয়দিগের মত softy নরম নই; এদেশের লোকেরা খুব জেদাল ও রোকাল। কিছুকাল হইল এখানকার মেছোরা ধর্ম্মঘট করিয়া মাছের দাম ডবল বাড়াইয়া দিল। মাছ নহিলে আপনাদের চলে, কিন্তু আমাদের চলে না। কিন্তু আমরাও উল্টো ধর্ম্মঘট করিলাম। পূর্ব্ব দাম না হইলে মাছ খাইব না। একদিন গেল, দুইদিন গেল, তৃতীয় দিনে পচা মাছ এখানে ওখানে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে দেখা গেল। চতুর্থ দিনে লোকের বাড়ী লুকাইয়া সস্তা দামে মাছ বিক্রি হইতে দেখা গেল। সাতদিনের মধ্যে ধর্ম্মঘট মিটিয়া গেল। আমরা আবার সস্তায় মাছ পাইতেছি।

বুদ্ধিমান পাঠক বলিবেন, তবে কি আমি লোকদের নগ্ন থাকিবার পরামর্শ দিতেছি। অতটা নয়। তবে আমি শারীর বিধান বিদ্যার (physiology) অধ্যাপক ও ছাত্র—আমি ইহা নিশ্চয়তার সঙ্গেই বলিতে পারি—যে বাঙ্গালাদেশের আবহাওয়া যেরূপ—এখানকার যেরূপ জলীয় বাষ্প ও তাপযুক্ত বায়ু—যাহার মধ্যে আমাদিগকে অবস্থান করিতে হয়, সেখানে ফাল্গুন হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত এই আট মাস লোকে যদি নগ্ন থাকে তাহা হইলে তাহার শারীরিক কোন ক্ষতিই হইবে না। লেনার্ড হিল নামক প্রসিদ্ধ শারীর-বিধানবিৎ ও ডাক্তার বহু গবেষণার দ্বারা জলীয় বাষ্পপূর্ণ উত্তপ্ত ও ঘর্ম্মকর বায়ুমণ্ডল শরীরের পক্ষে কত ক্ষতিকর এবং শ্রমজীবীদিগের কার্য্যশক্তি উহা কত কমাইয়া দেয় তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বাঙ্গালাদেশের দুর্ব্বলকর (enervating) আবহাওয়া হইতে বাঁচিবার জন্য অর্দ্ধনগ্ন দেহ এবং পাতলা কাপড় পরিধান করিবার প্রথা ভূয়োদর্শনের ফলে আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলা (adaptibility) একটা মস্ত গুণ। জীবন্ত জাতিগণের মধ্যে এই অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তনশীলতা গুণ বেশী, আর আমাদের মত অর্দ্ধমৃত জাতির এই গুণ সামান্যই আছে। দুর্ব্বলজাতি বা লোক বাধ্য হইয়া নিজেকে পরিবর্ত্তিতও করে। সবল লোক বা জাতি সেই পরিবর্ত্তন নিজের হিতকর ভাবিয়া স্বইচ্ছায় তাহা গ্রহণ করে। এই শতাব্দীর প্রাক্কালে ইংরাজ মহিলাগণের গাউন রাস্তায়

প্রায় ঝাঁট দিয়া যাইতে দেখিয়াছি এবং নগ্নপদ দেখিলে মেমেদের মূর্চ্ছা হইত এরূপ গল্প শুনিয়াছি। কিন্তু গত যুদ্ধের সময় ও পরে উহাদের বেশের কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটিল। মেমেদের গাউন হাটু বা হাটুর উপর পর্য্যন্ত উঠিল। অনেকের পা মোজাহীন হইল। সাহেবদের প্যাণ্টুলেন সর্ট হইল; কোট গিয়া সার্ট অনেকাংশে তাহার স্থান গ্রহণ করিল। বস্ত্রের অভাব জন্য এই সকল ব্যবস্থা হইল এবং দেখা গেল অতি স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই বস্ত্রের দুর্ভিক্ষে এবং কিছু পূর্ব্বের আসল দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালীদের পরিবর্ত্তন-পটুতার (adaptibility) কোনও পরিচয় পাই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন ছিল তখনকার সাহিত্যে এই পটুতার প্রমাণ পাই। সম্প্রতি মহাভারতে একটি গল্প পড়িতেছিলাম। এক ঋষি দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যাভাবে প্রাণ যায় দেখিয়া এক ব্যাধপল্লীতে রাত্রিকালে প্রবেশ করিয়া কুকুরের মাংস দেখিতে পাইলেন। তিনি উহা চুরি করিয়া ভক্ষণ করিবেন ভাবিয়া কুটীরের দিকে অগ্রসর হইলেন। এমন সময় এক ব্যাধের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহার বিকট চীৎকার অনাহূতের অন্তরে আতঙ্ক উৎপাদন করিল। ঋষি ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি নিজ পরিচয় দিলেন। ব্যাধ তখন তাহাকে এভাবে এস্থলে উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ঋষি বলিলেন তোমার এই কুকুরের মাংস চুরি করিয়া খাইব বলিয়াই এখানে আসিয়াছিলাম। ইহার পরে মহাভারতে ঐ ঋষি-ব্যাধের এক তুমুল তর্কের বিবরণ আছে। ব্যাধ ঋষিকে ঐ দুষ্কর্ম্ম করিতে দিয়া পাপভাগী হইতে চাহে না, সে নানা উপদেশ দিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। ঋষি অনেক অন্য উপদেশ দিয়া বুঝাইলেন—আপৎকালে শরীর রক্ষার্থ ঐ রূপ দুষ্কর্ম্মও কর্ত্তব্য।

ঐরূপ স্বাস্থ্যকর পরিবর্ত্তনপটুতা বর্ত্তমান কালে দেখিতে পাই না। দুর্ভিক্ষের সময় বাঙ্গালী দীনেরা কেবল একটু ফেন দাও বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল। তাহারা ইঁদুর বিড়াল শিয়াল ছুঁচো কাক শকুন শালিক সাপ কেঁচো প্রভৃতি প্রাণী খাইয়া কোথাও প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিয়াছে এরূপ গল্প শুনিতে পাই নাই। অথচ প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থসমূহে ঐ সকল দ্রব্যের খাদ্যগুণ প্রশংসার সহিতই বর্ণিত আছে।

এই পরিবর্ত্তন-পটুতা বস্ত্র দুর্ভিক্ষের সময়ও দেখিতেছি না। যদি বাঙ্গালায় ভাল নেতা থাকিতেন তাঁহারা সংক্ষিপ্ত বস্ত্র ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেশের লোককে এই বস্ত্র বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেন। বস্ত্র দুর্ভিক্ষে পল্লীগ্রামে স্ত্রীলোক বস্ত্রাভাবে গৃহের বাহির হইতে পারিতেছে না বা আত্মহত্যা করিতেছে এরূপ বৃত্তান্ত পড়িতেছি, অথচ কোন কোন স্ত্রীলোক যে চটের গাউন পরিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেছে তাহা পড়িতেছি না।

আমাদের পিতামহ পিতামহীরা (বর্ত্তমান যুবকদিগের প্রপিতামহ প্রপিতামহীরা) যে অনেক কম বস্ত্র (প্রায় অর্দ্ধেক) ব্যবহার করিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাধারণত পুরুষরা আট ন' হাত কাপড় ব্যবহার করিত। সর্ট যদি হাটুর উপর উঠায় কোনও দোষ না থাকে, কাপড় হাটু পর্য্যন্ত হইলে দোষের হইবে কেন। মাদ্রাজীরা আমাদের অর্দ্ধেক মাত্র কাপড় ব্যবহার করেন। ঐরূপ কাপড় পরিয়া তাহারা আফিস পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকরাও বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় অর্দ্ধেক মাত্র কাপড় ব্যবহার করিত। সেমিজ সায়া ব্লাউসের বালাই ছিল না, কাপড়ও ১২ হাত হইত না চওড়াও অত ছিল না। ঐরূপ কাপড় পরা যে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অধিকাংশ বাঙ্গালীর বাড়ীর আলো বাতাস বিরল, উষ্ণ, জলীয় বাষ্পপূর্ণ রন্ধনশালা বা ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে যাহাদের জীবনযাপন করিতে হয় বস্ত্রের অল্পতা তাহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

সমস্ত বাঙ্গালী জাতি যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জাতীয় বস্ত্রের পরিমাণ অর্দ্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ কমাইত, তাহা হইলে যে জাতীয় লাভ হইবে তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। দরিদ্ররা শীত বা লজ্জানিবারণের বস্ত্র পাইত। গৃহস্থকে বস্ত্রের জন্য এত উমেদারী করিতে হইত না বা জীবন-ধারণের পক্ষে আরও প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্য অর্থব্যয় সংক্ষিপ্ত করিতে হইত না। ধোপার খরচ কমিয়া যাইত, সাবান খরচ ও বস্ত্র পরিষ্কারের শ্রম কমিত। কাজেই লোকে কম মলিন বস্ত্র পরিত—ফলে স্বাস্থ্যের উন্নতি।

বাঙ্গালী জাতীয় ফ্যাসনের এই পরিবর্ত্তন বিলাতী বস্ত্রনির্ম্মাতা, স্বদেশী বস্ত্রনির্ম্মাতা, ব্ল্যাক মার্কেটের ব্যবসায়ী এবং অন্য যে কোন লোকে এই বস্ত্র বিভ্রাটে দুপয়সা অযথা উপার্জ্জন করে, তাহাদের সকলেই মার্কেট কমিয়া যাইবার আশঙ্কায় আতঙ্কিত করিবে এবং বস্ত্র বিভ্রাট যাহাতে ঘুচিয়া যায় তজ্জন্য তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

এই বস্ত্রবিভ্রাটের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন যদি ঘটিয়া যায় তাহা হইলে অশুভ হইতে শুভই ফলিবে। স্কুল ও কলেজের ছেলেদের হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত উঠা সার্ট এবং হাফ সার্ট চলন হউক। যে সকল স্কুলে ইলেকট্রিক ফ্যানের বন্দোবস্ত নাই সেখানে বছরে আট মাস ধরিয়া খালি গায়ে বা গেঞ্জি মাত্র গায়ে ছেলেরা স্কুলে কলেজে আসিলে তাহাদের স্বাস্থ্যের এবং পড়াশুনার উন্নতি হইবে—কারণ গ্রীষ্মের ও বর্ষার দিনে অনুতপ্ত শরীরে মনঃসংযোগ করিবার ক্ষমতা অধিক হইবে। স্পোর্টের সময় খালি গায়ে থাকিলে আরও ভাল। স্কুল কলেজের মেয়েদের সোজা কাটের ফ্রক বা গাউন পরিলে বস্ত্রের খরচা কমিবে, ধোয়াইবার খরচা কমিবে এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে। স্কুল কলেজে এই সকল ফ্যাসন চলিয়া গেলে সাধারণ ছেলেমেয়েরা তাহাদের অনুকরণ করিবে। সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পরিচ্ছদ অধিকতর কর্ম্মপটু ও স্বাস্থ্যপ্রদ হইয়া উঠিবে।

স্বাধীনতার রূপান্তর—শ্যাম বা থাইল্যাণ্ড

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

কাম্বোডিয়া দখলে জাপান শ্যামকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। তার বিনিময়ে জাপান এখন শ্যামের উপর চাপ দিতে থাকে চক্রশক্তির পক্ষে যোগদানের জন্য। শ্যাম তাতে রাজী না হওয়ায় ১৯৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে জাপান শ্যাম আক্রমণ করে। বিপুলসংগ্রাম তখন কি করবেন স্থির করতে পারলেন না। জাপসৈন্য ব্যাঙ্কক অভিমুখে অগ্রসর হয়ে আসছে। তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য নিয়োগ করে তিনি মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকলেন। বিপুল-সংগ্রাম ও তার অনুগামীদের তখন দৃঢবিশ্বাস যে যুদ্ধে চক্রশক্তির জয় অনিবার্য্য। তাঁরা বলতে লাগলেন যে জাপানকে বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। প্রাদিৎ ও তাঁর সমর্থকগণ বললেন যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মিত্রপক্ষের দিকে শ্যামের সহানুভূতি দেখানোর জন্য জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রয়োজন। কিন্তু বিপুল কোন যুক্তি মানতে রাজী হলেন না। তিনি জাপানের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

এদিকে ১৯৪২ সালেই প্রাদিতের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য ও বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী গোপনে গোপনে জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে লাগলেন। প্রাদিৎ মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। কিন্তু রাজা আনন্দমহীদলের রিজেণ্ট রূপে কাজ করতে লাগলেন। রাজা আনন্দমহীদল তখন ছাত্ররূপে সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থান করছেন। তিনি সমস্ত যুদ্ধকাল সুইজারল্যাণ্ডেই থাকেন। তিনি কোনদিন বিপুলসংগ্রামের চক্রশক্তি সহযোগী কার্য্যাবলী সমর্থন করেন নাই।

বিপুলসংগ্রাম যখন বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন তখন প্রাদিৎ ওয়াশিংটনস্থ শ্যামদূতকে ব্যাঙ্ককের প্রকৃত পরিস্থিতির বিষয় এবং জনগণের জাপ বিরোধী মনোভাবের বিষয় জানান এবং তাঁর মারফৎ মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব কর্ডেল হালের নিকট এক লিপি প্রেরণ করেন। শ্যামের এই দূতটীর নাম সেনি প্রামোজ। সেনি প্রামোজ মিঃ হালের হাতে উক্ত লিপিখানা দিয়ে জানান যে তাঁরা স্বাধীন শ্যাম আন্দোলন চালাবেন এবং এজন্য আমেরিকার সাহায্য প্রয়োজন। মিঃ হাল ও প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এজন্য শ্যামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা থেকে বিরত থাকেন। সেনি প্রামোজ বিপুলসংগ্রামের কার্য্যকলাপের নিন্দা করে বেতারে বক্তৃতা করেন এবং সর্ব্বপ্রকারে মিত্রপক্ষকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

১৯৪২ সালে মিত্রপক্ষের নিকট এই প্রতিশ্রুতির মূল্য বড় কম নয়। এশিয়ায় তখন জাপানের বিজয় অভিযান চলেছে। মিত্রপক্ষের মিত্র তখন সেখানে আর কেউই অবশিষ্ট ছিল না। আমেরিকা শ্যামের এই সহায়তায় দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ায় গোপনে গোপনে জাপ-বিরোধী কার্য্য চালাতে থাকেন। প্রামোজ সেনি আমেরিকাপ্রবাসী শ্যামবাসীদের তাঁর স্বাধীন শ্যাম আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান করেন। বহু শ্যাম যুবক গুপ্ত আন্দোলনের সমস্ত কার্য্যকলাপ শিক্ষা করে শ্যামে ফিরে যান। তাঁরা বিপুলসংগ্রামের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি, বেতারে সংবাদাদি প্রদান ও নাশকতামূলক কার্য্যে লিপ্ত হন। বৃটেনেও বহু শ্যামযুবককে এই ভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়। কিন্তু বিপুলসংগ্রামের বিরুদ্ধে সমগ্র গোপন আন্দোলন পরিচালনা করেন আমেরিকানগণ। ১৯৪৩ সালের শেষভাগের মধ্যে মিত্রপক্ষের সমর্থক সমস্ত শ্যামবাসিগণ চীনে ও ভারতে ফিরে আসেন এবং ১৯৪৪ সালে তাঁরা জলপথে ও বিমানে শ্যামে প্রবেশ করেন। তাঁরা এরূপ সুন্দরভাবে ও সাফল্যের সঙ্গে কার্য্য পরিচালনা করেন যে, ১৯৪৫ সালের প্রথম ভাগেই শ্যাম ও মার্কিন সেনানীগণ দলে দলে শ্যামরাজ্যে প্রবেশ করতে সমর্থ হন। জাপব্যূহের পশ্চাদ্ভাগে মার্কিণ বিমানসমূহ গোপনে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে থাকে। এই সমস্ত আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন লুয়াং প্রাদিৎ। সহকারী রিজেণ্ট আদুল দেজেরাসও এই আন্দোলনে প্রভূত সাহায্য করেন। আদুল ছিলেন পুলিস বিভাগের কর্ত্তা। তিনি পুলিসের লোক দিয়ে বৃটীশ ও মার্কিণ বিমানের ব্যবহারের ঘাঁটীগুলি পাহারা দিতেন ও অস্ত্রশস্ত্র রক্ষা করতেন। শ্যাম ও মার্কিণ চরদের রক্ষার ব্যবস্থা, তাদের লুকিয়ে রাখা ও খাবার ব্যবস্থা এবং রিজেণ্টের সঙ্গে তাঁদের সংবাদাদি আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করে দিতেন। সামরিক বিভাগের বহু অফিসারও এই আন্দোলনে যোগ দেন।

রাজধানী থেকে দূরে অবস্থিত পাহাড়ে পর্ব্বতে ও ধানের খেতের মধ্যে অবস্থিত প্রান্তরে প্রান্তরে আমেরিকানগণ প্রায় ৯০ হাজার শ্যামবাসীকে গেরিলা যুদ্ধে সুশিক্ষিত করে তুলেন। রাজধানীতে প্রাদিৎ নিজে মার্শাল বিপুলসংগ্রাম ও তাঁর অনুচরদের চারপাশে জাল বিস্তার করেন। এই ভাবে সাফল্যের সঙ্গে কাজ চলতে থাকলে স্থির হয় যে, একযোগে বাহির থেকে আক্রমণ ও ভিতর থেকে বিদ্রোহ করে বিপুল জাপ তাঁবেদার-রাজত্বের অবসান করা হবে। ১৯৪৫ সালের মার্চ্চ মাসে জাপান যখন ইন্দোচীনে সামরিক আইন জারী করে ভিসিপন্থীদের কাছ থেকে দেশের শাসনভার গ্রহণ করিল, শ্যামের নেতারা তখন ঠিক করলেন যে আক্রমণের উপযুক্ত সময় এসেছে।

লুয়াং প্রাদিৎ ওয়াশিংটনে তারযোগে জানালেন যে বিদ্রোহ করবার সুযোগ সমুপস্থিত—আর দেরী করা চলে না। কাণ্ডীতে দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার সর্ব্বাধিনায়ক লর্ড লুই মাউণ্ট ব্যাটেনের নিকট তিনি অনুমতি চাইলেন। উত্তরে লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেন জানালেন যে বৃটীশ এখনও প্রস্তুত নহে। এই ভাবে শ্যামের স্বাধীনতা আন্দোলনকারীরা বিদ্রোহের সুবর্ণ

সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। কারণ লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেন তাঁদের এই অনুমতি দিলেন না।

যাই হোক, জাপানের আত্মসমর্পণের পর স্বাধীন-শ্যাম আন্দোলনকারীরা গভর্ণমেণ্ট দখল করলেন। জাপানীরা দেখে বিস্মিত হল যে শ্যামে শত শত মার্কিন যোদ্ধা যেখানে সেখানে গজিয়ে উঠছে, বৃটীশ সৈন্যরা পৌঁছাবার বহুপূর্ব্বেই শ্যামবাসীরা আমেরিকানদের মুক্তিদাতা রূপে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তারা উত্তর মালয় থেকে সমস্ত শ্যামসৈন্য সরিয়ে নেয় এবং শ্যামের এই প্রাক্তন এলাকাগুলির উপর সমস্ত দাবী ছেড়ে দেয়। বৃটেনের নির্দ্দেশক্রমে তারা দখলদার বৃটীশ সৈন্যদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে ইংরাজদের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেয়। ইহা ছাড়া তারা শ্যামস্থ সমস্ত জাপসৈন্যকে নিরস্ত্র করতে স্বীকৃত হয়। এখানে বলা যেতে পারে যে বৃটীশ সৈন্যেরা ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়াতে জাপসেনাদলগুলিকে নিরস্ত্র করার ব্যাপারে কিছুমাত্র অগ্রসর হয় নাই। শ্যাম কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ২৫ হাজার জাপসৈন্যকে নিরস্ত্র করতে সমর্থ হয়।

রিজেণ্ট লুয়াং প্রাদিৎ স্বাধীন শ্যাম আন্দোলনের নেতাদের নিয়ে শাসন কার্য্য চালানোর ব্যবস্থা করলেন। সেনি প্রামোজকে প্রধান মন্ত্রী ও আদুল দেজেরাসকে সহকারী প্রধানমন্ত্রী করে নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠিত হল। মার্শাল বিপুলসংগ্রাম বন্দী হ'লেন। রাজা আনন্দমহীদল দীর্ঘ প্রবাসের পর স্বদেশে ফিরে এলেন। শ্যাম গভর্ণমেণ্ট কয়েকটি যুক্তি উত্থাপন করে মিত্রশক্তির নিকট বিশেষ বিবেচনার দাবী জানালেন। তাঁরা বললেন যে মার্শাল বিপুলসংগ্রাম কর্ত্তৃক মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বৈধ নহে। কারণ শ্যাম পার্লামেণ্ট ইহা অনুমোদন করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ ফ্রান্সের সহায়তার ফলেই জাপান শ্যাম আক্রমণে সমর্থ হয়। জাপানের প্রাধান্য স্বীকারে শ্যাম ফ্রান্সের আদর্শের অনুসরণ করেছিল। সুতরাং ফ্রান্স যদি মিত্রশক্তি বলে গ্রহণযোগ্য হয়, শ্যামকেও তাহ'লে মিত্রশক্তিরূপে গ্রহণ করা হবে না কেন। এ দিক দিয়ে তাদের দাবী ফ্রান্সের চেয়েও বেশী। কারণ ফরাসীরা মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল, শ্যাম কখনও তা করে নাই। ১৯৪২ সাল থেকে আরম্ভ করে গোপনে তারা মিত্রপক্ষের সমরপ্রচেষ্টায় সাহায্য করেই এসেছে।

মার্কিন গভর্ণমেণ্ট স্বাধীন শ্যাম আন্দোলনকারীদের সাহায্যের কথা স্মরণ করে অবিলম্বে নূতন শ্যাম গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করেন। মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব ঘোষণা করেন যে তাঁরা শ্যামের নিকট কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করবেন না এবং সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘে শ্যাম যাতে আসন পায় তার জন্য ভোট দিবেন। শ্যাম গভর্ণমেণ্ট বৃটেনের নিকটও অনুরূপ আচরণ প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু বৃটীশ প্রতিনিধি লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন যখন এর পরিবর্ত্তে ২১ দফা সর্ত্ত উত্থাপন করলেন তখন তাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্যাম গভর্ণমেণ্ট বিস্মিত হলেও আমরা বিস্ময়ের কোন কারণ দেখি না। ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ গভর্ণমেণ্ট, ইন্দোচীনে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট ও গ্রীসে রাজতন্ত্রীদের সমর্থনে যখন বৃটীশ সৈন্যকে নির্ব্বিকার চিত্তে নিরীহ অধিবাসীদের মস্তকে বোমা ফেলতে দেখি, ভারতবর্ষকে প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি দিয়ে যখন তা ভঙ্গ করতে দেখি, তখন শ্যামের প্রতি এইরূপ আচরণ ছাড়া আর কি আশা করা যায়?

প্রাথমিক সামরিক চুক্তি সম্পাদনের পর লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন শ্যামের প্রতিনিধিদের কাণ্ডীতে এক ভোজসভায় আমন্ত্রণ করলেন, ১৯৪৫ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে। শ্যামের প্রতিনিধিদল কাণ্ডীতে এলে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন স্মিতহাস্যে তাদের জানালেন যে তাঁর রাজনৈতিক পরামর্শদাতা তাঁদের জন্য একটী চুক্তিপত্র রচনা করে রেখেছেন। সেখানাতে সই করলেই আবার উভয় দেশের মধ্যে পূর্ব্বেকার সৌহার্দ্দ্য ফিরে আসবে। ইতিমধ্যে ব্যাঙ্ককস্থ জনৈক মার্কিন অফিসার কোনক্রমে জানতে পারেন যে, শ্যামের উপর কতকগুলি কঠোর শাস্তিসর্ত্ত আরোপ করা হবে। তিনি কাণ্ডীস্থ মার্কিন অফিসারের নিকট তারযোগে এই বার্ত্তা প্রেরণ করে তদন্ত করতে বলেন। শ্যামের প্রতিনিধিবর্গ উক্ত ভোজসভায় যোগ দিবার কিছু পূর্ব্বে তিনি মাউণ্টব্যাটেন সাহেবের পরামর্শদাত-রচিত চুক্তিপত্রের একটী নকল সংগ্রহ করেন। এতেই এমন একুশ দফা সর্ত্ত উল্লেখ করা হয় যে সেগুলি মেনে নিলে শ্যাম বৃটেনের ক্রীতদাস রূপে পরিণত হবে। উক্ত মার্কিন অফিসার এ সম্পর্কে ওয়াশিংটনে সাঙ্কেতিক ভাষায় এক তার করলেন এবং শ্যাম প্রতিনিধিদলকে মার্কিন গভর্ণমেণ্টের উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করলেন। এই অফিসারের হস্তক্ষেপের ফলে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের পরিকল্পনা ফেঁসে যায়। শ্যামের প্রতিনিধিবর্গ উক্ত ২১ দফার মধ্যে মাত্র পাঁচটী গ্রহণযোগ্য মনে করেন এবং অবশিষ্ট সর্ত্তগুলির জন্য ব্যাঙ্ককের নির্দ্দেশ প্রার্থনা করেন। তাঁরা যে পাঁচটী সর্ত্ত স্বীকার করেন তন্মধ্যে একটীর অনুসারে শ্যামরাজ্যের নাম পুনরায় থাইল্যাণ্ড রাখা হবে।

মার্কিন গভর্ণমেণ্ট এই ২১ দফা সর্ত্তের বিষয় কিছু জানতেন না। প্রাচ্যখণ্ডের যুদ্ধজয়ে আমেরিকার অংশ বড় কম নয়। এক কথায় আমেরিকার সাহায্যেই প্রাচ্যযুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয়লাভ ঘটে। তাই মার্কিন গভর্ণমেণ্ট বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের নিকট কড়া প্রতিবাদ জানালেন। বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট আমতা আমতা করে উত্তর দিলেন যে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর ক্ষমতাতিরিক্ত কাজ করেছেন।

মাউণ্টব্যাটেনের ২১ দফা সর্ত্ত গৃহীত হ'লে বৃটেন শ্যামের তৈল, কাঠ, চাল, রবার ও টিনের রপ্তানী-বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার লাভ করত, শ্যামের নৌবহর নিয়ন্ত্রণ, প্রধান প্রধান ঘাঁটীতে বৃটীশ সৈন্য মোতায়েনের অধিকার, নৌঘাঁটী নির্ম্মাণ ও ব্যাঙ্ককের উপর দিয়ে বাণিজ্য বিমানপথ বিস্তারের একচেটিয়া অধিকার হস্তগত করতে পারত।

এই ব্যাপারের পর আমেরিকা কাণ্ডীতে একজন কূটনৈতিক পর্য্যবেক্ষক প্রেরণ করলেন। শ্যামের প্রতিনিধিবর্গ উৎসাহিত হলেন এবং বৃটীশ কর্ত্তৃপক্ষ সর্ত্তগুলির সংশোধনের কথা বিবেচনায় প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু বৃটেন সহজে কার্য্যসিদ্ধি করতে দিলেন না। আমেরিকার

হস্তক্ষেপের জবাব হিসাবে বৃটেন অক্টোবর মাসে ফ্রান্সকে শ্যামের রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করালেন। ফ্রান্স দাবী করে বসল যে তাকে কাম্বোডিয়া প্রত্যর্পণ করতে হবে। বৃটেনও চরম চুক্তিপত্র সম্পাদনে ফ্রান্সের দাবী সমর্থন করতে লাগলেন। ব্যাঙ্ককে এর গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। প্রধান মন্ত্রী প্রামোজ ঘোষণা করলেন যে কাম্বোডিয়ার প্রশ্ন সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক পর্য্যবেক্ষণে গণভোট গ্রহণ করা হোক।

ক্ষুব্ধ হলেও শ্যামের কিন্তু গত্যন্তর ছিল না। বৃটীশ দখলদার সৈন্য তখন শ্যামের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এদেরই তারা বন্ধু বলে ডেকে এনেছিল এই কয়েকদিন পূর্ব্বে। তাদের তখন একমাত্র ভরসা এই রইল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সাহায্য করবে এবং বৃটেনকে অতলান্তিক সনদের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। ডিসেম্বরের শেষাশেষি বৃটেন তার ২১ দফা সর্ত্তের কয়েক দফা কমিয়ে নেয়; কিন্তু তাতেও যে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই সেটা বেশ বুঝা গেল ১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর।

অধীনরাজ্য, মিত্ররাজ্য ও উপনিবেশসমূহের প্রতি বৃটেনের শুভেচ্ছার একটী প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল শ্যাম। ভারত আজ তাই আর বৃটেনের শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করতে পারে না, স্বাধীনতা তাকে অর্জ্জন করতে হবে স্বীয় প্রতিভাবলে।

স্বপ্নিক

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তোমার স্বপ্ন, মোদের স্বপ্ন স্বপ্নের কুহেলিতে
ঢেকে গিয়েছিল;—তবু স্বপ্নের ঘোর লেগে ছিল চোখে,
চোখের জলের আল্‌পনা আঁকা মন্দির দেহলিতে
এখনো তাহার চিহ্ন রয়েছে জানে তা সর্ব্বলোকে।

একদা তোমার যাত্রার পথে যারা করেছিল ভীড়
ভেবেছিল তুমি তাদেরি মতন নিরাশায় যাবে ফিরে,
তারাত জানে না বজ্র কখনো আকাশে বাঁধে না নীড়—
উদ্বেল স্রোত থামে না কখনো ক্ষুব্ধ সাগর তীরে।

অন্তর তব বেদনা-আহত নয়ন স্বপ্নাতুর
সে দুটি নয়নে বহ্নির শিখা ক্ষণে ক্ষণে ওঠে জ্ব'লে
স্বাপ্নিক তুমি যুগান্ত আগে দেখেছিলে বহুদূর
তাই জ্বেলেছিলে যজ্ঞ-অনল মার মন্দির তলে।

তুমি যেচে নিলে কালিমা-মুক্ত আপন নির্ব্বাসন
পথ বেছে নিলে হে মহাপথিক, মহা সঙ্কট কালে
কোথা তুমি? তবু কোটি মানবের হৃদয়-সিংহাসন
তোমারি আশায় দিন গুণে যাবে কালের অক্ষমালে।

স্বপ্ন স্বপ্ন তোমার স্বপ্ন মোদের স্বপ্ন তুমি
সফল করিলে যাদুদণ্ডের অমোঘ স্পর্শ দিয়া
সেদিনও হেথায় স্বপ্ন-কাতর তোমার জন্মভূমি
ঘুমভাঙা চোখে পথপানে চায়, আবেগে অধীর হিয়া।

তুমি আগে এলে পশ্চাতে তব অযুত লক্ষ সেনা
সম্মুখে স্থির একই লক্ষ্য দিল্লীপ্রাসাদ চূড়া
পায়ে পায়ে এলে সুদীর্ঘ পথ—সে পথ তোমার চেনা
সে পথে পাথর বীরপদভরে' হয়ে গেল ধুলিগুঁড়া।

মুক্তি-নিশান যারা উড়াইল পূর্ব্ব অচল 'পরে
প্রথম প্রভাতে নব সূর্য্যের প্রভাতী বন্দনায়,
দেশের মাটির বিদীর্ণ বুকে বুঝি এতদিন ধ'রে
তাদেরি প্রাণের দ্রুত স্পন্দন রক্তের সাড়া পায়?

মায়ের বুকের রক্তের ধারা লাখো লাখো ধমনীতে
চঞ্চল হোল অধীর আবেগে এবার যাত্রা সুরু
যেথা আকণ্ঠ-পিপাসা সেথায় ধারাজল হ'তে দিতে,
আবার আকাশে শ্রাবণের মেঘ ডেকে যাবে গুরু গুরু।

সেই সে মেঘের বুক চিরে চিরে জ্বলন্ত তলোয়ার
এঁকে বেঁকে যাবে কালো পাহাড়ের জমাট অন্ধকারে,
দুর্গম পথে অগণ্য সেনা দাঁড়াইবে হুঁসিয়ার
হেথা অদৃশ্য ঘন করাঘাত হানিবে বন্ধ দ্বারে।

বন্দীশালায় জাগিবে বন্দী সেই সে প্রশান্ত কালে
কোটি মানবের মিলিত কণ্ঠে উঠিবে জয়ধ্বনি
পথে প্রান্তরে শ্মশানে শ্মশানে কোটি নরকঙ্কালে
শুনিব অমৃত অগ্নি-মন্ত্র উঠিতেছে রণরণি।

মৃত্যু-বাসর জেগেছে যাহারা আজো তারা বেঁচে আছে,
হয়ত তাহারা আবার দেখিবে মরণ-মহোৎসব,
সেই মুহূর্ত্তে তুমি কি বন্ধু, আসিবে প্রাণের কাছে
চিতার আগুনে দিগন্তব্যাপী জ্বেলে দেবে খাণ্ডব?

সেই খাণ্ডব-দহন-জ্বালায় জ্বলিবে অহঙ্কার
ক্ষমতাদৃপ্ত হীন প্রভুত্ব মাটিতে মিশিয়া যাবে,
চল্লিশ কোটি শিকল ভাঙার উঠিবে ঝণৎকার
যত মূর্চ্ছিত মুমূর্ষু দেহ সম্বিত ফিরে পাবে?

যে পথে এসেছ সে পথ আজিও তোমারি প্রতীক্ষায়
প্রহর গণিছে আবার কখন সাধনার হবে শেষ—
আবার তোমার জয়-যাত্রার মিলিত তপস্যায়—
কোটি কণ্ঠের জয়-ধ্বনিতে মুখরিত হবে দেশ।

নির্বাচন প্রসঙ্গ

শ্রীঅশোককুমার বসু

ব্যঙ্গ চিত্র

প্রথম অঙ্ক

স্থান মন্ত্রণাগৃহ। সন্ধ্যাকাল। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ। বৃষ্টির পূর্বাভাষ। উপস্থিত সকলে চিন্তাযুক্ত। মুখের রেখায় কুটিলতা পরিস্ফুট।

মানুষের হাত—"যাক বাবা, বাঁচা গেল! এই বার ভালোয় ভালোয় ধানগুলো ঘরে তুলতে পারলে হয়।"

হুঁকা—"বাঁচা গেল বলে বাঁচা গেল দাদা! নেও ভাই আমার কল্‌কেটি একবার ফিরিয়ে নেও!" হুঁকা প্রদান।

দক্ষিণ কলিকাতা সাধারণ কেন্দ্র—"হুঁকাতো ফেরাচ্ছ দাদা, কিন্তু আসল কথাটা কি ভুলে গেলে?"

মানুষের হাত—"তুমি আবার কে দাদা?"

দঃ কঃ সাঃ কেঃ—"আমি? দাঁড়িপাল্লা! সমান সমান বখ্‌রা চাই। সেটা ভুলে যেও না।"

খক্ খক্ করিয়া কাসিতে কাসিতে উত্তর পশ্চিম বর্ধমান সাধারণ পল্লীকেন্দ্র প্রবেশ করিয়া কহিল—"দাও বাবা, হুঁকাটা আমায় একবার দাও। বহুদূর থেকে আস্‌ছি। পথে আমার হুঁকা ভেঙ্গে গেছে!" হুঁকা লইয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

ধানের শীষ—"ও দাঁড়িপাল্লা দাদা! তোমায় কি রকম বখরা দিতে হবে?"

দাঁড়িপাল্লা—"তোমাকে যখন আমার দাঁড়িতে তুলবো, তখন একসের থাকবে তোমার দিকে, আর পাঁচপো আমার দিকে। এই হিসেব!"

মানুষের হাত—"বাঃ বাঃ, চমৎকার! পাঁচপো ইন টু একসের!"

পশ্চিম কলিকাতা সাধারণ কেন্দ্র লণ্ঠন হাতে প্রবেশ করিলেন!

উপস্থিত সকলে—"আসুন, আসুন, বসুন! আপনারই আগমন অপেক্ষায় ছিলাম!"

লণ্ঠন—"আমি বস্‌তে আসিনি! জান্‌তে এবং জানাতে এসেছি যে এবারের দুর্ভিক্ষে মানুষের হাত পড়বে কি না?"

ধানের শীষ—"কি বলছেন আপনি?"

লণ্ঠন—"বলছি যে গত বারে বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ হয়ে ছিল তার উপর ছিল মানুষের হাত! সবাই বলে সেটা ছিল মানুষের সৃষ্ট। যাদের হাতের পাঁচে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ ত্যাগ করে। এবারে যারা মানুষের হাত হয়েছেন, তাঁদের হাতে ধানের শীষ পড়বে কি না?"

দাঁড়িপাল্লা—"তা এখন বলা শক্ত। আমাদের বখ্‌রা হয়ে গেলে পর সেটা বিবেচনা করা যাবে যে কার হাতে উদ্বৃত্ত ধানগুলো দেওয়া যাবে। এখন ও সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। আর বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাবটা পাশ করে নিই। তার পরে ও প্রশ্ন তুল্‌তে পারো। এখন নয়।"

ফুল শুঁক্‌তে শুঁক্‌তে আদ্দির পাঞ্জাবীর পকেট থেকে সিগারেট বার করে ২৪ পরগণা উত্তর পশ্চিম সাধারণ পল্লী কেন্দ্র প্রশ্ন করেন—"এখন কেন উঠবে না দাদা!"

দাঁড়িপাল্লা—"কারণ বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব করে দেখি গড়ে আমাদের কিরকম পকেটে পড়ে। আরো জানো তো ভায়া, আমাদের ব্যয় বরাবরই আয়কে ছাড়িয়ে যায়। এবারও আশাকরি কোটী কোটী টাকা ঘাটতি দেখানো যাবে। দাও ভাই আমায় একটা সিগারেট দাও।"

হুঁকা—"দেখুন, সিগারেট খাওয়া নিষেধ, যেহেতু বিদেশী, সেহেতু বর্জনীয়! আমাদের দেখুন, আমরা হুঁকা ধরেছি।"

ফুল—"আরে ছোঃ, রেখে দিন মশাই হুঁকা শিকেয় তুলে। যা কিছু করি সবই তো লোক-দেখানো! কাজ তো মিটেই গেছে, কেল্লা তো মেরে দিয়েছি! ব্যস্! এখন আর কি! আর মনে রাখবেন, এখন আমরা ঘরের কোণে, নির্জনে। যত পারো দুহাত দিয়ে প্রাণখুলে বোতলের পর বোতল কেলেঙ্কারী করে খাও দাদা! কোন ভয় নেই, কোন ভাবনা নেই—কেউ টের পাবে না, শিবের বাবাও না!" বলিয়া ফুলটী পাঞ্জাবীর বোতামে গাঁথিলেন।

লণ্ঠন—"আপনাদের কাছে আমি যেটা জানাতে এসেছিলুম তা এখনো জানানো হয় নি! বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হলুম যে ধানের শীষেরা সবাই আপন আপন ঘরে ধানের আঁটী তুলেছেন। আর তাঁদের সাহায্য করেছেন, মাঠ থেকে নদীতীর পর্যন্ত গরুর গাড়ী। আর নদীতীর থেকে পরাপার করে গুদাম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন নৌকাবৃন্দ, আর তদারকের ভার নিয়েছেন মানুষের হাত! অতএব আমি জানাতে চাই এবার যেন মানুষের হাত না পড়ে; তাই আমি অন্ধকার পথ থেকে আলোর পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য লণ্ঠন নিয়ে আগিয়ে এসেছি!"

দাঁড়িপাল্লা—"তাইতো, আজ এ মীমাংসা হবার নয়। আগামী কাল যে সভা আহুত হয়েছে সেই সভায় এবিষয়ে মিটমাট্ করে নেওয়া যাবে। আপনারা কি বলেন?"

সকলে—"তাই হবে!"

দাঁড়িপাল্লা—"ও ঘড়ি দাদা, আপনার ঘড়িতে কটা বাজলো দেখুন তো?"

ঘড়ি—"বারোটা বেজে পাঁচ!

সকলে—"বারোটা বেজে গেছে?"

ঘড়ি—"আজ্ঞে অনেকখন, আপনাদের অনেক আগেই বেজেছিল, এখন আমার বাজালেন, আর বাংলাদেশেরও বাজাতে বেশী দেরী নেই।"

নৌকা—"কি যে হেঁয়ালীতে কথা বলেন আপনি, বোঝা যায় না!"

ঘড়ি—"আর বুঝে কাজ নেই দাদা। চলুন ওঠা যাক।"

এমন সময় উত্তর বঙ্গ মিউনিসিপ্যালিটী সাধারণ সহর কেন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে সাইকেলে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া সবাই উৎসুক দৃষ্টি সাইকেল-ওয়ালার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। হুঁকা—"সর্বনাশ হয়েছে? কি সর্বনাশ হোল?"

সাইকেল—"আর কি হোল না তাই বলুন।"

ফুল—"আরে খুলেই বল না, আর কেন দম্ভে মারছো!"

সাইকেল—"হায়, কলসীর নদী পার হ'তে গিয়ে গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে! গলায় ছিল দড়ি বাঁধা, দড়ি ছিঁড়ে হাত থেকে পড়া মাত্রই বার কতক বক্ বক্ শব্দ করে, ব্যস—খতম্! আচ্ছা স্যার, আপনিই বলুন তো, কলসী যে আত্মহত্যা করলো তার জন্য কলসীওয়ালাকে প্রমোশান্ দিলে হয় না!"

ফুল—"কি রকম প্রমোশন্?"

সাইকেল—"এই ধরুন না কেন টিউব-ওয়েলে। কলসী তো জলের জন্য। টিউবওয়েলও তো তাই। আর সবার ওপরে বড় গুণ টিউব-ওয়েলের যে, মাটি নিংড়ে রস বার করে আনে! আমার মনে হয় কলসী দাদার বন্ধুবান্ধবেরা বাংলাদেশ নিংড়ে রসের সমুদ্র তৈরী করে তার উপর সাঁতার কাটতে পারবেন।"

সবাই—"খাসা, খাসা বুদ্ধি, মনে রেখ ভাই, তোমাকেই এইবার আইন তৈরী করতে হবে! তুমি জিনিয়াস্। তুমি আইনের এভারেষ্ট।"

ফুল নাকিসুরে ভ্যানিটি ব্যাগে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন—"আমরা মর্মাহত হয়েছি। প্রাণ ব্যথায় ব্যথিয়ে উঠেছে। কি বলে যে কলসী-ওয়ালাকে সান্ত্বনা দেব সে ভাষা নেই। তবে কাল বিকাল পাঁচটায় যে সভা হবে সেই সভায় যেন তিনি উপস্থিত থাকেন। আচ্ছা, ছিপদাদা কোথায়? জানেন কিছু সাইকেল-মেসেন্জার দাদা?"

সাইকেল—"আজ্ঞে তাও জানি ফুলদিদিমণি! তিনি বাংলা-গঙ্গায় ছিপ ফেলে দেখছেন মোটা কিছু গাঁথা যায় কিনা!"

দাঁড়িপাল্লা—"বন্ধুগণ চলুন, এইবার আজকের মত মন্ত্রণা সমাপ্ত হোক।"

সাইকেল—"যাবেন কোথায়! বাইরে যে ভীষণ বৃষ্টি পড়ছে!"

লণ্ঠন—"ভয় নেই—ছাতা দাদারা থাক্‌তে সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাকুন, কি বলেন ছাতা দাদা!"

ছাতা—"নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমাদের কাজই তো এই। যাদের কস্মিন্ কালেও ভিজে যাবার প্রশ্ন নেই, তাদেরই মাথায় ছাতা ধরি। যারা চিরকাল পথে ভিজে, অসুখে পড়ে—প্রাণ ত্যাগ করে, তাদের দিকে ফিরেও তাকাই না! কারণ তারা থাকুক বা মরুক, তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না!"

শেষ অঙ্ক

সভাগৃহ। সভাপতি, সম্প্রতি আগত "স্যার…"নিস্তব্ধ কক্ষ। প্রহরী-শূন্য। সভাগৃহের বাহিরে বিক্ষুব্ধ জনতা ফলাফল জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

দাঁড়িপাল্লা"—সভাপতি মহাশয়! গতকাল যে কলসী আত্মহত্যা করেছে, তার মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য আমি প্রস্তাব করি যে সকলে সমবেতভাবে দুই মিনিট কাল দণ্ডায়মান হ'য়ে তার মৃত আত্মার মঙ্গল কামনা করুন। এইটাই চলতি ফ্যাসান।" উপস্থিত সবাই দণ্ডায়মান হইলেন।

ঘড়ি—"দুই মিনিট হ'য়ে গ্যাছে স্যার!"

সভাপতি—"দার্জ্জিলিং সাধারণ পল্লী কেন্দ্র—এদিকে আসুন।"

দার্জ্জিলিং সাধারণ পল্লীকেন্দ্র নিকটে আসিলে সভাপতি কহিলেন—"আপনিই তো দোয়াত কলম!"

"আজ্ঞে হ্যা।"

"আসুন আপনাকে চুবিয়ে লিখি!"

"সে আপনার দয়া!"

সভাপতি—"আপনারা সারা বাংলা দেশ এখানে এসেছেন। আমাদের আলোচ্য বিষয় ধানের শীষ নিয়ে কি করা যাবে! বর্তমানে যেরূপ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে তাতে আপনারা কি মনে করেন!"

মানুষের হাত—"আমরা মনে করি যে বাংলা দেশ থেকে যে ধানের শীষ পাওয়া গেছে তাতে একমাত্র আমাদেরই অধিকার আছে। সরকারেরও নেই সাধারণেরও নেই। সরকার সেগুলো গুদাম জাত করতে পারবেন না। অতএব আসুন ভাই, সব ধানের শীষগুলো আমরা অর্থাৎ মানুষের হাতের দল ভাগ ক'রে নিই!"

লণ্ঠন—"সভাপতি মহাশয়, আমরা প্রস্তাব করি যে ধানের শীষে বাঙ্গালী মাত্র প্রত্যেক ব্যক্তিরই অধিকার আছে। ধান বাঙ্গালীর প্রাণ, মানইজ্জত সবই। গত ১৩৫০ সালের কথা আমরা ভুলিনি। ইতিহাস আমাদের জানিয়ে দেয় যে, যখন দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন মান প্রাণ ইজ্জত সবই বিসর্জ্জন দিয়ে কুকুর বিড়ালের মত পথে পথে মানুষ মরেছে। আপনাদের মত অতুল ঐশ্বর্য্যশালীর দুয়ারে একমুঠো অন্ন না পেয়ে মা মৃত সন্তান বুকে ক'রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে। তবুও মুখ ফুটে বলেনি,—তোমরা দুবেলাই কেন পেট ভরে খাচ্ছ! আমরা কি এক বেলাও খেতে পাবো না? তোমাদের হাতে অন্ন বিতরণের ভার, তবুও আমরা থাকব অনাহারে? খাবারের দোকানের সামনে খাবারের দিকে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চিরদিনের মত চোখ বুঁজিয়েছে। তবুও বিদ্রোহ জাগায় নি, তবুও বলেনি যে আমরা না খেতে পেয়ে মরতে বসেছি আমাদের একটুকরো খাবার ফেলে দাও। আমাদেরও বাঁচার অধিকার আছে, আমাদের বাঁচতে দাও। বিচারালয়ের সামনে শেষ

নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, তবুও অবিচারের প্রতিবাদে সুবিচারের প্রার্থনা করেনি। কঙ্কালসার সব শিশুরা পৃথিবীতে আপন বলতে যা কিছু সব বিসর্জ্জন দিয়ে সর্ব্বহারা হয়ে পথের ওপর চিরনিদ্রার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। মাতৃহারা সন্তান মৃত অর্দ্ধভক্ষ্য মায়ের কঙ্কাল দেখিয়ে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কেঁদে উঠ্‌তো, ঐ কুকুরটা কাল রাতে আমার মাকে খেয়েছে, তোমরা ওকে মার, ও আমাকেও খেতে এসেছে! ডাষ্টবিন্ থেকে কাদা ছাই মাখা ভাত তুলে নিঃসঙ্কচিত্তে মুখে তুলে দিয়েছে, সময় সময় মানুষ ও কুকুরে একই অন্ন ভাগ করে খাওয়ার জন্য ঝগড়া করেছে, তবুও কেউ কুকুরকে তাড়ায় নি বা তাকে হাত ধরে ডেকে নিয়ে যায় নি। যে দেশের লোকেরা পতঙ্গের মত দুর্ভিক্ষের অনলে এভাবে পুড়ে মরতে পারে, যে দেশে একই সময়ে একদিকে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা চলে—আর অন্যদিকে বড় বড় হোটেল, রেঁস্তোরায় আনন্দের ফোয়ারা ছুটতে পারে, সেখানে মানুষের হাতের দলের পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবই সমর্থন পাবে এবং আইনও প্রশ্রয় দেবে পরোক্ষভাবে। তাই আমরা প্রতিবাদ করি—দেশে অন্ন বিলাবার ভার দেশবাসীর হাতেই আসুক। সরকারী গুদাম ভেঙ্গে দেওয়া হোক্। তাতে অপচয় কম হবে! মানুষ বা পশুর অখাদ্য হয়ে খাদ্যগুলো নদীতে পড়বে না। দালালরা লাভবান হবে না। সেই কারণে আমরা দেশবাসীকে আসন্ন মৃত্যুর হাতছানি থেকে রক্ষা করতে এবং অন্ধকার পথ থেকে আলোর পথে নিয়ে যেতে লণ্ঠন নিয়ে এসেছি!" (সেম্, সেম্)

দাঁড়িপাল্লা—"আমি প্রস্তাব করি যে, আমাদের মধ্যে যদি ভাগ বাঁটোয়ারা হয়, আমাদের দরকার পড়বেই। আমরা বখরার এক অংশ দাবী করি।" (হর্ষধ্বনি)

গরুরগাড়ী—"আমরা প্রস্তাব করি ধান যখন আনা হয় মাঠ থেকে তখন আমাদের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। সেজন্যে আমাদের গাড়ীভাড়া বাবদ আমরা এক অংশ দাবী করি।"

নৌকা—"আমরা নদীতীর থেকে পারা পার করে তীর পর্যন্ত নির্বিঘ্নে পৌঁছে দিয়ে ছিলাম, আমাদের পারানি বাবদ যেটুকু পাওনা সেটুকু কোনমতে ছাড়তে রাজী নই।" (এক্‌জ্যাক্টলি)

ফুল—"দেখুন, ধান আমি বুঝি না। ফুলই আমাদের নেশা! অতএব আমরা ফুলের মত সুন্দরী সাজতে যে যে খাদ্য পানীয় বৈদেশিক প্রসাধন প্রয়োজন—সব চাই। তার জন্য ধান বেচা লভ্যাংশ আমরা চাই-ই!"

মানুষের হাত—"মাননীয় সভাপতি মহাশয়, ও উপস্থিত বখরাদারবৃন্দ! আমি শুধু দুটি কথা বলতে চাই। লণ্ঠনদাদা আমাদের উপর যে দোষারোপ করেছেন, যে কলঙ্কের কালি ছড়িয়েছেন, তার প্রতিবাদে বলতে চাই, যে গতবারের দুর্ভিক্ষ মানুষের দ্বারাই হয়েছিল সত্য এবং আমরা স্বীকারও করি, কিন্তু যা হ'য়ে গেছে তার জন্য এখন মন খারাপ করে কোন লাভ নেই! বর্তমানে সে কলঙ্ক মোচন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আপনারা জানেন নিশ্চয়ই যে, যে হাত দিয়ে আঘাত হানা যায়, সেই হাতেই আবার ক্ষতস্থানে প্রলেপ দেয়। গতবারে আমরা লক্ষ লক্ষ মানুষের চিরদিনের মত আহারের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আমাদের মনে হয়, সেখানে তারা পরমানন্দে পোলাও কালিয়া খাচ্ছে। অতএব স্যার, এবারকারের মত আমাদের বিষয় পুনরায় বিবেচনা করুন। মনে রাখবেন স্যার, গতবারে যিনি আমাদের সভাপতি ছিলেন তাঁর কর্মপদ্ধতি ছিল সুন্দর, এবারেও আমরা সেই কর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে কাজ করব। মহাজনো যেন গত সঃ পন্থা।" (ক্যাপিটাল্)

সভাপতি—"সাধু, সাধু প্রস্তাব! আর কারো কিছু বলবার আছে? দোয়াত মশাই আপনি উস্‌খুস্ করছেন্ কেন? কিছু বলবেন নাকি?"

দোয়াত কলম—"আজ্ঞে না স্যর, তবে ভুলে যাবেন না আমার কথা। দোয়াত কলম যখন আপনার হাতেই, তখন সবই আপনার সুবিবেচনার ওপর নির্ভর করছে।"

কুঠার—"মাননীয় সভাপতি, আমি মনে করেছিলাম কিছু বলবো না, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি আমাকে বলতে বাধ্য করাচ্ছে। আমার বক্তব্য—ধান কাট্‌তে বরাবরই কাস্তে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এবারে ধান জোর করে বা ধাপ্পা দিয়ে ছিঁড়ে আনা হয়েছে। তবে ধান গাছের তক্তা করার সময় আমার কুঠারটি নিতে ভুল্‌বেন না স্যার। আর কুঠারের দরুণ অগ্রিম বায়না কিছু পাবোই।" হাত কচ্‌লাইয়া বসিয়া পড়িলেন।

সভাপতি—"আপনার নাম?"

কুঠার—"আজ্ঞে, শ্রীপশ্চিম ঢাকা সাধারণ পল্লীকেন্দ্র।"

সভাপতি—"এইবার বোধ হয় সকলের বক্তব্য শেষ হয়েছে, আচ্ছা, মহাপ্রাণগণ, আপনারা জানেন যে আপনাদের সহায়তা ছাড়া বর্তমানে আমার নিজের করার কিছুই ক্ষমতা নেই। আমি সর্বান্তঃকরণে আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করি। আমি জানি আপনাদের সাহায্য নিতে গেলে আমাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রত্যেকেরই মনস্তুষ্টি করতে হবে। অবশ্য আমরা তা পারি। কিন্তু বর্তমানে হাওয়া যেরূপ বদলে গেছে তাতে আমি অক্ষমতা জানাচ্ছি। ভাগাভাগি ব্যাপারটা পরে যা হয় করা যাবে, এখন শুধু আপনাদের কাছে বিশেষভাবে মানুষের হাতের কাছে এই অনুরোধ যে, ভাগ যা হয় হোক্ না কেন, আমার কথাটা শেষ পর্য্যন্ত মনে রাখবেন আপনারা।"

দক্ষিণ মধ্য কলিকাতা সাধারণ কেন্দ্র—

—"সভাপতি মহাশয় আমার কথা তো আপনারা একেবারেই ভুলে গেছেন।"

সভাপতি—"কে আপনি, পরিচয়?"

"আজ্ঞে আমি ফুটবল!"

সভাপতি—"কি বলতে চান?" সক্রোধে কহিলেন।

ফুটবল—"আমার ভাগে কিছু পড়বে তো স্যার!"

সভাপতি—"যদি নাই বা পড়ে দুঃখ করবেন না ফুটবল মশাই। আর আপনি তো হাওয়া খেয়েই জীবন ধারণ করে থাকেন। যদি একান্তই হাওয়ার অভাব হয়, গড়ের মাঠে সান্ধ্য হাওয়া খেয়ে আসবেন।

খুব মিষ্টি। হাঁ, ভাল কথা, তবে আপনার স্বদেশবাসীদের হাওয়া খাইয়ে এবারের মত দুর্ভিক্ষটা কাটিয়ে তুলতে পারেন, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনাকে রায় হাওয়া বাহাদুর টাইটেল্ উপাধি দেব।"

ফুটবল—"অশেষ করুণা আপনার স্যার।"

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি সাধারণ পল্লীকেন্দ্র—"তা হবে না, তা হবে না স্যার; আমরা প্রতিবাদ করছি। কঙ্কালসার দেশবাসী আর হাওয়া খেতে চায় না, যদি অনুমতি করেন আমরাই ব্যবস্থা করতে পারি।"

সভাপতি—"কে আপনারা? কি খাওয়াবেন আপনার লক্ষ লক্ষ দেশবাসীদের?"

আম ও খেজুর—"শাঁস বলে যে পদার্থ টুকু ছিলো তা তো আপনারাই খেয়ে নিয়েছেন, বাঁকি রয়েছে খাঁটি দুটি আঁটি! অনুমতি করুন স্যার, দু সের দশ ছটাকী ও পাঁচপজী দেশবাসীর মুখে আঁটি দুটি এনে পৌঁছে দিই!"

সভাপতি—"তাই দিন।"

আম ও খেজুর—"আহা, দেবতা! করুণার অবতার!"

খড়দহে শতশ্রীখোল উৎসব

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ, রায়বাহাদুর

গত বৎসর আমি এই উৎসবের সফলতা কামনা করেছিলাম। এ বৎসর দেখছি, এই উৎসবে যোগদান করবার সৌভাগ্যই আমার ভাগ্যে মিলে গেছে। সৌভাগ্য বলছি এই জন্য যে, আমি বিশ্বাস করি যে এই বৈষ্ণব উৎসব দেখবার সুযোগ কদাচিৎ ঘটে। একশত খোলের তুমুল কলরোলের কথা বলছি নে, খোলবাদ্য-ধ্বনি জীবের পক্ষে কল্যাণকর সেজন্যও বলছি না, বলছি এই জন্য আমাদের অবস্থাবৈগুণ্যে বা ভাগ্যবিপর্যয়ের গতিতে শ্রীখোলও দুর্লভ হয়ে পড়েছে। এখন আর বাংলার পল্লীতে পল্লীতে খোলের মধুর ধ্বনি, কীর্ত্তনের ভুবন-মঙ্গল সঙ্গীত শুনতে পাই না। আমার বাড়ী এক সুদূর পল্লীগ্রামে, সেখানে ছেলেবেলায় দেখেছি সন্ধ্যারতির পরে পাড়ায় পাড়ায় কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান হতো, আর বালক বৃদ্ধ যুবা সেই কীর্ত্তন গানে যোগদান করতো। আমি নিজে দেখেছি, পাড়াগাঁয়ের লোক কিছুক্ষণ তাদের দুঃখদারিদ্র্যের গ্লানি ভুলে যেতো কীর্ত্তনের আনন্দে। ভগবানের নামে সেদিন যে মত্ততা দেখেছি, এখন আর তা দেখ্‌তে পাই নে। আপনারা জানেন যে বাংলা দেশে নানা প্রকার সঙ্গীত আছে; বাউল, সারি, জারি, কবি ভাসানের ত কথাই নেই, বৈঠকী গানেরও চর্চা বহুস্থানে হয়ে থাকে। কিন্তু একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, Mass Singing বা গণ-সঙ্গীত বলতে কীর্ত্তনকেই বুঝায়। অন্যদেশের লোক জাতীয় সঙ্গীতে (National Song) যেমন বহুসংখ্যায় যোগদান করে, বাংলা দেশে তেমনি কীর্ত্তনে আপামর সাধারণ যোগদান করতে পারে। বিশ্বাসের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, প্রেমের সহিত এই 'কীর্ত্তন' করলে সকল অমঙ্গল দূর হয়ে যায়, এই ছিল জনসাধারণের বিশ্বাস। কাজেই খোল করতাল নিয়ে লোক দুচারজন বেরুলেই বহুলোক তাতে যোগদান করতো, কাউকে খোসামোদ করতে হতো না, কাউকে টাকা পয়সার লোভ দেখাতে হতো না। আমার সেই বাল্যকালের স্মৃতি থেকেই আমি একথা বলছি যে, পল্লীজীবনের কীর্ত্তনের যে কি প্রভাব ছিল, তা বলে শেষ করা যায় না। খোল কিনতে বা করতাল জোগাড় করতে বেশী কষ্ট স্বীকার করতে হতো না, কীর্ত্তনে যোগদান করবার জন্য সুকণ্ঠ থাকা বা পাণ্ডিত্য থাকারও দরকার হতো না। সুর ছিল সরল, ভাষা ছিল প্রাণের অভিব্যক্তি এবং বাজনাও ছিল সহজ, কাজেই যে কেউ ইচ্ছা করতো সেই গানে যোগদান করতে পারতো। যোগদান করতোও সর্বশ্রেণীর লোক বাধা শূন্যভাবে, আমরা ছেলেবেলায় কীর্ত্তন গান করেছি আমাদের পিতৃদেবের সঙ্গে। পিতাপুত্র, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ নিম্নবর্ণ সকলের মিলনক্ষেত্র ছিল এই কীর্ত্তন-গান। পল্লীতে যখন কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মহামারী দেখা দিত, তখন কোনও সরকারী বা বেসরকারী ডাক্তার পুঙ্গব তাঁর তোড়জোড়ের আড়ম্বর নিয়ে উপস্থিত হতেন না। লোকেরা খোল বাজিয়ে কীর্ত্তন করে' সেই সব মহামারীর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতো। এ আমার নিজের গত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—আপনারাও হয়ত আমার এই কথার সমর্থন পাবেন আপনাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার দপ্তরে। জনকল্যাণের ও গণজাগরণের বাহন ছিল এই কীর্ত্তন। কীর্ত্তনের আসরে অত্যাচারীর মুখ লজ্জায় মলিন হতো, মনোমালিন্য রক্তশিখায় পরিণত হতে পারতো না, বন্ধুত্বের রাখী-বন্ধন বাঁধা হয়ে যেতো লোকের অজ্ঞাতসারে, আর রোগপীড়া ছুটে পালাতো সমবেত বিশ্বাসের মঙ্গল নিশ্বাসে। পাড়ায় পাড়ায় যখন কলেরায় লোকে দলে দলে মৃত্যুমুখে পড়তো আর অবশিষ্ট লোক যখন সেই অবশ্যম্ভাবী পরিণামের প্রতীক্ষায় ম্রিয়মান হয়ে পড়তো, তখন সেই নাড়ীবশা প্রাণে উৎসাহের সঞ্চার করতো খোলের ধ্বনি; দলে দলে লোক ছুটে আসতো কীর্ত্তনের আহ্বানে। উন্মাদনার প্রভাবে লোকে সেই রোগপীড়া ও মৃত্যুর কথা ভুলে যেতো, সেই জন্য আর রোগপীড়া প্রবল হতে পারতো না। মৃত্যুর হাত থেকে বল্লাও খসে পড়তো। এ দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তাই বাংলাদেশে এই শতশ্রীখোল উৎসবের বহুপ্রচার আমি কামনা করি।

কীর্ত্তনের বার্ত্তা আমরা ভুলে গিয়েছি কিনা, তাই আবার সে কথা

মনে করে দেওয়া দরকার হয়েছে। আরও উপযুক্ত হয়েচে এই উৎসব শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কুঞ্জবাটী শ্রীপাট খড়দহে অনুষ্ঠিত হওয়া। নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট বঙ্গদেশের যে ঋণ, তা আমরা অনেকে হয়ত উপলব্ধি করি না। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারি যে দয়াল নিতাই-চাঁদের তুলনা হয় না। সারা বাংলা যে একদিন হরিনামে মেতে উঠেছিল, তা এই 'অক্রোধ পরমানন্দ' নিত্যানন্দের জন্য। প্রভু নিত্যানন্দ ছিলেন অবধূত, উদাসী। পড়ে গেলেন গৌরাঙ্গের প্রেমে। সেই প্রেমের ঠাকুরের প্রেরণায় নিত্যানন্দ বাংলার ঘরে ঘরে নামপ্রেম বিতরণ করেছিলেন। সেই অতীত দিনেও বাঙালী প্রভুকে ভুলে নাই। তাঁকেই 'প্রেমদাতা' বলে' আদর করেছিল। প্রেমদাতা বলতে নিতাইকে বুঝাতো। প্রেমের যোগ্য ভাণ্ডারী ছিলেন তিনি। কেননা তিনি আপনাকে কখনও প্রচার করেন নাই। তিনি বল্‌তেন—

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে-ই মোর প্রাণ॥

নিজকে ভুলতে না পারলে প্রেমদাতা হওয়া যায় না। নিত্যানন্দ আপনাকে ভুলেছিলেন একেবারে। তাই এই আত্মহারা পাগল প্রেমিকের কাছে বাংলাদেশ আত্মবিক্রয় করেছিল। তেমন আর হয় না। একদিন বাংলাদেশ যেমন প্রেমবন্যায় ভেসে গিয়েছিল, তেমন আর হয় না।

প্রেমবন্যা নিতাই হতে অদ্বৈত তরঙ্গ তাতে
চৈতন্য বাতাসে উথলিল।
আকাশে লাগিল ঢেউ স্বর্গে না এড়ায় কেউ
সপ্ত পাতাল ভেদি গেল॥

এর সহজ অর্থ এই যে নিতাই গৌর যে প্রেমবন্যা বহাইলেন, তাহাতে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ভেসে গেল অর্থাৎ সারাদেশ মেতে উঠেছিল এই কীর্ত্তনে —নাস্তিক পাষণ্ড ভণ্ড সকলেই নামের গুণে তরে গেল। এখনকার ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় যে বাংলাদেশে প্রেমধর্মের যে Movement অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল, তার প্রবর্ত্তক বা Source হচ্চেন শ্রীমন্নিত্যানন্দ। তার প্রেরণা বা Inspiration এসেছিল শ্রীচৈতন্য থেকে। আর অসামান্য পণ্ডিত জ্ঞানভক্তি উভয়ক্ষেত্রে প্রবীণ অদ্বৈতাচার্যের Interpretation বা তত্ত্বব্যাখ্যা তাকে করেছিল প্রাণবন্ত। এঁদের প্রত্যেকের কাছেই বাঙালী অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ।

কিন্তু আমরা এই অতুলনীয় সৌভাগ্যের কি সদ্‌ব্যবহার করছি? ভক্তিধর্মের ন্যায় উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিকতার উত্তরাধিকারী হয়েও আমরা তার মর্ম বিস্মৃত হয়েছি। বৈষ্ণবসমাজের কথা আমরা বলে থাকি, কিন্তু কোথায় সে সমাজ? একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বৈষ্ণব আজ সঙ্ঘবদ্ধ নয়; তাই আমরা নামপ্রেমের পতাকা বহন করবার শক্তি হারিয়েছি। সম্প্রদায় যদি না থাকে, তবে সে মন্ত্র, সে ধর্ম প্রাণহীন, নিষ্ফল হয়ে পড়ে। আজ কে একথা অস্বীকার করতে পারে যে, জগতের যে দুর্দশা হয়েচে, তাতে প্রেমের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী? জীবে দয়া, নামে রুচি—এই যে মহামন্ত্র আমরা লাভ করেছিলাম, আজ কি সবচেয়ে এই মন্ত্র মূল্যবান নয়? দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় সারা বিশ্ব ঘিরে ফেলেছে। যুদ্ধের একান্ত ধ্বংসলীলার অবসানে আবার ঝটিকার আয়োজন হচ্চে পশ্চিম আকাশে। মনে হয় না কি মানুষের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়—প্রেম। হিংসার দ্বারা বিশ্বের উপকার হবে না কোন দিন। হিংসার জ্বলনে জগৎ জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। আমাদের মহাপুরুষেরা যুগে যুগে অহিংসার জয়গান করেছেন। এই সেদিন যে মহাত্মা অনতিদূরে পদার্পণ করেছিলেন, তিনি অহিংসা মন্ত্রের প্রধান প্রচারক বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু মহাপ্রভু অহিংসারও উপরের কথা বললেন—প্রেম। অহিংসা সাধন, প্রেম সাধ্য। প্রেম হলো প্রয়োজন, অহিংসা তার উপায়। মনে অহিংসা না এলে প্রেম কখনও হয় না। হিংসাও করবো, প্রেমও আসবে প্রাণে, বিধাতার এমন বিধান নয়। প্রাণে অহিংসা স্ফুরিত হলেই আসবে ক্ষমা। বিশ্বজগৎকে ক্ষমা, শত্রুকে ক্ষমা, ক্ষমা ভিন্ন শান্তি নাই। তাই ক্ষমাসুন্দর প্রাণই প্রেমের পরকাশ। ক্ষমাহীন লোকের পক্ষে জীবে দয়া, প্রেম, রূপকথার মত অলীক। আর এই ক্ষমার সঙ্গে সঙ্গে মনে উদিত হয় বৈরাগ্য। বৈরাগ্য যার নাই, তার পক্ষে ক্ষমা করা দুঃসাধ্য। মনে যতক্ষণ বৈরাগ্য না আসে, ততক্ষণ ক্ষমা অসম্ভব। আবার বৈরাগ্য মনে উদিত হয় না ততক্ষণ, যতক্ষণ মনে থাকে অভিমান, অহঙ্কার, স্বার্থের চিন্তা।

বাস্তবিক মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত এই প্রেমধর্মের তুলনা নেই। ধর্ম জগতের ইতিহাসে এই শেষ কথা। যদি তাই হয়, তবে আমরা সে প্রেম জগৎকে পরিবেশন করতে পারি নি, তার কারণ আমাদের সঙ্ঘ-শক্তি নেই। আজকাল সঙ্ঘশক্তি ব্যতীত কিছুই সম্ভব হয় না। বৈষ্ণবেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে' শক্তিশালী হোন্‌, শান্তিপ্রসন্ন হৃদয়ে জীব জগতের দুঃখ বিমোচন করুন এবং দিকে দিকে প্রেমের বাণীকে জয়যুক্ত করুন, এই আমার প্রার্থনা।



নঞ্ তৎপুরুষ

বনফুল

১১

ভদ্রভাবে প্রতি-নমস্কার করে' নিজেই বিস্মিত হয়ে গেলেন তিনি। একে দেখে আর রাগ হল না তাঁর। শুধু তাই নয়, একটা নূতন দৃষ্টি নূতন মনোভাব জাগল যেন। যুগল তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আর একটু হেসে বললে—

"চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে আজ। গরম মোটে নেই"

"আপনি এখনও যান নি দেখছি"—চলতে চলতে উত্তর দিলেন পুরন্দরবাবু।

"না। একটা না একটা বাধা উপস্থিত হচ্ছে। আমার প্রোমোশন হয়েছে, জানেন, মাইনেও বেড়েছে। পরশু নাগাদ যাচ্ছি নিশ্চয়"

"প্রোমোশন হয়েছে ?"

"হবে না কেন"—ভ্রূযুগল উত্তোলন করে' যুগল বললে।

"না, তাই জিগ্যেস করছি···" পুরন্দরবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে' আড়চোখে চাইলেন একবার তার দিকে। লক্ষ্য করলেন যুগলের পোষাক পরিচ্ছদ আর আগেকার মতো নেই, বেশ একটু পারিপাট্য দেখা দিয়েছে।

চায়ের দোকানে বসে' কি করছিল ওখানে—পুরন্দরবাবু ভাবছিলেন মনে মনে।

"আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে ভালই হ'ল। একটা শুভসংবাদ আছে"

"শুভসংবাদ ?"

"আমি আবার বিয়ে করছি"

"সে কি !"

"দুঃখের পরে সুখ আসে, এই তো জীবন। আমি ভারী খুশী হতাম পুরন্দরবাবু যদি আপনি—কিন্তু না থাক, এখন বোধ হয় ব্যস্ত আছেন আপনি"

"হ্যাঁ ব্যস্ত আছি, শরীরও ভাল নেই আমার"

হঠাৎ মনে হল লোকটাকে এড়াতে পারলে যেন বাঁচেন। তার সম্বন্ধে যে নূতন মনোভাব জেগেছিল তা নিমেষে অবলুপ্ত হয়ে গেল।

"আমি ভারী খুশী হতাম যদি···"

কিসে সে খুশী হ'ত তা যুগল বললে না খুলে—পুরন্দরবাবু চুপ করে' রইলেন।

"তাহলে পরে হবে"—তার দিকে না চেয়েই পুরন্দরবাবু উত্তর দিলেন এবং চলতেই লাগলেন। যুগলও সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল।

"আচ্ছা তাহলে নমস্কার, আবার দেখা হবে আশা করি"

"নমস্কার"

পুরন্দরবাবু যখন বাড়ি ফিরলেন তখন তাঁর মনের সমস্ত শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। ওই লোকটার সংস্পর্শ কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না তিনি। বিছানায় যখন শুতে গেলেন তখনও তাঁর আবার মনে হল—লোকটা শ্মশানের কাছে কি করছিল ?

তার পরদিন সকালে উঠে তিনি ঠিক করলেন ভবেশবাবুদের ওখানে যাবেন। নিতান্ত কর্ত্তব্যবোধেই ঠিক করলেন, যাবার আন্তরিক ইচ্ছে ছিল না। কারও সহানুভূতি, এমন কি ভবেশবাবুদের সহানুভূতিও, বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল তাঁর পক্ষে। কিন্তু ভবেশবাবুরা একবার এসে তাঁর খোঁজ করেছেন, না গেলে অভদ্রতা হয়। তাঁর কেমন একটু সঙ্কোচ হতে লাগল তবু। চা খাওয়া শেষ করে' যাবেন কি যাবেন না ভাবছেন এমন সময়ে সবিস্ময়ে দেখলেন যুগল পালিত প্রবেশ করছে! পুরন্দরবাবু কল্পনাও করতে পারেন নি যে লোকটা আবার আসবে। নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন, কি বলবেন ভেবে পেলেন না। যুগল কিন্তু বেশ সপ্রতিভ। হেসে নমস্কার করে' চেয়ার টেনে বসল। যে চেয়ারটায় ইতিপূর্ব্বে বসেছিল ঠিক সেই চেয়ারটাতেই বসল। পুরন্দরবাবুও প্রতি-নমস্কার করে' বসলেন। প্রথম যেদিন যুগল এসেছিল সেইদিনের ছবিটা হঠাৎ স্পষ্ট ফুটে উঠল পুরন্দরবাবুর মনে।

"আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন ?" পুরন্দরবাবুর মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করে' যুগল বলল। যুগলের আচরণে যদিও আপাতদৃষ্টিতে লেশমাত্র আড়ষ্টতা ছিল না কিন্তু কোনও কারণে তার মনের ভিতর যে একটা তোলপাড় হচ্ছিল তা' সে ঢাকতে পারছিল না। বেশবাসও বিচিত্র করে' এসেছিল। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী, কোঁচানো জরি-পাড় শান্তিপুরের ধুতি, জরিদার উড়ুনি, অনামিকায় হীরের আংটি, পায়ে পাম্‌শু, চোখে রিমলেস চশমা, এসেন্সের গন্ধ ভুর ভুর করছে গায়ে। চশমাটা খুব সম্ভবত অলঙ্কারই, কারণ ইতিপূর্ব্বে তাঁর চোখে চশমা ছিল না।

"আশ্চর্য্য হবারই কথা" এঁকে বেঁকে হেসে যুগল সুরু করলে আবার—"এমন ভাবে আসাটা প্রত্যাশা করেন নি, বুঝতে পারছি। কিন্তু দেখুন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা অত ঠুনকো হওয়া উচিত কি ? পরস্পরের মধ্যে একটা দৃঢ়তর এবং মহত্তর বন্ধন থাকাটা কি বাঞ্ছনীয় নয় সমস্ত তুচ্ছতা সমস্ত মনোমালিন্য সত্ত্বেও ? কি বলেন আপনি"

"ভণিতা না করে' যা বলতে এসেছেন তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন" ভ্রূকুঞ্চিত করে' পুরন্দরবাবু বললেন।

"তাহলে সংক্ষেপে বলি শুনুন। কালই বলেছি তো আমি আবার বিয়ে করব। এখন আমি আমার ভাবী সহধর্ম্মিণীকে দেখতে যাচ্ছি। তাঁরা বালীগঞ্জে থাকেন। যদি অভয় দেন তো একটা প্রস্তাব করি।"

"কি বলুন"

"আপনার সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই এবং এখন যদি আপনি আমার সঙ্গে যেতে পারেন তাহলে কৃতার্থ হই"

"আপনার সঙ্গে যাব! কোথায়?"

পুরন্দরবাবুর চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হয়ে পড়ল।

"তাদের বাড়ি। মাপ করবেন, আমার মাথার ঠিক নেই, মনের ভাব ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না হয় তো, আমার ভয় হচ্ছে আপনি পাছে 'না' বলে' বসেন"

অতিশয় করুণ দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল পুরন্দরবাবুর মুখের দিকে।

"এখনই আপনার সঙ্গে আপনার ভাবী-সহধর্ম্মিণীকে দেখতে যাব— এই বলচেন আপনি?"

পুরন্দরবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে' সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন যুগলের দিকে। নিজের চক্ষু কর্ণকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি।

"হাঁা" সলজ্জ কণ্ঠে যুগল বললে—"রাগ করবেন না, পুরন্দরবাবু। পরিহাস করছি না আমি, অনুনয় করছি, সত্যিই বলচি কৃতার্থ হব। আমার আশা আছে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারবেন না আপনি"

"দেখুন, প্রথমত জিনিসটা অত্যন্ত অহেতুক"

পুরন্দরবাবু অধীর ভাবে প্রতিবাদ করলেন।

"আমার প্রবল আগ্রহ, আর কিছু নয়" যুগল সানুনয়ে সুরু করল আবার—

'তাছাড়া কারণও আছে। আপনার কাছে গোপন করব না কিছু-- কিন্তু সেটা ঠিক এখন, এই মুহূর্ত্তে বলতে চাই না। এখন আমার অনুরোধটুকু রাখুন শুধু…"

"কিন্তু আপনি নিজেই কি বুঝতে পারচেন না যে ব্যাপারটা কতদূর অশোভন?"

পুরন্দরবাবু দাঁড়িয়ে উঠলেন। যুগলও দাঁড়িয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

"কিছু অশোভন নয়। আমি আপনাকে আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে নিয়ে যাব---এতে অশোভন কি আছে! তাছাড়া আপনি তাদের চেনেনও। বালীগঞ্জের বিশ্বম্ভর বোস—নামজাদা উকীল— কর্পোরেশনের মেম্বার—"

"তাই না কি!"

একমাস আগে এঁকে ধরবার জন্যই তিনি কি চেষ্টাটাই না করেছেন নিজের মকোদ্দমার সুবিধে হবে বলে'। কিছুতেই নাগাল পান নি। তাঁর বিরুদ্ধপক্ষের দিকে ছিলেন ইনি বরাবর।

"হাঁা হাঁা সেই লোক" পুরন্দরবাবুর মুখভাব লক্ষ্য করে' যুগল বলে উঠল—"সেই যার পাশে পাশে আপনি রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে গল্প করছিলেন আর আমি দাঁড়িয়ে আপনাদের দেখছিলাম, আপনার কথা শেষ হয়ে গেলে আমিও তাঁকে ধরব ভেবেছিলাম সেদিন। কুড়ি বছর আগে আমরা এক অফিসে চাকরি করতাম কি না। সেদিন অবশ্য যখন আপনার কথা শেষ হবার পর তাঁকে ধরব ভাবছিলাম—তখন বিয়ের কথা ভাবিই নি। হঠাৎ সাতদিন আগে কথাটা মনে হল!"

"কিন্তু, কি মুশকিল, তাঁরা যে ভদ্রলোক"—কথাটার সম্যক অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করেই পুরন্দরবাবু সবিস্ময়ে বলে' বসলেন।

"হলই বা" যুগলের চোখে শাণিত দৃষ্টি ফুটে উঠল একটা।

"না, না মানে আমি বলছি যে যখন আমি তাদের বাড়ি গিয়াছিলাম তারা—"

"সব মনে আছে তাদের। আপনার কথা বলছিলেন, আপনাকে শ্রদ্ধাও করেন তিনি। কিন্তু আপনি বাড়ির সবাইকে দেখেন নি, তারা এত—"

"তিন মাস যেতে না যেতেই বিয়ে করবেন আপনি!"

"না বিয়ে অত তাড়াতাড়ি হবে না। তার এখনও বছর খানেক বাকী। না, না আপনি যা ভাবছেন তা নয়, তাঁরা আমাকে অনেকদিন থেকে চেনেন। আমার স্ত্রীকেও চিনতেন। সব জানেন আমার। তাছাড়া সম্পত্তি আছে আমার, চাকরিও পেয়েছি ভাল একটা, মাইনেও বাড়ল—আপত্তি নেই কিছু তাঁদের"

"তাঁর মেয়ের সঙ্গে?"

"সে সব বলব এখন" এঁকে বেঁকে বিগলিত হয়ে পড়ল যেন যুগল "আগে একটা সিগারেট ধরাই। আজই দেখবেন তাকে। একটা কথা কি জানেন, বিশ্বম্ভরবাবু রোজগার করছেন খুব কিন্তু রাখতে পারেন নি তেমন কিছু। আজকালকার খরচ তো জানেনই, তাছাড়া বালীগঞ্জে বাড়ি করতে গিয়ে জমানো টাকাটা খরচ করে' ফেলেছেন সব। বিরাট পরিবার, মেয়েই আটটি—ছেলে একটি মাত্র, সে ছেলেও মানুষ হয়নি এখনও। কাল যদি চোখ বোজেন দু'বেলা অন্ন জুটবে কিনা সন্দেহ। আটটা মেয়ে—তাদের কাপড় চোপড়ের খরচেই তো ফতুর হবার কথা—তাদের পড়িয়েছেন প্রত্যেককে। এদের মধ্যে পাঁচটি বেশ প্রাপ্তযৌবনা, বড়টির বয়স চব্বিশ পঁচিশ হবে, খাসা মেয়ে, আলাপ করে' দেখবেন। ষষ্ঠটির বয়স বছর পনেরো হবে—স্কুলে পড়ে। আগের পাঁচটির বিয়ে হয় নি কারও, আজকাল, মেয়ের বিয়ে মানে বুঝতে পারেন তো, কি ব্যাপার! নানা জায়গায় পাত্র খুঁজছিলেন ভদ্রলোক এমন সময় আমি গিয়ে হাজির। আমার মতো পাত্র একটিও জোটে নি ইতিপূর্ব্বে। জানাশোনা ঘর, লেখাপড়া জানে, খেতে পরতে পাবে এরকম ছেলে খুব সুলভ তো নয়—আত্মপ্রশংসা করছি না—কিন্তু আমার মতো পাত্র বিনাপণে পাওয়া অসম্ভব হবে ওঁর পক্ষে"

সোচ্ছ্বাসে বলে চলেছিল যুগল।

"আপনি বড়টিকে বিয়ে করেছেন?"

"না মানে, বড়টিকে না। আমি ষষ্ঠটি মানে যেটি স্কুলে পড়ছে তার কথাই বলেছি"

"সে কি!" হেসে ফেললেন পুরন্দরবাবু, "তার বয়স মোটে পনেরো বলছেন!"

"হাঁা, এখন পনেরো, আর ন'মাস পরেই ষোলয় পড়বে। তাতে হয়েছে কি! এখন বিয়ে করাটা দৃষ্টিকটু হবে অবশ্য, কথাটা পাকাপাকি হয়ে থাকবে শুধু—আহা আপনি আমাকে এতই অবুঝ মনে করেছেন!"

"ও, তাহলে এখনও কিছুই ঠিক হয় নি"

"হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে বই কি"

"সে মেয়েটি একথা জানে?

"মেয়ের বাবা মা তাকে হয়তো বলেন নি কিছু, একটা ইয়ে আছে তো, কিন্তু আমার মনে হয় সে জানে ঠিক" চোখ কুঁচকে হেসে ফেললে যুগল পালিত। তার পর বললে

"এখন বলুন কি বলছেন—"

"আমি সেখানে গিয়ে করব কি!"

"পুরন্দরবাবু—"

"এ তো অদ্ভুত আবদার দেখছি আপনার"

রাগে ঘৃণায় পুরন্দরবাবুর মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না।

একি অদ্ভুত বেহায়া লোক!

"চলুন, বুঝলেন, আমি বলছি, ভালই লাগবে আপনার"

গদগদকণ্ঠে অনুরোধ করতে লাগল যুগল—"না, না, না, শুনুন" পুরন্দরবাবুর অধীর ভাব লক্ষ্য করে' ব'লে উঠল সে আবার, "শুনুন, সব কথা শুনে তারপর ঠিক করবেন যা হয়। আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন বোধহয়। আপনার বন্ধুত্ব দাবী করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই, আমি একটা অনুগ্রহ চাইছি শুধু। আর এতে আপনি ভবিষ্যতে বিপন্নও হবেন না কোন রকমে তাও শপথ করে' বলতে পারি। তাছাড়া পরশুদিন তো চলেই যাচ্ছি আমি, আপনাকে আর বিরক্ত করতে আসব না, শুধু আজকের দিনটি দয়া করুন একটু। আপনার মহত্বে বিশ্বাস করি বলে' অনেক আশা করে' এসেছি। হয়তো ইদানীং আমার প্রতি একটু করুণাও হয়ে থাকবে আপনার—আমার মতো হতভাগার প্রতি যে কোন লোকেরই করুণা হওয়া উচিত, আপনার মতো উদার লোকের তো···সব কথা গুছিয়ে বলতে পারছি না—"

হঠাৎ যুগলের গলা কেঁপে গেল, আর কিছু বলতে পারলে না সে। পুরন্দরবাবু সবিস্ময়ে চাইলেন তার দিকে।

"আপনি আমাকে ঠিক যে কি করতে বলছেন তাও তো বুঝতে পারছি না, সাধ্যাতীত না হলে আমি তা—"

"আপনি এখন আমার সঙ্গে চলুন, তাহলেই উপকৃত হব। তারপর ফেরবার পথে, বিশ্বাস করুন, সমস্ত খুলে বলব আমি—বিশ্বাস করুন"

পুরন্দরবাবু তবু রাজি হলেন না, বিশেষ করে' নিজেরই অন্তরে দুষ্ট বাসনার গোপন সঞ্চরণ অনুভব করছিলেন বলে' আরও হলেন না। যুগল আবার বিয়ে করছে শোনামাত্রই মনের সুপ্ত অজগরটা নড়াচড়া সুরু করেছিল অনেক আগে থেকেই। হয়তো কৌতূহল, কিম্বা হয়তো নিগূঢ় আরও কিছু—রাজি হয়ে যেতে লোভ হচ্ছিল এবং যতই লোভ ততই দমন করবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। টেবিলের উপর দুই কনুইয়ের ভর দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন এবং মনে মনে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। যুগল ক্রমাগত খোসামোদ করে' যেতে লাগল।

"বেশ চলুন"—হঠাৎ ঠিক করে' ফেললেন তিনি, মনের ভিতরটা কেমন করতে লাগল যদিও। উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ঠেলে। যুগলের আনন্দের সীমা রইল না।

"জামা কাপড় বদলাতে হবে কিন্তু, এই বেশে যাবেন না কি—তা হবে না। ভাল কাপড় জামা বার করুন, চুলটা আঁচড়ান" আনন্দে উৎফুল্ল যুগল ব্যস্ত হয়ে উঠল।

আমি কি পরে যাব তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন লোকটা—পুরন্দরবাবুর মনে হল একবার।

একটু পরেই বেরিয়ে পড়লেন তিনি যুগলের সঙ্গে। যুগল প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাঁর পোষাকের পারিপাট্য দেখতে লাগল বারবার; শ্রদ্ধা যেন উথলে উঠতে লাগল আরও। পুরন্দরবাবু বিস্মিত হচ্ছিলেন, শুধু তার আচরণে নয়, নিজের আচরণেও। বাইরে চমৎকার গাড়ি অপেক্ষা করছিল একখানা।

"ও আমার জন্যে গাড়িও আপনি আগে থাকতেই ঠিক করে' এনেছিলেন?"

"গাড়ি আমি নিজের জন্যেই ঠিক করেছিলাম। কিন্তু আপনি যে যাবেন সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না আমার" একমুখ হেসে যুগল বললে।

"আপনাকে নিয়ে জ্বালাতন" গাড়িতে চড়ে হেসে অনুযোগ করলেন পুরন্দরবাবু।

"প্রশ্রয় দিয়েছেন বলেই জ্বালাতন করি" গাঢ়কণ্ঠে যুগল উত্তর দিল।

গাড়ি চলতে সুরু করল।

"আর পাপিয়া?" কথাটা একবার মনে হল কিন্তু জোর করে' সেটাকে মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন পুরন্দরবাবু। তাঁর মনে হতে লাগল একটা পবিত্র জিনিস অশুচি হয়ে যাবে যেন। সহসা নিজেকে অত্যন্ত হীন, অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনে হ'তে লাগল। ইচ্ছে করতে লাগল গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ি এবং যুগল যদি বাধা দেয় তার গালে ঠাস করে' চড় বসিয়ে দিই একটা। কিন্তু কিছুই হল না। যুগল মনের আনন্দে বকর বকর করতে লাগল; প্রলোভনটা আবার তাঁর মন জুড়ে বসল।

"আচ্ছা, পুরন্দরবাবু দামী পাথরের সম্বন্ধে কোনও ধারণা আছে আপনার?"

"কি পাথর"

"হীরে"

"আছে কিছু কিছু"

"আমার একটা উপহার নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। নেব?"

"এখন ওসব কেন"

"ক্ষতি কি তাতে। কি কিনি বলুন ত? ব্রোচ, দুল, ব্রেসলেট—একটা 'সেট' নিলে কেমন হয়, না শুধু একটা জিনিসই নেব"

"কতটাকা খরচ করবেন আপনি"

"হাজার দুই আড়াই"

"এত!"

"বেশী মনে হচ্ছে আপনার?" অপ্রতিভ হয়ে গেল যুগল একটু।

"একটা ব্রোচ কিম্বা একজোড়া দুল নিয়ে যান বড় জোর, এত খরচ করে' কি হবে এখন ?"

যুগল মুষড়ে গেল। অনেক টাকা খরচ করে' একটা 'হোল সেট' কিনে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সে। একটা গয়নার দোকানে গাড়ি দাঁড়াল। পুরন্দরবাবু আবার বেশী টাকা খরচ করতে মানা করলেন। শেষে একজোড়া ব্রেসলেট কেনা হ'ল—তাও যুগল যেটা পছন্দ করছিল সেটা নয়, পুরন্দরবাবু ওর মধ্যে সস্তা দেখে একজোড়া বেছে দিলেন। দাম মাত্র ৩০০৲ টাকা শুনে যুগলের মন আরও দমে' গেল। বেশী দামী কিনলে কি ক্ষতি ছিল।

"ভাল একটা জিনিস কিনে দিলেই হ'ত" গাড়িতে চড়ে' যুগল বলতে লাগল—"অতবড় সংসার, অতগুলি মেয়ে, বেচারারা গয়না কি পরতে পায়।" একটু পরে ফিক্ করে হেসে আবার সুরু করলে সে—'পনের বছর বয়স শুনে আপনি হাসছিলেন। কিন্তু ওই কম বয়স বলেই আমি আরও মজেছি। বেণী দুলিয়ে বই খাতা বগলে নিয়ে এখনও স্কুলে যায়,—হি-হি। মানে নিষ্পাপ, ওইতেই মুগ্ধ করেছে আমাকে, রূপে নয়। স্কুলে যায়, হুড়োহুড়ি করে, কথায় কথায় হেসে লুটিয়ে পড়ে, সে কি হাসি—আর কি নিয়ে হাসি শুনবেন, বেরালটা সিন্দুক থেকে লাফিয়ে পড়ে' কেমন বলের মতো চলে গেল, সংসারের কিছু জানে না এখনও—একেবারে কচি—হি—হি।"

পুরন্দরবাবু নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন।

মাঝে মাঝে তাঁর মনে হচ্ছিল—"আমাকে জোর করে' নিয়ে যাচ্ছে কেন ? কোনও মতলব নেই তো ! ফাঁদে ফেলবে না কি ? সত্যি আমার মহত্ত্বের উপর এখনও বিশ্বাস আছে ওর ! লোকটা কি ! ভাঁড়, বেকুব, পাগল—না আর কিছু !"

১২

পুরন্দরবাবু যা বলেছিলেন বিশ্বম্ভরবাবুরা সত্যিই ভদ্র পরিবার। বিশ্বম্ভরবাবু নিজে একজন পদস্থ এবং সম্মানিত লোক, সকলে তাঁকে খাতির করে। তাঁর আয়ের সম্বন্ধেও যুগল যা বলেছিল তা ঠিক। যতদিন তিনি রোজকার করছেন স্বচ্ছন্দে চলে' যাচ্ছে বেশ, কিন্তু তিনি চোখ বুজলেই সংসার অচল হয়ে পড়বে।

বিশ্বম্ভরবাবু পুরন্দরবাবুকে বেশ সহৃদয় ভদ্রতাসহকারে অভ্যর্থনা করলেন। মকোর্দ্দমা নিয়ে তাঁর সঙ্গে যে প্রচ্ছন্ন শত্রুতাটা হয়েছিল সেটা অবলুপ্ত হয়ে গেল যেন।

"খুব ভাল হয়েছে" প্রথমেই আরম্ভ করলেন তিনি, "আপোষে যে আপনারা মিটমাট করে' ফেলেছেন খুব ভাল হয়েছে এটা। আমারও তাই ইচ্ছে ছিল, আর আপনার উকীল পরেশবাবু তো অসাধারণ লোক এসব বিষয়ে। বেশ হয়েছে। কোন হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি আপনি তিন লক্ষ টাকা পেয়ে যাবেন। মকোদ্দমা চালালে অন্তত তিনটি বছর নাকানি চোবানি খেতে হ'ত আপনাদের দুজনকেই। এ খুব ভাল হয়েছে—"

বিশ্বম্ভরবাবু আলোক-প্রাপ্ত সমাজের লোক, তাঁর পিতা ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং পরদার বালাই নেই। একটু পরেই বিশ্বম্ভরবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে পুরন্দরবাবুর আলাপ হয়ে গেল। শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী দেবী স্থূলকায়া প্রবীণা। চোখে মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। দেখলেই মনে হয় যেন অবসন্ন তিনি। আলাপ করলে মার্জ্জিতরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। একটু পরেই তাঁর মেয়েরাও এল একে একে। পুরন্দরবাবু দিশাহারা হয়ে পড়লেন। একটি দু'টি নয়, দশ বারোটি যুবতী সমবেত হলেন একে একে এসে। চলেও গেলেন। তাঁরা বিশ্বম্ভরবাবুর মেয়েদের বান্ধবী বোঝা গেল। পাড়ায় থাকেন। বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়িটা বিশাল, নানাসময়ে জোড়া-তোড়া দিয়ে তৈরি। সামনে অনেকখানি জমি, প্রকাণ্ড বাগান। কথাবার্ত্তা থেকে বোঝা গেল যে তাঁরা পুরন্দরবাবুর আগমন প্রত্যাশা করছিলেন এবং যুগলের বন্ধু হিসেবেই বিশেষ করে' সম্বর্দ্ধনা করলেন তাঁর। তিনি আসাতে সকলেই উল্লসিত হয়ে উঠল খুব।

পুরন্দরবাবু অভিজ্ঞ লোক। একটা জিনিস সন্দেহ হ'তে লাগল তাঁর। এই অত্যুচ্ছ্বসিত সম্বর্দ্ধনায়, মেয়েদের বেশবিন্যাসের পারিপাট্যে তাঁর মনে হতে লাগল যে যুগল বোধহয় আকারে ইঙ্গিতে এদের কাছে প্রকাশ করেছে যে তিনি এখনও বিয়ে করেন নি, তাঁর বিষয় সম্পত্তি আছে, বনেদি বংশের ছেলে তিনি, অজস্র সময় এবং সম্পত্তি নিয়ে কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না, সুতরাং এইবার বোধ হয় বিয়ে করে' 'সংসারী' হতে পারেন—বিশেষতঃ এত বড় মকোর্দ্দমাটা নির্ব্বিবাদে মিটে গিয়ে অতগুলো টাকা পেয়ে গেলেন যখন। বড় মেয়ে সুস্মিতা—যাকে যুগল 'খাসা মেয়ে' বলে' বর্ণনা করেছিল—তার আচরণে সন্দেহটা আরও বদ্ধমূল হতে লাগল পুরন্দরবাবুর মনে। তার শাড়ি ব্লাউস, চুল বাঁধবার ধরণ, সলজ্জ দৃষ্টি প্রভৃতি অন্যগুলির থেকে একটু স্বতন্ত্র বলে' ঠেকল তাঁর কাছে। তার বোনেদের এবং তাদের বান্ধবীদের ধরণ ধারণ থেকেও প্রতীয়মান হতে লাগল যেন সুস্মিতার দৌলতেই তারা পুরন্দরবাবুর সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেয়েছে—অর্থাৎ যেন তিনি সুস্মিতাকে "দেখতে এসেছেন" এবং এরা সবাই তা আগে থাকতে জানে। তাদের ব্যবহার এবং মাঝে মাঝে দু'একটা কথাও যা প্রকাশ করতে লাগল তার অন্য কোন মানে হয় না আর। সুস্মিতা মেয়েটি লম্বা, ফরসা। তন্বী নয়, দোহারা। মুখখানি ভারী মিষ্টি। বেশ শান্ত শিষ্ট ভদ্র। পুরন্দরবাবুর মনে হতে লাগল এরকম মেয়ের বিয়ে হয় নি কেন এখনও ? আশ্চর্য্য তো। পণের জন্যে আটকেছে সম্ভবত। এখনও দেখতে বেশ সুশ্রী আছে, কিন্তু এরপর দেখতে দেখতে মোটা হয়ে যাবে, তখন…"। বিশ্বম্ভরবাবুর অন্য মেয়েগুলিও দেখতে বেশ। তাদের বান্ধবীদের মধ্যেও অনেকে রূপসী ছিল। পুরন্দরবাবু সুস্মিতার দিকেই মনটাকে একাগ্র রাখতে পারলেন না। তাছাড়া বিশেষ একটা উদ্দেশ্য ছিল তাঁর।

পারুল—ষষ্ঠী ভগ্নীটি, যে স্কুলে পড়ে, যুগল পছন্দ করেছে যাকে—সে অনেকক্ষণ পরে এল। পুরন্দরবাবু যে কতটা আগ্রহভরে তার আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন তা আবিষ্কার করে' নিজেই বিস্মিত হলেন, ধিক্কারও

দিলেন নিজেকে তার জন্যে। কিন্তু আগ্রহটা কমল না। পারুলের আবির্ভাবে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল বেশ। পারুলের সঙ্গে এল কঙ্কনা—ছিপে ছিপে শ্যামবর্ণের মেয়েটি, তীক্ষ্ণ মুখশ্রী, চোখের দৃষ্টি চকমক করছে, বুদ্ধির দীপ্তি ফুটে বেরুচ্ছে মুখভাবে। তাকে দেখে যুগল একটু তটস্থ হয়ে পড়ল। কঙ্কনার বয়স বছর তেইশ হবে। তার ব্যঙ্গ করবার ক্ষমতা না কি অসাধারণ। স্কুলে মাষ্টারি করে, পাশের বাড়িতে থাকে। কিন্তু সে বিশ্বম্ভরবাবুদেরই বাড়িরই একজন হয়ে গিয়েছিল প্রায়। বাড়ির সব মেয়েরা 'কঙ্কনা দি' বলতে অজ্ঞান। পারুলের তো তাকে ছাড়া চলতই না। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরন্দরবাবু বুঝতে পারলেন যে একটি মেয়েও যুগলের উপর প্রসন্ন নয়; পাড়ার মেয়েরাও নয়। পারুলের ভাবভঙ্গী থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে সে যুগলকে ঘৃণা করে। পুরন্দরবাবু এও লক্ষ্য করলেন যে যুগল এ সম্বন্ধে নির্ব্বিকার। হয় সে ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না, কিম্বা বুঝতে চাইছে না।

সবগুলির মধ্যে পারুলই সব চেয়ে দেখতে ভাল। রং তত ফরসা নয় কিন্তু অপরূপ। একটা বন্যশ্রী তার সর্ব্বাঙ্গে যেন মূর্ত্ত হয়ে রয়েছে। এখনও পোষ মানে নি, মানবার কোন লক্ষণও নেই। উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে দুষ্টুমি মাখানো, মুখের হাসিতে ছোট্ট একটু মিষ্টি খোঁচ, চমৎকার ঠোঁট দুটি, চকচকে দাঁত, তন্বী দেহটি পেলব বন্যবল্লরীর মতো, মুখভাবে শিশুর সারল্যের সঙ্গে মিশেছে আসন্ন যৌবনের পূর্ব্বাভাষ। তার বয়স যে পনেরোর বেশী নয় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল তার প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি কথায়।

যুগলের উপহার দেওয়া ব্যাপারটা মোটেই জমল না, হাস্যকর হয়ে উঠল। একটু অপ্রীতিকরও। পারুল ঘরে ঢুকতেই দেঁতো হাসি হেসে যুগল এগিয়ে গেল এবং পকেট থেকে ব্রেসলেটের বাক্সটা বার করে বললে—"এর আগের দিন তোমার গান শুনে এত ভাল লেগেছিল যে তোমার জন্যে প্রাইজ এনেছি একটা—হেঁ—হেঁ।" আর বলতে পারল না, কথা আটকে গেল, অসহায়ভাবে বাক্সটা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। পারুল নেবার জন্যে হাত বাড়াল না দেখে জোর করে' তার হাতে গুঁজে দিতে গেল। রাগে লজ্জায় চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল পারুলের, সে হাত সরিয়ে নিয়ে মায়ের দিকে ফিরে বললে—আমি নেব না।

বিশ্বম্ভরবাবু গম্ভীরভাবে বললেন—"নাও না, তাতে কি হয়েছে, এনেছেন যখন তোমার জন্যে, নাও। নিয়ে ধন্যবাদ দাও।" কিন্তু তাঁর মুখ চোখ দেখে মনে হল তিনিও অসন্তুষ্ট হয়েছেন। যুগলের দিকে চেয়ে বললেন "কি দরকার ছিল এসবের—"

পারুল যখন দেখলে না নিয়ে উপায় নেই, তখন নিতেই হল তাকে। "ধন্যবাদ"টা কোনক্রমে উচ্চারণ করে' মুখ টিপে মায়ের পাশে গিয়ে বসল সে, নাকের ডগাটা কাঁপতে লাগল তার। তার এক বোন উঠে গেল কি দিয়েছে দেখবার জন্যে। বাক্সটা না খুলেই পারুল তাকে দিয়ে দিলে সেটা। যুগলকে দেখিয়ে দিলে যে তার দেওয়া উপহারকে গ্রাহ্যই করে না সে। ব্রেসলেট জোড়া হাতে হাতে ঘুরতে লাগল, কেউ বিশেষ কিছু মন্তব্য করলেন না, ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল কারো কারো চোখের দৃষ্টিতে। হেমাঙ্গিনী দেবীই কেবল মৃদুস্বরে প্রশংসা করলেন একটু। যুগল মরমে মরে গেল। পুরন্দরবাবুই আবহাওয়াটাকে স্বচ্ছ করে' তুললেন শেষে। কথা কইতে আরম্ভ করলেন, যা মনে এল তাই নিয়েই সুরু করলেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব ঠিক হয়ে গেল, সবাই মন দিয়ে তাঁর কথা শুনতে লাগল। ওস্তাদ আড্ডাধারী ছিলেন পুরন্দরবাবু এককালে, আড্ডা জমাবার কৌশল জানা ছিল তাঁর ভাল করেই। যা হোক কিছু একটা কায়দা করে' সুরু করলেই জমে যায়। কখনও সরসতা, কখনও সরলতা, কখনও পরচর্চ্চা, কখনও রাজনীতি, দুচার লাইন কবিতা, দুচারটে রসিকতা নানা মন্ত্র জানা ছিল তাঁর। কিন্তু এক্ষেত্রে নিজের অন্তর থেকেই একটা বিশেষ প্রেরণা পাচ্ছিলেন তিনি, অপরকে আকর্ষণ করবার শক্তি যে তাঁর আছে তা যেন সচেতন ভাবে অনুভব করছিলেন এবং তারই মাদকতায় উৎফুল্ল হয়ে উঠছিলেন ক্রমশ। এখনই যে সকলে তাঁর দিকেই ফিরে তাকাবে, সাগ্রহে তাঁর কথাই শুনবে, তাঁর সঙ্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গে আলাপ করবে না, তাঁর রসিকতাতেই হাসবে কেবল—এ বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সত্যিই বেশ জমে উঠল একটু পরে। আরও তিন চারজন যোগ দিলে গল্পগুজবে হাসি ঠাট্টায়। পরকে আপন করে' দলে টেনে নেবারও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল পুরন্দরবাবুর। হেমাঙ্গিনী দেবীর মুখ থেকেও ক্লান্তির ছায়া অপসারিত হয়ে হাসির আলো ফুটল। সুমিতার তো কথাই নেই, মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসে পুরন্দরবাবুর কথা শুনছিল সে। পারুল কিন্তু একটু সন্দেহের চক্ষে দেখছিল পুরন্দরবাবুকে, তার ভ্রূভঙ্গী থেকেই বোঝা যাচ্ছিল তা। এতে পুরন্দরবাবুর উৎসাহ আরও বেড়ে যাচ্ছিল যেন। কঙ্কনাও যোগ দিয়েছিল আলাপে, পুরন্দরবাবুকে ঠাট্টা করতেও ছাড়ে নি একটু। "যুগলবাবু বলছিলেন আপনি তাঁর বাল্যবন্ধু, তাহলে আপনার বয়সও তো নিতান্ত কম নয়! পঞ্চাশের উপর তো হবেই, নয়? অথচ আপনাকে কত কমবয়সী মনে হচ্ছে"—মাথা দুলিয়ে মিছে কথাটা বানিয়ে বলেছিল সে, কিন্তু তারও পুরন্দরবাবুকে ভালই লাগছিল। যুগল কিন্তু একেবারে মুষড়ে গিয়েছিল। পুরন্দরবাবুর ক্ষমতা অবশ্য জানা ছিল তার এবং এখানে তাঁর সাফল্যে সে উল্লসিতও হচ্ছিল প্রথম প্রথম, যোগ দেবারও চেষ্টা করছিল তাঁর রসিকতায়, কিন্তু পুরন্দরবাবুর স্বতোৎসারিত আবেগের কাছে দাঁড়াতে পারছিল না সে। ক্রমশ সে গম্ভীর হয়ে পড়ল। শেষে তার মুখ দেখে মনে হতে লাগল অত্যন্ত দমে গেছে বেচারা।

"আপনি তো ঘরের লোক হয়ে গেলেন, আপনার সঙ্গে আর ভদ্রতার ভান করবার দরকার নেই। আমার একটু কাজ আছে, উঠি এবার। ছুটির দিনেও নিস্তার নেই মশাই, মকোর্দ্দমার কাগজপত্তর জমে' আছে এক গাদা। আপনার সম্বন্ধে কি ভুল ধারণাই ছিল আমার—ভেবেছিলাম অহঙ্কারী গোমড়া-মুখো ছিটগ্রস্ত লোকটা—এখন দেখছি ঠিক উলটো। মানুষ কত ভুলই করে। আচ্ছা, চলি আমি"

বিশ্বম্ভরবাবু চলে গেলেন। ঘরের কোনে পিয়ানো ছিল একটা। পুরন্দরবাবু প্রশ্ন করলেন—"এ যন্ত্রটি বাজায় কে"

তারপর পারুলের দিকে হঠাৎ ফিরে বললেন—"তুমি নিশ্চয় গাইতে পার"

"কে বললে আপনাকে" ফোঁস করে' উঠল যেন পারুল।

"এক্ষুণি তো যুগলবাবু বললেন"

"ওটা মিছে কথা। আমার গানের গলা নেই।"

"আমারও গানের গলা নেই। তবু আমি গাই মাঝে মাঝে"

"আপনি গাইবেন? আমিও গাইব তাহলে"—হঠাৎ পারুলের চোখ দুটোতে আলো ঝলমল করে' উঠল—"কিন্তু এখন নয়, খাবার পরে। গান খুব ভালো লাগে না আমার, জানেন—দিন রাত প্যান প্যান—বিচ্ছিরি—পিয়ানোটার জ্বালায় অস্থির—দিদি তো সকাল নেই সন্ধে নেই টুংটাং করছেই। দিদির গান অবশ্য শোনবার মতো—"

পুরন্দরবাবু এ সূত্র ছাড়লেন না। সুমিতা সত্যিই রোজ পিয়ানো সাধে। পুরন্দরবাবু সুমিতাকে অনুরোধ করাতে সবাই পুলকিত হল—হেমাঙ্গিনী দেবী তো গদগদ হয়ে পড়লেন একেবারে। একটু মুচকি হেসে সুমিতা উঠে পিয়ানোর কাছে গেল। হঠাৎ ভয়ানক লজ্জা হল তার, চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল, নিজের কাছেই অপ্রতিভ হয়ে পড়ল সে এতে—চব্বিশ বছরের বুড়ো ধাড়ি মেয়ে সে, কচি খুকীর মতো একি অশোভন লজ্জা! তার এ অপ্রতিভ ভাবটাও ফুটে উঠল মুখে। কোনক্রমে আত্মসম্বরণ করে' টুলটার উপর বসে' পড়ল সে। দু'চারটে মামুলি গৎ মামুলিভাবেই বাজালে। ভারী লজ্জা করছিল তার। পুরন্দরবাবু কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন প্রশংসায়। গৎগুলোরই প্রশংসা করলেন বেশী, বাদিকার তত নয়। কিন্তু সুমিতা এত সূক্ষ্ম প্রভেদ ধরতে পারল না। সে হৃষ্ট হয়ে উঠল খুব এবং এমন তন্ময় হয়ে পুরন্দরবাবুর সঙ্গীতবিষয়ক আলোচনা শুনতে লাগল যে পুরন্দরবাবুও তার প্রতি একটু আকৃষ্ট না হয়ে পারলেন না। "বাঃ বেশ মেয়েটি তো"—ফুটে উঠল তাঁর দৃষ্টিতে এবং তা সবাই বুঝতেও পারল, বিশেষ করে' সুমিতা নিজে।

"আপনাদের বাগানটা তো চমৎকার" হঠাৎ জানলা দিয়ে চেয়ে পুরন্দরবাবু বললেন—"চলুন না বাগানেই যাওয়া যাক, ঘরের ভেতর কেন, এমন বাগান থাকতে"

"হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন" প্রায় সবাই বলে' উঠল সমস্বরে, যেন সকলের মনের কথাটা পুরন্দরবাবুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

সবাই বাগানে নেবে গেল এবং সন্ধ্যে পর্য্যন্ত রইল সেখানে। হেমাঙ্গিনী দেবীর যদিও একটু ঘুমিয়ে নেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পাছে পুরন্দরবাবু কিছু মনে করেন এই ভেবে তিনি আর ঘুমুতে গেলেন না। কিন্তু বাগানে নেবে হুড়োহুড়ি করতেও প্রবৃত্তি হল না তাঁর, তিনি বারান্দায় বেরিয়ে একটা চেয়ারে বসে' ঢুলতে লাগলেন। পুরন্দরবাবু বাগানে গিয়ে খুব জমিয়ে ফেললেন মেয়েদের সঙ্গে। কিছুক্ষণ পরেই পাড়ার আরও কয়েকটি ছোকরা এসে জুটল। একজন কলেজে পড়ে, আর একজন ম্যাট্রিকের গণ্ডী পেরোয় নি। তাদের দেখে তাদের বান্ধবীরা অভ্যর্থনা করে' নিলে। নীল চশমা-পরা উস্কো-খুস্কো চুল তৃতীয় আর একটি ছোকরা এল। সে এসেই পারুল আর কঙ্কনাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে চেয়ে ভুরু কুঁচকে ফুসফুস গুজগুজ করতে লাগল। বোঝা গেল পুরন্দরবাবুর অভ্যাগমে অসন্তুষ্ট হয়েছে সে এবং বাগে পেলে তাঁকে এক হাত দেখিয়ে দিতেও ছাড়বে না।

"আসুন কিছু খেলা যাক"—অনেকগুলি মেয়ে বললে।

"কি খেলবে? কি তোমরা খেল রোজ?"

"সব রকম। লুকোচুরি, কানামাছি, ব্যাডমিন্টন। সন্ধ্যের সময় কিন্তু আমরা নতুন খেলা খেলি একটা—কিম্বদন্তী"

"সে আবার কি"

"আমরা সবাই মিলে বসব একটা ঘরে। একজন বাইরে চলে যাবে। তারপর আমরা একটা কিম্বদন্তী ঠিক করব—এই যেমন ধরুন 'অতি দর্পে হতা লঙ্কা'! তারপর যে বাইরে চলে গেছে তাকে ডাকা হবে। আর আমরা তাকে এক একটা বাক্য বলব। একজন মনে করুন বললে 'অতিশয় লোভ ভাল নয়' এর মধ্যে 'অতি' কথাটা আছে, আর একজন বললে 'দর্পনারায়ণ ঠাকুর বড়লোক ছিলেন, এর মধ্যে দর্প 'কাথাটা আছে। সকলের কথা শুনে তাকে কিম্বদন্তীটা বার করতে হবে"

"বাঃ বেশ মজার তো" পুরন্দরবাবু বললেন।

"না, মোটেই মজার নয়। খানিকক্ষণ পরে বিরক্ত ধরে' যায়" বলে' উঠল দু'তিনজন।

"কিম্বা আমরা থিয়েটার থিয়েটার খেলি অনেক সময়'—পারুল বললে—"ওই যে বড় বটগাছটা দেখছেন—যার সামনে চৌতারা আছে একটা—ওইখানে। বটগাছের পেছনটা আমাদের গ্রীনরুম। ওইখানে কেউ রাজা, কেউ রাণী, কেউ মন্ত্রী সেজে বসে থাকি। যার যা খুশী। তারপর গ্রীনরুম থেকে যখন যার খুশী বেরিয়ে এসে যা মনে আসে বলে যেতে হয়। আর সবাই বসে শোনে—"

"এটাও তো বেশ" পুরন্দরবাবু বললেন।

"যত বেশ ভাবছেন তত নয়" পারুলই প্রতিবাদ করলে ঠোঁট উলটে—"ভারী বিরক্তিকর হয়ে যায় মাঝে মাঝে। কেউ কিছু বলতে পারে না ভাল করে'। তবে আপনি যদি নাবেন হয় তো ভাল হবে। জানেন, আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম সত্যিই বুঝি আপনি যুগলবাবুর বন্ধু। এখন দেখছি সেটা বাজে কথা। বানিয়ে গল্প করেছিলেন ভদ্রলোক"

"আমার ওপর রাগ নেই তাহলে তো আর"

"আমার তো খুব ভাল লাগছে"—মুচকি হেসে ছুটে চলে গেল পারুল কঙ্কনার কাছে।

অপরিচিতা একটি মেয়ে এগিয়ে এসে পুরন্দরবাবুর কাণে কাণে বললে "আজ সন্ধেবেলা আমরা 'কিম্বদন্তী' খেলব। যুগলবাবুকে জব্দ করতে হবে, আপনি আমাদের দিকে, বুঝলেন"

আর একটি মেয়েকেও ইতিপূর্ব্বে ভাল করে' লক্ষ্য করেন নি পুরন্দরবাবু। কটা চুল, কটা চোখ, মুখে ব্রণের দাগ—এগিয়ে এসে আলাপ করলে পুরন্দরবাবুর সঙ্গে। ধপধপে ফরসা রং—মুখ লাল হয়ে উঠেছে রোদের তাতে। একমুখ হেসে বললে—"আপনি এসেছেন, বেশ হয়েছে। সময়টা কাটবে ভাল। এমন একঘেয়ে লাগে রোজ"

যুগল পালিতের অবস্থা ক্রমশই খারাপ হচ্ছিল। খানিকক্ষণ পরেই পুরন্দরবাবুর সঙ্গে পারুলের ভাব হয়ে গেল বেশ। তার চোখে আর সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রইল না। সে স্বচ্ছন্দে হাসছিল, লাফাচ্ছিল, চীৎকার করছিল, পুরন্দরবাবুর হাত ধরে টেনেও ছিল বার দুই, আনন্দ উথলে পড়ছিল যেন তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে। যুগলকে কিন্তু সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছিল না, তার ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছিল যেন যুগলের অস্তিত্বকেই সে স্বীকার করছে না। যুগল যেন নেই। পুরন্দরবাবু বেশ বুঝতে পারলেন যে সবাই মিলে যুগলের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে একটা। পারুল এবং আরও কয়েকটি মেয়ে পুরন্দরবাবুকে টেনে নিয়ে একদিকে চলে গেল, আর একদল মেয়ে যুগল পালিতকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গেল ঠিক বিপরীত দিকে। কিন্তু যুগল হঠাৎ ছটকে বেরিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে এল পারুলরা যেখানে ছিল এবং এসেই পারুল ও পুরন্দরবাবুর মাঝখানে নিজের টেকো মাথাটা হঠাৎ গুঁজে দিয়ে একটা অস্বস্তির হাসি হাসতে লাগল হাঁপাতে হাঁপাতে। আদব-কায়দা শোভনতা-অশোভনতা কোন কিছুরই তোয়াক্কা করছিল না আর সে যেন। সমস্ত আবরণ উড়িয়ে দিয়ে নিজের মনোভাবটা স্পষ্ট করবার চেষ্টা করছিল কেবল প্রাণপণে। পুরন্দরবাবু পারুলকে ছেড়ে সুমিতার দিকে যদি একটু মন দেন তাহলে বেচারা বেঁচে যায় যেন। সুমিতাকে একবার লেলিয়ে দেবারও চেষ্টা করলে সে। হাত মুখ নেড়ে একটু ধমকের সুরেই সুমিতাকে বললে—

"আপনি সরে' সরে' বেড়াচ্ছেন কেন, আলাপ করুন না পুরন্দরবাবুর সঙ্গে"

সুমিতা হাসিমুখে এগিয়ে এল একটু। পুরন্দরবাবু যে তাকে দেখতে আসেন নি একথা সে এতক্ষণে বুঝেছিল, তার সঙ্গর চেয়ে পারুলের সঙ্গই যে বেশী পছন্দ করছেন তিনি—এ-ও অস্পষ্ট ছিল না তার কাছে, তবু হাসিমুখে এগিয়ে গেল একটু সে। পুরন্দরবাবুর কথাবার্ত্তা সম্পূর্ণরূপে বোঝাবার মতো বুদ্ধি ছিল না তার, তবু সে শুনে যাচ্ছিল মুখের হাসিটুকু বজায় রেখে। তার মনে যে কোন দুঃখ হয়েছে তা তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল না। সকলের আনন্দের মাঝখানে সে যে থাকতে পেয়েছে এতেই যেন সে চরিতার্থ।

"তোমার দিদি ভারী চমৎকার লোক, নয়?" পুরন্দরবাবু পারুলকে বললে চুপি চুপি।

"কে দিদি? নিশ্চয়! দিদির মতো মেয়ে আছে! এতো ভালো লাগে দিদিকে" সোচ্ছ্বাসে বলে উঠল পারুল।

বিশ্বম্ভর-গৃহিণী আহারের আয়োজন করেছিলেন সাহেবী-কায়দায়।

বেশ বোঝা গেল যে তাঁদেরই জন্যে বিশেষ আয়োজন এটা। খাওয়ার পর বৈঠকখানায় গিয়ে জমায়েত হলেন সবাই।

আহারান্তে বিশ্বম্ভরবাবু বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছিলেন। পুরন্দরবাবুর আলাপ খুব উপভোগ করতে লাগলেন তিনি, তাঁর প্রতি কথায় হাসতে লাগলেন। পুরন্দরবাবুরও প্রাণে যেন জোয়ার এসেছিল। অনুপ্রাসে, অলঙ্কারে, কবিতায়, রসিকতায় মাতিয়ে তুললেন তিনি সবাইকে। যুগল পালিতের আর সহ্য হল না। সে-ও রবি ঠাকুরের দু' লাইন কবিতা আওড়ে দিলে…মেয়ের দল কলস্বরে হেসে উঠল, কারণ কবিতাটা একটু বেমানান হয়ে গেল। "ও মা, যুগলবাবুও কবিতা জানেন তাহলে" বলে' উঠল একজন।

বিশ্বম্ভরবাবু ঘাড় ফিরিয়ে হাসিমুখে চাইলেন যুগলের দিকে।

"কি কবিতা—"

তাঁর চতুর্থী কন্যা একমুখ হেসে বললে—"উনি বললেন; আজি রজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসবদত্তা?"

"বাসবদত্তা? ও, তার মানে—ও"

কঙ্কনা বললে—"রবি ঠাকুরের 'অভিসার' কবিতাটা—"

"অভিসার? ও"

বিশ্বম্ভর ভ্রূকুঞ্চিত করলেন একটু।

কঙ্কনা নিম্নকণ্ঠে যুগলকে বললে—"আপনার বরং বলা উচিত ছিল 'নগরীর দীপ নিবেছে পবনে, দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে'—ও কি আপনার চোখে কিছু পড়ল না কি"

যুগল চোখ কচলাচ্ছিল।

বিশ্বম্ভরবাবু শঙ্কিত হয়ে পড়লেন—"কি হল চোখে"

"চোখের নীচের পাতাটা ওপরের পাতার তলায় ঢুকিয়ে দিন"

"হাঁচুন, হাঁচুন"

"ঘাড়ে থাপ্পড় মারুন"

নানা উপদেশ বর্ষিত হতে লাগল।

"খেয়ে এখন ঘুমুবেন না কি! চলুন বাগানে যাওয়া যাক"—একজন বলে' উঠল।

"আমার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে"—বিশ্বম্ভরবাবু হাই তুললেন।

"আপনি শুয়ে পড়ুন গিয়ে। আমরা এখন হল্লোড় করব, আপনি কতক্ষণ থাকবেন। আপনি শুয়ে পড়ুন"

"ও, আচ্ছা।"

"চল, তোমার মশারীটা ফেলে দিই গে"

স-গৃহিণী বিশ্বম্ভরবাবু ওপরে চলে যেতেই বাগানে নেবে পড়ল আবার সবাই।

যুগল হঠাৎ পুরন্দরবাবুর কাছে গিয়ে চুপি চুপি বললে, "শুনুন একবার"

একটু দূরে সরে' গিয়ে সে বলে উঠল' "না, দেখুন, মাপ করবেন, এবার আমি কিছুতেই, এবার আমি কিছুতেই—মানে"

"মানে, কি?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন পুরন্দরবাবু।

যুগল আর কিছু বলতে পারলে না—ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল শুধু—জোর করে' হাসবার চেষ্টা করতে লাগল সে।

"কোথা—কোথা গেলেন আপনারা—আমরা সব 'রেডি'"

মেয়েদের কলকণ্ঠ শোনা গেল দূরে। পুরন্দরবাবু স্কন্ধদ্বয় উত্তোলন করে' 'শ্রাগ্' করলেন, তারপর মেয়েদের দিকে ফিরে গেলেন। যুগলও ছুটতে লাগল পিছু পিছু।

"নিশ্চয় রুমাল চাইছিলেন আপনার কাছে" কঙ্কনা বললে পুরন্দর-বাবুকে—

"গতবার রুমাল আনতে ভুলেছিলেন"

"প্রতিবারই ভুলবেন উনি" টিপ্পনি কাটলে পারুলের সেজদিদি।

"মা যুগলবাবু এবারও রুমাল ফেলে এসেছেন, মা যুগলবাবু রুমাল ফেলে এসেছেন" চীৎকার করে' উঠল একসঙ্গে সবাই।

হেমাঙ্গিনী দেবী দ্বিতলের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন—"ও, আচ্ছা, পাঠিয়ে দিচ্ছি" ভিতরে ঢুকে গেলেন তিনি।

"না, না আমার দুটো রুমাল আছে," চীৎকার করে' উঠল যুগল।

কিন্তু সে কথা হেমাঙ্গিনী দেবী শুনতে পেলেন না, একটু পরেই একটা চাকর একটা রুমাল নিয়ে ছুটতে ছুটতে নেবে এল। হো হো করে' হেসে উঠল সবাই।

"এবার কিন্তু কিম্বদন্তী খেলব আমরা" মেয়েরা সবাই বলে উঠল। একটা জায়গা ঠিক করে' বসে' পড়ল সবাই। কঙ্কনা প্রথমে যাবে ঠিক হল। কঙ্কনা দল ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেল, যেন কিছু শুনতে না পায়। একটা 'কিম্বদন্তী বাছা হল, কিম্বদন্তীর কোন কোন কথা দিয়ে কে কে বাক্য তৈরি করবে তা ঠিক হল, তারপর ডাকা হল কঙ্কনাকে। কঙ্কনা ঠিক ধরে' ফেললে কিন্তু। প্রবাদটা ছিল—যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই।

এর পর নীল-চশমা-পরা উসকো খুসকো চুল সেই ছোকরাটির পালা। এর সম্বন্ধে সবাই আরও সাবধান হ'ল—একে আরও দূরে ওই বটগাছটার কাছে গিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হল। ছোকরা চটল খুব, কিন্তু যেতেই হল তাকে। ফিরে এসে 'কিম্বদন্তী'টাও সে ধরতে পারলে না। প্রত্যেকের জন্য দু'বার দু'বার শুনলে তবু পারলে না। লজ্জিত হয়ে পড়ল বেচারা। প্রবাদটা ছিল—অতি বড় হ'য়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে, অতি ছোট হ'য়ো না ছাগলেতে খাবে।

"বাজে সব" বলে উঠল ছোকরা।

এর পর গেলেন পুরন্দরবাবু, তাঁকে আরও দূরে পাঠানো হ'ল, তিনিও হেরে গেলেন।

"বড্ড একঘেয়ে লাগছে" বললে কেউ কেউ।

"আচ্ছা এবার আমি সঙ্গে যাই" পারুল বললে।

"না, যুগলবাবু যাবেন এবার, এবার যুগলবাবুর পালা" সকলে চীৎকার করে' উঠল একযোগে।

ক্রমশঃ

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

ব্রিটিশ বাজেট

গত ৮ই এপ্রিল অর্থসচিব ডাঃ ডালটন কমন্সসভায় ১৯৪৬-৪৭ সালের ব্রিটিশ বাজেট উপস্থাপিত করেন। ব্রিটেন যুদ্ধের চাপে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছে, বাণিজ্যজীবী ব্রিটেনের ভোগ্যপণ্যের কারখানাসমূহ সমরপণ্য উৎপাদনের কারখানায় রূপান্তরিত হইয়াছে, প্রাত্যহিক নানা প্রয়োজনের জন্য ব্রিটেন এখন পরমুখাপেক্ষী। গত কয়েকবৎসর ধরিয়া বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক ও অন্তর্দ্দেশীয় ঋণ-সংগ্রহ করা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে যুদ্ধের খরচ মিটানো সম্ভব হয় নাই। ১৯৪৫-৪৬ সালেও ব্রিটিশ সরকারের ঘাটতি হইয়াছে ২২০ কোটি পাউণ্ড। বলা বাহুল্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সাম্রাজ্যিক দেশগুলির নিকট পর্ব্বতপ্রমাণ ঋণ, অন্তর্দ্দেশীয় সাধারণ ঋণ এবং যুদ্ধকালে সংগৃহীত করের প্রত্যর্পণযোগ্য অংশ ফিরাইয়া দিবার দায়িত্ব—এইরূপ নানাপ্রকার আর্থিক দায়িত্বের চাপে ভগ্নপ্রায় ব্রিটিশ অর্থনীতির পক্ষে ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট অবশ্যই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ অর্থসচিব ডাঃ ডালটন বাজেট রচনায় যে ধৈর্য্য ও জনস্বার্থসংরক্ষণমূলক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই আশাপ্রদ।

সাধারণতঃ অনেকে ডাঃ ডালটনকে রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদ মনে করিয়া থাকেন। আলোচ্য বাজেটেও ক্রয়কর এবং পণ্য উৎপাদন ও বণ্টন ব্যাপারে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখিয়া যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিকে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির অনুরূপ মর্য্যাদা দিবার যে চেষ্টা তিনি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সেই রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় মিলিয়াছে। কিন্তু এই বাজেটে অর্থসচিবের যে আশাবাদী মনোভাবের ছাপ রহিয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ভারতসরকারের অর্থসদস্য স্যার আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস যখন ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে অতিরিক্ত মুনাফাকর তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, তখন ডাঃ ডালটন এই সম্বন্ধে একরূপ বিরুদ্ধ মন্তব্যই করিয়াছিলেন। তাহার পর সত্যই কেহ আশা করেন নাই যে, তাহার নিজের বাজেটেও ব্রিটিশ অর্থসদস্য অতিরিক্ত মুনাফা-কর বাতিলের ব্যবস্থা করিতে সাহস করিবেন। ব্রিটিশ সরকারের ব্রিটিশ জনসাধারণের নিকট হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ৬৫০ কোটি পাউণ্ড। ইহার উপর বিদেশী দেনা আছে, তাছাড়া এবারের বাজেটেও প্রায় ৭০ কোটি পাউণ্ড ঘাটতি হইয়াছে। এ অবস্থায় অর্থ-সচিবের অতিরিক্ত মুনাফাকর তুলিয়া দিবার এই সংকল্পে অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন। তবে অতিরিক্ত মুনাফাকর একান্তভাবে যুদ্ধকালীন কর বলিয়া ডাঃ ডালটন ইহা যুদ্ধোত্তর বাজেটে বাতিল করিলেও ন্যাশনাল

ডিফেন্স কনট্রিবিউশন এবং ক্রয়কর চালু থাকায় ঘাটতির বাহুল্যে ব্রিটিশ সরকারী অর্থনীতি একেবারে বানচাল হইয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অবশ্য ক্রয়করকে যুদ্ধকালীন সামরিক কর হিসাবে মানিয়া লইতে ডাঃ ডালটন যে অস্বীকৃতি দেখাইয়াছেন, তাঁহার সেই মনোভাবের বিরুদ্ধ সমালোচনা অপ্রাসঙ্গিক নহে বলিয়া আমরাও স্বীকার করি।

অতিরিক্ত মুনাফা-কর বাতিল করা ছাড়া ব্রিটিশ অর্থসচিব তাঁহার বাজেটে উত্তরাধিকার করের হার হ্রাস করিয়া এবং ক্রয়কর ও আমোদ-করের হারে সুবিধা করিয়া দিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত ব্রিটেনের ১ শত পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তির উপরই উত্তরাধিকার কর লাগিতেছিল, ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে ডাঃ ডালটন ঘোষণা করিয়াছেন যে, অতঃপর ১ শত পাউণ্ড হইতে ২ হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত মূল্যের কোন সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার কর লাগিবে না। ২ হাজার পাউণ্ড হইতে ৭ হাজার ৫ শত পাউণ্ড পর্য্যন্ত মূল্যের সম্পত্তির উপর এই করের হার কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে কর বাতিল ও হ্রাস দ্বারা গ্রেট ব্রিটেনের প্রায় ২ লক্ষ সম্পত্তি উপকৃত হইবে বলিয়া মনে হয়। ৭ হাজার ৫ শত পাউণ্ড হইতে ১২ হাজার ৫ শত পাউণ্ড পর্য্যন্ত মূল্যের সম্পত্তির উপর চলতি হারে কর নির্দ্ধারিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে এবং ইহার উর্দ্ধমূল্যের সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার করের হার সামান্য বাড়ানো হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ১২ হাজার ৫ শত পাউণ্ডের বেশী দামের সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার করের হারবৃদ্ধি ধনীসমাজকে স্পর্শ করিবে বলিয়া এ সম্বন্ধে জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ না হইয়া সন্তুষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক।

আলোচ্য বৎসরে গত বৎসরের হিসাবে ব্রিটিশ সরকারের আয় হইবার কথা ৩০৯ কোটি পাউণ্ড, কিন্তু অর্থসদস্য নানাভাবে কর বাতিল করায় এবং করের হারহ্রাস করায় এই আয় ৩ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা আছে। এবারের বাজেটে ঘাটতি ধরা হইয়াছে ৬৯ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪৪-৪৫ এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে ব্রিটিশ সরকারের ব্যয়ের তুলনায় আয় হইয়াছিল যথাক্রমে শতকরা ৬০ ভাগ ও ৫৩ ভাগ, এবার নানাপ্রকার কর বাতিল ও হ্রাস করা সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য সামরিক ব্যয় সঙ্কোচ হইতেছে বলিয়া ব্যয়ের তুলনায় আয় শতকরা ৮২ ভাগ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। অবশ্য নিঃস্ব ও ঋণগ্রস্ত ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধোত্তর বাজেটে ভারসাম্য সংরক্ষিত হইলেই ভাল হইত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখনও যুদ্ধকালীন আবহাওয়া অনেকটা বজায় আছে বলিয়া এবং যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিকে শান্তিকালীন পরিস্থিতিতে রূপান্তরিত করিবার নানা সমস্যা বর্ত্তমান বলিয়া ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে ভারসাম্য আশা করা যায় না। তাছাড়া ব্রিটিশ অর্থসচিব অতিরিক্ত মুনাফা-কর বাতিল করিয়া যেমন ধনীদের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তেমনি উত্তরাধিকার কর বাতিল ও হ্রাস করিয়া মধ্যবিত্ত দেশবাসীকেও সন্তুষ্ট করিয়াছেন। জনসাধারণের সন্তোষ বিধানের চেষ্টা না থাকিলে ১৯৪৬-৪৭ সালের ব্রিটিশ বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ অবশ্যই অনেক কমিয়া যাইত। ব্রিটেন বাণিজ্যনীতির দেশ, ডাঃ ডালটন ব্রিটেনের যুদ্ধোত্তর শিল্পবাণিজ্য সম্প্রসারণের উপর স্বভাবতঃ জোর দিয়াছেনই, অধিকন্তু ধনীদের ইহাতে অংশগ্রহণেরই সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এই প্রয়াস ব্রিটেনের সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থান বজায় রাখিতে এবং দেশবাসীর আয়বৃদ্ধির ফলে সরকারের আয়বৃদ্ধিতে প্রভূত সাহায্য করিবে বলিয়াই আশা করা যায়। অবশ্য ব্রিটিশ জনসাধারণ এখনো করভারে বিপন্ন, তবে এবারের বাজেটে দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ পুনর্গঠনের যে আগ্রহ ডাঃ ডালটন দেখাইয়াছেন, তাহাতে আশা করা যায় দেশবাসীর সেই অসুবিধাভোগ দেশের কল্যাণের বিবেচনায় ব্যর্থ যাইবে না। শিল্পজীবী ব্রিটেন ভারতবর্ষ নয়, এখানে অর্থসদস্য এবারের বাজেটে সামান্য লবণকর রদ করিলেই অধিকাংশ দেশবাসী মহা উপকৃত হইত, ব্রিটেনে সরকার দেশের অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী বলিয়া করভার দেশবাসীকে অসুবিধাগ্রস্ত করিলেও ক্ষুণ্ণ করে না এবং মোটের উপর কর্ম্মসংস্থান সার্ব্বজনীন হওয়ায় ও অর্থের অন্তর্দ্দেশীয় প্রচলনগতি অব্যাহত থাকায় দেশবাসীর দিক হইতে করজনিত অসুবিধা এমন কিছু মারাত্মকও বিবেচিত হইবে না।

ভারতের জনসংখ্যা ও খাদ্যপরিস্থিতি

ভারতবর্ষ শিল্পজীবী দেশ নয়। সম্ভাবনা প্রচুর থাকিলেও এ পর্য্যন্ত এখানে অতি নগণ্য শিল্পপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। উন্নতধরণের পরিকল্পনা রচিত না হইলে এবং সেই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার আন্তরিকতা না থাকিলে খুব শীঘ্র ভারতে যে আশানুরূপ শিল্পাদি সম্প্রসারিত হইবে এমন ভরসাও করা যায় না।

মোটের উপর, অবস্থা যেরূপ তাহাতে ভারতকে এখনো দীর্ঘকাল কৃষিক্ষেত্রের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয়, ভারতবর্ষ কৃষিজীবী দেশ হইলেও এদেশে যে শস্য উৎপন্ন হয় তাহাতে এদেশবাসীর চলে না। ভারতের লোকসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, অথচ কৃষিব্যবস্থার কোন উন্নতি সাধিত হইতেছে না বলিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তি সাধারণ নিয়মে ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া এদেশের খাদ্যসমস্যা অধিকতর জটিল করিয়া তুলিতেছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, ভারতের ন্যায় সমৃদ্ধ ভূমিভাগে খাদ্যের এই অস্বচ্ছলতা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

ভারতে লোকসংখ্যা সত্যই মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯২১ সালের তুলনায় ভারতবাসীর সংখ্যা ১৯৪১ সালে ৮ কোটি ৩০ লক্ষ বাড়িয়াছে। বৎসরে গড়ে এই ৫০ লক্ষ হিসাবে লোক বৃদ্ধি হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাইবে, এমন কিছু অনুমান করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। যদিও সম্প্রতি জন্মহার বিগত শতাব্দীর শেষদিকের তুলনায় কিছু কমিয়াছে, মৃত্যুহার এমনভাবে কমিয়াছে যাহাতে ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধক সৃষ্ট হয় নাই। ১৮৮১-৯১ সালের মধ্যে ভারতে জন্মহার ও মৃত্যুহার ছিল যথাক্রমে ৪৯ এবং ৪১, ১৯৩১-৪১ সাল—এই দশ বৎসরের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুহার যথাক্রমে ৪৫ ও ৩১ হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া স্যার জোসেফ ভোরের নেতৃত্বে ভোর কমিটি যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা এই অবিরাম লোকবৃদ্ধিকে জনস্বাস্থ্যহানিঃ

অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারণ বলিয়াছেন। যে দেশে চূড়ান্ত আর্থিক দুর্দ্দশা বিদ্যমান এবং যে দেশের উৎপন্ন খাদ্যে দেশবাসীর স্বাভাবিক প্রয়োজন মিটে না, সেখানে লোকবৃদ্ধি বন্ধ করিতে না পারিলে জনস্বাস্থ্যের ক্রম অবনতি রোধ করা যাইবে না বলিয়া জোর কমিটি মত প্রকাশ করিয়াছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, মানুষ রক্তমাংসের জীব, আধ্যাত্মিক কোন আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তাহার জৈবপ্রবৃত্তি নিষ্ক্রিয় করিয়া তোলা স্বাভাবিকতো নয়ই, বোধ হয় সম্ভবও নয়। এই জন্যই জন্মহার বৃদ্ধি নিরোধমূলক নানা ব্যবস্থা বিভিন্ন সভ্যদেশে প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় সাধারণতঃ ১৫ হইতে ১৯ বৎসরের মধ্যে মেয়েদের সন্তান উৎপাদনের হার সবচেয়ে বেশী, এদেশে মেয়েদের বিবাহের বয়স বাধ্যতামূলকভাবে নিম্নপক্ষে ১৮ বৎসর করিলে শুধু অকারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি তথা দরিদ্রবৃদ্ধি বন্ধ হয় না, সঙ্গে সঙ্গে নানা মানসিক বিকাশের সুযোগ পাইয়া বর্ত্তমান সমস্যাসংক্ষুব্ধ যুগে মেয়েরা সংগ্রামের জন্য আত্মপ্রস্তুতির সুযোগ পায়। বাস্তবিক ভারতবর্ষের আর্থিক সম্ভাবনা প্রচুর, আর্থিক পুনর্গঠন পরিকল্পনার সাফল্যের সম্ভাবনাও যথেষ্ট, কিন্তু যেদেশে মানুষের বর্ত্তমান মাথাপিছু বার্ষিক আয় মাত্র ৬৫ টাকা (ইংলণ্ড ৯৮০ টাকা, আমেরিকা ১৪০৬ টাকা), সেখানে বর্ত্তমান জনমণ্ডলীর অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যসৃষ্টি করিতে হইলে ভয়াবহ সংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করা সত্যই একান্ত প্রয়োজন।

অবশ্য শুধু লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণই সমস্যার সমাধান নয়। খাদ্যের দিক হইতে এদেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থাও অবশ্যই করিতে হইবে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে কম পক্ষে ৬ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হয়, লোকসংখ্যা এখনকার হারে বৃদ্ধি পাইলে দশবৎসরের মধ্যে বর্ত্তমান হিসাবেই ভারতের প্রয়োজন হইবে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য। এদিকে বর্ত্তমানে ভারতে গড়ে মাত্র ৫ কোটি ৮০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। তাছাড়া ভারতবাসীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে এখনকার তুলনায় আরও বেশী খাদ্যের প্রয়োজন হইবে। জাপান যুদ্ধে হারিয়া এখন চরম খাদ্যসঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে, তবু এখনো প্রত্যেক জাপানী ২২৬০ ক্যালোরী যুক্ত খাদ্য পাইতেছে, অথচ ভারতবাসী গড়ে পাইতেছে মাত্র ৯৬০ ক্যালোরী যুক্ত খাদ্য। সাধারণ সময়েও তাহাদের ভাগ্যে ১২০০ ক্যালোরীর বেশী খাদ্য জুটিত না। এই হিসাবে ভারতে দশবৎসর পরে সর্ব্বসমেত নিম্নপক্ষে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ টন খাদ্য লাগিবার কথা। দেশের ভিতর হইতে এই খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইলে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানই যে একমাত্র উপায়, তাহা বলাই বাহুল্য।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির হিসাবে প্রকাশ, একমাত্র ব্রিটিশ ভারতেই প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ একর অনাবাদী জমি পড়িয়া আছে। এই জমিতে চাষের ব্যবস্থা করিলে খাদ্যশস্যের অবস্থা অবশ্যই ভাল হইবে। তাছাড়া যে উপায়ে ইটালী, জাপান, ক্যানাডা প্রভৃতি কৃষিপ্রধান দেশ শস্য উৎপাদন বাড়াইয়াছে, ভারতের কৃষিকর্ম্মেও সেই সব বৈজ্ঞানিক উপায় কাজে লাগানো একান্ত আবশ্যক। উৎকৃষ্ট বীজ ও সার ব্যবহৃত হইলে এবং জলসেচের সুবন্দোবস্ত হইলে ভারতের গড়পড়তা শস্যউৎপাদন অবশ্যই বেশী হইবে। বাস্তবিক কৃষিজীবী দেশ হইলেও কৃষিকর্ম্মের দিক হইতে ভারতবর্ষ এখনো লজ্জাকরভাবে পিছনে পড়িয়া আছে। জাপানী চাষীরা ভারতের চাষের জমির এক দশমাংশ মাত্র চাষ করিয়া এক তৃতীয়াংশ ফসল ঘরে তোলে। এই সামান্য জমিতেই তাহারা এ্যামোনিয়াম সালফেট, ফসফারিক এসিড প্রভৃতি রাসায়নিক সার ব্যবহার করে গড়ে বৎসরে ৪ লক্ষ টন। ভারতবর্ষে জমির আয়তন বিপুল হইলেও কৃষিকর্ম্ম চলে সনাতন পদ্ধতিতে, এই বিরাট জমিতে ভারতীয় চাষীরা বৎসরে মাত্র ৮০ হাজার টন রাসয়নিক সার ব্যবহার করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ভারতসরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ শুধু বাহাড়ম্বর না করিয়া ভারতীয় কৃষিকে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত করিবার দায়িত্ব যদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ভারতে খাদ্যের অস্বচ্ছলতা কোনকালেই হইবে না বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

অবশ্য বর্ত্তমান ভারতসরকার এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহ তাঁহাদের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাগুলিতে কৃষির উন্নতি সংক্রান্ত নানা ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু জনস্বার্থরক্ষায় এদেশের আমলাতান্ত্রিক শাসক সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্য এত প্রত্যক্ষ যে, তাঁহাদের উপর ভরসা করিতে আমাদের স্বতঃই সঙ্কোচ হয়। ১৯৪৩ সালের মহামন্বন্তরে কর্ত্তৃপক্ষের গাফেলতীর জন্য ৩০।৩৫ লক্ষ লোক অনাহারে মৃত্যুবরণ করিয়াছে, খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টনে তাহাদের অপদার্থতার জন্যই আবার আসন্ন দুর্ভিক্ষে এক কোটি ভারতবাসীর জীবন বিপন্ন হইতে চলিয়াছে। যাহাদের পরিচালনা ত্রুটিতে ভারতের ন্যায় সমৃদ্ধ দেশেও ৪ বৎসরের মধ্যে দুবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে, সেই শাসকসম্প্রদায়ের উপর আত্মরক্ষার জন্য একান্তভাবে নির্ভর করিবার ফল অনিশ্চিত নহে কি?

ভারতবর্ষে শীঘ্রই জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই জাতীয় সরকারের আমলে ভারতের কৃষিব্যবস্থা উন্নতিলাভ করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সুখের বিষয় আগামী দিনের কথা চিন্তা করিয়া জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির (National Planning Committee) খাদ্যসম্পর্কিত সাব কমিটি ভারতের খাদ্যঘাটতি পূরণ করিতে একটি ব্যাপক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। এই সাব কমিটি স্পষ্টই মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হইলে এদেশে বাহির হইতে খাদ্য আমদানীর কোন প্রয়োজন নাই। কমিটি আশা করিয়াছেন যে, তাঁহাদের পরামর্শে ও গভর্ণমেণ্টের অর্থানুকূল্যে কৃষি, মৎস্যচাষ এবং পশু-খাদ্য উৎপাদন ব্যাবস্থায় যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইলে পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারতে আড়াই হইতে তিন কোটি টন বাড়তি খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইতে পারে। পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য কমিটি গভর্ণমেণ্টকে এই উদ্দেশ্যে ১০ বৎসরে পরিশোধিতব্য ৫০ কোটি টাকা ঋণসংগ্রহের পরামর্শ দিয়াছেন। পরিকল্পনাটিতে ১৫টি ধারা আছে ও ইহার মধ্যে জমিদার শ্রেণীর পরিশ্রমজীবীদের উচ্ছেদ, অনাবাদী জমিতে চাষ, টুকরো জমি একত্রীকরণ, চাষে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য, উপস্থিত কিছু হউক বা না হউক, অদূর ভবিষ্যতে ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে জাতীয় কমিটির এই পরিকল্পনার যথার্থ মূল্য স্বীকৃত হইবে বলিয়া এই পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ায় ভারতবাসী মাত্রেরই আশান্বিত হইবার সঙ্গত কারণ আছে। ৩।৫।৪৬

মানুষজাতি

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

বর্ত্তমানের ভাষায় আমরা মানুষ মানুষই, অন্য কিছু নহি। কিন্তু পৌরাণিক যুগে মানবশাস্ত্র আমাদের অনেককেই মানুষ বলিয়া স্বীকার করিত না। বর্ত্তমানের মানুষ প্রজাপতি-গোত্র বটে, কিন্তু সকলস্থলেই মানব-গোত্র নহে। মরীচি প্রভৃতি দশ প্রজাপতি সপ্ত মনুর সৃষ্টি করিলেন যুগপর্য্যায়ে, পৌরাণিক মানব শুধু সেই সপ্ত মনুরই সন্তান। দশ প্রজাপতির স্বতন্ত্র সৃষ্টি—যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর, অসুর পিশাচ বানর নাগ ও পক্ষী। ইহার পরে প্রাণী জগৎ সৃজন।

এই যে যক্ষ রক্ষ প্রভৃতি, ইহারা কেমন জীব? মানবশাস্ত্রের টীকায় দেখা যায়, রাক্ষসের উদাহরণ—রাবণ বিভীষণ। কে সে রাবণ? যাহার লঙ্কা কনকময়ী অলকা, যাহার বীর্য্যে সসাগরা পৃথিবীর সমস্ত রূপঐশ্বর্য্য বাঁধা পড়িয়াছে। রাজনীতির যে শ্রেষ্ঠ আচার্য্য, চরিত্রনীতিতে সে ব্যসনমগ্নকণ্ঠ, বিলাস-উচ্ছল, ভোগোন্মত্ত। জগতের শ্রেষ্ঠ রূপঐশ্বর্য্যকে ইহারা গ্রাস করিতে ও ভোগ করিতে চায়।

গন্ধর্ব্বেরা আর একটি প্রজাপতি-গোত্র। ভাষ্যকার পরিচয় দিলেন, ইঁহারা গীতনৃত্যবিলাসী। ভারতের প্রতি কাব্যকুঞ্জে গন্ধর্ব্বেরা বিলাস ছড়াইয়াছে, মুগ্ধ করিয়াছে মানব কবিকে। প্রজাপতি-গোত্র অসুরেরা মানবের দেবতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছে, মানবের পরমারাধ্যকে ভুলাইয়া আপনার করিয়া লইয়াছে। যক্ষ ও কিন্নরেরাও আমাদের বহু যুগের পরিচিত।

পিশাচের পরিচয়ে ভাষ্যকার মন্তব্য করিলেন—তাহারা অশুচি, তাহারা মরুদেশনিবাসী। নাগ ও তক্ষকেরাও মানব শাস্ত্রে এমনই করিয়া অসম্মানিত। সাহিত্যের মধুকুঞ্জে কিন্নর-যুগলকে প্রথম মধু পান করিতে দেখি, অথচ মেধাতিথি ভাষ্য করিলেন, কিন্নরেরা অশ্বমুখ প্রাণীবিশেষ।

আর প্রজাপতি-গোত্র বানরজাতি—যাহারা রাবণের অলকা জয় করিয়া আনিল? মেধাতিথি মনুর ভাষ্যে বলিলেন তাহারা—'মর্কটমুখাঃ পুরুষবিগ্রহাঃ'। ভাষ্যকার কুল্লুকভট্ট এ বিষয়ে নীরব। সংস্কৃতি-অভিমানী আমরা এই অন্যতম প্রজাপতি গোত্রকে, সলাঙ্গুল ইতি উপাধিতে লঙ্কা-বিজয়ের মর্য্যাদায় পুরস্কৃত করিয়াছি। ত্রেতার গোধূলি-আলোকে যাহাদের সাথে মিতালির গান গাহিলাম, আজ দেখিতেছি তাহাদেরই কুলতিলকের চিত্রলিপি লাঙ্গুল বিলাসে শোভা পাইতেছে। ভক্তের সম্মুখে ইতর প্রাণীবেশে তাঁহার আজ কত সমাদর!

রামায়ণের বানরেরা নিজেরাই স্বীকার করিয়াছে তাহাদের শাখামৃগত্ব বা বানরত্ব বিশেষণ অযুক্ত নহে, শাখামৃগের মতই তাহারা যে লঘুচিত্ত ও চঞ্চলমতি। সমুদ্র লঙ্ঘনের পূর্ব পর্য্যন্ত লাঙ্গুল যাহাদের নাই, মহর্ষির কাব্যে যেখানে সমুদ্র লঙ্ঘনার্থই লাঙ্গুলের আবির্ভাব হইল, সেখানে সে বীর জাতিকে 'সলাঙ্গুলে'র কলঙ্ক কেন?

মহর্ষির কাব্যে বানরাধিপের পরিচয়—

> বালী নাম মহাপ্রাজ্ঞ শক্রপুত্রঃ প্রতাপবান্
> অধ্যাস্তে বানরঃ শ্রীমান্ কিষ্কিন্ধ্যামতুলপ্রভাম্।

ইন্দ্রপুত্র বলিয়া যাঁহার বীর্য্য পরিচয়, অতুলপ্রভা যাঁহার নগরী, তাঁহার বিশেষণরাজিতে আমরা সলাঙ্গুল মর্য্যাদাটি কেন যোগ করিয়াছি?

'কনকপ্রভা'—যেখানে বানররাজের পরিচয়, তৎপত্নীর রূপসুষমা যেখানে ব্যক্ত হইয়াছে—'তারাধিপনিভাননা' চন্দ্রাননা এই ব্যঞ্জনায়,যেখানে বানরোত্তমের পরিচয়—'পদ্মকেসরসঙ্কাশস্তরুণার্কনিভাননঃ,' সেখানে মেধাতিথির 'মর্কটমুখ' আসিল কেমন করিয়া?

কিন্নরেরাও এমনি করিয়া কি 'অশ্বমুখ' ধারণ করিল, এমনি করিয়াই নাগজাতি গরলযুক্ত হইল?

কিষ্কিন্ধ্যার গুহাপ্রাসাদের বিলাসকক্ষ দ্বারে দণ্ডায়মান্ কুপিত লক্ষ্মণের সম্মুখে সুগ্রীবাঙ্কশায়িনী তারার যে চকিতের পরিচয় তাহার সমৃদ্ধি যে কোনও শ্রেষ্ঠ কাব্যের মানবী নায়িকাতেও সম্ভবে না।˝ সেখানে লাঙ্গুল শোভার কোনও অবকাশ নাই। সুগ্রীব ও বালী পরস্পরকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া যেখানে বেশ সংযত করিল সেখানেরও ভাষা—

> স দদর্শ ততঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবং হেমপিঙ্গলং
> সুসংবীতং অবষ্টব্ধং দীপ্যমানমিবানলং।

অথবা স বালী গাঢ়সংবীতঃ—

লাঙ্গুল সংযম বা লাঙ্গুলাস্ফালনের কোনও অঙ্ক তো এ যুদ্ধপ্রারম্ভে স্থান পায় নাই। অথচ বানরজাতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হনুমান্ কোথা হইতে লাঙ্গুল সংগ্রহ করিলেন?

মানবশাস্ত্রে নাগতক্ষকের দংশনবৃত্তি ও অসুরের বিজৃম্ভন বৃত্তি বিশেষ পরিচয় স্বরূপ লিখিত হইয়াছে। অথচ অসুরদের সহিত মানবের বৈবাহিক সম্বন্ধ পৌরাণিক বার্ত্তা। দংশন ভয় দেখাইয়া যে নাগতক্ষকের ছায়া হইতে দূরে থাকিবার জন্য মানবশাস্ত্র নির্দ্দেশ দিয়াছে, সেই নাগতক্ষকের কন্যাকুল হরণ করিয়া মানবের অন্তঃপুর বহুবার অলঙ্কৃত হইয়াছে। ভল্লুক বলিয়া যে জাতিকে কলঙ্কিত করিয়াছি, তাহারই কন্যাকে মানবসিংহাসনে মহারাণী হইতে দেখিয়াছি।

ক্রমবিবর্ত্তমান নিয়মের দিক হইতে প্রশ্ন উঠিতে পারে; বর্ত্তমানে যে শাখাচারী বানর দেখি ইহারা কি তখন ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। লঙ্কাকাণ্ডে আছে ওষধি সংগ্রহের নিমিত্ত হনুমান্ যখন সমুদ্রলঙ্ঘন উদ্দেশে বীর্য্যাস্ফালন করিলেন, তখন

> স বৃক্ষখণ্ডাংস্তরসা জহার
> শৈলান্ শিলাঃ প্রাকৃতবানরাংশ্চ।

তাঁহার বেগপ্রভাবে বৃক্ষচূড়া ধ্বসিয়া পড়িল, পর্ব্বতচূড়া মণি হারাইল,

বন্য বানরেরা ভয়ে ভীত হইয়া সাগর জলে নিপতিত হইল। ক্ষীণবেগ এই বানর মেধাতিথির মর্কট হইতে পারে কিন্তু লঙ্কাবিজয়ী আপন প্রতিবেশী প্রজাপতি-গোত্র বানরজাতির সহিত মানবের শুধু আচারগত বৈষম্য ব্যতিরেকে কোনও অভিন্নতা নাই। অসুর যক্ষ রক্ষ কিন্নর—ইহারা মানব প্রতিবেশী, মানব হইতে অভিন্ন, পারস্পরিক বৈষম্য শুধু শৌর্য্যে বীর্য্যে আচারে বা ধর্ম্মানুপদ্ধতিতে।

রামায়ণে বানরপুঙ্গবেরা যখনই একে অপরের কাছে রামচন্দ্রের পরিচয় দিয়াছে, তখনই তাহাদের ভাষা—'ইক্ষ্বাকূনাং কুলে জাতঃ—'। তাহারা 'মনুষ্যাণাম্ কুলে জাতঃ'—এ কথা কোথাও বলে নাই। 'বানর' মনুষ্য সম্বন্ধে 'মনুষ্য' শব্দ ব্যবহার করে নাই, তাহাদের আপনার জনের মতো মানবের বংশগৌরব উল্লেখ করিয়াছে, অথচ আমরা, মানব বলিয়া যাহারা অতীতের গর্ব্ব করি তাহাদেরই শাস্ত্র প্রতিবেশী জাতিকে 'বানর' বলিতে কুণ্ঠাবোধ করিল না!

কিন্তু লাঙ্গুল সংগ্রহ হনুমান্ কখন করিলেন? সমুদ্রলঙ্ঘনের পূর্ব মুহূর্ত্তে বানর সেনানী যখন হনুমানের স্তুতি আরম্ভ করিলেন, তখন খুশীভরে তিনি—'সমাবিধ্য চ লাঙ্গুলং হর্ষাৎ বলমুপেয়িবান্।' এ লাঙ্গুল হনুমান্ আপন শরীরে সংযুক্ত করিয়াছিলেন সাগরলঙ্ঘন কামনায়। এ লাঙ্গুলচক্র বায়ুপূরিত বীর্য্যচালিত কৃত্রিম অভিযানাবলম্বন। সুন্দর কাণ্ডের মুখারম্ভে দেখি এই লাঙ্গুলচক্রে বেষ্টিত হইয়া হনুমান রাশিচক্র বেষ্টিত ভাস্করের ন্যায় অনুভাত হইতেছে। আরও দেখি,

—"তস্য বানরসিংহস্য প্লবমানস্য সাগরম্
পক্ষান্তরগতো বায়ু জীমূত ইব গর্জ্জতি—"

সাগরলঙ্ঘনকারী প্লবমান্ হনুমানের পক্ষান্তরগত বায়ু মেঘের মত গর্জ্জন করিতেছে। বাংলা রামায়ণে খুশীমত 'পক্ষান্তরগত' শব্দটি 'কক্ষান্তরগত' হইয়াছে। কিন্তু তথাপি দু একটি সংস্কৃত সংস্করণেরও যখন 'পক্ষ' শব্দের ব্যবহার পাইয়াছি, বর্ত্তমানের পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতে পারি—এ বায়ু গর্জ্জন বর্ত্তমান আকাশযানের পূর্ব্বগোত্র নহে কি?

বৈনতেয় মহাবল হনুমান্ 'গরুত্মানিব বিখ্যাত উত্তমঃ সর্ব্বপক্ষিণাম্।' সর্ব্ব পক্ষিদের উত্তম গরুড়ের মত বিখ্যাত। তাহার পরেই রামায়ণে রহিয়াছে—'পক্ষয়োর্যদ্বলং তস্য ভুজবীর্য্য বলং তব।' গরুড়ের যেখানে পক্ষবল, হনুমানের সেখানে ভুজ বল। সুতরাং পক্ষযুক্ত চক্রবৎ কৃত্রিম আকাশযানকে ভুজবলে বায়ুদাক্ষিণ্যে চালিত হইতে দেখিয়া সাগর লঙ্ঘন উপভোগ করিতেছি। কৃত্রিম বলিয়াই হনুমান অক্ষত শরীরে লাঙ্গুলে অগ্নি জ্বালিয়া সারা রাবণপুরী দাহন করিয়া সাগর জলে তাহা নির্বাপিত করিতে পারিয়াছিলেন।

সর্ব্ব পক্ষি মধ্যে উত্তম—এই কথাটিতে সম্পাতি ও জটায়ুর কথা মনে আসে। প্রারম্ভেই বলিয়াছি 'পক্ষী' বানরজাতির মতই আর একটি প্রজাপতি-গোত্র, মানব প্রতিবেশী।

সম্পাতি ও জটায়ু উড্ডয়নশীল পক্ষ লাভ করিয়া সূর্য্য সকাশে যাইবার বাসনা করিল। ব্যোমপথে মোহাচ্ছন্ন হইয়া জটায়ু পতিত হইল! তাহা রক্ষা করিতে গিয়া ভ্রাতা সম্পাতি আপন পক্ষ হারাইল। 'অহস্তু পতিতো বিন্ধ্যে দগ্ধপক্ষো জড়ীকৃতঃ।' ইহাদের কাহিনী যেন 'পিপীলিকার পাখা ওঠে' এই শ্রেণীর। জটায়ু আপন পক্ষ হারাইল আকাশপথে সীতাহারী রাবণের সহিত সংগ্রামে। রাবণ পুষ্পকরথচারী, আর জটায়ুর আকাশবিহার সামান্য কৃত্রিমতা অবলম্বন করিয়া। পুষ্পকরথচারী তাই জটায়ুকে পক্ষহীন করিয়া গেল। জটায়ু মানব ভাষায় কথা কহিয়াছে মানব প্রতিবেশী বলিয়াই—প্রাকৃত বা বন্য পাখী সে নহে।

এমনি করিয়াই দেখিতেছি মানবশাস্ত্র মানবের প্রতিবেশীকে মানবেরই সম্মুখে কিম্ভুত করিয়া বিকৃত করিয়া ব্যঙ্গ করিয়া পরিচিত করিতেছে। যেন তক্ষক হইলেই দংশন করিবে, গন্ধর্ব্ব হইলেই নৃত্য করিবে, কিন্নর হইলেই কামচর্চ্চা করিবে, রাক্ষস হইলেই অপহরণ করিবে! আজও সৌখীন রঙ্গমঞ্চে কিষ্কিন্ধ্যাগৌরব মহাবীরের অভিনয়ে সলাঙ্গুলত্ব দেখিয়া কেহ সংস্কৃতি-অভিমানী জাতীয় কলঙ্ক বলিয়া প্রতিবাদ করিতেছেন না।

অশোককাননে সীতাকে হনুমান্ প্রশ্ন করিতেছেন—'সুর অসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর নাগ যক্ষ রক্ষ, ইহাদের কোন্ জাতিসম্ভূতা আপনি বরবর্ণিনি! আপনি কি রুদ্রকুলবরললনা? আপনি কি দেবকামিনী!'

অর্থাৎ দেব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব মানব প্রভৃতিতে শরীর বৈষম্য খুব বেশী নহে,—সৌষ্ঠবে সুষমায় লাবণ্যে, শৌর্য্যে বীর্য্যে আচারে, ধর্মে বিশ্বাসে জ্ঞানে, অথবা ঐশ্বর্য্যে ও শিল্পে তাহাদের যা পারস্পরিক অপকর্ষ ও উৎকর্ষ।

তাই যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর আর নাগতক্ষক বানর পক্ষী পৌরাণিক কৌলিন্য হারাইয়া আজ মানবের সাথে মিলিয়া গলিয়া এক হইয়া গেছে। আজ আমরা শুধু মানব নহি, শুধু মানব-গোত্র আমাদের পরিচয় নহে, আমরা সেই প্রজাপতি-গোত্রসম্ভূত, আমরা মহামানবসঙ্ঘ।

মান-অবসান

শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

(১)

সখি শোন্ তবে সব কথা
নহে বুঝিবি কেমনে ব্যথা?
অল্প কথায় বুঝানো কি যায়
যেই নিদারুণ বিরহ জ্বালায়
পরাণ দহে?
দিবস রাতে মনের সাথে
মিশে যে রহে?

(২)

আমি তখন কি জানি সই!
আর আমি যে আমার নই?
নহিলে কি হায়! দিতাম তাহায়

অমন করিয়া নিঠুর বিদায়
নয়ন-নীরে ?
দারুণ মানে তাহার পানে
চাহিনি ফিরে !

(৩)

যবে তাহার মিলন লাগি
আকুলে উঠিনু জাগি
সব ইন্দ্রিয় সকল অঙ্গ—
হিয়ার মাঝারে স্বপনরঙ্গ—
দিছিনু মোরে
বিশ্ব-সাথে তাহার হাতে
খেলনা ক'রে।

(৪)

আমি অধীরা এমনি যবে
দূতী আসি কয় তবে
চতুর নিঠুর তোমার নাগরে
বেঁধেছে অপরে সোহাগে আদরে,
তোমারে ছলি
পিরীতি-রসে রেখেছে বশে
চন্দ্রাবলী।

(৫)

সই নির্ম্মম সেই কথা
হানিল দারুণ ব্যথা
ভাঙ্গিল হৃদয়; "এ হেন সময়
করে যদি আসি প্রেম-অভিনয়
ছলের রাজা,"
করিনু মনে "চতুর জনে
দিব রে সাজা" !

(৬)

তাই যবে সে নিকটে আসি
নয়নের জলে ভাসি
"ক্ষম রাই ! মোর অপরাধ ক্ষম !"
বলিয়া চরণে ধরেছিল মম,
শুনিনি কথা
রুদ্ধরোষে সয়েছি বসে
সে কাতরতা।

(৭)

শেষে আমার চরণ পরে
দিয়েছিল সে যে ধ'রে
যতেক আছিল আকুতি মনের,
যতেক অশ্রু ছিল নয়নের;
উপেক্ষাতে
দিয়াছি ঠেলে হেলায় ফেলে
রূঢ় আঘাতে।

(৮)

কত ঝরেছিল মোর আঁখি
তবু জোর ক'রে মুখ ঢাকি
হতাশে যবে সে লইল বিদায়
পরাণে যদিও ছিল "হায় হায়"
এসেছি চলি
আকুল ভাষা, সকল আশা
সবলে দলি।

(৯)

সেই হতে সে ত আর
কুঞ্জে ফিরে আবার
আসে নাই কভু, বড়ই কঠিন
জানিয়া আমারে—হৃদয়-বিহীন—
বুঝি সে ভীত
আসিলে কাছে, হয় সে পাছে
অবমানিত।

(১০)

আর, শিখি পাখা নাহি পরে,
শুনি, অধরে বাঁশী না ধরে,
থাকিয়া থাকিয়া বলে "রাধে রাধে,"
বসিয়া বসিয়া শ্বসিয়া সে কাঁদে,
আচম্বিতে
ভ্রমে সে ধায় রাধারে হায়
বক্ষে নিতে !

(১১)

সখি এ যে বড় অসহন !
মোর হয় না কেন মরণ ?
আমার বিরহে বঁধুয়া আমার
ত্যজিয়া শয়ন ভুলিয়া আহার
বেড়ায় ঘুরে ;
আমার তরে রহে না ঘরে,
নয়ন ঝুরে।

(১২)

এবে পাষাণের মত র'ব,
কোনো কথা আর নাহি ক'ব
যতদিন না সে কুঞ্জেতে আসে,
তেমনি আবেশে বসে মোর পাশে
হাতটি ধ'রে
বলে সে "রাধা ! পরাণ আধা !"
প্রেমের ভরে।

(১৩)

শুধু শেষ দুটো কথা বলি—
ও সে তুচ্ছ চন্দ্রাবলী !
প্রেমের আধার বঁধুরে আমার
কাড়িয়া লইতে সাধ্য কি তার ?
প্রেমসে বোঝে ?
আমাতে রত বঁধু নিয়ত
মোরেই খোঁজে।

(১৪)

আজি বঁধুর দশায়, হায় !
হৃদয় জ্বলিয়া যায়
বুঝিয়াছি দোষী নহে মোর কালা,
তবু এই খর-বিরহের জ্বালা
দিয়াছি তারে,
সে অনুতাপে ঘোর সে পাপে
পোড়ায়ে মারে।

(১৫)

সদা মর্ম্মপীড়ায় আমি
কাটাব দিবসযামী
কভু আসে যদি বঁধুয়া আমার,
অধীর মিলন সুখেতে আবার
হইব সারা,
ধরিয়া বুকে সে চাঁদ মুখে
চেতনহারা !

সাময়িকী

ডাক্তার সাহা ও দেশের ভবিষ্যৎ

গত ইষ্টারের ছুটীতে এবার দিনাজপুরে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মিলনের ২৪শ অধিবেশন হইয়া গেল। সভাপতি হইয়াছিলেন, অধ্যাপক ডক্টর মেঘনাদ সাহা। তিনি বলিয়াছেন—গভর্ণমেণ্ট যদি ব্যাপক শিল্পনীতি গ্রহণ না করেন এবং বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া জমীর উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি না করেন তাহা হইলে আমাদের দেশের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে না। শিল্প সংক্রান্ত বিবর্ত্তন ব্যবস্থার দ্রুত অগ্রগতি কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে, তাহা স্থির করিবার জন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র জাতীয় পরিকল্পনা কমিটী গঠন করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছেন—মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্য তালিকার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

বাঙ্গালায় নূতন মন্ত্রিসভা—

বাঙ্গালা দেশে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একত্র হইয়া মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা হইয়াছিল। সেজন্য কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদও চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লীগ-নেতা কংগ্রেসের কয়েকটি সর্ত্তে সম্মত না হওয়ায় সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় ও ২৪শে এপ্রিল বুধবার শুধু লীগদলের সদস্য লইয়া বাঙ্গালায় নিম্নলিখিতরূপ মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে—(১) মিঃ এচ-এস-সুরাবর্দ্দী, প্রধান মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র বিভাগ (২) মিঃ আহমদ হোসেন—কৃষি বিভাগ (৩) খাঁ বাহাদুর আবদুল গফরাণ—বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ (৪) খাঁ বাহাদুর মহম্মদ আলি—অর্থ, জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগ (৫) খাঁ বাহাদুর মোয়াজ্জেল হোসেন—(ইনি উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য) শিক্ষা ও রাজস্ব বিভাগ (৬) খাঁ বাহাদুর আবদার রহমন—সমবায় ও বাণিজ্য বিভাগ (৭) মিঃ সামসুদ্দীন আমেদ—শ্রম, শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ (৮) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল—বিচার ও পূর্ত্ত বিভাগ। বর্ণহিন্দু ও তপশীলভুক্ত সদস্যদের জন্য আপাততঃ মন্ত্রিসভায় ৪টি পদ খালি রাখা হইয়াছে।

নূতন মেয়র নির্ব্বাচন—

২৯শে এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশনের নূতন বৎসরের প্রথম সভায় মুসলেম লীগ দলের মিঃ এস-এম-ওসমান ও কংগ্রেস দলের শ্রীযুক্ত নরেশনাথ মুখোপাধ্যায় নূতন মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গত বৎসরের ডেপুটী মেয়র মিঃ শামসুল হক মেয়রপদপার্থী হইয়াছিলেন তিনি ৭১ ও ১০ ভোটে পরাজিত হইয়াছেন। মিঃ ওসমান বিহারের পাটনা জেলার লোক—তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম-এ, বি-এল পাশ করিয়া জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটের প্রেসিডেন্সি মুসলেম হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। অসহযোগ আন্দোলনে তিনি কারাবরণ করিয়া-ছিলেন। নূতন ডেপুটী মেয়র নরেশবাবু খ্যাতনামা ধনী ও ব্যবসায়ী।

কলিকাতায় শাহ-নওয়াজ—

আজাদ-হিন্দ-ফৌজের লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল শাহ নওয়াজ ও নেতাজির মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল মহবুব আমেদ গত ২৯শে এপ্রিল পাটনা হইতে কলিকাতায় আসিয়া-ছিলেন। তাঁহারা নেতাজির ৩৮।২ এলগিন রোডস্থ গৃহে বাস করিয়াছেন। হাওড়া ষ্টেশনে তাঁহাদের বিরাট সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পরদিন ৩০শে এপ্রিল কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক জনসভায় তাঁহাদের উভয়কেই সম্বর্দ্ধনা করা হয় ও তাঁহারা দেশবাসী সকলকে মুক্তি সংগ্রামে যোগদান করিতে আহ্বান জানান।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র—

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে পাইবার জন্য লোক এত উদ্‌গ্রীব হইয়াছে যে এখন যে কেহ যে কোন স্থানে নেতাজীর মত লোক দেখিলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছেন।

বোম্বায়ে ও বিহারে নেতাজীকে দেখার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। আবার বোম্বায়ের এক সংবাদপত্রে প্রকাশ, তাঁহাকে প্রায়ই সোভিয়েট চীন, ফরাসী ইন্দোচীন ও মালয়ে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়। ইন্দোনেসিয়ায় যাইয়া তিনি স্থানীয় নেতাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তিনি বোম্বায়ের ঐ পত্রের জন্য এক বাণীও দিয়াছেন। আজাদ-হিন্দ-সরকারের অন্যতম মন্ত্রী কর্ণেল ইসান কাদিরও মুক্তি লাভের পর বলিয়াছেন যে নেতাজী জীবিত আছেন।

শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ—

গত ২রা বৈশাখ সোমবার সন্ধ্যায় কলিকাতাস্থ শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের ২৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব



'শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ' এর পঞ্চবিংশতি প্রতিষ্ঠা দিবসে উপস্থিত ব্যক্তিগণ　　ফটো—তারক দাস

হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথি-রূপে উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশন উক্ত প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক ২০ হাজার টাকা সাহায্য দান করেন। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট যাহাতে ৩০ হাজার টাকা বার্ষিক প্রস্তাব করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে আয়ুর্ব্বেদকে যথোচিত মর্য্যাদা দান করেন, সে জন্য প্রধান অতিথি মহাশয়কে ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছিল।

বেতন বৃদ্ধির দাবী—

গত ইষ্টারের ছুটীতে কৃষ্ণনগরে বাঙ্গালার মফঃস্বল সহরসমূহের সরকারী কেরাণীদের বার্ষিক সম্মিলন হইয়াছিল। তাহাতে এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়, বর্ত্তমান অবস্থায় মাসিক ১২৫ টাকা আয়ের কমে কেহ ৪জনে গঠিত সংসারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারেন না। সেজন্য কেরাণীদের সর্ব্বনিম্ন মাসিক বেতন ৮০ টাকা (তাহার উপর মাগ্গী ভাতা) করার দাবী করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে দরিদ্রদের দুর্গতির সীমা নাই। সরকারী কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন কিনা কে জানে?

ভারতের দুর্দ্দশায় সহানুভূতি—

মিঃ ওয়ালটার ন্যাস নিউজিল্যাণ্ডের অর্থ সচিব। তিনি

প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। পথে তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি এদেশে জনগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন। সভ্য দেশে যে লোক গৃহের অভাবে পথে বাস করে, তাঁহার এ ধারণা ছিল না। তিনি ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও স্বাধীন নিউজিল্যাণ্ডে বাস করেন। পরাধীন ভারতের অধিবাসীদের শুধু বাসস্থান নহে, অন্নবস্ত্রের সমস্যার কথাও তাঁগার জানা ছিল না।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে ২লক্ষ ১০ হাজার ৫শত টন গম ভারতে আসিয়া পৌছিবে। কানাডা হইতেও প্রচুর গম ভারতে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। ভারতের অভাব কিন্তু এ বৎসর এত অধিক যে বিদেশ হইতে যাহাই আসুক না কেন, ভারতের অভাব মিটানো সম্ভব হইবে না।

রেল ধর্ম্মঘটের কারণ—

১৯১৬ সালের ৩১শে মার্চ্চ রেলওয়ে বোর্ড প্রকাশ করেন যে যুদ্ধের সময় অতিরিক্ত লোক গ্রহণের ফলে ঐ



রেলওয়ে কর্ম্মীদের সভায় শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলি — ফটো—পান্না সেন

মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ হুভার—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ হা[illegible] হুভার সারা পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া খাদ্য দ্রব্যের অবস্থা জানিবার জন্য সফর করিতেছেন। তিনি ২৪শে এপ্রিল দিল্লী পৌছিয়া প্রথমে মহাত্মা গান্ধী ও পরে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মিঃ হুভার সকলের সহিতই ভারতের খাদ্যের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ঐ দিনই ওয়াসিংটন হইতে ভারতে খবর আসিয়াছে যে সম্মিলিত খাদ্য বোর্ড হইতে ভারতে ৬০

তারিখে প্রয়োজনাতিরিক্ত লোকের সংখ্যা ছিল ৩৪৬২৮—[illegible]মধ্যে ১৮৯১জনকে রেলের বিভিন্ন কাজে স্থায়ীভাবে [illegible] করা হয় ও ১৫৭৪৮জনকে বরখাস্ত করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা ও বেতন বৃদ্ধির দাবী অগ্রাহ্য করার ফলে ভারতের সর্ব্বত্র সকল রেল কর্ম্মী একযোগে ধর্ম্মঘট করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

আদিবাসী হত্যার গুজব—

বাঙ্গালার নূতন প্রধান মন্ত্রী মিঃ এচ-এস সুরাবর্দ্দী ও বিহার প্রাদেশিক মুসলীম লীগের সভাপতি মিঃ হোসেন [illegible] প্রচার করিয়াছিলেন যে ২রা মার্চ্চ খুন্তীতে কংগ্রেস

ও আদিবাসীদের বিবাদে কংগ্রেস ১০০ আদিবাসীকে হত্যা করিয়াছিল। ঐ উক্তি যে মিথ্যা তাহা বিহার ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলের সদস্য ডাঃ পি-সি-মিত্র এক বিবৃতি দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ মিত্র খুন্তীকেন্দ্রে আদি-বাসী প্রার্থী শ্রীযুত জয়পাল সিংকে নির্ব্বাচনে পরাজিত করিয়াছিলেন। তথায় মাত্র ৫টি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল —তাহা শুধু আদিবাসীদের নহে—কংগ্রেস কর্ম্মীরাও দাঙ্গায় মারা গিয়াছে।

করাচীতে পিওন নির্ব্বাচিত—

গত ১৯শে এপ্রিল করাচী মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনে আবদুল গফুর নামে মিউনিসিপালিটীর এক পিওন বর্ত্তমান কমিশনারকে পরাজিত করিয়া নূতন কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রমিক কেন্দ্রে তাহার জয় হইয়াছে।

উড়িষ্যায় নূতন মন্ত্রিসভা—

উড়িষ্যায় কংগ্রেস দল নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। তথায় শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহাতাব নেতা হইয়া প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। ২৩শে এপ্রিল মন্ত্রীরা কাজ আরম্ভ করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ কানুনগো, শ্রীযুক্ত লিঙ্গরাজ মিশ্র, শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বিশ্বাস রায় মন্ত্রী হইয়াছেন।

মালয়ে মেডিকেল মিশন—

ভারত হইতে কংগ্রেস মেডিকেল মিশনের যে ৫জন সদস্য সম্প্রতি বিমানযোগে সিঙ্গাপুর যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ৪ জন বাঙ্গালী ও . জন মধ্যপ্রদেশের চম্পার অধিবাসী। তাঁহাদের নাম (১) ডাঃ সুবোধরঞ্জন চক্রবর্ত্তী (২) ডাঃ জ্যোতির্ম্ময় মজুমদার (৩) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (৪) শ্রীযুক্ত গঙ্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও (৫) ডাঃ কে-থিয়োডোর।

মধ্যপ্রদেশে নূতন মন্ত্রিসভা—

২৭শে এপ্রিল মধ্যপ্রদেশে নূতন কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন—পণ্ডিত ডি-পি-মিশ্র, শ্রীযুক্ত ডি-কে-মেটা, শ্রীযুক্ত এস-ভি গোখ্‌লে ও শ্রীযুক্ত আর-কে-পটিল অন্যতম মন্ত্রী হইয়াছেন। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই মন্ত্রীরা ১৪০ জন রাজবন্দীর মধ্যে ১০০ জনকে মুক্তিদানের আদেশ দিয়াছেন।

তরুণ সাহিত্যিক সঙ্ঘ—

গত ৭ই এপ্রিল শ্রীরামপুর টাউন হলে তরুণ সাহিত্যিক সঙ্ঘের শ্রীরামপুর শাখার উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। কবি জসীম উদ্‌দীন উদ্বোধন করেন। শ্রীযুক্ত সুধাংশু-কুমার রায়চৌধুরী প্রধান অতিথি ছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দকে অভ্যর্থনা করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ শাস্ত্রীর মঙ্গলাচরণের পর স্থানীয় শাখা সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিবৃতি ও বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের প্রেরিত বাণী পাঠ করেন। বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও কবি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীমতী কমলা শ্রীবাস্তব প্রমুখা কয়েকজন গান করেন। শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তীর উৎসাহে সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়।



শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বর্দ্ধনায় সমবেত সুধীবৃন্দ

ফটো—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

ভারতে দারুণ খাদ্য সঙ্কট—

গত ১৭ই এপ্রিল দিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে ভারত গভর্ণমেণ্টের খাদ্যসচিব সার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব

বলেন—মে মাস হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ৪ মাস কাল ভারতে দারুণ খাদ্যসঙ্কট দেখা দিবে। বোম্বাই ও দক্ষিণ ভারতে খাদ্যশস্যের বিশেষ অভাব। ভারতে এমন কোন প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য নাই, যেখানে খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত আছে। সম্মিলিত খাদ্য বোর্ডের সাহায্য না আসিলে ভারতের বহু স্থানে লোকের অশেষ দুর্গতি হইবে।

জলধর উৎসব—

গত ৩০শে চৈত্র ভাটপাড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সাহিত্যাগারের উদ্যোগে জলধর স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং সাহিত্যিক শ্রীকপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত গীত হইবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। কুমারী গীতা চ্যাটার্জির স্মৃতি সঙ্গীতের পর পণ্ডিত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় জলধরের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। অতঃপর ডাঃ কালিদাস ভট্টাচার্য্য, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, তারকদাস হালদার, পণ্ডিত ভবভূতি বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত রামরঞ্জন স্মৃতিতীর্থ প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীমণিমোহন মুখোপাধ্যায়, ভবতোষ কাব্যতীর্থ, ডাঃ জানকীবল্লভ সাংখ্যতীর্থ পি-এইচ-ডি ও হেড মাষ্টার সতীশচন্দ্র ভাদুড়ী মহাশয় বক্তৃতা দেন। সভাপতি মহাশয়ের জলধর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক সুদীর্ঘ বক্তৃতার পর শ্রীমহেন্দ্রেশ্বর মুখোপাধ্যায় 'কদম কদম বাড়ায়ে যায়' গানটি স্বীয় সুরে গাহিয়া সকলকে তৃপ্ত করেন। কলিকাতায় জলধর স্মৃতি সংঘের উদ্যোগে বীডন ষ্ট্রীটস্থ [illegible]রতী বিদ্যাভবন গৃহেও জলধরবাবুর এক স্মৃতি উৎসব [illegible]



জলধর স্মৃতিপূজা—ভাটপাড়া সাহিত্যাগার

পরলোকে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী—

১৭ই এপ্রিল রাত্রিতে খ্যাতনামা দেশসেবক শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় মাদ্রাজে ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। স্কুলের শিক্ষক হিসাবে তিনি জীবন আরম্ভ করেন। ভারত ভৃত্য সমিতির সদস্যরূপে কাজ করিয়া তিনি পরে উক্ত সমিতির সভাপতি হইয়া রাজনীতিক্ষেত্রে

যোগদান করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলা লেকচারার ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত গভর্ণমেণ্টের এজেণ্ট হইয়াছিলেন। ৫০ বৎসর কাল তিনি দেশের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

মাদ্রাজে নূতন মন্ত্রিসভা—

মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দলের সদস্য সংখ্যাই অধিক হয়। কংগ্রেসের বড়কর্ত্তারা ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সি-রাজাগোপালাচারী যাহাতে আবার পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা নির্ব্বাচিত হন, সে জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু পরিষদের সদস্যগণ সে নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া শ্রীযুক্ত টি-প্রকাশমকে নেতা নির্ব্বাচিত করেন ও তদনুসারে গভর্ণর শ্রীযুক্ত প্রকাশমের উপরই মন্ত্রিসভা রচনার ভার দেন। নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া গত ২৯শে এপ্রিল মাদ্রাজে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে—শ্রীযুক্ত ভি-ভি-গিরি, এম-ভক্তবৎসলম্, টি-এস-অবিনাশীলিঙ্গম্ কে-ভাষ্যম্, এস কুমারস্বামী রাজা, ডানিয়েল টমাস, শ্রীমতী রুক্মিণী লক্ষ্মীপতি, কে-আর-করাণ্ড, কে-কোটি রেড্ডি ও বেমুনকুর্ম্মাগা। ইহার পর আরও ২জন মন্ত্রী গ্রহণ করা হইবে। মাদ্রাজের সকল বিভাগ ও সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হইয়াছে। কাজেই সকল দলই এই নির্ব্বাচনে সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

জেলে বন্দী হত্যা—

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সম্প্রতি এক বিবৃতিতে ভয়াবহ সংবাদ প্রচার করিয়াছেন। প্রকাশ, ১৯৪৬ সালের ৩রা এপ্রিল জয়সালমীর জেলে সাগরমল গোপ নামক একজন রাজনীতিক বন্দীকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। ১৯৪১ সালের মে মাসে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া দণ্ডিত করা হইয়াছিল। জয়সালমীর রাজপুতানার দেশীয় রাজ্যের মধ্যে একটি অনুন্নত স্থান। এ সংবাদ সারা ভারতকে বিচলিত করিবে। পণ্ডিতজীর মত লোক প্রমাণাদি না পাইয়া অবশ্যই এ সংবাদ প্রচার করেন নাই।

চন্দ্রনাথে অনাচার—

চট্টগ্রামের নিকটস্থ চন্দ্রনাথ তীর্থে অনাচারের সংবাদ পাইয়া ভারত-সেবাশ্রম সংঘের সাধারণ সম্পাদক স্বামী বেদানন্দ তথায় তদন্ত করিতে গিয়াছিলেন। মন্দির নষ্ট করার পর স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীরা ভয়ে কেহ সে কথা প্রচার করেন নাই। চট্টগ্রাম জেলার শতকরা ৯০ জনেরও অধিক লোক মুসলমান। পুলিসও ব্যাপারটি ধামা চাপা দিবার জন্য রিপোর্ট দিয়াছেন—কোন পাগল এই কাজ করিয়াছে। কিন্তু কোন পাগলের পক্ষে উহা করা কখনই সম্ভব নহে। কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয়ে তদন্ত করিয়া দুর্ব্বৃত্তের শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত।



কলিকাতায় দাসহুগঘটনার একটি মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য ফটো—পান্না সেন

সিভিলিয়ানের দণ্ড—

৫ শত টাকা ঘুস লওয়ার অভিযোগে আলিপুরে স্পেশাল ট্রিবিউনালের বিচারে আই-সি-এস কর্ম্মচারী মিঃ টি-এ-মেননের গত ১২ই [illegible] তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। অর্থ না দিলে আরও ৯ মাস কারাদণ্ড হইবে। এই মামলার ফল কি সরকারী কর্ম্মচারীদের সুপথে পরিচালিত করিতে সাহায্য করিবে না?

বিহার মন্ত্রিসভার প্রচার—

বিহারে কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিং প্রথমে মাত্র ৪ জন সদস্য লইয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিলেন—তাহার পর দেওঘরের পণ্ডিত বিনোদানন্দ ঝা, হাজারীবাগের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ সহায়, পাটনার আচার্য্য বদ্রীনাথ বর্ম্মা, বেগুসরাইএর শ্রীরামচরিত্র সিংহ ও মোমিন নেতা আবদুল কোয়াম আন্সারীকে নূতন মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কোন আদিবাসীকে মন্ত্রী নিযুক্ত না করায় তাঁহাদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইবে।

সাতক্ষীরা রামকৃষ্ণ আশ্রম—

গত ১৯শে এপ্রিল হইতে ৪ দিন খুলনা জেলার সাতক্ষীরা রামকৃষ্ণ আশ্রমে বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। ২১শে এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যায় এক ধর্ম্মসভায় শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও বেলুড় মঠের স্বামী বীতশোকানন্দ রামকৃষ্ণের উপদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। স্থানীয় কর্ম্মীবৃন্দের চেষ্টায় আশ্রমের নিজস্ব গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে ও আশ্রমের কার্য্য দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগ ও সহায়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাতক্ষীরা ক্ষুদ্র সহর হইলেও তথায় এবার নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।



জামসেদপুর শ্যামাপ্রসাদ বিদ্যাভবনের উদ্বোধন দিবসে সমবেত সুধীগণ

নূতন মামলা—

ভারত গভর্ণমেণ্ট ও বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণদাবী করিয়া উক্ত গভর্ণমেণ্টদ্বয়ের বিরুদ্ধে একটি স্থায়ী ইনজাংসন প্রার্থনা করিয়া কালীঘাট ও বাঙ্গালার অধিবাসীদিগের পক্ষ হইতে কালীঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নিবারণ দত্তশর্ম্মা আলিপুরের তৃতীয় মুন্সেফ মিঃ এস-কে ভট্টাচার্য্যের আদালতে এক মামলা দায়ের করিয়াছেন। মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বাঙ্গালার বাহিরে খাদ্যশস্য বা বস্ত্র রপ্তানি নিষিদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ—গত ৫ বৎসর কাল গভর্ণমেণ্টদ্বয় তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালনে শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হইয়াছেন। ইহার ফলে কমপক্ষে ১৫ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

এইরূপ মামলা এদেশে নূতন, কাজেই ইহার ফলাফল জানিবার জন্য দেশবাসী সাগ্রহে অপেক্ষা করিবে।

পণ্ডিত নেহরুর ভবিষ্যদ্ বাণী—

৩রা এপ্রিল দিল্লীতে রয়টারের প্রতিনিধির নিকট পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বলিয়াছেন—আপোষ মীমাংসার দ্বারা স্বাধীনতা লাভ এবার আর সম্ভব হইল না বলিয়া ভারতের জনসাধারণ আজ যদি সহসা বুঝিতে পারে, তাহা হইলে ভারতে এক বিরাট গণবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। আমরা চাই বা না চাই—ইহা ঘটিবেই, কারণ দেশের অবস্থা আজ এমনই অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যতক্ষণ এ দেশে তৃতীয় পক্ষ উপস্থিত থাকিবে, ততক্ষণ রাজনীতিক দলগুলির মধ্যে বাস্তব বুদ্ধির উদয় হইবে না।

সিমলায় বৈঠক—

গত ৫ই মে হইতে সিমলায় তিনদলের বৈঠক আরম্ভ হইয়াছে। তথায় কংগ্রেস দলের ৪জন প্রতিনিধি—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, খাঁ আবদুল গফুর খাঁ ও সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, মুসলেম লীগ দলের ৪জন—মিঃ জিন্না, নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁ প্রভৃতি ও বৃটীশ পক্ষে ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্স সার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স, মিঃ আলেকজাণ্ডার ও বড়লাট মিলিত হইয়া ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা স্থির করিতেছেন। মহাত্মা গান্ধী সকলের পরামর্শদাতারূপে সিমলায় অবস্থান করিতেছেন।

মার্কিণ হইতে সতর্কতার বাণী—

আমেরিকাস্থ ইণ্ডিয়া লীগের সভাপতি মিঃ জে-জে সিংহ বিখ্যাত গ্রন্থকার পার্ল বাক, লুই ফিসার প্রভৃতি কয়েকজন ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল বিশিষ্ট আমেরিকাবাসী বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলীর নিকট তার করিয়া জানাইয়াছেন—"সময় দ্রুত চলিয়া যাইতেছে। যে কোন স্ফুলিঙ্গ ভারতবর্ষে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিতে পারে। ইহা সকলেরই দুঃখের কারণ হইবে। বিচক্ষণ রাজনীতিক

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইহাই উপযুক্ত সময়। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা থ. র ভারতবর্ষে অবিলম্বে সর্ব্ব ভারতীয় ভিত্তিতে মধ্যবর্ত্তী-কালীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। এই সরকারের সহিত বড়লাটের সম্বন্ধ হইবে ইংলণ্ডের রাজার ন্যায়।”

নেত্রকোনায় ভীষণ ঝড়—

গত ২৩শে মার্চ্চ সন্ধ্যায় মৈমনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার বিভিন্ন স্থানে প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টির ফলে তিন ব্যক্তি নিহত ও বহু গবাদি পশু ধ্বংস হইয়াছে। ঝড়ে অসংখ্য চালা ঘর উড়িয়া গিয়াছে ও বহু গাছ পড়িয়া গিয়াছে। ঐ অঞ্চলের সব বোরোধান ও শাকসবজী নষ্ট হইয়াছে। গ্রামবাসীদের অনশনে দিন যাপন করিতে হইয়াছে।

ঘৃত ও মাখন অদৃশ্য—

কিছুদিন পূর্ব্বে সামরিক বিভাগ কর্ত্তৃক কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট দুই শত টিন বাতিল ঘৃত নষ্ট করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল। তাহার মূল্য আন্দাজ ১৬ হাজার টাকা। ঐ ঘৃত নষ্ট করা হয় নাই—গুদাম হইতে উহা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ঐ ভাবে কর্পোরেশন গুদাম হইতে মিলিটারী বিভাগ কর্ত্তৃক বাতিল মাখনের কয়েক সহস্র টিনও অদৃশ্য হইয়াছে। এজন্য কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষকে বাহাদুরী দিতে হয়। ঐ সকল অখাদ্য জনগণকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা তাঁহারাই করিয়াছেন। আবার এই কর্পোরেশন বাজারে ভেজাল জিনিষ ধরিবার জন্য এক দল কর্ম্মচারী পুষিয়া থাকেন।

বোম্বাইয়ে নূতন সংস্কৃতি কেন্দ্র—

গত ১৬ই এপ্রিল বোম্বাইতে ‘ছন্দবিহার’ নামে একটী নূতন শিল্প-কলা সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ সিনেমা ব্যাবসায়ী শ্রীযুক্ত আম্বালাল প্যাটেল প্রতিষ্ঠানটীর উদ্বোধন এবং সভাপতিত্ব করেন। খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী শ্রীপ্রদীপকুমার রায় বহু চেষ্টার পর এই প্রতিষ্ঠানটী প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উদ্বোধন উৎসবে কুমারী গীতা রায়চৌধুরী, শ্রীমতী মালতী দেবী, শ্রীশংকর দাশগুপ্ত প্রভৃতি কণ্ঠ সংগীত ও আবৃত্তি দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করেন। বোম্বাইয়ের বহু বাঙ্গালী ও অ-বাঙ্গালী এ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

আসন্ন রেল ধর্ম্মঘট—

ভারতের সকল স্থানের সকল রেলকর্ম্মী সমবেতভাবে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে কর্ত্তৃপক্ষ রেল কর্ম্মীদের অভাব অভিযোগে কর্ণপাত না করায় তাহারা সকলে আগামী ২৭শে জুন হইতে ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিবেন।



শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর সভানেত্রীত্বে সিঁথি এমারেল্ড লাইব্রেরীর রজত জয়ন্তী উৎসব ফটো—নীরেন ভাদুড়ী

আড়িয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার—

চব্বিশ পরগণা কামারহাটি মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত এই দাতব্য প্রতিষ্ঠানটির জনকল্যাণকর সুনিশ্চিত পরিকল্পনাগুলি ক্রমশঃ কার্য্যে পরিণত হইতেছে এবং সদনুষ্ঠানে অগ্রণী সহৃদয় বদান্য ব্যক্তিবা প্রতিষ্ঠানটির কার্য্য-পদ্ধতি দর্শনে প্রীত হইয়া নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ভাণ্ডারের পুরাতন ভবনে বালিকা বিদ্যালয় ও হোমিওপ্যাথী দাতব্য চিকিৎসা যেমন সুষ্ঠুভাবে চলিয়াছে, নূতন বিস্তীর্ণ ভবনে এলোপ্যাথী দাতব্য চিকিৎসার বিভিন্ন বিভাগগুলিকে আরও উন্নত করা হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের চক্ষুরোগ বিশারদ ডাঃ বি, এম, চট্টোপাধ্যায় সপ্তাহে এক দিন করিয়া রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিতেছেন। ইণ্ডিয়ান ড্রাগসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাঁহার ঔষধালয়ের ঔষধপত্র বিনামূল্যে ভাণ্ডারকে প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের জনৈকা বহুদর্শী ধাত্রীকে ভাণ্ডারের

প্রসূতি সদনে পরিচর্য্যাকল্পে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং আগামী বাজেটে অতিরিক্ত আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী বাবু নারায়ণদাস বাজোরিয়া শিশু ও প্রসূতিদের জন্য একখানি ঘর তাঁহার স্ত্রীর নামে নির্ম্মাণ করিয়া দিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং পাঁচজন মহানুভব দাতা প্রসূতি-সদনের জন্য এক একটি 'বেড'এর জন্য প্রত্যেকে নির্দিষ্ট পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গুহের অব্যাহতি লাভ—

শ্রীযুক্ত এস-সি-গুহ সিঙ্গাপুরের খ্যাতনামা ব্যক্তি। সিঙ্গাপুর জাপানের কবলে যাইলে তিনি তথায় স্বাধীনতা



শ্রীযুক্ত এস্‌-গুহ

লীগের সভাপতি হইয়াছিলেন। পরে বৃটীশ সিঙ্গাপুর দখল করিলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত ২৩শে মার্চ্চ তিনি অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন।

তরুণ-ধর্ম-সংঘ—

স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ধর্ম বিষয়ক উপদেশ দিবার জন্য তরুণ ধর্ম-সংঘ নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। আধুনিক শিক্ষার মধ্যে ধর্ম বিষয়ক শিক্ষার অভাব যে অত্যন্ত গুরুতর ত্রুটি ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন। ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া বিদ্যা-বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিলে ভোগবহুল এবং ইহলোক-সর্বস্ব সভ্যতার সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিক ভয়াবহ পরিণাম দেখিয়া অনেকে সন্ত্রস্ত হইয়াছেন। ধর্মহীন শিক্ষার দ্বারা আমাদেরও যাহাতে সেরূপ অবস্থা না হয় তাহার জন্য আমাদের পূর্ব হইতে সতর্ক হইতে হইবে। আমাদের গৌরবময় প্রাচীন কীর্ত্তির সহিত পরিচিত না হইয়া আধুনিক ছাত্রগণ পাশ্চাত্য সভ্যতার হীন অনুকরণ করেন দেখিয়া আমরা লজ্জাবোধ করি। আমরা আশা করি স্কুলে ও কলেজে ধর্মগ্রন্থ অবশ্য পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হইবে এবং ম্যাট্রিকুলেশন, আই-এ প্রভৃতি পরীক্ষাতে ধর্মবিষয়ক একটি প্রশ্ন পত্র থাকিবে। খৃষ্টান কলেজে যদি হিন্দুর ছেলেকেও বাইবেল পড়িতে বাধ্য করা যায় তাহা হইলে রামায়ণ মহাভারত গীতা উপনিষদ প্রভৃতি পড়ান কেন সম্ভব হইবে না তাহা বোঝা যায় না। অবশ্য মুসলমান ছাত্রদের জন্য কোরাণ পাঠের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা মনে করা ভুল যে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা হইলে সাম্প্রদায়িক কলহ বৃদ্ধি পাইবে। ধর্মবিষয়ে অজ্ঞতাই কলহের কারণ। ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা হইলে কলহ কমিবে। তরুণ-ধর্ম-সংঘের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে কয়েকজন হাইকোর্টের বিচারপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের নাম দেখিলাম। ইহার সভাপতি মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ। ইহার সম্পাদক শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। আফিসের ঠিকানা, ৩নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্কুল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিলে বিনা ব্যয়ে স্কুল বা কলেজে ধর্মোপদেশক পাঠান হইবে। ইতিমধ্যে কয়েকটি স্কুল ও কলেজে ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছে।

মেজর জেনারেল এ-সি চট্টোপাধ্যায়—

আজাদ-হিন্দ-সরকারের অন্যতম মন্ত্রী মেজর-জেনারেল এ-সি-চট্টোপাধ্যায় গত ৩রা মে দিল্লীতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এম-বি পাশ করিয়া ১৯১৬ সাল হইতে তিনি সরকারী চাকরী করিতেছিলেন। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে সিঙ্গাপুরে চাকুরী করিতে যান—তাঁহার গমনের ২দিন পরে সিঙ্গাপুরের পতন হয় ও তিনি জাপানীদের হাতে বন্দী হন। তিনি লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্গত প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র।

রামদাস বাবাজীর জন্মোৎসব—

বাঙ্গালার খ্যাতনামা বৈষ্ণব সাধক, কীর্ত্তনীয়া ও পণ্ডিত শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের ৭০তম জন্মদিবস উপলক্ষে গত ২৪শে চৈত্র সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে কলিকাতা ২৫, বাগবাজার ষ্ট্রীটে পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণের সভাপতিত্বে এক উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। সভায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য্য, ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, শ্রীযুত কিশোরীমোহন গুপ্ত প্রভৃতি বাবাজী মহাশয়ের জীবনী ও কার্য্যাবলী বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বাবাজী মহাশয়ের জীবনী ও তাঁহার বিষয়ে বিভিন্ন সুধীমণ্ডলীর রচনা সম্বলিত একখানি পুস্তক প্রকাশের প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় বাবাজী মহাশয়ের অসাধারণ প্রতিভার বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন।


রামদাস বাবাজী　ফটো—সুদিন রায়

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়—

গত ২১শে চৈত্র সুসাহিত্যিক রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। উপন্যাস ও ছোট গল্প রচনা করিয়া তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'কলঙ্কিনীর খাল' ধারাবাহিকরূপে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়াও 'সবিনয় নিবেদন' 'বিস্ময়' 'বেদিয়া ছন্দ' প্রভৃতি উপন্যাসও পাঠক সমাজে সমাদৃত হইয়াছে। তিনি আলিপুরের উকীল ছিলেন।

ভুলাভাই দেশাই—

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সদস্য, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলের ভূতপূর্ব্ব নেতা, বোম্বায়ের খ্যাতনামা এডভোকেট ভুলাভাই দেশাই গত ৫ই মে রাত্রি ১টার সময়ে বোম্বায়ে ৭০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও বোম্বায়ে এডভোকেট জেনারেল ছিলেন। তাঁহাকে বোম্বাই গভর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্য পদ বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতির পদ প্রদান কর হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই।

প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন—

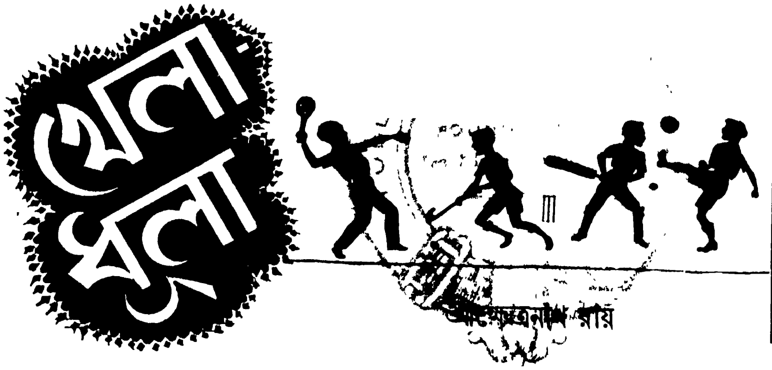
গত ১৯শে এপ্রিল মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানার হাঁসচড়া গ্রামে কাঁথী ও তমলুক মহকুমা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনের এক অনুষ্ঠান হয়। 'যুগান্তর' সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বনবিহারী গায়েন তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন ও সম্মেলনে আগত প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষক প্রতিনিধিগণকে আদর আপ্যায়ন করেন। উদ্বোধনী অভিভাষণ ও সম্পাদকের বিবৃতি পাঠের পর সভাপতি সুদীর্ঘ অভিভাষণে শিক্ষকদের অভাব অভিযোগ ও তাহার প্রতিকারের বিষয় বলেন।

প্রাথমিক শিক্ষকগণের দাবী—

গত ৪ঠা এপ্রিল বাঙ্গালার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের এক সভায় তাহাদের দাবী জানান হইয়াছে। নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সে সময় সভাপতিত্ব করেন। এখনও প্রাথমিক শিক্ষকগণ মাসে ১৬, ১৪ ও ১০ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। সকল ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষকের মাসিক ৫০ টাকা বেতন ও ট্রেনিং অপ্রাপ্ত শিক্ষকের মাসিক বেতন ৪০ টাকা দাবী করা হয় ও উভয় পক্ষে ১৫ টাকা মাগ্‌গী ভাতা দাবী করা হয়। সকল বিদ্যালয়ে প্রভিডেণ্ট ফণ্ড খুলিতে বলা হয় ও জেলা স্কুল বোর্ডগুলিকে কার্য্যকরী প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠনের দাবী করা হইয়াছে।

ডাক্তার রাধাবিনোদ পাল—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলার ও কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ডক্টর রাধাবিনোদ পাল যুদ্ধ-অপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত টোকিও আদালতের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া গত ৫ই মে টোকিও যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার এই সম্মান লাভ বাঙ্গালী জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয়।



খেলা ধুলা

ক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

বাইটন কাপ ফাইনাল ঃ

পোর্ট কমিশনার বাইটন কাপ ফাইনালে ২-১ গোলে বি এন রেলদলকে হারিয়ে এবছরের কাপ বিজয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে পোর্ট কমিশনার এবার হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানও হয়েছে। ইতিপূর্বে কাষ্টমস ক্লাব ১৯০৯, ১৯১০, ১৯১২, ১৯২৬, ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৩২ এবং ১৯৩৮ সালে মোট ৮বার, একই বছরে লীগ ও বাইটন কাপ বিজয়ী হয়ে যে রেকর্ড করেছে তা কেউ ভাঙ্গতে পারে নি। বি ই কলেজ ১৯০৫ সালে প্রথম লীগ ও কাপ বিজয়ী হয়েছিল। ১৯১৫, ১৯১৭ এবং ১৯৩৪ সালে রেঞ্জার্স ক্লাব লীগ ও কাপ পেয়েছে। মোট এই চারটি ক্লাব double honours পেয়েছে। তবে পোর্ট কমিশনার এবার হকি খেলায় যে রেকর্ড করেছে ইতিপূর্ব্বে কোন ক্লাব তা করতে পারে নি। তারা এবছর প্রথম বিভাগের হকি লীগ, বাইটন কাপ, সেকেণ্ড 'বি' লীগ এবং উইন্টার লীগ বিজয়ী হয়েছে—হকি খেলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইল। অপরদিকে হকি খেলায় বি এন রেলদলের রেকর্ড কাষ্টমস ক্লাবের পরই। রেলদল ইতিপূর্ব্বে ১৯৩৭, ১৯৩৯, ১৯৪৩, ১৯৪৪ এবং ১৯৪৫ সালে কাপ বিজয়ী হয়েছিল এবং রানার্স আপ হয়েছিল ১৯৩১, ১৯৩২, ১৯৩৫, ১৯৩৮ এবং ১৯৪২ সালে। রেলদল পর্য্যায়ক্রমে তিন বছর (১৯৪৩-১৯৪৫) বাইটন কাপ বিজয়ী হয়েছে এবং ১৯৪২-৪৬ সাল পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে পাঁচ বছর ফাইনালে উঠেছে। এবারের ফাইনাল খেলায় দুই দলের মধ্যে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে এবং শেষ পর্য্যন্ত পোর্ট কমিশনার দল বিজয়ী হয়। রেলদলও জয়লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে কিন্তু সেকেণ্ড হাফে পোর্ট কমিশনার দলের ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়দের দম ও গতিবেগের সঙ্গে কোন মতেই পাল্লা দিতে পারে নি। রেলদল তাদের অলিম্পিক খেলোয়াড় কার, গ্যালিবার্ডি এবং ট্যাপসেলকে পেয়েও পোর্ট কমিশনার দলের তরুণ খেলোয়াড়দের কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

হকি লীগ ঃ

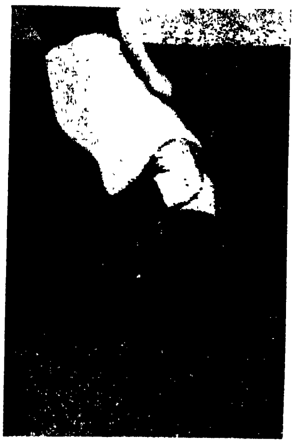
প্রথম বিভাগের হকি লীগে গত বছরের লীগ বিজয়ী পোর্ট কমিশনার ২-০ গোলে রেঞ্জার্সকে হারিয়ে এ বছরেও লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। দ্বিতীয় বিভাগের হকি লীগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ভবানীপুর ক্লাবকে হারিয়ে গ্রেল ক্লাব। ভবানীপুর দ্বিতীয় স্থানে আছে।

আগা খাঁ হকি কাপ ঃ

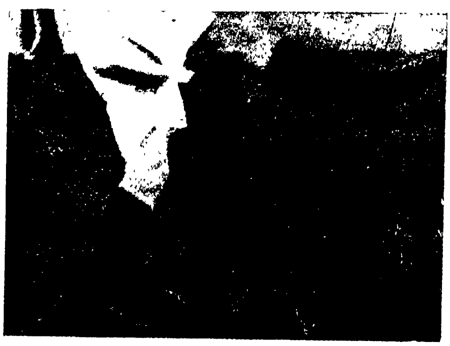
বোম্বাইয়ের জিমখানা মাঠে ইন্দোরের কল্যানমল মিলস ৪-২ গোলে ভূপাল ওয়াণ্ডারার্সকে হারিয়ে এ বছর আগা খাঁ হকি কাপ বিজয়ী হয়েছে। কল্যানমল মিলস সেমি-ফাইনালের দ্বিতীয় দিনের খেলায় ২-০ গোলে রাউল-পিণ্ডির স্পার্টান্স ক্লাবকে হারিয়ে ফাইনালে যায়। ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স ৩-০ গোলে জি আই পি রেলদলকে অপর-দিকের সেমি-ফাইনালে হারিয়ে কল্যানমল মিলস দলের সঙ্গে ফাইনালে মিলিত হয়। ফাইনালে কল্যানমল মিলস দলের খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড খুবই উন্নত হয়েছিল। তাদের টীম ও ষ্টিক ওয়ার্ক এবং পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স দলকে বিপর্য্যস্ত করেছিল। ব্যক্তিগতভাবে তাদের প্রত্যেক খেলোয়াড়ই উন্নত খেলার পরিচয় দেয়।

ফুটবল ইণ্টার ন্যাশানাল ঃ

ফুটবল ইণ্টার ন্যাশানাল খেলায় স্কটল্যাণ্ড শেষ সময়ে ইংলণ্ডকে এক গোল দিয়ে গত চার বছর পর বিজয়ী হ'ল। খেলা হয়েছিল গ্লাসগোর হাম্পডেন পার্কে ১৩৫,০০০ দর্শকদের সামনে।







স্থির বল কিক্ করার নির্ভুল পন্থা ঃ

স্থির বল 'Kick' করতে হলে যে পা দিয়ে বল 'Kick' করা হবে না সেই পা খানি বলের ঠিক গায়ে রেখে অন্য পা খানি পিছনে চালিয়ে সজোরে বলের উপর মারতে হবে

স্যর আশুতোষ চৌধুরী কাপ ঃ

বি ই কলেজ ৩-১ গোলে সেণ্ট জোসেফ কলেজকে হারিয়ে স্যর আশুতোষ চৌধুরী কাপ বিজয়ী হয়েছে।

ফুটবল মরসুম ঃ

ক'লকাতায় ফুটবল মরসুম আরম্ভ হয়েছে। সবে মাত্র খেলা আরম্ভ হয়েছে দর্শকদের কাছে খেলার আকর্ষণ এখনও তেমন জমে নি। এদিকে আই এফ এ-র জেনারেল মিটিংয়ে স্থির হয়েছিল এবার থেকে লীগের সকল বিভাগেই উঠা নামা পূর্ব্বের মত চলবে কিন্তু পরে হঠাৎ আর এক সভায় উঠা নামা বন্ধ রাখা হবে বলে স্থির হয়েছে। ফলে সহরের জুনিয়ার ক্লাবগুলির মধ্যে রীতিমত বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ফুটবল মরসুম আরম্ভের ঠিক চারদিন আগে আই এফ এ লীগে উঠা নামা বন্ধ রাখার পক্ষে রাজী হয়ে নিজের সম্মানই কেবল হারায়নি জুনিয়ার ক্লাবগুলির প্রতি অবিচার করেছে। যুদ্ধের অজুহাতে অনেক দিন লীগে উঠা নামা বন্ধ ছিল এখন কি কারণে আই এফ এ সেই ব্যবস্থা এখনও বজায় রাখতে পারে? লীগে উঠা নামার উদ্দেশ্য একদিকে প্রথম স্থান অধিকারী ফুটবল টীমের যোগ্যতা স্বীকার ক'রে তাদের প্রমোশন দিয়ে আরও ভাল খেলার সুযোগ দেওয়া এবং নিম্ন স্থান অধিকারী দলকে এক ধাপ নামিয়া খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখা। যেভাবে এবং যে অবস্থায় আই এফ এ লীগে উঠা নামা বন্ধ রাখার সমর্থন করেছে তাতে প্রথম বিভাগের ফুটবল দলগুলির উপর পক্ষপাতিত্ব ক'রে অপরাপর বিভাগীয় দলগুলির উপর অবিচার করা হয়েছে তা যে কোন সভ্য দেশ স্বীকার করবে। মাড়োয়ারী ক্লাবের (অধুনা রাজস্থান ক্লাব) অবৈতনিক সম্পাদক মিঃ বিনায়কপ্রসাদ টিমৎসিংকা আই এফ এর এই নীতি সম্পর্কে সংবাদপত্র মারফৎ এক বিবৃতি দিয়ে জনসাধারণের কাছে আই এফ এ-র স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। আই এফ এ-র মর্য্যাদা রক্ষা করতে হলে পরিচালক মণ্ডলীকে ধীর বুদ্ধিতে বর্ত্তমান অবস্থা অনুধাবন করা উচিত।

এফ এ কাপ ফাইনাল ঃ

যুদ্ধের দরুণ ১৯৩৯ সাল থেকে ফুটবল এসোসিয়েশন কাপের খেলা বন্ধ ছিল। পুনরায় এবছর খেলা আরম্ভ



এক পাশ থেকে বল 'Tackle' করবার জন্য অগ্রসর হয়েছে

হয়েছে। ২৭শে এপ্রিল এফ এ কাপের ফাইনাল হয়ে গেছে। সে কি বিরাট আয়োজন, দর্শকদের মধ্যে কি উদ্দীপনা। ফাইনালে উঠেছিল ডার্বি এবং চার্লটোন



নিভু'লভাবে 'Tackle' করছে

এ্যাথলেটিক। ১০০,০০০ হাজার দর্শক এম্পায়ার ষ্টেডিয়ামে এফ এ কাপের ফাইনালে খেলা দেখার জন্য টিকিট কিনে, টিকিট বিক্রী হয়েছিল ৪৫,০০০ পাউণ্ডের। এত বেশী অর্থ ইতিপূর্ব্বে কোন ফাইনাল খেলায় উঠে নি। ডার্বি দল টসে জেতে। খেলা আরম্ভ হ'ল। পনের মিনিটের মধ্যে কোন গোল হ'ল না। প্রথম দিকে খেলাটী খাপ ছাড়া হচ্ছিল। ডার্বি দলই প্রথম খেলায় নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখলো। খেলায় উভয় দলই গোল



খেলোয়াড়ের 'Tackle' করার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে

করার সুযোগ নষ্ট করেছে তবে ডার্বি দলের আক্রমণ পদ্ধতি অনেক উন্নত ছিল। খেলার নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল উভয় দিকেই একটি ক'রে গোল হয়েছে। খেলার

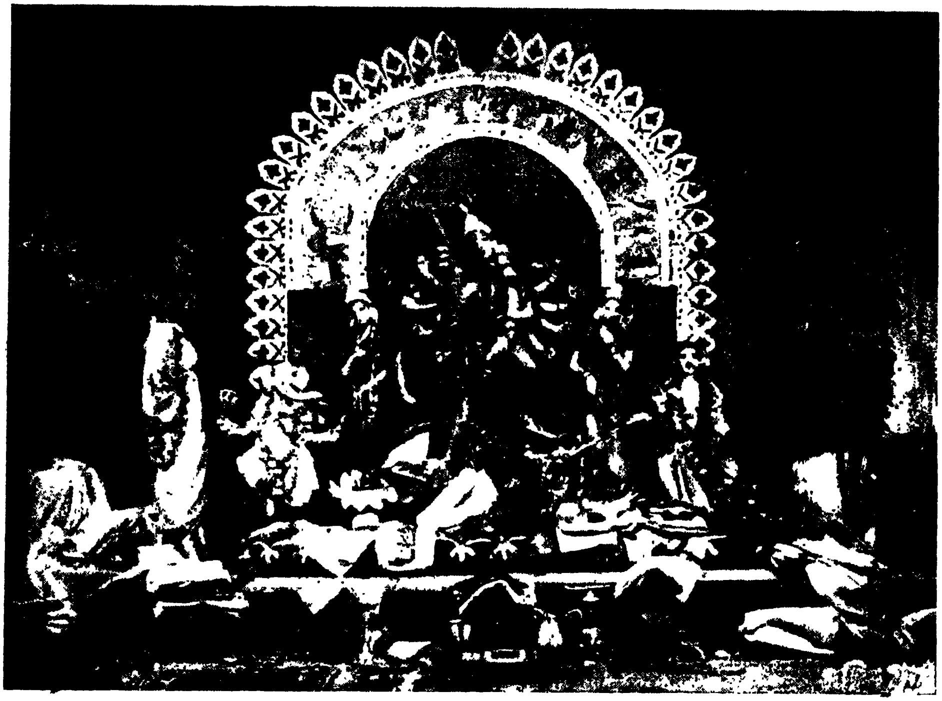


সামনের দিকে 'Tackle' করার ঠিক পদ্ধতি

অতিরিক্ত সময়ে ডার্বি দল ৪-১ গোলে চার্লটোন এ্যাথলেটিক দলকে হারিয়ে কাপ বিজয়ী হ'ল।

সিমলায় প্রতিমাপূজা—

সিমলার কালীবাড়ীর প্রতিমা মিত্র হলে এবৎসর সর্ব্বপ্রথম প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া দুর্গোৎসব করা হইয়াছে। ১৯২২, ২৩ ও ২৪ সালে সিমলার একাংশ টুটিকাণ্ডিতে প্রতিমা পূজা হইয়াছিল তাহার পর আর হয় নাই। সাহিত্যিক শিল্পী শ্রীমান ধীরেন ও শ্রীবিনোদ কর্ম্মকার প্রতিমা নির্ম্মাণ করেন। রায় সাহেব যতী



সিমলায় দুর্গোৎসব



শ্রীহরিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

নাথ চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীমোহন চক্রবর্ত্তী, রমণীমোহন ভট্টাচার্য্য, জগদীশ সেন, দ্বিজেন মল্লিক, সুশীল মিত্র, শিবদাস চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্ল মিত্র, উপেন্দ্র মজুমদার, মুরারী মিত্র, অমরেশ দত্ত, সুশীল দাশ গুপ্ত প্রভৃতি উৎসবে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মানিত—

২৪ পরগণা বেলঘরিয়ানিবাসী খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীযুত হরিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি কামারহাটী মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ঐ অঞ্চলের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ও কলিকাতার সাংবাদিক মহলে সুপরিচিত।

শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন পোদ্দার—

ইনি ঢাকা নারায়ণগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বঙ্গীয় মহাজন সভা নামক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। এবার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা

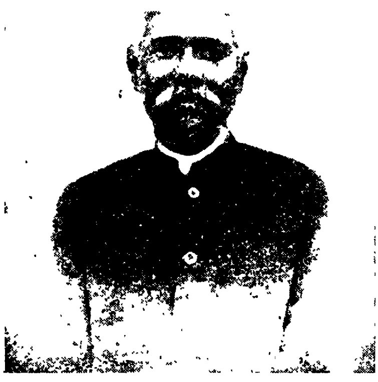
পরিষদের নির্ব্বাচনে তিনি বিনাবাধায় সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মধ্যে তিনি কিছুকাল হিন্দু মহাসভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নির্ব্বাচনের পর তিনি সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেস দলে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্য বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বত্র বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছে।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচন সংক্রান্ত কার্য্যে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সহসা হৃদ্‌রোগে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে ২ মাস কাল সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিতে উপদেশ দেওয়ায় তিনি আর নির্ব্বাচন সংক্রান্ত কাজ করিবেন না—নিজেও ভোট যুদ্ধ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। স্বাস্থ্যলাভের জন্য তাঁহাকে সমুদ্র যাত্রা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমরা তাঁহার সত্বর আরোগ্য কামনা করি ও প্রার্থনা করি, তিনি সুস্থ সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া দেশসেবায় ব্রতী থাকুন।

পরলোকে সুরেন্দ্রনাথ দে—

সুপ্রসিদ্ধ গণিতশাস্ত্রবিদ্ ৺গৌরীশঙ্কর দের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং রিপণ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ৺দেবশঙ্কর দের পুত্র রায় সাহেব সুরেন্দ্রনাথ

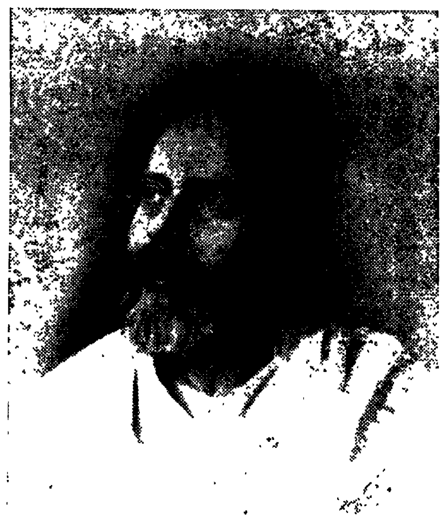


রায় সাহেব সুরেন্দ্রনাথ দে

দে গত ৩১শে অক্টোবর প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ১৮ই মার্চ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন, ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতৃহীন হন এবং স্বকীয় চেষ্টায় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রিপণ কলেজ হইতে বি-এ উপাধি এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে কৃষি-বিদ্যায় সম্মানজনক ডিপ্লোমা লাভান্তর ক্রমান্বয়ে উত্তরপাড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুল, হাওড়া জিলা স্কুল এবং শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বিজ্ঞান ও কৃষিবিদ্যার শিক্ষকতা করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'রায় সাহেব' উপাধিতে ভূষিত করেন। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষায়তনে (D. P. H. Class) প্রতিষ্ঠিত হইলে উহাতে তিনি অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার আবগারী পরীক্ষাগারে প্রধান রাসায়নিকরূপে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

পরলোকে পাঁচকড়ি দে—

বাঙ্গালার ডিটেক্‌টিভ সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক পাঁচকড়ি দে গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ৭২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন



পাঁচকড়ি দে

করিয়াছেন। তাঁহার রচিত ডিটেক্‌টিভ্ গ্রন্থগুলি রহস্যোদ্দীপক ছিল বলিয়া বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। তিনি একাধারে রহস্যস্রষ্টা ও কবি ছিলেন।

মহারাণী কাশীশ্বরী নন্দী

স্বর্গত দানবীর মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বিধবা পত্নী ও মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর মাতা কাশীশ্বরী নন্দী গত ৬ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটার সময় কাসিমবাজারে ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি স্বামীর উপযুক্তা সহধর্ম্মিণী ছিলেন ও দানের জন্য সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয়া ছিলেন। বহরমপুরের অম্বিকা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও বর্দ্ধমান যবগ্রামের উচ্চ ইংরাজী

বালক বিদ্যালয় তাঁহার নামে নামকরণ করিয়া দেশবাসী তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

পরলোকে কবিরাজ দীননাথ শাস্ত্রী—

গত ৬ই কার্ত্তিক কলিকাতার কবিরাজ দীননাথ শাস্ত্রী পরলোক-গমন করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং তিনি কলিকাতার অন্যতম প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। আয়ুর্ব্বিজ্ঞান বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি শত শত ছাত্রকে নিজ ব্যয়ে বাড়ীতে রাখিয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকাসমূহে তিনি বহু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

পরলোকে প্রতুলপতি গাঙ্গুলী—

কলিকাতা সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার প্রতুলপতি গাঙ্গুলী গত ৫ই ডিসেম্বর কলিকাতা বালীগঞ্জ ৬নং পদ্মপুকুর রোডে ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।



কবিরাজ দীননাথ শাস্ত্রী

রণ-সঙ্গীত

অনুবাদক শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

মূল—

কদম কদম বঢ়ায়ে জা
খুসীকে গীত গায়ে জা
(এ) জিন্দগী হ্যায় কোমকী
(তো) কোমপে লুটায়ে জা।
তু শেরে হিন্দ, আগে বঢ়
মরণসে ফির ভী তু ন ডর
আসমান্ তক উঠাকে সর
যোশে বতন বঢ়ায়ে যায়॥
তেরে হিম্মৎ বঢ়তি রহে
খুদা তেরি শুনতা রহে
জো সাম্‌নে তেরে চঢ়ে
(তো) খাক্‌মে মিলায়ে যায়।
চলো দিল্লী পুকারকে
কোমী নিশান সামহালকে
লাল কিল্লে গাড়কে
লহরায়ে জা লহরায়ে জা॥

অনুবাদ—

কদম কদম আগিয়ে চল্,
আনন্দ-গান তোল্ উছল,
এই জীবন জাতির তরেই
জাতির তরেই লুটিয়ে যাক্।
হিন্দের বীর এগিয়ে যাও,
মরণে কখনো ভয় না পাও,
আকাশে ঠেকায়ে উচ্চ শির
দেশের শক্তি বাড়াতে থাক্॥
হিম্মৎ তোর বাড়ছে জোর,
খোদা শুনছেন আর্জি তোর,
সাম্‌নে যাহারা হয় চড়াও
ছাই হ'য়ে তারা মিলিয়ে যাক্।
"চলো দিল্লী" জোর হেঁকে
জাতির পতাকা বুকে রেখে
লাল কেল্লায় উড়াইতে
দলে দলে তোরা ছুটতে থাক্॥

খেলা ধুলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

অষ্ট্রেলিয়ানস—৪২৪ (৮ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড) ও ৩০৪ (৫ উইকেট) প্রিন্সেস একাদশ—৪০১

'অষ্ট্রেলিয়ান্স সার্ভিসেস ক্রিকেট টিম' ভারতে তাদের দ্বিতীয় খেলাটিও লাহোরের প্রথম খেলার মত ড্র করেছে।

অষ্ট্রেলিয়ান্স: ১ম ইনিংস—হাসেট ১৮৭ এবং উইলিয়মস ১০০ নট আউট। দ্বিতীয় ইনিংস—হাসেট ১২৪ নট আউট। প্রিন্সেস—মুস্তাক আলি ১০৮ এবং অমরনাথ ১৬৩।

অষ্ট্রেলিয়ান্স সার্ভিসেস ঃ ৩৬২ ও ৮৮ (২ উইকেট)

পশ্চিম অঞ্চল একাদশ ঃ ৫০০

(৯ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

অষ্ট্রেলিয়ান্স: ১ম ইনিংস—কে মিলার ১০৬ এবং প্রাইস ৫৫ আমীর ইলাহী ৪ উইকেট। পশ্চিমাঞ্চল একাদশ—আর এস মোদী ১৬৮, ভি এম মার্চেণ্ট ৭৭ এবং ডি জি ফাদকার নট আউট ৭১। এলিস ১১৩ রানে ৪ উইকেট।

প্রথম টেষ্ট ম্যাচ ঃ

অষ্ট্রেলিয়ান্স ঃ ৫৩১ ও ৩১ (১ উইকেট)

ভারতীয় একাদশ ঃ ৩৩৯ ও ৩০৪

বোম্বাইতে অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের সঙ্গে ভারতীয় একাদশ দলের প্রথম বে সরকারী টেষ্ট খেলাটী ড্র হয়েছে।

অষ্ট্রেলিয়ান্স দল প্রথম টসে জিতে ব্যাট ক'রে প্রথম ইনিংসে ৫৩১ রান করে। জে পেটিফোর্ডের ১২৪, ডি কে কারমোডীর ১১৩, পেপারের ৯৫, জে ওয়ার্কম্যানের ৭৬ এবং এ এস হাসেটের (ক্যাপটেন) ৫৩ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাজারী ৪০ ওভার বলে ৯টা মেডান নিয়ে ১০৯ রান দিলেন, উইকেট পেলেন দলের মধ্যে বেশী ৫টা। সি এস নাইডু পেলেন ৩টে—৪৮ ওভার বলে ৭টা মেডেন পেয়ে এবং ১৪১ রান দিয়ে।

ভারতীয় একাদশ দলের প্রথম ইনিংস ৩৩৯ রানে শেষ হ'ল। দলের সর্ব্বোচ্চ রান করলেন ভি এস হাজারী ৭৫। এর পর অমরনাথ ৬৪। পেপার সর্ট লেগে অমরনাথকে উইলিয়ামসের বলে লুফেনিলেন। হাজারীও উইলিয়ামসের বলে বোল্ড হলেন। উইলিয়মসে, পেপার, এলিস এবং প্রাইস প্রত্যেকেই ২টো করে উইকেট পেলেন। ১৯২ রান পিছিয়ে থাকায় ভারতীয় দলকে 'ফলো অন' করতে হ'ল। খেলা শেষ হবার ১৫ মিনিট আগে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ হ'ল এবং কোন উইকেট না হারিয়ে ভারতীয় দলের ৭ রান উঠলো।

খেলার চতুর্থ দিনে অর্থাৎ শেষ দিনে ভারতীয় একাদশ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৩০৪ রানে শেষ হ'ল। ভি এম মার্চেণ্ট দলের সর্ব্বোচ্চ ৬৯ রান করলেন। প্রাইস এবং পেপার ৩টে ক'রে উইকেট পেয়ে বোলিংয়ে কৃতিত্ব দেখালেন।

অষ্ট্রেলিয়ান্স দলকে জিততে হলে ১১৩ রান দরকার, সময় মাত্র ২০ মিনিট। এ একেবারে অসম্ভব ব্যাপার জেনেও তারা খুবই উদ্দীপনার সঙ্গে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। এক উইকেটে ৩১ রান উঠলে পর খেলা বন্ধ হয়ে গেল। প্রথম বে-সরকারী টেষ্ট ম্যাচ ড্র হ'ল।

অষ্ট্রেলিয়ান্স ঃ ৩০০ ও ৮৫ (৩ উইকেট)

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাদশ দল ঃ ৩৮৫

(১ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

পুণায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাদশ দলের সঙ্গে দুদিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ান্স দল তাদের পঞ্চম খেলাটিও ড্র ক'রে।

টসে জিতে অষ্ট্রেলিয়ান্স দল প্রথম ব্যাটিং করে ৩০০ রানে তাদের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করে। মাত্র পাঁচ রানের জন্যে এ এল হাসেট সেঞ্চুরী করতে পারলেন না। তাঁর পরই সি পেপারের ৫০ রান উল্লেখযোগ্য।

হাতে ৪০ মিনিট সময় পেয়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাদের প্রথম ইনিংস আরম্ভ করলো এবং প্রথম দিনের শেষে এক উইকেট

হারিয়ে ৪১ রান উঠল। দ্বিতীয় দিনে পূর্ব্বদিনের নট আউট ব্যাটসম্যান এম আর রেগ এবং এ হাফেজ ব্যাট ক'রে দ্রুত রান তুলতে লাগলেন। এক উইকেটে ৩৮৫ রান উঠলে পর বিশ্ববিদ্যালয় একাদশ দল ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করলে। রেগ ২০০ রান এবং হাফেজ ১৬১ রান ক'রে নট্ আউট রইলেন। ভারতে কোন আগত দলের বিরুদ্ধে ডবল সেঞ্চুরী কেউ করতে পারেনি, রেগই এই প্রথম সে গৌরব পেলেন। তা ছাড়া রেগ এবং হাফেজের দ্বিতীয় উইকেটের জুটীতে ৩৪৪ রানও ভারতীয় ক্রিকেট মহলে ভারতীয় রেকর্ড বলে পরিগণিত হ'ল।

অষ্ট্রেলিয়ান্স : ১০৭ ও ৩০৪

পূর্ব্বাঞ্চল একাদশ দল : ১৭১ ও ২৮৪ (৮ উইকেট)

কলকাতার ইডেন গার্ডেনে পূর্ব্বাঞ্চল একাদশ দল ২ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়ান দলকে হারিয়েছে। এবারও অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের ক্যাপটেন টসে জয়লাভ করে তাঁরা প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ পেলেন। ইডেন গার্ডেনের উইকেট বরাবরই বোলারদের সুবিধা করে দিয়ে এসেছে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। মাত্র ১০৭ রানে লাঞ্চের পাঁচ মিনিট আগে অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গেল। সর্ব্বোচ্চ রান হ'ল মাত্র ২৫। এন চৌধুরী, সি এস নাইডু এবং সি টি সারভাতে প্রত্যেকে ৩টে ক'রে উইকেট পেলেন।

লাঞ্চের পর পূর্ব্বাঞ্চল একাদশ দলের প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ হল। দর্শক সমাগম ভালই হয়েছে। সকলেই আশা করছিলেন যখন এত অল্প রানে বিপক্ষদলের প্রথম ইনিংস শেষ করা গেছে তখন ভারতীয় দলের ব্যাটসম্যানরাও বোলারদের মত কৃতিত্ব দেখাতে পারবে। কিন্তু তা হল না। ১৭১ রানে ইনিংস শেষ হয়ে গেল ৪.৩২ মিনিটে। ৫ মিনিটে ডেনিস কম্পটন, মুস্তাক আলি এবং নিম্বলকার এই তিনজন ভাল খেলোয়াড় আউট হয়ে দর্শকদের হতাশ করলেন। মুস্তাক আলির ভুলে ডেনিস কম্পটন কোন রান না করেই রান-আউট হলেন। দলের মধ্যে মুস্তাক আলির ৪৬ রানই সর্ব্বোচ্চ হ'ল।

ডি ক্রিষ্টোফানি ১৫ ওভার বলে ২ মেডেন নিয়ে এবং ৪৬ রান দিয়ে ৪টে উইকেট পেলেন। প্রাইস পেলেন ৩টে, ৭ ওভার বলে ২ মেডেন নিয়ে আর মাত্র ১৪ রান দিয়ে। অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ হল। সূচনা খুব ভাল হ'ল না। প্রথম দিনের শেষ দেখা গেল ৩টে উইকেট পড়ে তাদের মাত্র ২৯ রান উঠেছে। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের শোচনীয় অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হল। হ্যাসেট ১২৫ এবং ক্রিষ্টোফানী ৬৯ রান করে আউট হলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩০৪ রানে শেষ হল। ঐ দিনের খেলার শেষে পূর্ব্বাঞ্চল একাদশ দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেট পড়ে গিয়ে ১২২ রান উঠল। মুস্তাক আলী এবং ডেনিস কম্পটন যথাক্রমে ৫৩ এবং ৩৯ রান করে নট আউট থাকেন। তৃতীয় দিনের খেলায় ৫৮ রান করে মুস্তাক আলি আউট হলেন। ডেনিস কম্পটন করলেন ১০১ রান। শেষের দিকে পূর্ব্বাঞ্চল দলের উইকেট তাড়াতাড়ি পড়তে লাগল। দলের এ সঙ্কট সময়ে নিম্বলকার এসে দ্রুত রান তুলে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। ৮ উইকেটে ২৮৪ রান উঠলে পর খেলা শেষ হয়ে গেল। পূর্ব্বাঞ্চল দল ২ উইকেটে বিজয়ী হল। ভারতবর্ষে অষ্ট্রেলিয়ান্সদলের এই প্রথম পরাজয়।

দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ ঃ

ভারতীয় দল : ৩৮৬ ও ৩৫০ (৪ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

অষ্ট্রেলিয়ান্স : ৪০২ ও ৪৯ (২ উইকেট)

কলকাতার ইডেন গার্ডেনে ভারতীয় দলের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের দ্বিতীয় বে সরকারী ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ ড্র হয়েছে। রবিবার ২৫শে নভেম্বর টেষ্ট ম্যাচ খেলা উপলক্ষে বিপুল জনসমাগম হয়েছিল। লাঞ্চের সময় প্রায় ২৫০০০ হাজার দর্শক খেলার মাঠে উপস্থিত ছিল বলে অনেকের ধারণা। ইতিপূর্ব্বে কোন ক্রিকেট খেলাতে এত দর্শক দেখা যায়নি। এমন কি ফুটবল খেলার দর্শক সংখ্যাও ছাড়িয়ে নতুন রেকর্ড করেছে। বহুলোক টিকিটের অভাবে হতাশ হয়ে মাঠ থেকে ফিরেছে। লাঞ্চের সময় সমস্ত গেট বন্ধ হয়ে যায়।

ভারতীয়দলের ক্যাপটেন ভি এম মার্চেণ্ট টসে জয়লাভ করে তিনি নিজে মানকদকে নিয়ে ব্যাট করতে নামলেন।

ভারতীয় দলের সূচনা খুব ভাল হল না। মার্চেণ্ট ১২ রান ক'রে রান আউট হলেন, দলের রান তখন ৩৬। মুস্তাক আলি মানকদের জুটী হলেন। লাঞ্চের সময় ৩ উইকেট পড়ে গিয়ে রান উঠেছে ১০২। মার্চেণ্ট ১২, মুস্তাক আলি ৩১ এবং অমরনাথ • রান করে আউট হয়েছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৫ সালের জ্যাক রাইডারের দলের সঙ্গে বে সরকারী টেষ্ট খেলার প্রথম ইনিংসেও অমরনাথ শূন্য রান করে দর্শকদের হতাশ করেছিলেন। লাঞ্চের পর মানকদ এবং হাজারী ব্যাট করতে নামলেন। তাঁদের রান যথাক্রমে ৪৬ ও ২। মানকদ তাঁর নিজস্ব ৬৩ রানের মাথায় ক্রিষ্টোফানীর বলে ক্যাচ তুলে মিলারের হাত থেকে সৌভাগ্যক্রমে ছাড়া পেয়ে সে যাত্রা রক্ষা পেলেন। মানকদ ৭৮ রান ক'রে উইলিয়ামসের বলে এল বি ডবলউ হলেন। দলের রান তখন ১৫৫। আর এস মোদী হাজারীর জুটী হয়ে খেলতে লাগলেন। চায়ের সময় ৪ উইকেটে ২১৩ রান উঠল। হাজারী ৫২ এবং মোদী ২৮ রান। উভয়েই একবার করে আউট হতে গিয়ে বেঁচে যান।

চারের পরে হাজারী ৬৩ রান করে রোপারের বলে বোল্ড হলেন। হাজারীর ১৪১ মিনিট খেলার মধ্যে ১০টা বাউণ্ডারী ছিল। পঞ্চম উইকেটের জুটীতে ভারতীয় দলের ৮০ মিনিটে ৭৬ রান উঠে। হাফিজ মোদীর জুটী হলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে খেলা ভেঙ্গে গেলে দেখা গেল উইকেটে ভারতীয় দলের ২৬৬ উঠেছে; মোদী ৬০ এবং হাফিজ ৭ করে তখনও ব্যাট করছিলেন। পেপার ২৫ ওভার বলে ৭টা মেডেন নিয়ে এবং ৭১ রান দিয়ে ২ উইকেট পেলেন।

দ্বিতীয় দিন দলের ৩০০ রানের মাথায় মোদী ৭৫ রান ক'রে পেপারের বলে এল বি ডবলউ হলেন। তাঁর ১৬২ মিনিট খেলায় ৬টা বাউণ্ডারী ছিল। ডি ফাদকার হাফিজের জুটী হলেন কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই হাফিজকে কার্মোডি ষ্টাম্পড করলেন। সি এস নাইডু এর পর এসে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। দর্শকেরা তাঁর খেলায় খুবই আনন্দ লাভ করলো। উইকেটের চারপাশে তাঁর চমৎকার লেটকাট এবং ড্রাইভ দর্শকদের বিমুগ্ধ করলো। ব্যাটিংয়ে যেমন তিনি দর্শকদের কাছ থেকে প্রশংসা পেলেন তেমনি পেলেন বিপক্ষদলের বোলার পেপার। পেপার সি এস নাইডুকে তাঁরই বলে অতি চমৎকার ভাবে বাঁ হাত দিয়ে লুফে নিলেন। দর্শকবৃন্দ তাঁকে সম্মান দিতে ভুললো না। নাইডু ৩২ মিনিট খেলে ৩৮ রান করেন, তার মধ্যে ৬টা বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার বাউণ্ডারী ছিল। তখন দলের রান ৯ উইকেটে ৩৮১। লাঞ্চের কুড়ি মিনিট আগে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ৩৮৬ রানে শেষ হ'ল। প্রথম ইনিংস ৩৮৫ মিনিটকাল স্থায়ী ছিল. পেপার সব থেকে বেশী ৪টে উইকেট পেলেন।

অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের প্রথম ইনিংস আরম্ভ হ'ল। ৯ মিনিট খেলার পর লাঞ্চের জন্যে খেলা বন্ধ রইল। তখন দলের মাত্র ৩ রান উঠেছে; এই ৩ রানই করেছেন কার্মোডী। তাঁর জুটী হুইটিংটনের শূন্য। লাঞ্চের পর ৪০ রান করে কার্মোডী এল বি ডবলউ হলেন। দলের তখন ৪৯ রান। পেটফোর্ড হুইটিংটনের জুটী হয়ে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে খেলা ভাঙ্গলে স্কোর বোর্ডে দেখা গেল হুইটিংটন ৯৫ এবং পেটফোর্ড ৮২ রান করে তখনও খেলছেন। দলের ১ উইকেটে ২২২ রান হয়েছে।

মঙ্গলবার তৃতীয় দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের ২৬৭ রানে পেটফোর্ডের উইকেট পড়ে গেল। পেটফোর্ড ১০১ রান করেন, তার মধ্যে ৯টা 'চার'। হ্যাসেট এসে হুইটিংটনের জুটী হলেন। ৪০ মিনিট খেলার পর ১৮ রান করে পার্থসারথীর হাতে হ্যাসেট ধরা পড়লেন। দলের সে সময় ৩১২ রান। মিলারের জুটী হয়ে হুইটিংটন নিজস্ব ১৫০ রান পূর্ণ করলেন ২৮৩ মিনিট ব্যাট করে। দলের তখন ৩২৪। এর পর হুইটিংটন তাঁর ১৫৫ রানে ফাদকারের বলে এল বি ডবলউ হলেন। তাঁর ৩০০ মিনিট খেলায় ১৫টা বাউণ্ডারী ছিল। লাঞ্চের ঠিক আগে পেপার মিলারের জুটী হলেন। পেপার ১৩ রান করে আউট হলে ওয়ার্কম্যান মিলারের সঙ্গে খেলতে লাগলেন। মিলারের খেলা দর্শকদের কাছে বেশ উপভোগ্য হ'ল। দর্শকদের তুমুল আনন্দধ্বনির মধ্যে মিলার ৯০ মিনিট খেলে নিজস্ব ৫০ রান করলেন তার মধ্যে ৬টা বাউণ্ডারী। ওয়ার্কম্যান অমরনাথের বলে পার্থসারথীর হাতে ধরা পড়ে ২৩ রানে বিদায় নিলেন। এর পর ক্রিষ্টোফানীও অমরনাথের বলে মোদীর হাতে আটকে গেলেন। উইলিয়ামস মিলারের জুটী হলে খেলার গতি ঘুরে গেল। দর্শকদের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি করলেন মিলার তাঁর অদ্ভুত খেলা দেখিয়ে। সি এস নাইডুর বলে ছয়ের বাড়ি মেরে মিলার নিজ দলের মধ্যে প্রথম ওভার বাউণ্ডারী করলেন। এর পর মানকাদের বল স্ক্রিনের ওপারে পাঠিয়ে ওভার বাউণ্ডারী করলেন পর পর ২ বার। দর্শকরা মিলারকে নিয়ে কি করবে ভেবে পেল না। চারদিক থেকেই হাততালি পড়ছে, থামতে যেন চায় না। ঐ একই ওভারে মানকাদের আর একটা বল ওভার বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে মিলার চারিদিকে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে ফেললেন। চতুর মানকাদ একটুও না দমে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন এবার একটা লো বল ছাড়লেন, তাঁর অনুমান একটুও ভুল হল না। মিলার এগিয়ে বল পিটতে গিয়ে বল ফসকালেন। পার্থসারথী একটুও দ্বিধা বোধ না করে ষ্টাম্পড করলেন। মিলার মোট ৪টা ওভার বাউণ্ডারী করেন। ইডেন গার্ডেনে এ পর্য্যন্ত আর কোন ব্যাটস ম্যান এ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। মিলার ১২৭ মিনিট খেলে ৮২ রান করেন, তার মধ্যে ৪টা ওভার বাউণ্ডারী এবং ৬টা বাউণ্ডারী। ৪টা বাজতে ১০ মিনিট সময়ে অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলো। তারা ৮৬ রানে অগ্রগামী রইল। এই দিনের খেলায় তিনজন কৃতিত্ব দেখালেন অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের হুইটিংটন এবং মিলার যথাক্রমে ১৫৫ এবং ১০১ রান ক'রে; অপরদিকে ভারতীয় দলের বোলার মানকদ। মানকদের বোলিং এভারেজ ৪৫ ওভার, ৫ মেডেন, ১৪৭ রান এবং ৩টে উইকেট। তাঁর বলের "লেংথ" সব সময়েই ভাল পড়েছিল। অমরনাথের বোলিং এভারেজ দাঁড়াল—২২ ওভার বল, ৭ মেডেন. ৪১ রানে ৩টে উইকেট। ভারতীয় দলের ফিল্ডিং খুব খারাপ হয়েছিল। সি এস নাইডু মিলারের সহজ ক্যাচ দুবার ফেলে দিয়ে দর্শকদের হতাশ করেন। তাছাড়া তাঁর বোলিংও তাঁর খ্যাতি অনুযায়ী হয়নি। ২১ ওভার বলে ১১৩ রান দিয়েছিলেন অথচ একটা মেডেন কিম্বা উইকেট পান নি।

মার্চেন্ট এবং মানকাদ ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলেন। মানকাদ ২১ রান করে আউট হলেন। পার্থসারথী এসে মার্চেন্টের জুটী হলেন। মার্চেন্ট উইকেটের চারদিকে পিটিয়ে খেলে দর্শকদের আনন্দ দিলেন। নির্দিষ্ট সময়ের শেষে দেখা গেল এক উইকেটে ৭০ রান উঠেছে।

চতুর্থ দিনের খেলায় সমস্ত সম্মান পেলেন ভি এম মার্চেন্ট ১৫৫ রান নট্ আউট থেকে। ২১৮ মিনিট খেলে তিনি তাঁর শত রান পূর্ণ করেন। তখন তিনি মোট ১২টা বাউণ্ডারী করেছেন। ২৯২ মিনিট খেলার পর তাঁর ১৫০ রান পূর্ণ হল। এই রানে ২৩টা বাউণ্ডরী ছিল। এদিকে আব্দুল হাফেজ তাঁর সঙ্গী হয়ে ৮৬ রান করে নট আউট আছেন। হাফিজকে সেঞ্চুরী করার সুযোগ দিতে গিয়ে মার্চেন্ট নিজে অনেক রান ছেড়েছেন, না হ'লে তাঁর দু'শ রান উঠত। চায়ের সময় খেলা বন্ধ হ'লে দেখা গেল ৪ উইকেটে ভারতীয় দলের ৩৫০ রান উঠেছে। মার্চেন্ট ও হাফিজ যথাক্রমে ১৫৫ এবং ৮৬ রান করে নট্ আউট আছেন। মুস্তাক আলি ৩ রান এবং অমরনাথ ৪৮ রান করে আউট হয়ে গেছেন।৪ উইকেটে ৩৫০ রান করে উপর ভারতীয় দল ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করলো।

চা পানের পর অষ্ট্রেলিয়ান্স দল তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। হাতে মাত্র এক ঘণ্টা সময়। খেলায় জিতে হলে ২৬৫ রান দরকার। রান খুব আস্তে আস্তে উঠতে লাগল ব্যাটসম্যানদের খেলায় কোন উৎসাহ দেখা গেল না। এক ঘণ্টা এত রান করা অসম্ভব দেখে দর্শক এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে উত্তেজনা আর রইল না। উইকেট আর বেশী না পড়ায় দিকে তখন ব্যাটসম্যানদের লক্ষ্য। খেলা শেষের নির্দিষ্ট সময়ে ২ উইকেটে ৪৯ রান উঠলে পর এই বেসরকারী দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচটি ড্র হয়ে গেল।

ভারতবর্ষে অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের খেলার ফলাফল: খেলা ৯ জয় ১, পরাজয় ২ এবং ড্র ৬।

ভারতীয় দল: ভি এম মার্চেন্ট (ক্যাপটেন), ভি মানকাদ মুস্তাক আলি, এস অমরনাথ, ভি এস হাজারী, আর এস মোদী আব্দুল হাফিজ, ডি জি ফাদকার, সি এস নাইডু, টি ভি পার্থসারথী, এবং সি আর রঙ্গচারী।

অষ্ট্রেলিয়ান্স: এ এস হ্যাসেট (ক্যাপটেন), ডি কে কার্মোডী, আর এস হুইটিংটন, জে পেটিফোর্ড, এ আর মিলার, সি জি পেপার, ওয়ার্কম্যান, ক্রিষ্টোফাণী, উইলিয়মস, রোপার এবং এলিস।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত কর্তৃক শরৎচন্দ্রের কাহিনীর নাট্যরূপ "অনুপমার প্রেম"—১।০

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "নারীর রূপ"—৩৲

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "পলাশী"—১।০

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "তাসের ঘর"—২।০

ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব"—১৸০

শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "অতনুর ডাক"—২৲

আশোক গুহ সম্পাদিত "দেশ বিদেশের লেখা"—৩৲

প্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত উপন্যাস "প্রমীলার সংসার"—২৲

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "জয় সুভাষ"—।০

রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর প্রণীত নূতন সংস্করণ "বেহুলা"—১৲

শ্রীসুধীরকুমার সেন প্রণীত "এ যুদ্ধের সেনাপতিরা"—২।০

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র ঘোষ প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "অমৃতের সন্ধানে"—১।০

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "নূতন অতিথি"—২৲

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী সংকলিত "আজাদ হিন্দ্ ফৌজ"—২৲

শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "তরঙ্গ ও প্রবাহ"—২।০, "মনের অন্তরালে"—৩৲

অলকা মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "তোমারই"—২৲

কণাদ গুপ্ত প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "রৌদ্র ছায়া"—২৲

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "চিঠি"—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



মাঘ—১৩৫২

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

বাঙ্গালীর শিক্ষা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার

আমি শিক্ষাব্রতী বা শিক্ষক নই ; আমার পক্ষে শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করা হয় তো অনধিকার চর্চ্চা, কিন্তু নিছক সত্য প্রকাশ করার অধিকার সকলেরই আছে।

আমি একজন পুলিশ কর্ম্মচারী। চল্‌তি ভাষায় বল্‌তে গেলে লোকে হেসে বলবে "তোমার আবার এ রোগ কেন?" নাম বদ্‌লে অথবা বেনামীতে কাজ সারলে কোন কথাই উঠ্‌তো না কিন্তু আত্ম-পরিচয় না দেবার মতন কোন যথার্থ কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। মানুষ যখন নিজের কাছে আত্মমর্য্যাদা হারিয়ে ফেলে তখনই সে পাঁচজনের কাছে মাথা হেঁট করে দাঁড়ায়।

আমার পরিচয়টা দেওয়ার একটু দরকারও আছে, কারণ আমার অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল এই বিভাগের কয়েকটা চাকরীতে কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্পর্কে। অনেকে হয় তো বলবেন, এই বিভাগে ভাল লোক চাকরী করতে যায় না। ভাল লোক বল্‌তে কি বোঝেন জানি না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা (Graduate) ভদ্রবংশীয় ছেলেরা এই বিভাগে ঢুকবার আগেই খারাপ হয়ে যায় না নিশ্চয়ই। যাক্ এ আমার আলোচ্য বিষয় নয়।

আমাদের Enforcement বিভাগে কয়েকটী লোক নেওয়া হবে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল, ২৫ বছরের নীচে Graduate ছেলে চাই। আবেদনপত্র আস্‌তে সুরু হল, শেষ দিন উত্তীর্ণ হতে দেখা গেল বারশ প্রার্থী, অথচ চাকুরী মাত্র কুড়িটি। এবার বাছাই করার পালা। নির্ব্বাচকদের কাজ বড় সহজ নয়। লটারী করার যদি নিয়ম থাক্‌তো, তা হলে কাজটা অতি সহজেই সারা যেতো ; আর ফলাফলের দিক দিয়ে যে খুব বেশী তফাৎ হত, তা মনে হয় না।

আবেদনপত্রগুলি প্রথমে পরীক্ষা হল, বিজ্ঞাপন মাফিক সমস্ত খবরাখবর দিতে ভুলেছেন কজন, কজনের বয়স বেশী হয়েছে ইত্যাদি। প্রথম সোপানে হড়্‌কে গেলেন প্রায় চারশ। প্রত্যেক দরখাস্তের মধ্যে কত আশা জড়িত আছে। দরখাস্ত পাঠিয়েই কত মনে রঙ্গীণ ছবি ভেসে উঠেছে—কেহ বা আল্‌নাস্‌কারের মতন দিবাস্বপ্ন দেখেছেন। এতগুলি ছেলের জমাট দীর্ঘশ্বাসের কথা মনে করে কচ কচ করে নামগুলো কাট্‌তে দুঃখ যে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু উপায়।

পুলিশ বিভাগের কাজে বেশ শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়, ডানপিটে অর্থাৎ শক্তসমর্থ হওয়া নিতান্ত দরকার। গভর্ণমেণ্ট নিয়ম করেছেন—

ন্নতম মাপ হওয়া চাই, লম্বায় ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি আর বুক ৩০ ইঞ্চি। মাপটা খুব উঁচুতে রাখা হয়েছে তা বলা চলে না। চেহারার একটা কদর আছে, তাল পাতার সিপাই দিয়ে কাজ চলে না। বাঙ্গালীর ছেলেকে গায়ের জামা খুলে মাপকাঠির সামনে দাঁড় করলেই তার শরীরের দৈন্যতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষা পাশ করা যায় কিন্তু এখানে তা চলে না। দ্বিতীয় সোপানে পার হয়ে বাকি রইলেন মাত্র শ খানেক।

অবশিষ্ট প্রার্থীদের মধ্য থেকে বাছাই করার জন্য একটী নির্ব্বাচক কমিটি বসেছিল, আর আমি ছিলাম তারই একজন সদস্য। আমরা প্রত্যেক প্রার্থীকে ছোট দুএকটী মৌখিক প্রশ্ন করে তাদের মানসিক পরিণতির পরিচয় নেবার চেষ্টা করেছিলাম।

আমাদের কয়েকটী প্রশ্ন ও বিভিন্ন প্রকারের উত্তর যা পেয়েছিলাম তাই নীচে উদ্ধৃত করছি। আপনারা ভুলে যাবেন না যে ছেলেরা প্রত্যেকেই কমপক্ষে Graduate—এদের মধ্যে M. A. ও Law পাশ করাও ছিলেন। বাঙ্গালী ছেলেদের অসম্পূর্ণ শিক্ষার কথা অনেক শুনেছি এবং দেখেছি। সামরিক বিভাগের এক ইস্তাহারে কয়েকটী উদাহরণও দেখেছিলাম। তবে এক জায়গায় একসঙ্গে এতগুলি ছেলেকে দেখবার সুযোগ খুব বেশী হয়নি। অনেকে হয় তো বলবেন, এসব কিছু নূতন কথা নয়। নূতনত্বের অভাব না থাকতে পারে কিন্তু যখন সকলে জেনে শুনে কোন রকম প্রতিকারের চেষ্টা করেন না তখনই বলতে হবে এ বিষয়ের বহুল প্রচার ও আলোচনা হয়নি এবং হওয়া দরকার।

আমরা প্রথমে কর্ম্মপ্রার্থীদের বয়স জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আপনার বয়স কত—এ প্রশ্নের মধ্যে আশা করি কোন জটিলতা খুঁজে পাবেন না, কিন্তু উত্তর কি পেয়েছিলাম তাই দেখুন। এই ২৩ কি ২৪ হবে; ঠিক বলতে পারছি না, দরখাস্তে লেখা আছে; ১৯৩৭ সালে ১লা মার্চ ১৬ বৎসর ছিল; Matriculation certificateএ লেখা আছে।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, "বয়স কত তা যখন সঠিক জানা নেই, কোন সালে জন্ম আশা করি বলতে পারবেন।" "১৯২২ বা ১৯২৩ হবে; এখন ২৩ বছর বয়স হিসেব করে সাল বলতে পারি; (এই উত্তর-দাতাকে হিসেব করতে বলায় বেশ খানিকটা পরে উত্তর পাওয়া গেল—) ১৯২১ হবে আমার ঠিক মনে নাই।"

পাড়াগাঁয় অনেক বৃদ্ধকে বয়স জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেয়েছি। এই ত্রিশ কি চল্লিশ হবে, আবার কেহ বলেছে শ্যামবাবুর ছেলে রতন আর আমি ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছি, রতনকে জিজ্ঞাসা করলে আমার বয়স জানতে পারবেন; আমি যখন ছোট ছিলাম গ্রামে মড়ক লেগেছিল, তা দেখুন কত বছর হবে; তা বাবু, গরীব মানুষ কুষ্ঠি তো নেই, কত আর হবে বছর ৩৫ হবে; কত আর হবে এই সবে দু একটা দাঁত পড়া সুরু করেছে।

আমাদের অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিন জীবনে বয়সের বিশেষ কোন মূল্য নেই। তাদের অল্প-পরিসর আবেষ্টনীর মধ্যে দু একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা যা ঘটে, তা তাদের মনে স্থায়ী হয়ে এঁকে —— আর সেইগুলিই হয় জীবনের এক একটি খুঁটি। এদের মধ্যে অনেকেই হয় তো কুড়ি পর্য্যন্ত গুনতেই জানে না, এদের পক্ষে হিসেব করে নিজের বয়স বলতে না পারায় কোন লজ্জার ব্যাপার নেই; কিন্তু আমাদের উচ্চশিক্ষিত যুবকদের মধ্যে যখন উল্লিখিত উত্তর পাই তখন তাদের শিক্ষার খুব তারিফ করতে পারি না।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, নিজের বয়স না জানা বা তা বলতে না পারার সঙ্গে শিক্ষার অভাব বা ত্রুটী কোথায় হল। আমি বলবো, যথেষ্ট। এরা সকলেই দরখাস্ত করার সময় বয়স উল্লেখ করেছেন এবং সকলেই যখন চাকুরী লক্ষ্য করেই লেখাপড়া করেছেন তাদের অন্ততঃ কত বয়স হল এবং কতদিন পর্য্যন্ত সরকারী চাকুরীর বয়স থাকে—এটুকু জানা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আর একটী প্রশ্ন করা হয়েছিল—Enforcement বিভাগ বলতে কি বোঝেন? উত্তরের বহর দেখুন। উত্তর এল, "তদন্ত বিভাগ; লোক কম পড়েছে তাই লোক নিয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে; Black market বন্ধ করা হবে; Enforce করতে হবে।" এইরূপ উত্তরের পর শুধু Enforce কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় জবাব পেলাম "To force অর্থাৎ force করা।"

আপনি আজকাল কি করছেন—এ প্রশ্নের উত্তরে যারা দু এক বছর নিষ্কর্ম্মা বসে আছেন উত্তর দিলেন Privateএ M. A. পড়ছি। এদের ভয় কিছু করছি না বললে ক্ষতি হতে পারে। সত্যকে ঢাকতে মিথ্যার আশ্রয় নিলেই বিপদ। Modern Historyতে M. A. পড়া ছেলে আমাদের নূতন তথ্যের সন্ধান দিলেন "First World War ১৯১৬ সালে শেষ হয়েছিল" এরূপ উত্তর পাবার পর একে বাদ দিতে আমাদের দ্বিধা হয়নি।

চীন দেশের আজকালকার রাজধানীরও নাম অনেকেই বলতে পারেন নি। কিন্তু চরম উত্তর পেয়েছিলাম "ইংলণ্ডের রাজধানী বাকিংহাম"। এর পরেও আশাকরি আর উদাহরণ দেবার দরকার হবে না।

আরও কয়েকটী প্রশ্নের চমৎকার উত্তরে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়েছিল এবং রাগ করে প্রশ্ন করেছিলাম—আপনি কি ভূগোল পড়েন নি? উত্তর পেলাম "তা ছোট বেলায় পড়েছিলাম, এখন কি আর মনে আছে"? এই পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের পর আমাদের বাঙ্গালী যুবক উত্তর দিলেন—ভূগোল ভুলে গেছেন। এমনই আমাদের দুর্ভাগ্য, ছেলেরা নির্দ্ধারিত পুস্তকাবলীর বাইরে তাকিয়ে দেখবার সুযোগ সুবিধা পায় নাই, প্রবৃত্তি ছিল কিনা জানি না—অন্ততঃ সেরূপ নির্দ্দেশ কোনদিন সে পায় নাই তা ঠিক। আমাদের বিচিত্র দেশে সবই সম্ভব। একদিকে আমরা স্বদেশ-বাসীদের জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ও পাণ্ডিত্যের উৎকর্ষতা দেখে গর্ব্ব অনুভব করি, আবার অজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়ি।

আমরা যখন বাজারে কোন জিনিস কিনতে যাই—প্রথমেই কোথায় তৈরী তাই দেখি। ব্রিটিশ, আমেরিকান অথবা জার্ম্মান হলে চোখ বুঁজে ধরে নিই জিনিসটী ভাল, জাপানী অর্থে বুঝি সস্তা,খেলো ও হাল্কা—আর দেশী হলে ভাল করে পরীক্ষা করি। এক এক দেশের ছাপের কত মূল্য। মালের বেলায় দেশ হিসেবে তারতম্য দেখি—তেমনই এক এক দেশের শিক্ষারও আদর অনাদর আছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের বাজার দর যে কত কম, তা সকলেই জানেন। যুদ্ধের আগে ১০।১৫৲ টাকায় বহু Graduate ছেলে পাওয়া যেতো, এখনও যে খুব দর বেড়েছে বলা চলে না। অবশ্যই বাজার দর আমদানী ও চাহিদার উপর নির্ভর করে, কিন্তু যখন কোন ছেলেকে ছাপ মেরে ছেড়ে দেওয়া হয়—সকলেই আশা করেন "ছেলেটী পণ্ডিত না হলেও মূর্খ নয়।"

কিন্তু আসলে কি দেখতে পাই? বাছাই করার ক্ষেত্র অতি প্রশস্ত, ভাল জিনিষটী সবাই চান, ফলে দাঁড়ায় অকেজো অথবা তদনুরূপ ছেলেরা দোরে দোরে ঘুরে বেড়ান। কর্ম্মহীন যুবকদের সংখ্যা বেড়েই চললো, অথচ ওই ছাপটুকুর জন্য কেরাণীগিরি ছাড়া অন্য কাজে যোগ দিতে পারলে না।

কেরাণীগিরিও যখন জুটলো না, বাকি রইলো মাষ্টারী। স্কুলের শিক্ষকদের স্থান আমাদের দুর্ভাগা দেশে কেরাণীদেরও নীচে। বেশীর ভাগ স্কুল-মাষ্টার আধপেটা খেয়ে বেঁচে আছেন। সই করে রসিদ দেন ৫০৲ টাকার, আসলে পান হয় তো ৩০৲, তাও প্রত্যেক মাসে নয়। প্রাইভেট স্কুলের চাকরীর এই অবস্থা। বলুন, এ চাকরী নেহাৎ না ঠেকলে কে করবে?

সর্ব্বত্র বিতাড়িত, বিফলমনোরথ, অসন্তুষ্ট, অর্দ্ধভুক্ত, শিক্ষকমণ্ডলীর কাছে আমরা কি আশা করতে পারি? এর ফল—আমাদের শিক্ষার দিন দিন অবনতি। অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত ছেলেরা জাতির গৌরব না হয়ে হচ্ছে বোঝা। এদের ফেলাও যাবে না, অথচ কাজে লাগানোরও উপায় নেই; এ অবস্থা আর কতদিন চলবে? আমাদের শিক্ষাকর্ত্তারা কি কিছু করবেন না? এইখানেই শেষ করলে হয়তো ভাল করতাম, কিন্তু আনুসঙ্গিক আর দু একটা কথা না বলে পারছি না। আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে—স্কুল-মাষ্টারদের ভাগ্যপরিবর্ত্তন করা। তাদের খেয়ে পরে বাঁচবার মতন বেতন দেওয়া; শুধু তাই নয়, এমন বেতন দিতে হবে যাতে প্রথম শ্রেণীর উপযুক্ত লোক আকর্ষিত হতে পারে। জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ছেলেমেয়েদের উপর, তাদের গড়ে তুলতে কার্পণ্য করতে গেলেই ফল হবে বিষময় এবং হচ্ছেও তাই।

অনেকে বলবেন পয়সার অভাব, আমি বলবো এ ভুল আমাদের ভাঙ্গতেই হবে। সব ছেড়ে পয়সা ঢালতে হবে শিক্ষার জন্য। শিক্ষা বিস্তার হল প্রথম, অন্যান্য কাজ হচ্ছে পরে। প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার করতে পারলে পরাধীনতার কলঙ্ক মুছে ফেলতে বেশী দিন লাগবে না। তা বলে, শিক্ষাবিস্তার মানে—কুশিক্ষা বিস্তার নয়, তার চাইতে অশিক্ষা ভাল।

এর পর বদলাতে হবে আমাদের শিক্ষিত সমাজের চলতি প্রথা, Graduate হতেই হবে। Graduate না হলে কি মানুষ হয় না। এ মোহ কেটে যাবার সময় এসেছে, বিশেষ করে যখন পাশ করেই চাকুরী জোটে না। জীবনের এতগুলি বছর অকেজো পড়াশুনায় নষ্ট না করে আগে থেকেই কাজে লাগবার দিকে মন দিতে হবে। কেরাণীগিরিতে B.A. পাশ করার দরকার হয় না। এই পাশই কর্ম্মপ্রাপ্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। B.A. পাশ শুনলেই নিয়োগ কর্ত্তার মনে হয় "এ ছোক্‌রা বেশীদিন টেক্‌বে না।"

আমার অফিসের একজন কেরাণীর ভাই B.Sc পাশ করে নানান জায়গায় চেষ্টা করে চাকরী পেলে না। ২।৩ বছর এ ভাবে কেটে যাবার পর বয়স যখন প্রায় পার হয়ে যায়, আমাকে ধরে বসলে। ছেলেটীর ভাগ্যদেবী এবার সুপ্রসন্ন হয়েছিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই ৪।৫টী চাকরী খালি হতে তাকে নিয়ে নিলাম—বেতন ৪৫৲ টাকা। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে অন্যত্র চাকরীর চেষ্টা সুরু হল। অনুরোধে পড়ে প্রথম কয়েকদিন আবেদন পত্রগুলি সুপারিশ লিখে পাঠিয়ে দিলাম, কিন্তু এত বাড়াবাড়ি সুরু হল যে বাধ্য হয়ে বল্লাম "তোমার একাজে মন লাগ্‌ছে না, তুমি সরে পড়।" B.Sc পাশ ছেলের কাছে উন্নত ধরণের কাজ পাওয়া তো দূরের কথা, কয়েক মাস তাকে বৃথা মাসহারা দেওয়া হল। অথচ Matric পাশ ছেলে নিলে সে মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করে যেতো।

আমাদের চাই আগে থেকে আবর্জ্জনা বাদ দিয়ে ভাল ছেলেদের উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা। কয়েক বছর আগে, মনে পড়ে একটী প্রস্তাব হয়েছিল—Universityতে পড়বার যোগ্যতামূলক আর একটী পরীক্ষা করা দরকার। এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু আজ যদি কেহ নিয়ম করে দেয় যে কেরাণীগিরিতে Matric পাশ ছেলে ছাড়া অধিকতর শিক্ষিত ছাত্র নেওয়া হবে না, দেশের শত আপত্তি সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা অর্দ্ধেক হয়ে যাবে।

আমাদের দেখতে হবে ছেলেরা যে শিক্ষা পাবে তা যেন তাদের ভবিষ্যত জীবনে কাজে লাগে। Mathematicsএ M.A. পাশ করা ছেলে কোন দিকে কিছু না করতে পেরে ল পাশ করে অধমতারণ উকিল হয়ে বসলেন। তার এতদিনকার সাধনা সব জলে ভেসে গেল। আগে থেকে একটা উদ্দেশ্য ঠিক না করে শিক্ষা দিলেই বাঙ্গালীর অনতিদীর্ঘ আয়ুকালের অতি মূল্যবান অংশ বৃথা নষ্ট হয়ে যাবে। অনেকে বলবেন General Educationএর একটা দাম আছে। General Education বলতে B.A. বা B.Sc. পাশ বোঝায় না, আর তার নমুনা তো দেখলেন। Matric পরীক্ষাতেই General Education শেষ করতে হবে।

আর তা করা সম্ভব হবে,যখন আমরা ইংরাজি ভাষা শিক্ষা তুলে দিতে পারবো। দোভাষী হতে যেয়ে আমরা কোন ভাষাই শিখি না। বাঙ্গালা মাতৃভাষা। অতএব জন্মাবধি পণ্ডিত। বঙ্গভাষায় বাঙ্গালীর দৈন্য সব চেয়ে বেশী। বাঙ্গালী অন্ততঃ ইংরাজি-জানা বাঙ্গালী বাঙ্গালা জানে না বল্লে খুব ভুল বলা হবে না। সে ইঙ্গ-বঙ্গ খিঁচুড়ি ছাড়া কথা বলতে বা লিখতে পারে না। আর ইংরাজীর তো কথাই নেই, ইংরাজ শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ে। ফরিদপুর জেলার (District) কোন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের (High English School) প্রধানশিক্ষক মহাশয় (Head Master) জেলা হাকিমের (District Magistrate) পরিদর্শন উপলক্ষে একটী অভিনন্দনপত্র (Address) ইংরাজীতে রচনা করে প্রকাশ্য সভায় পাঠ করেন। ইংরাজ হাকিম এই অদ্ভুত সাহিত্য রচনা সযত্নে রেখে দিয়েছেন এবং নিজের বন্ধুবান্ধব মহলে তা শুনিয়ে সকলকে আনন্দ দান করেন। [Bracketএ ইংরাজী কথাগুলি পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য দেওয়া হয়েছে !] আমি তাঁকে একদিন বলেছিলাম "দয়া

করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের কাছে এর নমুনা পাঠিয়ে দিন।" তিনি রাজি হলেন না, বললেন "মাষ্টার মশায় ভাল লোক, তাঁর এবং তাঁর স্কুলের ক্ষতি হতে পারে।" অকাট্য যুক্তি, কিন্তু কত শত ছাত্রের যে কত ক্ষতি হচ্ছে বা হবে, তা ভেবে দেখুন। ইংরাজি কি আমাদের সকলকেই শিখ্‌তে হবে? চল্লিশ কোটীর মধ্যে ১ কোটী লোক ইংরাজী জানেন কিনা সন্দেহ, তাদের চল্‌ছে কি করে? অন্যান্য সভ্য দেশের লোকেরা ইংরাজী শিক্ষা না করে কি মানুষ বলে গণ্য হচ্ছে না বা তাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকছে। যাদের দরকার, তারা শিখুন, আপত্তি কি? এই ইংরাজীর উপর জোর দিতে গিয়ে ছেলেরা যে সময় ও উদ্যম নষ্ট করছে তার বদলে তারা কি ফল লাভ করছে?

Matriculation পরীক্ষায় বঙ্গ ভাষার উপর খানিকটা জোর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আশানুরূপ ফল কিছুই হয় নি, হবেও না— যতদিন ইংরাজী একেবারে বর্জ্জন না করা হচ্ছে।

আমি যে কয়টি কথার অবতারণা করেছি তা একেবারেই নূতন নয়, অনেকবারই কথা উঠেছে—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ফল কিছুই হয় নি।

এই ধ্বংসলীলা শেষ হওয়ার পর নূতন করে গড়ার যুগ এসেছে, চারিদিকে পুনর্গঠনের পরিকল্পনা হচ্ছে। আমাদের শিক্ষা প্রণালী আমূল পরিবর্ত্তন করে স্বাভাবিক করে গড়ে তোলার সময় কি এখনও হয় নি?

পশ্চাতের ধূলি

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু

(২)

ঘণ্টা দেড়েক পরে বৃহৎ সরীসৃপের মত ধীর গতিতে গাড়ীখানা বাহির হইয়া গেল, প্ল্যাটফরমের সেই জনস্রোত যেন নিঃশেষে শুষিয়া লইল। অমর হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল. সেই শীতে কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে প্ল্যাটফরমের সীমানায় আসিয়া দাঁড়াইল। এদিকে ভিড় না থাকিলেও ষ্টেশনে জনতা হ্রাস পায় নাই। অন্যান্য প্ল্যাটফরমে আরও গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এই একটুখানি নির্জ্জনতার অবকাশে অমর সেই বিরাট বিশৃঙ্খলা অনুমান করিবার চেষ্টা করিল।

সহর খালি করিয়া অবলা ও শিশুদের পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সাধ্যমত সকলেই মাতা. স্ত্রী ও শিশুপুত্রদের দূরে রাখিবার বন্দোবস্ত করিল. জীবিকার শাসনে নিজেরা রহিয়া গেলেন; বিপদের দিনে কোন অভাবিতপূর্ব্ব উপায়ে প্রাণ লইয়া পলাইবেন এই আশা সম্বল করিয়া। কিন্তু এইখানেই কি কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেল? সমগ্র বিশ্বের পৌরজন হিসাবে আর কি কিছুই করিবার নাই? সকলের কানে কর্ম্মের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিল, শুধু তাহারাই বধির হইয়া রহিল? বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজনে ডাক আসিয়াছে। হোক্ সে যজ্ঞ মরণের, হোক সে আয়োজন নারকীয় ধ্বংসের, তথাপি সেই আহ্বানে বিশ্ববাসী সাড়া দিল। ইংরাজ ছুটিল জার্ম্মান ছুটিল আমেরিকান ছুটিল, জাপানী ছুটিল, বাহির হইল চীনের বীর। কে ডাকিল ইহাদের—দেবতা. না মানব? সে প্রশ্ন কাহারও মনে উঠে নাই। শুধু বাহির হইয়াছে কঠিন আবরণে নিজেকে সজ্জিত করিয়া—সংঘাতের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে। এ যজ্ঞে কাহার সাধনা সিদ্ধ হইবে, কে পাইবে জয়তিলক?

অমর আপন মনেই বলিয়া উঠিল, কেহ না। এ যজ্ঞে বিধাতা আপনার সৃষ্টির চরিতার্থতা লাভ করিবেন মানবের তপস্যা দিয়া. সে তপস্যা মরণের। তাই এ আহ্বান অবহেলা করিবার নহে। অমরের মনে হইল—এ আহ্বান অহর্নিশি তাহাকেও সচকিত করিয়া তুলে সে সাড়া দেয় না কেন? অমর অনুভব করিল—কি যেন তাহাকে করিতেই হইবে। তাহার হৃদয় মথিত করিয়া. আতঙ্কে উৎকণ্ঠায় প্রেরণায় ভাবনায় তাহাকে যেন বিধ্বস্ত করিয়া ভিতর হইতে কে বলিয়া উঠিল. চলো. তুমিও চলো—বাহির হইয়া পড়। কোথায় যাইবে. কি করিবে সে? স্থির হইয়া সে যতবার নিজেকে প্রশ্ন করিতে চায় তত তাহার ভিতর হইতে একটা অদম্য সংকল্প যেন চীৎকার করিয়া উঠে—চলো. চলো. আর সময় নাই ছুটিয়া চলো। অমর দ্রুত পায়চারি করিতে লাগিল. প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজের ভাবনাটা সে সংযত করিয়া লইতে চায়।

কিছুক্ষণ পরে সেই প্ল্যাটফরমে একখানা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে ষ্ট্রেচারবাহী কুলীরা প্রত্যেক কামরার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ট্রেণ হইতে মৃতবৎ যাত্রীদের বাহির করা হইল। প্রায় সকল যাত্রীই ষ্ট্রেচারে নামিল. কয়েকজন যাহারা হাঁটিয়া গাড়ী হইতে নামিল তাহারা গাড়ী হইতে নামিয়াই প্ল্যাটফরমের বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িল। অমর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। নানা জাতির নরনারীদের একটি একটি করিয়া নামানো হইতেছে। বর্ম্মী, চীনা, ইংরেজ এবং ভারতের নানা প্রদেশের নরনারীর কাতর মুখচ্ছবি দেখিয়া সে স্তব্ধ হইয়া

গিয়াছিল। সহসা তাহার ঠিক সম্মুখ দিয়া একটি বর্ম্মী মেয়েকে ষ্ট্রেচারে বহন করিয়া লইয়া গেল। দারুণ যন্ত্রণায় সে যেন প্রাণপণে চীৎকার করিতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু স্বর বাহির হইতেছে না, শুধু অধিকতর তীব্রতা লইয়া শরীরের অভ্যন্তরের বেদনা মেয়েটির বিকৃত মুখের রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিতেছে। অমর সহসা সেই ষ্ট্রেচারের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। হেমলতার সেই কথাটা তাহার মনে পড়িল, মেয়েমানুষের অত চট্ করে মরণ হয় না, ঠাকুরপো। মরণ এই মেয়েটিরও হয় নাই, অমরের মুখে একটা ক্ষীণ হাসি দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল।

ধীরে ধীরে সে যখন প্ল্যাটফরমের বাহিরে চলিয়া আসিল, তখনও গাড়ীর বিভিন্ন কামরা হইতে আহত, পঙ্গু, বিকৃতাঙ্গ যাত্রীগণকে নামানো হইতেছিল। অমর কাহারও দিকে ফিরিয়া দেখিল না, তাহার দুই কানে যেন সহস্র নরনারীর আর্ত্তনাদ আসিয়া আঘাত করিতেছিল। কান পাতিয়া তাহাই শুনিতে শুনিতে সে ষ্টেশনের সীমানার বাহিরে জনাকীর্ণ রাজপথে নামিয়া হাঁটিতে সুরু করিল।

হাঁটিতে হাঁটিতে এক সময় তালতলার এক বিরাট বাড়ীর সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইল। ফটকের পার্শ্বে পাথরের ফলকে গৃহস্বামীর নামটা ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়া ভিতরে ঢুকিয়া বৃদ্ধগোছের এক দরোয়ানকে কহিল, "ডক্টর মজুমদার বাড়ী আছেন?"

"আজ্ঞে হাঁ, ঐ যে হলঘরে মিটিং বসেচে।" বলিয়া দরওয়ানজী ঘরটা দেখাইয়া দিল।

অমর হলঘরের নিকটবর্ত্তী হইতেই ভিতর হইতে একটা মৃদু কলরব শুনিতে পাইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—অনেকগুলি তরুণ ডাক্তার ও ছাত্র পরিবৃত হইয়া তাহার প্রফেসর ডক্টর মজুমদার বসিয়া আছেন। মাসকয়েক পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অমর ইঁহার কাছে পড়িয়াছে, তাই অমর নমস্কার করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কহিলেন, "এসো এসো, বসো। কি খবর?"

অমর আসন গ্রহণ না করিয়া কহিল, "শুনলুম আপনাদের একটা পার্টি আসাম ফ্রন্টিয়ারের দিকে যাবে? কথাটা কি সত্যি?"

"হ্যাঁ, আজই রওনা হ'বেন। এঁরা সব যাচ্ছেন?" বলিয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তীদের কয়েকজনকে দেখাইয়া দিলেন।

"আপনাদের আরও ভলান্টিয়ার চাই কি, স্যর?"

"চাই তো বটে, কিন্তু কে আর যেতে চায় বলো?" ডক্টর মজুমদার হাসিলেন। কহিলেন, "নিজের দেশও যখন "ফ্রন্ট" হয়, তখন আমরা আঁত্কে উঠি। We are lamentably demoralised। যতীন আর আমি কি আর কম চেষ্টা করেচি? এ দেশে বন্যার স্বেচ্ছাসেবক জোটে, কিন্তু ফ্রন্টে যাবার কথায় হৃৎকম্প সুরু হয়। কি বলো যতীন, Is not it a fact?"

যতীন ঘাড় নাড়িয়া জানাইল তাহাই বটে। অমর সঙ্কোচের সহিত মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আমি ভাবচি স্যর, আমিও যাবো এঁদের সঙ্গে—আপনি যদি অনুমতি করেন—"

অমর আর কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া থামিয়া গেল। ডক্টর মজুমদার কিন্তু সবিস্ময়ে তাহার দিকে তাকাইলেন। অমরের আজ সারাদিন আহার হয় নাই, অস্নাত শুষ্ক মাথার উপর রুক্ষ কুঞ্চিত কেশ এলো মেলো হইয়া দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। শীর্ণ মুখে বেদনার ছায়া দারিদ্র্যের কালিমা বলিয়া ভুল হয়, পরণের কাপড়টা পর্য্যন্ত ধূলিমলিন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডক্টর মজুমদার অমরের আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিলেন। তাহার পর ঈষৎ নিস্পৃহ কণ্ঠে কহিলেন, "কিন্তু এঁদের সঙ্গে গেলে তো তুমি কোন বেতন পাবে না, বরং অন্যত্র কোথাও—"

কথাটা অমর বুঝিল। হাসিয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিল, "বেতন আমি চাইনে, স্যর। অন্য সকলের মতো ভলান্টিয়ার হিসেবেই যেতে চাই।"

ডক্টর মজুমদার কথাটা যেন বিশ্বাস করিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার বাম দিক্ হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "অমর চলুক, স্যর, আমাদের সঙ্গে। ও খুব হার্ডি আছে, স্যর।"

যে ছেলেটি সোৎসাহে কথা কয়টি বলিল, সে অমরের একজন ভূতপূর্ব্ব সহপাঠী নরেন। কিন্তু তাহার উৎসাহে শীতল জল নিক্ষেপ করিয়া ডক্টর মজুমদার অমরকে কহিলেন, "দেখো, যেতে চাও খুব ভালো কথা। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় একটা এত বড় adventureএর মধ্যে যাওয়া, I mean বাড়ীতে ঝগড়া মনোমালিন্য কিছু—"

তাহার কথার ইঙ্গিতে অমর বিরক্ত হইল, কহিল, "সে বিষয় আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সে রকম কোন কারণ ঘটে নি। এখন আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহ'লে আমি এখনই তৈরী হ'য়ে নিতে পারি।"

ডক্টর মজুমদারের ইহাতেও সংশয় ঘুচিল না; তবে কৃত্রিম উৎসাহে কহিলেন, "না, না, আমার আপত্তি থাকবে কেন? আমি তো তোমাদের মত স্বেচ্ছাসেবকই চাই। তা' তোমার জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে প্ল্যাটফরমে অপেক্ষা ক'রো। শীতের জামা-কিছু নিয়ো, কেমন?"

জামা কাপড়ের কথা শুনিয়া অমর একপ্রকার বিব্রত বোধ করিল। সহসা 'হাঁ' 'না' কিছুই বলিতে না পারিয়া অসহায়ভাবে চাহিয়া রহিল। ডক্টর মজুমদার তখন অমরের দিকে পিছন

ফিরিয়া কি একটা গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি অমরের ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন না; কিন্তু নরেন সহসা উঠিয়া আসিয়া চাপা গলায় অমরকে কহিল, "সে সব কিছু আপনাকে ভাবতে হবে না। চলুন আপনার সঙ্গে একটু ঘুরে আসি।"

নরেন একপ্রকার অমরকে টানিয়া লইয়া চলিল, ডক্টর মজুমদারকে একটা নমস্কার করিবার পর্য্যন্ত সময় দিল না।

বাহিরে আসিয়াই নরেন কহিল "চলুন, একটা রেস্তরাঁয় ব'সে গল্প করা যাক্—এখনও অনেক সময় আছে" ব'লিয়া অমরকে প্রতিবাদ করিবার সময় না দিয়াই নিকটে একটা চায়ের দোকানে গিয়া ঢুকিল।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে এক সময় কহিল, "দেখুন, আমার দু'টো ব্যাগ আছে, লেপও আছে দু'টো। তা ছাড়া এ আর পি তে কাজ ক'রতে ক'রতে খাকী প্যান্ট পেয়েচি, সেগুলো তো আছেই। আপনার সার্টের নীচে একটা সোয়েটার র'য়েচে, দেখ্‌চি। তার ওপর আমার এই কোটটা চাপিয়ে নেবেন; আমার একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ওভার কোট্ আছে সেইটাতেই আমি চালিয়ে নেবো। ব্যস্, আর ভাবনা কি?"

নরেন সকল বন্দোবস্ত করিয়া তবে চুপ করিল। অমর কৃতজ্ঞভাবে শুধু সায় দিয়া গেল—কেননা প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই। এই অযাচিত সাহায্য না পাইলে সে যাইবে কি করিয়া? সহসা আজ সে যে পথ বাছিয়া লইল, সে পথের দিশা তো ক্ষণকাল পূর্ব্বেও তাহার নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল। দিশা সে এখনও পায় নাই, বন্যার কল্লোলে জাগিয়া উঠিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন গৃহস্থ যেমন গৃহ প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়ায়, কর্ম্মহীন লুপ্তচেতনা সমাজজীবনের বাহিরে আসিয়া সে শুধু তেমনই একটা বৃহৎ স্রোতের গর্জ্জন শুনিতেছে মাত্র। তাই বাহির হইয়াছে, কিন্তু এতটা ভাবিয়া দেখে নাই। লেপ কম্বল লইতে গেলে তাহার বাবা যে যাইতে দিবেন না, ইহা সুনিশ্চিত। নরেনের এই অনুগ্রহে সে ভদ্রতা করিয়াও কোন অসম্মতি জানাইতে পারিল না।

চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া নরেন কহিল, "আপনার বাড়ীতে একবার দেখা ক'রতে যাবেন না?"

"না, বাবাকে একটা খবর পাঠিয়ে দিলেই হবে।"

নরেন বুঝিল—যে কোন কারণেই হোক্ অমর বাড়ীতে যাইতে চাহে না। সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "বেশ তো, চলুন না আমার মেসে। সেখান থেকে যাবার সময় মেসের চাকরকে দিয়ে আপনার বাবাকে একটা খবর পাঠালেই চলবে, কি বলুন?"

বাড়ীতে যাওয়ার সমস্যাটার এত সহজে সমাধান হইয়া যাওয়ায় অমর অত্যন্ত স্বস্তি বোধ করিল, কহিল, "সেই ভালো, চলুন।"

বিছানাপত্র নরেনের বাঁধাই ছিল। অমরের জন্য আরও কিছু সংগ্রহ করিয়া সে অমরকে লইয়া রাত্রির আহার সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সারিয়া লইল। সন্ধ্যার পর মুটের মাথায় মালপত্র বোঝাই করিয়া দুইজনে মেস হইতে বাহির হইল।

প্রায় দীপহীন পথে চলিতে চলিতে অমর বোধ করি কিছুই ভাবিতেছিল না—তথাপি নরেন যখন তাহার নব নব পরিকল্পনার বিবরণ দিতেছিল তখন অমরের কানে সেই সহস্র নরনারীর আর্ত্তনাদ তেমনই বাজিতেছিল। হেমলতার শুভ্র স্নিগ্ধ মুখের পাশে সেই বর্ম্মী মেয়েটির যন্ত্রণাকাতর আকুঞ্চিত বিবর্ণ মুখখানা মনে পড়িয়া গিয়া তাহার গতি অকারণে দ্রুত হইয়া আসিল। আচ্ছাদিত-প্রায় গ্যাসের স্বল্প আলোক অমরের মুখের উপর চোখ পড়িলে নরেন দেখিতে পাইত একটা কঠিন সংকল্পের প্রবল উত্তেজনায় অমরের মুখের পেশীগুলা যেন প্রতি মুহূর্ত্তেই দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছে।

রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

"গোবিন্দ নিবাসে"র তিনতলায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় আহারাদি সাঙ্গ করিয়া আচমন করিতে করিতে কহিলেন, "ওগো, শুনছ? যদুনাথবাবুর ছেলের ভাত আর খাইতে হবে না। সে কোথায় নাকি যুদ্ধে গেচে, যদুনাথবাবু এখনই খবর পেয়েচেন। ওঁরও বোধ হয় আজ আর খাওয়া হবে না। দেখো দিকিন্, ছোঁড়াটার কাণ্ড? বলে পড়ে কোথায় চলে গেল!"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তামাকু সাজিতে লাগিয়া গেলেন।

হেমলতা রান্নাঘরের কাজ সারিয়া ভাতে জল ঢালিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। সমস্ত বাড়ীটা অন্ধকারে নিজেকে আবৃত করিয়া যেন শ্বাসরুদ্ধ করিয়া ভয়ঙ্কর কিসের একটা প্রতীক্ষা করিতেছে। নীচে একতলায় উঠানের নর্দ্দমা হইতে অবিরাম একটা কলকল শব্দ উঠিয়া আসিয়া এই অন্ধকারে প্রতি কক্ষের দ্বারে দ্বারে যেন হানা দিয়া ফিরিতেছে। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, হেমলতা যেন সেই শব্দটাই কান পাতিয়া শুনিতেছিলেন। দ্বিতলের বারান্দায় যদুনাথবাবুর ঘরের সম্মুখে একটা সাদা পাঞ্জাবী শুকাইতেছিল। সহসা হেমলতা অন্ধকারেও বুঝিতে পারিলেন ওটা অমরের। তিনি দ্রুতপদে পাঞ্জাবীটা তুলিয়া লইয়া আসিলেন।

ঘরের ভিতর হইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ছোটবৌ, তোমার সারা হ'ল?"

পাঞ্জাবীটা বিছানার তলায় সন্তর্পণে লুকাইয়া রাখিয়া হেমলতা সাড়া দিলেন, "হ্যাঁ, এই যাই।" (সমাপ্ত)

বামুনের মেয়ে

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

৭০।৮০ বৎসর আগে পশ্চিম বাংলার পল্লীসমাজ যাহা ছিল 'বামুনের মেয়ে' তাহারই একটা চিত্র। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ উপন্যাসের ইহা পরিপূরক (Supplementary) মাত্র। পল্লীসমাজে আমাদের সমাজের কতকগুলি কথা বলিতে বাকি ছিল—এই উপন্যাসে সেগুলি বলা হইয়াছে। গোলোক চাটুয্যে বেণী ঘোষালেরই আর একটি রূপ। রাসমণির চরিত্রটা ইহাতে সম্পূর্ণ নূতন। পল্লীসমাজে শরৎচন্দ্র নিজের দেশকে কতটা ভালবাসেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—কিন্তু নিজের মিথ্যাভিমানে দৃপ্তমূঢ় সমাজকে তিনি কতটা ঘৃণা করেন—তাহা এই গ্রন্থে ভাল করিয়া ফুটিয়াছে। 'বামুনের মেয়ে'তে শরৎচন্দ্র যে সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভীকতা দেখাইয়াছেন—দেশের কোন ঐতিহাসিকও তাহা দেখাইতে পারেন নাই। বামুনের মেয়ের গ্রন্থকার আমাদের মাথার উপর যে উচ্চ আসনে সমাসীন—তাহার পাদপীঠ স্পর্শ করিবার শক্তিও আমাদের মত লেখকের নাই। এখানে তিনি সর্ব্ববিধ অন্ধ সংস্কার ও মিথ্যাচারের বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত। চিরন্তন সাহিত্যের স্রষ্টার ও নিরপেক্ষ তটস্থ উদারদৃষ্টির দ্রষ্টার এই আসন।

সন্ধ্যার পিতামহীর মুখ দিয়া শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন—

"এই যে কুলের মর্য্যাদা, এ যে কত বড় পাপ, কত বড় ফাঁকির বোঝা, এ যদি টের পেতে ত নিজের মেয়েটাকে এমন ক'রে বলি দিতে পারতে না। জাত আর কুলই সত্যি, আর সমস্ত জীবনের সুখদুঃখ কি এত বড়ই মিথ্যে?" * * *

"মিথ্যাকে মর্য্যাদা দিয়ে যত উঁচু ক'রে রাখবে—তার মধ্যে তত গ্লানি, তত পঙ্ক, তত অনাচার জমা হয়ে উঠতে থাকবে।" * * *

"দেশের রাজা একদিন শুধু গুণের সমষ্টি ধ'রেই ব্রাহ্মণকে কৌলীন্য-মর্য্যাদা দিয়ে শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন, তার পরে এমন দুর্দ্দিনও একদিন এসেছিল যে দিন সেই দেশের রাজার আদেশেই তাঁদেরই বংশধরের কেবল দোষের সংখ্যা গণনা করেই মেলবন্ধন করা হয়েছিল। যে সম্মানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ত্রুটী এবং অনাচারের উপর, তার ভিতরের মিথ্যাটা যদি জানতে দিদি, তাহলে ছোট জাত ব'লে যে দুলে মেয়ে দুটোকে তোমরা তাড়িয়ে দিলে তাদের ছোট বলতে তোমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট হতো।"

"মানুষে মানুষে ব্যবধানের এই যে মানুষের হাতে গড়া গণ্ডী, এ কখনো ভগবানের নিয়ম নয়। তাঁর প্রকাণ্ড মিলনের মুক্ত সিংহদ্বারে মানুষ যতই কাঁটার উপর কাঁটা চাপায়, ততই গোপন গহ্বরে তার অত্যাচারের বেড়া অনাচারে শতচ্ছিদ্র হতে থাকে। তাদের মধ্য দিয়ে তখন পাপ আর আবর্জ্জনা কেবল লুকিয়ে প্রবেশ করে।"

এই কথাগুলি ৭০।৮০ বৎসর আগের কোন পল্লীরমণীর মুখের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। এগুলো শরৎচন্দ্রের নিজেরই মন্তব্য। পল্লীরমণীর মুখে বলানো।

কৌলীন্য-প্রথা উঠিয়া গিয়াছে—জাতিকুলের অহঙ্কার অনেকটা শিথিল হইয়াছে—সমাজের সত্য দৃষ্টি ক্রমে উন্মীলিত হইতেছে। তবু শরৎচন্দ্রের উক্তিগুলি অন্তর্নিহিত সত্যের বলে এবং কলাচাতুর্য্যময়ী আবেষ্টনীর মধ্যে স্থান পাইয়া বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।

বাংলার পল্লীসমাজের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের রূপটা নিম্নলিখিত কথাগুলির মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে যথেষ্ট কলাচাতুর্য্যও আছে। Ironyও প্রচুর।

বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণ-বিধবা রাসমণির উক্তি—

"মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে যে একেবারে গোল্লায় যাবে। বুড়ো হতেই চললুম—লেখাপড়ার ত ধার ধারিনে, কিন্তু কোন শাস্তরটা জানিনে বল। কারো বাপের সাধ্যি আছে বলে, রাসি বামনী একটা অশাস্তর কাজ করেছে? এই মেয়েটা ছাগল-দড়ি ডিঙোবা-মাত্তর শিউরে উঠে বললুম, ওলো ছুঁড়ী করলি কি—আজ যে মঙ্গলবারের বারবেলা। কৈ কোন পণ্ডিত বলে যাক দেখিনি—না এতে দোষ নেই! ডাকো দিকি তোমার লিখিয়ে পড়িয়ে মেয়েকে—কেমন বলতে পারে?"

গোলোক চাটুয্যে পাঁচখানা গাঁয়ের সমাজপতি। তিনি জাহাজে ছাগল ভেড়া চালান দেন, যে গোরু চালান দেয় তাহার মূলধন যোগান, বিধবা শ্যালিকার চরিত্র নষ্ট করিয়া তাহাকে ভ্রূণহত্যা করিতে বাধ্য করেন এবং বৃদ্ধবয়সে চতুর্দ্দশী কন্যার কুলমর্য্যাদা রক্ষা করেন। তিনি শ্যালিকাকে বলিতেছেন—

"প্রভু গোকুল ঠাকুরের তিরোধানের দিন একটা পর্ব্ব দিন, ছোটগিন্নী, আমাদের মত সেকেলে লোকগুলো আজও এসব মেনে চলে ব'লেই তবু এখনো চন্দ্র সূর্য্য আকাশে উঠছে—জোয়ারভাটা নদীতে খেলছে।

সেবার সেই ভারি অসুখে জয়গোপাল ডাক্তার বললে—সোডার জল আপনাকে খেতেই হবে। আমি বললুম,—ডাক্তার, জন্মালেই মরতে হবে, সেটা বেশি কথা নয়; কিন্তু গোলোক চাটুয্যেকে যেন এ কথা আর দ্বিতীয় বার শুনতে না হয়। হররাম চাটুয্যের পৌত্র, যার এক বিন্দু পাদোদকের আশায় স্বয়ং ভাঁড়ারহাটির রাজাকেও পালকি-বেহারা পাঠাতে হ'তো।"

বৃদ্ধ গোলোক কিশোরী সন্ধ্যাকে বিবাহ করিতে চায়। রাসমণি তাহার মাকে এ শুভ সংবাদ দিয়া বলিতেছে—

"তোর পাগলী মেয়েটা কি তপিস্যিই করেছিল। যা, ভিজে কাপড়ে ভিজে চুলে গিয়ে শ্রীধরকে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করগে। পঞ্চাননের ও বিশালাক্ষীর থানে পুজো পাঠিয়ে দিগে।"

রাসমণি গর্ভবতী বিধবা জ্ঞানদাকে বলিতেছে—

"কপালের দোষে যে শত্রুটা তোর পেটে জন্মেছে—সেই আপদ বালাইটা ঘুচে যাক—কতক্ষণেরই বা মামলা। তার পরে যা ছিলি, তাই হ'। খা' দা' ঘুরে বেড়া, তীর্থধর্ম্ম বারব্রত কর—একথা কেউ না জানবে—কেউ বা শুনবে।"

রাসমণি প্রিয়নাথ ডাক্তারকে বলিল—"এখন দাও একটু ওষুধ পিওনাথ, যাতে গোলোক চাটুয্যের উঁচু মাথা নীচু না হয়। একটা দেশের মাথা, সমাজের শিরোমণি পুরুষমানুষ—তার দোষ কি বাবা? তার ঘরে এসে তুই ছুঁড়ী কি ঢলাঢলিটা করলি বল দিকি!"

তারপর শরৎচন্দ্র কৌলীন্যপ্রথার একটা অতি গূঢ় অঙ্গের পরিচয় দিয়াছেন—নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে। বিষয়বস্তুর দিক হইতে ইহাই রসবিকাশের বৃন্তস্বরূপ—

"এ কুকাজ হীরুনাপিত নিজের ইচ্ছেয় করেনি, তার মনিব মুকুন্দ মুখুয্যের আদেশেই করেছে। একে বুড়োমানুষ, তাতে বাতে পঙ্গু; তাই অপরিচিত স্ত্রীদের কাছ হতে টাকা আদায়ের ভার তার উপর দিয়ে ব'লে ছিলেন, 'হীরু' বামুনের পরিচয় মুখস্থ কর, একটা পৈতে তৈরি করে রাখ। এখন থেকে যা কিছু রোজগার করে আনবি—তার অর্দ্ধেক ভাগ পাবি।

আরো দশবারো জায়গা থেকে সে এমনি ক'রে প্রভুর জন্যে রোজগার ক'রে নিয়ে যেত। এ কাজ নূতন নয়, আর তার মনিবই কেবল একেলা করেন নি—এমন অনেক ব্রাহ্মণই দূরাঞ্চলে বখরার কারবারে অপরের সাহায্য নিয়ে থাকে।

ঠাকুরমা বলেছিলেন—জাতে কে ছোট কে বড় সে কেবল ভগবানই জানেন—মানুষ যেন কাউকে কখনো হীন ব'লে ঘৃণা না করে।"

এই সকল উক্তি হইতে যে সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়—সুখের বিষয় সে সমাজের পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। শরৎচন্দ্র সন্ধ্যা জগদ্ধাত্রীর পক্ষে সে কারণে জাত্যভিমানের অসারতা ও মূঢ়তা দেখাইয়াছেন,—ঠিক সেই কারণেই সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পক্ষে এই জাত্যাভিমান হাস্যজনক। জাতিতত্ত্ববিদ্ ও নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ শরৎচন্দ্রকে এ বিষয়ে সমর্থনই করিবেন।

জাত্যভিমানের দিক হইতে শরৎচন্দ্র সন্ধ্যার জীবনে যে Tragedy দেখাইয়াছেন—তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। সন্ধ্যা অরুণকে ভালবাসিয়াছিল ইহা পরম সত্য—হৃদয়ের নিভৃততম সত্য। অরুণও তাহাকে ভালবাসিত। জাত্যভিমানের মিথ্যা মোহে এই পরম সত্যকে সন্ধ্যা অস্বীকার করিয়াই তাহার দণ্ড ভোগ করিল।

সন্ধ্যা অরুণকে বলিল—"আভাসে ইঙ্গিতে কতবার জানিয়েছি যে কিছুতেই হয় না, তবুও তোমার ভিক্ষার জবরদস্তি যেন কিছুতেই শেষ হতে চায় না। বাবা রাজী হতে পারেন, মাও ভুলতে পারেন, আমিত ভুলতে পারিনে, 'আমি কত বড় বামুনের মেয়ে।' তুমিও আমার স্বজাত—কিন্তু বাঘ আর বেড়াল ত এক নয়, অরুণ দাদা।"

এই বাক্যগুলিতে যে Irony ও universal appeal নিহিত আছে—তাহা শরৎচন্দ্রের এই রচনাকে রসের উচ্চশিখরে তুলিয়া দিয়াছে, সন্ধ্যা তাহার বংশকুলের অহমিকায় ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছে, আর অদৃষ্ট-দেবতা মাথার উপরে হাসিতেছেন। এ দৃশ্য অপূর্ব্ব। সমগ্র ব্রাহ্মণসমাজই শরৎচন্দ্রের লক্ষ্য, সন্ধ্যা সে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে মাত্র।

তারপর যখন বিবাহের ছাঁদনাতলা হইতে সন্ধ্যার মাদোষের জন্য বর উঠিয়া চলিয়া গেল—তখন সন্ধ্যা চেলি পরিয়াই অরুণের পায়ের উপর পড়িয়া বলিল—

"আমাকে আর কেহ নেবে না—কেউ বিয়ে করবে না। কেবল তুমি ভালবাস। তুমি ছাড়া আজ পৃথিবীতে আমার কেউ নেই।"

অরুণ বলিল—আজ আমাকে ক্ষমা কর সন্ধ্যা, আমাকে একটু ভাবতে সময় দাও।

ইহা বুদ্ধিমতী সন্ধ্যার প্রেমাভিমানের দণ্ড নয়—ইহা নিষ্ঠুর জাত্যভিমানের দণ্ড। তাই শরৎচন্দ্রের সমবেদনা অরুণের প্রত্যাখ্যানে সঞ্চারিত হয় নাই।

এই উপন্যাসের সাহিত্যাঙ্গের অবলম্বন কিন্তু এই সমাজতত্ত্ব নয়—সমাজসংস্কার নয়—পল্লীসমাজের প্রতি ঘৃণা মাত্র নয়। ইহার অবলম্বন—প্রিয়নাথের চরিত্র ও পিতাপুত্রীর মধুর সম্বন্ধ। শরৎচন্দ্র দুর্দ্ধর্ষ কুলীন-সন্তান গোলোকের চরিত্রের পাশে এই দূষিতজন্মা প্রিয়নাথের চরিত্র আঁকিয়াছেন ধৃতরাষ্ট্রের পার্শে বিদুরের মত। প্রকারান্তরে শরৎচন্দ্র বলিতে চাহিয়াছেন—মহত্ত্ব বা মনুষ্যত্ব জন্মের উপর নির্ভর করে না। উচ্চ কুলেও গোলকের মত মহাপাষণ্ড জন্মে—নীচকুলে এবং দূষিত সংসর্গেও প্রিয়নাথের মত সাধুপুরুষের জন্ম হইতে পারে।

এই প্রিয়নাথ সমগ্র গ্রামের উপকার করিয়া বেড়ায়—আত্মভোলা মানুষ—গ্রামের লোক পাগলা ঠাকুর বলে—দুঃখীদের জন্য তাহার হৃদয় কাঁদে—গ্রামের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা তাহাকে ভালবাসে—কিন্তু ব্রাহ্মণ-সমাজ তাহাকে অপদার্থই মনে করে—স্ত্রী তাহাকে নির্য্যাতন করে। ঘরে বাহিরে অনাদৃত এই মহাপুরুষটির একমাত্র আশ্রয় তাহার কন্যা, সন্ধ্যা। লোকে তাহাকে লইয়া ব্যঙ্গ করে—সন্ধ্যার বুক ফাটিয়া যায়। এই লোকটির অভিমান তাহার বৃত্তির অভিমান। এই অভিমান রক্ষার জন্য সে এক শিশি ক্যাষ্টর অয়েলও পাইয়া আসে। অনাসক্ত চির-বৈরাগী পুরুষটিকে মানুষের স্তুতিনিন্দা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, আঘাত তিরস্কার কিছুই বিচলিত করিতে পারে না। বিষাক্ত পল্লীসমাজের বহু উর্দ্ধে সে অবস্থিত। এই আদর্শ ব্রাহ্মণটি কিন্তু হিরু নাপিতের সন্তান। সে যখন চিরবিদায় গ্রহণ করিল—তখনও সে নির্ব্বিকার; চোরের মত নিজের ঔষধের বাক্স ও হোমিওপ্যাথির বইগুলি লইয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যা সঙ্গী হইতে চাহিলে—তাহাকে সে বলিল—

আমার সঙ্গে কোথায় যাবে মা—তোমার মায়ের কাছে তুমি থাক—সেও অনেক দুঃখ পেলে। আর আমার নাম ক'রে যারা ওষুধ চাইতে আসবে—তাদের ওষুধ দিও। আর দেখ সন্ধ্যা, আমার বইগুলো যদি

তোর মা দেয় ত বিপিনটাকে দিয়ে দিস্। সে বেচারা গরিব, বই কিনতে পারে না ব'লেই ই সে কিছুই শিখ্‌তে পারে না।"

এই কথাগুলির স্বচ্ছতার মধ্য দিয়া যে চরিত্রটি ফুটিয়াছে তাহা বঙ্গসাহিত্যে অদ্বিতীয়, মহত্ত্বের জন্য নয়, অনন্যসাধারণতার জন্য।

সহস্র অপমান লাঞ্ছনাতেও তাহার হৃদয়ের উদারতা ম্লান হয় নাই। ষ্টেশনে জ্ঞানদার সঙ্গে দেখা—সে হতভাগিনীর অন্য কোন উপায় নাই—সে সঙ্গে যাইতে চাহিল—প্রিয়নাথ তাহাকেও সঙ্গে লইয়া গেল।

সুচিকিৎসক হইবার জন্য যে সতর্কতা, বিচক্ষণতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রয়োজন হয় তাহা তাহার ছিল না। তাহার ছিল হৃদয়-বৃত্তির আতিশয্য—হৃদয়-বৃত্তি দিয়া পরোপকার করা যায়—চিকিৎসকের খ্যাতিলাভ করিয়া অর্থোর্জ্জন করা যায় না। দারিদ্র্যের মহিমায় সমুজ্জ্বল তাহার অসাধারণ মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা তাহার কন্যা ছাড়া আর অন্য কেহ উপলব্ধি করে নাই। কোন্ অজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত জন্মকন্দর হইতে একটি নির্ম্মল স্বচ্ছ সলিলধারা বহিয়া আসিয়াছিল সমতলে, তৃষিতের তৃষ্ণা দূর করাই ছিল তাহার ব্রত, নীরস শুষ্ক মরুপ্রান্তর তাহার মর্য্যাদা বুঝিল না—তাহার অন্তর্নিহিত তাপে সে ধারা বাষ্পে পরিণত হইয়া উর্দ্ধলোকে চলিয়া গেল।

বামুনের মেয়ের যে মূল আখ্যানবস্তু তাহার জন্য প্রিয়নাথের চরিত্র অন্যরূপও হইতে পারিত। কিন্তু তাহাতে সমাজ-বিদূষণ ছাড়া এই পুস্তকে আর কিছু পাওয়া যাইত না এবং পুস্তকখানি সাহিত্যের উচ্চস্তরে আরোহণও করিত না। প্রিয়নাথের অপূর্ব্ব চরিত্রই ইহাকে উচ্চ সাহিত্যের মহিমা দান করিয়াছে।

প্রিয়নাথের প্রতি তাহার দুঃখিনী কন্যার গভীর সমবেদনাটুকু এই রচনায় গভীরতর রসসঞ্চার করিয়াছে। Ibsenএর Enemies of the people নাটকে ঠিক এইরূপ অপূর্ব রসসঞ্চারের কথা আছে। অসতর্ক-বুদ্ধি নিতান্ত অসহায় শিশুবৎ পিতাটিকে সন্ধ্যা সন্ধ্যার প্রদীপের মত অঞ্চলের আড়ালে বাঁচাইয়া চলিয়াছে এবং সকলেই যখন তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে তখন সেই কেবল তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে নাই।

সন্ধ্যা তেজস্বিনী বালিকা। তাহার তেজ ভ্রান্ত জাত্যভিমানকে আশ্রয় করিয়াছিল—তাহার চরম দণ্ড সে লাভ করিল। কিন্তু তাহার চরিত্রের তেজস্বিতা তাহাতেও নষ্ট হয় নাই। বিদায়ের পথে অরুণ যখন বলিল—সন্ধ্যা, সে রাত্রিতে আমি কিছুতেই মনস্থির করিতে পারিনি, কিন্তু আজ নিশ্চয় করেছি। তোমার কথাতেই রাজী হব। তখন সন্ধ্যা বলিল—"কিন্তু আজ আমারও মন স্থির হয়েছে। মেয়েমানুষের বিয়ে করা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন উপায় আছে কিনা সেটি জানতেই বাবার সঙ্গে যাচ্ছি।"

সন্ধ্যার জাত্যভিমান হইতে শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন—এই অভিমান মানুষ রক্ত হইতে পায় না—ঐতিহ্য (Tradition) হইতে পায়—সামাজিক পরিবেষ্টনী হইতে পায়—সেজন্য ইহা অধিকতর মিথ্যাবস্তু। তেজস্বিতা ও সত্যনিষ্ঠা জন্মগত হইতে পারে। রক্ত হইতে সঞ্চারিত হইলে সন্ধ্যার জাত্যভিমানের মোহ কিছুতেই এত প্রবল হইত না। সন্ধ্যা তাহার পিতামহীর তেজস্বিতা ও সত্যনিষ্ঠা রক্তপথেই পাইয়াছিল।

কৌতুকরস যে অনেক সময় করুণ রসেরই অন্তরঙ্গ সঙ্গী এই পুস্তকে শরৎচন্দ্র স্থলে স্থলে তাহাও দেখাইয়াছেন। প্রিয়নাথের আচরণে এক চোখ আমাদের হাস্যে উদ্দীপ্ত হয়—আর চোখে অশ্রু সঞ্চার হয়।

এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের সংস্কারমুক্ত দেশকালাতীত মানসের গভীর সহানুভূতির অশ্রু-শিশিরকণা সত্যের আলোকে ঝলমল করিতেছে। বলিতে ইচ্ছা হয়—হায় এই সমাজ! যে সমাজে মহাপাপিষ্ঠ ভ্রূণহত্যার অপরাধী বৃদ্ধবয়সে বালবধূর পরিণেতা গোলোক সমাজের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া বন্দিত, আর বিদুরকল্প সাধু পুরুষ সম্পূর্ণ নিরপরাধ প্রিয়নাথ যে জন্মের জন্য নিজে দায়ী নয় সেই জন্মের অজুহাতে বিড়ম্বিত—দেশ হইতে নির্ব্বাসিত—নিজের পত্নীর দ্বারাও পরিত্যক্ত, সেই সমাজ কি সাক্ষাৎ নরক নয়? এই কথাই শরৎচন্দ্র ঘোষণা করিয়াছেন গভীর আক্ষেপের সহিত।

সর্ববিধ অসত্য সংস্কারের বিরুদ্ধেই শরৎচন্দ্রের সারস্বত অভিযান। বামুনের মেয়েতে জন্মসম্বন্ধীয় অসত্য সংস্কারের উপরে শরৎচন্দ্র পরম সত্যের যে চন্দ্রিকাপাত করিয়াছেন—তাহা দেশকাল অতিক্রম করিয়া বিশ্বজনীনতার দরবারে পেঁাছিয়াছে। এই সংস্কার এখনো মানবসভ্যতার অঙ্গে কলঙ্ক রেখার মত বিরাজ করিতেছে। কৌলীন্য আজ নাই, কিন্তু তাহাকে অবলম্বন করিয়া তিনি যে সত্যের বিশ্বজনীন আবেদনটিকে বাণীরূপ দিয়াছেন—তাহা বিশ্বসাহিত্যে চিরদিন বিরাজ করিবে।*

* কেহ কেহ মনে করেন—প্রিয়নাথের আত্মবিভোর ভাব লইয়া একটু বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে—তাহার সহজ বুদ্ধির অবস্থাও মাঝে মাঝে দেখানো উচিত ছিল। সন্ধ্যার চিত্তের অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত ও উত্তেজিত মুহূর্ত্তে তাহার মুখ দিয়াই পিতার জন্মদূষণের সমগ্র ইতিহাসটা অরুণের কাছে ব্যক্ত করায় অস্বাভাবিকতার ছায়াপাত হইয়াছে—একথা আমাদের মনে হয়।

সন্ধ্যাদীপ

শ্রীমতী প্রভাময়ী মিত্র

স্বর্গের বাতায়নে মর্ত্ত্যের মুখ চেয়ে
সন্ধ্যা তারার দীপ জ্বেলে রাখে কোন মেয়ে?
বাজে আবাহনে শাঁখ ইঙ্গিতে বুঝি তারি,
প্রাসাদে কুটীরে দেয় মঙ্গল দীপবারি।
আধ আলো ছায়া মাঝে কারে খুঁজি ঘুরে আঁখি
শূন্য পিঞ্জরে ফিরে অচিন্ নীড়ের পাখি

কর্মযোগ

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

(২)

পূর্ব্বে যে সাধনা আর উপাসনার কথা বলা হয়েছে তার চেয়ে বিশুদ্ধতম সাধনা উপাসনা আর নেই। যে-সংযমের কথা বলা হয়েছে সে হচ্ছে সব থেকে কঠিন সংযম, যে-বুদ্ধির কথা বলা হয়েছে সে হল ভেদাভেদশূন্য, ঘৃণাদ্বেষবিবর্জিত সর্বত্র সমবুদ্ধি,—কিন্তু বিশেষ করে লক্ষ্য করতে হবে যে তথাপি এই উপাসনা, এ সংযম, এ বুদ্ধি নিয়েও মুক্তি আসবে না, সবই ব্যর্থ হতে থাকবে, যদি সর্বভূতহিতে রত না হও, যদি পরমমঙ্গলে ব্রতী না হও। শ্লোকশেষের ঐ 'সর্বভূতহিতেরতাঃ' কথাটি দাগ দিয়ে দিয়ে পড়া উচিত।

রাজর্ষি জনকের উদাহরণ দিয়ে গীতা বললেন—

কর্মণ্যেব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি॥

—জনকাদি কর্মের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। লোকসংগ্রহ অর্থাৎ লোকরক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখেও কাজ করা উচিত (অর্থাৎ কর্মত্যাগ করা উচিত নয়)।

রাজর্ষি জনকের কথা কে না শুনেছে? রাজা হ'য়েও ভোগসুখে তিনি নিস্পৃহ ছিলেন, প্রজামঙ্গলই ছিল তাঁর ব্রত। এই জনকেরই লোকবিশ্রুত চরিত্র রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' গোবিন্দমাণিক্যে কি সমুজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে উঠেছে—

"সমস্ত বাসনার দ্রব্য বিসর্জন দিয়া তিনি হৃদয়ের মধ্যে আশ্চর্য স্বাধীনতা অনুভব করিতে লাগিলেন। কেহ আর তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না, অগ্রসর হইবার সময় কেহ আর বাধা দিতে পারে না। প্রকৃতিকে অত্যন্ত বৃহৎ দেখিলেন এবং আপনাকেও তাহার সহিত এক বলিয়া মনে হইল। ···গ্রামে গিয়া মানবের প্রত্যেক কাজের মধ্যে তিনি এক নূতন সৌন্দর্য দেখিতে লাগিলেন।···যাহাকে দেখিলেন তাহাকে কাছে ডাকিয়া কথা কহিয়া সুখ পাইলেন···সর্বত্র দুর্বলকে সাহায্য করিতে এবং দুঃখীকে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল আমার নিজের সমস্ত বল এবং সমস্ত সুখ আমি পরের জন্য উৎসর্গ করিলাম, কেন না আমার নিজের কোনো কাজ নাই, কোনো বাসনা নাই।···যখন দুই ছেলেকে পথে বসিয়া খেলা করিতে দেখিতেন, দুই ভাইকে, পিতাপুত্রকে, মাতা ও শিশুকে একত্র দেখিতেন, তাহারা ধূলিলিপ্ত হউক, দরিদ্র হউক, কদর্য হউক, তিনি তাহাদের মধ্যে দূরদূরান্তরব্যাপী মানবহৃদয়সমুদ্রের অনন্তগভীর প্রেম দেখিতে পাইলেন।"

শুধু জনকাদির দৃষ্টান্ত নয়, শ্রীভগবান নিজের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বললেন—

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্মণি॥
যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্মচেদহং।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥

ঈশ্বর অতন্দ্রিত হয়ে কর্মে ব্যাপ্ত আছেন। একথা উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি, য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ—সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, একাকী তিনিই থাকেন জেগে, একা তিনিই নিরলস অতন্দ্রিত হ'য়ে সর্বপ্রাণীর কাম্যবিধান করেন, তাদের ভোগ্যবস্তুসকল বিধান করেন। তাঁর তো কোনো দায় নেই, এমন কি তাঁর তাড়া আছে যে কাজ তাঁকে করতেই হবে?—ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন—তবুও তিনি কাজ করেন, সর্বজীবের মঙ্গলবিধানের জন্য। তাঁর কাজ, সে হল স্বার্থলেশশূন্য বিশুদ্ধতম মঙ্গলকাজ, কেন না তাঁর সম্বন্ধে স্বার্থের কোনো কথাই উঠতে পারে না। এমন কি অর্থ আছে যা তিনি পান নি? এমন কি জিনিষ আছে যা তাঁর নেই? তিনি যেমন সর্বজীবের শাসন, সংরক্ষণ ও মঙ্গল করছেন, সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা ও বিনষ্টি হ'তে রক্ষা করছেন, মানুষকে ডাক দিয়ে বলেছেন,—তুমিও তেমনি করো, তুমিও আমারি পথের পথিক হও। তিনি বললেন—

একমাত্র মানুষকেই তিনি বলেছেন, তোমার দুই পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াও, মাটির দিক থেকে একবার আমার এই অনন্ত নীলাকাশের আলোর দিকে তাকাও, তুমি ক্ষুদ্র নও, হেয় নও, তুমি বীর। এযে আমাদের ওপর তাঁর কত বড়ো ভালবাসা তা কি একটিবারও আমরা ভেবে দেখব না! পিতা যখন তাঁর শিশুপুত্রকে বলেন, আমার এই কাজটি ক'রে দাও তো বৎস,—সে কি তিনি নিজে সেই কাজ পারেন না ব'লে? —সে কেবল তাঁর পুত্রকে মর্য্যাদা দেবার জন্যে, সে কেবল তিনি তাকে ভালবাসেন ব'লে। আমাদের পিতামহগণ জানতেন তাঁর এই ভালবাসা, তাই তো অতি সহজেই বিনা দ্বিধায় তাঁরা ডাকতে পেরেছিলেন তাঁকে পিতা ব'লে, বলেছিলেন 'পিতা নোহসি, পিতা নো বোধি'—তুমি আমাদের পিতা, তুমি যে পিতা সেই বোধ আমাদের দাও। আমরা যেন বিশ্বপিতার এ ভালবাসার অমর্য্যাদা না করি। তিনি যে দয়া ক'রে ডেকেছেন তাঁর মঙ্গলযজ্ঞে যোগ দিতে, এতে যেন নিজেকে কৃতার্থ মনে করি। যদি কোনোদিন সত্যি কারো চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারি, সত্যি দুঃখ লাঘব করতে পারি, তাহলে যেন অন্তরের নম্রতায় তাঁকে এই নিবেদন করতে পারি, এই যে তোমার কাজ আমায় দিয়ে করালে এতেই আমি ধন্য হলুম।

ঐ তাঁর মঙ্গলের রথ চলেছে। অরণ্যগিরি ভেদ ক'রে, জনপদের ওপর দিয়ে, মহাসাগর লঙ্ঘন ক'রে, নদনদীর ধারা বেয়ে, যুগ হতে যুগান্তরে

চলেছে। তাঁর জয়ধ্বজা বর্ষার নবমেঘে আকাশে ওড়ে, তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি আর সব ধ্বনিকে ছাপিয়ে কানে এসে বাজে—

"জনগণপথ তব জয়রথচক্রমুখর আজি
স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।"

কত দেশের নরনারী কত যুগের ওপার হ'তে অনন্ত অবারিতস্রোতে এসে ধরেছে তাঁর মঙ্গলরথের কাছি, কত দুঃখ, কত মৃত্যুকে উপেক্ষা ক'রে চলেছে এই বিঘ্নজয়ী নরনারীর ধারা! নিরন্তর সেই মঙ্গলময়ের আহ্বান এসে পৌঁছোচ্ছে মানুষের বুকের মাঝখানটিতে, মানুষ আর আরামের বিলাসশয়নে ঘরে বসে থাকবে না। তিনি বলে দিয়েছেন, টানো, টানো—আমার এই মঙ্গলের রথ তোমরা সবাই মিলে টেনে নিয়ে যাও! কোথায় মারী আছে, কোথায় দুর্ভিক্ষ, পীড়ন আছে, কোথায় বিদ্বেষ, হিংসা, লোভ, পাপ মানুষের মুখের ওপর ভ্রূকুটি ধরে আছে, কোথায় অজ্ঞানতার অন্ধকারে চোখে ঠুলি পরানো? কোথায় তিমির রাত্রির আঁধার ছাপিয়ে হতভাগা মানুষ বুকফাটা কান্না কাঁদে?—চলো চলো, সে সব দগ্ধদেশে কল্যাণের সঞ্জীবনীধারা ঢেলে দিতে দিতে চলো, মঙ্গলের আলো জ্বালাতে জ্বালাতে চলো, এই তো মানুষের মতো বাঁচা—আর সবাই ব্যর্থজীবন বহন করে, মোঘং পার্থ স জীবতি।

কিন্তু হায়, আজকের মানুষ যে বিশ্বাস হারাতে বসেছে, মঙ্গল কি কোনোদিন সত্যি সত্যিই আসবে! এই যুগে দু-দুটো জগৎ-জোড়া যুদ্ধ ঘটে গেল, কেবল মার খাওয়াই কি সার হবে? কি ভয়ানক ঠকিয়েছে মানুষ মানুষকে! যুদ্ধোত্তর-মঙ্গলের কত রঙীণ পরিকল্পনাকেই আমরা অলীক হয়ে যেতে দেখেছি,—এবারও কি তাই হবে? বড় বড় বুলির মুখোষ পরে সেদিনও যেমন, আজও কি তেম্‌নি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর ক্লেদসিক্ত স্বার্থপরতা তার লোলজিহ্ব লোভে যথাসর্ব্বস্ব চেটে খাবে? এত প্রাণ-বলিদান, এত রক্তপাত, দরিদ্রের এত দুঃখ, এত কষ্ট,—আবার সবই কি ব্যর্থ হবে? যারা অবহেলিত, পরিত্যক্ত, যারা কেবলই বাইরে দাঁড়িয়ে জলে ভিজেছে, রোদে পুড়েছে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন হয়ে বসে পড়েছে ধুলায়,—কেউ কি তাদের ভেতরে ডাকবে না, বসতে আসন দেবে না! আজ তাদের মনের শ্রদ্ধা টলেছে, বিশ্বাস টলেছে। শাণিত তীক্ষ্ণ তাদের বিদ্রূপের হাসি, নতুন কিছুতে তাদের অবিশ্বাস, ভাবে আবার কোনো অভিনব ফাঁদ বুঝি এটা! কিন্তু বুঝে ভাখো, যখন মনের শ্রদ্ধা এম্‌নি ক'রে টলে, বিশ্বাস আর থাকে না, শ্রদ্ধাকে বিশ্বাসকে তখন দ্বিগুণ জোরে আঁকড়ে থাকবার সেই যে ঠিক সময়! ঝড় যখন হালধরা হাতের মুঠিকে শিথিল ক'রে দিতে চায়, দ্বিগুণ জোরে হাতের মুঠিকে শক্ত করবার সেই যে একটিমাত্র ঠিক সময়। দীর্ঘদিন ধ'রে যে-লড়াই মানুষ এই অবহেলিতদের জন্যে লড়তে লড়তে এসেছে, এ লড়াই যে তাকে লড়তেই হবে, ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত তাকে হতেই হবে, নইলে কেমন ক'রে চূর্ণ হবে পুঞ্জীভূত অমঙ্গল? আশা হারিও না, বিশ্বাস ভেঙো না, হে নিঃস্বার্থ মঙ্গলব্রতী, অরণ্যসঙ্কুল বন্ধুর পথে পথ কাটতে কাটতে এগিয়ে চলো, শ্রমের জলে, চোখের জলে চন্দনলিপ্ত হোক্ দেহ তোমার,—এ যে তোমারি কাজ, এ কাজে তোমারি যে অধিকার।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে,—অধিকার বলা হয়েছে কেন? কি বোঝায় অধিকার বলতে? এই কথাটার মধ্যে যেমন একটা জোর আছে, তেমনি আবার একটা ত্যাগের ঔদাসীন্য আছে, এতে শক্ত ক'রে চেপে ধরা হাতের মুঠি, আর নিবেদনে প্রসারিত হাতের অঞ্জলি—দুইই বোঝায়। তাই 'অধিকার' কথাটি এমন সুনির্বাচিত যে এর বদলে আর কোনো কথা বসানো যেত না। যে-মানুষ কোনোকিছুর সঙ্গে একেবারে জড়িয়ে গেছে, তাতে তার কিসের অধিকার? যে দরকার হ'লে ছাড়তে পারে, তারি তো অধিকার। বিষয়ে অধিকার পাকা করে দানবিক্রীর ক্ষমতা, বিষয় যে ত্যাগ করতে পারে তারি থাকে বিষয়ের অধিকার। কাজের বেলাতেও তাই। ইতিহাসে দেখতে পাই কত সৎকাজ করে গেছেন কত রাজামহারাজ। পালরাজারা দীঘী কেটে জলকষ্ট ঘুচিয়েছেন, সের সা' রাস্তা তৈরি করেছিলেন ভারতের পূর্ব হ'তে পশ্চিম দিগন্তে, সম্রাট অশোকের চিকিৎসালয়, পান্থ-শালা, বৃক্ষরোপণ আর শিলালিপি আজও মানুষ ভোলে নি। কিন্তু এসব কাজ তো তাঁরা নিজের হাতে করেন নি, তবে কেন বলে এসব তাঁদেরি করা সৎকাজ? কিসে অধিকার জন্মাল তাঁদের? তাঁদের শুধু ছিল পরিকল্পনা, পর্য্যবেক্ষণ, অর্থব্যয়। আর মাটি কেটে, পাথর ভেঙে, ঘর্মাক্ত কলেবরে রৌদ্র বর্ষা শীতে সে-কাজ হাতে ক'রে তৈরি করেছিল কুলীমজুররা। তবে কেন বলে না এসব কাজ কুলীমজুরদেরই কাজ? তার কারণ কুলীমজুর কাজ দেয়নি, মজুরি নিয়েছে,—মজুরির অতিরিক্ত এক সিকিপয়সার কাজও দেয় নি। যা দিয়েছে, হাতে হাতে কড়ায় গণ্ডায় তা পরিশোধ হয়েছে। আর এঁরা কেবলি দিয়ে গেছেন—এঁদের কাজ প্রতিদানে কিছুই নেন নি, কাজ করেছেন, আর সেই কাজ দুহাতে সকলকালের মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন। যাঁরা নিজের কাজকে নিজের দিকে আঁকড়ে রাখেন না, সকলের মধ্যে নিঃশেষে দান ক'রে দিতে পারেন, তাঁরাই কর্মী।

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥

—কর্ম ব্রহ্ম হ'তেই উৎপন্ন জেন। এই ব্রহ্মই অক্ষর, সম শান্ত নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের এক বিভাব। তাই সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে অর্থাৎ মঙ্গল বিধানরূপ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। এরূপ প্রবর্তিত মঙ্গল-যজ্ঞ-চক্রের যে অনুবর্তন না করে, সে অঘায়ু, পাপিষ্ঠ, সে ইন্দ্রিয়াসক্ত, সে ব্যর্থ জীবন বহন করে।

কর্ম ব্রহ্ম হতেই সমুদ্ভূত। তিনিই সকল কাজের কর্মী, তাঁর এই কাজের নাম যজ্ঞ। সে হল সেই বিরাট যজ্ঞ—যা তিনি অতন্দ্রিতে আচরণ ক'রে যাচ্ছেন,—য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ—তাঁর সেই অনাদি অনন্ত মঙ্গল যজ্ঞচক্র নিরন্তর এই পৃথিবীতে আবর্তিত।

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি,—মানুষে কি কাজ করে না, ব্রহ্মই সব কাজ করেন?—হাঁ। ভেবে ভাখো, তোমার হাত পা ইন্দ্রিয় সবই তো ভগবানের দান। তারা কাজ করে ঐশ্বরিক বিধানে, প্রকৃতির গুণে।

মানুষ ঐ রকম হাত পা মস্তিষ্ক তৈরি করুক দেখি ! তা সে পারে না। এরা যে কাজ করে সে তো ঈশ্বরেরই কাজ, কেন না ঈশ্বর-সৃষ্ট এসব যন্ত্র। মানুষের তৈরি কলের কাজকে মানুষেরই কাজ বলে, কেউ বলে না এটা কলের কাজ। এও তেমনি। তাই, কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি—কর্ম ব্রহ্ম হতেই উৎপন্ন জেনো। কিন্তু তবু তো আমরা বলি, অমুক কাজ অমুক মানুষ করেছে। কেন বলি ? ঈশ্বরের কলে আর মানুষের কলে এই একটি মস্ত প্রভেদ আছে, মানুষের কলের কোনো স্বাধীন ইচ্ছা নেই, ঈশ্বরের কলের আছে। মানুষের কল বলুক দেখি, আমি করব না একাজ !—তা সে পারে না বলতে। কিন্তু ঈশ্বরের কল এই যে মানুষ, সে যে-মুহূর্তে ইচ্ছা করবে, আমি অমুক কাজটি করব, অমনি ঈশ্বর-সৃষ্ট ইন্দ্রিয়গুলি আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মতো তার ইচ্ছা পালন করতে থাকবে। ঈশ্বর মানুষকে এই আশ্চর্য অধিকারটি দিয়ে রেখেছেন যে সে যখনি তার ইচ্ছাখাটিয়ে কোনো কাজ করবে, সে-কাজটি তারি হবে। ঈশ্বর মানুষের দ্বারে দ্বারে তার সেই স্বাধীন ইচ্ছাটি ভিক্ষা করছেন—তাঁর মঙ্গল কর্মে মানুষের যোগদান করার ইচ্ছাটি। একেই বলে এবং প্রবর্তিতং চক্রের অনুবর্তন করা। যে-মানুষ তা না করবে, সে পাপিষ্ঠ, সে ইন্দ্রিয়াসক্ত, সে ব্যর্থজীবন যাপন করে।

কেন তিনি মানুষকে ডাকলেন ? তিনি তো একাই সব করতে পারতেন, তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি তো পশুকে ডাকেন নি, তবে মানুষকে ডাকলেন কেন তাঁর সাহায্য করতে ? তিনি যে মানুষকে ভাল বাসেন,মানুষের সঙ্গে যে তাঁর ভালবাসার সম্পর্ক, তাঁর লীলার সম্পর্ক, তাই তিনি মানুষকে ডেকেছেন। আর সব সৃষ্ট-জীবের মধ্যে একমাত্র মানুষেরই দুটি হাত তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ক'রে দিয়ে বলেছেন তোমার ঐ দুটি হাত দিয়ে আমার কাজটুকু ক'রে দাও। পশুদের তিনি একথা বলেন নি, পশুদের হাত দুটিকে তো তিনি মুক্ত করেন নি। পশুরা মাটির দিকে মুখ করেই জন্মায়, সারাজীবন মাটির দিকেই তাদের মুখ ফেরানো।

মিশরের ডায়েরী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৩

জীবানি বিমানকেন্দ্রে দশ মিনিট বিশ্রাম করলাম। তারপর ওমান উপসাগরের তীরে সার্জ্জা নামক একটা বিমানকেন্দ্রে বিশ্রামের জন্য নামলাম। ভীষণ গরম স্থান। চারিদিকে উত্তপ্ত বালু। এক একটা খেজুর গাছ ভিন্ন জীবনের কোন চিহ্নই নেই। বহুদূর থেকে গাধার পিঠে করে জল আনা হয়। বিমানকেন্দ্রে বিশ্রামাগারে পৌঁছে আমরা দেখলাম—এই দুর্জ্জয় বালুকারাশি জয় করে মানুষ অতি সুন্দর গৃহ, অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেছে। আমি প্রবেশ পথে দেখলাম—একটা বাঙ্গালী যুবক। আমাকে দেখে একটু এগিয়ে এলেন। সার্জ্জার পথে কোন অসামরিক বাঙ্গালী বৎসরাধিক কাল তিনি দেখেন নি। সাহস ক'রে আমার সঙ্গে কথা ব'লতে পারছিলেন না, যদিও কথা বলবার খুব ইচ্ছা দেখলাম। আমি এগিয়ে এসে তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস ক'রলাম, —আপনি কি মিঃ সেন ? তিনি আরও আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। তাঁর মুখ থেকে কথা সরছিলো না। আমি হেসে বল্লাম—আপনার ভাই করাচী এয়ার পোর্টে আপনার কথা ব'লেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে দেখে ভেতর থেকে আরও দু'জন বাঙ্গালী যুবক বেরিয়ে এলেন। আমার খুব আনন্দ হ'ল। তাঁদের আনন্দ বোধ হয় আরও বেশী হল। গগন সেন (হুগলী), মণি মিত্র (ফরিদপুর), ক্ষিতীশ কর (ময়মনসিংহ)—তিনটী বাঙ্গালী যুবক বেতার অফিসে কাজ করেন। বহুকাল পরে একজন বাঙ্গালী পেয়ে তাঁরা যেন স্বদেশের অংশ বিশেষের সন্ধান পেলেন। পরম আত্মীয় জ্ঞানে অতি যত্নে আমাকে তাঁদের বাসগৃহে নিয়ে খাওয়ালেন। আমাকে কিছুতেই B. O. A. C.র লাঞ্চ খেতে দিলেন না, যদিও তাঁদের রেশন অত্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ ছিল। প্রায় ৪৫ মিনিট তাঁরা বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক সূক্ষ্মতম সংবাদ—দুর্ভিক্ষ, বন্যা, অনাচার সমস্ত জেনে নিলেন। কি তীব্র আকাঙ্ক্ষা সামান্য সংবাদটুকুর জন্য। তাঁরা আমাকে ওমান উপসাগরের মণিমুক্তা ও ব্যবসার কথা ব'ল্লেন। অনেক দুঃখ ক'রলেন যে, বাঙ্গালী কোন যুবক ভাগ্য অন্বেষণে এদেশে আসে নি। বম্বের সঙ্গে ওমান উপসাগরের মুক্তা ব্যবসায়ীদের খুব লাভজনক কারবার চ'লছে। তারপর আবার বিমান সঙ্কেতে আমরা এগিয়ে চ'ল্লাম বাহেরিণের পথে। আমাদের পথ চ'লেছে—এক পাশে মরুভূমি, আর এক পাশে সাগর। উপর থেকে দেখা যাচ্ছিল যেন একখানি শ্বেতপট্টবাস ধরণীর বক্ষ আবৃত ক'রে র'য়েছে। ওমান উপসাগরের জলরাশি স্বল্প-তরঙ্গ, অতি শান্ত ও স্তব্ধ। মেঘের ছায়ায় কখনো কখনো জলের ওপর রঙ্গের খেলা ও বর্ণ চাতুর্য্য—ভারী চমৎকার, অতি অপূর্ব্ব। আমার কৌতুহল অপরিসীম। প্রকৃতির সেই আনন্দময়ী মূর্ত্তি—একদিকে রিক্তা বৈরাগ্যময়ী বসুন্ধরা, অপরদিকে প্রাচুর্য্যময়ী পূর্ণসলিলা অম্বুধি। প্রকৃতির কি অপরূপ রূপ ! প্রায় সাড়ে তিনটার সময় অনুভব করলাম, অদূরে মনুষ্যাবাস। কারণ, খর্জ্জুরবৃক্ষ মরুভূমির বক্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর একটু দূরে দু'একটা ক্ষুদ্র বেদুইন কুটীর, আড়ম্বরবিহীন অথচ মনুষ্যাবাস সূচনা ক'রছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা বাহেরিণের চিত্র দেখতে পেলাম। উপর থেকে মনে হ'চ্ছিল শুষ্ক মরুভূমির প্রচ্ছন্ন-

পটে সবুজ উদ্যান বাটিকা। পোতাশ্রয়ে বিশ্রামাগারে প্রথম আরব সেখের (Arab Chief) সাক্ষাৎ পেলাম। সুস্থ সবল দেহ, ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রু, মস্তকের শুভ্র আচ্ছাদন জড়িয়ে র'য়েছে, কৃষ্ণবর্ণ আগালা (বেল্ট)। স্কন্ধদেশ থেকে লম্বমান গালাবাইয়া (আচকান), তার উপরে সোনালী সুতার কারুকার্য্য, আর পদযুগলে বিচিত্র কারুকার্য্যময় চপ্পল; হস্তে জপমালা। ইহাই সাধারণ আরব গোষ্ঠপতির বেশ। এরা বড্ড তাড়াতাড়ি কথা বলে। একজন বাঙ্গালীর সাথে দেখা হ'ল; তিনি সামান্য রঙ্গীণ পানীয়ের জন্য আহ্বান ক'র্লেন। অক্ষমতা জানিয়ে মার্জ্জনা প্রার্থনা ক'র্লাম। তিনি স্মিতমুখে ব'ল্লেন ;—আপনার বিদেশ যাওয়া বৃথা। আমি উত্তর দিলাম —আপনার বিদেশবাস সার্থক জেনে আমি কৃতার্থ। তারপর এরোপ্লেনে ফিরে এসে দেখি—আমার সিগারেটের কৌটার অর্দ্ধেক শূন্য। পাশের তিনজন কানাডিয়ান সৈন্যের মুখে দেখলাম, আমারই কাভেণ্ডার সিগারেট। আমাকে দেখে তারা একটু অপ্রস্তুত হ'ল। সিগারেট নেওয়াতে দুঃখিত হই নি, চুরি করাতে নিজেই লজ্জিত হ'লাম; আমি তাড়াতাড়ি কৌটাটা এগিয়ে তাদের আরো সিগারেট দিলাম। কম্পিত-হস্তে তারা সিগারেট নিল; কিন্তু মুখে বেশ অপ্রস্তুতের ভাব দেখলাম। ব'ল্লাম,—দরকার হ'লে আরও নেবে, লজ্জা কিসের ?

তারপর বসরার পথে যাত্রা সুরু হ'ল। প্রায় ৭ হাজার ফিট উপরে উঠেছি; হঠাৎ অনুভব ক'রলাম, এরোপ্লেন খুব দুলছে। মাথা স্থির রাখতে পারছিলাম না। সামানের মহিলাটী তাঁর স্বামীর কোলে মাথা দিয়ে অবশ হ'য়ে শুয়ে প'ড়লেন। আর অনবরত বমি। ক্রমশঃই এরোপ্লেনে দোলা বেশী হ'তে লাগল। সাত আট জন শুয়ে প'ড়ল। প্লেন একবার উঠেছে, একবার নামছে, কথনও কখনও পাশ কাটাচ্ছে। জানালা দিয়ে বাইরে দেখলাম ধূলির সমুদ্র। সমস্ত পাংশুবর্ণ। শিখ কাপ্তেন ব'ল্লেন,—ধূলির ঝড় উঠেছে! স্থির হ'য়ে থাকুন। মরুভূমিতে ধূলির ঘূর্ণিবায়ু অতি ভীষণ। আমরা অনেক উপর দিয়ে যাচ্ছি। ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি কিন্তু মরুভূমির ধূলির ঝড়্কে সানন্দে অভিনন্দন জানালাম। ভয়ঙ্করেরও অভিজ্ঞতা বরণীয়। আধ ঘণ্টা পর ধূলির ঝড় কেটে গেল। দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতাগুল্ম ও বেদুইনের কুটীর বসবার নৈকট্য জ্ঞাপন ক'রল। আমরা প্রায় সাতটার সময় বসরা এয়ারপোর্টে নামলাম। তখনও সন্ধ্যা হ'তে তিন ঘণ্টা দেরী।

আমাদের হোটেলে নিয়ে এল। শাত-ইল্-আরব-হোটেল (Shatt-le-Arab-Hotel) মধ্যপ্রাচ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোটেল ব'লে বিখ্যাত। তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর সঙ্গমস্থলে মরুভূমি চাষ ক'রে নতুন উদ্যান তৈরী করা হ'য়েছে। সাদা বালি, সবুজ বিলাতী মুরসুমী ফুলের গাছ, নানা রঙের ফুল, জ্যামিতির সমস্ত চিত্র ও রেখা বৈজ্ঞানিকের কাজে লাগান হ'য়েছ। হোটেলের পশ্চাতেই র'য়েছে নর্ম্ম উদ্যান। সেখানে সঙ্গীত, নাটক, সিনেমা, নৃত্য সমস্ত আয়োজনই র'য়েছে। বিলাতী ব্যাণ্ড দিনে তিনবার তাদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। তাইগ্রিসে মেরিণ এয়ার পোর্ট হোটেলের পূর্ব্বদিকে, আর ল্যাণ্ড এয়ার পোর্ট হোটেলের পশ্চিমে। জলে ও স্থলে এই বিমানপোতের সঙ্গম অতি বিচিত্র। আমরা হোটেলে আমাদের নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে প্রবেশ ক'রবার পূর্ব্বে ইরাকীয় কাষ্টম্স্ এবং পোর্ট অফিসার নানারকম প্রশ্ন ও সংবাদ নিয়ে আমাদের অব্যাহতি দিলেন। তারপর আমরা লাউঞ্জে ব'সলাম। কি মূল্যবান তৈজসপত্র। আমাদের একটু হট্ ও কোল্ড পানীয় (Hot and cold drink) এর ব্যবস্থা ক'রে প্রধান ওয়েটার ফরাসী ভাষায়—জানিয়ে দিলে,—বিভিন্ন যাত্রীর নির্দ্দিষ্ট কামরা। আমি ও কাপ্তেন সিং পাশাপাশি কামরায় গেলাম। কামরায় র'য়েছে সমস্ত প্রয়োজনীয় আসবাব, তদুপরি একটী রেডিও, আর একটী টেলিফোন। প্রত্যেক কামরার জন্য একটী ক'রে আলাদা ভৃত্য। আমি স্নান করে বেরিয়ে দেখি, আমার টেবিলে র'য়েছে পরের দিনের বাগদাদ যাত্রার ব্যবস্থা-বিজ্ঞপ্তি; আর এক থালা ফল ও এক গ্লাস লেমন স্কোয়াস। ভৃত্য ব'ল্লে—রঙীন পানীয় চাইলে ভিন্ন দাম দিতে হবে। আমি জিজ্ঞেস ক'রলাম,—এই হোটেলের দক্ষিণা কত? উত্তর দিল,—প্রথম শ্রেণী ৪ পাউণ্ড ৫৫্ টাকা দৈনিক। বাস্তবিকই হোটেলের যা আয়োজন,—আসবাবপত্র, বিলাসের ব্যবস্থা, রেডিও, টেলিফোন, সিনেমা, নৃত্য—তার বিনিময়ে ৪ পাউণ্ড যুদ্ধের দিনে খুব বেশী নয়। তবে মহীশূরের মাউণ্ট পেলিয়ার হোটেলের প্রাকৃতিক দৃশ্যের যে একটা বিশেষ মূল্য অথবা দার্জ্জিলিংএর মাউণ্ট এভারেষ্ট হোটেলের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য র'য়েছে, সেটা মানুষের হাতে গড়া শাত-ইল্-আরব হোটেলে ছিল না।

এই হোটেলের বিশেষত্ব এই যে, কোন বেয়ারা কোন কথা বলে না। অদৃশ্য শক্তির মন্ত্রবলে এরা চ'লেছে যন্ত্রের মতন। মাত্র প্রধান বেয়ারা কথা বলে। আমরা বেয়ারাকে ডেকে তাইগ্রিসের ওপারে একটা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত ক'রে কাপ্তেন সিংএর সাথে বেড়াতে গেলাম। কাপ্তেন সিং রসিদ আলির বিদ্রোহের সময় প্রথম মালয় থেকে ইরাকে আসেন। সুতরাং বাসরা, বাগ্দাদ ও নিকটবর্ত্তী স্থান তাঁর পরিচিত। তিনি সঙ্গে থাকাতে অন্যান্য ভারতবাসীদিগের নানা সংবাদ জানতে পেলাম। বহু বাঙ্গালী বাসরায় র'য়েছেন, তাঁরা ব্যাঙ্কে, জাহাজে, পোর্ট অফিসে, একাউণ্ট বিভাগে কাজ করেন। যুদ্ধের বহু সামগ্রী বাসরা বাগ্দাদের পথ দিয়ে তেহরাণ, চীন ও মস্কোতে যায়। যুদ্ধের সময় ব'লে কাপ্তেন সিং কোন কথা বল্লেন না, তবে চোখ থাকলে অনেক কিছুই দেখা যায় ও বোঝা যায়।

আমরা প্রায় সাড়ে দশটায় ফিরে এলাম। তখন মাত্র ১ ঘণ্টা রাত হ'য়েছে। পাশে ব্যাণ্ড চলছে। একজন সামরিক কর্ম্মচারীর বিদায় উপলক্ষে নৃত্যের আয়োজন হয়েছে। তারপর ডিনার। ডিনার হলে দেখলাম হোটেলে দলে দলে বাসরার অভিজাত সম্প্রদায়ের নরনারী—সুবেশা, সুবেশিনী ভোজনোদ্দেশে সমাগতা। রাজশেখর বসুর ভাষায় "পরণে বাঁদিপোতার গামছা, ঠোঁটে সিন্দুর," মুখে শুভ্ররেণু মণ্ডিত, ভ্রূ-চিত্রিত; পরিপূর্ণ ইউরোপীয়—সরমের বালাই নেই। পাশে র'য়েছে সুবেশ পুরুষ-সঙ্গী। এখানকার অভিজাত সম্প্রদায়ের পক্ষে শাত্-ইল্ আরব হোটেলের পান 'ভোজন আভিজাত্যের নিদর্শন।

ডিনারের পর হোটেলের আর এক পাশে বায়োস্কোপ হবে। আমি

যাব না, তবে আমার প্রকোষ্ঠ থেকে জানালা খুলে দিলে নৃত্যের অংশ বিশেষ দেখা যায়। ডিনারের পরে এসে ভাগলপুরে একখানা চিঠি লিখ্‌লাম। হোটেলে পোষ্ট অফিস রয়েছে, ভারতবর্ষের পয়সার বদলে কিছু ইরাকীয় টিকিট ও মিশরীয় পয়সা কিনে নিলাম।

আমরা এবার ঘুমোব। বিছানায় শুয়ে আছি। চিঠি লেখা শেষ হয়েছে। পাশের নৃত্যমঞ্চ চঞ্চল চরণাঘাতে রণিত, মাঝে মাঝে বিলাসের অট্টহাসি কানে এসে পৌঁছুচ্ছে; কখন ঘুমিয়ে পড়লাম জানি না—হঠাৎ ঘুমভাঙবার পর দেখি ৪টা বেজেছে; তখনও সঙ্গীতের রেশ চ'লছে। জানলার পাশে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে দেখছি, ত্রয়োদশীর চাঁদ ও মুরমুমী ফুলের লুকোচুরি খেলা। আবার ঘুমিয়ে প'ড়লাম, কারণ ভোর পাঁচটায় উঠ্‌তে হবে। আমাদের বিমানে সাড়ে সাতটায় আমরা বাগ্‌দাদের পথে রওনা হবো। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

ভক্তের কল্পনা সে যে সাধারণ কল্পনা তো নয়।
তাঁর স্বপ্ন সত্য হতে কতক্ষণ লাগে বা সময়?
সকল আকাঙ্ক্ষা আশা তাঁর—
বহে ছাপ পরিপূর্ণতার,
আপনার করি লন তাঁর ইচ্ছা নিজে ইচ্ছাময়।

২

সুন্দর মন্দির শ্রেণী—সুবিশাল ওই দেবালয়,
কি গম্ভীর? কি বিপুল? চারুতায় কি মহিমাময়!
হৃদয়ের অলক্তকে আঁকা
কি প্রার্থনা রহিয়াছে ঢাকা—
শিল্পী তার অনুরাগ রেখে গেছে করিয়া অক্ষয়।

৩

আনন্দের গভীরতা প্রস্তরেতে দিয়ে গেছে ছাপ,
পুণ্যের নির্ম্মল করে গঠিত উহার প্রতি ধাপ।
কাব্য হেথা ভকতির সনে
গড়াগড়ি দিতেছে অঙ্গনে,
নিজেরে বিলায়ে অর্থ—করেছে ধর্ম্মের সঙ্গ লাভ।

৪

কাড়িয়া ভূখণ্ড এক, কে যেন অমৃতলোক হতে,
নিজ পুণ্যে আনিয়াছে ধরণীর এ ধূলার পথে।
গড়া নয়—সদা ভাবি আমি
এ মুরতি আসিয়াছে নামি—
সাধকের তপস্যার করুণার হিরন্ময় রথে।

৫

শিল্পী, কবি, ভক্ত তিনে—এ দেউল গড়েছে নির্জ্জনে,
ভাসি আনন্দাশ্রু নীরে—একসাথে বসি একমনে।
লাবণ্যের এইখানে শেষ,
অপরূপ ধরিয়াছে বেশ,
ধ্যান পেলে মূর্ত্তি হেতা—রূপ আসি লুটালো চরণে।

৬

জয় বৃন্দাবনচন্দ্র, হে মোদের বুকের ঈশ্বর,
এই গুপ্ত পল্লী বুঝি তব প্রিয় গোয়ালার ঘর?
অনাদৃতে এইরূপ করি
অনন্ত গৌরব দাও হরি,
কৃপায় কোথায় এসো—মানব মনের অগোচর।

৭

সত্য দেব, তুমি সরস্বতী, ভূর্জ্জপত্রে কুঙ্কুমের রাগে
অঙ্কিত করিলে যাহা নিবিড় ভকতি অনুরাগে—
তাই সত্য, তাহাই বাস্তব,
অপ্রাকৃত মিথ্যা আর সব,
তোমারি আকাঙ্ক্ষা আজ মূর্ত্তি-ধরে এইখানে জাগে।

৮

এ শুধু দেউল নয়, মনশ্চক্ষে দেখিতেছি ঠিক—
অপূর্ব্ব ইষ্টকে গড়া—তব বীজমন্ত্র—তব ঋক।
সাধন জীবন ব্যাপি তব—
তব প্রেম অগাধ দুর্ল্লভ,
আকার পেয়েছে হেথা—চেয়ে আছি আমি নির্নিমিখ।

৯

চক্ষু আসে আর্দ্র হয়ে, নমস্কার করি নমস্কার,
তুমি যে মিলায়ে আছ অঙ্গে অঙ্গে তব দেবতার।
তুমি মহাকবি, তুমি ধ্যানী,
সার্থক জীবন মম মানি
তোমার চরণ ধূলা শিরে তুলি লই বারম্বার।

১০

তুমি সবাকার বড়—বক্ষে তব রাজে বিশ্বম্ভর,
পড়ে তাঁর স্নান জল নিত্য তব মাথার উপর।
তাঁর পূজা পুষ্প নিজে হায়—
যেন হরি তোমার মাথায়,
তোমার অনন্ত পুণ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য হলো একত্তর।

আর্থিক দুর্গতি ও যুদ্ধোত্তর বেকার-সমস্যা

শ্রীউষাপতি ঘটক

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এতদিনে শেষ হইল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই বিজয়োৎসবে ভারতেরও বিশেষভাবে যোগদানের কথা ; কারণ ভারত ইউরোপে এবং সুদূর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের পূর্ব্বাঞ্চল বিশেষতঃ বাঙ্‌লা ও আসাম এই যুদ্ধে সত্য-সত্যই বিপুল-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ; বাঙ্‌লার অগণ্য নরনারীকে অনশন-ক্লিষ্ট দেহে মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছে, প্রধানতঃ এই যুদ্ধের জন্যই। রণক্ষেত্রে যাহারা বীরত্বের সহিত মৃত্যুর লেলিহান জিহ্বার অনলে ভস্মীভূত হইয়াছে—তাহাদের বীরত্ব অপূরণীয়।

বর্ত্তমান যুগের মহাযুদ্ধে সামরিক ও অসামরিক অধিবাসীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা চলে না। যে-যুগে আকাশ হইতে বোমাবর্ষণ করিয়া অসহায় নরনারী ও শিশু হত্যা করিয়া মৃত্যুর তাণ্ডব লীলা সৃষ্টি করা চলে,—সে যুগে সামরিক ও অসামরিক অধিবাসী বলিয়া কিছু নাই। যুদ্ধে যাহারা নানাভাবে সাহায্য করিয়াছে, তাহারা যাহাতে কর্ম্মহীন বেকার হইয়া না পড়ে তাহার ব্যবস্থা করা যেমন প্রয়োজন—তেমনি এই মহাযুদ্ধের ফলে যাহারা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদের কথাও আমাদের বিবেচনা করা অধিকতর আবশ্যক। এখন, প্রকৃত কাজের সময় উপস্থিত। বাঙ্‌লার দুর্গত অধিবাসীদের জন্য সাহায্যের কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে সরকারের তাহা এখনই প্রকাশ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তর সংগঠনে ভারতের শিল্পোন্নতি কোন পথে চলিবে, তাহা আজ পর্য্যন্ত প্রস্তাব, পরিকল্পনা ও আলোচনাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে বেকার-সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করিবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ? কারণ পৃথিবীতে যেরূপ খাদ্যাভাব, তাহাতে অকস্মাৎ যে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য কমিবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। ভারতে যাহারা বেকার হইয়া পড়িবে তাহাদের ক্রয় শক্তির অপ্রাচুর্য্যতা হেতু খাদ্য দ্রব্যের মূল্য কমিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না,—কারণ পৃথিবীতে খাদ্যাভাব হেতু খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা বাড়িবে। সুতরাং একদিক হইতে চাহিদা কমিলেও—অন্যদিক হইতে চাহিদা বাড়িতে থাকিলে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য কমিবার আশা নাই।

বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের প্রধান সমস্যা হইতেছে,—বেকার সমস্যা। এই সমস্যা-সমাধানের একটা উপায় হইতেছে,—ভারতের শিল্পোন্নয়ন। কিন্তু,—বিদেশ হইতে কলকব্জা আমদানী করিয়া যাঁহারা ভারতের শিল্পোন্নয়নের স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাঁহাদের স্বপ্ন দিবা-স্বপ্নের ন্যায় নিরর্থক হইবে ; কারণ পৃথিবীর অনেক দেশের যন্ত্র শিল্প বিধ্বস্ত। যে সমস্ত দেশের স্বদেশের চাহিদা মিটাইয়া বিদেশে যন্ত্রপাতি রপ্তানি করিবার ক্ষমতা ছিল,—তাহাদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মানি ও গ্রেটব্রিটেন প্রধান। ইহার মধ্যে আমেরিকার অবস্থা ভাল। জার্ম্মানির শিল্প-সমূহ বিধ্বস্ত ; আর যুক্তরাজ্যের ত কথাই নাই। যন্ত্রাদির জন্য এখনও বহুদিন পর্য্যন্ত যুক্তরাজ্যকে যুক্তরাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় আমেরিকার পক্ষে প্রাচ্যের দিকে না চাহিয়া পাশ্চাত্য-জগতের শিল্পোন্নতির কথাই বিবেচনা করা স্বাভাবিক। আবার অনেকে বলিতেছেন,ভারতেই কলকব্জা নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবেন ; তাঁহারাও বিভ্রান্ত; কারণ যুদ্ধের সময়ে ভারত বিশ্ব-বাণিজ্য প্রতিযোগিতার হাত হইতে নির্ম্মুক্ত থাকায় সামরিক শিল্পোন্নতি হয় তো এদেশে দেখা গিয়াছে ; কিন্তু সেইজন্য যে অ্যাংলো-আমেরিকান জাতি ভারতে কলকব্জা উৎপাদনের সুযোগ দিবেন, তাহা সত্য বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।* যুদ্ধে ভারতে যে সামান্য শিল্পোন্নতি দেখা গিয়াছে,—উহা যদি কোন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার দ্বারা রক্ষা করা না হয়,—তাহা হইলে বিশ্ব-বাণিজ্যের প্রবলস্রোতে উহা তৃণখণ্ডের অবস্থাপ্রাপ্ত হইবে। তা ছাড়া, আমেরিকা ও যুক্তরাজ্যের ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য রাজ্যের শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করা তাহাদের বাণিজ্য স্বার্থের পরিপন্থী। হয়তো কোন সুদূর (?) ভবিষ্যতে অ্যাংলো-আমেরিকান জাতি সহযোগিতার ভিত্তিতে ভারতকে কিছু-কিছু যন্ত্র-শিল্পে উৎপাদন-উপযোগী সামগ্রী নির্ম্মাণ করিতে দিতে পারে,—কিন্তু ভারতের কলকব্জা না থাকিলে

* "The highest that these···Anglo-American allies can concede to the backward; colonies and dependencies in the line of industrialisation is the production of consumption goods by modern machinistic methods. But they are opposed to the manufacture of machineries, tools, implements...investment goods by the backward, colonies and dependencies"—The *Equations of world Economy* by Prof. B. K. Sarkar pp. 96.

সে প্রচেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশেও বেকার সমস্যা দেখা দিবে। এই প্রকার সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতবর্ষের জাতীয় আয় বাড়াইবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই প্রকার সমস্যা সমাধানের জন্য ইংলণ্ডে "বিভারিজ পরিকল্পনা "(Beveridge Plan of Social Security) প্রস্তুত হইয়াছে। অবশ্য ধনতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ (Capitalistic Socialism) যে দেশে প্রবল, সে দেশে ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা * হইবেই; কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে যে শ্রমিক সরকার (Labour Government) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—তাঁহারা শ্রমিকগণের জন্য জাতীয় বীমা বা জাতীয় নিরাপত্তা (National Insurance)—বিধানের ব্যবস্থা করিতেছেন। "বিভারিজ পরিকল্পনা" এই প্রকার নিরাপত্তা বিধানের জন্য রচিত হইয়াছিল। ইহাতে সরকারী সাহায্যের সর্বনিম্ন পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ ও সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রায় ৬১ ভাগের কাছা কাছি দেখানো হইয়াছে। ভারতের পক্ষে এইরূপ কোন পরিকল্পনার দায়িত্বভার বহন করা সম্ভবপর কিনা তাহা এখন হইতেই বলা যায় না। তবে বিভারিজ পরিকল্পনা ১৯৪২—১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিবার কথা। প্রায় ২২।২৩ বৎসর স্থায়ী একটা পরিকল্পনার মধ্যে ভারতীয় শ্রমিকগণকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলে তাহা যে সাফল্য মণ্ডিত হইবে না, এইরূপ নিরাশা আমরা পোষণ করি না। তবে ভারতে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পথে অনেকগুলি প্রতিবন্ধক রহিয়াছে:

প্রথমতঃ, এদেশে যাঁহারা জাতীয় শিল্পোন্নতির কথা বিবেচনা করিতেছেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে প্রত্যেক জাতীয় পরিকল্পনা সমাজতন্ত্রবাদের (Socialism) অন্তর্গত,—তাহা ইংলণ্ডের ন্যায় ধনতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ (Capitalistic Socialism) বা রুশিয়ার ন্যায় গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ (Communistic Socialism) হইতেও পারে; কিন্তু ভারতে এখনও সমাজতন্ত্রবাদ প্রসারিত হয় নাই। ভারতের শাসন ব্যবস্থা এখনো প্রাচীন আদর্শে গঠিত।

দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও শিল্প-প্রসারের সম্ভাবনা এদেশে সীমাবদ্ধ; আয়ের পথ নানাদিক হইতে অবরুদ্ধ হইলে ভবিষ্যতের যে কোন পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবে।

তৃতীয়তঃ যে কোন পরিকল্পনা করা যাউক না কেন, তাহার সহিত ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বিশেষভাবে জড়িত। ভারতের স্বাধীনতা সার্থক হইয়া উঠিলে কোন পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হইবেনা।

আমাদের মনে হয়, ভারতের লক্ষ লক্ষ নর-নারীর আর্থিক দুর্গতি লাঘবের জন্য এখন হইতে কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রথমতঃ দ্রব্যমূল্য যাহাতে স্বাভাবিকভাবে নিম্নগতি প্রাপ্ত হয় তাহার জন্য সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Control System) তুলিয়া দেওয়া উচিত। খাদ্য শস্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা (Rationing System) বলবৎ রাখা যদি অপরিহার্য্য হয়, তাহা হইলে ভারতের প্রধান শস্য চাউল, গম প্রভৃতির মূল্য যথাসম্ভব কমাইতে হইবে,—কারণ ইহার সহিত সমস্ত দ্রব্যের মূল্য সংশ্লিষ্ট। যাঁহারা বলিতেছেন যে অন্যান্য দ্রব্যের দাম না কমিলে চাউল প্রভৃতির দাম কমিবে না তাঁহাদের সহিত আমরা একমত নহি।

দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধে যাহারা হাজার হাজার টাকা লাভ করিয়াছে, তাহাদের বর্দ্ধিত আয়ের উপর সর্ব্বাপেক্ষা ক্রমবর্দ্ধমান হারে (Most progressive rate) কর বসাইয়া সাধারণের উপর করভার লাঘব করা প্রয়োজন। কিন্তু যুদ্ধ জনিত আয় যেখানে নূতন নূতন আর্থিক পরিকল্পনায় বা লাভজনক ব্যবসায়ে মূলধনে পরিণত করা হইয়াছে সেখানে ঐ প্রকার আয়কে করভার হইতে যথাসম্ভব রেহাই দেওয়া আবশ্যক, কারণ আয়ের (Income) উপর করভার চাপান যাইতে পারে, কিন্তু মূলধনে পরিণত আয়কে (Capitalised Income) কর হইতে প্রথম অবস্থায় রেহাই দিলে সরকার পরে ঐ সমস্ত শিল্প-ব্যবসায়ের আয় হইতে লাভবান হইবেন।

তৃতীয়তঃ সরকার হইতে ঋণ-গ্রহণের ব্যবস্থা; সর্বসাধারণের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া সাধারণকে আয়ের একটা অংশ জমাইবার জন্য প্ররোচিত করা উচিত; কোন কোন ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। শিল্পোন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, জনস্বাস্থ্য ও জনশিক্ষার উন্নতি বিধান, প্রভৃতি অনেক পরিকল্পনা সরকারের আছে। ভারতীয়গণ অনেক সময়ে ঋণ লইয়া সরকারকে ঐ সমস্ত পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন; আর্থিক অসচ্ছলতার অজুহাতে সরকার ঐ সমস্ত প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়াছেন। এখন এইসব জনহিতকর কার্য্যসাধনে সরকারের অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহাতে অনেক শিল্পী, বিশেষজ্ঞ, কেরাণী এবং শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে। ইহাতে বেকার সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিবার সম্ভাবনা নাই।

চতুর্থতঃ, এই মহাযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যগণ জলে, স্থলে ও আকাশে বিশ্ব-মুক্তির যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন

---

* "The Beveridge Plan in being assailed openly and by tricky insinuation. Diehards are pulling political strings"—*John Bull* (London) of November 2, 1942.

করিয়াছে। ভারত যাহাতে বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিপদাপন্ন না হয় তাহার জন্য ভারতে এক একটা স্থায়ী সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী গঠনের প্রয়োজন আছে। এই সব কার্য্যেও অনেক ভারতবাসীর জীবিকা অর্জ্জনের সুযোগ মিলিতে পারে।

পঞ্চমতঃ, বৃটিশ সরকারের কাছে ভারত সরকারের যে টাকা পাওনা (Sterling Balances), উহা ভারত সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিলে উহা হইতেও সরকার কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য অনেক জন কল্যাণকর কার্য্যে অনেক টাকা নিয়োজিত করিতে পারেন। ইহার মধ্যে বাধ্যতামূলক জনশিক্ষা প্রধান। ইহাতেও বেকার সমস্যার সমাধান হইবে।

ভারতের শিল্পোন্নতির কথা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে কলকব্জা আসিতে অনেক বিলম্ব হইবে। আপাততঃ আমাদের নির্দ্ধারিত পথে চলিলে ভারতের আর্থিক উন্নতি দেখা যাইবে, দ্রব্য-মূল্য কমিতে থাকিবে ও জনসাধারণের আর্থিক দুর্গতির লাঘব হইবে। বেকার সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অনেক সমস্যার জটিলতা কমিয়া যাইবে।

আইনষ্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গীর একদিক্

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বি-এল

ঋষি যখন বলেন অতি মানস স্তরের কথা, কবি যখন গান বিশ্বসত্তার পরশের বিষয়,

'জাগরণে
ধেয়ানে, তন্দ্রায়, বিরাম সমুদ্রতটে
জীবনের পরম সন্ধ্যায়'

তখন এই ইলেকট্রন্ প্রোটন্ আইসোটপ অণুপরমাণুর ঘূর্ণীর রহস্য ভেদ করা প্রচণ্ড বিজ্ঞানের যুগের আবহাওয়ায় গড়ে-ওঠা আমরা শুনি, এ সব হচ্ছে বৈজ্ঞানিক মনোভাব প্রসূত নয়, শুধু ভাববিলাস, কল্পনার আতিশয্য, 'Hypostatised Sensation in the pit of the stomach, যুক্তি বিচার, যান্ত্রিক পরিমাপ, ল্যাবোরেটরি পরীক্ষা বিশ্লেষণগ্রাহ্য নয়।

কথায় বলে বড় বৈজ্ঞানিক শুধু বড় জ্ঞান তপস্বী নন্, বীর সাধক, তাঁরা কবি। কল্পনা করুন সূর্য্য নেই, চন্দ্র নেই, নক্ষত্র নেই, নীহারিকা নেই, সীমাহীন, দিশাহীন শূন্য (যেন আচার্য্য আর্য্যদেব বা ভদন্ত নাগসেনের কথা মনে পড়ে) শুধু ইলেকট্রন প্রোটন্—স্তব্ধ সমাহিত নিষ্কম্প স্বয়ম্প্রকাশ—পজিট্রন্ বা যুগ্ম আলোককণার সন্ধান নেই—বহু লক্ষ বর্ষ পরে যোগনিদ্রা ভাঙ্গলো, চাঞ্চল্যের হয় সুরু, 'Potential wall' যায় চূর্ণ হয়ে 'nuclear bombardment'এ, জমাট্ বাঁধে সৃষ্টির সুর—আসে গতির বেগ, নৃত্যের ছন্দ, নটরাজের তাণ্ডবে বিবশা বিশ্ব চেতনায় জাগে। তার কত শত যুগান্ত পরে জাগে এই সুন্দরী ধরণী, যে একদিন কায়াহীনা মায়াবিনী রূপে আকাশ পথে তূর্য্য বাজিয়ে সূর্য্যের পিছনে ঘুরে বেড়াত অভিসারিকার অন্তরের প্রচণ্ড দাহ নিয়ে। বৈজ্ঞানিক যখন এর ব্যাখ্যা আরম্ভ করলেন তখন একে কি বলব? "দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্য্যতি" দেবতার যা কাব্য, যা মরেও না, যা জীর্ণ হয় না তারই সত্যস্বরূপ বৈজ্ঞানিকরা উদ্ঘাটন্ করেন। আজ তাই মনে হয় পৃথিবীর যাঁরা বড় বৈজ্ঞানিক, যাঁদের চিন্তার ও বীক্ষণের ধারা যুগান্তর আনে প্রকৃতির রহস্যদ্বার উন্মোচনে, তাঁদের ব্যক্তিগত দর্শনবাদ (Personal Phiilosophy) বা দৃষ্টিভঙ্গী আজ কোন দিকে? মনীষী আইনষ্টাইনের কথাই আলোচনা করা যাক। আলবার্ট আইনষ্টাইনের নাম জানেন না এবং তাঁর রিলেটিভিটি মতবাদের নাম শোনেন নি এমন শিক্ষিত মানুষ আজকের পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

আইনষ্টাইন্ বলেন—আমরা পৃথিবীতে আসি কিছুদিনের জন্য—কেন তা জানি না—হয়ত এর ভিতরে একটা গভীর উদ্দেশ্য নিহিত আছে—মাঝে মাঝে তা মনে যে হয় না তা নয় কিন্তু একটা কথা এর মধ্যে বড় হচ্চে—মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সেটা হোক্ মধুময়—অগণিত জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের যে যোগ সেটা হচ্চে নাড়ীর সম্পর্ক। শুধু যে আমরা আমাদের পূর্ব্বগামীদের কাছে পেয়েছি

শত যুগান্ত আগে যে মানুষ যাত্রা করেছে সুরু
সেই যে প্রপিতামহ
জীবনে মরণে পথের শরণে
দুনিয়ার যত পদাতিকদের
একটি প্রণাম লহ

শুধু তাঁদের নয়—সেটা ত Biologyর সত্য—আমার পাশের মানুষ, সঙ্গের মানুষ—প্রতিদিন প্রতিক্ষণে তারা আমাদের কত দিচ্চে—আমরা যত পাচ্চি তত কি দিতে পারছি—এই দেওয়া নেওয়ার ঋণশোধের অন্ত নেই। শোপেনহরের একটি বাণী আছে "A man can surely do what he wills to do, but he cannot determine what he wills" এই মতবাদ আইনষ্টাইনকে [illegible]

তিনি বলেন এই মতবাদের একটা সুফল হচ্ছে যে জীবনে ব্যর্থতা, দুঃখ কষ্টের জন্য দোষ দিতে হয় না অপরকে, উদার অনুভূতি আসে, সব দ্বন্দ্ব দোলা সংশয় আঘাতকে গ্রহণ করা যায় ক্ষমাসুন্দর চক্ষে, এক বিজ্ঞজনোচিত ঔদার্য্যসুলভ কৌতুকের ভঙ্গীতে। ব্যবহারিক প্রাত্যহিক জীবনে নিছক মূঢ়তা হচ্ছে গভীর তন্ময় দৃষ্টিতে কেবলই ভাব জীবনের অর্থ কি? তার রীতি নীতি কি? ধ্যানধারণা কি? কস্তং, কুতঃ আয়াতঃ—কেবলই কি চিন্তা করব রাত্রির কোন অদৃশ্য রহস্যলোক হতে জীবন তরী উত্তীর্ণ হয় প্রভাতের আলোয়, আবার বিলীন হয়ে যায় অন্ধকারের সীমাবিহীনে! কিন্তু তাই বলে জীবনের এ আদর্শ নয় যে খাব দাব কাঁসি বাজাব, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। জীবনের পিছনে থাকবে একটা আদর্শে নিষ্ঠা, যা দেবে কর্ম্মে প্রেরণা, জোগাবে চিন্তার খোরাক, আনবে যাত্রাপথে অমেয় উৎসাহ, বৈচিত্র্য ও আনন্দ।' তাই আইনষ্টাইন্ প্রাচ্যের ঋষিদের পুনরাবৃত্তি করে বললেন তাঁর জীবনের আদর্শ হচ্ছে goodness, beauty and truth শিব, সুন্দর ও সত্য। জীবনটা প্রাচুর্য্য ও বিলাস সুখে ভরিয়ে তুলতে হবে এই মোহ নয়—এ রকম জীবন মেষযূথের পক্ষেই শোভা পায়—আমার প্রচুর টাকা ও জিনিষ হবে, নাম ও খ্যাতি, বাইরের সফলতায় ভর্ত্তি জীবন আইনষ্টাইনের জীবনবেদের কাছে 'এহ বাহ্য' তুচ্ছ ও হেয়। সরল মুক্ত অনাড়ম্বর জীবন দেহও মনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পরিপন্থী ত নয়ই, সহায়ক; কিন্তু তাই বলে মানুষের কাছ থেকে দূরে পালিয়ে নয়।

যত বড় যোগক্ষেম ব্যক্তি হোন—দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখে বিগতস্পৃহ, ভয় ক্রোধে বীতরাগ—মানুষ চায় সবার কাছে একটা স্নেহের পরশ, ভালবাসার ছোঁয়া যা মনকে রাঙিয়ে দেবে, রোসিয়ে দেবে এক অনির্ব্বচনীয় রহস্যঘন মাধুর্য্যের রসে। তাই আইনষ্টাইন্ বলেন যে এক আদর্শে অনুপ্রাণিত, এক চিন্তাধারায় সুপ্রতিষ্ঠিত বন্ধুদের সঙ্গে একযোগে কাজ করার সৌভাগ্য যদি না পেতাম আমার যৌবন হত শূন্য। অথচ বহু মনীষীকে দেখা যায় যে তাঁরা মনে একক অনাত্মীয়, উদাসীন; বহু আত্মীয় স্বজন স্তাবক ভক্ত শিষ্য অনুরাগীর দল রয়েছে, জনসমারোহ, সমাজ কোলাহলের কথাই ছেড়ে দিলাম। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখি সেই আপন-ভোলা বৈরাগীকে, যার একতারাতে ঘর ছাড়া সুর ঝঙ্কার। আইনষ্টাইনের মধ্যেও সেই অনাসক্ত মন, নিরাসক্ত ভোগীর প্রতীক্, দেশকালের অতীত। "I am a horse for single harness"। এক বৃহত্তর পটভূমিকায় এই মনীষীরা, দেশের গণ্ডী, পরিবারের পরিধি, সমাজের সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হন ফলে সঙ্গে সঙ্গে এসে যায় নিজের পরিবেশের উপর একটা ঔদাসীন্য, একটা বহির্বিমুখীনতা "সব দেশে মোর ঠাঁই আছে আমি সেই দেশ লব খুঁজিয়া"। "I have never belonged whole heartedly to a country or state or to my circle of friends or even to my own family" এটা শুধু আইনষ্টাইনের কথা নয়—বহু মনীষীর।

নিজেরা, তারা চায় একজন 'চিন্তা' করুক্ দায়িত্ব নিক্। সমাজ জীবনে শ্রেণী বিভাগ এইজন্য, সেই বিভেদ দাঁড়িয়ে আছে জোরের উপর। অথচ একথাটাও সত্য যে, যা কিছু থাকবে শাশ্বত হয়ে, সেটা হচ্ছে সৃষ্টিশীল মানব সত্তা "The creative and impressionable in dividuality, the personality" যে মানুষ গড়ে, চিরকালের অপরাজেয় অপরিমেয় মানুষ। আজ যা ঘটছে কাল তা ইতিহাসের অতীতে মিলিয়ে যাবে ছেঁড়া পাতায়, অনাগত দিনের লোকেরা ভাববে কি বোকা ছিলাম।

আমাদের জীবনে আমরা যা সব চেয়ে বেশী উপভোগ করি তা আমাদের কাছে রহস্যমাত্র, যা থাকে যবনিকার অন্তরালে। এই বিচিত্রের রহস্যভেদ, তার প্রকাশই হচ্ছে আর্ট ও বিজ্ঞানের প্রধান সূত্র। যে মানুষের মনে এই রহস্যোম্মোচনের কথা জাগেনা—যার মনে এর দোলা লাগেনা—সে মানুষ মৃতেরই সামিল। চক্ষুষ্মান হয়েও সে অন্ধ।

জীবনের রহস্যভেদের জন্য যে সৃষ্টি করা দৃষ্টির দরকার, তারই তাগিদ মানুষকে এগিয়ে দেয় ধর্ম্মবাদের দিকে। জানব, বুঝব, দেখব, সেই জিনিষকে যা অনির্ব্বচনীয়, যা অপরূপ, যা রসস্বরূপ রহস্যঘন, যার মধ্যে সন্ধান পাব অজানার বিচিত্র লীলার, অথচ যা আমাদের বুদ্ধির অতীত হবে না, যার সৌন্দর্য্য মনকে আচ্ছন্ন করবে—এই যে জ্ঞান, এই যে বোধি এই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম্মভাবের দ্যোতক্। এই বোধশক্তিতে বিশ্বাসই হচ্ছে সত্য এবং সেই হিসাবে আইনষ্টাইন একজন সত্যসন্ধানী ধর্ম্মবিশ্বাসী। কিন্তু এ কথা তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন যে আমি কখনও এমন এক ভগবানকে কল্পনা করিনি যিনি স্বর্গের স্বর্ণসিংহাসনে বসে তাঁর সৃষ্ট জীবকে ডেকে হাইকোর্টের মত বিচার করতে বসবেন। মানুষ এইরূপ কল্পনা করে ভয়ে ও অজ্ঞানে। এও বিশ্বাস করা সম্ভব নয় যে আমার এই দেহের বিনাশের সঙ্গে আমার বিশিষ্ট সত্তার বিনাশ হবেনা। আমি শুধু এইটুকু ধারণা করতে পারি যে যুগযুগান্তর ধরে সৃষ্টির মধ্যে একটা প্রাণবান ধারা বহমান্ হয়েছে। এই যে বিরাট বিপুল বিশ্বে আমরা চোখ মেলেছি তার কতটুকু আমরা জানি এবং কতটুকু বুঝি—কি অপূর্ব্ব এই বিশ্ব রচনা। প্রকৃতির বিচিত্র লীলার অব্যক্ত রহস্য একটুও যদি ব্যক্ত করতে পারি তবেই সার্থকতা।

বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা
বহু দিবসের সুখে দুঃখে আঁকা
লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল।

এতদিন আমাদের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিল যে দেশ কাল এবং বস্তু পৃথক পৃথক সত্তা এবং দেশ ও কাল বস্তুর আধার। বিজ্ঞানের দৃষ্টি সূত্র ছিল কার্য্য কারণ সম্বন্ধ (causality) ও প্রকৃতির নিয়মানুগত্য (uniformity of nature)। তাঁরা আরও ধরেছিলেন যে ইথারই শক্তির আধার ও বাহন। কণাদের মত ড্যাল্টন্ বল্লেন যে জড়কণা (atom)ই হচ্ছে বিশ্বের গোড়ার জিনিষ। উনবিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকরা মনে করিতেন যে এই হচ্ছে বিজ্ঞানের শেষ কথা।

আইনষ্টাইন্ ও আপেক্ষিকতাবাদের দ্বারা প্রমাণিত হলো যে দেশ

কাল ও বস্তুর কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই, দেশ এবং কাল আধারও নহে, আধেয়ও নহে, Time and space are not containers nor are they contents—they are variants—তাহারা বস্তুর অবধারণ মাত্র, কারণ বস্তুর "primary qualities" মৌলিক গুণ কিছুই নেই তার গতি (motion) ব্যাপ্তি (Extension) বা জড়মান (mass) সবই আপেক্ষিক সমকালিক্ (simultaneous) নয়। ইউক্লিডিয়ান্ জ্যামিতির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের পরেও দেখা দিল চতুর্থ Dimension —যার গতি ডিম্বাকৃতি নয় spiral (পাকানো)। তার পর আসিল জড়ের জড়ত্ব নাশ, অনিশ্চয়তা (Indeterminacy), ম্যাক্সপ্লাঙ্কের কোয়াণ্টাম্ "তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং" সবই তেজ পদার্থমাত্রেই ঋণাত্মক ও ধনাত্মক্ বিদ্যুৎকণার সমষ্টি—অতি পরমাণুর ঘূর্ণী ও লাফ। হাইড্রোজেন সম্বন্ধে নীলস্ বোহরের গবেষণা দেখাইল কেন্দ্রে প্রোটন্ চারিদিকে হালকা ইলেকট্রণের ঝড়। ঝড় উঠিল বৈজ্ঞানিক্ মহলে। অপরদিকে Applied Biologyর দিক থেকে বৈজ্ঞানিক্ ষ্টানলি আনলেন virusকে জড় ও জীবনের মাঝখানে। ওদিকে Heiseenberg Schurodinger বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকার করলেন না, তারা দেখলেন শুধু সম্ভাবনার তরঙ্গ-মালা (waves of probabilily) আধারবিহীন বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সমষ্টি, দেশ কাল সমবায়ে ঘটনাপুঞ্জ, যাহাদের গুণ নির্দ্দেশ করা যায় গাণিতিক সঙ্কেতের দ্বারা (a system of spatio temporal entities whose qualities are exclusively mathematical)। দার্শনিকরাও বসে নেই, তারাও (আঁরি বের্গস, লয়েড মর্গ্যান্, হোয়াইহেড প্রভৃতি) বলতে আরম্ভ করলেন বস্তু জড় নয়, চঞ্চল ; তাহাদের ভিতর প্রবল আলোড়ন চলিতেছে বিরোধের, দ্বন্দ্বের (Dialectic) নব নব রূপের বিকাশ হচ্চে চঞ্চলা নদীর মত, তাই পলকে পলকে মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে' কাল প্রবহমান্, ক্রমসঙ্কয়ী, ক্রমবর্দ্ধমান—গতিশীল সৃষ্টিশীল জগত (Emergent Evolution)।

আজ তাই দেখা দিয়েছে বৈজ্ঞানিক্ ও চিন্তাশীলদের মনোরাজ্যে এক প্রবল আন্দোলন, সৃষ্টির মূল রহস্য কি ? গতি কোন দিকে ? অনেকে অভিযোগ করেন যে জীনস্ এডিংটন্ প্রমুখ অধ্যাত্মবাদী বৈজ্ঞানিকরা বিজ্ঞানকে নিয়ে চলেছেন কল্পনারাজ্যের আশ্রয়ে—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মের বদলে সর্ব্বং খল্বিদং mathematical symbol এর মধ্যে তারা বাস্তবকে এড়িয়ে যাচ্চেন। এ অভিযোগ হয়ত সত্য নয়—কারণ রহস্যভেদের মূল কোথায় কেউ জানেনা, বাক্য ও চিন্তা নিবৃত্ত হয়ে ফিরে আসে। অনধ্যাত্মবাদী হ্যালেডেনই বলেন যে, প্রকৃতির পিছনে কিছু নেই এটা ধ্রুব সত্য, কিন্তু আমাদের যা জ্ঞান তাতে করে প্রকৃতির পূর্ণ স্বরূপকে জানা যায় না—তার স্বরূপ আমাদের জ্ঞানের গণ্ডীর চেয়ে ঢের বেশী। চিরকালের মানুষ রহস্যসন্ধানী—সে চায় উন্মোচন করতে, সত্যের মুখ আচ্ছন্ন অপাবৃণু 'হচ্চে তার মন্ত্র। এই সম্পর্কে আইনষ্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গীই সত্য বলে মনে হয় তিনি বলছেন যে এই রহস্য উন্মোচনই আমাদের ব্রত, কিন্তু সেটা কিছু কল্পনাশ্রয়ী অতীন্দ্রিয় কিছু নয়।

"We try to find our way through the maze of observed facts, to order and understand the world of our sense impressions. We want the observed facts to follow logically from our concept of reality. Without the belief that it is possible to grasp the reality with our theoretical constructions, without the belief in the inner harmony of our world, there could be no science. This belief is and always will remain the fundamental motive for all scientific creation. Throughout all our efforts, in every dramatic struggle between old and new views, we recognise the eternal longing for understanding, the ever fine belief in the harmony of our world, continually strengthened by the increasing obstacles to comprehension."

শরণাগতি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

(সত্যঘটনা অবলম্বনে)

'—সে সন্ন্যাসী গুরুদেব সমর্পিল এ আশ্রম,—সেইজন কোথা কেবা জানে।
দিন-ধেনু চলিয়াছে অনন্তকালের গোষ্ঠে, ব্যথা পাই মোর ভগ্ন প্রাণে।
শূন্য জীবনের তীরে ছায়া দোলে নিরাশার, নেমে আসে সন্ধ্যা বুঝি মোর—
আমার আরাধ্য দেবী ! তুমিও দিলে না দেখা—কহে ভক্ত স্বরে আঁখিলোর।
পার্শ্বে তার সহচর, সম্মুখে বিগ্রহ শোভে, শীর্ষে উষা-সৌন্দর্য্য উদার,
শ্যামল কুটীর-প্রান্তে পুষ্পগন্ধে সমীরণ বহিতেছে শান্তি বহ্‌ধার।
পড়ে মনে দুঃখ দৈন্য অতৃপ্তির স্মৃতি যত,—যৌবনের উৎকণ্ঠিত আশা,
পড়ে মনে পিতৃহারা মাতৃহারা জীবনের প্রভাতের আশ্রয়-পিপাসা
স্বজনের দ্বারে দ্বারে। অত্যাচার নিষ্পেষণ পদে পদে নিয়ত লভিয়া
পথে পথে কেঁদে কেঁদে বাউলের করুণায় নামমন্ত্র প্রত্যহ জপিয়া
কবে কোন্ দিনে এলো জন্মভূমি বঙ্গভূমি ত্যজি, রহে তাহা বিস্মরণে,
দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে বাল্যজীবনের শেষে যৌবনের জন্মান্তর সনে

ভ্রমিয়াছে। বৃন্দাবনে তবু দেখা মিলিল না, জপে জপে মালা যায় ঘুরে,
সংসারের ঘাটে ঘাটে চলেছে জোয়ার ভাঁটা সুদূরের বাঁশরীর সুরে।'
'—ক'র শিশু বিগ্রহের নিত্য সেবা—' বৈরাগীর অশ্রু ঝরে কহিতে কহিতে,
কাঁপে মোর ব্যাকুলতা, পারি না সহিতে ব্যথা, লক্ষ্য মোর বিপুল মহীতে
অলক্ষ্যে হারায়ে যায়, লহ মোর মৃদঙ্গেরে, ভক্তিভরে নিশীথে প্রভাতে
মনপ্রাণ সঙ্কীর্ত্তনে সঁপিও সবার সাথে,—বিগ্রহের শুভ দৃষ্টিপাতে
সুন্দরের অভিসার হবে চিত্ত যমুনায়—' শিষ্য তারে করিল প্রণাম,
আলিঙ্গন দিয়া কহে—'চলিলাম—শিষ্য মোর ত্যজিও না বৃন্দাবন ধাম।'

শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে ধ্বনিতেছে নাম জপ, আঁখি হতে ঝরে অশ্রুজল,
পরণে কৌপীন বাস, কণ্ঠে দোলে জপমালা; নাহি কিছু পথের সম্বল।
দূরে রাখি শ্রীধামের জনতামুখর রাজপথ, তরুবীথি পুষ্পবন
গোপপল্লী পার হয়ে চলিয়াছে ক্লান্তিহীন রাত্রিদিন উদ্দীপিত মন।
শিহরে বৈরাগী সদা, আপনার মনে কহে—'এই ধ্বনি জীবনে শুনি নি—
রসের মূরতি যেন নয়নে মিলায়ে যায়, যেন কার বাজিছে কিঙ্কিনী!'

গহন অরণ্যপথে প্রবেশিল সে বৈরাগী সংসারের মায়া রাজ্য হ'তে
তখন জাগিছে উষা পূর্ব্ববনান্তরে। কহিল সে ভাবাবেগে—'কোনমতে
ত্যজিব না এ অরণ্য, শার্দ্দুল উদরে যদি যেতে হয় তাও যাবো আমি,
পাবো নাকি দরশন সাধিয়া দুঃসাধ্যব্রত কহ মোরে ওগো অন্তর্যামী!'
অর্দ্ধভগ্ন অট্টালিকা বনাকীর্ণ স্তূপমাঝে জলাশয় বিরাজে সম্মুখে,
অতীতের স্মৃতিভরা যুগান্তের পদাবলী ছন্দে গাঁথা তরুবীথি বুকে।
পাতিল আসন সেথা, বটশাখা নুয়ে পড়ে জীর্ণ কক্ষ বাতায়ন 'পরে
চারিভিতে পক্ষীনীড়, দিনের আলোক ছটা কোনমতে ক্ষীণ হয়ে ঝরে।

অনিদ্রায় অনাহারে নাম জপে মগ্ন রহে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী বিরলে
কখন বহিছে অশ্রু, কখন বেপথু অঙ্গ, ভাবনেত্রে চিত্ত শতদলে।
হেরিছে উন্মত্ত ভৃঙ্গ; পলে পলে তনু ক্ষীণ, তবু নহে অলস হৃদয়,
উপচ্ছায়া সম আসে নব নব মূর্ত্তি কত, প্রাণে তার নাহি কোন ভয়।
দিনে দিনে দিল দেখা গ্রহণী উদরাময়, মালা জপ করে অহরহ,
অশ্রান্ত আবেগ লভি তন্দ্রা ক্লান্তি করি দূর সহিতেছে বেদনা দুঃসহ।

দীর্ঘদিন উদাসীন অরণ্যের মাঝে বসি বিকশিয়া তোলে আরাধনা,
আকুল হৃদয়খানি ছড়াইয়া দিল তার নাহি যায় প্রাণের যাতনা।
আপনার মনে কহে সে বৈরাগী—'এমনি হেলায় মোরে করিলে বঞ্চিত!
কই তুমি! এলে না তো! তোমার পরশ রাগে চিত্ত মম হোলো
না রঞ্জিত—'

একদা গোধূলিক্ষণে রাখাল বালক দুটি ছুটিতেছে উলসিয়া বন
ধেনু লয়ে তাহারি সম্মুখ দিয়া। বিস্মিত বৈরাগী—শিহরিল তনুমন;
ফিরে আসি জ্যেষ্ঠ জন দাঁড়াইল কক্ষে তার। স্নেহস্বরে কহিল—সন্ন্যাসী!
হেথায় রয়েছ কেন!—' দূর হতে শোনা যায়—'দাদা আয়'—
বাজে মেঠো বাঁশী।
কিবা অভিপ্রায় তব, এ কাননে রহিয়াছ—একি! বিষ্ঠামাখা কেন দেহ!'
কহিল বৈরাগী শেষে—'গভীর কাননে কেন হে কিশোর!
সঙ্গে নাহি কেহ?'

উত্তর না দিয়া কিছু, বিষ্ঠামাখা কৌপীনের প্রান্ত ধরি গেল জলাশয়ে,
ধৌত করি চীরবাস দিল তারে, কহিল সে—'কিবা হবে দুঃখ ব্যথা সয়ে!
নিবিড় কানন হ'তে চলে যাও'—বৈরাগীর কণ্ঠ হতে ধ্বনিল—'যাবো না—
কে তুই কিশোর এসে কলহ করিস্ মিছে, কেন তোর এতই ভাবনা.
আমি তো যাবো না, তুই চলে যারে, সন্ধ্যা নামে'—
সে কিশোর কহিল না কথা,
হোলো অন্তর্হিত। পরদিন তেমনি সময়ে আসি, করে ধরি পুষ্পলতা
কহিল কিশোর রোষে—'এখনো গেলে না তুমি? এই লহ, কর দুগ্ধ পান;
তুমি যদি নাহি যাও, মোরা যে খেলিতে এসে পাই ব্যথা, কেঁদে ওঠে প্রাণ
তোমারি লাগিয়া।' স্বর্গসুধা দুগ্ধ পিয়ে এলো ফিরে হৃতপ্রাণ বৈরাগীর
'—কি উদ্দেশ্যে আছ হেথা? ওরে ক্ষেপা, যাও চলে, যেথা রাজে
দেবতা মন্দির—'

পরদিন তেমনি সময়ে দুগ্ধ লয়ে আসি কহে—'যাও নাই হে বৈরাগী!'
'—আমি তো যাবো না কহিয়াছি বারে বারে'—কহিল কিশোর এসে—
'কার লাগি
বসে আছ এই বনে!' নিরুত্তর সে বৈরাগী, কিশোরের পাশে এল ছুটে
দূরের কিশোর। অগোচরে ডাকে—'দাদা, এসো দাদা,—
চারিভিতে আলো ফুটে।
নিস্তব্ধ নির্ব্বাক হয়ে ভাবিল বৈরাগী—'এরা কেন আসে? দুইটি বালক
কণ্টকিত বনপথে করে খেলা ধেনু লয়ে, শিরে কেন শিখীর পালক
কনিষ্ঠ জনের? ভালো করে পারিনাক হেরিবারে শ্যাম অঙ্গ—অন্তরাল
হ'তে ওযে কহে কথা—কারা এরা?'—অন্ধকারে গুমরিছে চিত্ত চক্রবাল।

পরদিন আসি কহে' সে কিশোর—'তবুও রহিলে তুমি নিষ্ঠুর নির্দ্দয়,
মোদের খেলার বিঘ্ন কর কেন?—' কহিল বৈরাগী—
-দাও মোরে পরিচয়—'
'—গোপ বালকের রূপ এত মনোরম! নহে, নহে—যেন প্রাণের তুলিতে
জীবন-আলেখ্য আঁকা।' কহিল কিশোর তারে—'যার নাম জপের ঝুলিতে
অবিরাম চলিয়াছে, যার তরে কাঁদে প্রাণ পাবে তারে যাও নীলাচলে—'
'—শুধাই তোমারে আমি কহ তুমি কোন্ জন?
পাশে এসে কেবা কথা বলে?—'
বৈরাগীর প্রশ্ন শুনি অদৃশ্য সে দুটী প্রাণী শ্যাম ঘন ছায়াচ্ছন্ন ঘরে
কাঁদে সেই সাধুজন, কাছে পেয়ে হারাইনু—' বেদনায় মৌন অশ্রু ঝরে।
বিহ্বলা রজনী এলো মর্ম্মরিল বনভূমি রোমাঞ্চিত পল্লবমালিকা,
জ্যোছনা-তরঙ্গে সাধু গাহন করিয়া ধ্যানে সাজাইল ভক্তি-দীপালিকা।

কিছুই চিরস্থায়ী নয়

শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুপ্ত

যুদ্ধের বাজার। মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যক্ষ অবদান—নতুন ইমারতে নতুন অফিস—ইউনাইটেড ট্রেডিং কোম্পানী।

নতুনের একটা সম্মোহন শক্তি থাকে—যা দুর্নিবার; তার আকর্ষণী জালে বদ্ধ হয়ে একদিন বিনয় এলো এ অফিসে আরো পাঁচজনের মত।

বড়বাবু কালীকিঙ্কর রায় সার্থকনামা পুরুষ—যেমন মোটা তেমি কালো, অন্য কিছু বললেও অত্যুক্তি হয় না। ছোট ছোট পিটপিটে দুটি চোখে বিনয়কে লক্ষ্য করলেন বেশ কিছুক্ষণ। বয়স তো কাঁচা, বিয়ে করেছো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বিনয়ের সলজ্জ উত্তর।

—বৌ তো তবে কচি খুকী, কি বললে লক্ষ্মীয়ে না, ছেড়ে থাকতে পারবে দিল্লীতে।

অন্ততঃ দিন কতক তো হবেই—বাড়ী যদ্দিন না পাওয়া যায়।

ঠোঁটে হাসির রেখা টেনে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে বড়বাবু বলেন, হ্যাঁ, আমাকেও হয়েছে। ওখানে কত পাচ্ছ—পঁচাত্তর? পারমানেণ্ট?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

ভ্রু কুঁচকিয়ে বলে চলেন তিনি, পারমানেণ্ট—বুঝলে কিনা পৃথিবীতে পারমানেণ্ট—মানে চিরস্থায়ী কিছুই নয়। যুদ্ধের বাজার—এই তো সময়। যতখানি গুছিয়ে নেওয়া যায়। আর এখানেও প্রসপেক্ট কম নয়। ডি এ সমেত এখনই একশ' দেবে এরা। কি বল?

বলবার কিছুই ছিল না। প্রাক্‌যুদ্ধ যুগে বিনয়ের মত কেরাণী, একসঙ্গে একশ' টাকা কল্পনাই করে নি—চোখে দেখা তো দূরের কথা।

অতএব পঁচাত্তরের পশ্চাৎ ধাপ ছেড়ে অগ্রবর্তী একশ র ধাপে পা দিল বিনয়। এর পর একটানা কেরাণীর কলম চললো এগিয়ে গতানুগতিকতার বাঁধা পথে—না তাতে বৈচিত্র্য, না কোন বৈশিষ্ট্য—যার ইতিহাস রাখা যায়।

এর মধ্যে মাধুরীর চিঠি বিনয়কে যেটুকু মাধুর্য এনে দেয়। নতুন পদলাভে আনন্দ প্রকাশ ও কুশল প্রশ্নাদির পর তার অবর্তমানে যে সব ছোটখাটো অসুবিধার উৎপত্তি হয়েছে খুঁটিনাটি সব উল্লেখ করে মাধুরী লিখেছে—একটা বাড়ী দেখ অল্প ভাড়ায়। যেমন করে পারো শীঘ্র নিয়ে যাও।

কথাটা বিনয় যে না ভাবছিল এমন নয়; মাধুরীর চিঠি আরো বেশী করে ভাবিয়ে তুললো তাকে—কিন্তু দিল্লীতে বাড়ী জোগাড় যে কি দুঃসহ ব্যাপার তা কি মাধুরী জানে! অনেক রাত অবধি বসে বসে ভেবেচিন্তে সে গুছিয়ে লিখলো—বাড়ীর অভাব, না দেখলে বুঝবে না, মাধু। মাথা গোঁজবার এতটুকু জায়গা এখানে পাওয়া শক্ত। কিন্তু আমার চেষ্টা সমানে চলবে। তোমার কষ্ট হচ্ছে বুঝচি, তবে সে কষ্ট চিরস্থায়ী থাকবে না স্থির নিশ্চয় জেনো।

আশ্বাস আশাতীত কাজ করলো। মাধুরীর চিঠির সুর গেল বদলে। সত্যিই তো সব দিন কি মানুষের সমান যায়!

কিন্তু স্বপ্ন আর বাস্তব—দুয়ের সমন্বয় বুঝি অলৌকিক।

বিনয় কাজের মাঝে ডুবেছিল। তার সেক্সনের দু' দুজন অনুপস্থিত সেদিন। নিশ্বাস ফেলার ফুরসৎ পর্যন্ত ছিল না। পিওন এসে বাড়িয়ে দিল একখানি তার।

তার—অর্থাৎ দুঃসংবাদের বাহক।

Wife Seriously ill. Come Sharp.

বড়বাবুর টেবিলে তারখানি রেখে বিনয় মিনতির সুরে বলে—অন্ততঃ চার দিনের ছুটি দিন। বাড়ীতে দেখাশুনো তদ্বির করবার কেউ নেই।

বড়বাবু হঠাৎ গম্ভীর মূর্তি ধারণ করলেন, বললেন—এই তো ক'দিনের কাজ। এদিকে আবার দু'জন নেই; এ অবস্থায় ছুটি দিই কেমন করে।

—কিন্তু না গেলে চলবে না, স্যার।

—মিছে ভাবো, বিনয়। কালীবাবু তাঁর বাঁধাগৎ মত বলে চলেন—একটু অসুখ বৈ তো নয়, সেরে যাবে—চিরস্থায়ী থাকবে কি। আচ্ছা, সাহেবকে বলে দেখি।

সাহেবকে বলে দেখি—এর অর্থ শুধু কেরাণীর অজানা নয়—চোখে ধূলো দেবার এমন পাকাপথ আর দুটি নেই। বিনয়ের ক্ষেত্রেও তা মিথ্যা হল না। অবসরহীন কেরাণীর কলম অবাধে চললো এগিয়ে। কিছু টাকা ধার করে টেলিগ্রাফিক মণিঅর্ডারে পাঠিয়ে দিয়ে বিনয় উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে পরবর্তী চিঠির প্রতীক্ষায় রইলো বসে।

এবারও এল চিঠি নয়—তার; তার—অর্থাৎ দুঃসংবাদের বাহক। Wife expired last evening.

বড়বাবু কালীকিঙ্কর রায় তাঁর সীট থেকেই জিজ্ঞাসা করেন, বৌ কেমন হে বিনয় ?

—মারা গেছে।

মারা গেছে—সীট ছেড়ে উঠে এলেন বড়বাবু। বিনয় টেলিগ্রামখানি কেবল এগিয়ে দিল। বড়বাবু পড়লেন। মুখে একটা দুঃখসূচক শব্দ করে প্রবোধ দিলেন—কিছুই চিরস্থায়ী নয়, বিনয়। মানুষ না বুঝে দুঃখ করে মরে পৃথিবীতে।

এর পর কালের চাকায় বছর গেল ঘুরে। বিনয়ের একশ টাকা বেতনের কেরাণীর জীবনে কিছুই পরিবর্তন আসে নি; যা কিছু পরিবর্তন এসেছিল তার দেহে এবং মনে—অবসাদ আর অকালবার্ধক্য।

কেরাণীর ভোঁতা কলম একটানা এগিয়ে চলে। গতানুগতিক। অনবসর কাজের মাঝে মনকে সব সময় ডুবিয়ে রাখতে চায় বিনয়, হারানোর বেদনা অভাবকে ভুলবার জন্যে। কাজ না পেলে অ-কাজ খুঁজে বার করে; একবারের করা কাজ দশবার করে করে; এতটুকু বিশ্রামও তার অসহ্য মনে হয়।

এম্নি কর্মমুখর একটি দিন। বড়বাবু বিশেষ ব্যস্ততার সঙ্গে বিনয়ের সম্মুখীন হন—মুখে উৎকণ্ঠা উদ্বেগের জমাট কালো মেঘ। কতকগুলি চিঠিপত্র রাখতে রাখতে বলেন, রইলো। দেরী হলে শেষে ট্রেণ ধরা যাবে না। ফোর্টিন ডাউনটা চারটের সময় না ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কোথায় যাবেন ?

—বাড়ী।

—হঠাৎ! কবে ফিরবেন ?

—হ্যাঁ, হঠাৎ। ভগবান যেদিন ফেরান। কিছুই স্থির নেই। পনেরো দিন—একমাসও হতে পারে। বলতে বলতে অদৃশ্য। বিনয় হতভম্ব।

প্রকৃত পক্ষে পনের দিনও না, একমাসও না; সপ্তাহ অন্তে বড়বাবু ফিরলেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বিনয়ের কিছু বলবার ভরসা হল না। বিষাদ আর অবসাদের নিবিড় ছায়া দুর্যোগ আর দুঃসংবাদের বার্তাই বহন করছিল।

ক্লান্ত ভগ্নস্বরে বড়বাবু নিজেই বল্লেন—ফিরে এলুম, বিনয়। যে জন্যে গেলাম তা হল কৈ। বৌকে বাঁচাতে পারলুম না।

—সেকি, কি হয়েছিল ?

—বোঝা গেল না। এ ক'দিন শুধু ডাক্তার আর ঘর করলুম, আর জলের মত পয়সা ঢাললুম। কি হল—কিছুই নয়। সান্ত্বনা এই যে চেষ্টা করতে পেরেছি শেষ সময় পর্যন্ত সামে থেকে।

কতক কথা কাণে গেল, কতক গেল না। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে টলতে টলতে নিজের টেবিলে কাজে ফিরে এলো; কিন্তু যে এতদিন কাজের মধ্যে অকাতরে ডুব দিয়েছিল, শত চেষ্টা করেও সে আজ কাজে তেমন করে ডুবতে পারলো কৈ! সারা মনকে আচ্ছন্ন করে তার অতীতের স্মৃতি জেগে উঠলো—বিষাক্ত বৃশ্চিক দংশনের সুতীব্র জ্বালা।

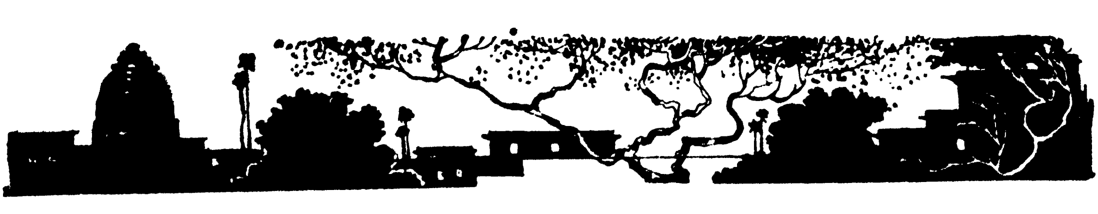
কতক্ষণ এইভাবে কেটে গেল, খেয়ালও ছিল না; হঠাৎ তার খেয়াল হল ভুল হয়ে গেছে, মস্ত বড় ভুল—হিমালয়ের পরিধির মত বিরাট ভুল। বড়বাবুকে একটা কথা তো বলা হয়নি! শশব্যস্তে উঠে পড়লো বিনয়—বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট যেন; পাগলের মত গিয়ে উপস্থিত হল বড়বাবুর টেবিলের সামে। কিন্তু দুরাশা! চেয়ার শূন্য বড়বাবু চলে গেছেন।

বজ্রাহত বসে পড়লো বিনয়। বুকের মধ্যে, মাথার মধ্যে, দেহের শিরায় শিরায় বিষের জ্বালা। নিজের ওপরেই আক্রোশ হয়ে ওঠে, কেন—কেন সে শোনাতে পারলো না বড়বাবুকে মুখ ফুটে শুধু একটীবার নিয়তির মত সত্যকঠোর, ভ্রূকুটীর মত ক্রূর কুটীল সেই জ্বালামুখী কথা ক'টি—কিছুই চিরস্থায়ী নয় পৃথিবীতে!

পট পরিবর্তনের পালা এলো। কয়েক মাসও পেরুলো না—অনেকের আশার মুখে ছাই ঢেলে হঠাৎ অভাবনীয় ভাবে যুদ্ধ গেল থেমে।

কুবেরের পূজারী দল কেউ প্রস্তুত ছিল না এর জন্য। বর্ষার জলে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা ব্যবসা গুলোয় এলো বিপর্যয় আর বিশৃঙ্খলা। ইউনাইটেড ট্রেডিং কোম্পানীর দরজাও এম্নি বিশৃঙ্খলার মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল একদিন—নতুন ইমারতের সেই নতুন অফিস।

বিনয়ের কিন্তু দুঃখ নেই—কিছুই চিরস্থায়ী নয় পৃথিবীতে।



রসায়নী বিদ্যা ও সামগ্রিক স্বাধীনতা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

সভ্যতার ইতিহাসের কোন প্রভাতে শিল্পের বিকাশ হইয়াছিল তাহা কেহ লিপিবদ্ধ করিয়া না রাখিলেও চরম সত্য এই যে, শিল্পই বিজ্ঞানের জননী ও ধাত্রী। মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সুপ্রণালী-বদ্ধ বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্কের পরিচয় পাওয়া না গেলেও শিল্পী-মনের যথেষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান দেখা যায়। আদিম মানবের মানসিক ক্ষুধার বিবর্ত্তনেই শিল্পের জন্ম ; শিল্পী মানুষের সাংস্কৃতিক চিন্তাই বিজ্ঞান।

ইতিহাস আরও শিক্ষা দেয়—মানব সভ্যতার সূতিকাগার প্রাচ্য দেশ। কাজেই প্রাচীন শিল্পের বিকাশ ভারতবর্ষ, ইরাণ, চীন ও মিশর দেশেই সম্ভব হয়। য়ুরোপে সভ্যতা প্রবেশ করে অনেকটা ঐতিহাসিক যুগে গ্রীসীয় ও রোমক রাজত্বের প্রারম্ভে, সম্ভবতঃ শিল্প ও বিজ্ঞানের অভিযানও প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্যে এই সময় হইতেই আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষের বেদ, ষড়দর্শন ও ভাগবতে শিল্পের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পুরাকালে ভারতীয় সকল বিদ্যাকেই কলা বলা হইত। দর্শন, বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, রসশাস্ত্র, ধাতুর্বিদ্যা, রঞ্জনবিদ্যা এবং সঙ্গীত প্রভৃতি এক একটী কলা ; এই রকম চৌষট্টি কলাতে বিদ্যার পরিধি স্থির হইত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে রসায়নী বিদ্যাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। অন্যান্য কলাবিদ্যার মতন রসশাস্ত্র ও ধাতুবিদ্যার প্রথম সূচনা পাওয়া যায় যজুর্ব্বেদে ; পরিস্ফুটিত ভাবে পাওয়া যায় অথর্ব্ববেদে, উত্তরকালে পরিণতি লাভ করে বৌদ্ধ-ভারতে চরক ও সুশ্রুতে। ইহার পরে বহুযুগ ধরিয়া বহু ঋষির সাধনায় উত্তরোত্তর এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে। কণাদ, নাগার্জ্জুন, চক্রপাণি, পাতঞ্জলি ও বৃন্দের সাধনায় ভারতীয় রসায়নের চরম উন্নতি সাধিত হয়। চরক, সুশ্রুত, রসেন্দ্রসার সংগ্রহ, রসরত্নসমুচ্চয় ও রসার্ণবে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ লিখিত কিম্বা উল্লিখিত আছে। চরক রসায়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, যাহা মানুষের সুস্থতা, মেধাবৃদ্ধি, শক্তি ও পৌরুষত্ব বৃদ্ধি করে তাহাই রসায়ন। সুশ্রুত চরককে অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন আয়ুস্কর পারদেই ইহা সম্ভব। বৃন্দ পারদকেই রসায়ন বলিয়াছেন। বস্তুতঃ অতি প্রাচীনকাল হইতেই আর্য্যঋষিগণ পারদের ব্যবহার অবগত ছিলেন। আসল চরক ও সুশ্রুতের পুস্তক লোপ পাইয়াছে। আমরা যে চরক ও সুশ্রুতের সহিত পরিচিত তাহা নাগার্জ্জুন নামক মহা-বৈজ্ঞানিকের সম্পাদিত টীকা মাত্র। ইহাতে পারদ ব্যতীত বহু রোগ ও রোগীর নিদানের ব্যবস্থা আছে। রসায়ন বলিতে আজকাল যাহা বুঝায় তাহার সূত্রপাত ইহাতে আছে ; পরন্তু উক্ত গ্রন্থদ্বয় পাঠে তৎকালীন ভারতের আচার ব্যবহার ও সভ্যতার মান বুঝিতে পারা যায়। এই সময়ের মধ্যে বহু বহু ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার বিচার ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতি স্থির হইয়াছে ; কলাশালা ও রসশালায় কতকটা আধুনিক পদ্ধতিতে কাজ হইতেছে। লোমনাশক সাবান, চুলের কলপ, অঞ্জন তৈয়ারীর বিধি, নানারকম বিষ ও তাহার ক্রিয়া, স্বর্ণঘটিত রসায়ন, মকরধ্বজ ও পঞ্চলবণ তৈয়ারীর বিধি ব্যতীত মৃদুক্ষার ও তীক্ষ্ণক্ষার তৈয়ারী বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি, সুশ্রুতে চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, মৃতদেহ পরীক্ষা, অম্লরস (acid) তৈয়ারীর বিধি লিপিবদ্ধ আছে। এখানে যে acid এসিড্ তৈয়ারীর বিধি লিখিত আছে তাহা Aqua Regia type, নাম দেওয়া আছে রসী। গন্ধক, লবণ, নিশাদল, সোহাগা এবং ক্ষার চুয়াইলে রসী তৈয়ারী হয়। ভাগবতে গন্ধক দ্রাবক (Sulphuric Acid) তৈয়ারী উল্লিখিত আছে। রসার্ণবে ফিটকারী চোয়াইয়া গন্ধক দ্রাবক তৈয়ারী করার পদ্ধতি দেওয়া আছে। উত্তরকালে তামিল দেশীয় পণ্ডিতেরা গন্ধক ও সোরা শক্ত মাটীর পাত্রে পুড়াইয়া কিম্বা তুঁতে অথবা হীরাকস চোলাই করিয়া গন্ধক দ্রাবক তৈয়ারী করিতেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। হীরাকস, তুঁতে ও ফিটকারী স্বাভাবিক প্রকৃতি-জাত দ্রব্য হিসাবে সৌরাষ্ট্রে, নেপালে, পঞ্চনদে কিম্বা রাজপুতানায় পাওয়া যাইত। অনেক সময় শিলাজতু জলে গুলিয়া পরিষ্কার রস জ্বাল দিয়া ফিটকারী প্রস্তুত করা হইত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে রসশিল্প বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। ঔষধ প্রস্তুত ও পরীক্ষার জন্য রসশালা স্থাপিত হইয়াছিল। নানাবিধ সূত্র ও সিদ্ধান্ত মান নির্ণয়ের জন্য ধার্য্য হইয়াছিল। বৃন্দের রসশালা নির্ম্মাণের পদ্ধতি, স্থান ও যন্ত্র নির্ম্মাণের ব্যাখ্যান এখনও কিয়দংশে শিক্ষণীয়। বৃন্দের মতে যে রাজার রাজ্যে শান্তি বিরাজিত, রাজা শিক্ষিত, বিচক্ষণ ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী, রাজ্য ধন জন, ধাতু-রত্নদ্রব্য জলাশয় এবং নানা ঔষধি গাছ-গাছড়ায় পরিপূর্ণ সেই রাজ্যে রসশালা নির্ম্মাণ বিধেয়। সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ঈশ্বর ও ইষ্টগুরুর প্রতি ভক্তিপরায়ণ, বহুভাষাভাষী, স্বল্প-আহারে তুষ্ট ব্যক্তিই রাসায়নিকের উপযুক্ত। পাঠক বিবেচনা করিবেন, খৃষ্টজন্মের সমকালীন পৃথিবীর পুরাতন জীবনাদর্শ বর্ত্তমানের বৈজ্ঞানিকেরও লক্ষ্য কিনা ?

ষোড়শ শতাব্দীর য়ুরোপ ক্রমে ক্রমে যেরূপে উনবিংশ শতাব্দীর জন্ম প্রদান করিল, ভারতে তাহা কেন অসম্ভব হইল ইহা বুঝিতে হইলে একমাত্র ইতিহাস ও জনশ্রুতি আমাদের অবলম্বন। মানুষের উদ্ভাবিত জ্ঞানচর্চ্চা ও অনুসন্ধিৎসার "দিবি আরোহণ"-এর কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের সঙ্গে জড়িত, ইতিহাসের এই শুষ্ক মন্তব্যে মন তৃপ্তি পায় না। ইতিহাস বলে বৌদ্ধধর্ম্ম ও সংঘের পতনের পরে ভারতের এই রসশাস্ত্র অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় যে ধর্ম্মগোষ্ঠীর হস্তগত হইল তাঁহারা তান্ত্রিক। তান্ত্রিকের চক্রে প্রকাশ্য অনুসন্ধিৎসার স্থান ছিল না। মন্ত্র, চক্র ও সাধন সকলই গোপনীয় রাখা তান্ত্রিকের ধর্ম্মের অঙ্গ ছিল। রসরত্নসার

সমুচ্চয়-এর ৭০-সংখ্যক শ্লোকে রসবিদ্যার গোপনীয়তা সম্বন্ধে লিখিত আছে —প্রকাশ্য আলোচনায় রসবিদ্যার গুণ ও শক্তিহানি হয়। এই গোপনীয়তার ফলে প্রকাশ্য জ্ঞানচর্চ্চার স্থলে আধিভৌতিক ভাবধারা স্থান গ্রহণ করিল। তন্ত্রশাস্ত্রে মহাদেব আসিলেন তন্ত্রাধিপতি হইয়া ;আমাদের প্রাচীন কিমিতি-শাস্ত্র তাঁহার মুখনিঃসৃত বাণী বলিয়া ঘোষিত হইল। রসরত্নসার সমুচ্চয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী রসরাজ পারদের জন্মবৃত্তান্ত মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের অপার্থিব শুক্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যজুর্ব্বেদ, তৈত্তেরীয় ব্রাহ্মণ, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি বিবিধ সংস্কৃত পুস্তকে অনেক জ্ঞানী ও পণ্ডিতের উপাধি ধাতুবিদ, লোহাবিদ প্রভৃতি পাওয়া যায়। মহাকবি বাণ স্বয়ং ধাতুবিদ্ ছিলেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় সমাজের উচ্চ স্তরের শিক্ষিত পণ্ডিত লোকেরা সকল রকম শিল্পকলা শিক্ষা ও সমাদর করিতেন। প্রাচীন বৌদ্ধ-গাথায় কলাবিদ্যায় পারদর্শীদের উদাহরণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। ইহার পরে বৌদ্ধধর্ম্মের পতন এবং নূতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আবির্ভাব। এই সময়ের মধ্যে জনসমাজে যে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে সমাজ-শাসনের ধারা বিভিন্ন খাতে চলিয়া যায়। সমস্ত দেশ ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হওয়ায় কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অভাবে ঘন ঘন রাষ্ট্রবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবের মধ্যে পূর্ব্বের অনুষ্ঠিত চৌষট্টিকলা বিদ্যা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া কালক্রমে বংশগত হইয়া পড়ে। নূতন সমাজব্যবস্থায় কায়িক পরিশ্রমের সমাদর যথেষ্ট না থাকায় ধর্ম্মাচরণ ও যুদ্ধ ব্যবসা লোভনীয় হইয়া পড়ে। মন্বাদি ঋষিগণ সুশ্রুতসম্মত মৃতদেহ পরীক্ষা করার চিকিৎসা, সমুদ্র ভ্রমণ প্রভৃতি অশাস্ত্রীয় বলিয়া ঘোষণা করায় দেশ ক্রমে ক্রমে দরিদ্র ও কূপমণ্ডুকতায় পরিপূর্ণ হয়। প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় বিধানে অন্যান্য চৌষট্টিকলার মত রসায়নী বিদ্যা তান্ত্রিক এবং ভোজবাজীদের হাতে পড়িয়া প্রকাশ্যচর্চ্চার অভাবে সাধারণের অনধিগম্য হইয়া অবশেষে লোপ পাইতে লাগিল। চরক, সুশ্রুত, নাগার্জ্জুন ও বাণভট্ট যে রসায়নীবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির প্রভৃতি মণীষীগণ যে জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্রের উন্নতি ও পুষ্টি বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, পাণিনি, কপিল, চার্ব্বাক ও শ্রীবুদ্ধ যেখানে স্বাধীন নব ন্যায় ও মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা কি শুধু চর্চ্চা ও অনুসন্ধিৎসার অভাবে লয়প্রাপ্ত হইল? ইহা জাতীয় গবেষণা ও সাধনার বিষয়। মরুভূমির অষ্ট্রিচ পাখী বালুকার ঝড় আগত বুঝিলে যেমন বালুকাভ্যন্তরে ঠোঁট গুঁজিয়া বাঁচিবার আশা পোষণ করে, সেইরূপ বাহির হইতে আগত বৈদেশিক ধর্ম্মপ্লাবন এবং আভ্যন্তরীণ মাৎস্যন্যায় এই দুই মহাশত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য সমাজ যে "নেতিবাচক" নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত না হইলেও দেশহিতকামী সকলেরই চিন্তা ও গবেষণার বিষয়।

ভারতের সৌভাগ্যাকাশের রবি যখন ধীরে ধীরে অস্তাচলে চলিয়া পড়িতেছে তখন য়ুরোপ ভূখণ্ডে সভ্যতার আলো সলাজ লজ্জার সহিত কুজ্ঝটিকা কাটাইয়া উঠিতেছে। এই সভ্যতার নূতন আলোকে যাঁহারা য়ুরোপে মাতামাতি করিয়া বেড়াইয়াছেন সেই রোমক সাম্রাজ্যে স্বাধীন চিন্তার স্থান বিন্দুমাত্রও ছিল না। জ্ঞান বিজ্ঞান কিম্বা রসায়নী শাস্ত্র সম্পর্কে যাঁহারা আলোচনা করিতেন লোকে তাঁহাদিগকে ঐন্দ্রজালিক বা ডাইনী বলিত। খৃষ্ট জন্মের ১৪০০ বৎসর পরেও কোপার্নিকাস তাঁহার পুস্তক লিখিয়াও ৩৬ বৎসর ভয়ে ভয়ে জনসাধারণের নিকটে প্রচার করিতে সাহসী হন নাই। তাঁহার নূতন মতবাদ ৩৬ বৎসর পরে আলোর মুখ দেখিলেও নাকে খৎ দিয়া তাঁহাকে প্রাণ বাঁচাইতে হইয়াছিল। রজার বেকন তাঁহার সময়ের তুলনায় অসামান্য লোক হওয়া সত্ত্বেও ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা আলোচনার জন্য অক্সফোর্ডের নিভৃত কক্ষে চতুর্দ্দশ বৎসর কারারুদ্ধ থাকেন ; ইহার দুইশত বৎসর পরেও বৈজ্ঞানিক সত্য অকপটে বলিবার জন্য গ্যালেলিওকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়। কিন্তু পুরাতন য়ুরোপে মার্টিন লুথার যেদিন বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া মানুষের চিরন্তনী স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করিলেন, য়ুরোপের জয়যাত্রা সুরু হইল সেইদিন হইতেই। মার্টিন লুথারের আন্দোলনের ঢেউ সারা য়ুরোপে সাড়া জাগাইয়া ইংলণ্ডে পৌঁছিল পতিত জাতির মাভৈঃ বাণীরূপে। সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই রোমক সাম্রাজ্য ও রোমক ধর্ম্মের নাগপাশ হইতে স্বাধীনতা লাভ করিয়া জাতির জীবনে যে-শক্তির সঞ্চার হইল তাহার ঘাত-প্রতিঘাতেই আমেরিকা ও ভারতের পথ আবিষ্কার, ফরাসী দেশে রাষ্ট্র বিপ্লব, জনগণকর্তৃক জনগণের জন্য জনশাসন প্রবর্ত্তন প্রভৃতি বিরাট বিরাট পরিবর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ডাল্টন, বয়েল, ল্যাবোয়াসিয়ে, বার্থেলো ময়সান্ প্রভৃতি মণীষিগণের চেষ্টায় বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইল। গ্যালেলিওর আত্মাহুতির পরের দুই শত বৎসর য়ুরোপের শুধু একই বাণী "এগিয়ে চলো" "এগিয়ে চলো"—"সারা দুনিয়ায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো।"

ভারতের কনাদ ঋষির পরমাণুতত্ত্ব তাঁহার জীবনের সহিত লোপ পাইয়াছে কিন্তু ডাল্টনের পরমাণুবাদের শতবার্ষিক উৎসব সমাপ্ত হইতে না হইতেই তাঁহার অবিভাজ্য পরমাণু বিভাজ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আলোক ও বৈদ্যুতিক রশ্মিব্যতীত অন্য কোনও প্রকার রশ্মি উৎপাদিত হইতে পারে তাহা বৈজ্ঞানিকেরা জানিতেন না। ১৮৯৬ সালে রণ্টেন এক অদৃশ্য রশ্মির কাহিনী শুনাইলেন ; আজ তাহা মানবের কত উপকারে আসিয়াছে। ইহার পরে বেকারেল পিচ-ব্লেণ্ড হইতে ইউরেণিয়াম্ ধাতু আবিষ্কার করিলেন। এই ধাতু হইতে অবিরাম রশ্মি নির্গত হয় বলিয়া আবিষ্কর্ত্তার সম্মানার্থে ইহার নাম "বেকারেল রশ্মি" দেওয়া হইয়াছে। মাদাম কুরী দেখিলেন পিচ-ব্লেণ্ড হইতে যে ইউরেণিয়াম্ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার বিকীরণ-শক্তি ইউরেণিয়াম্ হইতে অনেক বেশী, তখন তাঁহার ধারণা হইল পিচ-ব্লেণ্ড প্রস্তরে ইউরেণিয়াম অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী অপর সক্রিয় পদার্থ বর্ত্তমান আছে। দুই বৎসরের মধ্যেই মাদাম কুরী উক্ত পিচ-ব্লেণ্ড হইতে রেডিয়াম্ নামক অপর মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। অবিরত তাপরশ্মি ও বৈদ্যুতিক কণা বিকীরণ করে বলিয়া ইহার নাম দিলেন রেডিয়াম্। এই মহাযুদ্ধে বৈজ্ঞানিক বহুতর দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দান হইল ইউরেণিয়ামের পরমাণু বিশ্লেষণ, আণবিক বোমা। অপর দিকে সোভিয়েট রাশিয়া জাগতিক

রশ্মিকেও কাজে লাগাইতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। গত দুই শত বৎসরের মধ্যে য়ুরোপ ও আমেরিকায় বিজ্ঞানের যে চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার মূলে স্বাজাতিক নিষ্ঠা এবং সামগ্রিক স্বাধীনতা।

দীর্ঘ হাজার বছরের তামসিক রজনীর শেষে ভারতের ইতিহাসেও পুনরাবৃত্তি হইতে চলিয়াছে—সামগ্রিক স্বাধীনতা ভারতীয়ের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। পরাধীন ভারত দীর্ঘ দিন তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল-এর মীমাংসায় মস্তিষ্কের অপব্যবহার করিয়া কালক্ষেপণ করিয়াছে। তারপরে কোন শুভক্ষণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তো সংঘর্ষের সৃষ্টি হইল। পাশ্চাত্য আসিয়াছিল প্রাচ্যের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতে। রিক্ত ও দরিদ্র প্রাচ্য যখন স্বীয় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল তখনই প্রাচ্যের আকাশে নূতন রবির উদয় হইল। স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে? রিক্ত ও জীবন্মৃত প্রাচ্যে ধর্ম্মের স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা, নর নারীর সামাজিক স্বাধীনতা, এক কথায় সামগ্রিক স্বাধীনতার দাবী যিনি নূতন করিয়া ঘোষণা করিলেন তিনিই আমাদের বরেণ্য রামমোহন রায়। তাঁহার প্রেরণায় মৃত জাতির প্রাণে আবার নূতন ভাবধারার সৃষ্টি হইল। ইহার পরে আসিলেন কত চিন্তাশীল, কত ভাবুক! নূতন ভারতের পত্তন হইল। দিকে দিকে কত দরদী মনীষী তাঁহাদের ত্যাগ ও জীবন আহুতি দ্বারা জাতির মরা গাঙ্গে নবযৌবনের জলতরঙ্গ সৃষ্টি করিলেন। ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্পকলায় ভারত যে দেউলিয়া নহে—তাহারও গৌরবময় অতীত ছিল, বর্ত্তমানেও দেবার অধিকার আছে পৃথিবীতে তাহা সগৌরবে ধ্বনিত হইল। দীর্ঘ অমানিশার ঘনান্ধকারে ভারত তাহার সব কিছুই হারাইয়াছিল। এমন কি, দর্শন, গণিত, বীজগণিত, রসায়নীবিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভৃতিতে ভারত যে এককালে অগ্রণী ছিল তাহাও পৃথিবীর লোকে বিস্মৃত হইয়াছিল। যাঁহার যেদিকে দক্ষতা তিনি পুরাতন কীটদষ্ট জীর্ণশীর্ণ পুঁথি পত্র হইতে পুরাতন কীর্ত্তি পুনরাবিষ্কার করিতে লাগিলেন। রাসায়নী শাস্ত্রকে কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথি-পত্র হইতে জগতের সামনে যিনি নূতন করিয়া ধরিলেন তিনি আমাদের প্রণম্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র। তিনিই নব্য রসায়নী শিল্পকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সার্কুলার রোডের বাড়ীতে ১৮৯২ সালে যে-শিশুর জন্ম হয়, এতদিনের মাতৃরসে সঞ্জীবিত হইয়া তাহাই যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আজ নাই, কিন্তু তাঁহার সাধনা ও ত্যাগে রসায়নীবিজ্ঞান কলাশিল্প হিসাবে ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।*

* প্রবন্ধ লিখিবার সময় লেখকের সামনে নিম্নলিখিত পুস্তক ছিল—
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের History of Hindu Chemistry Vols 1 & 11.
" নব্য রসায়নীবিদ্যা
চরক সংহিতা—৺দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত।
সুশ্রুত সংহিতা—কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার অনুবাদিত।

বিচার-বিড়ম্বনা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

জেতা বা বিজিত, বীর্য্যের পায়ে নোয়ায় না যে-বা শির,
ভাগ্যের বরে শত জয়ে, তবু সে নহে কখনো বীর;
গৌরব তারই, দৈবের হাতে নহে যে-বা ক্রীড়নক,
স্বীয় শক্তির বলে যে সতত উন্নত মস্তক।

নানা শক্তির সমাবেশে যার বিক্রম-পরিচয়,
স্বার্থবিচারে বিচারক সাজি' আজি যা'র অভিনয়,
ন্যায়ের বিধানে যে জন না মানে স্পর্দ্ধিত অবিচারে,
শেষ নাই তা'র কাপুরুষতার, ইতিহাস জানে তা'রে!

রথের চক্র গ্রাসিয়া মেদিনী করুক বলক্ষয়,
রক্ষাকবচ শত্রুরে সঁপি' ঘটুক না পরাজয়,
স্বর্গে মর্ত্তে ছলে-কৌশলে লুটাক্ ধূলার মাঝে,
কর্ণ-'বিজয়'-বীর্য্যের বাণী ত্রিলোক ভুলিল না যে!

সাহায্যে আর সহযোগিতায় জয়ী সে যে আজি নিজে!
বীর্য্য অভাবে চিনে নাই তাই, কাহার মূল্য কি যে;—
চিরমানবের স্বাধীন মনের সহজাত অধিকার
খর্ব্ব যে করে, ধর্ম্মবিচারে লেখা তার ধিক্কার।

ব্যর্থ-কবিতা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি

সুরেন কাব্য লেখে। জীবনের ব্যর্থতা ও তিক্ততা, প্রশ্ন ও অভিযোগ তার অনেক আছে। কিন্তু তাই নিয়েই ত বেঁচে থাকা যায় না। একটা কিছু অবলম্বন চাই, যাকে ধরে মানুষ তার সংসারের ঘূর্ণীপাকে অন্ততঃ গা ভাসান দিয়ে চলতে পারে। কবিতা লেখা তার ছিল ঐ জাতীয় একটা অবলম্বন। সুখ্যাতি তাকে কেউ কেউ করতো, কেউ বা তার কবিত্ব রোগ নিয়ে টিপ্পনির কাণাকাণিও করতো।

শত্রুদের টিপ্পনিতে সুরেন তত বিরক্ত হ'তো না। তবে দরদী বন্ধুরা যখন তাকে জিজ্ঞাসা করতো যে সে লাইফ, ইন্সিওরের দালালি না করে, লাউকুমড়া বা বেগুন পালংএর বাগান না করে শুধু শুধু কবিতা লিখে সময় নষ্ট করে কেন তখন সুরেন বলতো—

"এই কাব্য লেখাটাই হচ্ছে আমার জীবনের কঠিন জল যাত্রার পোতাশ্রয়। অশ্রুর লুন সাগরের ওপর দিয়ে চলতে চলতে জাহাজ যখন গোপন পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আহত হয়—তখন এই পোতাশ্রয়ের মধ্যেই আমাকে আশ্রয় নিতে হয়—আমার বুকের ঘা শুখাবার জন্য!"

এই জাতীয় কথা শুনে কেউ বা চুপ করে থাকতো, কেউ বা মুচকে হাসতো। সুরেনের তাতে লেখা বন্ধ হ'তো না।

সুরেন প্রকৃতির কবি ছিল না। মানুষের মনের হাসি কান্নার খেলা, মান অভিমানের লুকোচুরি, বিরহ মিলন, আশা আকাঙ্ক্ষা, এই সব নিয়েই তার কবিতা ফুটতো বেশী। কখনও কখনও সে জীবনের প্রশ্ন বা সৃষ্টির সমস্যা প্রভৃতি নিয়েও কাব্য লিখতো, কিন্তু প্রকৃতি বা নারীর সৌন্দর্য্য নিয়ে সে কোনও দিনই মাথা ঘামাতো না।

রূপের শিল্পী সে ছিল না। তার প্রিয়াকে সে যথেষ্টই ভালবাসতো। কিন্তু কোনও দিনই তার রূপ নিয়ে "আদিখ্যেতা" করে কবিতা লিখতো না।

কিন্তু সেদিন কি একটা অঘটন ঘটে গেলো। সে তার প্রিয়ার রূপ নিয়ে শুধু যে একটা দীর্ঘ কবিতা লিখলে তা নয়, সেই কবিতাটা তার প্রিয়ার কাছে পড়িয়ে শুনাবার জন্য একটা সনেটও লিখে ফেলে।

অরসিকের কাছে "রসস্য নিবেদনম্" এর ব্যর্থতাকে সে খুবই ভয় করে। তাই বন্ধু বান্ধবের কাজের ব্যাঘাত করে তাদের অনিচ্ছুক কানের কাছে নিজের কবিতার আবৃত্তি কোনও দিনই সে করে না। মানুষের হাটে তার প্রিয় সৃষ্টিগুলো পাছে তার ন্যায্য মর্য্যাদা না পায় তাই সে সহজে সেগুলোকে হাটের মাঝে নিয়ে আসতেই সাহস করতো না।

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই সাহিত্য যদি সহিতত্ব না জাগায়, আমার বুকের হাসি কান্নার ঢেউ যদি অপরের বুকেও হাসি কান্নার দোলা না লাগাতে পারে, তা হ'লে সেটা অনাদৃত বন কুসুমের মতই খানিকটা ব্যর্থ হয়ে যায়। তা ছাড়া তোমার জন্য যদি আমি একটা রসানুভূতি অনুভব করি, তোমার প্রেমে আমি যদি উন্মাদ হয়ে পড়ি, তাহলে তোমাকেই যদি সে কথাটা বলতে না পারি তাহ'লে আমার বুকের বোঝাটা বড্ড যেন ভারী হয়ে ওঠে—।

কাজেই যে প্রিয়াকে লক্ষ্য করে সুরেনের কাব্য লেখা—তাকে পড়িয়ে শুনাতে না পারলে সুরেন যেন তৃপ্তি পায় না। সে গৃহিণীকে ডাক দিলে।

গৃহিণী রান্না ঘর থেকে এলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—"কি বলছো" ?

"কিছু কাজ আছে নাকি ?" সুরেন জিজ্ঞাসা করলে।

"না বিশেষ কিছু নেই—কেন বলত" ?

"একটা কবিতা লিখেছি শুনবে ? তোমাকে নিয়েই লেখা।"

"পাগল—হঠাৎ আবার আমার এত আদর কেন ? পড় শুনি —তোষামোদ করনি ত ?"

"শোনো না আগে ;—আচ্ছা—একটা গৌর চন্দ্রিকাও লিখেছি সেইটে থেকেই আরম্ভ করি কি বল ?"

পাগল স্বামীটির আগ্রহ দেখে কবি গৃহিণী রাজী হয়ে বল্লেন "বেশ ত তাই পড়ো"—

অবশ্য এটা ঠিক কবিতা শোনবার সময় ছিল না, শীতের সকাল, সব কাজই থৈ থৈ করছে—ছোট বেলা, এক হাতে সব কাজই তাকে সামলাতে হবে। অন্য দিনও তাদের কাব্যালোচনা হয়। সেটা হয় দিনান্তে রাত্রির বিশ্রামের সময়, কাজকর্ম্ম শেষ হয়ে ছেলে-পুলেরা ঘুমিয়ে পড়লে।

আজ স্বামীর আগ্রহ দেখে সেও কাব্য শোনবার জন্য একটা আগ্রহ দেখালে ; পাছে তা না করলে স্বামী ক্ষুণ্ণ হন। সে একটি হাতকে মুড়ে দেওয়ালের ওপর রেখে তারই ওপর পিঠিটি ঠেশান দিয়ে দাঁড়ালো—স্বামীকে বল্লে। "পড়—দেখি তোমার কাব্য !—এই নায়িকা নিয়ে আবার কাব্য ! যেমন পাগল" !!

সুরেন তার গৌরচন্দ্রিকা থেকে আরম্ভ করলে—এর পরেই আসল কাব্যটা আরম্ভ করবে—

দেখেছো তোমার লাগি নূতন কবিতা
রচেছি যা ঢালি মন বসিয়া বিজনে,
শিল্পীসম তব রূপ ভাবি মনে মনে
ফুটায়েছি তব লাগি মোর ব্যাকুলতা।
পড়ায়ে শুনাবো তাহা; এসো প্রিয়তম
কহিব বুকের বাণী; তব আঁখি দুটি
শুনি সে কবিতা মম উঠিবে কি ফুটি
আলোক-মদিরা পানে প্রসূনের সম।
এসো কাছে ছাড়ি কাজ, দেখো না কেমন
আকাশে করেছে মেঘ, তারি কাল ছায়া
ফেলিয়াছে তব মুখে যেন কোন মায়া!
কাব্য ছাড়া ভাল কিছু লাগে কি এখন!

—এই ভাবে সুরেন তার কাব্য আবেদন করে যাচ্ছিলো। কিন্তু তার গৌরচন্দ্রিকার সনেটটা সম্পূর্ণ আবৃত্তি করা হলো না। কারণ সুরেন যখন আবেশ ভরে তার কবিতা পড়ে যাচ্ছিল কবি-পত্নী তখন স্বামীর উপরোধে পড়ে কবিতাটি শুনছিল বটে কিন্তু তার মন পড়েছিল রান্না ঘরের দিকে। শেষ পর্যন্ত সে শুনে উঠতে পারলো না। কারণ সে উনুনে ভাত চড়িয়ে এসেছিল এবং সেটা প্রায় তৈরী হয়ে এসেছিল। সুরেন আবার ভাত ধরে গেলে তার গন্ধ মোটেই সহ্য করতে পারে না। ভাত পুড়ে গেলে তার খাওয়াই হবে না। কাজেই সুরেন যখন সনেটটির বারো লাইন পর্য্যন্ত পড়ে শুনিয়েছে তখন সুরেন গৃহিণী একটু ব্যস্ত হয়ে বল্লে—"একটু দাঁড়াও আমি এখুনি আসছি। দেখে আসি ভাতটা পুড়ে গেলো কিনা—রাগ করো না লক্ষ্মীটি"

সুরেন একটু আহত হয়ে চুপ করে রইলো। অরসিকের কাছে রস নিবেদনের ব্যর্থতা তাকে অভিভূত করে ফেললো। সে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর আস্তে আস্তে সনেটের কাগজটিকে ছিঁড়ে ফেললে। বলা বাহুল্য তার সঙ্গে আসল কবিতাটিও বিনষ্ট হলো।

সনেটটির শেষের দুলাইনে কি ছিল? আর আসল কবিতাটি বা কি ছিল? এমন কি লিখেছিল সুরেন এখনি যেটা পড়িয়ে না শোনালে সে স্থির থাকতে পারতো না? কবিগৃহিণীর উক্তিটাকে কবিতার ছাঁচে ফেলে আমরা না হয় সনেটটা পুরা চতুর্দ্দশপদী করলুম যথা—

"এখনি আসিব ফিরে রাগ করিও না—
দেখে আসি ভাতে জল ঠিক আছে কি না"—

কিন্তু আসল কবিতাটা যে কি ছিল সেটা ত আমরা বুঝতে পারলুম না! শ্রোতাদের মনে কোন্ প্রশ্নটা বড় হবে? কবির অরসিকের কাছে রস নিবেদনের ব্যর্থতার কথা? ছিঁড়ে ফেলা সনেটটার শেষের দুলাইনের কথা? না যে ব্যর্থ কবিতাটার কোনও সন্ধানই তারা পেলো না সেই ব্যর্থ কবিতাটার কথা?

ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

উপক্রমণিকা

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব ও সংমিশ্রণ এবং ভারতবর্ষের বাহিরের বিভিন্ন জাতির সহিত তাহাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিতগণ যে সকল ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা হইতে সম্ভবপর হইলে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণায় আসিবার চেষ্টা করা এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

এজন্য প্রথমে দেখা প্রয়োজন—নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের কোন অংশ হইতে এইরূপ সংমিশ্রণ ও সম্পর্ক নির্ণয় করিবার জন্য আবশ্যক তথ্য পাওয়া যায়। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে নৃতত্ত্ববিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা হয় বটে কিন্তু ইহা রসায়ন বিজ্ঞান পদার্থ বিজ্ঞান-এর পদের মশলা ব্যবহার করা হয় বলিয়া নৃতত্ত্ববিদ্যাকে বিজ্ঞানের শ্রেণীভুক্ত বলিয়া দাবী করা হয়। যাহা হউক, নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের এলাকায় কি কি বিষয়ের আলোচনা পড়ে দেখা যাউক। আলোচ্য বিষয় অনুসারে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানকে Physical ও Cultural এই দুই অংশে ভাগ করা হইয়াছে। Physical Authropologyর এলাকায় পড়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নরকঙ্কাল, করোটি (osteometry ও craniometry) প্রভৃতির বিচার; বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মাপজোখ ও পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে (anthropometry) দৈহিক লক্ষণ হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদিগের বা নির্দ্দিষ্ট গোষ্ঠীর মনুষ্যের জাতিলক্ষণসমূহ (racial characteristics) নির্ণয়ের চেষ্টা; racial biology cultural anthropologyর এলাকায় পড়ে শিল্প ও শিল্পজাত দ্রব্যের বিবরণ, সমাজের গঠন, সামাজিক অনুষ্ঠান,

প্রভৃতির বিবরণ সংগ্রহ ও আলোচনা। প্রধানতঃ যাহাদিগকে primitive tribes বলা হয়, অর্থাৎ আধুনিক সভ্যতার বাহিরে এখনও যে সকল মনুষ্য গোষ্ঠী বা সমাজ বাস করে তাহাদের জীবনযাত্রার সকল অঙ্গের পরিচয় সংগ্রহ করা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের বিষয়। সভ্যসমাজের মধ্যে নানাপ্রকার প্রাচীন প্রথা, বিধিনিষেধ এখনও বর্ত্তমান। এই-গুলির মূল অনুসন্ধান করা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর কাজের মধ্যে। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে প্রাপ্ত মাল-মশলার সাহায্যে প্রাচীন ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবনযাত্রা ও কৃষ্টির আলোচনা করাও নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের অঙ্গ।

সংক্ষেপে বলা যায় যে ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক দিয়া নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের দুইটি বিভাগ দেখা যায়। একটি বিভাগের লক্ষ্য পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলির অধিবাসীদিগের জীবনযাত্রার—সমাজগঠন, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ইত্যাদি—সকল অঙ্গের বিবরণ সংগ্রহ করা। এই কাজ কৃষ্টিমূলক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের মধ্যে পড়ে। দ্বিতীয় বিভাগের কাজ Physical authropologyর মধ্যে পড়ে। এই বিভাগে নৃতত্ত্ববিজ্ঞান Sociology, Physiology, Racial biology, Genetics প্রভৃতি বিজ্ঞানের সহিত মিলিয়া নূতন দিকে কাজ আরম্ভ করিয়াছে। এই বিভাগে অন্য একটি দিকে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ করিবার প্রয়াসের উল্লেখ পরে করা হইতেছে। একথা হয়ত অনেকে জানেন না যে কৃষ্টিমূলক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদী শাসননীতির প্রয়োজন ও প্রেরণা হইতে। অধীন, অনুন্নত দেশগুলির অধিবাসীদিগের জীবনের সকল অঙ্গের পরিচয় সংগ্রহ করা শাসক-জাতিসমূহের পক্ষে প্রয়োজন—যাহাতে তাহাদের সামাজিক জীবনের ব্যবস্থায় কোনপ্রকার অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ না করিয়া ও অহেতুক বিরোধের সৃষ্টি না করিয়া "সহানুভূতির সঙ্গে" শাসনকার্য্য নির্বিঘ্নে চালাইতে পারা যায়। colonial administrationএর এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এশিয়া, আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, পলিনেশিয়া ও মেলানেশিয়ার বিভিন্ন অনুন্নত মনুষ্যগোষ্ঠী সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ (প্রধানতঃ সাম্রাজ্যভোগী জাতির) বিশেষ অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়াছেন। অবশ্য একথা কেহ বলিবে না এই অনুসন্ধান ও গবেষণার পশ্চাতে কিছুমাত্র জ্ঞানপিপাসা নাই, ইহা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক। ভারতবর্ষেও কৃষ্টিমূলক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচনা প্রধানতঃ ঐরূপ প্রেরণা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের Castes ও Tribes সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোকেরা যে এই শ্রেণীর গ্রন্থ রচনার প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছেন ইহার তাৎপর্য্য এই যে শাসন কার্য্যের সুবিধা করা এই শ্রেণীর গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য; কিন্তু গোড়ায় উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাঁহাদের অনেকে যে সকল প্রামাণ্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন সেজন্য তাঁহাদের প্রাপ্য প্রশংসার ভাগ দিতে বা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে এদেশবাসীরা কৃপণতা করেন নাই।

অবশিষ্ট থাকে মনুষ্যজাতির গোষ্ঠীবিভাগ বা 'racial classification. ইহার অর্থ কয়েকটি নির্ব্বাচিত দৈহিক লক্ষণকে ভিত্তি করিয়া পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে (races) ভাগ করা। এই সকল নির্ব্বাচিত দৈহিক লক্ষণ হইল—চুল, মস্তকের গঠন, নাসিকার গঠন, মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশের গঠন, চক্ষুর রং ও গঠন, দেহের দৈর্ঘ্য, গাত্রবর্ণ প্রভৃতি। এই সকল লক্ষণের একটি, দুইটি বা সব কয়টির ভিত্তিতে পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যেমন ইউরোপীয়গণ সাধারণভাবে গাত্রবর্ণ অনুসারে পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে ভাগ করেন— white and coloured races, কিন্তু তাঁহাদের শ্বেতজাতির তালিকায় মধ্যে কেবল একটা নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের, অর্থাৎ ইউরোপের শ্বেত জাতিগুলি এবং আফ্রিকার, আমেরিকার ও অন্যান্য স্থানের তাঁহাদের আত্মীয়গণ পড়েন, এশিয়ার অধিবাসী যে সকল সাদা জাতি আছেন তাঁহারা coloured raceএর অন্তর্ভুক্ত। গাত্রবর্ণ অনুসারে এই প্রকারের জাতির শ্রেণীবিভাগ বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ নয়, ইহা রাজনৈতিক শ্রেণী বিভাগ। যতগুলি বেশী দৈহিক লক্ষণ অনুসারে পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে পরীক্ষা করা হইবে সেই অনুপাতে গোষ্ঠীর বা racial typeএর সংখ্যা বেশী দেখা যাইবে। সে যাহা হউক, দেখা যাইতেছে এই টাইপ নির্ণয় করিবার কাজ physical authropologyর এলাকাভুক্ত। এই racial classification স্থির করিবার ব্যবস্থার কোন ব্যবহারিক প্রয়োগ থাকিবার কথা নয়। কিন্তু এখন বিদেশী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী যিনি ভারতবর্ষের বাসিন্দা হইয়াছেন, বলিতেছেন—"Our Science has been debased in the interest of false racial theories." এ বিষয় পরে আলোচনা করা হইবে।

জাতি বা গোষ্ঠীর লক্ষণ নির্ণয় করিবার মাপজোখের ও পর্য্যবেক্ষণের মান ও প্রণালী সম্বন্ধে বর্ত্তমানে পৃথকভাবে কিছু বলা আবশ্যক, আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু বলা হইবে। কিন্তু বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ ও সম্পর্ক নির্ণয় করিবার চেষ্টায় নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর পক্ষে অনন্যনিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীনভাবে অগ্রসর হইবার পথে যে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় এখানে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেহ, দৈর্ঘ্য, মস্তক, নাসিকা মুখমণ্ডল প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মাপ ও গাত্রবর্ণ, চক্ষু, কেশ প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা কোন একটি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদিগের দৈহিক লক্ষণ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ হয় তাহা পরীক্ষা করিতে বসিলে প্রথমে দেখা যায় যে প্রত্যেকটি লোকের পরিমাপের ফল ভিন্ন। তারপরে দেখা যায় যে এই সকল পৃথক ফলের কতকগুলি পার্থক্য হয়ত উনিশ বিশের মধ্যে। যে সকল ফলের মধ্যে মোটামুটি মিল দেখিতে পাওয়া যায়—সেইগুলিকে সাধারণ মানরূপে ব্যবহার করিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে মূল বা প্রধান টাইপ স্থির করা হয়। এই সাধারণ মান হইতে ব্যতিক্রমগুলি সংমিশ্রণের ফল বলিয়া অনুমান করা হয় এবং লক্ষণগুলি মিলাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী বা দূরবর্ত্তী অঞ্চলের কোন টাইপের সঙ্গে সংমিশ্রণ হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হয়। এজন্য নৃতত্ত্ব-

বিজ্ঞানীগণ ফরমুলা ধরিয়া অঙ্ক কসিয়া জাতিলক্ষণের দিক দিয়া সাদৃশ্যের বা পার্থক্যের পরিমাণ স্থির করিবার চেষ্টা করেন। এই সাদৃশ্য বা পার্থক্যের পরিমাণ অনুসারে সংমিশ্রণের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী যে প্রণালীতে অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ করেন সে প্রণালী কেবল জীবিত মনুষ্য গোষ্ঠীর বেলাতে যথাযথ প্রয়োগ করা সম্ভব। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানসম্মত মাপ ও পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা সকলক্ষেত্রে সঠিকভাবে সংমিশ্রণ নির্ণয়করা সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন আজকাল নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের মধ্যে উঠিয়াছে। ইহার কয়েকটি কারণ আছে। একটি কারণ এই যে, যে-প্রণালীতে লক্ষণগুলি নির্ণয় করিবার চেষ্টা হয় সে প্রণালীতে নির্ভরযোগ্য ফল সব সময়ে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তারপর racial type এর যে ক্রমাগত পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তন,সংমিশ্রণ ইত্যাদির ফলে এই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। কাজেই পৃথিবীতে কোন অমিশ্র বা বিশুদ্ধ race বা জাতি আদৌ আছে কিনা এবং টাইপ স্থির করিবার ফরমুলার ভিত্তিতে যে racial classification বা জাতির শ্রেণী বিভাগ করা হইয়া থাকে তাহার কতটা বিজ্ঞানসম্মত এ প্রশ্ন উঠিয়াছে। প্রচলিত অনুসন্ধান প্রণালীর পরিপোষক হিসাবে blood grouping হইতে কোনরূপ সহায়তা পাওয়া যায় কিনা তাহা লইয়া কিছুকাল পরীক্ষার পর সন্তোষজনক ফল পাইবার আশা ত্যাগ করা হইয়াছে এবং Blood grouping পরীক্ষার ফল শরীরবিজ্ঞানের কাজে লাগাইবার চেষ্টা চলিতেছে।

সে যাহা হউক, যেখানে মাত্র করোটি বা কঙ্কালের অংশ লইয়া জাতির টাইপ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা হয় সেখানে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীকে এনটেমিষ্ট ও প্রত্নজীব-বিজ্ঞানীর palaeontologist উপর নির্ভর করিতে হয়। সম্পূর্ণ কঙ্কাল করোটি হইতে জাতির টাইপ স্থির করিবার ফরমুলা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী-দিগের আছে ; কিন্তু উহার প্রয়োগ এনাটমির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। এ কথা বলা বাহুল্য যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের করোটি পরীক্ষা করিয়া এই টাইপ স্থির করিতে হইলে কতকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই অনুমানের ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে পারে, এই অনুমান বৈজ্ঞানিক মনোভাব প্রসূত হইতে পারে, কিন্তু অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত যে ব্যাখ্যা তাহা ব্যক্তিগত মতামত মাত্র, বৈজ্ঞানিক তথ্যকে যে মূল্য দেওয়া হয় সে মূল্য উহাকে দেওয়া যায় না। একটু আগে বলা হইয়াছে যে racial theoryর ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। এই প্রয়োগের প্রণালী খুব সূক্ষ্ম। বৈজ্ঞানিক ঠাট আগাগোড়া বজায় থাকে বলিয়া বৈজ্ঞানিক অনুমান কখন ব্যক্তিগত মতে রূপান্তরিত হয় এবং রূপান্তরের মূলে কি প্রকার উদ্দেশ্য কাজ করে তাহা ধরিতে অনেক সময় লাগে। মোটামুটি একথা বলা যাইতে পারে যে racial theory ব্যাখ্যার ব্যাপারে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত নানাভাবে প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। সুতরাং এই জাতীয় সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবার পূর্ব্বে বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। Racial theoryর অপপ্রয়োগ ও কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর অবৈজ্ঞানিক কার্য্যকলাপ যে প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর চোখ এড়ায় নাই তাহার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আরও কিছু উদ্ধৃত করা যাইতেছে ; "...Anthropology is regarded with some suspicion in India. There are several reasons for this. The attempt of certain Scholars and Politicians to divide the aboriginal tribes from the Hindu community at the time of the census created the impression that science could be diverted to Political and communal ends....... But perhaps the chief thing that has disturbed nationalist opinion in India has been the creation of Excluded and partially Excluded Areas. It is an open secret that this move was largely the work of a distinguished anthropologist at the Round Table conference." (Dr. Verrier Elwin—Pres. Add. Indian Science Congress, 1944) ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব ও সংমিশ্রণ প্রভৃতি ব্যাখ্যার মধ্যে অবৈজ্ঞানিক মতবাদ কিভাবে প্রবেশ করিয়াছে পরে অন্যান্য দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তাহা আলোচনা করা হইবে।

Racial theory মানিয়া লইবার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন,ইহা বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের সম্পর্কে আলোচনায় এই সতর্কতার মাত্রা বাড়াইলে ক্ষতি নাই। চল্লিশকোটি লোকের বাসভূমি এই বিরাট দেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে সাদা, কাল, পীত, নানা জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ঐতিহাসিক যুগে উত্তর পশ্চিমের গিরিপথে মধ্য এসিয়া হইতে নানা জাতির নূতন নূতন প্রবাহ আসিয়া ভারতবর্ষের জন-সমুদ্রে মিশিয়াছে। চোখের উপর দেখা যাইতেছে যে উত্তরপূর্ব্ব হইতে পীত জাতির প্রবাহ এই সমুদ্রে আসিয়া পড়িতেছে। এই বিশাল জন-সমুদ্রকে বেওয়ারিশ দরিয়া বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ প্রচার হইয়াছে সেই সকল মতবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কিরূপ পরে দেখা যাইবে। মোটামুটি এই সকল মতবাদকে বেওয়ারিশ দরিয়ায় দুঃসাহসিক অভিযানের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। এ কথা বলা বাহুল্য যে এইরূপ অভিযান ছাড়া বেওয়ারিশ দরিয়ার সঙ্গে পরিচিত হইবার সহজ উপায় নাই। কাজেই ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের জাতিতত্ত্বের ইতিহাসের কয়েকটি অধ্যায়ে এইরূপ অভিযানের কাহিনী পাওয়া যাইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে গূঢ় আত্মপ্রচারের কৌশলকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলিয়া লোকে ভুল না করে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত, সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে বিলম্ব আছে। ইতিমধ্যে আমাদিগের পথনির্দ্দেশ করিবার জন্য যে সকল মতবাদ প্রচার হইয়াছে তাহাদের প্রকৃত ভিত্তি কি পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণের ফলে যে স্তর-বিন্যাস (ethnic stratification) নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীদের মতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইবে এবং এ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কমূলক সমস্যাগুলির সংক্ষেপে আলোচনা করা হইবে। কিন্তু এই আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ কি ভাবে পৃথিবীর অধিবাসীকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করিয়াছেন সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

অথচ

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

আত্মহত্যা!

কথাটি মনে হতেই তার রোমাঞ্চ হল। ভয়ে নয়। আনন্দেও নয়। হয়তো চরম দুঃখের নিরুপায়তার মাঝে একটা দিশে পাওয়ার উত্তেজনায়।

আত্মহত্যা ছাড়া তার মতো লোকের কি উপায়ই বা আর থাকতে পারে? জগতের কোথাও দাঁড়াবার মতো এককোঁটা ঠাঁই যার নেই, বিশাল ধরায় একবিন্দু ভরসা যার নেই, আত্মবিলোপই তার একমাত্র করণীয়। বেঁচে থাকার সহস্র দুঃখে তিলে তিলে জ্বলে পুড়ে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের নির্ধারিত সেই মৃত্যুপরিণতির দিকেই তো এগিয়ে যেতে হবে। তার আগেই এ-স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে সে শান্তি পাবে।

ভেবে দেখবার আর আছে কি? ভেবেছে তো অনেক দিন। লাভের মধ্যে ভাবনা শুধু বেড়েই চলেছে। আর ভাবনা নয়, আজই সে মরবে। মনে বেশ জোর পাচ্ছে সে। মনের কোনো কোণে একতিল দুর্বলতা নেই। উপেক্ষা করলে এমন শুভমুহূর্ত হয়তো আর কোনোদিন ফিরে পাওয়া যাবে না। অতএব আজ রাত্রেই—এখনই।

রাত শেষ হয়ে এসেছে। এর পর চরাচর জেগে উঠবে। নবসূর্য উঠবে তার আলোর উৎস নিয়ে। সে-আলোকে অন্তরের সব উৎসাহ সকল বলিষ্ঠতা নিভে যাবে হয়তো।

বিনিদ্র শয্যা ছেড়ে সে উঠে বসল।

এ ঘরেই—ওই কড়িকাঠের সঙ্গে! না, ঘরটাকে কেন কলুষিত করে যাবে? তার মৃত্যুপ্রেতায়িত এ ঘরে ভবিষ্যতে কেউ হয়তো থাকতে চাইবে না। আত্মহত্যার স্মৃতিমন্দির হয়ে না-ই রইল ঘরখানা।

লম্বা দড়িগাছা হাতে নিয়ে দরজা খুলে সে বেরিয়ে এল। উঠোনে দাঁড়িয়ে একবার আকাশের দিকে চাইল—আজন্মপরিচিত মহাকাশ। একটি দীর্ঘনিশ্বাসের উদ্‌গম বোধ করে সে সবলে গা ঝাড়া দিয়ে নিল। খিড়কিদরজা খুলে বরাবর এসে সে পুকুরধারে দাঁড়াল। বাড়িটির ছায়ামূর্তির দিকে দৃষ্টি মেলে দিল। পিতামহের আমলের জীর্ণ বাড়ি দেখলে মায়া হয়। মায়া! সে মায়ায় তার জন্য আছে শুধু দাবদাহের জ্বালা।

শুধু বাড়ি কেন, বিশাল বিশ্বের কোথায় আছে তার জন্য এক বিন্দু শীতলতা! সর্বত্র বহ্নিদাহ। রক্তমাংসের মানুষ এখানে বাঁচতে পারে কেমন করে?

দড়িটা কি খুব সরু হল? সরুই ভালো। বেশি মোটা হলে ফাঁস কষে পড়তে দেরি হয়ে কষ্ট দেবে। শক্ত আছে তো? দড়িটা সে টেনে দেখল, বেশ শক্ত আছে।

মোটা আমগাছের উঁচু ডালটাই পছন্দ হল। কিন্তু আমগাছটিকে সে কলঙ্কিত করে যাবে? তার মৃত্যুর পরে হয়তো ওর নাম হবে 'গলায় দড়ির আমগাছ'। কেউ হয়তো গাছটার আম খেতে চাইবে না। না-ই বা চাইল খেতে। তার নিজের যখন খাবার কোনো উপায় রইল না—বাঁচবার কোনো পথ রইল না জগতে, সে কেন ভাবতে যাবে জগত খেতে পেল, কি পেল না? শয়নগৃহের সেই কড়িকাঠেই গলায় দড়ি দিল না বলে তার আফসোস হতে লাগল।

এ আমগাছটাই তার পছন্দ হয়েছে—এ গাছের আম ভালো।

পূবের আকাশ লাল হয়ে উঠছে। আর সময় নেই। আগত ঊষার আলো ধরায় নামুক তার মৃত্যুবার্তা নিয়ে।

গাছের তলায় গিয়ে সে দাঁড়াল। গাছে উঠে ডালের সঙ্গে দড়ি বাঁধবে, সে দড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে নিচে ঝুলে পড়বে। কি জংগল গাছটার তলায়। দীর্ঘ ঘাসে একেবারে হাঁটু অবধি ঢেকে ফেলেছে।

ধরণীকে কি একবার শেষ প্রণাম করে নেবে? নাঃ, ধরণী তার কে?

গাছের গুঁড়িতে পা তুলতে যাবে, হঠাৎ পায়ের কাছে ফোঁস্ করে একটা শব্দ উঠল। সে আঁতকে উঠল। সর্বনাশ! এক কৃষ্ণনাগিনী ফণা বিস্তার করে তার হাঁটু সমান উঁচু হয়ে দুলছে। সে পিছিয়ে আসবার চেষ্টামাত্র করতেই মহারোষে সেই কেউটে সাপ তার পায়ে ছোবল মারল।

সে আর্তনাদ করে উঠল। তাড়াতাড়ি হাতের দড়ি দিয়ে দংশনক্ষত স্থানের একটু উপরে কষে বাঁধল—

কামালুদ্দিন বিহ্‌জাদ

শ্রীগুরুদাস সরকার

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পারস্যের কয়েকজন মরমী কর্ম্মোপদেশক, কবি, ও নীতিবেত্তা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হন। মজ্‌দদ্দিন অল্‌ বোগদাদী, ফরিদুদ্দিন আত্তর ও জালালুদ্দিন রুমী যথাক্রমে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় পাদে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। কবি ফরিদুদ্দিন আত্তর মরমী সন্তদিগের একখানি বিখ্যাত জীবনী সংগ্রহ রচনা করেন। জালালুদ্দিনের মস্‌নভি-ই-মা'নভি গ্রন্থ সুফিসম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে এখনও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বায়জাদের আবির্ভাব কালে মরমীদিগের প্রভাব যে বিশেষ কোনও কারণে অন্তর্হিত



৯নং চিত্র

হইয়াছিল এরূপ বিশ্বাসের হেতু দেখি না। যাহারই দ্বারা অঙ্কিত হউক না কেন, নীল আঙ্‌রাখায় আবৃত তনু এই উপবিষ্ট দরবেশ মূর্ত্তির কেবল রেখাচিত্র সাহায্যে যে অনুলিপি প্রদত্ত হইল তাহা বর্ণবিহীন হইলেও মূল-চিত্রের (১) বিশেষত্বের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতে সমর্থ হইবে। এ চিত্রখানি পঞ্চদশ শতাব্দীর বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে। ইহা হিরাটে অঙ্কিত হইয়াছিল।

(১) মূলচিত্রখানি ফরাসীদের "জাতীয় গ্রন্থাগারে" রক্ষিত আছে।

উজির মীর আলিশিরের ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে লিখিত "রত্নমালা" নামক একখানি পুঁথি বড্‌লিয়ান গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। মীর আলি শির সুফী মতাবলম্বী ছিলেন এবং শেষবয়সে নক্‌বন্দিয়া নামক এক দরবেশ দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় একজন হিতকর্মী পৃষ্ঠ-পোষকের প্রীতি সম্পাদনের জন্য বায়জাদের পক্ষে একজন দরবেশের মূর্ত্তি অঙ্কন অনুমানমূলক বলিয়া বিবেচিত হইলেও একবারে যে অসম্ভব এ কথা বলা যায় না।

হিরাটের চিত্রকরেরা অনেকেই সুফী সম্প্রদায়ের মতানুবর্ত্তী ও সমর্থক দিগের জন্য বহু ক্ষুদ্রক চিত্র অঙ্কন করিতেন। এ সম্পর্কে তৎকালীন পরিস্থিতির বিষয় একটু উল্লেখ প্রয়োজন। বিদেশী সৈন্য তখন দেশের ভিতর



১০নং চিত্র

আস্তানা গাড়িয়া বসিয়াছে, আর দেশময় খণ্ডযুদ্ধের ফলে চারিদিকেই অশান্তি বিরাজিত। এ সময়ে যে মতবাদ মানসিক শান্তির সন্ধান দেয়, সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মন যে সে দিকে আপনা হইতেই জীবিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বায়জাদ ছিলেন মতবাদ বিষয়ে সম্পূর্ণ রক্ষণশীল: সুফী সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার কোনও যোগাযোগ ছিল না। তাই মীর আলি শিরের রত্নমালার চিত্রগুলি যে তাঁহারই রচিত এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। আলিশির নিজেই একজন দক্ষ চিত্রকর ছিলেন। অপর শিল্পের সাহায্যে লওয়ায় তাঁহার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

সে যুগের সুফীভাবাপন্ন চিত্রগুলিতে কোথাও দরবেশদিগের নানা ভঙ্গীর নৃত্য, কোথাও বা উক্ত সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের সভাস্থলীতে বাদানুবাদ বেশ স্বাভাবিকভাবেই চিত্রিত হইয়াছে। শেষোক্ত প্রকারের একখানি চিত্রের নিম্নভাগে পারসীতে লেখা রহিয়াছে—"দরবেশদিগের সংসর্গ সাক্ষাৎ স্বর্গ বা স্বর্গতুল্য; তাঁহাদিগের সঙ্গ মিলিলে আর কিছুই অপূর্ণ থাকে না। এ সকল চিত্রপটের কোনও কোনও খানি বায়জাদের দ্বারা অঙ্কিত হওয়া অসম্ভব না হইলেও এতৎসম্পর্কে কোনও নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায় না।



৮নং চিত্র

পূর্ব্বোক্ত চিত্রগুলি যাহার দ্বারাই অঙ্কিত হউক না কেন, পারস্যের শিল্প ধারায় সুফী ভাবোন্মেষ যে বৈশিষ্ট্য আনয়ন করিয়াছিল তাহার যথার্থ উপলব্ধি হয় আর এক শ্রেণীর চিত্র দেখিলে। এই সকল চিত্রপটে শিল্পী যেন দর্শকের হৃদয়ের উল্লাস ও তাঁহার নয়নোৎসবের পরিপূর্ণতা সম্পাদনের জন্যই বদ্ধপরিকর। সুদৃশ্য কার্পেট, সুচিত্রিত টালি (tiles), খিলানের উপর সুকৌশলে উৎকীর্ণ, প্রসাধক অলঙ্কার স্থানীয়, সুন্দর সুন্দর লিপি, নানান্ ছাঁদের নক্সা কাটা শোভন কারুশিল্পের নিদর্শন, সব কিছুই চিত্রপটে স্থান পাইয়াছে। গাছ আছে, পাহাড় আছে, তাহার উপর গেজেল মৃগ আছে, আর আছে রূপালী কাণ্ডবিশিষ্ট চেনার বৃক্ষ। এ গুলিকে নিসর্গ চিত্র না বলিয়া সুন্দর প্রাকৃতিক প্রতিবেশের মধ্যে আত্মসমাহিত হওয়ার আমন্ত্রণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। (২) হাফিজের কবিতার ন্যায় এ সকল চিত্রের একটা গূঢ় অন্তর্নিহিত প্রেরণা আছে, চিত্রকর অনেকসময় হয়তো সে গূঢ়ার্থ নিজেই বুঝিতে পারেন নাই। শিল্পের সহিত সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য এবং জীবনের সহিত ও সে সম্পর্ক স্বল্প নিবিড় নয়। যে প্রশান্তি যে সৌম্যভাব, আমরা জীবনে কাম্য বলিয়া মনে করি, শিল্পেও তাহার প্রস্ফুরণ সমভাবেই প্রার্থনীয়। শিল্পী চিত্রপটে যে সংযম (repression) স্বতঃই অবলম্বন করিয়া থাকেন, কতকাংশ অপ্রকাশ রাখিয়া দ্রষ্টার কল্পনা বিশেষভাবে উদ্রিক্ত করেন, সেই নিরোধনকে শুধু শিল্পের নহে, জীবনেরও গূঢ়তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে হয় (৩)। শিল্পীর স্বাধীনতা যেখানে অব্যাহত থাকে সেইখানেই কেবল এ সত্যের সার্থকতা দৃষ্ট হয়। শুধু ফরমায়েসী চিত্রের যোগান দিতে গেলে কৃত্রিমতা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে, তখন এ সকল সূক্ষ্মতত্ত্বের মর্ম্ম আর সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না।

আর একখানি ক্ষুদ্রক চিত্রশোভিত পুঁথির কথা উল্লেখ করিলেই সমকালীন পুঁথিতে বায়জাদের চিত্রসন্নিবেশের নির্ঘণ্ট একরূপ পরিসমাপ্ত হয়। ইহা ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত নিজামী কবির খামসা গ্রন্থের একখানি পুঁথি (Or. Ms. 6810)। নিজামী জীবিত ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত (খৃঃ অঃ ১১৪২—১২০৩), আর এই পুঁথিখানি লিখিত হয় খৃঃ ১৪৯৪-১৪৯৫ অব্দে। ইহাতে বায়জাদ মিরেক্, ও কাশিম আলি এই তিনজন ওস্তাদেরই নামাঙ্কিত বিভিন্ন চিত্র স্থান পাইয়াছে। ছবিগুলি দেখিলেই সেগুলি যে দুই তিন হাতের আঁকা তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। নামলিখনের ভঙ্গী সমকালীন লিপিরচনার অনুরূপ প্রধানতঃ এই হেতুবাদে আব্ টমাস আর্ণাল্ড বায়জাদের নাম লেখা চিত্রগুলি তাঁহারই স্বহস্তে অঙ্কিত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যে একটা মতভেদও রহিয়াছে তাহা উল্লেখ না করিলে সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হইবে। কেহ কেহ বলেন যে এ বায়জাদ লোকপ্রসিদ্ধ কামালুদ্দিন বায়জাদ নহেন, বায়জাদ নামেরই অপর এক ব্যক্তি, যিনি ১৫০৭-৮ খৃঃ অব্দে সম্রাট বাবরের সহিত কাবুলে গিয়াছিলেন এবং ১৫১০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভারত সম্রাট রূপে বাবর দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন খৃঃ অঃ ১৫২৬ হইতে ১৫৩০ পর্য্যন্ত।

বাবর যে শিল্পীশ্রেষ্ঠ বায়জাদের চিত্রাদির সহিত সুপরিচিত ছিলেন তাহা সন্দেহাতীত বলিয়াই মনে হয়। তিনি বায়জাদের অসামান্য প্রতিভা ও সূক্ষ্ম কলাকৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। আবার সমঝদারের ভঙ্গীতে বায়জাদ অঙ্কিত শ্মশ্রুসমাবৃত মুখগুলির যথেষ্ট সাধুবাদ করিলেও তিনি চিত্রার্পিত শ্মশ্রুবিহীন মুখগুলির চিবুক রেখার আতিশয্য (exaggeration of the lines of the chin) দোষটিও উল্লেখ করিতে ছাড়েন নাই। যাউক সে কথা। (Or. Ms. 6810) প্রাগুক্ত পুঁথির ছবিগুলির মধ্যে যে কয়খানিতে বায়জাদের নাম অঙ্কিত আছে সেই কয়খানিই অধিক প্রাণবন্ত। কোন কোনও ছবিতে বায়জাদের নামছাড়া কাশিম আলির নাম ও সূক্ষ্মাক্ষরে লিখিত আছে—এই কারণে প্রকৃতরূপকারের সনাক্তকরণ লইয়া গোল করিয়াছে কিছু। হয় তো বায়জাদের এ কয়খানি চিত্র কাশিম আলিই সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন! একই কেন্দ্রে একই চিত্রশালার বিভিন্ন চিত্রকরের মধ্যে এরূপ সহযোগিতা থাকা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। (ক্রমশঃ)

(২) এ, উউ, পোপ, Introduction to Persian Art (1. 233) সুফী চিত্রের নমুনা স্বরূপ দুইখানি চিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন—একখানিতে চিত্রকর আত্মবিস্মৃতি হইয়া চিত্রাঙ্কন কার্য্যে নিরত, অপর চিত্রখানিতে কবি রম্য উদ্যানে উপবিষ্ট। উভয় চিত্রেই স্বাভাবিকতা, ও গাম্ভীর্য্য, ও অচাপল্য, অন্তর্নিহিত ধর্ম্মপ্রাণতার সহিত যেন কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে সমাবেশিত রহিয়াছে। শেষোক্ত চিত্রখানি (Poet in a garden) বষ্টনের ললিত শিল্প সংগ্রহাগারে (Museum of fine art Boston) রক্ষিত আছে। আমরা আলোকচিত্র হইতে উহার একখানি প্রতিলিপি

(৩) Lionel de fonseka, La verite daus l'art, p, 82.

দড়ি

শ্রীকমল মৈত্র

সতীশকে ঠিক কোন নাটকের বিশিষ্ট গ্রাম্য চরিত্রের নিখুঁত সংস্করণ বলেই মনে হচ্ছিল যখন সন্ধ্যার সময় দুই হাতে দুই থলি নিয়ে শ্রান্তভাবে দরজায় সে মৃদু করাঘাত করল। পায়ে অবশ্য স্যাণ্ডাল ছিল, কিন্তু পথের ধূলা ঠেলে উঠেছে হাঁটুর উপর। কাপড়টাকে বাঁচাতে গিয়ে হাঁটুর উপর শক্ত করে বেঁধেছে। পরিচয় না দিলে বোঝবার উপায় নেই যে ও সতীশ নাগ—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা ছাত্র, গ্রামের স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক; বড় জোর মনে হবে সম্ভ্রান্ত একজন চাষী।

দরজায় টোকা মেরে শান্তকণ্ঠে সে ডাকল—'মীনা'। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটী তরুণী শাড়ীর আঁচল জড়াতে জড়াতে দরজা খুলে দেয়।

"ইস্, এ কি চেহারা হয়েছে তোমার!" সমবেদনায় মীনা ভেঙ্গে পড়ে, "চল—" থলি দুটো তার হাত থেকে নিয়ে রান্নাঘরে রাখতে যায়। জ্বলন্ত উনুনটার উপর চট্ করে চায়ের জল বসিয়ে দিয়ে স্বামীর পাশে এসে নিঃশব্দে পাখা করতে থাকে।

"মুখ হাত ধুয়ে নাও, সরবং এনে দি—" হঠাৎ এক সময়ে মীনা বলে উঠে। ওদিকে জল নিশ্চয় ফুটে গেছে এতক্ষণ। চায়ের অভাব সে বিকাল থেকে বোধ কচ্ছে। গ্রাম সম্বন্ধে একটু বেশী রকম সচেতন, কারণ সব সময়ে চা পাওয়া যায় না, ভাল চায়ের তো কথাই নেই। মীনা সমস্ত কিছুই ত্যাগ করতে পারে চায়ের বিনিময়ে; এমনি নেশাখোর সে চায়ের ব্যাপারে।

সরবতের গ্লাসটা সতীশের হাতে দিয়ে রান্নাঘরে চলে যায় ত্বরিতপদে। জল ফুটে গেছে। স্বামীর আনীত থলি থেকে চায়ের প্যাকেট বার করতে বসে। নানা রকমের সব্জী—আলু, পটল ইত্যাদি বেরিয়ে এল; কিন্তু চা কৈ? অপর থলিটাও অধীর আগ্রহে উপুড় করে দিল; না, চা আসেনি। সেখান থেকে সে জিজ্ঞাসা করল—"চা আননি নাকি?"

সরবতের গ্লাসে সবেমাত্র চুমুক দিতে যাচ্ছে সতীশ, মীনার প্রশ্নে তা আর সম্ভব হল না। তাইতো, চায়ের কথা সে একেবারেই ভুলে বসে আছে! বাজার যাবার সময় মীনা কতবারই না স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কি উত্তর দিবে সে? এর পরিণামের কথা ভাবতে ভাবতে আসন্ন ঝড়ের অপেক্ষায় বসে রইল।

স্বামীর এই অনিচ্ছাকৃত ভুলকে তুচ্ছ জ্ঞান করে মীনা উড়িয়ে দিতে পারত যদি এই ভুলটা চায়ের বেলায় না হত! তার উপর যখন সে দেখল চায়ের পরিবর্ত্তে এসেছে গজ ছয়েক দড়ি তখন সে উঠল জ্বলে! দড়ি কি হবে? একবারও সে দড়ি আনতে বলেনি তাকে! দড়ি আনবার তবে কি উদ্দেশ্য? হঠাৎ তার মনে হল—তার স্বামী ইচ্ছা করেই চায়ের পরিবর্ত্তে 'দড়ি' এনেছে তার অতিরিক্ত চা প্রীতির উপর বিদ্বেষ দেখিয়েই। ভাবতেই মুহূর্ত্তের মধ্যে বদলে গেল সে। সতীশের কাছ থেকে যখন সে গিয়েছিল সরবং দিয়ে, তখন ধীর, নম্র, কর্ত্তব্যপরায়ণা আদর্শ স্ত্রীর মতই? কিন্তু ফিরে এল কলহপরায়ণা রণমূর্ত্তি হয়ে। কোমরে আঁচল জড়ানো যেন 'যুদ্ধং দেহী' ভাবটা! অপরাধীর মত সতীশ চুপ করে বসে রইল, ভুলে যাওয়ার জন্য বেশ বিনয়ের সঙ্গে মার্জ্জনা ভিক্ষার কথাই ভাবছিল সে। তাকে বলবার সুযোগ না দিয়ে মীনা সামনে এসে দাঁড়ায়—"এটা কি জন্যে এনেছ বলতে পার?" রাগে মীনার স্বর পর্য্যন্ত বদলে গেছে যেন। সতীশ দেখে মীনার হাতে 'দড়ি'! দড়ি আনার ইতিহাসের কথা স্মরণ করবার চেষ্টা করে সতীশ। তার বন্ধু গোবিন্দবাবু খানিকটা 'দড়ি' কিনে সতীশকে নিতে বলেছিলেন কারণ অমন শক্ত ও মজবুত দড়ি নাকি এ অঞ্চলে আর পাওয়া যাবে না। কিছু বিবেচনা না করেই সতীশ কিনে ফেলেছিল খানিকটা দড়ি। সত্য গোপন করে সতীশ উত্তর দেয়, "দড়ি! ওঃ—দড়ি? হ্যাঁ, কিনে আনলাম।—কাজে লাগবে।"

—"কি কাজে লাগবে বলত?" মীনা অধৈর্য্য হয়ে উঠে।

—"এই—ধর, কাপড় টাপড় শুকোতে দেওয়া—"

সতীশের মনে পড়ে যায়—মীনা তার খাটিয়েছে উঠানে কাপড় শুকোবার জন্যে। একটু ভেবে সতীশ আবার বলে, "আরে, বিছানা বাঁধতেও লাগতে পারে।"

—"কত টুর করেন উনি! তবু যদি দুটো হোল্ডল না থাকত!" তাইত! সতীশ আর ভাবতে পারে না। আর কিইবা প্রয়োজন আছে দড়ির?

মীনা নিজের ভাগ্যকে, নারীজন্মকে ধিক্কার দিতে দিতে চলে যায় সেখান থেকে, স্বামীর এই প্রচ্ছন্ন উপেক্ষায় সে মর্ম্মাহত। ফুটন্ত জল রান্নাঘরের নালায় ফেলতে ফেলতে রাগ হল তার নিজের উপর; নিজের ঐ অতিরিক্ত 'চা প্রীতির' উপর, কেন

সে চা খাওয়া ছেড়ে দিতে পারে না? স্বামী তো চা না খেয়ে দিব্যি বেঁচে আছে।

সাময়িক মেঘ হয়ত কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যেত, কিন্তু সতীশের সামান্য ভুলের জন্যই তা আর সম্ভব হল না; বরং আরো গুমোট হয়ে উঠ্‌ল, খেতে বসে সতীশ ব্যাপারটাকে পাকাপাকিভাবে চাপা দেবার জন্য খুব কোমল কণ্ঠে বললে, "মীনু, ও নিয়ে মন খারাপ কোর না; ছ' আনার জিনিষ! তাছাড়া বিদ্যাসাগরের কথা স্মরণ আছে তো? কোন জিনিষের কখন প্রয়োজন হয় আগে তা জানা যায় না। তবে সংসারে সব জিনিষেরই প্রয়োজন আছে।"

—"হ্যাঁ, আমার গলায় দড়ি দেবার সময় লাগবে বৈকি!" মীনা ভগ্নকণ্ঠে কথাটা বলে বাহিরে এসে চুপ করে বসে রৈল। সতীশ আর কোন কথা না বলে নীরবে আহার শেষ করে নিজের ঘরে চলে যায়। ঘরে ঢুকেই কিন্তু তার মনটা আবার ব্যাথায় ভরে উঠে। আজ তার বিবাহের তৃতীয় বার্ষিকী। সেই জন্য স্কুল থেকে বিকেলে কিছু ফুল এনেছিল সতীশ, মীনাও সেগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। আজকের এই স্মরণীয় রাতটা ব্যর্থ হয়ে গেল—সামান্য—অতি সামান্য ভুলের জন্য।

তুচ্ছ একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে মীনা এমন স্মরণীয় রাতটাকে উপেক্ষা করে অভিমান করে থাকতে পারে, আর সে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। আলো নিভিয়ে সে শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে আজকের ঘটনাটিকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করছিল। মীনা এল ঘরে। কোন কথা না বলে বিছানার এক পাশে সঙ্কুচিত হয়ে শুয়ে পড়ল। সতীশের হঠাৎ একটা দিনের কথা মনে পড়ে যায়; বিয়ের রাতের কথা! সেদিনও সে প্রথমে এইরকম ভাবে নির্বাক ছিল। কিন্তু সেদিন আর আজ? সেদিনের নীরবতার পিছনে ছিল লজ্জা আর সঙ্কোচ, আর আজ রয়েছে রাগ ও দুর্জ্জয় অভিমান! পাশ ফিরে সতীশ—অযাচিতভাবে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে—বেশ চাপা গভীর নিঃশ্বাস!…

শীতের স্তব্ধ রাত্রি। সতীশ ক্লান্ত—কখন ঘুমিয়ে পড়ে বুঝতে পারে না। হঠাৎ সে উঠে বসে ঘুমের মাঝেই। স্বপ্ন দেখেছে সে—বিশ্রী একটা স্বপ্ন! স্কুলে সে পড়াচ্ছিল একজন এসে খবর দিল যে, মীনা গলায় দড়ি দিয়েছে। ভয়ে ভয়ে একবার বিছানার দিকে তাকায়! না, মিনু ঘুমুচ্ছে। তাহলে স্বপ্নই। উঃ, ভীষণ ভয় হয়েছিল। শীতের রাত্রিতেও সে ঘেমে উঠেছে, স্বপ্নের ঘোর কেটে যাবার পর সে ভাবে, মীনা যা অভিমানী মেয়ে, স্বপ্নকে সে সত্যে পরিণত করতে পারে। কাজ নেই ঐ দাড়গাছাটা বাড়ীতে রেখে। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে চলে আসে। 'দড়ি'টা রাস্তায় ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে আসে।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মীনাও স্বপ্ন দেখছে। সামান্য কারণে স্বামীকে কষ্ট দেওয়ার ফলে সে নাকি বিষ খেয়েছে। ঘুমের ঘোরেই মীনা বলে উঠে, "না গো না—আর কিছু বলব না—" পাশ ফিরে ঘুমের ঘোরেই হাতদুটো বাড়িয়ে দেয়—গিয়ে পড়ে সতীশের বুকের উপর।

সতীশ আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠে। তাহলে মীনারও অভিমান ভেঙ্গেছে। সাদরে তার কপালে চুম্বন এঁকে দিতে দিতে বলে, "ছাড় মীনু, চুলগুলো—" সতীশের কথা থেমে যায় হঠাৎ। মীনা ঘুমের ঘোরে কথা বলছিল; সে জাগ্রতা নয়!…

• • • •

পরের দিন স্কুলে যাবার সময় মীনা হাসতে হাসতে এসে বলে, "কালকের সেই দাড়টা কোথায় গো?"

—"কেন?" সতীশ ভয় পায় আবার দড়ির খোঁজ হওয়াতে।

—"ভয় নেই, গলায় দড়ি দেব না।" খিল খিল করে হেসে উঠে মীনা, "ইদারার দড়িটা ছিঁড়ে গেল এইমাত্র বদলাতে হবে। ভাগ্যিস কাল দড়িটা এনেছিলে—"

—"ওঃ, আমি তো জানিনা সেটা কোথায়।"—সতীশ জামাটা গায়ে দিয়ে পথে নেমে পড়ে।

সহজ পথে

শ্রীজগদাশ গুপ্ত

এই দেশেতে মরি যেন, ইহা বলাই বৃথা,
অন্য দেশে মরতে হবে, অনর্থক এ-ভয়;
এই দেশেতেই হরিনাম, এই দেশেতেই গীতা;
দেশান্তরে গিয়ে মরার খরচ অতিশয়।
এই দেশেতেই মরা সহজ রোগে অনাহারে—
আঁত্‌কে' উঠে' অবাক হবে এমন ত' কেউ নাই;
মরে'ই আমরা অব্যাহতি ভূমানন্দ চাই।
এই দেশেতেই মরি যেন, অকারণেই বলা—
বাপ্‌ পিতাম' রেখে' গেছেন বেঁচে থাকার কাল;
শৈশব থেকে স'য়ে আসছে মরার পথে চলা—
বাছাবাছির ধার ধারি না অকাল কি কাল!
এই দেশেতে একদা যে জন্ম নিলাম আমি—
সুখ সেটা নয়; সুখের বলে' মরণটাই দামী।

সভ্যতার বাইপ্রডাক্ট

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত এম্-এ

নিউরেসিস্ বা স্নায়বিক রোগ আমাদের সভ্যজগতে আজকাল প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। কৃষ্টি ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সম্মুখে অসংখ্য সমস্যা ও জটিলতার উদ্ভব হ'য়েছে। এরি সম্মুখীন হ'য়ে মানুষের "মন" নামক পদার্থটী নানা ঘাত ও প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে কত না অশান্তির জাল বুনে চলেছে। কত না বলিষ্ঠ নরনারী এ দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হ'য়ে অসহায় তৃণের মতো কোথায় ভেসে গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এ অশান্তির আশ্রয়ে মনের অসুস্থতা ক্রমে মানুষের দেহকেও আক্রমণ করেছে, সহায়তা করেছে নানা রোগের সৃষ্টি করতে। সভ্যতার ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রোগ শোক, দুঃখ বেদনাও যেন আনন্দ ও সুখ-স্বপ্নের মতোই ওতপ্রোতভাবে তীব্র হ'য়ে উঠেছে। বাহ্যিক রোগকে দমন করতে নানা চিকিৎসার সুব্যবস্থা হ'য়েছে সন্দেহ নেই, বড় বড় ডাক্তার, ভালো ভালো ওষুধেরও অভাব নেই, কিন্তু মনকে ঘিরে যে তীব্র ব্যথা বেদনা গুপ্ত হ'য়ে প্রতিমুহূর্ত্তে মানুষকে তুষানলের মতো দহন ক'রে চলেছে—তার প্রতিকারের পথ কোথায়? এ আত্মঘাতী মনের অসুখকে নিয়ে বিশেষ ক'রে যে দু'জন মনীষী তাঁদের গবেষণার ফলে আমাদের এ অন্ধকার থেকে আলো দেখিয়েছেন তাঁরা হ'লেন—প্রফেসর ফ্রয়েড্ (Prof. Freud) এবং ডাঃ জাঙ্গ (Dr. Jung). মনীষী ফ্রয়েড্ বলেন : মানুষের কোনো আশা আকাঙ্ক্ষা যখন তার মনের কোণে দ্বন্দ্ব এনে দেয় এবং সে যখন তার অন্তরের একান্ত আশাটি তার অবচেতন মনে ঠেলে দিয়ে তাকে দমন ক'রে ভুলে যাবার চেষ্টা করে—তখন আসে বিরোধ। সে বিরোধের সম্মুখে প'ড়ে মানুষের অন্তর্জগতে হয় এক আলোড়নের সৃষ্টি। এই আলোড়নের ভিত্তি থেকেই মানুষের মনের এ অসুখের সৃষ্টি। Dr. Emanuel Miller তাঁর প্রবন্ধ Neurosis and civilization এও বলেছেন : "For Freud too, and more intensively, traces all human behaviour, both group and individual, from the operation of instinctual appetites and the way in which these instincts are aided and frustrated by the impact of human beings one upon another."

আমরা সাধারণতঃ মনে ক'রে থাকি যে, যে কোনো শোক-দুঃখের ঘটনা প্রবাহকে ভুলে থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু বিস্মৃতির অতলগর্ভে স্মৃতিগুলিকে ডুবিয়ে দিয়েও আমরা নিস্তার পাইনে। ভুলে যাওয়া সে তো সহজ কথা নয়! আপাতঃ দৃষ্টিতে যাকে আমরা মনে-না-থাকার ভাণ করি, সে তো ভুলে যাওয়া নয়। মনের নিভৃত কোণে তার বিজয় বৈজয়ন্তী নিত্যকালের মতো উড্ডীয়মান। ক্ষণিকের বিস্মৃতির অন্তরালে মনের সান্ত্বনাটুকুই হয়তো আমাদের যাত্রাপথে শান্তি এনে দেয়। ভুলে যাওয়া মিথ্যা কল্পনার আবরণে মানুষ শুধু পথ চলে। মনীষী ফ্রয়েড্ (Freud) বলেন : An idea entered into the ego of the patient which proved to be unbearable and evoked a power of repulsion on the part of the ego, the purpose of which was a defence against the unbearable idea. The defence actually succeeded and the idea concerned was crowded out of consciousness and out of memory so that its psychic trace could not apparently be found *yet this trace must have existed*. বস্তুতঃ মনের অন্তরালে স্মৃতির চিহ্ন একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় না,—সে তার আসন প্রদীপ্ত কোরে অনেক সম্ভাবনা নিয়েই প্রতীক্ষায় থাকে।

হয়তো মনের ঐকান্তিক সামঞ্জস্যের ফলে মানুষ চায়—কোনো একটা ঘটনা চক্রের সঙ্গে নিজেকে লিপ্ত ক'রে দিতে। কিন্তু সে ঘটনা হয়তো অপ্রীতিকর, সাধারণ সামাজিক আবেষ্টনের বিরুদ্ধাচরণ। তবুও মানুষ চায় তাকে একান্তভাবে পেতে। এ কল্পনাকে ব্যাহত করার পথেই আসে তার জীবনের চরম দ্বন্দ্ব। এখানে দু' একটি উদাহরণ দিয়ে এর স্বরূপ উপলব্ধি করার চেষ্টা করবো।

ধরুন,—একটি লোক প্রলুব্ধ হ'য়েছে আর একটি লোকের সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি। সে চায় একান্তভাবে সে নারীকে জয় করতে, তার রঙিণ কল্পনা বলাকার মতো উড়ে চলে নানা আশার জাল বুনে। কিন্তু সমাজের বিধি নিষেধ লঙ্ঘন ক'রে অন্তরের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তার দুঃস্বপ্ন হ'য়ে দাঁড়ায়। একদিকে সমাজের বিধি নিষেধ, নীতি—আর একদিকে তার ভালোবাসা—এ দু'এর বিরোধ তার অন্তরকে ব্যথিয়ে তোলে, এনে দেয় অন্তরে এক সুতীব্র আলোড়ন, মনের পরে ধরে ভাঙন।

* * * * *

একটি লোক শৈশব থেকে চুরি বিদ্যায় হাত পাকিয়েছে। আকস্মিক পরিবর্ত্তন এলো তার মনে। চুরি ছেড়ে—ধর্ম্ম নিয়ে উঠ্‌লো সে মেতে। বছরের পর বছর অতীত হ'য়ে যায়। ধর্ম্ম-কর্ম্মে মন তার উজাড় ক'রে দেয়; কিন্তু কোন্ অবসর ক্ষণে শৈশবের স্মৃতি তার মনকে ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে, ভুলতে পারে না সে তার অতীতের অসাধুতার আর কপটতার কথা। তার অন্তর জ্ব'লে যায় তীব্র অনুশোচনায়, অতীতের ইতিহাস অবচেতন মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারে না। তাকে ব্যথিয়ে তোলে।

* * * * *

অলকা ভালোবেসে তৃপ্তি পায় নীরেনকে। দিনের পর দিন অলকার ভালোবাসা গভীর হ'য়ে ওঠে। তার জীবনে নীরেনের আগমন একদিন মধুর হ'য়ে উঠবে—এ কল্পনা অলকাকে পাগল ক'রে দেয়। প্রতিদিন নীরেনের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হ'য়ে থাকে অলকা। প্রেম তার পরিণয়ে সাঙ্গ হ'বে, অলকার এই আশা। হঠাৎ অলকার কল্পনায় বাধা এলো, নীরেনের বিয়ে হ'লো জনৈকা সুনন্দার সঙ্গে। অলকা তার পরাজয়কে ঢাকতে চাইলে নীরবে, তার অন্তরের বাসনা চেতন থেকে অবচেতন মনে দিলে ফেলে, বিস্মৃতির মাঝে সে চাইলে মুক্তি। কিন্তু অবচেতন মনে তার অন্তরের যে ব্যর্থতা পুঞ্জীভূত হ'য়ে রইল, জীবনের প্রতি মুহূর্তে তা' তাকে পাগল ক'রে দিতে চাইলে।

* * * * *

একটি হোটেলে থাকেন একটি তরুণী। তারি পাশের ঘরে থাকেন একটি সুন্দর তরুণ। উভয়ের দৃষ্টি উভয়কে এড়ায়নি। তরুণীর ভালো লাগে তরুণটিকে। কথা বলতে আনন্দ পায়। তরুণের চলা-ফেরা তরুণীকে প্রচুর তৃপ্তি দেয়। তরুণ একদিন গিয়ে প্রবেশ করেন তরুণীর ঘরটিতে। তরুণী তাকে অভ্যর্থনা করেন মনের আনন্দে। তরুণীরই হাতের তৈরী একটি সুন্দর টেবিল ক্লথের (Table Cloth) উপর নজর পড়ে তরুণের। খুশিতে ভরে ওঠে তরুণীর বুক, হাতের তৈরী টেবিল ক্লথটি উপহার দেন তরুণটিকে। তারপর ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বেড়ে যায়। পাহাড়ে পাহাড়ে উভয়ের অবাধ ভ্রমণ চলে। একের সান্নিধ্য অপরের কাছে মধুময় হ'য়ে ওঠে। একদিন তরুণ নিরোদ্দেশ হ'য়ে উধাও হ'লেন। তরুণীর মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠ্‌লো—তবু অন্তরে ফল্গুধারার মতো ভালোবাসা তাঁর বেঁচে রইলো। তিনি চাইলেন সব মুছে দিয়ে, আবার নতুন ক'রে বাঁচতে। কিন্তু অবচেতন মন থেকে তাঁকে প্রতিমুহূর্তে দিলে আঘাতের পর আঘাত।

মনের ভেতর যে অশান্তির আগুন ক্ষণে ক্ষণে তরুণীকে অশান্ত ক'রে বিমর্ষ ক'রে তুললো, তাতে তিনি পাগল হ'য়ে গেলেন। দেখা যেতো এরপর থেকে তিনি নীরবে বসে একান্তে শুধু টেবিল ক্লথ বুনতেই ভালোবাসতেন।

* * * * *

এ তো গেল সাধারণ কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। এমনি কতো ঘটনা আরও ঘটে চলেছে তার ইয়ত্তা নেই। তা ছাড়া কারো প্রিয়পাত্রের বা আত্মীয়-স্বজনের আকস্মিক মৃত্যুতে এমনি মনের উপর প্রক্রিয়া চল্‌তে পারে, যার ফলে মানুষের মনে এক অসুখের সৃষ্টি ক'রে তাকে উন্মাদ ক'রে দিতে পারে।

অনেক ছেলে ও মেয়েকে আজকাল বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ না হ'য়েই পথ চল্‌তে হয়। ভালোবাসা মানুষের মানসিক ধর্ম্ম। বয়স্থা অবিবাহিতা মেয়ে ও বয়স্ক অবিবাহিত ছেলে অনেককেই স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় চিরন্তনী অন্তর্নিহিত প্রেম ও ভালোবাসাকে অন্তরের মণি কোঠায় উপেক্ষা ক'রেই পথ চল্‌তে হয়। তাদের প্রেম ও ভালোবাসার এ অপমৃত্যু অন্তরের নিভৃত কোণে যে দ্বন্দ্বের ও আলোড়নের সৃষ্টি করে—তা বলা বাহুল্যমাত্র। এ দমননীতির (repression) ফলে তাদের দৈহিক ও মানসিক অবস্থার যে পরিবর্ত্তন আসে তা' অবর্ণনীয়। দেহ শিথিল হ'য়ে আসে, অন্তরে প্রেরণা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়, ভগ্ন আর রুগ্ন দেহে মানুষকে শুধু হাহাকার করে ফিরতে হয়—অশান্তির বোঝা নিয়ে। নারীর মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা যেখানে মর্য্যাদা পায় না, সেখানে নারীর সকল সম্ভাবনাই ব্যর্থ হয়ে যায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মেজাজও রুক্ষ হয়ে আসে। স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে যেখানে মনের বাসনা চরিতার্থের পথে আসে বাধা, সেখানেই আসে দ্বন্দ্ব। সভ্যতার যাত্রা পথে এ সমস্যা ও জটিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। যখন মনের অসুখ প্রবলভাবে নাড়া দেয়, তখন এ মনের অসুখই বাইরে এসে আর একরূপ ধারণ করে। হয় তো হিস্‌টেরিয়া, পঙ্গুতা, হাত পা ফোলা কিংবা মাথার বিকৃতি একটা না একটা রোগ এসে আমাদের শরীরকে ধরে আঁকড়ে।

মনীষী ফ্রয়েড্ আরও বলেন যে, এ repression বা দমনই আবার অনেক সময় projection এ এসে দাঁড়ায়। তাই দেখা যায় অনেক অবিবাহিত পুরুষ বা নারী—পাখী, বেড়াল, কুকুর এমনি কতো কি লালন পালন ক'রে থাকেন। আর তাঁদের ভালোবাসা দিয়েই ওগুলোকে আদর যত্নে প্রতিপালন করেন। যে অন্তরের প্রেম ও ভালোবাসাকে তাঁরা অন্তরে জমাট ক'রে বেঁধে রেখেছেন—এ তারই একটা অভিব্যক্তি মাত্র। এটাই হ'লো Projection এর ফল। এর ভেতরই নিজেকে ডুবিয়ে রেখে তাঁদের হয় তো কতকটা সান্ত্বনা পাওয়ার প্রচেষ্টা।

মনীষী ফ্রয়েড্ মনের এ রোগের প্রতিকারের জন্য মনস্তত্ত্বের সাহায্যে আশানুরূপ ফল পেয়েছিলেন। মানুষের অবচেতনার গোপন ভাবধারাকে মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে চেতনায় পুনরায় ফিরিয়ে এনে, মানুষের এ গভীর আত্মঘাতী রোগ থেকে তাকে হাল্কা ক'রে মুক্ত ক'রে, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কৃতকার্য্য হ'য়েছিলেন।

নিউরেসিস্ রোগে আক্রান্ত হ'লে মানুষের ভেতর তিনটি উপসর্গ বিশেষ ক'রে দেখা দেয়। প্রথমতঃ মানুষ চিন্তান্বিত হ'য়ে নানা ভাবনায় হ'য়ে পড়ে বিমর্ষ, দ্বিতীয়তঃ ঘুমের ব্যাঘাত মনকে ক'রে তোলে বিদ্রোহী, তৃতীয়তঃ আহারে জন্মায় অরুচি। অতএব চিন্তাভাবনা, ঘুমের ব্যাঘাত ও অরুচি,—এ তিনের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক হ'য়ে চলতে হ'বে বিশেষ ক'রে। পুষ্টিকর খাদ্য বা ভিটামিনযুক্ত খাদ্যের প্রতি খুব নজর রাখতে হ'বে। আজিকার সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে যে সকল জটিলতার সৃষ্টি হ'য়েছে—তারি বাইপ্রডাক্ট রূপে এমনি কত রোগ শোক দুঃখের অধিকারী হ'য়ে দাঁড়িয়েছি আমরা। জীবনের চলার পথে প্রতিপদে নানা পরিবর্ত্তন এসে তীব্রভাবে মনের গণ্ডীটিকে দেয় আঘাতের পর আঘাত। আমরা অসহায় হ'য়ে পড়ি। কৃষ্টি ও সভ্যতার সঙ্গে এগুলোও আমাদের জীবনের পুরস্কার হ'য়েই দাঁড়িয়েছে।

শহরতলীর স্মৃতি

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ইদানীং পল্লী-অঞ্চলের পাঠাগারগুলির প্রচেষ্টায় শহরবাসী সাহিত্যিকগণ গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পেয়েছেন, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। প্রায়ই দেখি, দেশবরেণ্য মনীষীদের স্মৃতি-পূজা, বার্ষিকোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলিকে উপলক্ষ্য করে প্রত্যেক পাঠাগারের পক্ষ থেকেই সাহিত্য-সভার আয়োজন হয়, আর সেই সূত্রে শহরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের সাহচর্য্যে সভাকে জাঁকিয়ে তোলবার ধুম পড়ে যায়। এর ফলে, কস্মিনকালেও যে-সব শহরবাসী সাহিত্যিক পল্লীর সংস্পর্শে বড় একটা যেতে চাইতেন না, এক্ষেত্রে দায়ে পড়ে বা ভক্তবৃন্দের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়েই পল্লী-অঞ্চলে পদার্পণ করে রথ-দেখার আনন্দের সঙ্গে কলা-বেচার সুযোগটুকু পেয়ে তাঁরা নতুন পুঁজি নিয়েই শহরে ফিরেছেন, এমন উদাহরণও বিরল নহে। তা ছাড়া বহু পল্লীর সঙ্গে পরিচিত অনেক সাহিত্যিক-বন্ধুকে এই-ভাবে অদৃষ্টপূর্ব্ব কোন পল্লীর সংস্পর্শে গিয়ে নূতনতম কিছু দেখার আনন্দে অভিভূত হয়ে মুক্তকণ্ঠে সুখ্যাতি করতেও শুনেছি। 'আমরা একটু সুযোগ পেলেই নতুন কিছু দেখার আনন্দে বাংলার বাইরে ছুটে যাই ব্যয়ের ঘটা করে, কিন্তু বাড়ীর কাছাকাছি দর্শনীয় স্থানগুলির কোন খবর রাখি না, অথচ বাংলা দেশে এমন অনেক বিশিষ্ট অঞ্চল আছে—যেগুলি দর্শন করে আনন্দ-লাভের সঙ্গে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যেতে পারে।'—এই ধরণের অনেক কথাই সকলকে বিভিন্ন সভায় বলতে শুনেছি। সুতরাং সাহিত্য-সভাকে উপলক্ষ্য করে গ্রামাঞ্চলের সহিত শহরবাসী সাহিত্যিকদের এই মিলনী-ব্যাপারে প্রয়াস ও প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

পক্ষান্তরে এই মিলনী বৃহৎ সংহতিপুষ্টির প্রতীকরূপে আমাদের সামনে আশার আলোকপাতও করে। সংযোগ ঘনীভূত হলেই সংহতিতে পরিণত হয়, একের কল্যাণ তখন অন্যের কল্যাণকে আশ্রয় ক'রে পরিপুষ্ট হতে থাকে, একের সমস্যা অন্যের সমস্যার সঙ্গে জড়িত হয়ে জাতীয় কল্যাণের প্রকৃত রূপ দেখবার জন্য প্রত্যেকেই উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। সঙ্ঘশক্তি ক্রমশঃ যতই পরিণত ও উৎকৃষ্ট হতে থাকবে, ব্যষ্টির কল্যাণ ততই পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট হবে। এর ফলে গোটা বাংলার ভিন্ন ভিন্ন পাঠাগারগুলি এইভাবে সাহিত্যকে উপলক্ষ্য করে একদা পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধ হয়ে এক বিরাট দেহের অংশরূপে পরিণত হয়ে উঠবে, এমন আশাও করা যেতে পারে।

পাঠাগার সম্পর্কে উচ্চতম আশার কথা বলে এবার আলোচ্য প্রসঙ্গে আসা যাক—যে সূত্রে এর অবতারণা। কিছু পূর্ব্বে এমন এক পাঠাগারের বার্ষিকোৎসবে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পাওয়া গেল—কলকাতা শহর থেকে যার দূরত্ব বত্রিশ মাইলের বেশী নয়, কিন্তু গন্তব্য স্থানটিতে পৌঁছুতে দিনমানের প্রায় অর্দ্ধাংশ পথেই কাটবে এবং সেই দিনই শহরে প্রত্যাবর্ত্তনের কোন সম্ভাবনাই নেই।

স্থানটির নাম বুড়ুল, চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত একটি বিশিষ্ট নদীমাতৃক অঞ্চল। স্থানীয় যুবমঙ্গল পাঠাগারের বার্ষিকোৎসব উপলক্ষ্যেই এই আমন্ত্রণ। অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও উদ্যোক্তাদের আগ্রহে সভায় পৌরোহিত্য করবার ভার নিতে হয়। সাথী হন—শ্রীমান সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী এবং শ্রীমান বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত। পাঠাগারেরপক্ষ থেকে স্থানীয় কর্মী শ্রীমান অক্ষয়কুমার কয়াল এসে আমাদের নিয়ে যান। কথা থাকে, আর্ম্মেনিয়ান ঘাট থেকে হোরমিলার কোম্পানীর ঘাঁটালগামী ষ্টীমারে আমরা রওনা হব। সকাল সাড়ে আটটার সময় উক্ত ষ্টীমার জেটি থেকে ছাড়ে। পূর্ব্বে এই ষ্টীমার প্রত্যহই যাতায়াত করতো, যুদ্ধের দরুণ বর্ত্তমানে এক দিন অন্তর ছাড়ে ও ফেরে। সেই জন্যই যাতায়াতের এরূপ বিড়ম্বনা। এই ষ্টীমার ছাড়া ও গন্তব্য স্থানটিতে পৌঁছবার আরো ত্রিবিধ উপায় আছে। যথা—ট্রেণে উলুবেড়িয়ায় নেমে সেখান থেকে নৌকাযোগে; বজবজ থেকে বাসে আছিপুর নামক নৌঘাটায় নেমে সেখান থেকে নৌকায় এবং কালীঘাট-ফলতা লাইট রেলে ফলতায় নেমে সেখান থেকে নৌকায় যাওয়া। কিন্তু আরমেনিয়া ঘাট থেকে ষ্টীমারে যাওয়াই সব চেয়ে সুবিধাজনক। কথায় আছে—একা নদী বিশ ক্রোশ। ত্রিশ বত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করতে তাই ঝঞ্ঝাট এতো। যাই হোক, শহরের পথের ঝঞ্ঝাট—বিশেষ রকমের লরিগুলির উৎপাত কাটিয়ে আমরা যখন আরমেনিয়া ঘাটের জেটিতে এসে পৌঁছলাম, তখন ষ্টীমার ছাড়বার সময় হয়ে গিয়েছে। তবে আমাদের সৌভাগ্যক্রমে কতকগুলো সরকারী লটবহর নেবার জন্য ষ্টীমারকে আটকে রাখা হয়। স্থানীয় অনেকগুলি ভদ্রলোক ষ্টীমারের রেলিংয়ে ঝুঁকে সাগ্রহে আমাদের প্রতীক্ষা করছিলেন, দেখতে পেয়েই হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। আমরাও ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। ষ্টীমার ধরতে না পারলে অপর তিনটি পথের যে কোন একটি অবলম্বন করে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হোত।

প্রায় এক ঘণ্টা লেট করে ষ্টীমার ছাড়লো। দেখলাম, আমাদের মত আরো অনেকগুলি যাত্রীর পক্ষে এই অপ্রিয় ব্যাপারটি 'শাপে বরে'র পর্য্যায়ে পড়ে প্রীতিপ্রদ হোয়েছে। ষ্টীমার পেয়ে মুখে হাসি যেন ধরে না। ষ্টীমারখানির নাম "উর্ব্বশী"। এই লাইনের নাকি এখানিই ভালো ষ্টীমার। দেখলাম, নিচের ডেক এবং উপরের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বসবার পাটাতন ভরে গিয়েছে—পা বাড়াবারও যো নেই। এখানে কাঠের পাটাতন ছাড়া বসবার কোন আসন নেই। ইণ্টার এবং সেকেণ্ড ক্লাসে একই ধরণের খানকয়েক বেঞ্চি, উভয় শ্রেণীর মাঝখানে এক গাছা

মোটা দড়ির ব্যবধান। রেলিংয়ের গায়েই একখানি বেঞ্চি আমাদের জন্যে রাখা ছিল! সেখানে বসে তীরবর্ত্তী স্থানগুলি ভালো ভাবেই দেখা যায়।

ষ্টীমার ছাড়তেই দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরগুলিও আনন্দে দুলে উঠলো যেন। নদীর জলের সঙ্গে মানুষের—বিশেষতঃ বাংলা দেশের মানুষের মনের বুঝি একটা নিবিড় সম্বন্ধ আছে, তাই নদীর সংস্পর্শে এলেই তার জলের তালে তালে মনের মধ্যেও আনন্দ যেন উছলে উঠে। ষ্টীমার থেকে কলকাতা ও হাওড়ার শহরতলীর দৃশ্যগুলি চিত্রপটের মত চোখের উপর ভাসতে লাগলো। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ, খিদিরপুরের ডক পেরিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ষ্টীমার এসে মেটিয়াবুরুজের জেটিতে ভিড়লো। অযোধ্যার শেষ স্বাধীন নবাব ওয়াজিদ আলী শার নির্ব্বাসিত জীবন যাত্রার নিদর্শনগুলি বুকে ধরে আজও এই অঞ্চলটি দর্শনীয় ও স্মরণীয় হয়ে আছে। রাজ্যহারা নৃপতি দুর্ভাগ্যকে বরণ করেও নির্ব্বাসিত জীবনে যে অসাধারণ স্থাপত্য-কীর্ত্তির প্রভাবে এই অখ্যাত পতিত অঞ্চলটিকে বিখ্যাত নগরীতে পরিণত করতে সমর্থ হন—তার নিদর্শনস্বরূপ হর্ম্ম্যরাজি বিস্ময়ের সঙ্গে অন্তরকে বিষাদে আচ্ছন্ন করে!

মেটিয়াবুরুজের পরেই রাজাবাগান। শহরের এলাকা পেরিয়ে আমরা এখন চব্বিশ পরগণার গ্রামাঞ্চলে এসেছি। শোনা যায়, ভূ-কৈলাসের রাজাবাবুদের একখানি বাগানকে উপলক্ষ্য করে অঞ্চলটি রাজাবাগান আখ্যা পায়। কলকারখানার প্রাদুর্ভাবে এই স্থানটি শহরের মতই জমে উঠেছে। রাজাবাগানের বিপরীত দিকে নদীর অপর তীরে রাজগঞ্জের জেটি। স্থানটি হাওড়া জেলার অন্তর্গত একটি বাণিজ্য-প্রধান স্থান। এখান থেকেই আন্দুল ও মৌড়ী যাবার পথ। কল-কারখানা, গঞ্জ, হাট এবং আন্দুলের রাজা ও মৌড়ীর কুণ্ডুচৌধুরীদের জন্য রাজগঞ্জের প্রসিদ্ধি।

হাওড়া জেলার রাজগঞ্জ থেকে ষ্টীমার এবার চব্বিশপরগণার প্রসিদ্ধ অঞ্চল আকড়ার দিকে পাড়ি দিল। পূর্ব্বোক্ত রাজাবাগানের কয়েক মাইল তফাতে এই আকড়া। এখানে জেটি নেই। এ অবস্থায় উপকূল থেকে খানিক তফাতে ষ্টীমার নোঙর ফেলে দাঁড়ায়, তীর থেকে বরাদ্দ নৌকায় যাত্রীরা ষ্টীমারে ওঠে, স্থানীয় যাত্রীরাও ঐ নৌকায় উঠে তীরে নামে। যাত্রীদের ওঠা-নামায় সহায়তাকারী এই ধরণের নৌকা 'ছাঁদি' নামে পরিচিত।

আকড়ার কূলে ষ্টীমার ধরতেই অতীতের বহু স্মৃতি ছবির মত মনের পাতায় পর পর ফুটে উঠলো। এই অঞ্চলেই মণিখালি-কৃষ্ণনগর, বড়তলা, বৈঁতে, কাণখুলি, জালখুরা, চটামহেশতলা প্রভৃতি গণ্ডগ্রামগুলি স্মরণাতীত কাল থেকে প্রতিষ্ঠাপন্ন। কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত মুকুজ্যে বংশ এককালে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভূস্বামী ছিলেন। মেটিয়াবুরুজ, খিদিরপুর, বেহালা প্রভৃতির বহু অংশ তাঁদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কৃষ্ণনগরের মুকুজ্যে বাবুদের সাত মহল 'বড় বাড়ী' এ অঞ্চলের বিস্ময়ের বস্তু; তার ভগ্নদশা আজও লোকচক্ষুকে অবাক করে দেয়। অধুনা এই বংশের অনেকে কলকাতায় প্রতিষ্ঠাপন্ন। স্বনামধন্য গৌর মুকুজ্যে এই বংশেরই এক কৃতী পুরুষ ছিলেন। কলকাতার সিমুলিয়ায় তাঁর নামের রাস্তাটি স্মৃতিটুকু এখনো বজায় রেখেছে। এককালে এই সুবিস্তীর্ণ বড় বাড়ী, বিশাল দিঘী, বাগান, আকড়ার এই নদীতীরবর্তী স্থান ও ইটখোলাগুলি ছিল আমাদের ছেলেবেলার খেলাধুলার আস্তানা। এখান থেকে মাইল দুই দূরে ই-বি-আরের বজবজ শাখার রেল-ষ্টেসনটিও আকড়া নামে সুপরিচিত। এই অঞ্চলের ইটখোলা এবং কাটা কাপড়ের কারখানাগুলি কলকাতার স্থাপত্য ও সীবন-শিল্পের ব্যাপারে প্রধান সরবরাহকার।

আকড়া থেকে মাইল পাঁচেক তফাতে বাটানগর ষ্টেসন। এখানেও জেটি নেই, যাত্রীদের ওঠা নামায় ছাঁদির ব্যবস্থা। ষ্টীমার থেকেই বাটা সু কোম্পানীর নবনির্মিত নগরীর ইমারতগুলি দেখা যায়। এই অঞ্চলটি পূর্ব্বে নঙ্গী বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, বাটা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাটানগরীর এলাকায় পড়েছে। বিখ্যাত বার্ণ কোম্পানীর বিস্তীর্ণ ইটখোলা এবং সন্নিহিত কৃষিক্ষেত্রগুলি উচ্চমূল্যে ক্রয় করে আমেরিকার পদ্ধতিতে বাটানগর নির্মিত হয়েছে। জঙ্গলাকীর্ণ অখ্যাত অঞ্চল আজ সুরম্য নগরীর রূপ ধরে বাণিজ্য-জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। বাটানগরের কয়েক মাইল দূরেই বিখ্যাত বজবজ জেটি। কলকারখানা এবং কেরসিন তেলের ডিপোর জন্য বজবজ আজ চব্বিশ পরগণার একটি সমৃদ্ধ স্থান। বজবজের পর ষ্টীমার পুঁজালী নামক স্থানে এসে ধরলো। পুঁজালীর অপর পারে উলুবেড়িয়া; বামে চব্বিশ পরগণা, ডাইনে হাওড়া জেলা; উলুবেড়িয়া এই জেলার একটি বিশিষ্ট মহকুমা। এখানেও তীর থেকে অনেকটা তফাতে ষ্টীমার থামতে বিস্মিত হলাম। কারণ, উলুবেড়িয়ার জেটি, আর জেটি সংলগ্ন সারিবন্দী দোকানগুলির বাহার ছিল এখানকার একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। চেয়ে চেয়ে দেখলাম, সে জেটির চিহ্ন নেই, দোকানগুলিও অদৃশ্য হয়েছে; কয়েকখানি নৌকা ছুটে আসছে ষ্টীমার লক্ষ্য করে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, গত বছরে ভূগর্ভস্থিত পেট্রোলের পাইপে অগ্নিস্পৃষ্ট হওয়ায় যে শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে, সেই বিভ্রাটে সব ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এক স্থানে জেটির দগ্ধাবশিষ্ট একটা অংশ পড়ে আছে দেখালেন। ষ্টীমার থেকেই সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার অন্যান্য বিশ্রী নিদর্শনগুলিও চক্ষুকে পীড়া দিচ্ছিল। এখনও স্থানটি সুসংস্কৃত হয়ে ওঠেনি। স্থানীয় ব্যাপারীরা ছোট ছোট ডিঙ্গি করে পণ্যাদি ষ্টীমারের যাত্রীদের কাছে ফেরি করতে এনেছে দেখলাম।

উলুবেড়িয়া ছেড়ে খানিকটা যেতেই প্রেমচাঁদ জুট মিল দেখে চিত্ত যেন আনন্দে উৎফুল্ল হলো। হবারই কথা; কেননা, বাঙ্গালী ব্যবসায়ী পরিচালিত জুট মিলের গৌরবরশ্মি এর ধূম্ররাশির সঙ্গে বিকীর্ণ হচ্ছিল; ঢাকা ভাগ্যকুলের স্বনামধন্য রায়বাবুদের অমরকীর্ত্তি এই প্রতিষ্ঠানটি। ষ্টীমার আবার চব্বিশ পরগণার উপকূল লক্ষ্য করে গতি ফেরাতে লাগলো। দূর থেকেই ছবির মত একটি নূতন নগরীর রূপশ্রী আমাদের চক্ষুকে আকৃষ্ট করছিল; ষ্টীমার তীরে ভিড়তেই জানা গেল, এইটিই ভারতের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যবসায়ী বিখ্যাত বিড়লাভ্রাদার্সের প্রতিষ্ঠিত

বিরলাপুর। আগে এই অঞ্চলটি শ্যামগঞ্জ নামে পরিচিত ছিল, এইখানে বিরলা মিল স্থাপিত হবার সঙ্গে নূতনভাবে নগরপত্তন করে বিরলা ব্রাদার্স এর নামকরণ করেছেন বিরলাপুর। এখান থেকে আধুনিক প্রণালীতে নূতন রাস্তা প্রস্তুত করে বজবজ-বাখ্‌রা রোডের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, হাই স্কুল, বালিকা বিদ্যালয়, পাঠাগার, দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপিত করে নব নগরীকে সর্ব্বপ্রকারে সার্থক করে তোলা হয়েছে।

বিরলাপুরের পর রায়পুর। এখানেও ষ্টীমার ধরলো, আর জেটি না থাকায় নৌকায় যাত্রীদের ওঠা-নামার পর্ব শেষ হোল। এর পরেই নলদাড়ি ষ্টেশন। শুনলাম, এখানেই আমাদের নামতে হবে। এই নলদাড়ি থেকে মাইল দেড়েক তফাতে বুড়ুল গ্রাম—যেখানে আমরা সভা উপলক্ষে চলেছি।

ষ্টীমারে বসে বসেই এতক্ষণ জেটি ও চাঁদির সুবিধা অসুবিধা সকৌতুকে লক্ষ্য করে আসছিলাম, তখন ভাবিনি ষ্টীমার থেকে নৌকায় নেমে তীরে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদির ব্যাপারটা হাতে-কলমে উপলব্ধি করতে হবে। নলদাড়িতে জেটি না থাকায় অগত্যা চাঁদির আশ্রয় নেওয়া গেল। কিন্তু তীরভূমি কর্দ্দমাক্ত থাকায় জুতা খুলে কাদা ভেঙ্গে তীরবর্ত্তী রাস্তায় উঠতে হোল। সাথীরা জানালেন, পাল্কীর ব্যবস্থা আছে; কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে পাল্কীওয়ালারা আটকা পড়েছে, বর-ক'নে পৌঁছে দিয়েই তারা সত্বর আসছে। হেসেই বললাম, পাল্কীর কোন প্রয়োজন নেই, পল্লীপথে আমরা হেঁটেই যাবো। আমাদের জিদ দেখে তাঁরা অগত্যা সম্মত হলেন। দীর্ঘকাল পরে বাংলাদেশের সত্যিকারের পল্লীর সংস্পর্শে এসে তৃপ্তির সঙ্গে এমন একটা অপরিসীম অথচ সুপরিচিত মাধুর্য্যের আস্বাদ পেলুম যে, পথশ্রমের ক্লান্তি ও অবসাদ কোথায় তলিয়ে গেল।

ষ্টীমার থেকেই একটি সুউচ্চ অদ্ভুতাকৃতি ইষ্টকালয় লক্ষ্য করি, জানতে পারি, সেটি এ অঞ্চলের বিখ্যাত প্রাচীন বাতি-ঘর। নলদাড়িতে নেমে এই ঘরটির নিকট দিয়েই যাবার রাস্তা। ঘরটি প্রায় ২৫।৩০ হাত উঁচু; উপরের দিকে দুটি গবাক্ষ, নিম্নে তিনটি দরজা, মেজের ব্যাস ৬ হাত গোলাকার। মোগল আমলে এই ঘরটির আয়তন নাকি আরও বড় এবং পর্ত্তুগীজ দস্যুদের একটি আস্তানা ছিল, পরবর্তীযুগে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঘরটিকে ভেঙ্গে বর্ত্তমান আকারে পরিণত করেন। তাঁদের



নলডাঙ্গার বাতিঘর

ব্যবস্থাতেই এখানে আলোর নিশানা দেবার ব্যবস্থা হয়। বঙ্গোপসাগর থেকে যে সব জাহাজ কলকাতার অভিমুখে আসত, এই বাতিঘরের আলো দেখে নাবিকগণ জাহাজ নিয়ন্ত্রণে অবহিত হতেন। বতিঘরের ওঠবার সিঁড়িটি অনেক আগেই ভেঙ্গে গেছে। এরূপ জনশ্রুতি যে, এক ইংরেজ দম্পতি এই বাতিঘরে বাস করতেন, তাঁরাই আলো দিতেন। কিন্তু একদা মহিলাটি সরস্বতীর জলে স্নান করতে গিয়ে কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন, তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর সাহেবও নিরুদ্দিষ্ট হন। সেই থেকে বাতিঘরে আর আলো পড়েনি।

বাতিঘরের গল্প শুনতে শুনতে আমরা যখন বুড়ুল গ্রামে প্রবেশ করলাম তখন মধ্যাহ্ন অতীত হয়ে গেছে। গ্রামের প্রথমে স্থানীয় ভূস্বামী ঘোষ মহাশয়দের সুবৃহৎ ভবন। বাড়ীর সামনেই বৃহৎ পুষ্করিণী, বাঁধানো ঘাটের গায়ে শিবমন্দির। এই বাড়ীর কর্মী শ্রীমান নিখিলনাথ ঘোষ যুবমঙ্গল পাঠাগারের সম্পাদক। এঁদের আলয়েই আমাদের অবস্থিতির ব্যবস্থা ছিল। তরুণ কর্মীবৃন্দের সহিত প্রবীণ গৃহস্বামীর আদর আপ্যায়ন এবং সময়োচিত সুব্যবস্থার সকল শ্রান্তির অবসান হলো। আগাগোড়া প্রত্যেক ব্যাপারেই এঁদের উদ্যোগে আয়োজনে এমন ফাঁকটুকু কোথাও ছিল না যে 'পান থেকে চুণটুকু খসতে পারে!' বরং আড়ম্বরের আতিশয্যে আমরাই বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে পড়ি। আতিথেয়তায় এমন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা বাংলার পল্লীতেই সম্ভব।

বড়ুল গ্রামখানি পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা। পশ্চিম প্রান্তেই সরস্বতী-বা হুগলী নদী। ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়ে অদূরবর্তী ফলতার পাশ দিয়ে নদী



হুগলী নদীর তীরবর্ত্তী—বুড়ুল গ্রাম

বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। গ্রামের লোক সংখ্যা তিন হাজারের বেশী নয়। ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, মাহিষ্য এবং কাওরা এই চারি জাতির সমাবেশ দেখা যায়। সদ্গোপরাই এখানে বর্দ্ধিষ্ণু। গ্রামে মুসলমানও আছে, তাদের পল্লী আলাদা; এদের অধিকাংশই কৃষীজীবী ও দর্জ্জী। দেখে সুখী হলাম সাম্প্রদায়িকতার হাওয়া এখনো এ গ্রামে প্রবেশ করে নি। অন্যান্য স্থানের বিশ্রী ঘটনা সব শুনেও এরা তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নয় কথাটি যে খাঁটি, এক মুসলমানী প্রৌঢ়াকে গান গেয়ে সুবচনী পূজার জন্য

চাল পয়সা সংগ্রহ করতে দেখে উপলব্ধি করা গেল। চুবড়ীর মধ্যে দেবী সিন্দূর চর্চ্চিত মূর্ত্তি, ফুল পাতা পট, কড়ির চুবড়ী, উপরে রক্তবর্ণ বস্ত্রের আচ্ছাদনী। শুনলাম, এঅঞ্চলে মুসলমানীরাই সুবচনী পূজার উদ্দেশ্যে হিন্দু মুসলমানের বাড়ী বাড়ী ঘুরে পূজার উপচার সংগ্রহ করে, দেবীর মাহাত্ম্য শোনায়, গান গায়, ছড়া পড়ে।

গ্রামের মধ্যে যেগুলির প্রয়োজন, কোনটির অভাব দেখলাম না। হাইস্কুল, মেয়েদের শিক্ষালয়, প্রগতিমূলক স্থায়ী সমিতি, পাঠাগার, বাজার, গঞ্জ, হরিসভা, ডাক্তারখানা প্রত্যেকটি স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিচ্ছে। সমিতির এলাকায় এসে মনে হলো যেন কোন পবিত্র তপোবনের সংস্পর্শে আসা গেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর ফল ফুলের গাছগুলি প্রাচীরের মত আশ্রমটিকে ঘিরে রেখেছে, মাঝ খানে খানিকটা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ; এটিকে বজায় রেখে ঘরগুলি সুষ্ঠুপরিকল্পনায় নির্ম্মিত হয়েছে। পল্লী-মাটির পুরু উঁচু দেওয়াল, সারি সারি বড় বড় দরজা ও জানালা, মাথায় উলুর ছাউনি, দীর্ঘপ্রস্থে ঘরখানি এত বড় যে দুশো লোক নিয়ে একটা মিটিং বসানো চলে। দেওয়ালে দুধ-মাটির পলেস্তারা এমন সুশ্রী ও মসৃণ যে পংখের কাজকেও হার মানিয়ে দেয়। ঘরে ঢুকলেই এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নির্য্যাতীত দেশসেবক ৺ অনুরূপ চন্দ্রের সৌম্যমূর্ত্তি চোখে পড়ে। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত দুইখানি ছোট ঘরে সমিতির পাঠাগার ও শিক্ষাভবন। পল্লী-



নির্য্যাতীত রাজবন্দী—অনুরূপ সেন

ত সহজলভ্য উপাদানে নির্ম্মিত ঘরগুলির শান্ত রূপশ্রী দেখে এবং গ্রাম ও মবাসীদের কল্যাণকল্পে সমিতির কর্মীদের বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টার সঙ্গে রিচিত হয়ে যেমন মুগ্ধ হলাম, সেই সঙ্গে যে ত্যাগী মণীষীর বিপুল গঠন-শক্তি ও অনুপ্রেরণা ওতঃপ্রোতঃভাবে এর মূলে নিহিত, তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আমাদের চিত্তগুলি ভরে উঠলো।

১৯২১ অব্দের অসহযোগ আন্দোলনের তরঙ্গ যখন বন্যার মত সারা ভারতবর্ষকে প্লাবিত করে, এই ক্ষুদ্র অঞ্চলটির উপরেও তার সাড়া পড়েছিল। ফলে, ছেলেরা চাঁদা তুলে চরকায় সুতো কেটে তাঁত চালাবার ব্যবস্থা করে, সেই সঙ্গে স্থানীয় হাইস্কুলটিকে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করতে আন্দোলন চালাতে থাকে। এই সময় ঐ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত



বুড়ুল যুবমঙ্গল পাঠাগারের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবে সুধী বৃন্দ

হয়ে গ্রামে এলেন চরবাসী বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অনুরূপ সেন। ছেলেরা তাঁর মুখে শুনলো এক অভিনব সুর, ছাত্রদের সাধনার মন্ত্র; সেই সঙ্গে পেলো তারা পথের সন্ধান। অমনি তারা এই প্রিয়দর্শন মিষ্টভাষী দৃঢ়বাক্ সত্যনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতীকে শিক্ষাদাতার সঙ্গে প্রিয়তম নেতার স্থানে বসিয়ে তাঁর অনুবর্ত্তী হোল। যারা স্কুল ছেড়েছিল, তাঁর আহ্বানে আবার ক্লাসে গিয়ে বসলো; যারা আন্দোলনের তরঙ্গে গা ভাসিয়ে বিপথে ভেসে যাচ্ছিল তিনি তাদের ফিরিয়ে এনে সাফল্যের পথটি দেখিয়ে দিলেন। প্রথমেই তিনি ছেলেদের নৈতিক উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হলেন। তাঁরই উদ্যোগে স্কুলে একটি লিটারারী এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হোল, ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে চললো চরিত্রগঠন, নৈতিক উন্নতিও সদাচারের সাধনা। সমিতি ভবনে শিল্প শিক্ষার সঙ্গে ব্যবস্থা দিলেন তিনি ব্যায়ামের দ্বারা দৈহিক এবং প্রার্থনা ও ধর্মালোচনার সাহায্যে মনের উৎকর্ষ সাধন

করা চাই। ফলে, সমিতির বড় ঘরখানির পিছনে আলাদা একখানি ঘর তৈরী হোল—ছেলেরা যেখানে শুদ্ধ চিত্তে শ্রীভগবানের উদ্দেশে প্রার্থনা করে আত্মোপলব্ধির সুযোগ পেতো। এইভাবে আদর্শ কর্ম্মযোগীর নেতৃত্বে ছেলেরা শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং গ্রাম খানি উন্নত করবার সুযোগ পায়। কিন্তু হায়, এই সাধনায় সিদ্ধির পূর্ব্বেই সব ওলটপালট হয়ে যায়। কয়েক বৎসরের মধ্যেই যখন সরকার অর্ডিন্যান্সের বলে অসহযোগীদিগকে কারারুদ্ধ করে আন্দোলনের কণ্ঠরোধে বদ্ধপরিকর, তখন এই নীরব কর্ম্মীকেও অর্ডিন্যান্সের নাগপাশে বেঁধে এ অঞ্চলের ভাবী শ্রীবৃদ্ধির একটা সম্ভাবনার মূলোচ্ছেদ করা হয়। ১৯২৬ অব্দের ১৯শে ডিসেম্বর প্রচণ্ড শীতের প্রত্যূষে পুলিস তাঁর ঘরে খানাতল্লাস করে; তারপর অন্তরীণ অবস্থাতেই এইকর্ম্মযোগীর আশাময় জীবনের অবসান হয়। আরো দুঃখের কথা এই যে, বাঙ্গালাদেশের পল্লীউন্নয়ন ছিল যাঁর প্রাণের কামনা, বাঙ্গালা মায়ের সেই দরদী সন্তানকে কর্ত্তৃপক্ষ আর বাঙ্গলার মাটি স্পর্শ করবার সুযোগ দেন নি—বাঙ্গালার বাইরে অন্তরীণ অবস্থায় কঠিন ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতেই তাঁকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে হয়।

যথাসময় সভার কাজ আরম্ভ হলে সম্পাদকের বিবৃতি এবং স্থানীয় উৎসাহী কর্ম্মীদের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি সম্পর্কে এই অখ্যাত গ্রামখানি নানা দিক দিয়ে প্রগতির পথে যে কতখানি এগিয়ে গিয়েছে, আর এই অগ্রগতির মূলে কর্ম্মযোগী মণীষী অমুরূপ সেনের সাধনা যে কি গভীর প্রেরণা ও নৈতিক উপাদান যুগিয়েছে—তার একটা সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া গেল। কাজেই সভাপতির অভিভাষণে সাহিত্য ও পাঠাগার প্রসঙ্গে এই নির্য্যাতীত কর্ম্ম সাধকের প্রশস্তি কীর্ত্তন করে নিজেকেও ধন্য মনে করি। সেদিনের উৎসব সভামূলে শহরতলীর স্মৃতির সঙ্গে আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে বাংলার এ স্মরণীয় মানুষটির কাহিনী।

ট্রাজেডী*

ইন্দ্রযব

সেদিন ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কুয়াশায় সমস্ত শহরটা ঢাকা ছিল।

অফিস হইতে ফিরিয়া তিন বন্ধু ঠিক করিল কোনও একটা "বার" রেস্তোরা হইতে গরম হইয়া আসা যাউক, তাহারা যখন গরম হইয়া ফিরিয়া আসিল তখন রাত্রি সাড়ে বারোটা। নেশায় তাহাদের চোখ ছোট হইয়া আসিয়াছে,—পা' টলিতেছে।

হোটেলের ম্যানেজারের ঘরে ঢুকিয়া তাহাদের ঘরের চাবি চাহিতেই ম্যানেজার চাবিটা টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল—"দেখুন লিফ্‌ট্‌টা আজ খারাপ হ য়ে গ্যাছে; ইচ্ছা করলে এখানেই থাকতে পারেন, বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।"

নেশার ঘোরে এক বন্ধু বলিল—"কুছপরোয়া নেই! পায়দলমেই যায়েগা!"

তাহারা থাকে চব্বিশ তলার একটা ঘরে।

সিড়ির গোড়ায় এসে এক বন্ধু বলিল—"দেখ্‌ প্রথম আটতলা আমি ভূতের গল্প বলব, তার পরের আটতলা তুই "কমেডী"র গল্প বলবি, আর তার পরের আটতলা ও ট্রাজেডীর গল্প বলবে, তাহ'লে আর সিড়ি ভাঙ্গার কষ্ট গায়ে লাগবে না।"

প্রস্তাবে তিনজনেই রাজী!

ভূতের গল্প চলিতে চলিতে তাহারা আটতলায় পৌছিল। পালা বদলাইল। দ্বিতীয় বন্ধু এবার কমেডী আরম্ভ করিল। গল্পের আমেজে তাহাদের বেশ হাঁটার গতিবেগ আসিয়া গিয়াছে। তাহারা ষোলতলায় যখন ঢুলিতে ঢুলিতে পৌছিল তখন রাত্র দেড়টা।

এবার তৃতীয় বন্ধুর পালা; ট্রাজেডী!

তাহারা তিনজনে আগেকার চলার গতিতে মৌনভাবে সিড়ি ভাঙ্গিয়াই চলিয়াছে; সহসা প্রথম বন্ধু প্রশ্ন করিল—"আরে তোর ট্রাজেডী!" ততক্ষণে তাহারা আঠারতলা পার হইয়াছে।

—"দাঁড়া বলছি—একটু ভেবে নি!"

আবার প্রায় তিন তলা পার হওয়ার পর বলিল—"কিরে বলবি না?"

—"দাঁড়া একটু চিন্তা করতে দে।"

এমনি ভাবে তাহারা যখন চব্বিশ তলায় পৌছিল তখন প্রথম বন্ধু বলিল—"না ভাই—এটা তোর অন্যায়, একটাও ট্রাজেডীর গল্প বললি না!"

হঠাৎ কি মনে হইতেই তৃতীয় বন্ধু প্যান্টের পকেটে হাত চালাইয়া দিল; তাহার মুখে হতাশার ভাব ফুটিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই বলিল—একান্তই ছাড়বি না, তাহলে শোন্‌ ট্রাজেডীর গল্প—আমাদের ঘরের চাবিটা ভুলে ম্যানেজারের টেবিলেই ফেলে এসেছি।"

পাশের ঘরে ঢং করিয়া রাত্রি আড়াইটা বাজিল।

* বিদেশী গল্প।

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

(১০)

সভান্তে জলযোগের বন্দোবস্ত ছিল।

ডলিরা বড়লোক। নিজেকে কিছুই তদারক করিতে হয় না, উর্দ্দীপরা বেয়ারারাই পরিবেশন করিতেছিল। অপর্ণা চা'য়ের বাটি হাতে লইয়া ডাকিল.—মিস্ মিত্র, অত দূরে কেন? আসুন ভাল করে পরিচয় ক'রে নি। আসুন আপনি ত ভারি লাজুক।

রমলা অপর্ণার পানে চাহিয়া বলিল—লাজুক দেখ্‌লেন কোথায়?

—তবে আসুন।

রমলা উঠিয়া আসিল। অমল ও অপর্ণা যেখানে বসিয়াছিল তাহার সামনে আসিয়া বসিতেই অপর্ণা একটা কাপ তুলিয়া দিয়া বলিল—আসুন, একটু চা আগে হোক।

রমলা চা'র কাপটি হাতে করিয়া বলিল—বলুন—

অপর্ণা সমিতির খাতা বাহির করিয়া বলিল—আপনি ত রেবা বসুর বন্ধু, না?

—হ্যাঁ।

খাতার একটি শূন্য কলমে আঙুল রাখিয়া অপর্ণা বলিল,—আপনার বাসার ঠিকানা ত এর মাঝে এন্‌ট্রি করা হয় নি। বলুন—

যথারীতি নতুন সভ্যার ঠিকানা লেখা হইল। অপর্ণা ফাউনটেন পেনে ক্যাপ লাগাইতে লাগাইতে বলিল,—আপনার কবিতাটি বেশ হয়েছে, আশা করি সাম্‌নের অধিবেশনেও আপনার একটি কবিতা থাকবে। কথাটা বলিয়া ফেলিয়া অপর্ণা একটু মৃদু হাসিল,—অমল জানে এটা ব্যঙ্গ।

রমলা অপর্ণার মুখের পানে দৃঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিষ্ঠ ভাষায়ই বলিল—মানুষের অক্ষমতাকে ব্যঙ্গ করার মাঝে মহানুভবতা নেই, এ কথা আপনিও নিশ্চয়ই জানেন।

অপর্ণা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—তার মানে? আপনি এটাকে কেন ব্যঙ্গ মনে ক'রেছেন জানি না,—সেটাও আমার ভাবার অক্ষমতা বলে কি ক্ষমা ক'রতে পারেন না?

রমলা ম্লান হাসিয়া বলিল,—ভাবার অক্ষমতা নয় সেটা। আপনাদের মুখ, চোখ, চাপা হাসি সমবেতভাবে আমার অক্ষমতাকে ব্যঙ্গ ক'রেছে, এ কথাটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি আমার আছে।

অমল চা'এর কাপ তাড়াতাড়ি নামাইয়া রাখিয়া বলিল,—এ কথাটা কি আমার উদ্দেশ্যেও বলা চলে মিস্ মিত্র?

রমলা অপর্ণার পানে চাহিয়াই কহিল,—না,—অবশ্য যদি আপনার 'চমৎকার' কেবলমাত্র অভিনয়ই না হয়।

অপর্ণার উদ্দেশ্যে অমল কহিল—কবিতা না বুঝে যদি কেউ তাকে ব্যঙ্গ ক'রে তবে তাতে দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই, এটা নির্ভয়ে আমি ব'লতে পারি। মিস্ মিত্র এটা আপনি মনে রাখবেন—এখানে যাঁরা আছেন বা আসেন, তাঁরা সকলেই কবিতার উৎকৃষ্ট সমালোচক একথা বলা চলে না—

অপর্ণা অপাঙ্গে অমলকে দেখিয়া লইয়া বলিল,—সে গর্ব্ব তোমার মত কেউ করে না।

অমল কহিল,—তা নিয়ে তোমার মত ঝগড়াও রোজ রোজ কেউ করে না।

অমলের বলিবার ভঙ্গিতে তাঁহারা তিনজনই হাসিয়া উঠিল। ডলি আসিয়া কহিল—অমলবাবু, চা' পেয়েছেন?

—পেয়েছি কিন্তু খেতে পারি নি?

ডলি আতিথেয়তার ত্রুটি হইয়াছে মনে করিয়া প্রশ্ন করিল,—কেন কি হ'য়েছে?

—ঝগড়া ক'রতে ক'রতে চা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। আর ঠাণ্ডা চা খাওয়া আমার অভ্যাস নয়।

ডলি হাসিয়া বলিল—ঝগড়া কার সঙ্গে ক'রলেন?

—আপনাদের মাননীয়া সম্পাদিকা মহাশয়া, তাঁকে কর্ম্মভার দিলে এরকম ঝগড়া অনিবার্য্য।

ডলি বলিল,—বেশ, আবার চা দিচ্ছি, আবার ঠাণ্ডা হ'লে, না হয় আবার দেব—

অপর্ণা কহিল,—না ডলি, আর দিতে হবে না। অমলের পানে বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—আর চা খায় না।

অমল হতাশার সুরে হাত দোলাইয়া বলিল—এই দেখুন, ঝগড়া কি থাম্‌কা বাধে।

রমলা একটু কটাক্ষের সঙ্গেই বলিল—এ শাসন না মেনে ত পারবেন না, কেন আর পৌরুষ দেখাবার বৃথা চেষ্টা!

—অর্থাৎ?

রমলা হাসিয়া জবাব দিল—অর্থাৎ আদেশ।

অপর্ণাকে অমল বলিল,—আমাকে আদেশ দেওয়ার ধৃষ্টতা তোমার থাকা উচিত নয়।

অপর্ণা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—নেই, ওঠো। রাত্রির হ'লো,

আমাকে পৌঁছে দিয়ে তুমি বাসায় যাবে। আর মা তোমাকে যেতে বলেছেন।

ডলি চা লইয়া আসিয়া বলিল—কই, অমলবাবু এর মধ্যে চ'ল্লেন?

—হ্যাঁ।

—এ কি অপর্ণাদি! জানি আপনি ব'ল্লে অমলবাবুর থাক্‌বার সাধ্যি নেই, কিন্তু একটু পরে গেলে ক্ষতি কি?

অপর্ণা এ খোঁচায় চটিয়া গিয়াছিল, বলিল—কেন, ও কি আমার বাহন নাকি?

ডলি বলিল—বাহন বলা ঠিক হবে না, তবে—

অমল কহিল—বাড়ীতে পেয়ে আমাকে অপমান না ক'রলেও পারতেন মিস্ মিত্র। কথাগুলো আমার পক্ষে খুব শ্রুতিসুখকর হ'চ্ছে না।

ডলি তবুও বলিল—অপর্ণাদির বাহন হওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। একথা আপনার জানা উচিত।

অমল ব'লল—পুরুষ মানুষ হলেই কেবল বুঝ্‌তেন সেটা কত বড় দুর্ভাগ্য এবং অপমানকর।

অপর্ণা একটু তিক্তকণ্ঠেই বলিল,—সৌভাগ্যই হোক, আর দুর্ভাগ্যই হোক, এ নিয়ে আলোচনা করাটা আমার কাছে খুব সুরুচির পরিচয় বলে মনে হয় না।

ট্রামে উঠিয়া অপর্ণা চাহিয়া দেখিল, সেখানা প্রায় জনহীন। সে নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—একটা সত্যি কথা ব'লবে?

—কেন ব'লবো না? মিথ্যে কথা বলা আমার অভ্যাস নয়।

—তুমি রমলা মিত্রকে আগে থাক্‌তে চিন্‌তে?

—হ্যাঁ চিন্‌তুম।

—তবে আজ সভা-ক্ষেত্রে সে কথা স্বীকার ক'রলে না কেন?

—ও করে নি তাই। এর মাঝে ওর হয়ত কোন উদ্দেশ্য আছে।

—কি ক'রে তোমার সঙ্গে পরিচয়?

—তোমার সঙ্গে কেমন ক'রে পরিচয়—এর কোন জবাব হয়? কোনও সূত্রে দেখা হ'য়েছে, আলাপ হ'য়েছে এই পর্য্যন্ত। এখনও এত আলাপ হয়নি যে সর্ব্বত্রই তাকে চেনা দরকার। সে যদি আমাকে চিনতো আমিও পুরাতন পরিচয় স্বীকার ক'রে নিতাম।

অপর্ণা কোন কথা কহিল না। অনেকক্ষণ পরে একটু চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—কি যেন একটা কথা তুমি গোপন ক'রলে—যাক তা আমি শুন্‌তে চাই না, তবে এটা আমি বুঝেছি যে তোমার নিশ্চয়ই কোথায়ও ওকে কেন্দ্র ক'রে দুর্ব্বলতা আছে।

—যদি কোন কিছু গোপনই ক'রে থাকি তবে তাকে গোপনই থাক্‌তে দাও। এ সন্দেহ যে তোমার কেন হ'লো জানি না, তবে ভবিষ্যতে একদিন তোমার সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেব, আজ নয়। তোমার মা কি সত্যই ডেকেছেন?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—জানি না, সম্ভবতঃ তোমার কাছে আমার বিয়ে সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন ক'রবেন। তাঁর ধারণা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'লে আমি বেশী সুখী হব।

—সে সংবাদ আমার চেয়ে তুমিই বেশী সঠিকভাবে দিতে পারবে আশা করি। তুমিই তাকে সব জানিয়ে দিও। আমার সঙ্গে এ আলোচনার কোন প্রয়োজনই দেখি না।

অপর্ণা বলিল—আমার মতামত যে তোমার চেয়ে আমিই ভাল জানাতে পারবো এ কথা আমি জানি, কিন্তু তোমার মতামতটা ত আমি জানাতে পারবো না।

—বলা বাহুল্য মাত্র—তবে আমরা একমত হ'য়ে যদি তাঁকে আমাদের যুগ্ম মত জানাই তবে সেইটেই ভাল হয় না কি?

—ভাল হয় সন্দেহ নেই, তবে সেটা কি তুমি আমাকে জানাবে? জানাতে পারবে?

অমল বলিল—অবশ্যই পারবো, তোমার মতটা পাওয়া যাবে ত?

—তাও যাবে।

—তবে চল পার্কে নেমে, সভার অধিবেশনে আমাদের প্রস্তাব পাশ ক'রে নিয়ে, পরে উপরে পেশ ক'রবো।

—চল।

পার্কে প্রবেশ করিয়া অমল প্রথম আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল,—দূরে চারতলা বাড়ীর পরে আকাশের গায়ে একটা ঝাকড়া নারিকেল গাছের মাথা জ্যোৎস্নাস্নাত উজ্জ্বল আকাশের পটভূমিকার সাম্‌নে চীনে কালো রংএর মত নিবিড় কালো হইয়া রহিয়াছে। তার মাথার উপরে এক ফালি চাঁদ শূন্য পার্কের পানে চাহিয়া আছে। অমলের কবি প্রাণ সহসা যেন নূতন পুলকে শিহরিয়া উঠিল। বলিল—এস এখানে ঘাসের উপরেই বসি অপর্ণা।

দুইজনে বসিয়া পড়িল। অমল জ্যোৎস্নাস্নাত অপর্ণার মুখের দিকে লুব্ধদৃষ্টিতে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া বলিল—তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে আজ?

—হঠাৎ ই, এত সুন্দর তোমাকে কোনদিন দেখিনি—এই পরিবেশ, এই জ্যোৎস্না রাত, এরমাঝে তোমার দেহশ্রী মাদকতাময়, মোহময় হ'য়ে উঠেছে। অমল আস্তে অপর্ণার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল—তোমার মতটা তা হ'লে ব'লো—

অপর্ণা বলিল—কোন ইতিহাসে পুরাণে কোনদিন শুনেছ যে মেয়েদের মনের কথা পাওয়া যায়—আর পাওয়া গেলে পুরুষের আগে পাওয়া যায়! এই বুঝি তোমার মনস্তত্ত্বের জ্ঞান!

—জ্ঞান আমার ক্রমেই সংকীর্ণ হ'য়ে আসছে. সেটা বুঝেছি। তা হ'লে আমার কথা কয়েকটিই বলতে হবে?

—হ্যাঁ, কিন্তু রমলার সঙ্গে পরিচয় প্রসঙ্গে যে কথাটা গোপন ক'রেছ সেটা আগে বলতে হবে।

অমল মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল,—ব'লবো, তবে সেটা শুনবার পরে আর আমার মতামত দেওয়ার প্রয়োজন হবে না মনে করি।

অপর্ণা অকস্মাৎ যেন কিসের শঙ্কায় ব্যাকুলভাবে শেষ রাত্রির পাণ্ডুর চাঁদের মত অমলের মুখের দিকে চাহিল। একটু পরে, অমলের চোখের দিকে চাহিয়া বলিল—বল, প্রয়োজন অপ্রয়োজন সে বিচার আমার।

—আমাদের সমিতিতে এত লোক থাকতে. মানে এত মেয়ে থাকতে কেবলমাত্র রমলার সম্বন্ধে তোমার এত কৌতূহল কেন ব'লতে পারো?

—পারি. রমলা আজ সভার মাঝে বার বার কেবল তোমাকেই ও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে লক্ষ্য ক'রছিল এবং আমিও সেজন্য লক্ষ্য করেছিলাম। তার চাহনি দেখে আমি বুঝেছি, সে তোমাকে ভালবাসে এবং তোমাদের মাঝে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। তোমার কবিতা প'ড়বার সময় সেটা আরও ভাল ক'রে বুঝেছি।

—শেষেরটা ভুল না হলেও প্রথমটা ভুল—অর্থাৎ ভালবাসার কথাটা।

—আমাদের চোখে তোমরা ধূলো দিতে পারো কিন্তু মেয়েরা পারে না।

—পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণই এই।

—আমি বিশ্বাস ক'রলুম না। তার পরে বল—

অমল একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল—মার্জ্জনা ক'রো, সিগারেট খাই তা জানো। তুমি ও তোমার মা উভয়েই প্রশ্ন ক'রেছ—তথা অনুমান ক'রে নিয়েছ যে আমার দেশে জমিদারী আছে। তার টাকা প্রতি মাসে আসে এবং আমি আনন্দে তাই খরচ করি আর পড়ি—কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তেমন সরল নয়। আমি

চাজেই তোমাদের ধারণা হ'য়েছে জমিদারী আছে। আমি যেমন মিথ্যা বলিনি, তেমনি তোমাদের এ কল্পনাকেও আমি ভাজি নি। এর কারণ এই নয় যে আমি আমার দারিদ্র্যের জন্য লজ্জিত, কোন দিন নিজের অবস্থা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন হয়নি তাই। এখানে আমি ছাত্র পড়িয়ে, বেনামে চুরি করা রোমাঞ্চকর উপন্যাস লিখে আমার খরচ চালাই এবং বাড়ীতে কয়েক বিঘা পৈতৃক খামার জমি আছে তার ফসলে বিধবা মায়ের একবেলার হবিষ্যান্ন কোনমতে চলে। সংসারে আমি আর মা, এ ছাড়া কেউ নেই। বি এ পড়া পর্য্যন্ত মামা ও দুই একজন আত্মীয় ফি দেওয়ার সময় কিছু সাহায্য ক'রেছেন এইমাত্র। আর রমলা হ'চ্ছে আমার বর্ত্তমান ছাত্রের দিদি। সেখানে পড়িয়ে আমি মাসিক ১৫৲ টাকা অর্জ্জন করি, তার সঙ্গে আমার প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক, সেখানে তোমার অনুমান অর্থাৎ ভালবাসা একেবারেই অসম্ভব। এবার সম্ভবতঃ বুঝেছ?

—হ্যাঁ, কিন্তু রমলার সঙ্গে কি তোমার এইটুকু পরিচয় মাত্র?

—না. আর একটু। ও কবিতা লেখে এবং তার অহঙ্কার করে, এ কথা প্রথমদিনেই ও জানিয়ে দেয়, তাই আমিও কবিতা বুঝিনা এবং অঙ্কশাস্ত্রে এম এ পাড় এই ভাণ ক'রে এতদিন অভিনয় করেছি। সভায় অকস্মাৎ আমার অন্য পরিচয় পেয়ে ও হয়ত অবাক হ'য়েছে, হয়ত ভেবেছে আমি বড্ডো চালিয়াৎ—অন্ততঃ মিথ্যাবাদী ব'ললে আমার অস্বীকার করার উপায় নেই। ও আমার নাম দিয়েছে কাপালিক।

অপর্ণা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—কাপালিক! নিখুঁত নামটি!

—সম্ভব! কিন্তু এখন কি আর তোমার বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার মতামতের কোন প্রয়োজন আছে?

অপর্ণা মুখ নীচু করিয়া কহিল—কেন নেই?

—আমি গরীব, একথা শুনলে। এখনও কি তুমি আমার মত ছেলেকে বিয়ে করতে প্রস্তুত আছ? সম্ভবতঃ নেই, কাজেই তোমার একার মত জানালেই তোমার মা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন—

অপর্ণা সহসা কোন জবাব দিল না। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবিল, তার পরে মুখ তুলিয়া বলিল,—তুমি কি মনে কর, আমরা তথাকথিত শিক্ষা পেয়েছি এবং কতকটা স্বাধীনভাবে ক'লকাতা সহরের বুকে চলাফেরা করি বলেই আমাদের বিয়ে ব্যাপারে একমাত্র আমার মতামতই গ্রাহ্য হবে! তা নয়,—মা বাবার মতকে উপেক্ষা করার শিক্ষা এখনও পর্য্যন্ত পাইনি আমরা—

অমল বলিল,—তুমি যাকে ইচ্ছে বিয়ে ক'রতে পারো. তবে তোমার বক্তব্য মা বাবার জবানিতে বলে নিজেকে ছোট ক'রো না। শ'র সুপার ম্যান পড়েছ—এর পরেও কি মা বাবার উপরে নিজের মতামত চাপাতে চাও?

অপর্ণা বলিল,—তুমি হঠাৎ অমন মরিয়া হ'য়ে আমাকে আঘাত ক'রছো কেন? তোমার দারিদ্র্য নিয়ে আমি ব্যঙ্গ ক'রবো এ ধারণাই বা তোমার হ'লো কেমন ক'রে? তুমি এটুকু অন্ততঃ মনে রেখো যে মোটর, টেলিফোন, রেডিওকেই আমি জীবনের মাপকাঠি করিনি, সংসারে নিজের পায়ে ভর দিয়ে, দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবার ক্ষমতা আমার আছে। প্রমাণ হয়নি বটে, তবে সময় এলে প্রমাণ হ'বে।

অমল সহসা কহিল—চল তোমার মার কাছে সমস্ত বলে আসি, এটা তার মতামত ঠিক ক'রতে সহায়তা ক'রবে।

অপর্ণা তাড়াতাড়ি বলিল,—না, তোমাকে আজ যেতে হবে না। অন্যদিন দেখা ক'রো।

—কেন?

—কারণ আছে, পরে জানাব।

—তুমি ডেকে এনেছ মনে আছে?

—আছে আমিই ফিরিয়ে দিচ্ছি, তুমি বাসায় যাও, আমি এটুকু একা একাই যেতে পারবো। চল তোমাকে ট্রামে তুলে দিয়ে আসি।

অমল কিছু না ভাবিয়াই বলিল—চল।

ট্রামে উঠিয়া অমল একটা মানসিক শূন্যতা অনুভব করিল—বহুদিনের যুদ্ধান্তে আজ যেন সহসা সমস্ত দ্বিধা, সঙ্কোচ মুহূর্তে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আজ আশা করিবার কিছু নাই, ভয় করিবার কিছু নাই, দুঃখেরও কিছু নাই অমল তাই জানালার ভিতর মুখ দিয়া কেবল দূরে গড়ের মাঠের নিবিড় পুঞ্জীভূত অন্ধকারের পানে চাহিয়া রহিল।

মানুষ যতদিন বিপদের আশঙ্কা করে, প্রতি পলে প্রতি ক্ষণে সে দ্বিধা শঙ্কায় রুদ্ধশ্বাস হইয়া থাকে—কিন্তু যখন বিপদ আসিয়াই পড়ে তখন রুদ্ধ নিশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া সে যেন তৃপ্তি পায়—আজ অমলও তাই একটা তৃপ্তি বোধ করিতেছিল। অপর্ণার কাছে চাহিবার কিছু নাই. বলিবার কিছু নাই, আজ সব সন্দেহের অবসান হইয়াছে; এখন যাহা কিছু করিবার, যাহা কিছু দিবার সবই অপর্ণার। সে যদি কোন দিন ডাকিয়া লয় তবে সেদিন স্বেচ্ছায় সানন্দে সে হাত প্রসারিত করিয়া দিবে।　　ক্রমশঃ

আজাদ হিন্দের অঙ্কুর

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

মহাজাতি সদন

সাজ-সজ্জা করিয়া বেড়াইতে বাহির হওয়া গেল। ঠাণ্ডার দেশ, সমাগত সন্ধ্যা, সাজ-সজ্জার দরকার।

ফটক সন্নিকটে আসিতে দেখি, একটি গাছের পাশে দাঁড়াইয়া একটি পাঞ্জাবী তরুণী ক্যামেরা 'চার্জ্জ' করিতেছে। আমরা তাহার পানে চাহিতে সে বোধ করি একটু 'লজ্জা' পাইয়া গাছের আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইল; আমরা তিনজনেই হাসিলাম। সুভাষচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, এরকমটা নিত্যই হয়। আমি মেয়েটির দিকে অগ্রসর হইলাম। বলিলাম, হিন্দীতে, (আমার হিন্দীতে) আমরা তিনজন আছি, তুমি কাহার ছবি তুলিতে চাও? মেয়েটি হাসিল (আমার হিন্দী শুনিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারে এমন লোক ত দেখি না); হাসিয়া নির্ভীক নিষ্কম্পস্বরে কহিল, বসুজীর তসবির। আমি কাতর কণ্ঠে কহিলাম, কেন, আমাদের ছবি লইবে না? মেয়েটিকে লাজুক ভাবিয়াছিলাম, সে কিন্তু আদৌ লাজুক নহে। বেশ [illegible]। আমি 'ভগ্নাশভাবে' ফিরিতেছি, তরুণী সুভাষবাবুর উদ্দেশে শুদ্ধ ও স্পষ্ট ইংরাজীতে কহিল, আপনি একবার এদিকে চাহিবেন কি? সুভাষচন্দ্রের তাহাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। তরুণীর ক্যামেরা ক্লিক্ করিয়া উঠিল; তরুণী কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্মিতহাস্যে কহিল, থ্যাঙ্কস্।

তাহার বয়স কতই বা হইবে? তেরো-চোদ্দ, বড় জোর পনেরো-ষোল হইতেও পারে, তার বেশী কিছুতেই না। ঐ বয়সের বাঙ্গালীর মেয়ে আমার আবেদন ঐরূপ দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে এবং তাহার নিজস্ব অভিলাষ এমন অকুণ্ঠ কণ্ঠে প্রকাশ করিতে পারিত কি? অন্য দেশের খবর জানি না, বলিতেও পারি না, তবে আমার বাঙ্গলা দেশের কথা জানি। বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে ঐ বয়সটা অত্যন্ত 'মারাত্মক'—বিকাশের বাসনা ও প্রকাশের কামনা অপরিসীম, অথচ আত্মগোপনের প্রবল প্রচেষ্টা আপনার অজ্ঞাতসারে আপনি সর্ব্বাঙ্গ চাপিয়া ধরিতে চাহে; দৈহিক অবস্থাও তদনুরূপ। কুসুমিত উপবনের মত তরুণ অঙ্গ পত্রে পুষ্পে সমৃদ্ধ হইয়া বিকাশ-ব্যাকুল, অথচ লোকচক্ষু কি তীব্র, কি অন্তর্ভেদী বলিয়াই না বোধ হয়! লোক সমাজের অভ্যান্তে

যেন বাঁচে। এই তরুণীটি বঙ্গদেশের মাটীতে জন্মে নাই. বাঙ্গলার জল বায়ু তাহাকে স্পর্শ করে নাই. বঙ্গবালার সহজাত লজ্জা সঙ্কোচের সহিত তাহার পরিচয় হয় নাই। তাই যখন আমরা কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়াছি, দ্রুতপদে হাঁটিয়া আবার আমাদের কাছে আসিয়া, আমার পানে প্রসন্ননয়নে চাহিয়া, ইংরাজীতে অকুণ্ঠকণ্ঠে সে কহিতে পারিল, আপনারা দু'জন একমিনিট দাঁড়াইয়া পড়ুন, আপনাদেরও একখানি ছবি লইতে পারি। আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, না, আমাদের জন্য তোমার ফিল্ম অপব্যয় করা সঙ্গত হইবে না।

তরুণী হাসিমুখে শুভরাত্রি জ্ঞাপন করিয়া আর একবার তাহার আরাধ্য বীরকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইয়া, সৌখীন ডালহাউসীর পর্ব্বতীয় বনে সরু একটা পথ ধরিয়া অরণ্য মধ্যে সৌখীন বনদেবীর মত লীলায়িত ভঙ্গীতে অন্তর্দ্ধান করিল।

ডালহাউসী পাহাড়টা ঠিক দার্জ্জিলিং, নৈনিতাল, সিমলা, মুসৌরীরই মত। উচ্চতায় কোথায় সাত, কোথায় বা আট হাজার ফুট; প্রকৃতিটাও পুরাপুরি পার্ব্বতীয়। আকাশে মেঘ নাই, কিছু নাই, হঠাৎ এক পসলা বৃষ্টি আসিতে পারে; আবার তখনই দিনকরকিরণে দশদিশি প্রভাসিত হইতেও পারে। আমরা পথের মধ্যে এক পশলা জোর বৃষ্টি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলাম। শীতের দেশ, আসন্ন সন্ধ্যা, তায় মুষলধারা! তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া, জামা জুতা কাপড় বদলাইয়া, বারান্দায় আরাম কেদারায়, পায়ের উপরে কম্বল চাপাইয়া কেহ চা, কেহ কফি পানান্তে গরম হইয়া বসা গেল। আমার সিগারেটের খরচটা এখন কিছু বেশী হওয়ারই কথা, রসিকজনমাত্রই তাহা স্বীকার করিবেন; কিন্তু 'অরসিক' ধরমবীর মহাশয় স্বীকার ত করিলেনই না, অধিকন্তু গালিগালাজ করিয়া স্থানান্তর গমন করিলেন; বলিয়া গেলেন, তাম্রকূট ধুম্র সহ্যসীমা অতিক্রম করিয়াছে। আসলে তাহা নহে; কোনও দর্শনপ্রার্থীর আগমন ঘটিয়াছিল। ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের কথা পথে সুরু হইয়াছিল. বৃষ্টির আক্রমণে কথা শেষ হয় নাই। তাহারই সূত্র ধরিয়া আলোচনা আরম্ভ হইল।

সকলের স্মরণ থাকিতে পারে, আটাশ সালের কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র ছিলেন—স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর অধিনায়ক; ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রধান সম্পাদক; যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত অভ্যর্থনা সমিতির অধ্যক্ষ; কংগ্রেস অধিবেশনে পতিত্ব করিয়াছিলেন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। গান্ধীজী অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। তরুণ ও প্রিয়দর্শন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে বিরাট শক্তিধর বলিয়া বুঝিবার সুযোগ সেইদিনই প্রথম ঘটিয়াছিল। পৃথিবী প্রায়শঃ ভ্রান্ত দৃষ্টি; কিন্তু এক্ষেত্রে অভ্রান্ত-জগৎ বিস্ময়বিমুগ্ধনেত্রে তাহাই অবলোকন করিতেছে। আজিকার বিশ্বে জওহরলালজীর স্থান চিন্তানায়কগণের সর্ব্বাগ্রে, সকলের পুরোভাগে বলিলে বেশী বলা হইবে না।

আমার স্মরণশক্তি কোনকালেই ভাল ছিল না, এখন আরও খারাপ, তাহাতেও সন্দেহ নাই। তবু যতদূর মনে আছে, এখানে নবীন সুভাষকে লইয়া প্রবীণ নেতৃবৃন্দকে মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছিল। রাজনৈতিক তথা স্বাধীনতার সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের অতি মাত্রায় অস্থিরতা ও অধীরতা, দ্রুত অগ্রগমনের জন্য প্রবল চাঞ্চল্য, আমার মনে হইতেছে, এই অধিবেশনের কালে সর্ব্বপ্রথম সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। নবীনে ও প্রবীণে মতবিরোধের সূচনা কোথায়, কেমন করিয়া, অথবা কি কারণে তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল, রাজনীতির সহিত আত্মীয়-কুটুম্বিতাসম্পর্কলেশশূন্য আমার পক্ষে, সে কাহিনী এতকাল পর্য্যন্ত মনে রাখা কঠিন; মনে রাখিতেও পারি নাই; না রাখিয়া অপরাধ করিয়াছি বলিয়াও মনে করিতে পারিতেছি না। আমি স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের টেক্সট বুক লিখিতে বসি নাই যে ব্ল্যাকহোল ট্র্যাজিডি অসত্য লিখিলে অনুমোদনে বঞ্চিত হইতে হইবে। কিন্তু এইটুকু বেশ ভাল করিয়াই মনে আছে যে নবীনে প্রবীণে সঙ্ঘর্ষটা এক সময়ে দুরতিক্রম্য হইয়া উঠিয়াছিল এবং মিটমাটের আশা প্রায় বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। আর মনে আছে, মিটমাটের উদ্দেশ্যে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ছুটাছুটি। একবার প্রবীণের শিবিরে, একবার নবীনের ক্যাম্পে অহরহ তাঁহার সেই 'প্রায়' সাত ফুট দীর্ঘ দেহ লইয়া গমনাগমন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে কি? বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের বৃন্দা-দূতীর ভূমিকা অভিনয়ের বিশেষ কারণ ছিল।

পণ্ডিত মতিলাল ছিলেন, অত্যন্ত রাশভারী, একগুঁয়ে লোক। একবার যে কথায় 'না' বলিতেন, অনন্তকালেও তাহা 'হাঁ' হইত না; একবার যে লোককে ভাল চোখে না দেখিতেন, সে লোক ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হইয়া অথবা লঙ্কেশ্বর দশানন হইয়া সামনে চলাফেরা করিলেও চক্ষু ফিরাইতেন না। সকলেই জানিত তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন কদাচিৎ সম্ভব হইত। সেদিনের এবং আজিকার দিনের কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষীয় মধ্যেও মতিলালজীর মত ঋজু, স্পষ্ট, সরল, অমায়িক অথচ অত্যন্ত দৃঢ় কুলিশকঠোর এবং অনমনীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি সত্যই বিরল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। নবীন ও প্রবীণে বিরোধ যে কারণেই ঘটিয়া থাকুক না কেন, পণ্ডিত মতিলাল নবীনের কথা কাণে তুলিবেন না, তাহাদের 'মুখদর্শন' করিবেন না, এই অব্যক্ত সঙ্কল্প প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল; অথচ অবস্থা এমন যে সন্ধি না হইলেই নয়। কিন্তু কঠিন-

কঠোর-অপরিবর্ত্তনীয় 'না' শুনিবার জন্ত কে যাইবে ? কাহার এমন অকুতো সাহস ?

বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় অসমসাহসিক ব্যক্তি, সর্ব্বজনে সুবিদিত, অধিকন্ত তিনি স্বয়ং নবীনদলভুক্ত। যদিচ বর্ত্তমান বিরোধে তাঁহার মত প্রবীণেরই অনুকূল, তথাপি স্বগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতি পূর্ণমাত্রাতেই ছিল। মিলনাকাঙ্খী হইয়া তিনি নিজেই দৌত্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। বিধানের উপর মতিলালজীর স্নেহ গভীর ; বিশ্বাস অসীম ; শ্রদ্ধা অনন্ত। মতিলালজী প্রায়ই বলিতেন, আমার দেহখানার তত্ত্বাবধানের ভার বিধানের উপর ছাড়িয়া দিয়া আমি পরম নিশ্চিন্ত মনে কাজ করিয়া যাই। শুনিয়াছি, পরবর্ত্তীকালে বিধানচন্দ্রের প্রসারিত বাহুর উপরে দেহ-ভার ন্যস্ত করিয়া পণ্ডিতজী প্রশান্তচিত্তে শান্তির রাজ্যে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। মতিলালজীর দরবারে বিধানচন্দ্রের ওকালতী বিফলে গেল না ; সুকঠোর 'না' অতি সহজেই সু-কোমল 'হাঁ' হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে অধিক তথ্য বলিবার প্রয়োজনাভাব। কংগ্রেসের ইতিহাসে সে কাহিনী অবশ্যই লিপিবদ্ধ আছে। মোট কথা এই যে, ডাক্তার বিধানচন্দ্রের চেষ্টায় তখনকার মত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেও, কংগ্রেসী মহলে সুভাষচন্দ্রের (এবং আরও কয়েকজনের) উপর একটা প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস ও সন্দেহের মেঘোদয় হইয়াছিল। অনেক দিনের কথা সে, ভুলভ্রান্তি অসম্ভব না হইতেও পারে, তবে মনে হইতেছে, জন্মভূমির স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্ম সুভাষচন্দ্রের অন্তরের বেগ এবং আবেগ, গতি এবং প্রকৃতি অতি মাত্রায় অর্থাৎ অত্যন্ত দ্রুত, অতএব সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং নীতির বিচারে কংগ্রেসের অনেকের কাছেই অসঙ্গত ও অশোভন বলিয়াই প্রতীত হইয়াছিল। শৃঙ্খলিত মাতৃভূমির বন্ধনমুক্তির অত্যুগ্র কামনাই যে উত্তরকালে একদা সুভাষচন্দ্রকেই স্বদেশ, স্বজনপরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরদেশে লইয়া গিয়া সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া স্বয়ং সশস্ত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত করিবে—করিতে পারিবে, অথবা করিতে পারা সম্ভব হইবে সেদিন, সেকালে ইহা যে অতি বড় দুঃস্বপ্নেরও অগোচর ছিল ! শত শত বৎসরের পরপদানত, আপাদমস্তক-শৃঙ্খলিত, নিরস্ত্র, নিঃসহায় ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংসামন্ত্রদীক্ষিত ভারতবাসী যে কোনও কালে, কোনও অবস্থায় অসম্ভব সম্ভব করিতেও পারে ইহা সেদিন সুদূর কল্পনারাজ্যেরও বহির্ভূত ছিল ! সেদিন সুভাষের অন্তরে প্রজ্বলিত অগ্নি প্রবীণেরচক্ষুতে আলেয়া রূপেই প্রতিভাত হইয়াছিল। অনেকে বিরুদ্ধ মনোভাব গোপন রাখিতেও অক্ষম হইয়াছিলেন। গান্ধীজীর উক্তিতেও বিদ্রূপের করুণ সুর ধ্বনিত হইয়াছিল, আজও, এতকাল পরেও তাহা বেদনার সহিত স্মরণ করিতে হইতেছে। স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর ও বাহিনীর অধিনায়কের যোদ্ধ্‌বেশ ও যোদ্ধাসম্ভব কুচকাওয়াজ দর্শনে সার্কাসের অভিনয়ের সহিত ব্যঙ্গাত্মক তুলনা গান্ধীজীই করিয়াছিলেন। আমাদের মধ্যেও এমন লোকের অভাব ছিল না। বহুদিন পর্য্যন্ত যাঁহারা রঙ্গভরে অথবা ব্যঙ্গভরে সুভাষবাবুকে জেনেরাল অফিসার কম্যাণ্ডের অপভ্রংশ "গক্" (G.O.C) আখ্যায় আখ্যাত করিয়া আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিয়াছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র বক্র কটাক্ষ না করিয়াও বলিতে পারি (অন্তের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ধর্ত্তব্যই নহে !), সুভাষের সেদিনের সেই সমরনায়কের বেশ বঙ্গীয় তরুণের চিত্তপটে যে চিত্রখানি বিচিত্র বর্ণে, আপন গর্ব্ব গৌরবে, আপনার মহিমায় মুদ্রিত—অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, আজও দুই যুগান্তেও তাহার ঔজ্জ্বল্য ও মাহাত্ম্য অমলিন ও অপরিম্লান। মলিন হওয়া দূরের কথা, আজ সেই মাহেন্দ্রক্ষণটিকে জাতির জীবন প্রভাতরূপে বন্দিত করিবার জন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। একদিন যাহা খড়কুটায় সজ্জিত কাঠামো মাত্র ছিল, কালে তাহাই দশপ্রহরণধারিণী দনুজদলনী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পূজামণ্ডপ আলোকিত করিয়াছে।

সুভাষচন্দ্র কহিলেন, আপনারা ত খবর রাখেন না, হার্দেকার যখন প্রথম স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়তে লেগেছিল, কেউ তার কথা তখন কাণেও তোলে নি। হার্দেকার নাছোড়বান্দা, অক্লান্ত পরিশ্রমে বাহিনী গড়ে তুললো। গোড়ার দিকে যাঁরা অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই করেন নি, তাঁরাও হাঁ হয়ে গেলেন। কংগ্রেস বাহবা দিলে ; স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ক্রমে কংগ্রেসের অঙ্গ হয়ে গেছে।

"আমি বরাবর তার দিকে ছিলাম ; জওহরলালেরও কতকটা সহানুভূতি হার্দেকারের দিকে ছিল। কলকাতা কংগ্রেসে আমি হার্দেকারের চেয়ে আর একটু অধিক দূর অগ্রসর হতে চেয়েছিলাম। আমার বরাবরের মত এই যে, জাতীয় সৈনিকবাহিনী গড়তে হলে, তাদের সামরিক পোষাকও পরাতে হবে, সামরিক শিক্ষাও দিতে হবে ; তা না দিলেও হবে না।" এক মুহূর্ত্ত থামিয়া পুনরায় বলিলেন, আমরা ভাগ্যদোষে (সুভাষচন্দ্র ভাগ্য বিশ্বাস করিতেন, দেখা যাইতেছে) নিরস্ত্র, আমাদের অস্ত্র নাই, সে অবশ্য দুঃখের কথা ; কিন্তু অস্ত্র ছাড়া যেটুকুর প্রয়োজন, তা কেন না করবো !

আমি হাসিয়া বলিলাম, হাতি ঘোড়ার পাত্তা নাই, আগেই চাবুকের সন্ধান ?

সুভাষচন্দ্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। ম্লান দীপালোকেও সুগৌর-সুন্দর বদনমণ্ডল রক্তিমাভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; কহিলেন, ভুল, দাদা বিষম ভুল। হাতী ঘোড়া আমাদের আছে, নাই চাবুক। একটু থামিয়া পুনশ্চ সহাস্তে কহিলেন, চাবুক বলছি আমি ট্রেনিংকে।

জাতীয় বাহিনী কি কেবল পোষাকের শোভা দেখিয়েই লোককে চরিতার্থ করবে? একদিন তারাই হবে দেশের সৈন্য, দেশের যোদ্ধা। তাদের যদি সেই ভাবে গড়ে তুলতে না পারি, আমরাই ঠকবো। সুভাষ থামিলেন। অনেকক্ষণ নীরবতায় কাটিল। আজ মনে হইতেছে, দেশের সৈন্য, জাতির যোদ্ধা সংগঠনের পরিকল্পনায় তাঁহার দূরদৃষ্টি সেই সময় অনেক দূরে—সম্মুখে প্রসারিত, দিগন্ত হইতে দিগন্ত বিস্তৃত মেঘময় হিমালয় পর্ব্বতমালার ওপারে, বঙ্গোপসাগরের পরপারে, হয় ত বা ভারত সীমান্তেরও পারে চলিয়া গিয়াছিল। আমার সিগারেটের প্রবল ধূম্রবাষ্পেও তাঁহার চিন্তা ক্ষুণ্ণ হইল না।

কিয়ৎপরে কহিলেন, দাদা, সামরিক বেশভূষা ও আদব কায়দার ওপর আমাদের মত দুর্ব্বল, নিরস্ত্র ও পরাধীন দেশের লোকদেরও যে কতখানি সম্ভ্রম ও সমীহ তা বোধহয় আপনারা কল্পনা করতেও পারেন না (এ কথাটা কিন্তু ঠিক নয়! পারি না আবার! খুব পারি! নাইলে রাস্তা দিয়া মিলিটারী বীরপদভরে মেদিনী দলিত করিয়া যায় যখন, ছাদে উঠি কেন?) অল্প পরে কী কথা, মহাত্মা গান্ধী যখন সামনে দিয়ে যান, তখন লোকের মনে শুধু ভক্তি জেগে ওঠে, পায়ের ধুলো নেবার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়—এই মাত্র! কিন্তু আমাদের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী যখন নিয়মবদ্ধ সারিবদ্ধ হয়ে কদমে কদমে চলে যায় তখন জনতা দুধারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে, প্রস্থাবিত অন্তরে কি ভাবে, জানেন? ভাবে, আমিও কেন স্বেচ্ছাসেবক হই নি? হোলে আমিও ত অমনি বীরদর্পে কদমে কদমে হাঁটতে পারতুম। দাদা, এর মূল্য, আমার কাছে অনেক—অনেক;—অমূল্য, মহামূল্য।

এইখানে একটি প্রলাপ উক্তি পাঠিকা এবং পাঠক মার্জ্জনা করিবেন। আমার জীর্ণকায় ছিন্নপত্র রোজনামচার পৃষ্ঠায় বারম্বার কদম কদম শব্দের উল্লেখ দেখিয়া অধুনা জনগণবন্দিত, সুভাষগঠিত আই এন্ এ'র সময় সঙ্গীতের প্রথম কলিটি আমার মনে পড়িতেছে। কলিটি এইখানে উদ্ধৃত করিলাম:

কদম কদম বাড়ায়ে যা।
খুসী কে গীত গায়ে যা।

চতুষ্পার্শের অন্ধকার হইতে ঝিঁঝির অশ্রান্ত সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিতেছে; দূরের, নিকটের, সম্মুখের, পার্শ্বের পাহাড়ের অন্ধকারের মধ্য হইতে শৈলগাত্রপরিশোভিত গৃহগবাক্ষবিনির্গত আলোকবিন্দুগুলি অন্ধাকাশে নক্ষত্রের মত খচিত হইয়া উঠিয়াছে, বারান্দার নীচের বর্দ্ধিত পুষ্পোদ্যান হইতে অতি মৃদু সুরভি-শীতল বায়ুর সঙ্গে কখনও কখনও ভাসিয়া আসিতেছে। অল্প আলোকে ও স্বল্প অন্ধকারে আমরা এখনও বলি নি, আজ আপনাকেই প্রথম বলছি, কলকাতায় আমার একটা কংগ্রেস ভবন গড়বার ইচ্ছা আছে। কংগ্রেস হাউস্ নাম হলেও তাতে শুধু যে কংগ্রেসের কাজই হবে তা নয়! আসলে হবে সেটা জাতীয় বাহিনীর প্রধান শিবির! তার সঙ্গে লাইব্রেরী, ক্লাব, জিমনেসিয়াম, কংগ্রেস আফিস থাকবে, কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি (Institutionটা) মূলত: সৈনিক কেন্দ্র হবে। অনেক দিন থেকেই প্ল্যানটা মাথায় আছে, এইবার কলকাতায় গিয়ে কাজ আরম্ভ করবো।

আমি বলিলাম, বললেনই যদি, আরও 'বিবরিয়া কহ শুনি?'

সুভাষবাবু প্রশান্ত গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, অন্তত: এক লক্ষ স্বেচ্ছাসেবকের বাহিনী আমি এক কলকাতাতে, এক বৎসরের মধ্যেই গড়ে তুলতে পারবো বলে আশা করছি। হাডুডু খেলা থেকে তীর ধনুক চালানো, সমস্তই শেখানো হবে।......আমাদের দেশ যেদিন স্বাধীন হবে—হবেই একদিন—সে একদিন খুব দূর বলে আমি মনে করি না—সেদিন আমাদের এই প্রদেশে প্রদেশে গঠিত স্থায়ী জাতীয় বাহিনী দেশ রক্ষা করবে; দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রাখবে। কলকাতায় হবে, তার প্রথম প্রতিষ্ঠা!

আমার তখন কথা শুনিবার পালা, কথা বলিবার সময় নহে, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। সুভাষচন্দ্র বর্দ্ধিতোৎসাহে কহিতে লাগিলেন, কলকাতায় কিছু করতে গেলে, কর্পোরেশনের সহায়তা ছাড়া করা যায় না। (মৃদু হাসিয়া) সেই জন্যেই কর্পোরেশনে আমার যাওয়া দরকার। যেতেই হবে, নৈলে নয়। আমার প্ল্যান তৈরী, ফণ্ডের জন্য আবেদন প্রস্তুত, গিয়েই কাজ আরম্ভ ক'রে দিতে পারবো। তখন কিন্তু আপনাদের সাহায্য দরকার হবে, ফাঁকী দিতে পারবেন না।

আমি সহাস্যে কহিলাম—পাঠ্যাবস্থাই সে সুনাম ছিল বটে; এখন বোধহয় সে সুনাম কাটিয়ে উঠ্‌তে পেরেছি।

সুভাষ কহিলেন, কলকাতায় কাজ সুরু ক'রে দিয়ে প্রত্যেক প্রদেশে ঘুরে বেড়াবো (টুর করবো), প্রত্যেক প্রদেশে জাতীয় বাহিনীর কেন্দ্র তৈরী করতে হবে। আপনি হাসছেন নাকি? হাসছেন, হাসুন—কিন্তু তখন প্রশংসা না ক'রে পারবেন না, তা আমি বলে রাখছি।

তাহার পর বোধ করি বা রঙ্গভরেই কহিলেন, ভারতবর্ষের ১১টি প্রদেশে ১ লক্ষ ক'রে ১১ লক্ষ সৈনিক গড়ে উঠলে, সে কি আনন্দেরই হবে! না?

আপনি কি আমাকে এতই ধৃষ্ট মনে করেন যে আমি সে কথাও অস্বীকার করবো?

আপনাকে ধৃষ্ট বলতে পারি? বলিয়া তিনি নীরব হইলেন।

পর মুহূর্তে পুনরায় প্রদীপ্তকণ্ঠে কহিলেন, বড় জোর এক বৎসর! এই এক বৎসরের মধ্যে কংগ্রেসের জাতীয়বাহিনী গঠন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তখন দেখবেন—ভারতীয় জাতীয়বাহিনী জাতীয় সম্পদ ব'লে (an asset) ধন্য ধন্য পড়ে যাবে।

আজ ভাবি, এ কি দৈব বাণী? ভবিষ্যদ্বাণীর মতই উচ্চারিত হইয়াছিল? তবে এক বৎসর পরে নহে, ন্যূনাধিক আট বৎসর পরে, কংগ্রেসের বাহিরে, ভারতেরও বাহিরে যে বিরাট ভারতীয় জাতীয়বাহিনী সুভাষচন্দ্র গঠিত করিয়াছিলেন, পৃথিবীর স্বাধীনতা-কামী নর নারীর চিত্তে কি শ্রদ্ধার স্বর্ণসিংহাসনেই না তাহা অধিষ্ঠিত হইয়াছে! সুভাষচন্দ্রের ভারতবর্ষ সুভাষের ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর নামটি জপমালা করিয়াছে বলিলেও বোধ করি বেশী বলা হইবে না। কামনার কুসুমকাননের সুরভিত শ্রদ্ধাকুসুম অবচয়ন করিয়া অপরিসীম বিস্ময়ের স্বর্ণসূত্রে মালা গ্রন্থন করিয়া ভক্তিচন্দনবিলেপিত করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে সুনির্মল করে জাতীয় বাহিনীর কণ্ঠে দোলাইতে আজ চল্লিশ কোটি নরনারী লালায়িত। ভারতীয় জাতীয়বাহিনী ভারতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য লইয়াই ক্ষান্ত নহে, হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা, আরব সাগর হইতে বঙ্গসাগর উদ্দীপনার বিদ্যুদ্দীপ্তিতে প্রভাসিত করিয়া নবীন ভারতবর্ষকে নবীন ছন্দে, নবীন মন্ত্রে, দীক্ষিত করিতে চাহিতেছে। জাতি বর্ণ ধর্ম সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সাম্মিলিত কণ্ঠে জয় হিন্দ্ গাহিতেছে। ভারতের ইতিহাসে এমন সাম্য অভিনব এবং অতুলনীয়।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই নীরব। আমি অন্ধকার ধরণীর পানে চাহিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া আছি, অকস্মাৎ সুভাষচন্দ্রের মধুর-গম্ভীর কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

"একটি ভাল দিনক্ষণ দেখে জয় মা ব'লে নেমে পড়ি। কি বলেন?" (সুভাষচন্দ্র কি শাক্ত, কালী মা ভক্ত? এ মা কোন্ মা? জগজ্জননী মা, না জননী-জন্মভূমি মা? আরও এক কথা? সুভাষবাবু পাঁজী পুঁথি যাত্রা অযাত্রা জানিতেন, তাহার সাক্ষী আমার এই দুই কর্ণ।)

তাঁহার প্রশ্নের কি উত্তর দিয়াছিলাম, আদৌ দিয়াছিলাম কি না মনে নাই। বোধ করি উত্তর দিই নাই। অপাত্রে প্রশ্ন এবং উত্তর অনাবশ্যক বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছিলাম।

সুভাষচন্দ্র কহিলেন—জয় মা বলে দিই সুরু করে!

আবার জয় মা!

গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনী প্রকাশ হইয়া জানাইলেন, আহার্য্য প্রস্তুত।

আমরাও অপ্রস্তুত ছিলাম না, সভা ভঙ্গ হইল।

এইখানে পরিকল্পিত কংগ্রেস-ভবনটির কথা বলি। ১৯৩৮ সালের আগষ্ট (!) মাসে কলিকাতায় একটি "জাতীয় ভবন" ("কংগ্রেস ভবন") নির্ম্মাণের প্রস্তাব কর্পোরেশনের সভায় প্রথম আলোচিত হয়। চিত্ত-রঞ্জন এভিনিউর উপরে বৃহৎ একখণ্ড জমি ৯৯ বৎসরের জন্য নামমাত্র, বার্ষিক এক টাকা খাজনায় সুভাষচন্দ্র বসুকে জমা দিবার প্রস্তাব, মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির বিরুদ্ধতা ব্যর্থ করিয়া কর্পোরেশন কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। এই জমির উপরে সুভাষচন্দ্র সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবেন। তন্মধ্যে একটি রঙ্গালয়, একটি বক্তৃতামঞ্চ, একটি বহুগ্রন্থ সম্বলিত পুস্তকাগার, একটি বৃহৎ ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে, প্রস্তাবনায় এই কথাগুলি বলা হইয়াছিল। সহর ও সহরবাসীর স্বাস্থ্য, জ্ঞান, চিত্তরঞ্জন বিষয়ক কার্য্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রস্তাবটি সাদরে গৃহীত হয়। কথা ছিল, প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্যালয়ও ঐ ভবন মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইবে। তখন পর্য্যন্ত কংগ্রেস হাউস নামেই ভাবী ভবনটির পরিচিতি ঘটিয়াছিল।

১৯৩৮ সালের সে কথা; আজ ১৯৪৬। ইত্যবসরে দীর্ঘ আটটি বৎসর বিগত হইয়াছে। কিন্তু কোথায় সেই কংগ্রেস-ভবন? সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা কি তাঁহার কল্পলোকেই রহিয়া গেল? কলিকাতা সহরে যে কয় লক্ষ লোক বাস করেন, তাঁহারা ঐ প্রশ্ন না করিতেও পারেন, কিন্তু কলিকাতাই বঙ্গদেশ নহে এবং বঙ্গদেশই ভারতবর্ষ নহে। ভারতবর্ষ জানিতে চাহিতে পারে, সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস-ভবন এই দীর্ঘকালের মধ্যেও রূপায়িত না হইল কেন? "ভারতবর্ষ" মারফৎ এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিব এবং বলিব যে কল্পলোকে নহে, এই মর্ত্তলোকেই তাহা বিদ্যমান রহিয়াছে। বিশাল বঙ্গদেশ ও বিরাট ভারতবর্ষের নিকট সানুনয় নিবেদন, ভবন আমি দেখাইব। উদ্ধত উন্নত উচ্চ শিরে নহে—লজ্জাবনত মস্তকে সঙ্কোচধিক্কৃত ধীর পদে আসিতে হইবে, আমিও নতশিরে পথ প্রদর্শন করিব। দেখিয়া লজ্জায় হতবাক্ হইতে হয়—হইবেন; জাতির জীবনে ধিক্কার জাগে, উপায় নাই!

নামটি আজ আভাষেই বলিয়া রাখি—মহাজাতিসদন। আগামী মাসে ইতিহাস বিবৃত করিব।



ইঙ্গ—মার্কিণ আর্থিক চুক্তি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরেই মার্কিণ প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যখন ঋণ ও ইজারা চুক্তিকে একান্তভাবে যুদ্ধকালীন নীতি বলিয়া বাতিল করিয়া দিলেন, তখন দেউলিয়া ব্রিটিশসরকারের মাথায় হইল বজ্রাঘাত। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভার বহনে ব্রিটেন নিঃস্ব ও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধের খরচ চালাইতে ব্রিটেনকে অন্যদেশস্থ সম্পত্তির অধিকাংশ বিক্রয় করিতে হইয়াছে; আমেরিকার নিকট হইতে ঋণ ও ইজারা নীতিতে গ্রহণ করিতে হইয়াছে—ঋণ হিসাবে বহু পরিমাণ মাল; ভারতবর্ষ, ক্যানাডা, মিশর প্রভৃতি দেশের নিকট জমিয়া উঠিয়াছে ব্রিটেনের পর্ব্বতপ্রমাণ ঋণ। যুদ্ধের পরে ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয় হইয়া উঠে যে যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার চিন্তায় তাহার পক্ষে জয়ের আনন্দ পর্য্যন্ত ভোগ করা সম্ভব হয় নাই। এই শোচনীয় অবস্থা হইতে ব্রিটেন একমাত্র আমেরিকার সাহায্যেই উদ্ধার পাইবার আশা রাখে। কিন্তু সেই ধনী ও মিত্ররাষ্ট্র আমেরিকা পর্য্যন্ত যখন যুদ্ধ থামিতে না থামিতেই ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থানুসারে লেনদেন বন্ধ করিয়া দিল, তখন ব্রিটেনের রাষ্ট্রপরিচালকবর্গ চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। যুদ্ধকালীন নীতি যুদ্ধাবসানে বাতিল হইবে ইহা অতি সহজ বুদ্ধির কথা। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যখন এই নীতি বাতিল হইবার কথা ঘোষণা করেন তখন কাহারও অবাক হইবার কিছুই ছিল না! কিন্তু তবু আত্মকেন্দ্রিক অনেক ব্রিটেনবাসী এমন কথাও ভাবিয়াছে যে, হয় তো চার্চ্চিল-পরিচালিত টোরী সরকারের সমর্থক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের নবগঠিত শ্রমিক সরকারকে বিপন্ন ও জনসাধারণের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করাইবার জন্যই এই চুক্তি বাতিল করিয়া দিল। যাহা হউক চুক্তি বাতিল হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটেন কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য-লাভের আশা ছাড়িতে পারিল না। শ্রমিকসরকার সমস্ত অসম্মান মাথা পাতিয়া লইয়া শেষপর্য্যন্ত বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ লর্ড কিনেসের অধীনে একদল প্রতিনিধি যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করিলেন। কথা রহিল, ব্রিটেনের চরম দুরবস্থা সালঙ্কারে বিবৃত করিয়া এই প্রতিনিধিমণ্ডলী ব্রিটেনকে যে কোনভাবে আর্থিক সাহায্য করিবার জন্য মার্কিণ সেনেটকে অনুরোধ করিবে। যুক্তরাষ্ট্রে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড হ্যালিফ্যাক্সও এই প্রতিনিধিমণ্ডলীতে যোগ দিলেন।

তারপর কিনেস-হ্যালিফ্যাক্স মিশন দীর্ঘকাল যাবৎ মার্কিণ সেনেটের সহিত আর্থিক চুক্তি সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা চালান। উভয়পক্ষ হইতেই নানাভাবে চুক্তিটি সপক্ষে রাখিবার জন্য নানা চেষ্টা চলে। মার্কিণ সেনেটের একদল সদস্য ব্রিটেনের নিকট আমেরিকার পাওনার কথা ও বিভিন্ন সাম্রাজ্যভুক্ত দেশের কাছে ব্রিটেনের পর্ব্বতপ্রমাণ দেনার কথা উল্লেখ করিয়া ব্রিটেনকে নূতন কোন ঋণপ্রদানে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। আর একদল সদস্য খোলাখুলিভাবে বলেন যে, যে পর্য্যন্ত ব্রিটেন অটোয়া চুক্তি অনুযায়ী বাণিজ্যক্ষেত্রে সাম্রাজ্যিক সুবিধা গ্রহণের নীতি চালু রাখিবে, সে পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহাকে কিছুতেই আর্থিক সাহায্য করিতে পারে না; কারণ বাণিজ্যব্যাপারে ব্রিটেন কোন অন্যায় সুবিধা পাইলে শিল্পের উপর নির্ভরশীল অপর সমৃদ্ধ রাষ্ট্র আমেরিকার তাহাতে সমূহ ক্ষতি। যাহা হউক, এইরূপ সর্ত্তাদি লইয়া অনেকদিন দড়ি টানাটানি চলে।

তবে এই দড়ি টানাটানিতে শেষ পর্য্যন্ত ব্রিটেনেরই জয় হইয়াছে। কিনেস-হ্যালিফ্যাক্স মিশন শেষ অবধি মার্কিণ সেনেটকে ব্রিটেনকে ঋণপ্রদানে রাজী করাইয়াছে এবং রাজী করিতে সাম্রাজ্যিক সুবিধার নীতি বাতিল করার মত ব্রিটেনকে কোন স্বার্থত্যাগ করিতে হয় নাই।

ইঙ্গ-মার্কিণ আর্থিক চুক্তি অনুসারে ব্রিটেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ৪৪০ কোটি ডলার বা ১৪৬৬ কোটি টাকা ঋণস্বরূপ লাভ করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই টাকার মধ্যে ব্রিটেনকে ব্যবসা-বাণিজ্যাদির জন্য ব্যয় করিতে হইবে ১২৫০ কোটি টাকা এবং বাকী টাকা ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থায় ব্রিটেন কর্ত্তৃক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে গৃহীত মালের দাম চুকাইবার জন্য খরচ করিতে হইবে। এই চুক্তি অনুসারে মার্কিণ শাসন পরিষদের অনুমোদন হইলেই ব্রিটেন দেনার টাকা পাইয়া যাইবে, কিন্তু এই দেনা তাহাকে শোধ করিতে হইবে ১৯৫১ সাল হইতে ৫০টি বাৎসরিক কিস্তিতে। এই ঋণের দরুণ শতকরা ২ ডলার হিসাবে সুদ ধার্য্য হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, দেনার টাকা হাতে পাইবার এক বৎসরের মধ্যে ব্রিটেন ষ্টার্লিং এলাকাভুক্ত দেশসমূহ হইতে গৃহীত দেনার একাংশ প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা করিবে এবং এই সময় এই সব পাওনাদার দেশের ব্রিটেনের সহিত কারবারে যদি কোন বাণিজ্য উদ্বৃত্ত থাকে, তবে সমস্ত পাওনা ব্রিটেনের মারফৎ সেই দেশ পৃথিবীর যে কোন দেশের মুদ্রায় লাভ করিতে পারিবে। হিসাবে দেখা গিয়াছে ব্রিটেন যদিও ১৪৬৬ কোটি টাকা ধার করিতেছে, সুদে আসলে তাহাকে শোধ দিতে হইবে মোট ১৯৮৫ কোটি টাকা, অর্থাৎ ৩১৯ কোটি টাকা সুদ হিসাবে দিতে হইবে।

আগেই বলা হইয়াছে, ব্রিটেন যুদ্ধের দায়ে নিঃস্ব ও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধোত্তর সমস্যা যুদ্ধকালীন সমস্যার চেয়ে অনেক বড় এবং যুদ্ধের পরে অন্তর্দ্দেশীয় সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থান বজায় রাখিয়া দেশের আর্থিক ভারসাম্য রক্ষা করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। ব্রিটেনের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে হইলে তাহার শিল্পবাণিজ্য পুনর্গঠিত করিতে হইবে, কিন্তু সেজন্য প্রয়োজন বিপুল

পরিমাণ অর্থের। এই অর্থবিহনে বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটেনের পক্ষে বাঁচিয়া থাকাও হয় তো সহজ হইত না। কাজে কাজেই যে কোন ভাবে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ঋণসংগ্রহ করিয়া ব্রিটেন যে এ যাত্রায় বাঁচিয়া গেল তাহা বলাই বাহুল্য। ঋণের সুদের হার ব্রিটেনের অবস্থার তুলনায় খুব চড়া হইয়াছে, ব্রিটেনে অনেকে এ ধরণের অভিযোগ করিয়াছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে বর্ত্তমান ফাঁপাবাজারে সুদের হার একটু চড়া বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে দুইটি কথা আছে। প্রথমতঃ ব্রিটেন অধমর্ণ দেশ; কাজেই মহাজন হিসাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি একটু সুবিধা গ্রহণ করে তাহাতে বলিবার কিছু নাই। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ আর্ণেষ্ট বেভিনও সমালোচকদের শুব্ধ হইবার নির্দ্দেশ দিয়া এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"The fact is we are to borrow and we are not in a position to dictate terms" (আসল কথা, আমরা অধমর্ণ এবং সর্ত্ত স্থির করিবার অধিকার আমাদের নাই।) তাছাড়া বর্ত্তমান দুঃসময়ে ব্রিটেন এই আর্থিক সাহায্য লাভ করিয়া দেশের শিল্পবাণিজ্যের পুনর্গঠন করিতে পারিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য্য অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা বিদূরিত হইয়া ব্রিটেনের পক্ষে সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থান বজায় রাখা সম্ভব হইবে। এদিক হইতে সুদের হার একটু বেশী হইলেও তাহাতে ক্ষুণ্ণ বা ক্ষুব্ধ হওয়ার কিছু নাই। দ্বিতীয়তঃ, যদিও শতকরা ২ ডলার হিসাবে সুদের হার স্থির হইয়াছে, তবু আসলে সুদ দিতে হইবে ১৯৫১ সাল হইতে, এখন হইতে নয়। এই ছয় বৎসর বিনাসুদে ব্রিটেন যে ১২৫০ কোটি টাকা ভোগ করিবে, তজ্জনিত সুবিধা সে পাইবে যথেষ্ট এবং এই ছয় বৎসরের হিসাব ধরিলে বাস্তবিক সুদের হারও শতকরা বার্ষিক ২ টাকা অপেক্ষা হিসাবে অনেক কম হইবে। যদিও চড়া সুদে ধারের ব্যাপারে ব্রিটেনে অনেকে ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, তবু এই চুক্তির পরিণাম ভাবিয়া যাহারা আতঙ্কিত হইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যাই বেশী। অধিকাংশ ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদই ভাবিতেছেন যে এই চুক্তির ফলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বাণিজ্য বাজারে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিবে। এক তো ব্রিটেনকে দেনদার করিয়া যুক্তরাষ্ট্র স্বাভাবিক ভাবেই তাহার উপর কতকটা মাতব্বরী করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে, তা ছাড়া চুক্তি অনুসারে এম্পায়ার ডলার পুল তুলিয়া দিবার যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহাও ব্রিটিশ স্বার্থের দিক হইতে সম্ভবতঃ মহাক্ষতির কারণ হইবে। ইতিপূর্ব্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ও ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেটারী দেশসমূহকে লইয়া ষ্টার্লিং এলাকা যে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য চালাইত, তাহাতে উদ্বৃত্ত ডলার সম্পদ বিভিন্ন দেশ ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারিত না এবং যুদ্ধের মধ্যে এম্পায়ার ডলার পুলের মারফৎ ব্রিটেনই বলিতে গেলে বিভিন্ন দেশের ডলার লিজ-হিসাবে গ্রহণ করিয়া মার্কিণ পণ্যে অন্তর্দ্দেশীয় পণ্য চাহিদার মীমাংসা করিয়াছে। ব্রিটেনের এই স্বার্থপর নীতির জন্য ভারতবর্ষের ন্যায় অনুকূল বাণিজ্যিক গতিসম্পন্ন দেশের পাওনা ডলারগুলি বেহাত হইয়া গিয়াছে এবং পরিবর্ত্তে জুটিয়াছে সমমূল্যের কাগজী ষ্টার্লিং সিকিউরিটি। ইহার ফলে মার্কিণ যন্ত্রপাতি আনিয়া ভারতে শিল্পসমৃদ্ধি ঘটাইবার অথবা মার্কিণ পণ্যে ভারতের প্রচণ্ড অভাব মিটাইবার যে সম্ভাবনা ছিল, প্রয়োজনীয় ডলারের অভাবে সে সুবিধা ভারতবর্ষ পাইতেছে না। ইঙ্গ মার্কিণ আর্থিক চুক্তিতে স্থির হইয়াছে যে, অতঃপর সাম্রাজ্যিক ডলার তহবিল তুলিয়া দিয়া সমস্ত ষ্টার্লিং এলাকাভুক্ত দেশকেই বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত তহবিল পৃথিবীর যে কোন দেশের মুদ্রায় ব্যবহার করিবার সুযোগ দিতে হইবে। এখন কথা হইতেছে এই যে, ভারতবর্ষ, মিশর প্রভৃতি দেশ এতদিন ব্রিটেন হইতে মাল আমদানী করিত নিছক প্রয়োজনের তাগিদে, ব্রিটেনকে ভালবাসিয়া নয়। এখন যন্ত্রপাতির ও নানাবিধ শিল্প পণ্যের দিক হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই ব্রিটেন অপেক্ষা প্রত্যক্ষভাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এ অবস্থায় যদি যে কোন বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তকে ডলারে রূপান্তরিত করিবার সুযোগ থাকে, তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে ব্রিটেনের ভূতপূর্ব্ব একচেটিয়া এই সকল বাজারে পণ্য রপ্তানী অবশ্যই বাড়িয়া যাইবে। যদিও ৪৪০ কোটি ডলার ঋণ পাওয়ায় ব্রিটেন আশা করিতেছে যে, তাহার পক্ষে যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় শতকরা ৭৫ ভাগ রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারিত করা অতঃপর সম্ভব হইবে, তথাপি এইভাবে প্রবল মার্কিণ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইলে সেই রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুবিধা ব্রিটেন শেষ পর্য্যন্ত কতটা কাজে লাগাইতে পারিবে সে বিষয়ে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদগণ পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত নন। যাহা হউক, সমস্ত ভাল মন্দ জানিয়া শুনিয়াও ব্রিটেনের হাউস অফ কমন্স এবং হাউস অফ লর্ডস নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই ইঙ্গ-মার্কিণ আর্থিক চুক্তি মানিয়া লইয়াছে। ব্রিটেন জানে, বিরাট স্বর্ণসম্পদশালী আমেরিকার মতলব শেষ পর্য্যন্ত ব্রিটেনকেও স্বর্ণমান প্রবর্ত্তনে প্ররোচিত করিয়া পৃথিবীর আর্থিক নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে রাখা; কিন্তু স্বর্ণমানে ফিরিয়া যাওয়া ব্রিটেনের পক্ষে অসম্ভব-প্রায় হইলেও অবস্থা বৈগুণ্যে ব্রিটেনের পক্ষে মার্কিণ সাহায্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হইল না।

ব্রিটেনের অবস্থা যাহাই হউক, ইঙ্গ-মার্কিণ আর্থিক চুক্তি আমাদের ভারতবর্ষের পক্ষে কল্যাণকর হইবে কি না, সে কথা চিন্তা করার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। সকলেই জানেন, ভারতবর্ষ যুদ্ধের সময় নিজেকে বঞ্চিত করিয়া ব্রিটেনকে ধারে যে সকল পণ্য জোগাইয়াছিল, মূলতঃ তজ্জন্যই ব্রিটেনের নিকট তাহার প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা পাওনা হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য ব্রিটেনের আর্থিক বনিয়াদ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু যুদ্ধের দক্ষিণা হিসাবে ভারতবর্ষকেও বড় কম ত্যাগস্বীকার করিতে হয় নাই। তাছাড়া যুদ্ধের চাপে ভারতবর্ষ আজ তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ দৈন্য তীব্রভাবে উপলব্ধি করিয়াছে। এই দৈন্য হইতে রেহাই পাইতে হইলে ভারতবর্ষকেও প্রাথমিক ব্যয় রূপে বহু অর্থ নিয়োজিত করিতে হইবে। ভারতের চলতি নোটের পরিমাণ বর্ত্তমানে প্রায় ১২ শত কোটি টাকা, অথচ ইহার বিপরীত দিকে জামিন হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে আছে মাত্র ৪৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার সোনা। এ অবস্থায় ভারতের পক্ষে আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হইতেছে ব্রিটেনের নিকট পাওনা হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার লণ্ডন শাখায় সঞ্চিত প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার ষ্টার্লিং সিকিউরিটি—

উপর। এই পাওনা টাকা যদি ভারতবর্ষ আদায় করিতে পারে তবেই তাহার পক্ষেও অদূর ভবিষ্যতে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য পুনর্গঠন করিয়া অন্তর্দ্দেশীয় আর্থিক ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হইবে। এতদিন ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থা স্পষ্টতর হতাশাজনক ছিল, ইচ্ছা করিলেও ব্রিটেন যে আমাদের দেনা শোধ দিতে পারিত না, তাহা আমরা ভালভাবেই জানিতাম। প্রকৃতপক্ষে গত ব্রেটন-উডস সম্মেলনে ব্রিটিশ প্রতিনিধি লর্ড ফিনেস খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, নীতি হিসাবে ভারতের পাওনা প্রত্যর্পণ করাই ব্রিটেনের উচিত, কিন্তু ব্রিটেনের পক্ষে চরম আর্থিক দুরবস্থার জন্য বর্ত্তমানে সেই কর্ত্তব্য পালন করা সম্ভব নহে। আলোচ্য ইঙ্গ-মার্কিণ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় ব্রিটেন যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় শতকরা ৭৫ ভাগ শিল্প বাণিজ্য সম্প্রসারণের আশা করিতেছে; তাহার এইভাবে আর্থিক সমৃদ্ধি সাধিত হইলে ভারতের ন্যায্য পাওনাও যে অপ্রত্যর্পিত থাকিবে না, ইহা আমরা সহজেই আশা করিতে পারি। তাছাড়া চুক্তি অনুসারেই ব্রিটেন এক বৎসরের মধ্যে ষ্টার্লিং এলাকাস্থ দেশগুলির পাওনার একাংশ পৃথিবীর যে কোন মুদ্রায় ফিরাইয়া দিতে রাজী হইয়াছে, এদিক হইতে ভারতের জলে পড়িয়া যাওয়া পাওনা ফিরিয়া পাইবার কতকটা নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিতেছে বলিয়া এই চুক্তি সম্বন্ধে ভারতবাসী অনেকখানি আশা পোষণ করিতেছে।

কিন্তু ইহার আর একটি দিক আছে। ইঙ্গ-মার্কিণ আর্থিক চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষ অন্ততঃ একাংশ ষ্টার্লিং পাওনা ফিরিয়া পাইবার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছে সত্য। কিন্তু এইভাবে একাংশ ফিরাইয়া দিয়া বাকী পাওনার বেলায় ব্রিটেন যদি ফাঁকী দিবার মনোভাব দেখান, তাহা হইলে সমগ্র ভারতবাসীই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের পাওনার একটি বড় অংশ ফাঁকী দিবারও যে কিছু কিছু সম্ভাবনা আছে, তাহা ইঙ্গ-মার্কিণ আর্থিক চুক্তিটি মন দিয়া পড়িলে স্বতঃই মনে হয়। চুক্তিতে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটেনের ষ্টার্লিং দেনাকে মোটের উপর তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইবে। আগামী এক বৎসরের মধ্যে পাওনার যে অংশ ব্রিটেন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে তাহা হইবে প্রথম শ্রেণী; ১৯৫১ সাল হইতে কিস্তিবন্দীভাবে ব্রিটেন যে অংশ পরিশোধের ব্যবস্থা করিবে তাহা হইবে দ্বিতীয় শ্রেণী এবং যুদ্ধকালীন পাওনা-দেনার হিসাব-নিকাশেরও মজুত তহবিলের জন্য পাওনার যে অংশ সরাইয়া রাখা হইবে তাহা হইবে তৃতীয় শ্রেণী। প্রকৃতপক্ষে ভারতের মত দেশের পাওনা জমিয়াছে দারুণ দুঃখবরণের বিনিময়ে। বিপদের সময় ব্রিটেন ভারতের যে অর্থ হাত পাতিয়া লইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল, আজ উপায় থাকিলে তাহা পুরোপুরী শোধ দিয়া ভারতের বাঁচিবার ব্যবস্থা করাই তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া ব্রিটেন যে এইভাবে ইঙ্গ-মার্কিণ চুক্তির মারফৎ তাহার ন্যায্য পাওনা ফাঁকী দিবার না হইলেও প্রত্যর্পণে অযথা বিলম্ব করিবার ব্যবস্থা করিল, তাহা ভারতের স্বার্থের পক্ষে মারাত্মক হইবে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। বাস্তবিক প্রথমতঃ ব্রিটেন এক বৎসরের মধ্যে কতটা শোধ করিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। দ্বিতীয়তঃ ১৯৫১ সালে কিস্তি আরম্ভ হইলেও দেনার কতটা অংশ কিস্তিবন্দীতে পরিশোধিত হইবে তাহাও এখন নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তাছাড়া এই কিস্তি যত দীর্ঘ দিন ধরিয়া চলিবে, ততই ভারতের আর্থিক বনিয়াদের পুনর্গঠনে বিলম্ব দেখা দিবে। সব শেষে ব্রিটেন যুদ্ধকালীন দেনা পাওনা মিটাইবার জন্য দেনার কতক অংশ মজুত রাখার ও কতক অংশ বাতিল করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই আমাদের বিবেচনায় ভারতীয় স্বার্থের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিকূল ব্যবস্থা। ব্রিটেন দরকারের সময় সোজাসুজি দেনা করিয়াছে, পরিশোধের সময় সেই দেনার একাংশ বাতিলের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। সম্প্রতি ভারতের পাওনা ফাঁকি দিবার, অথবা অন্ততঃ কমাইবার জন্য ব্রিটেনে একটি আন্দোলন অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে একশ্রেণীর ব্রিটিশ সংবাদপত্র প্রচার সুরু করেন যে, ভারতবর্ষ নাকি যুদ্ধের সময় ব্রিটেনের অসহায়তার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সরবরাহকরা মালপত্রের অন্যায় দর লইয়াছে, কাজেই ন্যায্য হিসাবে তাহার পাওনা কমিয়া যাওয়া উচিত। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এই অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটি কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তথ্যাদি সহ প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, ভারতের সততা সম্পর্কে এইরূপ অভিযোগ মিথ্যা। সম্প্রতি আবার কয়েকটি ব্রিটিশ সংবাদপত্র আন্দোলন করিতেছে যে, ভারতবর্ষ নাকি যুদ্ধের জন্য তেমন কোন স্বার্থত্যাগ করে নাই, কাজেই এই অল্পতর স্বার্থত্যাগের বিবেচনায় তাহার পাওনা কমাইয়া দেওয়া হউক। বলা বাহুল্য, এই অভিযোগও যে একান্ত মিথ্যা, তাহা ভারতের সম্বন্ধে সাধারণজ্ঞানসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন। যুদ্ধের জন্য ভারতে ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে, পণ্যাভাবে এদেশের ৩৫ লক্ষ হতভাগ্য নরনারী অনাহারে মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। বে-সামরিক ভারতবাসী সামরিক বিভাগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সকল দিক হইতে যে অভাব বরণ করিয়া লইয়াছে, ইতিহাসে তাহার তুলনা মিলে না। ভারত হইতে যুদ্ধের মধ্যে এক সময় মাসে ৭০ হাজারের বেশী লোক সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে পূর্ব্ব এশিয়ায় যুদ্ধ বাধিবার পর ভারত-সরকারের যুদ্ধ জয়ের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই ছিল না, কাজেই বেসামরিক ভারতবাসীর বা ভারতের সাধারণ উন্নতি সাধনের দিকে তাঁহারা নজর দিবার পর্য্যন্ত অবকাশ পান নাই। এই ভাবে নিজেকে সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত করিয়া ব্রিটেনকে সাহায্য করা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের নামে যদি যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ না করিবার অভিযোগ আনা হয়, সেই অভিযোগের যথার্থতা লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সাধারণ ব্রিটেন-বাসী বা ব্রিটিশ সংবাদপত্র নয়, ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল পর্য্যন্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অক্ষশক্তির হাতে নিষ্পেষিত হইতে না দিয়া ভারতবর্ষকে সম্মিলিত শক্তি প্রাণে বাঁচাইয়া দিয়াছে, এই সৌভাগ্যের বিনিময়ে তাহার উত্তমর্ণত্ব কিছুতেই সমর্থনীয় নয়। হাউস অব কমন্সে ভারতের পাওনা কমাইবার উদ্দেশ্যে চার্চ্চিল স্পষ্টই বলেন :—"We are told we owe £ 1,200,000,000 to the Government of India and £ 400,000,000 to Egypt. Egypt would have

been ravished and pillaged by German arms. Is there to be no recognition of that? The same argument applies to the Government of India." (আমাদের বলা হয় যে, আমরা নাকি ভারত সরকারের নিকট ১২০ কোটি পাউণ্ড এবং মিশর সরকারের নিকট ৪০ কোটি পাউণ্ড ধারি। জার্ম্মানীর অভিযানে মিশর ধ্বংস হইয়া যাইত। সে কথা কি মনে রাখিবার মত নয়? ভারত সরকার সম্বন্ধেও এই একই যুক্তি উপস্থাপিত করা চলে।) বলা নিষ্প্রয়োজন, প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী একান্ত স্বার্থবাদী দৃষ্টিকোণ হইতেই এই কথা বলিয়াছেন। ১৯৪০ সালের চুক্তি অনুসারে ব্রিটেন ভারতের যুদ্ধ-ব্যয়ের একাংশ যোগাইবার প্রতিশ্রুতি দেয়। মিঃ চার্চ্চিল প্রমুখ অনেক ব্রিটেনবাসীর বক্তব্য এই যে, যুধ্যমান দেশ হিসাবে ভারতবর্ষ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ চালাইতে বাধ্য এবং যুদ্ধজয়ের গৌরব তাহার নিজস্ব বলিয়া যুদ্ধব্যয়ের অংশীদার হইবার জন্য তাহার কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত নহে। কথাটা কিন্তু আমাদের দিক হইতে যুক্তিসহ নয়। ভারতবর্ষ যুদ্ধ করিয়াছে সত্য, কিন্তু স্বেচ্ছায় করে নাই। অপ্রস্তুতির জন্য হিটলারের শ্রেষ্ঠ সুহৃদ মুসোলিনীর ইটালী ৯ মাস যুদ্ধ হইতে দূরে থাকিতে পারে, ব্রিটেনের একান্ত আপন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ২৭ মাস নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারে, স্পেন বা আয়ার্লণ্ড বরাবর উভয় পক্ষকে হাতে রাখিয়া চলিতে পারে, আর অতি উজ্জ্বল অষ্টাদশ শতাব্দীর সমরায়োজন-সম্পন্ন ভারতবর্ষের কি এই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হওয়া চলিত না? যুদ্ধে ভারত সরকার যোগ দিয়াছেন ব্রিটিশ সরকারের অঙ্গুলি হেলনে, তজ্জন্য ভারতবাসীকে তাহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। এ অবস্থায় ভারতবর্ষ যে যুদ্ধের জন্য তাহার ধনপ্রাণ নিয়োজিত করিয়াছে, তাহা আত্মরক্ষার জন্য নয়, ব্রিটেনকে বাঁচাইবার এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য। কাজেকাজেই ভারতের সমরায়োজনে ব্রিটেন যেটুকু সাহায্য করিয়াছে, তাহা করিয়াছে সম্পূর্ণভাবে আপন স্বার্থে; ভারতবর্ষ ব্রিটেনের আত্মরক্ষাসংক্রান্ত যুদ্ধে যেটুকু আত্মত্যাগ করিয়াছে তাহা করিয়াছে তাহার পরাধীনতার দক্ষিণা প্রদান হিসাবে। এদিক হইতে যাহারা ইঙ্গ-ভারতীয় সমরব্যয় সংক্রান্ত চুক্তি সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে আসেন, তাঁহারা ভারতের স্বার্থ চোখ বুজিয়া অস্বীকার করিবার দৃঢ়সংকল্প লইয়াই আসিয়া থাকেন। এখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, ব্রিটেন বিজয়ী হইয়াছে; যুদ্ধজয়ের গৌরব একা ভোগ করিবার লোভে ও ক্ষমতার অহঙ্কারে আজ যদি সে ভারতের সমস্ত সাহায্যের কথা ভুলিয়া বসে এবং তাহার সর্ব্বনাশের বিনিময়ে পাওনা ষ্টার্লিং পাওনা কমাইতে মনস্থ করে, তাহা কোন দিক হইতেই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক হইবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের বিদেশী দেনা কমাইয়া দিতে পারিলেই খুসী হয়, কারণ তাহাতে ব্রিটেনের পক্ষে মার্কিন দেনা শোধ করিবার অধিকতর সম্ভাবনা থাকে। এই আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবই ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক চুক্তিতে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যিক দেনা সম্বন্ধে অবলম্বিত বিধিব্যবস্থার মূলে কাজ করিয়াছে। বাস্তবিক ইতিপূর্ব্বে যখন ব্রিটেনকে ধার দেওয়ার কথা মার্কিন সেনেটে আলোচিত হইতেছিল তখন বামপন্থী সেনেটর ইমানুয়েল সেলার পরিষ্কারই বলিয়াছিলেন যে, ব্রিটেন যদি তাহার বিদেশী দেনা কমাইবার ব্যবস্থা না করে তাহা হইলে তাহাকে আর নূতন ঋণ প্রদান করা চলে না। ভারতের পাওনার একাংশ হইতে ব্রিটেনকে মুক্তি দিবার মতলব যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আছে, ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক চুক্তি ভালভাবে অনুধাবন করিলে ইহা স্বতঃই মনে হয়। আর্থিক চুক্তির অন্তস্থ ভারতের ক্ষতিসাধনের এই ষড়যন্ত্র অনুমান করিয়াই ভারতের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকামী অনেকে এই চুক্তির কঠোর বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন।

ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক চুক্তির ফলে ডলার এলাকার সহিত ষ্টার্লিং এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্যে বহু পরিমাণ সম্প্রসারণ ঘটিবে এবং সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র আমেরিকা এই চুক্তির ভিতর দিয়া পৃথিবীর বাণিজ্য-বাজারের উপর একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিবে। ব্রিটেনও এই চুক্তির সুযোগে সুবিধা পাইবে তাহার ভগ্নপ্রায় আর্থিক বনিয়াদ পুনর্গঠন করিবার। সংক্ষেপে ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক চুক্তির ফলে পৃথিবীতে ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক মাতব্বরীর অধিকার কায়েমী করিবারই ব্যবস্থা হইয়াছে। অবশ্য শোষিত দেশ হিসাবে পৃথিবীর অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের ভার ব্রিটেনের হাত হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে গেলে ভারতের বিশেষ কিছু আসে যায় না। তবে জলে পড়িয়া যাওয়া ষ্টার্লিং পাওনা ফিরিয়া পাওয়া সম্বন্ধে এই চুক্তিতে যে সামান্য হদিশ মিলিয়াছে, পরমুখাপেক্ষী ভারতের নিকট তাহাই সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। তবে কথা হইতেছে, ভারত সরকার যদি ভারতের স্বার্থ সম্বন্ধে তাঁহাদের চিরাচরিত উদাসীন মনোভাব পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে এই চুক্তি অবশ্যই এদেশের আর্থিক সৌভাগ্য সূচিত করিতে পারে। ষ্টার্লিংয়ের কত অংশ প্রত্যর্পণ করা হইবে, কোন মুদ্রায় সেই প্রত্যর্পিত ষ্টার্লিং গ্রহণ করা হইবে, বাকী ষ্টার্লিং কত কম কিস্তিতে আদায় করা সম্ভব, ভারতের অতি ন্যায্য পাওনার এক ভাগ কেনই বা বাতিলের কথা উঠে;—ইত্যাদি প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলি যদি ভারত সরকার সহৃদয়তার সহিত বিবেচনা করেন এবং ভারতের প্রকৃত শাসনের মত দৃঢ় মনোভাব লইয়া এ-সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের সহিত আলোচনায় অগ্রসর হন, তাহা হইলে চুক্তির ফলে ভারতের কোনরূপ ক্ষতি নাও হইতে পারে। আসন্ন নির্ব্বাচনে কংগ্রেস জয়যুক্ত হইবেই এবং অদূর ভবিষ্যতে ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য। এই নূতন গভর্ণমেণ্ট যে বর্ত্তমান ভারত সরকারের ন্যায় এদেশের স্বার্থ উপেক্ষা করিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এখন অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন যে, নূতন জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার আগেই ব্রিটিশ সরকারের নির্দ্দেশে ভারত সরকার হাত-ধরা কোন ভারতীয় কর্ম্মচারীর মারফৎ ষ্টার্লিং পাওনা সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া লইবেন। বাস্তবিক ব্রিটেনেও অনতিবিলম্বে ভারতের পাওনা সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার বিশেষ তোড়জোড় দেখা যাইতেছে। অবশ্য এইভাবে অনিবার্য্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবার আগেই যদি ভারত সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তাহা স্বতন্ত্র কথা। জাতীয় সরকার গঠিত হওয়া পর্য্যন্ত ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের একমাত্র আশা—এই ষ্টার্লিং পাওনা সম্পর্কে শেষ আলোচনা কিছুতেই বর্ত্তমান ভারত সরকারের চালানো উচিত নয়। বলা নিষ্প্রয়োজন,

ব্রিটিশ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে ভারত সরকার যদি আগামী গভর্ণমেণ্টের পদগ্রহণের আগেই ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটেনের নিকট পাওনা সম্পর্কে মীমাংসা করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে নূতন গভর্ণমেণ্ট দারুণ বিপদে পড়িবেন এবং জনমত এই দুর্নীতিমূলক স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে। বাস্তবিক ভারত সরকারের বোঝা উচিত যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় জনমত প্রথম মহাযুদ্ধের পরের জনমত অপেক্ষা অনেক অগ্রসর হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক যুদ্ধ তহবিলে দানের নামে ভারতের ১৯০ কোটি টাকা ব্রিটিশ সরকার ফাঁকি দিয়াছিলেন, সেই ক্ষতি ভারতবাসী একরূপ নিঃশব্দেই সহ্য করিয়াছিল ; এবার কিন্তু সেই লোভী মনোভাবের পুনরাবির্ভাব দেখা গেলে ভারতের জাগ্রত জনমত কিছুতেই শোষণকারী শাসকের সেই জুলুম সহ্য করিবে না।

শ্যামসুন্দর

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম্-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

গঙ্গা তীরে খড়দহে বীরভদ্র কি বিরহে,
নিত্য করে নাম সংকীর্ত্তন,
নাহি ছিল ভেদাভেদ, সবাই অন্তরে খেদ,
প্রভু হেথা হও প্রকটন।
নামরসে কি মত্ততা মুখে সদা হরি কথা,
ক্ষণে ক্ষণে ঝরে আঁখি লোর—
ভক্তগণ লয়ে সাথে কীর্ত্তন আনন্দে মাতে
এ সুখের নাহি বুঝি ওর।
অন্বেষিয়া মনে মনে, গোপন আরাধ্য ধনে
একদিন গেলা গৌড়পুর,
পাৎসাহ সমাদরে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া, পরে
সুধাইল কুশল সাধুর।
কি কারণে আগমন হে পণ্ডিত মহাজন,
শুনিয়াছি ফকিরালী কিছু—
জানা আছে হে ঠাকুর, পথ ক্লান্তি কর দূর,
অন্য কথা হবে সব পিছু।
আমার গৃহেতে আজি ভোজনে হউন রাজী
শুনি প্রভু বীরভদ্র হাসে,
যদি তব অন্ন খাই ভিন্ন ধর্ম্মী কহি তাই
আমি হিন্দু—তা'তে জাতি নাশে।
তবে যদি ভালবেসে তুমি নবাবের বেশে
পাশে বসে হেথা খানা খাও,
শীঘ্র তবে কর ত্বরা ইচ্ছামত পাত্রভরা
খাদ্য কিছু হেথায় আনাও।
পাৎসা' নির্দ্দেশ পেয়ে কিঙ্কর ছুটিল ধেয়ে
বাবুর্চ্চী করিল আয়োজন,
বীরভদ্র ইষ্টদেবে স্মরিয়া কহিল, এবে
বন্ধন করহ উন্মোচন।
সদ্যধৌত বস্ত্রে বেঁধে বাবুর্চ্চী এনেছে রেঁধে
নিজ হস্তে খাদ্য নবাবের,
পাৎসাহ হাসিমুখে কহিল সমুখে ঝুঁকে,
কি এনেছ ? দেরী হ'ল ঢের !
খুলিয়া ঢাক্‌নীখানি চোখে না প্রত্যয় মানি
কোথা খাদ্য এ যে পুষ্প রাজি !
মালতী মল্লিকা নানা নাহি নবাবের খানা,
একি ফকিরের কারসাজি !
বারবার তিনবার একই কাণ্ড ব্যবহার
তিনবারই বাহিরিল ফুল,
ক্ষুদ্র বীজে মহীরুহ যাঁর সৃষ্টি এ দুর্ব্বহ
কাণ্ড তারি নাহি বিন্দু ভুল।
নবাব বিস্ময় মানি' কহিল বিনয় বাণী
সাধু দান করহ গ্রহণ,
কিসে তুমি খুসী হবে কি আছে কিইবা লবে
লহ যাহা যাচে তব মন।
বীরভদ্র যুক্ত করে কহিল মধুর স্বরে,
কৃপা যদি কর পাৎসাহ,
ঝলমল করে শোভা মুনিগণ মনোলোভা
ও ভেলুয়া পাথরে আগ্রহ।
লভিয়া প্রস্তরখানি খড়দহে শিলা আনি
গড়াইল মূর্ত্তি মনোহর,
নয়নে মধুর হাসি করেতে মোহন বাঁশী
হের হোথা শ্রীশ্যামসুন্দর !

নঞ্‌তৎপুরুষ

বনফুল

"অসুখ করবে কেন? গাড়ী থামাতে বলব? জল চাই?—"

পুরন্দরবাবু ভয় পেয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

পাপিয়া তাঁর দিকে ফিরে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ—চোখ দুটো জ্বলছে যেন।

"কোথা নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?" তীক্ষ্ণকণ্ঠে হঠাৎ প্রশ্ন করল সে।

"খুব ভাল জায়গা, দেখবে খুব ভাল লোক তারা। চমৎকার ফাঁকা বাড়ি, অনেক সঙ্গী পাবে, কত খেলা করবে তারা তোমার সঙ্গে। ভয় কি, তোমার ভালর জন্যেই নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। রাগ কোরো না, পাপিয়া"

পুরন্দরবাবুর পরিচিত কেউ এ সময় তাঁকে দেখলে বিস্মিত হতেন।

"উঃ—কি—কি ভয়ঙ্কর লোক আপনি"—ক্ষোভে দুঃখে পাপিয়ার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল—জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে সে চেয়ে রইল শুধু।

"পাপিয়া, আমি—"

"আপনি পাজি, পাজি, পাজি, পাজি!"

নিজের হাত দুটো কচলাতে লাগল সে। পুরন্দরবাবু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন।

"পাপিয়া-মা—কেন এমন করছ, কেন এ কথা বলছ—"

"বাবা কি কাল আসবেন? সত্যি আসবেন?"

"হ্যাঁ। আমি নিজে নিয়ে আসব তাঁকে।"

"না, ঠিক ফাঁকি দিয়ে পালাবেন তিনি"

"তোমার বাবা কি ভালবাসেন না তোমাকে?"

"না, মোটেই না"

"দুর্ব্যবহার করেন তোমার সঙ্গে? বল"

পাপিয়া নীরব। তারপর তাঁর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্য দিকে চেয়ে রইল। অনেক সাধ্য সাধনা করলেন পুরন্দরবাবু, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কত কি বললেন, কত বোঝালেন, পাপিয়া শুনল বটে, কিন্তু মনে হল কিছু বিশ্বাস করছে না সে। কিন্তু সে যে শুনছে এতেই পুলকিত হয়ে উঠলেন তিনি। মানুষ মদ খেলে যে কি হয় তা-ই বোঝাতে লাগলেন তাকে। কোন ভয় নেই, তিনি তার আর তার বাবার যাতে কোন বিপদ না হয় তার ব্যবস্থা করবেন। পাপিয়া কি বুঝতে পারছে না যে তিনি তাদের কত আপন লোক, তাকে কত ভালবাসেন! পাপিয়া মুখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে চাইলে এবং তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চেয়েই রইল। তিনি গল্প করতে লাগলেন যে তার মায়ের সঙ্গে কত বন্ধুত্ব ছিল তাঁর, তাদের বাড়িতে কতবার গেছেন তিনি। এ কথা শুনে পাপিয়ার মন একটু ভিজল মনে হল। ক্রমশ সে দু' একটা প্রশ্নের উত্তরও দিতে লাগল, যদিও খুব সাবধানে এবং দু' এক কথায়। কিন্তু যা তিনি শুনতে চাইছিলেন তা কিছুতে বললে না সে, বাবার কথা একটি বললে না। পুরন্দরবাবু তার হাতখানা কথা বলতে বলতে ধরলেন এবং ধরেই থাকলেন। হাত সে টেনে নিলে না। নানা কথার মধ্যে একটা কথা কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠল—বাবাকে সে মায়ের চেয়ে বেশী ভালবাসত। বাবাই তাকে বরাবর বেশী স্নেহ করেছেন, মা তার দিকে ফিরেও চাইতেন না। কেবল মরবার আগে চুমো খেয়ে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলেন তিনি…অনেকক্ষণ…এখন সে মাকে খুব ভালবাসে, রোজ রাত্রে মনে পড়ে তাকে। পুরন্দরবাবু দেখলেন মেয়েটির আত্ম-সম্মান-জ্ঞান খুব আছে, কথায় কথায় এত কথা বলে ফেলে হঠাৎ যেন তার হুঁস হ'ল যে সে অন্যায় করছে—চুপ করে' গেল আবার। কান্নাকাটি আর করলে না, কিন্তু চুপ করে' রইল। বুনো জানোয়ারকে বন্দী করলে সে যেমন চুপ করে থাকে ঠিক তেমনি। একটা অচেনা জায়গায় যাচ্ছে বলেই যে তার কষ্ট হচ্ছিল তা ঠিক নয়। অন্য আর একটা কারণ ছিল।

পুরন্দরবাবু অনুভব করলেন সেটা। বাবার ব্যবহারে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল যেন তার। এত সহজে তিনি আসতে দিলেন তাকে একটা অচেনা লোকের সঙ্গে। মনে হল তার বোঝাটা পরের ঘাড়ে কোন ক্রমে তুলে দিয়ে বাঁচলেন যেন।

"মেয়েটা অসুস্থ"—পুরন্দরবাবু ভাবছিলেন—"খুবই অসুস্থ…ভয়ে ভাবনায় আরও কাবু হয়ে পড়েছে। মাতালটা করেছে কি! এতক্ষণে বুঝতে পারছি সব" কোচোয়ানকে জোরে হাঁকাতে বললেন তিনি। যাদবপুর জায়গাটা ফাঁকা, বাগানও আছে ভদ্রলোকের একটা, ছেলে-মেয়েগুলিও ভাল, নতুন জায়গায় গিয়ে শরীরটা সেরে যেতে পারে, তারপর…। তারপর যে কি হবে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না; তাঁর মনে—ইতিমধ্যেই ভবিষ্যতকে রঙীণ করে তুলেছিলেন মনে মনে। আর একটা কথাও নিঃসন্দেহে অনুভব করছিলেন তিনি, এখন যা তাঁর মনে হচ্ছে তা ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নি, এ মনোভাব জীবনে বদলাবেও না আর কখনও।

"আঁকড়ে ধরবার মতো এই তো একটা পেয়েছি কিছু—সম্পূর্ণ জীবন একটা" সানন্দে ভাবছিলেন তিনি।

অনেক চিন্তা তাঁর মনের উপর দ্রুতবেগে খেলে যাচ্ছিল, কিন্তু একটাকেও আমোল দিলেন না তিনি—পরে ভাল করে' ভেবে দেখা যাবে সব। ভাল করে' ভেবে না দেখা পর্য্যন্ত প্রত্যেকটিকেই চমৎকার

মনে হচ্ছিল, একেবারে অকাট্য—এ ছাড়া আর কি হওয়া সম্ভব! এই করতে হবে।

ভাবছিলেন—"সবাই মিলে বুঝিয়ে মাতালটার হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে একে। যাদবপুরে ওদের বাড়িতেই থাকবে। দেবে না? ভাল করে' বোঝালে ঠিক দেবে। 'প্রথমে কিছুদিনের জন্য যাদবপুরে রেখে চলে যাক···তারপর ক্রমশঃ আমি আমার কাছে নিয়ে নেব। সেইটিই আমার উদ্দেশ্য। এ ছাড়া আর তো আমি কিছু চাই না। কিন্তু যুগলও হয় তো ওকে চায়। ওই হয় তো ওর জীবনের একমাত্র সুখ—তা হলে ওকে যন্ত্রণা দেয় কেন! যন্ত্রণা দিয়ে সুখ পায় বোধ হয়।"

অবশেষে এসে পৌঁছল তারা। ভবেশবাবুর বাড়িখানা সত্যিই চমৎকার। গাড়ি থামতেই, একদল ছেলেমেয়ে কলরব করতে করতে এসে অভ্যর্থনা করল। পুরন্দরবাবু অনেকদিন আসেন নি। তাঁকে দেখে সবাই মহা খুশী—সবাই ভালবাসে তাঁকে। ওরই মধ্যে যারা বড় গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই তারা চীৎকার করে' উঠল—"আপনার মকোর্দ্দমার কি হল কাকাবাবু—কত বাকী আর—"

বড়দের অনুকরণে ছোটরাও তাই বলতে লাগল—মহা সোর গোল তুললে সবাই মিলে। নীলিমা দেবী বেরিয়ে এলেন, ভবেশবাবুও। তাঁরাও স্মিতমুখে মকোদ্দমার বিষয়ে জানতে চাইলেন।

নীলিমা দেবীর বয়স বছর সাঁইত্রিশ। একটু মোটা হয়ে গেছেন, কিন্তু তবু এখনও সুন্দরী বলা চলে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চোখে মুখে বেশ একটা সজীবতা আছে। ভবেশবাবুর বয়স বছর পঞ্চান্ন, চালাক চতুর বুদ্ধিমান এবং সর্ব্বোপরি সদাশয় ব্যক্তি। পুরন্দরবাবুর মতে এঁরাই আদর্শ গৃহস্থ। এই পরিবারটির প্রতি পুরন্দরবাবুর অনুরাগের আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। প্রায় কুড়ি বছর আগে, পুরন্দরবাবুর ছাত্র-জীবন শেষ হয় নি তখনও, এই নীলিমা দেবীকে বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়েছিলেন তিনি। নীলিমা দেবীই তাঁর জীবনের প্রথম প্রণয়। প্রচণ্ড, হাস্যকর এবং চমৎকার। নীলিমা দেবী কিন্তু বিয়ে করেছিলেন ভবেশ মল্লিককে। পাঁচ বছর পরে দেখা হয়েছিল আবার। সেই উদ্দাম প্রণয় ক্রমশঃ রূপান্তরিত হল শান্ত স্নিগ্ধ বন্ধুত্বে। বন্ধুত্বের মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল অবশ্য। এক অনির্দ্দিষ্ট ফল্গুধারার গোপন রসে তা সঞ্জীবিত থাকত যেন। কোন কালিমা ছিল না, গ্লানি ছিল না, শুভ্রতা ছাড়া আর কিছু ছিল না এ বন্ধুত্বে। তাঁর জীবনে পবিত্র প্রণয়ের একটি মাত্র নিদর্শন বলে' বোধ হয় এর বিশেষ একটা মূল্য ছিল তাঁর কাছে। এই পরিবারের সংস্পর্শে এলে তাঁর সমস্ত মুখোস, সমস্ত বহিরাবরণ খসে' যেত যেন। সরল, উদার-সহৃদয় পুরন্দরবাবু আত্মপ্রকাশ করতেন সহজ ভাবে। ছেলেদের সঙ্গে মিশতেন, তাদের আদর করতেন, নিজের সমস্ত দোষ ত্রুটি অকপটে স্বীকার করতেন, কোন রকম ভড়ং থাকত না। প্রায়ই বলতেন যে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এদের কাছেই এসে থাকবেন এবার। মুখের কথা নয়, সত্যিই ইচ্ছে ছিল তাঁর।

পাপিয়ার কথা সব খুলে বললেন। বেশী বলবার দরকার ছিল না পুরন্দরবাবুর অনুরোধই যথেষ্ট এ পরিবারের কাছে। নীলিমা সস্নেহে অভ্যর্থনা করে' নিলেন মাতৃহীন পাপিয়াকে এবং ছেলেমেয়েরা যখন পাপিয়াকে বাগানে টেনে নিয়ে গেল তখন তিনি পুরন্দরবাবুকে বললেন যে তার যথাসাধ্য তিনি করবেন, পাপিয়ার কোন কষ্ট হবে না, পুরন্দরবাবু নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

আধঘণ্টা পরেই তিনি বললেন—"এবার আমাকে যেতে হবে।" সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কতদিন তিনি আসেন নি, এসেই বলছেন যেতে হবে। আধঘণ্টা পরেই! কিন্তু পুরন্দরবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তাঁর অধৈর্য্য দেখেও অবাক লাগল সকলের। পুরন্দরবাবু প্রতিশ্রুতি দিলেন যে পরের দিনই আবার আসবেন, আজ কিন্তু যেতেই হবে। সকলেই লক্ষ্য করল বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে রয়েছেন তিনি। হঠাৎ উঠে তিনি নীলিমা দেবীকে বললেন—"শোন, একটু কথা আছে তোমার সঙ্গে, চল ও ঘরে চল।"

পাশের ঘরে গিয়ে বললেন—"অনেকদিন আগে তোমাকে একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে? তোমাকেই বলেছিলাম খালি, ভবেশবাবু এর বিন্দুবিসর্গ কিছু জানেন না। আমার সেই বর্দ্ধমানের ব্যাপারটা?"

"মনে আছে বই কি, প্রায়ই সে গল্প করতেন যে"—মৃদু হেসে নীলিমা বললেন।

"গল্প নয়, সত্য কথা, আর তোমাকেই কেবল বলেছিলাম তা। তার পরিচয় তোমাকে দিই নি। সে এই যুগল পালিতের স্ত্রী। সে এখন মারা গেছে—পাপিয়া তারই মেয়ে—মানে আমারই মেয়ে!"

"সত্যি!"

"সত্যি—কোন ভুল নেই এতে"—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন তিনি।

অতিশয় উত্তেজিতভাবে সংক্ষেপে যতটা পারলেন বললেন আবার—সবটাই বললেন।

অপর্ণার নামটা ছাড়া নীলিমা সবই শুনেছিলেন আগে। পুরন্দরবাবু নামটা আগে বলেন নি—কারণ তাঁর ভয় ছিল যদি কখনও অপর্ণা পালিতের সঙ্গে নীলিমার দেখা হয়ে যায় তখন সে হয়তো ভাববে—পুরন্দরবাবুর মতো লোক—এই মেয়েকে এত ভালবেসেছিলেন! কি আশ্চর্য্য! নীলিমাকে পর্য্যন্ত নামটা বলেন নি তাই।

"ওর বাপ কিছু জানে না?"—নীলিমা প্রশ্ন করলেন।

"তা, মানে—হ্যাঁ—সন্দেহ—জানেই ধরতে হবে। ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হয়নি এখনও আমার কাছে। হ্যাঁ জানে বই কি—কাল আজ দুদিনই যা লক্ষ্য করলাম তাতে তাই তো মনে হয়। কিন্তু কতটা জানে তাই আমাকে জানতে হবে। তাই আমি যেতে চাইছি এখুনি, আজ রাত্রে তার আসবার কথা আছে আমার বাসায়। আমি কিছুতে বুঝতেই পারছি না জানলে কি করে'—সমস্তটা জানা কি করে' সম্ভব! কিন্তু জেনেছে। পূর্ণ গাঙ্গুলীর সম্বন্ধে যে জেনেছে তাতে আর সন্দেহ নেই! কিন্তু আমার কথা জানলে কি করে? অপর্ণা খুব চতুর মেয়ে ছিল—কারও নাম বলবার পাত্রী সে নয়। তা ছাড়া জানই তো—স্বামীদের অদ্ভুত একটা অন্ধ বিশ্বাস থাকে স্ত্রীদের সম্বন্ধে। স্বর্গের দেবতাকে তারা বরং অবিশ্বাস করে কিন্তু স্ত্রীকে নয়। যুগলের তো কথাই নেই।

না, না, মাথা নেড়ো না—আমারই ষোল আনা দোষ তা আমি স্বীকার করছি। শুধু এখন নয়—বহুদিন থেকে স্বীকার করছি আমিই দোষী।... সে যে সব জানে একথাটা এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল আজ সকালে যে, তার কাছে আমি প্রায় স্বীকার করে' ফেলেছিলাম সব। কাল রাত্রে হঠাৎ দেখা হয়ে এমন লজ্জিত হয়ে পড়েছিলাম, এমন অভদ্র ব্যবহার করে বসেছিলাম—ছিছি কি যেন হয়ে গেল একটা! মদ খেয়ে এসেছিল লোকটা বুঝলে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে মদ খেয়েছিল বলেই এসেছিল, বুকের জ্বালাটা চাপতে পারে নি—তার প্রতি কত বড় অন্যায় যে করা হয়েছে তাই জানাতেই এসেছিল—মানে, না এসে পারে নি। অন্যায়টা কে যে করেছে তা-ও সে জানে...সেই কথাটাই বলতে এসেছিল ...তা না হলে রাত দুপুরে অমন করে' আসার মানে হয় না কোনও। দোষ দিচ্ছি না তার...আমি হলেও ওই করতুম। কাল আজ দু'দিনই আমি গোপন করতে পারি নি নিজেকে। হড়বড় করে' কি সব যে বলে' বসলাম...আঃ! আর ঠিক এমন সময় এল যখন আমার মাথার ঠিক নেই। পাপিয়াকেও ঠিক যন্ত্রণা দেয় ও। আমার মনে হয় মনের ঝাল ঝাড়বার জন্যে...মেয়েটার ওপর দিয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে! হ্যাঁ, প্রতিশোধ নিতে পারে ও...যদিও মানুষ নয়, একটা কীট-বিশেষ...কিন্তু বিষটুকু ঠিক আছে। আগে লোকটা ভদ্র ছিল—যদিও মেরুদণ্ড বলে' কিছু ছিল না। এই ধরণের লোকরাই উচ্ছন্ন যায় শেষ পর্য্যন্ত। আমি কোন অন্যায় করতে চাই না ওর ওপর—ওর যথাসাধ্য উপকার আমি করব। আমিই দোষী...আমিই ওর জীবনটা নষ্ট করে' দিলাম হয় তো। লোকটা সত্যিই বন্ধু বলে' ভাবত আমাকে। একবার বৰ্দ্ধমানে হাজার দুই টাকার দরকার হয়েছিল আমার—চাইবামাত্র দিয়ে দিলে একটা রসিদ পর্য্যন্ত চায় নি...বুঝলে..."

"আপনি বড্ড বেশী অস্থির হয়ে পড়েছেন"—নীলিমা বললেন—

"আপনার জন্যে ভাবনা হচ্ছে আমার। পাপিয়াকে নিজের মেয়ের মতো যত্ন করব আমি—সে বিষয়ে কোন চিন্তা করবেন না। কিন্তু অনেক কিছু গড়াতে পারে এর থেকে, আপনি সাবধানে কথাবার্ত্তা কইবেন তাঁর সঙ্গে—উচ্ছ্বাসের মুখে যা তা বলে' বসবেন না যেন। যা হবার তা তো হয়েই গেছে।"

পুরন্দরবাবুকে বিদায় দেবার জন্যে সবাই বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। ছেলেরাও পাপিয়াকে নিয়ে এল বাগান থেকে। পাপিয়ার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে তাদের। পুরন্দরবাবুকে দেখে পাপিয়া মাথা নীচু করলে—লজ্জায় বোধহয়। পুরন্দরবাবু সকলের সামনে তার মুখচুম্বন করলেন, বারবার বললেন যে কালই তিনি যুগলবাবুকে নিয়ে আসবেন। পাপিয়া চুপ করে' মাটির দিকের চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ তাঁর হাত দুটো ধরে' সকরুণ দৃষ্টিতে চাইলে তাঁর দিকে, মনে হল কি যেন বলবে। তিনি তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে পাশের ঘরটায় ঢুকে পড়লেন।

"কি, পাপিয়া"—

পাপিয়া এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে, তারপর তাকে নিয়ে ঘরের কোনে চলে গেল একেবারে।

"কি বলবে, কি হয়েছে—"

চুপ করে' রইল সে, যেন কথা বলতে পারছে না। নির্নিমেষে কালো চোখের দৃষ্টি তাঁর মুখের উপর নিবদ্ধ করে' নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখে মুখে সমস্ত ভঙ্গিমায় ফুটে উঠল ভয়—কিসের একটা আতঙ্ক।

"গলায় দড়ি দেবে..." চুপি চুপি বললে, স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো।

"কে গলায় দড়ি দেবে।"

"বাবা। কাল রাত্রে গলায় দড়ি দিচ্ছিল। আমি দেখতে পেয়েছিলাম। আমাকে বলেছে গলায় দড়ি দিয়ে মরব। অনেকদিন থেকে চেষ্টা করছে...কাল আমি দেখেছিলাম—"

"কি বাজে কথা বলছ"—মুখে একথা বললেও পুরন্দরবাবু মনে মনে বিস্মিত হলেন। হঠাৎ পাপিয়া তাঁর পায়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল... কি যে বলল কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি...কি করবেন ভেবে পেলেন না। অশ্রুসিক্ত বেদনাতুর দৃষ্টি তুলে সে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। পাপিয়ার এই মূর্ত্তিই আঁকা হয়ে রইল তাঁর মনে...ভবিষ্যতে স্বপ্নে জাগরণে এই মূর্ত্তিই দেখতে পেতেন তিনি।

হঠাৎ তাঁর হিংসে হল। মেয়েটা সত্যিই কি বাপকে এত ভালবাসে? সমস্ত রাস্তা এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে এলেন। বুকটা পুড়ে যেতে লাগল। আজ সকালেই তো বললে যে সে মাকে খুব ভালবাসত। তাঁকে? তাঁকে বোধহয় ঘৃণা করে! বাবা গলায় দড়ি দেবে মানে? মাতালটা সত্যিই আত্মহত্যা করবে না কি।...না, ব্যাপারটা জানতে হবে। আদি অন্ত তলিয়ে সব জানতে হবে—দেরি করলে চলবে না।

(ক্রমশঃ)

নয়নে তব প্রেমের দীপ জ্বলে

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম-এ

পরাণ মোর পাগল করে একি তোমার হাসি
ফুলের মত ঝরছে অবিরল;
হৃদয় মূলে ছড়াও তুমি একি মুক্তা-রাশি,
এ কোন্ রূপে করছ ঝলমল্।
কেশ গুচ্ছে মেঘ-নিবিড় একি শীতল ছায়া
আঁখি আলোয় একি অরুণ শিখা,

উষার মত জ্বলিছ তুমি, জ্বালছ মোর কায়া,
তরুণ চোখে একি নবীন শিখা।
হৃদয় মোর হারিয়ে গেল তোমার মাঝখানে,—
অন্তহীন মহাসিন্ধু জলে,
যেদিকে চাই আপন তব পরাণ মোর টানে,
নয়নে তব প্রেমের দীপ জ্বলে।

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১০

মাণিক আমাদের পরিচিত নন্দকে সঙ্গে করে' ঘরে ঢুকলো।

ডাক্তার। কি হে, কি খবর নন্দ?

নন্দ। আজ্ঞে—খ-খ-খবর ভালই। আপনার চি-চি-চিঠি পড়ে, চে চে চেয়ারম্যান সাহেব খু খু খুব খুশী। ত তখুনি ক্লা ক্লা-ক্লার্ককে ডে ডেকে, একটা ভা-ভালো দেখে টে টে টে—

ডাক্তার। হ্যাঁ বুঝেছি—টেথিস্‌কোপ আনতে হুকুম করলেন, —তারপর?

(নন্দর কথাগুলো যথাসম্ভব সোজাভাবেই বলে যাই)

নন্দ। কাগজে বেশ পরিষ্কারভাবে মোড়া একটি প্যাকেট এনে দিয়েই ক্লার্ক ব্যস্তভাবে চলে যাচ্ছিল। চেয়ারম্যান সাহেব বললেন—"যেওনা দাঁড়াও, ওটা দেখবো,—খোলো।"

ক্লার্ক বললে—"কাজ ফেলে অমন সুন্দর করে বাঁধলুম Sir,—আবার—"

চেয়ারম্যান বললেন—"হ্যাঁ, আবার বাঁধলেই হবে।"

ক্লার্ক অগত্যা অনিচ্ছায় খুললে। একটা পুরোণো বাতিল (rejected) জিনিষ দেখেই সাহেব সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। মূর্ত্তি বদলে গেল।—"কোন্ দিয়া?"—

কম্পমান ক্লার্ক তখন কাঁপছে।—"হুজুর রামপ্রসাদবাবু।"

শুনে সাহেব বললেন—"রহিমবাবু হোনেসে ভি রেহাই নেহি হায়। চলো" বলেই উঠে পড়লেন। গিয়ে, দেখে শুনে এই নতুন যন্ত্রটী আমার হাতে দিয়ে বললেন—"আপ লে যাইয়ে।"

—"সে মূর্ত্তির সামনে লম্বা সেলাম ঠুকে, পালিয়ে এসেছি মশাই। বুঝলুম—আগুন যখন লেগেছে তখন এ বোম ফাটবেই"—

ডাক্তার বললেন—"আপিসের অভ্যাসের দোষ ভিন্ন আর কি বলবো। কারুর অনিষ্ট না হলেই ভালো। যাক্ আমার বড় উপকার করলে ভাই"—

নন্দ বললে,—"যা চে-চে-চেহারা দেখলুম, তা তা তার মধ্যে ই-ই ইষ্ট থাকতে পারে না মশাই। যাক্ এখন চ চ চললুম"—

(নন্দ চলে গেল)

মাণিক বললে—"রামপ্রসাদ একদিন যে ফ্যাসাদে পড়বে তা আমি জানতুম। ওষুধেও ভেজাল চালায়, ওর দেওয়া কুইনিন্ কাজ করে না,—কাজ করে বাজারে—"

"থাক্ মাণিক। ডাক্তারী পাস্ করে কি ভুলই করেছি। এখন না পারি হাঁড়ি বেচতে, না পারি বিড়ি পাকাতে। নোকরির চেয়ে বকরি বেচা ছিল ভালো।"

"এ আবার কোথায় এসে পড়লেন!"

"না ও একটা by product—ভাবতেই জগতে আসা কিনা। দেখছ না ছেলের আর তেলের নাম রাখতেই আকাশ পাতাল ভাবনা,—শব্দ কল্পদ্রুমেও টান পড়ে। রবিবাবুও রেহাই পেতেন না। রামপ্রসাদ নামটী তো মন্দ নয়, কিন্তু ফ্যাসাদ ভাখো!"

"যার ফ্যাসাদ সে বুঝবে মশাই, আপনি বৃথা ভাববেন না"···

"বৃথা কি হে, যন্ত্র তো এলো—এ আবার কি মন্ত্র শোনাবে কে জানে। পোকার যে অন্ত নেই।"

"যত বাজে দুর্ভাবনা আপনার। শোনাবে আবার কি! সেবার যে সাইলেণ্ট ভাউয়েল ছিল—এবারে সে 'হাউয়েল' শোনাবে—দেখে নেবেন। এখন বরং একটা দুধওলা গায়ের সন্ধান করুন।"

"তুমিও যে বাজে কথা আনলে। জগতে 'গরুর' অভাব পেলে নাকি? তাদের সর্ব্বত্র পাবে। আমাদের তো গোকুলেই বাস। তুমি গরুর জন্যে ভেবনা। Grow food মানে ঘাস ছাড়া আর কি। মাড়োয়ারীদের বাড়ীর দু'তিনটে case হাতে আছে—জীবনরামের জরুর কলেরিক ডায়েরিয়া, ভাবনা কি? গরু ঘরে বাঁধাই আছে।"

"তবে আর কি, আপনি একটু স্থির হোন, আমি রান্নাঘরে চললুম···" (মাণিক চলে গেল)

ডাক্তার একলা পড়ে গেলেন।—"এখন বসে বসে করি কি? মাণিক বোঝেনা, ভাবতে বারণ করে। আরে—ভাবনা আছে তাই বেঁচে আছি, Gold flake আর কতক্ষণ, ধরালেই শেষ। ভাবনার কি মাথা মুণ্ডু থাকে, তবু সে সঙ্গীর কাজ করে। সব কথার কি অর্থ থাকে। নাইবা রইল, তবু কইতে হয়। এই যে, আমরা রোগীদের বলে আসি—total rest নিতে। ওর চেয়ে অর্থহীন কথা আছে কি? গরীবের মাথায় তখন—মুদীর পাওনা ঘুরছে। বাড়িতে পিলিটে লাউডগার মত নিত্য বাড়ছে। বেতনের বাড় বছরে দরাজ দু টাকা। আপিসের মিষ্টার মিলারের 'কিলারের' মত মূর্ত্তি দাঁড়িয়েছে। নিজের ১০৩ ডিঃ জ্বর। কত ছুটাই বা দেবে। তার ইত্যাদি চিন্তা কি কথায় রুকবে!—Total rest,

বিশ্রাম তার মৃত্যুর পূর্ব্বে নেই। ওটা jest ছাড়া আর কিছু নয়। তবু তো বলি—বলতে হয়। কিন্তু অর্থহীন।"—

ওদিকে রন্ধনশালে গালে হাত দিয়ে মাণিক ভাবছে—"আশ্চর্য্য মানুষ, একটু চেষ্টা করলে কত টাকাই আনতে পারে, সে খেয়াল নেই। কিছু এলেও যা—না এলেও তাই। বোঝেন সব, ভাবেনও দিনরাত,—কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। টাকার কথা কি রোজগারের কথা কইতে তো একদিনও শুনলুম না। চাকরী করাটা যেন একটা কিছু নিয়ে থাকা মাত্র। এমন আত্মভোলা সরল খোলসা লোক তো দেখিনি। সামলে নিয়ে চলবার লোক সঙ্গে থাকা দরকার বলেই মনে হয়। দু'হাজারের ওপর এসে গেছে—খোঁজ নেই! ওসব কথা কইবার সুযোগও দেন না। আমি যে কি করবো—ভেবে পাই না। আমাকেও এমন করে ফেলেছেন, ওঁকে একঘণ্টা না পেলেই ছট্‌ফট্ করি, শান্তি পাই না। দেখছি ভগবানও এঁদের ভার নিজে না নিয়ে থাকতে পারেন না—তা না তো চলছে কি করে"—

মাঝে দুদিন ডাক্তার কেবল রুগী দেখেই বেড়িয়েছেন। খুঁজে খুঁজে দূরে দূরেও ঘুরেছেন,—তাদের সাহায্যও করেছেন। রোগীর সংখ্যাও কমে আসছে,—মাথাটাও ভাল আছে। বিনোদীকে মাছের ঝোলও খাইয়েছেন। বেলায় ফিরে এসে বললেন—"বুঝলে মাণিকলাল চোখ কেবল দেখেই না, দেখার জন্যেই নয়। কথাও কয় হে"—

"কোথায় দেখলেন মশাই? দেখলেন না শুনলেন?"

"একসঙ্গে দুইই হয়ে গেছে হে! সেই ১০ বছরের দুঃখী মেয়েটার চোখে কৃতজ্ঞতার নীরব ভাষা পেলুম। যারা দুধে ভাতে মানুষ, তাদের সহজ লভ্য এডুকেশন আর উচ্চ শিক্ষার সার্টিফিকেট-গুলো অলঙ্কারের মত প্রায়ই ঝঙ্কার আর টঙ্কার দেয়। যাত্রায় রাণী কৈকেয়ীর অঙ্গে মুখর I mean খসখসে বেনারসী। বেমানান বলছি না। তবে পরের বেড়ায় বা বুদ্ধির মধ্যে বন্দী। মন্থরার কথা শিল্প-চাতুর্য্যেই সে সফল। কিন্তু যাদের কেতাবী খেতাব নেই—অভাবে, দুঃখে, কষ্টে, দারিদ্র্যে—মানুষ হয়—তারা ভগবানের দিকে চেয়ে তাঁর প্রতি—নির্ভর করে দুর্ভর জীবন বেয়ে চলে, তাদের Educationএ শিক্ষার ভেজাল নেই—আপ্ত বাক্যের মত খাঁটি। জগৎকে তাদের হাতে হাতড়ে পাওয়া কিনা! দুঃখ যে পেলে না, তার চেয়ে দুঃখী আর কেউ নেই মাণিক,—তার জন্মটাই বৃথা হয়ে"···

মাণিক অতিষ্ঠের মতো বলে উঠলো—"ডোবালেন ডাক্তারবাবু—ঝোলে যে মাছ ছেড়ে এসেছি। একদম ভুলিয়ে দিয়েছেন! এতক্ষণে বোধহয়—'ঝালদে মাছ' দাঁড়ালো।"

"ওঃ—সে খুব চলবে—বেশ চলবে। পুড়ে না গেলেই হোল।"

"দেখে আসি" বলে' মাণিকলাল চলে গেল।

ডাক্তার (আপন মনে)—"আশ্চর্য্য, বাসায় যখন ফিরলুম—পেট খাই খাই করছে, খিদেয় দাঁড়াতে পারছি না!—তারপর (ঘড়ি দেখে) তিন কোয়াটার কেটে গেছে,—সে কথা ভুলে গেছি! এই পেটের জন্যেই তো সব—চিন্তা, চেষ্টা, চাকরি, এস্তোক্ চুরি ডাকাতি খুন পর্য্যন্ত। সে খিদে গেল কোথা?"

মাণিকলাল হাঁকলে—"আর নয় মশাই, মাথায় একটু জল দিয়ে আসুন।"

"এই যে—এলুম বলে। আজ আর পুরো স্নান চলবে না। যাঁকে ভুলেছিলুম, তাঁকে বেড়ানেড়ে জাগিয়ে দিয়েছ দেখছি! খিদেটা আবার সবেগে এসে পড়েছেন।"

পাঁচ মিনিটেই তোয়ালে পরে এসে—আসন নিলেন। দু চার গ্রাস মুখে দিয়েই—

"তুমি মিছে ভয় করছিলে মাণিক—ঝোলটার জল মরে আস্বাদ বেড়ে গেছে।"

"এখন তো তাড়া নেই—খা'ন ভাল করে।"

"হ্যাঁ তুমিও বসে যাও, বেলা আর নেই।"

"তা বসছি, কিন্তু বাজারে যে কোথাও চাল পাওয়া যাচ্ছে না মশাই"—

"ও অমন হয়, মাঝে মাঝে ডুব মারে। ডুব না মারলে যে রত্ন আসে না। পরে কালো বাজার আলো করে। মরুভূমে জল পাওয়া যায় না, কিন্তু উটের গলায় লুটের মাল পাওয়া যায় হে। মাড়োয়ারী ভায়ারা বেঁচে থাকুন, বলেছি তো—তাঁদের বাড়ি case আছে—মা ভালো করে দিন—ভেব না। চাল রাখবে কোথায়?"

"আজ্ঞে—পেলে তার উপায় হয়েই যায়।"

"না হে, ও জিনিস দশ সের করে আনাই ভালো, দুটো পেট বই তো নয়। বহু সাধু 'X Ray নিয়ে ঘুরছেন—তাঁদের পাহাড়-ফোঁড়া দূরদৃষ্টি! শেষ half প্যাণ্ট না হারাতে হয়।"

"ভালো কথা, এদিকে যে আমার প্যাণ্টের খোল ভরাট্! এইবার আপনার পালা"—

"তবেই হয়েছে! কোথায় ফেলে আসবো!"

"পেণ্ট্‌লেন আবার ফেলে আসবেন কি?"

"হয়—হয়, সময়ে সবই হয়; আমার মায়ের মরজি হলেই হয়। পোড়া শোল পালায়, পড়নি? মনে করনা—মিছে। মিছে কথা লেখবার জন্য ব্যাসের মাথাব্যথা ধরেনি।—না হয় অনেকের জানা একটা ঘটনা, খেতে খেতেই বলি, শুনবে? বেশী দিনের—কথা নয়—"

"শুনব না ?—বলেন কি হুজুর। শিক্ষা দীক্ষাও হয়নি, জানিও না কিছু। সত্য বলতে কি,—আপনাকে পেয়েই তো আমার শিক্ষা সুরু হয়েছে। কত কথাই শুনলুম, কত কি জানলুম। এ সুযোগ আমার ভাগ্যে আর কবে মিলেছে! প্রকাশ্যেই কি আর মনে মনেই কি, আপনাকে গুরু বলেই জেনেছি। আপশোষ হয়—সর্ব্বক্ষণ শুনতে পারি না—সময়ে কাজগুলো না সারতে পারলে আপনাকে যে ভোগাবার জন্যই আমার থাকা হয় মশাই"—

ডাক্তার—"তুমি না থাকলে আমার দুর্দ্দশার সীমা থাকতো না, সেটা আমাকে একদিনও জানতে দাওনি মাণিক। তোমাকে পেয়ে আমি আনন্দেই আছি। যাক্—এখন তবে শোন, আমি সংক্ষেপেই বলবো"—

—"হরিদ্বারে কুম্ভমেলা,—সেবারে পূর্ণকুম্ভ। হিমালয়ের উচ্চ শিখর ছেড়ে—বড় বড় সাধুরা, অর্থাৎ জীর্ণ, শীর্ণ, উলঙ্গ মহাত্মারা সব গঙ্গাস্নানে নেমেছেন। তাঁদেরও বিধিমত সঙ্কল্প করে ডুব দিতে হয়। পাণ্ডারা তাঁদের কাছেও কিছু নিয়ে সঙ্কল্প করাচ্ছেন। দক্ষিণা না দিলে নাকি স্নানের ফল হয় না। একটি সাধুর কাছে কিছুই ছিল না। তিনি বলেন—"আমার যে কিছুই নেই বাবা।" পাণ্ডার সেদিন Mail day সর্ব্বক্ষণ দেখবার শোনবার ফুরসুৎ নেই, অন্যের কাজ করাতে ব্যস্ত। সাধুর দিকে না চেয়েই বললে, "ঢুঁড়কে দেখিয়ে না—কুছ মিল্ যায়গা।" সাধু উলঙ্গ,—না ট্যাঁক না পাকিট্,—ঢুঁড়কে কি? বললেন—"পয়সা রাখকে হাম ক্যা করেঙ্গে,—হায় নেই বেটা।"—পাণ্ডা শেষ বিরক্ত হয়ে বললে—"কুছ দেনাই হায়—পাত্তি, পাত্থর যো মিলে কুছ, দিজিয়ে।"—"তোমার মঙ্গল হোক্"—বলে সাধু এক টুকরো পাথর কুড়িয়ে তার হাতে দিলেন। পাণ্ডা বোধহয় সেটার মানরক্ষার্থে সেটা পকেটে ফেলে, সাধুকে সঙ্কল্প করিয়ে দিলে, তিনি ডুব দিয়ে উঠে গেলেন। পাণ্ডার পকেটগুলি পয়সার ভার আর সইতে পারছিল না, আগন্তুক আমদানিরও স্থানাভাব। সাধুও চলে গেছেন। পাণ্ডা তখন সাধুর দেওয়া সেই হাবাতে পাথরখানা তাড়াতাড়ি বার করে—"দূর হো" বলে গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে—লোক্‌সেনে ভার কমিয়ে বাঁচলো। যখন সুবিধে হয় তখন সকল দিক থেকেই হয়। পাণ্ডা খোলসা হবার আরো একটা সুবিধে পেলে। একজন স্নানার্থী এসে—টাকা বার করে ভাঙানি পয়সা চাইলে,—সঙ্কল্প করবে।—পাণ্ডা হালকা হবার আশায় তাড়াতাড়ি পয়সা দিতে গিয়ে দেখে পয়সা নেই, সব সোনা যে! একি! তখন পাগলের মত সেই সাধুকে খুঁজতে ছুটোছুটি! তাঁকে আর কোথায় পাবে! শেষ সারাদিন, পরে কয়েকদিন পর্য্যন্ত, সেই পাথরখানি খুঁজতে গঙ্গায়

শুনে মাণিক আশ্চর্য্য! "পাণ্ডারা দিনরাত সাধু দেখে, সাধু একখানা বাজে পাথর দিতে পারেন কি, এটা তার মাথায় আসেনি!"

"তবে আর একটু শোন। ও অহঙ্কার কেউ করতে পারেন না। জানা জাস্তো জিনিষও অনেকে ফেলে দিয়েছেন। মহারাজা দুষ্মন্তের চেয়ে জ্ঞান, বুদ্ধি-বিশারদ রাজাও—দুর্লভ প্রেম বিনিময়ে পাওয়া শকুন্তলাকে দেখে যিনি পাগল হয়েছিলেন, দু দিন পরে সেই প্রাণসমা পত্নীকে দেখে তিনি চিনতে পারেন নি। সভার মধ্যে তাঁকে অকথা কুকথা বলে, অপমান করে ফেলে দিয়েছিলেন। পাথরকে নয়, জীবন্ত স্বর্ণপ্রতিমাকে—নীরবে নয়, পূর্ব্বকথা সব শুনেও?—কি বলবে? প্যাণ্ট ফেলতে কতক্ষণ হে! জগতে আশ্চর্য্য কিছুই নয় মাণিক।"

মাণিকলাল মাথা চুলকুতে চুলকুতে বললে—"গ্রহের কাজ ছাড়া আর কি বলবো।"

"Yes—come round—পথে এসো। গ্রহ মানো তো? তাঁকে তো আমরা আন্দামানে ফেলে আসিনি,—তিনি সঙ্গেই আছেন। যাক্—কথা বেড়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে আহারটাও। আবার তুমি শুনিয়েছ—চাল বাড়ন্ত! থাক—আমাদের চিঠির কথা ফুরোয় নি, সে ফ্যাসাদ সম্বন্ধে যা করবার তুমি যা ভাল বোঝ কোরো, আমাকে জড়িও না। হ্যাঁ,—এখনো কি যুধিষ্ঠির দিচ্ছে নাকি? কি সত্যবাদী হে! মা বাপ ছেলের নামকরণে ভুল করেন না দেখছি। ভেব না, এখানে আমাদের স্থিতি আর কদিনই বা, প্যাণ্টের বোঝা বাড়াবার ভয় নেই"—

মাণিক মনে মনে আওড়ালে—"সব উল্‌টো বোঝেন।" বললে—"আজ্ঞে আর দু'তিনটে instalment হলেই"—

"হলেই যুধিষ্ঠির বাঁচে বুঝি!"

"আজ্ঞে না হুজুর,—একটু কারণ হয়েছে কি না—তাই"…

ডাক্তার ব্যস্ত ভাবে,—"Loss দিতে হচ্ছে নাকি?"

"রসের কারবারে Loss আবার কি মশাই"

"বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে নাকি?—ওদের বাড়িতে আবার ডাকাতি করবে কারা?—ওরাই তো সর্দ্দার"—

"আজ্ঞে না, সে সব নয়।"

"তবে আবার কেনো?"

মাণিকের ইচ্ছা ছিল না কথাটা—কি মুস্কিল, এমন মানুষও দেখিনি—টাকা রোজগারে আবার 'কেনো' থাকে নাকি?—শেষ বলতেই হোল—"আজ্ঞে কুমারসম্ভবের খবর পেয়েছে কিনা। বলে—ডাক্তার সাহেবের যে খরচ রয়েছে অনেক!"

"এ খবর তাকে কে দিলে?—তারই বা এত দুশ্চিন্তা কেনো! কী পাপ—"

"পাপ কি মশাই! সুসংবাদ যে হাওয়ায় ফেরে, দেবার লোকের কি অভাব আছে?"···

সে তো মথি লিখিত সুসংবাদ হে—যা হাটে বাজারে নেচে ঘোরে। সে সব দেবতাদের কথা, যাঁরা সবার হিতার্থে আসেন···

মাণিক। "ভাগ্যবান ছেলেরাও বাপমাকে কষ্ট দিতে, দুর্ভাবনায় ফেলতে আসে না মশাই। তারা নিজের ব্যবস্থা নিজেরাই করে আসে বেশী নয়, যুধিষ্ঠির মাত্র গোটা দুই Instalment বাড়াতেই বলে। বিষয়ী লোক সব দিক ভাবে কি না। তারও তা'হলে এখানকার Contract বোধক'রি শেষ হয়।"

"হলে যে বাঁচি, কি জালেই জড়িয়েছে!—বেশ ছিলুম, আবার মাথাটা ঘোলাসে দেখাছ। এতো ভবিষ্যৎও তোমরা ভাবতে পারো!"

"মাপ করবেন হুজুর, আপনার চেয়ে আমাদের ভবিষ্যৎটা অনেকটা খাটো।—একখানা চালা বাড়ানো না হয় রান্নাঘর সারানো পর্য্যন্ত। বিশ বছর পরে ছেলেকে ভিয়েনায় না কোথায় পাঠিয়ে সার্জ্জন বানাবার কথা মাথায়ও আসে না মশাই।"

ডাক্তার হো হো করে হেসে বললেন,—"ওসব শোন কেনো,—আমারি কি আসে! ওটা মধ্যবিত্তের বাঁচবার বিত্ত—আত্মপ্রসাদ হে! লম্বা লম্বা খেয়াল ভেঁজে বেশ থাকা যায়। কারুর অনিষ্টকর কিছু না হলেই হল। কিন্তু তাও হয় মাণিক! পরিবার তাতে বিগড়ে থাকেন—সুখী হন না। তাঁদের কাছে বসে—সংসারের কথা, অভাবের কথা শুনতে পারলেই খুশী। তখন বলেন—"অমুকের বৌভাতে কিছু না দিলে ভাল দেখায় না—কি দেবে বলো দিকি!—ওদের জামাই এসেছে, কি মিষ্টি গলা! তাই কি ছাই বাড়ীতে একটা হারমোনিয়ম আছে, একদিন খেতে বলে শুনতুম।" ইত্যাদি শোনা যায় বলো!—থাক্, মনে আছে তো—কাল আবার সেই ক্ষুধিত পাষাণের ভাষা শুনতে যেতে হবে। নতুন T. E. টা রাখলে কোথায়? তোমার জইপোকা না আবার আঁতুড়ে খোঁজে!—উঠে একটু rest নিতে হবে—load আহারটা বেশী হয়ে গেল। হ্যাঁ, তোমার ঐ ও কথাটা—Instalment এর হে—পাষাণ ভেদের পর হবে—কি বলো!

(উঠে পড়লেন)

মাণিকের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। হাত গুটিয়ে ভাবতে লাগলো—"কি অদ্ভুত লোকের পাল্লাতেই পড়া গেছে! যুধিষ্ঠিরে Contract শেষ হচ্ছে শুনে বলেন "বাঁচা গেল"! টাকা আসা যে বাঁচবার মহৌষধ, সে খেয়াল নেই। প্যাণ্ট যখন খালি পে ঝল্ ঝল্ করে ঝুলবে, তখন যেন আরাম পাবেন! এ লো নিয়ে পরিবার সুখী হবেন কি—পাগল যে হয়ে যান না—সেইটা আশ্চর্য্য! আমরাই সামলাতে পারি না!—"

"—বোঝেন কিন্তু সব—নিজেও সামলাতে পারেন না। ভাবে সবই ঝঞ্ঝাট। কথা কিন্তু একটিও ভুল বলেন না,—লাগেও বে থাক্—এগন রইলো। অনেক কাজ, আমিও সামলা পারছি না।"

* * * * *

পরদিন প্রভাতে মাণিক ঘুম ভাঙালে।—"এখনো ঘুমুচে নাকি? উঠে মুখটা ধুয়ে ফেলুন—চা প্রস্তুত।"

ডাক্তার উঠে পড়লেন—"তুমি দেখছি একটি wonder—ক শুলে তাও জানি না, কখন উঠলে তাও জানি না—আবার চ প্রস্তুত। স্বপ্ন নাকি!—দেখ মাণিক—আগে আগে চা'টা খে এখন ভাবছি ওটা খাবার জিনিষ নয়, ঘুম ভাঙাবার এ উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। খেয়ে যে কি হয়, তা আজো বুঝ না, একটা বদ অভ্যাস মাত্র। ছেড়ে দেওয়াই ভা উচিতও।"—

"আজ তো খান—করে ফেলেছি।"

পাতলা প্রচ্ছন্ন হাসির আভাস টেনে ডাক্তার বললেন "বুদ্ধিমানেরা কেমন পাতা সেদ্ধ খাইয়ে মাথা খেয়ে দিয়েছে- হলেও একদিন চলে না! জঙ্গলের মধ্যে তো বাস, দেশে পা তো অভাব নেই—অভাব কেবল বেম্পতির দশার, তিনি প মুখো!—দূর হোক্—দাও, খেতে তো হবেই।" মুখ গেলেন।—

মাণিক মনে মনে হাসতে হাসতে—"ঘুম না ভাঙতেই ডাক্তার বক্তার হলেন! কতক্ষণে থামবেন—জানি না।" আনতে গেল।

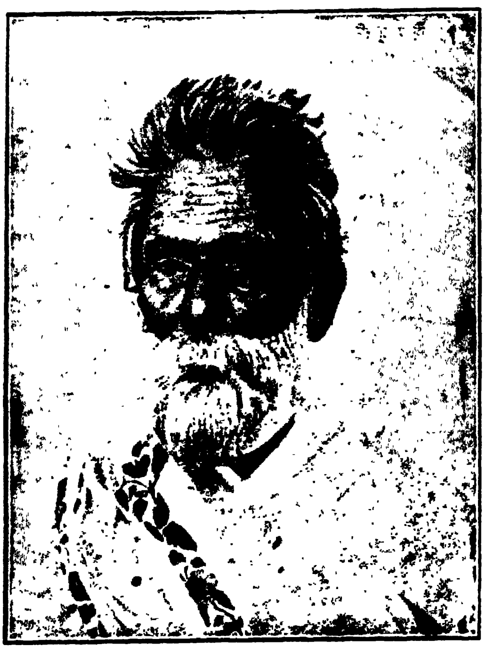
ডাক্তার। "এই যে এনেছ,—দাও।"



সন্ধ্যাকালে প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ, বি-এস্‌-সি

প্রায় ৪৩ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। এক সন্ধ্যাকালে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সহ প্রথম সাক্ষাৎ। বেঙ্গল কেমিক্যালের তৎকালীন ক্ষুদ্র কারখানার দ্বিতলের একটি ক্ষুদ্র গৃহে। উহাই তাঁহার শুইবার, খাইবার ও পড়িবার ঘর। পাশের একটা অপেক্ষাকৃত বড় ঘরে কতকগুলা আলমারি ও টেবিল চেয়ার ছিল। সেটা কারখানার মিটিং গৃহ। মিটিংয়ের সময় বাদ উহা প্রফুল্লচন্দ্রেরই অধিকারে থাকিত। এ সময়ে তিনিই কারখানার সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা। অধ্যক্ষ গিরিশ বসু মহাশয়ের দত্ত পরিচয়-পত্র সঙ্গে ছিল, দেখা করিতে কোনও অসুবিধা হয় নি। বলিলেন, যখন আসবে এই সময়েই আসবে। এইটা আমার লোকের সহ গল্প করিবার সময়। সকালে এলে মার খাবে। সেদিন—আসিয়াছিল দেখা করিতে, সকালে,'



আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

তাকে দূর দূর করিয়া বিদায় করিয়াছিলাম! সকাল বেলাটাই আমার কাজের সময়—পড়া ও লেখার সময়। যদি রোজ একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ২।৩ ঘণ্টা ধরিয়া কাজ করিয়া যাও—দেখিবে কয়েক বৎসর পর অনেক কাজ হইয়া গিয়াছে। আমরা দুজনে ছিলাম—আমি ও সতীশ মুখোপাধ্যায় (পরে প্রফেসার)।

কিছুকালের মধ্যেই আমরা তাঁহার প্রসিদ্ধ ময়দান ক্লাবে ভর্ত্তি হই এবং প্রায় ২০ বৎসরের উপর উহার সভ্য ছিলাম। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়—অতি দুর্য্যোগ ব্যতীত সেখানে যাইতাম। ঐ সভায় প্রফুল্লচন্দ্রই সকলের প্রধান আকর্ষণ; তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা করা বা তর্ক করা পরম উপভোগ্য ছিল। অপর দুই প্রধান পাণ্ডা ছিলেন অধ্যক্ষ গিরিশ বসু, রাজনীতিক সত্যানন্দ বসু। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মাঝে মাঝে নিয়মিত আসিতেন, আবার মাঝে মাঝে অন্তর্হিত হইতেন। বলিতেন কাজের জন্য আসিতে পারেন না। হেরম্ব মৈত্র মহাশয় দুই একবার আসিয়াছিলেন। একজন তাঁহার সহিত বার্ণার্ডশর নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করিবার চেষ্টা ক'রে। মৈত্র মহাশয় যেন তাহাতে বিরক্ত হইয়াছিলেন। বার্ণার্ডশ তৎকালে নিম্ননীতিক সাহিত্যিকের মধ্যে গণ্য হইতেন অনেকের কাছে। এখন অবশ্য নীতির তৌলদণ্ডের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দুই একবার আসিয়াছিলেন। তাঁহার গল্প সকলেই উপভোগ করিত। তাহার একটি কথা মনে পড়ে। বাঙ্গালা দেশের সকল বড় লোকেরই ধুরধুরি নেড়েছি, কেবল তিনজনের নিন্দা চেষ্টা করিয়াও পারি নাই, সে তিনজন—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী ও কিশোরী চৌধুরী।

মতিলাল ঘোষ মহাশয় দু একবার আসিয়াছিলেন। একবার তিনি অহিফেনের উপকারিতা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন। তিনি নিজে আফিং খাইতেন, বলিতেন একটু বয়সে আফিং ধরিলে শরীর ভাল থাকে। আমরা তখন তাহার খুব প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন এই সভার একজন বড় পাণ্ডা ছিলেন। তাঁহার শরীরটা তখন ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। কিন্তু মনের খুব বল ছিল—এবং স্বদেশপ্রীতি ছিল। নিবারণ রায় (অধ্যাপক) কখন কখনও আসিতেন। তিনি একজন মডারেট রাজনীতিক ছিলেন। সেন মহাশয়ের সহিত তাহার ভীষণ তর্ক আমাদের আনন্দ দিত। নারীশিক্ষা সমিতির কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক মহাশয়ও একজন স্থায়ী সভ্য ছিলেন। আর সকল ছোকরার দল ছিল। ইহারা এখন সকলেই নানা বিভাগে খুব বড় বড় লোক:—নীলরতন ধর, দেবপ্রসাদ ঘোষ, জ্ঞান ঘোষ, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান মুখার্জী, হেমেন সেন, প্রিয়দারঞ্জন রায়।

উপেন সেন ও গিরিশবাবু নিজ নিজ মোটরে আসিতেন। ডাক্তার রায়ের এক ঘোড়ার গাড়ী ছিল। আমরা তখন তাহাকে ডাক্তার রায় বলিয়াই ডাকিতাম। পরে সার পি সি রায় এবং আরও পরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র নাম প্রচলিত হয়। ডাক্তার রায়ের অশ্বটি আমাদের কৌতুকের ও কৃপার পাত্র ছিল। কৌতুকের পাত্র—রায়ের মতই তাহার শীর্ণ দেহ এবং কৃপণ জীবন যাত্রাপ্রণালী ছিল। সায়ান্স কলেজের ঘাস-মাঠে তাহার বার আনা আহার্য্যপ্রাপ্তি হইত। কৃপার পাত্র—ডাক্তার রায়ের মাঝে

মাঝে এত সাঙ্গোপাঙ্গ তাহাকে বহন করিতে হইত যে তখন সকলেই তাহাকে কৃপা করিত।

ডাক্তার রায়ের জীবনে আমরা দুইটি বিপরীত গুণের সমাবেশ দেখিয়াছি। একদিকে দানশৌণ্ডতা, অপরদিকে নিষ্কপট কার্পণ্য। কথাটা লিখিতে একটু সঙ্কোচ হইতেছে। বাঙ্গালা দেশে মহাপুরুষদিগের জীবন-চরিত লিখিবার সময় অত্যন্ত অত্যুক্তি করা হয়। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, আশুতোষ প্রভৃতির জীবনে এরূপ অত্যুক্তি দেখিয়াছি। সাহিত্যিকরা বোধ হয় প্রথাটা সেকেলে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের নিকট হইতে পাইয়াছে। পণ্ডিত কোনও ভূস্বামীর নিকট কিছু অর্থের প্রার্থী হইয়া গমন করিয়া একটি শ্লোক পাঠ করিতেন। তাহাতে জমিদারকে পৃথিবীপতি, ভীষ্মের মত চরিত্রবান, ভীমের মত বাহু-বলযুক্ত, অর্জ্জুনের মত প্রচণ্ড বীর এবং কর্ণের মত দাতা এইরূপ বর্ণনা থাকিত। ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট পৃথিবীপতি ও দাতাকর্ণের নিকট হইতে ৫।১০ টাকা পাইয়া নিজেকে ভাগ্যবান ভাবিয়া প্রস্থান করিত। এরূপ অত্যুক্তির নমুনা হঠাৎ বররুচি কৃত পত্র কৌমুদিতে (শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত) পাইলাম ;—সবটা দিবার স্থানাভাব, সামান্য একটু দিলাম। রাজাকে—স্বস্তি গীর্ব্বাণচয় চূড়ারত্নরাজি রোচিশ্চ্ছিত চন্দ্রচূড়চরণনখেন্দু……বিষমসমরসঙ্করৎ…বিদ্বদ্দারিদ্র্য বিদ্রাবণ দ্রবিণরাশি বিশ্রাণনসমুপার্জ্জিতোর্জ্জিত যশোমালাবলি…।

উপন্যাস সাহিত্যেও এই অত্যুক্তিবাদ আসিয়াছে। পৌরাণিক যুগের সাহিত্যেও এই অত্যুক্তি বাদ ছিল না। নিজেকে সিংহের কাছে বা পক্ষির কাছে বলি দেওয়া ছিল ; পুত্রকে বধ করা বা দাসত্বে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পুরাণ সাহিত্যে উপসংহারে ঐ উৎকট কর্ম্মগুলির ভাল পরিণাম দেখান হইত। বর্ত্তমান যথার্থবাদ (realistic) যুগে মৃত মানুষকে ফিরাইয়া আনা যায় না—কাজেই ত্যাগের বা ক্লেশ স্বীকারের বীভৎসতাই থাকিয়া যায়, পুরস্কারের মাধুর্য্য থাকে না। একখানি নব-যুগের উপন্যাস পড়িতেছিলাম। তাহার ভাল চরিত্রগুলির ভাগ্যে বিশ্বের যত দুর্ভাগ্য আসিয়া পড়িয়াছে—পুত্রের নিধন, স্ত্রীর মৃত্যু, গৃহদাহ, বন্যা ইত্যাদি। আদর্শগুলি যদি অত্যুৎকট ত্যাগ ও ধৈর্য্যগুণসম্পন্ন হয়, কি অলোকসামান্য গুণাবলিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে দেবতা ভাবিয়া পূজা করা যায় কিন্তু তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার স্পৃহা দমিয়া যায়।

মনোরঞ্জন গুহের স্বদেশী আমলের বহু গল্প ছিল। উদ্দীপরা এক পাহারাওয়ালা এক মোট লইয়া থানার দিকে যাইতেছিল। পথে এক চাষাকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ব্যাটনের খোঁচা দিয়া নিজের মোট বাহকের কার্য্যে বাহাল করিল। চাষা বলবান, কিন্তু পাহারাওয়ালার পাগড়ী, জামা, জুতা দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল। পথিমধ্যে এক পুষ্করিণী দেখিয়া পাহারাওয়ালার স্নানের ইচ্ছা হইল। স্নান সারিয়া পোষাক পরিয়া সে চাষাকে মোট লইতে হুকুম করিল। চাষা সমস্ত দেখিয়াছে। বলিল আর তোমার হুকুম মানিব না—দেখিলাম তুমিও ত একটা আমারই মত মানুষ। পাহারাওয়ালা রুল দিয়ে তাহাকে মারিতে গেল, চাষা তাহাকে এক ধাক্কায় ভূপতিত করিয়া চম্পট দিল।

মহাপুরুষদের চরিত যদি অত্যুক্তির ভাষায় লেখা হয় তাহাতে লোকের তাহাকে পূজা করিবার স্পৃহা হয়, অনুকরণের চেষ্টা হয় না। আর শেষোক্ত চেষ্টা দ্বারাই দেশের অধিক উপকার হয়। অত্যুক্তি একপ্রকার মিথ্যা ভাষণ—মিথ্যা দ্বারা স্থায়ী শুভ হইতে পারে না। যাহা সত্য তাহাই টিকিয়া যায়। শ্রেয় সত্যের দ্বারাই লব্ধ হয়।

ডাক্তার রায়ের যে কার্পণ্য দোষের কথা লিখিলাম তজ্জন্য যাহাতে ভক্ত ক্ষুব্ধ না হয় সে উদ্দেশ্যেই এইটুকু লেখা। তিনি নিজেও স্বীয় কার্পণ্যের কথা বলিতেন এবং তৎসম্বন্ধে সমালোচনায় কৌতুক অনুভব করিতেন। একটা গল্প নিজেই বলিতেন। এক সময় মফঃস্বলে একটা রেলষ্টেসনে ওয়েটিং-রুমে ইজিচেয়ারে শায়িত আছেন। শীতের রাত, গায়ে তাঁহার অতি পুরাতন জীর্ণ একটা ওভারকোট। এক সাহেবের চাপরাশি মালপত্র লইয়া উপস্থিত হইল। সেগুলি গুছাইয়া রাখিয়া ডাক্তার রায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাঁহার শ্যামল শীর্ণদেহ, দাড়ি, ও জীর্ণ ওভারকোট দেখিয়া তাহাকে নিজের সমব্যবসায়ী ঠিক করিল। পাশের চেয়ারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা সাব কব আয়েগা। রায়ের কৌতুক লাগিল। তিনি তাহার ভ্রম না ভাঙ্গিয়া তাহার সহিত গল্প জুড়িয়া দিলেন।

ডাক্তার রায় অসাধারণ মানুষ ছিলেন। আবার তিনি সাধারণ মানুষ ছিলেন। তাহার মত বিদ্যা বুদ্ধি ও ধীসম্পন্ন বহু লোক ও ছাত্র দেখিয়াছি। অথচ তাহাদের এত উর্দ্ধে তিনি উঠিয়া গিয়াছেন কি প্রকারে? তাঁহার অসাধারণত্ব ছিল ইচ্ছা শক্তিতে। গীতায় বলে "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ"। মানুষের ইচ্ছা যখন একদিকে কাজ করে তখনই তাহার ফল দেখা যায়। পরস্পরবিরোধী বহু ইচ্ছা যাহাদের, তাহারা আর সময়ের বুকে নিজেদের পদচিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে না। তিনি প্রথমেই আমাদের বলিয়াছিলেন যে কোনও একটা উদ্দেশ্য লইয়া যদি প্রত্যহ তিন চার ঘণ্টা কাজ করিয়া যাও, কয়েক বৎসর পরে দেখিবে অনেক কাজ হইয়া গিয়াছে। সাধারণ হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া যাইব এই দুর্দ্দান্ত আকাঙ্ক্ষাই তাঁহাকে এত বড় করিয়াছিল। আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি সকল সময়ই দণ্ডায়মান হইতেন। ভারতবর্ষের পরাধীনতা তিনি একটা বিরাট অন্যায় ভাবিতেন। আর্থিক পরাধীনতা নিবারণের জন্য তিনি ছাত্রগণের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রতি প্রবৃত্তি আনিবার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন। শেষ-জীবনে দরিদ্রের দুঃখে তাহার হৃদয় বিগলিত হইতে দেখিয়াছি। তাহার নিজের উপর বিবিধ কার্পণ্য-পরীক্ষা দরিদ্রের শিক্ষার জন্যই হইত। কেবল শরীর অপটু ছিল বলিয়া বিবিধ খাদ্য সম্বন্ধীয় উপদেশ যাহা তিনি দিতেন নিজের উপর চালাইতে পারেন নাই।

• দেশের সামাজিক রীতি-নীতি অন্যায় ভাবিয়াই তিনি প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ দেশের জ্ঞান ভাণ্ডারের চাবি নিজেদের হাতে রাখিয়াছিলেন এই বিশ্বাসে তিনি ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী হইয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া তাঁহার মাঝে মাঝে কবিরাজের সঙ্গে তর্ক বাধিত। কবিরাজ বলিতেন—আপনি যা বলুন না কেন ব্রাহ্মণরা যেস্বার্থপর ছিলেন

একথা বিশ্বাস করিতে পারি না। ব্রাহ্মণরাই তথনকার ব্যবস্থাকর্ত্তা ছিল। যা কিছু অর্থ বা ক্ষমতার কার্য্য তারা অন্যদের দিয়াছিল। কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়দিগকে রাজকার্য্য—বৈশ্যদিগকে ব্যবসা—বৈদ্যদিগকে অর্থকরী চিকিৎসাবিদ্যা দিয়াছিলেন। নিজেদের জন্য ত রেখেছিলেন ভিক্ষা। যাই বলুন—বেদ বেদান্ত অন্য কেউ পড়তে যেত না—কারণ তাতে টাকা ছিল না। ব্রাহ্মণরাই দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়া ঐ সকল জ্ঞান যে পুরুষানুক্রমে বহন করিয়া আমাদের জন্য এ যুগ পর্য্যন্ত আনিয়াছেন তজ্জন্য সকলেরই উঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

ডাক্তার রায়ের এক শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত ছিলাম। এক ভদ্রলোক তাঁহার ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে এই অত্যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন। আমরা—যারা তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ সেখানে উপস্থিত ছিলাম তাহাদের কাছে সমস্তটা যেন কেমন খাপছাড়া লাগিল। সুদীর্ঘদিন তাহার সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। স্বদেশভক্তির বক্তৃতা দিয়াছেন, দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি কর বলিয়া বক্তৃতা দিয়াছেন, সমাজ সংস্কার কর বলিয়া বক্তৃতা দিয়াছেন কিন্তু কোনও ধর্ম্ম বক্তৃতা—ঈশ্বর সম্বন্ধে বক্তৃতা তাহার কাছে শুনি নাই। একবার যেন তাহাকে Martineaur এক ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতে দেখিয়াছিলাম ; তার চেয়ে ঢের বেশী পড়িতে দেখিয়াছিলাম—Leckyর History of Rationalism in Europe এবং Bucklea History of Civilisation. ঐ দুই বই ধর্ম্মের বিশেষ সম্পর্ক রাখে না—উল্টোভাবে ছাড়া।

গড়ের মাঠে তাহার সহিত অনেক সন্ধ্যা কাটিয়াছে। তাহাদের বেশীর ভাগই মনের উপর এখনও (২০।২৫ বৎসর পরে) স্মৃতির ছাপ রাখিয়া যায় নাই। কিন্তু একটি সন্ধ্যার স্মৃতি—উজ্জ্বল রহিয়াছে। সে স্মৃতি এখন মধুর—কিন্তু তখন ভয়াবহ ছিল। যে বিপদ কাটিয়া যায় তাহার স্মৃতি মধুরই থাকে। সেদিন গিরিশবাবু বোধ হয় আসেন নি। ডাক্তার রায় ও কবিরাজ আসিয়াছিলেন। যুবকদের কে কে আসিয়াছিল ঠিক মনে পড়িতেছে না। ৪।৫ জন ছিল। সহসা আকাশে মেঘ ও ঝড়ের আবির্ভাব। এরূপ স্থলে সময় থাকিলে বড়রা নিজ নিজ গাড়ির দিকে এবং অন্যরা ট্রামের দিকে ধাবিত হইত। তা না হলে একটা খেলার তাঁবুতে আশ্রয় লওয়া হইত। ঝড়ের বেগ এত বেশী এবং এত ধুলা উড়িল যে চলা দুর্ঘট হইয়া পড়িল। কবিরাজের শরীরটা ভাল ছিল না ; তিনি কিছু ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে ধরিয়া টেণ্টে লইয়া যাওয়া হইল ; রায়কে কোনও সাহায্য করিতে হয় নাই। এখন ভীষণবেগে ঝড়, বৃষ্টি ও শিলাপাত আরম্ভ হইল। উপরে গাছের ডাল যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাঁবু যেন উড়িয়া যায় মনে হইতে লাগিল। ছিন্ন তাঁবুর ছিদ্র দিয়া দুই একটা শিলও আসিতে লাগিল। কবিরাজ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কয়েকজন তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিল। দুইটী বালতী যোগাড় করিয়া বড় দুইজনের মাথায় দেওয়া হইল এবং পরে তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান ভাবিয়া দুটি টেবিলের তলে বসান হইল। আমরা মুখসাপট করিতে লাগিলাম—হালকা তাঁবু যদি ভেঙ্গে পড়ে ত কয়েকজনে মিলিয়া ধরিয়া থাকিব। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের বীরত্বের পরীক্ষা দিতে হয় নাই। খানিকক্ষণ পরে ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল। একটি যুবক সিক্তদেহে ও বসনে ধীরে ধীরে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে অক্ষতদেহ দেখিয়া পরমানন্দিত হইলাম। সে একটা নালার মধ্যে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত দেহ করিয়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়া শিলাবৃষ্টি ভোগ বা উপভোগ করিয়াছে।

গাড়ীতে না উঠা পর্য্যন্ত কবিরাজের আর্ত্তনাদ উঠিতেছিল। নিরাপদে সেখানে উঠিয়া তিনি পরম আনন্দলাভ করিলেন। এই বিপদে অব্যাহতি পাইয়া (কারণ পরদিনও তাঁহার পীড়ার কোনওরূপ উগ্রতা বৃদ্ধি হয় নাই) কবিরাজ আমাদের উপর এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে একদিন সন্ধ্যায় প্রচুর খাদ্যসম্ভার মাঠে আনিয়া সকলকে পরিপাটিভাবে খাওয়াইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, ইহা তাঁহার বার্ষিক অনুষ্ঠানের মধ্যে গণ্য হইয়া গেল।

প্রণমি তোমায়

শ্রীশান্তশীল দাশ

গম্ভীর তিমির রাত্রি, নিস্তব্ধ ধরণী,
রুদ্ধ কারাগার হ'তে ক্রন্দনের ধ্বনি
ভেসে আসে, মিশে যায় আকাশে, বাতাসে,
কাতর সে আর্ত্তনাদ ; ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাসে
জানায় বন্দিনী নারী—'শৃংখলের ভার
মুক্ত কর্—সহিতে যে পারি না ক' আর !'
কত যাত্রী আসে যায়, নীরবে কেবল
বন্দিনী জননী লাগি' ফেলে আঁখিজল,
লৌহ শৃংখলের ভার নয়নের জলে
ছিন্ন হ'ল না ক' হায়, গেল সে বিফলে।

সহসা কে তুমি বীর ! ভাস্বর বয়ান,
অমার আঁধার ভেদি হ'লে আগুয়ান ;
দীপ্তমুখে এলে যেথা বন্দিনী জননী
আপন দুর্ভাগ্য বহি' যাপেন রজনী
নীরবে আনতমুখে ; পরশি' চরণ
কহিলে, "মা তোর দুঃখ করিব হরণ
শপথ করিনু আমি ; ও লৌহ শিকল
মুক্ত ক'রে দেব মাগো, মুছ আঁখিজল !"
জননী নীরবে শুধু চাহি' তার পানে
বর্ষিলেন স্নেহাশীষ প্রসন্ন নয়ানে।

মৃত্যুঞ্জয়ী

শ্রীযামিনীমোহন কর

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভ্যানের ভিতরাংশ। পরদিন সকাল দশটা। গাড়ীর ভিতরে দু'ধারে বসবার সীট। সীটের ওপরে একটা পুরোনো সুটকেশ। একধারে দরজা, তার উল্টো দিকে জানলার মত কাটা। আর সব বন্ধ। সেই জানলা দিয়ে ভিতরকার লোক ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলতে পারে। গাড়ীর মধ্যে চালের সঙ্গে ফিট করা ইলেকট্রিক লাইট জ্বলছে।

একটু পরে ফণী ঢুকল। হাতে একটা ব্যাঙ্কের ব্যাগ।

ব্যাগটা সীটের উপর রেখে দিল

ফণী। উঠে আসুন গিরীনবাবু। দেরী করছেন কেন?

আর একটা ব্যাঙ্কের ব্যাগ নিয়ে গিরীন খোঁড়াতে খোঁড়াতে গাড়ীতে উঠল

গিরীন। এই যে—

(সীটের উপর ব্যাগ রেখে দিল)

ফণী। কি হ'ল?

গিরীন। উঠতে গিয়ে পায়ে চোট লেগেছে।

মুখ বিকৃত করে পায়ে হাত বুলোতে লাগল

ফণী। খুব লেগেছে?

গিরীন। ভয়ানক।

ফণী। (ভ্যানের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে) আপনার আজ কি যে হয়েছে—

গিরীন। কে জানে কার মুখ দেখে সকালে উঠেছিলুম—

ফণী। (জানলার কাছে গিয়া) শোভা সিংহ—

শোভাসিং। (জানলা দিয়ে মুখ বার করে) জী—

ফণী। তুমি এইবার চলো। একবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কা সামনে দাঁড়ায়েগা, বুঝা?

শোভাসিং। জী হুজুর।

মুখ টেনে নিয়ে শোভাসিং জানলা বন্ধ করে দিলে। এঞ্জিনে স্টার্ট দিলে। গাড়ী চলতে আরম্ভ করল

ফণী। যাক্, গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে—

গিরীন। (পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে) ভয়ানক লেগেছে—

ফণী। (শ্লেষের সঙ্গে) ভাঙ্গে নি তো!

গিরীন। ভাঙ্গো ভাঙ্গো হয়েছিল—

ফণী। সামান্য একটু ছড়ে গিয়ে থাকবে।

গিরীন। কালসিটে পড়ে গেছে।

ফণী। ক্রমাগত পা নিয়ে টানাটানি করবেন না। ওতে ব্যথা আরও বাড়বে। ব্যাঙ্ক অর্ডারটা সঙ্গে এনেছেন তো?

গিরীন। এনেছি।

পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে ফণীকে দিয়ে আবার পায়ে মন দিল

ফণী। খালি পা ঘষছেন কেন? একটু অন্যমনস্ক হয়ে থাকুন, ব্যথা অনেক কম মনে হবে। আমার দাঁতে ব্যথা হলে তাই করি।

গিরীন। কিন্তু এতো দাঁতে ব্যথা নয়, এ যে পায়ে ব্যথা।

ফণী। (কাগজ দেখে) ত্রিশ হাজার পাঁচশ সত্তর—

গিরীন। ব্যাগ খুলে চেক করা হ'ল না তো?

ফণী। ব্যাঙ্কের লোক করে দিয়েছে।

গিরীন। তবুও আমাদের একবার—

ফণী। ভুল পেমেণ্ট কেউ করে না। ওরা ব্যাগে ভরবার আগে চেক করে দেয়। ওয়ার্কশপে গিয়ে মিলিয়ে নিলেই হবে।

গিরীন। যদি সেখানে গিয়ে দেখা যায় শর্ট পড়েছে।

ফণী। পড়বে না। (কাগজটা পকেটে রেখে) ত্রিশ হাজার! এত টাকা কোন সপ্তাহে আমরা নিয়ে যাইনি।

গিরীন। না।

ফণী। বড় ঝুঁকির কাজ। এই শেষবার—তার পর আর নয়।

গিরীন। শেষবার!

ফণী। হ্যাঁ। এরপর থেকে ওয়াকশপ নিজেদের টাকা নিজেরা ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে যাবে। আমাদের আর পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে না। এতে আমাদের মেহনত বাঁচবে, আর রিস্কও কমে যাবে। এতগুলো টাকা নিয়ে প্রতি সপ্তাহে কলিকাতার মধ্যে দিয়ে আনাগোনা—তার ওপর হাওড়ার পুলে যা ভীড় থাকে, প্রায়ই ট্যাক্সি জ্যাম হয়ে যায়—

গিরীন। আচ্ছা, যদি কখন কিছু হয়, মানে এই চুরি—

ফণী। হওয়া শক্ত। আজ এগারো বছরের ওপর আমি এ কাজ করছি—

গিরীন। তা জানি, তবুও কিছু বলা তো যায় না।

ফণী। কেউ একাজে হাত দিতে সাহস করবে না। তা ছাড়া, দেখেছেন?

পকেট থেকে একটা জিনিষ বার করল

গিরীন। কি?

ফণী। নাম জানি না। চোরাবাজার থেকে কিনেছি। তারা বললে "জেম্মো"।

গিরীন। এ দিয়ে কি হবে?

ফণী। কাউকে মারলে এটার মাথায় চাপ পড়বে। ভেতর থেকে ছুরীর মত বেরিয়ে তখুনি ফুটে যাবে।

গিরীন। আমি এ রকম জিনিষ তো আগে কখনও দেখি নি—

ফণী। এর এক ঘা খেলে যে কোন লোক একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

গিরীন। ওটা কি সব সময় সঙ্গে থাকে?

ফণী। না। যেদিন টাকা নিয়ে যাই, শুধু সেই দিন সঙ্গে নিই।

গিরীন। ড্রাইভারের সঙ্গে কিছু থাকে না?

ফণী। এ রকম কিছু না থাকলেও সীটের তলায় একটা স্প্যানার আছে। তাতে যে কোন লোককে এক ঘায়ে খুন করে ফেলা যায়।

গিরীন। হ্যাঁ, একদিন স্প্যানার দেখেছিলুম বটে। চাকা খোলবার সময়—

ফণী। হ্যাঁ। তা ছাড়া লোকটার গায়ে যা জোর আছে—

গিরীন। তা আছে। শিখ কিনা!

ফণী। তার ওপর আবার আমাদের গাড়ীর পিছন পিছন একটা পুলিশকার—

গিরীন। (চমকে) পুলিশকার!

ফণী। হ্যাঁ।

গিরীন। কেন, পথে কোন বিপদ হবার সম্ভাবনা—

ফণী। না, না। সে রকম কিছু নয়। এ তো বহুদিন থেকেই চলে আসছে—

গিরীন। কই, আমি তো জানতুম না!

ফণী। এ কথা তো সকলকে বলে বেড়ানো হয় না। সেই একবার ড্রাইভার বলেছিল আমাদের গাড়ী কয়েকজন লোক ফলো করছিল, সেই থেকেই এই বন্দোবস্ত।

গিরীন। সেই থেকে প্রত্যেকবারই পুলিশের গাড়ী পিছনে থাকে?

ফণী। হ্যাঁ। ব্যাঙ্ক থেকে ওয়াকশপ পর্য্যন্ত। গাড়ী ফটকের ভেতর ঢুকে গেলে তারা ফিরে যায়। অবশ্য কোম্পানী এর জন্য পুলিশকে মোটা রকম টাকা দেয়।

গিরীন। সে তো বটেই।

ফণী। আপনার পা এখন কেমন আছে?

গিরীন। এখনও বেশ ব্যথা রয়েছে। (মাটীতে পা রেখে দাঁড়াতে গিয়ে) উঃ! এখনও দাঁড়াতে পাচ্ছি না।

ফণী। বাড়ীতে গিয়ে এক ডোজ আর্ণিকা খেয়ে নেবেন, আর চুণ হলুদ লাগাবেন। ওসব টিংচার আয়োডিনের কর্ম্ম নয়।

গিরীন। আচ্ছা।

ফণী। আপনি কি আজ দেশে যাবেন?

গিরীন। হ্যাঁ। শনিবার শনিবার যাই।

ফণী। দেশে তো কেউ নেই বললেন? তবে প্রতি সপ্তাহে যান কেন? কিছু মাল টাল—

গিরীন। না, না, ফণীবাবু কি যে বলেন?

ফণী। কিছু বলছি না। তবু সাবধান—

গিরীন। (ভীত ভাবে) সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন—

ফণী। (হেসে) ঠাট্টা বোঝেন না গিরীনবাবু। আর থাকলেই বা ক্ষতি কি! অ্যাঁ, গাড়ী থামল যে? দেখি— (জানালা খুললে) শোভাসিং; কেয়া হুয়া?

শোভাসিং। রিজার্ভ বন্ধ হুজুর।

ফণী। গিরীনবাবু, চট করে এই চিঠিটা ওদের দিয়ে আসুন—

ফণী পকেট থেকে চিঠি বার করে গিরীনকে দিল। গিরীন চিঠি হাতে দাঁড়াতে গিয়ে একটা আর্ত্তনাদ করে আবার বসে পড়ল

গিরীন। উঃ, বাপরে!

ফণী। কি হ'ল?

গিরীন। পায়ে যেন কেউ সূচ ফোটাচ্ছে। (আবার দাঁড়াতে গিয়ে) ওরে বাপরে—(ভ্যানের দেয়াল ধরে) অসম্ভব। এক পা নড়তে পারব না

ফণী। আচ্ছা ড্রাইভারকে বলি। ড্রাইভার—

শোভাসিং। (জানালায় মুখ এনে) জী হুজুর।

ফণী। এই চিঠি টো ম্যানেজারকে অপিস মেঁ দে কে আও তো।

ফণী গিরীনের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে ড্রাইভারকে দিতে গেল

শোভাসিং। গাড়ী ছোড়কে ম্যাঁয় নহী জা সকতা হুজুর।

ফণী। আরে কত দেরী লাগেগা। জায়গা আওর আয় গা।

শোভাসিং। হুকুম নহী হ্যায় হুজুর।

ফণী। এক মিনিট মে কেয়া হো জায় গা।

শোভাসিং। নহী হুজুর, গাড়ী ছোড়কে এক মিনট ভী ম্যাঁয় নহী জা সকতা। শোভাসিং জানলা থেকে মুখ সরিয়ে নিল

ফণী। কি ফ্যাসাদ! গিরীনবাবু, আপনি কি একটুও হাঁটতে পারবেন না।

গিরীন। ভীষণ ব্যথা করছে।

ফণী। আপনাকে নিয়ে তো ভারী বিপদে পড়লুম দেখছি।

গিরীন। আমি বড়ই দুঃখিত, কিন্তু কি করব—দাঁড়াতে পারছি না—

ফণী। যত সব—আচ্ছা, আমিই নিজেই যাচ্ছি। (ভ্যানের দরজা খুলল) আমি নেমে গেলেই দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে নেবেন। না আসা পর্য্যন্ত খুলবেন না। বুঝলেন?

গিরীন। আজ্ঞে হ্যাঁ—

ফণী নেমে গেল। গিরীন দরজা বন্ধ করে জানলার দিকে একবার ভাল করে দেখে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে চাবী বার করে ব্যাঙ্কের একটা ব্যাগ খুলে নোটের তাড়া বার করে নিজের সুটকেশে ভরল এবং সুটকেশের কতকগুলো ছেঁড়া খবরের কাগজের তাড়া ব্যাগে ভরে দিল। এমন সময় জানালা খুলল। গিরীন তাড়াতাড়ি সব সামলে অন্য দিকে চেয়ে বসল—

শোভাসিং। (জানালায় মুখ রেখে) উও খুদ জানা নহী চাহতে থে।

গিরীন। না। ইচ্ছা নহী থা।

শোভাসিং। ম্যাঁয় তো গাড়ী ছোড়কে নহী জা সকতা। হুকুম নহী হ্যায়।

গিরীন। ঠিক বাত। তুমি আমার সঙ্গে বাত মত কও। দেখলে সে—

শোভাসিং। ঠিক কহতে হ্যাঁয়।

জানালা থেকে মুখ সরিয়ে শোভাসিং জানালা বন্ধ করে দিলে। গিরীন তাড়াতাড়ি চাবী দিয়ে ব্যাঙ্কের ব্যাগ খুলে আগেকার মত নোটের তাড়া আর খবরের কাগজের তাড়া বদলি করলে। ব্যাঙ্কের ব্যাগ দুটোতে চাবী দিয়ে যথাস্থানে রাখলে। ভ্যানের দরজায় খট খট আওয়াজ হল।

গিরীন। কে?

ফণী। (নেপথ্যে) আমি—ফণী।

গিরীন। খুলচি।

দরজা খুলে দিল। ফণী ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলে। গিরীন জানলায় টোকা দিল।

শোভাসিং। (নেপথ্যে) হুজুর—

গিরীন। ঠিক আছে। চলো।

ফণী ও গিরীন নিজ নিজ স্থানে বসল। গাড়ী চলতে লাগল

ফণী। লোকটা ইচ্ছে করলেই যেতে পারত। স্রেফ বদমাইসী।

গিরীন। ওয়ে বললে গাড়ী ছেড়ে যাবার হুকুম নেই—

ফণী। গেলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত! সব বাহানা। আমি ও তো গিছলুম। তাতে টাকার কি ক্ষতি হয়েছে?

গিরিন। কিছু হয় নি বটে, কিন্তু যদি হত?

ফণী। কি হত?

গিরীন। টাকা যদি যেত, মানে—যদি যেত—

ফণী। তা হলে একটু ক্ষতি হত?

গিরীন। কার? আপনার? আমাদের?

ফণী। আমাদের কেন? আফিসের কাজ কর্ম্মের ক্ষতি হ'ত।

গিরীন। কর্ম্মচারীরা টাকা পেত না?

ফণী। তারা কাজ করেছে, দিতেই হবে।

গিরীন। কিন্তু টাকা চুরি গেলে—

ফণী। কোম্পানীকে দিতে হ'ত। কোম্পানীর এতগুলো টাকা লোকসান যেত। তার পর পুলিশের হাঙ্গামা, আমাদের নিয়ে টানা-টানি—অনেক রকমের গণ্ডগোল হ'ত। এই শেষ বার। এর পর আর এরকম ঝুঁকির কাজে হাত দিতে হবে না।

গিরীন। এক রকম নিশ্চিন্দি।

ফণী। বটেই তো। কোন দিন কি হবে বলা তো যায় না। অবশ্য কেউ চুরি করতে এলে সহজে নিয়ে যেতে পারত না—(হাত-ঘড়ি দেখে) সাড়ে দশটা বাজে। আপনার পা এখন কেমন?

গিরীন। একটু ভাল। (দাঁড়াতে চেষ্টা করে) এখন দাঁড়াতে পারছি।

ফণী। আমি তা লক্ষ্য করেছি। এখন আর পায়ে হাত দিচ্ছেন না (জানালার কাছে গিয়ে) ড্রাইভার—

শোভাসিং। (নেপথ্যে) হুজুর।

ফণী। হাওড়া ষ্টেশনের সামনে এক মিনিট দাঁড়ায়গা।

শোভাসিং। টেশন তা আ গয়া— গাড়ী দাঁড়াল

ফণী। গিরীনবাবু, আপনি তবে নামুন—

গিরীন। আচ্ছা। ধন্যবাদ।

দরজা খুলে সুটকেশ হাতে গিরীন খুঁড়িয়ে নামল। ফণী দরজা বন্ধ করলে

ফণী। ড্রাইভার—চলো।

গাড়ী ষ্টার্ট নিল। চলতে আরম্ভ করল ক্রমশঃ

মুক্তি-সেনা

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

প্রাণের মায়া তুচ্ছ ক'রে দেশের প্রেমে মাত্‌ল যারা
ভয় করে না চোখ্‌ রাঙানি, ভয় করে না লৌহ-কারা ;
মুক্তি-গানে পাগল হ'ল, বাস্‌লো ভালো নিজের দেশে,
বক্ষ চিরে রক্ত দিল, সহিল শত পীড়ন-ক্লেশে ;
ধন্য তারা, পূজ্য তারা—জয় তাদের, তারাই বীর ;
জয় পতাকা তাদের হাতে, তাদের চির উচ্চশির !

২

ত্যাগাদর্শে সিদ্ধতপা, খাঁটি মানুষ এ অবনীর,
মারণ-কাঠি ঝুলছে গলে হাসছে তবু শান্তধীর ;
অত্যাচারী চালায় গুলি, তাতেও যারা দমিত নয়,
মরণ-জয়ী চলছে তবু তুচ্ছ করে প্রাণের ভয় ;
ধন্য তারা, পূজ্য তারা—জয় তাদের, তারাই বীর ;
জয় পতাকা তাদের হাতে, তাদের চির উচ্চশির !

সহজ হাসে উড়ায় ত্রাসে, ভয় করে না বন্দিবাসে,
দুই পা দিয়ে মাড়ায় যারা শাঠ্যভরা ফন্দি-ফাঁসে,
সত্য শুধু মাথার মণি, মার অভয় যাদের আশা,
ভীরুর প্রাণে দের সাহস, মূকের মুখে যোগায় ভাষা ;
ধন্য তারা, পূজ্য তারা,—জয় তাদের, তারাই বীর
জয় পতাকা তাদের হাতে, তাদের চির উচ্চশির !

৪

শোষণ-করা শাসননীতি মানতে যারা নয়ক রাজী,
গায়ের জোরে যত দাবাও, যতই বল, "বেজায় পাজী,'
সজাগ যারা, তরুণ যারা, সত্যপথে যাবেই ঠিক,
মুক্তি-সেনা মরণজয়ী শক্তিশালী ও নির্ভীক ;
ধন্য তারা, পূজ্য তারা,—জয় তাদের, তারাই বীর ;
জয় পতাকা তাদের হাতে তাদের চির উচ্চশির !

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

প্রথম অধিকরণ—বিনয়াধিকারিক

ষষ্ঠ প্রকরণ—উপধা-দ্বারা অমাত্যগণের শুচিতা ও অশুচিতার জ্ঞান

দশম অধ্যায়

মূল :—মন্ত্রী ও পুরোহিতকে বন্ধু করিয়া অমাত্যগণকে সাধারণ অধিকারে স্থাপনপূর্ব্বক উপধা দ্বারা শোধিত করিবেন।

সঙ্কেত :—শৌচ—শুচিতা—প্রভুর প্রতি বিশ্বস্তভাব; purity. অশৌচ—অশুচিতা—স্বামীর প্রতি দুষ্টভাব—অবিশ্বস্ততা—impurity (SH); faithlessness বলা ভাল। মন্ত্রিপুরোহিতসখঃ—মন্ত্রী ও পুরোহিতকে সখা করিয়া—অর্থাৎ—মন্ত্রী ও পুরোহিতের সাহায্যে অথবা তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া একযোগে। সামান্য—সাধারণ, অপ্রধান (গঃ শাঃ), ordinary (SH)। অধিকরণ—অধিকার, পদ, government departments (SH)। উপধা—ছল, প্রলোভন; temptation (SH)। শৌচয়েৎ—শোধয়েৎ (গঃ শাঃ); examine (SH); শুচিতা পরীক্ষা করিবেন—এইরূপ অর্থ সঙ্গত বোধ হয়।

মূল :—অযাজ্য যাজনে ও অধ্যাপনে নিযুক্ত পুরোহিত অসহনশীল হইলে রাজা তাঁহাকে অবমানিত করিবেন (অথবা স্বপদচ্যুত করিবেন)। তিনি মন্ত্রিগণের দ্বারা শপথপূর্ব্বক এক একজন অমাত্যকে ভেদগ্রস্ত করিবেন—'এই রাজা অধার্ম্মিক; (আমরা) ধার্ম্মিক অন্য কোন তাঁহারই বংশজাত, অবরুদ্ধ, কুল্য, একপ্রগ্রহ, সামন্ত, আটবিক বা ঔপপাদিককে ইহার (স্থানে) সুষ্ঠুভাবে নিবেশিত করিব। ইহা (অন্য) সকলেরই রুচিকর—আপনার বা কিরূপ (লাগিতেছে)? প্রত্যাখ্যানে শুচি—ইহাই ধর্ম্মোপধা।

সঙ্কেত :—ব্যাপারটি হইতেছে এইরূপ—রাজা পুরোহিতের সহায়তায় অমাত্যগণের সাধুতা পরীক্ষা করিতে পারেন। অবশ্য পুরোহিতের সহিত পূর্ব্ব হইতেই গোপনে যোগসাজস থাকা চাই—বাহিরে উহার প্রকাশ থাকিলে চলিবে না। প্রকাশ্যে রাজা পুরোহিতকে অযাজ্য-যাজনে বা অযোগ্যের অধ্যাপনে নিযুক্ত করিবেন। পুরোহিত উহাতে কুপিত হইবেন। ফলে রাজা তাঁহাকে অবমানিত ও পদচ্যুত করিবেন। তখন পুরোহিত প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক অমাত্যের নিকট এই বলিয়া চর পাঠাইবেন—'এ রাজা ত অধার্ম্মিক—ইহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইহার স্থানে আর একজনকে প্রতিষ্ঠিত করা যাউক (কিরূপ লোককে বসান যাইতে পারে তাহারও একটা তালিকা এই প্রসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে, যথা—ঐ রাজবংশেরই কেহ ইত্যাদি;—এইরূপ লোকের উপরই অমাত্যগণের সহানুভূতি থাকা স্বাভাবিক)। অন্য সকল অমাত্যেরই এ বিষয়ে সম্মতি আছে—কেবল আপনার মত কি জানাইবেন।' অবশ্য এই ব্যাপার গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যে শপথ (দিব্য) দেওয়া হইবে। যদি অমাত্য (প্রত্যেকে বা কেহ কেহ) এই প্রলোভনকর গোপনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তাঁহাকে শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

অযাজ্যযাজনে—অযাজ্য—যাঁহাকে যজমানরূপে স্বীকার করা যায় ন —যজমান হইবার অযোগ্য—যথা—বৃষলীপতি ইত্যাদি (গঃ শাঃ) outcaste (SH)। এরূপ দুরাচার নীচ ব্যক্তির পৌরহিত্যে নিযুক্ত অসহনশীল—অক্ষমাণঃ (মূল)—অধর্ম্ম কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার ফলে কুপিত (গঃ শাঃ); refuses (SH); does not tolerate becames angry বলা উচিত। অবক্ষিপেৎ—অবমানিত করিবেন স্বপদচ্যুত করিবেন (গঃ শাঃ); shall dismiss (SH); shal insult বলাও উচিত। সত্রিভিঃ—through the medium of spies under the guise of classmates (SH); 'গূঢ়পুরুষ প্রণিধি' প্রকরণে 'সত্রী'র লক্ষণ দ্রষ্টব্য—যাঁহারা রাজার অসম্বন্ধী হইয়া রাজকর্ত্তৃক অবশ্য ভরণীয়—সামুদ্রিক বিদ্যাদি শিক্ষা করিয়া তাহা সাহায্যে যাঁহারা চরের কার্য্য করেন, তাঁহারাই সত্রী। উপজাপয়ে —ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিবেন। তৎকুলীন—যে রাজার বিরোধ করা চেষ্টা হইতেছে, সেই রাজা যে বংশে জাত, এই প্রস্তাবিত রাজাও সে বংশেরই লোক। অবরুদ্ধ—বন্দী—রাজদ্রোহিতার অপরাধে বা আশঙ্কা বন্দী কোন জনপ্রিয় ব্যক্তি। কুল্য—রাজা হইবার যোগ্য উচ্চকু সম্ভূত; neighbouring king of his family (SH)। শ্যামশা এ অর্থ কোথায় পাইলেন বুঝা গেল না। একপ্রগ্রহ—সকলে যাঁহা তুল্যরূপ পূজা করেন—সমপূজ্য (গঃ শাঃ); গণপতি শাস্ত্রীর মতে— 'প্রগ্রহ' অর্থে পূজা। শ্যামশাস্ত্রীর মতে— of self-sufficiency. আপে মতে 'প্রগ্রহ' অর্থে নেতা—একচ্ছত্র নেতা। এ অর্থ ভাল। সাম পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের অধিপতি (গঃ শাঃ); অধীন করদ রাজা। শ্যামশা অনুবাদ করেন নাই। আটাবিক—বনপতি—আরণ্য রাজা, wil chief (SH)। ঔপপাদিক—পাদ অর্থে 'প্রত্যন্ত-পর্ব্বত' (অর্থাৎ উচ্চ পর্ব্বতের মূলে অবস্থিত ক্ষুদ্র পাহাড়); পাদের সমীপে—উপপাদ। উপপা জাত—ঔপপাদিক—ইহাই গঃ শাঃ মত। শ্যামশাস্ত্রীর মতে—উহার অ upstart. আমাদের মনে হয়—যাঁহার রাজা হওয়া উপপন্ন (অর্থা যুক্তিযুক্ত)। গঃ শাঃ প্রায় অনুরূপ আর একটি অর্থও দিয়াছেন— ঔপপাদিক—পুরোহিত ও অমাত্যবর্গের সম্মিলিত নির্দ্ধারণে স্থিরীকৃত উপপাদ—'সমর্থন' (গঃ শাঃ); আমাদের অর্থ—উপপাদ—উপপাদন

উপপাদের যোগ্য উপপাদিক। অন্য প্রতিপাদয়ামঃ (মূল)—ইঁহার স্থানে নিবেশিত বা প্রতিষ্ঠিত করিব। এই মর্ম্মে যে অমাত্যকে ভাঙ্গান দরকার, তাঁহার নিকট গুপ্ত সংবাদ পাঠান হইবে। ঐ অমাত্য যদি এই প্রকারে উপজাপিত হইয়াও 'না, আমি এরূপ করিব না' বলিয়া দূতকে ফিরাইয়া দেন, তাহা হইলে রাজা বুঝিবেন—উক্ত অমাত্য নির্দ্দোষ ও বিশ্বাসযোগ্য। ইহার নাম 'ধর্ম্মোপধা'—ধর্ম্ম-স্থাপনের অনুকূল বচোভঙ্গী দ্বারা ছলনা। পুরোহিত যে রাজাকে পদচ্যুত করিতে চাহিতেছেন—ইহাতে তাঁহার রাজার উপর ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ নাই ; রাজা যখন তাঁহাকে অধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করিয়া চাহিয়াছেন, অতএব রাজা অধার্ম্মিক ; অধার্ম্মিক রাজার উচ্ছেদ-কামনায় পুরোহিত এই ষড়্‌যন্ত্র করিতেছেন—ইহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত স্বার্থ কিছুই নাই—কেবল ধর্ম্মস্থাপনই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। 'ধর্ম্মোপধা' শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য। শ্যামশাস্ত্রীর religious allurement'—অত্যন্ত অস্পষ্ট। বরং this allurement is based on the religious plea (of dethroning an unrighteous king and establishing a righteous substitute' বলা চলে।

মূল :—সেনাপতি অসৎপ্রগ্রহহেতু অবক্ষিপ্ত হইয়া সত্রিগণ দ্বারা এক একজন অমাত্যকে লোভনীয় অর্থ দ্বারা রাজ বিনাশের নিমিত্ত উপজাপিত করিবেন (এই মর্ম্মে)—'ইহা আমাদিগের মধ্যে অন্য সকলেরই রুচিকর, আপনারই বা কেমন (লাগে) ? প্রত্যাখ্যানে শুচি—ইহাই অর্থোপধা।

সঙ্কেত :—অসৎপ্রগ্রহ—ইহারও অর্থ সুনিরূপণযোগ্য নহে। শ্যামশাস্ত্রীর অর্থ—'dismissed from service for receiving condemnable things'—অর্থাৎ কুৎসিত দ্রব্য গ্রহণ করা হেতু। অবশ্য পাঠান্তরও আছে—অসৎপ্রতিগ্রহেণ। কিন্তু ইহাই যদি অর্থ হয় যে—সেনাপতি নিন্দিত দ্রব্য (কিংবা উৎকোচ) গ্রহণ করার অপরাধে বিতাড়িত হইলেন, তখন আর তাঁহার সহিত ষড়্‌যন্ত্রে যোগ দিতে অমাত্যগণ চাহিবেন না। এক তিনি যদি প্রভূত অর্থ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বিতাড়িত হন, আর সেই অর্থের অংশবিশেষ প্রদানের লোভ দেখাইয়া অমাত্যবর্গকে ভাঙ্গাইতে চাহেন তাহা যে একেবারে অসম্ভব একথা আমরা বলি না। তথাপি অমাত্যবর্গের সহানুভূতি আকর্ষণের নিমিত্ত সেনাপতিকে অসৎ দ্রব্য গ্রহণকারী বলিয়া বর্ণনা না করাই ভাল। গণপতি শাস্ত্রীর অর্থ—অসৎপ্রগ্রহ অর্থাৎ অপূজ্য-পূজার নিমিত্ত অবমানিত ; রাজা সেনাপতিকে আদেশ দিলেন—পূজার অযোগ্য কোন ব্যক্তিকে পূজা কর——সেনাপতি ইহা অপমানজনক মনে করায় রাজাদেশ পালন করিলেন না। ফলে তিনি অর্থ ও মান উভয়ই হারাইলেন। এরূপ অর্থ স্বীকার করিলে পুরোহিতের ন্যায় তিনিও সহানুভূতির প্রত্যাশা করিতে পারেন। অবমানিত ও পদচ্যুত হইয়া তিনি চর পাঠাইয়া অমাত্যবর্গকে একে একে ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতে পারেন। পুরোহিত শপথপূর্ব্বক ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করেন ; কারণ তাঁহার ছলনা—ধর্ম্মোপধা। পক্ষান্তরে, সেনাপতি কেবল শপথমাত্র সহায়ে ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করেন না—তিনি লোভনীয় অর্থের প্রলোভনও দেখান—ইহাই পার্থক্য ; কারণ—এ ছলনা যে 'অর্থোপধা'। গঃ শাঃ উপজাপের (অর্থাৎ ভাঙ্গাইবার) পদ্ধতিরও উল্লেখ করিয়াছেন—'এই রাজা অপথে প্রবৃত্ত ; ইঁহার স্থানে সৎপথবর্ত্তী ইঁহারই বংশোদ্ভূত, অবরুদ্ধ বা ঐরূপ অন্য কাহাকেও প্রতিষ্ঠিত করা যাউক'।

যাঁহারা ধর্ম্মানুরাগী, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মস্থাপনের প্রলোভন দেখাইয়া ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিবেন পুরোহিত। যাঁহারা অর্থলোভী, তাঁহাদিগকে লোভনীয় অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিবেন সেনাপতি। শ্যামশাস্ত্রী অর্থোপধার ভাষান্তর দিয়াছেন—monetary allurement.

মূল :—লব্ধবিশ্বাস ও অন্তঃপুরে প্রাপ্তসংকারা পরিব্রাজিকা এক একজন মহামাত্রকে প্রলোভিত করিবেন (এই মর্ম্মে)—'রাজমহিষী তোমায় কামনা করেন—সমাগমের উপায়ও কৃত হইয়াছে। আর (ইহাতে) মহান্ অর্থও হইবে'। প্রত্যাখ্যানে শুচি—ইহাই কামোপধা।

সঙ্কেত :—পরিব্রাজিকা—ভিক্ষুকী (গঃ শাঃ)—সন্ন্যাসিনী বলাই ভাল। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা অবশ্য 'ভিখ্‌ণুনী'—কিন্তু 'ভিক্ষুকী' বলিলে সাধারণ ভিখারিণী বুঝায়—সন্ন্যাসিনীর ভাবটা বুঝায় না। A woman spy in the guise of an ascetic (SH)—এ অর্থ সঙ্গত। লব্ধবিশ্বাসা—শ্যামশাস্ত্রী ইংরাজী দেন নাই ; যিনি (রাজার বা রাজমহিষীর) বিশ্বাসভাজন। অন্তঃপুরে কৃতসৎকারা—অন্তঃপুরবাসিনী মহিষী ও অন্যান্য পুরনারীগণ-কর্ত্তৃক পূজিতা। মহামাত্র—(১) মাহুত (এ স্থলে সে অর্থ নহে) ; (২) অমাত্য। শ্যামশাস্ত্রী ভাষান্তর করিয়াছেন—prime minister. মহামাত্রের—'মহা' শব্দটি থাকার দরুণই কি 'prime' minister অর্থ করা হইল ? তাহা হইলে 'একৈকং মহামাত্রং'—এই বাক্যাংশের সঙ্গতি থাকে না। শ্যামশাস্ত্রী ইংরাজীও করিয়াছেন 'each prime minister.' কিন্তু prime minister ত একের অধিক থাকিতে পারে না। অতএব, ইহা অসঙ্গত। বস্তুতঃ 'মহামাত্র' বলিতে অমাত্যমাত্রকেই বুঝায়। কৃতসমাগমোপায়া—সমাগম অর্থে রাজান্তঃপুরে সমাগম অর্থাৎ গমন, অথবা সমাগম অর্থে সঙ্গম বা মিলন ; সমাগমের উপায় ; তাহা করা হইয়াছে। রাজমহিষীই অন্তঃপুরে প্রবেশ ও তাঁহার সহিত মিলনের উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। এ মিলনে যে কেবল কামোপভোগ চরিতার্থ হইবে তাহা নহে—পরন্তু অর্থও প্রচুর আসিবে। অতএব, কামের প্রলোভন ইহাতে মুখ্য—আর অর্থের প্রলোভন গৌণ। কাম-প্রলোভনমুখ্য বলিয়া ইহা 'কামোপধা' (love allurement (SH) ।

(ক্রমশঃ)

স্বাধীনতার নবজন্ম—ইন্দোচীন

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোচীনেও গণদেবতার রুদ্ররোষ জ্বলে উঠেছে। এই আগুন কিন্তু নূতন নয়, বহুকাল ধরেই ইহা ধূমায়িত হচ্ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে এই অঞ্চলে ফরাসীরা বেপরোয়াভাবে শোষণনীতি চালাতে আরম্ভ করলে গণশক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হয়। বহু পূর্ব্ব থেকেই প্রায় শতবর্ষকাল ধরে ফরাসী ইন্দোচীনের দেশপ্রেমিকগণ ফরাসী উপনিবেশ প্রথার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। ফরাসী সরকারের নির্ম্মম দমননীতিকে উপেক্ষা করে কি ভাবে এই সংগ্রাম চলে আসছে এই প্রবন্ধে তারই একটা ইতিহাস দেবার চেষ্টা করবো।

ইন্দোচীনে আজ দেখতে পাই যে আনামীদের গণঅভ্যুত্থানকে দমন করবার জন্য বৃটীশ ও ফরাসীদের পাশাপাশি জাপানীরাও লড়াই করছে। আশ্চর্য্য লাগে! ১৯৩৯ থেকে আরম্ভ করে দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল বৃটেন যে শক্তিকে ফ্যাসিষ্ট, পররাজ্যলোভী ও বর্ব্বর বলে অভিহিত করে এসেছে আজ তারই সাহায্যে আনামীদের স্বাধীনতার দাবীকে গলা টিপে মারার চেষ্টা সত্যই অভিনব! ইন্দোচীনে যতক্ষণ জাপশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল ততক্ষণ আনামের সিংহাসনে এক সম্রাট অধিষ্ঠিত ছিলেন। জাপানীদের আত্মসমর্পণের পর সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং স্বাধীনতাকামী গণকর্মীরা 'ভিয়েটনাম' গভর্ণমেণ্ট গঠন করেন। আনামীরা ইন্দোচীনকে ভিয়েটনাম নামে অভিহিত করে থাকে। এই ভিয়েটনাম গভর্ণমেণ্টের পেছনেই ভিয়েটমিন বা আনামীদের সম্মিলিত দলগুলি শক্তি যোগাচ্ছে। কম্যুনিষ্টগণও এই দলে আছে। আনামের এই নূতন গভর্ণমেণ্ট সুশৃঙ্খলেই দেশের শাসন চালাচ্ছিলেন। বৃটীশ সৈন্যদের ইন্দোচীনে আগমনের পর থেকেই গোলযোগ সুরু হয়। বৃটীশ সেনানায়ক মেজর জেনারেল গ্রেসির হাতে সামরিক ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। গ্রেসি পৌঁছেই এক ঘোষণা জারী করলেন যে কোনরূপ ইস্তাহার বিলি করা চলবে না এবং পথে অস্ত্রশস্ত্র, এমন কি লাঠি নিয়ে চলাও নিষিদ্ধ করলেন। শেষ পর্য্যন্ত ভিয়েটনামকে তাদের অধীনস্থ পুলিশ ও সৈন্যসংখ্যা, ঘাঁটিগুলির অবস্থিতি, এমন কি অস্ত্রশস্ত্রের প্রকৃতি পর্য্যন্ত জানাতে নির্দ্দেশ দেওয়া হল। ভিয়েটনামের ধারণা ছিল যে মিত্রপক্ষ তাদের আনামীদের প্রতিনিধিস্থানীয় গভর্ণমেণ্ট বলে গ্রহণ করবেন। কিন্তু গ্রেসির আবির্ভাবে তাদের নিরাশ হ'তে হ'ল। তা সত্ত্বেও তাঁরা নির্দ্দেশ পালনে কোন ত্রুটী করলেন না। ভিয়েটনামের ঘরবাড়ী আনামীদের প্রহরাধীন থাকলেও জাপানী ও গুর্খা সৈন্যেরা রাজপথে টহল দিতে লাগল। ১৯৪৫ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অবস্থাটা এইরূপ দাঁড়ায়—জাপানীদের যেখানে যেখানে ঘাঁটী ছিল সেইখানগুলি ছাড়া বাকী সমস্ত জায়গায় আনামীদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল। রাজধানী সাইগনের অসামরিক শাসনকার্য্যও আনামীরাই চালাতে লাগল—সামরিক কর্ত্তৃত্ব রইলো বৃটীশের হাতে। আপোষের জন্য গ্রেসি ও ভিয়েটনাম গভর্ণমেণ্টের মধ্যে আলোচনা চলতে লাগল। এমন সময় ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে ফরাসীদের অভিযান অতি অপ্রত্যাশিত ভাবেই সুরু হয়। ভোর রাত্রেই রাস্তায় রাস্তায় গুলি গোলা চলতে লাগলো। তখনও পর্য্যন্ত কিন্তু বৃটীশ ও গুর্খা সৈন্যরা রাস্তায় টহল দিচ্ছিল। আনামীরা সবিস্ময়ে দেখলে যে ফরাসীরা লরীযোগে সহরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। বৃটীশের নিকট টমিগান, জাপানীদের মেসিনগান, রিভলবার- এমন কি ছুরি পর্য্যন্ত নিয়ে ফরাসীরা অস্ত্রসজ্জা করে। সকাল ছ'টা পর্য্যন্ত ফরাসীরা অভিযান চালিয়ে ভিয়েটনাম গভর্ণমেণ্টের সমস্ত ভবন ও পুলিশ ঘাঁটি দখল করে বসে, যাকে সামনে পেলে তাকেই বন্দী করে। অকস্মাৎ আক্রান্ত হয়ে আনামীরা সহর হতে পলায়িত হয়। যে সকল আনামী বন্দী হল ফরাসীরা তাদের প্রতি বর্ব্বর আচরণ করতে লাগলো। স্ত্রী-পুরুষ শিশু সকলকে বেঁধে এক জায়গায় ফেলে রাখা হল। কেউ একটু নড়াচড়া করলেই ফরাসী প্রহরীরা তাদের সঙ্গীন পদাঘাতে পুরস্কৃত করতে লাগল। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এর প্রতিবাদ করা হলে উত্তর এল—"নেটিভদের সঙ্গে এই রকম ব্যবহারই আমাদের প্রাচীন রীতি।"

ফরাসীদের এই আকস্মিক অভিযানে যে বৃটীশের গোপন সম্মতি ছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। তা না হ'লে গ্রেসির হাতে সামরিক কর্ত্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও ফরাসীদের পক্ষে অভিযান চালান সম্ভবপর হ'ত না। বৃটীশের পক্ষ থেকে বারম্বার ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আনামীদের এই অভ্যুত্থানে জাপানীরা প্ররোচনা দিয়েছে এবং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা ভিন্ন রূপ। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত যে জাপ ফরাসী মৈত্রী ইন্দোচীনে বলবৎ ছিল আজ বৃটীশের সম্মতিক্রমে তারই পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। জাপানীদের দ্বারা পরিচালিত জাপ-লরীতে চড়ে আনামীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বৃটীশ ও ফরাসীরা আনামীদের জাপ তাঁবেদার বলে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করছে এবং নির্ম্মম ভাবে দমন ও শোষণ নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। অবলীলাক্রমে আনামীদের হত্যা করতেও তারা দ্বিধাবোধ করছে না। তা সত্ত্বেও এখানে স্বাধীনতার যে আগুন জ্বলে উঠেছে তা নির্ব্বাপিত হচ্ছে না এবং হবেও না কোনদিন।

এখন ইন্দোচীনের ভৌগোলিক অবস্থা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করা যাক। ইন্দোনেশিয়ার মত ইন্দোচীনও একটা দেশ নয়, কয়েকটী দেশের সমষ্টি। দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ায় ফরাসী-অধিকৃত দেশগুলির সমষ্টিগত নাম ইন্দোচীন। পাঁচটী স্বতন্ত্র দেশ নিয়ে ইহা গঠিত—কোচিন চীন, আনাম, কাম্বোডিয়া, টনকিং ও লাওস। ইন্দোচীনের সমগ্র ভূভাগের পরিমাণ ২৮৬০০০ বর্গ মাইল, অর্থাৎ ফ্রান্সের প্রায় দেড়গুণ। ১৯৩১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী এখানের জনসংখ্যা

প্রায় ২৩ কোটী ৪৫ লক্ষ তিন হাজার পাঁচশত। এই জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ৪১ হাজার ফরাসী। মঙ্গোলবংশীয় আনামীরাই আনাম, টনকিং ও কোচিন-চীনে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় পাঁচ ভাগের চারি ভাগ। আনামীদের ভাষা চীনা ভাষার অনুরূপ এবং চীনা হরফেই লিখিত। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে দক্ষিণ চীন থেকে চীনারা এসে এইখানে বসবাস সুরু করে। কোচিন-চীন ও কাম্বোডিয়ার অধিবাসীদের কাম্বোডীয় বলা হয়। খৃষ্টীয় সভ্যতার জন্মের বহুপূর্ব্বেই এরা হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবাধীন হয়। এ ছাড়া দক্ষিণ আনামে চাম, টনকিংয়ে থাই এবং লাওসে থাস প্রভৃতি বহু আদিম জাতির বাস। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের শোষণ এখানে একটা মহান উপকার সাধন করেছে এই যে, এই সমস্ত বিভিন্ন জাতি তাদের স্বাতন্ত্র্য ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে।

ইন্দোচীন পৃথিবীতে চাল উৎপাদনের সর্ব্ববৃহৎ কেন্দ্রসমূহের অন্যতম। গম এবং ভূট্টাও এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। স্বর্ণ, টিন, তাম্র, দস্তা, লৌহ ও কয়লাও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার এই অখ্যাত দেশগুলি অতি প্রাচীনকালেই হিন্দুদের উপনিবেশ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীনকালে হিন্দুরা কাম্বোডিয়াকে কাম্বোজদের রাজ্য বলেই জানতেন। প্রাচীন হিন্দুরাজ্য চম্পা আধুনিক কোচিন চীন ও দক্ষিণ আনামের ভূভাগকে নিয়েই গঠিত হয়েছিল। আঙ্কর নগরী ও পার্শ্ববর্ত্তী আঙ্কর বট মন্দির হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবের পূর্ণ পরিচায়ক। প্রাচীনকাল থেকেই এই অঞ্চলগুলি চীনের প্রভাবাধীন হয়। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে এক আনামী বংশের ভূপাল চীনাদের বিতাড়িত করে আনামী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত আনামীরাই দেশ শাসন করে। তারপর ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ এখানে আসন পাতে।

ইন্দোচীনে ফরাসীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার মূলে ছিল প্রাচ্যখণ্ডে বৃটীশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সংঘাত। ভারতে ফরাসীরা ইংরাজদের কুটনীতির নিকট পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয়। তখন স্বভাবতঃই তারা এমন একটি অঞ্চলের সন্ধানে ব্যাপৃত হয় যাতে করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে তারা বৃটেনের বাণিজ্যেও ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার এই অঞ্চলটীকেই তখন তারা যোগ্যস্থান বলে নির্ব্বাচিত করে। জনৈক ফরাসী পাদরীর বুদ্ধি ও পরামর্শ ক্রমেই এখানে ফরাসী সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। এই পাদরীটির নাম—বিশপ-পিগনু-ড-বিহেন। এই বিশপ তদানীন্তন ফরাসী সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের নিকট এক স্মারকলিপিতে জানান—"ভারতে শক্তিদ্বন্দ্বে ইংরাজরা যেরূপ অনুকুল অবস্থায় উপনীত হয়েছে তাতে করে ফ্রান্সের পক্ষে সেখানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। শক্তি সাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে কোচীন-চীনে ফরাসীদের উপনিবেশ স্থাপনই বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে বলে মনে হয়। ভারতে ইংরাজদের ধ্বংস কত্তে হলে তার বাণিজ্য হয় ধ্বংস, না হয় ক্ষতিগ্রস্ত করতে হবে। আমরা যদি এখানে উপনিবেশ স্থাপন করি তাহ'লে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যাপারে আমরা বিশেষ লাভবান হতে পারবো এবং ইংরাজরা চীনের বাণিজ্যে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যুদ্ধের সময় আমরা মাত্র কয়েকখানা ক্রুজারের সাহায্যে চীনের পথ বন্ধ করে শত্রুর বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে পারবো। আমাদের সৈন্যের রসদ এবং অন্যান্য উপনিবেশের জন্য দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমরা এখান থেকেই সরবরাহ করতে পারবো। প্রয়োজন হলে এখানকার অধিবাসীদের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহও করা যাবে। কাজেই এইখানে যদি আমরা ঘাঁটী স্থাপন করি তাহ'লে ইংরাজরা আর পূর্ব্বদিকে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে সমর্থ হবে না।" (১৮৮৬ সালের সি-বি নর্ম্যানের 'কলনিয়াল ফ্রান্স' হইতে)

এই পত্র ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের মুখোস উন্মোচনের পক্ষে অতি মূল্যবান দলিল। ইংরাজ বা ফরাসীরা প্রাচ্যখণ্ডে যে সভ্যতা বিস্তারের মহান উদ্দেশ্যে আসে নাই—এর থেকে তা বেশ ভাল করেই বুঝা যায়। ফরাসীরা পূর্ব্ব থেকে পরিকল্পনা করেই ইন্দোচীনে এইভাবে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে। তার উদ্দেশ্য হল ইংরাজদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া। আসলে ফরাসীরা এখানে জলদস্যুদের একটা ঘাঁটী স্থাপন করে বৃহত্তর জলদস্যু ইংরাজদের সায়েস্তা করতে চেয়েছিল।

ফরাসী সম্রাট সানন্দে এই সাম্রাজ্য প্রয়াসী বিশপের পরিকল্পনায় সায় দিলেন। কোচিন-চীনে এক গৃহ যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ফরাসীরা ইন্দোচীনে আত্ম প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। আনামের সিংহাসনের দুই দাবীদারের একপক্ষ নিয়ে ফরাসীরা উপনিবেশের পত্তন করে। গুয়েন-ফুয়া-আন নামক আনাম রাজ ফরাসীদের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করে সিংহাসন দখল করেন এবং সমগ্র আনাম, টনকিং ও কোচীন-চীনে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন। ১৭৮৭ সালে ফরাসী সম্রাট ও আনাম রাজের মধ্যে যে চুক্তি নিষ্পন্ন হয় আনাম-রাজ তাতে ফরাসীদের হাতে কয়েকটী স্থান ছেড়ে দেন। এই ভাবে দক্ষিণ পুর্ব্ব এশিয়ায় ফরাসী উপনিবেশের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর সাম্রাজ্যবাদীদের চির পরিচিত কুট কৌশল একে একে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। রাজা গুয়েন-ফুয়া আনের বংশধরদের সঙ্গে ফরাসীদের বনিবনা হল না। খৃষ্টীয় মিশনারিদের প্রচার কার্য্য তাঁরা পছন্দ করলেন না এবং তাদের প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করলেন। অবশ্য এর ফলভোগও তাদের করতে হ'ল। মিশনারীদের প্রতি অত্যাচারের সুবিধা নিয়ে ফরাসী রাজ আনামীদের সায়েস্তা করতে অগ্রসর হলেন। ইন্দোচীনের স্বাধীনতা রবি এইবার অস্তমিত হল এবং ১৮৬২ সালের চুক্তিবলে ফরাসী শাসন সুরু হল। ফরাসী নৌ-সেনানায়কদের দ্বারা শাসন কার্য্য পরিচালিত হতে লাগল। এইভাবে প্রায় ১৫ বৎসর কাল অতিবাহিত হল। ফরাসীরা অবিশ্রান্তভাবে একের পর একটী করে ইন্দোচীনের বিভিন্ন অংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে লাগল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এইভাবে সমগ্র ইন্দোচীনে ফ্রান্সের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

ফ্রান্স ও বৃটেন এই দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যেও আপোষ হয়ে গেল। ১৯০২ সালে ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি অনুযায়ী সুদূর প্রাচ্যে উভয় শক্তির প্রভাবাধীন এলাকার সীমা নির্দ্দিষ্ট করা হ'ল।

(আগামী বারে সমাপ্য)

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

শ্রীঅবনীনাথ রায়

মিরাটে বড়দিনের ছুটিতে এ বছর প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ত্রয়োবিংশ অধিবেশন হ'য়ে গেছে। সত্যি ক'রে গুণ্‌তে গেলে এটি ত্রয়োবিংশ নয়, চতুর্বিংশ অধিবেশন হয়। মধ্যে এক বছর সম্মেলন বসেনি, কিন্তু তার বার্ষিক বৈঠক এলাহাবাদে বসেছিল। এই কারণে পরের বছর লক্ষ্ণৌ সহরে সম্মেলনের জুবিলি অর্থাৎ পঞ্চবিংশ অধিবেশন হবে স্থির হয়েচে।

কয়েকটি কারণে এ বছরের সম্মেলন খুব সার্থক হয়েচে ব'লে আমার মনে হয়। এই রকম সাহিত্য সম্মেলনের উদ্দেশ্য আর যাই হোক্, প্রধান উদ্দেশ্য জাতির মধ্যে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করা, জাতির ক্রমশঃ ক্ষীয়মান প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ এবং সঞ্জীবিত ক'রে তোলা। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েচে—আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত এবং শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি এবং ভাষণে। অনুপ্রাণনার সৃষ্টি হয় পরস্পর মিলনে এবং যাঁদের মধ্যে প্রাণশক্তি সতেজ এবং দেশের কল্যাণ-ইচ্ছা জাগ্রত তাঁদের সাহচর্য এবং উপদেশ লাভে। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র ক'রে সেই দুর্লভ সুযোগ ঘটেছিল। বাংলা দেশের গৌরব এবং বাঙালীর কৃতী সন্তান অনেকে একত্র হ'য়েছিলেন এবং প্রতিনিধি-নিবাসে একত্র থাকার ফলে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হ'য়েছিল।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনকে সম্মাননা প্রদর্শন করার জন্য মিরাটে বাঙালী এবং হিন্দুস্থানী মহলে প্রতিযোগিতা পড়ে গিয়েছিল। এ বিষয়ে মিরাটের অ-বাঙালী অধিবাসীরা তাঁকে এতটুকু পর ব'লে মনে করে নি। এইটিই ত ভারতের সর্বনিধির পরিচায়ক, যে বাঙালীর নেতাকে তারা কেবলমাত্র বাঙালীর ব'লে মনে করছে না, মনে করছে সমগ্র ভারতবাসীর নেতারূপে। যদিচ আচার্যদেব প্রতিনিধি নিবাসেই অবস্থান করছিলেন, তবু তাঁর স্নানাহার যে কোথায় সম্পন্ন হ'ত আমরা জানতে পেতুম না। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখতুম কেউ তাঁকে চা খাওয়াতে বাসায় নিয়ে গেছেন, কেউ স্নান করাতে, কেউ বা মধ্যাহ্ণ-ভোজনে। সকলে শান্তভাবে অপেক্ষা করতেন, তারপর যাঁর ভাগ্যে যে সুবিধাটুকু জুটতো তিনি তার সুযোগ গ্রহণ করে ধন্য হ'তেন। আর মহিলাবৃন্দ ত তাঁকে সর্বদা ঘিরে ব'সে থাক্‌তেন—কলেজের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সতরঞ্চির উপর রোদে পিঠ ক'রে ব'সে তাঁদের অপরাহ্ণ-সভা জমে উঠ্‌তো—আচার্যদেব সকলের মাঝখানে ঠাকুর্দার মত ব'সে হাস্য পরিহাস সহযোগে গম্ভীর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেন এবং উপদেশ দিতেন।

এই সর্বনিধির গুপ্ত কারণ বা সিক্রেট্, কি আমি ভেবে দেখতে চেষ্টা করেছি। মনে হচ্চে এর একমাত্র কারণ নিজের মনোমত আদর্শকে পূজা করবার শক্তি। যৌবনে আদর্শ হয়ত সকল বাঙালীর ছেলের মনেই একটা থাকে, কিন্তু সাধনার দ্বারা শতকরা নিরানব্বই জন আমরা সেটাকে সার্থক ক'রে তুলতে পারি নে। আমাদের ত্যাগ এবং তপস্যা নেই—তাই আমরা সাধারণের গতিপথ অবলম্বন করেই চলি—আমরা অসাধারণ হ'তে পারি নে। ক্ষিতিমোহনবাবুকে জানি—আমি তাঁর ছাত্র। যৌবনে একদা কাশ্মীর ষ্টেটের বড় চাকরি ছেড়ে শান্তিনিকেতনে এসে শিক্ষকতার কার্যে যোগ দিয়েছিলেন—আজও সেই কাজে নিযুক্ত আছেন। তফাতের মধ্যে এই হয়েচে যে—আজ তাঁর শিক্ষকতার ক্ষেত্র কেবলমাত্র বিশ্বভারতীতে সীমাবদ্ধ নয়—সে ক্ষেত্র সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসারিত হয়েচে। একথা অনুমান করা শক্ত নয় যে মধ্যবিত্ত বাঙালী-জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যা বহুবার তাঁর দুশ্চর তপস্যাকে ব্যাহত করবার চেষ্টা করেছে কিন্তু তিনি তাঁর অসাধারণ চরিত্রবল, নিষ্ঠা এবং নির্লোভিতার দ্বারা সকল বাধা জয় করেচেন। তাই আজ ৬৭ বছর বয়সেও তাঁর স্মৃতিশক্তি অক্ষুণ্ণ, কর্তব্য-বোধ অটুট এবং দেশের মঙ্গলকামনা অমোঘ। তা না হ'লে নীচু রক্তচাপের (low blood pressure) ভগ্নস্বাস্থ্য রোগী—উত্তর ভারতের দুঃসহ শীত সহ্য করতে শান্তিনিকেতন থেকে মিরাটে আসতে পারতেন না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখলুম নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয়কে। ইতিপূর্বে জামসেদপুর অধিবেশনে তাঁকে দেখেছিলুম কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নি। এবার তাঁকে দেখে এবং ভাষণ শুনে বুঝলুম তিনি prince among man হ'য়েও gem among the Bengalis. "Dawn" ম্যাগাজিনের আমল এবং স্বদেশী আন্দোলনের যুগ থেকে তিনি তাঁর জীবন-কথা আরম্ভ করলেন। লৌহ-শিল্পে তাঁর কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার সংবাদ দিলেন এবং কি ক'রে ওকালতি করবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েও তাঁকে ইঞ্জিনিয়ার লাইনে আসতে হ'ল তার গুপ্ত কথা বর্ণনা করলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর যে পরমাশ্চর্য বিদ্যাবত্তা (encyclopaedic knowledge) এবং দরদভরা প্রাণের পরিচয় পাওয়া গেল সেটা যে-কোন জাতির পক্ষেই আদরের সামগ্রী। জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয়ই জগতে দুর্লভ—রক্ষিত মহাশয়ের চরিত্রে সেই সমন্বয় ঘটেচে। পণ্ডিত হ'য়েও তাঁর চরিত্রে শুষ্কতা আসে নি। সর্ববিধ ঐশ্বর্যের অধিকারী হ'য়েও তাঁর পরিধানে প্যান্টকোট দেখলুম না, চরিত্রে দম্ভ দেখলুম না। অপর পক্ষে বাঙালী জাতির জন্য সমবেদনার অন্ত নেই—বাঙালী জাতির ইতিহাসে এবং তাদের ভবিষ্যতে কি অনন্ত বিশ্বাস। স্পষ্ট বল্‌লেন যে আপনারা আমাকে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিযুক্ত মানুষই বলুন বা আর যাই বলুন, আমি বাঙালী ছাড়া অন্য জাতকে চাকরি দিই নে। তাঁর অধীনে দেড় হাজার টাকা বেতনের কর্মচারী পর্যন্ত আছেন। এ কথাটি বিশেষ করে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে আমি দেখেচি বাঙালীর সাধারণ মনোবৃত্তি হ'ল আন্তর্জাতিক এবং বিশ্বমৈত্রীমূলক স্বাজাতিক এবং বাঙালীমৈত্রীমূলক নয়। এটা আদর্শ হিসাবে যত বড়ই হোক্ দৈনন্দিন জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে এর

ফল মারাত্মক। এরূপ ক্ষেত্রে রক্ষিত মহাশয়ের এই বাঙ্গালী প্রীতি মধিকখিত সুসংবাদের মত স্বাগতম্। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মত উদাত্ত স্বরে সম্মেলনে ঘোষণা করলেন, "হে বাঙ্গালী যুবক, তুমি মনে ক'রো না যে ভারতবর্ষের অন্য কোন জাতির তুলনায় তোমার জীবিকার্জনের শক্তি অল্প। তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি অদ্বিতীয়—তুমি রাজা রামমোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দের বংশে জন্মগ্রহণ করেছ—তুমি চেষ্টা করলেই তাঁদের মত শক্তিমান হ'তে পারবে। শুধু মতান্ধতা পরিহার কর—নিজের প্রাপ্য বুঝে নেওয়ার জন্যে নিজের পায়ে দাঁড়াও। সংস্কারগত বৈরাগ্যকে (chronic apathy to the world) অবলম্বন ক'রে দধীচি মুনির মত অস্থি দিতে প্রস্তুত হ'য়ো না। তা যদি দাও তবে তার ঔষধ আমি বল্‌তে পারবো না। কিন্তু যদি মানুষ হ'য়ে দাঁড়াতে চাও তবে তার শত পন্থা আমি চেষ্টা ক'রে দেখার জন্য ব'লে দিতে পারবো।"

"শিল্প ও বাণিজ্য" শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও ধুরন্ধর ব্যক্তি। ২১ বছর আগে তাঁকে বোম্বাই সহরে দেখেছিলুম—এই দীর্ঘ দিন পরে মিরাটে পুনরায় দেখা হ'ল। চেহারার বিশেষ পরিবর্তন হয় নি—শুধু চুলে সামান্য পাক ধরেছে মাত্র। আগের মতই সদানন্দ, তেমনি কর্মঠ। আমি যখনকার কথা বলছি তখন হিন্দুস্থান কনস্‌ট্রাকসান কোম্পানীর জন্ম হয় নি—তখন তিনি হীরাচাঁদ ওয়ালচাঁদ কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার। স্যর বিঠলভাই থ্যাকারসের "পর্ণ-কুটীর" নামক প্রাসাদ পুণায় তখন ওঁদের কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে তৈরী হচ্ছে। তার কাজ পরিদর্শন করতে প্রায় প্রতি শনিবার তিনি বোম্বাই থেকে পুণা আসতেন এবং আমাদের সেল্‌টার (The shelter) নামক মেসে থাকতেন। সেই দু'দিন যে কত আনন্দে কাটতো তার স্মৃতি এখনো অম্লান আছে। নিজের জীবনের কত কাহিনী তখন বলেছেন, আসামের ডিব্রুগড় সহরে তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনের ঘটনা এখনো মনে আছে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি নিজেকে গ'ড়ে তুলেছেন, বাঙ্গালী জাতিকেও সেই মন্ত্রে তিনি গড়তে চান। তাঁর অভিভাষণ প্র্যাক্‌টিক্যাল লোকের অভিজ্ঞতার কথা—তাতে সাহিত্যের সৌন্দর্য নেই। তাঁর মতের সঙ্গে অনেকের হয়ত মতদ্বৈধ হবে কিন্তু তাঁর মন্তব্যগুলি সব চিন্তাশীল লোকের প্রণিধানযোগ্য। তিনি সকল বাঙ্গালী ছেলের উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী নন, চাকুরীরও তিনি বিরুদ্ধে। ব্যবসায়ে তাঁর সম্মতি আছে। ব্যবসায়ের নানা পন্থা তাঁর নখদর্পণে।

শিববাবুর ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনের সব কৃতিত্ব আমরা জানতুম না। রক্ষিত মহাশয় এবার তাঁর মৌখিক ভাষণে সেটা জানিয়ে দিলেন। সিন্ধু নদীর জলবন্ধন, সিঙ্গাপুরের অতুলনীয় ডক্ সব শিববাবুর ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতার কীর্তি। ভারতবর্ষে যতগুলি বড় টানেল্ (tunnel) তৈরি হয়েছে সব শিববাবুর কর্তৃত্বাধীনে। সেই কারণে মনে হয় বাঙ্গালীর এই কৃতী সন্তানের অভিমত প্রত্যেক বাঙ্গালীর পক্ষে সশ্রদ্ধভাবে চিন্তা ক'রে দেখবার যোগ্য।

"শিল্প ও বাণিজ্য" নাম দিয়ে একটা শাখা মিরাটে এইবার সম্মেলনের নতুন অঙ্গস্বরূপ খোলা হয়েছে। এর মধ্যে বিজ্ঞানশাখাকে মিশিয়ে দেওয়া চলে এবং শিল্প অর্থাৎ Industryকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে এই শাখার নেতৃত্ব করবার ভার অর্পণ করা হয়েছিল এমন ব্যক্তির হস্তে যিনি শিল্প বা Industry সম্বন্ধে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারেন এবং বাঙ্গালী যুবকদের জীবিকার্জন সমস্যার সমাধান করে হদিশ বাত্‌লাতে পারেন।

দেখা গেল মহিলা-শাখা দ্বারা সম্মেলন বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছে। আমাদের সমাজের অর্ধাংশ কি ধারায় চিন্তা করছেন, তাঁদের অভাব অভিযোগ কি, সেটা জানার প্রয়োজন ছিল। সত্যই ত তাঁদের সমস্যা এবং পুরুষদের সমস্যা এক নয়। বিশেষ এটা এমন একটা সময় যখন আমাদের বাঙ্গালী-সমাজ পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে এক প্রবল ধাক্কা খেয়েছে, কোথাও কোথাও সেই আঘাতের প্রবলতায় তার অন্তঃপুরের ভিৎ খ'সে পড়েছে। পাশ্চাত্য দেশে দেখতে পাচ্ছি—নারী নিপুণভাবে পুরুষের অনুকরণ প্রয়াসী—তাঁর পরণে পাৎলুন, মুখে সিগ্রেট। জীবনেও তিনি সন্তান পালনের চেয়ে সভাসমিতি পরিচালনাকে বড় কর্তব্য বলে গণ্য করছেন। এর অবশ্যম্ভাবী ফল ভারতীয় সমাজেও দেখা দিয়েচে—সেখানে নারী পাত্‌লুন না পরুন, সভাসমিতি নিয়ে মত্ত থাকাকে অন্তঃপুরিকার বৈচিত্র্যহীন জীবনের চেয়ে মূল্যবান ব'লে মনে করছেন। এর প্রমাণ খানিকটা দেখতে পাওয়া যায় অ্যারিস্‌টোক্র্যাটিক সমাজ-জীবনে, খানিকটা প্রবোধকুমার প্রভৃতি ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে। এরকম অবস্থায় ভারতীয় নারীর কল্যাণ কোথায়—এবিষয়ে একটা authoritative নির্দেশ পাওয়ার প্রতীক্ষা ছিল। মহিলাশাখার সভানেত্রী দিল্লী ইন্দ্রপ্রস্থ গার্লস কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা প্রভা সেনগুপ্তা সেই নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রত্যেক দায়িত্বশীল নারীকে প'ড়ে দেখতে অনুরোধ করি। শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার অভিভাষণের সারমর্মকে সমর্থন করলেন আচার্য ক্ষিতি মোহন সেন। আচার্যদেব বল্‌লেন, দিন এবং রাত্রি যেমন সময়ের দুইটি ভাগ তেম্‌নি পুরুষ এবং নারী একই পুরুষ থেকে উদ্ভূত। এঁরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরঞ্চ Complimentary, এঁদের দুইয়ের ধর্ম এক নয়, যেমন নিরবচ্ছিন্ন দিনও ভাল লাগে না, নিরবচ্ছিন্ন রাত্রিও ভাল লাগে না। দুইয়ের সম্মেলনে পরম কল্যাণ। পুরুষ সর্বত্র বীজদাতা, প্রকৃতি তাকে রূপদান করে। তাই প্রকৃতির বা নারীর কাজ সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা, তাকে পোষণ করা, তাকে রূপদান করা। এ নারী পুরুষের replica নয়। সন্তান যদি বাপের কাছে তাড়া খায় তবে মায়ের আঁচলে গিয়ে মুখ লুকোয়, কিন্তু সব জননীও যদি পুরুষালি ধর্ম অবলম্বন ক'রে পিতা হ'য়ে বসে থাকেন, তবে সন্তানের পক্ষে মহা দুর্দৈব হবে।

সম্মেলনের আর একটি আকর্ষণ ছিল এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কীর্তন। অনুকূলবাবু একাধিক বার সম্মেলনের দর্শনশাখার সভাপতিত্ব করেছেন, কিন্তু সভাপতি না হ'য়েও যে তিনি প্রতিনিধি হ'য়ে আসতে পারেন, এবার তার প্রমাণ দিলেন। বাস্তবিক এমন নিরভিমান, স্বভাবভদ্র, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি বেশি দেখা যায় না। তাঁর সুকণ্ঠের কীর্তন সমবেত সমস্ত শ্রোতার

মনোহরণ করেছিল। সম্মেলন শেষ হ'য়ে গেলেও মিরাটের লোক তাঁকে ছাড়লো না—তাঁর কীর্ত্তন শোনবার জন্ত তাঁকে রেখে দিল।

সম্মেলনের সার্থকতা কি, সম্মেলনে কি কাজ হচ্ছে, এ বিষয়ে কারোর কারোর মুখে প্রশ্ন শুনেছি। সম্মেলনের নাম থেকে "সাহিত্য" শব্দটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাবও শোনা গেছে। এর একটা উত্তর আমার মনে হয় এই যে, সম্মেলনের বয়ঃক্রম পঁচিশ বছর হ'ল—এর মধ্যে যদি একটা অন্তর্নিহিত সার্থকতা না থাকতো তবে এর মৃতদেহকে এত দীর্ঘ দিন ধ'রে লোকে বহন ক'রে নিয়ে বেড়াত না। কোন বস্তুই তার অন্তরগত সত্য ব্যতীত কেবলমাত্র প্রোপাগ্যাণ্ডা বা লোকের হাততালির জোরে বেঁচে থাকতে পারে না। কিন্তু এর একটা আরো সদুত্তর হঠাৎ কাণে এল। দিল্লী সহরের আদুবাবুর নাম উত্তর ভারতের প্রবাসী বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত। তিনি প্রতিবারের মত এবছরও মিরাটে প্রতিনিধিরূপে এসেছিলেন। আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন, "সম্মেলনে এসে আমি যা শিখি দশবছর ধ'রে বাইরের জীবনে আমি তা শিখতে পারি নে। ক্ষিতিমোহনবাবুর অভিভাষণ, রক্ষিত মহাশয়ের অভিভাষণ শুনে আমি যা শিখেছি, দশবছর ধ'রে বাইরে বেড়ালেও আমি তা শিখতে পারতুম না।" আমার মনে হয় আমরা যদি প্রত্যেকে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করি তবে এই উত্তরই পাব। আদুবাবুর মত উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য—আদুবাবু সেন্টিমেণ্টাল টাইপের মানুষ নন, তিনি নীরব কর্মী। তাঁর কর্মপদ্ধতির সঙ্গে প্রবাসী বাঙ্গালীর অনেকেরই সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। আমি কেবলমাত্র একটা উদাহরণ দেব। একবার দিল্লীর কংগ্রেস অধিবেশনে হঠাৎ খবর না দিয়ে এক রাত্রে ১২০০ প্রতিনিধি উপস্থিত হন। আদুবাবু প্রতিনিধি নিবাসের অধিনায়ক ছিলেন—এমন সুশৃঙ্খলার সহিত তাঁদের আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা তখুনি করলেন যে মনে হ'ল তিনি যেন পূর্ব্বাহ্নেই এই লোকগুলিকে সম্বর্দ্ধনা করবার জন্তে প্রস্তুত ছিলেন।

এই লেখার মধ্য দিয়ে সম্মেলনের পারসন্তালিটির কথাই বলেছি, কেননা সম্মেলনের সার্থকতা তার পারসন্তালিটির উপরই নির্ভর করে। সম্মেলনের কাঠামোপানাকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে পারেন একমাত্র এই পারসন্তালিটি।

বাহির বিশ্ব

অতুল দত্ত

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ফ্যাসিজমের সহিত লড়ে নাই—লড়িয়াছে ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে। ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রগুলি একচ্ছত্র সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিল বলিয়াই ঐ সব রাষ্ট্রকে চূর্ণ করার প্রয়োজন ঘটে। এই প্রয়োজনে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বহু বিষোদ্গীরণ করা হইয়াছে; ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রগুলি ধ্বংস হইবার পর জগৎ হইতে ফ্যাসিস্ত প্রথা চিরদিনের জন্ম নির্ব্বাসিত হইবে বলিয়া আশ্বাসবাণী শুনানো হইয়াছে। যুদ্ধের সময় আমরা আটলান্টিক সনদের আট দফা স্বাধীনতার কথা শুনিয়াছি; প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের চতুর্ব্বর্গ মোক্ষের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি। এই সব আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি যে কতদূর অন্তঃসারশূন্য, তাহা যুদ্ধ শেষ হইবামাত্রই আজ চারি দিকে বীভৎসভাবে প্রকাশ পাইতেছে। ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্র চূর্ণ হইলেও ফ্যাসিজম্ এখনও মরে নাই। যুদ্ধের সময় জার্ম্মানরা যে নীতিতে অনুপ্রাণিত হইয়া চেকোস্লোভাকিয়ার একটি গ্রাম ধ্বংস করিয়াছিল, সেই নীতি অনুসারেই বৃটিশ সৈন্ত এখন যাভার গ্রাম নিশ্চিহ্ন করিতেছে। ফ্যাসিজমের সমাধি হয় নাই—তাহার জাত্যন্তর ঘটিয়াছে মাত্র।

ফ্যাসিজম্ ও সাম্রাজ্যবাদ মূলতঃ অভিন্ন। গণতান্ত্রিক ভণ্ডামীর দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষা করা অসম্ভব হইলে তখন কৃত্রিম মুখোস অপসারিত হইয়া সাম্রাজ্যবাদের যে নগ্ন রূপ প্রকট হয়, তাহাই ফ্যাসিজম্। ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দিকে দিকে যে গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে, তাহা সাম্রাজ্যবাদীদের মিষ্ট কথায় আর শান্ত হইতে পারে না। গণতান্ত্রিকতার ছদ্ম আবরণে শত বর্ষ ধরিয়া যে জগদ্দল পাথর গণ-শক্তির বুকে চাপিয়া ছিল, তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিবার জন্ত এই শক্তি আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই উদ্দেশ্যের সহিত সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সঙ্ঘর্ষ প্রত্যক্ষ। তাই, আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন রূপ প্রকাশ পাইতেছে; এই রূপই ফ্যাসিজম্ নামে অভিহিত।

মস্কো-সম্মেলন

তিন মাস পূর্ব্বে লণ্ডনে পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলন ব্যর্থ হইবার পর হইতে আমেরিকা ও তাহার অনুগৃহীত বৃটেনের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার কূটনৈতিক মনোমালিন্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। বল্কান্ অঞ্চলের সোভিয়েট প্রভাবাধীন কয়েকটি রাষ্ট্রের নব-গঠিত গভর্ণমেণ্টকে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি স্বীকার করিতে চাহিতেছিল না। ইতালী সম্পর্কে সন্ধি-চুক্তি লইয়া দুই পক্ষে কোনওরূপ মীমাংসা অসম্ভব মনে হইতেছিল। প্রধানতঃ এই সম্পর্কে মতদ্বৈধতার জন্তই লণ্ডন বৈঠক ভাঙ্গিয়া যায়। জাপানে জেনারল ম্যাক্-আর্থারের ডিক্টেটারী বজায় রাখিবার জন্ত আমেরিকা জিদ্ করিতেছিল। সোভিয়েট রুশিয়ার প্রস্তাব অনুযায়ী জাপান সম্পর্কে একটি চতুঃশক্তির (আমেরিকা, বৃটেন, রুশিয়া ও চীন) নিয়ন্ত্রণ-কমিশন নিয়োগ করিতে আমেরিকা অস্বীকার করে। ইরাণে সোভিয়েট রুশিয়ার সমর্থনে আজারবাইজানের অধিবাসীরা আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়ায় বৃটেন তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল। চীনে প্রতিক্রিয়াপন্থী চুংকিং কর্ত্তৃপক্ষের সমর্থনে মার্কিণ

সামরিক বিভাগের তৎপরতায় সেখানে বড় রকমের মার্কিণ-সোভিয়েট বিরোধ আসন্ন হইয়া উঠে। আণবিক বোমার গোপন তথ্য সোভিয়েট রুশিয়াকে না জানাইবার সিদ্ধান্তে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি এংলো-স্তাক্‌শান শক্তির অবিশ্বাস কতখানি, তাহা বিশ্রীভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

কূটনৈতিক বিরোধ ও পারস্পরিক অবিশ্বাস যখন এইভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল, স্বার্থান্বেষীর দল যখন তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনার কথা খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিতেছিল, সেই সময়—ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে আমেরিকার পক্ষ হইতে পররাষ্ট্র সচিবদের আর একটি বৈঠক আহ্বানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। অতঃপর, ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি প্রধান তিনটি শক্তির পররাষ্ট্র-সচিব মস্কোয় এক বৈঠকে মিলিত হন।

আমেরিকার পক্ষ হইতে এই সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশের প্রধান কারণ চীনের পরিস্থিতি বলিয়া মনে হয়। শ্রমশিল্পে অনুন্নত চীনের বিশাল বাজারে প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য আমেরিকা অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। এখানে প্রচুর কাঁচামাল ও কলকজ্জা বিক্রয়ের স্বপ্ন সে দেখিতেছে। এই জন্য চীনের সামন্ততান্ত্রিক জমিদার ও সমরনেতাদের প্রাধান্যের অবসান ঘটানো তাহার স্বার্থ। এই দিক হইতেই আমেরিকা চীনের কম্যুনিষ্টদের গণতান্ত্রিক নীতি কতকটা সমর্থন করে। কিন্তু চীনের রাষ্ট্রক্ষেত্রে নেতৃত্বের বল্গা সে চুংকিংএর প্রতিক্রিয়াপন্থীদের হাতেই রাখিতে চায়। ইহার প্রধান কারণ—কম্যুনিষ্টরা আপাততঃ সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী না হইলেও তাহাদের প্রভুত্বাধীন চীনে কোনও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মোড়লী যে বেশী দিন চলিবে না, তাহা আমেরিকা জানে। চীনে আমেরিকার এই স্বার্থের কথা স্মরণ রাখিলে এক দিকে সেখানকার রাষ্ট্রক্ষেত্রে একটা মীমাংসার জন্য দৃশ্যতঃ আমেরিকার আগ্রহ এবং সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে কুয়োমিণ্টাংকে তাহার সামরিক সাহায্য দানের প্রকৃত কারণ বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

রুশিয়া চুংকিং গভর্ণমেণ্টকে চীনের একমাত্র গভর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে; চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সে কোনও কথাও বলিতেছে না। কিন্তু সম্প্রতি মাঞ্চুরিয়ায় সোভিয়েট রুশিয়ার তৎপরতায় বোঝা গিয়াছে যে, চীনে আমেরিকার অভিসন্ধি সম্পর্কে সে মোটেই উদাসীন নয়। সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলি এমন কথাও বলিয়াছে যে, মাঞ্চুরিয়ায় যেমন লালফৌজ রহিয়াছে, তেমনি উত্তর চীনেও মার্কিণ সৈন্য অবস্থান করিতেছে। চীনের ব্যাপারে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সন্দেহজনক নীরবতা এবং রুশ সংবাদপত্রের এই বক্র উক্তি ওয়াশিংটনের কর্ত্তৃপক্ষের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছিল; তাহার সহিত মনোমালিন্য বাড়াইয়া তুলিতে তাঁহারা আর সাহস পাইতেছিলেন না। বিশেষতঃ চীনের কম্যুনিষ্টদের শক্তির সন্ধান পাইয়া তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, সামরিক বলে চিয়াং-কাই-সেক্ কোম্পানীকে চীনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সেখানে বড় রকমের সামরিক তৎপরতা প্রয়োজন হইবে। ইহার পর সোভিয়েট রুশিয়া যদি প্রকাশ্যে চীনে মার্কিণ নীতির বিরোধিতা আরম্ভ করে, তাহা হইলে এই চীনকে কেন্দ্র করিয়াই তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইতে পারে। এই জন্যই সোভিয়েট রুশিয়াকে আপাততঃ খুশী রাখিয়া আমেরিকার মোড়লীতে চীনের গৃহ-বিবাদের মীমাংসার চেষ্টা করিবার জন্য মার্কিণ ধুরন্ধরদের কিছু সময় লাভের প্রয়োজন হইয়াছিল। চীনের প্রসঙ্গ সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত আলোচনা করিবার প্রয়োজন ছিল না। বরং চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রুশিয়া হাত দিবে না বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, সেই কুকার্য্য আমেরিকাও যে করিতেছে না, তাহাই বুঝাইবার প্রয়োজন ছিল।

মস্কোয় ইতালী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি ও ফিনল্যাণ্ডের সহিত সন্ধি-চুক্তির ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে যে শক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল, তাহারাই কেবল সন্ধি-চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবে। এই সন্ধি-চুক্তি সম্পর্কে মস্কোর আলোচনা অনুযায়ী অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করিবার জন্য পররাষ্ট্র সচিবদের প্রতিনিধিদিগকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর, পূর্ব্বের যে সুদূর প্রাচ্য পরামর্শ কমিশনে যোগ দিতে রুশিয়া আপত্তি করিয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন সুদূর প্রাচ্য কমিশন গঠন করা হইবে, স্থির হইয়াছে। ইহা ছাড়া, জাপানের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে টোকিওয় একটি কাউন্সিল স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। পূর্ব্বে এই সম্পর্কে রুশিয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছিল। উত্তর কোরিয়ার সোভিয়েট কম্যাণ্ড এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিণ কম্যাণ্ড লইয়া গঠিত একটি যুক্ত কমিশন কোরিয়ার গণতান্ত্রিক দলগুলির সহিত আলোচনা করিয়া সেখানে স্বায়ত্ত-শাসন স্থাপনে সচেষ্ট হইবে। এই কমিশন কোরিয়ার অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ দেশ সম্পর্কে ৫ বৎসরের জন্য চতুঃশক্তির (আমেরিকা, বৃটেন, রুশিয়া ও চীন) ট্রাষ্টিসিপ্ স্থাপনের প্রস্তাব চারিটি দেশের গভর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থাপিত করিবে। রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ার গভর্ণমেণ্ট প্রতিনিধিমূলক নহে বলিয়া আমেরিকা ও বৃটেন পূর্ব্বে এই গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিতে চাহে নাই। ইহাদের সম্পর্কে স্থির হইয়াছে যে, সহকারী সোভিয়েট পররাষ্ট্রসচিব এবং মস্কোস্থিত বৃটিশ ও মার্কিণ দূত অবিলম্বে ঐ দুইটি দেশে যাইবেন। তাঁহারা যদি মনে করেন—সেখানকার বিশ্বাসযোগ্য প্রতিনিধিমূলক দলের প্রতিনিধি গভর্ণমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তাহা হইলে তাঁহারা এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য ঐ দুই দেশের বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবেন। এই ত্রুটির সংশোধন হইলে বৃটেন ও আমেরিকা ঐ সব গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া লইবে।

উল্লিখিত মস্কো সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে বোঝা যাইবে যে, এই পর্য্যন্ত এই সম্মেলনে সোভিয়েট রুশিয়ার জয় হইয়াছে। আণবিক শক্তি উৎপাদনের পদ্ধতি বৃটিশ, আমেরিকা ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গোপন রাখিবার যে সিদ্ধান্ত ট্রুম্যান-এট্‌লি-কিং স্থির করিয়াছিলেন, তাহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। ঐ শক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য আন্তর্জ্জাতিক কমিশনের প্রস্তাব সোভিয়েট রুশিয়া মানিয়া লইয়াছে।

ইরাণের গোলযোগ

ইরাণের গোলযোগ সম্পর্কে মস্কোয় কোনওরূপ সিদ্ধান্ত না হওয়ায় বৃটিশ প্রতিক্রিয়াপন্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে। মস্কোয় নাকি এই সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল এবং এক সময়ে মনে হইয়াছিল যে, এই ব্যাপারে একটা মীমাংসা হইয়া যাইবে। শেষ পর্য্যন্ত সোভিয়েট রুশিয়ার আপত্তিতেই নাকি তাহা সম্ভব হয় নাই।

ইরাণের গোলযোগ সম্পর্কে নানারূপ মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃত ব্যাপারটা এই—উত্তর ইরাণের আজারবাইজান্ প্রদেশের অধিবাসীরা জাতিতে তুর্কি ; তাহাদের ভাষা ও জাতিগত সংস্কৃতি স্বতন্ত্র। ইহারা রাজনৈতিক চেতনায় ইরাণের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী অপেক্ষা অনেক বেশী অগ্রসর। তাহার পর, আজারবাইজানের সোভিয়েট রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত অংশ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হওয়ায় এই অঞ্চলে নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে।

ইরাণের অধিবাসীর সংখ্যা দেড় কোটীর মত ; ইহার অধিকাংশ লোকই চরম দারিদ্র্য-প্রপীড়িত। দুই হাজার সামন্ততান্ত্রিক জমিদার ইরাণের সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য করে ; মজলিস্ নামক আইন পরিষদটি প্রকৃতপক্ষে চালায় তাহারাই। শাসনযন্ত্রে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি। রাজস্বের অধিকাংশ ব্যয়বহুল শাসনব্যবস্থা চালাইবার জন্য খরচ হয় ; সমাজহিতকর কাজের জন্য কিছুই প্রায় অবশিষ্ট থাকে না। ইরাণ তৈলসম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। এই খনিজ তৈলের গন্ধ পাইয়া বৃটিশ বণিকরা বহু পূর্ব্বে এখানে আসিয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। ইরাণের মধ্যযুগীয় দুর্নীতিপরায়ণ শাসনব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখাই তাহাদের স্বার্থ।

আজারবাইজানের অধিবাসীরা ইরাণের এই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের শাসনশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের জন্য বহুদিন হইতে আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। গত অক্টোবর মাসে সেখানে টুডে পার্টি বা পিপ্‌লস্ পার্টির নেতৃত্বে নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হয়। এই নির্ব্বাচনের পর সেখানে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজারবাইজানের অধিবাসীরা ইরাণ হইতে পৃথক্ হইয়া যাইতে চাহে নাই ; তাহাদের বিরুদ্ধে এই ধরণের যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

তবে, একথা ঠিক যে, আজারবাইজানের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের চেষ্টায় সোভিয়েট রুশিয়া পরোক্ষে সাহায্য করিয়াছে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ডাণ্ডা মারিয়া এই আন্দোলন থামাইতে চাহিয়াছিলেন— কিন্তু উত্তর ইরাণের সোভিয়েট সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ তাহা করিতে দেয় নাই।

ইরাণ তথা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার আগ্রহ স্বাভাবিক। এই অঞ্চলে গত কিছুকাল সোভিয়েট-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের আভাস পাওয়া যাইতেছে। আমরা দেখিয়াছি—সীরিয়া-লেবাননের ব্যাপারে ফ্রান্সের প্রস্তাব অনুযায়ী সোভিয়েট রুশিয়াকে আমন্ত্রণ জানাইতে বৃটেন্ ও আমেরিকা আপত্তি জানাইয়াছিল। প্যালেষ্টাইনের ব্যাপারে আমেরিকা মোড়লী করিবার অধিকার পাইল ; কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়াকে দূরে রাখা হইল !

তিনটি মহাদেশের সংযোগস্থলে মধ্য-প্রাচ্যের এই দেশগুলির সামরিক গুরুত্ব খুব বেশী। প্রাচ্যের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বৃটেন্ এই অঞ্চল সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। ইহা ছাড়া, ইরাণ ও ইরাকের খনিজ তৈলে বৃটিশ বণিকদের বিশেষ স্বার্থ রহিয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকা সৌদী-আরবে তৈল আহরণের অধিকার পাইয়াছে। সেবার তেহরাণ হইতে ফিরিবার সময় প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বিনা কারণে রাজা ইবন্ সৌদের সহিত মোলাকাৎ করেন নাই। এই সব কারণে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সোভিয়েট রুশিয়াকে এই অঞ্চল হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা স্বাভাবিক।

পক্ষান্তরে, সোভিয়েট রুশিয়ার নিরাপত্তার জন্য পূর্ব্ব-ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির গুরুত্ব যেমন, মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলির গুরুত্বও তেমনি। সুতরাং এই অঞ্চল সম্বন্ধে সে উদাসীন থাকিতে পারে না। ইরাণে প্রকৃত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে উৎসাহ দেওয়ায় সোভিয়েট রুশিয়ার স্বার্থ রহিয়াছে। সমগ্র ইরাণে সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষপাতী গণতান্ত্রিক আন্দোলন সফল হইলে অদূর ভবিষ্যতে ইরাণকে কেন্দ্র করিয়াই সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলন আরম্ভ হইতে পারে।

বৃটেন্‌কে আমেরিকার ঋণ

ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থায় আমেরিকার নিকট বৃটেনের ঋণের একটা বিরাট অঙ্ক মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট মকুব করিয়াছেন এবং বৃটেন্‌কে নূতন করিয়া মোটা ঋণ দিতে সম্মত হইয়াছেন। এই ঋণের কতকাংশ দিয়া বৃটিশ রাজ্যে অবস্থিত মার্কিণ পণ্য বৃটেন্ ক্রয় করিবে ; অবশিষ্টাংশ সে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত অন্য প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারিবে। এই ঋণের সুদ নামমাত্র, ১৯৫১ সালের মধ্যে ইহা পরিশোধের কোনও দায়িত্ব নাই। ইহার পর ৫০ বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে পরিশোধ করিতে হইবে। আমেরিকার এই ঋণ প্রদানে কোনও উদারতা নাই—গূঢ় অভিসন্ধি লইয়া সে বৃটেনকে এই ঋণ দিয়াছে।

প্রথমতঃ বৃটেন্ আমেরিকা হইতে কাঁচা মাল ও কলকব্জা কিনিবার জন্য এই ঋণ ব্যবহার করিবে। এইভাবে বৃটিশ শ্রমশিল্প ও বৃটিশ রপ্তানী বাণিজ্য গড়িয়া তোলাই বৃটেনের উদ্দেশ্য। সুতরাং এই ঋণে মার্কিণ ব্যবসাই পরোক্ষে উপকৃত হইতে যাইতেছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এই—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এখন ষ্টার্লিং অঞ্চলে বাণিজ্যের সুবিধা পাইল। বৃটিশ সাম্রাজ্য, বৃটিশের ম্যাণ্ডেটেড্ রাজ্য প্রভৃতি লইয়া এই ষ্টার্লিং অঞ্চল। এখানকার ব্যবসা এতদিন বৃটেনের মারফৎ চলিত ; অর্থাৎ এখানকার বহির্বাণিজ্যেও বৃটেন্ মোড়ল ছিল। এই চুক্তিতে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, ষ্টার্লিং অঞ্চলের দেশগুলি যেখানে ইচ্ছা সেখানে পণ্য ক্রয় করিতে পারিবে। এই সর্ত্তটি বৃটেনের অর্থ-নৈতিক সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে সজোর আঘাত করিয়াছে। এই কারণেই ইঙ্গ-মার্কিণ ঋণ চুক্তি সম্পর্কে বৃটিশ রক্ষণশীল মহলে আমরা এত আর্ত্তনাদ শুনিয়াছি, তাহাদের একচেটিয়া অর্থ নৈতিক প্রভুত্বের ক্ষেত্রে আমেরিকা এবার ভাগ বসাইল।

ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়া

বৃটিশ সঙ্গীণের সাহায্যে ইন্দোচীনে ও ইন্দোনেশিয়ায় ফরাসী ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এখনও চলিতেছে। ইন্দোচীনে এই কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে এবং এখানে ফরাসীদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। বৃটিশের পক্ষ হইতে বলা হয় যে,

জাপানীদিগকে নিরস্ত্র করিবার জন্য এবং বেসামরিক বন্দীদিগকে নিরাপদ স্থানে অপসারণের উদ্দেশ্যে তাহারা ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ জাপানীদিগকে নিরস্ত্র করিতেছে না। স্থানীয় অধিবাসীদিগকে "সমুচিত শিক্ষা" দিবার জন্য তাহাদিগকে ব্যবহার করিতেছে। গত ১৫ই নভেম্বর ইন্দোনেশিয়ার অবস্থা সম্পর্কে রয়টার সংবাদ দেয় যে "...radio reports that the Japanese soldiers were fighting shoulder to shoulder with the Allies. রেডিওর সংবাদে প্রকাশ, জাপ-সৈন্য মিত্র-পক্ষের সৈন্যের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছে। ইন্দোচীনে প্রাগযুদ্ধ-কালীন কর্ত্তৃপক্ষ এবং ফরাসী "বড় সাহেবের" দল জাপানের সহিত পুরাপুরি সহযোগিতা করিয়াছিল। বৃটিশ সঙ্গীণের সাহায্যে তাহাদিগকে আবার ইন্দোচীনে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইতেছে এবং সেই উদ্দেশ্যে জাপ সৈন্যের সাহায্য লওয়া হইতেছে। অবশ্য ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই। জাপানীরা এশিয়াবাসী এবং পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও তাহারাই প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ, ফরাসী ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগী।

বৃটিশ সামরিক বিভাগ ইন্দোনেশিয়ার সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার চালাইয়াছে; বিমান হইতে নিরস্ত্র অধিবাসীদের প্রতি বোমা বর্ষণ, হিংস্র ট্যাঙ্ক নিয়োগ, নিরস্ত্র গ্রামকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া—কিছুই বৃটিশ সৈন্য বাদ দেয় নাই। তাহাদের এই ফ্যাসিস্ত বর্ব্বরতার অন্যতম সহায়ক ভাড়াটিয়া ভারতীয় সৈন্য। কিন্তু এত করিয়াও ইন্দোনেশিয়ানদের স্বাধীনতাস্পৃহা দমন করা সম্ভব হয় নাই। যদিও সুরাবায়া ও বাটাভিয়া বৃটিশ সৈন্যের অধিকারে আসিয়াছে বটে, কিন্তু এই দুইটি সহরে গুপ্ত প্রতিরোধ এখনও অত্যন্ত প্রবল। যদিও অবশিষ্টাংশে ইন্দোনেশিয়ান্ কর্ত্তৃপক্ষের প্রভাব এখনও অটুট রহিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ানদের সহিত একটা মীমাংসা করিবার জন্য ভূতপূর্ব্ব ওলন্দাজ শাসক ভ্যান্-মুক্ ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই আলোচনার ফল কি হইবে, তাহা এখন বলা যায় না। তবে, এ কথা সত্য যে, ইন্দোনেশিয়ানরা পরিপূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার না পাইলে শান্ত হইবে না।

চীনের গৃহযুদ্ধ

চীনে কম্যুনিষ্টদের সহিত চুংকিং গভর্ণমেণ্টের মীমাংসার চেষ্টা আবার আরম্ভ হইয়াছে। এবার মার্কিণ প্রতিনিধি জেনারল জর্জ্জ মার্শালকে চিয়াং-কাই-সেক মুরুব্বি ধরিয়াছেন; এই বিরোধের মীমাংসা করিবার জন্য তাঁহাকে মধ্যস্থতা করিতে বলা হইয়াছে। সম্প্রতি মার্কিণ দূত হার্লি গোঁসা করিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অসন্তুষ্টির কারণ—চীনের কম্যুনিষ্টদের দমন করিবার জন্য আমেরিকা আরও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই। জর্জ্জ মার্শাল তাঁহার স্থানেই নিযুক্ত হইয়াছেন।

জেনারল মার্শালের মধ্যস্থতা কম্যুনিষ্টরা মানিয়া লইবে কি না, তাহা এখনও বোঝা যাইতেছে না। জেনারল মার্শাল কম্যুনিষ্ট নেতাদের সহিত রুদ্ধদ্বারকক্ষে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চালাইতেছেন। এই আলোচনার ফলাফল কি হইবে, তাহা বোঝা যাইতেছে না। কম্যুনিষ্টদের নিকট কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের প্রধান দাবী—স্বতন্ত্র সেনাবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। কম্যুনিষ্টদের যুক্তি—সম্মিলিত কম্যাণ্ডের ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত সেনাবাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া চলে না। চুংকিংএর প্রচারকারী কম্যুনিষ্টদের এই যুক্তিটি চাপা দিয়া জগৎকে কাঁদুনী শোনায় যে, এক রাষ্ট্রের মধ্যে দুইটি সেনাবাহিনী কেমন করিয়া থাকিতে পারে? বেসরকারী সেনাবাহিনী কেমন করিয়া থাকা সম্ভব? ৩।১।৪৬

নয়ী পলাশী

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

রাতের আকাশে সূর্য্য দেখেছ' কেউ?
নগরে হঠাৎ ভেপান্তর—নিমেষ নভে ঝড়:
মাঠে সাগরের ঢেউ?
আঁধারেও রাঙা রৌদ্র ওঠে যে—ভুলেও ভেবেছ' কেউ?
আমি ত' দেখেছি ভাই—
বুলেটের ঘায়ে কিশোরের খুলি জ্বালালো কী রোশনাই!
একুশে রাত্রি নভেম্বর, তন্দ্রামগন মহানগর
সবুজ-রক্তে হঠাৎ দেখি সে লাল:
সারা পথে পথে ছড়ানো-ছিটানো কুসুমের কঙ্কাল!
শুনেছি কাঁদন রোল: কত না মায়ের খালি হ'য়ে গেল কোল।
ঊর্দ্ধ্ব আকাশে শনির বলয় পুড়ে পুড়ে হ'লো ছাই:
তবুও সংজ্ঞা নাই—
ধূলার তীর্থে কিশোর-দেবতা কী মহামন্ত্রে ঠায়—
দু'টী রক্তের মিলন-মেলায় রজনী পোহালো, হায়!

সে কবে মনে যে পড়ে—
অস্ত গোধূলি কালো হ'য়ে ওঠে পলাশীর প্রান্তরে।
ছলোছলো গঙ্গায়:
মীরমদনের শোণিত ঘনালো মোহনলালের গায়।
সে মহাপ্রাণের ঢেউ? মনে কি রেখেছে কেউ?
তারি ধারা এ যে পাক খেয়ে ওঠে দেড়শ' বছর পর:
এ কোন নভেম্বর
কঠিন শীতের রাত্রিকে করে সূর্য্য-স্বয়ম্বর!
সেই সূর্য্যেরি রৌদ্রে দেখিতে পাই:
কুয়াশা ছিঁড়েছে ভাই!
কচি হাড় আর রক্তে জমাট পথ ছুটে গেছে কোন
দিগন্তে জানা নাই—
শুধু, আছে আছে জানি—এ' পথেরি শেষে ঈপ্সিত প্রাঙ্গন:
আরো, আরো পদাতিক চাই।

সাময়িকী

বোলপুর ও রামপুরহাটে গান্ধীজি—

১৮ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার বেলা ২টার সময় সোদপুর হইতে যাত্রা করিয়া মহাত্মা গান্ধী সন্ধ্যা ৬টার সময় একটা স্পেশাল ট্রেনে করিয়া বোলপুরে পৌছেন। ষ্টেশন হইতে মোটরে ভুবনডাঙ্গা পর্য্যন্ত যাইয়া তিনি পদব্রজে শান্তিনিকেতন আশ্রমে গমন করেন। তিনি মনে করেন যে শান্তিনিকেতন তাঁহার নিকট তীর্থক্ষেত্র—কাজেই তীর্থক্ষেত্রে তিনি গাড়ী চড়িয়া যাইবেন না। সোদপুর হইতে স্পেশাল ট্রেনটিকে প্রত্যেক রেল ষ্টেশনে থামাইতে হয় কারণ প্রতি ষ্টেশনে গান্ধী দর্শনের জন্য জনতা অপেক্ষা করিতেছিল, লাইনের উপর শুইয়া তাহারা গাড়ীপর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছিল। ৮ বৎসর পরে গান্ধীজি আশ্রমে গমন করিলেন। এইবার লইয়া গান্ধীজি ৬ বার শান্তিনিকেতন দর্শন করিলেন। অধ্যাপক তান ইয়েন-সেন গান্ধীজিকে দর্শন করিবার জন্য বিমানযোগে চুং কিং হইতে আশ্রমে আসিয়াছিলেন—তিনি, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুত নন্দলাল বসু প্রভৃতি গান্ধীজিকে ফটকে অভ্যর্থনা করেন। আশ্রমে পৌছিয়াই গান্ধীজি প্রার্থনা সভায় যোগদান করেন ও বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। প্রতি বুধবার প্রাতঃকালে শান্তিনিকেতন আশ্রম মন্দিরে যে উপাসনা হয় গান্ধীজি বুধবার প্রাতঃকালে তাহাতে যোগদান করিয়া জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। শান্তিনিকেতনে গান্ধীজির সহিত শ্রীযুত পিয়ারীলাল, ভারতকুমারাপ্পা, মণিলাল গান্ধী, পরশুরাম জী, রাজকুমারী অমৃতকুমারী, রামকৃষ্ণ বাজাজ, কানু গান্ধী, ডাঃ সুশীলা নায়ার, আভা গান্ধী, প্রভাবতী সেন, আপতুস সালাম, কাঞ্চন বেন, সুধীর ঘোষ ও বিজয় ভট্টাচার্য্য তথায় গিয়াছিলেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপসনার পরে অধ্যাপক তান-ইয়েন সেন গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করেন। বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে চীনের বর্ত্তমান অবস্থার কথা আলোচনা হইয়াছিল।

বুধবার বিকালে গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে দীনবন্ধু ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন। খ্রীষ্টান ও পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তথায় এণ্ডরুজ মেমোরিয়াল হল নির্ম্মিত হইবে। ১৯৪০ সালের ৫ই এপ্রিল দীনবন্ধু এণ্ডরুজের মৃত্যুর পর এ পর্য্যন্ত তাঁহার স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারে ৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের মধ্যবর্তী স্থানে এই স্মৃতিভবন নির্ম্মিত হইবে। প্রখর রৌদ্র সত্বেও গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথের মৃণ্ময় কুটীর 'শ্যামলী' হইতে পদব্রজে দেড় মাইল দূরবর্তী আম্রকাননস্থ ঐ স্থানে গমন করিয়াছিলেন।

বৃহস্পতিবার ২০শে ডিসেম্বর প্রাতে গান্ধীজি শ্রীনন্দলাল বসুর সহিত কলাভবন দেখিতে যান—কলাভবন হইতে পদব্রজে উত্তরায়ণে রবীন্দ্রভবন দর্শন করেন। ১৯৪০ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথকে শেষ পত্র লিখিয়াছিলেন ও উহাতে তিনি বিশ্বভারতীর স্থায়িত্ব বিধানের জন্য যথাশক্তি চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

শান্তিনিকেতনে আশ্রমবাসীদের সহিত কথাবার্ত্তার সময় মহাত্মা গান্ধী ইংরাজি ভাষা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিলেন। যাঁহারা হিন্দী জানেন না, গান্ধীজি তাঁহাদের বাঙ্গালা কথাই শুনিয়াছেন। বাঙ্গালা ধীরে ধীরে বলা হইলে তিনি বেশ ভালই বুঝিতে পারেন। মাঝে মাঝে তিনি বাঙ্গালায় ২.৪টি কথা বলিয়া থাকেন।

বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৪টার সময়ও গান্ধীজি প্রভাতী প্রার্থনায় যোগদান করেন ও তাহার পর শিল্পী শ্রীযুত মুকুল দে'র চিত্রশালা দর্শন করিয়াছিলেন।

বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে সদলে গান্ধীজি স্পেশাল ট্রেনে রামপুরহাটে গমন করেন। শান্তিনিকেতনে এবার গান্ধীজি শ্যামলীতেই বাস করিয়াছিলেন। বেলা আড়াইটায় রামপুরহাটে পৌছিয়া প্রথমে তিনি বীরভূম জেলার কংগ্রেস নেত্রী শ্রীযুক্তা মায়া ঘোষের বাড়ীতে যান। তাহার পর তাঁহাকে টাউন হলে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় সম্বর্দ্ধনার পর তিনি রামপুরহাট পার্কে গমন করেন ও এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। বেলা সাড়ে ৪টার পর তিনি স্পেশাল ট্রেনে রামপুরহাট ত্যাগ করিয়া রাত্রি ১০টায় সোদপুরে ফিরিয়া আসেন। পথে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে বিপুল জনতা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল।

এক বৎসরে স্বরাজ লাভ—

মহাত্মা গান্ধী এখনও প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে দেশের লোক যদি নিম্নলিখিত ৪ প্রকার কর্ম্মে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করে, তবে এখনও এক বৎসরের মধ্যে দেশ স্বরাজ লাভ করিতে পারিবে। (১) একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক কোটি টাকা সংগ্রহ (২)

দেশব্যাপী চরকার প্রচার (৩) শক্তিশালী করিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান গঠন ও (৪) অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন। কিন্তু কে সে কথা শুনিবে।

ভারত-সচিব ও ভারতের ভবিষ্যৎ—

ভারত সচিব লর্ড প্যাথিক লরেন্স গত ১লা জানুয়ারী লণ্ডন হইতে এক বক্তৃতায় ভারতবাসীদের লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—"নূতন শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট ভারতকে বৃটীশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সমান অধিকারে অংশীদার করিয়া পূর্ণ ও স্বাধীন অবস্থা দান করিতে উৎসুক। সে বিষয়ে ভারতকে সাহায্য করিতে শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট চেষ্টার ত্রুটি করিবে না। ভারতের মঙ্গলের জন্ত ভারতবাসীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য শাসন ব্যবস্থা স্থির করিবার জন্ত অবিলম্বে চেষ্টা করা হইবে।" নববর্ষের প্রথম দিনে ভারত সচিব যাহা বলিয়াছেন, তাহা আন্তরিকতাপূর্ণ হইলেই ভারতবাসীরা সন্তুষ্ট হইবে।

নারী জাতির কর্ত্তব্য—

২রা জানুয়ারী কাঁথিতে এক মহিলার প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা গান্ধী নারীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়টি কথা বলিয়াছেন—"যে নারীর স্বামী দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, সে নারী যদি তাহার সন্তান সন্ততিকে যথোপযুক্তভাবে পালন করেন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃত দেশ সেবা করিবেন, কেন না তাঁহার সন্তান-সন্ততিও উত্তর কালে দেশের সেবায় তাহাদের পিতার মতই আত্মোৎসর্গ করিতে পারিবে। তাহাদের গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মও যথাযথ ভাবে সম্পাদন করা ও সূতা কাটিয়া পরিবারের বস্ত্রের সংস্থান করা কর্ত্তব্য।"

সুভাষচন্দ্রের সংবাদ—

আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকজন মুক্তিপ্রাপ্ত নেতা লাহোরে ফিরিয়া যাইয়া ২৭শে ডিসেম্বর সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন—নেতাজীর সহিত মিঃ ষ্ট্যালিনের বহুবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং রুশিয়ার নেতা তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। জাপান আত্ম-সমর্পণ করার পর সুভাষচন্দ্র রুশিয়া গিয়াছেন। পশ্চিম সীমান্তে রুশীয় সৈন্তগণ আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্তগণকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল—নেতাজী তাহাদের সহিত রুশিয়ায় বাস করিতেছেন ও উপযুক্ত সময়ে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবেন—অধিকাংশ মুক্ত আজাদ হিন্দ ফৌজ সদস্ত এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

পণ্ডিত জহরলালের সঙ্গীত—

গত ২৫শে ডিসেম্বর পাটনা বাঁকীপুরের ময়দানের সভায় এক যুবকের মুখে—কদমকদম বাড়ায়ে যা—আজাদ-হিন্দ ফৌজের এই রণসঙ্গীত শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ছুটিয়া মাইক্রোফোনের নিকট যাইয়া কি ভাবে রণসঙ্গীত গাহিতে হয় তাহা দেখাইবার জন্ত ক্রমোচ্চসুরগ্রাম ও তেজের সহিত রণ-সঙ্গীতটি গান করেন এবং বলেন যে, ইহা একটি রণসঙ্গীত—ঠিক রণসঙ্গীতের মত করিয়াই ইহা গাহিতে হইবে।

সমগ্র বিশ্বে বিদ্রোহানল—

মিস্ পার্ল বাক খ্যাতনামা লেখিকা, তিনি নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন। তিনি গত ১লা জানুয়ারী নিউইয়র্কে এক ভোজ-সভায় বলিয়াছেন—আমেরিকার প্রতি এসিয়ার অবিশ্বাস ক্রমশঃ ঘৃণায় পরিণতি লাভ করিতেছে। চীন, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন ও কোরিয়ায় গণ-অভ্যুত্থানের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—সর্ব্বত্র আগুন জ্বলিতেছে—যুদ্ধ পূর্ব্বকালের মতই সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের আগুন। আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রাচ্যে আজ যে ঘৃণার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বিদূরিত করিয়া আস্থা ফিরাইয়া আনা সম্ভবপর—কিন্তু তজ্জন্ত আমেরিকাকে প্রাচ্য-জগতের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে হইবে ও উক্ত স্বাধীনতাকে নিরাপদে রাখার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে।

কর্ণেল জগন্নাথরাও ভোসলা—

আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্ততম নেতা কর্ণেল জগন্নাথরাও ভোসলা এখন দিল্লী লাল কিল্লায় বিচারের জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। ১৯০৬ সালে মহারাষ্ট্রে প্রসিদ্ধ ভোসলা পরিবারে তাহার জন্ম হয়—সিন্ধিয়া রাজবংশের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ত্তমান। তিনি ডেরাডুনে ও স্যাণ্ডহার্ষ্টে সামরিক কলেজে সমরবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৯২৮ সালে তিনি ভারতীয় সেনাবিভাগে কমিশন লাভ করেন ও জাপানের সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে সিঙ্গাপুরে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তিনি পরে আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্টের অন্ততম মন্ত্রী হন ও প্রধান সৈন্তাধ্যক্ষ পদ লাভ করেন। তিনি রুশিয়া, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

মালয় ও ব্রহ্মে ভারতবাসীর দুর্দ্দশা—

নাগপুরের 'হিতবাদ' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত এ ডি মানি সম্প্রতি মালয় ও ব্রহ্মের অবস্থা দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া জানাইয়াছেন—ব্যাঙ্কক-রেঙ্গুন রেল নির্ম্মাণ করিতে যাইয়া ৮০ হাজার ভারতীয় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ঐ সকল হতভাগ্যদের পরিবারবর্গ মালয়ে দারুণ দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে। মালয়ে চট পরিহিত ভারতীয় মহিলাদের প্রায়ই পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। মালয় ও ব্রহ্মে ভারতবাসীর অবস্থা চরমে উঠিয়াছে। এখনই তাহাদের দুর্দ্দশা দূর করার ব্যবস্থা হওয়া

প্রয়োজন। মালয়ে ভারতীয়গণ যেরূপ দুর্দশাপন্ন হইয়াছে, সেরূপ আর কোন সম্প্রদায়ের লোকের কষ্ট হয় নাই। এখনও বহু ভারতীয়কে পুলিসের হেফাজতে রাখা হয় ও তাহাদের উপর অবিচার অনুষ্ঠিত হয়।—আমরা ভারতবাসীরা এই সংবাদ জানিয়াও কি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিব ?

বাঙ্গালোরে দীপালী উৎসব—

অন্যান্যবারের মত এবারও বাঙ্গালোরের প্রবাসী বাঙ্গালীরা একত্র হইয়া দীপালী উৎসব উদ্‌যাপন করে। এই প্রসঙ্গে নৃত্য-গীতাদি অনুষ্ঠিত ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বন্ধু" নাটক সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। ইহার পর প্রীতিভোজনের আয়োজন উৎসবকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে।

কংগ্রেসের হীরক জুবিলী—

গত ২৮শে ডিসেম্বর ভারতের সর্বত্র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হীরক জুবিলী উৎসব সোৎসাহে সম্পাদিত হইয়াছে। ১৮৮৫ সালে অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান মিঃ এলেন অক্টেভিয়াস হিউমের নেতৃত্বে কংগ্রেসের জন্ম হয় ও প্রথম বৎসর বোম্বায়ে খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। এখন সেই কংগ্রেস ভারতের বৃহত্তম রাজনীতিক গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ৩৫ বৎসর পরে ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের রূপ পরিবর্তিত হয় ও তদবধি গত ২৫ বৎসরকাল কংগ্রেসের নূতন স্বাধীনতা আন্দোলন চলিতেছে।

গান্ধী-গভর্ণর সাক্ষাৎ—

গত ২২শে ডিসেম্বর মহাত্মা গান্ধী পুনরায় বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ কেসির সহিত সাক্ষাৎ করেন। সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট হইতে রাত্রি ৯টা ৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টাকাল উভয়ের আলোচনা চলিয়াছিল। এইবার লইয়া কলিকাতায় ৫ বার গান্ধীজি গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গান্ধীজি বাঙ্গালা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে পুনরায় গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

পণ্ডিত নেহরুর সফর—

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু আসাম সফর শেষ করিয়া ২১শে ডিসেম্বর শুক্রবার রাত্রি ৮টায় কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিলেন। ট্রেণ ৬টায় কলিকাতায় আসবার কথা ছিল—কিন্তু দুই ঘণ্টা পথে বিলম্ব করে। পণ্ডিতজী ষ্টেশন হইতে সরাসরি কলিকাতা দেশবন্ধু পার্কের জনসভায় গমন করেন—তথায় প্রায় দুই লক্ষ লোক পণ্ডিতজীর বক্তৃতা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। পণ্ডিতজী সে সভায় প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরদিন শনিবার সারা দিন তাঁহাকে নানা সভায় বক্তৃতা করিতে হয়। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ছাত্রদের এক বিরাট সভায় বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বসু সে সভায় সভাপতিত্ব করেন। ঐ দিন কালিকা থিয়েটারে পণ্ডিতজী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের এক মর্ম্মর মূর্তির উদ্বোধন করেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ঐ উৎসবে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে পণ্ডিতজী ১০নং রাজা নবকিষণ ষ্ট্রীটে শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজের উদ্বোধন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ রাধাবিনোদ পাল সে সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা ৭টায় তিনি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত বীণা সিনেমাতে 'আমীরী' চলচ্চিত্র দেখিতে গিয়াছিলেন—ঐ চিত্রে বস্তীজীবনের দুরবস্থা চিত্রিত করা হইয়াছে। ঐ দিন বেলা তিনটায় বড়বাজার গিরিশ পার্কে এক সভায় পণ্ডিতজীকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল—শ্রীযুক্ত মূলচাঁদ আগরওয়ালা ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ও ৪৮ হাজার টাকা পূর্ণ একটি থলি পণ্ডিতজীকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল। শনিবার রাত্রিতে ট্রেণ না থাকায় পণ্ডিতজী মোটরযোগে কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে চলিয়া যান। রাত্রি ১টায় সময় তিনি শান্তিনিকেতনে পৌঁছেন ও 'উদীচী' নামক যে গৃহে রবীন্দ্রনাথ বাস করিতেন, তথায় রাত্রিযাপন করেন। ২৩শে ডিসেম্বর সকালে বিশ্বভারতীর বার্ষিক সভায় পণ্ডিতজী সভাপতিত্ব করেন। সভার শেষ দিকে পণ্ডিতজী সভাস্থল ত্যাগ করায় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাশ সভায় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। রবিবার অপরাহ্নে চীন ভারত সংস্কৃতিক পরিষদের বার্ষিক সভায়ও পণ্ডিত নেহরুকে সভাপতিত্ব করিতে হইয়াছিল। সভা হইতে পণ্ডিতজী সরাসরি পাটনার পথে বর্দ্ধমানে গমন করেন। পণ্ডিত নেহরুর কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁহার দেড় বৎসর বয়স্ক পুত্র রাজীব শান্তিনিকেতনে ছিলেন—তাঁহারাও পণ্ডিতজীর সহিত পাটনা যাত্রা করেন। পণ্ডিতজী সন্ধ্যায় বর্দ্ধমানে পৌঁছিয়া টাউন হল ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। সেখানেও পণ্ডিতজীকে টাকার তোড়া উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

২৪শে ডিসেম্বর পণ্ডিত জহরলাল নেহরু পাটনায় যাইয়া তথায় সচ্চিদানন্দ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিহার প্রাদেশিক ছাত্র সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়াছেন। পাটনা বিজ্ঞান কলেজের ছাত্রগণ নিজেদের রক্তে এক অভিনন্দন পত্র লিখিয়া সম্মিলনে পণ্ডিত নেহরুকে তাহা প্রদান করিয়াছিলেন। পণ্ডিত নেহরু বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনে বিহার প্রদেশ যাহা করিয়াছে তাহা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বিহারের সকল অংশেই ঐ আন্দোলন দেখা গিয়াছিল—তাহার তীব্রতা বালিয়ার আন্দোলন অপেক্ষা ভীষণতর ছিল—১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধ অপেক্ষা বিহার সেদিন অধিকতর



সায়েন্স কলেজের সভায় পণ্ডিতজীর বক্তৃতা ফটো—ডি-রতন



চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে পণ্ডিতজী



কলিকাতায় এসোসিয়েটেড্ চেম্বার্স অফ্ কমার্শের সভায় লর্ড ওয়াভেলের বক্তৃতা



শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (বাঙ্গালা কংগ্রেসের সভাপতি) ফটো—তারক দাস



আচার্য্য কৃপালানী ফটো—পান্না সেন



শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহাতাব (উড়িষ্যার নেতা ফটো—পান্না



কলিকাতায় শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু   ফটো—পান্না সেন



শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বক্তৃতা করিতেছেন   ফটো—ডি-রতন



সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংএ যাইতেছেন



পণ্ডিতজীর সহিত সংবাদপত্রপ্রতিনিধিবর্গ

সম্মুখে (বাম দিক হইতে) শ্রীশম্ভু চট্টোপাধ্যায় (আনন্দবাজার) পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও শ্রীতারক দাস (অমৃতবাজার পত্রিকা) পিছনে বাম দিকে—শ্রীমণীন্দ্র ভট্টাচার্য্য (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড) দক্ষিণে—



ওয়ার্কিং কমিটির সভা ভঙ্গে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের গৃহ পরিত্যাগের সময় মহাত্মাজী ও মৌলানা আজাদ্‌ শ্রীমতী আভা গান্ধীর সহিত পরিহাস করিতেছেন ফটো—তারক দাস



বন্যা ও পৌত্রীসহ নাগরদোলায় পণ্ডিতজী ফটো—তারক দাস



[illegible] ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ফটো—তারক দাস



ওয়ার্কিং কমিটির একটি দৃশ্য ফটো—পান্না সে

সংগ্রাম করিয়াছিল। লোক সে সময়ে আত্মার নির্দ্দেশে কাজ করিয়াছে—কাহারও নির্দ্দেশের অপেক্ষা রাখে নাই—উহাই সেদিনের আন্দোলনের বিশেষত্ব ছিল।



শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মিঃ আসফ আলী ফটো—পান্না সেন



গৌহাটীর পথে পণ্ডিতজীর ভাষণ ফটো—তারক দাস

বাঙ্গালার কংগ্রেসকর্ম্মী ও গান্ধীজি—

গত ২৩শে ডিসেম্বর রবিবার বিকালে বাঙ্গালার প্রায় একশত বৈঠকে সমবেত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, সম্পাদক কালীপদ মুখোপাধ্যায়,



নেতাজীর চিত্র
শিল্পী শ্রীসুনীলমাধব সেনগুপ্ত অঙ্কিত



ঈশ্বরদী ষ্টেশনে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর বক্তৃতা ফটো—তারক দাস

শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্ত, অমরকৃষ্ণ ঘোষ, বীণা দাস প্রভৃতি তথায়

প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। তাহার পর হিন্দুস্থান মজদুর সংঘের প্রায় ২৫০ জন কর্ম্মীও গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করেন। ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জে এম-দত্ত প্রভৃতি শ্রমিক কর্ম্মীদের

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও গান্ধীজি—

গত ২রা জানুয়ারী মেদিনীপুর কাঁথিতে এক কর্ম্মী সভায় মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—"আমার বিশ্বাস সুভাষ বসু এখনও জীবিত



আগড়পাড়ায় মুক্ত রাজবন্দী সম্বর্দ্ধনা ফটো—নীরেন ভাদুড়ী



প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধী ফটো—তারক দাস



কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে পণ্ডিতজী, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং ডাঃ কে চক্রবর্ত্তী ফটো—ডি-রতন

সহিত উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজি সকলকে সকল প্রশ্নেরউত্তর

আছেন ও কোথাও লুকাইয়া আছেন। আমি তাঁহার সাহস ও স্বদেশপ্রেমের প্রশংসা করি—কিন্তু তিনি যে উপায় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে আমার আস্থা নাই। ভারতবাসীরা তরবারি দ্বারা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারিবে না।" এতদিন পরে গান্ধীজি যে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে কথা বলিয়াছেন, ইহাই সান্ত্বনার কথা। সুভাষচন্দ্র যে অবস্থায় পড়িয়া নূতন নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে অবস্থায় লোকের অন্য কিছু করা সম্ভব ছিল না।



ওয়ার্কিং কমিটির পথে ফটো—স্বপনকুমার সেন

গঠনমূলক কার্য্য—

মহাত্মা গান্ধী দেশের কর্ম্মী-বৃন্দকে বার বার গঠনমূলক কার্য্যে ব্রতী হইতে আবেদন জানাইয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"গঠন কর্ম্মের তালিকা আমার ও ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের গঠন কর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তিকায় দেওয়া হইয়াছে। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ



সোদপুরের পথে একখানি যাত্রীপূর্ণ স্পেশ্যাল ট্রেণের দৃশ্য

ফটো—পান্না সেন

পুস্তিকাখানি আমার পুস্তিকারই ব্যাখ্যা স্বরূপ। একথা মনে রাখা দরকার যে আমাদের প্রদত্ত তালিকায় দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি কাজের উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র, আমরা যে সকল রকম কাজের কথা বলিয়াছি তাহা নয়। স্থানীয় অবস্থা অনুসারে—এই মুদ্রিত কর্ম্ম তালিকায় উল্লিখিত হয় নাই, এমনতর অনেক কাজের কথা মনে হইতে পারে। স্থানীয় কর্ম্মীদিগকে এই সকল কাজ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।" গান্ধীজির ঐ আদর্শ অনুসারে হুগলী জেলার কংগ্রেস কর্ম্মীরা আরামবাগ মহকুমার খানাকুল থানায় মুণ্ডেশ্বরী নদীতে ভুরেড়া ও গোপালনগরে বাঁধ নির্ম্মাণ করেন—প্রথমবারে ঐ কার্য্য বিফল হইলে পরে ১৫টি স্থানে বাঁধ বাঁধিয়া ঐ অঞ্চলের ৫খানি গ্রামের মাঠে জল দিবার ব্যবস্থা হয়। ফলে ১১ হাজার বিঘা জমীতে সেচের জলে ৫৫ হাজার মণ বোরো ধান উৎপন্ন হয়। ঐ ধানের মূল্য ৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। তাহা ছাড়া জল পাইয়া ঐ অঞ্চলে পিঁয়াজ, আলু, আখ, তিল প্রভৃতিরও ফসল বাড়িয়া যায় ও কৃষকগণ কমপক্ষে অধিক এক লক্ষ টাকা মূল্যের ফসল পায়। জল বিল ও দিঘীতে যাওয়ায় মৎস্য চাষেরও সুবিধা হয়। ৬০।৭০জন কংগ্রেস সেবক অবৈতনিকভাবে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া ঐ কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত করেন। এই কার্য্যে মোট ৪২ হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। জলকর বাদে ২০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে ও বাকী টাকা চাঁদা তুলিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে হুগলী হইতে নির্ব্বাচিত ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য শ্রীযুত বীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত সুকুমার দত্ত, শ্রীরাধানাথ দাস ছাড়াও কংগ্রেস-

সেবক শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় গৌরহরি রক্ষিত, শঙ্করীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কালীপদ সিংহ রায় প্রভৃতির অক্লান্ত চেষ্টা ও অর্থব্যয় দেশের আদর্শ স্থানীয় হইয়াছে। বোরো ধান সম্পর্কে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে স্বল্পমাত্র সংগঠন শক্তি ঠিক ভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলে বাঙ্গালার বহু স্থানে নদীনালার সামান্য সংস্কার-সাধন বা সাময়িক বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতির দ্বারা শস্যোৎপাদন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে অর্থব্যয়ের ২০ গুণ পর্যান্ত অধিক মূল্যের ফসল পাওয়া যায়। কৃষকরাও স্বেচ্ছায় খরচের টাকা আদায় দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন, শুধু নিঃস্বার্থ কর্ম্মচেষ্টার দ্বারা তাঁহাদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করিতে হয়। এই পথে কৃষক সংগঠন ও আর্থিক কল্যাণ এই উভয় দিকেই অগ্রসর হওয়া যায়। পল্লী উন্নয়নকামী কর্ম্মিদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইলে দেশ প্রকৃত উপকার লাভ করিতে পারিবে।

বিহার প্রাদেশিক বীমা সম্মিলন—

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পাটনা টাটা হলে বিহার প্রাদেশিক বীমা সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। কবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত



শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সভায় বাঙলা দেশের খ্যাতনামা কবিকে বীমা কর্ম্মী ও বীমা বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও বক্তা হিসাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। পাটনার বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রূপে তাঁহার অভিভাষণ দেন। মথুরাদাস বর্দ্ধন সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সভাপতি দেড় ঘণ্টাকাল তাঁহার সুলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। বিহারে এই প্রকার বীমা সম্মেলন এই প্রথম।

স্কুল কলেজে প্রার্থনা ও গান্ধীজি—

১লা জানুয়ারী মেদিনীপুর কাঁথিতে প্রার্থনার পর মহাত্মা গান্ধী সকল স্কুল, মক্তব, উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ প্রভৃতির কর্তৃপক্ষকে প্রত্যহ প্রার্থনার ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—প্রার্থনার দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তাহার ঈপ্সিত ফল লাভ করিতে পারে। আমরা ইতিপূর্ব্বে স্কুল কলেজে প্রার্থনার প্রয়োজনের কথা আলোচনা করিয়াছি। ভারতে নীতি ও ধর্ম্মহীন শিক্ষা ভারতবাসীকে বিপথগামী করিয়াছে। স্কুল কলেজে প্রার্থনার ব্যবস্থা হইলে তাহার মধ্য দিয়া ছাত্রদের মধ্যে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে।

বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর—

পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু সম্প্রতি বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার অভ্যন্তরে ঘুরিয়া আসিয়া এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে জানা যায়—বাঁকুড়ার লোক ইতিমধ্যেই শীর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এরূপ আশঙ্কা করা হইতেছে যে ২।৩ মাসেই অবস্থা আরও খারাপ হইবে। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা ইতিমধ্যেই গৃহস্থালীর বাসনপত্র ও গহনা বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছে বা করিয়া ফেলিয়াছে। সামান্য চাউল ও জঙ্গল হইতে আহরিত শাকপাতার উপর তাহাদিগকে জীবনধারণের জন্য নির্ভর করিতে হইতেছে। একটি কুটীরে যাইয়া আমি দেখি, ঘরে খাদ্য নাই—রান্নার ভান করিয়া শিশুদিগকে শান্ত রাখিবার জন্য শুধু জল ফোটান হইতেছে। প্রকাশ, এই বাঁকুড়া হইতেই কয়েক মাস পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট ১১ টাকা মণ দরে চাউল কিনিয়া প্রায় লক্ষ মণ চাউল বিদেশে পাঠাইয়াছেন। যে চাল বাঁকুড়ায় ১২ টাকা দরে কেনা হইয়াছিল, তাহাই কলিকাতা অঞ্চলে রেশনের দোকানে ২৫ টাকা মণ দরে বিক্রয় করা হইতেছে। শ্রীযুক্ত কুঞ্জরু বলিয়াছেন যে, মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও কাঁথি মহকুমার অবস্থা বাঁকুড়ার অবস্থা অপেক্ষা একটু ভাল। তবে ঐ সকল অঞ্চলে অন্য জেলা হইতে চাউল প্রেরণ করা প্রয়োজন। চিনি, সরিষার তেল, কাপড় প্রভৃতির অভাব তিনি সর্ব্বত্রই দেখিয়া আসিয়াছেন। এখন হইতে যদি সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চলেন, তবে হয় ত দুর্ভিক্ষ নাও হইতে পারে।

নূতন পরিষদের অধিবেশন—

আগামী ২১শে জানুয়ারী নয়া দিল্লীতে নব নির্ব্বাচিত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবে। বর্ত্তমানে কংগ্রেস

দলের সদস্য সংখ্যা ৫৮ জন ও লীগ দলের সদস্য সংখ্যা ৩০ জন। ১০২ জন নির্ব্বাচিত সদস্যের মধ্যে ৬৮ জন নূতন লোক। প্রকাশ এবার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন। পুরাতন পরিষদে বাঙ্গালার সার আজার রহিম সভাপতি ছিলেন।

রায়-ভট্ট সম্বর্দ্ধনা—

গত ২৩শে ডিসেম্বর রবিবার সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে কলিকাতা ২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীটে ১০৬ বৎসর বয়স্ক বৈষ্ণব পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণের সভাপতিত্বে এক সভায় প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব



শ্রীঅমূল্যধন রায়-ভট্ট

সাহিত্যিক ও পাণিহাটী গৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়-ভট্টকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। সভায় বহু লোক সমাগম হইয়াছিল এবং নানা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মানপত্র দেওয়া হইয়াছে। বহু কবি ও সাহিত্যিক পত্র দিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন। রায়-ভট্ট মহাশয়ের জীবনব্যাপী সাধনা তাঁহাকে বৈষ্ণব জগতে অমর করিয়া রাখিবে।

আজাদ-হিন্দ ভাণ্ডারে দান—

কলিকাতা সিমলা ৯নং জগদীশনাথ রায় লেন নিবাসী খ্যাতনামা চিত্র শিল্পী শ্রীযুক্ত সুনীলমাধব সেনগুপ্ত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একখানি তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়া এক মূল্যবান ফ্রেমে বাঁধাইয়া আজাদ-হিন্দ ফৌজ সাহায্য ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। পণ্ডিত জহরলাল উহা কলিকাতায় অবস্থানকালে গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ উক্ত ভাণ্ডারে দান করা হইবে।

শিল্পী শ্রীপান্না সেন—

খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পী শ্রীমান পান্না সেন গত ২২শে ডিসেম্বর বেতারে সঙ্গীত দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাহা তিনি রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। রেডিওর সঙ্গীত বিভাগে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে এইভাবে অর্থদান করিলেন। গত ৩



শ্রীপান্না সেন

বৎসর নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিষয়ে তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। চলচ্চিত্র জগতে 'পোষ্যপুত্র' 'পথের সাথী' ও 'বসুমাতা' চিত্রে তিনি সহকারী সঙ্গীত পরিচালকের কার্য্য করিয়াছেন।

ক্যাপ্টেন গাঙ্গুলীর সম্বর্দ্ধনা—

আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ক্যাপ্টেন সুশীলকুমার গাঙ্গুলী কিছুদিন পূর্ব্বে নীলগঞ্জ বন্দীনিবাস হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি হুগলী জেলার উত্তরপাড়ার অধিবাসী। গত ১৫ই পৌষ উত্তরপাড়ার অধিবাসীরা এক বিরাট সভা করিয়া ক্যাপ্টেন গাঙ্গুলীর সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

মেজর-জেনারেল চ্যাটার্জ্জি গ্রেপ্তার—

গত ২৯শে ডিসেম্বর লণ্ডন হইতে খবর আসিয়াছে যে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ৬ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হানয়ে গ্রেপ্তার করিয়া সিঙ্গাপুরে আনা হইয়াছে। ঐ দলে মেজর জেনারেল চ্যাটার্জ্জি আছেন। তিনি লাহোরনিবাসী সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ও নিজে কিছুদিন আগে বাঙ্গালার সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন; জাপানীরা আত্মসমর্পণ করিলে তিনি উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। শীঘ্রই তাঁহাকে ভারতে আনয়ন করা হইবে।

শ্রীযুত সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়—

এবার বাঙ্গালার রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি রাজসাহীর খ্যাতনামা



শ্রীসত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষাব্রতী রায় বাহাদুর ৺কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ও নিজে আজীবন দেশহিতব্রতী। এ দেশের শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি হাইকোর্টের এডভোকেট হইয়াছিলেন ও পরে কয়েক বৎসর ধরিয়া বিলাতে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি সমবায় আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। গত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সুবক্তা বলিয়াও তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস কেন্দ্রীয় পরিষদেও তিনি বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ সংরক্ষণ দ্বারা বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

সেনানীত্রয়ের মুক্তিলাভ—

দিল্লীর লাল কিল্লায় আটক আজাদ হিন্দ-ফৌজের সেনানীত্রয় ক্যাপ্টেন সা-নওয়াজ, লেপ্টেনাণ্ট ধীলন ও ক্যাপ্টেন সাইগলকে ৩রা জানুয়ারী মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে। লাল কেল্লার সামরিক আদালত কর্ত্তৃক তাঁহারা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের জঙ্গীলাট উক্ত দণ্ড মকুব করিয়াছেন। সেনানীত্রয়ের অন্য দণ্ড মকুব হইলেও জঙ্গীলাট তাহাদের পদচ্যুতি, বকেয়া বেতন ও ভাতা বাজেয়াপ্তির দণ্ড বহাল রাখিয়াছেন। কারণ তাঁহার মতে আনুগত্য ত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা কোন অফিসার বা সৈন্যের পক্ষে গুরুতর অপরাধ।" মুক্তিলাভের পর তাঁহারা তখনই লালকিল্লা হইতে দিল্লীতে এক বন্ধুগৃহে গমন করেন। দেশবাসীবৃন্দের সমবেত দাবী স্বীকার করিয়া আজাদ-হিন্দ-ফৌজের নেতৃত্রয়কে মুক্তি দান করিয়া জঙ্গীলাট বিবেচনার কার্য্যই করিয়াছেন।

আগড়পাড়ায় রাজবন্দী সম্বর্দ্ধনা—

গত ১৬ই ডিসেম্বর ২৪ পরগণা আগড়পাড়া গ্রামে বিবেকানন্দ সমিতির মাঠে ব্যারাকপুর মহকুমার মুক্ত রাজবন্দীদিগকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী সভাপতিত্ব করেন। পাণিহাটীর অধ্যাপক সাতকড়ি মিত্র, কামারহাটীর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়, দমদমের শ্রীযুক্ত কানাই দাস ও শ্রীযুক্ত গৌরদাস, বরাহনগরের শ্রীযুক্ত গণপতি দত্ত ও হালিসহরের শ্রীযুক্ত গৌর গাঙ্গুলী সকলেই সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দী—সভায় উপস্থিত ছিলেন। সোদপুরের শ্রীরজনী মুখোপাধ্যায় অসুস্থতার জন্য সম্বর্দ্ধনায় যোগদান করিতে পারেন নাই।

অক্ষয় শতকোৎসব—

গত ১০ই ও ১১ই পৌষ হুগলী চুঁচড়ায় সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের জন্মের শত বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিন সকালে চুঁচড়া কদমতলায় সাহিত্যাচার্য্যের পৈতৃক গৃহে পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের পৌরহিত্যে একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। উহাতে অক্ষয়চন্দ্রের চিত্র, গ্রন্থ ও দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। ঐ দিন অপরাহ্নে হুগলী মহসীন কলেজে চন্দননগরনিবাসী সুলেখক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অক্ষয়চন্দ্রের গৃহটি ভারতীয় পুরাতন স্মৃতি চিহ্ন সংরক্ষণ আইনানুসারে যাহাতে রক্ষার ব্যবস্থা হয়, সেজন্য ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ জানাইয়া সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিনেও হুগলী কলেজেই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার প্রবীণতম খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ উৎসব উপলক্ষে চুঁচড়ায় প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত সুবোধ রায়কে যে পত্র দিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহার একাংশ উদ্ধৃত করিলাম—তিনি লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালী যদি অক্ষয় শতকোৎসব না করে, সে কাজ পাপের মত তার সঙ্গ নিয়ে থাকবে—সে কলঙ্ক দুরপনেয়। বাঙ্গালার ইতিহাস তা লজ্জানত শিরে বহন করবে। বাঙ্গালায় যাঁরা সাহিত্যের জন্মদাতা, বঙ্কিম যুগের সর্ব্বস্তম্ভ, বঙ্গদর্শনের রক্ষকগোষ্ঠী, তাঁদেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী অক্ষয়চন্দ্রের শতবার্ষিকী যোগ্যতম সম্মানে সুসমাধা না হলে যে গুরুহত্যা হয়ে থাকতে হবে। তিনি নামেই অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন না, আমাদের সাহিত্যেও অক্ষয় হয়েই থাকবেন। * * একটি কথা সসঙ্কোচে বলছি। অক্ষয়চন্দ্রের নিজের কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলী রেখে যান নি—অন্ততঃ আমার জানা নেই। তাঁর 'সাধারণী' পত্রিকাই তাঁর পরিচয় বহন করে। তাহাও এখন সাধারণের অগোচরে গিয়ে

পড়েছে। ইংলণ্ডে আজিও কিন্তু এডিসনের স্পেকটেটার পত্রিকার সংস্করণের পর সংস্করণ দেখা দিচ্ছে। আমাদের সময় সাধারণীকেই আমরা স্পেকটেটারের মতই দেখতুম ও সম্মান দিতুম। তাই প্রস্তাব কর্ত্তে ইচ্ছা হয়—এমন কেহ কি নাই, যিনি অক্ষয়চন্দ্রের সেই অমূল্য প্রবন্ধগুলি নির্ব্বাচনান্তে পুস্তকাকারে প্রকাশের ভার নেন। সুখের বিষয় অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা অক্ষয়চন্দ্রের "জীবনী—জীবনপঞ্জী—পুরাতন প্রসঙ্গ সুক্তিসমূচ্চয় সঙ্কলন" করে 'তর্পণ' নাম দিয়ে উৎসব উপলক্ষে এক পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। অক্ষয়চন্দ্রের কথা দেশের সর্ব্বত্র আলোচিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালা দেশের সকল পুস্তকাগার ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠানকে আমরা আগামী এক বৎসরের মধ্যে একদিনও অন্ততঃ সভাদি করিয়া অক্ষয়চন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য আলোচনার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করি।

ইন্দুপ্রভা দেবী—

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের মালিক স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ইন্দুপ্রভা দেবী গত ২রা পৌষ সোমবার রাত্রিতে



ইন্দুপ্রভা দেবী

তাঁহার কাশীর বাড়ীতে ৪৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। স্বামী সতীশচন্দ্র ও পুত্র রামচন্দ্রের অকাল মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল। তিনি ২৪পরগণা রহড়া বালকাশ্রম প্রতিষ্ঠা কার্য্যে ও বেলিয়াঘাটায় উপেন্দ্র মুখার্জ্জী মেমোরিয়াল হাসপাতালে দশ লক্ষাধিক টাকা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার ৪ কন্যা (একজন অবিবাহিতা), বিধবা শাশুড়ী, বিধবা পুত্রবধূ ও ৪ বৎসর বয়স্কা পৌত্রী বর্ত্তমান।

প্রাচ্যবাণীমন্দিরে ঈদ্-বিজয়া উৎসব

সম্প্রতি প্রাচ্যবাণীমন্দিরে সম্মিলিত ঈদ্ বিজয়া উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় কোরাণ ও উপনিষদ্ পাঠ, ইসলামীয় ও ভারতীয় সঙ্গীত, আবৃত্তি ও হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা সকলের চিত্তাকর্ষণ করে। প্রাচ্যবাণীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী মুসলমান রাজগণের সংস্কৃত-প্রীতি ও সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানগণের দান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতি ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এইরূপ মিলন সভার অত্যাবশ্যকতার কথা আলোচনা করেন।

ডাক্তার অজিতমোহন বসু—

কলিকাতা ৮৬ বালীগঞ্জ প্লেস নিবাসী খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার অজিতমোহন বসু গত ২৮শে ডিসেম্বর ৬২ বৎসর বয়সে



ডাঃ অজিতমোহন বসু

পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি এদেশে প্রথম ইলেকট্রো-হাইড্রোপ্যাথী চিকিৎসা ব্যবসা করেন এবং চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে ঐ বিভাগের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। তিনি স্বর্গত স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র।

ক্যাপ্টেন প্রতুলপতি গাঙ্গুলী—

গত ৬ই ডিসেম্বর কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক ক্যাপ্টেন প্রতুলপতি গাঙ্গুলী মহাশয়ের পরলোক গমনের সংবাদ আমরা গত মাসে প্রকাশ করিয়াছি। তিনি ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে আই এম এস হইয়া পরে ৮ বৎসর ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ও ৬ বৎসর কলিকাতা মেডিকেল কলেজে কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষার আগ্রহ খুব বেশী ছিল—সেজন্য তিনি কয়েকবার লণ্ডন, ভিয়েনা প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। তিনি পাশ্চাত্য দেশের চিকিৎসা বিষয়ক সকল সাময়িক পত্র পাঠ করিতেন। তিনি কয়েক বৎসর কলিকাতা মেডিকেল রিভিউ পত্রের প্রধান সম্পাদক ছিলেন।



ডাঃ প্রতুলপতি গাঙ্গুলী

পরলোকে সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—

গত ১২ই ডিসেম্বর সকাল ৯টায় অবসরপ্রাপ্ত বিচারক সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ৫৫বি মহানির্ব্বাণ রোডে নিজবাসগৃহে ৬২ বৎসর বয়সে লোকান্তর গমন করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি সুসাহিত্যিকও ছিলেন এবং পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেন ও লোকান্তর নামে একখানি সুচিন্তিত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত 'পারায়ণ' নামে অপর একটি ধর্ম্মগ্রন্থ এখনও যন্ত্রস্থ। তিনি স্বামী শিবানন্দের শিষ্য ছিলেন। পবিত্র, পরোপকারী, ধর্ম্মপরায়ণ ও অমায়িক প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন।



৺সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—

বিশিষ্ট দার্শনিক পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ২০শে ডিসেম্বর সকালে ৭১ বৎসর বয়সে তাঁহার হাওড়ার বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ে বিশ্বাস করিতেন ও জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। তিনি বহু ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

অঘোরনাথ অধিকারী—

খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী রায় বাহাদুর অঘোরনাথ অধিকারী গত ২০শে ডিসেম্বর কলিকাতা বালীগঞ্জ ২৫ হিন্দুস্থান পার্কে স্বগৃহে ৮৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বহু জনহিতকর কার্য্য ও প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

খেলা ধূলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

অষ্ট্রেলিয়ান্স ক্রিকেট ঃ

সাউথ জোন ঃ ১৫৯ ও ২৩৩

অষ্ট্রেলিয়ান্স ঃ ১৯৫ ও ১৯৮ (৮ উইকেট)

তিনদিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ান্স দল ৬ উইকেটে সাউথ জোন একাদশকে পরাজিত করে। ভারতবর্ষে এই জয়ই তাদের প্রথম। সাউথ জোন টসে জিতে প্রথম ব্যাটিং করে। প্রথম ইনিংসের ১৫৯ রানে আইবারার ৪৯ এবং পালিয়ার ৪৯ রান উল্লেখযোগ্য। এলিস ২১ রানে ৪ এবং প্রাইস ৩৩ রানে ৪ উইকেট পেলেন। দ্বিতীয় দিনে অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের প্রথম ইনিংস মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে শেষ হ'ল। বেশী রান করলেন জে ওয়ার্কম্যান ৭৬। তিনি ১৫৭ মিনিট উইকেটে খেলেছিলেন। মোট রানে ১টা ছয় এবং ৪টা বাউণ্ডারী ছিল; গুলমহম্মদ ৫৬ রানে ৪ এবং রাম সিং ৫৭ রানে ৫টে উইকেট পেলেন।

৩৬ রানে পিছিয়ে থেকে সাউথ জোন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। দলের ৪৯ রানে প্রথম উইকেট পড়লো। লাঞ্চের সময় দলের ঐ রানই রইলো। তখন জনষ্টোনের ২১ রান এবং আইবারা তখন শূন্য। লাঞ্চের পর দলের মোট রানে আর কিছু যোগ না হয়েই দ্বিতীয় উইকেট পড়লো। আইবারের সঙ্গে আস্তার আলি জুটী হয়ে খেলার অবস্থা অনেকটা ফিরিয়ে দিলেন। এর পর তৃতীয় এবং চতুর্থ উইকেট ১১৮ রানে পড়লো। চায়ের সময় ১৪৭ রান দেখা গেল ৫ উইকেটে। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে সাউথ জোনের ৮ উইকেটে ২১৩ রান উঠলো। আইবারা ৪৫, রামসিং ৪২ এবং গোপালন ৪১ রান করে আউট হলেন। তৃতীয় দিনের খেলায় আর মাত্র ১০ রান যোগ হলে পর সাউথ জোনের দ্বিতীয় ইনিংস ২৩৩ রানে শেষ হ'ল। এই ইনিংস শেষ হ'তে ২০০ মিনিট সময় লাগে।

খেলায় অষ্ট্রেলিয়ানদের জিততে হলে ১৯৮ রান দরকার। হাতে সময় প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা। অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের এই রান তুলতে আর বেগ পেতে হ'ল না। চার উইকেটে প্রয়োজনীয় রান উঠে গেলে পর তারাই বিজয়ী হ'ল। এই ইনিংসে ওপনিংস ব্যাট-স্ম্যান ডি কার্মোডী ৮৭ রান করে নট আউট রইলেন। ডি ক্রিষ্টোফানীর নট আউট ৫৭ রানও উল্লেখযোগ্য। গোলাম মহম্মদ একাই ৫৯ রানে ৪টে উইকেট নিলেন।

অলিম্পিক ঃ

ইউনাইটেড ষ্টেট্স অলিম্পিক কমিটির অন্যতম সদস্য মিঃ গষ্টাভাস কির্বে এক বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন, পরবর্ত্তী 'অলিম্পিক গেম' ইউরোপেই অনুষ্ঠিত হবে। বর্ত্তমানে আমেরিকায় দল পাঠানো ব্যয় বাহুল্য বলেই লণ্ডন কিম্বা সুইজারল্যাণ্ডে অলিম্পিক গেম বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

ওয়াণ্টার হ্যামণ্ড ঃ

ইংলণ্ডের অন্যতম ক্রিকেট খেলোয়াড় ওয়াণ্টার হ্যামণ্ড ১৯৪৭ সালে ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করবেন বলে এক সংবাদ পাওয়া গেছে। নিমন্ত্রণ পেলে তিনি ১৯৪৬-৪৭ সালে অষ্ট্রেলিয়া-গামী এম সি সি দলে যোগদান করবেন বলে জানা গেছে। ঐ বছরের খেলাই তাঁর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলার শেষ অধ্যায় হবে। হ্যামণ্ডের বয়স বর্ত্তমানে ৪৪ বছরের কাছাকাছি। ভারত-বর্ষের সঙ্গে টেষ্ট খেলায় তিনি ইংলণ্ড দলের পক্ষে অধিনায়কত্ব করবেন।

তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ ঃ

অষ্ট্রেলিয়ান্স ঃ ৩৩৯ ও ২৭৫

ভারতীয় একাদশ ঃ ৫২৫ ও ৯২ (৪উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়ান্স সার্ভিসেস একাদশ দলের সঙ্গে শেষ—তৃতীয় টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দল ৬ উইকেটে জয়লাভ করে।

মাদ্রাজে ৭ই ডিসেম্বর তৃতীয় টেষ্ট খেলা সুরু হ'ল! অষ্ট্রেলিয়ান্স দল টসে জিতে প্রথম ব্যাটিং ক'রে দিনের শেষে ৭

উইকেটে ৩১৫ রান করে। এ এল হ্যাসেটের নট্ আউট ১৩৩ রান এবং পেপারের ৮৭ রান উল্লেখযোগ্য। সি সারভাতে ৯২ রানে ৩টে উইকেট পেয়ে বোলিংয়ে সাফল্যলাভ করলেন। দ্বিতীয় দিনে মাত্র ২৫ মিনিট খেলা হ'লে অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের প্রথম ইনিংস্ মোট ৩২০ মিনিট খেলার পর ৩৩৯ রানে শেষ হ'ল। সর্ব্বোচ্চ রান করলেন হ্যাসেট। তাঁর মোট ১৪৩ রানে ১৩টা বাউণ্ডারী ছিল এবং ২২৮ মিনিট তিনি উইকেটে খেলেছিলেন। পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য রান ৮৭ পেপারের। ব্যানার্জি ৮৬ রানে এবং সারভাতে ৯৪ রানে উভয়েই ৪টে উইকেট পেলেন।

ভি এম মার্চ্চেন্ট এবং মুস্তাকআলি ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলেন। মার্চ্চেন্ট নিজে ১১ রান ক'রে দলের ৩১ রানে প্রথম আউট হলেন। মুস্তাক আলির সঙ্গে লালা অমরনাথ খেলতে নামলেন। মুস্তাক দলের ৫০ রানে নিজস্ব ২৮ রানে হ্যাসেটের কাছে ধরা পড়লেন। এর পর হাজারী এবং হাফিজ অমরনাথের সঙ্গে খেলে যথাক্রমে ১১ এবং ৮ রান ক'রে আউট হলেন। আর এস মোদী অমরনাথের সঙ্গে খেলতে নামলেন, তখন অমরনাথ ৬৮ মিনিট খেলে ৫১ রান করেছেন। মোদী খেলার প্রারম্ভে বেশ সুবিধা করতে পারেননি, রান খুবই ধীরে ধীরে উঠতে লাগলো। দলের ১৭০ মিনিট খেলার সময় স্কোর বোর্ডে দেখা গেল মোট ১৫২ রান উঠেছে—অমরনাথের তখন ৮০ এবং মোদীর ১৩ রান। অমরনাথ উইকেটের চারপাশে একাধিক দর্শনীয় বল মেরে ১২৯ মিনিট খেলে নিজস্ব শত রান পূর্ণ করলেন। এবারের টেষ্ট খেলায় অমরনাথের এই প্রথম সেঞ্চুরী। দলের মোট ১৮৭ রানের সময় অমরনাথ ১০৩ রান করেছেন, তার মধ্যে বাউণ্ডারী বারটা। নিজস্ব ১১৩ রানের মাথায় অমরনাথ প্রাইসের বলে ক্যাচ তুলে কার্মোডীর হাতে ধরা দিলেন। এই রান তুলতে তাঁর ১৪১ মিনিট সময় লাগে। মোট বাউণ্ডারী ১৪টি। এদিকে মোদী ৯৭ মিনিট খেলে ৫৩ রান করেছেন, বাউণ্ডারী ৬টা, দলের রান ২৩৫। গুল মহম্মদ তাঁর জুটী হ'লেন। চা-পানের সময় দলের রান হ'ল ২৪০। মোদী বেশ স্বচ্ছন্দভাবে খেলে রান তুলতে লাগলেন। দিনের শেষে দেখা গেল ভারতীয় দলের ৫ উইকেটে ৩০১ রান উঠেছে। মোদী ৮৫ এবং গুল মহম্মদ ৩৮ রান করে নট আউট আছেন।

তৃতীয় দিনের খেলায় গুল মহম্মদ ৯৫ মিনিট খেলে ৫৫ রান করে আউট হলেন। এর মধ্যে ৭টা বাউণ্ডারী। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটীতে তিনি এবং মোদী ১১৯ রান তুলেছিলেন। সারভাতে মোদীর জুটী হলেন। মোদী ৩ ঘণ্টা ব্যাট ক'রে তাঁর শত রান পূর্ণ করলেন। প্রতিনিধিমূলক খেলায় এই তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী। এদিকে সারভাতে মাত্র ২ রান করে আউট হলেন। তাঁর [illegible] সি এস নাইডু এসে মোদীর জুটী হলেন। দলের ৪৪৭ রানে [illegible] ঘণ্টা খেলে মোদী ১৫০ রান করলেন। এই রানে মোট [illegible] বাউণ্ডারী ছিল। সি এস নাইডু করলেন ৫০ রান ৬৫ মি[নিট] খেলে যখন দলের রান ৪৪৯। নাইডু ৬২ রানে প্রাইসের স্লিপে উইলিয়মসের হাতে ধরা পড়লেন। তাঁর ৮ম উইকে[ট] জুটীতে ৮০ মিনিটে ১৪০ রান উঠেছিল। মোদীর সঙ্গে ব্যান[ার্জী] খেলতে লাগলেন। লাঞ্চের সময় দলের রান ৮ উইকেটে ৫[...] মোদী ১৮৬ এবং ব্যানার্জী ৫। লাঞ্চের পর খেলার মাঠে দ[র্শক] সংখ্যা প্রায় ১৮ হাজার দাঁড়াল। মোদীর খেলা দর্শকদের [...] উপভোগ্য হ'ল। দলের ৫২০ রানে ব্যানার্জী ৮ রান করে আ[উট] হলেন। এ সময় মোদীর রান ১৯৯। শেষ খেলোয়াড় মা[কা] মোদীর জুটী হ'লেন। ৩০৭ মিনিট খেলে মোদী ২০৩ [রান] করলেন, মোট বাউণ্ডারী ২২; দলের রান তখন ৫২৪। এলি[স-এর] বলে ড্রাইভ মারতে গিয়ে মোদী বোল্ড হলেন। মোদী অষ্ট্রেলি[য়ান্স] দলের বিরুদ্ধে টেষ্ট খেলায় নট আউট ২০৩ রান করে রে[কর্ড] করলেন। পূর্ব্বের রেকর্ড ছিল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দ[লের] রিগসের ২০০ রানের। মাকা এক রান করে নট আউট রইলে[ন]। পেপার ১১৮ রানে সব থেকে বেশী ৪টে উইকেট পেলেন।

অষ্ট্রেলিয়ান্স দল তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আ[রম্ভ] করলো। সূচনা খুবই ভাল হ'ল। দিনের শেষে ১৪৮ রান উঠ[ল] এক উইকেটে। হুইটিংটন ৬২ রান করে আউট হলে[ন]। ডি কার্মোডি ৭২ এবং পেটিফোর্ড ২ রান করে নট আ[উট] রইলেন।

চতুর্থ দিনে অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের দ্বিতীয় ইনিংস মোট ২[...] মিনিট খেলার পর ২৭৫ রানে শেষ হ'ল। ভারতীয় দল দ্বি[তীয়] ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। জয়লাভের জন্য ৯০ [রান] প্রয়োজন। হাতে সময় ১৩০ মিনিট। অষ্ট্রেলিয়ান্স দল সতর্কতার সঙ্গে ফিল্ডিং করতে লাগলো। প্রথম উইকেট [...] রানে, দ্বিতীয় ৭৬ রানে এবং তৃতীয় ৮৮ রানে এবং ৪র্থ [...] রানে পড়ে গেল। ৪ উইকেটে ৯২ রান উঠলে পর ভারতীয় বিজয়ী হ'ল। দলের উল্লেখযোগ্য রান করলেন মার্চ্চেন্ট ৩৫ [...] মুস্তাক আলি ৩৭।

ভারতীয় দল: ভি এম মার্চ্চেন্ট (অধিনায়ক), এস মুস্ত[াক] আলি, এল অমরনাথ, আব্দুল হাফিজ, ভি এস হাজারী, [...] এস মোদী, গুল মহম্মদ, সি টি সারভাতে, সি এস নাইডু, এস ব্যানার্জী, ই এস মাকা।

অষ্ট্রেলিয়ান্স দল: এ-এল হ্যাসেট, ডি কে কার্মোডি, [...]

হুইটিংটন, জে পেটিফোর্ড, সি প্রাইস, কে মিলার, সি পেপার, ডি ক্রিষ্টোফানী, উইলিয়ামস, এস সিস্‌মে, আর এলিস।

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রান (Highest Total)—অষ্ট্রেলিয়ান্স: ৫৩১ রান, ভারতীয় দলের বিপক্ষে বোম্বায়ের প্রথম টেষ্ট ম্যাচে। অষ্ট্রেলিয়ান দলের বিপক্ষে: ৫২৫ রান। মাদ্রাজের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে ভারতীয় একাদশ এই রান করেন।

সর্ব্বাপেক্ষা কম রান (Lowest Total)—অষ্ট্রেলিয়ান্স: ১০৭ কলকাতায় পূর্ব্বাঞ্চল একাদশের বিপক্ষে। অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের বিপক্ষে: ১৩১ রান। কলকাতায় পূর্ব্বাঞ্চল একাদশ দল এই রান করেন।

ব্যক্তিগত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রান—অষ্ট্রেলিয়ান: এ এল হ্যাসেট ১৮৭, দিল্লীতে প্রিন্সেস একাদশের বিপক্ষে। অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের বিপক্ষে: আর এস মোদী ২০৩ রান, মাদ্রাজের তৃতীয় টেষ্টের প্রথম ইনিংসে ভারতীয় একাদশের পক্ষে।

শতাধিক রান: অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের পক্ষে—এ এল হ্যাসেট: ১৮৭ রান এবং ১২৪ দিল্লীর প্রিন্সেস একাদশের বিরুদ্ধে এবং ১৮৩ রান মাদ্রাজের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচের প্রথম ইনিংসে। পেটিফোর্ড: ১২৪ রান বোম্বাইয়ের প্রথম টেষ্টম্যাচে এবং ১০১ রান কলকাতায় দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে। কার্মোডী: ১২৪ রান বোম্বাইয়ের প্রথম টেষ্ট ম্যাচে। মিলার: ১০৬ রান বোম্বাইয়ের ওয়েষ্ট জোন খেলায়। উইলিয়ামস: ১০০ রান* দিল্লীর প্রিন্সেস একাদশের বিরুদ্ধে। হুইটিংটন: ১৫৫ রান কলকাতায় দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে।

অষ্ট্রেলিয়ান্স দলের বিপক্ষে শতাধিক রান: হেগ—২০০ রান* পুণায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে। আব্দুল হাফেজ—১১৩ লাহোরে নর্থ জোনের পক্ষে। আর এস মোদী—১৬৮ রান বোম্বাইয়ের ওয়েষ্ট জোনের পক্ষে এবং ২০৩ রান মাদ্রাজে তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে। অমরনাথ—১৬৩ দিল্লীতে প্রিন্সেস একাদশের পক্ষে এবং ১১৩ রান মাদ্রাজের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে। ভি এম মার্চেন্ট—১৫৫ * রান কলকাতায় দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে। * নট আউট।

অষ্ট্রেলিয়ান দলের ব্যাটিং এভারেজ

পর্য্যায়ক্রমে পাঁচজন খেলোয়াড়ের ব্যাটিং এভারেজ

	ইনিংস	বেশীরান	মোট রান	এভারেজ
হ্যাসেট	১১	১৮৭	৮৬৪	৮৬·৪
কার্মোডী	১৪	১১৩	৫৯২	৪৫·৫
পেপার	১০	৯৫	৩৬৪	৪০·৫
হুইটিংটন	১২	১৫৫	৩৯৬	৬৬·০
পেটিফোর্ড	১৩	১২৪	৪১৭	৩৪·৭

অল ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন ঃ

বোম্বাইয়ে অল্ ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে গত দু'বছরের চ্যাম্পিয়ান দেবীন্দরমোহন পাঞ্জাবের চ্যাম্পিয়ান প্রকাশনাথের কাছে পরাজিত হয়েছেন।

ফলাফল ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলসে প্রকাশনাথ (পাঞ্জাব) ১৫-৯, ১-১৫ এবং ১৫-১২ পয়েন্টে দেবীন্দরমোহনকে (পাঞ্জাব) পরাজিত করেছেন।

মহিলাদের ডবলসে মিস মমতাজ চিনোয় এবং মিস এফ তলায়ার খাঁ (বোম্বাই) ১৫ ১০, ৬-১৫ এবং ১৫ ৬ পয়েন্টে মিস সুমন দেওধর এবং সুন্দর দেওধরকে হারিয়েছেন।

পুরুষদের ডবলসে জি লুইস এবং দেবীন্দরমোহন (পাঞ্জাব) ১৫ ৫ এবং ১৫ ৯ পয়েন্টে ভি ম্যাডগাওকার ও ডি জি মণ্ডুইকে (বোম্বাই) হারিয়েছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে মমতাজ চিনোয় (বোম্বাই) ১১ ৬ এবং ১২ ৯ পয়েন্টে মিস সুন্দর দেওধরকে (পুণা) হারিয়েছেন।

মিক্সড ডবলসে প্রকাশনাথ এবং মিস্ সুমন দেওধর (পাঞ্জাব পুণা) ১৮-১, ৮-১৫ এবং ১৫ ১০ পয়েন্টে দেবীন্দরমোহন ও মিস সুন্দর দেওধরকে হারিয়েছেন।

বেঙ্গল টেনিস ঃ

বেঙ্গল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ডবলসের ফাইনালে এ বছর প্রথম বাঙ্গালী খেলোয়াড়দ্বয় বিজয়ী হয়েছে।

পুরুষদের সিঙ্গলসে ম্যানমোহন ৬-৩, ৩ ৬,৬ ৩, ৫ ১ গেমে ঈরশাদ হোসেনকে পরাজিত করেছেন।

ফাইনাল খেলার ফলাফল ঃ

পুরুষদের ডবলসের ফাইনালে দীলিপ বসু ও খসু সেন ৬-২, ৬-৩, ৬ ২ গেমে সুমন্ত মিশ্র এবং ম্যানমোহনকে হারিয়েছেন।

মেয়েদের সিঙ্গলসে মিস ডি সানসোনী ৬ ৪, ৬ ২ গেমে মিস নোলানকে পরাজিত করেছেন।

মিক্সড ডবলসে দীলিপ বসু ও মিস্ স্যানসোনী ৬ ২, ৬ ৪ গেমে ঈরশাদ হোসেনকে হারিয়েছেন।

অল ইণ্ডিয়া টেনিস ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলসে ঘস্ মহম্মদ ৭ ৫, ৬-৩, ৬ ৩ গেমে দিলীপ বসুকে পরাজিত করেছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে মিস স্যানসোনী ৬-১, ১০-১২, ৬ ২ গেমে মিসেস এস আর মোদীকে পরাজিত করেছেন।

পুরুষদের ডবলসে জে এম মেটা ও সুমন্ত মিশ্র ৭ ৫, ৬-৩, ৬-৩ গেমে ঘস্ মহম্মদ ও এস-এল-আর সোহানীকে পরাজিত করেন।

সি-জে-এডি ঃ

অষ্ট্রেলিয়ার ভূতপূর্ব্ব টেষ্ট বোলার সি জে-এডি পরলোকগমন করেছেন। তিনি ১৮৯৬ সালে অষ্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে ইংলণ্ডে খেলতে গিয়েছিলেন। ঐ বছরের অষ্ট্রেলিয়া টেষ্টদলের আর মাত্র একজন খেলোয়াড় জীবিত আছে তাঁর নাম জো ডাবলিং।

আন্তঃপ্রাদেশিক স্কুল ক্রিকেট ঃ

ক্রিকেট খেলার প্রসার এবং উন্নতিকল্পে আন্তঃপ্রাদেশিক স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান বছর থেকে আরম্ভ হয়েছে। বর্ত্তমান বছরে আটটি প্রাদেশিক স্কুল টীম প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল। খেলা এইভাবে হয়েছিল—(১) বোম্বাই বনাম হায়দ্রাবাদ; (২) মাদ্রাজ বনাম বিহার, (৩) বাঙ্গলা বনাম সিন্ধু; (৪) বরোদা বনাম মহারাষ্ট্র।

প্রতিযোগিতার ফাইনালে সিন্ধু প্রদেশ বোম্বাই প্রদেশের সঙ্গে খেলেছিল, সিন্ধু প্রদেশ এই প্রতিযোগিতায় কুচবিহার ট্রফি বিজয়ের প্রথম সম্মান পেয়েছে।

ফাইনাল ফলাফল ঃ

সিন্ধু ঃ ৯৯ ও ৩৭৪ (এ যোগাসিয়া ১৫০, সার দিনসা ৮৪, এইচ মাবেদ ৫৪; ১৩১ রানে ৯ উইকেট বি ইরাণী)

বোম্বাই ঃ ১৫৭ (বি ইরাণী নট আউট ৬৭) ও ১৯৩ (বি ইরাণী ৫৩)

রঞ্জি ট্রফি ঃ

হোলকার ঃ ৪৩৩ (বি নিম্বলকার ১০৬, জে এন ভায়া ৮৯, মুস্তাকআলি ৫০, সি টি সারভাতে ৪৮, সি নাইডু ৬০)

বিহার ঃ ১৪২ ও ১০৪

হোলকার এক ইনিংস ও ১৮৭ রানে বিহার প্রদেশকে পরা করেছে।

মহীশূর ঃ ১৫৮ ও ২৯২ (বি ফ্রাঙ্ক ৮৩, কে তারাপুর পি শ্যামসুন্দর ৫২; রঙ্গচারী ১০৪ রানে ৫ উইকেট)

মাদ্রাজ ঃ ১৭২ ও ১৬৬ (রামারাও ৩৯ রানে ৫ উইকে

দক্ষিণাঞ্চল ফাইনালে মহীশূর ১১২ রানে বিজয়ী হয়েছে।

বরোদা ঃ ৩২৮ (এইচ অধিকারী ১২৯, এম এম না ৬৬; ম্যানসিং ৭৯ রানে ৪ উইকেট) ও ৩৬৫ (অধিক নট আউট ১৫১; ভি, হাজারী ৮৭)

নওনগর ঃ ২১৮ (যাদবেন্দ্র সিং ৫৮; আমীর ইলাহী রানে ৪ উইকেট)

প্রথম ইনিংসের ১১০ রানে অগ্রগামী থেকে বরোদা নওনগর পরাজিত করেছে।

বাঙ্গলা প্রদেশ ঃ ১২৬ ও ২৩৯

যুক্তপ্রদেশ ঃ ৯৮ ও ২২২

বাঙ্গলা প্রদেশ ৪৪ রানে যুক্তপ্রদেশকে পরাজিত করেছে।

হায়দ্রাবাদ ঃ ৩৩৯ (আইবারা ১২৮, হোসেন ৮৫, গুল মহম্মদ ৭৬)

সি-পি এবং বেরার ঃ ১৫৪ (গুলমহম্মদ ৬৫ রা ৭ উইকেট) ও ১২৭

দক্ষিণাঞ্চলের খেলায় হায়দ্রাবাদ এক ইনিংস এবং ১১৮ রা সি পি এবং বেরারকে পরাজিত করেছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

সতীকুমার নাগ সম্পাদিত স্বাধীন ভারতের ইতিহাস "আজাদ হিন্দ ফৌজ"—১।০

হরিপদ পাণ্ডে প্রণীত উপন্যাস "অভিসার"—১।০

শ্রীগৌতম সেন প্রণীত নাটক "রামচন্দ্রের নরক দর্শন"—১।০, উপন্যাস "প্রিয়া ও জননী"—২।০

শ্রীপ্রভাত হালদার প্রণীত "ভয়ঙ্করের সাধনা"—৷৵০

মনসা চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "নতুন সূর্য"—৸৵০

শ্রীসন্তোষকুমার পাল প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "যুগান্তরের গান"—১৲

শ্রীসুকুমার রায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "নবজাতক"—২।০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



ফাল্গুন—১৩৫২

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

অনর্থের মূল

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

স্বর্ণমান সমস্যা

(ক) ইংলণ্ড

পূর্ব্বে ভারতবর্ষ পত্রিকায় আমরা স্বর্ণমান সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এবার প্রধান প্রধান দুই একটি দেশের স্বর্ণমান সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করা যাক। প্রথমেই ইংলণ্ডের স্বর্ণমানের উত্থান পতনের ইতিহাসের একটা আভাষ দেওয়া হলো।

১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের জন্ম হয়। পূর্ব্বে ওদেশের স্বর্ণকাররা জনসাধারণের অর্থ নিজেদের কাছে গচ্ছিত রেখে তার বদলে যে রসিদ বা সার্টিফিকেট দিত, সেইটাই অনেক সময় এখানকার কাগজী-মুদ্রা বা নোটের মত একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে চলাফেরা করতো। তৃতীয় উইলিয়ম যখন ইংলণ্ডের রাজা তখন আর্থিক টানা-টানির জন্য তাঁর হঠাৎ কিছু টাকার বিশেষ দরকার হয়ে পড়ায় এই স্বর্ণকাররা তাঁকে শতকরা বার্ষিক আট টাকা সুদে ১,২০০,০০০ পাউণ্ড কর্জ্জ দেয়। এর পরিবর্ত্তে রাজা মহাজনদের একটি চাটার বা আজ্ঞা-পত্র দান করেন ... ...ত একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করে তাদের ঐ পরিমাণ নোট ছাপাবার ... ...ত দেন। এই ব্যাঙ্কের নামই হয় ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড এবং এই ব্যাঙ্ককে অন্যান্য যৌথ ব্যাঙ্কের (Joint stock Banks) থেকে মুক্ত করে উত্তমরূপে সুপ্রতিষ্ঠ করার জন্য ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইনের দ্বারা অন্যান্য যৌথ ব্যাঙ্ককে নোট ছাপবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। ছোট ছোট প্রাইভেট ব্যাঙ্কের অবশ্য নোট প্রচলনের অধিকার রইলো। ১৯২১ সনে একমাত্র ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড ব্যতিরেকে আর সমস্ত ব্যাঙ্কের ১৮৪৪ সনের ব্যাঙ্ক এক্ট অনুযায়ী নোট প্রচলন করা বন্ধ হয়ে গেল।

নেপোলিয়নের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জীবন মরণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থার বড়ই শোচনীয় পরিণতি হতে থাকে এবং ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের স্বর্ণ তহবিল সেই সময় প্রায় নিঃশেষ হতে চলে। তারপর ফরাসীরা দেশে অবতীর্ণ হয়েছে—এই রকম একটি গুজবে ব্যাঙ্কের স্বর্ণ তহবিলে হঠাৎ চাপা পড়ে এবং অনুপায় হয়ে সরকারী এক ঘোষণানুযায়ী ব্যাঙ্ক স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে তার পরিবর্ত্তে প্রচুর

পরিমাণে নোট বার করতে থাকে। এতে দেশে নোট বা টাকার মূল্য কমে গেল, সোনার দাম ভীষণ ভাবে বেড়ে চললো এবং স্বর্ণমুদ্রা বাজার থেকে একরকম উধাও হয়ে গেল। এই অবস্থায় দেশের মুদ্রা ব্যবস্থাকে আবার সুদৃঢ় করার জন্য ১৮১০ খৃষ্টাব্দে হাউস অফ্ কমন্স কমিটী (House of Commons Committee) নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁরা বুলিয়ন রিপোর্ট (Bullion Report of 1810) নামে একটি সুচিন্তিত রিপোর্ট দাখিল করেন। ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের ক্যাশে টাকার পরিবর্ত্তে নোট দিবার নীতিকে তাঁরা তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তাঁরা এই মত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যে নোটের পরিবর্ত্তে যে কোন মুহূর্ত্তে একমাত্র স্বর্ণ দিবার জন্য প্রস্তুত থাকলেই নোটেও অত্যধিক ও স্বেচ্ছাচারী প্রচলন বন্ধ করা যায়।

রাজনৈতিক দলাদলির জন্য ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড বুলিয়ন কমিটির রিপোর্ট মত কাজ করেনি, কিন্তু শীঘ্রই তাদের ফলভোগ করতে হয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ানের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতির পর দেশব্যাপী একটা আর্থিক অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দেয় ও সেই গণ্ডগোলে দেশের অনেকগুলি ব্যাঙ্ক-মামলা করে। এতে সেই সমস্ত ব্যাঙ্কের নোট প্রচলন বন্ধ হয়ে দেশে আর্থিক সঙ্কোচন দেখা দেয় এবং পণ্যমূল্য ও সোনার দাম আবার বাড়তে আরম্ভ করে। এই সময় ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড স্বর্ণমান প্রথা অবলম্বন করে এবং ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড পুনরায় নোটের বিনিময়ে স্বর্ণ দিতে স্বীকৃত হয়।

ছোট খাট ব্যাঙ্কগুলি অনেক সময়ই ফেল করতে থাকায় এবং নোট প্রচলন সম্বন্ধে খুব কড়াকড়ি নিয়ম না থাকায় ইংলণ্ডের আর্থিক জগতে প্রায়ই অনিশ্চয়তা দেখা দিতে থাকে এবং অনেক সময়ই প্রয়োজনের অতিরিক্ত নোট বাজারে দেখা দিতে আরম্ভ করলো। এই সময় ওদেশে আর্থিক নিরাপত্তার জন্য দুইটি বিভিন্ন মতাবলম্বী দলের সৃষ্টি হয় (Currency school ও Banking school)। একদল বলে যে ব্যাঙ্ক যে কাগজীমুদ্রা ছাপায়—তা শুধু ধাতব মুদ্রার পরিবর্ত্তে, সুতরাং প্রত্যেকটি নোটের পশ্চাতে সমপরিমাণ সোনা ব্যাঙ্কের তহবিলে মজুত থাকা প্রয়োজন। ভিন্ন দলের মত ছিল যে নোটের মোট পরিমাণ স্থির করার ভার ব্যাঙ্কের উপরই একেবারে ছেড়ে দেওয়া কর্ত্তব্য এবং দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণের উপরই নির্ভর করে ব্যাঙ্ক নিজ নোটের মোট পরিমাণ স্থির করবে। এতে প্রত্যেকটি কাগজীমুদ্রার জন্য তহবিলে সম পরিমাণ স্বর্ণ জমা রাখার প্রয়োজন নেই। বর্ত্তমান কালে একের পর এক দেশগুলি স্বর্ণমান ত্যাগ করে যে উপায়ে দেশের কাগজী মুদ্রার পরিমাণ আজ স্থির রাখছে, তার গোড়া পত্তন হয়েছিল দেখা যায় এই সময়ই। কিন্তু প্রথম দলেরই সেদিন জিৎ হয় এবং এই কারেন্সী স্কুলের মতানুযায়ী ১৮৪৪ সনের সুবিখ্যাত ব্যাঙ্ক আইন (The Bank charter act of 1844) গঠিত হয়। এই আইনে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডকে ১৪,০০০,০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত নোট, পশ্চাতে শুধু মাত্র সরকারী কাগজ (Securities) জমা রেখেই বার করবার অনুমতি দেওয়া হয়। এর জন্য স্বর্ণ জমা রাখার কোন প্রয়োজনই নেই। এর উপর আর যা কিছু নোট প্রচলন করা হবে তার প্রতিটির পশ্চাতে অবশ্য সমপরিমাণ সোনা জমা রাখতে হবে। এই রকম নোট প্রচলনের প্রথাকে ফিডিউ-সিয়ারী ইস্যু প্রথা (Fiduciary Issue system) বা প্রচ্ছন্ন প্রথা বলা হয়।

বিনা সোনায় যে কাগজীমুদ্রা বার করা যাবে তার সীমা এত কম থাকায় ব্যবসা বাণিজ্যের বাড়তির জন্য প্রয়োজন হলে বা যতক্ষণ আর সোনা না আসছে, ততক্ষণ ব্যাঙ্ক কোনক্রমেই আর নোট ছাপাতে পারবে না। কাজেই মুদ্রার অল্পতা বা মুদ্রাকৃচ্ছ্রতা দেখা দেবার কথা। কিন্তু ১৮৪৪ সনের ব্যাঙ্ক এক্টের এই প্রধান ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে এই এক্ট কাগজী মুদ্রার অত্যধিক বৃদ্ধি ও তৎজনিত মুদ্রার অবচয়ের (depreciation) হাত থেকে ইংলণ্ডকে যথেষ্ট পরিমাণে রক্ষা করে চলেছে। উপরোক্ত ত্রুটী সংশোধনের জন্য ১৯১৪ সনের আর একটি এক্ট (The currency and Bank notesAct of 1914) গভর্ণমেণ্টের অনুমতিতে বিশেষ প্রয়োজনের সময় ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডকে প্রয়োজনানুযায়ী নোট ছাপাবার ক্ষমতা দেয়। পূর্ব্বে অনেক বারই ব্যাঙ্ককে প্রয়োজনের তাগিদে আইন ভেঙ্গে সোনা ছাড়া নোটের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হয়েছে এবং অনেক বারই আবার নূতন আইন করে এই বাবদ নোট ছাপাবার সীমাকে ক্রমশই উর্দ্ধে উঠান হয়েছে। অবশেষে ১৯২৮ সনের আর একটি এক্ট দ্বারা (The Currency and Bank act of 1928) বিনা সোনায় শুধু সরকারী কাগজ (Securities) তহবিলে রেখে ২৬০,০০০,০০০ পাউণ্ডের নোট ছাপাবার অধিকার ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডকে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়লে সরকারী অনুমতি নিয়ে প্রথমে মাত্র ছয় মাসের জন্য এর চেয়েও বেশী নোট—সরকারী কাগজ পশ্চাতে জমা রেখে বার করা চলবে। এই বাবদ নোট বার করার এই সংখ্যাকেও অনেকে কম বলে মনে করেন এবং ১৯৩১ সনের জুলাই মাসে ম্যাক্ মিলিয়ান কমিটি তাদের রিপোর্টে বলেন (The Report of the Macmillian committee) যে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডকে এই বাবদ ৩৮০,০০০,০০০ পাউণ্ডের নোট ছাপাবার অধিকার দেওয়া হোক এবং এই নোট ছাপাবার উর্দ্ধতম সীমাকে ৪০০,০০০,০০০ পাউণ্ডে রাখা হউক। এই কমিটী এও বলেন যে, ব্যাঙ্কের স্বর্ণ তহবিল যেন কিছুতেই ৭৫,০০০,০০০ পাউণ্ডের নিচে সচরাচর না নামে। যদি বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে তবে সরকারী অনুমতি নিয়ে সাময়িক ভাবে কিছু কমান যেতে পারে। তারপর ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে অবস্থার চাপে পড়ে ইংলণ্ডকে স্বর্ণমান ত্যাগ করতে হয় এবং যদিও তার স্বর্ণও সরকারী কাগজের তহবিল ও প্রচলন সম্বন্ধে মোটামুটি পূর্ব্বের নিয়ম কানুনই রয়ে গেল কিন্তু স্বর্ণমান ত্যাগ করায় নোটের পরিবর্ত্তে চাওয়ামাত্র ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের স্বর্ণ দেওয়ার আর কোন বাধ্যবাধকতা রইল না।

গত যুদ্ধের সময় আবার অবস্থার চাপে পড়ে ইংলণ্ডকে সাময়িকভাবে স্বর্ণমান ত্যাগ করতে হয়। যুদ্ধের আতঙ্কে পরে বিশ্বের যার যা কিছু ইংলণ্ডের কাছে পাওনা ছিল সকলেই তা চেয়ে বসলো এবং ইংলণ্ড থেকে

হু হু করে সোনা বাইরে বেরিয়ে যেতে লাগলো। সেই সময় ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড তার সুদের হার (Rank Rate) দশ টাকা পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দেয়, যাতে করে বিদেশীরা বেশী সুদের আশায় ও দেশেই টাকাটা জমা রাখে। আইন দ্বারা সোনা ছাড়া নোট প্রচলনের সীমাকে আরো উর্দ্ধে উঠিয়ে দেওয়া হলো এবং ট্রেজারী নোটের প্রচলন আরম্ভ হলো। এই ভাবে ইংলণ্ড সেদিন দুর্দ্দিনকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

যুদ্ধের পর স্বর্ণমানে ফিরে যাবার জন্য আবার আন্দোলন আরম্ভ হোলো। ১৯১৮ সনে কান্‌লিফ কমিটি (The cunlif committee) ইংলণ্ডকে স্বর্ণমানে ফিরে যাবার চেষ্টা করতে অনুমোদন করে এবং এই জন্য আমেরিকার ডলারের সঙ্গে যুদ্ধ পূর্ব্বকার বিনিময় হারে পাউণ্ডকে নিয়ে যেতে বলে; কারণ যুদ্ধে ইংলণ্ডে অতিরিক্ত মুদ্রা বার হওয়ায় পাউণ্ডের মূল্য অনেক কমে যায় এবং এক পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে কাজেই যুদ্ধ-পূর্ব্বাপেক্ষা কম ডলার পাওয়া যেতে আরম্ভ করে। কিন্তু ইংলণ্ডের মুদ্রানীতি সম্বন্ধে ওই সময় দুইটি দল হয়। একদল কান্‌লিফ কমিটির মতানুযায়ী ইংলণ্ডে স্বর্ণমানে ফিরে যেতে বলে এবং আর একদল বলে যে স্বর্ণমানের পরিবর্ত্তে ইংলণ্ড দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থা দেশের বাণিজ্যের প্রয়োজনানুসারে নিয়ন্ত্রণ করবে। প্রথম দলকে sound currency school বা লণ্ডন স্কুল বলা হয় এবং দ্বিতীয় দলকে Managed currency school বা ক্যাম্ব্রিজ স্কুল বলা হয়। অবশেষে লণ্ডন স্কুলেরই জয় হয় এবং ১৯২৫ সনে ইংলণ্ড আবার স্বর্ণমানে ফিরে যায় এবং আমেরিকার ডলারের সঙ্গে ইংলণ্ডের পাউণ্ডের যুদ্ধ-পূর্ব্বকার বিনিময় হার (Exchange Rate) স্থির হয়। কিন্তু এতে ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থার ঘোরতর ক্ষতি হয় এবং তার পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি এই ভুলেরই সাক্ষ্য দেয়।

১৯২৫ সনে ইংলণ্ডের পাউণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার ডলারের যুদ্ধ-পূর্ব্বেকার যে বিনিময় হার স্থির হয়, পরবর্ত্তী ঘটনা থেকে বোঝা গেল যে তা ঠিক না হয়ে বেশী হারে ধার্য্য হয়েছিল। অর্থাৎ এক পাউণ্ড ৪.৮৬ ডলারের সমান, এই হারের চেয়ে আসলে এক পাউণ্ড তার চেয়ে কম ডলারে ধার্য্য করা অর্থনৈতিক বিজ্ঞান সম্মত হতো। কিন্তু না হওয়ায় ইংলণ্ডের ঘোরতর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। প্রকৃত হারের চেয়ে যদি কোন মুদ্রা বেশী হারে স্থির করা হয় তবে সে দেশের রপ্তানী কমে গিয়ে আমদানি বৃদ্ধি পায় এবং এইভাবে হুহু করে দেশের টাকা বিদেশে চলে যায়। যেমন, এক পাউণ্ড যদি প্রকৃত ৩ ডলারের সমান হয়, অথচ ভুল বশত ৪.৮৬ ডলারের সমান বলে স্থির করা হয়—তাহলে বিলাতের ব্যবসায়ী আমেরিকা থেকে এক পাউণ্ড দিয়ে ৩ ডলারের স্থানে ৪.৮৬ ডলারের সমান বেশী মাল নিজ দেশে আমদানি করে প্রচুর পরিমাণে লাভ করতে পারবে, এমন কি নিজ দেশের মালের দামের চেয়ে কিছু কম দামে মাল ছেড়ে দিলেও তার যথেষ্ট লাভ থেকে যায়। কাজেই বিদেশী মালে দেশ ভরে যাবে। ঠিক বিপরীতভাবে আমেরিকার ব্যবসায়ী ইংলণ্ড থেকে মাল আমদানি করতে বিশেষ চাইবে না, কারণ তাতে তাকে ৩ ডলারের পরিবর্ত্তে ৪.৮৬ ডলার অর্থাৎ বেশী দাম দিয়ে বিলাতের মাল কিনতে হবে। কাজেই এ দিকে যেমন বিলাতের আমদানি বাড়বে, অন্যদিকে তার রপ্তানি খুবই কমে যাবে এবং দেশের টাকা বিদেশে চলে যেতে থাকবে। ১৯২৫ সন থেকে ইংলণ্ডের সেই অবস্থাই হলো। তারপর ১৯২৯ সনে দেখা দিল বিশ্বব্যাপী ঘোরতর আর্থিক দুর্দ্দিন (Economic depression)। এই অবস্থায় ৬ বৎসর টানা হিঁচড়ার মধ্য দিয়ে বহু ক্ষতি স্বীকার করতে করতে ১৯৩১ সনে ইংলণ্ড স্বর্ণমান ত্যাগ করে সকল যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পায়। ১৯৩১ সনের সেদিনকার সেই আর্থিক ওলোটপালোটের মধ্যে ইংলণ্ডের স্বর্ণমান ত্যাগ আর্থিক জগতে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে রয়েছে। এ বিষয়ে তাই আমাদের কিছু আলোচনার প্রয়োজন।

১৯১৪-১৮ সনের মহাসমরের পর থেকেই ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই কাহিল হয়ে আসছিল। ইংলণ্ডকে বাঁচতে হয় অন্য দেশের উপর নির্ভর করে। অন্য দেশের কাঁচা মাল কিনে এনে তার দ্বারা যন্ত্রের সাহায্যে নানাবিধ দ্রব্য তৈরী করে বিশ্বের হাটে সে তা আবার বিক্রি করে। এইভাবে বহির্বাণিজ্যের লাভ দ্বারা ইংলণ্ডবাসী তাদের ঠাটবাট বজায় রেখে চলে আসছে। ঐ যুদ্ধে অবরোধ প্রথার জন্য অনেক দেশ যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের মাল না আসায় নিজেরাই সে সব মাল প্রস্তুত করতে আরম্ভ করে দেয়। সুতরাং যুদ্ধের পর ইংলণ্ড দেখলো যে বাহির বিশ্বে তার মালের কাট্‌তি অনেক কমে গেছে। ভারতে তাদের এক চেটিয়া বাজার, কিন্তু এদেশে স্বদেশী আন্দোলনের জন্য বিশেষ করে বিলাতী কাপড় চোপড় বিক্রী বহুল পরিমাণে কমে গেল। এই সব কারণে মাল আমদানী ও রপ্তানী দ্বারা পূর্ব্বে ইংলণ্ডের যে প্রচুর লাভ থাকতো তা ক্রমেই কমে আসতে থাকে। ১৯২৯ সনে আমদানি থেকে রপ্তানি শতকরা মাত্র ১৩৮ পাউণ্ড বেশী ছিল; ১৯৩০ সনে সেটা দাঁড়ায় ৩৯ পাউণ্ডে; অবশেষে ১৯৩১ সনে রপ্তানির থেকে আমদানিই বেশী হয়ে পড়ে।

যুদ্ধের পর পরাজিত জার্ম্মানীর উপর এত অধিক করের বোঝা (Reparation) চাপান হয় যে তাতে তার প্রায় শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি বিজেতা দেশকে অত টাকা কর দেওয়া তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। জার্ম্মাণী যাতে নিজেদের শিল্পোন্নতির দ্বারা এই কর দিতে পারে এই আশায় ইংলণ্ড ও আমেরিকা জার্ম্মাণীকে টাকা ধার দিয়ে তার শিল্পের মূলধন যোগাতে থাকে। জার্ম্মাণী এই টাকা কর্জ্জ পেয়ে আর্থিক অবস্থার বেশ খানিকটা উন্নতিও করে ফেললো। কিন্তু সুদের হার বেশী থাকায় তার লাভ করা মুস্কিল হয়ে পড়ে। ১৯২৮ সনের শেষে নিজেদের দেশে আর্থিক গোলযোগের জন্য আমেরিকা জার্ম্মানীকে আর নূতন করে টাকা ধার দিতে রাজী হয় না। ফলে জার্ম্মানীর বিশেষ করে অর্দ্ধসমাপ্ত শিল্পগুলির অবস্থা টাকার অভাবে সঙ্গীন হয়ে উঠে। জার্ম্মানীর আর্থিক ভাঙ্গনে ইংলণ্ডের সমস্ত টাকা জলে যায়, সুতরাং ইংলণ্ড জার্ম্মানীকে প্রচুর অর্থ ধার দিতে আরম্ভ করে। এতে তার লাভও ছিল প্রচুর। আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি বহুদেশের লোকের টাকা ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল। তিন টাকা সুদের সেই সব টাকা ইংলণ্ড জার্ম্মানীকে ৮ টাকা সুদে ধার দিয়ে যথেষ্ট

পরিমাণে লাভবানও হচ্ছিল। কিন্তু যুদ্ধ ঋণের বোঝা (war debts) এত অধিক চাপান হয়েছিল যে জার্ম্মানী এত টাকা কর্জ্জ পেয়েও কিছুতেই সামলাতে পারছিল না। তা ছাড়া বিশ্বব্যাপী একটা ঘোরতর আর্থিক মন্দার ছায়াও ক্রমেই পৃথিবীর উপর এগিয়ে আসছিল। সব যায় দেখে ইংলণ্ড জার্ম্মানীকে আরো কর্জ্জ দেবার জন্য ঝুঁকে পড়লো। আমেরিকা ও ফ্রান্স ইংলণ্ডের এই বেপরোয়া ভাব দেখে সতর্ক হয়ে উঠে। ১৯২৫ সনে স্বর্ণমানে ফিরে যাবার পর ডলারের সঙ্গে পাউণ্ডের বিনিময় হার উচ্চে রাখার দরুণ (পূর্ব্বে বর্ণিত হয়েছে) ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থাও ক্রমেই অবনতির দিকে ধাবিত হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে উপর্য্যুপরি কয়েকবার ইংলণ্ডের বাজেট ঘাট্‌তি দেখা দেয়। দেশের আয়ের থেকে ব্যয়ের পরিমাণ বেশী হলে এই অতিরিক্ত ব্যয় নোট ছাপিয়ে পরে মিটান হবে এবং তাইতে হয়তো ইংলণ্ডকে স্বর্ণমান ত্যাগ করতে হবে ও তার পাউণ্ডের মূল্য কমে যাবে, এই আশঙ্কায় অন্যান্য দেশের মহাজনরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যদি পাউণ্ডের মূল্য বা ক্রয়-ক্ষমতা কমে যায় তবে পূর্ব্বে এক পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে যতগুলি ডলার বা ফ্রাঙ্ক (ফ্রান্সের মুদ্রা) পাওয়া যেত তা আর পাওয়া যাবে না, সুতরাং তখন ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে গেলে কম ডলার বা ফ্রাঙ্ক নিতে হবে, এই ভয়ে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক থেকে আমেরিকা ও ফ্রান্সের মহাজনদের টাকা তোলার হিড়িক্ পড়ে গেল। ইংলণ্ডে তখন স্বর্ণমান, সুতরাং টাকার বদলে সোনা দিতে সে বাধ্য, তাই হু হু করে সোনাগুলি দেশ থেকে বার হয়ে যেতে লাগলো। এই রকম একটা দুর্য্যোগ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই অনেকে তখন ইংলণ্ডকে স্বর্ণমান ত্যাগ করতে বলে, কিন্তু সে আরো কিছুদিন দেখি দেখি ভাব করে কাটিয়ে দেবার পর যখন দেখলো যে আতঙ্ক বা অবস্থার কোন উন্নতিই হলো না, এবং তার স্বর্ণ তহবিল এক রকম খালি হতে চলেছে তখন ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ড স্বর্ণমান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ১৯৩১ সনে ইংলণ্ডের স্বর্ণ তহবিলের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬৫০ মিলিয়ন ডলার; অথচ সে বায়গায় আমেরিকার ৪৬০০ মিলিয়ন ও ফ্রান্সের ছিল ২৩০০ মিলিয়ন ডলার। আরো কিছুদিন পূর্ব্বে স্বর্ণমান ত্যাগ করলে, ইংলণ্ডের স্বর্ণ তহবিল এতটা খালি হতো না। ইংলণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বহুদেশও একের পর এক স্বর্ণমান ত্যাগ করে। আমেরিকা কিছুদিন পর্য্যন্ত নিজেদের গোঁ ধরে রাখে। কিন্তু ১৯৩৩ সনে এপ্রিল মাসের এক দুর্য্যোগের ধাক্কায় সেও স্বর্ণমান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

স্বর্ণমান ত্যাগ করে সোনার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার পর ইংলণ্ডের মুদ্রা পরিমাণ দেশের আর্থিক প্রয়োজনানুসারেই নিয়ন্ত্রিত হতে লাগলো। অন্যান্য কতকগুলি দেশ—যাদের সঙ্গে ইংলণ্ডের লেন দেনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তারাও স্বর্ণমান ত্যাগ করার পর ইংলণ্ডের সঙ্গে এসে যোগ দেয়। নিজেদের মধ্যে মুদ্রার বিনিময় হার যাতে স্থির রেখে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা করা যায় সেইজন্য এরা সকলে মিলে একটি ষ্টার্লিং দল (sterling group) তৈরী করলো। ইংলণ্ডের মুদ্রা পাউণ্ড ষ্টার্লিংএর সঙ্গে নিজ নিজ মুদ্রার একটা স্থির সংযোগ স্থাপন করে সব দেশ নিজ নিজ দেশের মুদ্রাকে আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনানুসা নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। এই দলের সকলেই একই মুদ্রানীতি অনুস করবে, নিজের প্রয়োজন বা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কেউই কোন নিজস্ব অনুসরণ করতে পারবে না—এইভাবে ষ্টার্লিং দলের সৃষ্টির দ্বারা একটি আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে উঠে—যা কি স্বর্ণ বা কারো উপর নির্ভর-শীল নয়।

ইংলণ্ড স্বর্ণমান থেকে বিচ্যুত হওয়ার পর খুব সফলতার সহে নিজ দেশের মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। এমন কি গত ঘোর দুর্দ্দিনে সময় যখন স্বর্ণমানে অবস্থিত বহুদেশের দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত উঠা-না করছিল, সেই সময় ইংলণ্ড এবং তার ষ্টার্লিং দলভুক্ত দেশগুলি নি নিজ মুদ্রাকে একটানা স্থির ভাবে রক্ষা করে চল্‌তে সক্ষম হয়। এইজ বিশ্বচক্ষে এই ষ্টার্লিং দল শ্রদ্ধার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অনেকে এ দলে যোগদান করারও ইচ্ছা প্রকাশ করে। সোনার সঙ্গে সব সম্ব ঘুচিয়েও যে দেশের অভ্যন্তরীণ মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং বিদেশে মুদ্রার সঙ্গে বিনিময় হার স্থির রাখার কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হতে পারে, ষ্টার্লিং দল গত দুর্দ্দিনে অনেকটা তাই প্রমাণ করেছে।

গত দশ বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাসীর মধ্যে মুদ্রানীতি সম্পর্কে মোটামু তিনটি দলের উদ্ভব হয়েছে। একটী স্বর্ণদল (gold block)—অর্থা যারা স্বর্ণমান কায়েমের দ্বারাই দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে; দ্বিতীয় আমাদের পূর্ব বর্ণিত ষ্টার্লিং দল (sterling block)—যাদের প্রকৃতই একটি আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রামান (International standard) বলা যেতে পারে। আর তৃতীয় হলো, আমেরিকার নিজ দেশের ডলার সম্বন্ধে অনুসৃত নীতি—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য দেশের মুদ্রানীতি সম্বন্ধে বিশেষ মাথা ব্যথা নেই, সে তার ডলারের মূল্য কম করে কি উপায়ে দেশের পণ্য মূল্যের বৃদ্ধি করা যায়, কেবল সেই চিন্তায়ই দুর্দ্দিনের সমস্ত বৎসরগুলি ধরে বিভোর ছিল। প্রথম দুইটি দল, অর্থাৎ স্বর্ণদল ও ষ্টার্লিং দল অবশ্য আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার পক্ষপাতী, কারণ তা নইলে তাদের মুদ্রা প্রথা কায়েম রাখা দুষ্কর।

কিন্তু যে যে প্রথাই অবলম্বন করুক, মুদ্রানীতিতে অন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা ভিন্ন মুদ্রামানকেই স্থির রাখা সম্ভব নয়। এই জন্যই গত-বৎসর আমেরিকার বৃটন উডস (Bretton woods) নামক স্থানে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞ লোকেরা মিলে যুদ্ধোত্তর কালের জন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা পরিকল্পনা করেছেন (International currency plan)। আমেরিকা এখন চাইছে সকল দেশকে আবার স্বর্ণমানে ফিরিয়ে নিতে। কারণ তা হলেই তার কাছে যে রাশি রাশি সোনা জড়ীভূত রয়েছে, তার একটা সদ্‌গতি হয়। কিন্তু ইংলণ্ড এবিষয়ে একেবারে নিরুত্তর, কারণ বর্ত্তমানে স্বর্ণ সম্বন্ধে সে একরকম দেউলিয়া। কাজেই অনেক আলাপ আলোচনার পর ঐ আন্তর্জ্জাতিক সভায় যে পরিকল্পনা স্থির হয়, তাকে অনেকটা জগাখিচুড়ি বলা চলে—অর্থাৎ, স্বর্ণের সঙ্গে

মুদ্রার কিছু সম্বন্ধ অবশ্য রাখা হয়েছে, তার আবার স্বর্ণমানে না থেকেও এই পরিকল্পনায় যোগদান করা যায়। ভারতবর্ষ এ পরিকল্পনায় যোগদান করবে কিনা এখনও স্থির হয় নাই। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে তা স্থির করা হবে। বারান্তরে এবিষয়ে আলোচনার ইচ্ছা রইলো।

কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন মুদ্রানীতির সাফল্যের জন্য যে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা ও মনোভাবের কথা বলছিলাম, আজ দুনিয়ার হাটে সে জিনিষটিরই অভাব সবচেয়ে বেশী হয়ে পড়েছে। যুদ্ধে তো মিত্রপক্ষীয়রা জয়লাভ করলেন, ইংলণ্ড ও আমেরিকা আজ প্রভূত পরিমাণে শক্তিশালীও হলো। কিন্তু বিশ্ব বলতেতো শুধু এই দুই দেশই বোঝায় না। অথচ তাদের মনোভাব যেন অনেকটা সেইরকম। অর্থাৎ, তারা যা বলবেন তাইতেই বিশ্বের মঙ্গল হবে, এইরকম একটা ভাবের ধোঁয়া যেন ইতি-মধ্যেই উঠে পড়েছে। ভারতের কথা নয় ছেড়েই দিলাম, কারণ পরাধীন দেশের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন কথাই আসতে পারে না। কিন্তু আরও তো দেশ আছে। তাদের সুবিধা অসুবিধাগুলিও একবার দেখা দরকার। তারপর বিজীত দেশগুলি আজ শক্তিহীন হয়ে পড়লেও চিরদিনই যে তারা সে অবস্থায় থাকবে তা কখন হয় না। সুতরাং তাদের সুখ সুবিধাকে একেবারে অগ্রাহ্য করে অতিরিক্ত শোষণ কার্য্য চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এর ফল কখনও ভাল হবে না। গতযুদ্ধের পর জার্ম্মানীর পুনরুত্থানের দৃষ্টান্ত এখনও চোখের সামনে ভাসছে। সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা লাভ করতে হলে আন্তর্জ্জাতিক সহানুভূতির প্রয়োজন। আর তা নইলে আন্তর্জ্জাতিকতার মূলে কুঠারাঘাতই করা হবে।

মৃত্যুঞ্জয়ী

(নাটক)

শ্রীযামিনীমোহন কর

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

(প্রতুল চৌধুরীর বসবার ঘর। এক ধারে ঈজেলের ওপর মল্লিকা বসুর ছবি রয়েছে। আর একধারে টেবিলের ওপর ট্রেতে সাজান মদের বোতল, ডিক্যাণ্টার, গেলাস ইত্যাদি। একটা দেরাজযুক্ত টেবিলের ওপর পুরোণো একটা সুটকেশ রয়েছে। ঘরের জানালাগুলো খোলা। ঘর সোফা, আলমারি ইত্যাদি দিয়ে সুসজ্জিত)

প্রতুল। (নেপথ্যে) চলুন গিরীনবাবু, ভেতরে চলুন—

গিরীন। (নেপথ্যে) আচ্ছা, ধন্যবাদ!

(গিরীন ও সুটকেশ হাতে প্রতুলের প্রবেশ। টেবিলের ওপর সুটকেশটা রেখে প্রতুল ঘরের সমস্ত আলোগুলো জ্বেলে দিলে। বাহিরে যাবার দরজায় চাবী লাগাল)

গিরীন। আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমরা কার্য্যোদ্ধার করেছি।

প্রতুল। (হেসে) কিন্তু করেছি এটা তো দেখতে পাচ্ছেন।

গিরীন। কেউ পিছু নেয় নি তো?

প্রতুল। (জানালার পর্দা টেনে দিতে দিতে) না। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

গিরীন। আপিসে গিয়ে ব্যাগ খুলে ফণীবাবুর যে কি অবস্থা হবে—

প্রতুল। একটু ড্রিঙ্ক— (একটা গেলাসে একটু মদ ঢেলে আনলে)

গিরীন। কখনও খাই নি

প্রতুল। খান। নার্ভসে যা ষ্ট্রেন পড়েছে—

(গিরীনকে মদের গেলাস দিল)

গিরীন। (খেয়ে) আপিসে যা হৈচৈ পড়ে যাবে—

প্রতুল। তাদের সঙ্গে আপনার আর কি সংস্রব! আপনার সুটকেশের চাবীটা?

গিরীন। (চাবী বার করে) এই যে। (প্রতুলকে চাবী দিল) ফণীবাবু প্রথমে আমাকে পাঠাতে চেষ্টা করলেন। পায়ে চোট লেগেছে বলে কাটিয়ে দিতে ড্রাইভারকে যেতে বললেন। যখন সেও গেল না, তখন নিজেকেই যেতে হ'ল।

প্রতুল। কোন গণ্ডগোল হয় নি তো?

গিরীন। না। ছেলে খেলার চেয়েও সোজা। (মাথাটা নেড়ে) উঃ মাথাটা ভয়ানক ঘুরছে—

প্রতুল। নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। আপনি একটু চুপ করে বসে রেষ্ট নিন। দাড়ান, আপনাকে আমি একটা ওষুধ দিচ্ছি—

(দেরাজ খুলে একটা শিশি বার করলে)

গিরীন। দিন। আমার কাপড় জামা—

প্রতুল। (এক গেলাস ব্রাণ্ডিতে শিশির ওষুধ মিশিয়ে) আপনার জন্য সাহেবী পোষাক পাশের ঘরে রেখেছি। নতুন নাম এবং নতুন পোষাক—

গিরীন। ভারী সুবিধা হবে। বিশেষ করে আমি চিরকাল ধুতি পরি, সুট পরলে কেউ চিনতেই পারবে না।

প্রতুল। এই নিন ওষুধ। ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে মিশিয়ে দিলুম। বলকারক হবে। (গেলাস দিল)

গিরীন। (গেলাস হাতে) কাল সকালের, হয়ত আজকের বিকেলের কাগজেই ব্যাঙ্ক ভ্যান লুটের সন্ধান বেরোবে। "সকাল সাড়ে দশটায়, দিনের আলোতে সকলের চক্ষে ধূলি দান—" খুব গরম খবর হবে—

(গেলাস মুখের কাছে নিয়ে যাচ্ছে এমন সময় নিরঞ্জন ঘরে ঢুকল)

নিরঞ্জন। গিরীনবাবু—

গিরীন। (চমকে গেলাস নামিয়ে) কে ?

নিরঞ্জন। আমি। চিনতে পারছেন না ?

গিরীন। (গেলাস হাতে) প্রতুলবাবু, আপনি যে বলেছিলেন বাড়ীতে কেউ নেই !

প্রতুল। তোমার দশটার সময় যাবার কথা ছিল না ? বললে, আমি বেরোবার পরই তুমি যাবে—

নিরঞ্জন। কথা তাই ছিল বটে, কিন্তু যাওয়া হয় নি। আমি যাই নি।

প্রতুল। কেন ?

নিরঞ্জন। পরে বলব।

গিরীন। (গেলাস হাতে ভীত ভাবে) উনি কি সব জানেন ?

নিরঞ্জন। জানি। কিন্তু আমাকে ভয় করবার কোন কারণ নেই। দেখি গেলাসটা—(গিরীনের হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিল)

আপনার পক্ষে এখন আর মদ খাওয়া ঠিক নয়—

প্রতুল। তুমি যাও নি কেন ?

নিরঞ্জন। আমি তো বলেছি, পরে বলব। (গিরীনের প্রতি) আপনি যান, আর দেরী করবেন না—

গিরীন। (ভীত ভাবে) কেন ? ভয়ের কিছু ঘটেছে নাকি ?

নিরঞ্জন। না।

গিরীন। সত্যি বলুন।

নিরঞ্জন। সত্যিই বলছি, এখন আর আপনার ভয়ের কারণ নেই।

গিরীন। আমি জানতুম না যে আপনিও এর মধ্যে আছেন।

নিরঞ্জন। আপনি গিয়ে কাপড় জামা বদলে ফেলুন—যত তাড়াতাড়ি পারেন।

গিরীন। হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। কোথায় যেতে হবে প্রতুলবাবু।

প্রতুল। এই পাশের ঘরে। (একটা দরজা দেখালে)

গিরীন। বেশীক্ষণ লাগবে না। (দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে) সত্যি কোন ভয়ের কারণ নেই তো ?

নিরঞ্জন। না, না।

প্রতুল। যান, কাপড় জামা বদলে আসুন। আমি ততক্ষণ ডাক্তার গুপ্তর সঙ্গে কথা বলি।

গিরীন। আচ্ছা। (নিরঞ্জনের প্রতি) যখন ফিরে আসব আমায় আর চিনতে পারবেন না।

নিরঞ্জন। বটে। দরজাটা বন্ধ করে দেবেন তাহলে এফেক্ট আরও ভাল হবে।

গিরীন। আচ্ছা। এলুম বলে। (গিরীনের প্রস্থান)

নিরঞ্জন। লোকটা কাপড় জামা বদলে নিক—যদিও তোমার তা ইচ্ছা ছিল না।

প্রতুল। এ সবের অর্থ কি ?

নিরঞ্জন। (মদের গেলাস দেখিয়ে) আমার ইচ্ছা ছিল না যে তুমি এ কাজ কর।

প্রতুল। এই জন্যই বুঝি তুমি যাও নি ?

নিরঞ্জন। এটাও একটা কারণ বটে।

প্রতুল। যাক, তুমি যে থেকে গেছ ভালই হয়েছে। আমাদের সব প্ল্যান বদলাতে হবে।

নিরঞ্জন। বেশ। সব প্ল্যানই বদলাবে। প্রতুল, আমাকে রেহাই দিতে হবে—

প্রতুল। রেহাই দিতে হবে মানে ?

নিরঞ্জন। দিল্লীতে যখন তুমি এই কাজে প্রথম ব্রতী হও, আমি তোমায় কথা দিয়েছিলুম যে চিরকাল তোমায় সাহায্য করব—

প্রতুল। (চমকে) তবে কি বম্বেতে তুমি যাবে না ?

নিরঞ্জন। না। আই অ্যাম সরি—

প্রতুল। কিন্তু তুমি না থাকলে—

নিরঞ্জন। আমি না থাকলেও চলবে।

প্রতুল। না। চলবে না। চলতে পারে না। নিরঞ্জন, আমার এইখানটায় কিছু গোলমাল হয়েছে। (পিঠের একটা স্থান দেখালে)

নিরঞ্জন। কি হয়েছে ?

প্রতুল। গ্ল্যাণ্ডস্ বড্ড তাড়াতাড়ি ফেল করছে—

নিরঞ্জন। ফেল করছে ?

প্রতুল। হ্যাঁ। কয়েকঘণ্টার মধ্যে বদলে ফেলা প্রয়োজন !

নিরঞ্জন। কিন্তু তুমি যে বলেছিলে এখনও মাস খানেক—

প্রতুল। তখন তাই ছিল বটে, কিন্তু এ ক'দিনের ভাবনায় আর আপসেটে—

(গম্ভীরভাবে ঘরময় পায়চারী করতে লাগল। মুখে চিন্তার রেখা)

নিরঞ্জন। নার্ভাস ষ্ট্রেনে ভয়ানক ডিজেনারেট করে—

প্রতুল। তুমি যখন ঘরে ঢুকলে, তোমাকে দেখে আমি চমকে উঠলুম—সেই শকের পরে কি রকম বোধ করতে লাগলুম আর এইখানে একটা ব্যথা—

দু'হাতে কোমর চেপে ধরল

নিরঞ্জন। কি করবে ?

প্রতুল। কিছু করবার নেই বন্ধু। যে বছরগুলিকে আমি ঠকিয়ে দূরে ঠেলে রেখেছি তারা উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবেই।

নিরঞ্জন। মানে তোমার কি মনে হচ্ছে যে তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ—

প্রতুল। এগজ্যাক্টলি !

নিরঞ্জন। এখুনি না বদলাতে পারলে—

প্রতুল। আর কয়েকঘণ্টা মাত্র বাঁচব। হয়ত' লোলচর্ম্ম শক্তিহীন বৃদ্ধের মত স্থবির হয়ে দিন দশ পনেরো টিকেও থাকতে পারি।

নিরঞ্জন। (একটু পরে ধীরে ধীরে) হয় ত' তাই ভাল—

প্রতুল। (অবাক হয়ে) নিরঞ্জন, তুমি-তুমি এই কথা বলছ!

নিরঞ্জন। হ্যাঁ এবং ঠিকই বলছি। প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যাওয়াতে সুখ অথবা শান্তি কিছুই নেই।

প্রতুল। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না নিরঞ্জন।

নিরঞ্জন। প্রতুল, আজ আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি তোমার এ সাধনা কতখানি নিষ্ফল।

প্রতুল। নিষ্ফল? কেন?

নিরঞ্জন। তোমার শরীরটাকে তুমি অমরত্ব দিয়েছ, কিন্তু তার জন্য দাম দিতে হয়েছে অনেক। দয়া, মায়া, মনুষ্যত্ব সব।

প্রতুল। আমার তা মনে হয় না।

নিরঞ্জন। হয় না কারণ তুমি অন্ধ, ভ্রান্ত। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ছাড়া আর তোমার কি আছে? কতগুলো লোকের গ্ল্যাণ্ড নিয়ে তুমি তাদের পঙ্গু করে দিয়েছ, কতগুলো নিরীহ ব্যক্তিকে তোমার দেহকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য বিসর্জ্জন দিয়েছ, ঘুষ, চুরি, খুন তোমার জীবন পথের অপরিহার্য্য অঙ্গ করে তুলেছ—অথচ তোমার মনে কখনও আঘাত দেয় নি, তোমার প্রাণ কখনও কেঁদে ওঠেনি, তোমার চোখে কখনও এক ফোঁটা জল আসে নি। এই কি জীবন! এরই জন্য কি তোমার মনুষ্যমেধ যজ্ঞ। নিজের আত্মাকে হত্যা করে শরীরকে বাঁচিয়ে রেখে কি লাভ!

প্রতুল। আমাকে বাধ্য হয়ে ওসব করতে হয়েছে।

নিরঞ্জন। সৃষ্টির নিয়মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তুমি সৃষ্টিছাড়া হয়েছ। মানুষকে ধ্বংস করে তুমি মনুষ্যত্ব হারিয়েছ। তুমি বেঁচে থেকেও মরে আছ। তুমি সাধারণ মানুষের মত হাসতে পার না, মিশতে পার না, ভালবাসতে পার না। এমন কি অন্ধকারকে পর্য্যন্ত তুমি ভয় কর—(প্রতুলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে গিরীনের মদের গেলাস তুলে ধরে) আর যে চির অন্ধকারে তুমি গিরীনকে পাঠাবার মতলবে ছিলে, সে অন্ধকারকে যে কত বেশী ভয় কর তা প্রকাশ করা যায় না—

প্রতুল। এ ছাড়া যে আমার উপায় ছিল না!

নিরঞ্জন। আগে যা উপায় ছিল না বলে আরম্ভ করেছিলে ক্রমে এখন তা স্বভাবে পরিণত হয়েছে। বিষ, মৃত্যু তোমার ক্রীড়ার সামগ্রী হয়ে পড়েছে। নিজেকে মানুষের হাত থেকে, পুলিশের হাত থেকে, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি অবলীলা ক্রমে গিরীনের মত কত লোককে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়েছ। প্রতুল, তুমি মানুষ নয়—মানুষরূপী দানব।

প্রতুল। আমি এ সব শুনতে চাই না নিরঞ্জন—

নিরঞ্জন। কিন্তু আমি বলতে চাই। আমি বৃদ্ধ, প্রকৃতির নিয়মানুসারে বৃদ্ধ—

প্রতুল। আর আমি প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ যুবা—বৃদ্ধ হয়েও যুবা—

নিরঞ্জন। হ্যাঁ। তোমার গবেষণা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় ত' পারে, তার দেহ এবং ফাঁকা জীবন নিয়ে। কিন্তু তারমধ্যে জীবনের সব চেয়ে বড় রত্ন আত্মা—তা থাকবে না।

প্রতুল। তুমি আজ মত বদলেছ বলে আমি আমার পথ বদলাব এ ধারণা তুমি মনেও স্থান দিও না। তুমি সাহায্য কর আর নাই কর নিরঞ্জন, আমার সাধনার পথে আমি অগ্রসর হবই।

নিরঞ্জন। আমার আর কিছু বলবার নেই প্রতুল। প্রার্থনা করি, ভগবান যেন তোমায় ক্ষমা করেন।

প্রতুল। যদি ভগবানও ত্যাগ করেন তবু—তবু আমি আমার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করে যাব। মর জগতে আমিই প্রথম অমর!

নিরঞ্জন। তোমার অগাধ সাহস—

প্রতুল। সাহস নয় বন্ধু, বিশ্বাস।

নিরঞ্জন। হয় ত' তোমার কথাই ঠিক। তোমার বিশ্বাস আমাকে বিস্মিত করেছে। কিন্তু ভুলই হোক আর ঠিকই হোক, আমি তোমার বন্ধুই থাকব। তোমার প্রতি আমার প্রীতি কোন অংশেই কমবে না। চিরবিদায়ের আগে আমাদের এই মনোমালিন্য মনকে সত্যই পীড়া দিচ্ছে—

প্রতুল। (হেসে) মনোমালিন্য কিসের?

নিরঞ্জন। (হেসে) তা বটে। একটু তর্ক বিতর্ক মতের পার্থক্য—কি বল?

প্রতুল। তা ছাড়া আর কি!

সুটকেস খুলে নোটের তাড়া বার করতে লাগল

নিরঞ্জন। সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি তোমার মঙ্গল কামনা করব—

প্রতুল একটা প্যাকেট ছিঁড়ে অবাক হয়ে গেল। আবার একটা ছিঁড়তে লাগল

নিরঞ্জন। তোমাকে ত্যাগ করে চলে যাওয়াও ভয়ানক শক্ত। তোমার মত বন্ধু আর আমার নেই—

প্রতুল। (নোটের দিকে চেয়ে বিস্মিত ভাবে) নিরঞ্জন, নিরঞ্জন—

নিরঞ্জন। কি হল?

প্রতুল। এই দেখ! [নিরঞ্জনের দিকে নোট এগিয়ে ধরলে

নিরঞ্জন। কি হয়েছে?

প্রতুল। এ সত্যকারের নোট নয়—জাল!

নিরঞ্জন। জাল?

প্রতুল। হ্যাঁ জাল। (আর একটা প্যাকেট ছিঁড়ে) বাহিরে জাল নোট আর ভেতরে শাদা কাগজ!

নিরঞ্জন। এ কি কথা!

প্রতুল। প্রত্যেক বাণ্ডিলটা তাই। (হতাশ ভাবে সুটকেসের দিকে চেয়ে) এখন উপায়!

নিরঞ্জন। সত্যকারের নোট মোটে নেই?

প্রতুল। না। একটাও নয়। (নিরঞ্জনের দিকে চেয়ে) কেউ এই ব্যাপারটা জানত!

নিরঞ্জন। কি করে জানল ?

প্রতুল। জানি না। যখন সত্যকারের নোটের বদলে এই সব ব্যাগে পুরে দিয়েছিল, তখন নিশ্চয়ই কোন রকমে জানতে পেরেছিল। কিন্তু টাকা না পেলে আমার কি হবে ? কি হবে নিরঞ্জন—কি হবে—

বলতে বলতে প্রতুল পড়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি টেবিলের কোনটা ধরে নিজেকে সামলে নিল। মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

নিরঞ্জন। (কাছে গিয়ে) প্রতুল—বস। এই শকের জন্য—

প্রতুল। (ক্ষীণ কণ্ঠে) আমাকে একটু ব্র্যাণ্ডি দাও।

নিরঞ্জন। কিন্তু তাতে তো তোমার কোন উপকার হবে না।

প্রতুল। তবু দাও, দেখি। (নিরঞ্জন একটা গেলাসে মদ ঢালতে লাগল) তারা জানত আজ আমরা টাকা সরাব তাই বদলে দিয়েছিল—

নিরঞ্জন। এই নাও। (গেলাস দিল)

প্রতুল। (খেয়ে গেলাস টেবিলে রেখে হাঁফাতে হাঁফাতে) না, এতে কোন উপকার হবে না।

নিরঞ্জন। একটা ইঞ্জেক্‌শান দিয়ে দেব ?—

প্রতুল। না, এখন থাক। (আরও কয়েকটা তাড়া তুলে) সব সেই—জাল নোটে মোড়া শাদা কাগজের বাণ্ডিল।

প্রতুলের হাত কাঁপতে লাগল। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না

নিরঞ্জন। এ কি করে সম্ভব হ'ল ?

প্রতুল। বোধহয়—বোধহয় কেন নিশ্চয়ই—(পাশের ঘরের দরজার দিকে চেয়ে) ওর কাজ ! নিশ্চয়ই ওর চালাকি—(দরজার কাছে গিয়ে) গিরীন বাবু—

গিরীন। (নেপথ্যে) হয়ে গেছে। আসছি—

দরজা খুলে গিরীনের প্রবেশ। সুট-পরা, চোখে চশমা। হাতে লাঠি আর টুপি।

গিরীন। আমি যাবার জন্য প্রস্তুত। প্রতুলবাবু, আমার যা প্রাপ্য—

নিরঞ্জন। (অবাক হয়ে) গিরীনবাবু !

গিরীন। ভুল করছেন, আমি গিরীনবাবু নয়। (টুপি ও লাঠি টেবিলে রেখে) তারপর মিষ্টার চৌধুরী, এইবার আমাদের কন্ট্রাক্টের শেষ অংশটা কমপ্লীট হোক।

প্রতুল। (নোটের তাড়া এগিয়ে দিয়ে) দেখুন—

গিরীন। ডাক্তার গুপ্ত, কি রকম মানিয়েছে ? বাড়ীতে এই পার্টটা অনেকদিন অভ্যাস করেছি।

প্রতুল। এই গুলো দেখুন—

গিরীন ((চশমা খুলে নোটগুলো নিয়ে) অ্যাঁ, এ কি !

প্রতুল। কেন, আপনি জানেন না ?

গিরীন। এ তো স্রেফ শাদা কাগজ, আর জাল নোট।

প্রতুল। হ্যাঁ।

গিরীন। (আরও কয়েকটা নোটের তাড়া খুলে) সব তাই—শুধু কাগজ !

প্রতুল। হ্যাঁ, শুধু কাগজ ! আমার সঙ্গে চালাকি—

গিরীন। এত মেহন্নতের পর শুধু কাগজ—

প্রতুল। এ আপনার কাজ ?

গিরীন। (অবাক হয়ে) আমার কাজ !

প্রতুল। আমাকে ঠকিয়ে পুলিশে ধরিয়ে দেবার মতলব ?

গিরীন। কি বলছেন আপনি ! আমি এ কাজ করতে যাব কেন ? (একবার প্রতুলের—একবার নিরঞ্জনের দিকে ভীত ভাবে চেয়ে) এ কাজ আমি করতে পারি না—

প্রতুল। না, আমি জানি আপনি পারেন না।

গিরীন। তবে কি করে এ হ'ল ?

প্রতুল। সেইটাই তো আমিও জানতে চাইছি !

গিরীন। আমি নিজে হাতে এর মধ্যে টাকা ভরেছিলুম—কোথায় গেল ?

প্রতুল। আপনি যে রকম এনেছেন সেই অবস্থায় রয়েছে।

গিরীন। আমি সোজা ব্যাঙ্কের ব্যাগ থেকে সুটকেসে ভরেছি—নিজের হাতে—(এক পা পেছিয়ে প্রতুলের দিকে চেয়ে) এ আপনার কাজ !

প্রতুল। না, না—

গিরীন। হ্যাঁ, আপনার। চোরের ওপর বাটপাড়ি !

প্রতুল। মাথা গরম করবেন না গিরীনবাবু।

গিরীন। সত্যকারের টাকা কোথায় বলুন ? কি করেছেন ? কোথায় রেখেছেন ? বাগে পেয়ে—

প্রতুল। আপনি কি সত্যিই ভাবছেন যে আমি আপনাকে ঠকাব ?

গিরীন। তবে টাকা কই ?

প্রতুল। ব্যাঙ্কের ব্যাগ থেকে টাকা নেবার সময় দেখেছিলেন ?

গিরীন। দেখেছি বলা চলে না। তাড়াহুড়ো করে বাণ্ডিল বার করেছি আর সুটকেসে পুরেছি—(একটা বাণ্ডিল হাতে নিয়ে) চট করে দেখে তো বোঝবার উপায় নেই যে এর মধ্যে কোন কারসাজি আছে।

প্রতুল। ব্যাঙ্ক থেকে যখন টাকা দেয় সে সময় উপস্থিত ছিলেন ?

গিরীন। না, ব্যাগ একেবারে ভরা চাবী লাগান অবস্থায় ছিল—(একটু ভেবে) তাই তো ! এ কথা তো এতক্ষণ ভাবি নি। চিরকাল টাকা আমাদের সামনে গুণে ব্যাগে ভরা হয় কিন্তু এবার তারা আগে থেকে রেডী করে রেখেছিল।

প্রতুল। (ভীতভাবে) আগে থেকে রেডী করে রেখেছিল ?

গিরীন। হ্যাঁ। এ নিশ্চয়ই ব্যাঙ্কের কাজ !

নিরঞ্জন। তার মানে তারা আপনাদের প্ল্যান সম্বন্ধে জানত'।

গিরীন। জানতে পারে না।

প্রতুল। জানতে যে পেরেছিল তার প্রমাণ তো চোখের সামনেই রয়েছে।

গিরীন। কিন্তু কি করে জানল ?

প্রতুল। কাউকে কিছু বলেছিলেন ?

গিরীন। কই না তো !

প্রতুল। ঠিক ?

গিরীন। মাইরি বলছি কাউকে কিচ্ছু বলি নি। (প্রতুলের আর নিরঞ্জনের দিকে চেয়ে কাঁদ কাঁদ স্বরে) টাকা না হলে আমি যেতে পারব না। আমার একূল ওকূল দু'কূলই গেল। আপিসেও যাওয়া চলবে না—

প্রতুল। না, সেখানে ফেরা চলবে না—

গিরীন। আমি তবে কি করব। আমার কি হবে ? উঃ কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেল—(নিজের মদের গেলাস তুলে) মদ, শুধু মদ—

প্রতুল। (হাত থেকে গেলাস কেড়ে নিয়ে) না—এখন নয়।

নিরঞ্জন। এখন নয় ?

প্রতুল। না। (টেবিলে গেলাস রেখে দিল)

নিরঞ্জন। ওটা ফেলে দাও প্রতুল।

প্রতুল। দেব, কিন্তু এখন নয়…(দরজায় খট খট ধ্বনি)

গিরীন। (চমকে) কে ? (সকলে দরজার দিকে চেয়ে রইল)

প্রতুল। জানি না। (আবার খট খট ধ্বনি)

গিরীন। আপনি বলেছিলেন বাড়ীতে কেউ নেই !

প্রতুল। আমি তাই জানতুম। তাড়াতাড়ি নোটগুলো সুটকেসে পুরে ফেলুন।

গিরীন। (তাড়া ব্যাগে রাখতে রাখতে) কে এল ?

প্রতুল। সুটকেসটার ডালা বন্ধ করুন।

গিরীন। (ভীতভাবে) কি হবে ?

প্রতুল দরজার চাবী খুলল। রেজা ঘরে ঢুকল

রেজা। মাফ করবেন স্যার— (দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল)

প্রতুল। তুমি ! কি করে এলে ?

রেজা। বাড়ীর পিছনের গলির দিক দিয়ে। খিড়কী দরজার একটা চাবী আমার কাছে ছিল। (চাবী দেখাল)

প্রতুল। কি চাও ?

রেজা। ভাবলুম যদি আপনার কোন কাজে লাগি। (একটু এগিয়ে চাপা গলায়) ফটকের সামনে দু'জন পুলিশের লোক দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় বাড়ীর ওপর নজর রাখছে।

প্রতুল। অ্যাঁ !

গিরীন। (ভীতভাবে) পুলিশ ?

রেজা। জানলা দিয়ে দেখুন না। (সকলে জানলার কাছে গেল)

নিরঞ্জন। কই ?

রেজা। ঐ দেখুন। একজন পানের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে, আর একজন ঐ গাড়ীটার পাশে। (সকলে জানলা থেকে সরে এল)

প্রতুল। তুমি কি করে জানলে যে তারা এই বাড়ীর ওপর নজর রাখছে—

প্রতুল যেন পড়ে যেতে গেল। তাড়াতাড়ি চেয়ার ধরে নিজেকে সামলে নিল

রেজা। আপনার এখানে পুলিশের আনাগোনা দেখে। খগেনবাবু, লোকেনবাবু এরা সব ঘোড়েল লোক—

প্রতুল। তা বটে—

প্রতুলের মাথাটা নুয়ে পড়ল, মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল

নিরঞ্জন। প্রতুল !

প্রতুল। ও কিছু না—

সোজা হবার চেষ্টা করল, পারল না। নিরঞ্জন দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল

রেজা। আপনার কি শরীর খারাপ ?

প্রতুল। না, বিশেষ কিছু নয়।

গিরীন। (রেজার প্রতি) ওরা বাইরে কতক্ষণ থেকে আছে ?

রেজা। সমস্ত সকালটা—

গিরীন। তা হলে আমাদের ওপর নজর রাখবার জন্য নয়। আমরা তো এই এলুম !

রেজা। কিন্তু কালও সমস্ত দিন ছিল—

প্রতুল। কালও ছিল ?

রেজা। হ্যাঁ।

গিরীন। (ভীতভাবে) প্রতুলবাবু, কি হবে ?

প্রতুল। ভয় পেলে চলবে না গিরীনবাবু।

গিরীন। কিন্তু ওরা যে আমাদের ধরতে এসেছে।

একটা শিশি ও হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ হাতে নিরঞ্জনের প্রবেশ

প্রতুল। কি আনলে ?

নিরঞ্জন। হাইপোডার্মিক--

প্রতুল। না, না, দরকার নেই।

নিরঞ্জন। এখনই যদি একটা ইঞ্জেকশন নাও—

সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না

প্রতুল। না, না—

নিরঞ্জন। তুমি ক্রমেই দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছ !

প্রতুল। জানি। আমার যখন প্রয়োজন হবে তোমায় বলব।

(ক্রমশঃ)



কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

মূল :—একজন অমাত্য প্রবহণের নিমিত্ত সকল অমাত্যকে আবাহন করিবেন। তজ্জনিত উদ্বেগবশতঃ রাজা তাঁহাদিগকে অবরুদ্ধ করিবেন। পূর্ব্বে অবরুদ্ধ কাপটিক ছাত্র অর্থমানাবক্ষিপ্ত সেই সকল (অমাত্যের) এক একজনকে প্রলোভিত করিবে—'অসৎ (পথে) প্রবৃত্ত এই রাজা, ইহাকে হত্যাপূর্ব্বক (ইহার স্থানে) অন্যকে সুষ্ঠুরূপে প্রতিষ্ঠাপিত করিব। (আমাদের মধ্যে অন্য) সকলেরই ইহা রুচিকর, আপনারই বা কিরূপ (লাগে)' ? প্রত্যাখ্যানে শুচি—ইহাই ভয়োপধা।

সঙ্কেত :—প্রবহণ—নৌকা, বড় বড় ভড়—বজরা, জাহাজ। পূর্ব্বকালে প্রবহণ-সাহায্যে সমুদ্র-যাত্রা করা হইত। শ্যামশাস্ত্রী উত্তরাধ্যায়ন-সূত্র-টীকা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—"সামুদ্রি কাব্যাপারিণঃ মহাসমুদ্রং প্রবহণৈস্তরন্তি" (seafaring merchants cross the high seas by means of Pravahanas). শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটিকাতেও প্রবহণে সমুদ্র-যাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়। গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় অর্থ করিয়াছেন—(১) নৌবিশেষ, (২) কর্ণীরথ (ছোট ছোট রথ—শিবিকা বা পাল্কী ? আপ্তে মহোদয়ও এই দুই প্রকার অর্থ দিয়াছেন। জাহাজে করিয়া জলযাত্রা ও জলবিহার ; আর কর্ণীরথে স্থলযাত্রা, উদ্যানবিহার ভোজন-ক্রীড়াদি সম্ভব। প্রবহণের যে অর্থই ধরা যাউক, ক্ষতি নাই। একজন অমাত্য প্রবহণে করিয়া আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যে যদি অপর সকল অমাত্যকে নিমন্ত্রণ করেন, আর সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা যদি গোষ্ঠী-প্রমোদার্থ একত্র মিলিত হন, তখন রাজার মনে স্বভাবতঃ আশঙ্কা হইতে পারে—অমাত্যেরা একত্র মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়্যন্ত্র করিতেছে না ত ? এইরূপ আশঙ্কা প্রচারিত করিয়া তিনি অমাত্যগণকে কারারুদ্ধ করিবেন। অবশ্য এই ব্যাপারে গোড়া হইতেই সবটা রাজার গড়াপেটা। একজন অমাত্যকে দিয়া রাজা সকল অমাত্যকে আবাহন করাইবেন—সকলে মিলিত হইলে ষড়্যন্ত্রের আশঙ্কা রটাইয়া তাঁহাদিগকে অবরুদ্ধ করিবেন। এইরূপে বিনা অপরাধে অবরুদ্ধ হইলে অমাত্যবর্গের মন সম্ভবতঃ রাজার উপর বিরূপ হইবে—এরূপ আশা করা অন্যায় নহে। অতএব, এই সুযোগে তাঁহাদিগের মন ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করা উচিত। একজন ছাত্রবেশী চর (কাপটিক) অমাত্যবর্গের প্রত্যেক্যের নিকট একে একে যাইবে—প্রত্যেকের নিকট যাইয়া এরূপ ভাণ করিবে যেন সেও পূর্ব্বে এই রাজার দ্বারা বিনা কারণে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। এ কারণে সে রাজার বিরোধী। অন্য অমাত্যগণের নিকটও সে গিয়াছিল—সকলেই তাহার সহিত যোগ দিয়া রাজার বিরুদ্ধতা করিতে চাহেন। অতএব, অসৎ আচরণে প্রবৃত্ত এই রাজাকে হত্যা-পূর্ব্বক অন্য একজন সদাচারী যোগ্য ব্যক্তিকে তৎপরিবর্ত্তে সিংহ স্থাপন করা যাউক। অন্য সকলেরই ইহাতে সমর্থন আছে— ব্যক্তিগতভাবে সেই বিশিষ্ট অমাত্যের (যাঁহার নিকট কাপটিক প্র করিতেছে তাঁহার) কি মত ? যদি তিনি রাজবিদ্রোহের প্র প্রত্যাখ্যান করেন,তবে বুঝিতে হইবে, তিনি নির্দ্দোষ—শুদ্ধ। রাজনিগ্র ভয়েও তিনি প্রলোভিত হইবার পাত্র নহেন। ভয়-প্রদর্শনপূর্ব্বক ছলনার নাম 'ভয়োপধা' (allurement under fear—SH).

আবাহয়েৎ—আবাহনপূর্ব্বক একত্র আনয়ন ও মিলিত করাইবে তজ্জনিত উদ্বেগ—অমাত্যবর্গের মিলনে রাজার উদ্বেগ (অক্ষমা, আশ জন্মান স্বাভাবিক। অবরুদ্ধ করিবেন—গ্রেপ্তার করিবেন ; অর্থা করিবেন, পদচ্যুত করিয়া অবমানিত করিবেন, কারারুদ্ধ করিবেন ইত্যা নানারূপ অর্থ সম্ভব। কাপটিক—ছাত্রবেশী চর ; 'গূঢ়পুরুষোৎপত্তি' প্রক ইহার বিবরণ দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বে অবরুদ্ধ—শ্যামশাস্ত্রী যে অর্থ করিয়া তাহা অতি সঙ্গত—'pretending to have suffered impriso ment ; কেবল to have previously suffered বলিলে সমঞ্জস হইত। 'পূর্ব্বে অবরুদ্ধ হইয়াছিল'—এইরূপ ভাণকারী। বস্তুতঃই পূর্ব্বে অবরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে ত আর রাজার চর হইয়া অমাত্যগ শুচিতা পরীক্ষায় সাহায্য করিতে পারে না। রাজার নিযুক্ত চর ছা ছদ্মবেশে প্রত্যেক অমাত্যের নিকট যাইয়া বলিবে—'এই রাজা দুষ্কর্ম্মান্বিত ; আমাকেও পূর্ব্বে অবরুদ্ধ করিয়াছিল—আসুন সকলে মিলি ইহার বধসাধন করি—সকলেরই মত আছে—কেবল আপনার মত কি বলুন'। অসৎপ্রবৃত্ত (মূল)—অসৎপথে প্রবৃত্ত, অশোভন কর্ম্মে প্রবৃ (গঃ শাঃ) ; betaken himself to an unwise course (SH) evil course বলাই উচিত ছিল। রাজকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইবার ভ বশতঃ এই প্রকার প্রলোভনে স্বীকৃত হওয়ার সম্ভাবনা। ভয়প্রদ দ্বারা এইরূপ ছলনা ; তাই ইহার নাম—'ভয়োপধা'।

মূল :—এই (সকলের) মধ্যে ধর্ম্মোপধা-শুদ্ধ (অমাত্যগণকে ধর্ম্মস্থীয় কণ্টকশোধনাদি (কর্ম্মসমূহে) স্থাপিত করিবেন অর্থোপধাশুদ্ধগণকে সমাহর্ত্তা সন্নিধাতা প্রভৃতির (কর্ম্মসমূহে স্থাপিত করিবেন)। কামোপধাশুদ্ধগণকে বাহ্য ও আভ্যন্তর বিহার রক্ষা কার্য্যে (নিযুক্ত করিবেন। ভয়োপধাশুদ্ধগণকে রাজা কর্ম্মসমূহে (নিযুক্ত করিবেন)। সর্ব্বোপধাশুদ্ধগণকে মন্ত্রী করিবে (আর) সকল বিষয়ে অশুচিগণকে খনি দ্রব্য হস্তি-বন-কর্ম্মান্ত নিযুক্ত করিবেন।

সঙ্কেত :—ধর্ম্মস্থীয় কণ্টকশোধন—তৃতীয় ও চতুর্থ অধিকরণ দ্রষ্টব্য

ধর্ম্মস্থীয়—দাওয়ানী আদালতের কার্য্য (civil court) ; কণ্টকশোধন —ফৌজদারী আদালতের ব্যাপার (criminal court)। সমাহর্ত্তা— রাজস্ব-সংগ্রহ-কর্ত্তা (revenue collector)। সন্নিধাতা—ধনরক্ষক ; শ্যামশাস্ত্রী ইংরাজী দিয়াছেন—chamberlain ; Lord Chancellor of the Exchequor বলা ভাল। বিহাররক্ষা—গঃ শাঃর মতে "বিহার' অর্থে বিহার-সাধনভূতা রাজান্তঃপুরনারীবর্গ ; তাঁহাদিগের রক্ষা। শ্যাম-শাস্ত্রী 'বিহার' অর্থে—বিহার-স্থান (pleasure-grounds) বুঝিয়াছেন। যে কোন একটি অর্থ লইলেই অপরটি আপনি আসে—বাদ দেওয়া যায় না। বাহ্য বিহার—কেবল ভোগিনী নারীগণ ; আভ্যন্তর বিহার—দেবী (অভিষিক্তা মহিষী)গণ—(গঃ শাঃ) ; pleasuregrounds, both external and internal (SH)। আসন্ন কার্য্য—রাজার শরীর রক্ষাদি, যাহাতে ভয়-জয়ের প্রয়োজন (গঃ শাঃ) ; immediate service (SH) সর্ব্বোপধাশুদ্ধ—ধর্ম্ম অর্থ-কাম-ভয়-চতুর্ব্বিধ প্রলোভনে অপ্রলুব্ধ শুদ্ধচিত্ত। ঈদৃশ ব্যক্তি 'মন্ত্রী' হইবার উপযুক্ত। আর এক একটি মাত্র উপধাশুদ্ধ 'অমাত্য' পদের যোগ্য। মন্ত্রী ও অমাত্যে ভেদ ইহাই। আর যাঁহারা চারিটির কোন একটিও প্রলোভন জয় করিতে পারেন নাই, খনি প্রভৃতির কার্য্যে তাঁহাদিগের উপযোগ কর্ত্তব্য। শ্যামশাস্ত্রী বলিয়াছেন যাঁহারা এক বা সব কয়টি প্রলোভনে অশুদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছেন (who are proved impure under one or all of these allurements)—এ অর্থ কোথা হইতে আসিল ? মূলে আছে 'সর্ব্বত্রাশুচীন্'—অর্থ সুস্পষ্ট। খনি—mine, দ্রব্য—গঃ শাঃ ; 'বন' শব্দটির সহিত যোগ দিয়াছেন 'দ্রব্যবন"—দারুযোগ্য বৃক্ষবহুল বন ; timber (SH)। হস্তী—গঃ শাঃর ব্যাখ্যায় গজ-বন—'বন' শব্দের সহিত এস্থলেও যোগ—গজবহুল অরণ্য। শ্যামশাস্ত্রী 'বন' শব্দ পৃথক্ ধরিয়াছেন। কর্ম্মান্ত—manufactories (SH) ; গঃ শাঃর মতে— খনি—দ্রব্যবন-গজবন—এতৎ সম্বন্ধীয় কর্ম্মান্ত অর্থাৎ ব্যাপারস্থানে— শরীরের আয়াসজ কর্ম্মস্থানসমূহে অশুদ্ধ অমাত্যগণের নিয়োগ কর্ত্তব্য।

মূল :—ত্রিবর্গ ভয় সংশুদ্ধ অমাত্যবর্গকে যথাশৌচ নিজ নিজ কর্ম্মসমূহে অধিকারী করিবেন—ইহাই আচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত।

সঙ্কেত :—ত্রিবর্গ—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম (মনু ২।২২৪ দ্রষ্টব্য) ত্রিবর্গ— ভয়-সংশুদ্ধ—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-ভয়—এই চতুর্ব্বিধ উপধা-শুদ্ধ। যথাশৌচ— যিনি যে বিষয়ে শুদ্ধ—তৎ তৎ শুদ্ধির অনুকূলভাবে। অধিকারী করিবেন—অর্থাৎ রাজা নিযুক্ত করিবেন। এইরূপে আচার্য্যগণ ব্যবস্থিত —ইহাই আচার্য্যগণের ব্যবস্থা।

মূল :—অমাত্যগণের শুচিতা (পরীক্ষার) নিমিত্ত রাজা আপনাকে অথবা দেবীকে লক্ষ্য (স্থানীয়) করিবেন না—ইহাই কৌটিল্য দর্শন।

সঙ্কেত :—অমাত্যের শুদ্ধি-পরীক্ষার্থ রাজা নিজেকে অথবা তাঁহার মহিষীকে লক্ষ্য (বা বিষয়) কদাপি করিবেন না—ইহাই কৌটিল্যের অভিমত। ঈশ্বরঃ (মূল)—রাজা। দেবী—মূর্দ্ধাভিষিক্তা মহিষী, পাটরাণী। লক্ষ—লক্ষ্য—উপলক্ষ, নিমিত্ত ; butt, object (SH)। শ্যামশাস্ত্রীর মুদ্রিত মূলে আছে—'লক্ষ্মীশ্বরঃ'—উহা নিশ্চিত মুদ্রাকর-প্রমাদ—'লক্ষমীশ্বরঃ' (গঃ শাঃ)—যথার্থ পাঠ—শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদে 'laksham' আছে।

মূল :—বিষ দ্বারা জলের (দূষণের) ন্যায় অদুষ্টের দূষণ করিবেন না ; যেহেতু কদাচিৎ প্রকৃষ্টরূপে দুষ্ট হইলে তাহার ঔষধ পাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

সঙ্কেত :—স্বভাবতঃ দোষশূন্য যে অমাত্য—উপধা-প্রয়োগ-দ্বারা তাঁহার প্রলোভন অকর্ত্তব্য ; তিনি প্রলোভন জয় করিতে সমর্থ হইলেও প্রলোভন দেখান উচিত নয় ;—এ প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে—স্বভাবতঃ নির্ম্মল জীবন-হেতু যে জল, নিশ্চিত-মৃত্যুকারণ বিষ-দ্বারা তাহার দূষণ অনুচিত। অতঃপর কারণ প্রদর্শিত হইতেছে—স্বভাবতঃ অদুষ্ট হইলেও ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় যদি অমাত্য প্রলোভিত হইয়া দোষযুক্ত হন, তখন আর তাহার প্রতীকারের কোন সম্ভাবনা থাকে না- তিনি তখন অনর্থ-কারণ হইয়া দাঁড়ান। কদাচিৎ—প্রদুষ্টের সহিত অন্বয় (গঃ শাঃ) ; পাইবার সম্ভাবনা নাই (নাধিগম্যেত)—ইহার সহিত অন্বয় (শ্যাম)।

মূল :—সত্ত্ববান্ (অমাত্যগণের) বুদ্ধি (স্বভাবতঃ) ধৃতিতে অবস্থিত (হইলেও) উপধাসকল দ্বারা চতুর্ব্বিধ (উপায়ে) (একবার) কলুষীকৃতা হইলে অন্ত পর্য্যন্ত গমন না করিয়া নিবৃত্ত হয় না।

সঙ্কেত :—May not, when once vitiated and repelled under the four kinds of allurements, return to and recover its original form—শ্যামশাস্ত্রীর এ অনুবাদ নিতান্তই উচ্ছৃঙ্খল। সত্ত্ব—প্রকাশময়ী বুদ্ধিবৃত্তি। সত্ত্ববান্—প্রজ্ঞাবান্। ধৃতিতে অবস্থিত—ধৃতি-ধৈর্য্য—প্রলোভন উপেক্ষার উপযোগী ধৈর্য্য। ধৃতিতে অবস্থিত অর্থাৎ ধৃতি (ধৈর্য্য) যুক্ত। অন্ত পর্য্যন্ত না যাইয়া—নিজের অভিপ্রেত বিষয়-সিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত (গঃ শাঃ) ; বাঙ্গালায় যাহাকে বলে—'ডুবেছি না ডুব্‌তে আছি—এখন এর শেষ না দেখে ফিরছি নি'— পাপ একবার করিতে আরম্ভ করিলে কত নিম্নস্তরে পৌছান যায়, তাহা দেখিবার উৎকট স্পৃহা পাপীর মনে জন্মে—ইহাই তাহার তৎকালীন মনোবৃত্তি। অতএব অদুষ্টকে দূষিত করা অনুচিত। একবার দূষিত হইলে তাহার অসাধ্য আর কিছুই থাকে না—ইহাই তাৎপর্য্য।

মূল :—সেই হেতু চতুর্ব্বিধ চার্য্যে বাহ্য অধিষ্ঠান (স্থাপন) করিয়া রাজা সত্রিগণ দ্বারা অমাত্যগণের শৌচাশৌচ পরীক্ষা করিবেন।

সঙ্কেত :—চার্য্যে—উপধাপ্রয়োগে। বাহ্য—রাজা ও রাণী ছাড়া

অন্ত বহিরঙ্গ লক্ষ্য। অধিষ্ঠান—লক্ষ্য, উপলক্ষ, নিমিত্ত, butt (SH)। মার্গেত (মূল)—'মার্গ' ধাতুর অর্থ প্রার্থনা, যাচ্ঞা করা। এস্থলে অর্থ—পরীক্ষা করা, জানিতে ইচ্ছা করা—shall find out (SH)।

রাজা নিজেকে বা মহিষীকে এইরূপ পরীক্ষা-বিষয়ে উপলক্ষ করিবেন না। কে জানে? মানুষের মন না মতি!—বুঝা কঠিন। অতি বিশ্বাসী অমাত্যও যদি হঠাৎ প্রলোভনে পড়িয়া যান, তাহা হইলে তখন রাজার জীবন অথবা রাণীর চরিত্র রক্ষা করাও কঠিন হইতে পারে। এই কারণে কৌটিল্যের সিদ্ধান্ত—অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ষড়্য
প্রলোভন, অথবা অন্য কোন নারীর প্রলোভন দেখান উচিত। ইহ
রাজার আত্মরক্ষা, অন্তঃপুর-রক্ষা ও অমাত্যের শুচিতা-পরীক্ষা—
একযোগে হইতে পারে।

॥ ইতি শ্রীকৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বিনয়াধিকারিক-নামক প্রথম অধিকর
'উপধা-দ্বারা অমাত্যগণের শৌচাশৌচ-পরিজ্ঞান'-শীর্ষক
দশম অধ্যায় (ষষ্ঠ প্রকরণ) ॥

স্বাধীনতার নবজন্ম—ইন্দোচীন

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

ইন্দোচীনে ফরাসীদের শাসন পরিকল্পনা বেশ খানিকটা জটিল। কোচিন-চীনকে প্রত্যক্ষভাবে ফরাসী-শাসিত উপনিবেশে পরিণত করা হয়; জনৈক ফরাসী গভর্ণর এখানকার শাসনকার্য্য পরিচালনা করতে লাগলেন। আনাম ও কাম্বোডিয়াকে ফরাসী আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করা হল। এই উভয় স্থানেই নামে একজন ক'রে রাজা রইলেন বটে, কিন্তু ফরাসী রেসিডেন্টই হলেন সর্ব্বেসর্ব্বা। টনকিং ও লাওসকে ফরাসী রেসিডেন্টের শাসনাধীন করা হ'ল। সমগ্র ইন্দোচীনের শাসনকার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য একজন গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হলেন। তাঁকে সাহায্য করবার জন্য একটী পরিষদ গঠিত হল। গভর্ণর জেনারেল হলেন এর সভাপতি এবং সেনা ও নৌ-বিভাগের সেনাধ্যক্ষদ্বয়, ইন্দোচীনের সেক্রেটারী জেনারেল, কোচিন-চীনের গভর্ণর, আনাম, কাম্বোডিয়া, টনকিং ও লাওসের রেসিডেন্ট চতুষ্টয় এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্ত্তারা হলেন এর সদস্য। কোচিন-চীন উপনিবেশ বলে ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদে এখানকার ফরাসীরা একজন ডেপুটী নির্ব্বাচন করে পাঠাতেন। ২৪ জন সদস্য দ্বারা গঠিত এক পরিষদও স্থাপিত হয়। এই পরিষদে ইন্দোচীনের ব্যবসায়ী, জমিদার প্রভৃতি ১০ জন প্রতিনিধির আসনের ব্যবস্থা করা হয়।

ইন্দোচীনে কোন দায়িত্বশীল গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয় নি। স্বেচ্ছাচারমূলক ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাই এখানে প্রচলিত হয় এবং দেশে যাতে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হতে না পারে তৎপ্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক কুশাসনের চরম দৃষ্টান্তস্থল ইন্দোচীন। দেশবাসীদের রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেই শাসনকর্ত্তারা সন্তুষ্ট ছিলেন না, ফরাসী বণিকদের স্বার্থের খাতিরে দেশবাসীদের বৈষয়িক উন্নয়নের সমস্ত দ্বারও রুদ্ধ করা হয়। ইন্দোচীনের অধিবাসীরা যাতে কৃষি ছাড়া অন্য কোন প্রচেষ্টায় লিপ্ত না হয় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা তার প্রতিই নজর দিলেন। এতে ফ্রান্সের পক্ষে কৃষিজাত পণ্য ও কাঁচামাল প্রাপ্তির ব্যবস্থা হয়। ইন্দোচীনের রপ্তানীযোগ্য মালপত্রের অধিকাংশই—চাল, ভুট্টা, রবার ও কয়লা—ফ্রা
যেতে লাগল। তখন ফরাসী গভর্ণমেন্ট কৌশলে শুল্কের হার এ
ভাবে বেঁধে দিলেন যে ইন্দোচীনের পক্ষে অন্য কোন দেশের সঙ্গে বৃহ
বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠে। ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত শিল্পোন্নয়
কোন প্রশ্নই উঠে নি। ১৯৩৮ সালে কেবল দেশ রক্ষার খাতি
শিল্প উন্নয়নের কথা উঠে। শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন বা কলকারখানা স্থ
করলে পাছে লভ্যাংশের হ্রাস পায় সেই ভয়ে ফরাসীরা ইন্দো
শিল্পোন্নয়নের বিরোধিতাই করে আসছিলেন। ফরাসীরাই ইন্দোচী
বাজার একচেটে করে রাখে এবং ইন্দোচীনের আমদানী বাণি
অর্দ্ধেক পণ্য ফ্রান্স থেকেই সরবরাহ হয়। এইভাবে ফরাসী শ
ইন্দোচীনের বৈষয়িক উন্নতির পথ বন্ধ করে রাখে।

ইন্দোচীনরা উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের নিকট দেশকে বি
করলেও ইন্দোচীনবাসীদের স্বাধীনতা লাভের অত্যুগ্র কামনাকে
ফেলতে পারেন নি। ১৮৬২ সালেই বিপ্লবের বহ্নিশিখা দেখা দেয়
সে আগুন আজও নেভেনি। ফরাসীদের দমন ও তোষণনীতি এইরূ
সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। ফরাসী শাসনের নাগপাশ ছিন্ন করবার
এই বহ্নি নির্ব্বাপিত হবে, তৎপূর্ব্বে নয়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইন্দো
দীর্ঘকাল অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। বহু আকারে এই সং
আত্মপ্রকাশ করেছে। মাঝে মাঝে এই সংগ্রামের তীব্রতার অ
পরিলক্ষিত হলেও কখনই সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হয়নি। ১৮৮৫ স
এক চুক্তির সর্ত্তবলে আনাম ফ্রান্সের হাতে যায়। সেই বৎসরেই আনাম
বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং হিউয়ের সেনানিবাসে অতর্কিত আক্র
চালায়। ফরাসীদের তাঁবেদার আনামরাজ পলায়ন করেন। ১৮৮৬ স
উত্তর আনামে ফান-দিন-ফুইং এবং টন্‌কিংয়ের ব-দ্বীপ অঞ্চলে গুয়ে
থিয়েন-থুয়াট নামক দুই দেশপ্রেমিক বীরের নেতৃত্বে আনামীরা ফরাসীদে
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইন্দোচী

স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। প্রায় কুড়ি বৎসর যাবৎ টনকিংয়ের অভ্যন্তরে হোয়াংহোয়াথাম ফরাসী সৈন্যদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালান এবং তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে ফরাসীরা জয়লাভে সমর্থ হয় '৩০। ১৯০৭ সালে সমগ্র এসিয়ায় নূতন করে গণজাগরণ দেখা দেয়। ভারতে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোচীনে জিজিয়া-করের বিরুদ্ধে এক গণআন্দোলন সুরু হয়। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই ইন্দোচীনের জাতীয় আন্দোলনের অভ্যুদয় হয়। এই সময় সংস্কৃতির দিক থেকেও ইন্দোচীনে এক আন্দোলন আরম্ভ হয়।

১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাসমরের আমলে ফরাসী শাসনের উচ্ছেদ-কল্পে পর পর কয়েকটা বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র চলে এবং রাজনৈতিক দলগুলি দানা বাঁধিতে থাকে। রাজন্যবর্গও এই আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১৬ সালের ষড়যন্ত্রের নেতা ছিলেন প্রিন্স দুই-থান। ফরাসীরা কঠোর হস্তে এই সকল বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র দমন করে। ফরাসী শাসকগণ শাসন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু বৃটীশের মতই তারাও এই সকল প্রতিশ্রুতির কোন মূল্যই রাখেন নি। ইতিমধ্যে ইন্দোচীনের জাতীয় আন্দোলনেও একটা আমূল পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। প্রাচীনদের হাত থেকে নেতৃত্ব আসে নবীনদের হাতে। পাশ্চাত্য মনোভাবসম্পন্ন এই সকল নবীন নেতা পৃথিবীর সঙ্গে তাল রেখে চলার নীতি গ্রহণ করেন। একটী 'নবীন আনামী দল' ও 'বিপ্লবী আনামী যুবসঙ্ঘ' গঠিত হয়। উদার দৃষ্টি-সম্পন্ন এই সকল রাজনৈতিক নেতা প্রাচ্যের অন্যান্য জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ-স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। ফলে ইন্দোচীন, দক্ষিণচীন ও ইন্দোনেশিয়ার বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। ভারতের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের বাণী বিনিময় হয় এবং ১৯২৭ সালে ইন্দোচীনের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ডুংং-ভ্যান-গিউ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহযোগিতায় নিপীড়িত জাতিবর্গের লীগ সংগঠন করেন। ডুয়ং ১৯২৯ সালে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে যোগদান করেন।

১৯৩০ সালে ইন্দোচীনে কম্যুনিষ্ট পার্টির পত্তন হয়। ১৯৩০-৩৪ পর্য্যন্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির পরিচালনায় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কিষাণদের এক বিরাট বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ফরাসীরা এর প্রতিবিধানে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের অবতারণা করে। ১৯৩৪-৩৫ সালে ফ্রান্সে পপুলার ফ্রন্ট গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইন্দোচীনে খানিকটা স্বাধীনতা দেওয়া হয়। রাজনৈতিক আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ান গঠন, সংবাদপত্র প্রকাশ আইনতঃ সিদ্ধ করা হয়। এককালীন বিদ্রোহীরা ইন্দোচীন শাসন পরিষদ ও হ্যানয়ের মিউনিসিপাল কাউন্সিলে স্থান লাভ করলেন। কিন্তু ফ্রান্সে পপুলার ফ্রন্ট গভর্ণমেণ্টের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আবার এই সকল সুবিধা প্রত্যাহৃত হয়।

১৯৪০ সালে ইন্দোচীন জাপানের করায়ত্ত হয় এবং ইন্দোচীনের স্বাধীনতা আন্দোলনের নূতন পর্য্যায় আরম্ভ হয়। আনামীরা ফরাসীদের পরিবর্ত্তে জাপানীদের অধিকার স্বীকার করে নেবার পক্ষপাতী নয়। তারা নিজেদের হাতে নিজেদের ভাগ্য রচনার ভার গ্রহণে সমুৎসুক। তাই ইন্দোচীনে জাপ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর গেরিলা তৎপরতা দেখা দেয় এবং দুবার বিদ্রোহ ঘটে। ১৯৪১ সালে ইন্দোচীনের সবগুলি দল মিলে স্বাধীনতা লীগের পত্তন করে। ১৯৪৪ সালে লীগ গণপরিষদ গঠন ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করে এবং সমগ্র জনসাধারণকে গেরিলা বাহিনীতে যোগদানের আহ্বান জানায়। স্বাধীনতা লীগের মূলঘাঁটী আনাম ও টনকিং, তবে কোচিন চীন সমেত সমস্ত ইন্দোচীনেই লীগের যথেষ্ট প্রতিপত্তি হয়।

১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় জাপ সামরিক শক্তির অবসান ঘটায় ইন্দোচীন দীর্ঘ ৮৩ বৎসরের সংগ্রামে যে সুযোগ পায় নি আজ সেই সুযোগ দেখা দিয়েছে এবং তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্যও আনামীরা প্রস্তুত। জাপানী শক্তির উচ্ছেদের পর তারা ফরাসী শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখতে চায় না। তারা ফরাসী উপনিবেশের অবসান এবং দেশের সমস্ত ব্যাপারে পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আনামীরা সাইগনে এক স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করেছে এবং আনামের শক্তিহীন রাজা সিংহাসন ত্যাগ করেছে। আনামীদের জনপ্রিয় দল ভিয়েটমিন এই গভর্ণমেণ্টের সমর্থক। টনকিংয়ের প্রধান দুই দলের মধ্যে যে মতবিরোধ ছিল তারও অবসান হয়েছে। অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী হো-চি-মিন ও ভিয়েটমিন দলের নেতা গুয়েন হাইথানের মধ্যে আপোষ হয়েছে। কারণ উভয়েরই লক্ষ্য ফরাসী শোষণের অবসান।

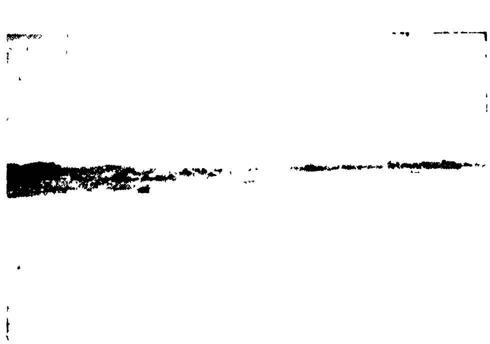
দুঃখের বিষয় সদ্য নাৎসীকবলমুক্ত ফ্রান্স নিজ তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ইন্দোচীনে প্রভুত্বের অবসান করতে চায় না। ফ্রান্সের বর্ত্তমান কর্ণধার দ্য গলে ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত হন নি যে ইন্দোচীনে ফরাসী শাসন অক্ষুণ্ণ রাখতে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টায় তিনি বিরত হবেন না। আজ তাই ইন্দোচীনে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষায় অপূর্ব্ব শক্তি সম্মিলন দেখা যায়—বৃটীশ, ফরাসী ও জাপানী সৈন্য আনামীদের বিরুদ্ধে পাশাপাশি যুদ্ধ করছে। বিপদ-কালে এমি আশ্চর্য্য সমন্বয় ঘটে থাকে। এর থেকেই বেশ বোঝা যায় যে ইন্দোচীনে সাম্রাজ্যবাদের আয়ু শেষ হয়েছে।



সুন্দরবনের নদীপথে

কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এম্‌-এ

সমুদ্র আর পাহাড়। দুয়ের মধ্যে কোনটার সৌন্দর্য মানুষকে বেশী টানে জানি না। দুয়েরই রহস্যের অন্ত নেই, অসীম মায়ায় দুই-ই হাতছানি দিয়ে ডাকে। সমুদ্রের ধারে সকাল হতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হতে সকাল বসে থাকলেও তার রূপের অন্ত পাওয়া যায় না। ক্ষণে ক্ষণে রং বদলাচ্ছে, চেহারা বদলাচ্ছে, জোয়ার ভাটার খেলা চলছে। তেমনি পাহাড়ের রহস্যের অন্ত নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যে কাঞ্চনজংঘার রূপ বদলানো দেখুন—সকাল হবার ঠিক আগেটাতে কাঞ্চনজংঘা ফ্যাকাশে শাদা হয়ে উঠল, দেখতে দেখতে তার চেহারা বদলে গেল, মনে হল যেন রক্ত ফেটে পড়ছে, তারপর ক্রমশঃ ক্রমশঃ সোনালি কমলা রঙ্ হয়ে শেষকালে উজ্জ্বল শাদায় ঝক্‌ঝক করতে লাগল। তেমনি, বিকালবেলায় কাঞ্চনজংঘার চূড়ায় রঙের মূর্চ্ছনাটুকু ধীরে ধীরে লক্ষ্য করুন—সূর্য তার গায়ে কত রং ফলিয়ে তোলে, তারপর যখন সমস্ত পাহাড়ে গম্ভীর ছায়া নেমে আসে তখনও



পদ্মার দৃশ্য

রংটুকু ওখানে লেগে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক মুহূর্তে মিলিয়ে যায়, সমস্ত উপত্যকাময় নেমে আসে অন্ধকার। এই দুই অজানার টানে মানুষ পাড়ি দিয়েছে, গিয়েছে সাতসমুদ্র পারে, চড়েছে দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায়। সাগরের ঢেউ আর পৃথিবীর ঢেউ—এর মধ্যে কার মায়া বেশী তা স্থির করা সম্ভব নয়।

সম্প্রতি যখন কয়েকদিনের জন্য ছোটনাগপুরে গিয়েছিলুম তখন নগাধিরাজের মহিমার সঙ্গে পরিচয় হোলো না বটে, কিন্তু তবু পৃথিবীর ঢেউ এর সঙ্গে আবার খানিকটা পরিচয় হোলো। ওখানের পাহাড় বড় নয়, কিন্তু বড় না হওয়াতেই তার সৌন্দর্য। যেন ঘরোয়া। ভীষণ নয়, দেখে স্তম্ভিত হতে হয় না। মনে মনে আলাপ করা চলে। গভীর জঙ্গল নয়, ছোট বড় মাঝারি শালবন, তলাটি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ছোটো ছোটো নদী—এমন কি দামোদরও সেখানে বালির উপর দিয়ে ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে। সেখান থেকে ফিরে স্বতঃই সমুদ্রের কথা ভাবা চলে না। সাগরের সঙ্গে তুলনা হয় একমাত্র হিমালয়েরই। মন চাইছিলো খুব একটা ঘরোয়া নদীপথে যেতে, যার বিস্তার সাগরের মত নয়, অনেকটা ঘরোয়া, যার সঙ্গে মনে মনে সমসপ্তকে সুর মেলানো যায়, মুদারা-তারায় নয়।

এ হেন সময়ে শোনা গেলো, সুন্দরবন ডেসপাচ সার্ভিস আবার চলছে। এর চেয়ে সুখবর আর কি হতে পারে? শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত বাঙালী পাঠকদের সঙ্গে এই নদীপথের পরিচয় ঘটানোর পর হতেই এই নদীপথের সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপ করবার দারুণ ইচ্ছা ছিলো। তার উপর খবর পাওয়া গেলো যুদ্ধকালীন প্রতিবন্ধক দূর হওয়ায় এই ডেসপ্যাচ সার্ভিস আবার পুরোণো কালের মতই চলতে শুরু হয়েছে। কেবল খাবার জিনিষ এবং রান্নার ব্যবস্থা যাত্রীদের নিজেদের করতে হয়। এর চেয়ে ঘরোয়া নদীপথ আর কি হতে পারে। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা হতেই বাংলা দেশের উদ্ভব, আদিম অরণ্য আজও নিবিড় শ্যামল স্নেহে তাকে আঁকড়ে ধরে আছে, পুষ্ট করেছে তার প্রাণশক্তি—এর চেয়ে ঘরোয়া কথা বাঙালীর পক্ষে সত্যিই কিছু নেই। অতএব স্থির করা গেলো কলকাতা হতে সুন্দরবন হয়ে গোয়ালন্দ পর্যন্ত গঙ্গা, সুন্দরবন ও পদ্মার বিচিত্র আস্বাদ নিয়ে আসা যাক্।

হাওড়া পুলের তলায় জগন্নাথঘাট থেকে ডেসপাচের ষ্টীমার ছাড়ে। আমাদের জাহাজের নাম কোহিস্থানী। নামের অর্থ বোঝা গেল না। শুক্রবার সকাল ন'টায় জাহাজ ছাড়ার কথা। সেই অনুসারে ঠিকঠাক হয়েছে, এমন সময় খবর পাওয়া গেল জাহাজ ছাড়বে বৃহস্পতিবার রাত্রে। সুতরাং সন্ধ্যাবেলায় জাহাজে চড়লেই চলবে। সন্ধ্যাবেলায় জাহাজে এসে শোনা গেল, সময় আবার বদলেছে—পরের দিন দশটা নাগাৎ ছাড়ার সম্ভাবনা। সমস্ত রাত্রি অকারণে জগন্নাথঘাটে থাকা নিরর্থক ভেবে বাড়ী যাওয়া গেল, বাড়ীর লোকেরা তো অবাক! পরের দিন আবার খবর মিললো যে ষ্টীমার ছাড়তে সন্ধ্যা সাতটা—অতএব তাড়াতাড়ি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যথারীতি সময় আবার বদলালো। তাড়াতাড়ি করে জাহাজে উঠলাম শুক্রবারই তিনটার সময়, সাড়ে তিনটায় সময়

জাহাজ ছেড়ে দিল। ভাবলাম, এইবার যা হোক্ যাত্রা শুরু হল। কিন্তু তখনও এই নদীপথের সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় হয় নি। জাহাজ ঘাট ছেড়ে মধ্য গঙ্গায় গিয়ে ভালভাবে নোঙর করল। কি [illegible]? ভাটার জল আরও না কমলে হাওড়াপুলের তলা দিয়ে [illegible] না। সন্ধ্যার মুখে হাওড়া পুলের তলা দিয়ে ধীরে ধীরে পার হয়ে আমরা দক্ষিণের দিকে এগোতে লাগলাম। নতুন কাস্টমস্ হাউস্, হাইকোর্ট, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, খিদিরপুর পার হয়ে জাহাজ বোট্যানিকেল গার্ডেনের সামনে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল দুখানি ফ্ল্যাট নেবার জন্ম। হিরনোদা এবং জাঙ্গিরা নামে দুখানি ফ্ল্যাট বাঁধা হয়েছে। কিন্তু তারপরে জাহাজ চলবার কোনই লক্ষণ নাই। অবশেষে শোনা গেল, আজ রাত্রে জাহাজ আর চলবে না, কাল ভোরে প্রকৃতই রওনা। বৃহস্পতিবার থেকে টানাপড়েন করে শনিবার ভোর না হলে আসল যাত্রা শুরু হবে না।

কি করা যায়। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার চেষ্টায় যদি বা হাওড়া পুল থেকে বোটানিকেল গার্ডেন পর্যন্ত আসা গেল সেখানেই আবার বারো ঘণ্টা পড়ে থাকতে হবে শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। নিরুপায়। অগত্যা বসে বসে গঙ্গার শোভা নিরীক্ষণরূপ বাধ্যতা-মূলক কর্তব্য পালন ছাড়া অন্য কিছু করবার রইলো না। কিন্তু যা [illegible] বাধ্যতামূলক কর্তব্য, কিছুক্ষণ বাদেই তা হয়ে উঠল আনন্দের উৎস। গঙ্গার এত কাছে থেকেও গঙ্গার বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় আমাদের কিছুই নেই। একটা বয়ায় আমাদের জাহাজ বাঁধা ছিল, উত্তরমুখে। ভাটার জল কলকল শব্দ করতে করতে নেমে চলেছে, হড়হড় করে ষ্টীমারের গায়ে আওয়াজ করছে, বয়াটা ঘুরছে. শেকলে টান পড়ে আওয়াজ হচ্ছে, মনে হচ্ছে জলের সঙ্গে তার টানাটানি। কিন্তু ক্রমে জোয়ার এলো, সমস্ত গঙ্গার জল স্থির হয়ে দাঁড়াল. কেমন একটা থমথমে ভাব! এমন সময় একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। ফ্ল্যাটসমেত গোটা জাহাজ সেই জলের চাপে নিঃশব্দে বয়াকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ বৃত্ত অঙ্কন করে ঘুরে দাঁড়াল দক্ষিণমুখে। সামনে খিদিরপুর ডকের অজস্র রকমারি আলো। লালচে শাদা. মার্কারি বাষ্পভরা নীলচে শাদা, তাছাড়া লাল সবুজ রকমারি আলো। তার দীর্ঘ প্রতিফলন হয়েছে জোয়ারের টলমল জলে, হাজার ছোট ছোট ঢেউয়ে সেই প্রতিফলনের শিখা কেঁপে উঠছে, ভেঙে যাচ্ছে—অপরূপ পিকাসোর ছবি। জলে যে বিপুল আবেগ ধীরে ধীরে নিঃশব্দে সঞ্চারিত হোলো জাহাজ যেন তার সাড়া পেয়েছে। জোয়ারের জলে আওয়াজ নেই। রাত্রে শুয়ে শুয়ে শুনছি, আবার যখন ভাটা এলো, জলের আওয়াজ বদল হোলো, আবার সেই একটানা হড়হড় শব্দ।

সন্ধ্যাবেলায় আমাদের সারেং এলো। নাম মদন মিয়া, বাড়ী মুন্সীগঞ্জ। পঁয়ত্রিশ বছর এই কোম্পানীতে কাজ করছে সে। বললে, আজ রাত্রি এখানেই নোঙর করে থাকবে, ভোরবেলায় খোদাতালার লীলা হলেই জাহাজ ছেড়ে দেবে সে। তাহলে কাল সন্ধ্যা নাগাৎ নামকানা পৌছান যেতে পারবে, সেখান থেকে সুন্দরবন আরম্ভ।

শনিবার।

ভোর পাঁচটা। ডেকে আসো জ্বলছে। সামনে দাঁড়িয়েছি, দেখি বয়া থেকে শিকল খোলা হচ্ছে। দুটী লোক, চিকণ কালো সবল বলিষ্ঠ পাথরে-কোঁদা চেহারা, বয়ার উপর লাফিয়ে পড়ে চেপে ধরল শিকলটাকে। মোটা লোহার খিল খুলে এলো, উন্মত্ত বেগে বয়াটা ঘুরে গেল, ষ্টীমারে ধাক্কা লাগে লাগে। মধ্যে লোক দুটী, ধাক্কা লাগলে পিষে যাবে। তেতলা হতে ঠিক সেই সময়ে সারেং হাঁকল হুঁশিয়ার, লোকদুটী লাফিয়ে পড়ল ষ্টীমারে। ছোট ঘটনা, কিন্তু রোমাঞ্চকর।



চরমুণ্ড

এইবার আমাদের প্রকৃত যাত্রা শুরু হল। ভাটার টানে এবং পুরো ষ্টীম দক্ষিণে চলেছি। ক্রমে ক্রমে পরিচিত এবং স্বল্প পরিচিত জিনিষ পিছনে সরে যেতে লাগল। বেলা আটটায় বজবজ পৌছলাম। বড় বড় পেট্রোল ট্যাঙ্ক, চমৎকার কোয়ার্টার্স—বজবজ চিনতে দেরী হয় না। সাড়ে আটটায় প্রেমচাঁদ জুট মিলস্ এর সীমানা ছাড়ানো গেল। কলকাতার গঙ্গা চারপাশের কলকারখানার চাপে মলিন; এখানে তার সে চেহারা নয়। সবুজ মাঠ, পাড় অনেক জায়গায় বাঁধান, মধ্যে মধ্যে বাড়ী—যেন সাজান বাগান। কোথাও কোথাও নৌকোর সার, ছোট ছোট ষ্টীমারগুলো ব্যস্ত ত্রস্ত হয়ে এদিক ওদিক যাতায়াত করছে। তার মধ্যে 'রাম' বলে একটা চেনা ষ্টীমার চোখে পড়ল, রাজগঞ্জ ফেরী সার্ভিসের ষ্টীমার। আমরা তাতে চড়ে একবার তক্তাঘাট থেকে রাজগঞ্জ অবধি গিয়েছিলুম। এবার আর ঐ ছোট ষ্টীমার নয়, আমাদের ষ্টীমারের বিপুল বপু

ফ্ল্যাট জুড়ে আরও বিরাট্ হয়েছে। একটা ছোটখাটো জাহাজের মতই চলেছি। এমন সময় আমাদের দর্পচূর্ণ হোলো। দেখা গেলো, পিছনে ছুটী বড় সমুদ্রগামী জাহাজ অত্যন্ত জোরে আসছে, দেখতে দেখতে আমাদের ছাড়িয়ে চলে গেল। সারেং-এর মুখে শোনা গেল, তবু তারা অর্দ্ধেক ষ্টীমে যাচ্ছে, সমুদ্রে পড়লে পুরো জোরে যাবে। যে জাহাজটা ওর মধ্যে বড় সেটার থেকে অনেক বস্তা আটা ও চিনাবাদাম ফেলে দিল, কাছের নৌকাগুলি আঁকশি দিয়ে টেনে তুলে নিলো। এর অর্থ কি বুঝলাম না।

সাড়ে দশটায় উলুবেড়ের কাছাকাছি এসে ছুটী কলকাতাগামী ডেসপাচের সঙ্গে দেখা হল, কাথিয়াবাড় ও মাদারা। কয়েকটা বড় জাহাজও কলকাতার দিকে গেল।

আরও ঘণ্টাখানেক চলবার পর দেখা গেল ডান দিক হতে একটা বেশ বড় নদীর মত স্রোত যেন গঙ্গায় মিশেছে। খালাসিদের জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে ওটা মেদিনীপুরের খাঁড়ি, ওদিকে ষ্টীমার চলে না। কিন্তু অত বড় জলস্রোত কি একটা খাঁড়ি? বিশ্বাস হয় না। অবশেষে খবর পাওয়া গেলো যে ওটা যে সে জলস্রোত নয়, দামোদর নদ। কোথায় রামগড়ের দামোদর, কোথায় এখানকার দামোদর। বিপুল জলরাশি গঙ্গায় ঢালছে। আরও কিছুক্ষণ চলার পর রূপনারায়ণের সঙ্গম পাওয়া গেল। বিরাট্ নদী। যেখানে মিশেছে সেখানে বহু বর্গমাইল অতল জল থই থই করছে। দুই চারটা নৌবহর দাঁড়াতে পারে, এত জায়গা। রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনীর বিখ্যাত কবিতা মনে পড়ল।

রূপনারাণের মুখে পড়ি বালুচর
সংকীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমর
জোয়ারের স্রোতে আর উত্তর সমীরে
* * * * *
কোথা তীর। চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্র নৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে।

সত্যি তাই! এখন ভরা গঙ্গা, বালুচরের কোনও চিহ্ন নেই। কিন্তু শীতকালেও এই বিরাট্ জলরাশি যে কোনও মুহূর্তেই উন্মাদ নৃত্যে করতালি দিয়ে উঠতে পারে, মনে হোলো—তীরের নাগাল পাওয়া আমাদের জাহাজেরই পক্ষে শক্ত হবে, নৌকার দূরের কথা। যেদিকে তাকাই শুধু জল, তীর চোখে পড়ে না। রূপনারায়ণ ও গঙ্গার সঙ্গমের ঠিক মুখে একখানি দোতলা বাড়ী, লাল টালির চিলেকোঠা—একটু দূরেই সারি সারি কয়েকটা টিনের ঘর, সম্ভবতঃ গ্রাম, দেখা গেল।

কলিকাতার তলায় গঙ্গার জল কার্ত্তিকের শেষেও লাল, তবে তাতে ঢেউ নেই—বাঁধা পাড়ের মধ্য দিয়ে বওয়ায় তার উদ্দামতা কিছু নেই। রাজগঞ্জের বাঁক ফিরতেই নদী চওড়া হতে শুরু হোল এবং জলের চেহারা বদলাতে আরম্ভ করল। জলের রং আরও লাল, ঢেউগুলি অপেক্ষাকৃত বড়। দামোদর সঙ্গম পার হয়ে গেল নদী কূলে কূলে ভরা, কিন্তু জলের রং হোল ঈষৎ ফিকে। রূপনারায়ণ পার হতে জলের রং হয়ে দাঁড়াল ফিকে গেরুয়া। চমৎকার নরম রং, কূলে কূলে ভরা অতল জল থই থই করছে, দূরে তটভূমি ছুটী নীল অর্দ্ধচন্দ্রের রেখার মত দেখা যাচ্ছে, দুএকটা পাল তোলা নৌকো ক্বচিৎ দেখা যাচ্ছে, বড় বড় জাহাজ যাওয়া আসা করছে।

বেলা একটা নাগাত ডায়মণ্ডহারবারের সীমানায় পৌছলাম। নদীর ধারে বাড়ীঘর, সেই ভাঙ্গা কেল্লা, তার শেষে লোহার টাওয়ার, বোধ হয় হাওয়া-আফিসের। ডায়মণ্ডহারবার ছাড়বার পরই আড়কাটী (Pilot) তুলে নেওয়া গেল। আড়কাটীর নাম মাণিক আলি, এইখানে জাহাজ পাইলট করবার ভার তার উপরে। তার নির্দ্দেশমত আমরা গঙ্গায় আরও কিছুদূর গিয়ে হুগলী পয়েন্ট পার হয়ে বড়তলা বলে একটা খালে পৌছলাম। এ জায়গাটাতে চড়া পড়ে যথেষ্ট, সেইজন্য পাইলটের হিসেব মত চলতে হয়। বড়তলায় নাকি বারটা নদী, অর্থাৎ খাল, এসে মিশেছে। বড়তলা ছাড়িয়েই আমরা বাঁয়ে চ্যানেল ক্রীক নামে একটি খাঁড়িতে এসে ঢুকলাম। খাঁড়িটী বেশ চওড়া, কিন্তু অগভীর। আমাদের সঙ্গের ছুটা ফ্ল্যাটের খালাসিরা জল মেপে মেপে চড়া আছে কিনা দেখতে লাগল এবং দরকার মত সুর করে ও ও ও ও বাম্ দিকে এ এ এ-এ নাই, ও ও ও ও ডান্ দিকে এ-এ এ এ নাই, হাঁকতে লাগল। চ্যানেল ক্রীকে একটু এগোনোর পর আরও একটা খাঁড়ি ডান দিকে বেরিয়েছে দেখা গেল। এ খাঁড়িটা নাকি সাগর দ্বীপের ওপাশ দিয়ে ঘুরে গেছে। আমরা চ্যানেল ক্রীক দিয়ে অগ্রসর হতে হতে বাঁয়ে কাকদ্বীপ ও ঘুঘুডাঙ্গা পেলাম, ডাইনে দূরে কচুবেড়ে ও সাগরথানা দেখা গেল; পাইলট সাগর মেলার স্থানও বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু দূরবীণের সাহায্যেও তা বোঝা গেল না। কাছেই অবশ্য কাঁকড়ামারীর চর বলে একটা চর পড়ল; বেশ জঙ্গল,—শোনা গেল হরিণ এবং বাঘ আছে। তার সামনেই একটা ফ্ল্যাটের ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে। বহু বছর আগে অ্যাণ্ড্ ইউল কোম্পানীর 'লণ্ডন' নামে একটা পাট-বোঝাই ফ্ল্যাটে আগুন লাগে, তাতে সেটা ডুবে যায়, আর তোলা যায় নি। এটা সেই নিমজ্জিত লণ্ডন।

কাঁকড়ামারীর চরের সামনে একটা সরু খাল এসে চ্যানেল ক্রীকে পড়েছে, সারেংরা তাকে বলে নামকানার খাল, স্থানীয় নাম

ইটিসী। জাহাজ চ্যানেল ক্রীক ছেড়ে বাঁয়ে এই খালের মধ্যে ঢুকল। জাহাজ গোটা খালটা জুড়ে চলেছে। নামকাণা একটা বড় গ্রাম, মেদিনীপুর থেকে চাষীরা এসে আবাদ করেছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরগুলি। নদীর ধারে ধারে কিছু কিছু ঝোপ থাকলেও ভেতরে দিগন্তব্যাপী ধানক্ষেত, তার মধ্যে মধ্যে খাঁড়ি আছে, দেখা যায় না। পাল তোলা নৌকাগুলি যায়, মনে হয় ধানক্ষেতের মধ্যে মধ্যে এক একটা পাল চলে আসছে, নৌকোও নজরে পড়ে না। নামকাণায় একটা ফরেষ্ট আফিস ও একটা টেলিগ্রাম আফিস আছে। আড়কাটী এখানে নেমে গেল, তাকে এই ষ্টীমার নির্ব্বিঘ্নে পার হওয়ার খবর টেলিগ্রাম করতে হবে কলকাতায় ষ্টীমার কোম্পানীর হেড আফিসে। তার মারফৎ বাড়ীতে টেলিগ্রামও পাঠান গেল।

নামকাণা পার হতে হতেই আগুনের পিণ্ডের মত সূর্য্য অস্ত গেল। কিছুদূর গিয়ে সন্ধ্যার আবছায়া হয়ে আসছে, এমন সময় নামকাণার খাল ছাড়িয়ে সপ্তমুখী নামে একটা চওড়া নদীতে পড়া গেল। অনেকগুলি কল্‌কাতাগামী ডেস্‌পাচ ষ্টীমার দাঁড়িয়ে আছে। আমরা সপ্তমুখী হয়ে আরও কিছুদূর এসে ঠিক সুন্দরবনের ভিতরে ঢুকব।

রাত্রির অন্ধকার নামবার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টীমারের সার্চলাইট জ্বলে উঠল। অন্ধকার রাত্রি, আকাশে অজস্র তারা, তার মধ্যে সার্চলাইটের আলোয় নদীর জল, দূরের তটভূমি, বাঁকের গাছপালা, কচিৎ দু একটা নৌকো হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠছে, আর লক্ষ লক্ষ পোকা আলোয় ঝলমল করতে করতে সার্চলাইটের দিকে ছুটে আসছে। প্রোপেলারের একটানা আওয়াজ, জলের এক সুরের আওয়াজ, আলো-আঁধারের লুকোচুরি, চারপাশের গম্ভীর নৈস্তব্ধ্য—সব মিলিয়ে যেন খাদে-চড়ায় মিশোনো একটা খণ্ডকাব্য।

সারারাত্রি ষ্টীমার চলবে।

রবিবার।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে জোর হাওয়ার আওয়াজ এবং জলের ঢেউ ভাঙার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আকাশে অল্প ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ,—অল্প-স্বল্প বিদ্যুৎও ছিল। জোর হাওয়া আর বিরুদ্ধ স্রোত মিলে বড় বড় ঢেউ হচ্ছিল। কাল রাত্রে বহু বড় বড় জলস্রোত পার হয়েছি। অন্ধকারে সার্চলাইট পড়ে, পাশে বনভূমির রেখা দেখা যায়, এক একটা সাদা-রং-করা টিনের চিহ্ন ভেসে ওঠে, সার্চলাইট তার উপর নিবদ্ধ থাকে, সেটা পার হয়ে আবার তটভূমির গাছের উপর সার্চলাইট বোলানো হয়—কোথায় টিন আটকানো আছে খুঁজবার জন্য। যেখানে সেখানে পাঁচ সাতটা বড় বড় জলস্রোত এসে মিশেছে—এ রকম পাঁচমাথা ছ'মাথার অন্ত নেই। অথচ প্রত্যেকটাই হাওড়া পুলের তলার গঙ্গার চেয়ে কম চওড়া নয়। এ রকম কত জলস্রোত পার হয়ে এলাম তার হিসেব নেই। ভোর-বেলায় দেখা গেল দু-পাশে জঙ্গল। গাছগুলি বড় নয়, কিন্তু খুব



সুন্দরবন

ঘন। তলা ঝোপঝাপে ভর্ত্তি। জঙ্গল একেবারে জলের ধার পর্য্যন্ত নেমে এসেছে।

একটু বেলা হতে এই সব বড় বড় স্রোত ছেড়ে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট খালে ঢোকা গেল। খালটার প্রস্থ আমাদের ফ্ল্যাটসমেত জাহাজের দেড় গুণের বেশী নয়। জলের স্রোত কম। জঙ্গল দুধারেই নিবিড় ঘন, একেবারে জল ছুঁয়ে আছে। খালটা অনবরত বেঁকে বেঁকে গেছে। এর নাম প্রথম নম্বরের আঠারবাঁকী, দ্বিতীয় নম্বরের আঠারবাঁকী খুলনা হতে বরিশালের মধ্যে পড়ে। এ রকম দৃশ্য কদাচিৎ দেখা যায়। দুপাশে কাঁচা সবুজ গাছের সার জলটা ছুঁয়ে আছে, তর তর করে কাঁচ-কাঁচ জল বয়ে চলেছে, এদিক ওদিকে জেলেডিঙ্গি দু-একটা দেখা যাচ্ছে, আর বাঁকে বাঁকে অপূর্ব সুষমা উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। সুন্দরবনের সুন্দর নামের সার্থকতা বোঝা যায়। মনে হয়, এ যেন প্রকৃতিদেবীর সাজানো একটা বিরাট্ বাগান, তার মধ্যে ঘুরে ঘুরে খাল গিয়েছে। ভরা শীতের দিনে মিঠে রোদের আমেজে ছোটনাগপুরের বাগানের মত-সাজানো উপত্যকা যখন অপূর্ব সুষমা মণ্ডিত হয়ে দেখা দেয় সে সময় পাহাড়ের গা দিয়ে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে গিয়েছি, তারও প্রতি পদে নতুন নতুন বিস্ময়—কিন্তু এ যেন সমতল মাটির বুকে তেমনি ঘুরে ঘুরে জলের রাস্তা করা হয়েছে। তাতে সেই পাহাড়ের কাঠিন্য, জমির রুক্ষতা। কাচা সবুজ, কালচে সবুজে মেশানো জঙ্গলের পাড় বাঁধা নিস্তরঙ্গ নদীপথে বিনা আয়াসে আমাদের জাহাজ ঘুরে ঘুরে চললো।

আমরা রাত্রেই রায়মঙ্গল নদী পার হয়ে খুলনা জেলায় প্রবেশ

করেছি। কিছুদূর এসেই নদীর একপাশে বসতি আরম্ভ হোলো। একদিকে দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেত, সবুজ হয়ে জ্বলছে, নদীর পাশে অতি-পরিচ্ছন্ন চালাঘর, বাঁধ দিয়ে আটকানো পুকুর, অন্যদিকে জঙ্গল। বাঁকে বাঁকে ছবির রেখার পরিচ্ছন্নতা। যে দিক্‌টায় বসতি হয়েছে সেদিক্‌টায় দু চারটী বড় বড় দীর্ঘ গাছ নদীর তটরেখার ইঙ্গিত দিচ্ছে, পেছনে অবারিত ধানক্ষেত, নদীর ধারেই গ্রাম। অপর পারে এখনও অক্ষুণ্ণ জঙ্গল সবুজ প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে, তার পটভূমিতে নদীর শাদা জল চিকচিক করে উঠছে। শোনা গেল এ খালটার নাম আপনগেছের খাল। এত অজস্র খাল যে সারেংরাও প্রত্যেকটার নাম জানে না!

বিকাল বেলায় আবার সরু খালে পড়া গেল। আঠারবাঁকীর চেয়ে অবশ্য এ খালটা বেশী চওড়া, কোন বসতি আর নেই, দু পাশের জঙ্গল আরও গভীর, গাছগুলি আরও বড় বড়, খালের বাঁকগুলি খুব বেশী। ইংরেজীতে বলা যায় Hairpin dends. আমাদের জাহাজ ধীরে ধীরে মোড় নিতে লাগল। এর দৃশ্যও কোন অংশে আঠারবাঁকীর চেয়ে কম সুন্দর নয়। জায়গাটার নাম না জানায় নতুন নামকরণ করা গেল বাইশবাঁকী। মনে হতে লাগল এ যেন কোন্‌ বিরাট্‌ সাজানো বাগানের ঝিল দিয়ে ভেসে চলেছি। দু পাশে কালো মাটি, ঘন বন, জলের ধারে ধারে এক ধরণের পামগাছ, নিস্তরঙ্গ খাল, দু-চারটী নৌকো স্থির হয়ে ভাসছে আর আমাদের জাহাজে প্রপেলার হতে একটানা জল ভাঙার শ-শ-শ, আওয়াজ আসছে।

কিছু দূর এগিয়ে আড়াশিবসা নামে একটা খালে পড়লাম এই রকম আরও কতকগুলি খাল পার হয়ে পশুরিয়া খাল হতে রূপসা নদীতে পড়ব, রূপসায় ঘণ্টাখানেক গেলে খুলনা পৌঁছন যাবে খুলনা পৌঁছতে রাত্রি বারটা হবে। (আগামী বারে সমাপ্য)

নেতাজী বসুর জয়!

ডাঃ শ্রীইন্দুভূষণ রায়

বন্দে মাতরম্‌, বন্দে মাতরম্‌,
গাও ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়,
ভারত-গগনে উজ্জ্বল দীপ—
নেতাজী বসুর জয়।
জয় হিন্দ্‌, জয় হিন্দ্‌, জয় হিন্দ্‌,
গাও ভারতের জয়,—
ভারত-গগনে উজল-তারকা
নেতাজী বসুর জয়।

বাংলা মায়ের গর্ব্বের নিধি কুমার ব্রহ্মচারী—
স্বদেশে বিদেশে হেলায় ঠেলিয়া দফ্‌তর সরকারী,
মায়ের দুঃখ ঘুচাতে ত্যজিল সম্পদ-সুখ-আশ,
স্বাধীনতাপণে বরিয়া লইল দুঃসহ কারাবাস।
জয় হিন্দ্‌, জয় হিন্দ্‌……
সহায়-বিহীন সম্বলহীন বিদেশে একক বীর
আজাদ-হিন্দ ফৌজ গঠিল শৌর্য্যদীপ্ত শির;
ভোঁসলে আসিল, আসিল কিয়ানী, হবিবর রহমান্‌
আপন শোণিতে শপথ লিখিল, নেতাজী অন্তপ্রাণ।
জয় হিন্দ্‌, জয় হিন্দ্‌……
বাঙ্গালী, নেপালী, শিখ, জাঠ, এল মারাঠী বীর্য্যবান্‌,
জাতিভেদ ভুলি, ভুলি আপনায় হিন্দু মুসলমান,
তিন রঙ্গে-রঙ্গা জাতীয় পতাকা তুলি নিল দৃঢ করে,
নেতাজীরে ঘিরি দাঁড়াল সকলে যুঝিল দেশের তরে।
জয় হিন্দ্‌, জয় হিন্দ্‌……
ঝান্সীবাহিনী অধিনায়িকা ভগিনী মোদের লক্ষ্মী,
শাহনাওয়াজ, সীগল, ধীলন, বুর্হান দেশরক্ষী,
কত শত বীর মায়ের দুলাল করিল মরণপণ;—
লাল কেল্লায় চলেছে তাদের বিচারের প্রহসন।
জয় হিন্দ্‌, জয় হিন্দ্‌……
জাগো হে হিন্দু, জাগো মুস্‌লিম ভুলে জাতি অভিমান,
হীন স্বার্থেরে দলি-পদতলে রাখিতে দেশের মান,
কাঁধে কাঁধ দিয়ে ভাই ভাই মিলে ভুলে যাও দলাদলি,
নেতাজীর পণ করিতে সফল—নৈতিক বলে বলী।
জয় হিন্দ্‌, জয় হিন্দ্‌……
মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত বীর-স্বাধীনতা এক লক্ষ্য,—
বাংলা মায়ের গরবী দুলাল লৌহ-সুদৃঢ় বক্ষ!
মরেছে নেতাজী? মরিতে পারে না, সে যে মৃত্যুঞ্জয়,-
স্বদেশ প্রেমের অমৃতে অমর—গাও নেতাজীর জয়!
জয় হিন্দ্‌, জয় হিন্দ্‌……

তিনটি ভাল ম্যাজিক

যাদুকর পি-সি-সরকার

অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান যাদুকর আর্ণোল্ড ফার্ষ্ট (Arnold Furst) সাহেব কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। আর্ণোল্ড ফার্ষ্ট সাহেবের নাম এদেশে বিশেষ পরিচিত না হইলেও ওদেশের যাদুকর সমাজে তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ও প্রতিপত্তি আছে। মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে মার্কিনদিগের খুব বড় বড় ঘাঁটি (base) করা হইয়াছিল এবং সহস্র সহস্র মার্কিন সৈন্য সেখানে থাকিত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট এই যুদ্ধরত সৈন্যদিগকে আনন্দ পরিবেশনের জন্য U. S. O. show বিভাগ খোলেন এবং এই U. S. O. Camp showsএর পক্ষ হইতে ওদেশের বহু খ্যাতনামা যাদুকরদিগকে এদেশে পাঠান হয়। প্রথমে



যাদুকর আর্ণোল্ড ফার্ষ্ট ও পি-সি সরকার

(Arnold Furst & P. C. Sorcar)

আসেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাদুকর জ্যাক গুইন (Jack Gwynne), যাদুকর জ্যাকগুইন হস্তকৌশলজাত (manipulative) ম্যাজিকে বিশেষ দক্ষ এবং তিনি বহু নূতন নূতন খেলা আবিষ্কার করিয়া জগৎ প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। আমি যে Box, Tray and Screen Illusion খেলাটি দেখাইয়া থাকি—উহা এই যাদুকর জ্যাকগুইন সাহেব কর্ত্তৃকই আবিষ্কৃত। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি মুঙ্গেরে আনন্দভবনে মুঙ্গেরের রাজা ও বিহারের লাট সাহেব স্যার র্যাদারফোর্ডের সম্মুখে এই খেলাটি বিশেষ সাফল্যের সহিত প্রদর্শন করিয়াছি। একটি 'ট্রে'র উপর কয়েক খণ্ড টুকরা তক্তা পড়িয়াছিল—সেই টুকরা টুকরা তক্তাগুলি দিয়া 'ট্রে'র উপর একটা বাক্স তৈযার করা হইল এবং সেই বাক্স হইতে একটি একটি করিয়া প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটি নানা রংএর সিল্কের রুমাল বাহির করা হইল। বাক্সটির মধ্যে ঐরূপ রুমাল দুই ডজনের বেশী কিছুতেই স্থান সঙ্কুলান হইতে পারিত না। এর পর একটি প্রকাণ্ড ত্রিবর্ণরঞ্জিত খদ্দরের ভারতীয় জাতীয় পতাকা বাহির করা হইল। সপারিষদ লাট সাহেব ইহা দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। এর পর আরও ফ্লাগ, তারপর



যাদুকর আর্ণোল্ড ফার্ষ্ট ও যাদুকর লেভান্তে

(Arnold Furst & Levante)

জীবন্ত কবুতর ঐ বাক্স হইতে বাহির করা হইল। এই খেলার মধ্যে যে কোন সময় বাক্সটিকে খুলিয়া ভাঙ্গিয়া একেবারে খালি দেখান চলে। খেলাটি খুবই চমৎকার। ইহা ছাড়া Temple of Benares, Colour Changing Rabbit, Flipover Dove Vanish Box প্রভৃতি সমস্তই যাদুকর জ্যাকগুইনের আবিষ্কৃত। জ্যাকগুইন ভারতবর্ষে আসিয়া উত্তর

দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করেন এবং ভারতীয় যাদুবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণা করেন। তিনি ভারতীয় যাদুবিদ্যা দর্শনে খুবই প্রীত হন এবং আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি আসামে আমার খেলা দেখেন—আমি তখন শিলং, সিলেট, গৌহাটি অঞ্চলে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিতেছিলাম। যাদুকর জ্যাকওইন আমাকে তাঁহার ফটোচিত্র দিয়া যান এবং তাহাতে লিখেন To my friend Sorcar, the best Magician I saw in India এবং মুখে খুবই

হিসাবে আমার কথা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। আমার যাদুবি সম্পর্কে তিনি নিউ ইয়র্কের Bill Board পত্রিকায় এবং পৃথিবী বিখ্য মাসিক Sphinx পত্রিকায় বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়াছে যাদুকর জ্যাকওইন সাহেবের পর আসেন যাদুকর আর্ণোল্ড ফার্ষ্ট আর্ণোল্ড ফার্ষ্ট সাহেব Fresh fish sold here today নামক এ খেলা আবিষ্কার করিয়া যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন। এই খেল বিগত Pacific Coast American Magiciansএর আন্তর্জ্জাতি প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার ল করে এবং আমেরিকায় ও লণ্ডনে বহু লব্ধপ্রসিদ্ধ যাদুকরের প্রশ লাভ করে। বর্ত্তমানে বহু খ্যাতনা যাদুকর পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই খে প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতে যাদুকর (Arnold Furst) আর্ণো ফার্ষ্ট কলিকাতায় আমাকে ে ইষ্টার্ণ হোটেলে প্রীতিভো আপ্যায়িত করেন এবং দুই দি দিন আমরা যাদুবিদ্যা বি আলোচনা করি। আমি তাঁ খেলা দেখি এবং আমার খে তাঁহাকে দেখাই। তিনি আমা ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর বলি অভিহিত করিয়া ক্ষুদ্র গণ্ডী সীমাবদ্ধ করিতে নারাজ হন এ পৃথিবীর যাদুকর সমাজের পংক্তি তুলিয়া "A Great Magici বলেন। চিত্রে যাদুকর আর্ণো ফার্ষ্ট ও অষ্ট্রেলিয়ান যাদুকর ভান্তে (Levante) সাহেব দেখা যাইতেছে। লেভান্তে সাহে পৃথিবীর একজন "Gr Magician." অপর চিত্রটি ত যখন আর্ণোল্ড ফার্ষ্ট সাহেবের খে দেখিতে যাই তখন তো হইয়াছিল। আর্ণোল্ড স তাঁহার খেলা দেখাইব

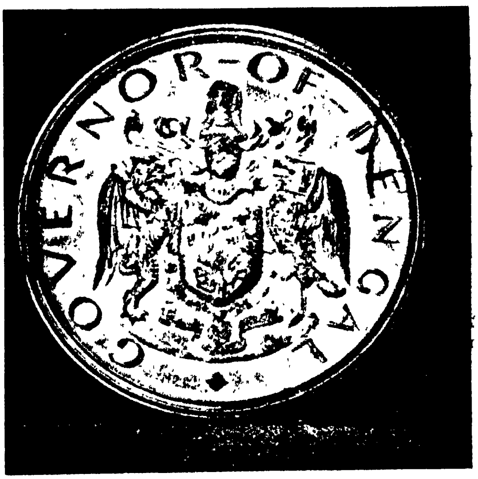


মার্কিন যাদুকর জন মুলহল্যাণ্ড (John Mulholland) টুপী হইতে খরগোস বাহির করিতেছেন

প্রশংসা করেন। আমি ইহাতে যথেষ্ট গর্ব্ব অনুভব করি, কারণ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাদুকরের নিকট হইতে এইরূপ প্রশংসা পাইবার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। এর পর যাদুকর জ্যাকওইন আমেরিকায় যাইয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের নিকট এবং তদ্দেশীয় যাদুকর সম্মিলনীতে ভারতীয় যাদুবিদ্যার কথা এবং ভারতীয় যাদুবিদ্যার প্রকৃষ্ট পরিচয়দাতা

সময় কতকগুলি ভারতীয় খেলা দেখান এবং ভারতীয় খে তিনি পছন্দ করেন এ কথা স্বীকার করেন। তাঁহার প্রদ খেলাসমূহের মধ্যে ডিম, রুমাল, শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ, পা ছিঁড়িয়া জোড়া দেওয়া, Fresh fish sold here প্রভৃতি উল্লেখযোগ সকল যাদুকরই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলা সর্ব্বশেষে দেখান—যাদু

Arnold Furst সাহেবও তাঁহার সর্ব্বশেষ খেলা টুপী হইতে খরগোস বাহির করা (**Rabbit out of a hat**) দেখান। যখন তিনি টুপীর মধ্য হইতে একটি জীবন্ত সাদা খরগোস টানিয়া বাহির করেন তখন তাঁহাকে অপর একজন পৃথিবী-বিখ্যাত যাদুকরের মত মনে হইল। তাঁহার নাম জন মুল হল্যাণ্ড (John Mulholland) যাদুকর জন মুল হল্যাণ্ড পৃথিবীতে ম্যাজিক বিদ্যার ইতিহাস এবং ম্যাজিকের খেলা সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জ্ঞান রাখেন। Mulholland—world's greatest Authority in the History of Magic এই নামে সমগ্র পৃথিবীতে পরিচিত। যাদুকর মুল হল্যাণ্ড সাহেব ওদেশের পত্রিকাদিতে প্রায়ই যাদুবিদ্যা সম্পর্কে লিখেন, নিজেই একটী পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি

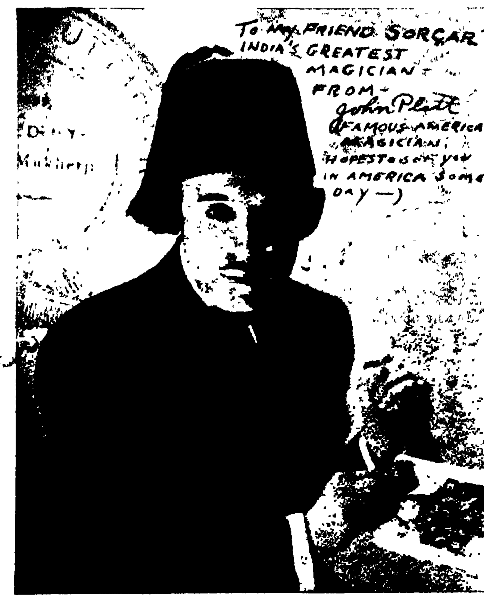


গভর্ণমেন্ট মেডেলিয়ন (ভারতীয় যাদুকরদের মধ্যে পি-সি-সরকারই সর্ব্বপ্রথম এই 'বিশেষ পদক' লাভ করেন)

কয়েকবার পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং শেষবারে ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন। পাঁচ মিনিটে আমগাছ তৈয়ারী করা তাঁহার একটি বিশেষত্বপূর্ণ খেলা। এই খেলাটি তিনি ভারতবর্ষ হইতেই শিখিয়া গিয়াছিলেন। আমেরিকায় তিনি Ching Ling Foo চিং লিং ফু: অথবা মহম্মদ দি বক্স হিন্দু Mohammad Bux the Hindoo এই নাম লইয়া খেলা দেখান। মার্কিন যাদুকরগণ এই ভাবে ছদ্মনাম ও ছদ্মবেশ লইয়া খেলা দেখাইতে খুবই ভালবাসেন। U. S. O. Showর পক্ষ হইতে John Platt নামক অপর একজন খ্যাতনামা মার্কিন যাদুকর ভারতবর্ষে আসেন—তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় নাম লইয়া ভারতীয় পোষাকে খেলা দেখাইয়া থাকেন। Johnny Platt সাহেবও আমার খেলা দেখিয়া খুবই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমাকে আমেরিকায় লইয়া যাইবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবার আশঙ্কায় Johnny Platt সম্পর্কে এক্ষণে বেশী লিখিব না, বারান্তরে তাঁহার কথা আলোচনা করা যাইবে। এক্ষণে কয়েকটি সহজ ও সুন্দর ম্যাজিকের খেলা প্রকাশ করিব যাহা দেখাইয়া আমার পাঠকবর্গ অনায়াসে তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবদিগকে অবাক করিয়া দিতে পারিবেন।

মনের কথা বলা

ছোটদের মহলে 'থটরিডিং'এর খেলা খুব ভাল জমে। ইতিপূর্ব্বে থটরিডিংএর নানারূপ খেলাই বহুস্থানে প্রকাশিত করিয়াছি, (রেডিওতে বলিয়াছি, পত্রিকায় লিখিয়াছি এবং পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছি)। কিন্তু এক্ষণে যেটি বলা হইতেছে এইটি সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। ইহাতে যাদুকর তাঁহার দর্শকদের একজনকে তাঁহার কত টাকা আছে মনে মনে ধরিতে বলিবেন, তারপর কয়েকটা যোগ বিয়োগ পূরণ করা—ব্যস যাদুকর বলিয়া দিলেন কত টাকা ধরা হইয়াছে। এক্ষণে খেলাটির কৌশল



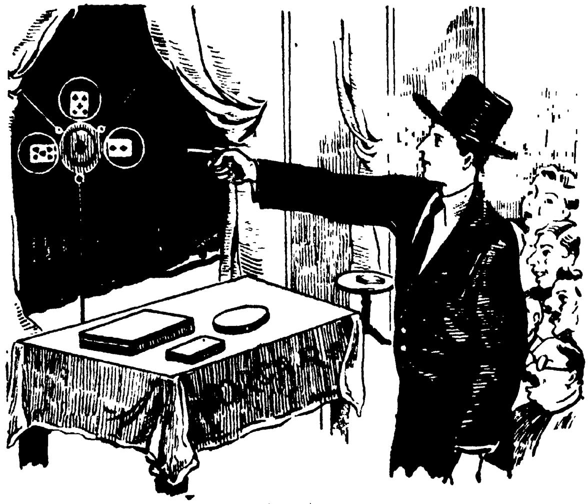
চিকাগোর সুপ্রসিদ্ধ যাদুকর জন প্লাট (**John Platt**) মুসলমানবেশে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিতেছেন।

বলিয়া দেওয়া যাইতেছে। যাদুকর তাঁহার দর্শককে বলিলেন—"আপনার পকেটে যত টাকা আছে মনে মনে ধরুন। আমাকে বলিবেন না—উহাকে ডবল করুন। এক্ষণে উহাকে পাঁচ দিয়া গুণ করুন। কত হইল আমাকে জানান।" ভদ্রলোক যত বলিবেন তাহার পিছন হইতে শূন্যটি বাদ দিলেই তাহার মনের সংখ্যা বাহির হইল। উদাহরণ দ্বারা বুঝান যাইতেছে :—মনে করুন ভদ্রলোকের ২৫৲ পঁচিশ টাকা ছিল, উহাকে ডবল করাতে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা হইল এক্ষণে এই ৫০কে ৫ দ্বারা গুণ করাতে ৫০ × ৫ = ২৫০ হইল। যাদুকর এই ২৫০ শুনিয়া দুই শত পঞ্চাশের ০ বাদ দিলেন এবং ২৫ পাইলেন—সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিলেন

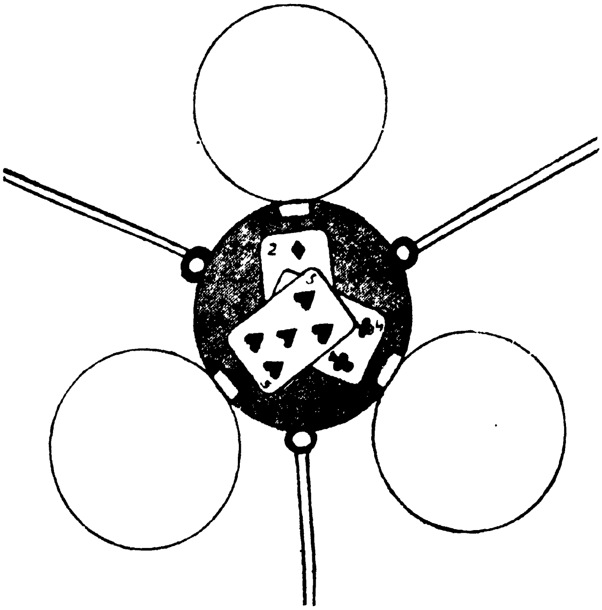
তাহার ২৫৲ আছে। এই খেলার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা অতিশয় সহজ, অথচ কেহ সহজে ধরিতে পারে না।

পয়সাকে আধুলি করা

পয়সাকে আধুলি করার খেলাটা খুবই সহজ অথচ খুবই সুন্দর এবং যে কেহ অতি সহজে এইটি করিতে পারিবেন। আমি যখন স্কুলের



বেলুন টারগেট খেলা



টারগেটের পশ্চাতের দৃশ্য খুঁটিনাটি

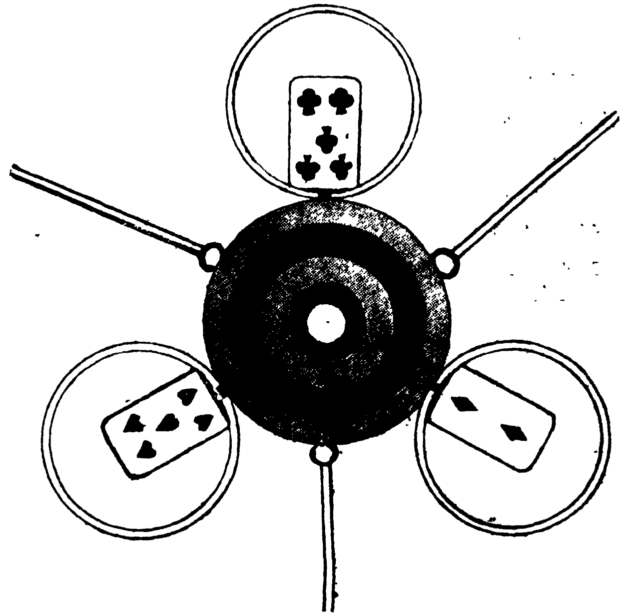
নীচের দিকে পড়িতাম তখন এইটি ছিল আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলা। সে কথা মনে হইলে আজকাল হাসি পায় সত্য, কিন্তু নূতন প্রণালীতে এই খেলা আমি বর্ত্তমানেও দেখাইয়া থাকি। একটা নূতন পয়সা লইয়া এই খেলা করিতে হয়। আধুনিক মাঝখানে ছিদ্রযুক্ত পয়সা নহে ঠিক ইহার পূর্ব্বকার পয়সা যাহা আকৃতিতে আধুলির ঠিক সমান ছিল। পয়সাটির যেদিকে রাজার মাথা আছে সেইদিকে রূপার গিল্টি বা সিলভারিং বা নিকেল প্লেটিং করাইয়া লইতে হইবে। কলিকাতায় যে কোন ইলেক্টোপ্লেটিং-এর দোকানে দিলেই তাহার নামমাত্র পারিশ্রমিকে কয়েক মিনিটের মধ্যে এইটি করিয়া দিবে। তবেই সমস্ত প্রস্তুত হইল। এক হাতে সং প্রভৃতি লেখা দিকটা বাহির করিয়া সকলকে দেখাইতে হইবে যে সেটা একটি সাধারণ পয়সা মাত্র। এইবা পয়সাটি একজন লোকের হাতে ধরিতে দিয়া তাহাকে বলিতে হইবে যে পয়সাটি হাতে দেওয়া মাত্র যেন তিনি হাত বন্ধ করেন। এর পর হাত খুলিলেই দেখা যাইবে যে তাঁহার হস্তস্থিত পয়সাটি আধুলিতে রূপান্তরি হইয়াছে। কি মজা! তৎক্ষণাৎ ঐটি তাঁহার নিক হইতে নিজের হাতে তুলিয়া লওয়া মাত্র এবং হাত মু করা মাত্র উহা পুনরায় পয়সা হইয়া যাইবে। ব্যাপার কিছুই নহে, একজনের হাত হইতে অপর জনের হাত পয়সা লওয়ার ব্যাপারে আপনা আপনিই পয়সাটি উঃ হইয়া যাইতেছে এবং দর্শকগণ গিল্টি করা পয়স পিঠ দেখিয়া আধুলি ভ্রম করিতেছেন। মফঃস্বলে লোকেরা যাহারা পয়সার উপরে অনুরূপ গি করাইবার সুযোগ বা সুবিধা পাইবেন না, তাঁহা পয়সার উপর পাতলা আঠা মাখাইয়া তাহার উ সিগারেট বাক্সের রাংতা (রাঙ্গ) লাগাইয়া জোরে চাপি আঁটিয়া দিতে পারেন। তাহাতেও খেলাটা ভাল ভাবে হয়। দুইটা পয়সা এইভাবে তৈয়ার করিয়া লই এই খেলাটা অন্যভাবেও দেখান যাইতে পারে। যে ডান হাতে পয়সার পিঠ এবং বাম হাতে আধুলির দেখান হইল। ওয়ান-টু-থ্রি বলিয়া দুই হাত করিয়া পুনরায় খুলিবামাত্র বাম হাতে পয়সা যা এবং ডান হাতে আধুলি যাইবে—অর্থাৎ এহাত ও যাতায়াত করিল। খেলাটা খুবই সহজ নহে কি অনেকে পয়সার পিছনে আধুলি আঠা দ্বারা আটক লইয়া এই খেলা দেখাইয়া থাকেন। আমার উহা হয় না, কারণ অতিরিক্ত পুরু বলিয়া ধরা পড়ার সম্ভ আছে।

বেলুন টারগেট

(SORCAR'S BALLOON TARGET)

আমার আবিষ্কৃত 'বেলুন টারগেট' খেলাটি অতি অল্পকালের

পৃথিবী বিখ্যাত হইয়াছে। ইহা আমি আমার বিখ্যাত বেলুনের মধ্যে তাস খেলাটির কৌশলেই তৈয়ার করি। সে খেলাতে একটি মাত্র বেলুন ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এইটিতে তিনটি বেলুন এক সঙ্গে ব্যবহৃত হইবে। চিত্র দেখিলে এই খেলা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হইবে। যাহারা যাদুবিদ্যা বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই অভিজ্ঞ তাঁহারা দেখিবেন যে, এই খেলাটি বহুলাংশে পুরাতন খেলা 'কার্ডষ্টার' (card star) এর অনুরূপ হইলেও বহুগুণে উন্নত। রঙ্গমঞ্চে খেলা আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বে হইতেই রঙ্গিন সিল্কের ফিতা দ্বারা একটি চাঁদমারি (target) টাঙ্গান আছে। উহাতে তিনটি রিং ফিট করা আছে। এক্ষণে যাদুকর এক প্যাকেট তাস লইয়া দর্শকদের নিকটে গেলেন এবং উহার মধ্য হইতে যে কোন তিনটি তাস টানিয়া লইতে বলিবেন। তিনটি তাস বাছিয়া লইবার পর দর্শকগণ উহা পুনরায় প্যাকেটে ফিরাইয়া দিলেন কিম্বা বন্দুকের নলের মধ্যে ভরিয়া নিলেন অথবা ঐগুলি পুড়াইয়া ছাই করিয়া, সেই ছাই বন্দুকের নলের মধ্যে ভরিয়া দিলেন। তারপর সকলের পরীক্ষিত তিনটি বেলুন সর্ব্বসমক্ষে ফুঁ দিয়া ফুলাইয়া ঐ রিংটির মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হইল। এইবার ওয়ান-টু-থ্রি বলিয়া বন্দুকের আওয়াজ করিবামাত্র বেলুন তিনটি যুগপৎ ফাটিয়া যাইবে এবং সে স্থলে দর্শকদের মনোনীত তাস তিনটি দেখা দিবে। এই খেলাটি বিশেষভাবে ব্যবসায়ী যাদুকরদের জন্য প্রযোজ্য, কারণ তিনটি তাস দর্শকদিগের দ্বারা নিজের ইচ্ছামত টানান কষ্টকর, তবে অভ্যাস করিলে জগতে কিছুই অসাধ্য নহে। তিনটি তাস 'ফোর্স' করার জন্য "সেল্‌ফ ফোর্সিং" তাসের ব্যবহার করা চলে। তখন খেলাটি নবাগতদের পক্ষে সহজসাধ্য হইয়া উঠে। প্রথম চিত্রে দেখান হইয়াছে যে রঙ্গমঞ্চের 'বেলুন টারগেট' ফিতা দ্বারা ঝুলান রহিয়াছে এবং যাদুকর বন্দুকের আওয়াজ করিবামাত্র বেলুনগুলি ফাটিয়া যথাক্রমে চিড়াতনের পাঁচ, হরতনের পাঁচ ও রুহিতনের দুই—এই তিনটি তাস উঠিয়াছে এবং দর্শকগণ ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় চিত্রে ও তৃতীয় চিত্রে যথাক্রমে টারগেটের পশ্চাতের দৃশ্য এবং খেলার শেষে সম্মুখের দৃশ্য দেখান হইয়াছে। তাসগুলি আটকাইয়া রাখিবার জন্য ছোট ছোট 'স্প্রীং ক্লিপ আছে—'স্প্রীং ক্লিপের' মধ্যে উক্ত তাস তিনটি আটকাইয়া দিয়া—পিছন দিকে ভাঁজ করিয়া রাখিতে হয়। দ্বিতীয় চিত্রে দেখান হইয়াছে কিভাবে রুহিতনের দুই, তৎপর চিড়াতনের পাঁচ এবং তৎপর হরতনের পাঁচ ভাঁজ করিয়া রাখা হইয়াছে। এইভাবে রাখিলে ওপিঠ হইতে একটি তাসও দেখা যাইবে না এবং এইভাবেই এই বেলুন টারগেট রঙ্গমঞ্চে পূর্ব্ব হইতে টাঙ্গান থাকে। তাসগুলি ভাঁজ করিয়া অপর একটি 'স্প্রীং ক্লিপ' দ্বারা আটকাইয়া রাখিতে হয় এবং এই ক্লিপের সংযুক্ত সুতা পর্দ্দার অন্তরালে সহকারীর নিকট থাকিবে। যাদুকর ওয়ান-টু-থ্রি বলিয়া বন্দুকের আওয়াজ করিবামাত্র সহকারী পশ্চাৎ হইতে সুতা ধরিয়া টান দিবেন এবং দর্শকদের মনোনীত তাস



সম্মুখে দৃশ্য (খেলা হইবার পর)

ঘুরিয়া যাইয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইবে। তাসের এবং স্প্রীংএর আঘাত লাগিয়া বেলুনগুলি আপনা আপনি ফাটিয়া যাইবে। তবে বেলুনগুলি শক্ত রবারের প্রস্তুত হইলে সহজে না ফাটিতেও পারে। সেক্ষেত্রে বেলুন ফাটাইবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, যেমন প্রত্যেকটি স্প্রীং-এর সহিত ছোট ছোট আলপিন ঝালাই করিয়া রাখা ইত্যাদি। খেলাটি ব্যবসায়ী যাদুকরদের পক্ষে খুবই ভাল—বর্ত্তমানে আমেরিকার বহু যাদুকর আমার এই খেলা দেখাইতেছেন এবং তাঁহারা ইহার নাম দিয়াছেন 'Sorcar's Balloon Target', কিছুদিন পূর্ব্বে বিগত ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আমার এই বেলুন টারগেট খেলাটি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে Abbotts Magic Capital of the Worlds মুখপত্র জগৎ প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকাতে বহুচিত্র শোভিত হইয়া প্রকাশিত হয় এবং তাহাতে নির্দ্দেশ ছিল যে যাদুকরগণ যেন ইহা 'Sorcar's Balloon Target' নামে ব্যবহার করেন। একজন ভারতীয় যাদুকর কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত খেলা পৃথিবীর সর্ব্বদেশীয় যাদুকরগণ প্রদর্শন করিতেছেন শুনিলে মনে আনন্দ হয়। আশা করি উপরোক্ত খেলা তিনটি আমাদের দেশের ছোট বড় সকলের নিকট সমাদৃত হইবে।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

দশ

মণিমোহন তখনও যেন সম্মোহিত হইয়াই আছে।

স্বপ্ন দেখিতেছে নাকি? দেখিতেছে অসংলগ্ন খেয়াল? দশ বছর আগে যা একেবারেই শেষ হইয়া গিয়াছিল, যা নিশ্চিহ্ন ও নিঃশেষ হইয়া ভাসিয়া গিয়াছিল তেঁতুলিয়া নদীর কূল ভাঙা প্রচণ্ড জোয়ারের তরঙ্গে উন্মাদ স্রোতোধারার সঙ্গে, তাহা কি আবার এমন ভাবে ফিরিয়া দেখা দিতে পারে কোনো উপায়ে, কোনো সম্ভব বা অসম্ভব স্বপ্নেও?

কিন্তু স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, কিছুই নয়। যাহা দেখিবার তাহা তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। অত্যন্ত সত্য এবং বাস্তব এই পৃথিবী। নৌকার নীচে তীক্ষ্ণধারার খালের জল বহিতেছে—নৌকা দুলিতেছে ক্রমাগত। মশাগুলি কানের কাছে তেমনি গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে। খাল হইতে পচা কচুরি এবং সদ্যোবর্ষণের পরে পৃথিবী হইতে পিচ্ছল কাদার গন্ধ বাতাসে ভাসিতেছে। মাঝিদের লণ্ঠনের আলোর চারিদিকে একটা প্রায়ান্ধকার অস্পষ্টতার সৃষ্টি হইয়াছে, দারোগা বেদনা বিমর্ষ মুখে তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ পরিবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। শিকার জাল হইতে চম্পট দিয়াছে এবং তাঁহার ইন্‌স্পেক্টর হইবার সযত্ন-লালিত স্বপ্নও সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে কৈবল্যধাম লাভ করিয়া বসিয়া আছে।

আর দারোগার টর্চের আলো যাহার মুখে পড়িয়াছে—সে কে, সে কী?

শাদা পাথরে খোদাই করা বুদ্ধমূর্তি। জীবনে কত কীর্তিই সে করিল তাহার শেষ নাই। সে কীর্তির একটা অধ্যায়ের সঙ্গে মণিমোহন নিজেও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত। সাধারণ দৃষ্টির বিচারে, সমাজের চোখে তাহার স্থান কোথাও নাই। একটা উচ্ছৃঙ্খল বন্য জীবন—একটা আগুনের মতো তীব্র তপ্ত লালসা। কিন্তু এই মুখখানা দেখিলে সে কথা কাহার মনে হইবে। নির্মল, পবিত্র, কোনোখানে মলিনতার একবিন্দু চিহ্ন পর্যন্ত নাই।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে কথা কহিল। বলিল, থাক আলো নিবিয়ে দিন। আমি দেখছি দারোগা বাবু।

মেয়েটি তাহাকে চিনিল কি? তাহার নীলার মতো চোখে পরিচয়ের কোনো আভাস কি ঝলক দিয়া উঠিল? কিন্তু সে সব স্পষ্ট করিয়া কিছু মনে হইবার আগেই দারোগার টর্চের আলোটা নিবিয়া গেল। শুধু মাঝিদের লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল শিখার যে রক্তাভাটুকু জাগিয়া রহিল, তাহাতে মনে হইতে লাগিল যেন কোনো জনহীন নিবিড় বনের মধ্যে শান্ত সমাহিত ভাঙা একটি দেবমূর্তির ওপরে বনের পাতার ফাঁক দিয়া খানিকটা আলোকের দীপ্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মণিমোহন বলিল, আমি কাল ওর সঙ্গে কথা বলব। আজ থাক। আপনি কি ওকে থানায় নিয়ে যেতে চান?

নৈরাশ্যক্ষুব্ধ দারোগা যে চীৎকার করিয়া উঠিলেন না, সে শুধু মণিমোহন সম্মুখে ছিল বলিয়াই। বলিলেন, থানায় নিয়ে যাবোনা মানে? চালান দেব। কি আপনি বলেন স্যার? এই বেটিই সব জানে, সব গণ্ডগোলের গোড়াতেই—

—প্রমাণ করতে পারবেন তো?

—নিশ্চয়। সাক্ষীর অভাব হবেনা। বলেন কি মশাই, আমার এতদিনের আশা, বুড়োবয়েসে কোথায় একটু ভালো রকম পেন্সন পাবো তা নয়—

গলার সুরে মনে হইল যেন কান্না উচ্ছলাইয়া পড়িতেছে।

—বেশ, যা ভালো বোঝেন করুন। তবে আমি একবার কাল আপনার আসামীর সঙ্গে একটু আলোচনা করে দেখব। হয়তো আপনার তাতে সুবিধেই হবে।

—বেশ তো, বেশ তো স্যার। দারোগা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন: তা হলে কালই আপনার কাছে হাজির করব সকালে। কখন নিয়ে যাব? আটটা—নটা?

—আচ্ছা।

মণিমোহন চোখ বুজিয়া বিছানার উপরে শুইয়া পড়িল। তাহার আর ভালো লাগিতেছে না, কথা বলিতেও যেন সে শ্রান্তি বোধ করিতেছে।

দারোগা কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন, স্যার বোঝেন তো, আমাদের সবই আপনাদের দয়ার উপর নির্ভর করছে। দু চারটে কথা যদি বার করে দিতে পারেন, তাহলে কেনা গোলাম হয়ে থাকব। অবশ্য আমরা চেষ্টার ত্রুটি করবনা, তবুও—

—আচ্ছা—আচ্ছা—মণিমোহন যেন ধমক দিল একটু: সে আপনার ভাবতে হবেনা। আমি যতটুকু ভালো বুঝি করব।

—না, তাই বলছিলাম আর কি স্যার। আচ্ছা আপনি ঘুমোন—সন্ত্রস্ত দারোগা নৌকা হইতে নামিয়া গেলেন।

রাত্রি শেষ যাম। নৌকা ছাড়িয়া দিল। কালকের মতো

আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে অস্ত চাঁদের উপরে, ভোরের দিকে বৃষ্টি নামিবে কিনা কে জানে। নৌকার গায়ে বেত-কাঁটার আঁচড়, দূরে শিয়ালের ডাক—কোথা হইতে হিস্‌হিস্‌ করিয়া একটানা একটা অদ্ভুত শব্দ। যেন নৌকার আকস্মিক উপদ্রবে বিব্রত হইয়া কতকগুলি সত্ত ঘুমভাঙা সাপ একসঙ্গে ফণা তুলিয়াছে—শত্রুকে ছোবল মারিবে।

মণিমোহন ঘুমাইবার জন্য চোখ বুজিল কিন্তু ঘুম আসিলনা। চোখের পাতায় যেন হাজার হাজার পিন ফুটিতেছে—মাথার মধ্যে ফুলঝুরির মতো অবিশ্রাম কতকগুলি আগুনের তারা ঝরিয়া চলিয়াছে। কাকে দেখিল সে—কী দেখিল! দশবছর ধরিয়া যাহার জন্য সে স্বপ্ন রচনা করিয়াছে, অনেক শান্ত কোমল রাত্রে চাঁদ-ডুবিয়া-যাওয়া স্নিগ্ধ অন্ধকারের মধ্যে যখন শুধু দূরের রেল লাইনের কলিকাতাগামী ট্রেনের চাকার তলায় মরা-নদীর ব্রীজ হইতে ঝমঝম করিয়া একটা অদ্ভুত শব্দ ভাসিয়া আসিয়াছে, আর ঘুমন্ত রাণীর বাহু বন্ধন হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া সে বালিশের উপরে উঠিয়া বসিয়াছে—সেই সময় চলন্ত একটা অন্ধকার ট্রেনের জানালা হইতে একখানি উজ্জ্বল সুন্দর আভাসের মতো মনের সামনে প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে কাহার মুখ? এবং সেই মুখকে এখানে এইভাবে যে দেখিবে এমন কল্পনা সেকি করিয়াছিল কখনো?

আশ্চর্য মুখখানি। এত ঝড় এত ঝাপটা বহিয়া গেছে। সর্বোপরি বহিয়া গেছে সময়—তেঁতুলিয়ার স্রোতে নতুন ডাঙা, নতুন উপনিবেশ জাগাইয়া তোলা সময়। অথচ সে স্রোত এতটুকুও দাগ কাটে নাই, একটি শামুক ঝিনুকের চলার দাগেও সে মুখ এতটুকু রেখাঙ্কিত হইয়া উঠে নাই। আশ্চর্য!

কাল দেখা হইবে। দশ বছর আগেকার ঝড়ের সন্ধ্যা কি ফিরিয়া আসে? আর কি ফিরিয়া আসে কখনো? জীবনের গতি বৃত্তাকার নয়, কখনো সরল, কখনো সরীসৃপ। সেদিনও মনটা নিজের বাঁধা পথ খুঁজিয়া পায় নাই—মনে রোমান্সের নেশা ছিল—এই নতুন দেশ, অদ্ভুত নদী সেদিন বিচিত্র রোমাঞ্চ কল্পনা আর স্বপ্ন কামনা জাগাইয়া তুলিত। সেদিন আজ আর নাই। সব চেনা হইয়া গেছে, জানা হইয়া গেছে, প্রতিদিনের অতি পরিচয়ে নেশা কাটিয়া গেছে। দীর্ঘ নদীপথ ক্লান্তিকর মনে হয়,—নতুন জাগা বালির চর দেখিয়া তিনশো বছর আগেকার পর্তুগীজদের স্বপ্ন ফিরিয়া আসে না—দুপুরের রোদে ঝিকমিকি বালির তাপে চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়া যায়।

সর্বোপরি রাণী। সেদিনও উজ্জ্বল মন তাকে মানিয়া লয় নাই—সেদিনের প্রেম ছিল আকারহীন একটা অর্ধ তরল পিণ্ডের মতো, যেমন খুশি তাহাকে রূপ দেওয়া চলিত, আকার দেওয়া চলিত। আজ অনেক সুখের তাপে সেই তরলতা জমাট বাঁধিয়াছে—জীবনের যাহা কিছু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে সমান একটা কঠিন ভিত্তির উপর। আজ সেখানে আলোড়ন জাগাইতে গেলে ভূমিকম্প ঘটিয়া যাইবে—সব ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার হইয়া যাইবে। সে ভাঙন আজ আর মণিমোহন কামনা করেনা—সে ভাঙনকে মনের মধ্যে মানিয়া লইবার স্পৃহা বা দুঃসাহস কোনোটাই তাহার নাই। আজ রাণীই ভালো—আজ পিণ্টুর মধ্যেই তাহার ভবিষ্যতের রূপায়ন। তাহার চাকরীর ভবিষ্যৎ একটা স্পষ্ট উজ্জ্বল দিগন্তের দিকে আঙুল বাড়াইয়া দিয়াছে।

না—দশ বছর আগেকার ঝড়ের সন্ধ্যা আর ফিরিবেনা।

* * *

কিন্তু সুখ ছিলনা বলরাম ভিষক্‌রত্নের। ভগবান তাঁহার কপালে একবিন্দু সুখ লেখেন নাই, প্রাণপণ চেষ্টা করিলেই কি আর তাহাতে এক বিন্দু সুবিধা হইবে।

মনে মনে ডিসিল্‌ভা আর ক্রুজার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিতে করিতে বলরাম ফিরিলেন। জননী মেরীর এত দয়া, আর এই সন্তানগুলিকে তিনি কি মর্ত্যলোক হইতে তুলিয়া তাঁহার স্নেহময় স্বর্গীয় কোলে স্থান দিতে পারেন না? তাহা হইলে পৃথিবীর না হোক, অন্তত বলরামের ভাজা-ভাজা হাড়গুলি তো জুড়াইয়া যায়।

রাধানাথ তাঁহার খাবার ঢাকিয়া রাখিয়া ঘুমাইতেছে। পড়িয়াছে কুম্ভকর্ণের মতো, কাণের কাছে এখন তাহার প্রবল বেগে কাড়া-নাকাড়া বাজাইলেও সে ট্যাঁ কোঁ করিবেনা। বলরামের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় সে নিরিবিলিতে এবং নিভৃতে তাঁহার মদনানন্দ মোদক কিছু কিছু উদরস্থ করিয়া থাকে।

হাত পা ধুইয়া বলরাম খাইতে বসিলেন। রাত্রে তিনি ভাত খান না—খান সামান্য রুটি আর তরকারী। কিন্তু রুটি মুখে দিয়াই মনে হইল, ইহার চাইতে জুতোর শুকতলা চিবাইয়া হজম করা সহজ। টানের চোটে মুখের বাঁধানো গোটাকয়েক দাঁত একসঙ্গে বাহির হইয়া আসিবার বাসনা করিল।

—দুত্তোর—

জোর করিয়া কয়েক টুকরা রুটি দাঁতে ছিঁড়িয়া বলরাম উঠিয়া পড়িলেন। হতভাগা দিনের পর দিন কী রান্নাই যে রাঁধিতেছে আজকাল। গৃহিণীহীন সংসারের চিরকাল যা হইয়া থাকে ঠিক তাই, এ জন্য আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই, রাগ করাটাও সমান মূল্যহীন এবং অবাস্তর।

কিন্তু দোষ শুধু রাধানাথেরই নয়। সাবাস একখানা যুদ্ধ বাধিয়াছে বটে। মানুষকে একেবারে বেহদ্দ করিল, ত্রিভুবন

দেখাইয়া ছাড়িল বলিলেই চলে। ধান-চালের যাহা হইবার তাহা-তো যোলো আনাই হইয়াছে, আর আটা যা আমদানি হইতেছে ইদানিং তাহার তুলনা ভূ-ভারতে কোথাও মিলিবেনা। কয়াতের গুঁড়া এবং ধানের তুঁষ মিলাইয়া যে কোনোদিন আটা নামক একটি খাদ্য হইয়া উঠিতে পারে, আর তাহা মানুষের পেটে ঢুকিয়া তাহার ক্ষুধা দূর করিতে পারে, কবিরাজী শাস্ত্রের কোনো পুঁথিতেই তাহার উল্লেখ নাই। এ কী ব্যাপার এবং কী বস্তু ?

বলরাম নিজেই উঠিয়া গড়গড়াটা ধরাইলেন। তারপর আসিয়া বসিলেন বাহিরের ঘরটাতে। বয়েস বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমটাও আজকাল অত্যন্ত হালকা হইয়া উঠিয়াছে। ছানী কাটানো চোখ দুইটা মাঝে মাঝে জ্বালা করে, এক একদিন মাথার মধ্যে রক্ত চড়িয়া যায়, কপালের দু'পাশে রগগুলি রক্তের চাঞ্চল্যে লাফাইতে থাকে—ঘুম আসে না। আজও ঘুম আসিবে বলিয়া মনে হয় না। বলরাম বসিয়া বসিয়া গড়গড়া টানিতে লাগিলেন।

কিছু কিছু মশার উপদ্রব বোধ হইতেছিল, দুহাতে সেগুলি মারিতে মারিতে কখন যে তন্দ্রার আবেগ আসিয়াছে বলরাম ভালো করিয়া তাহা টের পান নাই। অস্পষ্ট হইয়া আসা চেতনার মধ্যে তিনি দেখিতেছিলেন—ডি সিল্‌ভা মেজের উপরে উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে, দুর্গন্ধ বমিতে তাহার সর্বাঙ্গ ভাসিয়া গেছে, আর—

কড়াং—কড়াং—

দরজার কড়া নড়িল। কড়—কড়াং—

তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। তাকিয়ায় পিঠ খাড়া করিয়া ক্ষুব্ধ বিরক্ত বলরাম উঠিয়া বসিলেন—আঃ, এই রাত্রে আবার জ্বালাইতে আসিল কে ? অসুখ বিসুখ কী দিনই যে পাইয়াছে—রোগীদের অত্যাচারেই এবারে বলরামকে চর ইসমাইল ছাড়িয়া তল্পী তল্পা গুটাইতে হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। ডাক্তারখানার শিশিতে তো খানিকটা লাল নীল জল, অতএব—

কিন্তু দরজার কড়া নাড়িতেছে অধৈর্যভাবে।—কে ?

কোনো সাড়া আসিল না।

—কে ডাকে এখন ?

তবুও সাড়া নাই। সহসা একটা আশঙ্কায় বলরামের মন ভরিয়া গেল। চারদিকে যে একটা অশান্তি এবং বিক্ষোভের চাপা আগুন ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে এ সংবাদ তিনি পাইয়াছেন। ধান নাই, চাল নাই। চর ইসমাইলের মানুষগুলির রক্তে বিদ্রোহ জাগিতেছে। তাহারা এখানে ওখানে জমায়েত করিয়া স্থির করিয়াছে যেমনভাবে হোক ধান চাল সংগ্রহ করিবেই। মহাজনের গোলা কিম্বা আড়তদারের গুদাম—দরকার হইলে লুট তরাজ করিয়া লইতেও তাহাদের আপত্তি নাই। তাহাদের লক্ষ্য বস্তুর ভিতরে তিনিও যে একজন আছেন, একথাও বলরাম ভালো করিয়াই জানেন।

সুতরাং আতঙ্কে তাঁহার বুকের ভেতরটা বাঁশপাতার মতো কাঁপিতে লাগিল। উঠিয়া দরজা যে খুলিয়া দিবেন এমন শক্তি রহিল না, শুধু বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দুর্গানাম জপ করিয়া চলিলেন।

কিন্তু কড়,—কড়াং! কড়,—কড়,—কড়াং—

কড়া নাড়া চলিতেছে তো চলিতেছেই। বলরাম কাণ পাতিয়া শব্দটা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন। যে নাড়িতেছে সে খানিকটা সংশয়-গ্রস্ত এবং ভীত। খুব সম্ভব ডি ক্রুজ বলিয়া মনে হইতেছে! তবু বিশ্বাস নাই—সাড়া দেয় না কেন ?

মরিয়া হইয়া বলরাম হাঁকিলেন : কে ?

একটা অস্পষ্ট শব্দ যেন পাওয়া গেল। কিন্তু কী শব্দ ? বলরাম কাণ পাতিলেন। একটা চাপা কান্না—কেউ যেন কোঁপাইয়া কোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। হ্যাঁ—কোনো ভুল নাই, কান্নার শব্দই বটে। কিন্তু কার কান্না, কিসের কান্না ?

আর বসিয়া থাকা অসম্ভব।

—দাঁড়াও—দাঁড়াও—খুলছি—মরিয়া হইয়া একটা হাঁক দিয়া বলরাম উঠিয়া পড়িলেন। যা হওয়ার হোক। এই অশ্রান্ত কড়ানাড়া, রহস্যময় নীরবতার সঙ্গে কান্নার শব্দটা তাঁহাকে পাগল করিয়া দিতেছে। বলরাম আলোটার তেজ বাড়াইয়া দিলেন, তার পরে অত্যন্ত সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া দ্বিধা কম্পিত হাতে দরজার হুড়কাটা টানিয়া খুলিয়া দিলেন। কে জানে, কোন্ ভয়ানক একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার বাহিরে তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

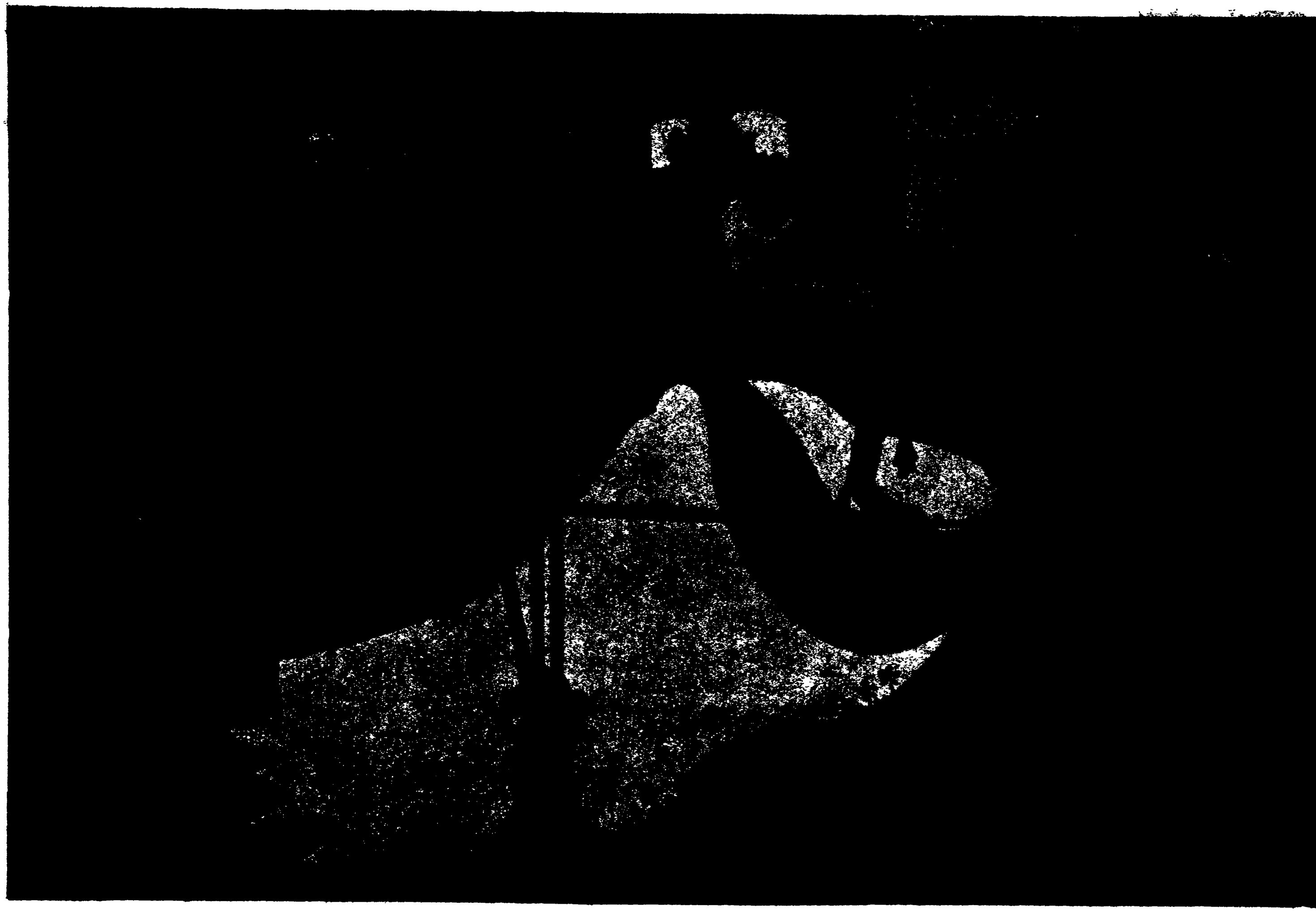
কিন্তু বাস্তবিকই একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার বাহিরে তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে যাহা ঘটিল অন্তত সে সম্ভাবনার জন্য মনের দিক হইতে তিনি একটুকু প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহাকে নির্বাক স্থবির করিয়া দিয়া একটি লোক ছুটিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিল। কিন্তু সে কী এবং কে বলরাম বুঝিতে পারিলেন না।

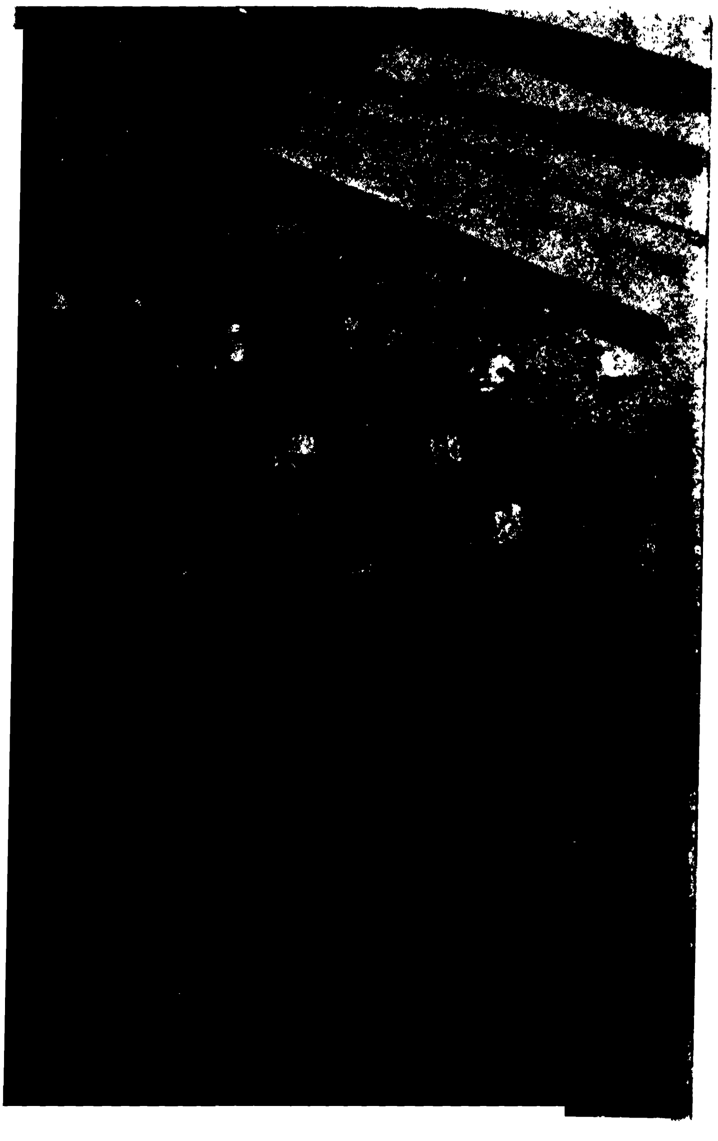
তাহার সর্বাঙ্গ বোরখায় ঢাকা। সেই বোরখার এখানে ওখানে কাঁচা রক্ত চাপ বাঁধিয়া আছে। ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া সে মাতালের মতো টলিতেছে।

ব্যাপার কী ? ভৌতিক ঘটনা নাকি ? না বলরাম ঘুমাইয়া আছেন এখনো ?

কিন্তু বোরখায় ঢাকা রহস্যময় মূর্তিটি তাঁহার সামনেই তো দাঁড়াইয়া আছে। রক্তের দাগগুলি সম্বন্ধে সংশয়ের কোনো অবকাশই



—নরেন্দ্রনাথ মল্লিক



নাই। হায় ভগবান—একি সমস্তার মধ্যে তুমি নিরীহ গোবেচারী ...রাম ভিষকরত্নকে টানিয়া আনিলে! শেষ পর্যন্ত খুনের মামলায় ...বেন নাকি তিনি ?

—তুমি কে—কী চাও ?

উত্তরে তেমনি চাপা কান্নার শব্দ। বোরখার ভিতর হইয়া চাপা কান্নার শব্দ। একটি মেয়ে—মুসলমানের মেয়ে আকুল হইয়া কাঁদিতেছে।

বলরামের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া গেল। সমস্ত চৈতন্য ...র শক্তিকে অতিক্রম করিয়া গেছে। পাগলের মতো তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন: কে তুমি, কী চাও ?

মেয়েটি এবারেও জবাব দিল না। তখনই সোজা একেবারে বলরামের পায়ের উপরে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল।

কয়েক মুহূর্ত বলরাম থ হইয়া রহিলেন। তারপর কী ভাবিয়া মেয়েটির মুখের উপর দিয়া টানিয়া বোরখাটা সরাইয়া লইলেন।

গাল কপাল দিয়া রক্ত গড়াইয়া নামিয়াছে—একখানা সুন্দর মুখ সেই রক্ত মাখিয়া একটি পদ্মের মতো পড়িয়া আছে। অজ্ঞান হইয়া গেছে মেয়েটি, দাঁতে দাঁত লাগিয়াছে—বুকের ভিতর হইতে এক একটা দীর্ঘনিশ্বাস যেন পাঁজর ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে।

দশ বছর পার হইয়া গেছে। তবু লণ্ঠনের আলোয় বলরাম তাহাকে চিনিলেন। শিরায় শিরায় রক্তে মাংসে কামনা কল্পনায় যে এতদিন ধরিয়া এমনভাবে একাত্ম হইয়া আছে তাহাকে ভুলিয়া যাওয়া কি এতই সহজ। শুধু দশ বছর কেন, একশো বছরের বেশি হইয়া গেলেও বলরাম তাহাকে চিনিতে পারিতেন!

রক্তমাখা রক্তপদ্মের মতো যাহার মুখখানি সেই মেয়েটি মুক্তা। দশ বছর আগে না বলিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আজ আবার তেমনি না বলিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছে।

ক্রমশঃ

রবীন্দ্র-কাব্য-মাধুরী

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্-এ

...নাথের রচনার প্রাচুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য অফুরন্ত এবং তাঁহার ভাব-বৈচিত্র্য ...নাকুশলতাও বিস্ময়জনক। মানব-হৃদয়ের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ...ন্দ-বেদনাকে তিনি সুললিত ছন্দ ও সুবলয়িত সুষমায় মণ্ডিত ... একটি শাশ্বত বাঙ্ময় মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত করিয়াছেন,—

"যে নিঃশ্বাস তরঙ্গিত নিখিলের অশ্রুতে হাসিতে—
আমি তারে ধ'রেছি বাঁশিতে।"

...রবীন্দ্র-কাব্য যেন নিঃসীম অগাধ অতল একটি মহাসমুদ্র—অনন্ত ...আকর। এই অপরূপ ছন্দ, ভাব-গভীর, বিচিত্র প্রকাশ ভঙ্গিমায় ...ন্বিত, উচ্ছ্বল হৃদয়াবেগ স্পন্দিত কাব্যের রহস্যময় কল্পলোকে পদে আমাদের বিভ্রান্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে মহাকবির জিজ্ঞাসা অপরিমেয়—ভাষ্য সীমাহীন—দৃষ্টিভঙ্গী চির-...র্দ্ধমান ও নিত্য নবীনতায় সঞ্জীবিত। এই অনন্যসাধারণ প্রাচুর্য্য ও ...তার মধ্যে আমরা এরূপ বিমূঢ় হইয়া পড়ি যে অনেক সময় কবির ...র মূল সূত্রগুলি হারাইয়া ফেলি। একটি পুষ্প ও লতাগুচ্ছের ...ধ্যে মুগ্ধ—চমৎকৃত দর্শকের নিকট যেমন উপবনের সমগ্র রূপটি ধরা ...না, সেইরূপ রচনার পরম্পরা ও প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ...ল কাব্যেরও সমগ্র রূপটি ফুটিয়া উঠে না। ইহাও স্মরণ রাখা ...জন যে, ক্ষুদ্র খণ্ডের মাধুরী ও উজ্জ্বলতাটুকুও কাব্যের ক্ষেত্রে কম ...ান নয়; কাব্যের সমগ্রতা ও বিশালতার মধ্যে ইহা হারাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সম্পূর্ণের সপ্রতীতির পক্ষে এই তথ্যটি জানিয়া রাখা উচিত। কাব্যের প্রতি সুবিচার করিতে হইলে তাহার আংশিক ও সমগ্র—পরম্পরার সহিত সংযুক্ত ও তাহা হইতে বিযুক্ত দুইরূপই দেখা কর্ত্তব্য। এক একটি হিল্লোল যেরূপ নদী-প্রবাহের নিরবচ্ছিন্নতাকে অক্ষুণ্ণ রাখে, বিভিন্ন রূপ ও বিচিত্র ভঙ্গিমাও সেইরূপ কবির রচনাকে অসংখ্য তাৎপর্যের মধ্য দিয়া একটি অপূর্ব্ব সৌষম্য ও নিটোল পরিপূর্ণতায় সার্থক করিয়া তোলে। যে সকল তত্ত্ব আপাতদৃষ্টিতে অসমঞ্জস, অকিঞ্চিৎকর ও পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হয়, সমগ্রভাবে দেখিলে তাহাদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য, সঙ্গতি ও সমাধানের সূত্র আবিষ্কার করা সহজ হইয়া পড়ে।

কিন্তু "এহ বাহ্য, আগে কহ আর"। রবীন্দ্র-রচনার মর্ম্মকথা কি ? কোন্ সূত্রটি "মণিগণাইব" তাঁহার বিচিত্র কাব্য সৃষ্টিকে বিধৃত করিয়া আছে ? সংক্ষেপে ইহার উত্তর—অনন্তের সহিত সংযোগ ও নিবিড় বিশ্বাত্মবোধ। 'অনন্ত', 'অসীম', 'অজানা' প্রভৃতি শব্দগুলি একপ্রকার প্রহেলিকা সৃষ্টি করিবার সম্ভাবনা, কারণ এ গুলির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে হইলে যে মানসিক উৎকর্ষ, আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্য, স্বচ্ছ দৃষ্টি ও সর্ব্বসংস্কারমুক্ত হৃদয়ের প্রয়োজন তাহা সকলের নাই—থাকিতেও পারে না। মোটামুটি এইটুকু জানা প্রয়োজন যে, কবি অসীমের দৃষ্টিকোণ হইতে এই সসীম জগৎ ও জীবনকে দেখিতে ও উপলব্ধি করিতে

চাহিয়াছেন। বিশ্বের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত অথচ বিশ্বাতীত একটি বিরাট্ সত্তার মধ্যে সংসারের সকল তুচ্ছতা, খণ্ডতা ও ক্ষুদ্রতা বিলীন হইয়া গিয়াছে এবং সকল অনৈক্যের মধ্য হইতে একটি ঐক্যের সুর অহরহ ধ্বনিত হইতেছে—ইহাই তাঁহার জীবন-দর্শনের গোড়ার কথা। প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ জীবনের মধ্যে একটি অপূর্ণতা রহিয়াছে; সৃষ্টির মর্ম্মস্থল হইতে যে অবিশ্রান্ত গতিবেগ উৎসারিত হইতেছে তাহাই ইহাকে পূর্ণতার অভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। যাহা নিশ্চল ও স্থিতিশীল তাহা অপূর্ণ ও মিথ্যা সৃষ্টির মূল—Scheme of thingsএর সহিত সংযোগ নাই। কবির সম্পূর্ণ রচনাকে মনে হয় অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার উদ্দেশে অভিযান—সীমা হইতে অসীমে প্রয়াণ—সান্ত হইতে অনন্তের মধ্যে আত্মসমর্পণের আকুতি! এ যেন শেলীর—

The desire of the moth for the star,
of the night for the morrow,
The devotion to something afar
from the sphere of our sorrow.

বস্তুতঃ পূর্ণতার ধর্ম্মই রিক্ততা—"পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় ক্ষয়" করাই তাহার বৈশিষ্ট্য—সৃষ্টির মূলে যে অশ্রান্ত অগ্রগতি উহার সহিত একীভূতিই তাহার লক্ষ্য,—

শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও;
ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।'
কুড়ায়ে লও না কিছু ক'রো না সঞ্চয়;
নাই শোক, নাই ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।
যে মুহূর্ত্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্ত্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।

মোটামুটিভাবে বলিতে পারা যায় যে, অনন্তের জন্য কবির আকুলতাই তাঁহার সার্ব্বভৌম দৃষ্টিকে উদ্বোধিত করিয়াছে এবং তাঁহার বিশ্বজনীনতাকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। এই জন্যই তিনি ক্ষুদ্র খণ্ডের মোহ বর্জ্জন করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে আপনাকে সম্প্রসারিত করিতে চাহিয়াছেন।

জগতের মর্ম্ম হ'তে মোর মর্ম্মস্থলে
আনিতেছে জীবন লহরী।

ইহা শুধু নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত দ্রষ্টার নিষ্ক্রিয় উপভোগ নয়—বিশ্ব-বৈচিত্র্যের সহিত নিবিড় একাত্মবোধেরই ইহা একটি দৃষ্টান্ত।

স-শীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জরস্তড়িৎপতাকোঽশনিশব্দমর্দ্দলঃ
সমাগতো রাজবদুদ্ধতদ্যুতির্ঘনাগমঃকামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে।

ইহার মধ্যে প্রকৃতির যে চিত্রটি কালিদাস ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা সুন্দর হইলেও নিতান্তই বাহিরের চিত্র—প্রকৃতির অন্তরাত্মার সহিত তাহার কোনো যোগ নাই। এ দৃষ্টিভঙ্গীটি উদাসীন নিরাসক্ত দ্রষ্টার—ধ্যানীর নয় অথবা ইহা হৃদয়াবেগের দ্বারা অনুরঞ্জিতও নয়। অনুরূপ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা এ ক্ষেত্রে তুলনীয়। বিরাটের দৃষ্টিকোণ হইতে ধ্যান-নেত্রে দেখিয়াছেন বলিয়াই নিতান্ত পার্থিব বস্তুও তাঁহার কাব্যে 'মহতো মহীয়ান্' হইয়া উঠিয়াছে। নর-নারীর প্রেম—যাহা আমাদের নিকট একটি অতি সাধারণ জাগতিক ব্যাপার—যাহাকে আমরা হৃদয়ের প্রতি হৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণ ব্যতীত আর উচ্চতর কিছু কল্পনা করিতে পারি না, তিনি তাহার মধ্যে জন্মজন্মান্তরের একটি ধারাবাহিক সূত্রের সন্ধান পাইয়াছেন।

আমরা দুজনে এসেছি ভাসিয়া
যুগল প্রেমের স্রোতে

অথবা—

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার,
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

মৃত্যুর মত একটি ভয়াবহ বস্তুও তাঁহার কবিতায় মঙ্গল-আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে—তাঁহার শোক ব্যক্তিগতরূপ পরিগ্রহ না করিয়া বিশ্বজনীন হইয়া উঠিয়াছে।

হেথায় যে অসম্পূর্ণ সহস্র আঘাতে চূর্ণ বিদীর্ণ বিকৃত
কোথাও কি একবার সম্পূর্ণতা আছে তার জীবিত কি মৃত?
জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন ছিন্নরূপ ধরি'
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি তারে গাঁথিয়াছে আজি অর্থপূর্ণ করি?

এই জিজ্ঞাসার মধ্যে সীমা যে অসীমের মধ্যে বিলীন হইয়া সার্থক হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, অসম্পূর্ণ যে সম্পূর্ণতার অভিমুখে অহরহ প্রধাবিত হইতেছে কবি তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন—

রবীন্দ্র-কাব্যে যে আশা-বাদ (optimism) ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—যাহা জীবনের ব্যর্থতা, নশ্বরতা, অসম্পূর্ণতা ও কদর্য্যতার মধ্যেও আমাদের নিকট এই সান্ত্বনাটুকু বহিয়া আনে যে—

জীবনে যত পূজা হয় নি সারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা—

তাহা কবির প্রজ্ঞাদৃষ্টির ফল। ভূমার অনুভূতিই এই দৃষ্টিকে উদ্বোধিত করিয়াছে। সাধারণ মানুষের দুইটি চক্ষু—রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় নেত্র বিকশিত হইয়াছিল এবং এইজন্যই তাঁহার 'ঋষি' অভিধা সার্থক। যিনি সর্ব্বভূতের প্রাণের স্পন্দন আপনার প্রাণে অনুভব করেন, যিনি জীবনের সর্ব্বপ্রকার অসামঞ্জস্যের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিতে পান, যিনি সৃষ্টির নিষ্ঠুরলীলা প্রত্যক্ষ করিয়াও বলিতে পারেন—

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত,
খড়্গ তোমার হে দেব বজ্রপাণি চরম শোভায় রচিত।—

তিনিই তো প্রকৃত ঋষি ও দ্রষ্টা। কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থেরও প্রজ্ঞা দৃষ্টি ছিল এবং তাই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

Central peace
Subsisting for ever at the heart of endless agitation,

তাঁহার কাব্যেও সৃষ্টির সকল পদার্থের মধ্যে নিগূঢ় অন্তরাত্মাটির সন্ধান পাইবার অসংখ্য পরিচয় পাওয়া যায়। তিনিও তাঁহার নিজের কথায় বলিতে গেলে "Life of things" প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি অনেক সময় শুষ্ক নীতি ও নীরস তত্ত্বের পাষাণ-প্রাচীরে প্রহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—রসলোকে প্রবেশ করিতে পারে নাই। যদিও প্রজ্ঞা-দৃষ্টি রস-দৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু, তথাপি প্রজ্ঞা দ্বারা উদ্বোধিত হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্র-দৃষ্টি রসানুরঞ্জিত তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশ্বের সহিত ঐক্যানুভূতি যে দিন সহসা জাগ্রত হইল সেদিনের কথা কবি স্বয়ং বলিয়াছেন—

"একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না…"

অন্তরের অন্তস্থল এই যে সহসা একটি আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হওয়া ইহাই Cosmic Consciousnessএর উদ্বোধন। ওয়ার্ডসোয়ার্থও এই অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন—

That serene and blessed mood
In which......the breath of this corporeal frame,
And even the motion of our human blood,
Almost suspended, we are laid asleep
In body, and become a living soul :
While with an eye made quiet by the power
Of harmony, and the deep power of joy,
We see into the life of t' ·gs.

এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করা গেল তাহার সহিত সম্যক্ পরিচয় না থাকিলে—শাশ্বতের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষণিকের রূপ রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে কি ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে তাহা না জানিলে কবির রচনার মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু এস্থলে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। জগৎ ও জীবনের প্রতি তাঁহার একটি স্থায়ী দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ ভূমার উত্তুঙ্গ শিখর হইতে ইহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার একটি বিশেষ প্রচেষ্টা আছে বলিয়াই যে কবি কখনো অন্য কোনো একটি ভঙ্গীতে এগুলি দেখিবে না তাহা যেন আমরা মনে না করি। কবিতায় যে নানা Mood নানা সময়ে ফুটিয়া উঠে তাহা যেন ভুলিয়া না যাই। কবি অসীমের সহিত সংযুক্ত ও বিজড়িত করিয়া যেরূপ এ জীবনকে দেখিয়াছেন, উহার সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া ও ভূমা হইতে দূরে দাঁড়াইয়াও তেমনি জীবনের রসাস্বাদন করিবার বাসনা মাঝে মাঝে তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে। কেবলমাত্র "অকারণ পুলকে" উচ্ছ্বসিত হইয়া গান গাহিবার নেশা তাঁহাকে অনেক সময় পাইয়া বসিয়াছে এবং এই সময় সকল প্রকার হিসাব, যুক্তি ও তত্ত্বের কথা তুচ্ছ ও অসার বলিয়া মনে হইয়াছে। এই দৃষ্টি ও মনোভাবকে ক্ষণবাদীর দৃষ্টি ও মনোভাব বলা যায়।

ইহার স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন নয়। কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ের সুললিত ভাষায় বলি—

"আমাদের জীবনের কতকগুলি মুহূর্ত্ত অস্বাভাবিকরূপে উজ্জ্বল—কতকগুলি মুহূর্ত্ত একটা অকারণ আনন্দে মধুময়—কতকগুলি মুহূর্ত্ত হঠাৎ একটা গভীর গূঢ় সত্যকে উদ্ঘাটিত করিয়া ফেলে—কতকগুলি মুহূর্ত্ত যেন বৈচিত্র্যহীন জীবনে অনির্ব্বচনীয় ভাবগৌরবে রহস্যময়। জীবনে এই মুহূর্ত্তগুলির তুলনা নাই। এই মুহূর্ত্ত কচিৎ কখনও আসে—অরুণ-করোজ্জ্বল বুদ্বুদের মত জাগিয়াই বিলীন হইয়া যায়। অনাদরে অবহেলায় এইগুলিকে আমরা চিরদিনের জন্য হারাই, অথবা বুদ্ধি দিয়া অগ্রপশ্চাতের জীবন-ধারার সহিত তাহাদের মূল্য বিচার করিতে গিয়া সেগুলিকে উপভোগ করিতে পারি না। কবি নিজের চিত্তকে দেশকাল ও কার্য্য-কারণপরম্পরা হইতে বিযুক্ত করিয়া, বেষ্টান্তর—স্পর্শশূন্য করিয়া এই মুহূর্ত্তগুলিকে উপভোগ করিয়াছেন এবং ভাষা-ছন্দের বন্ধনে সেইগুলিকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন।"

'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থে এই ক্ষণবাদমূলক বহু কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতই এই কবিতাগুলিতে ভাঙ্গনের কূলে বসিয়া—ধ্বংসকে অবধারিত জানিয়াও মুগ্ধ উল্লসিত কবি-চিত্ত জীবন-পুষ্প হইতে লুব্ধ মধুপের মত মধুপান করিতে ব্যগ্র হইয়াছে। কাল-কবলিত সৃষ্টির ভয়াবহরূপ দেখিয়াও উপভোগ-আকুল কবি বিচলিত হইয়া উঠেন নাই। তিনি ভালোই জানেন যে—

থাকব না ভাই থাকবে না কেউ থাকবে না ভাই কিছু…কিন্তু তাই বলিয়া দুঃখ করা এবং জীবনের ক্ষণ-মাধুরী হইতে বঞ্চিত থাকা নিষ্ফল। অতএব—

ওরে থাক্ থাক্ কাঁদনি,
দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেরে
নিজ হাতে বাঁধা বাঁধনি।
যে সহজ তোর র'য়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নেরে বুকে,
আজিকার মত যাক্ চুকে যাক্
যত অসাধ্য সাধনি।

রবীন্দ্রকাব্যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, বিশ্বাত্মবোধ ও ক্ষণবাদ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা গেল তাহাতে ঐ গুলিকে কেহ তত্ত্ব হিসাবে দেখিলে ভুল করিবে। সর্ব্বাগ্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহার কবিতায় যদি কোনো তত্ত্ব স্ফুরিত হইয়া থাকে তবে উহাকে তাঁহার কবিপ্রকৃতির বিকাশ ও বিবর্ত্তনের মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে দেখিতে হইবে। উদ্দাম স্রোতের বেগে নদী-সিকতায় যেমন অসংখ্য ক্ষুদ্র লহরী জাগিয়া উঠে, কবির বিপুল সৃষ্টির চতুর্দ্দিকেও সেইরূপ বহু তত্ত্ব জাগিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার প্রকৃত দৃষ্টি রস-দৃষ্টি—প্রজ্ঞাদৃষ্টিলব্ধ ফলকেই তিনি রসানুলিপ্ত করিয়াছেন এবং ইহাই কবির ধর্ম্ম—তাত্ত্বিকের ধর্ম্ম নয়। যে পরম সত্যের দ্বার তাঁহার সম্মুখে উন্মোচিত হইয়াছে—যে প্রজ্ঞার ফলে তিনি বলিয়াছেন—

ধূলির আসনে বসি' ভূমারে দেখেছি ধ্যান-চোখে
আলোকের অতীত আলোকে—

তাহা কোনো কৃচ্ছ সাধনার দ্বারা সম্ভব হয় নাই—Intuitionএর দ্বারা

হইয়াছে। ব্যক্তি-জীবনের সহিত বিশ্ব-জীবনের যে নিগূঢ় ঐক্যানুভূতি তাঁহার কবিতার উৎসকে উৎসারিত করিয়া দিয়াছে তাহা রসময় ও সৌন্দর্য্যময়; চঞ্চল-জীবনের হেম-পাত্র হইতে রূপ-রস-গন্ধের উচ্ছলিত কবোষ্ণ মদিরা পান করিবার যে বাসনা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছে তাহাও দার্শনিক Hedonism নয়—কবিসুলভ মনোবৃত্তির ফল।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে আর একটি স্মরণীয় বিষয় এই যে, তাঁহার কবিতাকে জীবনের ভাষ্য হিসাবে দেখিলে একটি বিরাট কবি-মানসের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস তাহাতে পাওয়া যায়;—ইহা কম লাভ নয়। কাব্য জীবনেরই প্রতিবিম্ব। পৃথিবীর কতকগুলি কবির সম্বন্ধে একথা বেশী খাটে; রবীন্দ্রনাথ সেই সকল কবিদের মধ্যে অন্যতম। স্থিতিশীলতা তাঁহার মনের ধর্ম্ম নয়—কোনো তত্ত্বকেই তিনি চিরদিনের জন্য আঁকড়িয়া ধরেন নাই। এই অনন্ত গতির ফলে যে নব নব তত্ত্ব কবি-হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে তাহারই আলোকে তাঁহার কবিতাকে দেখিতে হইবে।

টেলিভিশন্

শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও শ্রীঅশোককুমার মিত্র

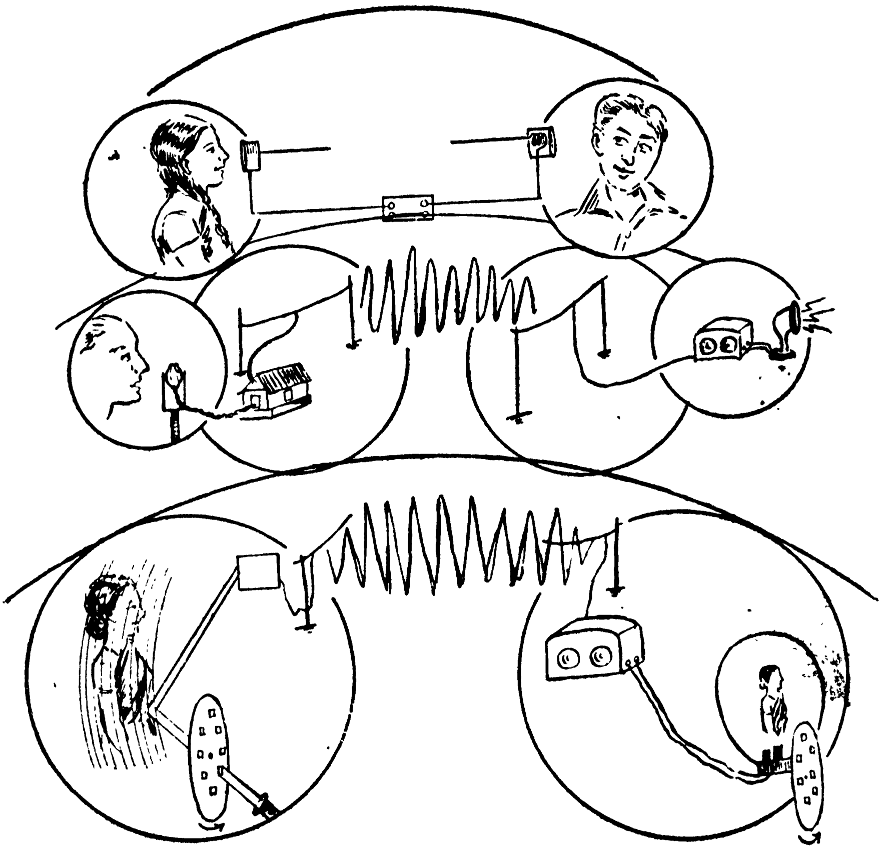
প্রথম পরিচ্ছেদ

আমাদের চোখের গঠন অসম্পূর্ণ। তার ফলে অসুবিধা হয়ত কিছু হয়েছে, কিন্তু সুবিধাও হয়েছে প্রচুর। চোখের অসম্পূর্ণতার সুযোগ নিয়ে আমাদের আমোদপ্রমোদের ক্ষেত্রও যথেষ্ট বেড়ে উঠেছে। তার মধ্যে সিনেমার কথা আমরা সবাই জানি। আমাদের চোখের মজা হ'ল এই, যে কোনও জিনিষ একবার দেখলে আমরা তাকে তখনি ভুলতে পারিনে। চোখের সামনে হয়ত একখানা ছবি দেখছি। সেখানা যদি চট করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে কিন্তু আমরা তখনই বুঝতে পারব না যে ছবিটা সরে গেল। বুঝতে খানিকটা সময় নেবে। চোখ অনেকটা ক্যামেরার মত। সামনে কোনও জিনিষ পড়লে তার ছবি পড়বে চোখের ভিতরে। দৃশ্যমান জিনিষ সরে গেলেও চোখের ভিতরকার ছাপ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যায় না, সামান্য একটু কাল থাকেই। অবশ্য এই সময়টুকু খুবই অল্প, এত অল্প যে শুনলে অবাক হতে হয়। এই সময়টুকু মাত্র এক সেকেণ্ডের বারো তেরো ভাগের একভাগ। হোক না এ ভুল সামান্য! কিন্তু এই সামান্য ভুলের সুযোগ নিয়েই বায়োস্কোপের ছায়া-ছবি গড়ে উঠেছে। সিনেমায় দেখতে পাই ছবি নড়ছে। সেখানকার মানুষ কথা কইছে, হাসছে, আরও কত কি! অথচ সত্যি সত্যি ত আর ছবির ভিতরকার মানুষ বা প্রাণীগুলি নড়ছে না। ধরা যাক, আমরা সিনেমার পর্দ্দায় দেখচি একটা লোক হাত দিয়ে টুপি তুলচে। কিন্তু কি করে এটি সম্ভব হ'ল? ছবির ভিতরকার মানুষটিই কি হাত তুলচে? মোটেই তা নয়। আসলে ওখানে একটিমাত্র ছবিই দেখানো হচ্ছে না। প্রথমে মানুষটির টুপি তুলবার বিভিন্ন অবস্থার পর পর কতগুলি ছবি তোলা হয়েচে। প্রথমটায় সে টুপিটায় হাত দিয়েচে। দ্বিতীয় ছবিটায় সে টুপি শুধু হাতখানা একটু তুলেচে। তারপরে ছবিখানায় আরও একটু তুলেচে। এই রকম করে ছবিগুলি তোলা হয়ে গেলে, সেগুলিকে একটার পর একটা করে চোখের সামনে ধরা হ'তে লাগল। যদি একটার পর একটা আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়াতে থাকে তাহ'লেই মজার ব্যাপার ঘটবে। প্রথম ছবিটার ছাপ চোখ থেকে মিলিয়ে যাবার আগেই সে সরে গেল, আর তার জায়গা দখল করল এসে দ্বিতীয় ছবিখানা। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ছবির ছাপ পড়লো চোখের ভিতর। অথচ প্রথমটার ছাপ কিন্তু তখনও মিলিয়ে যায়নি। তাই মনে ধাঁধা লাগে—সত্যিই কি একটা ছবি দেখলাম এবং তার ভিতরে কি দেখলাম! টুপিটা মাথার উপরে, আর হাতখানা টুপিটাকে ধরে আছে—এই, না টুপিশুদ্ধ হাতখানা মাথা থেকে সামান্য একটু উপরে? তখন মনের সঙ্গে চোখের একটা মিটমাট হয়। মনে হয় টুপিশুদ্ধ হাতখানাই যেন একটু উপরে উঠে গেল। এই ব্যাপার ঘটে এত তাড়াতাড়ি যে আমরা বুঝতেই পারি না আসলে কি কারসাজি করা হ'ল। এই হ'ল ছায়া-ছবির গোড়ার কথা।

একটা আগুনের গোলা যদি দড়ি বেঁধে খুব তাড়াতাড়ি ঘোরানো যায় তাহ'লে মনে হবে একটা আগুনের রিং। এখানেও সেই চোখের ভুল। আসলে আগুনের গোলাটা ত আর সমস্ত রিং জুড়ে নেই। কিন্তু আমরা যেদিকে তাকাই সেইখানে যখন গোলাটা এলো তখন তার ছবি পড়ল গিয়ে আমাদের চোখের ভিতর। গোলাটা সঙ্গে সঙ্গেই সরে গেল, কিন্তু চোখের ভিতরকার ছবিটা তখন তখনই মিলিয়ে যাবে না। গোলাটা যদি এত তাড়াতাড়ি ঘুরতে থাকে যে সেই ছবি চোখ থেকে মিলিয়ে যাবার আগেই সে ঘুরে আবার সেই জায়গায়ই আসে তাহ'লে মনে হবে, আগুনের গোলাটা তো নড়ছে না ওখান থেকে। এই রকম যে পথ দিয়ে আগুনের গোলাটা ঘুরচে, তার যে কোনো জায়গাতেই মনে হবে গোলাটা স্থির হয়ে আছে। আমরাও তাই একটা আগুনের রিং দেখতে পাবো।

আরও একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ইলেকট্রিক বাতি জ্বেলে আমরা হয়ত বই পড়চি। আলো এসে পড়চে সমস্ত পাতাটার উপরেই। এখানে আমাদের চোখের ভুলের সুযোগ নিয়ে এমন এক রকম আলোর বন্দোবস্ত করা যেতে পারে যাতে করে আলো এসে একই সময় সমস্ত

:পাতাটার উপর না পড়লেও আমাদের মনে হবে যেন আলো পড়েচে সমস্ত পাতাটা জুড়েই। আমরা যেমন পড়বার সময় বাঁ দিক থেকে ডানদিকে পড়তে পড়তে এগোই, আবার একটা লাইন পড়া শেষ হলে দ্বিতীয় লাইনের বাঁদিক থেকে সুরু করি, তেমনি স্থির আলোর বদলে ছোট একটা টর্চ্চ বাতি দিয়ে এক একটা লাইনের উপর বাঁদিক থেকে সুরু করে ডানদিকে আলো ফেলা হতে লাগল। প্রথম লাইনের শেষ পর্য্যন্ত আলো ফেলা শেষ হ'লে, ফের দ্বিতীয় লাইনের বাঁদিক থেকে আলো ফেলা আরম্ভ করতে হবে। তার পরে তৃতীয় লাইন। এই রকম করে যখন সমস্ত দিকে যখন আলো পড়েছিল তখনকার ছবি চোখ থেকে মিলিয়ে যাবার আগেই টর্চ্চের বাতিটা সমস্ত লাইনগুলির উপর আলো ফেলা শেষ করে ফের গোড়ার জায়গায় এসেচে—নতুন করে ঘুরে আসবার জন্য তাহ'লে আমরা চোখে দেখে বুঝতেই পারবো না যে একটা চলন্ত আলো দিয়ে পাতাটার উপর আলো ফেলা হচ্চে। মনে হবে একটা স্থির আলোতেই সমস্ত পাতাটা আলো হয়ে রয়েছে। কারণ যেখানেই তাকাই সেখানেই আলোর একটা ছাপ মেলাতে না মেলাতেই আবার সেখানে আলো এসে যাচ্ছে আর তার ছাপও পড়ে যাচ্ছে চোখের ভিতর। তাই মনে হবে



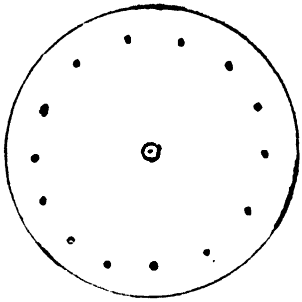
[টেলিফোন, বেতার এবং টেলিভিশনের তুলনা দেখানো হইয়াছে। টেলিফোনে তার বাহিয়া কারেণ্টের ঢেউএর উপর ভর দিয়া শব্দ যাইতেছে। বেতারে শব্দ যাইতেছে ইথার তরঙ্গের মাথায় চাপিয়া আর টেলিভিশনে ছবি যাইতেছে ইথার তরঙ্গের মাথায় পা দিয়া]

াতাটা শেষ হয়ে গেল, তখন আবার গোড়া থেকে সুরু হ'ল এই আলো ফলা। টর্চ্চের আলোটা যদি খুব ধীরে ধীরে নড়তে থাকে তাহ'লে াটা পাতাটার উপর একসঙ্গে আলো দেখতে পাবো না। যখন যে ায়গাটিতে আলো গিয়ে পড়বে সেই জায়গাটিই শুধু আলোকিত দেখব। ন্ত বাতিটা যদি এত তাড়াতাড়ি চলে' বেড়ায় যে প্রথম লাইনের গোড়ার বরাবরই সেখানে আলো রয়েছে। কোনও একটা জায়গার ছাপ আমাদের চোখে এক সেকেণ্ডের বারো-তেরো ভাগের একভাগ সময় ধরে থাকেই। তাই আলোটা যদি সেকেণ্ডে অন্তত বারো-তেরো বার গোটা পাতাটার উপর দিয়ে ঘুরে আসে তাহ'লেই হ'ল। শুধু এই কেন, যে কোনও জিনিষই এই রকম চলন্ত আলোতে দেখলে বোঝা যাবে না

যে আলোটা সত্যি সত্যিই চলে বেড়াচ্ছে কিনা। আলো নিয়ে এত যে খেলা হচ্ছে, সে কথা মনেই হবে না।

এইখানেই হ'ল টেলিভিশনের সুরু।

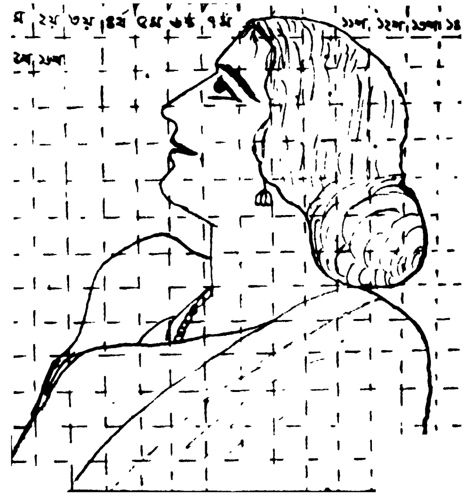
আমরা যে সামনের জিনিষ দেখতে পাই তার কারণ হ'ল তাদের কাছ থেকে আলো এসে পড়ে আমাদের চোখে। তবে সব জিনিষেরই যে নিজেরই আলো আছে এমন নয়। অনেকের নিজেরই আলো রয়েছে, যেমন সূর্য, পৃথিবীর প্রদীপ, এই সব। আবার অনেকের আলো ধার করা। জগতে এদের সংখ্যাই বেশী। সামনে যে বইখানা দেখছি তার নিজস্ব আলো বলতে কিছু নেই। কিন্তু সূর্য বা অন্য কোন বাতি থেকে আলো এসে পড়চে বইএর উপরে এবং সেথান থেকে তখন আলো ঠিকরে আসে আমাদের চোখে। তাই আমরা দেখতে পাই। যেখান থেকে যেরকম আলো আসচে সেইখানটিকে সেইরকম দেখবো। যেখান থেকে লাল আলো আসচে সে জায়গা মনে হবে লাল, আবার যেখান থেকে সাদা আলো আসচে সেখানটা মনে হবে সাদা। যেখান থেকে আলো আসচে খুবই কম সেই জায়গা মনে হবে কালো। আমরা রংএর কথা এখানে বাদ দিয়ে শুধু সাদা-কালোর কথাই বলব। যেমন আমরা দেখি বায়োস্কোপের ছবি সাদায়, কালোয়। এই রকম একটা ছবির কথাই



চোদ্দটা ফুটো-ওয়ালা ডিস্ক

ধরা যাক। এর চুল থেকে আলো আসচে বেশী, তাই কপাল মনে হয় ফর্সা। ছবির প্রত্যেকটি জায়গা সম্বন্ধেই এই একই কথা। ছবির বিভিন্ন অংশ যেমন নাক, কান, চোখের তারা এই সব থেকে বিভিন্ন পরিমাণ আলো এসে পড়ে আমাদের চোখে তাই আমরা এই সব আলাদা আলাদা বলে বুঝতে পারি। যদি কপাল আর চিবুক থেকে অবিকল একই আলো এসে পড়ত আমাদের চোখে, তাহ'লে আর চিবুক-কপালের পার্থক্য বোঝা যেত না—সব একাকার হ'য়ে যেত। আসল কথা হ'ল এই যে, শুধু বিভিন্ন পরিমাণ আলো বিভিন্ন অংশ থেকে আসচে বলেই তাদের পৃথক পৃথক করে চেনা যাচ্ছে। কোনও হাফ্‌টোন ছবি দেখলে এই কথাটি সহজেই বোঝা যাবে। সেখানে নাক-চোখ—সবই কম-বেশী কালো-ফুটকির সমন্বয় নিয়ে আঁকা হয়। যেখানে ফুটকিগুলি যত ঘন সেখান থেকে আলো আসবে তত কম।

হয়ত আমরা একটা মানুষের ছবি দেখচি—স্থির আলোতে নয়, সন্ধানী (চলন্ত) আলোয়। বইএর পাতায় যেমন পর পর লাইন সাজান রয়েছে, মনে মনে ছবিটাকেও সেই রকম লাইনে ভাগ করে ফেলা হ'ল। তারপরে একটার পর একটা করে লাইনের উপর দিয়ে ফেলতে হবে সন্ধানী আলো—খুবই তাড়াতাড়ি। সবগুলি লাইন যখন শেষ হয়ে যাবে তখন ফের আলো ফেলা সুরু হবে সবার উপরের লাইন থেকে। ছবির যে কোন জায়গা থেকে যে আলো ঠিকরে এসে আমাদের চোখে লাগে, আসলে এই আলোই সেই অংশটুকুর ছবির অনুভূতি জাগায়। ছবিটাকে মনে মনে অনেকগুলি ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে ফেললাম। মনে মনে নম্বর দিলাম—এক নম্বর অংশ, দু নম্বর অংশ—এই রকম। প্রত্যেক অংশ থেকে যে আলো আসচে তাকে চালান করে আনতে হবে দর্শকের সামনে পর্দার উপরে। কিন্তু পর্দার উপরে যে কোন জায়গায় এনে ফেললেই তো হবে না। আসল ছবির এক নম্বর অংশ থেকে যে আলো আসচে তাকে



[যে ছবি দূরে পাঠাইতে হইবে তাহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হইয়াছে]
fig III

আনতে হবে পর্দার উপরে যেখানে এক নম্বর অংশের থাকা উচিত। ছবির ডান চোখ হয়ত দশ নম্বর অংশে রয়েচে। তাই পর্দার উপরে সেখান থেকে আলো এনে ফেলতে হবে যেখানে দশ নম্বর অংশের থাকার কথা অর্থাৎ যেখানে ডান চোখ ফুটে ওঠা উচিত। আসল ছবির যেখানকার আলো, পর্দার উপরেও তাকে অনুরূপ জায়গায় নিয়ে আসতে হবে, এই-ই হ'ল দরকারী কথা। এ যেন আসল ছবির টুকরোগুলিকেই পর্দার উপর এনে ঠিক ঠিক জায়গায় সাজিয়ে দেওয়া।

ঠিক ঠিক জায়গায় নিয়ে আসার কাজ কিন্তু অন্য এক কৌশলেও করা যায়। পর্দার সামনে বসাতে হবে একটা ডিস্ক,—তার ভিতরে একটি ফুটো। ছবির যে কোন অংশ থেকে যে আলো আনা হচ্ছে তাকে ঠিক মত জায়গায় না ফেলে সমস্ত পর্দাটার উপর ফেলতে হবে। আর ঐ

ফুটোটিকে আনতে হবে দরকার মত জায়গায়। কারণ ফুটোর ভিতর দিয়ে গোটা পর্দাটাতো আর দেখা যাবে না। দরকারী জায়গাটাই শুধু দেখা যাবে। আমরা উদাহরণ দেবার বেলা বলেছি যে দশ নম্বর অংশের ভিতর রয়েছে ছবির ডান চোখ। সেখান থেকে যে আলো আসচে তাকে সমস্ত পর্দার উপর ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল। এখন ডিস্কের ফুটোটিকে আনতে হবে এমন জায়গায় যেখানে দশ নম্বর অংশের ছবি পড়া উচিত পর্দার উপরে, তাহলেই সেখানে ডান চোখ দেখা যাবে। তাই এক অংশের আলো পর্দার উপরে অনুরূপ জায়গায় না এনে, তার বদলে ফুটোটিকে অনুরূপ জায়গায় আনা হচ্ছে।

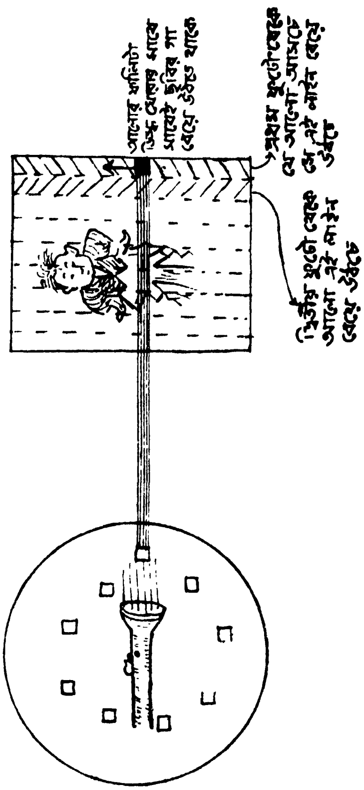
কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে সন্ধানী আলো যেমন ছবির বিভিন্ন অংশের উপর পড়চে তখনতখনই সেই সেই অংশ থেকে ঠিকরে-পড়া আলোকে কি করেই বা পর্দার উপরে আনা যায়, আর কি করেই বা ডিস্কের ফুটোটিকে ঠিক ঠিক সময়ে ঠিক ঠিক জায়গায় নিয়ে আসা যায়? কিন্তু তার আগে বেতারের সাধারণ দু'একটা কথা বলা দরকার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কথা বললে বা শব্দ করলে বাতাসে ঢেউ উঠতে থাকে, আর সেই ঢেউ যখন আর একজনের কানে গিয়ে লাগে তখন সে শুনতে পায়। এটা জানা কথা। কিন্তু এই শব্দকেই যদি অনেক, অনেক দূরের লোকের কাছে চালান করে দিতে হয় তাহ'লে একটু কৌশল করতে হ'বে। নিতে হ'বে কোন যন্ত্রের সাহায্য।

প্রথমেই মনে পড়ে টেলিফোনের কথা। টেলিফোনের ভিতরে থাকে দু'টি অংশ—একটা কথা-বলা কৌটো—মাইক্রোফোন, আর দ্বিতীয়টা শুনবার যন্ত্র—রিসিভার। মাইক্রোফোনের ভিতরে থাকে ছোট একটা ইবোনাইটের কৌটো, কারবনের গুড়োতে ভর্ত্তি। তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে একটা ষ্টিলের চাকতি দিয়ে। এই চাকতিটির সামনেই কথা বলতে হবে এবং কথা বললেই বাতাসের ধাক্কায় চাকতিটা কাঁপতে থাকে। তারই ফলে ভিতরকার গুড়োগুলি কখনও জমাট বেঁধে যায়, আবার কখনও বা যায় আলগা হয়ে।

এদিকে রিসিভারও ঠিক ঐ রকম একটি ইবোনাইটের কৌটা। তবে তার ভিতরে কারবন গুঁড়োর বদলে রয়েছে একটা তার-কুণ্ডলী। সেই কুণ্ডলীর ভিতরে আবার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে একখণ্ড লোহা। এরও মুখ বন্ধ করা হয়েছে একটি ষ্টিলের চাকতি দিয়ে। জড়ানো তার কুণ্ডলের ভিতর দিয়ে যদি ইলেকট্রিক কারেণ্ট বইতে সুরু করে তাহ'লে লোহাটা যায় চুম্বক হয়ে। কারেণ্ট বেশী গেলে এর জোর হয় খুব বেশী। আবার কম কারেণ্ট গেলে জোরও যায় কমে। এবারে মাইক্রোফোন আর রিসিভার জুড়ে দিতে হবে। প্রথমেই নেওয়া হ'ল ব্যাটারী। তার এক মাথা থেকে তার এনে জুড়ে দেওয়া হ'ল মাইক্রোফোনের চাকতিটির সাথে। আর একটা তার নিয়ে, তার একপ্রান্ত মাইক্রোফোনের কারবন গুঁড়োর ভিতর ঢুকিয়ে দিতে হবে, আর অপর প্রান্ত জুড়ে দিতে হবে রিসিভারের ভিতরকার জড়ানো তার কুণ্ডলীর এক প্রান্তের সাথে। সেই তার কুণ্ডলীর আর একপ্রান্ত এইবারে জুড়ে দিতে হবে ব্যাটারীর অপর প্রান্তের সঙ্গে। তাহ'লে, কারেণ্ট ব্যাটারী থেকে প্রথমে মাইক্রোফোনের কারবন গুঁড়োর ভিতর দিয়ে তার বেয়ে চলে যাবে রিসিভারের জড়ানো তারে। সেখানে তার কুণ্ডল পেরিয়ে ফের চলে আসবে ব্যাটারীতে। এই হ'ল কারেণ্টের পথ। এখন দেখা যাক, কথা বললে কী ব্যাপার দাঁড়ায়। আগেই বলেছি যে কথা বললে বা শব্দ করলে কারবন গুড়োগুলি কখনও বা জমাট বেঁধে যায়—আবার কখনও বা যায় আলগা হয়,



[এখানে যে ফুটাটি টর্চ্চের সামনে পড়িতেছে তাহার মধ্য দিয়াই শুধু আলো গিয়া ছবির উপর পড়িতেছে। ডিস্কটি ঘুরিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ছবির উপর আলোর ফালিটিও একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া যাইতেছে]

চাকতিটির ধাক্কায় ধাক্কায়। জমাট বাঁধা কারবনের ভিতর দিয়ে কারেণ্টের যেতে ভারী সুবিধা, আর আলগা গুঁড়োর ভিতর দিয়ে যেতে অসুবিধার একশেষ। তাই কথা বলার সাথে সাথে এই জমাট বাঁধা আর আলগা হবার দরুণ কারেণ্ট বেশী-কম হতে থাকে। সোজা কথায় বলা যায় কারেণ্টের মধ্যে ঢেউ উঠতে থাকে। এই ঢেউ অর্থাৎ কম-বেশী-হওয়া ইলেকট্রিক কারেণ্ট, তার বেয়ে চলে যায় রিসিভারের জড়ানো তারের মধ্যে। কিন্তু সেই তার কুণ্ডলের ভিতর দিয়ে কম-বেশী কারেণ্ট যাওয়াতে চুম্বকের জোরেও কম-বেশী হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সামনের চাকতিটির

উপরের কম-বেশী টান পড়তে থাকে। এই কম-বেশী টানের পাল্লায় পড়ে চাকতিটি কাঁপতে থাকে। বাতাসে ঢেউ ওঠে। সেই ঢেউ যখন কানে এসে লাগে তখনই কথা শোনা যায়।

দেখা যাচ্ছে টেলিফোনের ভিতরে বাতাসের ঢেউ দিয়ে কারেন্টের ঢেউ সৃষ্টি করা হচ্ছে। সেই কারেন্টের ঢেউকে তারের সাহায্যে পাঠানো হচ্ছে দূরে। সেখানে আবার কারেন্টের ঢেউ থেকে বাতাসের ঢেউ সৃষ্টি করে নেওয়া হচ্ছে।

এর পরে এলো বেতার। এখানেও মাইক্রোফোন রয়েছে। আর শোনবার প্রান্তে রয়েছে রিসিভার, হয় টেলিফোন, নয় লাউড্‌স্পীকার। এখানেও কথা বলার সাথে সাথেই কারেন্টের ঢেউ সৃষ্টি হ'তে থাকে ঠিক টেলিফোনেরই মত। তবে এখানে সেই কারেন্টের ঢেউ বয়ে নিয়ে যাবার জন্ম কোনও তার নেই। তখন খুঁজতে হ'ল অন্য কোন রকম বাহক। ইথারের ঢেউই হ'ল এই বাহক। ইথারের ঢেউ কারেন্টের ঢেউকে মাথায় করে নিয়ে যেতে পারে না। কারেন্টের ঢেউ দিয়ে তার গায়ে ছাপ মেরে দিতে হয়। সেই ছাপ মারা ইথার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে সব দিকে। শ্রোতা সেই ঢেউকে ধরে তার আকাশ তার দিয়ে। তার পরে তার রেডিও যন্ত্রের সাহায্যে এর কাছ থেকে ঠিক আগের মতই কারেন্টের ঢেউ সৃষ্টি করে নেয়। আর সেই কারেন্টের ঢেউ থেকেই টেলিফোনের রিসিভার বা লাউড্‌স্পীকার বাজতে সুরু করে।

এখানে দরকারী কথাটা হ'ল কারেন্টের ঢেউ দিয়ে ইথারের ঢেউকে ছাপ মেরে দেওয়া। টেলিভিশনেও এই একই ব্যাপার। সেখানে শুধু শব্দের বদলে আলো থেকে প্রথমে কারেন্টের ঢেউ সৃষ্টি করা হয়। তারপর সেই ঢেউ দিয়ে ছাপ মেরে দেওয়া হয়, ইথার ঢেউএর গায়ে। দর্শক সেই ছাপ মারা ইথার ঢেউ থেকে প্রথমে কারেন্টের ঢেউ সৃষ্টি করে, তার পরে সেই ঢেউ থেকে আবার সৃষ্টি হয় আলোর—শব্দের নয়।

এই হ'ল টেলিভিশনের মূল কথা।

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ-এস্‌-এস্‌, এফ-আর্‌-ই-এস্‌

(১৯)

উপসংহার

বর্ত্তমান প্রস্তাবটি সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে উমেশচন্দ্রের চরিত্র ও ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে দুইচারিটী কথা বলিব।

উমেশচন্দ্র তাঁহার জীবনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শের একটি সুন্দর সমন্বয় করিয়াছিলেন। কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, অপূর্ব্ব উদ্যমশীলতা ও অনুকরণীয় নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত অনন্যসাধারণ ত্যাগ, নির্ভীক তেজস্বিতা ও অসীম উদারতা তাঁহার মহান চরিত্রে সম্মিলিত হইয়াছিল। পরিবারের ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি স্নেহ, অতিথির প্রতি বাৎসল্য, দেশের প্রতি অসীম অনুরাগ, সর্ব্বভূতে দয়া, শরণাগতকে আশ্রয় দান, অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ তাঁহার চরিত্রকে মহনীয় করিয়াছিল। মাতা পিতা পিতামহ প্রভৃতির অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠা তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছিল। তখন এদেশের অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি কোমতের ধ্রুবদর্শনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ (যাঁহার পত্রে প্রিন্সিপ্যাল এস্‌-লব, আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, স্যর হেনরী কটন প্রভৃতি মনীষিগণ ধ্রুবদর্শনের আলোচনা করিতেন,) ইঁহাদের ন্যায় উমেশচন্দ্রের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপরেও কোমতের অসাধারণ প্রভাব পতিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। কিন্তু তিনি অন্তরের বিশ্বাস তিনি পিতৃপিতামহ প্রতিষ্ঠিত দেবতাদিগের পূজার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং নিজেকে হিন্দু ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ব ও গৌরব অনুভব করিতেন। যে ইংলণ্ডে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, সমাজহিতৈষী প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও স্বদেশপ্রেমিক উমেশচন্দ্রের চিতাভস্ম ধারণ করিয়া ভারতবাসীর নিকট তীর্থ-মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে, সেই ইংলণ্ডে উমেশচন্দ্রের সমাধির উপর খোদিত আছে—

"Here lives W. C. Bonnerjee, a Hindu Brahmin, who on his way home fell a victim to Bright's disease & etc"

অথচ উমেশচন্দ্র এত উদার ছিলেন যে কাহারও ব্যক্তিগত ধর্ম্মমতে তিনি হস্তক্ষেপ অনুচিত মনে করিতেন। এমন কি যখন তাঁহার পত্নী হেমাঙ্গিনী দেবী খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকেও উক্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেন তখন উমেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন তিনি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন না, ইচ্ছা করিলে তাঁহার পত্নী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। তিনি মনে করিতেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" হেমাঙ্গিনী দেবী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার মহান স্বামীর শ্রদ্ধা তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছিল এবং স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ইংলণ্ডের বাসভবন বিক্রয় করিয়া এদেশে আসিয়া হিন্দু বিধবাদিগের ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য ও একাদশীব্রত প্রভৃতি পালন করিতেন বলিয়া শুনা যায়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ৭ই জানুয়ারী ইঁহার মৃত্যু হয় এবং লোয়ার সার্কুলার রোড সমাধিক্ষেত্রের দক্ষিণ-পূর্ব্ব

কি, অপরিচিতগণও তাঁহার অপূর্ব্ব আতিথেয়তার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রগণ বিপদে পড়িলে তাঁহার নিকট অকৃপণভাবে অর্থসাহায্য ও সৎপরামর্শ লাভ করিত। এদেশে উমেশচন্দ্রের অবস্থানকালে কেহ মাতৃদায় বা পিতৃদায় জানাইলে তিনি মুক্ত হস্তে দান করিতেন। কিন্তু বিবাহে পণপ্রথার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং কন্যাদায় জানাইলে তিনি সাহায্য না করিয়া কন্যাকে উচ্চশিক্ষা দিতে পরামর্শ দিতেন। তিনি স্বয়ং পুত্রকন্যাগণকে উচ্চশিক্ষা দান করিয়াছিলেন



সুশীলা এনিটা বনার্জী

এবং বিবাহ ও ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহাদিগের স্বাধীন মতামত কখনও উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার পুত্রকন্যাগণের নাম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার চারিপুত্র ও চারি কন্যা হয়। যথাক্রমে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হইল :—

(১) কমলকৃষ্ণ শেলী—ইনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ৫ই মার্চ্চ জন্মগ্রহণ করেন ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন এবং কিছু-কাল অফিসিয়াল রিসিভারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি গার্ট্রুড নাম্নী এক ইংলণ্ডীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার এক পুত্র এডুইন শেলী প্রিভিকৌন্সিলের ব্যারিষ্টার হন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ৩০শে এপ্রিল কমলকৃষ্ণ শেলী দেহরক্ষা করেন এবং লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হন। ইঁহার শিশুকন্যা ডলি (জন্ম ৩রা জুলাই ১৮৯৬, মৃত্যু ৬ই জুলাই ১৮৯৬) ও নিকটে সমাধিস্থ আছে।

(২) নলিনী হেলইস—ইনি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ১০ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন ও অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। ইনি জর্জ্জ ব্লেয়ার নামক ইংলণ্ডীয় এক ব্যারিষ্টারকে বিবাহ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে জর্জ্জ ব্লেয়ার যোগদান করিয়াছিলেন এবং কর্ণেলের পদ লাভ করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ৮ই মে জর্জ্জ ব্লেয়ার এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জানুয়ারী নলিনী দেহত্যাগ করেন এবং উভয়েই লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হন।

(৩) সুশীলা এনিটা—১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ২রা অক্টোবর ইঁহার জন্ম হয় এবং লণ্ডনে এম-বি উপাধি লাভ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন। ইনি চিরকুমারী ছিলেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ—লক্ষাধিক মুদ্রা—তাঁহার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র লাহোর হাসপাতালে দান করিয়া গিয়াছেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ২৫শে সেপ্টেম্বর ইনি দেহরক্ষা করেন এবং লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হন।

(৪) কালীকৃষ্ণ উড—ইনিও ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন এবং রেঙ্গুন হাইকোর্টে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি উমেশচন্দ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেন এবং কখনও ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করেন নাই। বিক্রমপুরের কুলীন বংশসম্ভূতা শ্রীযুক্তা মৃণালবালা গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত ১৯১২ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুনে তাঁহার বিবাহ হয়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে কলিকাতার উপকণ্ঠে বালিগঞ্জের পণ্ডিতিয়া রোডের বাড়ীতে হৃদ্‌রোগে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁহার পত্নী হিন্দুমতে তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্যাদি সম্পাদন করেন। ইঁহার একমাত্র কন্যা কুমারী সাধনা দেবী বর্ত্তমান



মিষ্টার ও মিসেস এ-এন-চৌধুরী

বৎসরে কলিকাতাবিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ইতিহাসে এম-এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সম্প্রতি ইনি উমেশচন্দ্রের একখানি ইংরাজী জীবনী প্রকাশিত করিয়া ইঁহার সর্ব্বজনপূজ্য পিতামহের তর্পণ করিয়াছেন।

(৫) সরলকৃষ্ণ কীট্‌স্—ইনি অকালে পিতার জীবদ্দশাতেই ইংলণ্ডে পরলোকগমন করেন।

(৬) শ্রীযুক্তা প্রমীলা ফ্লোরেন্স—ইনিও অক্সফোর্ডে উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং এম্-এ উপাধিধারিণী। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সদস্য (ফেলো) এবং দেশে শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ আগ্রহশীলা। কলিকাতার খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার এ-এন্-চৌধুরীর সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে। ইঁহাদের তিনপুত্র ও এক দুহিতা। সকলেই অক্সফোর্ডে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়ন্ত সৈন্য



মিষ্টার ও মিসেস পি-কে-মজুমদার

বিভাগে কার্য্য করেন এবং কেশবচন্দ্র সেনের পরিবারস্থ এক মহিলাকে বিবাহ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র হেমচন্দ্র সৈন্যসংক্রান্ত বিমান বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। তৃতীয় পুত্র দিলীপও সৈন্য-বিভাগে নিযুক্ত আছেন। ইঁহাদের একমাত্র কন্যা মিসেস অমিতা মুখার্জী লক্ষ্ণৌ নিবাসী পবিত্রকুমার মুখার্জীকে বিবাহ করেন। মিষ্টার মুখার্জী নৌবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী।

(৭) রতনকৃষ্ণ কার্য্যাণ—ইনিও ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন এবং উৎকৃষ্ট ইংরাজী লেখক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কণ্ট্রোলার-জেনারেল রজনী রায়ের কন্যা অমিয়া রায়ের সহিত ব্রাহ্মমতে ইঁহার বিবাহ হয়। ইহার দুই পুত্র ভরত ও প্রতাপ। প্রতাপ মার্টিন এণ্ড কোং-এর অধীনে কাষ করিতেন। রতনকৃষ্ণের চারিটী কন্যাও উচ্চশিক্ষিতা—

(ক) শ্রীযুক্তা মৃণালিনী এমার্সন এম-এ—বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করেন।

(খ) শ্রীযুক্তা শীলা অডার,—চিত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী।

(গ) শ্রীযুক্তা অনিলা গ্রেহাম, এম্-এস্-সি—সরবরাহ বিভাগে উচ্চ পদে নিযুক্তা আছেন।

(ঘ) শ্রীযুক্তা ইন্দিরা টালিয়ান খাঁ। ইনি বোম্বাইয়ে টাটা কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী একজন সম্ভ্রান্ত পার্শীকে বিবাহ করিয়াছেন।

(৮) জানকী আগ্‌নিস্। দার্জিলিঙ্গের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার (ইসলাম-পুরের জমীদারবংশীয় মিঃ প্রিয়কৃষ্ণ মজুমদারের সঙ্গে ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহাদের এক পুত্র জয় প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেন এবং অপর এক পুত্র করুণকুমার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিমান-বহরে উইং কম্যাণ্ডারের সম্মানজনক উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু অকস্মাৎ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় উচ্চতর সম্মান লাভ করিয়া যাইতে পারিলেন না। ইঁহাদের এক কন্যা তারা দেবীর সহিত অক্সফোর্ড



তারাদেবী ও জয়পাল সিং

বিদ্যালয়ে শিক্ষিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হকি খেলোয়াড় জয়পাল সিংহের বিবাহ হইয়াছে।

উমেশচন্দ্রের সন্তানগণের মধ্যে মিসেস এ-এন-চৌধুরী এবং মিসেস পি-কে-মজুমদারই এক্ষণে জীবিতা আছেন।

উমেশচন্দ্রের অন্যতম খুল্লতাত শিবচন্দ্রের পুত্র—ইংলণ্ডের অন্যতম ধর্ম্মযাজক রেভারেণ্ড পিট বনার্জী উমেশচন্দ্রের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইনি একবার পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য পদপ্রার্থী হইয়াছিলেন কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সংকল্প পরিত্যাগ করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র টীকেন বনার্জী 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জিয়ানে'র সম্পাদকীয় চক্রে আছেন। টীকেনের পত্নী মার্জরীও উক্ত পত্রের একজন বিশিষ্ট লেখিকা। রেভারেণ্ড পিট বনার্জীর

ভ্রাতা ভার্ণন ম্যাকাই বনার্জীও উমেশচন্দ্রের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। ইনি বাঙ্গালার শাসন বিভাগে কায করিতেন। শ্রীযুক্তা সাধনা দেবীর



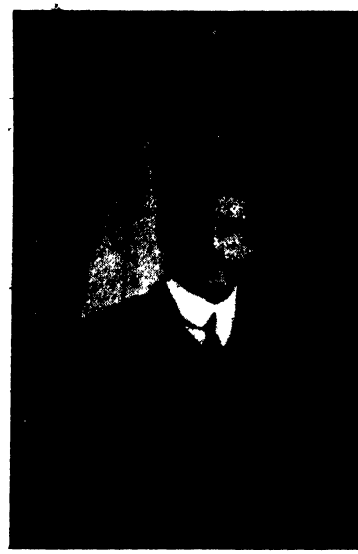
রেভারেণ্ড পিট বনার্জী

গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট পিট বনার্জীর স্মৃতিকথা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে উমেশচন্দ্র ইংলণ্ডে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তরের ব্যক্তিগণের সহিত মিশিতেন এবং তাঁহার সন্তানগণকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।



ডীকেন বনার্জী

সকলেই ইঁহাদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। তাঁহার স্মৃতিকথা হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে বিলাতে উমেশচন্দ্রের একটা ছোট-খাটো লাইব্রেরী ছিল, তাহাতে হাজার দুই বহি ছিল—অধিকাংশই ইতিহাস ও জীবনচরিতবিষয়ক। প্রাচীন সৎসাহিত্যের গ্রন্থ বেশী না থাকিলেও মোটামুটি তৎসম্বন্ধে তাঁহার বেশ জ্ঞান ছিল। তিনি মিল্টন হইতে ভাল ভাল অংশ আবৃত্তি করিতে ভালবাসিতেন কিন্তু মানব-হৃদয়ের গভীরতম ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া সেক্ষপীয়র ও ডিকেন্স তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। উমেশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ তাঁহার চরিত্রের সকল গুণকে অতিক্রম করিয়াছে। দেশকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন এবং দেশবাসী তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। সেইজন্য বিভিন্ন প্রদেশ-



ভার্ণন ম্যাকাই বনার্জী

বাসীর আচার, ব্যবহার, অত্যধিক রক্ষণশীলতা, কুসংস্কার সত্ত্বেও কেহই তাঁহার উদার হৃদয় হইতে দূরে যাইতে পারে নাই। কংগ্রেসের জন্য, বিশেষতঃ উহার ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটীর জন্য তিনি যে কত দূর অর্থ সাহায্য ও আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার পরিমাণ কখনও জানা যাইবে না। রায় বাহাদুর আনন্দ চার্লু একটী প্রবন্ধে যথার্থই লিখিয়াছিলেন :—

"উমেশচন্দ্র একজন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল যে বাক্য কেবল অসার পাতা এবং কার্য্যই ফল। তিনি দৃশ্যতঃ ভারতীয়দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ইংরাজী ভাবাপন্ন হইলেও অনুভূতি, প্রেম ও মনোভাবে ভারতীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভারতীয় ছিলেন। তিনি নেতার আসন অধিকার করিবার দাবী না করিলেও তিনি প্রকৃত-পক্ষে সকলকে পরিচালিত করিতেন এবং যখন পরস্পরবিরোধী শক্তিসমূহ কার্য্যক্ষেত্রে ব্যাঘাত জন্মাইবার চেষ্টা করিত এবং ব্যক্তিগত প্রাধান্যের

জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিদৃষ্ট হইত ; তখন তিনি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিরসাহায্যে সমস্ত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন এবং তাঁহার অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তারিত করিয়া সকলকে প্রভাবান্বিত করিতে পারিতেন। তাঁহার দান অসংখ্য ছিল কিন্তু উহা গোপনে অনুষ্ঠিত হইত, যেন প্রকাশ পাইলে তাঁহার বিশেষ লজ্জার কারণ ঘটিবে। এতদ্দ্বারা তিনি আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুজ্ঞা দৃঢ়ভাবে পালন করিয়াছিলেন—যে নয়টী গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে দান একটী। তিনি বৈদিক মন্ত্রের আদেশ "মাতৃ দেবো ভব"—"মাকে' দেবতার মত পূজা করিবে'—অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের মধ্যে তিনি হৃদয়ের কপাট মুক্ত করিয়া সকল কথাই তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া বলিতেন।"

কংগ্রেসের কার্য্যনির্বাহক সমিতি প্রভৃতিতে উমেশচন্দ্রের সুযুক্তিপূর্ণ অভিমত যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিত তৎসম্বন্ধে পরমেশ্বরণ্ পিল্লাই তদীয় Indian Congressmen নামক পুস্তকে যে একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অনেকটা আলোকপাত করে। তিনি লিখিয়াছেন :—"একদিনের ঘটনার কথা আমার স্মরণ আছে। পুণায় কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন হইতেছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে মিষ্টার মেটা ও মিষ্টার বনার্জ্জী ছিলেন। একটা বিষয়ের আলোচনায় কংগ্রেস নেতৃগণের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ উঠিয়া যথাশক্তি ওজস্বিতা ও বাগ্মিতাসহকারে তাঁহার অভিমত প্রকটিত করিলেন ও সভ্যগণের করতালি দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া পুনরুপবেশন করিলেন। তারপর মিষ্টার মেটা উঠিলেন এবং সুরেন্দ্রনাথের যুক্তিগুলি সহাস্য মুখে বিশ্লেষণ করিলেন, স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসরসিকতা দ্বারা সভ্যগণের মধ্যে হাস্যরসের সঞ্চার করিলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমিতির সদস্যগণকে তাঁহার স্বপক্ষাবলম্বী করিয়া ফেলিলেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রতিবাদে উত্তেজিত হইয়া পুনরায় গাত্রোত্থান করিলেন এবং অধিকতর ওজস্বিতার সহিত বক্তৃতা করিলেন, বক্তৃতার অপূর্ব্ব অলঙ্কারপূর্ণ উপসংহারাংশ শুনিয়া সদস্যগণ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। পরিশেষে উমেশচন্দ্র উঠিলেন এবং সরল সদ্যুক্তিপূর্ণ ও ওজস্বিনী বক্তৃতায় সুরেন্দ্রনাথের অভিমত খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। এই তর্ক-বিতর্ক প্রাণময়, উদ্দীপনাময়—প্রথম শ্রেণীর বিতর্কের মধ্যে গণ্য। ইহা যেন সিংহ, ভল্লুক ও ব্যাঘ্রের মধ্যে যুদ্ধ। আর একজন উপস্থিত থাকিলে ইহা আরও প্রাণময় ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত—যদি আর্ডলি নর্টন উহাতে উপস্থিত থাকিতেন! কংগ্রেসের ইতিহাসে একবার মাত্র এক স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষে কংগ্রেসের এই উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি কংগ্রেস পতাকাতলে সমবেত হইয়া প্রতিভার লীলা দেখাইয়াছিলেন। সেটী বোম্বাই কংগ্রেস। তথায় ব্রাড্‌ল উপস্থিত ছিলেন এবং ব্যবস্থাপক সভার পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিষয়-নির্বাচনী সমিতিতে বিতর্ক হইয়াছিল। বাস্তবিকই উহাতে প্রতিভা ও মনীষার অপূর্ব্ব লীলা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা, মেটার তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তি, উমেশচন্দ্রের সরল অথচ ন্যায় ও যুক্তিসমন্বিত অভিমত এবং সর্ব্বশেষে নর্টনের তীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী আক্রমণ!"

ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে উমেশচন্দ্র অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, সমাজে অনন্যসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রভাব, সমস্ত অর্থ প্রয়োজন হইলেই তিনি দেশের জন্য নিয়োজিত করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। কেন্দ্রীয় পরিষদের অন্যতম সদস্য সুপণ্ডিত রাজনীতিবিদ্ শ্রীযুত প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের খরচের জন্য ৭৫০০্ ঘাট্‌তি হয়। এটর্ণি ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উহা পূরণ করিবার জন্য কয়েকজন ধনীর দ্বারস্থ হইবার সংকল্প করেন। উমেশচন্দ্রকে বলিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ ৭৫০০্ টাকার চেক সহি করিয়া দিয়া বলেন এই সামান্য টাকার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিবার প্রয়োজন নাই। উমেশচন্দ্র



ভূপেন্দ্রনাথ বসু



লেখক

নীরবে দেশসেবা করিতে ভালবাসিতেন, তিনি সেই Last infirmity of a noble mind—মহৎ ব্যক্তিগণের একমাত্র দুর্ব্বলতা—যশাকাঙ্ক্ষা

হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ছিলেন। আমাদের স্বর্গত শ্রদ্ধেয় বন্ধু নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় যে সুন্দর সনেটে এই অকৃত্রিম দেশপ্রেমিকের 'তর্পণ' করিয়াছেন তাহাই পুনরুচ্চারিত করিয়া আমরা তাঁহার উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি :—

"বিধিদত্ত প্রতিভায় করি আরোহণ,
কৃতিত্বের—সাফল্যের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায়,
ব্যবহারাজীব কার্য্যে তুমি বাঙ্গালায়
লভিলে অতুল যশ, প্রতিপত্তি ধন।
উৎসাহে তোমার পন্থা করিয়া গ্রহণ,
জয়ী হ'য়ে ঘোরতর প্রতিযোগিতায়
লভিয়াছে শ্রীসৌভাগ্য ইষ্ট সাধনায়
তোমার স্বদেশবাসী আজি কতজন।

স্মরণীয় সদাশয় হিউমের সাথে
ভারতে 'জাতীয় মহাসমিতি' গঠনে,
ভারতবাসীর প্রাণে একতা জাগাতে—
বদ্ধ-পরিকর হ'য়ে কায় মনে ধনে
দেশের যে হিত তুমি সাধিলে, তাহাতে
তব নাম চিরদিন গাঁথা রবে মনে।"

সমাপ্ত

সিঁড়ি

শ্রীভবেশ দত্ত

বড় সাহেব পার্শোনাল এ্যাসিষ্টাণ্টকে ধমক দিলেন—তোমার কাছ থেকে এ ধরণের ভুল হিসাব পাওয়া খুবই দুঃখের বিষয়—একটা responsible post নিয়ে আছো—আর তোমারই কাজে এত ভুল, যাও clear out।

পার্শোনাল এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট বড় একটা সেলাম দিয়া নিজ অফিসে আসিয়া ফোন করিলেন বড়বাবুকে।

বড়বাবু কাছা আঁটিতে আঁটিতে হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া মিলিটারী ভঙ্গীতে স্যালুট দিয়া দাঁড়াইলেন।

পি-এ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—আপনার কাজ মোটেই প্রশংসনীয় নয়, কাজে এত ভুল—সামান্য হিসাবেই আপনার এত ভুল You are going to be a worthless day by day—যান আমার সামনে থেকে, মন দিয়ে কাজ কোরতে হয় কোরুন, না হয় resign দিন।

বড়বাবু কাঁচুমাচু হইয়া হাত কচলাইতে লাগিলেন।

পি-এ ধমক দিলেন—Get out from my Chamber।

বড়বাবু অগ্নিশর্ম্মা হইয়া অফিসে আসিয়া ডাক দিলেন ছোটবাবুকে, ছোটবাবু অনাদি সবেমাত্র নস্য নাকে লইয়াছিল রুমাল দিয়া নাক মুছিতে মুছিতে বড়বাবুর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, বড়বাবু বলিলেন—তুমি একটা idiot বুঝেছো—তোমাকে আমি Discharge কোরব—সামান্য যোগ বিয়োগ তুমি কোরতে পারো না, আমি report কোরব সবায়ের নামে—নোতুন staff recruit কোরব।

অনাদি অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল।

বড়বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—Get out, সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।

অনাদি তাহার জামার আস্তিন গুটাইয়া বাহিরে আসিয়া অফিস বয় ইব্রাহিমকে ডাক দিলেন।

ইব্রাহিম কাছে আসিতেই অনাদিবাবু তাহার গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া দুটো চড় মারিয়া বলিলেন—তোমার বড় বাড় হোয়েছে, তাই নয়, কোন কথাই কানে যায় না। অফিসটা এমন অপরিষ্কার হোয়ে রয়েছে, চোখে দেখতে পাও না।

অনাদি বেগে অফিসে চলিয়া গেলেন।

ইব্রাহিম ঝাড়ুওয়ালা বংশীকে চীৎকার করিয়া ডাকিল—বংশী কাছে আসিতেই ইব্রাহিম বলিল—তোমার হাজরী আজ বাবুদের চোখে কাটিয়ে দেবো—কোন কাজই তুমি করো না।

বংশী হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—হুজুর, মারা যাবো। হাজরী কাটিয়ে দেবেন না।

ইব্রাহিম গম্ভীর হইয়া বলিল—ভাগো হিয়াসে—

আজাদ হিন্দের অঙ্কুর

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

পরের ইতিহাস কলঙ্ক ও বেদনার ইতিহাস। ১৯৩৯-৪০ সাল বিগত। মাঝখানে একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। সে ভীষণ দুর্য্যোগে বঙ্গদেশ, তাই বা কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনীতি বিপর্য্যস্ত—পর্য্যুদস্ত। ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজি কর্তৃক কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত (মনোনীত?) হইয়াছিলেন। আমাদের মনে আছে এই বৎসরে সর্ব্ববয়ঃকনিষ্ঠ সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে গান্ধীজী রাষ্ট্রপতি সম্বোধনে সমাদৃত করিয়াছিলেন; তদবধি রাষ্ট্রপতি অভিধানটিই সুপ্রচলিত। ১৯৩৯ সালে, সুভাষবাবু গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের উচ্চ মণ্ডলের মতের বিরুদ্ধে পুনরায় রাষ্ট্রপতি পদ অধিকারের চেষ্টা করেন এবং নির্ব্বাচনে. হাইকম্যাণ্ডের গান্ধীজী মনোনীত 'শ্লথগতি' প্রবীণ পট্টভি সীতারামিয়ার পরিবর্ত্তে ঝঞ্ঝাগতি নবীন সুভাষচন্দ্রের জয়ের এতদ্ভিন্ন অন্য কারণ থাকিতে পারে না। গান্ধীজী স্বয়ং এই পরাজয়কে তাঁহার ব্যক্তিগত পরাজয় বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পরবর্ত্তী কাহিনী অত্যন্ত বিরস ও তিক্ত। এতদিন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে গান্ধীজী মহামানবের প্রাপ্য পূজা পাইতেন, এখন হইতে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিল যে পদে পদে পূজার অঙ্গহানি ঘটিলেও বাঙ্গালীর মনস্তাপ জন্মিল না।

১৯৩৯এর কংগ্রেস অধিবেশন হইল, জব্বলপুর সন্নিকটস্থ ত্রিপুরীতে। কংগ্রেসে না আসিয়া গান্ধীজী সেই সময়ে রাজপুতানার রাজকোট নামক এক ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যের শাসন সংস্কার সম্পর্কে রাজ্যের সীমান্ত দ্বারের লৌহ কপাটে মাথা ঠুকিতে সুরু করিয়া দিলেন; আর তাঁহার অনুচরবর্গ—উচ্চমণ্ডল—ত্রিপুরীতে অভিমন্যু-বধের পুনরভিনয়ের আসর পাতিলেন। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিসদৃশ পরিস্থিতি এতই দুষ্পাচ্য হইয়া পড়িয়াছিল যে আমার মনে আছে, আমি আমার দুইজন রাজনৈতিক বন্ধু সমভিব্যাহারে ত্রিপুরী পরিহরি বহুবারদৃষ্ট নর্ম্মদার জলপ্রপাত ও মদনমহল দর্শনও



কলিকাতা কর্পোরেশনের ক্ষুদ্র বৃহৎ তুচ্ছ মহৎ সর্ব্বকার্য্যে সুভাষচন্দ্রের আন্তরিক সংযোগ ঐতিহাসিক সত্য। কর্পোরেশনের ক্ষুদ্র একটি ব্যাঙ্কের উদ্বোধনে সুভাষচন্দ্র, মধ্যস্থলে চীফ ইঞ্জিনীয়ার ডক্টর বি, এন্, দে ও প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা জে, সি, মুখার্জ্জি (পার্শ্বে)

দারুণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও জয়লাভ করিয়াছিলেন। উচ্চমণ্ডল সহিত গান্ধীজীর পরাজয় এবং সুভাষচন্দ্রের বিজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উচ্চমণ্ডলের ধীরমন্থর গতির বিরুদ্ধে দেশের জনমত কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল এবং একটা বিশাল ও বিস্তৃত অংশ সুভাষচন্দ্রের অধীর, অস্থির ও দ্রুতগতিকেই পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক গতি মুক্তির প্রকৃষ্ট পন্থা বিবেচনা করিতেছিল। সংখ্যায় তাহারাই অধিক, সেই সংখ্যাধিক্য সুভাষকে জয়মাল্য দান করিয়াছিল।

স্বাস্থ্যকর বিবেচনা করিয়াছিলাম। ত্রিপুরীর তুলনায় মর্ম্মরমণ্ডিত নর্ম্মদা স্বাদু ও স্বচ্ছ বোধ হইয়াছিল।

সুভাষচন্দ্রকে চিরকাল প্রবল ও সবল জননায়করূপেই আমি (সকলেই) দেখিয়াছি। কিন্তু এই সময়ে যে দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা, তখনকার দিনে বহু বাঙ্গালীকে ব্যথিত করিয়াছিল। কংগ্রেসের একটি কর্ম্ম পরিষদ আছে, সাধারণতঃ ওয়ার্কিং কমিটি নামে খ্যাত। সদস্য সংখ্যা ১৩ কিম্বা ১৫। সভাপতি সদস্য নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। সুভাষচন্দ্র ইচ্ছা করিলে তাঁহার কর্ম-পরিষদ গঠন করিতে পারিতেন, করা তাঁহার উচিত ছিল কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ গান্ধীজীর আশীর্ব্বাদ ও উচ্চমণ্ডলের সহযোগিতা যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন। কলহ আবর্ত্তিত আবহাওয়ায় ঐ দুইটি বস্তুই অপ্রাপ্য না হইলেও দুষ্প্রাপ্য, সকলেই তাহা জানিত; সুভাষচন্দ্রও যে না জানিতেন, তাহাও নহে। তথাপি কেন যে তিনি মনোনীত কর্মী লইয়া ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে বিরত রহিলেন, বুঝি নাই। ত্রিপুরীর সপ্তরথী রচিত দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া যখন সুভাষচন্দ্র, জামাডোবায় তাঁহার অন্যতম অগ্রজের (শ্রীযুত সুধীর বসুর) গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন সেইখানে এক সুদীর্ঘ পত্রে ঐ পরামর্শ দিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেও আমাদের বাধে নাই। কয়েকদিন পরে, কার্সিয়ঙের গিধা পাহাড়ে পরম শ্রদ্ধেয় (মেজদা) শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর পার্ব্বত্য বিরাম মন্দিরে চা বৈঠকে, শরৎবাবুকেও আমি সাধারণ (অর্থাৎ আমাদের মত গোলা) বাঙ্গালীর বাসনা বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলাম। কিন্তু না, কাল-বৈশাখী অত্যাসন্ন, গতি রোধে কাহার সাধ্য?

অমোঘ অদৃষ্ট—যাহাকে আমরা নিয়তি বলি—কেমন কদমে কদমে সুভাষচন্দ্রকে দূর হইতে দূরান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তখনকার দিনে তাহা দুনীরিক্ষ থাকিলেও, এখন চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। নিয়তির বিধান যে অখণ্ডনীয় অপরিবর্ত্তনীয়, তাহা অস্বীকার করিবার ধৃষ্টতার আদৌ অবসান ঘটে। ঝড়ে আপন ঘরখানি উড়িয়া গিয়াছিল বলিয়াই না সুভাষচন্দ্র সমগ্র এসিয়া মহাদেশকেই আপনার ঘর করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন? ভারতীয় কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইয়াছিল বলিয়াই না অভিনব এবং অভাবনীয় কংগ্রেস সৃজিত হইতে পারিয়াছিল! পৃথিবীর যে ইতিহাস রচিত ও পঠিত হইয়া থাকে আর যে ইতিহাস আজও রচিত হয় নাই, ভবিষ্যকালের নরনারী যে ইতিহাস পাঠ করিবার ভরসা রাখেন, তাঁহাদিগকে আমি ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ইতিবৃত্তের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে বাধ্য। নিয়তি অদৃশ্য, অদৃষ্ট ও প্রবল পুরুষকার যেন অভিন্নহৃদয় সুহৃদ—সঙ্গের সাথী হইয়া সুভাষের সঙ্গে পথে প্রান্তরে, অরণ্যে, রণে, বিজয়ে পরাজয়ে হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। এমন অন্ধ কে আছে যে যাহা দেখিতে পায় না?

কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেসের বৃহত্তর পরিষদের অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের পতন ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের অভ্যুত্থান। তৎসঙ্গে "বন্দেমাতরম"-এর অঙ্গচ্ছেদ। দুইটার কোনটাকেই বাঙ্গালী সুস্থচিত্তে অথবা সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই, ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী জাতিটাই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে, আজ, স্মরণ করিতেও দুঃখ ও লজ্জা হয় যে ক্ষোভের আধিক্য অত্যন্ত অশোভন হইয়া অতিথিপরায়ণ বঙ্গদেশের শুভ্র অঙ্গ দুরপনেয় কলঙ্কের কালিমায় মসীবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মর্ম্মান্তিক পরিতাপ এই যে, মহান হইতে মহীয়ান্ মহাত্মা গান্ধীকেও ক্ষোভাগ্নির উত্তাপ স্পর্শবিরত হয় নাই। অগ্নি চিরদিন অন্ধ। এই দৃষ্টিহীন অন্ধ অগ্নি বহুদিন ধরিয়া বহু দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং সুভাষচন্দ্র পরিকল্পিত সেই কংগ্রেস ভবনটিও অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গেল।

জমি পাওয়া গিয়াছে, আগেই বলিয়াছি। কর্পোরেশনে সুভাষের ভক্তবৃন্দ প্রস্তাব করিলেন, ঐ জমিতে গৃহনির্ম্মাণকল্পে নগদ এক লক্ষ টাকা সুভাষচন্দ্রকে প্রদত্ত হোক। কর্পোরেশনে সুভাষচন্দ্রের অমিত প্রতাপ, সামান্য বিরোধিতা ব্যর্থ করিয়া প্রস্তাব পাশ হইয়া গেল; কিন্তু টাকা বাহির হইল না। কেন, তাহা এখনই বলিতেছি।

পাঠিকা ও পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিতেছেন যে ঠিক নয় মাস পূর্ব্বে, ডালহাউসী পর্ব্বতে বসিয়া সুভাষচন্দ্র যে পরিকল্পনা আভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই ব্লু প্রিন্টে—বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছে। হে মোর দুর্ভাগা দেশ, মহোচ্চ পরিকল্পনার কি শোচনীয় পরিণতি!

কর্ম্মবীর স্বদেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্রের তেজস্বিতায়, বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া কর্পোরেশনের সভায় যাঁহারা লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়া দেশাত্মবোধের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, কয়েক ঘণ্টা পরে, তাঁহারাই অনেকে দল বাঁধিয়া, ঘোঁট পাকাইয়া প্রস্তাবটিকে পণ্ড করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া, কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার শরণ লইলেন, লাখ না হয় ফাঁক। তাঁহাদের কাজটা নিশ্চয় নিন্দার্হ। কিন্তু কারণও কিছু ছিল; অকারণ বলিতে পারিব না। ডালহাউসী (পাহাড় নহে পুকুর) তটোপরি অবস্থিত প্রাসাদাভ্যন্তরে চির বিদ্যমান জুজুর ভয়ে অনেকের হৃদয় বিকম্পিত ছিল। জুজুর ভয় কবে বা কোথায় নাই? তখনকার মন্ত্রিবর্গের চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণের

হইলেও, মন্ত্রিমণ্ডলের মনিবগণের চর্ম্মের বর্ণ শ্বেত। বিশ্ববিধাতার বিশ্ববিধানে বিধি এই যে, শ্বেত আদেশ দিবে, কৃষ্ণ পালন করিবে। গোরোচনা গৌরী মান করিবে, কৃষ্ণকায় কৃষ্ণ মানভঞ্জনের পালা গাহিবে। কৃষ্ণকায় পরিচালিত কৃষ্ণবর্ণ কর্পোরেশনের উপর শ্বেতবর্ণের নীল নয়ন কোনদিনই প্রসন্ন ছিল না। কাণাঘুষার কথা রটিল যে শ্বেত, কালো মাথায় মাথট, বসাইয়া লুণ্ঠিত লক্ষ মুদ্রা পুনরুদ্ধারে দৃঢ় সঙ্কল্প। "অমন অবস্থায় পড়লে অনেকেরই মত বদলায়।" আর একটা গৌণ কারণও ছিল। সুভাষের রাষ্ট্রপতি পদত্যাগের পর হইতে, সগান্ধী কংগ্রেসের উচ্চমণ্ডলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের যে ঘূর্ণিবাত্যা বঙ্গদেশকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল, তাহার প্রবল বেগ তখনও মন্দীভূত হয় নাই। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িয়া, পুরাণের বিশ্বামিত্র ঋষির অনুসরণে নবীন কংগ্রেস



রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক মহাজাতি-সদনের ভিত্তি স্থাপন। মাইকে সুভাষচন্দ্র ; ছবির বামদিকে মৃত্তিকাসনে সুভাষাগ্রজ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু

[কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সৌজন্যে]

গঠন করিয়াছেন, নাম দিয়াছেন, ফরওয়ার্ড ব্লক। নব্য কংগ্রেসের চেলা চামুণ্ডারা বৃদ্ধ কংগ্রেসকে হাড়গোড় ভাঙ্গা দ করিয়া ফেলিয়া তবে শান্ত হইবে, বাজার এমন গরম। প্রাদেশিকতার ভূতপ্রেত দক্ষযজ্ঞান্তে নন্দী ভৃঙ্গীর মত তাণ্ডবের ধুয়া-নাচ নাচিতেছে। প্রাদেশিকতার ভূতটি বাঙ্গলার স্কন্ধে আর প্রেত মহোদয় বিহারের ঘাড়ে চড়িয়া বসিয়াছে। ঢিলের আঘাত ও পাটকেলের প্রত্যাঘাতে অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলা দেশ হইতে গালাগালির যে গ্যাস ছুটিতেছিল, নিতান্তই গ্যাস-প্রুফ বলিয়া গান্ধীজী ও তাঁহার অনুচরবর্গ সে যাত্রা পরিত্রাহি ডাকিয়াই বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। নতুবা নিধন নিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বর্ণে বর্ণে ও অক্ষরে অক্ষরে কথাগুলা রূঢ় হইলেও আমার এই কথা সত্য। কর্পোরেশনে এক দল লোক ধুয়া ধরিয়া ফেলিল; বলিল, রাধাও নাচিবে না, তেলও পুড়িবে না অর্থাৎ লক্ষ টাকায় জাতীয় ভবনও হইবে না, জাতীয় বাহিনীও গঠিত হইবে না, টাকাগুলি গান্ধী মারণ যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিতেই শেষ হইয়া যাইবে! তাহারা আইনের প্যাচে ফেলিয়া চাফকে আটকাইয়া দিল। গভীর রাত্রে, ক্যামাক ষ্ট্রীটে চীফের ভবনে আসিয়া, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর সাধ্যসাধনা-রোষক্ষোভ সমস্তই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়া গেল। আমাদের স্নেহভাজন কাউন্সিলার শ্রীমান সুধীর রায়চৌধুরী বিজয়সিং নাহার, মৃগেন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি সুভাষ ভক্তগণও ব্যর্থমনোরথ হইলেন। শেষ চেষ্টা হিসাবে তাঁহারা সুভাষচন্দ্র ও চীফের সাক্ষাৎ আলাপের ব্যবস্থা করিলেন। যেদিন প্রভাতে 'গুহক মিলন' হইবে সেইদিন অতি প্রত্যূষে, কাক কোকিল শয্যা ত্যাগ করিবারও পূর্ব্বে, আমার ঘরের টেলিফোনের ঘণ্টা ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল; টেলিফোন কাণে দিতেই, বঙ্কিমের চন্দ্রশেখরের "অগাধ জলে সাঁতার" শীর্ষক পরিচ্ছদের গুটি কয়েক ছত্র অন্তরে বীণার তারে ঝঙ্কার তুলিল।

"প্রতাপ ডাকিল, শৈবলিনী—শৈ"—

শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল, হৃদয় কম্পিত হইল। * * * কত কাল পরে! বৎসরে কি কালের মাপ! ভাবে ও অভাবে কালের মাপ। শৈবলিনী কত বৎসর সেই শব্দ শুনে নাই, সেই এক মন্বন্তর। * * * চক্ষু মুদিয়া বলিল,"প্রতাপ, আজিও মরা এই গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?"

কতকাল পরে! সুভাষচন্দ্র স্মরণ করিয়াছেন কিন্তু আনন্দে নিরানন্দ। তাঁহাকে সে কথা বলিলাম। সুভাষচন্দ্র বলিলেন, তা বললে হবে না, টাকাটা চাই। মিঃ মুখার্জ্জি আমার এখানে আসবার আগে আপনি তাঁকে বলুন।...ডালহাউসী পাহাড়ে সাহায্য করবেন, প্রতিশ্রুত ছিলেন, মনে আছে?

"বসি সেই শিলাতলে
নির্ঝরিণী কোলে
বলেছিলে কত কথা
ভুলিলে কেমনে?"

ভুলি নাই! ভুলি নাই!!

হাতী ঘোড়া উট সব তলাইয়া গিয়াছে, মশা পারিবে জল মাপিতে? মিঃ জে-সির মত বন্ধুবৎসল বন্ধু বিরল এবং আমার সৌভাগ্যক্রমে দীর্ঘকাল (আজ পর্য্যন্ত) আমার এই উচ্চহৃদয় সুহৃদের নিরবচ্ছিন্ন স্নেহসম্ভোগের সুযোগ হইলেও, কর্পোরেশনের ব্যাপারে, যেখানে রাজায় রাজায় যুদ্ধ, সেখানে উলুখাগড়ার করণীয় কিছু থাকিতে পারে না জানিয়াও, কাঠবিড়ালীর ভূমিকা অভিনয় করিতে পশ্চাদপদ হওয়াটা ভাল মনে হইল না। কিন্তু আমি ত তৃণাদপি সুনীচেন, সুভাষচন্দ্রকেও ব্যর্থ হইতে হইয়াছিল। জে-সির আবার —ইহাও বলি যে, দোষ ছিল না। কর্পোরেশনের প্রায় চল্লিশজন সদস্য লিখিতভাবে অনুরোধ (অর্থাৎ নির্দ্দেশ, কেন না, তাঁহারা মনিব) করিয়াছিলেন, তাঁহারা লক্ষ টাকা খয়রাত প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার জন্ম বিশেষ সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই সভাধিবেশন না হওয়া পর্য্যন্ত চীফ যেন টাকা না দেন। জে-সি সুভাষবাবুর গৃহে চা খাইতে খাইতে সেই কথাই বলিয়াছিলেন। 'এই অনুরোধ পত্র প্রত্যাহার করাইয়া দিন, অথবা গোটা কুড়ি নাম উঠাইয়া লইবার ব্যবস্থা করুন, আমি চেক্ দিবার আদেশ দিতে এক মুহূর্ত্তে বিলম্ব করিব না।' ইহা সম্ভব হয় নাই। ইত্যবসরে হাইকোর্ট ইঞ্জাংসন দিয়া বসিল। আশা অতলে ডুবিল। সুভাষচন্দ্র কিন্তু তাহাতেও দমিলেন না। তাঁহার আয়োজন সম্পূর্ণ। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ভিত্তি প্রস্তর প্রোথিত করিতে আসিয়া ভবনটির নামকরণ করিলেন, মহাজাতি সদন; "A house of Nation."

আজও চিত্তরঞ্জন এভিনিউর উপর কবিদত্ত নাম ও বিশাল সৌধের কঙ্কালখানি বক্ষে ধারণ করিয়া সুভাষের মহাজাতি সদন পথচারীর মনে অতীতের করুণ স্মৃতি জাগাইবার জন্ম বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিতেছে।

সেদিনের সেই বিফলতা, সেই ব্যর্থ প্রয়াস যে কিছুকাল পরে শত সহস্র গুণ বলশালী হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সে কথা আজ আর কাহার অবিদিত? কলিকাতা মহানগরীর মহাজাতি সদন ঘটনাচক্রে কঙ্কালই রহিয়া গেল, কিন্তু দেশান্তরে, ক্ষেত্রান্তরে, প্রকারান্তরে যে মহাজাতি সঙ্ঘ সৃজিত হইয়া ভারতের স্থলজলগগন প্রকম্পিত করিয়া তুলিল, কোমল ও করুণ কণ্ঠের সাম গানকে চিরবিদায় দিয়া সমর সঙ্গীতে বৃহত্তর ভারতের নদনদী নগরনগরীগিরিপর্ব্বতরাজি

প্রতিধ্বনিত করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে নব নব অধ্যায় সংযোজন করিয়া দিল, তাহার তুলনা কোথায় ?

ইতিহাস শিবাজীকে দস্যু সর্দার চিত্রিত করিয়াছে, সিরাজদ্দৌলাকে লম্পট নরঘাতকরূপে অঙ্কিত করিয়াছে; সুভাষচন্দ্র ও সুভাষ-সৃষ্ট আই এন্-একে পরস্বাপহারী নরপিশাচ জল্লাদ করিয়া কাঠগড়ায় খাড়া না করিলেই বিস্ময়ের বিষয় হইত। ইতিহাসের ত এই মূল্য।

ভারতের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে, বৃহত্তর এসিয়া খণ্ডে ভারতের সকল প্রদেশের সকল জাতিবর্ণধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নরনারী সমন্বয়ে সেই যে মহাজাতির গান সুভাষচন্দ্র রচিয়াছিলেন, আমরা আজ যাহা স্বকর্ণে শুনিয়া ধন্ত হইতেছি, আমাদের পরে আমাদের বংশধরগণ তাহা শুনিয়া চরিতার্থ হইবে এবং তাহারও পরবর্ত্তীকালে, যুগযুগান্তে, শতাব্দীর শেষে যে অনাগত জাতি জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারাও তাহা শুনিয়া গৌরববোধ করিবে। ইতিহাসের হেন সাধ্য হইবে না যে তাহার বিলোপসাধন ঘটায়।

সুপ্তিহীন স্তব্ধ নিশীথে অন্ধ আকাশের পানে চাহিয়া প্রহরের পর প্রহরের অবসানে চিন্তার রশ্মি যখন অসংযত বেগে অনন্তের অন্তহীন পানে প্রধাবিত হয়, তখন সুভাষচন্দ্রের অপরিম্লান গৌরবদীপ্ত সাফল্যের বিরাট ব্যর্থতার তুলনায় আমাদের অসীম শক্তিশালী কংগ্রেসও যেন স্কুল কলেজের ডিবেটিং ক্লাবের মত ক্ষুদ্র ও নিষ্প্রভ হইয়া যায়। চন্দ্রমা ও খদ্যোতের উপমাটাই মনে করাইয়া দেয়! এই কথা বলিলাম বলিয়া, কংগ্রেসের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা অথবা আনুগত্যের অভাব আছে এরূপ মনে করিবার কাহারও কোন কারণ নাই। ভারত মহাসমুদ্রের বালু বেলায় কংগ্রেসের সংখ্যাহীন অগণিত ভক্তের মাঝে লেখকও একটি নগণ্য বালুকণা—সাগর-সৈকতে সবই বালি, সেখানে ভেজালের স্থান নাই। আজিকার ভারতবর্ষে কংগ্রেস যাহার হৃদয়াসন অধিকার করিতে না পারিয়াছে, হয় তাহার হৃদয় নাই, না হয় রোগাক্রান্ত হৃদয়ের স্পন্দন ও অনুভূতি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। আমার হৃদয়াবেগ আমার অজ্ঞাত নহে, কিন্তু তথাপি একথা না বলিয়া পারি না যে সুভাষচন্দ্র অনাগত অনন্ত কালের জন্ত অনন্তকাল সমীপে যে বজ্রগর্ভ বাণী প্রেরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনায় সবই ম্লান, সমস্তই ধূসর।

হিংসা অহিংসার দ্বন্দ্ব, অস্ত্রযুদ্ধ অথবা সত্যাগ্রহের কলহ ভারতবাসীর চিত্ততলে বহুকাল যাবত যে অন্তর্বিরোধের অগ্নি প্রজ্জলিত রাখিয়াছে সুভাষচন্দ্রের অবিস্মরণীয় বিবর্ত্তি তাহাদেরও মূক স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে। পথের কলহ নির্ব্বাণ করিয়া দুর্নিরীক্ষ্য লক্ষ্যকেই প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কে কোন্ পথ ধরিয়া, কোন্ যানবাহনে আরোহণ করিয়া দূর লক্ষ্যে পৌছিবে, সে তর্ক-বিচার আজ অতীত হইয়া গিয়াছে। লক্ষ্য এবং লক্ষ্যবোধের প্রশ্নই আজ একমাত্র প্রশ্ন! ✓ যেন নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডলে পূর্ণিমার চাঁদ।

সুভাষচন্দ্র জীবিত অথবা লোকান্তরিত, কেহ জানে না। আই-এন্ এর দৃঢ় বিশ্বাস, সুভাষচন্দ্র জীবিত; গান্ধীজী বলেন, সুভাষের জন্ত নীরবে প্রার্থনা কর; সুভাষচন্দ্রের দেশবাসী মনে করে, পরাধীন ভারতের চিরজাগ্রত আত্মার মত ভারতের মুক্তিকামী সুভাষচন্দ্র ও মৃত্যুঞ্জয়ী, অবিনশ্বর। কিন্তু জীবিত অথবা মৃত, কিছু আসে যায় না। গ্যারিবল্ডি কি মরিয়াছেন? শিবাজী কি মৃত? রাণা প্রতাপসিংহ যে চিরদিন অমর। জর্জ ওয়াশিংটনের কি বিনাশ আছে? সুভাষচন্দ্রও চিরজীবী। শুধু ভারতে নয়, শুদ্ধ এসিয়ায় নয়, পৃথিবীর যেখানে যে দেশে, যে কোণে যে পরাধীন জাতি আছে, সেইখানে, সেই দেশে, সেই মানবসমাজের প্রত্যেকটি নরনারী সুভাষচন্দ্রের নামের পাদমূলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ধন্ত ও কৃতার্থন্মন্য হইবে। যে সঙ্গীত একদিন বীর সুভাষচন্দ্রের উদাত্ত বীরকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল, পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী নরনারীর সম্মিলিত কণ্ঠে সেই সঙ্গীত ধ্বনিত হইবে আমরা শুনিতেছি। ঐ শোন সেই গান।

"ঐ দূরে—অতি দূরে, ঐ নদীর ওপারে, ঐ পর্ব্বতমালার পর-পারে, ঐ ঘন বনানীর অপর পারে—ঐ দেখা যায় আমাদের মাতৃভূমি—আমাদের সাধনার মহা তীর্থ—আমাদের ভারতবর্ষ—আমাদের কামনার ধন, আমাদের বাসনার স্বর্গ, আমাদের আরাধনার নন্দনকানন, আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ। একদিন আমরা ঐখান হইতে এই সুদূরে আসিয়াছিলাম। আবার আজ আমরা সেইখানে ফিরিয়া যাইব। ঐ শোন ভারতবর্ষের আহ্বান, ঐ শোন জন্মভূমির আহ্বান! কি মধুর, কি স্নেহপবিত্র সে আবাহন। ঐ শোন। চলো......"

জাগ্রত ভারত অনন্তকাল ধরিয়া উৎকর্ণ হইয়া ঐ গান শুনিবে। চন্দ্রমা-আকর্ষিত সাগর জলের মত উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া ঐ গান মানব-হৃদয় আলোড়িত করিবে।

বন্দে মাতরম্। জয় হিন্দ্।



প্রতিদ্বন্দ্বী

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্তী

সহরের লোক সব অবাক হয়ে গেল যখন রায় বাহাদুর সারদা উকীলের মেয়ে যূথিকা বরমাল্য অর্পণ করলো জেলখাটা চরকাকাটা খদ্দরধারী অহীনের গলায়। সবাই জানে উচ্চশিক্ষিতা সুন্দরী যূথিকা সিভিলিয়ান মিঃ টি, রয়কে বিয়ে করবে। দুই পক্ষে বহুদিন ধরেই বিয়ের কথা চলছিল। মিঃ রয় ও যূথিকা প্রায়ই তখন এক সঙ্গে সান্ধ্যভ্রমণে বের হোত, আর তাদের কলহাস্যে মুখরিত হতো রায় বাহাদুরের "রোলস্‌রয়স্‌" গাড়ী। হঠাৎ সে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাওয়ায় পাড়ায় নিষ্কর্মাদের পক্ষে ঘোট পাকানো স্বাভাবিক। তবে ঘোটের উপর তাঁরা তৃপ্তিলাভই করেছেন, কারণ, বিবাহ হোয়েছে সনাতন হিন্দুধর্ম মতে—প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবেরা তৃপ্ত হয়েছেন ভূরিভোজনে। এ সব ছাড়া—অহীনকে দেখে তারা সবাই একবাক্যে প্রশংসাও করেছে; সদাহাস্য স্বাস্থ্যবান সুন্দর যুবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র।

যূথিকার বান্ধবী মিনতি হেসে বললে, "আচ্ছা যূথী, জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী না হ'য়ে অৰ্দ্ধ উলঙ্গ ফকীরের শিষ্য অহীনের বধূ হলি কেন? তুই তো চিরটাকাল গান্ধীর নাম শুনে ক্ষেপে উঠ্‌তিস্‌—তোর বুলিই ছিলো ঐ মহাত্মাই বাংলার শত্রু।" যূথিকা এক ঝলক হেসে উত্তর করলো কবির ভাষায় "অমন অবস্থাতে পড়লে সকলেরই মত বদলায়।"—মিনতি চটুল পরিহাসে বললে, "আজ উঠি ভাই—নমস্কার বাংলার বিপ্লবলক্ষ্মী পণ্ডিত্।"—মুখে ফুল চন্দন পড়ুক"—বলে সহাস্যে যূথিকা বান্ধবীর বিদায় নিলো।

এই বিবাহের কিছু পরে রায় বাহাদুর তাঁর বিরাট বাগানবাড়ী ও তৎসংলগ্ন জমিতে গড়ে তুললেন বৃহৎ কাপড়ের কল, লোহালক্কড়ের কারখানা ও জুট মিলস—গঙ্গাতীরে বৈদ্যুতিক আলোকসম্ভারে কারখানার কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দের বাসস্থান তৈয়ারী হ'লো—দেখতে দেখতে সেখানে এক বিরাট নগরী গড়ে উঠ্‌লো। ইহার অনতিদূরে স্থাপিত হলো এক আদর্শ কৃষিক্ষেত্র, তার পার্শ্বে আদর্শ গ্রাম—সেখানে খোলা হলো চরকার শিক্ষাকেন্দ্র—তার সন্নিকটে বহু বিঘা জমিতে পোতা হলো অসংখ্য কাপাশ গাছ। এই সকল প্রতিষ্ঠানে বিদেশ হতে আনা হলো বহুদর্শী 'এক্সপার্টস' মোটা বেতনে। রায় বাহাদুর জামাতা অহীন ও কন্যা যূথিকার উপরে কর্তৃত্বের ভার অর্পণ করে নির্দেশ দিলেন তাদের বুঝতে ও শিখতে বিদেশী অভিজ্ঞের নিকট থেকে প্রতিষ্ঠানের সব ফিকির বা সিক্রেট্‌স।

অহীন আত্মনিয়োগ করেছে সম্পূর্ণ ভাবে কলকারখানায়, আদর্শ গ্রামোন্নয়নে। তার মুহূর্ত অবসর নাই। ইহার উপর নিজের পরিকল্পনায় সে শ্রমিকদের জন্য এক নৈশ বিদ্যালয় খুলে তাদের

শিক্ষার পথে আলোকপাত করেছে। তার পূর্বের অনেক সহকর্মীকে এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত করেছে। যূথিকা ছায়ার মত তার পার্শ্বে আছে অবিরাম। রায় বাহাদুর পেয়েছেন অপার আনন্দ কন্যা জামাতার আন্তরিকতায় ও তাদের শিক্ষা দীক্ষায়; বুঝেছেন, মেয়ে হয়েছে দাম্পত্য সুখে সুখী। অহীনের বহুমুখী প্রতিভায় ও অদ্ভুত ধীশক্তিতে—তার সুমধুর সরল ব্যবহারে রায় বাহাদুর মুগ্ধ হয়েছেন। অহীনের পোষাক পরিচ্ছদ চালচলন অনাড়ম্বর, পরিধানে খদ্দর।

কয়েক বৎসর পরে। ১৯৩৯ সনে ইউরোপে সমরানল প্রজ্বলিত হ'লো। ১৯৪১ মহাযুদ্ধ সংক্রামিত হ'লো সমগ্র পৃথিবী যুড়ে। ১৯৪২ সনের মে মাসে বাংলার চট্টগ্রামে জাপানীরা বিমান আক্রমণ করলো। ডিসেম্বর মাসে জ্যোৎস্না-পুলকিত রাত্রে জাপানীরা কলিকাতায় বোমা ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে সহর হ'তে লোক পালাবার পালা সুরু হলো—সে কি অদ্ভুত দৃশ্য! ভয় সংক্রামক ব্যাধি—লোকের মুখে সামান্য ঘটনা রূপায়িত হয় ভীতিব্যঞ্জক রূপে—গভর্ণমেণ্ট নির্বন্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করলেন যুদ্ধের যাবতীয় খবর; তার ফলে জনসাধারণের মনে নানা সন্দেহের উদ্রেক হ'লো—সহরময় অদ্ভুত গুজবের ফলে সহরবাসী হ'লো শঙ্কিত সন্ত্রস্ত; দেখতে দেখতে সহর হ'য়ে গেল জনশূন্য। যে লোক কখনও সহরের বাইরে যায় নি তাকে ছুটতে হলো অজানার সন্ধানে—অপরিচিত পাড়াগাঁয়ে জীর্ণ পর্ণশালায় আশ্রয় নিয়ে স্বস্তি পেলো—পরিণামে তাকে হারাতে হয়েছে তার ধন দৌলৎ—প্রিয়জন। কলিকাতার অধিবাসীরা মর্মে মর্মে অনুভব করেছে এই ভীতির পরিণাম—সর্বস্বান্ত হয়েছে মধ্যবিত্ত ভদ্রপরিবার।

যূথিকা রায়বাহাদুরকে বৈদ্যনাথধামে তাদের নিজ বাড়ীতে পাঠাতে চাইলে। রায় বাহাদুর হেসে বললেন, "তোকে আর অহীনকে 'বোমার' মুখে রেখে আমি পালাবো দেওঘর, ক্ষেপেছিস?" তিনি কোথাও যেতে রাজী হলেন না দেখে যূথিকা তাদের গৃহের চারিদিকে তুললো "ব্যাফ্‌ল ওয়ালস"—কারখানার চারিদিকে এয়ার রেড সেল্টারস, ট্রেঞ্চ, ব্যাফ্‌ল ওয়ালস আরো কত কি। অহীনের উৎসাহে ও অভয়বাণীতে কারখানার অধিকাংশ কর্মচারী ও মজুর পালাল না বোমার ভয়ে। সেই সময়ে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হ'লো এসিয়া বাহিনীর কেন্দ্রস্থল—সমর উপকরণের চাহিদা মিটাতে আবশ্যক হ'লো বহুবিধ সাজ সরঞ্জাম, লোক লস্কর, কয়েক রকম জিনিষপত্র। ফলে মিলিটারী কণ্ট্রাক্টস মিললো অসংখ্য। রায় বাহাদুরের কারখানা দিবারাত্রি চলতে লাগলো সেই চাহিদা মিটাতে; তাঁর প্রতিষ্ঠান আরো বাড়াতে হ'লো। অহীন খুশী করলো কর্তৃপক্ষকে তার অদ্ভুত কর্মকুশলতায়। মোটা টাকার বিমান ঘাঁটীর কণ্ট্রাক্ট পেলো সে—মা লক্ষ্মী করলেন তাকে তাঁর বর-পুত্র। সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে পড়লো অহীনের যশঃসৌরভ ও প্রতিভা।

পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধে ইংরেজ বিব্রত হয়ে পড়লেন। তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না এরূপ সর্বনাশা সমরের জন্য। উচ্চাকাঙ্ক্ষী হিটলারের সর্বনাশা অভিসন্ধি পৃথিবীর শান্তি নষ্ট করলো—জাপানের দুরাশাও এই পঙ্কে নিমজ্জিত হ'ল। ব্রিটীশ ভারতের নিকট থেকে সকল রকমের সাহায্য চাইলেন। কংগ্রেস তার বিনিময়ে যুদ্ধশেষে জগৎ সমক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণায় প্রতিশ্রুতি দাবী করলেন। কিন্তু ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতির ঘোষণা দিতে সম্মত না হওয়ায় কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ বৃটেনের সঙ্গে সহযোগিতায় অস্বীকৃত হলেন! মহাত্মা গান্ধীও এই সূত্রে অসহযোগিতার প্রতীক "Quit India" (ভারত ত্যাগ কর) বাণী প্রচার করলেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের মাথায় ভূত চাপল, ভারতে চণ্ডনীতি চললো, কংগ্রেস নেতৃবর্গ কারারুদ্ধ হ'লেন বিনা বিচারে, আমলাতন্ত্রের মুখোস গেল খুলে।

আগুন জ্বলে উঠলো দিকে দিকে। ৮ই আগষ্ট মোকামা জংশনে এসে দাঁড়াল একখানি ট্রেণ। কংগ্রেস সেবকগণ এঞ্জিনের সামনে ঝুলিয়ে দিলে একটা কংগ্রেস পতাকা। বিদেশী ড্রাইভার ধৈর্য হারিয়ে রেগে জাতীয় পতাকা দিলে এঞ্জিনের অগ্নিগর্ভে ফেলে। কংগ্রেস সেবকগণ আর্তনাদ করে উঠলেন এই বর্বরোচিত কার্যে। লোকমুখে ছড়িয়ে পড়লো সেই খবর চারদিকে। অসংখ্য লোক এসে জড় হলো সেখানে—দাবী করলো ড্রাইভারের অন্যায় কার্যের বিচার। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সেই দাবী অগ্রাহ্য করে ডাকলো পুলিশ। জনতা গেল ক্ষেপে। ড্রাইভার ছুটলো প্রাণভয়ে তার কোয়াটারে। উন্মত্ত জনতা মুষ্টিমেয় পুলিশ ফোর্সকে কাবু করে পশ্চাদনুসরণ করলো সেই ড্রাইভারের। তার দরজা ভেঙ্গে তাকে করলো প্রহার—নষ্ট করলো তার তৈজসপত্র। তারপর সুরু হলো গুণ্ডা বদমাইসদের অনাচার। তারা সেই সুযোগে ব্যাপকভাবে লুটতরাজ করতে লাগলো। গভর্ণমেণ্টও দমন নীতির চূড়ান্ত দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু জনমন তাতে অধিকতর ঐক্যবদ্ধ হলো। ভারতের নেতৃবৃন্দ তখন কারারুদ্ধ; কংগ্রেসের অহিংস নীতি সংরক্ষণের নির্দেশ দেবার নেতা ছিল না কেহ বাইরে। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত আগষ্ট আন্দোলনের ঢেউ বইল। সারা ভারতে অশান্তির তাণ্ডব নৃত্য সুরু হ'লো। বাংলার মেদিনীপুর জেলায় সেই গণ-অভ্যুত্থানের জের ভীষণ মূর্ত্তিতে প্রকটিত হলো।

মিঃ টি, রয় বিলাত থেকে আই সি এস হয়ে ফিরে এসে বাংলায় পৌছিলে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা মাতা ভ্রাতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে তাঁর মাথা ঘুরে গেল। প্রগতিশীলা আধুনিক মহিলারা স্বেচ্ছায় এসে ঘিরে দাঁড়ালো তাঁকে—মিঃ রয় মনের আনন্দে মেলামেশা সুরু করলেন মহিলা মহলে। মেয়ের অভিভাবক ছেড়ে দিলেন মেয়েকে অবাধে মিঃ রায়ের সকাশে, সিভিলিয়ান জামাই পাবার আশায়। মিঃ রয় গভীর জলের মৎস্য—তিনি নিরাশার বাণী শোনান কি কাউকে। বরং তাঁর ব্যবহারে মনে ধরিয়ে দিতো রঙীণ নেশা। এমনি করে হঠাৎ এক পার্টিতে পরিচয় হয়েছিল যূথিকার সঙ্গে মিঃ রয়ের—সেই পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। মিঃ রয় সুন্দরী শিক্ষিতা অথচ ধীর, স্থির ও অচঞ্চলা; যূথিকাকে দেখে এবং তার পিতার অগাধ সম্পত্তির সন্ধান পেয়ে ভবিষ্যতের আশায় এদিকে ঝুঁকে পড়েন। কিন্তু তাঁর একদিনের একটু অসাবধানতার জন্য শিকার হাত ছাড়া হয়ে যায়। যূথিকা কানা ঘুষা অনেক কিছু শুনেছিলো মিঃ রয়ের চরিত্র সম্বন্ধে, কিন্তু ঘটনাচক্রে একদিন শহরের কোন সিনেমা হাউসে পিতাপুত্রীর চক্ষুসমক্ষে সেটা সুস্পষ্ট হওয়ায় তাঁরা তিক্ত হয়ে ওঠেন, আর সেইদিন থেকেই রায় বাহাদুরের গৃহে মিঃ রায়ের গমন নিষিদ্ধ হয়। যূথিকা বিদ্রোহী হলো সিভিলিয়ানের পত্নী হতে। সম্বন্ধ বিচ্ছেদের ইহাই হেতু।

বিপত্নীক থাকাটা অসুবিধাজনক দেখে মিঃ রয় হঠাৎ স্কুলের মিষ্ট্রেস মিস্ মিনতিকে বিবাহ করেন। লোকে সেই বিবাহ নিয়ে অনেক গুজব তোলে। কিছুদিন পরে তিনি বদলী হলেন মেদিনীপুরে—অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে। তখন সেই জেলার কাঁথী ও তমলুক মহকুমায় আগষ্ট আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ার তাণ্ডবলীলা চলছিলো। মিঃ রয় এই সুযোগে তাঁর আগেকার 'ব্লাক রেকর্ডস্' গুলো মুছে ফেলবার অভিপ্রায়ে আন্দোলনকারীদের উপর পীড়ন নীতি চালালেন চূড়ান্তভাবে। মেদিনীপুরবাসী আতঙ্কিত হলো তাঁর বর্বরোচিত অত্যাচারে। সেই সময়ে জাপানী সেনা আসামের সীমান্তে হানা দিলো, মাঝে মাঝে হতে লাগলো বোমা বৃষ্টি। গভর্ণমেণ্ট আতঙ্কিত হয়ে ডোবালো নৌকা—নিয়ন্ত্রিত করলো যানবাহন, চালের দর বেড়ে চললো, ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হোল। পঞ্চাশের মন্বন্তর ছাপিয়ে গেল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। ভয়াবহ মৃত্যুলীলা চললো বাংলার বুকে—লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরতে লাগলো। সেই সময় দৈবদুর্বিপাকে বাংলার কতক অংশে হলো জলপ্লাবন, হতভাগ্য গ্রামবাসীরা হলো গৃহহীন, অন্নহীন—পথের ভিক্ষুক। মিঃ রয় হুকুম দিলেন, আগষ্ট আন্দোলনের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিজনদের যেন কোন প্রকার সাহায্য দেওয়া না হয়। ফলে, হতভাগ্য ভিক্ষুকেরা শেয়াল কুকুরের ন্যায় মরতে লাগলো। বুভুক্ষু মুমূর্ষুর দল ছুটে এলো কলিকাতা নগরীতে। অলিতে গলিতে তাদের করুণ আর্তনাদে অতিষ্ঠ হলো সহরবাসী—রাস্তায় রাস্তায় নগ্ন অর্দ্ধনগ্ন নর-কঙ্কালের মিছিল মহানগরীর বুকে শিহরণ তুললো।

রায় বাহাদুর জামাতা অহীনকে ডুবিয়ে রেখেছেন অসংখ্য কার্য্যের চাপে। বিশাল প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাণ হচ্ছেন অহীন, দায়িত্বতার অসীম। তবু মাঝে মাঝে ভারত জননীর পরাধীনতার আর্তনাদ ধ্বনিত হয় তার হৃদয় মন্দিরে—ব্যথিত হয় তার প্রাণ। মহাত্মার "ভারত ছাড়" মন্ত্র যখন প্রচারিত হলো সাম্রাজ্যবাদীদের আমলাতন্ত্রের মুখোস খুলতে অহীন চাইলো ছুটী, মুক্তি সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করবে ব'লে। রায় বাহাদুর প্রমাদ গণলেন। কিন্তু সারদাবাবু বললেন, "বাবা, আমি তোমাকে যে সকল প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বভার দিয়েছি—তার প্রত্যেকটা মহাত্মা গান্ধীর অনুমোদিত ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সহায়ক। মহাত্মা গান্ধী বাস্তববাদী; তিনি জানেন ভারতবাসী যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে না, অহিংসা বা আত্মিক বলের অমোঘ শক্তি দ্বারা তিনি পরাজিত করতে চান সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তিকে, তাই হিংসা, বিদ্বেষ, কলহ, দ্বন্দ্ব ত্যাগ করতে হবে, আত্মশুদ্ধি দ্বারা জয় করতে হবে আসুরিক শক্তিকে। তাঁর "ভারত ত্যাগ কর" শ্লোগ্যান গভীর ভাবব্যঞ্জক; তিনি জানেন শক্তিশালী ইংরেজকে চলে যাও বললেই চলে যাবে না, তাঁদের চলে যেতে বাধ্য করতে হবে আমাদের অহিংসনীতি অবলম্বন করে। তাই গড়ে তুলতে হবে ভারতকে সর্বতোভাবে স্বাধীন। ব্যবসা বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিরাট কারখানা, উন্নতি করতে হবে বিবিধ শিল্পের, বর্জ্জন করতে হবে বিদেশী পণ্য। দেশকে স্বাধীন করতে হলে তাকে শিল্প বাণিজ্যে করতে হবে শক্তিশালী—স্বাবলম্বী হবে যে মুহূর্তে আমাদের দেশ বিশ্বের শক্তি সমূহের সম্মুখে দাঁড়াতে পারবে—তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারবে শিল্প বাণিজ্যে, জয়যুক্ত হবে ভারতের মুক্তি সংগ্রাম—সরে যাবে ভারত থেকে বিদেশী রাজা বন্ধুত্ব স্থাপন করে। ফাঁকা বক্তৃতা বা অনাবশ্যক কারাবরণ করে স্বরাজ লাভ হতে পারে না, চাই প্রকৃত গঠনমূলক কাজ। আমি সেই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়েই এই প্রতিষ্ঠান গড়েছি। এখন একে স্বরাজের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে তোমার কাজ। অহীন বিস্মিত হলো রায় বাহাদুরের যুক্তিপূর্ণ উপদেশে। দ্বিগুণ উৎসাহে আবার আত্মনিয়োগ করলো শিল্প প্রতিষ্ঠানে, গ্রামোন্নয়নে, খাদী প্রতিষ্ঠানে। কিছুদিন পরে সুজলা সুফলা বাংলার বুকে দুর্ভিক্ষের করাল মূর্তি দেখে অহীনের হৃদয় কেঁদে উঠলো হতভাগ্য বুভুক্ষুদের জন্য। সে আত্মনিয়োগ করলো দারিদ্র নারায়ণের সেবাব্রতে। খুললো অন্নসত্র প্রতি দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে। যূথিকা স্বেচ্ছায় এসে

দাঁড়ালো স্বামীর পার্শ্বে অন্নপূর্ণা মূর্তিরূপে—খুলে দিলো অন্নসত্র বাংলার বিভিন্ন স্থানে; গভর্ণমেন্ট ও মিলিটারী কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করলো এই সদনুষ্ঠানে। অহীন ও যূথিকা ঘুরে বেড়াতে লাগলো বাংলার পল্লীতে পল্লীতে। তারা উভয়ে একবার গেলো মেদিনীপুর অঞ্চলে। স্তম্ভিত হ'লো নিরীহ পল্লীবাসীদের প্রতি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিষ্ঠুর অত্যাচার কাহিনী শুনে। অন্নহীন, গৃহহীন, বস্ত্রহীন, সরল পল্লীবাসীকে তারা দিলো বস্ত্র, চাউল দুগ্ধ ইত্যাদি। মৃতকল্প গ্রামবাসীদের মুখে হাসির রেখা ফুটলো—তারা দু' হাত তুলে আশীর্বাদ করতে লাগলো। অহীন প্রতি বাড়ীতে বিতরণ করলো চরকা ও তুলা। অর্থ দিলো সংস্কার করতে তাদের বাসগৃহ। অহীনের দরিদ্রনারায়ণের সেবা কাহিনীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র।

মিঃ টি, রয় অহীন ও যূথিকার আগমন বার্তা পূর্বেই অবগত ছিলেন। তাঁর মনে জাগলো প্রতিহিংসা; পুলিশ সাহেবকে লিখলেন, জেলায় ঢুকেছে এক গান্ধীর চেলা, "ভয়ানক লোক—দাগী বিপ্লবপন্থী।" জেলার কর্তার 'নোট' পেয়ে সাহেব ছুটলেন অহীনের স্থানে। গোপনে তাদের কার্যাবলি সংগ্রহ করে যে রিপোর্ট পাঠালেন, তা পড়ে মিঃ রয়ের পিত্ত জ্বলে গেলো—একটা জেল ফেরৎ বিপ্লবীকে করেছে প্রশংসা!—পুলিশ সাহেবের রিপোর্টের উপর লিখলেন, "আমি সন্তুষ্ট হইনি তোমার তদন্তে—আমি স্বয়ং যাচ্ছি তদন্ত করতে।" সাহেব 'নোট' পড়ে মুচকী হাসলেন, তিনিও যাবার জন্ত তৈরি হলেন।

মিনতি মনে মনে অনেক কিছু কল্পনা করেছিলো। আই সি এস স্বামী পেয়ে বাইরে সে পাচ্ছে সম্মান,—পার্টিতে নিমন্ত্রণ—প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউসনের পৌরোহিত্যের পদ, আরো কত কি—কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাংলায় ঢুকে স্বামীর উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র—অসভ্য ব্যবহারে তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে। সে ভাবে এই কি বিলাতী শিক্ষা-দীক্ষার ফল!—এরাই দেশের রক্ষক—দশের আদর্শ? সেদিন রাত্রে পানাসক্ত অবস্থায় মিঃ রয় প্রকাশ করে ফেললেন তাঁর মনের গোপন উদ্দেশ্য, মিনতি জানালো যে, প্রতিহিংসা নিতে তার স্বামী অহীন ও যূথিকার উপর আমলাতন্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতা প্রয়োগ করতে ক্ষেপে উঠেছে! শিউরে উঠলো সে স্বামীর নীচপ্রবৃত্তি দেখে। মিনতিভরা কণ্ঠে স্বামীকে বললো, "ওগো দোহাই তোমার, তুমি করো না এমনি অন্যায় অত্যাচার যূথীদি ও অহীনবাবুর ওপর। তাঁরা যে দেশের বরণীয়, পূজ্য।" উন্মত্ত রয় (সে কথায়) কুৎসিত বাক্যে গালাগালি করলো মিনতিকে।

রাজীবপুরে আজ বিপুল সমারোহ। পার্শ্ববর্তী পঞ্চাশটা গ্রামের অধিবাসী হিন্দুমুসলমান—ধনীদরিদ্র মিলিত হ'য়েছে আজ অভিনন্দিত করতে অহীন ও যূথিকাকে তাদের বিদায়ের প্রাক্কালে। পৌরোহিত্য করছেন জেলার ডিষ্ট্রীক বোর্ডের চেয়ারম্যান—খান বাহাদুর মামুদ খাঁ! সভায় উপস্থিত হয়েছেন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিদেশী মিলিটারী বৈমানিক উচ্চ কর্মচারী প্রভৃতি। সভাভঙ্গের পূর্বাহ্নে হঠাৎ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রয়কে উপস্থিত দেখে সভাপতিও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি অভ্যর্থনা করতে অগ্রসর হলেন। মিঃ রয় 'ব্যুরোক্রাটিক' চালে ভ্রূভঙ্গী করে অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, "সভা বন্ধ করুন, খান বাহাদুর আপনি পৌরোহিত্য করছেন এই সভায়, একটা জেলখাটা দাগী বদমাসকে দিচ্ছেন আসন, আমি ওকে এখুনি "য়্যারেষ্ট" করবো।" ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের এই উদ্ধত ব্যবহারে খানবাহাদুর ব্যথিত হলেন, তিনি মঞ্চোপরি উঠে সাহেবের আদেশ ও তাঁর বাণী সভাস্থ লোককে শুনিয়ে তাদের অভিপ্রায় জানাতে চাইলেন; সমগ্র জনতা সমস্বরে বলে উঠলো, "মানবো না আমরা হাকিমের অন্যায় হুকুম; সভার কাজ চালান হোক।"—সভায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'লো—সাহেব অধৈর্য হয়ে ডাকলেন পুলিশ। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর নিমগ্ন করে অমনি অসংখ্য জনতা সরোষে ঘিরে ফেললো ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে। তিনি ভীত চকিত নেত্রে তাকিয়ে দেখলেন—পুলিশ এসে তখনো পৌঁছয় নি, পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন 'রিভলভার নেই। অসীম সমুদ্রে নিমজ্জিত নিঃসহায় ব্যক্তির ন্যায় তিনি ত্রস্তভাবে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। সেই মুহূর্তে অবিচলিত ভাবে দ্রুতপদে অহীন এসে দাঁড়ালো মিঃ রয়কে পিছু করে। জনতা হলো স্তব্ধ। সে কোমল নম্রকণ্ঠে বললো, "ভ্রাতৃবৃন্দ, আমি অহিংসবাদী, আমি করযোড়ে অনুরোধ করছি এই রাজ কর্মচারীকে আপনারা কোন প্রকার অবমাননা করবেন না—আপনারা আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির জন্য বিপদ বরণ করবেন না।"—বলেই অহীন দু' বাহু প্রসারিত ক'রে দাঁড়ালো। জনতা শান্তভাব ধারণ করলো—বিস্মিত হলো তারা অহীনের অদ্ভুত সংযম ও অহিংসনীতিতে। জনতা সরে গেলে অহীন মিঃ রয়ের দিকে ফিরে বিনয় নম্রভাবে বললেন, "আসুন মিঃ রয়, এই মঞ্চের ওপরে বিশ্রাম করুন; আসুক আপনার পুলিশবাহিনী—আমি স্বেচ্ছায় চলে যাবো তাদের সঙ্গে, আমায় বিশ্বাস করুন।"—মিঃ রয় বিস্মিত হলো অহীনের সরল অনাড়ম্বর ব্যবহারে। কি মনে করে একবার তাকালেন তীক্ষ্ণভাবে অহীনের দিকে। কিছুক্ষণ পরে কৌতূহলের সুরে মিঃ রয় প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি মিঃ এ, চৌধুরী—কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে পড়তেন, ভাল বক্তা ছিলেন?" অহীন একটু হেসে ঘাড় নেড়ে মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, "হাঁ,—আপনি বরাবরই ছিলেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী; আমিই "কাউ কোর্টে" ওকালতি করে ছাড়িয়ে এনেছিলুম আপনাকে কয়েদখানা থেকে, মনে পড়ে কি মিঃ রয়,

সেই মিস্ লেসীকে?"—মিঃ রয় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ছুটে গিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন অহীনকে; উচ্ছসিত কণ্ঠে বললেন, "বন্ধু,—আমায় ক্ষমা করো।" পুলিস সাহেব দূরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য করি?" মিঃ রয় অহীনকে আলিঙ্গনমুক্ত করে রুমালে মুখ মুছে বললেন, "না? তুমি পুলিশ ফোর্স নিয়ে চলে যাও, সভার কার্য এখন চলবে।" পুলিশ সাহেব মুখের হাসি



দেখছিলেন এতক্ষণ; মুচকি হেসে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছ ঘেঁসে নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "সার, এবারে আমি আসামীকে গ্রেপ্তার চেপে সেলাম ঠুকে প্রস্থান করলেন। সভায় লোক করে উঠলো।

যুদ্ধোত্তর ভারতের দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তো শেষ হ'য়ে গেলো।

যুদ্ধ-কালীন এই ছয় বছর আমাদের প্রতিদিনের অভ্যস্ত জীবনে অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। প্রথমেই মনে পড়ে জিনিষ-পত্তরের দামের কথা। বর্তমানে জিনিষ-পত্তরের যা' দাম, তা' ছয় বছর আগে আমাদের কল্পনারও বাইরে ছিল। মোগল আমলের টাকায় আট মণ চাউল, আর ১৯৪৩ সনে বাংলাতে ত্রিশ বত্রিশ হতে আরম্ভ করে একশত টাকা চাউলের মণ—দুই-ই কিছুদিন আগে সমান অবিশ্বাস্য ছিল। বর্তমানে চাউলের দর অনেকটা সম্ভবের মধ্যে নেমে এসেছে, কিন্তু অন্যান্য জিনিষ-পত্তরের দামের কিছুমাত্র কম্‌তি হওয়ার লক্ষণ নেই। কাপড়, কয়লা, তেল, তরকারী, ঘি—হয় নেহাৎ দুষ্প্রাপ্য, আর যদি বা পাওয়া যায়, নিতান্তই দুর্মূল্য।

এখন আমাদের মনে আশা জাগ্‌তে পারে ও সে আশা-জাগরণটা নিতান্তই স্বাভাবিক যে, যুদ্ধ থেমে যাওয়ার সংগে সংগে জিনিষপত্তরের দাম আবার সেই আগের মত সস্তা হ'য়ে যাবে, অর্থাৎ কিছুদিনের মধ্যেই ঘুম থেকে উঠে দাড়ি কামানোর জন্য দু'পয়সা দামে ভাল ব্লেড পাওয়া যাবে, চা' খাওয়ার সময় অল্প খরচে পাওয়া যাবে প্রচুর কেক্, বিস্কুট,

ডিম, আর ছুটী এলে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সামান্য খরচেই বাইরে যেয়ে অনেক দেশ ঘুরে আসা যাবে। এই ছয় বছর জিনিষপত্তরের দাম যে হারে বেড়েছে, আমাদের মধ্যবিত্ত লোকদের আয় সে অনুপাতে বাড়েনি। সুতরাং আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক সব সুখ-সুবিধাগুলোকে বাদ দিয়ে গত দু'বছর কোন রকমে কালাতিপাত করে এসেছি—মনে মনে মস্ত আশা যে যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর জিনিষপত্তরের দাম সস্তা হলে আমাদের সকল ক্ষতিগুলোকে সুদে-আসলে পুষিয়ে নেওয়া যাবে।

কিন্তু এখানে আমাদের জেনে রাখা ভাল যে যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পরেও জিনিষপত্তরের দাম সস্তা হবে না—অন্ততঃ যাতে সস্তা না হয় সে দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

কথাটা একটু হেঁয়ালীর মত শোনায়, কিন্তু আসলে উহা নিছক সত্য। ব্যক্তিগতভাবে আমরা হয় ত সকলেই-সস্তা জিনিষ চাই, দশ টাকার বদলে তিন টাকাতে একজোড়া ধুতি পেলে খুবই খুশী হই। কিন্তু আসলে ব্যক্তির সুখের সমষ্টি নিয়ে সমাজের সুখ নয়, অর্থাৎ সমষ্টিগত সুখের সংগে ব্যক্তিগত সুখের কোথায় একটা বিচ্ছেদ আছে। তাই তুমি আমি সস্তা কাপড় পেয়ে সুখী হলেও সমাজের পক্ষে সেটা কল্যাণকর নয়। বিষয়টা আর একটু খোলসা করে বলা যাক্।

আমরা যে সমাজে বাস করি, সেখানে ধনোৎপাদন করা হয় লাভের আশায়, অর্থাৎ এই ধনবাদের যুগে কাপড়-ব্যবসায়ী আমাদের কাপড় পরিয়ে লজ্জা নিবারণের সহায়তা করছেন বলে কিছুমাত্র আত্মপ্রসাদ লাভ করেন না। তিনি বড় রকমের প্রসাদ লাভ করেন—যখন লাভের অঙ্কটা বড় হয়ে উঠে, আর আপন বিরাট প্রাসাদে বিলাস প্রমোদের অভাব ঘটে না। জিনিষপত্তরের যখন দাম কমতে থাকে, তখন স্বভাবতঃই বড় বড় ব্যবসায়ীদের মুনাফার অংশটাও কমে যেতে থাকে। ফলে তারা উৎপাদন কমিয়ে দেন—আর উৎপাদন যত কম্‌তে থাকে, জিনিষের দাম আরও কম্‌তে থাকে।

এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে জিনিষের দাম যদি আরও কমে যেতে থাকে, সে তো আরও ভাল কথা। কিন্তু আসলে বিপদটা হলো আর একটু অন্যরকম। ধনোৎপাদন কমে যাওয়া মানেই বড় বড় কলকারখানাগুলোর কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া। তার ফলে প্রথম চোটেই শত শত, বরং আরও বেশী, সহস্র সহস্র শ্রমিক মজুর বেকার হ'য়ে পড়ে। তাদের রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গেলে সমাজের দুর্গতি বাড়বে বই কম্‌বে না। শুধু যে শ্রমিক দলই বেকার হয়ে পড়বে, তা' নয়—মধ্যবিত্ত লোক যারা কল-কারখানায় কাজ করেন—তাদেরও অনেক সময় কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে, তারাও বেকার হয়ে এসে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোকে আরও জটিল করে তোলেন।

সমস্যাটা শুধু এইখানে এসে যে শেষ হয়ে যায় তা' নয়। বিপদ এই যে একজন বেকার আরও দশজন বেকার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ একবার বেকার সমস্যা সুরু হলে তার শেষ নাগাল পাওয়া বড় কঠিন। কারণ যে মানুষ বেকার তার কোন রোজগার নেই। ফলে, সে অনেক জিনিষই কিন্‌তে পারে না এবং যে সব জিনিষ সে কিন্‌তে পারে না, সে সব জিনিষের চাহিদাও কমে যায় ও বিক্রী কম হতে থাকে। তখন সে সব ব্যবসাতেও লাভের অংশে ঘাটতি পড়ে যায় এবং সেখানেও আবার বেকার সমস্যার সৃষ্টি হতে থাকে। সুতরাং একবার যদি হঠাৎ কাপড় সস্তা হয়ে যায়, তবে যে শুধু কাপড়ের ব্যবসাতেই মুনাফা কমে যায় তা নয়, চিনি, জুতো, লোহা, সিমেন্টের ব্যবসাতেও ক্ষতি সুরু হবে ও আর্থিক সমস্যা ক্রমশঃ জটিলতর হয়ে উঠ্‌বে।

সুতরাং আমাদের কর্তব্য, যুদ্ধের পরে জিনিষপত্তরের দাম যাতে হঠাৎ কমে না যায়, সে দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখা এবং মোটামুটী ভাবে আশা করা যায় যে রাতারাতি জিনিষপত্তরের দাম সস্তা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, বর্ত্তমানে আমাদের সকল রকম প্রয়োজনীয় জিনিষেরই নিতান্ত অভাব। যুদ্ধ থেমে গেলে সেই সব প্রয়োজনীয় জিনিষের চাহিদা কিছুমাত্র কমে যাবে না, বরং বেড়েই যাবে। যেমন ধরা যাক কাগজ, কাপড়, স্পিরিট, টুথপেষ্ট, এ সব জিনিষের চাহিদা ক্রমেই বেড়ে যাবে। বাড়ীঘর তৈয়ার করার জন্য সিমেন্ট, চুণ, লোহা ইত্যাদি জিনিষেরও চাহিদা বেড়ে যাবে। ফলে লোকের হাতে অনেক টাকা আস্‌বে, টাকা এলেই আবার অন্য জিনিষের চাহিদা বেড়ে যাবে এবং এমনি করেই বেকার সমস্যাটাকে থামিয়ে রাখা যাবে।

যুদ্ধের পরে নিজেদের হাতে টাকা জমিয়ে না রাখাই ভাল। টাকা জমিয়ে রাখা মানে কোন একটা জিনিষ না কেনা এবং সমষ্টিগতভাবে কোন জিনিষ না কেনা মানেই সেই ব্যবসাতে ক্ষতির কারণ সৃষ্টি করা। ব্যবসাতে ক্ষতি হলেই জিনিষপত্তরের দাম কমে যাবে ওসংগে সংগে বেকার-সমস্যা দেখা যাবে। সস্তা জিনিষ পেয়ে আমাদের যা' লাভ হবে, বেকার সমস্যা সৃষ্টি করে আমাদের সমাজে তা'র চেয়ে ঢের বেশী ক্ষতি হবে।

পথের সম্পদ

শ্রীভোলানাথ ঘোষাল

সুন্দরী সেই মেয়ে
পথে চলে গেল ক্ষণেকের তরে দেখেছিনু আমি চেয়ে।
আজিকে আমার হৃদি মেঘ বনে বিজলী খেলিয়া যায়
নীপ্‌-নিকুঞ্জে শতদল মেলি কুসুম ফুটিল হায়!

আজিকে আকাশে খণ্ড মেঘেতে ভাসিছে পত্র-লেখা
নভমণ্ডলে উড়িছে বলাকা ছুঁয়ে দিগন্ত রেখা—
বিনা বাতাসেতে বাজিতেছে বাঁশী স্মরিয়া আমার নাম
পথে যেতে আজ কি পাইনু আমি—কি জানি বা হারালাম!

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১১

চা এক চুমুক পেটে যেতেই—

ডাক্তার। "আঃ বাঁচলুম! ওদের পাতা বাছায়ের বাহাদুরি আছে বটে। 'কালকাসুন্দে' পাতা কি আর এ আস্বাদ দিতো? তাই না এখন তিন গুণ দাম দিয়েও ওদের rejected—ঝেঁটিয়ে খেলা কাটিকুটি গুলো সবাই খাচ্ছি—

মাণিক। তবে যে বলছিলেন···

ডাক্তার। সাধে কি বলি মাণিকলাল! দেশে লোক ঘর ঘর ম্যালেরিয়ায় মরছে—আমাদের চিরকেলে মহৌষধ পাঁচনটা পেলেও বাঁচতো। সেও তো পাতা সেদ্ধ হে! গ্রে ষ্ট্রীটে তার গর্ব্ব কতো। কিন্তু বড় বড় কবিরাজ মশাইরা অন্দর মহলে "সুগন্ধী তৈল" বানাতে ব্যস্ত। পীলে বাড়লেই বা, কেশ না বাড়লে দেশ যে কৃতার্থ হবে না! আবার নাকি সে কোঁকড়াবে—ঢেউ খেলাবে! তাঁরা তেলের নাম খুঁজে হায়রাণ। বিদেশী নামে টান্ পড়েছে। কেউ ভাবছেন—'প্রেটি নাইট', কেউ ভাবছেন 'বেড্ বিউটি'। এদিকে দীর্ণ দাওয়ায় শুয়ে উত্থানশক্তিরহিত জ্বরক্লিষ্ট কঙ্কালেরা যদি তাঁদের দয়ায়—দু'বেলা দু ভাঁড় পাঁচন দু' পয়সায় সহজে পেতো, অনেকে বাঁচতে পারত! কুবেরেরা এ কাজটি অনায়াসে করতে পারেন। না হয় পঞ্চকুবের মিলেই করুন। তা'তেও পয়সা নেই—তা নয়, —মশায়রাও মরে না। দেশে সখের "প্রভাত ফেরি" চলে, পাঁচনের ফেরি চলে না কি। মুখে মুখে মৃত-কবি রঙ্গলালকে টানাটানিও চলে। তাঁর "স্বাধীনতা হীনতায়" আর সবই তো বেশ চলছে! যাক্—দাও, আর একটু দাও মাণিক—

মাণিক। (দুঃখের হাসি চেপে)—এই যে—নিন না। তার পর কি করবেন বলুন!

ডাক্তার। করব' আর কি! ওষুধ তো আর নেই, —ডাক্তারিই আছে। আমাদেরও রূপ দেখানো 'ফেরি' চালাবো। চলো একবার ঘুরে আসি। যার প্রমাই আছে, অর্থাৎ বহু কষ্ট আছে—সে বাঁচবে।

সপ্তাহ তিনেক এই রুগী দেখা কাজটি তিনি নিয়মিত করে' যাচ্ছেন। যত্ন করে' দেখছেন, ব্যবস্থাও করছেন। অনেকে ভালো হয়েছে, হচ্ছেও। মাণিককে কয়েকটা ওষুধ সঙ্গে নিতে বলে' এগিয়ে পড়লেন। মাণিক সে সব গুছিয়েই রেখেছিল।

ডাক্তার। ওহে—সে ঝঙ্কাটটা আছে তো? mean আংটীটা। আজ একবার চাই যে।

মাণিক। এই গলায় বাঁধাই রয়েছে হুজুর!

ডাক্তার। ও কি আমাদের জন্যে! দিয়ে কেবল বিপন্ন করেছেন, দুর্ভাবনা বাড়িয়েছেন।

রোগীদের দেখে, ব্যবস্থা করে', হালকা হয়ে বেরুচ্ছেন, —বিনোদীর খবরটা নিয়ে বাসায় ফিরবেন। হঠাৎ শ্রীযুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা! "কি পাপ"!

যুধিষ্ঠির একটা গলিতে হাত জোড় করেই অপেক্ষা করছিল। চোখোচোখি হতেই—"দাস কি অপরাধ করেছে হুজুর? অত বড় সুখবরটা শুনতেও তার মানা! আমাকে অত' পর ভাবলেন কেনো দেবতা?"

ডাক্তার আশ্চর্য্য! "আরে না না যুধিষ্ঠির। তোমাকে যে চিনেছি, তাই সাবধান হ'তে হয়। বিদেশে রোজগার করতে এসেছ, না লুটতে এসেছ? অবান্তরের খোঁজ্ কেনো। যা "প্রত্যক্ষের বাহিরে", তার কথা ছেড়ে দাও। সত্য হলে, আমরা মধ্যবিত্ত, ও সব নমঃ নমো করে' সারাই উচিত। দু' একদিন আগে তোমাকে জানাতুম। তুমি শুনে বসে' আছ দেখছি!"

যুধিষ্ঠির। লুটের কথা বলবেন না হুজুর। এতো কারো দাবী নয়, এ আমার মা জননীর কাজ। এর প্রেস্‌ক্রিপসন্ আমরা লিখব'।

ডাক্তার। বিদেশে আর আমাদের অবস্থায়, বাড়াবাড়ি করা ভালো হবে না যুধিষ্ঠির।

র। আপনি কি বলছেন হুজুর, মাপ করবেন, এখন ভালো যে কিসে হয়, আপনার সে খবর নেই দেখছি। এখন চুনো-পুঁটিরাও রাঘব বোয়াল গিলছে! ষষ্ঠী পূজোতেও পাঁচ হাজারের কম প্রণামী নেই। যাক্ —সে সব আপনার শোনবার দরকার নেই…

ডাক্তার। না যুধিষ্ঠির—আমার শুনে কাজ নেই। যা ভালো হয় মাণিকলাল করবে বলেছে, তুমি ও নিয়ে ভেব না। এখন আমি রুগী দেখতে চললুম—

যুধিষ্ঠির। আপনার চেষ্টায় আর ব্যবস্থায় রোগ আর বাড়তে পারছে না। আরো দিন কতক থেকে নির্ম্মূল করে' যান হুজুর। কিছু খরচ তো আছেই—

ডাক্তার। আজ সাহেবের সঙ্গে কথা কয়ে' দেখি।

মাণিকলাল চোখ টিপে ইঙ্গিত করায়, যুধিষ্ঠির ডাক্তারের পায়ের ধুলো নিলে।

ডাক্তার চিন্তিতভাবে বেরিয়ে পড়লেন। বিনোদীকে দেখে বাসায় ফিরবেন।

দেখেন বিনোদীলাল বাইরে বেরিয়েছে, মাকে প্রণাম করছে। বড় খুশি হলেন, বললেন—"হ্যাঁ, এখন ওই তোমার ওষুধ, ওটি নিত্য কোরো। ওর উপর আর ওষুধ নেই। আমাদের ওষুধ আর খেতে হবে না। বল্ পেলেই o/cর সঙ্গে দেখা কোরো।

দুঃখীরাণীকে বললেন—"তুমিই এখন মায়ের মা। তাঁর সেবা কোরো—সুখী হবে"। সে নীরবে চোখ মুছলে।

অন্ধী-মায়ের সঙ্গে দু'চারটি কথা কয়ে', তাঁকে অভয় দিয়ে ফিরলেন। অন্ধের চক্ষে পরদা পড়ে গেলেও অশ্রু আটকায় না—আশীর্ব্বাদের স্রোত অবাধ থাকে। তাই নিয়ে ফিরলেন।

মাণিক অনেকক্ষণ কথা কয় নি। বিমর্ষমুখে বললে —"মা থাকতে অ্যাতো বুঝিনি ডাক্তারবাবু। এখন আর মা নেই, আজ মনে হচ্ছে যেন কেহই নেই—কিছুই নেই"।

মাণিকের চোখে জল ভরে' আসছে দেখে, ডাক্তার আরম্ভ করলেন—"কেই বা ভাবে, কেই বা বোঝে! ওরে—আমরা তাঁকে বুঝি না বুঝি, তাঁর পুঁজি ওই সন্তান, তাঁর সবটাই সন্তানের তরে—সন্তানই তাঁর সত্তা—প্রভেদ-হীন সমতা-মমতা। আর কোথাও কারো কাছে তা পাবে না। শোননি—উদ্ধব মা যশোদাকে যখন বললেন—"শ্রীকৃষ্ণ ভালো আছেন, তাঁর তরে ভেব না। তিনি যে সাক্ষাৎ ভগবান—জগৎ চিন্তামণি, তিনি সামান্য নন" ইত্যাদি। শুনে মা যশোদা বিরক্ত ভাবে বলেছিলেন—"ওরে আমি তোদের চিন্তামণির কথা জিজ্ঞাসা করছি না।—চিন্তামণি নয়—আমার গোপাল কেমন আছে জিজ্ঞাসা করছি—চিন্তামণি না—আমার গোপাল। মায়েই এ কথা বলতে পারেন। ছেলেকে ভগবান বলাতে মায়ের প্রাণ তুষ্ট হয় না, অনেকখানি রয়ে যায়। সে অনেকখানির কথা বুঝবে কে?"

উভয়ে বাসায় পৌঁছে গেলেন। মাণিক তখনো অন্যমনস্ক। ডাক্তারকে বর্ত্তমানে নেবে আসতে হল'—"একটু চা খাওয়াবে মাণিক!"

নিজেকে সামলে মাণিক বললে—"আজ্ঞে এখুনি। ভাতের জল চড়ানই আছে।"—পাঁচ মিনিটেই চা এসে গেল।

ডাক্তার। তখন চায়ের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছি—প্রায়শ্চিত্ত করি—বলেই হাসিমুখে চুমুক দিলেন। দেখো ভগবানের সৃষ্টির কোনো কিছুই ছোট নয়। গরীব দেশের পয়সা হু হু করে বাইরে চলে যাচ্ছে—তাই লাগে। মশা কামড়াচ্ছিল তো চিরকাল, কারো টনক নড়েনি। যেই প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে "মস্কিটো কয়েল" (মশার ধূপ) আমাদেরি মতো মরা চীন থেকে এলো, আমরা বাহবা দিয়ে নিলুম। দক্ষদের লক্ষ লক্ষ টাকা দিলুম। বস্তুটি কিন্তু ওই পাতা-ছ্যাঁচা বই অন্য কিছু নয়। বোধ করি আমাদের আনাচে-কানাচে জন্মায়—খুবই পরিচিত—কিন্তু পরিচয় নেবে কে?

মাণিক। কেবল কামড়ের কথাই বললেন—ম্যালেরিয়ার বাৎসরিক উৎসবটা—মড়কটা বাদ গেল যে।

ডাক্তার। ভুল নয় মাণিক। পশ্চিমের বড় বড় বিদ্বান মুরুব্বিরা—খাম্বাজে আওয়াজ দিচ্ছেন—ম্যালেরিয়াই (অর্থাৎ মরাই) আমাদের বাঁচবার শ্রেষ্ঠতম উপায়। এখানকার কোনো কোনো মোসাহেবও তাঁদের দোয়ারকি করছেন। আমাদের নাকি ভাত কাপড়ের বড় অভাব

নেই, অভাব হয়েছে লোক কমাবার। আমাদের লোক সংখ্যা যে অসম্ভব বাড়ছে! ম্যালেরিয়া তবু কতকটা সাহায্য করে। এ অকাট্য যুক্তির ওপর আমার উক্তির স্থান কোথায়? খুড়োরিয়া, জ্যেঠারিয়ারা বেঁচে থাকলেই মঙ্গল। সুতরাং থাক্—পাগলা-গারদের ফটক আর খুলিয়ে কাজ নেই।

মাণিক চাঙ্গা হয়েছে দেখে বললেন—"এইবার নেয়ে ফেলি, কি বলো?"

মাণিক। আজ্ঞে হ্যাঁ, মাথাটা ঠাণ্ডা করাই ভালো।

ডাক্তার হাসি টেনে উঠলেন।—"মনে আছে তো—আমাকে আবার"...

"আজ্ঞে খুব আছে। আপনি খেয়ে নিয়ে একটু শুয়ে পড়ুন—rest নিন্।"

ডাক্তার। rest? ভুলে যাও কেনো! মনটা যে বাবুইপাখীর জাত। ঝড় ঝাপটা এলেই বাসার মধ্যে আর থাকে না, বাইরে গিয়ে বসে। নাইতে গেলেন।

মাণিক আপন মনে—"কাজের সময় বিরক্তও হই, কিন্তু ভালও লাগে। ইনি যে কি রকম সংসার করলেন তা ভেবে পাই না। সায়েস্তা খাঁ আসছেন—সেই ঠিক্ করবে।"

মাণিক রন্ধনশালে ঢুকলো!

ডাক্তার আহারাদির পর শুয়েছিলেন। আদ ঘণ্টা পরেই ব্যস্তভাবে—"মাণিক কোথা গেলে হে?"

মাণিক। এই যে, আপনার 'হাফ্-প্যাণ্টের' থাপ্ ঠিক করছি।

"আরে ও এখন থাক্। এদিকে যে চারটে বাজে!"

"এখনো ১০ মিনিট বাকি, ঢের সময় আছে মশাই।"

"তুমি তো বললে ঢের সময় আছে! আমার রাজবেশ করাও তো আছে। সঙ্গে নিতে হবে আবার দুটো বকাল। দুনিয়ার মজা দেখো—ফুটো জিনিস্ লোকে ফেলে দেয়—অকেজো বলে'। সে দিন কিন্তু টেথিসকোপে ফুটো ছিল না বলে' কি ঝুঠো অভিনয়ই করে' আসতে হয়েছে! বিধাতাকে নমস্কার। তাঁর ভুল যেন কখনো ধরতে যেও না"—

অন্য পথে গিয়ে পড়েছেন দেখে মাণিক বললে—"কিন্তু এখন তো আপনি সময়ের দিকে দেখছেন না?"

ডাক্তার। ইস্ তাই তো—thank you—আর দেখছো—সময়টি কেমন তাঁর অদ্ভুত সৃষ্টি? তার না মোটর, না ট্রেণ, না প্লেন—তার পা'ও দেখিনি, আবার না ঘুম না বিশ্রাম। সৃষ্টির মুহূর্ত্ত থেকে সেই যে চলেছে তো চলেছে। ওকে থামাবে কে?

মাণিক। ঘড়ি—

ডাক্তার। তার মধ্যে নেই মাণিক। সে কেবল—দাসেদের I mean চাকুরেদের থামায়, থামায় না—ছোটায়—

মাণিক। আপনি থামচেন কই?

ডাক্তার। তাও তো বটে। আর কথা বাড়িও না, এ দিকে চারটে কুড়ি। মাথা খেলে! দাও—দাও সেই দুষমন্ দুটো।

মাণিক T. C. আর আংটী বার করতে বসলো'। ডাক্তার বেশ বদলালেন।—"ওই যাঃ খেউরি হওয়া হল' না তো!"

"এই তো পরশু কামিয়েছেন!"

ডাক্তার। দিন গুণে কি ঘণ্টা গুণে কলের মজুরির মাপ হয়, আবার কাজ দেখে, কাজের গুরুত্ব দেখতেও যে হয়। পরশুর কথা আর কোথাও ব'ল না। আজকাল না কামিয়ে ছেলেরা শবদাহ করতেও যেতে পারে না, তা'তে মৃতের অসম্মান আছে। আর আমি যাচ্ছি সাহেব বাড়ী!

মাণিক। মাপ করবেন, শুনেছি নবকেষ্ট বাহাদুরও যেতেন, বিদ্যেসাগর মশাইও যেতেন।

"সে সব পূর্ব্বের কথা, সে দিন আর নেই। এখন পশ্চিমের কথা কও। বড়াল কবি লিখে গেছেন—বোধ হয় এইরকম—

"সকলেই পূরবেতে চায়,
দেখেনা পশ্চিমে চেয়ে—কি ডুবিয়া যায়।"

এখন পশ্চিমকে সামলাও। Excuse me—বাড়ী ফিরে না দেখো—তিনি Bob ক'রে (ববরি-চুলো হয়ে) বসে' আছেন! যাক্, আর সময়ও নেই, তোমারি জিত্। কিন্তু মুখের দিকে চাইলে কি বলব?"

আমাদের মুখ কেউ চাইবেনা, এঁর এখনো গুরু মেলেনি বোধ হয়—

—"বলবেন—বাজারে ব্লেড্ (blade) পাওয়া যাচ্ছে না Sir."

"বেশ বলেছ—Very appropriate—দেখ একজন সব্-জজের বিপদের কথা মনে পড়ছে"…

"এখন থাক্ মশাই, পরে শুনব', নিজের বিপদটা—"

—"ইস্—সেইটাই তো আগে বটে"—

ফুঁ দিয়ে দেখে "টেথিসকোপটা" পকেটে ফেললেন—আংটীটা বুড়ো আঙুলে গলাতে গলাতে—"তবে দুর্গা বলি।" বেরিয়ে পড়লেন।

মাণিকলাল চিন্তিত ভাবে নিজের কথা ভাবতে বসল'। নিজের কথা মানে—বাড়ির কথা—স্ত্রীপুত্রের কথা। কিন্তু ডাক্তারবাবুর কথাই এসে গেল :—"ওঁকে একলা ছেড়ে দিয়েও স্বস্তি নেই। কি করে' যে কাজ করে' চলেছেন—ভেবে পাই না! নিশ্চয়ই ভগবান সহায় না হয়ে পারেন না। আমার মিছে ভাবা। থাক্—

—"বাড়ির যে খবর পেয়েছি, মাথা খারাপ করতে তাই যথেষ্ট। ভিটে কি মিঠে জিনিস্!"—

—"ভাগ্যে ডাক্তারবাবুকে পেয়েছিলুম, তাঁর দুটো কথা শুনলেই সব ভুলে যাই। সে দিন বললেন—বিদেশে যারা চাকরি করে, সামর্থ্য থাকতে দেশে ফেরা সম্ভব নয়, দেশে তাদের অতিরিক্ত বাড়ী ঘর, বিষয় সম্পত্তি বাড়ানো, কেবল চিন্তা আর অসুখ বাড়ানো। ছেলেদের চোষা বা পাওয়া আমের আঁটি দেখেছ তো, কসিতে না দাঁত ঠেকলে ছাড়ে না। আমাদের মালিকেরাও এমন হিসিবি,দেহে মাস থাকতে আমাদের রেহাই নেই। রসের কথা বলছি না—retire করবার দিন কাছিয়ে এলেই চিন্তায় সব রস শুকিয়ে যায়। যিনি প্রভুদের হাতে-পায়ে ধরে যাট বছরের সনন্দ পান I mean চেয়ারে বসতে পান ও ড্যাম, ডেভিল, শোনবার সৌভাগ্য পান, তাঁর আনন্দের আর সীমা থাকে না। ভাগ্যদোষে বেঁচে থাকেন তো, ভুরুর চুল পাকিয়ে, উৎসাহহীন কুব্জদেহে দেশে ফেরা তখন যেন বিদেশে ফেরাই হয়। গ্রামের তখন সবই বদলে গেছে। শ্রীনাথ জ্যেঠার সে গুলজার চণ্ডীমণ্ডপ, কোথায় যে ছিল বুঝতে পারা যায় না। নিজের জমিতে লাগানো সাতটা নারকোল গাছ সাবালক হয়ে কখন চলতে শিখে প্রতাপ খুড়োর বাগানের সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়ে' বেশ ফল দিচ্ছে, কেউ তা জানে না। শতকরা ৯৫ জন চিনতে পারে না—পুরাতনকে নূতন দেখে বলে'—"ইনি আবার কোথাকার কে এলেন?" তার পর সে অনেক কথা। সে মুখরোচক আলোচনা এখন থাক। তাঁদের আর দোষ কি?—আমাদের ভাগ্যেও তাই আছে মাণিক—

শুনে বলেছিলুম—"সত্যই বড় ভাবালেন—এখন উপায়?" ডাক্তারবাবু বলেছিলেন—"উপায় তিনটি—(১) সব সয়ে মিলে মিশে তাঁদের আপন করে' নেওয়াই সব চেয়ে ভালো। পয়সা থাকলে সকলে তা করে না বা পারে না, (২) বালীগঞ্জ তাঁকে টানে, এই তো দেখছি। বিলম্বে বোধ হয় সেখানেও মিলবে না। আর পয়সা না থাকে (৩) কাশী আছেন। যেবা ইচ্ছা হয়। তাও বেশী দিন নয়—বাঙ্গালিটোলায় ঘুন ধরেছে, দ্রুত উত্তর বাহিনী।"

ডাক্তারবাবুর একটি কথাও ফেলতে পারি না। বাড়ির চিঠির কথা সেদিন শুনিয়েছেন—খুললেই স্বর্গ নরক দুই ভোগ করায়, আবার দু'দিন না পেলেই দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না!

মাণিক দুদিন পূর্ব্বে পরিবারের একখানি সন্তনন্ত-বর্জ্জিত দীর্ঘ পত্র পেয়েছে, এ সব তারি ফুট। বানান বিশুদ্ধ হলে' বিপদ বাড়তো।—খিড়কির পুকুরটা, যার পঙ্কোদ্ধার করতে গরীবের সেভিংস্ অঙ্ক ফুরিয়ে যায়, যাতে মাছের ছানা ফেলিয়ে আসে, সে পুকুরটি যেচে বসেছে—unemploymentএর দুঃখ নাই। তাঁর এখন নিত্যকর্ম্ম ছিপ-ফেলে মাছ ধরা, পুকুরটিও নাকি রাজু জেলেকে, নিজের বলে' জমা দিয়েছেন। সে মাছ ধরছিল, ছোট ছেলেটা একটা মাছ চায়। পেয়েছিল খুড়োর এক ধমকানি। বালক ভয়ে পালাতে গিয়ে পড়ে' নাক থেঁতো করেছে—জ্বর হয়েছে!—মাণিক যতই বাদসাদ দিয়ে ভাবতে যায়—খুড়োকে চেনে, তাই ভুলতে পারছে না। দেশের সম্পত্তির এই বিপত্তি!

ভাবছে "এখন উপায় কি? বিদেশীর তরে দেশের কারই বা দুর্ভাবনা। আমার হয়ে তাঁরা কেনই বা কথা কবেন? সেটা বুদ্ধিমানের কাজও নয়। ভেবে আর কি করব! এখন ডাক্তারবাবু এলে যে বাঁচি।"

ভগবান বিপন্নের কথা শুনলেন। সহসা মশ্ মশ্ শব্দ। "মাণিকলাল" বলেই হাসিমুখে ডাক্তারবাবুর প্রবেশ। —"মা দুর্গার দয়ায় কেল্লা ফতে।"

মাণিক। আঃ বাঁচালেন মশাই। আপনাকে ছেড়ে আর একা একদণ্ড থাকা আমার চলবে না। একটা না একটা দুর্য্যোগ উপস্থিত হয়—

ডাক্তার সবিস্ময়ে—আবার কি হোলো? যুধিষ্ঠির ধাওয়া করেছিল বুঝি! সেই ডোবাবে দেখছি—

মাণিক। কি যে বলেন! ওই একটিই তো সত্যিকার বন্ধু বলে' পেয়েছি মশাই। সে কথা এখন থাক। সেই যে বলেছিলেন "বাড়ির চিঠি"—তা পেয়েছি এবং তার মধ্যে খুড়োর practical অভিনয়,—ছোট ছেলেটার নাক থেঁতো, পত্নীর অনুতাপ প্রভৃতি নরক ভোগও পেয়েছি ও করছিলুম। ভাগ্যে আপনি এসে পড়লেন।—মার সে পাপ কথা, এখন আপনার কথা শুনি। O/C আর T. C.র কথা আগে বলুন। এখানকার চ্যাপটার প্রায় শেষ—আজকের কথাগুলো তাই ভালকরে শুনতে ইচ্ছা হয়; পরে যা আছে তা তো আর নতুন পড়া নয়—

ডাক্তার। তাই ত' বড় ভাবছো দেখছি—ভাববারই কথা বটে।—মুখ বদলে গিয়েছে, বোলে দিয়েছে। এর পর সেই দুষমনদের দুঃশাসনী পেসন্ বাড়বে বই কমবে না, সেটাও ঠিক্। উপায় কি? চাকুরি যে আমাদের অদৃষ্ট-লিপি মাণিক। ভেব না, দেখবার একজন আছেন—

মাণিক। নাঃ, আর ভাবছি না। আপনার আসার সঙ্গে সঙ্গেই বল্ পেয়েছি। দেখবার একজন আছেন তার পরিচয়ও পেয়েছি। কিন্তু—

ডাক্তার। "কিন্তুটা" এখন থাক মাণিক। পূর্ব্বে কখনো সবিস্তার শুনতে চাওনি, আজ সবিস্তারের কথা শুনেই আমি চমকে গিয়েছি, বোধ করি তোমার চিন্তার "আগামী"টা অনুমান করতেও পেরেছি। ভেব না, কিন্তু মনে রেখো মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না—

মাণিক। স্বীকার করি হুজুর, কিন্তু তা হলে' মাণিকের এ চাকরি করাও আর হয় না—

ডাক্তার স্তব্ধ বিমর্ষে মিনিটখানেক থেকে বললেন—ও সম্বন্ধে কথা দু-কাপ চা খাবার পর হবে,—এখন থাক।

মাণিক। বড় ভুল হয়ে গেছে—মাপ করবেন, আগে চা-টা আনি।

মাণিক চা আনতে উঠল। কিন্তু পূর্ব্বের মত ছুটল না।

"তাই তো, মাণিক বড় ভাবছে। ভাবনাও অযথা নয়। কেনো জানি না,—কর্ত্তারা আমাদের দুজনকে তফাৎ করবেই। তার আঁচও পেয়েছি। অন্যের প্রতি সাহেবের একটু সুনজর দেখলেই ওঁদের কুনজরে তাকে পড়তেই হয়। তখন তার জন্যে worse (আঁটকুড়ো) ষ্টেসনের খোঁজ চলতে থাকে, যেখানে মোটর পৌঁছয় না। আমাদের উভয়ের জন্যে—তাই চলছে শুনেছি। উপায় কি? মাণিককেই বা বলব' কি?"

মিশরের ডাইরী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

(৪)

পাঁচটার সময় বি-ও-এ-সির লোক এসে দরজায় আঘাত ক'রে যাত্রার ইঙ্গিত জানাল। স্নান সেরে এসে দেখি পালঙ্ক-চা (Bed-tea) প্রস্তুত। যাত্রার পোষাক প'রে জিনিষপত্র বেয়ারার জিম্মায় দিয়ে আমরা ব্রেক-ফাষ্টের জন্য ডিনার হলে উপস্থিত হ'লাম। খাদ্যসামগ্রী প্রচুর; পাশের টেবিলে তিনজন সামরিক কর্ম্মচারী যা' খেল, দেখে মনে হ'ল যেন তাদের এই জীবনের শেষ খাওয়া।

ঠিক সাতটার সময় এয়ারপোর্টে এলাম। আমাদের সঙ্গে একজন যুবক—নতুন যাত্রী, চ'লেছে বাগদাদে; সঙ্গে এসেছে তার মা, ভাই-বোন তাকে তুলে দিতে। সবার কি কান্না! কারণ তার এই প্রথম এরোপ্লেন চড়ার অভিজ্ঞতা। পিতা তাকে সমস্ত বিষয়ে সাবধান ক'রে দিলেন এবং নানা খুঁটিনাটি উপদেশ দিলেন। মা, বোন কয়েকবার চুমু দিল। তারা সবাই পোর্টের সীমানার বাইরে। শেষ মুহূর্ত্তে ছোট বোনটি তার অশ্রুসিক্ত রুমালটী দূর থেকে ছুঁড়ে দিল। ভাইটী দৌড়ে গিয়ে সেই রুমালখানি কুড়িয়ে নিল। সব ঘটনাটা দেখে মনে হ'ল ইউরোপীয় পরিচ্ছদের অন্তরালে এখনও সুপ্ত র'য়েছে প্রাচ্য মন—স্নেহ, মমতা, বন্ধ

দিয়ে ঢাকা। ঠিক সাড়ে সাতটার সময় আমাদের এরোপ্লেন চ'ল্‌লো বাগদাদের পথে।

এবার সত্যিকারের মরুভূমির উপর দিয়ে চ'লেছি। ডানপাশে তাইগ্রিস, বামপাশে দিকচক্রবাল রেখার পানে ছুটছে সীমাহীন মরু। মাঝে মাঝে দুই এক জায়গায় র'য়েছে খর্জ্জুরবৃক্ষশ্রেণী—কৃষকের অতি নিপুণ হস্তে সাজান। দেখে বোঝা যায় যে কৃষিবিভাগ এই বনবীথির পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করে। প্রায় এক ঘণ্টা চলার পর আবার আমরা প'ড়লাম ধূলির ঝড়ে; বসরার পথে যে ঝড় দেখেছিলাম, আরবের মরুপ্রান্তে এই ঝড়ের গতি, তদপেক্ষা বহুগুণ বেশী। চারিদিকে কাল-ধূলির ঝঞ্ঝা, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ—অবশ্য সেই বালুকা সমুদ্রের স্রোতের মত বিরামবিহীন। ধূলি আমাদের স্পর্শ ক'রতে পারে নি, কারণ সমস্ত কাঁচের জানালা। মনে হ'ল বিরাট শূন্য ধূলি দিয়ে তৈরী হ'য়েছে। বসরা থেকে বাগদাদ বিমানপথে ৩০০ মাইল। তার মধ্যে প্রায় ২০০ মাইল পথ ধূলিতে ঢাকা ছিল। বাগদাদ এসে নামলাম প্রায়



ইজিপ্ট

তিন ঘণ্টা পরে। এত বিলম্বের কারণ, ধূলির এবং বিমানপোতের প্রতিযোগিতা।

বাগদাদ এরোড্রম বিশেষ চমৎকার নয়। তবে খুব বিরাট। এখান থেকে একটা রেললাইন চ'লেছে কারবালার দিকে, আর একটা লাইন গেছে তেহরাণের দিকে, তৃতীয়টা চ'লেছে উত্তর আরবে মরুভূমির সীমান্ত স্পর্শ ক'রে এলেপ্পোর পথ দিয়ে তুরস্ক অতিক্রম ক'রে ইউরোপ পর্য্যন্ত। এরোপ্লেন থেকে নেমে আমরা পাসপোর্ট, মেডিকেল সার্টিফিকেট দেখিয়ে বিশ্রামাগারে প্রবেশ ক'রলাম; এখান থেকে সহর প্রায় ছয় মাইল। বহু ভারতবাসী নানাপ্রকার যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত র'য়েছে এই বাগদাদে। সহর দেখার সুযোগ হ'ল না। আধঘণ্টা পরে আমাদের যাত্রা সুরু হবে প্যালেষ্টাইনের দিকে।

এবার চ'লেছি বাগদাদ থেকে উত্তর আরবের মরুভূমির উপর দিয়ে প্যালেষ্টাইনের পথে। এরোপ্লেন প্রায় ১০,০০০ হাজার ফিট উপর দিয়ে যা'চ্ছিল। নীচে ঘন কৃষ্ণ বালুকার স্তূপ, মাঝে মাঝে ধূলির ঝড়ে বালুকা স্তূপীকৃত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে পরিণত হ'য়েছে। কচিৎ কখনও সমান্তরাল বালুকাক্ষেত্রের ভিতরে রেখার মতন পথ চ'লেছে। বোধ হয় মানুষের পায়ে চলা পথ। কিন্তু এর কোন নিশ্চয়তা নেই কোথায় পথ আরম্ভ, কোথায় পথ শেষ। বালুকারাশি তীব্র হিংস্ররূপ পরিগ্রহ ক'রে যেন মানুষের তৈরী বসতিক্ষেত্রের প্রতিযোগিতার জন্য অপেক্ষা ক'রছে। একবার পথ হারিয়ে গেলে পথিক বিভ্রান্ত হবে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। সেইজন্য বোধ হয় আরবজাতি অত্যন্ত অতিথিবৎসল। পথহারা পথিকের আশ্রয় অত্যন্ত প্রয়োজন; তাই প্রত্যেক আরব বেদুইন অন্যকে আশ্রয় দিতে উন্মুখ। কারণ, মরুভূমির যাত্রীদের পক্ষে পথ হারান অতি সহজ ব্যাপার। একে অন্যকে আতিথ্য না দিলে নিজেও বিপদের সময় আতিথ্যের সুযোগ পাবে না। আরবদের হিংস্র চরিত্রের অন্যতম কারণ বোধহয় পারিপার্শ্বিক মরুভূমির হিংস্র, উগ্র, নৃশংসরূপ। আরব বেদুইনের দুইটী বিরুদ্ধ প্রকৃতি—একদিকে ভয়ঙ্কর, অন্যদিকে অতিথি-পরায়ণ। মরুভূমির বালুকাই এর প্রচ্ছদপট। আমি অতি উৎসাহের সঙ্গে এই আতঙ্কজনক হিংস্র রূপ উপভোগ ক'রলাম।

আমরা জেরুজালেমের অপর পার্শ্বে লীডা নামক এয়ারপোর্টে



ইজিপ্ট

নামলাম প্রায় সাড়ে চারটার সময়। একজন ইহুদী গর্ব্বের সঙ্গে জেরুজালেমের কথা ভাঙ্গা আরবী ও ভাঙ্গা ইংরাজীতে ব'লে গেল। জেরুজালেমের অতীত ঐশ্বর্য্যের বিবরণ দিয়ে গেল এবং ব'ল্লে—জেরুজালেম না দেখলে আমার মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ ব্যর্থ হবে। আমি তাকে আশ্বাস দিলাম, তোমাদের আতিথ্য একবার গ্রহণ ক'রব। এখান থেকে লোহিত-সাগর ৪০ মাইলেরও কম। আমাদের সহযাত্রী ক্যাপ্টেন সিং সস্মিতমুখে বিদায় নিয়ে হাইফার উদ্দেশ্যে চ'লে গেলেন।

আমাদের পাসপোর্ট পরীক্ষার পর আবার যাত্রা সুরু হবে। লীডা থেকে ১৫ জন যাত্রী আমাদের সঙ্গে কায়রো চ'ল্ল। প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় আমরা এশিয়া ত্যাগ ক'রে লোহিত সাগর অতিক্রম ক'রলাম। এখানেও মরুভূমি র'য়েছে, বালুকারাশি অপেক্ষাকৃত ভদ্র আকৃতির, রুদ্র কৃষ্ণবর্ণ নয়। মাঝে মাঝে মেঘের ছায়া প'ড়ে কোথাও কোথাও নীলাভ হ'য়ে উঠেছে। কোন কোন স্থানে ঘন বসতির সাক্ষাৎ পেলাম —মাঝে মাঝে পয়ঃপ্রণালী, পাশে পাশে সৈন্যশিবির—যুদ্ধক্ষেত্রের নৈকট্যের আভাস পাওয়া যায়। প্রায় সাড়ে ছয়টার সময় আমরা

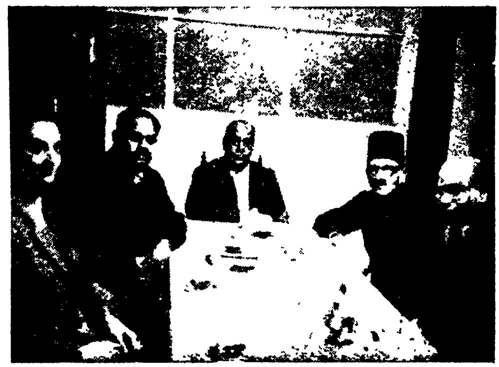
মিশরের রাজধানী কায়রোর প্রান্তদেশে একটী এয়ার পোর্টে নামলাম। এটী সহর থেকে দশমাইল দূরে। কাষ্টমস্‌, পাস্‌পোর্ট, ডাক্তারি সার্টিফিকেট তন্ন তন্ন ক'রে দেখা হ'লো। আমাদের সঙ্গের লণ্ডনযাত্রী সস্ত্রীক ইউরোপীয় ভদ্রলোক এইবার প্রথম পাসপোর্ট দেখিয়েই নিষ্কৃতি পেলেন না। তাঁর সুটকেশ যখন খোলা হ'ল, তিনি মুখ অত্যন্ত বিকৃত ক'রে অস্বচ্ছন্দমনে এই নিয়মের কাছে মাথা নত ক'রলেন। আমাকে পাসপোর্ট অফিসার ব'ল্লেন,—আপনার মিশরে স্থিতির অনুমতি মাত্র একমাস। আপনি তাড়াতাড়ি এই অনুমতি পত্র পরিবর্ত্তন ক'রে নেবেন। বি-ও-এ-সির মোটর আমাদিগকে নিয়ে এলো তাদের কায়রোর অফিসে। সেখান থেকে বিভিন্ন হোটেলে আমাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হবে। আমি ও মিঃ সিলভরাজ হোটেলে না থেকে ওয়াই-এম-সি-এর আশ্রয় নিতে চ'ল্লাম। আমার সঙ্গে সেক্রেটারী মিঃ আলেকজাণ্ডারের নামে কানেডিয়ান মিঃ ডাণ্ডাডেলের একখানি পরিচয়পত্র ছিল। আমি সিলভরাজের পরিচয় ও মিঃ ডাণ্ডাডেলের চিঠির উপর নির্ভর করলাম।



ইজিপ্ট

কায়রো

ওয়াই-এম্‌-সি-এ গৃহ কায়রোর বি-ও-এ-সির অফিস থেকে পাঁচ মিনিটের পথ। মিঃ আলেকজাণ্ডার সাইপ্রাসে গিয়েছেন। তাঁর সহকারী মিঃ মালবিয়া আমাদের সাদর সম্বর্দ্ধনা করে নিয়ে গেলেন। তিনি আপ্যায়ন করে আমাদের স্নানের ও জলযোগের ব্যবস্থা করলেন। রাত্রি নয়টার সময় আমরা অফিসার মেসে ডিনারে বসেছি। আমিই একমাত্র অসামরিক পোষাক ধারী অপরিচিত। অন্যান্য সকলেই আমাকে দেখে আশ্চর্য্য হলেন; এই যুদ্ধের দুর্য্যোগে হঠাৎ কোন অসামরিক ভারতবাসীর কায়রো আগমন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। মিঃ মালবিয়া আমাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন—একজন ভারতীয় অধ্যাপক, ইসলাম সংস্কৃতি চর্চ্চার জন্য এসেছেন এবং এই মধ্যপ্রাচ্যে এক বৎসর অবস্থান করবেন। আমার পাশের টেবিলে বসেছিলেন একজন অফিসার—নিবাস সীমান্ত প্রদেশের মর্দ্দান জেলায়, জাতিতে পাঠান। আমার সঙ্গে পনের মিনিট আলাপ করে তিনি আমাকে তার গৃহে অবস্থানের জন্য আমন্ত্রণ করলেন। হিন্দু অধ্যাপক ইসলাম সংস্কৃতির চর্চ্চা করতে এসেছেন ব'লে অত্যন্ত গর্ব্ব অনুভব করলেন এবং আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিলেন। রাত্রি সাড়ে দশটার পর তিনি আমাকে তাঁর আবাসে নিয়ে গেলেন। এই আবাসটি একটি পেন্‌সনপ্রাপ্ত একজন মিশরীয় মহিলা পরিচালিত। এত রাত্রেও আমাকে এক পেয়ালা কফি দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। পরের দিন আমাকে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাঙ্কে নিয়ে যাবেন এবং কয়েকজন আরব ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। এইপাঠান ভদ্রলোকের সহৃদয়তা আমার অনেক দিন মনে থাকবে। তাঁর নাম—কাপ্টেন ফজল করিম খাঁন।



ইজিপ্ট

কঙ্কাল হাসে না কভু

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত এম-এ

অতলান্ত গুহা হ'তে শুধু ব্যর্থ কাতর প্রার্থনা,—
জীবনের দিনগুলি গোণা।
আলোকের আশা আজো নাই—
চাওয়া-পাওয়া হিসাবের ঠিকানা মিলাই!
ভিক্ষা-বীজ-মন্ত্রে শুধু বাঁধিয়াছি বাসা,
কঙ্কাল মনের কোণে তবু ধরি আশা—
স্বপ্ন তবু আজো এসে করে করাঘাত,
জীবনে কী আসিবে প্রভাত?
অন্তর শুকায়ে গেছে—সাহারায় বৃথা পরিক্রমা—
আলোক নিভেছে কবে
আঁধার হ'য়েছে শুধু জমা!
কঙ্কাল হাসে না কভু—
শুষ্ক মুখে ভাষা নেই কবি,
মরণ নেমেছে ভাখো, পথে পথে তারি সব ছবি।

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

(১১)

অমল খোকাকে পড়াইতেছিল। প্রায় দেড় ঘণ্টা হইয়া গিয়াছে—

কিন্তু রমলা আজ আসে নাই। খোলা দরজার দিকে চাহিয়া চাহিয়া অমল বৃথাই প্রতীক্ষা করিয়াছে—এখন সে বুঝিয়াছে যে আজ আর সে আসিবে না। তাহার মিথ্যা পরিচয়, সভাগৃহে তাহার ব্যবহার, সমগ্র একত্রিত করিয়া অমল যুক্তি দ্বারা বিচার করিতেছিল—রমলা যদি আজ তাহার পরিচয় অস্বীকার করে তবে তাহাতে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। তারই ভৃত্য হইয়া সে যে অপমান তাহাকে করিয়াছে, তাহা হয়ত সে ভুলিতে পারে নাই—

অমলের চিন্তাস্রোতকে বাধা দিয়া খোকা কহিল—পড়া হয়ে গেছে মাষ্টার মশায়, উঠি ?

—এঁ্যা, অঙ্ক হ'য়েছে ?

—হাঁ্যা। আপনি একটু বসুন, দিদি ব'লেছে।

—ও আচ্ছা।

অমল অপেক্ষা করিতেছিল।

রমলা সহাস্য মুখে ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল—নমস্কার, কবি অমলবাবু।

অমল প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল,—বসুন,—কোন রকম ব্যঙ্গ বা তিরস্কারেরই আমি প্রত্যুত্তর দেব না প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি, অতএব আপনি যথেচ্ছ ব্যঙ্গ ক'রতে পারেন।

রমলা খোকার চেয়ারটায় বসিয়া বলিল—আজ অকস্মাৎ একেবারে যুধিষ্ঠির হ'লেন কেন ?

—যে কারণে আপনি আমাকে কটুক্তি ক'রবেনই প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন।

রমলা তেমনি হাসিয়া বলিল,—এ রকম প্রতিজ্ঞা ক'রেছি তা বুঝলেন কি ক'রে ?

অমল বলিল—প্রথম বচনেই বুঝেছি—ওটা মানুষ স্বভাবতঃই বোঝে। যাক্, আপনার প্রশ্ন, ব্যঙ্গ এবং তিরস্কার আরম্ভ করুন। হাড়িকাঠের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখবেন না !

—আপনার মাঝে এত দৈন্য, এত বিনয়; একে যে অভিনয় বলে ভ্রম হয়।

—আমার মাঝে ঔদ্ধত্য আছে,একথা অন্ততঃ আপনি বলতে পারেন না।

রমলা পুনরায় হাসিয়া বলিল—না, তা বলা যায় না কিন্তু এতগুলো মিথ্যে কথা আমার কাছে কেন বলেছিলেন ?

—মিথ্যে কথা ! এতগুলো ?

—হাঁ্যা, আপনি অঙ্কশাস্ত্রে এম্-এ, পড়েন, কাপালিক, কবিতা বোঝেন না—এ সমস্ত কেন ব'ললেন ?

—কেন বলেছিলুম মনে নেই, তবে বলে বেশ তৃপ্তি পেয়েছিলাম মনে আছে—আর সে দিন নতুন পরিচয় পেয়ে কেমন মজা হ'ল বলুন ত ?

—মজা ! আপনার মাঝে আর একটু লজ্জা আশা করেছিলাম।

—আজ আমার অবস্থা মিথ্যাবাদী রাখালের চেয়েও শোচনীয়। তারপর ?

—সমিতির সভায় আপনি যে আমাকে চিনতে পারলেন না ?

—আপনিও ত আমাকে চেনেন নি। ভাবলুম, আমার সঙ্গে পরিচয় আছে একথা স্বীকার ক'রতে আপনি হয়ত অনিচ্ছুক, তাই আমিও তেমনি ভাবেই চলেছি।

—ও এই মাত্র। যাহোক্,—আপনি সমস্ত প্রশ্নের উত্তরই বেশ ভেবে চিন্তে এসেছেন দেখছি। আপনি মিথ্যা কথা বলে যে অভিনয় ক'রেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ। আমার ঔদ্ধত্য ও স্পর্দ্ধাকে আপনি বেশ শিক্ষা দিয়েছেন—এটা আমার প্রাপ্য, কাজেই আমার কোন রাগ নেই আপনার উপর। তবে মানুষের অসম্পূর্ণতার প্রতি আপনার সহানুভূতি থাকলে সেটাই কি বেশী মহানুভবতার পরিচয় হ'ত না !···আপনার কাছে আমার লজ্জা নেই, আপনি ত জানতেন আমি নতুন সভ্য হ'য়েছি—

—না, আমাদের সমিতির কথা জানতুম না।

—ইচ্ছা করলে ওই অসম্মানের হাত থেকে আপনি রক্ষা ক'রতে পারতেন। অপর্ণার খাতা'ত আপনি দেখেছেন।

—না, আমি সভায় যাবো তা ঠিক ছিল না, শেষ মুহূর্ত্তে গিয়েছি।

রমলা ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া কি যেন ভাবিল, তাহার পর উঠিয়া যাইয়া চাকরকে চা'র তাগাদা করিয়া পুনরায় বসিয়া বলিল,—অপর্ণা কে ?

অমল অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিল—আমাদের সঙ্গে পড়ে।

—আপনি তাঁকে যে 'তুমি' বলেন ?

—ব'লতে ব'লতে হ'য়ে গেছে—অমনি অনেক সহপাঠীকেও ত বলি।

—আপনাদের মাঝে খুব···একটু থতমত খাইয়া সে বাক্যটি সম্পূর্ণ করিল,—ঘনিষ্ঠতা, না ?

—সম্ভব, নইলে আর তুমি ব'লবো কেন। তবে সে ঘনিষ্ঠতার অর্থ আপনি কি ক'রবেন জানি না।

রমলা বলিল,—ভয় নেই, আমি কিছু মনে ক'রবো না। তবে সে যে আপনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে, আপনার মনে করে এ-তে বোধ হয় সন্দেহ নেই—

অমল বলিল—আমার মত দরিদ্র কোন ব্যক্তিকে সে যদি আপনার মনে করে তবে সে তার মহানুভবতা এবং আমার পক্ষে আপনার পরিচয়ের মত তার পরিচয়ও যথেষ্ট গৌরবের।

চা খাইতে খাইতে অমল বলিল,—মিস্ মিত্র, একটা জিনিষ কখনও ভুলবেন না। আমি কি এবং আমার কতটুকু এ জগতে প্রাপ্য তা আমি কখনও ভুলি না। সেদিনও আমি ভুলিনি যে আমি আপনাদের ভৃত্য মাত্র এবং আজও ভুলিনি যে আমি তাই। এই চা, খাবার, আপনার পরিচয়, এ সমস্তকেই আমি যথেষ্ট মূল্যবান এবং আপনাদের স্নেহের দান বলে মনে করি—

রমলা বলিল—মানুষ—মেয়েরা কি কেবল অর্থ দিয়েই লোককে বিচার করে। মানুষ হিসাবে তার গুণ, শক্তি, শিক্ষা এগুলো কি বিচার করে না—

—জানি না, তবে এমন সুখের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে হয়নি।

—আপনি বেছে নিতে পারেন নি। নইলে আপনি দেখতে পেতেন মানুষের আভিজাত্যের খোলসের অন্তরালেও তার প্রাণ আছে।

—অবসর ও সুযোগ পেলে দেখ্‌বো।

—সত্যি ক'রে বলুন,—আপনি কেন এতগুলো মিথ্যা পরিচয় আমাকে দিয়েছিলেন?

—জানি না।

—জানি, আমাকে লাঞ্ছনা দেওয়াই আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু আর কেন? এতেও কি আপনার হয় নি?

—আমাকে বৃথা দোষ দিবেন না, মিস্ মিত্র। যা কেবল খেলার ছলে—অমল লজ্জিত হইয়া মাটির দিকেই চাহিয়া ছিল।

—হ্যাঁ, কেবল খেলার ছলেই বটে—তবে তা আজ প্রায় প্রাণঘাতী হ'য়ে উঠেছে, তা বুঝ্‌তে পারেন।

অমল রমলার মুখের পানে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া বলিল—আমার জন্যে জীবনে কেউ কোনরূপ দুঃখ বা কষ্ট পায় তা আমি চাই না। আমার জন্যে যদি কোন কষ্ট পেয়ে থাকেন তবে আমি দুঃখিত এবং মুক্তকণ্ঠে আমার অপরাধ স্বীকার ক'রে ক্ষমা চাইছি।

—ক্ষমা চাইবার কিছু নেই। আমি দুঃখিত ত হইনি, আপনাকে প্রথমে যতখানি অবহেলা হয় ত করেছিলাম আজ যে ততখানি শ্রদ্ধা করি একথা কি আপনি বুঝতে পারেন?

—আমার ভাগ্য।

রমলা টেবিলের উপর বাম হাতের তর্জ্জনীটা কয়েকবার অকারণে বুলাইয়া অমলের মুখের পানে চাহিয়া বলিল,—অপর্ণা ও আপনার মাঝে ঘনিষ্ঠতা, তথা ভালবাসা গড়ে উঠেছে এ সংবাদ পেয়ে এবং স্বচোক্ষে দেখে আমার যথেষ্ট উপকার হ'য়েছে। আমাদের মাঝে ভালবাসার মত কিছু হয়ত নেই, কিন্তু আমাদের অন্তরেরও একটা মূল্য আছে তা অস্বীকার আপনি ক'রবেন না।

—কোনদিন করিনি।

—কিন্তু আমাদের এই শ্রদ্ধার কি কোন প্রীতিদানই নেই?

অমল চমকাইয়া ফিরিয়া রমলার মুখের পানে চাহিল। রমলা কি চাহে? কি সে নানা কথার জালে জড়াইয়া ব্যক্ত করিতে চাহিতেছে! অমল প্রশ্ন করিল,—আমি কি প্রতিদান দিতে পারি? আমি যে অত্যন্ত অক্ষম, সে কথা আপনি ভুললেন কেমন ক'রে?

—অক্ষমতাটা আপনার ত অভিনয়।

—না,—আমি গরীব একথা আপনি জানেন।

—জানি, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী যে সেদিন জেনে এসেছি। আপনি হয়ত জানেন না যে আপনি ও আপনার কবিতাই সমিতির সকলের আলোচ্য বিষয়।

—কেমন ক'রে জানি না। সেও হয়ত ব্যঙ্গই—

—না, সেটা appreciation,

অমল সহসা সংশয় অতিক্রম করিতে যাইয়া প্রশ্ন করিল—আপনিও appreciate করেন?

—হ্যাঁ, এক কথায় গুণমুগ্ধ—রমলা একটু হাসিয়া অমলের মুখের দিকে চাহিল।

—বটে?

—হ্যাঁ, স্বীকার ক'রতে কুণ্ঠা নেই, কিন্তু আপনি কি মনে করেন আমাকে—

অমল বলিল—আমার মনিব।

—কেবলমাত্র তাই?

অমল লক্ষ্য করিল, শিক্ষাভিমানী উদ্ধত, স্পর্দ্ধিত রমলার দুই চোখের কোণে দুই ফোঁটা জল, ছন্দ-পতনের দৈন্য লইয়া টলটল করিতেছে। রমলা হয়ত তাহাই গোপন করিতে নমস্কার না করিয়াই দ্রুত প্রস্থান করিল। অমল অত্যন্ত ধীরপদক্ষেপে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল।

প্রয়োজন ছিল না এবং মনে মনে অমল সমস্ত প্রয়োজনই শেষ করিয়া ফেলিয়াছিল তাই অপর্ণার সহিত দেখা হওয়া সত্ত্বেও সে কিছু বলে নাই। অত্যন্ত ভাল ছেলের মত ক্লাসের কোনে একাকী বসিয়াছিল। ঝড়ের পরে শান্ত প্রকৃতির মত তার মন আজ কেবল ভিজা ঘাসের গন্ধে রহিয়া রহিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিতেছে মাত্র। তাহার দারিদ্র্য অপর্ণাকে না হইলেও তাহার মাতা পিতাকে বিমুখ করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু রমলা এত জানিয়াও কেন অশ্রু গোপন করিতে নমস্কার না করিয়াই প্রস্থান করিল?

সারাটা দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিয়া গেল—অনেক ইংরাজ কবি, নাট্যকারের প্রসঙ্গ ক্লাসে আলোচিত হইল। অনেক লিরিক কবিতার ব্যাখ্যা হইল, অমল স্বপ্নহীন শূন্য অন্তর লইয়া সবই শুনিয়াছে। অপর্ণা কলেজে আসিয়াছে—যে নীল সিল্কের শাড়ীখানা পরিয়া সে একদিন তাহাকে খুশী করিয়াছিল, আজ সে সেইখানাই পুনরায় পরিয়াছে—ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক, আর নেহাত পর্য্যায়ক্রমেই হোক। নানারূপ কাজ করা ব্লাউসটা আজ শাড়ীর অন্তরাল হইতেও তাহার ঐশ্বর্য্যের ইঙ্গিত করিতেছে।

শেষ ঘণ্টার শেষে, সকলের প্রস্থানের পর অমল ধীরপদক্ষেপে ক্লাস হইতে বাহির হইতেছিল। ভাবিয়াছিল সম্মুখের পথ নিশ্চয়ই জনশূন্য, কিন্তু অকস্মাৎ সে আবিষ্কার করিল, অপর্ণা দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছে। অমলের সঙ্গে দেখা হইতেই বলিল—তোমার কি হ'য়েছে বল ত?

অমল ম্লান হাসিয়া বলিল—কি আবার হবে !

—তুমি বড্ডো সেণ্টিমেণ্টাল। তোমাকে ত আজ বাড়ীতেও নিয়ে যেতে সাহস হ'চ্ছে না।

—কেন ?

—কি জানি, মেয়ে হয়ত মার কাছে সবিস্তারে এবং অতিরঞ্জিত ক'রে তোমার দারিদ্র্যের বর্ণনা ক'রবে। তোমার ত আর জ্ঞান কাণ্ড কিছু থাক্‌বে না।

অমল হাসিল। অপর্ণা বলিল,—হাসির কথা নয়,—সেদিন সেই ভয়েই তোমাকে নিয়ে যাই নি, তুমি হয়ত খুব অপমানিত হ'য়ে, অভিমান ক'রে এসেছ ?

অমল বিস্মিত আঁখি মেলিয়া শুধু কহিল,—অভিমান ?

অপর্ণা বলিল,—হ্যাঁ, নিজের মনের অন্তরালে ত কিছু নেই। অভিমান ক'রেছ—ভয় নেই অতটুকু দাবী তোমার আছে আমার উপর। চল, কোথায় যাবে—

অমল ব্যঙ্গ করিল—তোমাদের বাড়ীতে ত আর যাওয়া হবে না।

অপর্ণা হাসিয়া বলিল,—আর নয় আজ। খোঁচা তুমি যতই দাও,—আজ আর কিছু ব'লবো না।

অমল অপর্ণার মুখের দিকে ঋজু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—অনেকক্ষণ। প্রগল্‌ভ অপর্ণার মুখে আজ ভয় ও সহানুভূতির প্রলেপ স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে কহিল—চল, কোথায় যাবে ?

—চা খেয়েছ ?

—না।

—তবে চল, চা খেয়েই বেরুই। যেখানে হয় নামলেই হবে।

কোনরূপ সিভলরি না দেখাইয়া অপর্ণার পয়সায়ই সে চা খাইয়া আসিল এবং তাহারই পয়সায় গড়ের মাঠে আসিয়া বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া পড়িল।

অপর্ণা অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল,—সেদিন তুমি খুব দুঃখিত হ'য়েছিল ?

—না। আমি জানি, আমার দারিদ্র্যকে তুমি তোমার মা'র কাছে গোপন ক'রতে চাও, কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই। ধর, যদি তুমি আমাকে বিবাহ ক'রতেও প্রস্তুত থাকো তা হ'লেও মা বাপের অমতে এ দারিদ্র্যকে তুমি ইচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ ক'রতে পারবে না—সে কথাও আমি জানি ; তবে তোমার এই পরিচয়, এই ঘনিষ্ঠতা সম্ভবতঃ ভালবাসা—আমার চিরদিন স্মরণ থাক্‌বে। তোমাদের মত শিক্ষিতা যারা তাদের সঙ্গে মিশবার যথেষ্ট সুযোগ আমার জীবনে হয় নি,—তুমি আমার প্রথম পরিচয়। জানি না কেন যেদিন প্রথম তোমাকে দেখেছিলাম সেই দিন থেকেই ভাল লেগেছে,—লাইব্রেরীতে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কেবল তোমাকেই দেখতাম। আজ এ দৈন্য প্রকাশ ক'রতে বাধা নেই, যখন সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা আজ নিঃশেষে নির্মূল হ'য়ে গেছে—

আর-বলা-যায়-না এমনি ভাবে যেন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠেই অমল থামিয়া গেল। অপর্ণা অমলের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল—সুদূরপ্রসারী তার দৃষ্টি ও এই স্বীকারোক্তিতে তাহার অন্তর করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। বার বার তাহার কাছে পরাজিত হইয়া সে আনন্দিত হইয়াছে, কিন্তু আজ অমলের এমনি পরাজয় তাহাকে ব্যথিত করিল। জীবনের একটা পরাজয় কি একটা ব্যর্থতাই মানুষকেই ব্যথিত করিতে পারে না, যখন গগনবিহারী সগর্ব্ব অন্তর বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়ে তখনই তাহা করুণা জাগায় ; গিরিচূড়ার পতনের মত বিপুল তাহার এই পরাজয়, বিরাট তাহার পতন। অপর্ণার বিলোল আঁখিপল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিয়াছিল। সে অমলের হাতখানাকে সস্নেহে আকর্ষণ করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে কহিল,—অমল, তুমি দুঃখ ক'রো না। তোমার দারিদ্র্যকে আমি ভয় করি, আমি ঘৃণা করি এ ভেবে আমাকে অসম্মান ক'রো না। আমার অন্তরও আজ উচ্চকণ্ঠে তোমার মতই ব'লতে পারে, তোমার পরিচয় আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাক্‌বে ; কিন্তু বাপ মা তারা মনের কোন মূল্যই দেয় না,তারা দেখে সম্পদ—যা দেহের স্বাচ্ছন্দ্য দিলেও মনের শান্তি আনে না—আমরা নিরুপায়ের মত বাপমায়ের ইচ্ছায়ই চলি—

অপর্ণাও থামিয়া গেল,—যাহা অন্তরের মাঝে আজ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই, কণ্ঠ নাই। দুইজনে মুখোমুখি নির্ব্বাক—দুইটি ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ বিরাট তরঙ্গ যেন অকস্মাৎ মন্ত্রমুগ্ধের মত থামিয়া গিয়াছে।

অদূরে ঘর্ঘর শব্দে অজ্ঞাত কত যাত্রী বহন করিয়া ট্রাম চলিয়া গেল—দুইটি তন্দ্রাচ্ছন্ন মনের মাঝে কোনও পরিবর্ত্তন আসিল না, একটা শুক্‌নো পাতা উড়িয়া আসিয়া অপর্ণার কোলের কাছে পড়ল !

অমল হাসিল। অপর্ণা প্রশ্ন করিল,—হাস্‌লে কেন ?

—ছিন্নপত্রের মত আমরা যদি আজ অতীতকে ফেলে দিতে পারতাম।

ক্ষণিক দুইজনেই আবার চুপ করিয়া রহিল।

অমল অকস্মাৎ অত্যন্ত নগ্ন প্রশ্ন করিল,—তুমি কি আমাকে বিয়ে ক'রতে পারো ?

অপর্ণা কোনরকম আশ্চর্য্য না হইয়া, ম্লান একটু হাসিয়া বলিল,—তুমিই বল, হিন্দুর মেয়ে আমার পক্ষে কি একথা স্বীকার করা উচিত ?

অমল একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল,—থাক্‌, শুনেও লাভ নেই।

অপর্ণা অমলের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া কি যেন দেখিতেছিল, অনেক ভাবিয়া বলিল,—তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ রইল।

—বল—

—বন্ধ ত হ'য়ে এল, বাড়ী যাবে নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ।

—যাবার আগে আমাদের বাড়ীতে একবার যেও—কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর যে মা'র কাছে এ সব ব'ল্‌বে না।

—বেশ, তাই হবে। কিন্তু অপর্ণা, বিদায়কে দীর্ঘ ক'রে লাভ নেই। জানি আমাকে রিক্তহস্তে কেবলমাত্র বেদনা নিয়েই ফিরে আসতে হবে ; তার জন্যে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা সবচেয়ে বড় বিড়ম্বনা।

অপর্ণা বলিল,—তাই হোক্‌—জীবনে বিড়ম্বনার অন্ত নেই, এটা না হয় আর একটা বাড়লো—

—বেশ তাই হোক্‌। (ক্রমশঃ)

সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র

রায়বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

সে আজ অনেক দিনের কথা। ৩৫ বৎসর পূর্বে চুঁচুড়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের এক বিরাট্ অধিবেশন হইয়াছিল। আমরা কলিকাতা হইতে বিপুল দল বাঁধিয়া অধিবেশনে যোগদান করিতে আসিয়াছিলাম—তাহার মধ্যে অনেক গণ্যমান্য লোক ছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্ভবতঃ অধ্যাপক যদুনাথ সরকারও ছিলেন। সেই অধিবেশনে সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের দর্শনলাভ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তাঁহার কদমতলার বাসভবনে তিনি আমাদিগকে যে প্রচুর উদারতা-সমন্বিত সৌজন্যে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের মনে অনেক দিনের মত একটি ছাপ রাখিয়া দিয়াছিল। তখন অক্ষয়চন্দ্র বাংলা সাহিত্যের একজন দিক্‌পাল বলিয়া বন্দিত হইতেন। আমরা দেখিলাম তাঁহার প্রসন্নগম্ভীর মূর্ত্তি, গভীর সাধনাপূত নিষ্ঠা এবং পুরাতন আদর্শ-প্রদীপ্ত জ্ঞান গরিমা। সেই পরিণত বয়সে তিনি যেন সৌম্য শান্ত মহাদেবের ন্যায় স্থির ধীর অটল ভাবে বিরাজ করিতেছিলেন।

আজ সেই মহাপুরুষের জন্মতিথির শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কল্পে এই যে অনুষ্ঠান হইতেছে আমি ইহাতে যোগদান করিতে পাইয়া ধন্য হইলাম। অল্প কয়েকটি কথায় আমি তাঁহার মহনীয় চরিত্রের কোনও অংশও প্রকাশ করিতে পারিব এরূপ স্পর্দ্ধা আমার নাই। তবে অক্ষমের দুর্গোৎসবের মত আমার এই স্মৃতিবন্দনা উপচারের অভাব সত্ত্বেও আন্তরিকতার দৈন্য প্রকাশ করিবে না।

অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার আলোচনা করিতে হইলে আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রীয় যুগে যাইতে হইবে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ যে বিস্ময়কর উন্নতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। তথাপি মানবের স্মৃতিশক্তি সীমাবদ্ধ, এবং কালের অমোঘ চক্রাবর্ত্তে অতীত যতই দূরে সরিয়া যাইতে থাকে, ততই তাহার আলেখ্য অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া আসে। বঙ্কিমের অভ্যুদয়ে যে মধ্যাহ্ন দিনালোকে বাংলা সাহিত্য উদ্‌ভাসিত হইয়াছিল, আজ কত জনে তাহার সে দুর্নিরীক্ষ্য তেজ কল্পনায় আনিতে পারে? অক্ষয়চন্দ্রের অবদানের প্রকৃত স্বরূপ ও মূল্য বুঝিতে হইলে, মানসপটে আঁকিতে হইবে বঙ্কিম-মণ্ডলের সেই সুষমাশ্রেণীমণ্ডিত চিত্র। বাংলা সাহিত্যের অদৃষ্টে তেমন অপূর্ব যোগাযোগ বহু ঘটে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, চন্দ্রনাথ বসু, ভূদেব, চন্দ্রশেখর, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতিকে লইয়াই সেই মহিমোজ্জ্বল মণ্ডল গঠিত হইয়াছিল।

হিন্দু জানে যে, কোনও দেবতাকে পূজা করিতে হইলে অগ্রে তাঁহার আবরণ দেবতাগণকেও পূজা করিতে হয়। আমরা সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি। বঙ্কিম যুগ যাঁহাদের রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া আজিও আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে, আমরা তাঁহাদের পূজা করিতে বিরত হইয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের অপার্থিব প্রতিভার কথা মনে হইলেই 'বঙ্গদর্শনে'র কথা মনে পড়ে। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন' যাঁহাদিগকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়াছিল, তাঁহাদিগের কথা স্মরণ করিলেই, বঙ্গভাষার জয়যাত্রা আমরা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া যে উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি একদিন আমাদের বাঙ্গালীর ভাগ্যাকাশ ভাস্বর করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই একতম ছিলেন মনীষী অক্ষয়চন্দ্র। অক্ষয়চন্দ্রের সহযোগিতার কথা আমরা বঙ্গদর্শনের অনুষ্ঠান পত্রেই প্রাপ্ত হই। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনে অক্ষয়চন্দ্রের রচনা গৌরবের সহিত প্রকাশিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বলিয়াছেন যে অক্ষয়চন্দ্রের ন্যায় গদ্যলেখক বঙ্গদেশে খুব অল্পই জন্মিয়াছেন। বঙ্কিমের 'কমলাকান্ত' এক অফুরন্ত রসের ভাণ্ডার। এমন লেখা আর জন্মে নাই। সেই কমলাকান্তের দপ্তরের একটি প্রবন্ধ 'চন্দ্রালোকে' অক্ষয়চন্দ্রের রচিত। বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তে যে অপূর্ব গদ্য কবিতার সৃষ্টি করিলেন, তাহার সঙ্গে সুর মিলাইবার স্পর্দ্ধা আর কাহারও ছিল না।

চন্দ্রশেখরের উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে তাহার মধুরতা আছে, কিন্তু গভীরতা নাই। সেই বঙ্কিমমার্কা মাধুর্য ও গাম্ভীর্যের একত্র সমাবেশ আমরা দেখিতে পাই অক্ষয়চন্দ্রে। আমার মনে হয়, বঙ্কিম-মণ্ডলের মধ্যে একমাত্র অক্ষয়চন্দ্রই বঙ্কিমের নিকটে পৌঁছিবার শ্লাঘা অর্জন করিয়াছিলেন। উভয়েই সাহিত্য-স্রষ্টা, উভয়েই সমালোচক। নদী যেমন কূল ভাঙ্গিয়া আপনার পথ করিয়া লয় এবং পরে উভয় কূলের বহুদূর পর্যন্ত শস্যশালী করিয়া দেয়, বঙ্কিমচন্দ্র এবং অক্ষয়চন্দ্র উভয়েই সেইরূপ সমালোচনের'প্রহরণ' হস্তে লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং সাহিত্যের গতিভঙ্গী নির্দেশ করিয়া সৃষ্টি কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। উভয়ের গদ্য অনবদ্য এবং উভয়ের প্রদর্শিত আদর্শ অদ্যাপি চলিতেছে। এক দিকে সাধুভাষা, অপরদিকে চলিত ভাষা—এইগঙ্গা যমুনার ধারা সংযোগে ইঁহাদের রচনা বাংলা সাহিত্যে এক স্মরণীয় যুগ প্রবর্তন করিল। ইহার ছন্দ, লীলায়িত গতিভঙ্গী এবং সরস শব্দ-নির্বাচনী শক্তির জন্য এই যুগের বাংলা আমাদের ভাষার ইতিহাসের গতি দ্রুত করিয়া দিল। আর একটি বিষয়েও ইঁহাদের মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় সাম্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা উভয়েই দেশাত্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর যে ঐতিহ্য আছে, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি যে কোনও জাতির সংস্কৃতি হইতে হীন নহে, বাঙ্গালী যে হেয় নহে, ইহাই তাঁহারা লেখনীমুখে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া বাঙ্গালীর জড়ত্ব দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আজ আমরা হয়ত এইরূপ চেষ্টার সম্যক্ মর্যাদা দিতে পারিব না; কিন্তু সেদিনে যখন বৈদেশিক সংস্কৃতির আক্রমণে আমাদের গণচেতনা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল তখন ইহার প্রতিক্রিয়া সমাজ শরীরে অত্যন্ত শুভপ্রদ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে যে দুর্গোৎসবের উদ্বোধন করিলেন, অক্ষয়চন্দ্র 'মহাপূজায়' তাহার দক্ষিণান্ত করিলেন। অক্ষয়চন্দ্র ২৫ বৎসর ধরিয়া সাধারণীতে দুর্গোৎসব সম্বন্ধে যে সুন্দর সুন্দর সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন তাহারই মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া তাঁহার পুত্র বন্ধুবর অজয়চন্দ্র কতকগুলি প্রবন্ধ ছাপিয়াছেন। তাহাই আমরা 'মহাপূজা' নামে পাইতেছি। বঙ্কিম ও অক্ষয় প্রথম প্রথম অগস্ত-কোমতের মতের পক্ষপাতী ছিলেন। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে এই বিশ্বমানবতাবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিকপ্রবরের প্রভাব অত্যন্ত বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটা এই দার্শনিক মতের প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিলেও বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয় যুগপৎ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি (Hindu culture) এর মর্মস্থল উদ্‌ঘাটন করিতে না পারিলে মহামানবতার ভাব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সেই জন্য তাঁহারা আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকিলেন। বস্তুতঃ কোনও জাতির আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে শুধু বিদেশীয় ভাবের মোহে ঘুরিয়া কোনও লাভ হয় না। রাজনারায়ণ বসুও এইরূপে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা তৎকালে দেশে বিদেশে সমাদৃত হইয়াছিল। বিদেশীয় ধর্মপ্রচারকদের অভিমান চূর্ণ হইয়াছিল।

যাহা হউক, এই দুই মহাপুরুষ—বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র —যে সংস্কৃতির উৎস-সন্ধান পাইয়া ধন্য হইলেন, তাহা প্রচার করিবার জন্য উভয়ে একই পন্থা অনুসরণ করিলেন। গণজাগরণের পক্ষে সংবাদপত্রই একমাত্র প্রশস্ত পন্থা। বঙ্কিম তাঁহার সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন' বাহির করিলেন ১২৭৯ সালে; আর অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাধারণী' প্রকাশ করিলেন তাহার পর বৎসর। এই দুই বন্ধু জন-শিক্ষার জন্য যে আয়োজন করিলেন, তাহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবার যোগ্য। 'সাধারণী'র বৈশিষ্ট্য হইল, শুধু যে উহা সাপ্তাহিক পত্র তাহা নহে, উহাতে রাজনীতিও আলোচিত হইত। এই বিষয়ে অক্ষয়চন্দ্রের নিকট বাঙ্গালা অধিকতর ঋণী ইহা বলিতেই হয়। আজ পর্যন্ত সেই ধারা চলিয়া আসিতেছে। পরাধীন দেশে লোকশিক্ষার একমাত্র উপায়—সংবাদপত্র। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অনেকে সাধারণীর প্রসাদে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার ঋণের কথা সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি অক্ষয়চন্দ্রকে সাহিত্য-গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

অক্ষয়চন্দ্র পরে 'নবজীবন' প্রকাশ করেন। হিন্দুধর্মের সমর্থন ও ব্যাখ্যা করিবার জন্য এই পত্রিকা সাধারণীর পর ১১ বৎসর প্রকাশিত হয়। এই সময়ে শশধর তর্কচূড়ামণি তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যার দ্বারা হিন্দুজনমতের উপর

যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র এই ব্যাখ্যার সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে না পারায় 'নবজীবনে'র আবির্ভাব হইয়াছিল।

এতক্ষণ আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এই দুই সাহিত্য-মহারথী সাহিত্য-সেবায় একই পন্থা অনুসরণ করিতেছিলেন। এইবারে তাঁহাদের বৈলক্ষণ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনায় মন দিয়াছিলেন এবং তারই জন্য তাঁর নাম প্রসিদ্ধ হইল। উপন্যাস আমাদের দেশে সুপ্ত রাজকন্যার মতো সোনার কাঠির অপেক্ষা করিতেছিল। বঙ্কিমের ভাগ্যে লেখা ছিল সেই সোনার কাঠি স্পর্শ করিবার কৃতিত্ব। প্রতিভাশালী ক্ষণজন্মা পুরুষেরা ধূলিমুষ্টি স্পর্শ করিলে তাহাই সোনা হইয়া যায়। প্রবন্ধে, কৌতুকে, রস-রচনায়, গল্প ও উপন্যাসে সব দিকে বঙ্কিমের প্রতিভা সোনা ফলাইল। কিন্তু সরস্বতী দেবী তাঁহার ললাটে যে সোনার মুকুট পরাইয়া দিলেন, তাহা তাঁহার উপন্যাসের জৌলুষে ভাস্বর হইয়া উঠিল। বঙ্গবাসী বিস্ফারিত নয়নে দেখিল এক নূতন আশার নূতন আলোক! সেই আলোকে তাঁহার প্রবন্ধ, কবিতা, রস-রচনা যেমন কিছু স্তিমিত হইয়া পড়িল, অক্ষয়চন্দ্রেরও সাহিত্য-প্রতিভা সেই একই কারণে নিষ্প্রভ হইয়া গেল। প্রবন্ধ যতই উৎকৃষ্ট হউক, উপন্যাসের আবেদন তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক। মন মাতাইতে উপন্যাসের সমকক্ষ অন্য কিছুই ভাষার ভাণ্ডারে নাই। এই কারণেই শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা অনেক পরে আসরে নামিলেও উপন্যাসের প্রতিভায় তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। ইহাই সাহিত্যের স্বাভাবিক নিয়ম। উপন্যাসের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হওয়ার পরে আর এই অসাধারণ সাহিত্যিক যুগলের মধ্যে তুলনার অবকাশ বেশী রহিল না।

তাহা না হইলে, অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা সর্বত্র সর্বকালে অনস্বীকার্য। তিনি সব্যসাচীর ন্যায় সাহিত্য সৃষ্টি ও সমালোচনা যুগপৎ চালাইয়াছিলেন। বাঙ্গালীকে তিনি যে সম্পদ্ দিয়া গিয়াছেন, তাহা যতদিন বঙ্গভাষার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে ততদিন সমাদৃত হইবার যোগ্য। শুধু সমালোচনা নহে, রসের পুর দিয়া তিনি যে সকল অপ্রিয় সত্য প্রচার করিয়া তাঁহার দেশবাসীকে সচেতন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের এই জাতীয় পুর্ণ-জাগরণের দিনে স্মরণ করিবার যোগ্য। অনেক স্থলে এই ব্যঙ্গ রচনায় তিনি ঈশ্বরগুপ্তের সমকক্ষতা দাবী করিতে পারেন। তাঁহার 'নববাণিজ্য' 'চণকচূর্ণ' প্রভৃতি যে সে সময়ে সার্থক রচনা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কাঞ্চন বদলে কাচ পাইনু
পৈঁছার বদলে চুড়ি।
মুকুতা বদলে শুকতি পেলাম
হীরার বদলে নুড়ি॥

একথা সেদিনও যেমন সত্য ছিল, আজও তেমনি আছে।

অক্ষয়চন্দ্রের হাস্যরস ছিল নির্মল ও নিষ্কলুষ। সাধারণীর চানাচুরে তিনি অমৃতবাজার, ইণ্ডিয়ান মিরর, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি সকলকেই ব্যঙ্গ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে আনন্দ ব্যতীত অন্য কোনও পরিস্ফুট বা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য নাই! এখন সমালোচনা বলিতে যেমন গালাগালি বা দলাদলি ব্যতীত আর কিছুই বড় বুঝায় না, বঙ্গদর্শন সাধারণীর দিনে তেমনটি ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। ইঁহাদের সমালোচনায় থাকিত পাণ্ডিত্যের পরিচয়—যাহার নিকট মস্তক আপনা হইতেই সম্ভ্রমে অবনত হইয়া পড়ে। নবজীবনে অক্ষয়চন্দ্র যে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, আজকালকার সাহিত্যে তেমনটি বড় দেখিতে পাই না। নবজীবনের দ্বিতীয় বর্ষে 'বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম' প্রবন্ধটি অক্ষয়চন্দ্রের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

অক্ষয়চন্দ্র বৈষ্ণবধর্ম এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি প্রথম হইতেই অনুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের বাড়ীতে বিগ্রহের পূজা হইত বলিয়া বোধ হয়। বিজয়া দশমীর পর দিন হইতে একমাস কাল বাড়ীতে নিয়মসংকীর্ত্তন হইত এ সংবাদ তাঁহার লেখা হইতেই পাওয়া যায়। অক্ষয়চন্দ্রের পিতা সে সময়কার ভাল কীর্ত্তনগায়কদের বৈঠকখানায় বসাইয়া তাহাদের কীর্ত্তন শুনিতেন। অক্ষয়চন্দ্র নিজেও 'গোষ্ঠ গান' শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। পরে তাঁহার পিতার নিকট যশোহর থাকা কালে সুবিখ্যাত বৈষ্ণব সাহিত্যিক জগবন্ধু ভদ্র মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। জগবন্ধুবাবু গৌরপদতরঙ্গিণী এবং বিদ্যাপতির

পদ সংগ্রহে যে অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহার তুলনা বিরল। জগবন্ধুবাবু বিদ্যাপতির পদাবলী সংগ্রহ করিয়া নিজ নাম না দিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের একখানি ভদ্র মহাশয় অক্ষয়চন্দ্রের পিতাকে উপহার দেন। "সেই পুস্তক নিয়ত নাড়িয়া চাড়িয়া দুরূহ পদের ক্রমাগত অর্থ করিবার চেষ্টা করিয়া আমি সেই অনুরাগ পোষণ করিতে লাগিলাম।" (পিতা ও পুত্র) অক্ষয়চন্দ্রের এই অনুরাগ পরে অত্যন্ত আনন্দের হেতু হইয়াছিল। ইহারই ফলে তিনি জস্টিস্ সারদাচরণ মিত্রের সহযোগে প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ প্রকাশে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথম খণ্ডে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস গোবিন্দ দাস, কবিকঙ্কন প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি চুঁচড়ায় থাকা কালে স্বনামধন্য উকীল দীননাথ ধর মহাশয়ের সৌজন্যে এই গ্রন্থগুলি দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্রের পদসংগ্রহ দেখিয়াই মহাজন পদাবলীর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কবিগুরু যে অক্ষয়চন্দ্রকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন, তাহাও তাঁহার চিঠিপত্র হইতে জানা যায়।

অক্ষয়চন্দ্রের নিষ্ঠা কাব্যসংগ্রহ প্রকাশেই পর্যবসিত হয় নাই। তিনি যে আদর্শ লইয়া দেশ সেবা, সমাজ সেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সব দিকে বিকাশ তাঁহার জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার এই সেবাব্রত সাহিত্য সাধনায় সমাপ্তি লাভ করে নাই। তিনি তাঁহার পল্লীবালকদের শিক্ষার জন্য 'সাধারণী স্কুল' স্থাপন করিয়া নিজে শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন আদর্শ সমাজের মধ্যে যাহাতে অনুসৃত হয় তাহার জন্য তিনি একটি টোল স্থাপন করিয়া পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত তাহা সুষ্ঠু-ভাবে পরিচালন করিয়াছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্রের জীবনী সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে হইলে, সমগ্র দৃষ্টি দিয়া ইহা দেখিতে হইবে এবং তাহা দেখিলে আজ তাঁহার জন্মশতকোৎসবে বাঙ্গালীর অশ্রুবর্ষিত পুষ্পচন্দন বর্ষিত হইবে।

যে গেছে, সে চ'লে যাক্

শ্রীহাসিরাশি দেবী

অস্ফুট নক্ষত্রালোকে তোমার লিখিয়া যাওয়া নাম,—
আজিকে প্রথম হেরিলাম।

ফাল্গুনের ফুলবনে বসন্তের শেষ বেলা মোর,—
পাণ্ডুর চাঁদেরে চাহি নিঃশব্দে ফেলিছে আঁখি লোর
আলো ও আঁধারে ঢাকা নিঃসঙ্গ স্বপন বুকে রাখি,—
তন্দ্রাহীন দীর্ঘ রাতি জাগি
বিগত বন্ধুরে স্মরি,
শুষ্ক শীর্ণ পল্লবে মর্ম্মরি ;
সহসা শিহরি উঠি আমার আকাশ,
ফেলে দীর্ঘশ্বাস।

খণ্ডহীন মোর অবসর।
আমার মুহূর্ত্তগুলি অলস মন্থর
পদে একে একে চলে ধীরে ধীরে—
অন্তহীন তমসার তীরে
চির বিস্মৃতির দূর দেশে,
আপনারে ডুবাতে নিঃশেষে।
নবাগত বন্ধু মোর! তবু আজ তোমারে জানাই,
যদি তুমি এসে দেখো, আমার দুয়ার খোলা, শুধু আমি নাই,
নিভে গেছে আমার দীপালী,
বুকের সৌরভ ঢালি
হেমন্ত-রাত্রির শেষে প্রভাতের নভ-নীলিমায়,
যদি শোনো তোমার বীণায়
বাজিছে আমারই নাম নয়নের জলে,
তারে মোর শূন্য গৃহতলে
হে বন্ধু, ফেলিয়া যেও। ব'লে যেও, আর যারা সব
এপথে আসিছে ঐ আশা করি—আনন্দ উৎসব:
বলিও তাদের ডাকি,—ক'রোনাক' ভুল,—
যেথা শুধু মরীচিকা বরষায় ফোটে না বকুল,
সেথা হ'তে ফিরে যাও ;—আর আসিও না,
যে গেছে সে চ'লে যাক ;—ক'রো তারে নীরবে মার্জ্জনা।

নিষ্কৃতং পুরুষ

বনফুল

জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি।

"সকালে এমন গুলিয়ে গেল সব। ভাল করে' ভেবে দেখবারই সময় পেলাম না"—পাপিয়ার কথা ভাবতে ভাবতেই আসছিলেন পুরন্দরবাবু—"এবার কিন্তু তলিয়ে দেখতে হবে ব্যাপারটা কতদুর গড়িয়েছে সত্যি।" তলিয়ে দেখবার আগ্রহাতিশয্যে একবার ভাবলেন যুগলের বাসাতেই যাওয়া যাক, কিন্তু তখনই আবার মনে হল—"না আমার বাসাতেই ও আসুক। ইতিমধ্যে আমি আমার মকোদ্দমার কাজ খানিকটা সেরে ফেলি।"

কাজ সারবার জন্য কাগজপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি সুরু করলেন, কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলেন যে কাজ এগোচ্ছে না, বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। পাঁচটার সময় চা খাবার জন্যে যখন বেরুলেন, তখন তাঁর প্রথম মনে হল যে সত্যিই বোধহয় তিনি নিজেই সব করতে গিয়ে আরও জটিল করে' তুলেছেন তাঁর মকোদ্দমাকে, তাঁর উকীল তাঁকে দেখলেই যে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করে—ঠিকই করে বোধ হয়। কেন হাঁপিয়ে মরছি আমি। কথাটা ভেবেই হাসি পেল তাঁর—"একথাটা কাল মনে হলে কিন্তু কষ্ট হ'ত!" তখনই কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন আবার। অধীরতা আরও বেড়ে গেল। এলোমেলো নানা চিন্তা জাগতে লাগল মনে—বিশৃঙ্খল পরস্পর-সম্বন্ধ-হীন চিন্তা সব—যার কোন মাথামুণ্ড নেই। ক্রমশঃই অস্থির হয়ে উঠতে লাগলেন।

"নাঃ, ওই লোকটাকে চাই"—শেষ পর্যন্ত ভাবলেন—"ওর রহস্য সমাধান না করতে পারলে কিছুই করা যাবে না।"

সাতটার সময় বাড়ি ফিরে যুগল পালিতকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন তিনি, তারপর রাগ হল, তারও খানিক পরে কেমন যেন দমে' গেলেন। শেষটা ভয় হতে লাগল।

"শেষ পর্যন্ত কি যে হবে ভগবানই জানেন" বারবার আবৃত্তি করতে লাগলেন, বারবার ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সারা ঘরময়, বারবার ঘড়ি দেখতে লাগলেন। অবশেষে, নটার সময় যুগল পালিত এল। পুরন্দরবাবুর মনে হল "লোকটার যদি আমাকে ঠকাবার উদ্দেশ্যে থাকে তাহলে এর চেয়ে বড় সুযোগ আর পাবে না। কিছু মাথার ঠিক নেই, একদম নেই"—কিন্তু সঙ্গেসঙ্গেই আত্মস্থ হলেন তিনি, মনের জোর আবার যেন ফিরে এল হঠাৎ।

স্বচ্ছন্দ সাবলীল কণ্ঠেই তিনি বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। যুগল পালিতও একটু বাঁকা হাসি হেসে স্বচ্ছন্দভাবে বসে পড়ল সোফাটায়। তার স্বাচ্ছন্দ্য দেখে অবাক হলেন পুরন্দরবাবু, আগের রাত্রের মতো মোটেই নয়। এ যেন অন্য লোক।

[illegible]শান্তভাবে পুরন্দরবাবু সব বলে গেলেন। পাপিয়া কি ভাবে কত ভদ্রভাবে তাঁরা অভ্যর্থনা করলেন তাকে, পাপিয়াকে ওখানে নিয়ে যাওয়াতে কতটা ভাল হল। ক্রমশঃ পাপিয়ার বদলে কথাটা ভবেশবাবুদের সম্বন্ধে হতে লাগল। কি চমৎকার লোক ওঁরা, তাঁর সঙ্গে কতদিনের আলাপ, ভবেশবাবু নিজে কত সহৃদয়, অথচ প্রভাবশালী লোক—ইত্যাদি। যুগল শুনে যাচ্ছিল—খুব যে মন দিয়ে তা নয়। মাঝে মাঝে চোখ তুলে চেয়ে দেখছিল—একটা তীব্র ক্রুর হাসিও যেন উঁকি দিচ্ছিল চোখের কোণ থেকে।

"বড্ড খামখেয়ালী লোক আপনি"—বলেই অতিশয় বিশ্রী রকমের একটা হাসি হাসলে সে।

"আপনার মেজাজটা আজ যেন খারাপ বলে' মনে হচ্ছে"—পুরন্দরবাবু বললেন।

"হবেই না বা কেন! আর পাঁচজনের যখন হয়, আমারই বা হবে না কেন"—হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে বলে উঠল যুগল, মনে হল যেন ওৎ পেতে ছিল।

"তা'তো বটেই"—হেসে উত্তর দিলেন পুরন্দরবাবু—"না, আমি ভাবছিলাম কিছু হয়েছে বুঝি"

"হয়েছে বই কি!"—যুগল এমনভাবে উত্তর দিলে যেন কোন কিছু হওয়াটাই একটা কৃতিত্ব।

"কি হয়েছে"

যুগল চুপ করে' রইল কিছুক্ষণ।

"পূর্ণবাবু শেষকালে ঠকালেন আমায়—পূর্ণ গাঙ্গুলী কলিকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের শিরোভূষণ একজন…"

"দেখা করলেন না আপনার সঙ্গে? দারোয়ান বুঝি বললে বাড়ীতে নেই"

"এবার বাড়িতেই ছিলেন, আমি প্রবেশের অনুমতিও পেয়েছিলাম, তাঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল—কিন্তু তিনি মারা গেছেন! কাল মহাসমারোহসহকারে তাঁর শবযাত্রা বেরুবে শুনলাম"

"সে কি! পূর্ণবাবু মারা গেছেন?"

পুরন্দরবাবু অতিমাত্রায় বিস্মিত হলেন, যদিও বিস্মিত হবার কারণ ছিল না কিছু। "হ্যাঁ। ছ' বছর যিনি আমাদের ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন কাল দুপুরবেলা তিনি মারা গেছেন, অথচ আমি খবর পাই নি কিছু। কাল দুপুরবেলাই ভাবছিলাম ভদ্রলোকের খবরটা নিয়ে আসি একবার। আহা, মেনিনজাইটিস হয়েছিল! দেখা করবার সুযোগ যখন ঘটল, গিয়ে মড়া দেখলুম। একেই বলে কপাল! তাদের বলে এলাম, বড় ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আমাদের। কিন্তু ছ' বছর ধরে আমার সঙ্গে উনি যে

ব্যবহারটা করেছেন—দীর্ঘকালের এই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব—সে সম্বন্ধে এখন কি করা উচিত বলুন তো। ওঁর জন্যেই আমার এখানে আসা…"

"তা আর কি হবে বলুন"—পুরন্দরবাবু হেসে বললেন—"উনি তো আর ইচ্ছে করে' মারা যান নি"

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে যুগল বলে উঠল—"স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করছি যে!" একটা অদ্ভুত কুটিল হাসি খেলে গেল তার চোখে। পুরন্দরের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ, সমস্ত দৃষ্টি দিয়ে একটা প্রচ্ছন্ন বিষ ক্ষরিত হচ্ছে যেন। কিন্তু এভাব বেশীক্ষণ থাকল না। পরক্ষণেই তার অধরেও ব্যঙ্গ-তিক্ত হাসি ফুটে উঠল একটা ধীরে ধীরে।

"ও কথার মানে কি"—যেন কিছু বোঝেন নি এমনিভাবে প্রশ্ন করলেন তিনি।

"স্বামীর ভূমিকা মানে স্বামীর ভূমিকা—ভূমিকা"—টেবিল চাপড়ে উত্তর দিল যুগল।

"আপনি অভিনয় করছেন?"

"নিশ্চয়! শুধু অভিনয় করছি না—মহত্ত্ব-সহকারে করছি"—সমস্ত দন্ত নীরবে বিকশিত করে' একটা অতি কুৎসিৎ হাসি হাসলে যুগল।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।

"আপনার বুকের পাটা আছে, একথা মানতেই হবে"—পুরন্দরবাবু বললেন অবশেষে।

"কেন, একথা বললাম বলে? তাহলে আনান কিছু—বেশী নয় এক বোতল"

"বেশ তো, কি খাবেন আপনি"

"শুধু আমি কেন, আপনিও খাবেন আজ। খাবেন না?" একটা আদেশের সুর যেন ধ্বনিত হয়ে উঠল যুগলের কণ্ঠস্বরে—চোখের দৃষ্টি থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুল যেন।

"বেশ তো। কি আনাব? শ্যামপেন?"

"হ্যাঁ শ্যামপেনই ভাল। হুইস্কি এখন চলবে না"

পুরন্দর উঠে গিয়ে চাকরকে হুকুম করলেন।

"দীর্ঘ ন'বৎসর পরে পুনর্মিলন উৎসবটা বেশ করে' জমানো যাক—"

একটা বেখাপ্পা বেসুরো হাসি হেসে যুগল বাগিয়ে বসল।

"পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে এক আপনিই রইলেন শুধু। পূর্ণবাবু গেলেন।"

কবি গেয়েছেন—

> "মধুনিশি পূর্ণিমার আসে যায় বারবার—
> সে তো রে ফেরে না আর যে গেছে চলে'"

ভঙ্গীভরে হাত দুটি উলটে হাসিমুখে পুরন্দরবাবুর দিকে চেয়ে রইল। "যা বলবি বলে' ফেল না ব্যাটা—ইঙ্গিত কিঙ্গিত ভাল লাগে না আর" পুরন্দরবাবু মনে মনে বলছিলেন। রাগ ক্রমশই বাড়ছিল তাঁর, আত্মসম্বরণ করা অসম্ভব হয়ে উঠছিল।

"আচ্ছা একটা কথা বলুন তো" বিরক্তি চেপে পুরন্দরবাবু বললেন, "পূর্ণ গাঙুলী যদি আপনার প্রতি অন্যায়ই করেছিলেন তাঁর মৃত্যুতে তো আপনার আনন্দিতই হওয়া উচিত। আপনি ক্ষুব্ধ হচ্ছেন কেন"

"আনন্দিত? আনন্দিত হতে যাব কেন"

"আমার তো মনে হয় আনন্দিত হওয়াই উচিত"

"হি—হি! আমার মনোভাব ঠিক ধরতে পারেন নি আপনি। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন—শত্রু মরে যাওয়া ভাল, কিন্তু বেঁচে থাকা আরও ভাল। হি—হি!"

"কিন্তু আপনি তো তাকে একটানা পাঁচ বচ্ছর দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ক্লান্তি আসা উচিত ছিল"—একটু অভদ্ররকম খোঁচা দিয়ে পুরন্দরবাবু উত্তর দিলেন।

"আপনি কি মনে করেন আমি তখন জানতাম…আমি কি জানতাম তখন?" যুগল পালিতের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল হঠাৎ। অন্ধকার কোণ থেকে লাফিয়ে হঠাৎ আলোতে বেরিয়ে এল যেন সে। বেরিয়ে এসে বাঁচল যেন। এতদিন ধরে' যে জটিল প্রশ্নটার সম্মুখীন হতে চাইছিল সে কিন্তু পারছিল না—হঠাৎ আড়াল আবডালে সরে' যাওয়াতে চক্ষুলজ্জার দায় থেকে সে বাঁচল যেন।

"আমাকে আপনি কি ভেবেছেন বলুন তো"

অপ্রত্যাশিত রকম নতুন একটা দীপ্তি ফুটে উঠল তার চোখে মুখে। চেহারাই বদলে গেল। এতক্ষণ তার মুখভাবে কুৎসিৎ কদর্য্যতা ছাড়া আর কিছু ছিল না। পুরন্দরবাবু ঘাবড়ে গেলেন একটু।

"আপনি কিছুই জানতেন না এ কি সম্ভব?"

"আমি জানতাম সেইটেই কি সম্ভব? সেইটেই কি সম্ভব? আশ্চর্য্য লোক এই শহরের ভদ্রলোকরা! আপনাদের বিচারে মানুষে আর কুকুরে কোন তফাত নেই, আর আপনারা সবাইকে বিচার করেন নিজেদের হীন মানদণ্ড দিয়ে। সুস্থ মস্তিষ্কে বহাল তবিয়তেই একথা বলছি আপনার মুখের উপর!"

প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল সে টেবিলের উপর। মেয়েই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, কারণ শব্দটা খুব জোরে হ'ল।

পুরন্দরবাবু গম্ভীর হয়ে পড়লেন।

"শুনুন যুগলবাবু, আপনি জানতেন কি জানতেন না তা আমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক, তা আপনি বুঝতেই পারছেন। আপনি যদি না জেনে থাকেন ভালই, যদিও…আর একটা কথাও আমি বুঝতে পারছি না, আপনি এসব কথা আমাকেই বা বলছেন কেন"

"আপনাকেই ঠিক বলছি না আমি, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে লক্ষ্য করেই আমি বলি নি কিছু"—চক্ষু আনত করলে যুগল।

শ্যামপেন নিয়ে চাকর প্রবেশ করল।

"এই যে"—সোল্লাসে যুগল বলে উঠল। চাকরটা আসাতে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল যেন।

"গ্লাস আন দিকি বাবা এইবার। বাঃ, আর কিছু চাই না। খুলেই এনেছ, বেশ বেশ। হে ভারত নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি ত্যজিতে মুকুট দণ্ড—আসুন। যাও—তুমি যাও—"

চাকরটা চলে গেল। যুগলের উৎসাহ সঞ্জীবিত হল, পুরন্দরবাবুর দিকে সে উদ্ধত দৃষ্টি মেলে চাইলে আবার।

"স্বীকার করুন"—হঠাৎ সে বলে উঠল—"স্বীকার করুন যে এসব মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয় আপনার কাছে—রীতিমত প্রাসঙ্গিক, ভীষণ কৌতূহলজনক। এত বেশী যে এই মুহূর্ত্তে যদি আমি সবটা না বলে' চলে' যাই রাত্রে ঘুম হবে না আপনার"

"কি যে বলছেন"

"ঠিকই বলছি"

একটা অদ্ভুত হাসিতে তার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"আসুন সুরু করা যাক"

গ্লাসে মদ ঢালতে লাগল। একগ্লাস পুরন্দরবাবুর দিকে এগিয়ে দিলে।

"আসুন, প্রথমেই প্রিয় পূর্ণবাবুর উদ্দেশ্যে পূর্ণ গ্লাস শেষ করা যাক—" বলেই গ্লাসটা তুলে ঢক ঢক করে শেষ করে' ফেললে।

"আমি পূর্ণবাবুকে আর টানব না"

"কেন! অমন একটা পুণ্য-স্মৃতি!"

"আপনি এখানে আসবার আগেই খেয়ে এসেছিলেন একটু, নয়?"

"হ্যাঁ, একটু। কেন?"

"না, এমনি। কাল রাত্রে আমার মনে হয়েছিল, আজ সকালে আরও বেশী করে' মনে হয়েছিল যে অপর্ণার মৃত্যুটা বড্ড মর্ম্মান্তিক হয়েছে আপনার পক্ষে।"

"মর্ম্মান্তিক হয় নি তা-ই বা কে বললে আপনাকে এখন"

ঠিক যেন স্প্রিংয়ের মতন লাফিয়ে উঠল যুগল।

"আহা, আমি সে ভাবে বলছি না কথাটা। পূর্ণবাবুর সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা ভুলও তো হতে পারে—এতবড় গুরুতর ব্যাপারে ভুল ধারণা নিয়ে থাকলে—"

যুগলের মুখে চতুর হাসি ফুটে উঠল একটা। বাঁ চোখটা ছোট করে' কুঞ্চিত করলে সে একবার।

"পূর্ণ গাঙুলীর ব্যাপার কি করে' আবিষ্কার করলাম তা জানতে আগ্রহ হচ্ছে আপনার নিশ্চয়"

পুরন্দরবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠল। একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন তিনি।

"না আমার আগ্রহ হবে কেন"

"বোতল-ফোতল শুদ্ধ ব্যাটাকে এই মুহূর্ত্তে দূর করে' দিলে কেমন হয়" পুরন্দরবাবু মনে মনে গজরাচ্ছিলেন। হঠাৎ সমস্ত মুখটা আরও লাল হয়ে গেল তাঁর।

"সব বলছি, ব্যস্ত হবেন না। আপনার কৌতূহল হয়েছে তা বুঝতে পারছি, হওয়াটাই তো জীবন্ত প্রাণের লক্ষণ, আপনি যে একটা প্রাণবন্ত লোক তাতে আর সন্দেহ কি। হি—হি। দিন একটা সিগারেট দিন··· গত ফাল্গুনের পর থেকে আর···"

"এই যে নিন"

"গত ফাল্গুনের পর থেকেই আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, তার পর থেকেই উচ্ছন্ন গেছি বুঝলেন। কেমন করে' কি হল সব বলছি—শুনুন। যক্ষ্মা ব্যাধিটা, আপনি তো জানেন, ভারী এক অদ্ভুত ব্যায়রাম। যক্ষ্মা রোগী কখনও বিশ্বাস করে না যে তার মৃত্যু আসন্ন—অথচ ফট করে' যে কোন মুহূর্ত্তে মারা যেতে পারে সে। মৃত্যুর ঠিক পাঁচ ঘণ্টা আগে অপর্ণা প্ল্যান করছিল যে পনর দিন পরে সে তার পিসির কাছে বেড়াতে যাবে —পিসি থাকে ত্রিশ মাইল দূরে। অনেক মেয়ের একটা বদ অভ্যেস আছে আপনি জানেন বোধহয়—শুধু মেয়েদের কেন তাদের প্রণয়ীদেরও আছে—প্রেমপত্রগুলি তারা পুড়িয়ে না ফেলে সযত্নে রেখে দেয়। কাগজের টুকরোটি পর্য্যন্ত তুলে রাখে। অনেক সময় আবার সন তারিখ মিলিয়ে গুছিয়ে রাখে থাক করে'। এতে যে কি সুখ পায় তারা—তা তারাই জানে। হয় তো স্মৃতিসুখ, বলতে পারি না। অপর্ণা পিসির বাড়ি বেড়াতে যাবার আয়োজন করছিল যখন মৃত্যুর পাঁচ ঘণ্টা পূর্ব্বে—তখন বুঝতেই পারছেন, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তার আশা ছিল যে ভাল হয়ে যাবে। ফলে হল কি—সে যখন হঠাৎ মারা গেল তখন তার ড্রয়ারে রৌপ্য এবং মুক্তাখচিত একটি আবলুস কাঠের বাক্স থেকে গেল। চমৎকার বাক্সটি। চাবিও সেই ড্রয়ারেই ছিল। সেই বাক্সেই সব ছিল—সমস্ত। বিগত কুড়ি বছরের সমস্ত চিঠিপত্র সন তারিখ মিলিয়ে চমৎকার করে' গুছিয়ে রেখে দিয়েছিল সে। পূর্ণবাবু একটু কবি-প্রকৃতির লোক ছিলেন (একবার একটা মাসিক পত্রে প্রেমের গল্পও লিখেছিলেন বুঝি একটা) —তাঁর চিঠি প্রায় শতাধিক ছিল—সবই তো পাঁচ বছর ধরে' লিখেছেন। কতকগুলো চিঠিতে অপর্ণা আবার নিজের হাতে নোটও লিখেছে কিছু কিছু। স্বামীর দিক দিয়ে জিনিসটা বেশ উপভোগ্য—কি বলেন।"

পুরন্দরবাবু বিদ্যুৎগতিতে ভেবে দেখলেন—না, তিনি কোন চিঠি অপর্ণাকে লেখেন নি। না কিচ্ছু না। দুখানা চিঠি অবশ্য লিখেছিলেন —কিন্তু দুটোতেই অপর্ণার নির্দ্দেশ অনুসারে ঠিকানা ছিল যুগলের নামে। অর্থাৎ দুটোই নিরামিষ চিঠি। অপর্ণার শেষ চিঠির উত্তরই দেন নি, দেবার প্রবৃত্তি হয় নি।

গল্প শেষ করে' যুগল মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে পুরন্দরের দিকে চেয়ে রইল। চেয়েই রইল পুরো এক মিনিট ধরে'।

"আমার কথার জবাব দিচ্ছেন না যে"

"কোন কথার"

"জিনিসটা সাক্ষীর পক্ষে বেশ উপভোগ্য, কি না"

"আমি আর কি বলব"—পুরন্দরবাবু উঠে পড়লেন এবং ঘরের চার দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

"আপনি ঠিক ভাবছেন—এ লোকটা কি, ঘরের কথা বাইরে বলে' বলে' বেড়াচ্ছে! হি—হি। ঠিক ভাবছেন আপনি—আপনাকে চিনি তো—ভীষণ রুচি-বাগীশ লোক আপনি—"

"আমি কিছুই ভাবছি না। আপনার আচরণে অপ্রত্যাশিত কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো। পূর্ণ গাঙ্গুলীকে জীবিত কেন চাইছিলেন তা-ও বুঝতে পারছি, আপনার এ দাবীকে শ্রদ্ধা করতেও ইচ্ছে করছে—"

"আচ্ছা, পূর্ণবাবুকে পেলে কি করতুম আপনি মনে করেন—"

"তা কি ক'রে' বলব"

"আপনি বোধহয় ভাবছেন ডুয়েল লড়তুম—অ্যাঁ নয় ?"

"আঃ কি বিপদ"—একটু অধীরভাবে বলে' উঠলেন পুরন্দরবাবু, তিনি আর আত্মসম্বরণ করতে পারিলেন না—"আমার তো মনে হয় এ অবস্থায় লোকে বাজে বকবক করে না, অতীত নিয়ে হা-হুতাশ করে না, নালিশও করে না কারও উপর, কোন রকম বাজে ভাবভঙ্গীর ধার দিয়েই যায় না—এ অবস্থায় যারা ভদ্রলোক তারা যা করবার সোজা করে' ফেলে"

"হি—হি—হি। আমি বোধ হয় ভদ্রলোক নই"

"সে আপনি বুঝুন। যদি ভদ্রলোক নন তাহলে জীবিত পূর্ণ গাঙ্গুলীকে চাইছিলেন কেন…"

"পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করাটা অন্যায় কি ! ঠিক এমনি ভাবে এক বোতল মদ আনিয়ে খেতাম দু'জনে—"

"তিনি মদ খেতেনই না আপনার সঙ্গে"

"কেন ? আপনি খাচ্ছেন তো ! আপনার চেয়ে কি হিসেবে বড় তিনি—"

"আমিও আপনার সঙ্গে বসে' মদ খাচ্ছি না ঠিক"

একটু অপ্রতিভ ও মনে মনে একটু বিরক্ত হলেন পুরন্দরবাবু।

"ও ! হঠাৎ আভিজাত্য উথলে উঠল যে আপনারও দেখছি"

"মহা জুলুমবাজ লোক দেখছি আপনি। নিরীহ স্বামী ছাড়া আপনি আর যে কিছু হতে পারেন তা ধারণা ছিল না আমার !"

"নিরীহ স্বামী ? মানে ?"—যুগল কান খাড়া করে' উঠে বসল।

"মানে খুব সরল। স্বামী বহুপ্রকার হয়—নিরীহ স্বামী একটা টাইপ।"

"আর জুলুমবাজ ? জুলুমবাজ বললেন যে এখনি—"

"ঠাট্টাও বোঝেন না। উঠুন, বাড়ি যান এবার—"

"জুলুমবাজ কথাটা কি অর্থে ব্যবহার করলেন বলুন না খুলে—দোহাই আপনার !—জুলুমবাজ—অ্যাঁ—? জুলুমবাজ !"

"যথেষ্ট হয়েছে বাড়ি যান এবার। উঠুন, অনেক রাত হয়েছে।"

পুরন্দরবাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটছিল।

"যথেষ্ট হয় নি মোটেই" ফোঁস করে' উঠল যুগল, "আপনার হয় তো আর ভাল লাগছে না কিন্তু যথেষ্ট হয় নি মোটেই। আমার সঙ্গে বসে মদ খেতেই হবে আপনাকে। না খেলে ছাড়ছি না। আসুন—গ্লাস নিন"

"আপনি যাবেন কি না"

"যাব। কিন্তু তার আগে মদ খাব। আর আপনাকে আমার সঙ্গে, মদ খেতে হবে। খেতেই হবে"

তার কণ্ঠস্বরে কোন রসিকতা বা ভাঁড়ামির সুর ছিল না। হঠাৎ সে অন্য লোক হয়ে গেল যেন। পুরন্দরবাবু বিস্মিত হয়ে গেলেন।

"আসুন, খান এক গ্লাস আমার সঙ্গে, ক্ষতিটা কি"

পুরন্দরবাবুর হাতটা বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইল যুগল। স্পষ্ট বোঝা গেল এক সঙ্গে মদ খাওয়ার গুরুতর মানে আছে অন্য কিছু।

"কিছু ক্ষতি নেই—আসুন। কিন্তু বোতলে আর আছে কি কিছু"

"হ্যাঁ, ঠিক দু'টি গ্লাস আছে। রীতিমত সভ্য রীতিতে গ্লাস 'ড্রিংক্' করতে হবে কিন্তু"

সভ্য রীতি অনুযায়ীই গ্লাস ড্রিংক করা হ'ল। শেষ করে পুরন্দরবাবু বললেন—"আচ্ছা লোক আপনি।"

যুগল নিজের রগ দু'টো টিপে চুপ করে' রইল খানিকক্ষণ মাথা হেঁট করে'। পুরন্দরবাবু প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যাশা করতে লাগলেন এইবার যুগল তার শেষ এবং আসল কথাটি বলবে। কিন্তু যুগল কিছুই বললে না, চেয়ে রইল কেবল এবং একটু পরে' তাঁর দিকে ফিরে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

পুরন্দরবাবু আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। চীৎকার করে' বলে উঠলেন, "কি বিপদ, কি চান আপনি আমার কাছে ! মাতলামি করবার আর জায়গা পেলেন না"

"চেঁচাবেন না। চেঁচাচ্ছেন কেন, চেঁচাবার কি আছে। আমি মাতলামি করছি না। আপনি আমার চক্ষে এখন কি জানেন—প্রমাণ চান ?"

হঠাৎ সে পুরন্দরবাবুর হাতখানা তুলে নিয়ে চুম্বন করলে। খাবড়ে গেলেন পুরন্দরবাবু।

"এই, এই তার প্রমাণ। আর কিছু বলবার নেই এবার আমি চললাম"

"যাবেন না, থামুন। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি"

যুগল পালিত দুয়ারের কাছে ফিরে দাঁড়াল।

পুরন্দরবাবু বললেন (তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন যুগলের চোখের দিকে না চাইতে)—"কাল আপনাকে ভবেশবাবুদের ওখানে যেতে হবে। তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ও হবে, তাঁদের ধন্যবাদও দিয়ে আসবেন। ভুলবেন না, যেতেই হবে"

"নিশ্চয়। যাব বই কি। নিশ্চয়—হ্যাঁ,"—যুগল মাথা এবং হাত নেড়ে এমন একটা ভঙ্গী করলে যে পুরন্দরবাবুর মনে তার আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রইল না।

"পাপিয়াও অনেক করে' বলে দিয়েছে। আমিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তাকে যে আপনাকে নিশ্চয় নিয়ে যাব"

"পাপিয়া !"—যুগল পালিত ঘুরে দাঁড়াল ভাল করে'—"পাপিয়া ? পাপিয়া আমার কাছে এখন কি এবং কতটা তা জানেন ? কোনও ধারণা আছে আপনার" হঠাৎ পাগলের দৃষ্টি ফুটে উঠল তার চোখে।

"আচ্ছা থাক—সে কথা পরে হবে, পরে হবে। আর একটা কথা শুনুন আগে—একসঙ্গে বসে' মদ খাওয়াতেই সন্তুষ্ট নই আমি," হঠাৎ সে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল এবং নির্নিমেষে চেয়ে রইল।

"আবার কি চাই"

"আমাকে চুমু খেতে হবে"

"পাগল না কি! কি বলছেন যা তা"

"হতে পারে, কিন্তু চুমু খেতেই হবে আপনাকে। খান, আসুন। এখুনি তো আমি আপনার কর চুম্বন করলাম"

পুরন্দরবাবু বজ্রাহতবৎ নিস্পন্দ হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ ঝুঁকে—যুগল পালিতের মাথাটা তার বুকের কাছে পড়েছিল প্রায়—চুম্বন করলেন তাকে। মুখে ভীষণ মদের গন্ধ!

"বাস্ বাস্ বাস্ বাস্"—চীৎকার করে উঠল যুগল, চোখ দুটো জ্বলে' উঠল যেন উন্মত্ত হিংস্রতায়—"বাস্। এইবার সব খুলে বলি শুনুন—আপনাকেও সন্দেহ হয়েছিল আমার। এর পর আর কারও ওপর কি বিশ্বাস হয়?"

হঠাৎ কেঁদে ফেললে সে। ঝর ঝর করে' চোখের জল ঝরে' পড়তে লাগল।

"সুতরাং বুঝতে পারছেন, আপনিই এখন আমার একমাত্র বন্ধু"

ছুটে বেরিয়ে চলে গেল।

পুরন্দরবাবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"মাতলামি করে' গেল লোকটা"—হাত নেড়ে খানিকক্ষণ পরে বললেন "নাঃ—মাতলামি ছাড়া আর কিছু নয়। স্রেফ মাতলামি"। (ক্রমশঃ)

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

ব্রেটন উডস পরিকল্পনা ও ভারতবর্ষ

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সকল দেশের, বিশেষ করিয়া মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির অর্থ-নৈতিক ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক ও মুদ্রাতহবিল গঠনের পরিকল্পনা রচিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্ত্তমানে জগতের সর্ব্বাধিক সমৃদ্ধ দেশ। এই পরিকল্পনাতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই উদ্যোক্তা হিসাবে কাজ করে এবং এই সম্পর্কে ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে আমেরিকার ব্রেটন উডস সহরে একটি আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-নৈতিক সম্মেলনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা চলে। ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে সম্মেলনে এই বিরাট দেশের আর্থিক দুরবস্থা ও ব্রিটেনের নিকট পাওনা ষ্টার্লিং যথাসত্বর ফিরিয়া পাইবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করা হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্রিটেনের এবং ব্রিটেনের মিত্র ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের ঔদাসীন্যে সেই আলোচনা প্রত্যক্ষ কোন ফলপ্রসব করিতে পারে নাই।

যাহা হউক, ব্রেটন উডস সম্মেলনে শেষ পর্য্যন্ত স্থির হয় যে, যুদ্ধোত্তর কালে বিভিন্ন দেশের শিল্পবাণিজ্যের সম্ভাবনা কার্য্যকরী করিতে একটি আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাতহবিল ও ব্যাঙ্ক গঠিত হইবে। আন্তর্জ্জাতিক তহবিলটি গঠিত হইবে ৮৮০ কোটি ডলার মূলধন লইয়া এবং মূলধন সংগৃহীত হইবে বিভিন্ন দেশের দেয় চাঁদায়। প্রস্তাবিত তহবিল ও ব্যাঙ্কের পরিচালনার ভার ১২টি দেশের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত পরিচালকমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত হইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্থির হয় যে, যে পাঁচটি দেশ সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ চাঁদা দিবে তাহারা হইবে স্থায়ী সদস্য এবং বাকী চাঁদা প্রদানকারী দেশগুলির মধ্যে আর সাতটি সদস্য গ্রহণ করা হইবে। ভারতবর্ষের পরিধি, জনসংখ্যা ও বহির্বাণিজ্যের হিসাবে ভারতবর্ষকে একটি স্থায়ী সদস্য পদ দেওয়া হইবে বলিয়া অনেকে আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তে উন্নতিশীল ভারতবর্ষ এই স্থায়ী সদস্য পদলাভের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। সম্মেলনে নির্দ্ধারিত হয় যে, ৮৮০ কোটি ডলারের মধ্যে আমেরিকা ২৭৫ কোটি ডলার, ব্রিটেন ১৩০ কোটি ডলার, রাশিয়া ১২০ ডলার, চীন ৫৫ কোটি ডলার ও ফ্রান্স ৪৫ কোটি ডলার চাঁদা দিয়া স্থায়ী পাঁচটি সদস্য পদ দখল করিবে এবং ভারতবর্ষ চাঁদা দিবে ৪০ কোটি ডলার। ফ্রান্স অপেক্ষা ৫ কোটি ডলার এবং চীন অপেক্ষা ১৫ কোটি ডলার কম চাঁদা নির্দ্ধারিত করিয়া ভারতবর্ষকে সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ ইচ্ছা করিয়া চাপিয়া রাখিলেন, অধিকাংশ ভারতবাসীর মনে এই ধারণ বদ্ধমূল হইয়াছিল।

১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর উপরিউক্ত আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও ব্যাঙ্কের প্রাথমিক সদস্য হইবার শেষ তারিখ ছিল। ভারত সরকার যথাসময়ে এই সদস্য পদ গ্রহণ সম্পর্কে ব্যবস্থা পরিষদের মতামত গ্রহণ করেন নাই; সময়ের অল্পতার অজুহাতে গত ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে বড়লাট হঠাৎ এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া ভারতের সদস্য পদ গ্রহণের অধিকার নিজহাতে তুলিয়া লন এবং তাহার নির্দ্দেশানুসারে আমেরিকাস্থ ভারতীয় এজেণ্ট জেনারেল সার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী ভারতের পক্ষে গত ২৭শে ডিসেম্বর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ভারতবর্ষকে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও ব্যাঙ্কের প্রাথমিক সদস্য পদগ্রহণে বাধ্য করেন। অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, বিরাট আর্থিক দায়িত্বের প্রশ্নজড়িত থাকিলেও এই ব্যাপারে শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের মতগ্রহণ করা হইল না, অথচ যখন পরিষদের অধিবেশন চলিতেছিল এবং যখন সত্য সত্যই মতামত বিবেচনা করিবার সময় ছিল তখন ভারত সরকার এই প্রয়োজনীয় বিষয়টি চাপিয়া গেলেন। তৎকালীন অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইসম্যান তখন পরিষদের সদস্যবৃন্দকে জানাইতেছিলেন যে, সদস্যদের এ ব্যাপারে ভয় পাইবার কিছু নাই, আন্তর্জ্জাতিক তহবিল ও ব্যাঙ্কে যোগদানের শেষ সিদ্ধান্ত যাহাতে ব্যবস্থা পরিষদ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়, তজ্জন্য তিনি যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবেন। বলা বাহুল্য, অর্থসচিব আশ্বাস দিয়াছিলেন বলিয়াই

ভারতীয় সদস্যগণ পরিষদের অধিবেশন ভাঙ্গিয়া যাইবার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে জোর করেন নাই ; এখন স্যার জেরেমীর সেই কথার কোন মূল্য না দিয়া ভারত সরকার এই যে সময়াল্পতার অজুহাতে অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া বসিলেন, তাহাতে ভারতীয় জনমত ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের মর্য্যাদা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

অবশ্য আমাদের এই অভিযোগের অর্থ ইহাই নয় যে, ভারতবর্ষ আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা ব্যাঙ্কে যোগ দিয়া নিঃসন্দেহে ভুল করিয়াছে এবং ইহার ফলে ভারতের আর্থিক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেই। বরং আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিলে চাঁদা না দিলে ভবিষ্যতে দেশবিশেষের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য অধিকার সঙ্কুচিত করিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তজ্জন্য ভারতবর্ষের সদস্য হইবার ফল বোধ হয় ভালই হইবে। তাছাড়া ভারতবর্ষ চাঁদা দিবে ৪০ কোটি ডলার, হিসাবে অধিক চাঁদা প্রদানকারীদের মধ্যে তাহার নাম ষষ্ঠ, কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির প্রথম পাঁচটি আসন সংরক্ষিত হইলেও বাকী সাতটি আসনের একটি লাভ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নাও হইতে পারে। ইহার উপর ভবিষ্যতে যে কোন সময় সদস্য পদে ইস্তাফা দিবার অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় ভারতের ভবিষ্যতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট যদি পছন্দ না করেন তাহা হইলে সামান্য আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিয়াই ভারতের পক্ষে তহবিল বা ব্যাঙ্কের সহিত সকল সম্পর্ক ছেদ করা চলিবে।

তবে এই আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা ব্যাঙ্কের গঠন প্রণালী বর্ত্তমানে যেরূপ, তাহাতে স্পষ্টই মনে হয় যে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক প্রভাব পুরোপুরী প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই ইহাদের জন্ম হইয়াছে। ভারতবর্ষ সদস্য পদ গ্রহণ করিয়া অবশ্যই ইঙ্গ-মার্কিন ষড়যন্ত্রের জালে জড়াইয়া পড়িল। ১৯৪৪ সালে যখন আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-নৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তখন ইহার ফলাফলের উপর মন্তব্য করিতে গিয়া দিল্লীর বিখ্যাত সাপ্তাহিক ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট বলিয়াছিলেন :—**From the view point of India the monetary conference is a dismal failure if not a costly farce.** হয় তো শেষ পর্য্যন্ত এই তহবিলে বা ব্যাঙ্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য নিষ্ফল নাও হইতে পারে, কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন ষড়যন্ত্র যদি ব্যর্থ না হয় তাহা হইলে শেষ অবধি ইহা অবশ্যই প্রহসনে দাঁড়াইবে। ভারতবর্ষ যোগ দেওয়ায় অনেক মার্কিন ও ব্রিটিশ সংবাদপত্র আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহার ফল ভারতের পক্ষে শুভ হইবে—কারণ ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে শিল্পবাণিজ্যের জন্য আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ধার পাইবে। বলা বাহুল্য, এই ঋণ-লাভ ভারতের পক্ষে বড় কথা নয়, ভারতের পক্ষে বড় কথা ব্রিটেনের নিকট পাওনা দেড় হাজার কোটি টাকা আদায়। এই প্রাপ্য টাকা আদায় হইলে ভারতকে শিল্পবাণিজ্যের জন্য পরের নিকট হাত নাও পাতিতে হইতে পারে।

ভালমন্দের কথা নয়, আসল অভিযোগ হইতেছে যে, ব্যবস্থা পরিষদের সম্মতি না লইয়া ভারত সরকার তাড়াহুড়া করিয়া চুক্তি সম্পাদন করিয়া অত্যন্ত অন্যায় কাজ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক চুক্তিতে অনেক জটিল বিষয় আছে এবং সেই বিষয়গুলি ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা বিচারিত হওয়া অত্যাবশ্যক। এই পরম প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাড়াতাড়ি অর্ডিন্যান্স পাশ করিয়া কাজ গুছান ভারত সরকারের ভারতের স্বার্থ সম্বন্ধে ঔদাসীন্যেরই পরিচায়ক। ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক ষড়যন্ত্রের মূল সম্ভবতঃ রাশিয়ার চোখে ধরা পড়িয়াছে, তাই রাশিয়া এখনও আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও ব্যাঙ্কের প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণ করে নাই। রাশিয়া যে সময় লইয়া এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিষদের সদস্যদের দ্বারা ভালভাবে আলোচনা করাইয়া লইতে চায়, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এদিকে একে-তো ইঙ্গ-মার্কিন মতিগতি বিশ্বের পক্ষে ত্রাসের বস্তু, তাহার উপর একমাত্র বিরুদ্ধ শক্তি রাশিয়া যদি শেষ অবধি সরিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে এই তহবিল ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা বিশ্ব নিরাপত্তার দিক হইতে নিছক প্রহসন হইয়া দাঁড়াইবে।

মোটের উপর যে ব্যাপারে রাশিয়ার মত শক্তিমান রাষ্ট্র সকল দিক হইতে চিন্তাভাবনার জন্য দীর্ঘকালের পর আবার সময় গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষের ন্যায় দুর্ব্বল ও দরিদ্র দেশের শাসক-সম্প্রদায়ের কি আলোচনার জন্য বিষয়টি পরিষদে উপস্থাপিত করা উচিত ছিল না ? স্বায়ত্ত-শাসনের পথে ভারতবর্ষকে অনেকখানি আগাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ব্রিটিশ তথা ভারত সরকারের দিক হইতে জোর গলায় প্রচারকার্য্য চালান হয়, ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের ন্যায্য অধিকার এইভাবে ইচ্ছা করিয়া সঙ্কুচিত করাই কি শাসক সম্প্রদায়ের সেই ঔদার্য্যের নমুনা ?

নবগঠিত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের যে অধিবেশন শুরু হইতেছে তাহাতে জাতীয়তাবাদীগণ ব্রেটন উডস চুক্তি সম্পর্কে ভারতসরকারের স্বৈরাচারমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিন্দাপ্রস্তাব আনিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সম্বন্ধে ভারতের স্বার্থের সহিত ব্রেটন উডস চুক্তির সত্যকার সম্পর্ক বিবেচনা করিবার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাবও আনা হইবে। আমরা আশা করি পরিষদে উভয় প্রস্তাবই গৃহীত হইবে এবং এই প্রস্তাবগুলির ফলে ভারতসরকার যদি ভারতের স্বার্থহানি করিয়াই থাকেন, তাহারা অদূর ভবিষ্যতে সেই ত্রুটি সংশোধন করিতে বাধ্য হইবেন।

নোট অর্ডিন্যান্স

যুদ্ধের সময় ভারতে যে ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে, উচ্চহারে আয়কর স্থাপিত না হইলে তাহা অবশ্যই আরও মারাত্মক হইত। ভারত সরকারের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় সুযোগ সম্ভাবনামত ভারতে যদি শিল্পপ্রসার হইত, তাহা হইলে যুদ্ধের পূর্ব্বের ১৭৮ কোটি টাকার নোটের পরিবর্ত্তে ১২শত কোটি টাকার নোটের প্রচলন দেশে সত্যই কতখানি আর্থিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিত বলা যায় না। তবে সরকারী ঔদাসীন্যে শিল্পবাণিজ্য সম্প্রসারণের সেই দুর্লভ সুযোগ যখন বাস্তবিকই ব্যর্থ হইয়াছে, তখন ইহা লইয়া আলোচনা করিয়া লাভ নাই। যাহা হউক, ভারত সরকার কিন্তু মনে করেন যে ভারতে সত্যকার চালু নোটের তুলনায় বাজারে চালু নোটের পরিমাণ কম এবং যুদ্ধকালীন চোরা বাজারের কারবারীরা আয়কর ও অতিরিক্ত মুনাফা-কর ফাঁকী দিবার জন্য অনেক

উচ্চ মূল্যের নোট ঘরে আটক করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের মতে এই সকল লুকানো নোটের পরিমাণ দুইশত কোটি হইতে তিনশত কোটি টাকা। এই সঞ্চিত নোট যাহাতে ব্যবসায়ীবৃন্দ বাহির করিতে বাধ্য হয়, তজ্জন্য গত ১২ই জানুয়ারী শনিবার ভারত সরকার পর পর দুইটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া ব্যাঙ্কগুলিকে একশত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের নোটগুলি গণনা করিবার নির্দ্দেশ দেন এবং ৫শত, হাজার, ও ১০ হাজার টাকার নোটগুলির সহজে হস্তান্তরিত হইবার সুযোগ বাতিল করিয়া দেন।

১শত টাকার উর্দ্ধ মূল্যের নোটসমূহের লীগাল টেণ্ডার হইবার ক্ষমতা বাতিল হওয়ায় ভারতের আর্থিক বাজারে সম্প্রতি দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। যাহারা বাস্তবিক আয়কর ফাঁকী দিবার জন্য বেশী মূল্যের নোট সিন্দুকজাত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা অতঃপর নোটগুলি ভাঙ্গাইবার জন্য বাহির করিতে বাধ্য হইতেছে এবং নোট ভাঙ্গাইবার ফরম সহি করিবার সময় নোট প্রাপ্তির সূত্র পরিষ্কারভাবে লিখিতে গিয়া তাহাদের স্বরূপ ধরা পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিতেছে। এই সব গণ্ডগোল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অনেকে সঞ্চিত নোট শতকরা ৪০।৫০ টাকা ব্যজে পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া দিতেছে, ভারতের নানা স্থান হইতে এই ধরণের বহু সংবাদ আসিয়াছে। দেশীয় রাজ্যগুলিতে একই সময়ে অর্ডিন্যান্স চালু হইতে থাকায় দেশীয় রাজ্যে নোট চালান দিয়াও নিষ্কৃতি লাভের সুযোগ নাই। অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, হয় তো ছোট ছোট ব্যাঙ্ক এই সকল উচ্চমূল্যের নোট কিনিয়া লাভবান হইবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু ১৪ই জানুয়ারী ভারত সরকার এক নূতন অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে যে কোন সময় তালিকাভুক্ত যে কোন ব্যাঙ্কের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিবার অনুমতি দেওয়ায় সেই সুযোগ অনেকটা নষ্ট হইয়াছে বলা চলে। ১২ই জানুয়ারী শনিবার দ্বিতীয় অর্ডিন্যান্স যখন প্রকাশ হইবে বলিয়া গুজব শোনা যায়, তখন অনাগত বিভ্রাটের আশঙ্কায় উচ্চ মূল্যের নোট মালিকগণ যে কোন দামে সোনা কিনিতে ভিড় করিতে থাকে। শনিবার এই কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময়ের মধ্যে চাহিদার চাপে বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার মূল্য প্রতি ভরি ৭৫ টাকা হইতে ১ শত টাকায় উঠিয়া যায়। গভর্ণমেণ্ট মুদ্রা সঙ্কোচের জন্য এইভাবে প্রত্যক্ষ প্রয়াস দেখাইতেছেন মনে করিয়া জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ হইতে কয়েকদিন শেয়ার বাজারে শেয়ার বিক্রয়ের ধুম পড়িয়া যায় এবং অনেক নাম করা শেয়ারের লক্ষণীয় মূল্যাবনতি ঘটে। বাস্তবিক যুদ্ধের পরে ভারতে শিল্প প্রসার না হওয়া সত্ত্বেও এখনও যে শেয়ার বাজারে তেজীভাব বজায় আছে তাহার কারণ অর্থবান ব্যক্তিরা যে কোন ভাবে টাকা খাটানো অপেক্ষা শেয়ার বাজারে টাকা লগ্নী করা লাভজনক মনে করিতেছেন; কিন্তু অর্ডিন্যান্স জারীর ফলে ফাঁপাই টাকার পরিমাণ কমিয়া গেলে (কমিয়া যাইবেই, কারণ গভর্ণমেণ্টের নিকট সমর্পিত উচ্চ মূল্যের নোটের উপর আয়কর ও অতিরিক্ত মুনাফাকর তো বসান হইবেই, অধিকন্তু নূতন অর্ডিন্যান্সের দ্বারা নূতন উচ্চহারে কর বসানও বিচিত্র নয়) সামান্য সুদ প্রদানকারী ব্যাঙ্কের দাবী অস্বীকার করিয়া অনিশ্চিত শেয়ার বাজারে টাকা খাটাইতে লোকের ভরসা না হওয়া স্বাভাবিক।

নোট অর্ডিন্যান্স জারীর ফলে টাকার বাজারেও প্রভূত বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। গত ১৫ই জানুয়ারী ভারত সরকার কর্ত্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার খোলা হয়, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ৫০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। ঐ দিন ভারত সরকারের ১৯৬০ সালে পরিশোধিতব্য শতকরা বার্ষিক ২৸০ আনা সুদের ২৫ কোটি টাকার ঋণপত্র বিক্রয়ের কথা ছিল, আগে এই ঋণপত্র বিক্রয়ের জন্য কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময় ছিল যথেষ্ট, এবার কিন্তু পুরো একদিন সময় দিয়াও ৬।৭ কোটি টাকার বেশী ঋণপত্র বিক্রীত হয় নাই।

চোরাকারবারীদের নিকট হইতে আটক টাকা বাহির করিয়া আনিলে সাধারণ বাজারের অবস্থা যে ভাল হইবে সে বিষয়ে আমরাও কোন সন্দেহ পোষণ করি না। তবে মুস্কিল হইতেছে এই যে, ভারত সরকারের আলোচ্য অর্ডিন্যান্সের ফলে শুধু চোরাকারবারীরা নয়, অনেক ভদ্র ধনী ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এবং বিশেষ করিয়া মহিলারা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। দ্বিতীয় অর্ডিন্যান্সে বলা হইয়াছিল যে, ১০ দিনের মধ্যে ফরম সহি করিয়া নোট ভাঙ্গাইতে হইবে। যথা সময়ে প্রয়োজনীয় ফরম অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায় নাই বলিয়াও জনসাধারণের মধ্যে গভীর উদ্বেগ দেখা গিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অবশ্য এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছিলেন যে, ছাপার ফরম পাওয়া না গেলে টাইপ করিয়া অথবা হাতে লিখিয়া ফরম তৈয়ার করা চলিবে, কিন্তু এই বিজ্ঞপ্তি ভাল ভাবে প্রচারিত না হওয়ায় লোকের বিশেষ উপকার হয় নাই। ফরমে অনেক গুলি তথ্য পরিষ্কার ভাবে লিখিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে, নোট কোথা হইতে কেমন করিয়া পাওয়া গিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট কড়াকড়িভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে, মিথ্যা কথা বলিয়া ফরম ভর্ত্তি করিলে অপরাধীর তিন বৎসর জেল ও জরিমানা পর্য্যন্ত হইতে পারিবে। বলা বাহুল্য, স্ত্রীলোক ও ভদ্র নোটমালিকদের সমস্ত সংবাদ মনে রাখা নানা কারণে সম্ভব নয়, এ ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ কঠোর ভাবে না করিয়া সহজ বিচার বোধ কাজে লাগান কর্ত্তৃপক্ষের উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। প্রকৃতপক্ষে নোটের ন্যায্য মালিকদের অনেকে আইনের কঠোরতাজনিত অহেতুক আশঙ্কায় অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। করাচীর জনৈক পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক তাহার সঞ্চিত টাকাগুলি জল হইয়া যাইবার ভয়ে হার্টফেল করিয়া মারা গিয়াছে। অনেকে সময়াভাব, ফরমের অভাব, অদৃষ্ট দোষে কারাবরণের সম্ভাবনা প্রভৃতির চিন্তায় হাতের নোট যে কোন দামে বেচিয়া দিয়াছে এবং দুষ্টবুদ্ধি লোক যে জনসাধারণের অসহায়তার সুযোগে এইরূপ নোটের ব্যবসা চালাইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। নোট ভাঙ্গাইবার জন্য দশ দিন সময় অত্যন্ত কম বলিয়া সারা দেশব্যাপী এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলে এবং গভর্ণমেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত ২২শে জানুয়ারী হইতে ২৬শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত নোট ভাঙ্গাইবার দিন বাড়াইয়া

দেন। তাছাড়া গভর্ণমেণ্ট আরও বলিয়াছেন যে, কর্ত্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনা করিলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আগামী ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত নোট ভাঙ্গাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

এই অর্ডিন্যান্স জারীর ফলে ভারত সরকার বাস্তবিক কত টাকার লুকানো নোটের সন্ধান পাইলেন তাহা এখনো জানা যায় নাই। শুনা যাইতেছে ইহা নাকি মোট ১ শত টাকা উর্দ্ধ মূল্যের চলতি নোটের শতকরা ৫৫।৬০ ভাগের বেশী হইবে না। বাজারের উপর হইতে চোরাকারবার ও মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব কমাইবার জন্য এইরূপ অর্ডিন্যান্সের প্রয়োজন অবশ্যই অস্বীকার করা চলে না। তবে এখনো অনেক লোক মনে করিতেছেন যে, নোট যে কোন সময় ভাঙ্গাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া গভর্ণমেণ্ট যখন একবার নোট বাজারে ছাড়িয়াছেন তখন সেই নোট ভাঙ্গাইবার ব্যাপারে কোন বিধি নিষেধ আরোপ করিবার অধিকার ভারত সরকারের নাই। ভারত সরকারের এই নোট অর্ডিন্যান্সের বৈধতা সম্পর্কে নোটমালিকদের পক্ষ হইতে বোম্বাই হাইকোর্টে একটি ও কলিকাতা হাইকোর্টে দুইটি মামলা দায়ের করা হইয়াছে। বোম্বাই হাইকোর্টের মামলাটি অবশ্য বাতিল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্টের মামলার ফলাফল এখনো জানা যায় নাই।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের গরুর গাড়ী

ভারতবর্ষে বিপুল সুযোগ সম্ভাবনা সত্ত্বেও শুধু কর্ত্তৃপক্ষীয় ঔদাসীন্যে এতকাল কৃষিজীবনের দুঃসহ দারিদ্র্য ভোগ করিতেছে। ভারতে শিল্প সমৃদ্ধি হয় নাই বলিয়াই ভারতবাসী বাধ্য হইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধারণ জীবন যাপন করে এবং পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশের অধিবাসীদের সহিত পা মিলাইয়া চলিতে পারে না। বর্ত্তমান যুগ বিদ্যুতের যুগ, বিমান ও মোটর গাড়ীর যুগ। এই যুগের হিসাবে ভারতের অবস্থা বিচার করিয়া বলা হইয়া থাকে যে, ভারতবর্ষ আজও গরুর গাড়ীর যুগে পড়িয়া আছে।

অবশ্য ভারতবর্ষ যে এখনও কার্য্যতঃ গরুর গাড়ীর উপর সর্ব্বাধিক নির্ভরশীল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভারতে বিমান পথের কথা উঠে না, রেলপথ আছে প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য, মোটর পথের অবস্থা রেল পথের তুলনায় এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। ভারতে এখনও গ্রামাঞ্চল হইতে সহরে ও রেল ষ্টেশনে মালপত্র আনা নেওয়া করিতে গরুর গাড়ীই একমাত্র সম্বল। পল্লী অঞ্চলের অধিকাংশই কাঁচা রাস্তা, ভারী গরুর গাড়ী চলিয়া এই সব রাস্তায় গর্ত্ত হইয়া যায়, বর্ষাকালে জল কাদায় সেই রাস্তা অগম্য হইয়া উঠে বলিয়া গরুর গাড়ীর পক্ষেও চলাচল বিপজ্জনক হইয়া উঠে। রাস্তার এবং যান বাহনের এই অসুবিধা ভারতের আভ্যন্তরীণ শিল্প বাণিজ্যের অনেক ক্ষতি করিয়া থাকে।

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা হিসাবে ভারত সরকার ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪ লক্ষ মাইল নূতন পথ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান পথসমূহ লইয়া এই প্রায় ৭ লক্ষ মাইল পথ রক্ষা করা কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে অবশ্যই কঠিন হইবে—যদি না যানবাহন চলাচলের সুব্যবস্থার দ্বারা পথগুলিকে অক্ষত রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। গরুর গাড়ীই যে আমাদের দেশের পথের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাজে কাজেই এদেশে যদি এমন গরুর গাড়ী চলে, যাহা লঘুতার জন্য পথ ঘাটের ক্ষতি করিতে পারিবে না, তাহা হইলেই সব চেয়ে ভাল হয়।

আমেরিকায় খুব হালকা ধরণের গরুর গাড়ী চলে। ভারতে এতদিন এইরূপ গাড়ী আমদানী হয় নাই। প্রকাশ, নিউইয়র্কের ক্যাথলিক আর্কবিশপ ডেসিগনেট ফ্রান্সিস স্পেলমন হালকা ধরণের গরুর গাড়ী কিনিবার জন্য ভারতকে এক হাজার ডলার উপহার দিয়াছেন। বলা বাহুল্য উপহারের এই অর্থের পরিমাণ নগণ্য, তবে এই অর্থ দ্বারা নমুনা হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় গাড়ী ভারতে আমদানী হইলে ভারতবাসী হালকা ধরণের গরুর গাড়ী সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে এবং ফলে ভারতের রাস্তাঘাট বহুলাংশে সংরক্ষিত হইয়া এদেশের অনেক আর্থিক স্বার্থ রক্ষিত করিতে পারে। শুনা যাইতেছে, বোম্বাইয়ের জনৈক ক্যাথলিক শিল্পপতি উপরি উক্ত আর্কবিশপের টাকায় যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে হাল্কা গরুর গাড়ী আনাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ভারত সরকার যদি এই গাড়ী আনয়নের ব্যাপারে উৎসাহী হন এবং ভাল হইলে নিজেদের খরচে গাড়ী আনাইয়া সেই গাড়ী সমবায়ের ভিত্তিতে চাষীদের নিকট ভাড়া দেন বা বিক্রয় করেন তাহা হইলে এই ব্যবস্থা যুদ্ধোত্তর রাস্তা উন্নয়ন পরিকল্পনার অনেক সাহায্য করিবে বলিয়া মনে হয়। (২৭-১-৪৬)

পরাজয়

শ্রীশান্তশীল দাশ

দিকে দিকে জাগে যন্ত্রের কোলাহল ;
শ্রান্তি ভুলেছে ধরণীর নরনারী।
যন্ত্র জগত—গতি তার চঞ্চল ;
ছুটে চলে—সবে ছোটে পশ্চাতে তারই !
নিতি নব নব ধ্বংসের সম্ভার,
যন্ত্র যুগের কত বিচিত্র দান ;
গড়িতে পারে না করে শুধু সংহার,
সাজানো পৃথিবী ভেঙে করে খান খান।
যন্ত্র দানব মানুষেরই হাতে গড়া,
মানুষেরে আজ করেছে সে ক্রীতদাস—
দানবের দাপে মরণোন্মুখী ধরা
নীরবে কাতরে ফেলিয়া দীর্ঘশ্বাস।
মানুষের মনে জাগে ঘোর বিস্ময়,
সৃষ্টির কাছে কী দারুণ পরাজয় !

সাময়িকী

কবি করুণানিধান সম্বর্দ্ধনা—

গত ১৯শে পৌষ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার মহাবোধি সোসাইটী হলে কলিকাতার সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যসেবীরা বাঙ্গালার প্রবীণতম লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক সভাপতিত্ব করেন। করুণানিধানকে সভায় হাজার টাকার একটি তোড়া এবং এক জোড়া মটকার ধুতি ও চাদর উপহার দেওয়া হয়। সম্বর্দ্ধনা সমিতির সভাপতি রূপে শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবি করুণানিধানকে সম্বর্দ্ধনা করেন ও কবি মোহিতলাল মজুমদার অভিনন্দন পাঠ করেন। বহু খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক সম্বর্দ্ধনা সভায় উপস্থিত হইয়া কবি করুণানিধানকে বক্তৃতা ও কবিতা দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। শেষে করুণানিধান এক বক্তৃতা করিয়া সকলের সম্বর্দ্ধনার উত্তর দিয়াছিলেন।



কলিকাতায় কবি শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বর্দ্ধনায় উপস্থিত সাহিত্যিকগণ

কবি বিজ্ঞান কংগ্রেসে বাঙ্গালী—

বাঙ্গালোরে বিজ্ঞান কংগ্রেসে এবার কয়েকজন বাঙ্গালী বিভিন্ন শাখায় সভাপতি হইয়াছিলেন—(১) ডক্টর বি-সি গুহ রসায়ন বিভাগে সভাপতিত্ব করিয়াছেন—ইনি ১৯০৪ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএচ-ডি ও ডি এস্‌সি হন। বহুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত-রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন, এখন তিনি ভারতগভর্ণমেণ্টের খাদ্য বিভাগের প্রধান টেকনিকাল পরামর্শ-দাতা (২) মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা বিভাগের সভাপতি হইয়াছিলেন ডাক্তার ইন্দ্র সেন। তিনি চিকিৎসা ও দর্শন উভয় শাস্ত্রে পারদর্শী এবং মানাবিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া থাকেন। শ্রীঅরবিন্দের যোগ তাহাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। (৩) ডাক্তার কে-এন বাগচী চিকিৎসা বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৮৮৮ সালে নদীয়া জেলায় তাহার জন্ম হয় ও ১৯১৫ সালে তিনি এম-বি পাশ করেন। তিনি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের রসায়ন বিভাগের পরীক্ষক—ঐ বিষয়ে তাঁহার মত পারদর্শিতা অতি অল্প লোকের মধ্যে দেখা যায়। (৪) অধ্যাপক প্রেমাঙ্কুর দে এবার শরীর-বিদ্যা বিভাগের সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৮৯৩ সালে নদীয়া জেলার জগন্নাথপুরে তাঁহার জন্ম হয়—১৯১৭ সালে তিনি এম-বি পাশ করেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকরূপে সুপরিচিত।

কুমুদরঞ্জন সম্বর্দ্ধনা—

গত ২৩শে ডিসেম্বর বর্দ্ধমান কাটোয়ার সূর্য্যনারায়ণ টাউন হলে কাটোয়া মহকুমার কোগ্রাম নিবাসী কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিককে

মহকুমার অধিবাসীরা সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। দীপালি সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ সভায় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। স্থানীয় বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কবিকে অভিনন্দন পত্র দান করেন। উত্তরে কবিবর কুমুদরঞ্জন বলেন—"কবিতা লেখা আমার সখ বা জীবিকা নহে, উহা আমার জীবন! উহাদের মধ্যেই আমার জীবনধারা প্রবাহিত। * * আমার পরিহাস-প্রিয় বন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করেন, আমি কিসের আশায়, অজয় কূলে, বন্যা-বিধ্বস্ত কুটীরে বাস করি। আমি হাসিয়া বলি—আমি বড় দুরাকাঙ্ক্ষ। এই অজয়ের তীরে এক কবির গৃহে এক ছত্র কবিতা লিখিয়া দিতে ভগবান আসিয়াছিলেন—আমিও অজয় তীরে বাস করি, কবিতাও লিখি—তার উপর আবার আমি দীন—আমার কুটীরে দীনবন্ধুর আসার সম্ভাবনা কম নহে? এই লোভেই ত অজয়কে ছাড়িতে পারি না।"

প্রয়োজনীয় প্রস্তাব—

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের মীরাট অধিবেশনে এবার যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটি প্রস্তাব বিশেষ প্রয়োজনীয়। (১) বাঙ্গালার বাহিরে যে সব বাঙ্গালী বসবাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন তাঁহাদের অসুবিধা, অভাব ও অভিযোগ ক্রমশই বাড়িয়া চলিতেছে। তাহার প্রতিকারকল্পে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির উদ্যোগ প্রয়োজন। কেবলমাত্র প্রবাসী বাঙ্গালীদের চেষ্টায় তাঁহাদের অসুবিধা দূর হওয়া সম্ভব নহে। বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার যে সকল অংশকে রাজনৈতিক কারণে আজকাল অন্য প্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই সমস্ত স্থানের বাসিন্দাদের অসুবিধা তীব্র ও বিভিন্নমুখী—এই সকলের আলোচনা ও প্রতিবাদকল্পে সমগ্র বাঙ্গালী সমাজকে সচেতন ও অভিজ্ঞ করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে এই অধিবেশন স্থির করিতেছেন যে, এ বিষয়ে উপযুক্ত আলোচনার জন্য কলিকাতায় এই সম্মিলনের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হউক ও নিম্ন-লিখিত কয়জনের উপর তাহার জন্য ভার অর্পণ করা হউক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ রক্ষিত (আহ্বায়ক), শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সার আবদুল হালিম গজনভী, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—আবশ্যক হইলে ইঁহারা আরও অধিকসংখ্যক সদস্য গ্রহণ করিতে পারিবেন (২) প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের কর্ম্মক্ষেত্র



কাটোয়ায় কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সম্বর্দ্ধনায় সুধীবৃন্দ

প্রসারিত হওয়ায় এবং তাহার অভাব ও অসুবিধা ক্রমবর্দ্ধমানহওয়ায় আমাদের এই অধিবেশন সম্মিলনকে নিম্নলিখিত তিনটি কেন্দ্র হইতে কার্য্য করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য নির্দেশ দিতেছেন (ক) এলাহাবাদ—মূল কেন্দ্র (খ) কলিকাতা—পত্রিকা পরিচালনা, প্রচার ও বিভিন্ন ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলীর অনুবাদ ও প্রকাশ। (গ) দিল্লী—অবাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা প্রচারকল্পে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রতিনিধিদের নিকট বাঙ্গালা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার প্রচেষ্টা ও তাঁহাদের প্রদেশের ছাত্রদের মধ্যে বিলাত ও জার্ম্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মত বাঙ্গালা ভাষা ইচ্ছামূলক বিষয়ের মত পড়াইবার যাহাতে ব্যবস্থা করা হয়, তাহার জন্য যথোপযুক্ত প্রচার। এই তিনটি কেন্দ্রেই নিজ নিজ কর্ত্তব্যের অন্তর্গত প্রবাসী বাঙ্গালীদের অভাব অভিযোগের ও অসুবিধার একটি রেজিষ্টার খোলা হইবে এবং সেই সকল অভিযোগের অনুসন্ধান ও প্রতিকার করার সুব্যবস্থা করা হইবে।

নেতাজীর জীবনী—

ক্যাপ্টেন সা নওয়াজ আজাদ হিন্দফৌজের ইতিহাস ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনী সম্বন্ধে এক পুস্তক রচনা করিতেছেন। ঐ পুস্তকের বিক্রয় লব্ধ অর্থ সমস্তই আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সাহায্য ভাণ্ডারে প্রদত্ত করা হইবে। ক্যাপ্টেন সা নওয়াজের পুস্তক অবশ্যই আদৃত হইবে।



শ্রদ্ধানন্দ পার্কে শা নওয়াজ কর্তৃক শহীদদের সমাধিতে পুষ্পাঞ্জলি দান ফটো—পান্না সেন



স্কটীশচার্চ কলেজে ছাত্রছাত্রীদের এক সভায় মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজের বক্তৃতা ফটো—পান্না সেন

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—

গত ২রা জানুয়ারী বাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ত্রয়োবিংশ অধিবেশন হইয়াছে। এবার মূল সভাপতি হইয়াছেন অধ্যাপক আফজল হোসেন। অধ্যাপক হোসেন পাঞ্জাবের অধিবাসী, বয়স বর্ত্তমানে ৫৭ বৎসর, তিনি স্যার ফজলী হোসেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি বহুকাল পাঞ্জাবের লায়ালপুর কৃষি কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। ১৯৪৫ সালের অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর ৩ মাস তিনি আমেরিকা, ক্যানাডা ও বৃটেনের বহু প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে ভারতের খাদ্য সমস্যা ও তাহার সমাধানের কথা বিশেষ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। উহাই এখন ভারতের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। এ সময়ে অধ্যাপক হোসেনকে মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া বিজ্ঞান কংগ্রেসের সদস্যগণ উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন।

কাশীতে রবীন্দ্রনাথের চিত্র প্রতিষ্ঠা—

গত ২রা ডিসেম্বর হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাবয়বের একটি তৈল চিত্র প্রতিষ্ঠা উৎসব হইয়া গিয়াছে। চিত্রখানি কলিকাতা আর্ট সোসাইটী দান করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে কুমারী রমা ঘোষ কাশীতে যাইয়া সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটী ছাত্রী লইয়া রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিয়াছিল। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় চিত্রখানি হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়কে কলিকাতা আর্ট সোসাইটীর পক্ষে প্রদান করেন। স্যর মীর্জ্জা ইসমাইল চিত্র উন্মোচন করিবার সময় কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অতঃপর কলিকাতার শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ঠাকুর বংশের লেখক লেখিকাদের রচিত ২২৫খানি গ্রন্থ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে "ঠাকুর ফ্যামিলী কলেক্সন" নামে পুস্তকসংগ্রহ দাতাদের পক্ষে প্রদান করেন।



সোদপুরে বাংলার কংগ্রেস কর্ম্মীদের এক অধিবেশনে মহাত্মাজীর ভাষণ ফটো—পান্না সেন

কলিকাতায় ট্রাম সমস্যা—

গত ২রা জানুয়ারী কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় মেয়র শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জানাইয়াছেন—কর্পোরেশনের সহিত ট্রাম কোম্পানীর যে চুক্তি ছিল তদনুসারে ১৯৪৭ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে কর্পোরেশনের ট্রাম কিনিয়া লওয়ার কথা ছিল—কিন্তু কর্পোরেশন ট্রাম ক্রয় না করায় ঐ চুক্তি বাতিল হইয়াছে। কাজেই ট্রাম ক্রয় সম্পর্কে যে মধ্যস্থতার ব্যবস্থা পূর্ব্বে করা হইয়াছে, সে বিষয়ে এখন আর কিছু করার প্রয়োজন নাই। কাজেই এখন এই বিষয় লইয়া মামলা করা ছাড়া কর্পোরেশনের গত্যন্তর রহিল না।

পণ্ডিত মালব্যের চিত্র প্রতিষ্ঠা—

কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যর ৮৪তম জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা আর্ট সোসাইটীর দিলীপ দাশগুপ্ত মালব্যজীর একখানি পূর্ণাবয়বের তৈল চিত্র হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন। গত ৩রা ডিসেম্বর তাহার প্রতিষ্ঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিরাট মণ্ডপে সহস্রাধিক নরনারীর ও মালব্যজীর উপস্থিতিতে চিত্র উন্মোচন হয়। চিত্রের সম্মুখে ডাল, চাল, কালজিরা, ধান দিয়া অতি বিচিত্র আলিপনা শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ ও নমিতা চাটার্জ্জি সজ্জিত করেন। এই নূতন পরিকল্পনা

সকল দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। কলিকাতা আর্ট সোসাইটীর সম্পাদক চিত্র প্রদান করেন এবং কলিকাতার মেয়র চিত্র উন্মোচন করিয়া মালব্যজীর গুণকীর্ত্তন করেন।



গান্ধীজীর খাদি প্রতিষ্ঠান ত্যাগ ফটো—পান্না সেন

শিক্ষা সম্মিলন—

গত ২৮শে ডিসেম্বর মাদ্রাজে নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মিলনের একবিংশ অধিবেশন হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান ও ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার সার সি-পি রামস্বামী আয়ার ঐ সম্মিলনে সভাপতি রূপে তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—"কোন গভর্ণমেণ্ট বা শাসন যন্ত্র যদি শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী না হয়, তবে তাহা অত্যন্ত অন্যায়। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করা প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। কিন্তু ভারতের গভর্ণমেণ্ট তাহা করে নাই।" মাদ্রাজের গভর্ণর সার আর্থার হোপ ঐ সম্মিলনের উদ্বোধন করিতে যাইয়া শিক্ষকদের বেতনের দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পর?

মহিলা সম্মিলনের প্রস্তাব—

বড়দিনের ছুটিতে সিন্ধুদেশের হায়দ্রাবাদে শ্রীযুক্তা হংসা মেটার সভানেত্রীত্বে যে নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলন হইয়া গিয়াছে তাহার মূল প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—ভারতের স্বাধীনতা আর বিলম্বিত করা কাহারও পক্ষে উচিত হইবে না। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট গণপরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র গঠনের ভার দিন—ইহা সকলেই চায়। গণপরিষদ গঠনের জন্য সকল প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোট দ্বারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। সারা ভারতে প্রত্যেক মানুষ আজ স্বাধীনতার দাবী জানাইতেছে। সে দাবী সত্বর পূর্ণ করা না হইলে যে ভারতের অবস্থা ভীষণতর হইবে, তাহা মনে করিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই শঙ্কিত হইতেছেন।



কলিকাতায় পার্লামেণ্ট-প্রেরিত প্রতিনিধিবৃন্দ

ফটো—পান্না সেন

সাপ্রু কমিটীর রিপোর্ট—

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে সার তেজবাহাদুর সাপ্রুর নেতৃত্বে যে কমিটী গঠিত হইয়াছিল তাহার প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের মধ্যেই ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি নিহিত রহিয়াছে। পাকিস্থান সম্পর্কে কমিটী বলেন—উহা দ্বারা ভারতের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবে এবং ভারতবর্ষ অনন্তকালের জন্য পারস্পরিক কলহে লিপ্ত হইবে। ভারতবর্ষকে এ ভাবে বিভক্ত

করিতে গেলে ভারতবর্ষ অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ধকার যুগে ফিরিয়া যাইবে। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিটী বলেন—উহা পরিত্যক্ত না হইলে স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন স্বপ্নের মতই থাকিয়া যাইবে। রাজনৈতিক দিক হইতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়া গেলে অর্থনৈতিক ও দেশরক্ষা ব্যাপারে সহযোগিতা রক্ষা করা অসম্ভব না হইলেও কষ্টকর হইবে। কমিটী এই মতও ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সম্রাট প্রতিনিধির দপ্তর তুলিয়া দিতে হইবে এবং বর্ত্তমানে তিনি যে সার্ব্বভৌম অধিকার পাইতেছেন, উহা প্রস্তাবিত ভারতীয় ইউনিয়নের মন্ত্রিমণ্ডলের হাতে দিতে হইবে। সাপ্রু কমিটীর সদস্যগণ একমত হইয়া যে শাসনতন্ত্র গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহা গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিলে বহু সমস্যার সমাধান আপনা হইতেই হইয়া যাইবে। কিন্তু সে কথায় কেহ কি কর্ণপাত করিবে? যাহারা আমাদের নিজেদের মধ্যে অনৈক্য থাকার দোহাই দিয়া নানা কথা বলেন, এই রিপোর্ট তাহাদের মুখবন্ধ করিবে সন্দেহ নাই।

চট্টগ্রামে ভীষণ কাণ্ড—

চট্টগ্রাম সহর হইতে মাত্র ৫ মাইল দূরে একটি বড় রাস্তার ধারে কাহারপাড়া গ্রামে উহার নিকটে অবস্থিত সিভিল পাইওনিয়ার



চট্টগ্রামের গৃহহারা গ্রামবাসীদের উন্মুক্ত মাঠে বসবাস

ফটো—পান্না সেন

ফোর্সের সৈন্যগণ ভীষণ অনাচার অনুষ্ঠান করিয়াছে। ৫৬টি বাড়ী পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফলে ৬২ পরিবারের মোট ২১২ জন লোক গৃহহীন হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত কালীপদ মুখোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে যাইয়া তদন্ত করিয়া আসিয়াছেন; গ্রামের প্রায় ৫০টি স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হইয়াছে, কংগ্রেস, মুসলমানলীগ ও কম্যুনিষ্ট সকল সম্প্রদায়ের নেতারা একযোগে দুস্থদের সাহায্য দানে অগ্রসর হইয়াছেন। সামরিক ও বেসামরিক উভয় বিভাগ হইতেই তদন্তের ব্যবস্থা হইয়াছে।

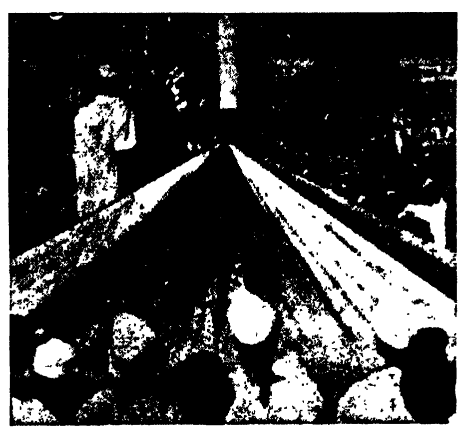


অত্যাচার প্রপীড়িত গ্রাম দর্শনের পরে চট্টগ্রাম সহরের এক সাধারণ সভায় শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা ও শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা

ফটো—পান্না সেন

কংগ্রেসের নূতন কার্য্যালয়—

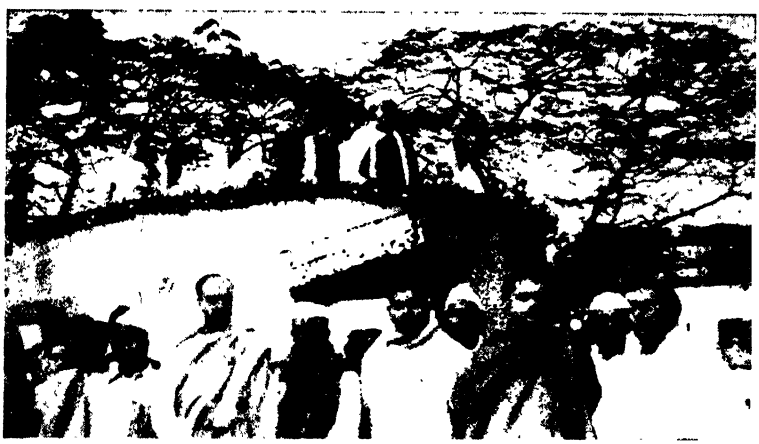
গত ১লা জানুয়ারী হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যালয় ১১৫ই ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের (সার্কুলার রোডের মোড়) বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে সে দিন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে এক সভাও তথায় হইয়া গিয়াছে। বাড়ীটি বেশ বড়, কাজেই তথায় কাজের সকল প্রকার সুবিধা হইবে।



স্বাধীনতা দিবসে দেশবন্ধু পার্কে শা নওয়াজ কর্তৃক স্বাধীনতা-পতাকা উত্তোলন ফটো—পান্না সেন



অধিক মূল্যের নোট ভাঙ্গাইবার জন্য
ব্যাঙ্কের দরজায় জন সমাবেশ
ফটো—ডি-রতন



দেশবন্ধু পার্কে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র
বসু সম্বর্দ্ধনা
ফটো—ডি-রতন



ডায়মণ্ডহারবার জেটি ভাঙ্গিয়া
সাগর-যাত্রীদের
শোচনীয় অবস্থা
ফটো—ডি-রতন

...য়েন্দাবাহিনীর সদস্যদের মুক্তি—

...আজাদ-হিন্দ-ফৌজের গোয়েন্দা বাহিনীর কয়েকজন সদস্য ১৯৪৪ ...ফেব্রুয়ারী মাসে আরাকান রণাঙ্গনে লাফ নদীর নিকট ধৃত ...নৈনি জেলে আটক ছিলেন। তন্মধ্যে গত ২রা জানুয়ারী ...মনোরঞ্জন চৌধুরীকে কুমিল্লায় মুক্তি দিয়া তাঁহার গতিবিধি ...ের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুত শিবশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, ...ন্ত দক্ষ, সুরেশ বড়ুয়া ও ভবতারণ ভট্টাচার্য্যকে মুক্তি দিয়া ...জেলা চট্টগ্রামে প্রেরণ করা হইয়াছে। খুলনার তারাপদ ...র্ত্তী ও শ্রীহট্টের অতুল চক্রবর্ত্তীও মুক্তিলাভ করিয়াছেন।



সোদপুর ষ্টেশনে ট্রেন-কামরায় গান্ধীজী ফটো—পান্না সেন

...জাদ-হিন্দ-ফৌজের বালকবৃন্দ—

১৫ হইতে ১৭ বৎসর বয়স্ক আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ৪৫ জন ...তীয় সদস্যকে ১লা জানুয়ারী মাদ্রাজে আনা হইয়াছে। শ্রীযুত ...াষচন্দ্র বসু যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদের জাপানে ...াইয়াছিলেন। তাহাদের শিক্ষা শেষ হইবার পূর্ব্বেই জাপান ...ত্মসমর্পণ করে ও মার্কিণ উড়োজাহাজে করিয়া তাহাদের মানিলায় ...য়া যাওয়া হয়। পরে যুদ্ধবন্দীরূপে তাহারা বৃটীশের হেফাজতে ...সিয়াছিল।

শরৎ বসু সম্বর্দ্ধনা—

গত ১৩ই জানুয়ারী রবিবার বিকালে কলিকাতা দেশবন্ধু পার্কে কলিকাতার অধিবাসীবৃন্দের পক্ষ হইতে নেতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে এক সভায় সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। সম্বর্দ্ধনা সমিতির পক্ষ হইতে আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার শরৎবাবুকে ১ লক্ষ ১১ হাজার ১ শত ১ টাকা পূর্ণ একটি থলি উপহার দিয়াছিলেন। সভায় আজাদ-হিন্দ-ফৌজের মুক্ত সদস্যগণের বসিবার জন্য একটি উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বিলাতী প্রতিনিধিদের পরিচয়—

বিলাতের পার্লামেণ্টের নিম্নলিখিত ৮জন প্রতিনিধিকে ভারতের প্রকৃত অবস্থা দেখিয়া ও শুনিয়া যাইবার জন্য ভারতে প্রেরণ করা হইয়াছে। ঐদলে এক জন মহিলা আছেন তাঁহার নাম মিসেস এস-ওয়ান হেড নিকল—তিনি শ্রমিক দলভুক্ত। শ্রমিক দলের আরও ৪জন সদস্য আছেন—(১) মিঃ আর-রিচার্ডস্ (২) মিঃ আর-ডবলিউ সোরেনসেন (৩) মেজর ডবলিউ-ওয়াট ও (৪) মিঃ এ-জি-বটমলী। রক্ষণশীল দলে ২ জন—মিঃ গডসেনিকলসন ও ব্রিগেডিয়ার এ-আর-ডবলিউ লো এবং উদারনীতিক দলের মিঃ হাকিন মরিস ঐ দলে আছেন। প্রথম শ্রমিক মন্ত্রিসভায় মিঃ রিচার্ডস্ সহকারী ভারতসচিব ছিলেন ও ভারতের অর্থনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ—তিনি ঐ দলের নেতা হইবেন। মিঃ সোরেনসেন বহুকাল ধরিয়া ভারতের অবস্থার কথা আলোচনা করেন ও ভারত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লেখক। ভারত সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তক আছে ও তিনি ১৯৩৪ সালে ইণ্ডিয়ান লীগ পার্লামেণ্টরী কমিটীর সম্পাদক ছিলেন। মিসেস নিকল শ্রমিকদলের প্রচার কার্য্যে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন। মেজর ওয়াটের বয়স ২৭ বৎসর, তিনি ব্যারিষ্টার। মিঃ বটমলী শ্রমিক নেতা ও ব্রিগেডিয়ার লো একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

বাঙ্গালার দুর্দ্দশায় গভর্ণর—

বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ কেসি গত ১৭ই জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেশনে যাইয়া বলিয়াছেন—বাঙ্গালা অতি দরিদ্র দেশ। তথায় শিক্ষা নাই, খাদ্য নাই ও বাসগৃহ নাই, সে জন্য লোকের দুর্দ্দশারও অন্ত নাই। সেজন্য গভর্ণর বাঙ্গালার সেচ ও নদী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থায় বিশেষ জোর দিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলে একটিমাত্র ফসল হয়, কোথাওবা তাহা ভাল হয় না। সর্ব্বত্র যাহাতে বৎসরে ২বার ফসল উৎপাদন করা যায়, সেজন্য গভর্ণমেণ্টকে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে। গভর্ণরের ইহা শুধু মৌখিক আশ্বাসের কথা কি না জানি না।

গঙ্গাসাগর যাত্রীদের বিপদ—

গত ১৩ই জানুয়ারী শনিবার ডায়মণ্ডহারবারে গঙ্গাসাগর মেলার যাত্রীদের জাহাজে উঠিবার ঘাটেদুর্ঘটনার ফলে ১৭০ জন যাত্রী নিহত ও ৩০০ জন আহত হইয়াছে। একবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় ও আবার বেলা সাড়ে ৫ টার সময় তীর হইতে জেটীতে যাইবার পথ মানুষের চাপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। এই দুর্ঘটনার জন্য কাহারা দায়ী, সে সম্বন্ধে তদন্ত হইতেছে। যাহারা এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী সেই অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

গফরগাঁওয়ে পুলিসের গুলীবর্ষণ—

মৈমনসিংহ জেলার গফরগাঁও নামক স্থানে জেলা লীগ সম্মিলন উপলক্ষে নবাবজাদা লিয়াকং আলি খাঁ, মিঃ সুরাওয়ার্দ্দী প্রভৃতি যাইলে স্থানীয় লীগ বিরোধী মুসলমানগণ মিছিল করিয়া লীগের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিল। উভয় দলের লোকদের মধ্যে ইট ছোড়াছুড়ি হইলে পুলিস লীগ-বিরোধীদের উপর গুলীবর্ষণ করিয়াছে ও পুলিস পাহারা দ্বারা স্কুলগৃহে লীগের সভা করাইয়াছে। এই সংবাদ কতটা সত্য, সে বিষয়ে তদন্ত করিয়া প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করা উচিত।

মহিলা সদস্যের বর্ণনা—

শ্রীমতী নিকল,বৃটীশ পার্লামেণ্টের মহিলা সদস্য। তিনি প্রতিনিধি দলের সহিত ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি নয়া দিল্লীতে বলিয়াছেন—এই প্রতিনিধি দল বিলাতে ফিরিয়া গিয়া ভারত সম্বন্ধে সকল কথা বলিয়া বৃটীশ জনসাধারণকে স্তম্ভিত করিবে! আমার মনে হয়, ভবিষ্যতে দিল্লীর এই বিরাট লাটপ্রাসাদ কলেজ বা হাসপাতালে পরিণত করার প্রয়োজন হইবে। বৃটীশ জাতি গত ১৫০ বৎসর ভারত শাসন করিতেছে—তাহার পরেও ভারতের দুর্দ্দশার শেষ নাই। ছেলেরা লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায় না—লোক রোগে ঔষধ পায় না। অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক লোক অশিক্ষিত। বিলাতের লোক শ্রীমতী নিকলের কথা শুনিবে ত?

স্বরাজ লাভের উপায়—

মহাত্মা গান্ধী মাদ্রাজ যাইবার পথে গত ২০শে জানুয়ারী ওয়ালটেয়ারে উপস্থিত হইয়া স্থানীয় ইণ্ডিয়ান ইনিষ্টিটিউটে এক সভায় বলেন—ভারতবাসীকে স্বরাজ লাভ করিতে হইলে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে প্রথমেই কাজ করিতে হইবে—(১) অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন (২) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন ও (৩) আদিবাসীদের (পার্ব্বত্য জাতি) উন্নতির ব্যবস্থা। তিনি সকলকে অহিংসা ও সত্যের পথ গ্রহণ করিয়া শৃঙ্খলার সহিত কাজ করিতে বলেন এবং ভারতের জাতীয় ভাষারূপে হিন্দুস্থানী শিক্ষা করিতে উপদেশ দেন। লোক দলে দলে গান্ধীজির দর্শন লাভের জন্য পথে যাইয়া ভিড় করে—তাহারা কি এই সকল বিষয়ে অবহিত হইবে?

শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ—

শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ খ্যাতনামা কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক নেতা। তিনি বর্ত্তমানে আগ্রা সেণ্ট্রাল জেলে রহিয়াছেন। বৃটীশ পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ রেজিনাল্ড সোরেনসেন ভারতে আসিয়া গত ১৯শে জানুয়ারী আগ্রা জেলে যাইয়া ২ ঘণ্টাকাল শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশের সহিত কথা বলিয়া আসিয়াছেন। বিলাত হইতেও খবর আসিয়াছে যে খ্যাতনামা নেতা মিঃ ফ্রেনার ব্রকওয়ে শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ ও শ্রীযুক্ত রামমনোহর লোহিয়ার মুক্তির জন্য বিলাতে আন্দোলন আরম্ভ করিতেছেন। কিন্তু ইহার কোন ফল হইবে কি?

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সম্মানিত—

দিল্লীতে নূতন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলের সদস্যগণ গত ১৯শে জানুয়ারী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে দলের নেতা ও মিঃ আসফ আলিকে ডেপুটী নেতা নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। এই নির্ব্বাচনে কোন ভোটাভুটি হয় নাই। শেঠ গোবিন্দ দাস দলের কোষাধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক এন-জি-রঙ্গ, মিঃ এন-ভি-গাডগিল ও মিঃ মোহনলাল সাকসেনা দলের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। সর্দ্দার যোগেন্দ্র সিং, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী ও মিঃ এস-টি আদিত্যান দলের সাধারণ হুইপ এবং শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ সিং প্রধান হুইপ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পরিষদে কংগ্রেস দলের সদস্য সংখ্যা হইয়াছে ৬২জন।

বৃটেনের আর্থিক দুরবস্থা—

বৃটেনকে এখন বার বার আমেরিকার নিকট টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হইতেছে। এখন এমন অবস্থা আসিয়াছে যে আমেরিকা আর কোন মূল্যবান দ্রব্য গচ্ছিত না রাখিয়া স্বর্ণ দান করিতে সম্মত হইতেছে না। সে জন্য নাকি বৃটিশ সম্রাটের মুকুটে যে সকল মূল্যবান হীরা ও রত্ন আছে, সেগুলি আমেরিকার নিকট গচ্ছিত রাখা হইবে। যুদ্ধের জন্য পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই এখন দেউলিয়া অবস্থা লাভ করিয়াছে। বৃটেনকে বিরাট সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা করিতে যাইয়া শুধু উপনিবেশ গুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে হয় নাই—নিজেও দারুণ দুরবস্থায় পড়িতে হইয়াছে।

কৃষ্ণনগর কলেজে শতবার্ষিক—

গত ১৪ই জানুয়ারী নদীয়া কৃষ্ণনগরে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কলেজের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বাঙ্গালার গভর্ণর তথায় গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের সহিত ছাত্রগণের মতভেদের

গোয়েন্দাবাহিনীর সদস্যদের মুক্তি—

আজাদ-হিন্দ-ফৌজের গোয়েন্দা বাহিনীর কয়েকজন সদস্য ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আরাকান রণাঙ্গনে লাফ নদীর নিকট ধৃত হইয়া নৈনি জেলে আটক ছিলেন। তন্মধ্যে গত ২রা জানুয়ারী শ্রীযুত মনোরঞ্জন চৌধুরীকে কুমিল্লায় মুক্তি দিয়া তাঁহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুত শিবশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, হরিকান্ত দক্ষ, সুরেশ বড়ুয়া ও ভবতারণ ভট্টাচার্য্যকে মুক্তি দিয়া নিজ জেলা চট্টগ্রামে প্রেরণ করা হইয়াছে। খুলনার তারাপদ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীহট্টের অতুল চক্রবর্ত্তীও মুক্তিলাভ করিয়াছেন।



সোদপুর ষ্টেশনে ট্রেন-কামরায় গান্ধীজী ফটো—পান্না সেন

আজাদ-হিন্দ-ফৌজের বালকবৃন্দ—

১৫ হইতে ১৭ বৎসর বয়স্ক আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ৪৫ জন ভারতীয় সদস্যকে ১লা জানুয়ারী মাদ্রাজে আনা হইয়াছে। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদের জাপানে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদের শিক্ষা শেষ হইবার পূর্ব্বেই জাপান আত্মসমর্পণ করে ও মার্কিণ উড়োজাহাজে করিয়া তাহাদের মানিল্লায় লইয়া যাওয়া হয়। পরে যুদ্ধবন্দীরূপে তাহারা বৃটিশের হেফাজতে আসিয়াছিল।

শরৎ বসু সম্বর্দ্ধনা—

গত ১৩ই জানুয়ারী রবিবার বিকালে কলিকাতা দেশবন্ধু পার্কে কলিকাতার অধিবাসীবৃন্দের পক্ষ হইতে নেতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে এক সভায় সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। সম্বর্দ্ধনা সমিতির পক্ষ হইতে আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার শরৎবাবুকে ১ লক্ষ ১১ হাজার ১ শত ১ টাকা পূর্ণ একটি থলি উপহার দিয়াছিলেন। সভায় আজাদ-হিন্দ-ফৌজের মুক্ত সদস্যগণের বসিবার জন্য একটি উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বিলাতী প্রতিনিধিদের পরিচয়—

বিলাতের পার্লামেণ্টের নিম্নলিখিত ৮জন প্রতিনিধিকে ভারতের প্রকৃত অবস্থা দেখিয়া ও শুনিয়া যাইবার জন্য ভারতে প্রেরণ করা হইয়াছে। ঐদলে এক জন মহিলা আছেন তাঁহার নাম মিসেস এস-ওয়ান হেড নিকল—তিনি শ্রমিক দলভুক্ত। শ্রমিক দলের আরও ৪জন সদস্য আছেন—(১) মিঃ আর রিচার্ডস্ (২) মিঃ আর-ডবলিউ সোরেনসেন (৩) মেজর ডবলিউ-ওয়াট ও (৪) মিঃ এ-জি-বটমলী। রক্ষণশীল দলে ২ জন—মিঃ গডসেনিকলসন ও ব্রিগেডিয়ার এ-আর-ডবলিউ লো এবং উদারনীতিক দলের মিঃ হাকিন মরিস ঐ দলে আছেন। প্রথম শ্রমিক মন্ত্রিসভায় মিঃ রিচার্ডস্ সহকারী ভারতসচিব ছিলেন ও ভারতের অর্থনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ—তিনি ঐ দলের নেতা হইবেন। মিঃ সোরেনসেন বহুকাল ধরিয়া ভারতের অবস্থার কথা আলোচনা করেন ও ভারত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লেখক। ভারত সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তক আছে ও তিনি ১৯৩৪ সালে ইণ্ডিয়ান লীগ পার্লামেণ্টরী কমিটীর সম্পাদক ছিলেন। মিসেস নিকল শ্রমিকদলের প্রচার কার্য্যে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন। মেজর ওয়াটের বয়স ২৭ বৎসর, তিনি ব্যারিষ্টার। মিঃ বটমলী শ্রমিক নেতা ও ব্রিগেডিয়ার লো একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

বাঙ্গালার দুর্দ্দশায় গভর্ণর—

বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ কেসি গত ১৭ই জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেশনে যাইয়া বলিয়াছেন—বাঙ্গালা অতি দরিদ্র দেশ। তথায় শিক্ষা নাই, খাদ্য নাই ও বাসগৃহ নাই, সেজন্য লোকের দুর্দ্দশারও অন্ত নাই। সেজন্য গভর্ণর বাঙ্গালার সেচ ও নদী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থায় বিশেষ জোর দিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলে একটিমাত্র ফসল হয়, কোথাওবা তাহা ভাল হয় না। সর্ব্বত্র যাহাতে বৎসরে ২বার ফসল উৎপাদন করা যায়, সেজন্য গভর্ণমেণ্টকে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে। গভর্ণরের ইহা শুধু মৌখিক আশ্বাসের কথা কি না জানি না।

গঙ্গাসাগর যাত্রীদের বিপদ—

গত ১৩ই জানুয়ারী শনিবার ডায়মণ্ডহারবারে গঙ্গাসাগর মেলার যাত্রীদের জাহাজে উঠিবার ঘাটেদুর্ঘটনার ফলে ১৭০ জন যাত্রী নিহত ও ৩০০ জন আহত হইয়াছে। একবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় ও আবার বেলা সাড়ে ৫ টার সময় তীর হইতে জেটীতে যাইবার পথ মানুষের চাপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। এই দুর্ঘটনার জন্য কাহারা দায়ী, সে সম্বন্ধে তদন্ত হইতেছে। যাহারা এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী সেই অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

গফরগাঁওয়ে পুলিসের গুলীবর্ষণ—

মৈমনসিংহ জেলার গফরগাঁও নামক স্থানে জেলা লীগ সম্মিলন উপলক্ষে নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁ, মিঃ সুরাওয়ার্দী প্রভৃতি যাইলে স্থানীয় লীগ বিরোধী মুসলমানগণ মিছিল করিয়া লীগের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিল। উভয় দলের লোকদের মধ্যে ইট ছোড়াছুড়ি হইলে পুলিস লীগ-বিরোধীদের উপর গুলীবর্ষণ করিয়াছে ও পুলিস পাহারা দ্বারা স্কুলগৃহে লীগের সভা করাইয়াছে। এই সংবাদ কতটা সত্য, সে বিষয়ে তদন্ত করিয়া প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করা উচিত।

মহিলা সদস্যের বর্ণনা—

শ্রীমতী নিকল,বৃটীশ পার্লামেন্টের মহিলা সদস্য। তিনি প্রতিনিধি দলের সহিত ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি নয়া দিল্লীতে বলিয়াছেন—এই প্রতিনিধি দল বিলাতে ফিরিয়া গিয়া ভারত সম্বন্ধে সকল কথা বলিয়া বৃটীশ জনসাধারণকে স্তম্ভিত করিবে। আমার মনে হয়, ভবিষ্যতে দিল্লীর এই বিরাট লাটপ্রাসাদ কলেজ বা হাসপাতালে পরিণত করার প্রয়োজন হইবে। বৃটীশ জাতি গত ১৫০ বৎসর ভারত শাসন করিতেছে—তাহার পরেও ভারতের দুর্দ্দশার শেষ নাই। ছেলেরা লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায় না— লোক রোগে ঔষধ পায় না। অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক লোক অশিক্ষিত। বিলাতের লোক শ্রীমতী নিকলের কথা শুনিবে ত?

স্বরাজ লাভের উপায়—

মহাত্মা গান্ধী মাদ্রাজ যাইবার পথে গত ২০শে জানুয়ারী ওয়ালটেয়ারে উপস্থিত হইয়া স্থানীয় ইণ্ডিয়ান ইনিষ্টিটিউটে এক সভায় বলেন—ভারতবাসীকে স্বরাজ লাভ করিতে হইলে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে প্রথমেই কাজ করিতে হইবে—(১) অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন (২) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন ও (৩) আদিবাসীদের (পার্ব্বত্য জাতি) উন্নতির ব্যবস্থা। তিনি সকলকে অহিংসা ও সত্যের পথ গ্রহণ করিয়া শৃঙ্খলার সহিত কাজ করিতে বলেন এবং ভারতের জাতীয় ভাষারূপে হিন্দুস্থানী শিক্ষা করিতে উপদেশ দেন। লোক দলে দলে গান্ধীজির দর্শন লাভের জন্য পথে যাইয়া ভিড় করে—তাহারা কি এই সকল বিষয়ে অবহিত হইবে?

শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ—

শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ খ্যাতনামা কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক নেতা। তিনি বর্ত্তমানে আগ্রা সেণ্ট্রাল জেলে রহিয়াছেন। বৃটীশ পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ রেজিনাল্ড সোরেনসেন ভারতে আসিয়া গত ১৯শে জানুয়ারী আগ্রা জেলে যাইয়া ২ ঘণ্টাকাল শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশের সহিত কথা বলিয়া আসিয়াছেন। বিলাত হইতেও খবর আসিয়াছে যে খ্যাতনামা নেতা মিঃ ফ্রেনার ব্রকওয়ে শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ ও শ্রীযুক্ত রামমনোহর লোহিয়ার মুক্তির জন্য বিলাতে আন্দোলন আরম্ভ করিতেছেন। কিন্তু ইহার কোন ফল হইবে কি?

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সম্মানিত—

দিল্লীতে নূতন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলের সদস্যগণ গত ১৯শে জানুয়ারী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে দলের নেতা ও মিঃ আসফ আলিকে ডেপুটী নেতা নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। এই নির্ব্বাচনে কোন ভোটাভুটি হয় নাই। শেঠ গোবিন্দ দাস দলের কোষাধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক এন-জি-রঙ্গ, মিঃ এন-ভি গাডগিল ও মিঃ মোহনলাল সাকসেনা দলের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। সর্দ্দার যোগেন্দ্র সিং, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী ও মিঃ এস-টি আদিত্যান দলের সাধারণ হুইপ এবং শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ সিং প্রধান হুইপ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পরিষদে কংগ্রেস দলের সদস্য সংখ্যা হইয়াছে ৬২জন।

বৃটেনের আর্থিক দুরবস্থা—

বৃটেনকে এখন বার বার আমেরিকার নিকট টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হইতেছে। এখন এমন অবস্থা আসিয়াছে যে আমেরিকা আর কোন মূল্যবান দ্রব্য গচ্ছিত না রাখিয়া স্বর্ণ দান করিতে সম্মত হইতেছে না। সে জন্য নাকি বৃটিশ সম্রাটের মুকুটে যে সকল মূল্যবান হীরা ও রত্ন আছে, সেগুলি আমেরিকার নিকট গচ্ছিত রাখা হইবে। যুদ্ধের জন্য পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই এখন দেউলিয়া অবস্থা লাভ করিয়াছে। বৃটেনকে বিরাট সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা করিতে যাইয়া শুধু উপনিবেশ গুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে হয় নাই—নিজেও দারুণ দুরবস্থায় পড়িতে হইয়াছে।

কৃষ্ণনগর কলেজে শতবার্ষিক—

গত ১৪ই জানুয়ারী নদীয়া কৃষ্ণনগরে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কলেজের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বাঙ্গালার গভর্ণর তথায় গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ছাত্রগণের মতভেদের

ফলে সেদিন কোন ছাত্র বা ভূতপূর্ব্ব ছাত্র উৎসবে যোগদান করেন নাই। সহরে সম্পূর্ণ হরতাল রক্ষিত হইয়াছিল, দোকান পাট বন্ধ ছিল, এমন কি সাইকেল রিক্সা পর্য্যন্ত চলে নাই। ছেলেরা দলে দলে মিছিল করিয়া পথে পথে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছিল। উৎসবে মাত্র কয়েকজন বৃদ্ধ ও জো-হুকুম উপস্থিত ছিলেন।

গোয়ালিয়রে পুলিসের গুলী—

গোয়ালিয়র রাজ্যে বিরলা মিলে ধর্ম্মঘট হওয়ায় গত ১৫ই জানুয়ারী পুলিস শান্ত ধর্ম্মঘটীদের উপর তিন ঘণ্টা ধরিয়া গুলী চালাইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। ফলে নাকি বহু লোক মারা গিয়াছে ও শত শত লোক আহত হইয়াছে। এদেশে শ্রমিক মালিক বিরোধ হইলেই তৃতীয় পক্ষ পুলিস যাইয়া শান্তি স্থাপনের পরিবর্ত্তে এই ভাবে অশান্তি বৃদ্ধি আর কত দিন করিবে?

বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসন—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী বার্ষিক কনভোকেসন উৎসবে বক্তৃতা করিবার জন্য পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল—তিনি সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। পণ্ডিতজীর মত লোককে এই কার্য্যে আহ্বান করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় উপযুক্ত নির্ব্বাচন করিয়াছেন। দেশসেবায় ত্যাগ ছাড়াও পণ্ডিতজীর পাণ্ডিত্যও অসাধারণ।

গান্ধী-গভর্ণর সাক্ষাৎ—

বাঙ্গালাদেশ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে গান্ধীজি গত ১৮ই জানুয়ারী সপ্তম বার বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ কেসির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ১৩৫ মিনিট কাল উভয়ের মধ্যে আলোচনা চলিয়াছিল। গত ১লা ডিসেম্বর কলিকাতায় পৌছিয়াই গান্ধীজি মিঃ কেসির সহিত দেখা করেন ও কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্ব দিন শেষ বার দেখা করেন। এই সাক্ষাতের ফলে বাঙ্গালা কি সত্যই উপকৃত হইবে?

চট্টগ্রামের গ্রামে পাইকারী জরিমানা

চট্টগ্রাম কক্সবাজারে ঝিলঙ্কা গ্রামে মিলিটারী টেলিফোনের তার কাটার অভিযোগে গ্রামবাসীদের উপর ১০ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া চট্টগ্রামের দৈনিক সংবাদপত্র পাঞ্চজন্য সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। একজনের অপরাধে সকল গ্রামবাসীর দণ্ড—ইহাই বৃটিশ বিধান।

আবার যুদ্ধের কথা—

ফ্রান্সের খ্যাতনামা জ্যোতিষী মঃ ডম নেরোমান বলিয়াছেন—১৯৪৬ সালের যে জুন মাসে আবার যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা দেখা যায়। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধের সময় যেরূপ গ্রহসমাবেশ দেখা দিয়াছিল, এবৎসরেও সেইরূপ গ্রহ সমাবেশ দেখা যায়। মঃ নেরোমান একটি জ্যোতিষ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার এই উক্তি সমগ্র পৃথিবীর লোককে আতঙ্কিত করিবে সন্দেহ নাই। নূতন যুদ্ধ বাধুক, আর নাই বাধুক, আমাদের অবস্থার যে কোন উন্নতি হইতেছে না, তাহা সকল দিক দিয়াই প্রকাশ পাইতেছে।

ব্রহ্মনেতার আত্মসমর্পণ—

ডক্টর বা ম ব্রহ্মের প্রথম প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৩৭ সালে ভারত হইতে ব্রহ্মদেশকে পৃথক করা হইলে তিনি প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ঐ বৎসর তিনি ব্রাহ্মণের প্রতিনিধি হইয়া ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সে যোগদান করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯৪০ সালে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ১২ মাস কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। জাপান ব্রহ্মদেশ অধিকার করিলে তিনি ব্রহ্মের মুখপাত্ররূপে ১৯৪৩ সালে জাপানের সহিত সন্ধি করেন। তিনি এত দিন লুকাইয়াছিলেন—গত ১৭ই জানুয়ারী তিনি টোকিওতে বৃটীশ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। জাপান আত্মসমর্পণ করার পর তিনি উত্তর জাপানের হোকাইডো দ্বীপে বাস করিতেছিলেন। টোকিওতে বৃটিশ অফিসে খ্যাতনামা ভারতীয় সাংবাদিক শ্রীযুত অমর লাহিড়ী তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

গান্ধীজির জেল পরিদর্শন—

মহাত্মা গান্ধী ১৫ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলে যাইয়া দুই ঘণ্টাকাল রাজবন্দীদের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। তখন ঐ জেলে ৪৯ জন রাজবন্দী ছিলেন। ১৭ই জানুয়ারী তিনি দমদম সেণ্ট্রাল জেলে যাইয়াও ২৫ মিনিট তথায় অতিবাহিত করেন। দমদম জেলে সেদিন ২০১ জন রাজবন্দী ছিলেন। রাজবন্দীদের সহিত তিনি বর্ত্তমান রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাঁহাদের অভিমত জানিতে গিয়াছিলেন।

আজাদ হিন্দ নেতা ও এম-পি—

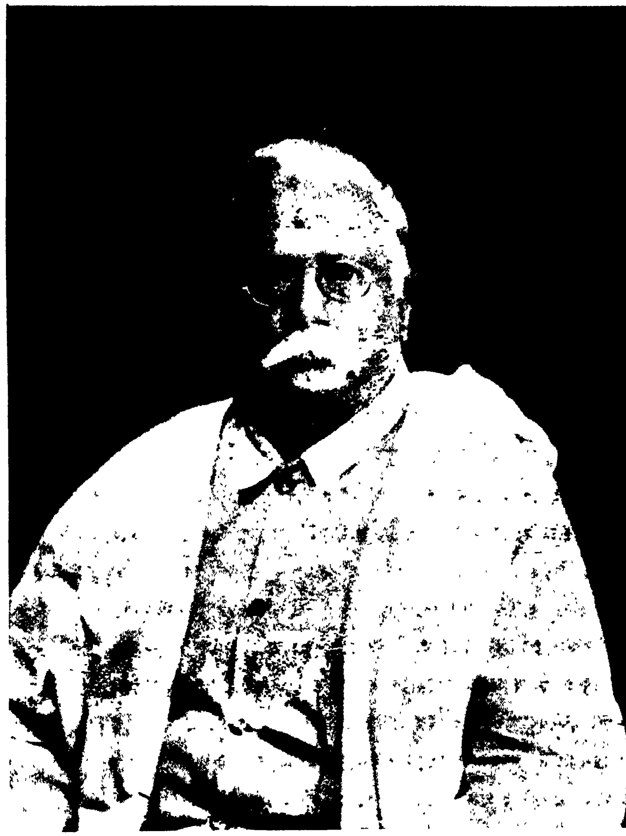
বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রতিনিধি দলের সদস্য মিঃ সোরেনসেন গত ১৭ই জানুয়ারী দিল্লীতে আজাদ হিন্দ-ফৌজের মুক্তিপ্রাপ্ত নেতা কর্ণেল সাহনওয়াজ ও মিঃ সেহগলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ৩৫ মিনিট কাল কথা বলিয়াছেন। মিঃ সোরেনসেন যে সকল প্রকার লোকের অভিমত জানিয়া বেড়াইতেছেন, তাহা তাঁহার কার্য্য দেখিয়াই বুঝা যায়।

কংগ্রেসের তারিখ পরিবর্ত্তন—

আগামী এপ্রিল মাসে দিল্লীতে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনের যে কথা ছিল তাহা হইবে না, যে মাসে কংগ্রেস হইবে—তবে কোথায় হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ—

কলিকাতা সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ গত ১৫ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ৭৯ বৎসর বয়সে তাঁহার পার্কসার্কাসস্থ বাসগৃহে পরলোকগমন করিয়াছেন। গ্রীক ও ল্যাটিনে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং উপনিষদ ও দর্শনশাস্ত্র তিনি গভীর ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ সালে মৈমনসিংহ টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৯৮ সালে তিনি ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়া ১৯০৬ সালে তিনি কারাবরণ করিয়াছিলেন। তিনি দৃঢ়চেতা, সত্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপ্রাণ লোক ছিলেন।



বোম্বায়ে কৃতী বাঙ্গালীর মৃত্যু—

বোম্বাই প্রবাসী বাঙ্গালী জুয়েলার্স শিল্পী এবং বোম্বাই দুর্গাবাড়ী সমিতির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত নীলমণি শিকদার মহাশয় "ব্রেণটিউমার" রোগে অস্ত্রোপচারের পর গত শুক্রবার ২১শে ডিসেম্বর ৪৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি একজন ধার্ম্মিক, পরহিতৈষী ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন।

ডাক্তার সুরেন্দ্রকুমার বসু—

কলিকাতার বেলিয়াঘাটানিবাসী সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার



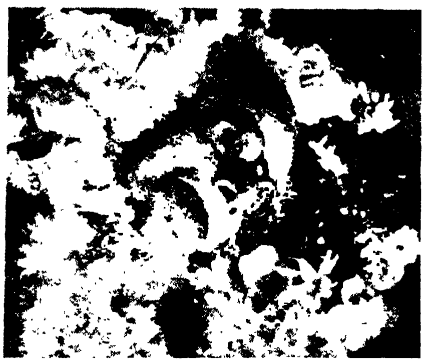
ডাঃ সুরেন্দ্রকুমার বসু

সুরেন্দ্রকুমার বসু বিগত ৩রা পৌষ মঙ্গলবার ৭২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি ১২৮০ সালে বসিরহাট ধলতিথার বসু বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শুধু চিকিৎসা শাস্ত্রেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই, ইঁহার দেশপ্রীতি, সামাজিকতা, দরিদ্রনারায়ণের সেবা ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য সাধারণের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

পরলোকে যতীন্দ্রনাথ বসু—

বাঙ্গালার খ্যাতনামা জননায়ক যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গত ২৪শে জানুয়ারী সকালে তাঁহার কলিকাতা বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট বাসভবনে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি স্বর্গত জননায়ক ভূপেন্দ্রনাথ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। এম এ, বি-এল্ পাশ করিয়া তিনি এটর্ণী হন ও সারাজীবন নিজেকে জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও ১৯১৭ সালে নরম

উদারনীতিক দলে যোগদান করেন ও বহু দিন উহার সভাপতি ছিলেন। প্রায় ২০ বৎসর তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। সহরের সকল সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি কোন না কোন সময়ে নিজেকে যুক্ত রাখিয়াছিলেন। বহুদিন তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও



যতীন্দ্রনাথ বসু চিরনিদ্রায় অভিভূত ফটো—পান্না সেন

সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কিত কাঁথি তদন্ত কমিটীর সভাপতিরূপে পুলিশের অনাচারের নিন্দা করিয়া তেজস্বিতার পরিচয় দেন। তাঁহার নেতৃত্বে উদারনীতিক দল পর্য্যন্ত সাইমন কমিশন বয়কট করিয়াছিল। তাঁহার সহৃদয় ও সুমধুর ব্যবহার সকলকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিত।

ন্যাশানাল থিয়েটার—

গত ১লা ফেব্রুয়ারী দ্বিপ্রহরে কলিকাতা গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে এক ভোজ সভায় ন্যাশানাল থিয়েটার্স লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রীযুত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতায় এক নূতন রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা ও চলচ্চিত্রে নেতাজীর জীবন কথা প্রস্তুতের সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। থিয়েটার জগতে সুপরিচিত শ্রীযুত প্রবোধ-চন্দ্র গুহ উক্ত নূতন প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হইয়াছেন। নূতন কার্য্যের জন্য কলিকাতার বহু খ্যাতনামা ব্যবসায়ী উহাতে যোগদান করিয়া অর্থ সরবরাহ করিতেছেন। আমরা এই নূতন প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

ইউ-স'র মুক্তিলাভ—

ব্রহ্মদেশের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মিঃ ইউ স ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাস হইতে বন্দী ছিলেন—গত ২৫শে জানুয়ারী তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪১ সালের শেষ ভাগে ব্রহ্মের ভবিষ্যৎ শাসন [illegible] সম্পর্কে বৃটিশ মন্ত্রিসভার সহিত আলোচনা করিবার জন্য তিনি ইংলণ্ডে যান—লণ্ডন হইতে ফিরিবার পথে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ইউগাণ্ডায় আটক রাখা হইয়াছিল। এখন তিনি রেঙ্গুনে ফিরিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতায় মেজর জেনারেল সা-নওয়াজ—

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মোৎসব উপলক্ষে উৎসবে যোগদানের জন্য আজাদ-হিন্দ ফৌজের অন্যতম নায়ক মেজর জেনারেল সা নওয়াজ গত ২২শে জানুয়ারী কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বাবুর ১নং উডবার্ণ পার্কের বাড়ীতে বাস করেন। ঐ দিনই তিনি ৩৮।২ এলগিন রোডে যাইয়া সুভাষচন্দ্রের শয়ন কক্ষখানি দর্শন করেন—তথায় যাইয়া তাঁহাকে অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখা যায়। ঐ স্থানে সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীযুক্তা বেলা মিত্র নিজের হাতের আঙ্গুল কাটিয়া সাহ নওয়াজের ললাটে রক্ত তিলক দান করেন। সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট তিনি বলেন—কংগ্রেসই আমার অস্থি মজ্জা। পরদিন বুধবার নেতাজীর জন্মদিবসে মেজর জেনারেল সাহ নওয়াজকে লইয়া কলিকাতা সহরে এক তিন মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। ঐ শোভাযাত্রা দেশপ্রিয় পার্ক হইতে রাসবিহারী এভেনিউ, রসা রোড, সার আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, চৌরঙ্গী রোড, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী রোড, ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়া দেশবন্ধু পার্কে গমন করিয়াছিলেন। এরূপ সুবৃহৎ ও সুনিয়ন্ত্রিত শোভাযাত্রা কলিকাতায় ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। দুই ধারের পথে ও বাড়ীগুলিতে এরূপ জনসমাগমও কখনও দেখা যায় নাই। বেলা ২টায় শোভাযাত্রা বাহির হইয়া রাত্রি ৮টায় দেশবন্ধু পার্কে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। ৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবক, তিন শত স্বেচ্ছাসেবিকা, এক হাজার শিখ ও খালসা, দুইশত অর্হর ও আজাদ মসলেম, ২৩০ খাকসার, ৩০ জন অশ্বারোহী, ৫০ জন সাইকেল আরোহী, ৫ জন মোটর সাইকেল আরোহী ঐ দলে ছিলেন। ৩টি লরীতে ৮০ জন আজাদ হিন্দ সদস্য ও একখানি মোটরে সাহ নওয়াজ ছিলেন। একটি শিখ ও একটি বাঙ্গালী কিশোর বাহিনীও শোভাযাত্রার মধ্যে ছিল।

বুধবার শোভাযাত্রার পূর্ব্বে সাহ নওয়াজ নেতাজীর বাসগৃহে যাইয়া বলেন—"আমি চিরদিন আমার নেতাজীর অনুগত ও বিশ্বস্ত সৈনিক থাকিব এবং আমার ৪০ কোটি দেশবাসীর পূর্ণ মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়া যাইব। আমি আমার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিব এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের

জন্য নেতাজীর নেতৃত্বে আরব্ধ সংগ্রাম চালাইয়া যাইব। নেতাজী আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

বৃহস্পতিবার বিকালে দেশপ্রিয় পার্কে কলিকাতাবাসীর পক্ষ হইতে সাহ নওয়াজকে এক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তথায় কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পৌরহিত্য করেন; তথায় সাহ নওয়াজ বলেন—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইংরাজেরা ভারতবর্ষ ছাড়িয়া গেলে হিন্দু মুসলমান ভেদজ্ঞান ও তাহাদের সঙ্গে চলিয়া যাইবে। ইংরাজেরা যতদিন থাকিবে ততদিনই এই ভেদ জ্ঞান থাকিবে।"

সন্ধ্যায় কলিকাতার সেন্ট্রাল মিউনিসিপাল অফিসে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে সাহ নওয়াজকে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন



আজাদ-হিন্দ-গভর্ণমেন্টের ডাক-টিকিট ফটো—পান্না সেন

করা হয়। ঐ দিন স্কটীশ চার্চ্চ কলেজেও এক ছাত্রসভায় সাহ নওয়াজ বক্তৃতা করিয়াছিলেন; তথায় তিনি বলেন—যে কেহই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করিবে, সে নিজের ভ্রাতা হইলেও তাহারই বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইতে হইবে। শুক্রবার অপরাহ্ণে হাওড়া ময়দানে ডালমিয়া পার্কে সাহ নওয়াজকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। তথায় লক্ষাধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় মানপত্র দেন। সাহ নওয়াজ তথাও বলেন—"হিন্দু, মুসলমান, শিখ—ভারতের সকল সন্তান—সবাই একত্রে ইংরেজকে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া তাড়াইয়া দাও—আমাদের সকলকে আজ এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে।" ঐ দিন দ্বিপ্রহরে দেশবন্ধু পার্কের এক ছাত্রসভাতে সাহ নওয়াজ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

শনিবার সাহ নওয়াজ বাঙ্গালা ত্যাগ করেন। যাইবার সময় তিনি যেন আমাদের নেতাজীকে সশরীরে ও নিরাপদে তাঁহার স্বদেশে আনিয়া দেন।"

ঐ দিন তিনি সকালে দেশবন্ধু পার্কে স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে যোগদান করেন ও নেতাজীর পরিকল্পিত মহাজাতি সদন পরিদর্শন করেন।

কয়দিন সাহ নওয়াজের কলিকাতা বাস উপলক্ষে সারা সহরে এক সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলি—

সাড়ে ৩ বৎসর কাল গোপনে থাকার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মিঃ আসফ আলির পত্নী শ্রীযুক্তা অরুণা গত ৩০শে জানুয়ারী প্রথম কলিকাতায় আত্মপ্রকাশ করেন। তাহার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ ছিল, গভর্ণমেন্ট সেগুলি প্রত্যাহার করিয়া



৩০শে জানুয়ারী কলিকাতা দেশবন্ধু পার্কের সভায় শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলি ফটো—পান্না সেন

লইয়াছেন। তিনি বাঙ্গালীর মেয়ে—বাঙ্গালা ত্যাগের পূর্ব্বে তিনি বাঙ্গালীকে আবার ১৯০৫ সালের মত বিদেশী পণ্য বয়কট ব্রত গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা দেশবন্ধু পার্কেও তিনি ১৫ মিনিট কাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজি ও উর্দ্দু ভাষায় যে বক্তৃতা করেন, তাহা সত্যই অসাধারণ। ১৯৪২ সালের আগষ্ট হাঙ্গামার পর গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্ত তিনি

পানিহাটীতে মহাত্মা গান্ধী—

প্রায় ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ২৪পরগণা পানিহাটী গ্রামে আগমন করিয়া রাঘব পণ্ডিত নামক এক ভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আগমন বর্ণনা চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে পানিহাটিতে তাঁহার স্মরণ মহোৎসব হইয়া থাকে। মহাপ্রভু গঙ্গার যে ঘাটে নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া যে বটবৃক্ষতলে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, ৫ শত বৎসরের পুরাতন সে ঘাট ও বটবৃক্ষ এখনও বর্ত্তমান। রাঘবের গৃহে এখনও নিত্যসেবার গ্রন্থে আছে, সেই গ্রন্থগুলিও মহাত্মাজীর অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহাকে দেখান হয়। গান্ধীজি পানিহাটীর তীর্থ দর্শন করিবেন জানিয়া পানিহাটীতে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়। সোদপুর খাদিপ্রতিষ্ঠান হইতে পানিহাটীর গঙ্গার ঘাট পদব্রজে মাত্র ২০ মিনিটের পথ। পানিহাটী মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুশীলকৃষ্ণ ঘোষ দুই দিন অহোরাত্র লোকজন খাটাইয়া গান্ধীজির গমন-পথ সংস্কার ও পরিচ্ছন্ন করিয়া দেন। পানিহাটী নিবাসী সুপণ্ডিত প্রবীণ ভক্ত শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত মহাপ্রভুর ব্যবহৃত কাঁথা, লাঠি, জপের মালা, মহাপ্রভুর হস্তাক্ষর প্রভৃতি গান্ধীজিকে দেখাইবার জন্য যথাসময়ে বটতলায়



পানিহাটী বটতলায় মহাত্মাজীর মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ব্যবহৃত পুঁথী, ছিন্ন কন্থা, খড়ম ও অন্যান্য দ্রব্যাদি পরিদর্শন

ফটো—কানন মুখোপাধ্যায়



পানিহাটীর বটতলায় মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের ব্যবহৃত জিনিষপত্রের সম্বন্ধে মহাত্মাজীর প্রশ্ন

ফটো—কানন মুখোপাধ্যায়

ব্যবস্থা আছে, ঐ গৃহের বহু প্রাচীন মাধবীকুঞ্জ ভক্তমাত্রকেই তথায় আকর্ষণ করে। ব্যারিষ্টার-কবি পরম বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় এবার মহাত্মা গান্ধীকে ঐ স্থান দর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া এক কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি মহাত্মাজীকে গত ১৫ই জানুয়ারী পড়িয়া শুনান হইলে তিনি পানিহাটী দর্শনের আগ্রহ প্রকাশ করেন। পানিহাটীর কথা যে সকল প্রামাণ্য এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। গত ১৮ই জানুয়ারী শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টার সময় মহাত্মাজী সঙ্গীগণের সহিত পদব্রজে পানিহাটী বটতলায় আগমন করেন। রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, পণ্ডিত অমূল্যধন রায় ভট্ট, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বটতলায় উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজি বটবৃক্ষ পরিক্রমা করিবার পর ২০ মিনিট দণ্ডায়মান থাকিয়া

প্রদর্শনীয় জিনিষগুলি দর্শন করেন ও সে সম্বন্ধে সকল তথ্য শ্রবণ করেন। সেদিন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মিত্র মহাশয়ের নেতৃত্বে পানিহাটীবাসী ছাত্রগণ গান্ধীজির গমনাগমনের সমস্ত পথটি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন। গান্ধীজিকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্ত এই দেড় মাইল পথ বহু তোরণ দ্বারা সাজান হইয়াছিল এবং পথপার্শ্বের প্রত্যেক গৃহের অধিবাসী নিজ নিজ গৃহ পুষ্প পতাকায় সজ্জিত করিয়াছিলেন। পথের উভয় পার্শ্বে নরনারী নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া গান্ধীজিকে দর্শন ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। গান্ধীজি তীর্থক্ষেত্রে উপবেশন পর্য্যন্ত করেন নাই—তিনি পুনরায় পদব্রজেই সোদপুর আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় গান্ধীজির সহিত সর্ব্বক্ষণ থাকিয়া তাঁহার তীর্থ দর্শনের সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের যে কবিতা গান্ধীজিকে পানিহাটীর প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—



পানিহাটীর বটবৃক্ষতলে মহাত্মাজী　ফটো—তারক দাস

সোদপুরে এসে একদিনও তুমি এলে নাকো পানিহাটী
আমার প্রভুর পায়ের পরশে সোনা হল যার মাটী।
হেথায় রাঘব ভবনে নিত্য প্রভুর আবির্ভাব
এত কাছে এসে সেথা কি যাবে না? এ বড় মনস্তাপ।
সুদীর্ঘকাল পথ চেয়ে আছে সে কি গো আসিবে ফিরে,
অতীতের স্মৃতি মনে করি ভাসে, পানিহাটী আঁখিনীরে।
সে মোহন তনু, আলু থালু বেশ, নয়নে আবেশ আঁকা
মাধবীকুঞ্জ প্রহর গুণিছে, কবে সে উদিবে রাকা?
মনের পরশে ভোলে না মাধবী, চায় সে পাগল চাঁদে,
নিত্য নিতুই আসে আর যায়, প্রাণ তাই আরো কাঁদে,
গোটা সে মানুষ, সুঠাম সুতনু, দেবে না আলিঙ্গন?
ঘন সুনিবিড় পাতাগুলি কাঁপে, রহি রহি অনুখন।
অদূরে পতিতপাবনী গঙ্গা বয়ে যায় ধীরে ধীরে,
এই বাঁধা ঘাট, এই সেই বট, দাঁড়ায়ে নদীর তীরে।
এই ঘাটে প্রভু নেমেছিল আসি, নিতাই-এ সঙ্গে করি,
চরণ পরশে ধন্য এ ঘাট, হেথা বেঁধেছিল তরী।
রাজার কুমারে বাঁধিতে নারিল, রমণী রাজ্যসুখ
দড়ির বাঁধনে বাঁধিতে চাহিল, স্নেহাতুর মার বুক।
ইন্দ্রের মত ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরা সম জায়া
এ সব ফেলিয়া রঘুনাথ শুধু চাহিল—চরণ ছায়া।
বাপুজী, বাপুজী, আমাদের এই একান্ত নিবেদন,
ক্ষণতরে তুমি পানিহাটী যেয়ো জুড়াইতে তনু মন।

দেখিও কাঙাল দরিদ্র এক ভক্ত নিভৃত কোণে
প্রভুর পাদুকা বুকে করি নাম জপিতেছে মনে মনে।
কুড়ায়ে রেখেছে পরম যতনে ছিন্ন কন্থাখানি,
সন্ন্যাসী বেশে শ্রীঅঙ্গে যাহা গোরা নিয়েছিল টানি,
এর পথ ঘাট, প্রতি ধূলি কণা, মুক্তার চেয়ে দামী
এই ধূলিতেই আমার প্রাণের দেবতা এলেন নামি।

সোদপুর হতে বেশী দূরে নয়—এই পথ গেছে গাঁয়ে
একদিন তুমি অতি প্রত্যুষে দাঁড়াইয়া বটছায়ে,
বাঙ্গালীর এই পরমতীর্থে ভরা গঙ্গার কূলে
বাঙ্গালীর-প্রাণ-শতদলটিরে যতনে লইও তুলে।
তুমি ভারতের মহান আত্মা, শক্তির মূলাধার,
অকপটে তাই করিনু জ্ঞাপন যাহা ছিল বলিবার।
তোমারে স্মরণ করানু বলিয়া আমারে করিও ক্ষমা,
করিও পরশ মাধবীকুঞ্জ, বটেরে পরিক্রমা।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি—

গত ২৪শে জানুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দলের মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত জি ভি মাবলঙ্কার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ৬৬ ভোট ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর ৬৩ ভোট পাইয়াছেন। লেঃ কর্ণেল জি সি চট্টোপাধ্যায় ঐ দিন পরিষদে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মাবলঙ্কার পূর্ব্বে বোম্বাই প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি ছিলেন।

বোম্বায়ে পুলিশের গুলী—

২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্র দিবস উপলক্ষে বোম্বায়ে শোভাযাত্রা বাহির হইলে পুলিশ নানাস্থানে গুলী চালাইয়াছে। ৪।৫ দিন ধরিয়া সহরের যাবতীয় কাজকর্ম্ম বন্ধ ছিল ও প্রত্যেক দিনই জনতার উপর নানাস্থানে গুলী বর্ষিত হইতে থাকে। ফলে বহু লোক হতাহত হইয়াছে। এখন যে আর লোক মরিতে ভয় করে না, তাহা সর্ব্বত্রই প্রমাণিত হইতেছে।

সিঙ্গাপুরে বন্দী আটক—

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ৬০৫ জন লোককে গত ১১ই জানুয়ারী ব্যাঙ্কক হইতে ভারতে পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যপথে সিঙ্গাপুরে জাহাজ হইতে নামাইয়া লওয়া হইয়াছে ও তাহাদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করা হইয়াছে। ভারতে আনিয়া তাহাদের বিচার করা হইবে বলিয়া শুনা গিয়াছিল, এখন নাকি তাহাদের সিঙ্গাপুরেই বিচারের ব্যবস্থা করা হইবে। ঐ দলে আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ঈশ্বর সিং, মিঃ করিম গণি ও শ্রীযুক্ত পরমানন্দ আছেন।

স্বাধীনতা-দিবস অনুষ্ঠান—

এ বৎসর ২৬শে জানুয়ারী যেরূপ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত ভারতের সর্ব্বত্র স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেরূপ আর কখনও দেখা যায় নাই। ভারতের প্রায় প্রতি গৃহে সেদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইয়াছে এবং প্রতি ভারতবাসী সেদিন কংগ্রেস কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট স্বাধীনতার বাণী পাঠ করিয়াছেন। সমগ্র ভারত যে আজ একযোগে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভে অগ্রসর, তাহা স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে আবার দুর্ভিক্ষ—

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ইংরাজ বর্ষে আবার ভীষণতর দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে বলিয়া চারিদিক হইতে তাহার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। প্রকাশ এবার বোম্বাই ও মাদ্রাজ অঞ্চলে এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে যে তাহার ফলে ভারতের ১০ কোটী লোককে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত গভর্ণমেন্টের খাদ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান মিঃ বি আর সেনও আসন্ন দুর্ভিক্ষের কথা স্বীকার করিয়াছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলায় ঘুরিয়া আসিয়া জানাইয়াছেন যে মেদিনীপুরে এখনই ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। বাঁকুড়ায় পূর্ব্বেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে—সেখানে রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি বহু জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান সাহায্য দান কার্য্যে ব্রতী আছেন। মেদিনীপুরেও অবিলম্বে সাহায্যদান কার্য্য আরম্ভ করার প্রয়োজন হইয়াছে।

সিন্ধুপ্রদেশের অবস্থা—

সিন্ধুপ্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। তথায় বিভিন্ন দলের সদস্য সংখ্যা এইরূপ—কংগ্রেস—২২, মুসলেম লীগ—২৭, জাতীয়তাবাদী মুসলমান—৪, সৈয়দ দল—৪ ও শ্বেতাঙ্গ—৩। মোট সদস্য সংখ্যা—৬০। সৈয়দ দল কংগ্রেস বা মুসলেম লীগে যোগদান করিবেন না—তাঁহারা কংগ্রেস ও লীগের নেতাদের মিলিত হইয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সিন্ধুর মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সমস্যা সমাধানের জন্য সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল তথায় গমন করিয়াছেন।

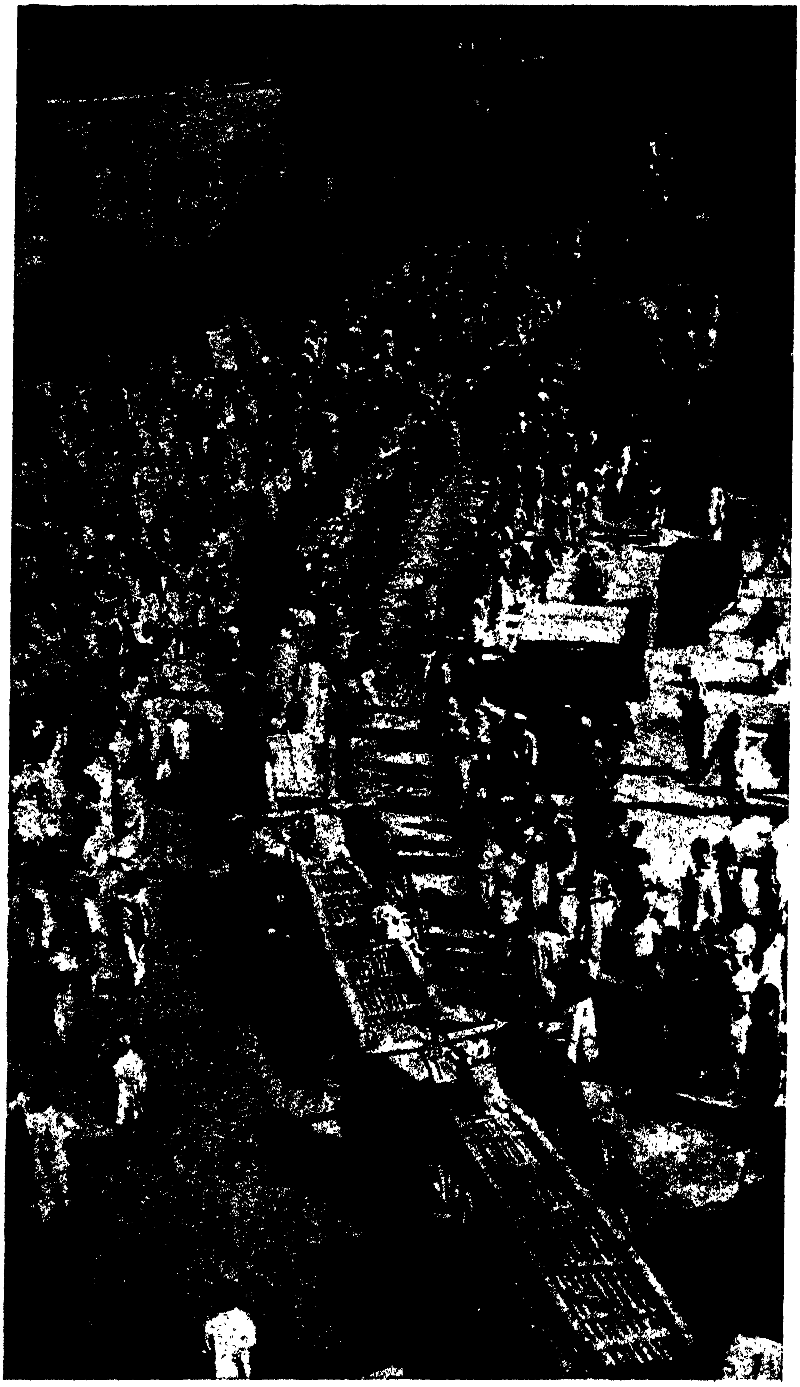
কংগ্রেস চিত্র প্রদর্শনী—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে এবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক অভিনব প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। সিপাই যুদ্ধ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত জাতীয় জাগরণ আন্দোলনের ইতিহাস তথায় চিত্র দ্বারা দেখান



দেশবন্ধু পার্কে ছাত্রসভায় মেজর জেনারেল শা নওয়াজের বক্তৃতা

ফটো—পান্না সেন



স্বাধীনতা দিবসে কলিকাতার রাজপথে গো-শকটের বিরাট শোভাযাত্রা ফটো—পান্না সেন

হইয়াছে। ৬ জন শিল্পী ১১৫ খানি চিত্রে ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন। এই প্রদর্শনী কলিকাতায় স্থায়ীভাবে দেখাইবার ব্যবস্থা করা উচিত এবং বাঙ্গালার সর্ব্বত্র যাহাতে এইরূপ প্রদর্শনী দেখান হয়, সে বিষয়েও জনগণের চেষ্টা করা উচিত। এই প্রদর্শনীর জন্য আমরা উদ্যোক্তাদিগকে অভিনন্দিত করি।

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—

এক বৎসরেরও অধিককাল আমেরিকা-বাসের পর শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত গত ১৯শে জানুয়ারী এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পণ্ডিত জহরলাল ভগিনীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এরোড্রোমে উপস্থিত ছিলেন। নামিয়া শ্রীযুক্তা পণ্ডিত বলেন—আমেরিকার লোককে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে শুধু মিথ্যা কথা জানানো হয়, তাহারা ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই জানে না। আমেরিকাকে ভারত সম্বন্ধে সত্য কথা জানানো প্রয়োজন।

শিরোহীর শাসকের মৃত্যু—

শিরোহী রাজ্যের শাসক অসুস্থ হইয়া কিছুকাল দিল্লী ২০ নং আলিপুর রোডে স্বগৃহে বাস করিতেছিলেন। গত ২৩শে জানুয়ারী তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার মুসলমান সেক্রেটারী তাঁহাকে মুসলমান প্রথানুসারে কবর দেন। ইতিমধ্যে রাজ্যের ২জন মন্ত্রী আসিয়া মৃতদেহ রাজ্যে লইয়া গিয়া হিন্দু প্রথানুসারে দাহ করিবার দাবী করেন। তাহাদের মৃতদেহ দেওয়া হয় নাই। উক্ত শাসক রাজপুত বংশীয় ছিলেন।

ঝিকরগাছায় আই-এন-এ—

গত ২৯শে জানুয়ারী সিঙ্গাপুর ও শ্যাম হইতে ১৪শত আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ বন্দীকে যশোহর-ঝিকরগাছা বন্দীনিবাসে রাখা হইয়াছে। তথায় যে ৫শত বন্দী ছিল, তাহাদের অন্য কোন স্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এখনও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কত লোক বন্দী হইয়া আছেন, কে জানে ?

নেতাজীর জন্মদিবস—

গত ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবস উপলক্ষে ভারতের সর্ব্বত্র দিনটি পালিত হইয়াছে। ভারতের সকল অধিবাসীর গৃহ সেদিন উৎসব উপলক্ষে সাজান হয় ও সকল গৃহে সন্ধ্যায় আলোকমালা দেওয়া হয়। সর্ব্বত্র সভা ও শোভাযাত্রা করিয়া নেতাজীর জীবন-কথা আলোচিত হয়। বেলা দেড়টার সময় নেতাজীর জন্মসময় বলিয়া সকল গৃহ হইতে একযোগে শঙ্খধ্বনি করা হইয়াছিল। এরূপ জন্মোৎসবও ভারতে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই।

দেবানন্দপুরে স্মৃতিমন্দির—

গত ২৭শে জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্নে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মভূমি হুগলী দেবানন্দপুরে তাঁহার স্মৃতি উৎসব উপলক্ষে তাঁহার পৈতৃক বাসভবনের নিকট এক স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। কবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় উৎসবে পৌরহিত্য করেন ও খ্যাতনামা কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান প্রতিনিধিরূপে উৎসবে বক্তৃতা করেন। ঐ উপলক্ষে বহু খ্যাতনামা সাহিত্য-সেবী সেদিন উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি দল—

বৃটিশ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি দল জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে কলিকাতায় আসিয়া কয়েক দিন থাকিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কয়েকজন নেতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কয়েকটি গ্রাম দেখিয়া ও কয়েকজন প্রতিনিধির নিকট নিবেদনের পালা শুনিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বিলাতে ফিরিয়া গিয়া ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে যে বিবরণ পেশ করিবেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া ভারতবর্ষকে নূতন শাসনব্যবস্থা দানের কথা স্থির হইবে।

নেতাজীর পায়ে লুটায় এ শির শ্রদ্ধায় অবনত !

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

রাজপথে কাল ডঙ্কা বাজায়ে যাহারা চলিয়া গেল—
বক্ষ তাদের নহেক বর্ম্মে ঢাকা ;
মাথার উপরে জাতীয় পতাকা শুধু গৌরব দোলে,
চক্ষে তাদের নবীন-আলোক মাখা !
নাই হাতিয়ার, নাইক কামান, গ্যাস, বিষ কিছু নাই,
তবুও তাহারা সকল তুচ্ছ করি ;
শস্ত্র-বিহীন সৈনিকদল যুদ্ধক্ষেত্রে ছোটে—
নবীন আহবে জয় করিবারে অরি।
সিংহল-জয়ী বিজয়সিংহ, শিবাজীর আশা নিয়ে,
চলিল তাহারা লক্ষ্যের পানে ধেয়ে—
কল্‌কাতা থেকে চলিল কি তারা দূর দিল্লীর পানে ?
কদম্ কদম্ সদর্পে গান গেয়ে ?
নাই তাহাদের নেতাজী, তবুও ঘটে আর পটে পূজো,
ফুলের বদলে তাজা প্রাণ নিয়ে ছোটে,
জয়তু নেতাজী, জয়তু নেতাজী, সমবেত রোল তোলে,
বাংলার বুকে নতুন আলোক ফোটে !
বিস্ময়ে হেরি নবীন-যুগের এমনি সূচনা যত ;
নেতাজীর পায়ে লুটায় এ শির শ্রদ্ধায় অবনত !

I have failed

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

শা নওয়াজ খানের কথা আমাকে আগে বা পরে অনেক বলিতে হইবে। এই মানুষটিকে জানিবার, চিনিবার ও বুঝিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। রাজার প্রতি আনুগত্য, তাহার নিয়োগকর্তাদের প্রতি আনুগত্য, সহকর্ম্মিগণের প্রতি আনুগত্য ভঙ্গ করিয়া, সমর-শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য শৃঙ্খলা নষ্ট করিয়া এই লোকটি রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল; সাম্রাজ্যবাহিনীর বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অস্ত্র যুদ্ধ করিয়াছিল; সেই রণরঙ্গে তাহার সহসৈনিকদের হত ও আহত করিয়াছিল। দিল্লীর লালকেল্লায় শা নওয়াজ খান, ধীলন ও সায়গলের বিচার হয়। বিচারফল যাহাই হৌক, সর্ব্বাধিনায়ক (কম্যাণ্ডার-ইন্-চীফ) তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়াছেন। ২২এ জানুয়ারী শা নওয়াজ খান কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ২৩এ জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত সুভাষচন্দ্রের জন্মোৎসব হইতে ২৬এ জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে কলিকাতা মহানগরী, সুভাষের ভারতীয় বাহিনীর মুক্তিপ্রাপ্ত সৈন্যাধ্যক্ষ শা নওয়াজ খানকে কেন্দ্র করিয়া উল্লাসে, উৎসাহে, আনন্দে উদ্বেল, উৎফুল্ল ও মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছিল। শা নওয়াজ খান উডবার্ণ পার্কে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।



জেনারেল শা নওয়াজের কপালে রক্ত তিলক দান — ফটো—পান্না সেন

তিনি বিমানে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। দম দম বিমান কেন্দ্র হইতে বসু পরিজনগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া উডবার্ণ পার্কে আনয়ন করেন।

শ্রীমতী অমিতা মিত্র নেতাজীর সহচর বীরকে বরণ করেন। বরণ প্রথা আমাদের প্রথা—ভারতবর্ষে—বাঙ্গলাদেশে বর বরণ, কন্যা বরণ, গুরু পুরোহিত বরণ হইতে বীর বরণ—রাজ বরণ প্রথা পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। গল্প কথায় শুনিয়াছি, এই মহানগরীতে, ইংলণ্ডের রাজা ও রাজকুমারকে কোনও সময়ে কেহ কেহ বরণ করিয়াছিল। বীর-বরণের ইতিবৃত্ত আমাদের জানা নাই। জানা নাই এই কারণে যে, বীর আখ্যার আখ্যাত হইতে পারেন এমন বীরের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। দীর্ঘকালের কলঙ্ককালিমাচ্ছন্ন ঘৃণিত ইতিবৃত্তের অবসানে বাঙ্গালী বীরত্বের সন্ধান পাইয়াছে; শৌর্য্যের গৌরব দীপ্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছে; বীর্য্যের সুষমা বায়ুভরে উড়িয়া আসিয়া বঙ্গদেশকে মাতাইয়া দিয়াছে। তাই আজ বঙ্গ রমণী তাহার বরণডালা করে বীর বরণে অগ্রসর হইয়াছে। অমিতা আরও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। শোণিত লিখায় শা নওয়াজ খানের ললাটে রাজটীকা—বীর লিখা আঁকিয়া দিয়াছেন।

বীর-জায়া বীরের মর্য্যাদা বুঝে। তাই চন্দন-লিখায় তাহার মন উঠে নাই; সিন্দুর বিন্দু অমিতার মনঃপুত হয় নাই। নিজ চম্পক-অঙ্গুলি ছেদন করিয়া সেই রক্তের তিলক লিখিয়া দিয়াছে। এই অমিতার স্বামী বৃটিশের আদালতে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। গান্ধীজী বৃটিশের নিকট তাহার হইয়া অনুকম্পা যাচ্ঞা করিয়াছিলেন; বৃটিশ গান্ধীজীর আকুতি অবহেলা করে নাই, মুক্তি ভিক্ষা দিয়াছে! হরিদাস মিত্র যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। হরিদাসের অপরাধ, সে নাকি বৃটিশের শত্রুর সহিত সংযোগ

স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছিল। অপরাধ গুরুতর—সন্দেহ নাই; কিন্তু উদ্দেশ্য, আত্মস্বার্থ নহে, আত্মাহুত নহে, ভারতের উদ্ধার সাধন; স্বদেশের মুক্তি কামনা।

কে বলিতে পারে, সুন্দরী বঙ্গরমণীর করধৃত বরণডালাখানা যখন বীর বরণ করিতেছিল তখন কারান্তরালবাসী আর একজন বীরের কথা শীতের কুজ্ঝটিকার মত তাহার অন্তরতলে অন্ধকারের সৃষ্টি করিতেছিল কি না! উদাস দুটি নয়নের নীচে বিচ্ছেদ সাগর তরঙ্গায়িত হইতেছিল কি না—তাই কে বলিতে পারে! কম্পিত দু'খানি অধর-ওষ্ঠের তলে রোদনসমুদ্র আছাড় বিছাড় করিতেছিল কি না কেই বা তাহা বলিতে পারে? কেহ না! তাহার ব্যথা সেই জানে! কিন্তু বাঙ্গলার মেয়ে বাঙ্গালীর বধূ, আপনাকে বিলোপ করিতে তাহার বিলম্ব হয় না।

বরণ-অন্তে শা নওয়াজ খান বলিলেন, নেতাজীর বাড়ী?

ঐ—কাছেই।

কেহ আনিল গাড়ী, কেহ বলিল, একটু বিশ্রাম—

"দেবতার মন্দিরে কি গাড়ীতে যাইতে আছে! বিশ্রামের অনেক সময় পাওয়া যাইবে। নেতাজীর বাড়ী সর্ব্বাগ্রে!"

বন্ধুবৃন্দ সঙ্গে চলিলেন। তত ক্ষণে পথ জনারণ্যে পরিণত। মহানগরীর একাংশ যেন এইখানে আজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।



দেশপ্রিয় পার্কে মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাবৃন্দ কর্ত্তৃক শা নওয়াজকে শ্রদ্ধানিবেদন　ফটো—পান্না সেন

সেই কক্ষ! কতদিন, কত কাজে, কত হর্ষ বিষাদে, কত বার গিয়াছি! উচ্চ নীচ, পণ্ডিত মূর্খ, মিত্র বৈরী, দেশী বিদেশী কত লোক কত ছলে কত বার গিয়াছে—সেই কক্ষ! এই সেদিন গান্ধীজী এই কক্ষে আসিয়া কত কথাই বলিয়া গিয়াছেন। সেই ঘর তেমনই সজ্জিত—শোভিত, মনে হইবে, সুভাষচন্দ্র বুঝি বাহিরে গিয়াছেন, এখনই ফিরিবেন। সেদিনও জনতা জমিত; আজও জনতা অপেক্ষমান। কেদারার উপরে সুভাষের সেই ছবিখানি—কেশবিরল গৌরসুন্দর আনন, খদ্দরের অঙ্গ-বাস; আজ একটি মালা পরিয়াছে।

শা নওয়াজ খান ভাল ও ভদ্র মানুষটির মত সিঁড়ি উঠিলেন, তোমাতে আমাতে তাঁহাতে কোনও তারতম্য নাই, হঠাৎ ঘরের সম্মুখে আসিয়া সেই ভীষণ মোটা জুতা ভীষণ শব্দ করিয়া উঠিল—শা নওয়াজ খান আর শা নওয়াজ খান নহেন, মেজর জেনেরাল শা নওয়াজ! ফল্ ইন! জয় হিন্দ! এক, দুই, তিন মুহূর্ত্ত। তারপর গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই ছবি—তাহার নেতাজীর সেই ছবিখানি সবলে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, সেকি বালকের কান্না, সেকি নারীর ক্রন্দন! হায় বীর! ক্রন্দন কি তোমায় শোভা পায়? কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "আর একদিন, আর একদিন নেতাজি, তোমাকে আমি এমনি জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম। যেদিন ভারতভূমিতে প্রথম পদার্পণ করিবার জন্ত সুভাষ ব্রিগেডের নেতৃত্ব, নেতাজি, নেতাজি, তুমি এই অক্ষম অধম অনুচরকে দিয়াছিলে! সেদিন তুমি ছিলে মানুষ, আমি তোমার দাস; আজও আমি সেই দাসই আছি; কিন্তু দেবতা আমার, তুমি কোথায়?" ছবি ছাড়িয়া জানালা, জানালা হইতে আলনা, আলনা ছাড়িয়া দরজায়, দুটি চক্ষুতে শতধারা বহিয়া যাইতেছে; সম্বদ্ধোষ্ঠ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে! ভোগবতী বসুধা বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া উঠিতে চাহে, বসুমতী অতি কষ্টে দমিত রাখিয়াছেন।

সুভাষের সেই শয্যা! শা নওয়াজ খান খাটের নীচে জানু পাতিয়া শয্যায় মুখ লুকাইলেন; চোখের জলে চাদর ভিজিল; উপাধান সিক্ত হইল। চাহিয়া দেখি, ঘরের চারিদিকে যত চোখ—সব চোখে জল ছল ছল টল টল! কক্ষ নিস্তব্ধ, কেবল মৃদু করুণ ক্রন্দন শব্দ! মেজর জেনেরাল শা নওয়াজ তখনও চাদরে মুখ ঘসিতেছেন আর অতি মৃদু, অতি ধীর, অপরাধীর কণ্ঠে বলিতেছেন, নেতাজি আমি পারি নাই; নেতাজি আমি পারি নাই (I have failed! I have failed)! নেতাজি আমায় ক্ষমা করুন, আমি পারি নাই!

নেতাজী কোথায় জানি না! যেখানে থাকুন, বীরঅনুচরকে তিনি যে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়াছেন, তাহা জানি! আর শা নওয়াজ খানকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতেও পারি, হে বীর! তোমার ব্যর্থতাও বিজয়মণ্ডিত হইয়াছে। তোমার নেতাজীর পুণ্যে ভারতবর্ষ শতাব্দীর পথ এক নিমিষে অতিক্রম করিয়াছে। তোমার নেতাজী ধন্য, নেতাজীর অনুচর তোমরা, তোমরাও ধন্য!

বাহিরে কে রব তুলিল, শা নওয়াজ জিন্দাবাদ!

মুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া শা নওয়াজ বাহিরে আসিয়া সিংহনাদ করিলেন—নেতাজী…

জনতা বলিল, নেতাজী জিন্দাবাদ!

জয় হিন্দ!



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

বেঙ্গল এ্যাথলেটিক স্পোর্টস ঃ

বেঙ্গল এ্যাথলেটিক স্পোর্টস এসোসিয়েশনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে গ্রেল ক্লাবের জি ক্যারাপিট ২৮ পয়েন্ট পেয়ে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান সীপ পেয়েছেন। তিনি ছ'টি অনুষ্ঠানে যোগদান ক'রে পাঁচটিতে প্রথম হন এবং একটিতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। মহিলাদের অনুষ্ঠানে ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাবের মিস্ ভুলসি বিক ১০ পয়েন্ট পেয়ে ব্যক্তিগত চাম্পিয়ান হ'য়েছেন। দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে গ্রেলক্লাব ৪১ পয়েন্ট পেয়ে। ১২ বছরের কম বয়সের বালিকাদের অনুষ্ঠানে শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের কুমারী নীলিমা ঘোষ ১৫ পয়েন্ট পেয়ে ব্যক্তিগত চাম্পিয়ান হয়েছেন।

ব্র্যাডম্যান এবং ও'রেলী ঃ

যুদ্ধের পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ডন্ ব্র্যাডম্যান এবং ওরেলী যেমন প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট এভারেজ ক'রেছিলেন তেমনি বর্ত্তমানেও তাঁরা ক'রেছেন। তিন ইনিংসে ব্র্যাডম্যান ২৩২ রান ক'রেছেন তার মধ্যে একবার নট আউট। ১১৬ রানের এভারেজ ছিল। নিউ সাউথ ওয়েলসের বার্ণেস প্রায় তাঁকে ধরে ফেলেছিলেন আর কি? বার্ণেসের ছ ইনিংসের মোট রান ৬৭৪ ছিল। তাঁর এভারেজ ১১২ রান। ও'রেলী ১৯টা উইকেট পেয়ে ১২ এভারেজ করেন।

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল স্পোর্টস ঃ

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ানসীপের ২৩শ বার্ষিক প্রতিযোগিতায় একটি বিষয়ে নতুন বেঙ্গল রেকর্ড হয়েছে এবং কয়েকটি বিষয়ে সমান হয়েছে। ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাবের পি উডক্রে হপ, ষ্টেপ এবং জাম্পে ৪৪ ফিট ৪½ ইঞ্চি দূরত্ব অতিক্রম ক'রে নতুন বেঙ্গল রেকর্ড স্থাপন ক'রেছেন। রেঞ্জার্সের এম লিমিং জাভেলিন নিক্ষেপে তাঁর পূর্ব্ব রেকর্ড উন্নত ক'রেছেন। এ ছাড়া ৪×১০০ মিটার রীলে, মেয়েদের ৫০ মিটার দৌড়ে এবং ব্রড জাম্পে বেঙ্গল রেকর্ডের সমান হয়েছে। ৫০০ মিটার ভ্রমণে এ কে দত্ত তাঁর পূর্ব্ব ভারতীয় রেকর্ড উন্নত করেছেন।

ফলাফল ঃ

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ—জি ক্যারাপিট (গ্রেলক্লাব) ১৫—পয়েন্ট। দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ—ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব—৪০ পয়েন্ট। মহিলাদের চ্যাম্পিয়ানসীপ—মার্গারেট নিকলস্ (রেঞ্জার্স)—১৮ পয়েন্ট। ঐ দলগত চ্যাম্পিয়ান সীপ—ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব ৩৬ পয়েন্ট।

আন্তর্জাতিক ফুটবল ঃ

ইংলণ্ড ৮৫০০০ হাজার দর্শকের সামনে ২—০ গোলে বেলজিয়ামকে হারিয়েছে। এই ফুটবল খেলায় দর্শক হিসাবে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ক্লিমেন্ট এটলি উপস্থিত ছিলেন।

রঞ্জি ক্রিকেট ঃ

বাঙ্গালা দল ঃ ১১৯ ও ২৬৬

হোলকার দল ঃ ২৮৮ ও ১০২ (৫ উইকেট)

হোলকার দল ৫ উইকেটে বাঙ্গলা প্রদেশকে রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালে পরাজিত করেছে। হোলকার দল বাঙ্গলা দেশে খেলে বাঙ্গলা দলকে এই প্রথম হারাবার গৌরব লাভ করলো।

বাঙ্গলা টসে জিতে প্রথম ব্যাটিং করে এবং মাত্র ৯০ মিনিটের মধ্যে সব উইকেট পড়ে যায়। দলের সব থেকে বেশী ৫২ রান করলেন এস মুস্তাফী। উইকেট পড়লো এইভাবে ১২ রানে ১ম, ১২ রানে ২য়, ১৮ রানে ৩য়, ২৪ রানে ৪র্থ, ৩৬ রানে ৫ম, ৩৮ রানে ৬ষ্ঠ, ৪০ রানে ৭ম ৪০ রানে ৮ম, ৭২ রানে ৯ম এবং ১১৯ রানে শেষ উইকেট। এম জগদল ৩৬ রানে ৪টে উইকেট পেলেন। হোলকার দলের ৪ উইকেটে ১৭০ রান উঠলে পর প্রথম দিনের খেলা শেষ হ'ল।

দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চের সময় হোলকার দলের ৯ উইকেটে ২৭৬

রান উঠল। লাঞ্চের পর আর মাত্র ১২ রান যোগ হ'লে পর ২৮৮ রানে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল। দলের সর্ব্বোচ্চ ৪৩ রান করলেন বি বি নিম্বলকার। সারভাতের ৪২ রান উল্লেখযোগ্য। এস ব্যানার্জি ২৯ ওভার বলে ৫টা মেডেন নিয়ে এবং ৮৮ রান দিয়ে ৪টা উইকেট পেলেন। এন চৌধুরী ৭৫ রানে পেলেন ৩টে উইকেট। বেলা ২-৩০ মিনিটে বাঙ্গলা দল ১৬৯ রান পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। দ্বিতীয় দিনের শেষে তাদের ২২২ রান উঠলো ৬ উইকেটে। এন চ্যাটার্জি ৬৮ রান করে নট আউট রইলেন।

তৃতীয় দিনের খেলায় বাঙ্গলার দ্বিতীয় ইনিংস ২৬৬ রানে শেষ হ'ল। এন চ্যাটার্জি ১৩৫ মিঃ খেলে ৯৯ রান করলেন। এর পর উল্লেখযোগ্য ধ্রুবদাসের ৫৭ রান।

বেলা ১২-৩৫ মিনিটে হোলকার দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। জয়লাভের জন্য ৯৮ রান প্রয়োজন। বেলা ২-৫৩ মিনিটে প্রয়োজনীয় রান উঠে গেল। হোলকার দল বিজয়ী উইকেটে। সি এস নাইডু ৪০ রান করে নট আউট রইলেন। এস ব্যানার্জি ৩১ রানে ৩টে উইকেট পেলেন।

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার :

হিন্দুদল : ৩৬৮ ও ২১৩ (উইকেট ডিক্লে)

পার্শী দল : ১৭৭ ও ৯৪

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে হিন্দুদল ৩১০ রানে জয়লাভ করেছে।

হিন্দুদলের প্রথম ইনিংসের উল্লেখযোগ্য রান—ডি মানকদ ৭৪, সোহোনী ৫৭, সিন্ধে ৪৯, কিষেণচাঁদ ৪৫। দ্বিতীয় ইনিংসে কিষেণচাঁদ রান আউট ৭২ এবং কে রঙ্গনেকার নট আউট ৫১ রান। পালিয়া ৯৩ রানে ৪টে উইকেট পান।

পার্শীদলের প্রথম ইনিংসের দলের সর্ব্বোচ্চ ৫৫ রান করলেন জে বি খোট। ফাদকার ৭২ রানে ৩ এবং সিন্ধে ৫৩ রানে ৩ উইকেট পেলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিংয়ে সাফল্য দেখালেন সিন্ধে ৩১ রানে ৪ এবং ফাদকার ৪৫ রানে ৩টে উইকেট পেয়ে।

টম্ লটন ঃ

ইংলণ্ড এবং চেলসার ফুটবল সেণ্টার ফরওয়ার্ড টম লটন মিডলসেক্স দলে ক্রিকেট খেলা চর্চ্চা করবেন বলে স্থির করেছেন। খ্যাতনামা ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলোয়াড় হেণ্ডারসন, হিউস এবং ডেনিস কম্পটনের পদাঙ্কই তিনি অনুসরণ করেছেন।

প্রদর্শনী হকি খেলা

স্মরণ থাকতে পারে ১৯৩৫ সালে অল্ ইণ্ডিয়া হকি টীম নিউজি-ল্যাণ্ডে খেলতে যায়। হকি খেলায় ভারতীয় দলের প্রতিষ্ঠা বহুদিনের। অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় হকি দল উপর্য্যুপরি তিনবার বিজয়ী হয়ে পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ান সীপ পেয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে সময়ে সময়ে ভারতীয় হকি দল বাইরে হকি খেলতে গেছে কিন্তু বিদেশী হকি দলের এ দেশে আগমন কদাচিৎ ঘটে থাকে। আফগান থেকে হকি দল ভারতবর্ষে খেলতে আসতো, সে অনেক বছর আগের কথা। নিউজিল্যাণ্ড থেকে একটি সার্ভিস হকি দল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে হকি খেলেছে। এই দলটিকেই প্রকৃত প্রথম বৈদেশিক হকি দল বলা





বোলিং গ্রিপস : লেগ্ ব্রেক অফ্ ব্রেক

যায়। এই সার্ভিস হকি দল বেশীর ভাগই মিলিটারী দলের সঙ্গে খেলেছে। তারা এ পর্য্যন্ত ১০টি খেলায় ৬টি খেলায় হেরেছে এবং ৪টি খেলায় জিতেছে। ক'লকাতায় বেঙ্গল হকি এসোসিয়েসন দলের সঙ্গে প্রদর্শনী খেলায় সার্ভিস দল ১—২ গোলে পরাজিত হয়েছে। সব থেকে বেশী গোলের ব্যবধানে তারা হেরেছিল পিণ্ডি সিভিলিয়ান দলের কাছে ২—১১ গোলে। ক'লকাতায় মোট ৬০ মিনিট খেলা হয়েছিল। সার্ভিস দলের খেলোয়াড়রা

তাদের অভ্যস্থ গতি এবং কৌশল অবলম্বন করে বিপক্ষদলকে পরাস্থ করে। বাঙ্গলা দেশে সে সময় হকি মরসুম আরম্ভ হয়নি, ফলে স্থানীয় দলের খেলোয়াড়দের খেলায় বিশেষ অনুশীলন ছিল না। তাছাড়া বি এন আর দলের নামকরা খেলোয়াড়রা এ দলে যোগদান করতে পারে নি। এ সব সত্বেও স্থানীয় দল হকি খেলায় ভারতীয়দলের সম্মান রক্ষা করেছে।

রঞ্জি ক্রিকেট ঃ

পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনাল খেলা ঃ

সিন্ধু ঃ ২৩৪ ও ৩০৬

বোম্বাই ঃ ৫৬০ (৫ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড)

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পশ্চিমাঞ্চলের সেমি ফাইনালে বোম্বাই দল এক ইনিংস এবং ২০ রানে সিন্ধুদলকে পরাজিত করেছে।

সিন্ধুদল প্রথম ব্যাট করে। তাদের প্রথম ইনিংসের উল্লেখযোগ্য রান জে ইরাণী ৪১। ডি ফাদাকার ৬১ রানে ৪টা উইকেট পান। বোম্বাই দল ৫ উইকেটে ৫৬০ রান উঠলে ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে। ভি এম মার্চেন্ট নট আউট ২৩৪ রান করেন। কে রঙ্গনেকার করেন ১১৫ রান। সিন্ধুদলের দ্বিতীয় ইনিংস ৩০৬ রানে শেষ হয়। এনায়েৎ খাঁ ৮৭, জি কিষেণচাঁদ ৭৫ এবং দাবুদ খাঁ ৫৮ রান করেন। এই খেলায় ভি এম মার্চেন্ট এবং রঙ্গনেকার পঞ্চম উইকেটের জুটিতে মোট ৩২৫ রান তুলে রেকর্ড করেছেন।

দক্ষিণাঞ্চলের ফাইনাল খেলা ঃ

মহীশূর ঃ ১৮৮ ও ৩০৯

হায়দ্রাবাদ ঃ ১৭৬ ও ২২০

মহীশূর ১০১ রানে হায়দ্রাবাদকে রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দক্ষিণাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় পরাজিত করেছে।

মহীশূরের প্রথম ইনিংসের দলের সর্ব্বোচ্চ রান গুরুদাচারের ৫৪। ভরতচাঁদ ৩০ রানে ৪ এবং দুর্গাপ্রসাদ ৩৬ রানে ৩ উইকেট পান। হায়দ্রাবাদের প্রথম ইনিংসে ভরতচাঁদ দলের সর্ব্বোচ্চ ৫১ রান করলেন। মহীশূর দলের ২য় ইনিংসে রামদেব নট আউট ৮০ রান করলেন। হায়দ্রাবাদ দলের ২য় ইনিংসের সর্ব্বোচ্চ ৪৭ রান করলেন আইবারা ৮০ মিনিট খেলে। রামরাও ১ম ইনিংসে ৩৭ রানে হায়দ্রাবাদ দলের ৭টে উইকেট পান এবারও পেলেন ৪টে ৪৯ রানে।

বেঙ্গল টেবল টেনিস ঃ

পুরুষদের জুনিয়ার সিঙ্গলসের লীগে কুমার ঘোষ কোন খেলায় না হেরে ব্রাবোর্ণ কাপ বিজয়ী হয়েছেন।

উইণ্টার হকি লীগ ঃ

ক'লকাতায় হকি মরসুম আরম্ভ হয়ে গেছে। লীগের 'এ' গ্রুপে পোর্টকমিশনার ৭টা খেলে ১৪ পয়েন্ট করেছে। তার পরই ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব, ৫টায় ৮ পয়েন্ট। এ দুটি ক্লাব এখনও কোন খেলায় হারেনি। 'বি' গ্রুপে মোহনবাগান ক্লাব প্রথম যাচ্ছে, ৭টা খেলায় ১টা হেরে ১২ পয়েন্ট পেয়েছে।

নবাব পতৌদী ঃ

আগামী গ্রীষ্মকালে ইংলণ্ডে যে ভারতীয় ক্রিকেট দল খেলতে যাচ্ছে তার অধিনায়ক হয়েছেন খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় নবাব পতৌদী। নবাব পতৌদী ১৯৩২ সালে ইংলণ্ড দলের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়া গিয়ে ইংলণ্ডের পক্ষে সিডনীর প্রথম টেষ্ট ম্যাচে ১০২ রান করেন। তিনি এ পর্য্যন্ত ভারতীয় দলের পক্ষে ইংলণ্ড দলের বিপক্ষে ক্রিকেট খেলেন নি। নবাব পতৌদী হকি এবং বিলিয়ার্ডে অক্সফোর্ড ব্লু পেয়েছেন তাছাড়া কেম্ব্রিজের বিরুদ্ধে তাঁর নট আউট ২৩৮ সর্ব্বোচ্চ রান হিসাবে রেকর্ড হয়ে আছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "ইতালীর সেরা গল্প"—২॥০
শৈলবিহারী ঘোষ প্রণীত "জার্মাণীর সেরা গল্প"—৩৲
শ্রীশিশিরকুমার দত্ত প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "সোনার দেশ"—।৵০, "সোনার কুঞ্জ"—।৵০
দেবী লক্ষ্মীমণি ও বিশ্বাস যোগীন্দ্রমোহিনী প্রণীত "শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতি"—।০
শ্রীরণজিৎ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "জন্মভূমি"—১॥০
শামসুদ্দীন প্রণীত "মুকুলের স্বপ্ন"—৮০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী—শ্রীযুক্ত মণি গাঙ্গুলী

দেবদাসী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস



দিনের শেষে

শিল্পী—শ্রীনীরেন ভাদুড়ী

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য ক





ভারতবর্ষ



চৈত্র—১৩৫২

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

যুগ-সন্ধির শেষ বৈরাগী—আচার্য্য বলদেব

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী এম-এ

শ্রীমন্মহাপ্রভু তদীয় জীবন-ভাষ্যে প্রেম-রস-সীমা স্বরূপ শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীর প্রণয় মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি ব্যতীত ব্রজ-বধূগণের স্বার্থসম্পর্করহিত প্রেম-রত্নের মাহাত্ম্য প্রচার যে আর কাহারও দ্বারা সম্ভবপর হইত না, তাহা বলাই বাহুল্য—

যদি গৌরাঙ্গ না হ'ত কি মনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেম-রস-সীমা
জগতে জানা'ত কে॥
মধুর বৃন্দা বিপিন-মাধুরী
প্রবেশ-চাতুরী-সার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত নূতন পথ জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারের, পূজা-মন্দিরের এক অভিনব সামগ্রী। কিন্তু মহাপ্রভু এই পথ-নির্দ্দেশের জন্য অপরাপর আচার্য্য-পাদের মতো সূত্র-ভাষ্য বা গ্রন্থাদি রচনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। যে কথা তাঁহার বিরহ-মথিত, হৃদয়ে অশ্রুর অক্ষরে চির-লিখিত তাহা তাঁহার জীবন-ধারার সংমিশ্রণে অপূর্ব্ব শ্রী, অপূর্ব্ব কারুণ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া জগজ্জনকে বিমোহিত, একেবারে পাগল করিয়া দিয়াছে। তবু একথা বলিতে হয়, পুষ্প শুষ্ক হইয়া গেলে, সৌরভও সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়া থাকে। কাজেই সেই সৌরভ-সুধার দিব্য-কাহিনী বিশ্বের কর্ণে কর্ণে পরিবেশন করিয়া জগ-জনকে চিরদিনের জন্য কিনিয়া রাখিতে আবার প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

প্রেরণা যেরূপ প্রবল, লেখকও তেমন যোগ্য হওয়া চাই। অপূর্ব্ব প্রেরণার রস-রহস্য চিরাঙ্কিত করিয়া রাখিবার জন্য বুঝি শ্রীভগবানই সে কর্ম্মভার আপন হস্তে রাখিয়াছিলেন। তাই রূপ-সনাতন, শ্রীজীব, বিশ্বনাথ, বলদেব প্রভৃতির ন্যায় অভূতপূর্ব্ব ভক্ত-সুধীজনের আবির্ভাবে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সমলঙ্কৃত হইয়া উঠিল, তাঁহাদের শ্রীলেখনীতে নদীয়া-নাথের মর্ম্মকথা, কর্ম্মপ্রথা রূপগ্রহণ করিয়া যুগ-যুগের অতৃপ্ত হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন করিল, যুগ-যুগান্তের নর-নারী-হৃদয়ে আনন্দ-রস নির্ঝরিণীর মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত করিয়া দিল।

এই আচার্য্য-বৃন্দের মধ্যে শ্রীপাদ বলদেবের জীবন-কথা সম্বন্ধেই যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রয়াস পাইব। তবে

ভক্ত-চিত্তের চরিত্রাঙ্কনে কতদূর সাফল্য লাভ করিব, তাহাই পদে পদে চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া পড়িতেছে। কোনো মহাপুরুষের জীবন-কাহিনী বিবৃত করিতে তিনিই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি, যাঁহার অনুরূপ-চরিত্রে আসক্তি জন্মিয়াছে। কিন্তু আমার ন্যায় অভাজনের সে যোগ্যতা কোথায়? তবে অনুপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা 'মধুর' মিষ্টতাকে বুঝাইতে হইলে যেমন 'চিনির মতো', 'গুড়ের মতো' ইত্যাদি বলিয়া দৃষ্টান্ত-সম্ভারে বুঝাইবার চেষ্টা পাইতে হয়, তদ্রূপ আমিও আজ, "ভারতবর্ষের" পাঠক-পাঠিকা সমক্ষে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সার্থক বৈরাগী, আচার্য্য বলদেবের অমর আলেখ্যখানি তুলিয়া ধরিবার প্রয়াস পাইতেছি।

বলদেবের গৃহস্থাশ্রমের বিবৃতি-সম্বন্ধে আজও সুধীবৃন্দ একমত হইতে পারেন নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে বাঙ্গলার অধিবাসীরূপে সজ্জিত করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ তাঁহাকে উড়িষ্যার বালেশ্বর মহকুমার অন্তর্গত রেমুণার নিকটবর্ত্তী এক পল্লী-অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। যাহা হোক তিনি খণ্ডায়েত বৈশ্য-বংশের এক কৃষক-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই বলদেব-হৃদয়ে ভক্তি-বীজ নিহিত ছিল। জীবনের ক্রম-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি-পথের পথিক হইবার ইচ্ছা তদীয় হৃদয়ে বলবতী রূপ ধারণ করে এবং ন্যায়-শাস্ত্র ও অপরাপর দর্শন অধ্যয়নান্তর তিনি ভক্তি-শাস্ত্র পাঠের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন। ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়, বলদেবের ভাগ্যেও ইহার ব্যতিক্রম হইল না। পীতাম্বর দাস নামক এক ভক্ত-প্রাণের সন্ধান করিয়া, তিনি তাঁহার নিকট ভক্তি-দর্শন পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। ভক্তি-শাস্ত্রের আস্বাদনে তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ-মধুর-রসোৎস উৎসারিত হইয়া পড়িল, ভক্তি-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য সততই তাঁহার প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবানও তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন, 'বেদান্ত-স্যমন্তকে'র বহুখ্যাত গ্রন্থকার ভক্তপ্রবর শ্রীমৎ রাধাদামোদর দাসের নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ভক্তপ্রবর রাধাদামোদর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ পরিবারের শিষ্য-সম্প্রদায়ভুক্ত এবং আচার্য্য বলদেব ইঁহাকেই তাঁহার ইষ্ট-গুরুরূপে গ্রহণ করেন,—

নিত্যানন্দ
|
গৌরীদাস পণ্ডিত (ঐ শিষ্য)
|
হৃদয় চৈতন্য (ঐ শিষ্য)
|
শ্যামানন্দ (ঐ শিষ্য এবং পরে শ্রীপাদ্ জীব গোস্বামীর আশীর্ব্বাদ লাভ করেন)
|
রসিকানন্দ মুরারি (ঐ শিষ্য)
|
রাধানন্দ (ঐ পুত্র এবং শিষ্য)
|
নয়নানন্দ (ঐ পুত্র এবং রসিক মুরারির শিষ্য)
|
রাধাদামোদর (ঐ শিষ্য)
|
বলদেব বিদ্যাভূষণ (ঐ শিষ্য এবং পরে শ্রীপাদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর কৃপালাভ করেন)

বলদেবের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে নন্দ মিশ্র এবং উদ্ধব দাসের নাম বি উল্লেখযোগ্য। বলদেব জয়পুর-রাজ জয়সিংহের (২য়) সময়ে বর্ত্তম ছিলেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবৎ-কাল।

বলদেব আকুল অন্তকরণে যখন শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হ'ন, ত তথায় ভারত-বিশ্রুত বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বর্ত্তম ছিলেন। বলদেব তাঁহারই শ্রীচরণসরোরুহে নিজেকে সমর্পণ কি শ্রীধামের লুপ্ত-শ্রী পুনরুদ্ধার তথা গোস্বামী-শাস্ত্রের পঠন-পাঠনের সুব্য করিয়া জগতে অনন্য সাধারণ প্রেম-সুধা বিতরণের জন্য বদ্ধপরি হইলেন।* অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সুবিধা-মানসে আবার তাঁহাকে কতি গ্রন্থ ও টীকা রচনা করিতে হইল,—

১। সাহিত্য-কৌমুদী
২। কৃষ্ণানন্দিনী (ঐ টীকা)
৩। গোবিন্দ-ভাষ্য
৪। সূক্ষ্মা (ঐ টীকা)
৫। সিদ্ধান্ত-রত্ন
৬। ঐ টীকা
৭। কাব্য-কৌস্তুভ
৮। গীতা-ভূষণ (গীতার-টীকা)
৯। রাধাদামোদর-কৃত ছন্দ-কৌস্তুভ গ্রন্থের টীকা
১০। প্রমেয়-রত্নাবলী
১১। কান্তিমালা (ঐ টীকা)
১২। রূপ গোস্বামি-বিরচিত স্তব-মালার টীকা
১৩। রূপ গোস্বামী কৃত লঘু-ভাগবতামৃতের টীকা
১৪। নামার্থ-শুদ্ধি (সহস্রনামের টীকা)
১৫। জয়দেব গোস্বামি-বিরচিত "চন্দ্রালোকে"র টীকা
১৬। সিদ্ধান্ত-দর্পণ
১৭। তত্ত্ব-সন্দর্ভের টীকা
১৮। রূপ গোস্বামীর "নাটক-চন্দ্রিকার" টীকা

ইহা ব্যতীত উপনিষদের উপরও তিনি কিছু কিছু টীকা করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।

আচার্য্য বলদেবের ন্যায় শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব য হইত, তাহা হইলে শ্রীবৃন্দাবনকে যে আজ আমরা কি ভাবে পাইতাম, তাহা শ্রীভগবানই জানেন। ভারতে বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য সুরক্ষিত। যমুনা-পুলিনে যে মোহন-বংশী ধ্বনিত হইল, সে সু বিশ্ব-কর্ণে গলিয়া গলিয়া জগজ্জনকে একেবারে প্রেমময় করিয়া শ্রীপ্রভু অদ্বৈত আচার্য্য আবার 'প্রেমের সেই রাজ-রাজেশ্বরের মধুকর জন্য খাত কাটিতে লাগিলেন', আর গৌরাঙ্গ-লীলায়, তাহার হইয়া দেশের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক-জীবনে একটা বিপ্লব ঘটাই

রূপ-সনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতি ষড়-গোস্বামিগণের শিক্ষাদর্শ ও জীবনাদর্শে তাহা পরিপূরিত হইয়া উঠিল, দস্যু-তস্কর-অধ্যুষিত বন-বিষ্ণুপুর সাধু হইল, খেতরীর মহা-মহোৎসবে সে প্লাবনের ঢেউ লাগিয়া সমস্ত দেশকে একেবারে ভাসাইয়া লইয়া গেল, শ্রীপাদ্ শ্যামানন্দ গোস্বামীর প্রেরণায় উড়িষ্যা-বাসীর জীবন-ধারায় বৈষ্ণবীয়-ভাব স্থিরত্ব লাভ করিল। তাই বলিতেছি, ভারতে বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য অবহেলার জিনিষ নহে। বাহুবল নয়, জিগীষা নয়, রাষ্ট্র-গৌরব নয়,—মধুর-রসালপদ প্রেম-ধর্ম্মকেই শ্রীবৃন্দাবন নয়ন-বারিতে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সু-মহৎ বীর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই জন্যই বুঝি সম্রাট্ আকবর ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন,—"ফকিরাবাদ"। কিন্তু কালের কুটিলা গতি—আওরঙ্গজেব ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া নাম রাখিলেন "মুমিনাবাদ", অর্থাৎ মহম্মদীয় ধর্ম্মবিশ্বাসীগণের বাসস্থান। তিনি বৃন্দাবনকে ধর্ম্মান্তরিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। শ্রীধামের 'শ্রী' লুপ্ত হইল—বৃন্দাবন দেবশূন্য, জনশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব ইহলোক হইতে অপসারিত হইলে বাহাদুর সাহ, জাহাঙ্গীর সাহ, ফারুক সায়র প্রভৃতি উত্তরাধিকারীত্রয় গৃহ-বিবাদে লিপ্ত থাকিয়াই তাঁহাদের ভব-লীলা সাঙ্গ করিলেন। তারপর আসিল মোহাম্মদ সাহ। তিনি ২৯ বৎসর কাল রাজত্ব করিলেন। ইঁহারই সময় জয়সিংহ (২য়) মথুরামণ্ডলের শাসন-কর্ত্তা হইয়া শ্রীধাম-সংস্কারে ব্রতী হইলেন। শ্রীপাদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীই * তখন শ্রীধামে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের একমাত্র বিশিষ্ট নিদর্শন। কিন্তু একা তিনি কি করিবেন? তাঁহার কাতর-ক্রন্দনে বুঝি শ্রীভগবান ব্যথিত হইলেন। অমনি তাঁহার যোগ্য-সহচরের আবির্ভাব হইল, কোথা হইতে বলদেব বিদ্যাভূষণ আসিয়া আবার তাঁহারই শ্রীচরণকমলে শরণ লইল। বিশ্বনাথ যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, বলদেবের সাহচর্য্যে গোস্বামি-শাস্ত্রের পুনরায় পঠন-পাঠনের সু-ব্যবস্থা করিয়া জয়পুর হইতে মোহাম্মদ সাহের সম্মতিক্রমে গোবিন্দজী, গোপীনাথজী প্রভৃতির প্রতিনিধি দেব-মূর্ত্তিগুলি শ্রীধামে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগতে অনন্ত-সাধারণ প্রেম-বিতরণের পথ পরিষ্কার করিলেন।

এই সেই বলদেব বিদ্যাভূষণ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বহুখ্যাত শেষ-নিদর্শন, শান্ত এবং সুন্দর—সেকাল ও একালের যুগ-সন্ধিক্ষণে দণ্ডায়মান হইয়া খনির মধ্যে মণির সন্ধান বলিয়া দিতেছে।

* মৎ-রচিত "বৈষ্ণবাচার্য্য বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৫১।

ব্ল্যাক আউট

শ্রীঅনিলকুমার বক্সী

ব্ল্যাক-আউটের যুগ। কৃষ্ণপক্ষের রাত। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে তারারা নিরুদ্দিষ্ট। বিরাট জংশন ষ্টেশনে মেল ট্রেনের অপেক্ষার্থী জনতাদের মধ্যে নীরেন। ট্রেন আসবার কোন লক্ষণই নেই দেখে ও একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারী সুরু ক'রে দিলে। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। চোখ ধাধান আলোর পরিবর্তে চোখ টাটান অন্ধকার! শুধু দূর অন্ধকারে সিন্দুগর্ভে রক্তবিন্দুর মত এক একটা আলো জল্ জল্ ক'রে জ্বলচে।

ট্রেনের অপেক্ষায় সকলের প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত ঠিক সে সময় স্থির লাইনদুটোতে শব্দের তুফান ছুটিয়ে একটা বিরাট অন্ধকারের স্তূপের মত ট্রেনটা এসে থেমে গেল।

সদ্য-আগত প্রাণীদের এবং উপস্থিত যাত্রীদের সম্মিলিত কোলাহল সঙ্গে সঙ্গেই নৈশ উর্দ্ধলোক পর্যন্ত চমকিত ক'রে তুলিল।

গাড়ীটা থেমেচে কি নীরেন অমনি ভীড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ল। নারী, শিশু, বোঁচকা-বুঁচকি সামনের যা' কিছু সব পদদলিত ক'রে দুই সবল বাহুতে সম্মুখের পথ মুক্ত ক'রে ও একটা থার্ডক্লাশ কামরার সামনে এসে উপস্থিত হ'লো।

সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মুষ্টিবদ্ধ হাত নো এড্‌মিশন্ মূর্ত্তিতে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

নীরেন দেখলে তাকে পুরোভাগে ক'রে তার পেছনে বহুলোক জড়ো হ'য়ে গেছে।

প্রতিপক্ষের অসংখ্য কিলচড়কে উপেক্ষা ক'রে গাড়ীর হাতলটার নাগাল পেতেই ও জবরদস্ত সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে গেল।

যিনি দরজার সম্মুখভাগ আগলে ছিলেন তাঁর নাকে একটা ঘুসি প'ড়তেই তিনি নাকিসুরে চীৎকার শুরু ক'রে দিলেন।—আজকালকার লোকের কী মিলিটারী মেজাজ! মিলিটারী যুগ কিনা!··· সামান্য একটু জায়গার জন্যে—এ্যাঃ, একেবারে রক্ত বের ক'রে দিয়েচে!

নীরেনও ছাড়বার পাত্র নয়। বল্লে—আপনারাও কম নন্ মশায়, সামান্য একজনকে একটু জায়গা দিতে হবে ব'লে তার মাথাটা আর একটুও আস্ত রাখেন নি!···

কিন্তু অতি পরিচিত কণ্ঠস্বরে রীতিমত সন্দেহের উদ্রেক হ'লো। টর্চ ফেলতেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

নীরেনের বাবা চীৎকার ক'রে উঠলেন—ঁ্যা, নীরু নাকি!

সঙ্গে সঙ্গেই কলের মত উত্তর হ'লো—বাবা আপনি!



সৈনিক

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার

ইতস্ততঃ মৃতদেহ চারিধারে পড়ে রয়েছে—বিকৃত, কুৎসিত, দুর্গন্ধময় আর ভয়াবহ। সভ্য মানুষের জিঘাংসা পশু-পক্ষীদলকে পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

ব্রহ্মদেশের সীমান্ত। অসমতল ভূমি। পাহাড়ের শিকড় যেন চারধারে ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্গম, দুস্তর, বিপদসংকুল পাহাড়ী বন। বাঘ ভাল্লুক, সিংহ ও বিষাক্ত সর্পকুল যে সভ্যমানুষের হিংস্রতায় কোথায় আত্মগোপন করেছে তার স্থিরতা নেই। গলিত শবের দুর্গন্ধে বন ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।

৩২ নং সেনাবাহিনী নিঃসাড়ে আত্মগোপন করে চুপি চুপি এগিয়ে চলেছে—সন্ত্রস্ত ও সন্দিগ্ধ। উঁচু হয়ে রয়েছে রাইফেলের সঙ্গিন। পিছন ফিরে তাকাবার সময় নেই। জাপানী-বাহিনী ঘাঁটি ছেড়ে চলে গেছে। অবিলম্বে তা' দখল করতে হবে এবং সেই ঘাঁটিটিকে ভিত্তি করে অগ্রগামী নূতন আক্রমণ সুরু হবে।

এই বাহিনীর পশ্চাতে পশ্চাতে চলেছে অফিসারদের ছোট একটি দল। আরও পশ্চাতে রয়েছে আরও একটি সেনাবাহিনী।

অফিসারদের মধ্যে ক্যাপ্টেন রঞ্জিত রায় ব্যতীত সকলেই শ্বেতাঙ্গ—ইংরেজ, আমেরিকান ও অষ্ট্রেলিয়ান।

ক্যাপ্টেন রায় প্রাণীহত্যা, শত্রুকে নির্মূল করবার ছল কৌশল ও শঠতার দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ গত দেড় বছরের মধ্যে সার্জেণ্ট থেকে ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত হয়েছে।

যারা মৃত্যুকে বরণ করে কিংবা মৃত্যুকে সম্মুখে রেখে জয়রথের পথ পরিষ্কার করে দিয়ে যায় তারা এগিয়ে গেছে। হয়ত কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে গেছে। সে দলের কতজন যে পথপ্রান্তে ধুলোয় মিশে গেছে তার হিসেব কেউ রাখেনি—রাখবার অবসর নেই এবং রাখতে গেলে অগ্রসর হওয়া যায় না। শান্তির দিনে পাইকারী ভাবে তাদের জন্য স্মৃতি স্তম্ভ রচিত হবে, বাধ্যতামূলক ভাবে দেশবাসী সমষ্টিগতভাবে অভিশপ্ত আত্মাগুলির জন্য নাটকীয় দৃশ্য তৈরি করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে, ধর্মমন্দিরে গিয়ে গান গাইবে এবং ভবিষ্যৎ দেশবাসীকে প্রস্তুত হবার জন্য জয়ধ্বনি করবে।

রঞ্জিত নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে ঘাঁটির দিকে দুর্গম

পাহাড়ী পথ ধরে। সৈনিক দল পথ করে গেছে, শত্রুর আক্রমণের বিশেষ কোন সম্ভাবনা নেই। তবু ভয় থেকে যায়; কারণ সভ্য মানুষ আইনগত ভাবে নরহত্যা করবার সর্বদিক উন্মুক্ত করে রেখেছে।

পথে ও বিপথে কত পরিচিত কত অপরিচিত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। নানা জাতি, নানা ভাষাভাষী ও নানা পরিচ্ছদধারী। খানিক দাঁড়াবার অবসর নেই। ফিরে তাকাবার সময় নেই। ভয়, দুর্বলতা, দয়ামায়া ভাবপ্রবণতা কোন কিছুরই স্থান নেই। এমন কি পিতামাতা, পুত্রকন্যা, স্ত্রী, সমাজ সংসার ও কোন প্রকার বন্ধনও নেই। অথচ এরাই সমাজ-জীবনে অপরের দুঃখে-শোকে কাতর হয়, কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় আঁৎকে উঠে। যাদের একটি মৃতদেহ দর্শনে অন্তর কেঁদে উঠত, তারাই এখন দিনের পর দিন কত সহস্র মৃতদেহ দলিত মথিত করে জিঘাংসার উন্মত্ততায় তাণ্ডব নৃত্য করে চলেছে। আজ সাম্যবাদ নেই, আন্তর্জাতিকতা নেই, অহিংসা নেই, মানবতা নেই—শুধু নীচতা, বর্বরতা, শঠতা আর হিংস্র ও কুৎসিততম হত্যা।

একদা যে ছিল শ্রেষ্ঠ বন্ধু, সে হয়ত রাষ্ট্রীয় বিরোধে চরম শত্রুতে পরিণত হয়েছে। যে হয়ত ছিল শিক্ষা-দীক্ষায় গুরু, জীবনের যোগে রচনা করে দিয়েছে প্রতিষ্ঠা, যার ঋণ জীবনে শোধ করা যাবে না তাকেই রাষ্ট্রের দাবীতে করতে হবে হত্যা। ইহাই সভ্যতার দান—গোঁড়া দেশভক্তির অভিশাপ। রাষ্ট্রের দাবীতে ব্যক্তিত্ব নেই, পৃথক সহানুভূতি নেই।

এই দেশভক্তিকে ভিত্তি করে কত সর্বজন-বন্দিত সাহিত্য রচিত হয়েছে। এই হিংস্র পাশবিক বীরত্বের কত জয়গাঁথা রচনা হয়েছে যুগে যুগে। কত লোক দেশভক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, কত কিশোর মন পররাজ্য-গ্রাস করবার বীরত্বের মোহে কিংবা দেশরক্ষার অজুহাতে সযতনে হত্যার বীজ অন্তরে রোপন করেছে।

রঞ্জিত নিঃশব্দেই চলেছে। সঙ্গীরা তাকে হাস্য-কৌতুকপরিহাসে টানবার জন্য চেষ্টা করেছে কয়েকবার, কিন্তু পারেনি। রঞ্জিত পারে না ওদের মত জীবনযাত্রাকে এত সহজ করে নিতে। হয়ত এর কারণ পরাধীনতা। স্বাধীনজাতি জীবন ও মৃত্যুকে যত সহজে খেলোয়াড়ী মনে গ্রহণ করতে পারে, পরাধীন জাতি তত সহজে পারে না। কারণ এদের পশ্চাতে নেই কোন নৈতিক চেতনাবোধ, নেই ভবিষ্যতের কোন উজ্জ্বল আলোক রেখা। তার রক্তে রয়েছে শুধু হিংস্র বীরত্বের মোহ, আর আর্থিক প্রেরণা।

একদল লোক চলছে মৃত সৈনিকদের সনাক্ত করে। একটি শত্রুপক্ষীয় মৃতদেহ খানাতল্লাসীর পর পাইকারী কবরে ফেলে দেবার আয়োজন চলেছে। এমন সময় রঞ্জিত সেখানে এসে পৌছাল।

বাঙ্গালীর মৃতদেহ দেখে রঞ্জিত প্রথমটা একটু থমকে গেল কিন্তু দাঁড়াল না, এগিয়ে চলল।

কিন্তু এ মৃতদেহটি যেন মনে হয় পরিচিত। পরিচিত না হলেও যেন পরিচিত লোকের সঙ্গে ভারি সাদৃশ্য রয়েছে। রঞ্জিত চলে যেতে পারল না—নিজের অজ্ঞাতেই মৃতদেহটির পাশে ফিরে এল। আশ্চর্য! মৃতদেহটির আকর্ষণ! কিন্তু কেন? এই কি স্বজাতির প্রতি অবচেতন মমতা? হয়ত হবে।

সঙ্গীরা অগ্রসর হয়ে যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের মৃতদেহ যেন শৃগাল কুকুরের মৃতদেহের মত পথের বুকে পড়ে থাকে।

রঞ্জিতের মনে হয় লোকটি যেন বহু পরিচিত। কিন্তু কিছুই স্মরণ হয় না। অথচ মনে হয়—কী যেন মধুর স্মৃতি রয়েছে বিস্ময়ে আবৃত হয়ে। অস্বস্তিতে মনটা ভরে উঠে—অন্ধকারে আলোক সম্পাত হয় না।

রঞ্জিত ডাইরী বহিটি চেয়ে নিল। সনাক্ত করবার কিছুই পাওয়া যায়নি—একটি শুধু আংটি পাওয়া গেছে। তাতে নামের আদি অক্ষরগুলি শুধু লেখা রয়েছে—বি-কে-সি।

রঞ্জিত পুনরায় চলতে লাগল। বি-কে-সি! কত নাম হতে পারে। বিমান, বিভূতি, বিবেকানন্দ, বীরেন্দ্র, ভূপেন, ভারত, বাণী, বিমল, বিনয়—উঃ, আরও কত নাম রয়েছে। চৌধুরী, চ্যাটার্জি, চক্রবর্তী, চাকলাদার, চাকী, চন্দ—কত উপাধি!

রঞ্জিত আর ভাবতে পারল না। একটি গাড়ির শব্দে চমকে উঠল। রঞ্জিতকে আত্মগোপন করতে হল না।

মিত্র পক্ষীয় একটি জিপ। তাকে তুলে নেবার জন্যই জিপটি এসেছে।

ঘাঁটিতে পৌছে রঞ্জিত রীতিমত অবাক হয়ে গেল। ঘাঁটিটি মাত্র বার ঘণ্টা পূর্বে দখল হয়েছে। জাপানীরা ছেড়ে যাবার সময় ঘাঁটিটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে গিয়েছিল। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই মিত্রপক্ষীয় লোকজন সেটিকে ক্ষুদে সহরে পরিণত করে ফেলেছে। অফিসারদের জন্য সারিসারি তাঁবু পড়েছে। খাট, টেবিল, চেয়ার, গালিচা, প্রভৃতিতে তাঁবুগুলি সুসজ্জিত হয়েছে। খাবার ঘর, পৃথক পৃথক বাথরুম সুসজ্জিত হয়েছে।

রঞ্জিত ক্লান্ত, বিপর্যস্ত। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে ক্যাম্পখাটে এসে লম্বা হল। মৃতদেহটির কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। ঘুরে ফিরে কেবল অতীতের কথাই মনে পড়ে। কোথায় কতদূরে যেন সে কি ফেলে এসেছে। তা যেন কত প্রিয়। প্রিয় স্মৃতিই রয়েছে জড়িয়ে, নতুবা গতানুগতিক এই সামান্য ঘটনা কেন বারবার বিস্মৃত স্মৃতির সমুদ্র মথিত করে তুলবে!

মন বিভ্রান্ত ও পর্যুদস্ত এবং শরীর অতিশয় অবসন্ন। বন্ধুদের এড়াবার জন্য রঞ্জিত চোখ বুজে থাকতে থাকতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। বেশিক্ষণ ঘুমাতে পারল না, সৈনিকদের হাসি-হুল্লোড়ে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

চারধারে চলেছে নাচ গান, খেলাধূলা। এদের দেখে মনে হয় না যে, এরাই বহু লোককে হত্যা করেছিল এবং এদেরই বহু সঙ্গী যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল। এদের দেখে মনে হয় না যে, এরাই যে কোন সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে—যে কোন মুহূর্তে শত্রু দ্বারা নিহত হতে পারে।

রঞ্জিতের মনে হল, এই ত' সৈনিকের জীবন। কোন ক্লেদ জড়তা নেই, কোন ভয় শংকা নেই, কোন শোক তাপ নেই, কোন দুঃখ বেদনা নেই—ইহারা মনে প্রাণে যেন মৃত্যুঞ্জয়।

হাউয়ার্ড সানফ্রান্সিকো অধিবাসী। রঞ্জিতের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব। হাউয়ার্ড কোন এক ফিল্ম গানের একটি কলি গাইতে গাইতে ভিতরে প্রবেশ করল। রঞ্জিতকে বলল, হ্যালো ক্যাপ্টেন র‍্যা, তোমার হল কি? সবাইকে এড়িয়ে চুপি চুপি ঘুমাচ্ছ, আর জেগে বিরস বদনে কি

রঞ্জিত সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আজ মনটা ভাল নয়।

তোমার ত' কোন বান্ধবী নেই, কোন চিঠিও পাওনি—আশ্চর্য!

মরা দেখে দেখে মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

হাউয়ার্ড হেসে উঠে বলল, পুরুষের মানায় না—এ দুর্বলতা নারীদের জন্য। তুমি পুরুষ, তুমি সৈনিক—জীবনটা ত' খেলা।

নরহত্যা খেলা!

শত শত মানুষ হত্যা করে বুঝতে পারছ না?

তুমি আমায় হত্যা করতে পার?

না পারি না, কারণ আমি আর তুমি মানুষ। মানুষ মানুষকে স্বাভাবিক অবস্থায় খুন করতে পারে না। এই যে হত্যা লীলা চলছে তা' কি মানুষ মানুষকে হত্যা করছে? নিশ্চয় নয়। দেশ দেশকে হত্যা করে। আমরা শুধু অস্ত্র। আমাদের শান দেয় দেশপ্রীতি। চল দু' পেগ টানা যাক্—তোমার সাময়িক ক্লৈব্য কেটে যাবে।

এমন সময় কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ অফিসার হৈ হৈ করতে করতে প্রবেশ করল!

একজন বলল, হাউয়ার্ড, তুমি হেরে গেলে। তুমি বলেছিলে পাওয়া যাবে না, কিন্তু তিনটির ব্যবস্থা হয়ে গেছে, আরও পাওয়া যেতে পারে। গাইড অপেক্ষা করছে, চল!

হাউয়ার্ড বলল, রক্ত পরীক্ষা হয়নি, জাপানীরা ছিল অনেকদিন ধরে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, তুমি বড্ড ভীতু। ভ্রাম্যমান দল কবে আসবে তার কোন ঠিক নেই—টু হাংরী, ভয় নেই, ওরা প্রফেসানাল নয়।

হাউয়ার্ড জিজ্ঞাসা করল, র‍্যা, তুমি নিশ্চয় যাবে?

রঞ্জিত বলল, না।

হাউয়ার্ড বলল, তোমার মনটা ভাল নয়। সৈনিকদের এত গোঁড়া হলে চলে না। যতক্ষণ বাঁচবে ততক্ষণ পূর্ণ মাত্রায় আনন্দ উপভোগ করে নেবে। আনন্দের মাঝেই আমরা দেশের জন্য মৃত্যু বরণ করব।

রায় বলল, আমায় ক্ষমা কর। আমি নীতি মেনে

গভীর রাত্রি।

সৈনিকগণ পালা করে নিঃশব্দে টহল দিচ্ছে।

রঞ্জিত ঘুমাচ্ছিল। কমেণ্ডারের আদেশে একজন এসে তাকে জাগিয়ে দিল। আশ্চর্য এক স্বপ্ন সে দেখছিল। ছাত্র জীবন শেষ করে সে গিয়েছিল ব্রহ্মদেশে ভাগ্যান্বেষণে। সে আজ প্রায় দশ বছরের পুরাতন কাহিনী। রেঙ্গুন থেকে সামান্য বেতনের কাজ নিয়ে তাকে যেতে হয়েছিল মেমিওতে।

রঞ্জিত তাড়াতাড়ি ইউনিফর্ম পরতে লাগল। তাকে এখনি একদল সৈন্য নিয়ে যাত্রা করতে হবে। একদল গরিলা বাহিনী একটি গুরুত্বপুর্ণ সেতু ধ্বংস করতে অগ্রসর হয়েছে। সেতুটি তাকে রক্ষা করতে হবে।

স্বপ্নের আবেশ তার কাটেনি। অসমাপ্ত স্বপ্নের কাহিনী মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মেমিওতে সে এক প্রবাসী বাঙ্গালীর বাড়িতে বাস করত। গৃহস্বামী ছিলেন অতিশয় ভদ্র ও সরল প্রকৃতিয়। ছোট্ট সংসার—স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা। এক পুত্র বিমল চ্যাটার্জি ছিল তার সহকর্মী এবং বিশেষ বন্ধু। দেশ স্বাধীন করবার রঙীণ স্বপ্ন তাদের বন্ধুত্বকে প্রগাঢ় ও অকৃত্রিম করেছিল। তাদের দেশ স্বাধীন করবার স্বপ্নে বিমলের বোন সুলেখাও যোগদান করত। সুলেখার বয়স তখন ষোল কি সতের ছিল। কী সুন্দর ছিল তার গভীর কালো চোখ দুটি।

দ্বিতীয়বার আদেশ আসতেই রায় গিয়ে কমাণ্ডারের টেবিলের সুমুখে স্যাল্যুট করে দাঁড়াল।

আদেশপত্র আর ক্ষুদ্র সেনাদল নিয়ে রঞ্জিত বেরিয়ে পড়ল। ভয়ংকর অন্ধকার রাত্রি। আকাশে মেঘের ঘনঘটা, যে কোন মুহূর্তে ঝড় উঠতে পারে। ঘন ঘন বিদ্যুতের তীব্র ঝলকানীতে চোখে ধাঁধা লাগছে। জমাট বাঁধা ঝোপ ঝাড়, কাঁটা বনের মধ্য দিয়ে পথ চলেছে। প্রয়োজনে তৈরি পথ, নদীর ধারে, জলাশয়ে এবং ঘন বনের মাঝে বার বার হারিয়ে যায়। পথ প্রদর্শককে কেন্দ্র করে সেনাদল সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে।

কী ভয়ংকর জঙ্গল, কী দুর্গম ও কষ্টসাধ্য পথ। মেঘাড়ম্বরে গভীর স্তব্ধ নিশা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

কে জানে কোথায় কোন ঝোপে হিংস্র পশু শিকারের সন্ধানে ওৎপেতে বসে রয়েছে। গরিলা দল অভ্যর্থনার জন্য পথের মধ্যে প্রতীক্ষা করছে কি না তাই বা কে জানে।

এই কী জীবন! মৃত্যু নিয়ে খেলাই কী মানুষের জীবন! স্বপ্নটা কি শুধু মিথ্যা? এই মিথ্যা স্বপ্নও কি সত্য হতে পারত না। কিন্তু হল না। বর্ণ ভেদ রচনা করল এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর—দু'টি জীবনই ব্যর্থ হয়ে গেল।

দেশ স্বাধীনতার পবিত্র আবেষ্টনীর মাঝেই দুটি প্রাণ মিলিত হয়েছিল। সে মিলন কেন পূর্ণ হল না, কেন সার্থক হল না?

সৈন্য দল এগিয়ে চলেছে। এরা বীর—নেই কোন ভয়, নেই কোন শংকা, নেই কোন ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান। যেন দম দেওয়া কলের পুতুল।

এরাই ত' সৈনিক। সঙ্গী শত্রুর গুলিতে ধরাশায়ী হয় মৃত্যু যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে। হয়ত দেহের এক অংশ উড়ে যায়, ফিনিক্ দিয়ে রক্ত বেরুতে থাকে। 'জল' 'জল' বলে কী ভয়াবহ, কী মর্মন্তুদ চীৎকার ধ্বনিত হয় চতুর্দ্দিকে। কে দেবে জল! মৃত্যুর তাণ্ডব লীলা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর্তনাদ যায় বর্বরতার ঘর্ঘর শব্দে তলিয়ে।

এরাই ত সৈনিক। বন্ধুর মুখ ও হাত পা হয়ত বোমাতে উড়ে যায়, সারা অঙ্গ ঢেকে যায় জমাট বাধা রক্তে—মানুষ বলে চেনা যায় না। বন্ধুকে মুহূর্ত্তে কাঁধে তুলে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে—তারপর হয়ত খানিক পরেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

রঞ্জিত ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলে যন্ত্র-চালিতের মত। কী দুর্গম ও বিশ্রী পথ। প্রতি পদক্ষেপে স্বপ্নের মায়া কেটে যায়।

সুলেখা এখন কোথায়? হয়ত তার বিয়ে হয়ে গেছে। হয়ত সে স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে সোনার সংসার রচনা করেছে। আর সে সহায়সম্পদহীন স্রোতের মুখে বছরের পর বছর ধরে কোথায় ভেসে চলেছে।

সুলেখার কি কখনও কোন বিশেষ অবস্থায়ও তার কথা মনে পড়ে না? হয়ত পড়ে না। কত দিনের কত পুরাতন স্মৃতি। যেমনি শোকে দুঃখে, দারিদ্র্য আর জীবনের পরাজয়ে তার অতীত ডুবে গেছে ব্যর্থতার বিষাদে, তেমনি করেই হয়ত সুলেখারও প্রথমরাগ নূতন দাম্পত্য-প্রেমের আনন্দে ও জীবনের জয়ছন্দে তলিয়ে গেছে।

বিমলই বা এখন কোথায়? বি-কে-সি কি বিমল নয়? না, না—এ ত' শুধু স্বপ্ন, মিথ্যা স্বপ্ন। বিমল নয়, বিমল মরতে পারে না, সুলেখার বিয়ে হতে পারে না। এ মিথ্যা।

আধ ঘণ্টার রাস্তা তারা প্রায় দু' ঘণ্টায় অতিক্রম করে লক্ষ্যস্থলে পৌছল। সেতুটির সন্নিকটে তারা নদীর তীরে এক জঙ্গলে আত্মগোপন করল। নিস্তব্ধ রাত্রিতে নদীর গর্জন ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছে। বর্ষার জলে নদীটি কূল ছাপিয়ে উঠবার প্রতীক্ষা করছে। যে কোন সময় প্লাবিত হতে পারে। পিচ্ছল পথ, একবার অসতর্ক মুহূর্তে ক্ষিপ্ত নদীবক্ষে পিছলিয়ে পড়লে বাঁচবার উপায় নেই।

অবসাদক্লান্ত নিদ্রালু শয্যা ত্যাগ করে যারা ভয়ংকর ও দুস্তর পথ অতিক্রম করে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে তারা সৈনিক।

আর যারা নিশ্চিন্ত মৃত্যুকে বরণ করে সেতুটিতে ডিনামাইট বসাতে এগিয়ে এসেছে তারাও সৈনিক।

এ কি আত্মদান না আত্মনিগ্রহ? এরা কেন এমনিভাবে আত্মনিগ্রহ করে? রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘর্ষ—জনসাধারণ কেন প্রাণ দেয়—প্রাণ গ্রহণ করে। বর্ণনাতীত দুঃখ দুর্দশায় ত' জনসাধারণকেই পড়তে হয়। এ কথা জেনেও এরা কি করে পাপ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে? এই আত্মনিগ্রহের মূল্য ত পররাষ্ট্রগ্রাস কিংবা পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক শঠতা ও বর্বরতায় অর্জিত স্বৈরাচারপূর্ণ জমিদারী সংরক্ষণ! মানুষকে মানুষ খুন করে বর্বর ক্ষমতা লাভের জন্য,সভ্য রাষ্ট্র কি করে মৃত্যু নিয়ে এমনিভাবে ইতরমি করতে পারে।

এরাই সৈনিক। কেন জীবন দেয় এবং সংহার করে পশুর মত জীবন—তা' এরা জানে না। ভ্রান্ত দেশপ্রেম ও ব্যক্তিত্বহীনতা, বিবেকবুদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্যহীন পশুর মত ধ্বংসযজ্ঞে বলিদান করে। ইহাই রাষ্ট্রনীতি—ইহাই সভ্যতা। যে যত ব্যাপকভাবে—মনুষ্যসমাজ, ধনসম্পত্তি, ঐতিহ্য, শিল্প ধ্বংস করে অপরকে পদানত করতে পারে—সেই তত বড় ও সভ্য এবং বিশ্ব-আইনকানুনের নিয়ন্তা।

এমন নিকষ কালো দুর্যোগভরা রাত্রে ক্ষিপ্ত নদীবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী ভাসিয়ে কোন লোক যে বিরাট একটি সেঁতু উড়িয়ে দেবার জন্য আসতে পারে তা' রঞ্জিতের ধারণাতীত ছিল। কোন লোক সজ্ঞানে এমন নির্বোধ দুঃসাহস প্রকাশ করতে পারে না। অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ একটি ডিঙ্গী প্রবল স্রোতে ভেসে এসে পুলের থামে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে তলিয়ে গেলএবং একটি বোমার বিস্ফুরণ হল। বিস্ফুরণের শব্দে রঞ্জিত সচকিত হয়ে সেতুর নীচে সার্চ লাইট ফেলতেই বিস্মিত হয়ে গেল। এক দল লোক সেতুর থামে থামে বোমা, ডিনামাইট প্রভৃতি স্থাপন করে যাচ্ছে। এই ক্ষুদ্র দলের যে নেতৃত্ব করছে সে একজন মহিলা। মহিলাটির দিকে তাকিয়ে রঞ্জিত শিহরে উঠল। স্বপ্নের নায়িকা কি করে বাস্তবরূপ ধরে চোখের সুমুখে শত্রুরূপে দেখা দিল। তবে কি এখনও স্বপ্নের ঘোর কাটেনি!

মুহূর্ত বিলম্ব চলে না, শত্রুরা সংখ্যায় মাত্র পাঁচ জন। পাঁচ জনকেই হঠাৎ একসঙ্গে হত্যা করতে হবে, যাতে ডিনামাইট বিস্ফুরণ করবার অবকাশ না পায়।

অতি সতর্কতার সঙ্গে গুলি বর্ষিত হল এবং ঝপ্ ঝপ্ শব্দ করে লোকগুলি নদীবক্ষে ছিটকে পড়ল। মৃতদেহগুলির আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেতুটি রক্ষা পেল। রঞ্জিতও সেতুর উপর উঠে এল এবং ডিনামাইট ও বোমাগুলি সরিয়ে ফেলবার জন্য আদেশ দিল।

হঠাৎ দেখা গেল একজন মহিলা-সৈনিক দ্রুত অপর তীর অভিমুখে চলে যাচ্ছে এবং ছোট ছোট কতকগুলি বোমা সেতুর উপর রেখে যাচ্ছে। রঞ্জিত আর বিলম্ব করল না, রাইফেল তুলে গুলি ছুড়ল। মহিলাটি কোনরূপ কাতর শব্দ না করে ওপারে ছিটকে পড়ল এবং পরমুহূর্তে অদূরে স্থাপিত বোমা লক্ষ্য করে কম্পিত হস্তে রিভলবার তুলে গুলি চালাতে লাগল।

বোমা ও ডিনামাইটগুলি বিকট শব্দে বিস্ফুরিত হতে লাগল এবং সেতুটি টুকরো টুকরো হয়ে চতুর্দ্দিকে ছিট্‌কে পড়তে লাগল।

সব যখন শান্ত হল তখন ওপারে একটি নারীদেহ বিক্ষিপ্ত ভগ্ন সেতুর নীচে পাওয়া গেল। একটি পা দেহচ্যুত হয়ে কোথায় যে উড়ে গেছে খুঁজে পাওয়া গেল না। মাথাটা থেঁত্‌লে গেছে, একটি বাহু চর্মের বন্ধন ছিন্ন করবার

দু'বার এসে ঘুরে গেছি।



অবকাশ না পেয়ে ঝুলে আছে। জমাট রক্তে বিকলাঙ্গ মৃতদেহটাকে বীভৎস ও ভয়াবহ করে তুলেছে।

দেহ তল্লাসীতে একটি পরিচয়জ্ঞাপক ভগ্ন কার্ড পাওয়া গেল। তাতে লেখা রয়েছে শ্রীমতী সুলেখা চ্যাটা··· ············ঝান্সী·········

বীভৎস দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে রঞ্জিত সরে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সুলেখার নাম শুনে সে আঁত্‌কে উঠল, সর্বাঙ্গ তার হিমশীতল পরশে যেন শিথিল হয়ে যেতে লাগল।

এও কি শুধু মাত্র স্বপ্ন, শুধু মাত্র জাগরণে মিথ্যা দুঃস্বপ্নের কুহেলিকা! নিদ্রা শেষে এ দুঃস্বপ্ন কি মিথ্যা হয়ে যাবে না?

সৈনিক জীবন চরম বাস্তব, এর কোথায়ও কোন মিথ্যা লুকিয়ে থাকে না।

শ্রবণ বেলগোলা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

মহীশুর রাজ্যে প্রাচীন শিল্পের যে সব নিদর্শন আছে, তাদের মধ্যে জিন শ্রমণ গোমত রায়ের প্রস্তর মূর্ত্তি অন্যতম। প্রায় পাঁচশত ফুট উচ্চ এক পাহাড়ের শিরে মন্দির। তার প্রাঙ্গণে ৫৭ ফুট উচ্চ নিগ্রন্থ মুমুক্ষুর প্রস্তর মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি দেখা যায় বহু দূর হ'তে। মনে হয় যেন শৈলেরই একটা শিখর।

রোড্‌সের কলোসাস বিদ্যমান নাই। সুতরাং তার বৃহত্ত্বের পরিমাপ কতটুকু ইতিহাসমূলক, আর কতটুকু কল্পিত সে কথা বলা কঠিন। ভারতবর্ষের বাহিরে মাত্র দুটি অতি বৃহৎ প্রস্তর মূর্ত্তি বিদ্যমান। উভয় মূর্ত্তিই মিশরের। দ্বিতীয় রমেসিস্ ভূপালের সমাধি মন্দিরের উপর এ মূর্ত্তি আছে ৫৭ ফুট উচ্চ। মূর্ত্তি আন্দাজ খৃষ্টের সাড়ে বারো শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হ'য়েছিল। আমাদের গোমত রায় এই অপূর্ব্ব দ্বিতী রমেসিস মূর্ত্তির সমান উচ্চ।

থীব্‌সের নিকট নীল নদীর তীরে মিশরের দ্বিতীয় অতিকায় মূর্ত্তি ৬ ফুট উচ্চ। কিন্তু যে পুস্তক এই মাপ লিপিবদ্ধ করেছে, তার মতে গোমত রায়ের উচ্চতা ৭০ ফুট। এ হিসাবে ভারতের বিরাট মূর্ত্তিই প্রথম স্থানে যোগ্য। এ মূর্ত্তি সৃষ্টি হ'য়েছিল খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতকে। শিল্পরমা

দক্ষিণে আবু সিম্বেল মন্দিরে দ্বিতীয় রমেসিসের ৬৫ ফুট উচ্চ যুগ্ম মূর্ত্তির প্রত্যেকটি ঐ পুস্তকের বর্ণনায় ৬৫ ফুট। আফ্‌গানিস্থানে বুদ্ধদেবের একটি উৎকীর্ণ মূর্ত্তির উচ্চতা শত ফুট।

গোমত রায়ের মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য, শিল্প-নিপুণতা এবং অপূর্ব্ব ভঙ্গী ভাস্কর-বিদ্যার এক অসাধারণ সাফল্য। আমি যখনই কোনো পাথরের মূর্ত্তি বা কমনীয় পুতুল দেখি, তখনই মনে হয় প্রস্তরশীলাকে কঠোর বা নীরস বলা সত্যের অপলাপ। মানুষ শিল্পী শীলা-খণ্ডে নিজের মনের আদর্শ সুন্দরকে প্রকৃষ্টভাবে রূপ দিতে পারে। আলেখ্য কথা কয়। কিন্তু পাষাণ দেবতাও কথা কয় আপামর সাধারণের সঙ্গে। চিত্র হ'তে সম্যক আনন্দ লাভ করতে দর্শকের চক্ষুকে শিক্ষা দিতে হয়। বৃহদায়তন গোমত রায়ের



তোরণ

মুখের প্রসন্ন, সরল, নিষ্পাপ ভাব মানুষের উপর মানুষের শ্রদ্ধা বাড়ায়। পুঁথি-পড়া পণ্ডিতকে স্বীকার করতে হয় শিল্পীর কাব্য, কলমে লেখা নয়, হাতুড়ী, ছেনী এবং বাটালীতে প্রকটিত অন্তস্তলের উদ্বুদ্ধ কবিতা।

জৈন তীর্থঙ্কর পুরুদেবের পুত্র ছিলেন গোমত রায়। তাঁর আজানুলম্বিত বাহুর জন্য তাঁর নাম ছিল ভুজবলী বা বাহুবলী। পিতার সিংহাসনে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভরতকে অধিষ্ঠিত হ'তে না দিয়ে বাহুবলী রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু ক্ষাত্রধর্ম্ম হ'তে তাঁর মনে অধিক প্রতিষ্ঠিত ছিল দেবত্ব। তিনি জ্যেষ্ঠের হাতে জিত রাজ্য প্রত্যর্পণ ক'রে, নিজে সিদ্ধিলাভের জন্য বনে গমন করেছিলেন। তার পর তিনি শ্রমণ হন।

কখন্ কবে ঘটেছিল তা নির্দ্দিষ্ট রূপে বলবার ধৃষ্টতা আমার নাই। দু'বার এসে ঘুরে গেছি। প্রত্ন-তত্ত্ববিদের বিচারও সকল ক্ষেত্রে আমাকে অভিভূত করে না। সন, মাস, তারিখের উপর অনন্ত-চাওয়া হিন্দু কোনো দিন নির্ভর করে নি—তাদের সাহিত্যে, দর্শনে, পুরাণে বা ইতিবৃত্তে। যেখানে ভারতবর্ষের জীবনের পথে বাহিরের কোনো প্রাচীন জাতি দেখা দিয়েছে, সেই বিদেশী জাতির বর্ণনা হ'তে কতকগুলা ঐতিহাসিক কালের সময় নির্দ্দেশ করতে পারা যায়। বেদে, মহাভারতে এবং পুরাণে উল্লিখিত নক্ষত্রপুঞ্জের বর্ণনা হ'তে কোনো কোনো মনীষী কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ প্রভৃতির সময় নির্দ্ধারণ করেছেন। মনীষা এবং অঙ্কের দেবতা প্রণম্য।

শ্রবণ বেলগোলায় কবে শ্রমণ গোমত রায়ের অতিকায় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার হিসাব মহীশূরের প্রত্নতত্ত্ববিদেরা স্থির করেছেন। শিলা-লিপিতে ব্যক্ত যে গোমত রায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গাঙ্গেয় রাজবংশের



গোতম রায়-মূর্ত্তির উর্দ্ধাংশ

রাজমল্ল সত্যবাক্য ভূপতির মন্ত্রী চামুণ্ড রাজার আদেশে। ঐ ভূপতির রাজত্বকাল গণনা ক'রে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে খৃষ্টীয় ৯৮৩ সালে এই বিশাল মূর্ত্তি নির্ম্মিত হ'য়েছিল।

শ্রবণ বেলগোলা তীর্থ-ভূমি দর্শন এবার মহীশূর যাওয়ার আমাদের অন্যতম কারণ ছিল। দশেরার উৎসবঘোরে মগ্ন থাকে মহীশূর। সহরের আনন্দ যখন একটু কম হ'ল, হোটেল মেট্রোপোলের শিষ্ট কর্ম্মাধ্যক্ষ লোবো সাহেব পরামর্শ দিলেন অচিরে শ্রবণ বেলগোলা যাবার। কানাড়ী ভাষায় বেলগোলা মানে শ্বেত-সরোবর। স্থানটি মহীশূর সহর হতে ৬২ মাইল দূরে।

প্রত্যেক হোটেলের আশ্রিত এক একজন সর্ব্ব-কর্ম্মের মুরুব্বী থাকে। সে যাত্রীকে যত্ন ক'রে সুবুদ্ধি দিয়ে তার সহায়তা করে, আর নিজের যৎকিঞ্চিত লাভের সুবিধা করে। মহীশূরের রাজ-হোটেল মেট্রোপোল। তার যাত্রীর সহায় পাঠান।

পাঠানের নাম কেহ জানে না। সে মালাবারের লোক। কবে তার বংশের কে টিপুসুলতানের ফৌজে কাজ করত। সেই ঐতিহ্য পাঠানের গৌরব।

তার দু'খানা মোটর গাড়ি আছে, আর দু'খানা টাঙ্গা। প্রত্যেকটি তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে। সদাই হোটেলের বাগানে পাঠান মিঞা দাঁড়িয়ে, যাত্রীদের মেজাজ এবং আবশ্যক বুঝে যানবাহনের বন্দোবস্ত করে। তার বক্তৃতা মেয়েমহলেই বেশী।

আমার স্ত্রীর কাছে বক্তৃতা দিয়ে পাঠান আমাদের বহু তীর্থ করালে। সে উর্দ্দু বলে। আমার স্ত্রীকে বোঝালে—মায়িজী শ্রবণ বেলগোলামে পীরকা মূরত একশো ফুট উঁচা। উঃ! কেয়া খোদাকা মেহের বাণী আওর হামারা মুলুককা খোদাইবালাকা বাহাদুরী।

কিন্তু বাহাদুরী দেখাতে সে কম গাড়ি ভাড়া নেবে? মাত্র তেলের দাম, টায়ারের লোকসান ইত্যাদি হিসাব করে মাশুল ধার্য্য করলে দেড়শত টাকা। শেষে রফা হ'ল ১২৫৲ টাকায়—৭২ মাইল পথ যাওয়া আসা।

দিনটা ছিল মেঘলা আর ঠাণ্ডা। আমাদের নাত্‌নী শমিতাকে ভুলিয়ে দাসী চাকরের জিম্মায় রাখবার ব্যবস্থা হ'ল। তখন মহীশূরে শিল্প-প্রদর্শনী হ'চ্ছিল। খুঁকু সেখানে পুতুল কেনবার আশায় বিশেষ উপদ্রব করলে না। হোটেলের ম্যানেজার খাবার দিল সঙ্গে। পাঠান তার ড্রাইভারকে কানাড়ী ভাষায় যা' বলবার বোলে, শেষে উর্দ্দুতে বল্লে—খবরদার মায়িজী-লোককা কুছ্ তক্‌লিফ্ নেহি হোয়। সেরিঙ্গাপটাম ভি দেখ্‌লায় দেঙ্গা।

তার ভাষা ব্যাকরণশুদ্ধ নয়।

ভোরের আলোয় মেঘে ঢাকা আকাশের নীচে, সুন্দর রাজপথে যেতে যেতে বুঝলাম, দেশের রাজা যদি মঙ্গলকামী হয়, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে লড়িয়ে দেবার স্বার্থান্ধ লোক যদি দেশে না থাকে, ভারতবাসী অল্পে তুষ্ট হ'য়ে স্বর্গসুখে নিজের জন্মভূমিতে বাস করতে পারে। কাবেরী নদীকে বেঁধে, রাজ্যময় খাল কেটে, মহীশূর ধনধান্য পুষ্পভরা। হরিতক্ষেত্র কাঁচা ধানের উপহার মাথায় নিয়ে আনন্দে দোল খাচ্চে। দেশের কৃষক-পত্নী, কুলি-রমণী, গোয়ালিনী এবং উকীল-ঘরণী সবাই রঙীণ সাড়ি ভূষিতা। সকলেরই মাথায় বেণীমূলে ফুল গোঁজা। প্রত্যেক গ্রামে চিকিৎসালয়, প্রসূতি বিরামাগার, এমন কি দুচার গ্রাম অন্তর পশু-চিকিৎসার ব্যবস্থা। নয়। কিন্তু ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে কুটীরগুলি শান্তির আগার। অন্ততঃ আমাদের সবার মনে সেই ধারণা জন্মেছে এবং বাহিরের সকল লোক ঐ কথাই কয়—ইংরাজ অবধি।

আমার পুত্র এবং পুত্রবধূ দুবছর পূর্ব্বে শ্রবণ বেলগোলা গিয়েছিল উটী হ'তে। তখন থেকে তাদের সখ আমাদের সেই গৌরবস্থল না দেখিয়ে পৃথিবী হ'তে বিদায় নিতে দেবে না। কুড়ি মাইল যাবার পরই পুত্র একটা দূরের পাহাড় দেখিয়ে বল্লে—বাবা ঐ ইন্দ্র পাহাড়। বধূমাতা একটু সন্দিগ্ধ নয়নে তার দিকে তাকাল।

দূরে পাহাড়ের মাথার উপর যেন একটা শৃঙ্গ। তার পাশে আর একটা পাহাড়। ছবি দেখে আমার যা জ্ঞান হয়েছিল সে অভিজ্ঞতা আমায় নিঃসন্দেহ করলে ইন্দ্রগিরি সম্বন্ধে। অতঃপর গাড়ি হ'তে এক



সোপান পথে ডুলি

মাঠে নেমে সারথীর সাক্ষ্যগ্রহণ ক'রে স্থির করা গেল যে পাহাড়ের মূর্ত্তি আপাততঃ গিরিশৃঙ্গ রূপে প্রতীয়মান।

তারপর মাঝে মাঝে সে দৃষ্টির বাইরে যায়, আবার অবসর মত নয়নপথে পড়ে। ইতিমধ্যে মাঠের শোভা দেখি, বনের দৃশ্যে পরিতৃপ্ত হই, এবং গ্রামের সুখদুঃখের কল্পনা করি।

অখণ্ড হিন্দুস্থানের একটা অসুবিধা মাদ্রাজী নাম, বিশেষ স্থানের। মাদ্রাজ হতে বাঙ্গালোরের পথেই আছে বিল্লীভক্কম। যাক্ সে কথা। শ্রবণ বেলগোলার সন্নিকটে ছন্নরায়পাটন। বেশ পরিষ্কার ছোটো সহর। তারপর আবার মাঠ, খাল, বিল, অবশেষে শ্রবণ বেলগোলা। যত কাছে অগ্রসর হলাম, ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করলে ক্ষপণকের মূর্ত্তি।

পাঁচশত সোপান। ওঠবার মুখে ফটক। দুখানা পাথরের থামের মাথায় একখানা [illegible] পাথর।

[illegible] জগদম্বা মা চামুণ্ডার কৃপায় দিনটা ছিল মেঘলা। তবু [illegible]ড়ি ভাঙ্গতে হ'বে। স্ত্রীর পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু দুর্ব্বলের মনের বল [illegible] পারব বলেন তিনি।



চামুণ্ডা পাহাড়ের নন্দী

অতঃপর সমবেত ভদ্র-মণ্ডলী অবোধ্য ভাষায় যে সব কথা বল্লে দ্বিভাষী ড্রাইভারের সাহায্যে বুঝলাম যে তাদের অর্থ ডুলি আসছে। কিন্তু যখন ডুলী এলো, তার সঙ্গে এলো হাঁসি, পাগলের হাঁসি, অশিষ্টের হাঁসি। একটা ছোট রেলিঙ-ঘেরা চারপাইকে বাঁশে দোলানো। সেই বাঁশে কাঁধ দেবে ডুলী-বাহক। কিন্তু যাঁর জন্ত এ ব্যবস্থা তিনি বিদ্রোহিণী। শেষে আমাদের দু'বার [illegible] বসলেন। সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য আমাদেরও পথের কষ্টকে হ্রাস করলে। ফাঁসিকাঠের আকারের প্রবেশ পথ পার হয়ে প্রায় দুশো ফুট উচ্চে একটি ছোট মন্দির আছে। দর্শনের অজুহাতে সেখানে একটু বিশ্রাম করলাম। কিন্তু যখন শৈলশিরে উঠে গোমতেশ্বরের পূর্ণ দর্শন পেলাম, সকল কথা ভুলে গেলাম বিস্ময়ে। কারণ—

মূর্ত্তির উচ্চতা	৫৭ ফুট
শ্রীচরণ	৯ ফুট
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ	২ ফুট ৯ ইঞ্চি
অর্দ্ধেক জঙ্ঘা	১০ ফুট
কোমর	১০ ফুট
মধ্যম অঙ্গুলী	৫ ফুট ৩ ইঞ্চি

অথচ এই বিরাট প্রস্তর মূর্ত্তির মুখ প্রসন্ন, অন্তরের জ্ঞানে দীপ্ত, শিশুর মত সরল, দেবতার মত সুখ-দর্শন। সিদ্ধির শান্তি এবং সংযত-চিত্ত মানুষকে কত সুন্দর করতে পারে, সেই পরিকল্পনা মূর্ত্ত হয়েছে এই পাষাণ-মূর্ত্তির গঠনে।

মাঝে প্রাঙ্গণ। চারিদিকে বারান্দা। তার পিছনে তিনদিকে ছোট ছোট মন্দির-প্রকোষ্ঠ। যেমন এদেশের চক-মিলানো অট্টালিকা হয়। প্রত্যেক মন্দির-গৃহে এক একজন জিন-অর্হতের মূর্ত্তি—ধ্যানী মূর্ত্তি। বুদ্ধদেবের এবং জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি-রচনার আকার এবং প্রকারে প্রভেদ আছে। এ তীর্থ-দিগম্বর সম্প্রদায়ের, তাই প্রত্যেক মূর্ত্তি নির্গ্রন্থ। মূর্ত্তিগুলি কন্নাদ হৈশাল শিল্পের সুনৈপুণ্যের মনোরম নিদর্শন। ঋষিদের নাম লেখা আছে প্রত্যেক মন্দির-কক্ষে। প্রাঙ্গণে বিরাট মূর্ত্তি বিদ্যমান না থাকলে শিল্প-প্রিয়ের এই চব্বিশটি মূর্ত্তিই আনন্দের কারণ হ'ত। আমি ভক্তদের কথা বলছি না।

চব্বিশটি তীর্থঙ্কর—আদিশূর, অজিত-নাথ, সম্ভব, অভিনন্দন, সুমতি-নাথ, শ্রেয়াংশ, বাসুপূজ্য, বিমলনাথ, অনন্তনাথ, ধর্ম্মনাথ, শান্তিনাথ, কুন্তুনাথ, অরনাথ, মল্লীনাথ, মুনিসুব্রত, নমিনাথ, নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ, বর্দ্ধমান।

পরে একথা নিয়ে আমার সঙ্গিনী মহিলাদ্বয়কে পরিহাস করেছিলাম। জীবন্ত এবং গতায়ু মানুষের পূজার নিয়ম এক। ধন, মান, যশের আয়তনে জীবিত মানুষ আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। অবশ্য দেবতা পরি

কল্পনায় মনকে শিখিয়ে, নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির আশারূপ ঘুষ দিয়ে ঋষিরা আমাদের অন্তঃকরণকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধিদাতা গণপতির প্রণাম এবং পূজার ব্যবস্থা করেছেন। মন্দির গৃহে যে চতুর্দ্দশ ঋষির মূর্ত্তি আছে, তাঁরা সাধনবলে অমরত্ব লাভ করেছেন, তাই এঁরা জিন-ভগবান। কিন্তু প্রাঙ্গণের অতিকায় মূর্ত্তি প্রথমেই আমাদের শ্রদ্ধার দাবী করলেন, আয়তনের বিশালতায়। মহিলারা গোমতরায়ের বিরাট পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লেন— পরিবারের শান্তি, স্বাস্থ্য এবং শ্রীবৃদ্ধির বিরাট আশীর্ব্বাদ লাভের প্রত্যাশায়!

গোমতেশ্বরের সিদ্ধিলাভের ঐতিহ্যকে রূপ দেবার জন্য তাঁর মূর্ত্তির প্রকাণ্ড পায়ের দুপাশে পাহাড়ের চিত্র। তার গহ্বর হ'তে সর্পভুক গোধা উপাদান হিংসা। হিন্দুশাস্ত্রই কাম, ক্রোধ প্রভৃতিকে ষড়রিপুও বলেছে এবং মেনে নিয়েছে যে এরা মানুষের স্বধর্ম্ম।

গোমতরায়ের মূর্ত্তির পা বয়ে গাছের ডালপাতা উঠেছে। তাঁর পার্শ্বের চামরধারিণী নারী-মূর্ত্তি সৌন্দর্য্যের উৎকৃষ্ট পরিকল্পনা। বলা বাহুল্য পরিবেশকে সমীচীন না করলে, শিল্প ফোটে না। বারান্দার ছাদের পাথরের টালির খোদাই মূর্ত্তিও মধুর। একখানি চিত্রের নিদর্শন দিলাম এই প্রবন্ধে। মন্দির প্রান্তরে প্রবেশের তোরণ [illegible] পাথর কেটে নির্ম্মিত।

ইন্দ্রগিরি পাহাড়ে দেখবার আরও অনেক গৌরবময় দৃশ্য আছে। শিখরে ওঠবার পূর্ব্বে তয়াগদ ([illegible]) [illegible] কারুকার্য



মুখ বার করেছে, মুগ্ধ হয়ে অর্হতের শান্তির ছায়ায় হিংসার সংস্কার বিস্মৃত। কে জানে ভারতবর্ষের এ উচ্চ আদর্শ কোনোদিন মানুষের সমাজ গ্রহণ করবে কিনা? আমার পুত্র জয়দেব বল্লেন—আপাততঃ কেন? কোনো দিন যে জগৎ হিংসা ভুলবে তার কোনো লক্ষণ ইতিহাসে কোথাও প্রকটিত হয়নি।

তার জননী বল্লেন—যুদ্ধে যত অর্থ ব্যয় হয়েছে, তাতে সারা বিশ্বে নূতন কৃষি, শিল্পের যুগ আনতে পারত মানুষ।

মনোহর। পাদপীঠে স্তম্ভ বসানো। দুখানি পাথরের মধ্য দিয়ে একখানি রুমাল চালিয়ে দিয়ে অন্যদিকে বার করে নেওয়া যায়। এর শিলা-লিপি হ'তে অবগত হওয়া যায় যে চামুণ্ডরায় এই কীর্ত্তি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রাচীন দিনে এস্থলে অন্নবস্ত্র বিতরিত হ'ত।

বেলগোলা গ্রামের সরোবর স্বচ্ছ জলে পূর্ণ। গ্রামে আরও কয়েকটি মন্দির আছে। এ গ্রাম সাগর পৃষ্ঠতল হ'তে প্রায় তিন হাজার ফুট উচ্চে।

ইন্দ্রগিরির সম্মুখে অপর একটি শৈল আছে। তার নাম চন্দ্রগিরি। এ

বৈষ্ণব, জৈন, বৌদ্ধ উপাসক পরস্পরের সঙ্গে বিরোধ ক'রে জাতীয় জীবন-শক্তি অপচয় করেছে। কিন্তু এ কথা স্বীকার্য্য যে য়ুরোপে ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট বিরোধের অনুরূপ হিংসা ও রক্ত-লোলুপতা দৃষ্ট হয়নি ভারতের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে।

বলেছি মহীশূর হ'তে বেলগোলার রাজপথ মনোরম। ফেরবার সময় একটা মাঠে আমরা একপাল হরিণ দেখেছিলাম। বোধ হয় সাধারণের পক্ষে মৃগয়া নিষিদ্ধ। তাই কৃষকের লগুড়ের আশঙ্কাকে উপেক্ষা করে তারা মায়া-মৃগের মত বিচরণ করছিল প্রান্তরে।

মহীশূর রাজত্বে বাকী প্রাচীন কীর্ত্তি যা দেখেছি আর যা দেখব, সে কথা আলোচনা করা ভিন্ন এখন আর অন্য কাজ রহিল না। মহীশূরের পরিখার মত চামুণ্ডা পাহাড়ের উপর সুবৃহৎ নন্দী ষাঁড়ের কথা মনে হল। এ অতিকায় কালো পাথরের অপূর্ব্ব সুশ্রী নন্দী কত বড়, আনুপাতিক চিত্রে বোঝা যাবে। অন্যত্র বলেছিলাম তাঞ্জোরের ষাঁড় অতি বড়। তখন চামুণ্ডা পাহাড়ে তার রাজ-সংস্করণ দেখিনি।

কিন্তু প্রশ্ন হয় এসব অতিকায় ভাস্কর্য্য নির্ম্মিত হ'ল কোথা? অন্যত্র গঠন করে পাহাড়ের উপর তুলতে আধুনিক বলবিদ্যা এবং অতি শক্তিশালী মার্কিনী ক্রেন হিমসিম খাবে। আমার বিশ্বাস ঐ সব স্থলে বৃহদাকারের আগ্নেয় শীলা ছিল পাহাড়ের অংশ। তাদেরই কেটে রূপ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে কার্য্যও শ্রম, শিল্প এবং প্রভূত বিচার-বুদ্ধি সাপেক্ষ। গঠন ক'রে রূপ সৃষ্টি করার একটা সুবিধা হচ্চে যে ভুল হ'লে, আবার ভেঙ্গে নূতন করে গড়া যায়। কিন্তু ভাস্কর্য্যে একটু ভ্রম হ'লে, পাথরটা বাতিল হয়। কাজেই প্রকাণ্ড পাষাণ কেটে অতিকায় ঋষির মূর্ত্তি রচনা সূক্ষ্ম শিল্প।

শ্রবণ বেলগোলায় ধর্ম্মশালা আছে। সেখানে দেশ-বিদেশ হ'তে জৈন তীর্থযাত্রী আসে। আমরা যোধপুরের এক পরিবার দেখলাম। সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবার, কারণ মহিলার অনেক হীরক-খচিত আভরণ। একবার চিদম্বরমে এক নায়ার মহিলার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। তিনি ইংরাজি বলেন কিন্তু পায়ে সোনার মল। শিক্ষার সঙ্গে নিজের দেশাচার বজায় রেখেছেন দেখে আমার স্ত্রী তাঁকে খুব প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি আমাদের প্রণামী দিতে চাইলেন, আমার স্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন যে দক্ষিণে ব্রাহ্মণেতর জাতি মন্দিরে তেমন শ্রদ্ধা পায় না, তাই আমার যজ্ঞোপবীত অত ঘটা ক'রে দেখানো হ'চ্চে। আসলে আমি ম্লেচ্ছ-ভাবাপন্ন লোক।

ম্লেচ্ছভাবাপন্ন ব'লে আমরা বেলগোলার ধর্ম্মশালায় প্রবেশ করলাম না। মাইল দুই এসে ইন্দ্রপাহাড়ের পিছনে এক গিরিনদীর কূলে শিলাখণ্ডে বসে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন করলাম। গোমতেশ্বরের প্রশস্ত পৃষ্ঠ দেশ ছিল আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে।

স্ত্রী বল্লেন—তীর্থস্থান থেকে এসে যা' তা' ভোজন, এই হ'ল এ যুগের ভণ্ডামী।

আমার মনে যে ভাব বহুক্ষণ উদয় হচ্ছিল সেই কথা বল্লাম। খৃষ্টের নামে যুদ্ধ শেষ করবার যুদ্ধ করে খৃষ্টান, আনবিক বোমা সমেত। আর জয়ের জন্য পাদ্রীরা গীর্জ্জায় প্রার্থনা করে। সন্ন্যাসী বুদ্ধদেবের পুণ্য-স্মৃতি অমর করবার বাসনায় মানুষ আঙ্কুরভট বরোবুদর, অনুরাধাপুর ও বুদ্ধগয়ায় রাজ-রাজেশ্বরের উপযোগী মন্দির নির্ম্মাণ করেছে। জৈন সন্ন্যাসী গৃহত্যাগী নির্গ্রন্থ দিগম্বর অর্হৎদেব নামে শিল্পী ও তার পৃষ্ঠ-পোষক কুবের-ভক্ত গড়েছে দিলবারা মন্দির আবু পাহাড়ে। আর বনবাসী নির্ব্বাসিত শ্রীরামচন্দ্রের শিব-পূজার ঐতিহ্য জাগিয়ে রাখবার জন্য দক্ষিণ ভারতের ভক্তরাজার অমর কীর্ত্তি সেতুবন্ধ রামেশ্বরের ভুবন বিখ্যাত শ্রীমন্দির।

পুত্রবধূ শ্রীমতী চিত্রিতা বল্লেন—আধুনিক লড়াই ছাড়া বাকীগুলা তো ভক্তির প্রমাণ।

আমি বল্লাম—ভোজনটাও। তাঁরি দেওয়া দেহকে পুষ্ট ও সুস্থ রাখলে কাল পরশুর মধ্যে প্রাচীন সোমনাথ মন্দির দেখতে পাব। আত্মার সার্ব্বজনীন মুক্তি স্রষ্টা, চাননা। তাহলে তাঁকে সৃষ্টির লীলা বন্ধ রাখতে হবে। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ই চিরানন্দের আনন্দ-লীলা।

অসমতল

শ্রীনীরেন গুপ্ত

দুর্য্যোগভরা এক রাত্রিশেষের প্রভাত। সারারাত ঝড়বাদলের অবিশ্রান্ত মত্ততার পর প্রকৃতির রূপ এখন রণক্লান্ত যোদ্ধার মত অবসন্ন।

রাজপথের ধারে প্রকাণ্ড আসবাবের দোকানটার বন্ধ দরজা খুলে গেল। দোকানের কর্ম্মচারী ম্যানেজারবাবু ভেতরে প্রবেশ করলেন। ঝড়ের প্রচণ্ড দাপটে ওধারের একটা জানালা কেমন করে খুলে গেছে—তারই মধ্য দিয়ে জলের ঝাপটা এসে সামনের টেবিলটাকে স্পর্শ করেছে,—এখানে ওখানে তারই অস্পষ্ট চিহ্ন। সামনের দরজার কবাটগুলো এক এক করে খুলে দিতেই আসবাব-পত্রের চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠল। আধুনিকতম ডিজাইনের চেয়ার, টেবিল, আলমারী, সোফা সব সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে তাদের দামের লেবেল গায়ে ঝুলিয়ে। কোনের জানালাটা খুলে দিতেই একঝলক আলো এসে গদিআঁটা ডবল্ কাউচটার উপরে পড়ল। ম্যানেজার অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলেন কাউচের নরম গদির বুকে

গা এলিয়ে দিয়ে গভীর ভাবে ঘুমাচ্ছে একটা শীর্ণদেহ বালক। পোষাক ও চেহারা থেকেই বোঝা যায় সে নিরাশ্রয় পথের ভিক্ষুক।

মূল্যবান কাউচের পরিচ্ছন্নতা নষ্ট হল ভেবে ম্যানেজার আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। বাঁ হাতে ছেলেটার চুলের ঝুঁটি ধরে একটানেই সোজা দাঁড় করিয়ে দিলেন তাকে। অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতায় ভীত ও বিভ্রান্ত হয়ে হতভাগ্য কাঁপতে লাগল।

ম্যানেজারের চোখে বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল, কণ্ঠে বজ্র গর্জ্জে উঠল —কী মতলবে এখানে সেঁধিয়েছিলি শয়তান?

কাঁপা গলায় মৃদুস্বরে সে বললে—ঝড়বাদলে কোথাও আশ্রয় পাইনি বাবু।

—সেজন্যে দরজা ভেঙ্গে এখানে সেঁধিয়েছিলি?—প্রবল উত্তেজনায় ম্যানেজার অপরাধীর দিকে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেলেন— নিশ্চয় চুরির মতলব করেছিলি, বেটা ঘুঘু কোথাকার!

—না, বাবু না, শুধু ঝড়বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্যে।

ম্যানেজার ধমকে বললেন—ইস্, ঝড়বৃষ্টি যেন ওকে গিলে ফেলত। তা না হয় ভেতরেই ঢুকেছিলি, কিন্তু কাউচের গদির ওপর গিয়ে বাদশাহী ঘুম ঘুমিয়েছিলি কেন রে কুকুর?

করুণ আবেদনের সুরে অপরাধী বললে—ঘুম—বড় ঘুম পেয়েছিল—তিনরাত ঘুমাই নি।

ম্যানেজার অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ফস্ করে তার একখানা কান ধরে বললেন—তা গদি ছাড়া নবাবের ঘুম হয় না—না? রাস্তার ফুটপাতগুলো আছে কী করতে?

ছলছল চোখে সে বললে—এবারটা ছেড়ে দিন বাবু, আর কখনো—

—কিন্তু দামী কাউচটাকে দাগ লাগিয়ে নোংরা করেছিস্ তার কি শুনি?—কান ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেলেন কাউচের কাছে— দে ব্যাটা, ক্ষতিপূরণ বের কর এখনি।

অপরাধী এবার কেঁদে ফেললে—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বিশীর্ণ নোংরা মুখের ওপর দিয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

ঝাড়নটা এনে ম্যানেজার ওর হাতে গুঁজে দিলেন, বললেন— কাঁদলে চলছে না। এই নে ঝাড়ন। ওটা পরিষ্কার করে দিলে তবে ছাড়া পাবি।

কাউচের এখানে ওখানে কিছু কিছু ধুলো লেগেছিল। ভাল করে ঝাড়তেই উঠে গেল। তারপর ম্যানেজারের আদেশে গলাধাক্কা দিয়ে তাকে বের করে দেওয়া হল, দয়া করে আর কোনো শাস্তি দেওয়া হল না।

রাস্তার ধারে মোটর থামিয়ে সাহেবী পোষাকপরা এক বাবু ভারিক্কী চালে এসে আসবাবের দোকানে ঢুকলেন। ম্যানেজার সসম্ভ্রমে উঠে বিনীতভাবে সামনের চেয়ারটা তাঁকে দেখিয়ে দিলেন বসবার জন্যে।

—আমি কিছু আসবাব কিনতে চাই। আগন্তুক বললেন।

ম্যানেজার বললেন—দয়া করে এই আসবাবগুলো দেখুন, যদি কিছু পছন্দ হয়, অথবা order পেলে আমরা আপনার মনের মত তৈরী করিয়ে দিতে পারি।

—অত সময় নেই। প্রথমেই একটা ছোট ড্রেসিং টেবিল চাই।

—এই যে একটা আছে with double glass।

—এটা বড্ড বেশি ছোট হয়ে যাচ্ছে।

—আচ্ছা এইটে দেখুন। এতে চলবে কি?

—হ্যাঁ, এটা চলতে পারে। তারপর একটা ডবল্ কাউচ চাই।

ম্যানেজার একখানা সুন্দর কাউচের কাছে ক্রেতাকে নিয়ে গেলেন, বললেন—আশা করি এতেই আপনার কাজ হবে।

ক্রেতা বললেন—ওই কোণের কাউচখানা একবার দেখতে চাই। ওর ডিজাইনটা ভাল লাগছে।

ম্যানেজার ভয়ে ভয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। ওর ওপরেই হতভাগা ছোঁড়া রাত কাটিয়েছিল, কোনো মলিনতা ক্রেতার চোখে ধরা না পড়ে।

—হ্যাঁ, এই কাউচখানাই নিতে চাই, আর চাই একটা মাঝারী গোছ চায়ের টেবিল। এই যে, এটাতেই হবে। আপনি বিল করুন। আমি দাম দিয়ে যাচ্ছি আর ঠিকানা রেখে যাচ্ছি। আজকেই এগুলো পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন।

পকেট থেকে ক্রেতা একতাড়া নোট্ বের করলেন, আর বের করলেন নাম ঠিকানা ছাপানো একখানা কার্ড।

মিষ্টার অরুণ মিত্র, এ্যাড্ভোকেট, হাইকোর্ট···

তার নীচে ঠিকানা।

আট মাস পরে। অরুণ মিত্রের স্ত্রী মিসেস্ রাগিণী মিত্র চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন—আমাদের furnitureগুলো বড্ড old-fashioned হয়ে গেছে।

মিঃ মিত্র বললেন—কথাটা আমিও ভাবছিলুম। চল না আজই New designএর খোঁজে বেরিয়ে পড়া যাক।

মিসেস্ মিত্র মাথা নেড়ে বললেন—Readymade জিনিষ বড্ড তাড়াতাড়ি পুরোণো হয়ে যায়। এবারে সব জিনিষ আমি order দিয়ে তৈরী করাব। তার design হবে এমন নূতন, যা সকলকে তাক লাগিয়ে দেবে।

মিঃ মিত্র সংশয়ের সুরে বললেন—কিন্তু এরকম design—

বিজয়িনীর মত হেসে মিসেস্ মিত্র বললেন—আমার কাছে

Modern American furnitureএর একটা Catalogue আছে। তারই অনুসরণে এবারে আমাদের সব জিনিষ হবে। তুমি তোমার সেই fashion-houseএর ম্যানেজারকে একবার খবর দিও। Catalogue দেখিয়ে আমি নিজে তাকে সব বুঝিয়ে দেব।

—এ তো খুবই ভাল কথা। অনেক বিবেচনা করে মিঃ মিত্র বললেন।

মিসেস মিত্রের উপদেশ মতই আসবাব তৈরীর যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে বলে ম্যানেজার তাকে ভরসা দিলেন। মিসেস্ মিত্র মনে মনে ভাবলেন—ব্যতিক্রম যদি কিছু হয় সেটাও নূতনত্বই হবে এই যা সান্ত্বনা।

ফিরে আসবার পথে মিঃ মিত্রের বাড়ীর বাইরের দিকে একটা ঘরে ম্যানেজারের দৃষ্টি পড়ল। ঘরটা ব্যবহার করা হয় না বলেই মনে [illegible] তার মধ্যে পড়ে আছে অন্যান্য কতকগুলো আসবাবের [illegible] সেই ডাবল কাউচটা।

—এরই মধ্যে কাউচটা অব্যবহার্য্য হয়ে গেল? ম্যানেজার বললেন।

—না। মিঃ মিত্র বললেন—কাউচটা মোটে ব্যবহারই করি নি। কিনে আনবার পরই সকলে বলতে লাগলেন যে ওটা ভারী old-fashioned, তাই নূতন কয়েকটা তৈরী করিয়ে নিলুম। ওটা অতিরিক্ত আসবাব হিসাবে পড়ে আছে ওখানে।

কি জানি কেন ম্যানেজারের মনের মধ্যে একটা নাড়া লাগল। কাউচখানা দোকানে সাজানো ছিল চারমাস আর এখানে পড়ে আছে আটমাস। এই এক বছরের ভেতরে একটীবার শুধু এটা মানুষের প্রয়োজনে লেগেছিল—এক দুর্য্যোগের রাতে। ম্যানেজার স্পষ্ট দেখতে পেলেন পৃথিবীতে এমনি অনেক বস্তুই মানুষের প্রয়োজনে লাগছে না—যাদের কিছু নেই তাদেরও নয়, যাদের আছে অতিরিক্ত তাদেরও নয়। অসমতল এই পৃথিবীর প্রান্তর—কোথাও বা অভাব তার, কোথাও আতিশয্য।

পৃথিবীর একটা নীতিহীন সত্য আজ সামান্য একটা কাউচের মধ্য দিয়ে ম্যানেজারের কাছে আত্মপ্রকাশ করলে।

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

অকস্মাৎ [illegible]ন। পণ্ডিতের শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাতে এই শ্রীগ্রন্থের ব[illegible] এক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। আমরা সঙ্কটমোচনের প্রার্থনায় সজ্জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রাচীনগণের মুখে শুনিয়াছি—পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হওয়ায় রামাশ্রম নামে কোন সাধু শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনে "দুর্জ্জন-মুখ-চপেটিকা" প্রণয়ন করেন। কাশীনাথ-ভট্ট তাহার প্রত্যুত্তরে উক্ত শ্রীগ্রন্থের আধুনিকত্ব প্রতিপাদন হেতু "দুর্জ্জন-মুখ-মহাচপেটিকা" রচনা করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে "দুর্জ্জন-মুখ-পদ্ম-পাদুকা" রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থকারের নাম জানি না। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবত যে ঋষিপ্রণীত, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থখানি এবং মিতাক্ষরার টীকাকার বালভট্টের পুরাণ শব্দের ব্যাখ্যা পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত রচনায় জন্য কোন দক্ষিণী আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। দক্ষিণ ভারতের আলবারগণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পল্লভ রাজগণের সময়েই আবির্ভূত হন এবং ধর্ম্মপ্রচার করেন, ঐতিহাসিকগণ এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। আলবারগণ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন, অথবা লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা করিতেন, এইরূপই শুনিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা নন্দ-নন্দন কৃষ্ণের অথবা গোপীভাবের পরকীয়া রসের উপাসক ছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দক্ষিণ ভারতের প্রথমাচার্য্য নাথমুনি উত্তর ভারত হইতেই পাঞ্চরাত্র ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া দক্ষিণ ভারতে প্রচার করেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। আচার্য্য শঙ্করের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বেই উত্তর ভারতে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচলন ছিল। শঙ্করের "বিষ্ণু সহস্র নামভাষ্যে" শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ পাওয়া যায়। শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদ পঞ্চীকরণ ব্যাখ্যায় এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী হনুমৎ ও চিৎসুখমুনি রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী এই গ্রন্থের কয়েকখানি প্রাচীন টীকার বা ভাষ্যের কথা বলিয়াছেন। আলবারগণের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই নাট্যকার ভাস বালচরিত রচনা করিয়াছিলেন এবং অন্ধ্রভৃত্যবংশীয় নরপতি হাল গাথা-সপ্তশতীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকেই এই রাধাকৃষ্ণলীলার মূল গ্রন্থ বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন।

করে খুলে গেছে—ভাব ..

শ্রীমদ্‌ভাগবতের মধ্যেই ভাগবতধর্ম্ম উদয়ের ক্রম পরম্পরা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ২য় স্কন্ধ নবম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার প্রশ্ন চতুষ্টয়ের উত্তরে শ্রীভগবান চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ দিয়াছিলেন। ১ম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবানের তৃতীয়াবতার দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক "সাত্বত তন্ত্র" প্রণয়নের উল্লেখ আছে। ইহা চতুঃশ্লোকী ভাগবতেরই ভাষ্য বিবৃতি। এই সাত্বত তন্ত্রই সুবিখ্যাত "নারদ পঞ্চরাত্র"। ইহাই পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের আদি গ্রন্থ, বর্ত্তমানে এই গ্রন্থ দুর্লভ। যাহা পাওয়া যায় তাহার মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থের যথাযথ রূপ রক্ষিত নাই। মঙ্গলকাব্যের অষ্ট মঙ্গলার মত ইহা পাঁচ রাত্রির উপদেশ নহে। ইহা পঞ্চ মহাভূত বা পঞ্চতন্মাত্রের ব্যাখ্যা অর্থাৎ ভৌতিক কাণ্ডও নহে। নারদপঞ্চরাত্রে ৩৪ শ্লোকে ইহাকে পঞ্চসংবাদও বলা হইয়াছে। নারদপঞ্চরাত্র বলেন—(১ম রাত্র) "রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতং।

তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ ৪৪॥

"রাত্র শব্দের অর্থ জ্ঞানবচন। এই জ্ঞান পাঁচ প্রকার। তাই মনীষীগণ ইহাকে পঞ্চরাত্র বলেন। জন্ম-মৃত্যু-জরানাশক যে পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ মুখ হইতে শম্ভু সংপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাই প্রথম জ্ঞান। (নারদ শম্ভুর নিকট হইতে এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সাত্বত-তন্ত্র প্রণয়ন করেন।) যদ্দারা হরিচরণে লীন হওয়া যায়, সেই মুমুক্ষু বাঞ্ছিত শুদ্ধমুক্তিপ্রদ জ্ঞানই দ্বিতীয়। সুবিশুদ্ধ মঙ্গলজনক কৃষ্ণভক্তি-প্রদ জ্ঞান তৃতীয়, যদ্দারা হরিপদে দাস্য লাভ এবং অভীষ্টপ্রাপ্তি ঘটে। চতুর্থ যৌগিকজ্ঞান যোগীগণের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ও সিদ্ধগণের সুখপ্রদ। ইহার দ্বারা অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবশায়িতা, সর্ব্বজ্ঞতা, দূরশ্রবণ, পরকায় প্রবেশন, কায়ব্যূহ, জীবদান, পরজীবহরণ, সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব, শিল্পিত্ব ও সর্গসংহার কারকত্ব, এই ষোড়শসিদ্ধি জ্ঞানীগণের আয়ত্ত হয়। আর যে জ্ঞানে বিষয়ে বদ্ধচিত্ত, ইন্দ্রিয়সেবী, আত্ম ও কুটুম্বভরণে রত বিষয়ীগণকে ইষ্টদেবী মায়া সম্মোহিত করেন, তাহাই পঞ্চম জ্ঞান। প্রথম ও দ্বিতীয় জ্ঞান সাত্ত্বিক, কিন্তু নির্গুণ তৃতীয় জ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চতুর্থ জ্ঞান রাজসিক, ভক্তগণ তাহা বাঞ্ছা করেন না। পঞ্চম জ্ঞান তামসিক, ইহা বিদ্বানগণের অবাঞ্ছনীয়। পঞ্চপ্রকারে কথিত এই জ্ঞানকে পণ্ডিতগণ পঞ্চরাত্র বলিয়া জানেন। এই পঞ্চরাত্র সপ্ত প্রকারও কথিত হয়, যথা—ব্রাহ্ম, শৈব, কৌমার, বাশিষ্ঠ, কাপিল, গৌতমীয় এবং নারদীয়। বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র, সিদ্ধি-শাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র—"ইহা ষট্ পঞ্চরাত্র নামেও বিখ্যাত"। (৪৫-৫৮ শ্লোক—প্রথম রাত্র) আশা করি ইহা হইতেই প্রমাণিত হইবে নারদ পঞ্চরাত্র মাত্র অনুষ্ঠান-গ্রন্থই নহে। ইহার মধ্যে চতুঃশ্লোকী ভাগবত-রহস্যও নিহিত আছে। নারদের নিকট হইতে ব্যাসদেব এই ভাগবতধর্ম্মই প্রাপ্ত হন। বেদ-বিভাগ, মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন ইত্যাদির পরও চিত্তে শান্তিলাভ না হওয়ায় ব্যাস বিষণ্ণ হইয়াছিলেন, তজ্জন্যই দেবর্ষি তাঁহাকে (সাত্বত তন্ত্রের রহস্য বিস্তার) গোবিন্দগুণময়ী শ্রীমদ্‌ভাগবত উপদেশ করেন। নারদের উপদেশে মহর্ষি ভগবান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন সরস্বতী-নদীতটে শম্যাপ্রাস নামক আশ্রমে সমাধিযোগে শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক স্বীয় পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। শুকদেব ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন সভায় সেই গ্রন্থই কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পুরাণবক্তা সূত তাহা শুনিয়াছিলেন, তিনি নৈমিষারণ্যে অনুষ্ঠিত ঋষিগণের যজ্ঞক্ষেত্রে শৌনকাদির প্রশ্নে তাহারই পুনরাবৃত্তি করেন। ইহাই শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থের প্রকাশ পারম্পর্য্যের ইতিহাস। ইহার মধ্যে দাক্ষিণাত্যের অথবা আলবার-গণের কথা একান্তই অপ্রাসঙ্গিক। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে দ্রাবিড়ের কোন কোন পুণ্যসলিলা নদীতটে নারায়ণ-পরায়ণ ভক্তগণ জন্মগ্রহণ করিবেন এই কথা আছে। শ্লোকের প্রকৃত পাঠ এইরূপ—

"ক্বচিৎ ক্বচিৎ মহারাজো দ্রাবিড়েষু চ ভূমিষু", ভূরিষ বা ভূরীশ পাঠ ভ্রমাত্মক। এই শ্লোকের অর্থ "দ্রাবিড় ভূমিতেও কেহ কেহ জন্মগ্রহণ করিবেন।" এ কথা যে আলবারগণকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? দাক্ষিণাত্যের অন্যতম আলবার রাজা কুলশেখর ত্রিবাঙ্কুরের অধিপতি ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী ইহার আবির্ভাব কাল স্থির করিয়াছেন। কুলশেখরের জীবনেতিহাসে শ্রীবৈষ্ণবগণের উল্লেখ আছে! কেহ কেহ ইহাকে রামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করেন। ইনি মুকুন্দমালা স্তোত্রে শ্রীমদ্ভাগতের শ্লোক গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং কোন কোন আলবার যে শ্রীমদ্‌ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং আলবারগণের সৃষ্ট আবহাওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হয় নাই, বরং ভাগবতধর্ম্মের প্রভাবেই আলবারগণের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, এইরূপ সিদ্ধান্তই ইতিহাসসম্মত।

আচার্য্য রামানুজ শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধার করেন নাই জানিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। শ্রীভাষ্যের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ নাই একথা হয়তো সত্য; আমি শ্রীভাষ্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নহি, কিন্তু একথা আচার্য্যগণের মুখে শুনিয়াছি যে রামানুজ শ্রীভাষ্য

হইয়াছে। শ্রীপাদ রামানুজের অপর কোন গ্রন্থ বাঙ্গালায় অনূদিত হয় নাই। সুতরাং রামানুজ শ্রীমদ্‌ভাগবত সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন, এ কথা বলা দুঃসাহসের কাজ। এ সম্বন্ধে আর একটী কথা, যখন শ্রীরামানুজের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীশঙ্করাচার্য্যের এবং শ্রীগৌড়পাদের, হনুমন্তের ও চিৎসুখাচার্য্যের গ্রন্থে শ্রীভাগবতের উল্লেখ আছে, তখন পরবর্ত্তী রামানুজকে লইয়া বিতণ্ডার কোন প্রয়োজন নাই।

আরো একটী কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের বঙ্গেশ্বর বর্মনরাজগণ যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন, নিম্নোক্ত শ্লোকে তাহার প্রমাণ পাই।

সোঽপীহ গোপীশত কেলি করে কৃষ্ণো মহাভারত সূত্রধার।
অর্ঘ্য পুমানংশ কৈতাবতার, প্রাদুর্ভূবোদ্ধৃত ভূমিভারঃ॥

সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত দক্ষিণ ভারত হইতে আসে নাই।

শ্রীপাদ রামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী যামুন মুনির নাম সর্ব্বজন পরিচিত। তিনি বিষ্ণুপুরাণ রচয়িতা পরাশরের নামে কোন শিষ্যের নামকরণের বাসনা পোষণ করিতেন। রামানুজ যামুনের অপর দুইটী বাসনার ন্যায় এ বাসনাও পূর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "ক্বচিৎ ক্বচিৎ" শ্লোক দেখিয়া মনে হয়, তখনো দ্রাবিড়ে অধিক ভক্ত ছিলেন না। এই কয়েকজন মাত্র ভক্তের প্রেম ভক্তি শ্রীমদ্‌ভাগবতের মত ঐরূপ একটী জটিল দার্শনিক তথ্যপূর্ণ, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তির সমন্বয়-মূলক, সার্ব্বজনীন্ ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাব্যরসাত্মক নানা আখ্যান উপাখ্যান সংযুক্ত মহাগ্রন্থের প্রেরণা আনিয়াছিল, এ কথা স্বীকার করিলে দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি ব্যাস ও পরমহংসপ্রবর শুকদেবের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে হয়। আচার্য্য যামুনের সম্বন্ধে পূজ্যপাদ শ্রীল রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় তাঁহার "শ্রীবৈষ্ণব" গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, এইস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি "একায়ন শাখা" ও অপরাপর বিষয়ে তিনি বহু পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

"ইঁহার (যমুনাচার্য্যের) অন্যতম গ্রন্থের নাম "আগম প্রামাণ্য"। ভাগবত সম্প্রদায় এবং পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত পোষণের উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ বিরচিত। এই গ্রন্থের উপসংহারে আর একখানি গ্রন্থ ছিল, তাহার নাম "কাশ্মীর আগম প্রামাণ্য"। কিন্তু এখন আর কোন কিছু ইহার সম্বন্ধে জানা যায় না, তবে এইটুকু জানা যায় যে উহাতে ইনি একায়ণ শাখার প্রামাণ্য স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। উহা বেদের শাখা বিশেষ এবং ভাগবত সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত সম্বলিত ছিল। আগম প্রামাণ্য গ্রন্থখানি পদ্যে এবং অনুষ্টুপ্‌ছন্দে রচিত। একায়ণ শাখা শুক্ল যজুর্ব্বেদ ও কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত। পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের যাহারা ব্যবস্থা যায়া তাঁহাদের নিত্যকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। ইঁহারা আরাধনার জন্য দিবাভাগকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম ভাগ অভিগমন, অর্থাৎ ভগবানের নিকট গমন করার উপায়। স্নান ও জপের পরেই এই ভাগে লিখিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহাতে ৮টা বাজিয়া যায়। ইহার পরে ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত ভাগের নাম উপাদান। জীবিকা নির্ব্বাহের কার্য্যাদির জন্য এই সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার পরে ইজ্যা, অর্থাৎ পঞ্চ-যজ্ঞের সময়, ভোগ আরাধনা ইত্যাদি। আহারান্তে শাস্ত্রপাঠ; ইহার নাম স্বাধ্যায়। যোগ সাধনার জন্য সূর্য্যাস্তের পর হইতে শয়ন পর্য্যন্ত সময় নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। কোনও সময়ে পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। ভারতবর্ষে শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, শৈব, গাণপত্য, পাশুপত, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বহুল গ্রন্থ এখনও দৃষ্ট হয়। পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায় অতি প্রাচীন। ভাগবত, সাত্বত, পৌষ্কর, জয়াক্ষ সম্প্রদায়সমূহ পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের শাখা-বিশেষ। বেদান্তদেশিকের কৃত "পাঞ্চরাত্র রক্ষা" নামে গ্রন্থ আছে। ইহাতে শ্রীবৈষ্ণবগণের নিত্য-নৈমিত্তিক সাধনের পদ্ধতি লিখিত আছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের প্রতি কটাক্ষ করিয়া গিয়াছেন। আমরা যথাস্থানে সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। শ্রীপাদ যমুনাচার্য্য এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীভাষ্য আলোচনার সময় আমরা অন্য গ্রন্থে তাহার উল্লেখ করিব। (শ্রীবৈষ্ণব, ২০৫—২০৬ পৃষ্ঠা)

শ্রীমদ্ভাগবত নারদ প্রণীত সাত্বত তন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায় এবং তাঁহাদের গ্রন্থ যে বহু প্রাচীন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সম্প্রদায় হইতেই শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থের অভ্যুদয়, শ্রীমদ্‌ভাগবত তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছেন। দেবর্ষি নারদ হইতে মহর্ষি বেদব্যাসের ভাগবতপ্রাপ্তি এই কথাই প্রমাণিত করিতেছে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যেমন ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, তেমনই এই মহতী বিনষ্টির মহাশ্মশানে দুইটী মহারত্ন সমুদ্ভূত হইয়াছে। একটী শ্রীমহাভারত, অপরটী শ্রীমদ্‌ভাগবত। মহাভারতের মধ্য মণি যেমন শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা, শ্রীমদ্‌ভাগবতের সর্ব্বস্ব তেমনই শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আদিতে গীতার অভ্যুদয় অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত অভ্যুদিত হন। গীতাপ্রোক্ত ধর্ম্ম স্মরণাতীত কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। এই ধর্ম্মের চরম ও পরম পরিণতিরূপে অতি স্বাভাবিক ভাবেই ভাগবতধর্ম্মের উদয় হয়। গীতার ধ[…] কালে নষ্ট হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট তাহা পুনঃপ্রকা[…]

কর্ত্তৃক বেদব্যাসের নিকট তাহা প্রকাশিত হন। গীতা যে ধর্ম্মের বাঙ্‌ময় রূপ,ব্রজগোপীগণ সেই ধর্ম্মের আনন্দ চিন্ময়ী জঙ্গম-প্রতিমা। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বমানবের অবশ্য-গ্রহণীয় ও আচরণীয় ধর্ম্ম এই ভাগবতধর্ম্ম। ইহাকে কাম-দিগ্ধ বলা অথবা হাজার বার শত বৎসর পূর্ব্বের আধুনিক মানব প্রণীত বলা বাতুলতা। ভারতের অতীত এক দুর্দ্দিনে মানবহিতে এই ধর্ম্মের অভ্যুদয়; ইহার পটভূমিকায় রহিয়াছে এক মহাশ্মশানের পরিবেশ। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে ইহার ইঙ্গিত আছে।

পরীক্ষিতোঽথ রাজর্ষের্জ্জন্মকর্ম্ম বিলাপনম্।
সংস্থাঞ্চ পাণ্ডুপুত্রাণাং বক্ষ্যে কৃষ্ণ কথোদয়ম্॥
যদামৃধে কৌরব সৃঞ্জয়ানাং
বীরেষথো বীর গতিং গতেষু।
বৃকোদরাবিদ্ধ গদাভিমর্ষ
ভগ্নোরুদণ্ডে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রে॥ (১৩১৪)

লোকবাহ্য ভক্তি তন্ময় নৃত্যগীত নয়, মানবের দুর্দ্দিনে মানবের আত্যন্তিক দুঃখই এই ধর্ম্মের প্রেরণা আনিয়াছিল। একদিন প্রতিহিংসা-পরায়ণ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে পরীক্ষিতকে পরিত্রাণ করিবার জন্য শ্রীভগবান চক্রহস্তে উত্তরাগর্ভে উদিত হইয়াছিলেন। সেদিন তিনি আপন স্বরূপে মর্ত্তধামে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারই রক্ষিত বিষ্ণুরাত পরীক্ষিত যেদিন ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া বিপন্ন, সেদিনও তিনি পরীক্ষিতকে রক্ষা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু চিন্ময়দেহে নয়, বাঙ্‌ময় দেহে শব্দব্রহ্ম স্বরূপে। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই রূপান্তরিত অন্যতম আবির্ভাব এই শ্রীমদ্‌ভাগবত।*

* গুণরাজ খান প্রণীত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ভূমিকায় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ মহাশয় শ্রীমদ্‌ভাগবত বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, আমি 'দেশ' পত্রিকায় তাহার আলোচনা করি। চিরাচরিত প্রথানুসারে 'দেশ' পত্রিকায় তাহার প্রতিবাদ না করিয়া রায় বাহাদুর 'ভারতবর্ষে' একটী প্রবন্ধ লিখিয়া পাদটীকায় আমার সন্দেহ নিরসনে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা প্রণিধান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রবন্ধ শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের ভূমিকার পিষ্টপেষণ মাত্র। আমার প্রবন্ধের কোন উত্তরই তাহার মধ্যে নাই। ছাপার ভুল লইয়া রসিকতা—'মদ্‌ভাগবত নহে' (?)! এ রসিকতার উত্তর দিতে বিরত রহিলাম।

জয় হিন্দ্

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক, হোক তব জয়,
প্রিয় মোর, হে মোর স্বদেশ!
তোমার সমুদ্র-তীরে, অভ্রভেদী হিমাদ্রির শিরে,
নূতন প্রভাত সূর্য্য প্রণাম করিছে ধরণীরে;
সে সূর্য্য গর্জ্জিয়া ওঠে; ভয় নাই, নাই কোন ভয়,
আর আমি হব না নিঃশেষ।'

শতাব্দীর প্রান্তে বসে এতকাল কেঁদেছে যাহারা,
আজ তারা জয়ধ্বনি করে;
পঙ্গু, নারী, বৃদ্ধ, শিশু, সদ্যফোটা তরুণের দল
রক্তের আল্পনা এঁকে বিচিত্র করিছে ধরাতল,
তাদের মাথার পরে অনির্ব্বাণ জাগে শুকতারা,
লক্ষ্মী জাগে তাহাদের ঘরে।

প্রলয় শঙ্খের রোল পুবের পাহাড় পার হ'তে,
ভেসে এসে ঘুম ভেঙ্গে দেয়;
রক্তরাঙা দিনগুলি ফুল হয়ে গড়ে ইতিহাস,
মাটিতে আবার বুঝি দেখা যায় সোনালী আভাষ,
নীলপদ্ম ফোটে যেন শ্রীরামের অশ্রুজল স্রোতে
লবণাক্ত সাগর বেলায়।

বেদনা-বন্ধুর পথে নামিতেছে মুক্তির আলোক,
জয় হবে, জয় ভারতের;
উদার আকাশ বুকে ফুটিল যে রক্তরাগ শিখা,
সন্তান ললাটে মাগো বেঁধে দাও বিজয় লিপিকা;
মরণের গ্রন্থি থেকে জীবনের আবির্ভাব হোক,
শেষ হোক তামসী রাতের।



শ্রীমোহিতকুমার গুপ্ত

বছর পাঁচেক পরে কলকাতায় এসে নাকালের একশেষ! চারদিনেই রীতিমত হাঁফিয়ে উঠেছি। আগে বছরে তিনবার ছুটি নিতাম, আর ছুটি মানেই কোলকাতা। সে একদিনই হোক, আর একমাসই হোক। একশো মাইলও নয় কোলকাতা থেকে, যাতায়াতের হাঙ্গামা ছিল না। কিন্তু চালডালের মাপের সঙ্গে গাড়ী চাপাও যেদিন থেকে মাপ করবার আদেশ হয়েছে সেদিন থেকেই একরকম ট্রেণে ওঠা হয় নি। হঠাৎ কাজের তাগিদেই আবার অনেকদিন পরে বাধ্য হয়ে কোলকাতায় এসে পড়েছি। এসে অবধি ফ্যাসাদের আর শেষ নেই।

এই চারদিনের মধ্যেই অন্ততঃ পড়ে চার চারে-বোলবার হারিয়ে গেছি এবং কমপক্ষে পাঁচ-বোলং 'আশী'বার গঞ্জনা খেয়েছি। নিজেও যেমন ফ্যাকাশে মেরে গেছি রক্তাল্পতায়, সঙ্গে সঙ্গে কোলকাতাও দেখছি পুরো প্যাণ্ডাশে মেরে গেছে কাঁকির আওতায়। সারা গড়ের মাঠটাই হলদে হয়ে গেছে তাঁবুতে আর মেটে ঘরে। শুনেছি, ন্যাবার চোখে সবই হলদে। কিন্তু সকলেরই ত একসঙ্গে ন্যাবা হতে পারে না। অন্ততঃ 'ঠগ্ বাছ্‌তে গাঁ উজোড়ের' মত ন্যাবার প্রতিপত্তি কখনও হয়েছে কি না জানা নেই। তাই হারিয়ে যাওয়ার জন্তে আমি নিজেকে একা দায়ী মনে করি না, কারণ কোলকাতার রূপ সত্যিই পাল্টেছে!

গলি-ঘুঁজি যথাসম্ভব বাদ দিয়েই চলি, একমিনিটের জায়গায় দশ মিনিট লাগলেও। তবু দেখছি হারিয়ে যাওয়াটা একটা ব্যাধিতে দাঁড়িয়েছে। ব্যাধি বই কি। নেশাও নয়, পেশাও নয়, মুদ্রাদোষও নয়, অথচ থেকে থেকে হারিয়ে যাচ্ছি। বড় ছোট সকলেই উপদেশ দিলে—অত অন্তমনস্ক ভাল নয়। বেঙ্গল টাইম্, ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্, ক্যালকাটা-টাইম্—কত টাইম এলো গেলো, ঘড়ির-কাঁটা কতবার এগুস-পেছুল, কিন্তু কই তবুতো বড়-কাঁটা ছোট কাঁটা ঠিক একদিকেই ঘুরছে, একটু ওলট্-পালট্ হয় নি। তবে কেন আমি সচল মানুষ হয়ে হঠাৎ একটু আধটু অদল বদলের বিপাকে পড়ে বেচাল হচ্ছি? এই সব হাজারো রকমের টিপ্পনী আর ব্যাখ্যা!

সেদিন পথে বেরিয়ে কি দুর্ব্বুদ্ধি চাপলো মাথায়, ট্রামের কপালে 'গ্যালিফ ষ্ট্রীটের বিরাট তিলক দেখে চেপে বসলাম নতুনের উদ্দেশে। ও হরি, পৌছে দেখি এ যে খাল-ধার! নিজের বোকামীতে লজ্জায় মাথা কাটা গেল। অত বড় জাঁদরেল নামের পেছনে যে এই রকম একটা মারাত্মক উপহাস লুকিয়ে থাকবে আগে ভাবিনি। এ যেন সেই আমাদের "জর্জ্জ গ্যাব্রিয়েল ফ্রান্সিস্ এ্যারাট্‌নের" বাড়ীর ঠিকানা 'ছাতাওয়ালাগলি'র মতই ঠেক্‌লো। এ্যারাট্‌নের

আসল নাম হয়ত কোন-কালে 'হারাধন' ছিল দু'তিন পুরুষ আগে, এখন ফিরিঙ্গি-পাড়ায় রঙ্ পাল্টে ওই রকম দাঁড়িয়েছে—লোকটি আসলে বাঙ্গালী ক্রীশ্চান্। 'হারাধন' বলে ডাকলে লোকটি চটে যায়, কিন্তু ঠিকানা বলতে তার লজ্জা নেই, বলে—'ভ্যাটালা ঘালি'। সামনেই পাঞ্জাবীর দোকানে ঢুকে রুটি মাংসর সঙ্গে 'সপিশল্ ভাজি'র দুর্দ্দান্ত আকর্ষণ এড়াতে পারলাম না। সপিশলের সবিশেষ দক্ষিণা দিয়ে যখন টের পেলাম 'কুমড়ো-উচ্ছে-পটল' আদির নিকৃষ্ট অংশ অর্থাৎ খোসা ভেজেই এই 'সপিশল্' বা 'স্পেশ্যাল' এর সৃষ্টি, তখন আবার নতুন করে মনে হল কৃষ্ণের অপর নামই কালী! আমার এ অধ্যাত্মবাদ আমাকে মোক্ষের পথে বেশীদূর ঠেলে নিয়ে যেতে না পারলেও, সেদিন বাড়ীর সকলেই সেই রকম বড় গোছেরই একটা কিছু আশঙ্কা করেছিল। চা কিনতে বেরিয়ে রাত্রি দশটা হয়ে গেল দেখে কেউই নিশ্চিন্ত থাকতে পারে নি।

পাড়া, হাসপাতাল তোলপাড় করে সকলেই যখন ক্লান্ত, তখন একজন বল্লেন থানায় ডায়েরী করো। বলা যায় না উটকো লোক, হয়ত এতক্ষণ থানায় জমা হয়েও থাকতে পারে। টালিগঞ্জ থানায় যেতেই বল্লে—আছে একজন জমা, দেখুন যদি আপনাদের হয়। ভোজপুরী সেপাই তার আতুল-ভুঁড়ির ওপর চাবি বাঁধা পৈতে গাছটা একবার টান করে ঘষে নিয়ে ত্বরিতপদে চলে গেল, সঙ্গে নিয়ে এল উদোম্ ল্যাংটো একটি তিন বছরের ছেলেকে এবং গম্ভীর ভাবে বল্লে—কভি এয়্সা লেড়্কা-লোককো মৎ ছোড়্ না। সত্যচরণ নাকি বলেছিল—না আমাদের লোক হারালেও এত ছোট নয় আর উলঙ্গ নয়, ওতে চলবে না। বালীগঞ্জেও তাই, কোঁকড়ানো সাদা লোমওয়ালা ছোট্ট একটা পুড্ল্ নিয়ে এলো এবং জানালে ভাগ্যিস্ সময়মত এসেছেন, নইলে কালই অক্‌সনে চড়িয়ে দেওয়া হত, আমাদের বড়বাবুই এটা কিনে নিতেন। এর পরে সত্যচরণের আর কোথাও যাওয়া অসম্ভব না হলেও অসহ্য হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সেই হিতৈষীটি নাকি বলেছিলেন, বেরিয়ে যখন পড়া গেছে যতটা পারা যায় ঘুরেই যাওয়া যাক। ভবানীপুর থানায় পাওয়া গেল একটি একতারা বাজানো ভিখিরীর ছেলেকে, অন্ধ, দল ছাড়া হয়ে হারিয়ে গেছে এবং সেই সঙ্গে একটি বছর বাইশের তরুণীকে। সত্যচরণের মাথায় তখন রক্ত চড়ে গেছে, রাগে গর্ গর্ করতে করতে সে যখন বাড়ী ঢুকল, তখন সবে মাত্র এক হাঁড়ী দই নিয়ে আমি সদর দরজা পেরিয়ে এসেছি। হঠাৎ দই টা দেখে তার রাগটা জল হয়ে গেল তাই রক্ষে, নইলে কি হত বলা মুস্কিল! দই জিনিষটা সতুর বড্ড প্রিয়, সব ভুলে জিজ্ঞেস করলে—'জলযোগে'র নাকি? অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বল্লাম, আর বলিস কেন—ট্রামের ভেতর ভিড়ে কার দ'য়ের হাঁড়ি ভেঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ মাখামাখি হয়ে গেল, কোন রকমে ট্রাম থেকে নেমে যখন নিজের অসহায় অবস্থাটা অনুভব করবার চেষ্টা করছি, ভাঙ্গা ভাঁড় হাতে এক হিন্দুস্থানী ছোকরা পায়ে কেঁদে পড়ল—বাবুজী, হামকো সব লোকসান হো গিয়া আপ্‌কো বাস্তে। ওর ধারণা যেন আমিই ভেঙ্গেছি ওর দ'য়ের ভাঁড়, দোষ ও তাকে বিশেষ দিতে পারি না, কারণ সব দইটাই আমার গায়ে তখনও লেপ্টে আছে। তাকে আবার কিনে দিই, নিজেও তাই খানিকটা কিনে নিলাম। ছোক্‌রার মারোয়াড়ী মনিব বালীগঞ্জে বাড়ী করেছেন বটে, কিন্তু বড়বাজারের দই না হলে চলে না, কাজেই তাকে রোজই বড়বাজার ছুটতে হয় দই আনতে।

সতু হাঁড়ীটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ভেতরে চলে গেল, বকতে বেমালুম ভুলে গেল। কিন্তু কথায় আছে 'অঙ্গার শত ধৌতেন'—। খেতে বসে পাতের দই নিশ্চিহ্ন করে শেষ কোঁটাটি চাটতে চাটতে বল্লে—দিনের আলো থাকতে বাড়ী ফিরবে, নইলে রোজ রোজ এরকম থানা-পুলিশ করতে পারব না।

কিন্তু আশ্চর্য্য! কেউ রোগের আসল কারণ খুঁজবে না! আমার এই সামান্য ভুলগুলোই কি যত কিছু লক্ষ্যের বিষয়! যত নষ্টের গোড়া যে সেদিন 'গ্যালিফ্ স্ট্রীট্' তা আর কজন বোঝে! তাই যদি বুঝ্‌ত, তাহলে লোকে বলবে কেন, 'কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে—ইত্যাদি।

হেদোর জলে ইলিশ মাছ এখনও ওঠেনি, নইলে বাকি আর আছে কি? নন্তদের নোনা-ধরা বৈঠকখানায় আগে লোকে খালি-পায়ে ঢুকত না এত স্যাঁতসেঁতে, বেশীক্ষণ থাকলে সর্দ্দি হয়ে যেত। সেইখানে এখন মস্ত দোকান ঘর—পঞ্চাশ টাকা ভাড়া। রাতারাতি সাইনবোর্ড পড়ে গেল, সকালে গিয়ে দেখি 'ছাপা-শাড়ী'র বাণ্ডিল কড়িকাঠে ঠেকেছে, 'আল্পনা', কি 'কল্পনা' এই রকম গোছের একটা নামও বাইরে লট্‌কে দেওয়া হয়েছে। নন্তদের মস্ত দালান আগে পায়রায় নোংরা করত, কার্নিসে ছোট ছোট খুপরীতে তাদের ছিল বাসা। এখন সেই দালান খুপ্‌রী কেটে ঘর হয়ে গেছে, ও পেছনের গোয়াল আর ছাগলের ঘর চূণকাম করে তাতে দরজা বসিয়ে 'ঘর ভাড়া দেওয়া যাইবে' লট্‌কে দিয়েছে। লোকেরা চিঁড়ে চেপ্টা ট্রামে বাসে চেপে এবং চাপা গিয়ে। তা ছাড়া গাড়ী চড়ার যুগ কেটে গিয়ে এখন গাড়ী চাপার যুগ এসেছে। চাপার বহর দুদিকেই সমান—তলায় এবং ওপরে।

এত সব যুক্তি দিয়েও নাকি হারিয়ে যাওয়া সমর্থন কোনমতেই করা যায় না। না যাক্ তাতে কিছু এসেও যায় না। যেটা ঘটছে তাকে অস্বীকার করায় তো আর কোন বাহাদুরী নেই।

ফ্যাসাদের চূড়ান্ত হলো যেদিন ঠিক ঠিকানায় পৌঁছেও সঠিক লোকের সন্ধান পাওয়া গেল না। শুনলাম কেউ কেষ্টনগরে, কেউ

কদমতলায় গিয়ে বাস করছে কষ্টে-সৃষ্টে একঘরে পাঁচজনে গুঁতো-গুঁতি করে, আর তাদের জায়গায় জেঁকে বসেছে নতুন আমদানী করা লোকেরা। এক্ষেত্রে নিজে না হারালেও, যাদের দরকার তারা গেল হারিয়ে! বিপদ যখন আসে এইভাবেই আসে। তার ওপর আবার চেনা রাস্তাগুলো হয় হঠাৎ বেড়ে গিয়ে, নয় বন্ধ হয়ে নতুন রাস্তার চেয়েও নতুন ঠেকছে। অনেকটা যেমন রোজ দাড়ি কামানো ফিট্‌ফাট্ ফোকড়ের ফকিরী দাড়ি গজালে যে দশা হয়।

সবশুদ্ধ-হারানো তবু সহ্য হয়, কিন্তু খানিকটা হারিয়ে যাওয়া আরো বিপদের। পথ চলতে গিয়ে পকেট-মারের অবস্থা স্মরণ করলেই বোঝা যায় কি সে অবস্থা! ভীড়ে পকেট কাটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। কিন্তু চাপা কপাল হলে আবার ভীড়েরও দরকার হয় না। বছর ষোল আগে একবার ফাঁকা ট্রেণ থেকে মালপত্র নামিয়ে নিয়ে গেল অন্য লোকে দারোয়ানের নাকের তলা দিয়ে। দারোয়ানজীর জিম্মায় ছিল মালপত্র তারই কামরায়, গাঁজায় বুঁদ হয়ে নিজের মাল নিজেই অস্বীকার করলে, নিয়ে গেল অন্য লোকে তার অনুমতিক্রমেই। ভোরবেলায় হাওড়ায় পৌঁছে যখন হুঁস্ হল, জিনিষপত্র তখন তিনশ মাইল দূরে। খোঁজ করে জানা গেল, অশ্লেষা-তিথিতে যাত্রা করা হয়েছিল।

ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহে দুটি জিনিষ থেকে আমি নিজেকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছি—পকেট-মার আর জুতো-হারানো। নেমন্তন্ন বাড়ীতে জুতো হারানো কম উত্তেজক নয়। জুতো পরতে এসে যখন মালিক দেখেন তাঁর এক জোড়া নিউ কাটের পরিবর্ত্তে পড়ে আছে এক পাট ছেঁড়া বিদ্যাসাগরি চটি—আর এক পাটি স্যাণ্ডাল্, তখন পরিপাটি আহারের পরও বত্রিশ পাটি দাঁত আর একবার নিশ্‌পিশিয়ে ওঠে অপরিচিত জুতো চোরের উদ্দেশে।

বাকি ছিল বাসে চড়া, সেটাও হয়ে গেল। বস্তার মধ্যে চালের মত সরতে সরতে একেবারে কোণে গিয়ে জড়সড় হয়ে আছি। বস্তা থেকে বোমা চালিয়ে চাল বার করার মত যদি কেউ উল্টো দিক থেকে টেনে উদ্ধার করে তাহলে একটু সুবিধে হয়, কিম্বা ঊর্দ্ধবাহু হয়ে একপায়ে কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়, এ ছাড়া আর অন্য গতি নেই। ঝোলানো কোঁচাটিকে মালকোঁচা আকারে আনবার সুবিধে তাড়াতাড়িতে করে উঠতে পারিনি, এখন আর ঠিক করবার উপায়ও নেই। হাত সরানো বা কোমর বেঁকানো দুইটি তখন সামর্থ্যের বাইরে। পুষ্পকরথের কথা শুনেছি, মনে হল মস্তিষ্কে পুষ্পকের ক্রিয়া সুরু হয়েছে। এমন সময় শুনলাম—কোঁচাটা ধুলোয় নষ্ট হচ্ছে। শুনে আরো মুস্কিল হলো। কোঁচা বাগে আনবার চেষ্টা করলে অন্য লোকে পকেট সামলায়, নয়ত গোটা চারেক সজুতো ভারী পা আমার নিরীহ পায়ের ওপর চেপে ধরে। ভাবলাম—যাক্ যা হবার হবে।

কণ্ডাক্টার মিস্‌কণ্ডাক্ট্ বরদাস্ত করতে পারে না এতটুকু। চুলচেরা তার বিচার, গলা চেরা তার স্বর এস্‌প্ল্যানেডের কাছে তার কপ্‌চানো বুলির পুনরাবৃত্তি করলে—চার পয়সা টিকিট খতম। নাবতে আমায় এখানে হবেই, কিন্তু বেরোবার সাধ্য কি! মাধ্যাকর্ষণ, চুম্বকাকর্ষণ সবকটাই যেন হঠাৎ বিজ্ঞানের পাতা ছেড়ে বাসে বাসা করেছে মনে হল। পিছুটান, হ্যাঁচ্‌কানি, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, রক্তনেত্র-বাপান্ত, আর্ত্তনাদ-কাতরোক্তি সবই আছে, নেই কেবল একটা জিনিষ—আমার কোঁচা!

তাজ্জব ব্যাপার। কোঁচা তো আর এতটুকু সল্‌তে নয় যে বলা নেই—কওয়া নেই ফুড়ুক্ করে হাতছাড়া হয়ে যাবে। ঘাড় নীচু করে চোখ ঠিক্‌রে যে খুঁজব সে উপায় নেই। আশ্চর্য্য! কোঁচা ধরার যখন একান্ত প্রয়োজন তখনই তার পাত্তা নেই। কোঁচা-হারানো বাংলার ইতিহাসে বোধহয় এই প্রথম। হিন্দুস্থানীদের কথা স্বতন্ত্র, কোঁচাও নয়, কোমর-বাঁধাও নয় এমনি করেই ওদের কাপড় পরার কায়দা। যেমন কাঁসিও নয়, গামলাও নয়—তার মাঝামাঝি সংস্করণ ওদের থালা। ভাবনার সময় এটা নয়, দরজার কাছে এগিয়ে গেছি। শীতকালে শিশির ভেতর নারকোলতেলের মত দরজার মুখে সকলেই জমাট্‌ বেঁধে আছি, কারু নামবার ক্ষমতা নেই! গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত একজন আবার ঢোকবার চেষ্টা করছেন আমাদের ঠেলে। ডান হাতে তাঁর একফালি শসা। সকলে মিলে তাঁকে ঠেলে বার করবার উদ্যুগ করতেই তিনি করুণ স্বরে বল্লেন—আমায় ফেলে দেন ক্ষতি নেই. কিন্তু মুখের শসাটা আর ফেলে দেবেন না, নগদ তিনটি পয়সা দিয়ে কেনা!

ত্রিশঙ্কু অবস্থা থেকে রেহাই পেতেই হবে। বল্লাম—আপনারা নাবুন না। যেন মৌচাকে ঢিল পড়ল। অত ব্যস্ত হলে আজকাল চলে মশাই? অত যদি হয় ট্যাক্সিতে যান না কেন? ইত্যাদি গণ্ডা-গণ্ডা উচিত আর অনুচিত হুল্ ফোটাতে লাগলো ঝাঁকে ঝাঁকে।

কোনরকমে এক কাৎ হয়ে পা-দানিতে পা ছুঁইয়েছি, হুড়মুড় করে বিশাল বপু নিয়ে পেছন থেকে এক ভদ্রলোক জাপ্‌টে ধরলেন আমাকে। নিজেকে ছাড়িয়ে আর একটু অগ্রসর হবার চেষ্টা করি। 'দাঁড়ান, দাঁড়ান'—ভদ্রলোক আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে চেপে ধল্লেন। আচ্ছা মুস্কিলে পড়া গেল, বল্লাম—আপনিও পড়বেন আমিও পড়ব, আমি নামলে আপনি নামবেন। 'আমি কি ইচ্ছে করে আপনার ঘাড়ে চাপছি মশাই?'—ভদ্রলোক একটু চটেছেন মনে হলো।

সংশোধনের আশা নেই জেনে দুর্গা বলে লাফিয়ে পড়লাম।

সঙ্গে সঙ্গে পেছনের দুজন সজোরে আমার ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে পড়লেন। আমার পেছনের লোকটি সব পেছনের লোকটিকে বল্লেন—ছি ছি, আমার কোঁচাটা কোন আক্কেলে আপনি গুঁজেছেন। 'সরি'—সব শেষের লোকটি অপ্রস্তুতে ভেঙ্গে পড়েন—'ভিড়ের মধ্যে গুলিয়ে গেছে।'

তাঁর কথা শুনে আমার টনক নড়ল। নিজের কোঁচার অবস্থা দেখে হতবাক হই। বিস্ময়ে তাকাই মাঝের লোকটির দিকে—'একি আপনিও যে আমার কোঁচা টেনে নিজে হস্তগত করেছেন, তাই বলি আমার কোঁচা গেল কোথায়, কি আশ্চর্য্য।'

তিনি বল্লেন, কি করি মশাই, ভিড়ের মধ্যে শুনলাম কোঁচায় ধুলো লাগছে, তাই একটু সাবধানে কোঁচাটাকে গুছিয়ে নিলাম, দেখতে তো পাইনি, তাহলে কি আর আপনার কোঁচাটা আমি নিই আমার নিজেরটা ফেলে?

বল্লাম, আপনারটাও তো বেহাত হয়ে গেছে কিনা। শেষের ভদ্রলোকের তখন শোচনীয় অবস্থা, কারণ ভুলটা তাঁরই মারাত্মক। তিনি কাপড়ই পরেন নি, ফুল প্যাণ্ট, তাঁর পরণে। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে তিনি কৈফিয়ৎ দেন—আমার খেয়ালই ছিল না যে প্যাণ্ট পরে আছি, এক্সকিউজ মি প্লিজ্।

কোঁচা ফিরে পেয়েছি এই যথেষ্ট। বল্লাম, তাতে কি হয়েছে, আপনি তো আর ইচ্ছে করে ভুল করেন নি।

এবার থেকে ঠিক করেছি. কোঁচা-মালকোঁচার পাট একেবারে তুলে দেব। বাড়ীতে পরব লুঙ্গি, বাইরে প্যাণ্ট।

বলা বাহুল্য, এর পর সত্যচরণ আর আমায় কোনদিন একলা ছাড়েনি যতদিন কলকাতায় ছিলাম। সর্ব্বক্ষণ চোখে চোখে রাখতো পাছে কোন অঘটন ঘটে। কিছু বললে বলত, তোমার পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়, হয়ত কোনদিন বলবে 'কান নিয়ে গেল কাগে,' সারাদিন তুমি তোমার কানের পেছনে ঘুরবে আর আমরা ভেবে ভেবে মরব।

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া

জসীমূদ্দীন

ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া ঘুম ভাঙাইয়া দিল। বিছানার তল হইতেই চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিলাম, পুব আকাশের কিনারায় শুকতারা জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। আকাশের তলদেশে বর্ণের ইন্দ্রপুরী রঙীণ হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকের প্রত্যেক ছাত্রাবাস হইতে বালক-কণ্ঠের আজানধ্বনি আকাশে ভাসিয়া উঠিল। এ যেন গানের পাখীগুলি আকাশে ডানা মেলিয়া দিল। কতবার কতস্থানে কত মধুর আজানধ্বনি শুনিয়াছি কিন্তু এমন সুন্দর মোহন আজানের সুর ত কোনদিন শুনি নাই। আজানের সুর শুনিলে আমার অতীতের কথা মনে পড়ে—মুসলীম আজাদের সেই মৃতদিনগুলির কথা মনে পড়ে। যাহারা চলিয়া গিয়াছে সেই দূর দূরান্তের যুগযুগান্তের পথগুলির কণ্ঠস্বর আমি যেন শুনিতে পাই এই আজানধ্বনির মধ্যে। আজানের সুর শুনিলে আমার মৃত পিতার কণ্ঠস্বর মনে পড়ে। একবার আমি মৃত্যুর রূপ বর্ণনা করিয়াছিলাম আজানধ্বনিকে অবলম্বন করিয়া; কিন্তু আজানের আজানধ্বনি অন্যরকমের। চারি পাঁচটি ছাত্রাবাস হইতে চারি-পাঁচ রকমের আজানধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে—লহরে লহরে সুর আগমে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তারি তরঙ্গে তরঙ্গে পুব আকাশের মেঘগুলিতে রঙের ইন্দ্রপুরী গড়িয়া উঠিতেছে। যেন কোন অজ্ঞাত শিল্পী তার লুকান স্থান হইতে কিন্নর কণ্ঠের আজানধ্বনির তুলীতে পুব আকাশের কিনারা ভরিয়া এক যুগের রঙীণ ছবি আকিয়া লইতেছে। বালক কণ্ঠের মধুর আজান-ধ্বনি ভরিয়া যেন কোন রঙীণ আকাশ কুসুম ফুটিয়া উঠিতেছে।

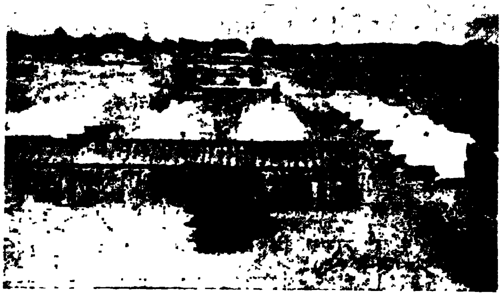
আজানধ্বনি ধীরে ধীরে সুদূর আকাশে মিলাইয়া গেল। আসমানে ফজরের আলো আরো রঙীণ হইতে লাগিল। গাছের ডালে ডালে শত শত বিহগ-কণ্ঠ জাগিয়া উঠিল। তাহারি তলে তলে শত শত বালক বিহগ-কণ্ঠ কলকাকলী করিয়া ফিরিতে লাগিল।

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার নূতন প্রভাত এইভাবে আরম্ভ হইল। বিছানা হইতে উঠিয়া মুখহাত ধুইলাম। আমার দরজার সামনে আবার সমবেত বালক কণ্ঠের তারানা গান শুনিতে পাইলাম। জামিয়া মিলিয়ার সমস্ত ছাত্রেরা একস্থানে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। প্রতিদিনই তাহারা নামাজ শেষ করিয়া সামান্য কিছু খাইয়া এইভাবে সমবেত হইয়া তারানা গান করে। গানটি দীর্ঘকালের সেই, মুসলীম 'হার হাম সারে জাঁদা হামারা'। সমবেত বালক কণ্ঠে এই গান শুনিয়া আজ এই গান হইতে যেন আরো অনেক নূতন অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম। গানের শেষে একটি সাত আট বৎসরের বালক দাঁড়াইয়া দৈনিক খবর পড়িয়া শুনাইল। বালকটির পড়ার ভঙ্গীতে অতি সহজ সাবলীল ভাব। একজন শিক্ষক উঠিয়া বলিলেন, আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ ময়লা কাপড় পরিয়া আসিয়াছেন, কেহ কেহ হাত পা ও নাক কান পরিষ্কার করেন নাই

তাহাদিগকে খুঁজিয়া আলাদা করিতে হইবে। পাঁচ ছয়জন ছাত্র অমনি ময়না (তদন্ত) কার্য্যে লাগিয়া গেল। অপরাধকারীদিগকে আলাদা লাইনে আনিয়া দাঁড় করান হইল।

ক্লাশের ঘণ্টা বাজিল। ছেলেরা যার যার ক্লাশে চলিয়া গেল। যাইবার সময় অপরাধী ছেলেদের দিকে একবার তাকাইয়া গেল। কেহ কেহ বলিয়া গেল, "তোম গান্ধা।" ইহাতে অপরাধী ছেলেরা যেন মরমে মরিয়া গেল। কেহ কেহ লজ্জায় মুখ অন্যদিকে ফিরাল। বুঝিলাম শাস্তির পরিমাণটি একটু বেশী হইয়া পড়িল। কিন্তু জীবনে ইহারা আর যে এরূপ অপরাধ করিবে এরূপ মনে হইল না। এবার অপরাধী-দিগকে শিক্ষকমহাশয় খুব কোমলভাবে বলিলেন, জনাব, আপনারা এরূপ অপরিষ্কারভাবে কখনো স্কুলে আসিবেন না। আপনারা এখনই যার যার ঘরে যাইয়া দাঁত পরিষ্কার করিয়া মুখ হাত ধুইয়া ক্লাশে আসুন। অপরাধীর দল তাড়াতাড়ি যার যার ঘরে ছুটিল।

গত খেলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিয়াছিল। পরলোকগত মউলানা মহম্মদ-আলী, হাকিম আজমল খাঁ ও ডাঃ আন্সারীর অনেকখানি স্বপ্ন এই প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। গত ১৯২০ সালে আলিগড়ে



প্রথমারম্ভের সময় জামিয়া মিলিয়ার প্রতিষ্ঠান গৃহ

ইহার জন্ম। দেশের নেতাদের আহ্বানে একদল ছাত্র গোলামখানার শিক্ষালয় ছাড়িয়া আসিলেন। তাহারা নেতাদের কাছে আসিয়া দাবী করিলেন, আমাদিগকে দেশের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে পড়িবার সুযোগ দিতে



জামিয়া মিলিয়া ইস্‌লামিয়া দিল্লী

উঠে। গত ১৯২৬ সালে ইহা আলিগড় হইতে উঠাইয়া আনিয়া দিল্লীর করালবাগ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

গত ১৯৩৮ সনে দিল্লী হইতে ১৪ মাইল দূরে যমুনা নদীর তীরে জামিয়া নগরে ইহা স্থানান্তরিত হয়। বর্ত্তমানে ডাঃ জাকির হোসেন সাহেব এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ। তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাহার মহান ত্যাগে উদ্বোধিত হইয়া কতকগুলি তরুণ যুবকও এই জামিয়া মিলিয়ার কাজের ভার লইয়াছেন। আমি সৈয়দ আন্সারী সাহেবের অতিথি হইয়া এখানে অবস্থান করিতেছি। তিনি এখানে শিক্ষক ট্রেণিংএর ভার লইয়াছেন। ইউরোপের বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া নানা দেশের শিক্ষা প্রণালী অধ্যয়ন করিয়া তিনি আমেরিকা হইতে শিক্ষাকার্য্যের ডিগ্রী লইয়া আসিয়াছেন। তিনি এখান হইতে মাসে মাত্র ৮০ টাকা বেতন লইয়া থাকেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম অন্যান্য শিক্ষকদের বেতনও এমনই। ডাক্তার জাকির হোসেন সাহেবও প্রতিষ্ঠান হইতে মাসে ৮০ টাকার বেশী বেতন গ্রহণ করেন নাই। বহু শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ করিলাম। এই অল্প বেতনের জন্য কাহারও মনে কোন ক্ষোভ নাই। আন্সারী সাহেবের ৩টি ছেলেমেয়ে। তিনি এখানে পরিবার লইয়া থাকেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি করিয়া এই অল্প বেতনে আপনি সংসার চালান?" উত্তরে তিনি মাত্র একটু হাসিলেন। তাহার অর্থ বোধ হয় এই, স্বেচ্ছায় যে দারিদ্র্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, তাহার পরিণাম হাসিমুখেই বরণ করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু মনে বার বার প্রশ্ন করিয়াও আমি এই কথার উত্তর পাই নাই, ভবিষ্যতের জন্য কি সঞ্চয় থাকিবে ইহাদের? নিজেদের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু প্রাণাধিক ছেলেমেয়েদের পরিবার পরিজনদের কি অবস্থা হইবে, যদি হঠাৎ কাহারও মৃত্যু ঘটে। অদম্য সমাজ সেবার নেশা ইহাদের এমনই মশগুল করিয়া দিয়াছে যে, নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্ত ভবিষ্যৎ সেই অনন্ত সমাজ পরিবারের মধ্যে ইহারা বিলীন করিয়া দিয়াছেন। সব শিক্ষকের কথা আমি

তাহাদের মধ্যে আমি সমাজ-জীবনের ভবিষ্যৎ গড়ার স্পৃহার সেই জ্বলন্ত অনল দেখিতে পাইয়াছি।

স্কুলের শিক্ষা-প্রণালী অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক-শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আমেরিকার শিক্ষা-জার্ণেলে কোন নূতন শিক্ষাবিধির কথা প্রচারিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা এই স্কুলে প্রবর্ত্তিত হয়। আমরা যেমন শিশুদিগকে প্রথমে বর্ণপরিচয় করাইয়া ফলা বানান শিখাইয়া তবে বিভিন্ন পুস্তক পড়িতে অভ্যস্ত করি ইহারা সে প্রণালীতে শিশুদিগকে শিক্ষা দেন না। ইহারা প্রথমেই শিশুদিগকে গল্প পড়িতে শেখান, শিশুদের ক্লাশ-ঘরগুলি বহুচিত্রসমন্বিত। চিত্রগুলির অধিকাংশই শিশুরা নিজেরাই আঁকিয়াছে। শিক্ষকদের নির্দ্দেশ অনুসারে চিত্রগুলির



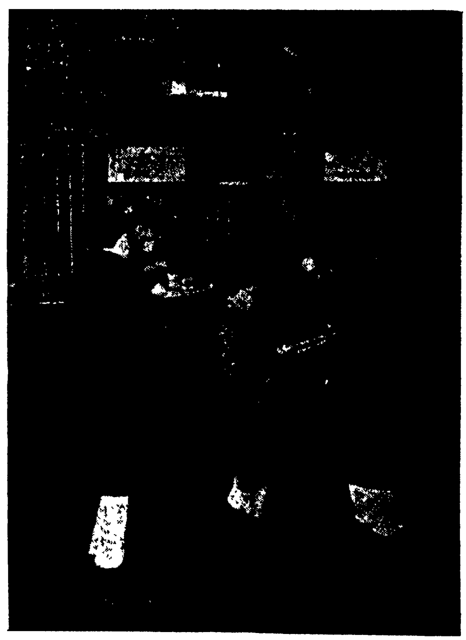
চিত্র ও শিল্পের আদশ

বিষয়বস্তু পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর অনুরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। তাহাতে চিত্রগুলি শুধু মাত্র চিত্তবিনোদনই করে না, ছাত্রদের পড়িবার নিরস বিষয়গুলি সরস হইয়া উঠে। তাহারা শুধু পুস্তক পড়িয়াই শেখে না। চিত্রগুলির সাহায্যেও পাঠাভ্যাস করে। ইহাতে শিক্ষণীয় বিষয় বস্তুর ছাপ তাহাদের মনে আরো গভীর ছাপ রাখিতে পারে।

এখানকার শিক্ষাপ্রণালীতে আরো একটি জিনিস লক্ষ্য করিলাম। শিক্ষাকার্য্য চালাইতে ইহারা কঠোর নিয়মানুবর্ত্তীর পক্ষপাতী নন। ক্লাশের ঘণ্টা শেষ হইতেই একটি ছাত্র তাহার হাতের বাঁশের বাঁশীটি বাজাইতে বাজাইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। শিক্ষক তখনও ক্লাশের বাহির হন নাই। তিনি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন না। বরঞ্চ একটু খুসীই হইলেন। এক ক্লাশে যাইয়া দেখিলাম ছেলেরা বায়না ধরিয়াছে, প্রথম ঘণ্টায় তাহারা ক্লাশ করিবে না। আজ ক্লাশ হইয়াই তাহাদের শীতের সুদীর্ঘ অবসর। সুতরাং প্রথম ঘণ্টায় তাহারা যাহা খুসী করিবে। শিক্ষক বহুভাবে বুঝাইতে চাহিতেছেন—পড়ার সময় পড়িতে হয়, গল্প করার সময় গল্প করিবে; কিন্তু কে শুনিবে সে কথা। ছেলেরা কিছুতেই শিক্ষকের কথা মানিবে না। গণ্ডগোল শুনিয়া হেড.মাষ্টার মহাশয় আসিলেন। ভাবিলাম এবার বুঝি সব ছেলে ভয়ে ভয়ে চুপ করিবে। কিন্তু তাহা হইল না। হেড্‌মাষ্টার যেন তাহাদের বন্ধু। কেহ তাঁহার বাহু ধরিয়া, কেহ তাঁহা কাঁধে ঝুলিয়া তাহাদের প্রার্থিত বিষয়টি জানাইতে লাগিল। হেড্‌মাষ্টা সাহেবও তাহাদিগকে বহুভাবে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা আ পড়িবেই না। তখন হেড্‌মাষ্টার সাহেব কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করি বলিলেন, আপনারা যখন আমাদের কথা শুনিতেছেন না, তখন আম চলিয়া গেলাম—আসুন মাষ্টার সাহেব, আমরা চলিয়া যাই। এরা বড় অভদ্র। এদের ক্লাশে আজ কোন শিক্ষকই পড়াইতে আসিবে না।

এই বলিয়া হেড্‌মাষ্টার সাহেব ক্লাশের শিক্ষকটিকে সঙ্গে লইয়া বাহি চলিয়া গেলেন। হঠাৎ ক্লাশ নীরব হইয়া উঠিল। একদল ছা শিক্ষকদের ক্লাশে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিল হেড্‌মাষ্টার সাহেব বলিলেন, আপনাদের সকলের সঙ্গে আমি কথা বলিত পারি না। আপনাদের হইয়া বলিবার জন্য আপনাদের ক্যাপটেনে পাঠাইয়া দিন। ছেলেরা ছুটিয়া যাইয়া তাহাদের দলপতিকে পাঠাই দিল। হেড্‌মাষ্টার সাহেব তাহার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে নিজে ঘরে প্রবেশ করিলেন।

এখানকার ছোট ছোট বালকদিগকেও শিক্ষকেরা 'আপনি' বলি সম্বোধন করেন। "দেখিয়ে জনাব, জেরা মেহেরবানি করকে শুনলিয়ে এইভাবে তাঁহারা ক্লাশের শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ করেন। শিক্ষকেরা বলে



ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত দোকান ও ব্যাঙ্ক

ছোট ছোট ছাত্রদের এইভাবে সম্বোধন করিয়া শিশু বয়স হইতেই তাহাদে মনে তাঁহারা একটি আত্মমর্য্যাদার ভাব ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হন।

জামিয়া মিলিয়ার ছাত্রদিগকে শুধু মাত্র পুঁথিগত বিদ্যা শিখাইয়াই কর্ত্তৃপক্ষেরা খুসী থাকেন না। শিশু বয়স হইতেই হাতে কলমে অনেক কিছু শিখাইয়া তাহাদিগকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলেন।

এখানে চিত্রবিদ্যা বিভাগ, কৃষি বিভাগ, বয়ন বিভাগ, পুস্তক বাঁধাই বিভাগ, মৃৎশিল্প বিভাগ প্রভৃতি খুলিয়া তাঁহারা ছাত্রদের বিভিন্ন মনোবৃত্তির স্ফুরণে সাহায্য করেন। ছোট ছোট ছেলেদের একটি ব্যাঙ্ক আছে। এই ব্যাঙ্কে ছেলেরা নিজেদের হাত খরচের টাকা জমা দেয়। চেকের সাহায্যে দোকানগুলি হইতে বিভিন্ন দ্রব্য তাহারা ক্রয় করিতে পারে। ছেলেদের ব্যাঙ্কটি ছেলেদের দ্বারাই পরিচালিত হয়।

এখানে ছোটদের পরিচালিত দুইটি দোকান আছে। এই দোকানে লজেঞ্জ, বিস্কুট, হালুয়া, খাতা, পেন্সিল প্রভৃতি পাওয়া যায়। ছেলেরা পালা করিয়া এই সব দোকানের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। আমাদের ছেলেবেলার কথা মনে হইল। যে বয়সে আমরা ইঁদুরের মাটি, ভাঁঙা-চাড়া এবং কচুর পাতা লইয়া দোকান দোকান খেলা করিতাম, সেই বয়সের ছেলেরা এখানে সত্যকার দোকান পাতিয়া তাহার পরিচালনার শিক্ষা করিতেছে।

জামিয়া মিলিয়ার ছাত্রাবাসগুলির বারেন্দায় ছেলেদেরই আঁকা নানা রকমের ছবি টাঙান থাকে। এই সব ছবি মাঝে মাঝে এ-ঘরে ও-ঘরে বদল করিয়া দেওয়া হয়। এখানে ছেলেদের কোন কাজকেই অবহেলা করা হয় না। দুই তিনটি বালক কবির সঙ্গে আলাপ হইল। শিক্ষকদের কাছে ইহারা নানাভাবে উৎসাহিত হইয়া থাকে।



শয়নাগার

এখানে নানাস্থান হইতে ছাত্র আসিয়া থাকে। সুদূর আফ্রিকার ছাত্রও এখানে দেখিলাম। পূর্ব্বে বঙ্গদেশ ও পশ্চিমে সুদূর আফগানিস্থান হইতেও ছাত্র আসিয়া এখানে পড়াশুনা করিতেছে।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ-স্বরূপ ডাক্তার জাকির হোসেন সাহেবের সঙ্গে আলাপ হইল। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া সমস্ত মুসলীম জাতির তথা ভারতবর্ষের মুক্তি কামনার স্বপ্ন দেখেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া মনে হইল, যেন একটা প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্বের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

তিনি বড় দুঃখ করিলেন—মওলানা ওবায়দুল্ল সিন্ধির জন্য। তিনি বলিলেন, সমস্ত ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীর যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় মৌলানা ওবায়দুল্লা সিন্ধির মত একজন বিদ্বানকে পাইলে গৌরবান্বিত হইত। রিক্ত হস্তে এই মওলানা ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। আরবী সাহিত্যের অত বড় পণ্ডিত কোথাও দেখি নাই। এ দেশের লোক তাহাকে গ্রহণ করিল না। অল্প আহার পাইয়া না খাইয়া তিনি মারা গেলেন। অথচ তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে তাহার বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানতপস্যায় আমরা অনেক কিছু লিখিতে পারিতাম। জামিয়া মিলিয়ার কথা শুনিয়া তিনি এখানে আসিয়াছিলেন। হাতে পয়সা ছিল না। ছয় আনার পয়সার অভাবে বাসের টিকিট কিনিতে পারেন নাই। প্রখর গ্রীষ্মের দুপুরে তিনি পায়ে হাঁটিয়া দিল্লী হইতে জামিয়া মিলিয়ার এই দশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন।

আমি বলিলাম, এই মওলানাকে আপনার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জড়াইয়া রাখিলেন না কেন?

তিনি উত্তর করিলেন, কবি সাহেব, আমার প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত ছিল না।



স্নানের আনন্দ

তার জন্য একটা আরবি বিভাগ খুলিয়া তাহাতে প্রয়োজন অনুসারে গ্রন্থাগার না দিলে ত তিনি কাজ করিতে পারিতেন না।

আমি বলিলাম, এই সুবিশাল ভারতবর্ষে এমন লোক কেহ ছিল না যে এই মওলানাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে?

তিনি উত্তর করিলেন, কেহ কিছু অর্থ সাহায্য করিলেও তিনি তাহার রাজনৈতিক সমতাবলম্বীদের দান করিয়া ফেলিতেন। আদর্শবাদের ইন্ধন এমনই করিয়া তিলে তিলে দাহন করে। এই মওলানার নামে একটি আরবি বিভাগ জামিয়া মিলিয়ায় শীঘ্রই খোলা হইবে।

আমাদের ফরিদপুরের তরুণ কর্ম্মী সোদরপ্রতিম মোহন মিঞার কথা উল্লেখ করিলাম। বলিলাম, কিছুদিন আগে তিনি আপনার জামিয়া মিলিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তিনি এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান ফরিদপুরে স্থাপন করিয়াছেন। রাজনৈতিক জীবন ত্যাগ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানে তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব নিয়োগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

এ খবর শুনিয়া জাকির হোসেন সাহেব বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। প্রয়োজন হইলে জামিয়া মিলিয়া হইতে তিনি সেখানে শিক্ষক পাঠাইতেও পারেন এরূপ কথাও বলিলেন।

জাকির হোসেন সাহেবের সঙ্গে আমাদের নিপীড়িতা সর্ব্বহারা মুসলীম সমাজের ভবিষ্যৎ বিষয়ে আরো অনেক আলাপ হইল। সমাজকে দেশকে তিনি কত ভালবাসেন। মুসলীম সমাজের অন্তস্তলে মিথ্যার বিরুদ্ধে অসত্যের বিরুদ্ধে বিপ্লব সৃষ্টি করিতে হইবে। দেশের সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে,বক্তৃতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেই বিপ্লবের ইন্ধন দিকে দিকে ছড়াইয়া দিতে হইবে। জামিয়া মিলিয়ার ছাওনীতে তিনি মুসলীম ভারতের সকলকে সেইজন্য একত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

জামিয়া মিলিয়া ছাড়িয়া আবার সুদূর দেশে ফিরিয়া চলিয়াছি। এখানকার শিশুবন্ধুদের ফুলের মত সুন্দর মুখগুলির স্মৃতি আমাকে অশ্রুসজল করিয়া তুলিতেছে। কোথায় সেই বঙ্গদেশের মক্তবগুলিতে বেত্রহস্তে মৌলবী সাহেবের আস্ফালন। বাঙ্গলা, আরবী, উর্দ্দু, ইংরাজী ভাষার বর্ণমালার কারাগারে শিক্ষার ফেরৈয়া সেখানে সহস্র অন্যায়ের অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত।

কাঠের বাক্স

শ্রীঅনিলচন্দ্র রায়

ঠাকুরমার কাঠের বাক্সটার প্রতি লোভ অনেকেরই ছিল। তার প্রধান কারণ বোধ হয় ঠাকুরমা এক মিনিটের জন্যও বাক্সটাকে হাতছাড়া করতেন না। স্বল্প-পরিসর, আলো বাতাসহীন শোবার ঘরের বিছানার ঠিক শিয়রের পাশে একখানা শতছিন্ন চাদর দিয়ে বাক্সটা জড়িয়ে রাখতেন,আর রুদ্রাক্ষের মালা জপ করতে করতে শীর্ণ শরীরের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি দিয়ে বাক্সটার দিকে চেয়ে দেখতেন।

উঠতি বড় পরিবার; নাতি্-নাতনি বৌ-ঝির অভাব নেই। তিন তিনটে ছেলেই কৃতী, বৌদের দুঃখ নেই। নাতিরাও বড় হয়েছে। কেউ কলেজে পড়ে, কেউ বা সদাগরি অফিসে কাজে লিপ্ত হয়েচে। ঠাকুরমার জন্য তারা নামাবলী, কলির মাহাত্ম্য, সময় সময় ক্ষীরের মোহন সন্দেশ প্রভৃতি খাবারও সযত্নে নিয়ে আসে, আর এই স্নেহ-সিক্তা বৃদ্ধা পরম সন্তোষ সহকারে সেগুলি টেনে নিয়ে কাঠের বাক্সটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ দৃষ্টি প্রদান করেন।

সকলেই ভাবে কাঠের এই জীর্ণ পদার্থ টার মধ্যে কি অপরূপ সামগ্রী আছে যার জন্য ঠাকুরমার এত ব্যস্ততা!

বাড়ীর কর্ত্তা পুরানো জমিদার ছিলেন—যাবার সময় সমস্ত জিনিষই চুলচেরা ভাগ করে ছেলেদের দিয়ে গেছেন। নিজের স্ত্রীকে পৃথকরূপে কিছু না দিয়ে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছেলেদের ওপরই দিয়ে গেছেন। কর্ত্তব্যপরায়ণ ছেলেরাও মাকে যথাসম্ভব সুখেই রেখেছে। স্নেহবৎসলা বৃদ্ধা নিজের অলঙ্কারাদি সমস্তই হাসিমুখে পুত্রবধূদের উপহার দিয়েছেন, শুধু এই কাঠের বাক্সটার বেলাতেই তিনি রূঢ়। কেউ ওটার কাছে গেলেই তিনি অসম্ভব বিরক্ত হতেন।

ছেলেরা বৌদের সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা করে—কর্ত্তা পাকা লোক ছিলেন, সার ও সেরা জিনিষটুকু বোধহয় মায়ের হেফাজতেই রেখে গেছেন। বৌয়েদের মধ্যে কাঠের বাক্সটি পাবার, প্রচেষ্টায় ঠাকুরমার প্রিয় ভাজন হবার কত প্রতিযোগিতাই না চলে। কিন্তু সবই বৃথা! সবাই ভাবে, কবে বা তিনি যাবেন, কবে সোনার তাল হাতে আসবে।

কিন্তু ঠাকুরমা তো ময়দানবের পরমায়ু নিয়ে আসেন নি, তাই সকল আশা আকাঙ্ক্ষা কৌতূহলের নিবৃত্তি করে তিনি সত্যিই একদিন সকলকে ছেড়ে চলে গেলেন। বৃদ্ধার শেষ নিঃশ্বাসের সময় পর্য্যন্ত কাঠের বাক্সটা ঠিক তাঁর নির্ব্বাক্ নিস্পন্দন বুকের মত একান্ত পাশেই ছিল। ঠাকুরমাকে নিয়ে যাবার আগে ছেলেরা সকলেই ঠিক করলেন—বাক্সটা সকলের সামনে খুলতে হবে ও ভাগ বাঁটারার ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে হবে।

তাই হলো। আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে বড় ছেলে খেলাবার ভার নিলেন—বহুদিনের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি ও অধীর আগ্রহ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো তাঁর কম্পিতচঞ্চল বুকে। চাদর খুলে বিবর্ণ বাক্সটার চাবিটা ঘোরাতে যেয়ে বড়র হাত একটু যেন কেঁপে উঠলো। বাক্সর ডালা খুলে গেল। একখানা অর্দ্ধভগ্ন ধূলিমলিন চিরুণী, কয়েকটা পুরোনো চারআনি, দুটো ডবল পয়সা, একটা আধুলি, কয়েকটা বড় বড় কড়ি।

সাগ্রহে মেজ বল্লে—ঐ এককোণে দেখচি কাগজে জড়ানো কি; হ্যাঁ ঐ তো রয়েচে—বড় ক্ষিপ্রহস্তে তাড়াতাড়ি কাগজের ছোট প্যাকেটটা টেনে আনলো ও তাড়াতাড়ি খুলতেই বেরুলো—একরাশ সিঁদুর ও একখানা ভাঙা শাঁখা।

ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে ছেলেরা বলে উঠলো, সংস্কার বটে!



বেঙ্গল ইম্‌পোর্ট কোং লিঃ

শ্রীসন্তোষকুমার দে

"এত বড় যুদ্ধটা গেল, একটা কিছু করে ওঠা গেল না," "জীবনে হাযুদ্ধ দুইটা আসে না" ইত্যাকার আফশোস অবিনাশের মনেও ছিল। টাকা কে না চায়, বিশেষত সে দরিদ্র পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি। দুর্ভিক্ষের মুখে পড়ে পরিবারবর্গকে দু'টি ক্ষুধার অন্ন ও পরিধানের বস্ত্র যোগাতে তাকে হিমসিম খেতে হয়েছে। সকালে টিউসানি ও দ্বিপ্রহরে কেরাণীগিরি করেও যখন কুলিয়ে উঠতে পারছিল না সেই সময় সে একটি পার্ট-টাইম চাকুরি জুটিয়ে নিলে। সন্ধ্যা সাতটা হ'তে রাত দশটা, একজন ব্যবসায়ীর গদিতে লেখা পড়ায় কাজ, পারিশ্রমিক ত্রিশ টাকা। মন্দ কি! মন্দ তো নয়ই, বরং ভালোই। সব মিলিয়ে অবিনাশ যা আয় করে, তাতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হ'তে লাগল।

পঞ্চাশের মন্বন্তর এই ভাবে কাটল। ইতিমধ্যে তার সকালের টিউসানিটি হাত ছাড়া হয়ে গেল। ছাত্রের পিতা মিলিটারি কণ্ট্রাকটর, তিনি দক্ষিণ কলকাতায় বাড়ী কিনে উত্তর কলকাতার অন্ধগলি হ'তে উঠে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশের টিউসানিটাও গেল। দশটা টাকা মাসিক আয় কম, মাসের শেষে ট্রামের পয়সা ঘাটতি পড়ে, সিগারেট ছেড়ে বিড়িতে নামতে হয়। তবু মন্বন্তর পার হয়ে অবিনাশ ও তার পরিবারবর্গ জীবিত অবস্থায় এপারে এসে পড়েছে। এখন সেই বাত্যাবিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গে মৃত্যুর হাতছানি অতটা যেন প্রকট নয়। এখনও রোজই কাগজে দুঃস্থদের মৃত্যু সংখ্যা মুদ্রিত হয়, কিন্তু লোকের সেটা গা সওয়া হয়ে গেছে।

সন্ধ্যার চাকুরিটি আছে। শুধু আছে নয়, পাঁচ টাকা বেতনও বেড়েছে—এখন পাচ্ছে পঁয়ত্রিশ। ব্যবসায়ের মালিক বনমালীবাবু সজ্জন ব্যক্তি। আর দশ রকম কারবারের সাথে সুতোর কারবারও তাঁর ছিল। যুদ্ধের সুযোগে এবং প্রকৃতপক্ষে অবিনাশের পরামর্শেই তিনি সহরোপকণ্ঠে একটি গ্রামে কয়েকখানি তাঁত বসিয়ে ব্যাণ্ডেজের কাপড় বুনিয়ে বড় বড় কোম্পানিতে গোটা থান সরবরাহ করে দুপয়সা পাচ্ছিলেন। দু'পয়সা হতেই দশ পয়সা হ'ল এবং বনমালীবাবুও দু'খানা বাড়ী কিনলেন। প্রতি রবিবারে অবিনাশ যেত তাঁতশালায়, বস্তুত সেটা কোনও কারখানা নয়, তাঁতিপাড়া। তারা সুতোর যোগান পাচ্ছে বনমালীবাবুর কাছে; আর গামছার মত ফাঁকবুনানীর কাপড় বুনে দিচ্ছে গজকে গজ। দিন রাত কাজ হচ্ছে। ছেলে বুড়ো সবার মুখে হাসি পঞ্চাশের মন্বন্তর তাদের প্রাণে মারে নি। দেখে অবিনাশের ভালোই লাগত। সে অবাক হয়ে বসে বসে তাদের কাজ দেখত—মেয়েরাও কেমন ঘরের কাজ সেরে পুরুষের সহায়তা করছে তাঁতিপাড়ার মাতামাতি কিছু দূর হতেই স্পষ্ট শোনা যেত। ঠক্ ঠক্ করে তাঁত বুনে চলেছে তজিমদ্দি—মাটির মেঝে খুঁড়ে তার মধ্যে পা ডুবিয়ে

বসেছে। স্বল্প সরঞ্জাম, বলতে গেলে আয়ও সামান্যই। কিন্তু তাদের আনন্দের পরিমাণ অপরিমেয়। হাসিটি মুখে লেগেই আছে। তারা জানে না, জানতে চায়ও না তাদের তৈরী কাপড়ে কি হবে। যুদ্ধ তাদের কাজ জুটিয়েছে—জুটিয়েছে মুখের অন্ন, পরিধানের বস্ত্র, তাতেই তারা খুশী। কোথায় কারা প্রাণ দিচ্ছে, কাদের শেষ শয্যায় সহায়তা করতে এই গজ লিন্ট ব্যবহৃত হবে, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন তাদের নেই।

বনমালীবাবুর বিশ্বাস ছিল, যুদ্ধ ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপেই এসেছে। মানুষ মরবার জন্যই জন্মায়। মরণ তাদের অবধার্য। তবু দশ জনের মৃত্যু যদি এক জনের পকেটে দু'টি পয়সা জুগিয়ে দিতে পারে সে এমন মন্দই বা কি! ব্যবসায়ে পয়সা পেতে লাগলে ব্যবসায়ীর লোভ বেড়ে চলে, প্রার্থনা হয়—ভগবান, যুদ্ধ যেন আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

যুদ্ধ চলতে থাকলেও সুতোর বাজারে বোমা পড়ে গেল। সরকারি ঘোষণায় সুতো নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেল। চিঠি পত্র দিয়ে, ঘোরাঘুরি করে কোন রকমেই সুতোর বন্দোবস্ত করা গেল না। বনমালীবাবুর সরবরাহ যে সব বড় বড় কোম্পানীতে সেখানেই তার আবেদন নিবেদনের শেষ সীমানা নয় জেনে অবিনাশকে নিয়ে দিল্লিতক্ দৌড়াদৌড়ি করিয়ে দেখলেন। ছুটাছুটিতে পায়ের সুতো ছিঁড়বার যোগাড় হল, তবু তাঁতের সুতোর যোগাড় হ'ল না। অতএব তাঁতিপাড়ার তাঁত গেল বন্ধ হয়ে। তাঁত বন্ধ হ'লে একবার অবিনাশ গিয়েছিল সেই গাঁয়ে। দেখে এসেছিল, তাঁতিদের মুখে নেই হাসি, তাঁতগুলি সব স্তব্ধ হয়ে আছে। সারা পাড়ার সেই বিষণ্ণ কাতর মূর্তি তার অন্তরে পীড়া দিতে লাগল।

কিছু দিন পরে ইউরোপে যুদ্ধাবসানের সংবাদ পাওয়া গেল। সেদিন সন্ধ্যায় বনমালীবাবু অবিনাশকে খবরের কাগজখানি দেখিয়ে খুব উৎফুল্ল চিত্তে বল্লেন—ওদিকের যুদ্ধ তো মিট্‌ল। এবার আমদানি রপ্তানির কারবার বড় করে হ'বে। বাজারে কাপড়ের যা চাহিদা, যদি দু এক চালান বিলাতী কাপড় এনে ফেলতে পারেন তবে এক কিস্তিতেই বাজিমাৎ হবে। আপনি লেখা পড়া করে এ বিষয়ে তত্ত্ব তল্লাস নিন। কাপড় হোক, ওষুধ হোক, বিদেশ হতে যা আনা যাবে তাতেই এখন পয়সা।

আমদানী কারবার বড় করে করবার উদ্দেশ্যে বনমালীবাবু একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি রেজেষ্টারি করলেন, নাম হ'ল 'বেঙ্গল ইম্পোর্ট কোম্পানি লিমিটেড'। সুতোপটির পয়সায় তার মোটা মূলধন দাঁড়িয়ে গেল।

আমদানী ব্যবসায়ের ফন্দি ফিকির অবিনাশের সব জানা। সওদাগরি অফিসের কাজে সে পাকা, কাষ্টম্‌স্ হাউসে তার বন্ধুবান্ধব রয়েছে, সুতরাং নূতন কোম্পানীর তরফে আমদানির অনুমোদনপত্র তার হাতে আসতে বিলম্ব হ'ল না। লাভের আশায় বনমালীবাবু অবিনাশকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। তার বেতন দিলেন বাড়িয়ে। এমনও আশা দিলেন, তার দিনের বেলার অফিসের বেতনের চতুর্গুণ দিয়ে তাকে আছে, ক্ষমতার আছে উন্মাদনা। অবিনাশ কল্পনার পাখায় ভর করে উড়ে গেল তার সুতোপটির ছোট খুবরি পেরিয়ে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে। লিফটে উঠে গেলে তিনতলায়—গোটা ফ্লাটটা তাদের অফিস। দরজায় পিতলের ফলকে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—'বেঙ্গল ইম্পোর্ট কোম্পানী লিমিটেড্'। অফিসে লাইন বেঁধে কেরাণীদের টেব্‌ল্, টাইপিষ্টদের খট্‌খটানি। এক দিকে সারি সারি অফিসারদের চেম্বার। পুসডোরের মাথায় ক্রোমিয়াম প্লেটে অফিসারের নাম লেখা। তারই মধ্যে সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে ভালো চেম্বারের সম্মুখে লেখা 'জেনারেল ম্যানেজার'। সামনে টুলে বসে উর্দ্দি পরা বেয়ারা। এটা অবিনাশের ঘর। নিজের নামটা দরজার উপরে লিখতে সে অপমান বোধ করে। টেলিফোন অপারেটার ইহুদি মেয়েটি দেখতে বেশ। কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, বল্লে, স্যার, রোটারি ক্লাব হ'তে ফিরবার পথে স্যার ড্যানিয়েল রিচার্ডসনের সাথে আপনার—

বনমালীবাবুর কথায় অবিনাশের কল্পনা বাধা পায়। বনমালীবাবু বল্লেন—এক্‌স্‌পোর্ট ইম্পোর্টের কাজই এখন চলবে শুধু, কি বলেন অবিনাশবাবু? ফ্যালাও কারবার হবে। মশাই এই আশাতেই বেঁচে আছি। জাহাজ ভরে মাল আসবে, গুদাম ঠেসে মাল তুলব, লরি ভরে মাল ডেলিভারি দেব, দশটা সরকার জেটিতে ঘুরবে, বিশটা দালাল গদিতে বসে থাকবে, দিনরাত বাজার সরগরম, তবেই না ব্যবসা! এই ব্যবসা মশাই আমার পৈতৃক জিনিষ, এর ঘাঁত ঘোঁত সব জানি। না হ'লে দেশী জিনিষের কারবারে মশাই হাঙ্গাম হুজ্জতই সার। লাভের বেলায় লবডঙ্কা। দিশি কোম্পানীর আজ এটা আছে তো কাল ওটা নেই, জিনিষের কোন ষ্ট্যাণ্ডার্ড নেই, খরিদ্দারের খাঁক্‌তি নেই। বকতে বকতে মুখ খারাপ। যুদ্ধের দরুণ আর কিছু পায় না তাই নিচ্ছে, বিলিতি জিনিষ এলে ও আর কেউ পুঁছবে না। আপনি এই কারবারে একবার ঢুকে দেখুন, আদি অন্ত পাবেন না। ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়, শেফিল্ডের ছুরি কাঁচির মত যেখানকার যে জিনিষটি ভালো গুদামে এনে তুলুন, আর বেচে ঘরে পয়সা তুলুন।

বনমালীবাবুর উৎসাহ অবিনাশের কল্পনাকেও যেন ছাপিয়ে গেল। তার চোখে মুখে কিসের দীপ্তি অবিনাশ ঠিক বুঝতে পারে না। সে কি কেবল ভবিষ্যৎ লাভের আশা, না তার চেয়েও বেশী কিছু?

রাত্রিবেলা ছাদে শুয়ে অবিনাশ আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। আকাশে মেঘ নেই। তারাগুলি ইতস্তত ছড়ানো। বাঁকা চাঁদের ম্লান আলোকে চতুর্দিকে ঈষৎ উজ্জ্বল কজ্জ্বল বর্ণের মধ্যে যেন কেমন বিষাদ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। ইউরোপের যুদ্ধের অবসান ঘটেছে, জাপানও সম্প্রতি পরাজিত হয়েছে, পৃথিবীর অশান্তি দূরীভূত হ'তে চল্ল। কেউ কোথাও আর অসুখী থাকবে না, কারো কিছু অভাব থাকবে না—সেদিন বুঝি আসছে। আমদানি রপ্তানি ব্যবসায় পৃথিবীর একপ্রান্তের সামগ্রী অপর প্রান্তে পৌঁছে দিয়ে বণ্টন করবে সম্পদ। বনমালীবাবুরা আরো বড়লোক হবেন, অবিনাশদের মত যারা চাকরীজীবী তাদেরও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হবে।

অবিনাশের বিষণ্ণ হওয়ার কোন কারণ নেই। এ সব বিবেচনা করেও কিন্তু অবিনাশ মনে শান্তি পেল না। বাতাসে যেন বেদনা ছড়িয়ে দিচ্ছে, চাঁদের ম্লান আলোকে কাদের ম্লান মুখের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

ছাদের পাশের একটা গাছের ছায়ায় ছাদের খানিকটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ছায়াটা অবিনাশ যেন কিছুটা শীতল অনুভব করলে। তার মনে পড়ে গেল, বারাসত ষ্টেশনে নেমে খানিকটা পথ চলে গেলে ছোট একটি বিল পড়ে। তার কোথাও এতটুকু ছায়া নেই। সেই রৌদ্রতপ্ত বিলপথ অতিক্রম করলে পাওয়া যেত ছোট তাঁতিপাড়া। সেখানকার আমগাছের শীতল ছায়ায় সে যেয়ে বসত—তখন তাঁতিপাড়া কর্মোদ্যমে মুখর। তাঁতিদের সে মুখের হাসি আজ মিলিয়ে গেছে। সুতার উপর কণ্ট্রোল একদিন উঠে যাবে, কিন্তু তখন জাহাজভরে আসবে ম্যাঞ্চেষ্টারের মিহি ধুতি, শাড়ী, সার্টিং, টার্কিশ তোয়ালে। খসখসে শাড়ী আর চড়চড়ে গামছা তখন কেউ পছন্দ করবে না।

বনমালীবাবু বলেছিলেন, শেফিল্ডের ছুরি কাঁচি আমদানির কথা। কাঞ্চননগরের কামারদের কথা অবিনাশের মনে পড়ে। অবিনাশের মামাবাড়ী কাঞ্চননগরে। মামাবাড়ীর পাশে এক কামার বাড়ী। রাস্তার পাশে একটা বড় বাদাম গাছ, তারই তলায় কামারশালা। সেই কামারশালার ছবি অবিনাশের মনে পড়ে যায়। শেফিল্ডের শাণিত শলাকা সেই বৃদ্ধ কর্মকারের বুক ভেদ করে গিয়েছিল। হয়ত তার পুত্রপ্রপৌত্রেরা এই যুদ্ধের বাজারে ঘরের খড়ের চাল ফেলে মাটির টালি দিয়েছে। কিন্তু এই সাময়িক সমৃদ্ধি ক'দিনের? আবার শেফিল্ড আসচে তার শাণিত ছুরি উঁচিয়ে। একদিন তাঁতিরা বুড়ো আঙুল উপহার দিয়ে বরণ করে নিয়েছিল, ম্যাঞ্চেষ্টারকে বসিয়েছিল তাকে মসলিনের মসনদে। আজ শেফিল্ড আর নিউইয়র্ককে অভ্যর্থনা জানাতে হবে শির উপহার দিয়ে। আর সেই শিরশ্ছেদের রক্ত লেহন করতে সাগ্রহে জিহ্বা বাড়িয়ে দেবেন বনমালীবাবুর দল। তাদের ব্যবসায় বিস্তৃত হ'বে, ফ্যান ফোন সাজানো সাত মহলা অফিস দেশের গৌরব বৃদ্ধি করবে।

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার এই ভয়াবহ রূপ আশঙ্কা করে অবিনাশ উঠে বসল। "পোষ্ট ওয়ার রিকনষ্ট্রাকসান" কথাটা যাদের মাতৃভাষা, কথাটাও তাদের পক্ষেই প্রযোজ্য। নতুবা "পোষ্ট-ওয়ার রি-ডেষ্ট্রাকসান" বললেই বা ক্ষতি কি? দেশীয় শিল্পের শবাসনে এই যে বাণিজ্য লক্ষ্মীর আবাহন, এই পরতন্ত্র সাধনায় পুঁজিপতিদের যত সুবিধাই হোক তাও সাময়িক। শ্রমিকের অন্ন মরলে তাদের অন্নেও কি একদিন টান পড়বে না?

মনে হয়, মানুষের বুদ্ধি দ্বিবিধ, একটা আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থ-বুদ্ধি-প্রণোদিত। নিজের প্রয়োজন নিয়েই সে তৃপ্ত। সেই বুদ্ধি প্রবল হ'য়েই বনমালীবাবুরা আমদানি কারবারের লাভের আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুভব করলেও বিচার করবার অবকাশ তাঁরা পান না। আর একটা বুদ্ধি ব্যাপ্ত, সকলের কল্যাণ-দর্শনই তার স্বভাব। ব্যক্তি স্বার্থ অপেক্ষা জাতি-স্বার্থ, সমাজ-স্বার্থ, দেশ-স্বার্থ চিন্তা করাই তার স্বভাব। সেই চিন্তা অল্প-বিস্তর সবার মধ্যেই থাকে। অভাবে অনটনে, নিত্যকর্মকঠোরতায় সেটা সহজে আবিষ্ট হয়ে পড়ে, কিন্তু সে চেতনাকে জাগিয়ে দিলেই সাড়া পাওয়া যায়। আমদানি বাণিজ্যের মোহে যখন ব্যবসায়ী মহল উন্মাদ হয়ে উঠেছেন, সেই মোহবন্যায় নিজেকে ভাসিয়ে দিতে দিতে অবিনাশের চিত্তে সেই সর্বমুখী চেতনা সাড়া দিয়ে গেল।

পরদিন কাগজে অবিনাশ বিজ্ঞাপন দেখতে পেল—কর্পোরেশন কমার্শিয়াল মিউজিয়ম স্বদেশী পণ্য রক্ষার আবেদন জানিয়েছেন, আর তারই পাশে বড় বড় হরফে বিজ্ঞাপন—আমেরিকা হতে ভালো হ্যারিকেন ল্যান্টার্ণ এসে পড়েছে আমাদের অন্ধকার হ'তে আলোকে নিয়ে যেতে'—এই সুসংবাদ! দুলে উঠল তার মন, ফুলে উঠল তার বুক—শবদেহে প্রাণ সঞ্চারের আনন্দ। স্বদেশী আন্দোলন, বিদেশী পণ্য বর্জন প্রভৃতি আন্দোলনের ধারা ক্ষীণতর হয়ে দেশবাসীর মন হতে মিলিয়ে গেছে। নেতৃবৃন্দ বন্দীশালায় অবরুদ্ধ, বৈজ্ঞানিকেরা বিদেশ ঘুরে এসে বক্তৃতা দিয়েই খালাস—কেউ শুনল, কেউ শুনল না। শিল্পপতিরা বিদেশ ঘুরে কি নিয়ে এলেন? আমাদের ত্যাগ, শ্রম ও সহনশীলতা দিয়ে গড়ে তোলা শিল্প আমাদের বাঁচাতেই হ'বে, বৃদ্ধি করতে হবে, যোগ্য করে তুলতে হবে বিদেশীর সাথে প্রতিযোগিতার জন্য। সব কিছুর মূলে তাই চাই স্বদেশী পণ্য গ্রহণের সঙ্কল্প। যত ছোট হ'ক, স্বল্প হ'ক, তাকে আশ্রয় করেই আমাদের শিল্প-বাণিজ্য গড়ে না তুললে দেশ কখনই স্বাবলম্বী হতে পারবে না।

অবিনাশ পথে বেরিয়ে এলো। পথ দিয়ে মিছিল চলেছে স্বদেশী পণ্য গ্রহণ করবার সংকল্প বাক্য প্রচার করতে করতে। আকাশে একখানা এরোপ্লেন উড়ে গেল, দু'একটা চিল তারই পথে ভেসে চলেছে।

কামালুদ্দিন বিহ্‌জাদ

শ্রীগুরুদাস সরকার

বিভিন্ন ক্ষুদ্রক চিত্রে বায়জাদের নাম যেরূপ বিভিন্নভাবে লিখিত আছে তাহা একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে উহা একই ব্যক্তির হস্তাক্ষর নয়। চিত্রাঙ্কনের বিশেষ কোন ভঙ্গী দেখিয়া বা অপর কোনও কারণে যে চিত্র যে শিল্পীর প্রতি আরোপ করা হইয়াছে, তাঁহারই লেখা হইয়াছে মাত্র। এরূপ ক্ষেত্রে অনুমান করা যাইতে পারে যে লেখক সম্ভবতঃ পরবর্ত্তীকালের যোদ্ধা বলিয়া পরিচিত কোনও ব্যক্তি বা গ্রন্থস্বামীরই কোনও বেতনভোগী কর্ম্মচারী; হয়তো গ্রন্থস্বামীর জ্ঞাতসারেই এবং খুব সম্ভবতঃ তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই, পুঁথির মূল্য ও মর্য্যাদা বাড়িবে বলিয়া

কর্ত্তৃক এরূপ কৃত্রিম স্বাক্ষর সন্নিবিষ্ট হওয়াও অসম্ভব নয়। এ অনুমানও বিশেষজ্ঞ সমাজে উপস্থাপিত হইয়াছে যে চিত্রশিল্পীর নাম লিপিকার কর্ত্তৃক বে-আন্দাজী লেখা নয়, পরন্তু পরবর্ত্তী পারসীক ও ভারতীয় পটুয়ারা মূল-চিত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিবার সময় বায়জাদের নামটি শুদ্ধ নকল করিয়া দিয়াছে—আসল পুঁথি ও তাহার চিত্রগুলি এখন কালবশে বিলুপ্ত। ক্ষেত্র-বিশেষে এরূপ যুক্তি অসঙ্গত বলিয়া মনে না হইতে পারে কিন্তু বক্ষ্যমান 'খামসা' পুঁথিখানি বায়জাদের জীবিতকালেই লিখিত, তাই বিভিন্ন চিত্রকরের সহযোগিতার কথা এ স্থলে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। মিরাকের (মিরেকের) চিত্রগুলি তখনকার বাঁধা রীতির ষোল আনা বজায় রাখিয়া চিত্রিত, কোথাও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ নাই, তাই এই পুঁথি সন্নিবিষ্ট মিরাকের নামাঙ্কিত চিত্রগুলি লইয়া কোনও মতদ্বৈধ উপস্থিত হয় নাই। এই পুঁথিতে স্নানাগারের যে একখানি চিত্র আছে তাহা বায়জাদের নিজ রচনা বলিয়া ধারণা জন্মে। বায়জাদ যে নীল-রঙের পক্ষপাতী ছিলেন এ মতবাদ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এ চিত্রে স্নানার্থীদিগের পরিহিত সব কয়খানি কটি-বস্ত্রই (তহবন্দ্) নীলরঙের। অন্যদিকে নানান্ নক্সার রং বেরঙের গামছাগুলি তেমনি আবার বর্ণবিষয়ে শিল্পীকে যথেষ্ট বৈচিত্র্য অবতারণার সুযোগ দিয়াছে। গামছাগুলি স্নান-ঘরের দরজার অনেকটা উপরে দড়ি হইতে ঝুলান। একজন লোক, মনে হয় স্নানাগারেরই কোন পরিচারক, আঁকশির মত কিছু একটা দিয়া, একখানি গামছা টানিয়া লইতেছে। চিত্রে সর্ব্বত্রই যেন প্রাণস্পন্দনের অনুভূতি দেদীপ্যমান। কেহ জনৈক স্নানার্থীর মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিতেছে, স্নানার্থী হাত বাড়াইয়া গায়ে মাখিবার জন্য তৈল লইতেছেন। অপর দুইজন, দেখিতে মুষ্টি যোদ্ধার দস্তানার মত মোটা একপ্রকার খসখসে দস্তানা শুধু ডান্ হাতে লাগাইয়া, বোধহয় কাহারও গাত্রমার্জ্জনার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কেহ বা কাপড় নিংড়াইতেছে। স্থির নিশ্চল ভাব এ চিত্রে কোথাও নাই। চিত্রস্থ ব্যক্তিগণের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভঙ্গী শিল্পরসিকের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে।

স্নানাগারের দেওয়ালের গায়ের নক্সাগুলি আধুনিক স্নানঘরের মিনা-করা টালির নক্সার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রবেশদ্বারের উপরকার প্রসাধক নক্সা এবং তৎসংলগ্ন একটি প্রকোষ্ঠে প্রাচীরের নিম্নভাগের লতামণ্ডল, সারাসেনদিগের শিল্পের স্মৃতি বহন করিয়া আনে।

এ চিত্র বায়জাদের পরিণত বয়সে অঙ্কিত, তাঁহার সৃজনশক্তি তখন পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে।

লোকবিশ্রুত বায়জাদ যে স্থৈর্য্যবিহীন বায়জাদ (Bihzad-i-muztar) নামে অভিহিত হইতেন, জনপ্রবাদ এ সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। তাঁহার চিত্রের চলঞ্চল গতিবেগ বুঝিবা তাঁহার প্রকৃতিগত চাঞ্চল্য হইতে তদনুষ্ঠিত শিল্পে বিসর্পিত হইয়াছিল, অথবা তাঁহার এই নামকরণের মূলে তাঁহার চিত্র নিহিত গতিশীলতাই যে অবস্থিত ছিল না তাহাই বা কে বলিবে? নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী ক্রিয়াও তুলিকা সাহায্যে আয়ত্ত করার তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। প্রকৃতিগত শক্তি-বশে অত্যল্প কালস্থায়ী ঘটনা বা কর্ম্মোদ্যমও তিনি সুচারুরূপে চিত্রিত করিতে সমর্থ হইতেন। গতিজনিত প্রবল উদ্যম এবং তজ্জন্য পেশীসমূহের অতিরিক্ত বিততি বা সঙ্কোচ তিনি চিত্রপটে অপূর্ব্ব সাফল্য ও শক্তিমত্তার সহিত অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, মানব বা ইতর জীবের শারীরিক প্রয়াস ফলে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের যে উদ্যম, তাহা তাঁহার চিত্রার্পিত মূর্ত্তিগুলিতে অতিসহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই সংক্রামিত হইয়াছে। তিনি এক সাদী সৈন্যদলের বক্ষু (Oxus) নদী অতিক্রম করার যে চিত্রখানি অঙ্কন করিয়াছেন তাহাতে অশ্ব ও অশ্বারোহী উভয়েই সমভাবে স্ব স্ব শক্তিপ্রয়োগে সচেষ্ট; চিত্রখানি দেখিলেই বুঝা যায় যে আত্মরক্ষার্থ পরপারে উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াসে শুধু তাহাদের পেশীনিচয় নয়, তাহাদের প্রত্যেক স্নায়ু তন্ত্রীও যেন ওজস্বিতায় পূর্ণ ও প্রস্ফুরিত।

সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে গেলে বায়জাদের শিল্পকলাসম্পর্কে নিম্নলিখিত গুণ-চতুষ্টয়ের উল্লেখ অপরিহার্য্য। তাঁহার চিত্রে দেখিতে পাই (১) দৃশ্য কাব্যোচিত হৃদয়গ্রাহী দ্যোতনা (dramatic expressiveness) (২) সুসমঞ্জস পরিকল্পনা ও কলাকৌশল (৩) লালিত্য ও শক্তিমত্তার একত্র বিকাশ (৪) অবর্ণনীয় তুলিকাস্পর্শ (ineffable touch) যাহা প্রাণস্পর্শেরই অনুরূপ। কয়জন চিত্রশিল্পীর চিত্রে এই কয়টিগুণ একত্র সমাবিষ্ট দেখা যায়?

বায়জাদের চিত্রকর্ম্ম রণক্ষেত্রের ভীষণ সংঘর্ষ, রাজসভার বিপুল সমারোহ, এবং আরোহীদিগের সুসজ্জিত শোভাযাত্রার আলেখ্যমাত্রেই পর্য্যবসিত হয় নাই। শিকার সন্ধানেরও মরুচারী বন্যপশুর চিত্রে, উড্ডীয়-মান বলাকায়, এবং তরুপুষ্পাদিসমন্বিত শান্তিময় প্রাকৃতিক দৃশ্যে, তিনি লীলাময়ের বিশ্বলীলার নানা বৈচিত্র্য নয়ন সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। শিল্পীর লাবণ্য যোজনায় ও প্রাকৃতিক পদার্থের প্রতিকৃতি অঙ্কনের নৈপুণ্যে, ভাবরূপানুবিদ্ধ অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি কিরূপ বিস্ময়করভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে এগুলি যেন তাহারই দৃষ্টান্ত। প্রণয়মুগ্ধ তরুণ তরুণীর ললিতচিত্রও তাঁহার তুলিকাস্পর্শে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়াছে। বায়জাদের ভাবাভিনিবেশের বা ভাবব্যঞ্জনার কৃতিত্ব ও তাহার আনুষঙ্গিক রূপ-নিষ্পাদন দক্ষতা দেখা যায় তাঁহার চিত্রপটের নরনারীর মূর্ত্তিগুলিতে। তাহাদের ভাবাভিব্যক্তি স্ফূর্ত্ত হইয়াছে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া। পূর্ব্বোক্ত বক্ষুনদী অতিক্রমণের চিত্রে প্রত্যেক সৈনিক ও সন্তরণশীল অশ্ব নদী পার হওয়ার যে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, জীবন-প্রয়াসের সেই অসাধারণ ভাব সন্নিবেশের মধ্যে প্রত্যেকের বিভিন্নতা অতি সহজ ও স্পষ্ট রূপেই প্রকাশমান হইয়াছে।

বায়জাদ ও বায়জাদের সমধর্ম্মী কয়েকজনকে বাদ দিলে দেখিতে পাই যে পারসীক চিত্র শিল্পে স্থিত্যাত্মক (static) ভাবই যেন প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিদেশী শিল্পসমালোচকের চক্ষে ইহা প্রায়শঃ দোষরূপেই পরিগণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সমঝদার গতিবেগ না থাকিলে প্রাণ স্পন্দনের উপলব্ধি করিতে পারেন না। আমাদের নিকট যাহা স্থৈর্য্যরূপে প্রকাশমান, শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীতে তাহা যে গতিশীলতারই রূপান্তর হইতে

পারে, ইহা আমাদের সহসা বোধগম্য হয় না। শিল্পী যদি সম্মুখস্থ দৃশ্য এক লহমার চকিত চাহনিতে দেখিয়া লইয়া যেমনটি দেখিয়াছেন তাহাই চিত্রপটে সন্নিবিষ্ট করেন তাহা হইলে আপনা হইতেই যেন স্থৈর্য্যের ভাব আসিয়া পড়ে। এ যেন তামসী নিশীথে ক্ষণপ্রভার আলোকে দৃশ্যটি নিমেষমাত্র দেখিয়া লওয়া! সম্মুখের পথে অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছে, ক্ষণেকের তরে এ দৃশ্য নয়নপথে পতিত হইল তাহার পরই আবার তমিস্রার ঘোর আবরণ! দ্রুতগ অশ্বের গতিও এরূপস্থলে স্তম্ভিতবৎ প্রতীয়মান হয় (১) সে কালের ভাবপ্রবণ শিল্পী আমাদের যুগের বাস্তবতার ঢোলে চিত্রে ভাববিন্যাসের তারতম্য নির্ণয় করিতে জানিতেন না। চিত্রনিহিত যাহা কিছু, সবই ছিল তাঁহার নিকট ভাবপ্রকাশের সহায়কমাত্র; তাহার উপর ছিল আলঙ্কারিক (Ornamental) প্রসাধনের দিকে প্রবল ঝোঁক—বৃক্ষলতা পশুপক্ষী এমন কি নরনারীর মূর্ত্তিগুলিও প্রসাধক অলঙ্কারের ছন্দেই পরিকল্পিত ও বিন্যস্ত হইত। প্রাচ্যের চিত্র ভাবপ্রধান, তাই চিত্রকরের দৃষ্টিভঙ্গী না বুঝিতে পারিলে উহা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এ কথা মনে না রাখিলে অনেক স্থলেই রসবোধের বাধা ঘটে।

চারুশিল্পের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মানির (খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দের ধর্ম্ম সংস্কারক Mani'র) যে জনপ্রবাদ মূলক খ্যাতি ছিল বায়জাদই তাহা অপসারিত করিয়া শিল্পাদর্শকে কল্পনালোক হইতে বাস্তবতার ভিত্তিভূমে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পোয়াল্দামির (২) যথার্থই বলিয়াছেন যে বায়জাদ মানির নাম উপকথায় পরিণত করিয়াছেন (Has turned the name of Mani to a Myth')। যে আদর্শ সম্মুখে রাখিলে মানুষিক উৎকর্ষ লাভ করা যায়, বায়জাদ সেই আদর্শই বুঝিতেন। দৈবী বা কাল্পনিক কোন কিছুর সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ ছিল না।

বায়জাদের চিত্রে হস্তী অশ্ব প্রভৃতি জন্তু স্থান তো পাইয়াছেই, আর প্রবাদ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে আঁকিতে হইয়াছে মাত্র দুইটি কাল্পনিক জীব—একটি ড্রাগন ও অপরটি সিমূর্ঘ অথবা সিমুরী পক্ষী। ড্রাগনের পরিকল্পনা চীনদেশ হইতে আসিয়াছিল বটে তবে পারসীক শিল্পীর হাতে উহার মূল আদর্শ কতকটা বদলাইয়া গিয়াছে। ড্রাগনের চারিটি পা, দেহ শল্কে আবৃত, আকৃতি দৃষ্টে কুম্ভীরের সহিত সাদৃশ্যের কথাই সহজে মনে পড়ে। বায়জাদ তৎপরিকল্পিত ড্রাগনের চিত্রে শল্কগুলি রূপালী বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন। পূর্ব্বে চীনদেশের নদীগুলি নক্রসঙ্কুল ছিল। এখনও ইয়াংসী নদীতে মধ্যে মধ্যে কুম্ভীর দেখা গিয়া থাকে। যখন বর্ষাগমে জলধারায় নদীর জল বর্দ্ধিত হইয়া চারিদিক সিক্ত ও প্লাবিত হয়, তখন কুম্ভীর দল শীতের জড়তা বিসর্জ্জন দিয়া আনন্দে জলমধ্যে সন্তরণ করে। নক্রদলের ক্রীড়াচঞ্চল আকৃতির সহিত ধূমজ্যোতিসলিল মরুৎ সন্নিপাতে সৃষ্ট ক্ষণপরিবর্ত্তনশীল পুঞ্জীভূত মেঘপটলের সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া সম্ভবতঃ এই ড্রাগন মূর্ত্তির উদ্ভব ঘটিয়া থাকিবে। মতান্তরে নক্র দলের এই হর্ষোৎফুল্ল বর্ষাকালীন আবির্ভাব অজ্ঞ জনসাধারণের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে যে ড্রাগনই পর্জ্জন্যের অধিপতি—ড্রাগন হইতেই ধরণীতল বর্ষার বারিপাতে উর্ব্বরতা লাভ করে। চীনাদের ন্যায় কৃষি-প্রধান জাতিকে মৌসুমী মেঘের বারিবর্ষণের উপর কি পরিমাণে নির্ভর করিতে হয় দেবমাতৃক বঙ্গদেশে তাহা সহজেই বুঝিবার কথা। বর্ষণ সহায়ক ড্রাগন ক্রমে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত এবং অবশেষে সর্ব্ববিধ উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠতার প্রতীকরূপে যে গণ্য হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? চীনাশিল্পে এই জন্যই ড্রাগনের বহুল ব্যবহার (১)। পারসীক শিল্পে কিন্তু ইহার এই বিশেষ দ্যোতনা যে কখনও প্রকট হইয়াছিল তাহার নিদর্শন দেখা যায় না। পারসীক বীর, ঠিক সেণ্ট-জর্জ্জের ভঙ্গীতে না হউক, ড্রাগনের সহিত যে যুদ্ধে নিরত রহিয়াছেন এইরূপ চিত্রই দেখা গিয়া থাকে।

ইউরোপীয় শিল্পে পরিকল্পিত ফিনিক্স (Phoenix) পক্ষীর সহিত কতকাংশে তুলনীয়, সিমুরী অথবা সিমূর্ঘ পক্ষী পারস্যের পুরাণ কথায় যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সিমুরীর কথায় হিন্দুপুরাণের এক গরুড় পক্ষীর বর্ণনাই স্মরণ পথে উদিত হয়। সিমুরী কোনও দেবতার বাহন নয় বটে কিন্তু উহা দৈবশক্তিসম্পন্ন এবং কথা কহিতে সক্ষম। ইহার অস্তিত্ব কালমধ্যেই প্রলয়জনিত সৃষ্টিনাশ নাকি অন্ততঃ তিনবার সংঘটিত হইয়াছে। পারসীক ক্ষুদ্রক চিত্রে অনেক স্থলেই এই মহাবিহঙ্গম চিত্রিত হইয়াছে, বিশেষ করিয়া সাহনামায় উল্লিখিত কিয়ানীয় যুগের ঘটনাদির প্রসঙ্গে। প্রাচীন ইরাণের প্রসিদ্ধ বীর শাম তাঁহার সদ্যজাত পুত্র জালকে এলবর্জ্জ পর্ব্বতের উপর পরিত্যাগ করেন, জন্মকালে তাহার মস্তকের কেশ শ্বেতবর্ণ ছিল বলিয়া। জাতকের কেশের এই অস্বাভাবিক বর্ণ বড়ই অশুভসূচক বলিয়া বিবেচিত হইত। সিমুরী, পরিত্যক্ত শিশুকে পর্ব্বতশীর্ষে নিজ নীড়ে লইয়া গিয়া সযত্নে লালন পালন করে এবং বীরশ্রেষ্ঠ জাল পরে জনসমাজে অশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হ'ন। কৃষ্ণকুমার শাম্ব গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া 'সপুত্রদার' মগাখ্য ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন পৌরাণিক আখ্যায়িকার এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া জর্ম্মান পণ্ডিত ডাঃ ব্লক (Block) শামের সহিত শাম্বের একতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিয়াছেন (২)। তাঁহার প্রতিপাদ্য প্রস্তাবের সহিত শিল্পের কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে তাঁহার মতবাদ সিমুরী ও গরুড়ের অভিন্নতা সমর্থন করে।

---

(১) A. U. Pope, Introduotion to Persian Art.

(১) E. Chavounes, De l'expression des voeux dans l'art populaire Chinois. pp. 3, 4, অধ্যাপক শাবান জর্ম্মান লেখক Hirth এর মতবাদ সবিস্তারে উল্লেখ করিয়া নিজগ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। এ দেশেও কার্য্য কারণ সম্পর্কে ভ্রমাত্মক ধারণায় উপনীত হওয়ার দৃষ্টান্ত কতই না দেখা যায়।

(২) Z. D M. G., vol. 64. p. 733 ff.

শিল্পী-পরিচয়

শ্রীভোলানাথ ঘোষাল

তবর্ষের' চিত্রামোদী পাঠকবর্গের নিকট শিল্পী শ্রীসুশীলকুমার পাধ্যায়ের নাম অবিদিত নহে। ইঁহার বহু রঙ্গীণ ছবি ভারতবর্ষে শিত হইয়াছে। সুশীলকুমার মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রাক্তন এবং শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর একজন প্রিয় শিষ্য। অধুনা ন্ত্রই 'বিদ্যোদয়' মহিলা প্রতিষ্ঠানে শিল্প-বিভাগের অধ্যক্ষরূপে কাজ



শিল্পীর শিল্প—১নং

করিতেছেন। গুরু শিষ্য উভয়ে মিলিয়া দাক্ষিণাত্যবাসীর মনে যে শিল্প-বোধ গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং তুলিতেছেন, তাহা অতুলনীয়। সুশীলকুমার, মাদ্রাজ অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও—বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবের সহায়তায় দাক্ষিণাত্যে বাংলার গান, বাংলার সাহিত্য, শিল্প এবং কৃষ্টি সম্বন্ধে যে সুদূর প্রসারণ প্রচার কার্য্য করিয়াছেন সে সম্বন্ধে অনেক বাঙ্গালীই হয়ত কিছুমাত্র অবগত নহেন।

মাদ্রাজের গভর্ণরপত্নী লেডী হোপ, ডিরেক্টার অব্ পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সন্ ডক্টর বিমানবিহারী দে, মহারাজা অব্ পিথাপুরম, টাটার স্কুল অব্ সোশ্যাল সায়েন্সএর অধ্যক্ষ ডক্টর জে, এম্ কুমারাপ্পা প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ এবং হিন্দু, মাদ্রাজ মেল, ইণ্ডিয়ান্ এক্‌সপ্রেস্ প্রভৃতি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকাগুলি এই তরুণ বাঙ্গালী শিল্পীর শিক্ষকতা কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় রাঁচি নিবাসী, সুসাহিত্যিক ৺অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। রাঁচিতেই



শিল্পীর শিল্প—২নং

আই-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই শিল্প শিক্ষার অদম্য অনুপ্রেরণা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া ইনি দেবীপ্রসাদের নিকট শিল্পদীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য মাদ্রাজ চলিয়া যান।...গুরু সম্বন্ধে সুশীলকুমার বলেন যে—দেবীপ্রসাদের ন্যায় শিল্পশিক্ষক আমাদের দেশে নাই বলিলেও চলে। যে কোন ছাত্রের স্বতস্ফূর্ত্ত নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীকে অগ্রসর করিবার পথ দেখাইয়া দিতে পারেন দেবীপ্রসাদ—তাঁহার টেক্‌নিক্ সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞানের জন্য। শিল্পী সুশীলকুমারের অঙ্কন পদ্ধতিতে আমরা দেবীপ্রসাদের ছবির পুনরাবৃত্তি দেখি না—দেখিতে পাই আসল

মানুষটিকে, শিল্পীর অন্তরাত্মাকে। এখানেই হইল গুরুর কৃতিত্ব। নিজের সুবিধা অনুযায়ী বিশেষ টেক্‌নিকে টানিয়া আনিয়া চিত্রাঙ্কন সেখানো সহজ, কিন্তু তাহাতে শিল্পী তৈয়ারী হয় না। গুরুর শিক্ষা পদ্ধতির সহিত সুশীলকুমারের শিক্ষা পদ্ধতির যথেষ্ট মিল আছে।

এই সঙ্গে আমরা সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত দুইখানি কালো সাদা স্কেচ্ প্রকাশ করিলাম। সত্যকার শিল্পরসিকদের এই কাজগুলি যে আনন্দ দানে সমর্থ হইবে সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। সুশীলকুমার যে আর্টের পুরাতন এবং সহজ চলতি পথের পথিক নহেন তাহা ইঁহার স্কেচ্‌গুলি হইতেই বেশ বোঝা যাইবে। বলিষ্ঠ রচনাশক্তি এবং টেক্‌নিকে ইনি গুরুর মান বজায় রাখিয়াছেন। নিজস্ব বিশিষ্ট প্রকাশ ভঙ্গী দিয়া ইনি দেশের উচ্চস্থান অধিকারী তরুণ শিল্পীদের মধ্যে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছেন। প্রবাসী বাঙ্গালী শিল্পীর এই গৌরবে বাঙ্গালী মাত্রেই গৌরবান্বিত হইবেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই উৎসাহী কৃতী বাঙ্গালী শিল্পীকে সুদুর প্রবাসে থাকিতে হইয়াছে অন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য। বাংলাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব নাই। শিশু শিল্প শিক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এই তরুণ শিল্পীকে যদি তাহাদের একটিও দেশে আনিয়া শিল্প শিক্ষাকার্যে নিয়োজিত করে তাহা হইলে আমাদের দেশের ও দশের যে যথেষ্ট লাভ হইবে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

নবাবী

আমিনুর রহমান

বাদশাহী আমলের নবাবী আর ইংরেজ আমলের নবাবীতে অনেক তফাত আছে বৈকি। ছেলেবেলায় শুনেছিলুম সেকালের নবাবরা যে পান খেতেন তা একজন বাঙ্গালী ত দূরের কথা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিলিতি সাহেবও খেয়ে সামাল দিতে পারে নি। খানা পিনা, আদব কায়দা, বেশভূষা, কথাবার্ত্তা, চালচলন দেখে লোকে বলত, হ্যাঁ নবাব বটে। আর হালের নবাবরা তেমন নবাবী করতে গেলে হালে পানি পাবে না। এদের নবাবীর পরিচয় বড় জোর নাম করা সাহেবী হোটেলে ডেরা-বাঁধা, তিন চারটে রেসের ঘোড়ার মালিক হওয়া, গোটাকতক বাইজী অথবা চিত্রতারকা পোষানি রাখা এবং সরকারি অথবা মিলিটারী কণ্ট্রাক্টরী করে নবাবীর পয়সা রোজগার করা! এরা বাংলার নবাব অথচ ভুলেও মুখে বাংলা ভাষা উচ্চারণ করবে না, ভাবখানা যেন সদ্য আরব থেকে এসেছেন। অথচ বাঙ্গালীর প্রতিনিধি হয়ে তাঁর ব্যবস্থা পরিষদে ঢোকা চাই, যেন সেটা তাঁর অবসর বিনোদনের একটা আড্ডাখানা। এরই মধ্যে যিনি একটু পয়সাওয়ালা নবাব, তিনি নবাবী করেন হনাভা থেকে সুটের কাপড় কিনে, লণ্ডনে সুট তৈরি করিয়ে এবং প্যারিস থেকে সেই সুট পরিষ্কার করিয়ে। ব্যস্ তারপর তিন দিনে ফতুর, তারপর লম্বাচওড়া বুলিতেই যা কিছু নবাবীর পরিচয়। আগেকার নবাবরা তবু দেশের পয়সা দেশেই রাখতেন, দেশের শিল্পকলা গড়ে তুলবার সহায়ক ছিলেন, নবাবীর নাম করে বিস্তর গরীব দুঃস্থদের সাহায্য করতেন এবং এখনও করেন। আর হালের নবাবরা যা করেন তাত চোখেই দেখতে চুলোয় যাকৃগে একালের খেতাবী নবাবদের কথা, মিছামিছি কথায় কথা বেড়ে যাবে

শরিফাবাদের নবাবদের নাম শুনেছেন? শোনেন নি? সাড়ে তিনশো বছরের বনেদী নবাব। সাবেকী জৌলুষটা তেমন না থাকলেও ঠাট ঠোল আনাই বজায় আছে। নবাব মিরজা কামালউদ্দিন শরিফাবাদী এখন গদিতে। বয়সে তরুণ, কলেজে পড়েছেন, খানদানী ঘরে বিয়ে হয়েছে। তাঁর প্রপিতামহের আমলের দেওয়ানজী মুন্সি ফয়েজউদ্দিন আখন্দ এখন অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়ায় অবসর গ্রহণের বাসনা জানিয়েছেন। তাই নবাব বাহাদুর কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন ঐ পদের উপযুক্ত একজন বুদ্ধিমান, শিক্ষিত আইনজ্ঞ যুবকের জন্য। আবু তালেব নামে এক এম-এ, বি এল পাশ যুবক নবাবের চোখে ধরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে বহাল হয়ে গেল।

আবু তালেব কিছুদিন পরেই আবিষ্কার করল যে নবাববাড়ীতে অত্যন্ত বাজে খরচ হচ্ছে, যা একটু চেষ্টা করলেই বন্ধ করা যায়। কেবলমাত্র নবাব বাহাদুর আর বেগম সাহেবার খেদমতের জন্য মোতায়েন রয়েছে চারটা বড় বাবুর্চ্চি, সাতটা ছোট বাবুর্চ্চি, দশটা চাকর, তেরটা চাকরাণী, আঠারোটা মালি, আর পাঁচটা দারওয়ান। তা ছাড়া একপাল মোসাহেব ত চব্বিশঘণ্টাই ভ্যান্ ভ্যান্ করছে। এসবের মধ্যে বিশেষ করে আঠারটা মালির ওপর আবু তালেবের নজর পড়ল। মালিগুলোর কাজের মধ্যে ছমাসে নমাসে এক আধটা ফুলের চারা লাগানো, এ ছাড়া ধরতে গেলে সারাদিনই বসে

মালি ছুটে গিয়ে পাতাটা কুড়িয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে আসে। কিম্বা সেলুনে যেমন দেড়ঘণ্টা ধরে দশ আনা ছ'আনা চুল ছাঁটাই হয় তেমনি করে কোন মালি হয়ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা ঝাড়ের ওপর কাঁচি চালিয়ে হরেক রকম নক্সা তৈরি করছে। আবু তালেবের রিট্রেঞ্চমেণ্ট প্রথম মালি বেচারাদের ওপর দিয়েই সুরু হল। একদিনে যোলজন মালি বরখাস্ত হয়ে গেল। তারা কিছুতেই এই বিনা কসুরে চাকুরি যাওয়া বরদাস্ত করল না। দলবেঁধে হুজুরের দরবারে আরজি পেশ করল। নবাব সাহেব তখন বাগিচায় সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরিয়েছেন। একদল মালিকে করজোড়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন "তোমরা কি চাও?" সর্দ্দার মালি এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে সেলাম করে বললে "হুজুর মা বাপ, গোস্তাকি মাপ করবেন—দেওয়ানজী আমাদের সবাইকে ছুটি দিয়েছেন।" নবাব সাহেব অবাক হয়ে বললেন "কেন? তোমরা করেছ কি?" সর্দ্দার মালি ইতস্তত: করে বললে "হুজুর মা বাপ. তাত জানি না।" নবাব সাহেবের মুখে বিস্ময়, বিরক্তি, ক্রোধ একসঙ্গে ফুটে উঠল। তিনি তখুনি তাঁর আরদালিকে হুকুম দিলেন "দেওয়ানজীকো আব্ ভি সালাম দেও।" আবু তালেব এসে উপস্থিত হলে নবাব সাহেব এতগুলি মালির একসঙ্গে চাকুরি যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আবু তালেব বলল "হুজুর আমি ওদের কাজ পর্য্যবেক্ষণ করে দেখেছি এবং আমার বিশ্বাস যে দুটি মাত্র মালিই আপনার সমস্ত বাগিচা তদারকের পক্ষে যথেষ্ট; এতগুলি মালি রাখার কোন দরকার নেই।" নবাব সাহেব ত রেগেই আগুন, চীৎকার করে বললেন "দরকার নেই মানে? আলবত দরকার আছে, একশবার দরকার আছে। আরে কম্‌বখ্‌ত এটাও বোঝ না যে ঐখানেই আমার নবাবী।" তারপর একটু সুর নামিয়ে বললেন "নাঃ তোমার দ্বারা হবে না, আজ পর্য্যন্ত এটা মাথায় ঢুকলো না যে তোমার প্রধান কর্ত্তব্য আমার নবাবী কিসে বজায় থাকে সেই দিকে নজর রাখা? তা না করে সেই নবাবীর মর্য্যাদা তুমি ক্ষুণ্ণ করতে বসেছ?"

আবু তালেবের চাকুরি যায় নি, কারণ এও নবাব বাহাদুরের একটা নবাবী।

নন্দদুলাল

শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস এম-এ, বার্-এট্-ল

নন্দ দুলাল, কিশোর গোপাল, তুমি কি ডাকিছ মোরে?
আমি যে তোমার করুণা ভিখারী, দৃষ্টি প্রসাদ মাগি—
আমি যে তোমারে খুঁজিয়া বেড়াই সকল জনম ভোরে।
ডাকো ডাকো মোরে কাছে টেনে লও, কর মোরে অনুরাগী।
আজো বঙ্গের নর নারী যায় বল্লভপুর গাঁয়ে,
সেথা হ'তে ফিরে খড়দহে এসে পুনঃ যায় শাঁইবনা।
রাধাবল্লভ, শ্যামসুন্দর, নন্দদুলাল পায়ে—
একে একে তারা প্রণমিয়া আঁকে অশ্রুর আলিপনা।
একই পাথরের তিন বিগ্রহ তিনঠাঁই রহিয়াছে,
বীরভদ্রের আরাধ্য ধন বিলাইছে হরিনাম।
মৃদু মৃদঙ্গ করতালরোলে ঐ গান গেয়ে নাচে,
হরে কৃষ্ণ হরে রাম—নিতাই গৌর রাধা শ্যাম।
পল্লীবাসীরে ভালবেসে তুমি দূরপল্লীতে এলে,
গরীবের সাথে সুখে দুখে প্রভু রহিয়াছ এক হয়ে।
বিদুরের ক্ষুদ ভুলিতে পারো না. তাই সম্পদ ফেলে
কাঙালের বেশে, কাঙালের দেশে রয়েছ দুঃখ সয়ে।
তোমার পূজার ছলেতে আমরা নিজেরে প্রচার করি,
তাই আসিয়াছি শাঁইবনা-গাঁয়ে করি এত আয়োজন।
তোমার পূজার অর্ঘ্য হৃদয়ে লইতে পারিলে বরি,
নিজেরে প্রচার করিতে এমন হত না কাঙাল মন।

ঢাকো ঢাকো মোর মলিন মনের সকল অহঙ্কার,
তোমার চরণে মতি থাকে যেন, আর সব কেড়ে লও।
ধনের নামের যশের তৃষ্ণা জেনেছি জীবনে সার,
তবু তুমি মোরে ডাকিছ ঠাকুর, কথা কও, কথা কও!
বাঁশরীতে নয় নন্দদুলাল, কণ্ঠের বাণী চাই,
নয়নের হাসি ভুলায়েছে মোরে, চাই না ভুলিতে আর
পিতার কণ্ঠে নাম ধরে ডাকো, শ্রবণে শুনিব তাই,
প্রিয়ার বেদনে মোরে বুকে বাঁধো ঝরুক নয়নধার।
কোন দিন কিছু লুকাইনি প্রভু, তুমি তো সকলি জানো,
কোথায় মিথ্যা কোথায় ছলনা কতটুকু ভালবাসা।
ব্যথা দেবে দাও তীব্র দাহনে তীক্ষ্ণ শায়ক হানো,
শুধু নিভায়ো না তোমারে দেখার ক্ষীণতম এই আশা।
হে বংশীধর বাজাও বাজাও—হেথা মনোরম ছায়া,
হায় এ বধির কর্ণে পশে না বাঁশরীর ক্ষীণ তান।
মোর অনুরাগ নিশার স্বপন—দিবসে মিলায় মায়া,
মোর ভালবাসা বালুচর ঘর, ঝটিকায় অবসান।
কি কহিতে হবে জানিনা ঠাকুর, কি যে প্রার্থনা মোর,
মানুষেরে যেন সদা ভালবাসি, ঘৃণা নাহি করি কভু,
ব্যথিতের ব্যথা বুকে যেন পাই, ঝরুক নয়নে লোর,
জীবন মরণ ধরম করম সকলি তোমার প্রভু।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—এগারো—

কিছুক্ষণ বলরাম কোনো কথাই কহিতে পারিলেন না। যেন কী একটা যাদুমন্ত্রে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে সুরু করিয়া জিহ্বা পর্যন্ত স্তব্ধ হইয়া গেছে। একি কখনো সম্ভব, এমন কি হইতে পারে কোনোদিন? ডি-সিলভার ঘর হইতে সেই উগ্র মদের গন্ধ তাঁহার নাসারন্ধ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকেও কি মাতাল এবং বিহ্বল করিয়া দিয়াছে?

বলরাম দাঁড়াইয়া রহিলেন। পা কাঁপিতেছে, মাথা ঘুরিতেছে—বুকের দুদিক হইতে দুইটা প্রাণপিণ্ড ছুটিয়া আসিয়া যেন একসঙ্গে ঠোকাঠুকি করিতেছে। কিন্তু বিহ্বল নির্বোধ হইয়াও বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না তিনি। পায়ের নিচে সেই রক্তাক্ত দেহটা নড়িতেছে—ঢেউয়ের মতো নিশ্বাস পড়িতেছে। বলরামের মনে পড়িল এমনিভাবে আর একবার তিনি টর্চের আলো ফেলিয়া দেখিয়াছিলেন: সিঁড়ির নিচে উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে একটি নারীমূর্তি, গলগল করিয়া তাজা রক্তের ধারা নামিয়া তাহার সর্বাঙ্গ ভাসাইয়া দিতেছে। সে দশ বৎসর আগেকার কথা, আর আজ—

পায়ের তলায় পড়িয়া গোঙাইতেছে মুক্তো। মুক্তো—দশবছর আগে একদিন যে বলরামের জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল—যাহার বুকের মধ্যে অসহায় মাথাটা গুঁজিয়া দিয়া তিনি শিশুর মতো ঘুমাইয়া পড়িতেন—তাঁহার সেই মুক্তো! মুহূর্তে যেন বিদ্যুতের চমকে বলরামের সর্বাঙ্গ নড়িয়া উঠিল।

—রাধানাথ, জল আন্, জল—

*　　*　　*　　*

মণিমোহনের বোট যখন চর-ইসমাইলে বাংলোর ঘাটে আসিল, তখন রাত্রির শেষ প্রহর। ঝিমঝিম ঝিরঝির করিয়া সেতারের একটানা সুরের মতো যে বৃষ্টিধারাটা ঝরিয়া পড়িতেছিল, সেটা থামিয়া গেছে ঘণ্টাখানেক আগে। বৃষ্টির জলে উজ্জ্বল হইয়া অস্তপথিক নক্ষত্র-চক্র আসন্ন-প্রভাত পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া আছে শান্ত আর কোমল দৃষ্টিতে। ব্যাঙের অবিচ্ছিন্ন আনন্দ-গান উঠিতেছে, ঝোপের মধ্যে পোকা ডাকিতেছে, ঝিঁঝিঁ ডাকিতেছে। কোথা হইতে বাসা-ভাঙা একটা কাক থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে—যেমন আর্ত, তেমনই করুণ তাহার অসহায় স্বর।

মণিমোহনের সমস্ত চৈতন্যটা আগুনের মতো জ্বলিতেছে। দৃষ্টির সামনে অগ্নিশিখার মতো প্রখর ও ভাস্বর হইয়া শোভা পাইতেছে একখানা জীবন্ত বুদ্ধমূর্তি। সে মূর্তির চোখে দুইখানি নীলা বসানো। শাহা উপনিবেশের কোনো কালবৈশাখীতে ঝড়ের পিঙ্গল আলোয় দীপ্তি বিচ্ছুরণ করিতে থাকে, তাহার পশ্চাতে কামনার শাণিত তীক্ষ্ণাগ্র একখানা ছোরা ঝলক লাগাইয়া যায়।

নৌকার মাঝি ঝপ করিয়া লগিটাকে ফেলিল। জল-কাদার মধ্য হইতে আকস্মিক শব্দ উঠিল একটা, যেন শেষ-রাত্রির রহস্যময়ী নদীটা সেই বর্মী মেয়ে মা-ফুনের মতো একটা কৌতুকের আনন্দে খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মাঝি বলিল, হুজুর, উঠবেন না?

মণিমোহন জবাব দিল, নাঃ থাক। এত রাত্রে আর উঠতে ইচ্ছে করছে না। ঘণ্টা তিনেক রাত আছে, নৌকোতেই ঘুম দিয়ে নেব এখন।

—সে কি হুজুর, কষ্ট হবে যে। ভালো বিছানা নেই, কিছু নেই—

—তা হোক, তা হোক।

মাঝিরা আর কথা কহিল না। হাকিমের মর্জির উপরে বলিবার কথা কিছুই তাহাদের নাই। মালসা হইতে আগুন লইয়া তাহারা হুঁকা ধরাইয়া আরাম করিয়া বসিল, দশ পনেরো মিনিট ধরিয়া তামাক টানিল, মণিমোহনের দুর্বোধ্য চট্টগ্রামের ভাষায় খানিকক্ষণ কী গল্প করিল, তারপর এক একখানা কাপড় মুড়ি দিয়া যে যেখানে পারিল গুটিশুটি হইয়া শুইয়া পড়িল। আর শোয়া মানেই ঘুমাইয়া পড়িতে যা দেরী।

নদীর বুক হইতে শেষ রাত্রির হাওয়া নৌকার এখান ওখান দিয়া ভিতরে ঢুকিতেছে। সকলের মধ্যেও অল্প অল্প শীতের শিহরণ লাগিতেছে মণিমোহনের। তবে এ ঠাণ্ডাটা পীড়াদায়ক নয়—শরীরের ভিতর কেমন বিচিত্র একটা অনুভূতিকে জাগাইয়া তোলে মাত্র।

ইচ্ছা করিয়াই রাতটা সে বোটে কাটাইয়া দিতে চায়। আজ দশবৎসর পরে বর্মী মেয়েকে দেখিয়া তাহার সমস্ত চিন্তা-চেতনাই যেন বিচিত্রভাবে বিশৃঙ্খল হইয়া গেছে। ঠিক সেই সব দিন যেন রক্তের মধ্যে সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছে—যে-সব দিনে তাহার রক্তে প্রবেশ করিয়াছিল উপনিবেশের নির্মম রুদ্র-বসন্ত, উন্মত্ত বর্বর যৌবন। বাহিরের গর্জন-মুখর অকাল-অন্ধকারে ঘরের মধ্যে দুইটি দেহের অণুতে অণুতে মশাল জ্বলিতেছিল, রাণীর মুখখানা ছায়াছবি হইয়া মিলাইয়া গিয়াছিল দৃষ্টির বাহিরে।

গায়ের মধ্যে জ্বালা করিতেছে, মাথাটা যেমন ভারী, তেমনি গরম হইয়া উঠিয়াছে। মণিমোহন উঠিয়া বসিল। তাহার আবার নেশা ধরিতেছে নাকি? কাল দারোগা মেয়েটাকে লইয়া আসিবেন নিশ্চয়। সে কী বলিবে কে জানে!

কী বলিবে!

হঠাৎ যেন মণিমোহনের চমক ভাঙিয়া গেল।

এ সে করিতেছে কী! সে কি পাগল হইয়া গেল? ওই অসচ্চরিত্র

একটা মগের মেয়ে, নিজের স্বামীকে যে ইচ্ছা হইলেই খুন করিতে পারে, কামনার তাগিদে যে-কোনো লোককে আত্মসমর্পণ করিতে যাহার বাধা নাই এবং যে একসময় মণিমোহনকে নির্বোধের মতো নাকে দড়ি দিয়া নাচাইয়া ছিল, তাহার সঙ্গে সে আবার কথা কহিতে চায় কোন্ সাহসে এবং কোন্ লজ্জায় !

বর্মী মেয়েকে তো বিশ্বাস নাই। সেদিন যে ঝড়ের সন্ধ্যা তাহার জীবনে আসিয়াছিল, মণিমোহনের কাছে সেই বিস্ময়কর ভয়ানক মুহূর্তটির মূল্য যাহাই থাক, এ মেয়েটার কাছে তাহার দাম কতটুকু ! ইহার এইই তো পেশা—যখন যাকে পায় কাছে টানিয়া লয়, দুদিনের জন্য তাহাকে মদের নেশায় আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া তারপর একটা ভাঙা-পুতুলের মতো ফেলিয়া চলিয়া যায়। মণিমোহন ও একদিন তাহার পুতুল খেলার সঙ্গী হইয়াছিল—তাহার বেশি কিছুই নয়।

মনে করো—কাল মেয়েটি হঠাৎ বলিয়া বসিল, একদিন মণিমোহনের সঙ্গে তাহার একটা অশোভন সম্পর্ক ছিল, একদিন মণিমোহন—

কথাটা ভাবিতেই অন্তরাত্মা তাহার চমক খাইয়া উঠিল। কী সর্বনাশ ! সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টির সামনে কতখানি নামিয়া যাইবে সে ! দারোগা জানিবেন, চর-ইসমাইলের সবাই জানিবে, রাণী জানিবে, কে জানিবে এবং কে জানিবে না ! আর ব্যাপারটা হয়তো ওখানেই শেষ হইবে না, শ্রাদ্ধ আদালত পর্যন্তও হয়তো গড়াইবে এবং ওই নির্লজ্জ—ওই ভয়ঙ্কর নীলার মতো জ্বলন্ত দুইটি শাণিত-নয়না মেয়েটি আদালতে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া বসিবে—

তাহা হইলে ? মণিমোহনের আচ্ছন্ন সত্তার মধ্যে বাস্তব পৃথিবীর তীব্র রূঢ় আলো আসিয়া পড়িল। দশ বছর আগে যাহা ঘটিয়াছিল আজ আর তাহা সত্য নাই—আজ আর তাহা সত্য হইতে পারে না। সেদিন দায়িত্ব ছিল না—জীবনের কোনো পরিপূর্ণ ভবিষ্যৎ রূপ ছিল না, শুধু রোমান্স্ ছিল, শুধু উদগ্র খানিকটা মাদকতা ছিল। কিন্তু আজ ? আজ সে গেজেটেড্ অফিসার হইয়াছে, সরকারী চাকরীর ক্রমোন্নতির পথ ধরিয়া চলিয়াছে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব সম্ভাবনার দিকে। রাণীকে সে ভালোবাসে, পিন্টুর মধ্য দিয়া তাহার নিজের মৃত্যুহীন প্রাণ-প্রবাহকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। খ্যাতি, অর্থ ও আরাম। অফিসে আদালতে দশ বছর আগেকার এই কেলেঙ্কারীটা জানাজানি হইলে মুখ দেখাইবার জো থাকিবে না, রাণীর কানে গেলে যেমন দুর্বহ, তেমনিই বিড়ম্বিত হইয়া উঠিবে সমস্ত পারিবারিক জীবনটা। তাহার চাইতে—

কাল দারোগা আসিবার আগেই সে পালাইবে। পালাইবে এই চর-ইসমাইল হইতে। আগষ্ট আন্দোলনের ফেরারী ধরা তাহার দায়িত্ব নয়, ওসম্বন্ধে মামুদপুরের দারোগা যাহা ভালো বোঝেন করিবেন। যে কাজে সে এখানে আসিয়াছিল, তাহা একরকম শেষ হইয়াছে, যাহা হয় নাই, তাহা সদর অফিসে ফিরিয়া গিয়া কাগজপত্র মারফৎ সারিয়া দিলেই চলিবে।

সে পালাইবে। আজ তাহার জীবন বদলাইয়াছে, তাহার যৌবন নাই। চর-ইসমাইলকে সে রক্তের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না, মানিয়া নিতে পারে না কাল-বৈশাখীর তরঙ্গ-তাণ্ডবে উন্মত্ত এই ভয়ানক নদীর দিগন্ত-বিস্তারকে, এখানকার বর্বর প্রাণোল্লাসকে। আজ তাহার মনের মধ্যে একদিকে দেখা দিতেছে লাল-কাঁকর ফেলা সেই ছোট প্ল্যাটফর্ম, বাতাসে ভাঁটফুল আর আমের মুকুলের গন্ধ, পারুল-বনের মধ্যে প্রেমদাস বৈরাগীর আখড়া হইতে খোল করতাল আর কীর্তনের সেই ঐকতান। আর একদিকে রাত্রির অপ্সরী কলিকাতা—ফ্লাওয়ার মার্কেট, মেট্রো সিনেমা, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের গা হইতে পাউডারের গন্ধ ; আর অফিসারদের ক্লাবে বিলিয়ার্ড টেবিলে ষ্টিকের শব্দ, তক্‌মা-আঁটা বেয়ারার হাতে রূপার ট্রেতে বিলাতী মদের পাত্র। ঘরে রেডিয়ো খুলিয়া বসিয়া আছে রাণী, পিন্টু তাহার খেলার মোটর লইয়া পিয়ারীর সঙ্গে অকারণ কলহাসিতে সমস্ত বারান্দাটা মুখর করিয়া তুলিয়াছে।

নাঃ—সে পালাইবে। কাল সকালেই এবং যেমন করিয়া হোক। যৌবনের আত্মবিস্মৃত একটি বিহ্বল তরুণের সঙ্গে আজকের হাকিম মণিমোহনের কোনো মিল নাই, কোনো মিল থাকা অসম্ভব।

* * * *

ওদিকে কালুপাড়ার দিক হইতে জনতার উত্তাল তরঙ্গ চর-ইসমাইলের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

মজাঃফর মিঞার গোলা পোড়াইয়া দিয়া তাহাদের রক্তেও আগুন ধরিয়াছে। এতদিন ধরিয়া যে ভয় এবং দ্বিধার ভার তাহাদের চাপিয়া রাখিয়াছিল, সেটা সরিয়া গেছে। এখন তাহাদের ভয় নাই, সংশয় নাই ; যুদ্ধ এবং মহাজনের পীড়নে যে জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিল—তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে উপনিবেশের অমার্জিত উদ্বেল শক্তি। মরিতে যদি হয় তো সোজা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মরিবে না—যা হয় একটা কিছু করিয়া তবে ছাড়িবে।

সারা রাত টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি—বাদলের দমকা বাতাস বহিতেছে। তাহারই মধ্যে, সেই জল বাতাস মাথায় করিয়া তাহারা মস্‌জিদের মাঠে সভা করিল। মহাজনদের সকলকে দেখিয়া লইতে হইবে। চাল না পাওয়া যায়, তাহারা যেমন করিয়া হোক আদায় করিয়া লইবে। দিনের পর দিন এই যে একটা দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে, গায়ে রক্ত থাকিতে, হাতে লাঠি থাকিতে তাহারা কিছুতেই সেটা মানিয়া লইবে না।

সভায় জোর গলায় বক্তৃতা দিল জমির।

—ভাই সব, নিজের বরাত নিজের হাতে। কুকুরের মতো না খেয়ে মরব কেন আমরা ? চলে এসো, যে ব্যবস্থা পারি আমরাই করব। আমরা জোয়ান—মরি তো লড়াই করে মরব—মেয়ে মানুষের মতো কেঁদে মরব না।

—আল্লা হ আকবর—

ভোরের অন্ধকার ফিকে হইবার আগেই পাঁচশো লাঠিয়াল অগ্রসর হইল চর ইসমাইলের দিকে। মামুদপুরের বনোয়ারী দারোগা তখন সুখ-শয্যায় পড়িয়া অচির-ভবিষ্যতে ইন্‌সপেক্টার হইবার সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছেন।

মণিমোহন বলিয়াছিল, রাণী, আজই সদরে ফিরতে হবে—এখনি। খুব জরুরি দরকার, খবর পেলাম।

ঘাটে বোট তৈরী হইতেছে। জিনিসপত্র সব তোলা হইয়া গেল। রাণীর শরীরটা এখনো দুর্বল···বোটের মধ্যে বিছানা পাতিয়া শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাকে। পিন্টু মায়ের কাছে বসিয়া একমনে চকোলেট চুষিতেছে,পিয়ারী মাঝিদের ধমক দিয়া নিজের পদ-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

মণিমোহন পালাইতেছে। দারোগা আসিয়া কী ভাবিবেন কে জানে। কিন্তু সে কথা ভাবিলে মণিমোহনের চলিবে না। যাহা নিশ্চয় আর নির্ধারিত হইয়া গেছে—সেখানে নতুন করিয়া ঝড় আনিতে আর সে চায় না। জীবন্ত-বুদ্ধমূর্তির নীলার মতো চোখ দুটির সঙ্গে দৃষ্টি মিলাইতে আজ আর তাহার সাহস নাই।

ঠিক এম্‌নি সময় আর একখানা নৌকা আসিয়া পাশে লাগিল। মণিমোহন চাহিয়া দেখিল, সামনে গলুইয়ে কবিরাজ বসিয়া।

—এ কি, কবিরাজ মশাই যে।

কবিরাজ ম্লানভাবে হাসিলেন।

—কোথায় চললেন?

—শহরে।

—নৌকোর ভেতরে কে?

কবিরাজ মুহূর্তে কেমন হইয়া গেলেন, পরক্ষণেই তাঁহার মুখ কঠিন ও দৃঢ় হইয়া উঠিল। স্থির শান্ত গলায় বলরাম জবাব দিলেন: আমার স্ত্রী।

দশবছর আগেকার কথা ভুলিয়া গেছে মণিমোহন। শুধু বলিল, আপনার স্ত্রী? ওঃ!

মণিমোহনের মাঝিরা নৌকার নোঙর তুলিয়াছে। পাঁচ পীর বদর—বদর। সামনে সকালের নদী শান্ত ও উজ্জ্বল বিস্তারে যেন ঘুমাইয়া আছে। ঝড়ের গর্জন নয়—রাক্ষসী ভৈরবীমূর্তিও নয়। জলের মৃদু কলধ্বনি যেন সঙ্গীতের মতো বাজিতেছে। ওপারে দিক্‌চক্রবালে শ্যামল বনরেখার ধু ধু আভাস দেখা যাইতেছে—মাথার উপর নির্ভাবনায় উড়িয়া চলিয়াছে মাছরাঙা আর গাং শালিকের ঝাঁক।

মণিমোহন বলিলেন, আচ্ছা কবিরাজ মশাই, নমস্কার।

—নমস্কার।

ভাঁটার প্রখরটানে সরকারী বোটখানা ভাসিয়া গেল।

বলরামের নৌকাও এখনি ছাড়িবে। মাঝিরা বেশ করিয়া তামাক টানিয়া লইতেছে—অনেকখানি পথ পাড়ি জমাইতে হইবে। বলরাম অন্যমনস্কের মতো বিড়ি ধরাইলেন।

মুক্তোর সর্বাঙ্গে গভীর ক্ষত। বেশ বোঝা যায়, ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়া তাহাকে কোপাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহার জ্ঞান এখনো ফেরে নাই, শহরে গিয়া ফিরিবে কি না কে জানে। বোধ হয় সম্পত্তির গোলমালেই মুকুল গাজীর সুযোগ্য পুত্রেরা তাহার এই অবস্থা করিয়া ছাড়িয়াছে।

কিন্তু ওসব ভাবিবার দরকার তাঁহার নাই। আজ মুক্তো তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে—আজ আবার তাহাকে তিনি গ্রহণ করিবেন। এই চর ইসমাইলে যেখানে সমাজ নাই, মানুষের বাঁধাধরা নিয়মের দোহাই মানিয়া যেখানে জীবন সরল-রেখাতেই বহিয়া যায় না—সেখানে মুক্তোকে নতুন করিয়া গ্রহণ করিতে তাঁহার দ্বিধা নাই, সংশয়ও নাই। তাই বোরখা খুলিয়া তিনি তাহাকে শাড়ী পরাইয়া দিয়াছেন,—দশবছর আগেকার তুলিয়া রাখা অতি-যত্নের ময়ূরকণ্ঠী শাড়ীখানা। শহরে গিয়া মুক্তো যদি বাঁচে, তাহা হইলে এই শাড়ী পরাইয়া মুক্তোকে তিনি নতুন করিয়া ঘরে তুলিবেন, নতুন করিয়াই তাঁহার মিলন-বাসর রচনা হইবে।

মুক্তো ঘুমাইয়া আছে। মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন নাই, পরম নিশ্চিন্ত, পরম আশ্বস্ত। যেন সারা রাত ঝড়ের মধ্যে ঘুরিয়া ক্লান্ত ভীত একটা পাখী নীড়ে আসিয়া তাহার আপনার জনের বুকের মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছে। বলরাম নাড়ী দেখিলেন। দুর্বল, কিন্তু স্বাভাবিক। এ পর্যন্ত আশঙ্কার কারণ নাই।

মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিয়াছে, এমন সময় ছুটিতে ছুটিতে পাগলের মতো রাধানাথ আসিয়া উপস্থিত হইল।

—বাবু, বাবু, সর্বনাশ।

—কী হয়েছে?

—পাঁচশো লোক এসে চড়াও হয়েছে—ধান লুঠ করে নিয়ে গেল। এখানে ওখানে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে—সব যে গেল!

—যাক।

—সে কি! আমি কী করব বাবু?

—যা খুশি। মাঝি, নৌকো খোলো।

চর-ইসমাইলে বলরামের আর আকর্ষণ নাই। যদি কখনো ইচ্ছা হয় ফিরিবেন, নতুবা নয়। যাক—সব যাক। আজ মুক্তোকে তিনি ফিরিয়া পাইয়াছেন, সব পূর্ণ হইয়া গেছে। চর ইসমাইলে না হোক—এত বড় পৃথিবী, এত বিরাট, এর কোথাও কি তাঁহারা স্থান করিয়া নিতে পারিবেন না? সারা জীবন ঘর বাঁধিবার যে ব্যর্থ বাসনা লইয়া তিনি শুধু বিষয়-সম্পত্তির মূল্যহীন বোঝাটাকেই টানিয়া চলিয়াছেন—আজ সেই বোঝা নামাইয়া দিয়া একটি প্রেমকেই তিনি স্বীকার করিতে চান।

রাধানাথ কথা কহিল না। সে শুধু বালির উপরে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

*   *   *   *

চর-ইসমাইলের দুরন্ত যৌবন জাগিয়াছে। নতুন কালে, নতুন রূপে। ইহার কাছ হইতে মণিমোহনেরা পালাইতে চায়, বলরামেরা ইহার বিচিত্র বিপুল সংঘাতকে সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু ইহাতে কতটুকু ক্ষতি। মৃত্যুঞ্জয়ী অমার্জিত মানবসত্তা এখানে নিঃশঙ্ক ও নিভৃত আয়োজনে দিনের পর দিন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে নিজেকে। এই বিশাল-ব্যাপ্ত জলরাশি হইতে—এই ঝড়ের আকাশ হইতে—বিলুপ্ত পর্তুগীজ জলদস্যুদের ভাঙা পঞ্জর হইতে—এখানকার অসংযত আরণ্য-কামনা হইতে। সে দিন হয়তো দূরে নয়—যেদিন এখান হইতেই নিজেকে প্রকাশিত করিবে বাংলার গণ-শক্তি—বাংলার প্রচণ্ড ও বিপুল প্রাণশক্তি।

সে ইতিহাস—দৈনন্দিন, সে ইতিহাস—ধারাবাহিক। তাহার সমাপ্তি নাই, উপসংহারও নাই। আজ উপনিবেশ হইতে চারশো মাইল দূরে বসিয়া সে অনাগত বিপুল কাহিনীর আমি ভূমিকা মাত্র রচনা করিয়া গেলাম, নতুন যুগের নতুন মানুষ আসিয়া তাহাকে সমাপ্ত করিবে।

—তৃতীয় পর্ব সমাপ্ত—

সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও হিন্দুর পরিণয়প্রথা

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর-ই-এস্

বঙ্কিমযুগ বাঙ্গালা সাহিত্যের সুবর্ণ-যুগ। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল প্রতিভাশালী লেখককে লইয়া এই নবযুগের সূচনা ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের স্থান অতি উচ্চে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে যখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার যুগান্তরকারী মাসিকপত্র 'বঙ্গদর্শন' প্রবর্ত্তিত করিবার সংকল্প করেন তখন নিম্নলিখিত খ্যাতনামা ব্যক্তির রচনাদি উহাতে প্রকাশিত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়—

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রামদাস সেন এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

ইঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকমল 'বঙ্গদর্শনে' কখনও লিখেন নাই, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে চারি বৎসরকাল বঙ্গদর্শন সম্পাদিত করিয়াছিলেন সেই চারি বৎসরে অন্যান্য নূতন লেখকের রচনাও প্রকাশিত হয়। চারি বৎসর পরে বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণকালে বঙ্কিমচন্দ্র নিম্নলিখিত ভাবে লেখকগণের নিকট তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"তৎপরে যে সকল কৃতবিদ্য সুলেখকদিগের সহায়তাতেই বঙ্গদর্শন এত আদরণীয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কাছে আমার অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিতে হইতেছে। বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বাবু রামদাস সেন, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির লিপিশক্তি, বিদ্যাবত্তা, উৎসাহ এবং শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের উন্নতির মূল কারণ। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের সহায়তালাভ করিয়াছিলাম, ইহা আমার অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।

"আর একজন আমার সহায় ছিলেন,—সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখ-দুঃখের ভাগী,—তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে আমি তাঁহার নামোল্লেখও করি নাই। কেন তাহা কেহ বুঝে না। আমার সে দুঃখ কে তাহার ভাগ লইবে? কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে? অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক—আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু—আমার সঙ্গে সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া তখনও কিছু বলি নাই, এখনও আর কিছু বলিলাম না।"

উপরিলিখিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন আরও কয়েকজন লেখকের নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ঋণী ছিলেন তাঁহাদের নাম পাদটীকায় এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন—

"বাহুল্য ভয়ে সকলের নাম লিখিত হইল না। বিশেষ আমার ভ্রাতৃদ্বয়, বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অথবা ভ্রাতৃবৎ বন্ধু বাবু জগদীশনাথ রায়ের নিকট প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা বাগাড়ম্বর মাত্র। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু শ্রীকৃষ্ণ দাসও আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।"

১২৮৪ সালে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদকতায় বঙ্গদর্শন পুনরুজ্জীবিত হইবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমসংশোধন করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

"গত বৎসর বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণকালে আমি অসাবধানতাবশতঃ একটি গুরুতর অপরাধে পতিত হইয়াছিলাম। যাঁহাদিগের বলে এবং সাহায্যে আমি চারি বৎসর বঙ্গদর্শন সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম, কবিবর বাবু নবীনচন্দ্র সেন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য।"

কিছুকাল পূর্ব্বে পত্রান্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের প্রধান নয়জন লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'বঙ্কিমসভার নবরত্ন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। সাহিত্য-সাম্রাজ্যের বিক্রমাদিত্য বঙ্কিমচন্দ্রের নবরত্নের নাম আমি একটি শ্লোকে গ্রথিত করিয়াছিলাম :—

বঙ্কিম বিক্রমাদিত্য নবরত্নধর
বঙ্গ সাহিত্যের রাজা খ্যাত ধরাপর ;
দীনবন্ধু ছিল তাঁর মুকুটের মণি,
কণ্ঠহারে রাজকৃষ্ণ আলোকের খনি ;
শোভিত দুইটী করে রতন বলয়ে,
রামদাস, লালমোহন হীরাখণ্ড হয়ে ;
পঞ্চ চন্দ্র চন্দ্রহারে ছিল জ্যোতির্ম্ময়,
যোগেন্দ্র, নবীন, হেম, প্রফুল্ল, অক্ষয়।

পরে একে একে বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত—'বঙ্গদর্শনের' চল্লিশজন লেখকেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছিলাম।

অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন বঙ্গদর্শনের লেখকগণের নাম প্রথম যখন বিজ্ঞাপিত হয়, তখন "আর সকলে নামজাদা, আমিই কেবল নাম-হীন, অথচ আমার নাম ছাপা হইল।" শুধু নাম ছাপা হয় নাই, বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাতেই তাহার লেখা 'উদ্দীপনা' পত্রস্থ হইয়াছিল, কারণ সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র তরুণবয়স্ক অক্ষয়চন্দ্রের মধ্যে প্রতিভার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি স্ফুরিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা প্রকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বে বন্ধু জগদীশনাথ রায়কে লিখিয়াছিলেন—

"I have got a lot of contributors who have promised to write and can write, in Dinabandhu, Hem Chandra, Krishna Kamal Bhattacharjya, Tara Prasad Chatterjee

and a young man, whom you don't know, but whose intellectual life I think I have greatly influenced, for good or for evil and whose inherent gifts presage something great for him in the future. His name is Akkhay Sarkar."

বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল, 'বঙ্গদর্শনের' চিন্তাশীল লেখক ও সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক, 'সাধারণীর' নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সম্পাদক, জাতির 'নবজীবনের' স্রষ্টা অক্ষয়চন্দ্রের কৃতকার্য্য বিস্মৃত হইবার নহে।

তবুও আমরা বিস্মৃত হইতেছি। নবীনযুগের তরুণগণ তাঁহার যথার্থ পরিচয় জানেন না। ইহার অন্যতম কারণ এই যে তাঁহার প্রতিভাপ্রদীপ্ত রচনাবলী, রসসমুজ্জ্বল বক্তৃতাসমূহ সহজপ্রাপ্য নহে।

১২৫৩ সালে ২৭শে অগ্রহায়ণ (ইং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ, ১১ই ডিসেম্বর) তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,আর এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী উৎসব। এই একবৎসর মধ্যে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও অনুরাগিগণের সমবেত চেষ্টায় যদি তাঁহার একটি সুলিখিত জীবনচরিত এবং বক্তৃতা ও রচনাবলী সঙ্কলিত হয় তাহা হইলে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের যথোচিত শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করা হয় এবং বঙ্গীয় পাঠকসমাজও উপকৃত হয়। ভবিষ্যতে এইরূপ কোন গ্রন্থ সঙ্কলিত হইবে এই আশায় আমরা নিম্নে অক্ষয়চন্দ্রের একটি দুষ্প্রাপ্য বক্তৃতা উদ্ধার করিতেছি। বক্তৃতাটির বিষয় 'হিন্দু পরিণয়প্রথা'।

বক্তৃতাটি উদ্ধার করিবার পূর্ব্বে ভূমিকাস্বরূপ দুই চারিটি কথা বলা প্রয়োজন।

বোম্বাই প্রদেশে সামাজিক প্রথানুসারে শিশুকালে রুক্মাবাইয়ের সহিত দাদাজী ভিখার বিবাহ হয়। পরে য়ুরোপীয় মিশনারীদের সাহায্যে রুক্মাবাই উচ্চশিক্ষালাভ করে কিন্তু তাহার স্বামী অশিক্ষিতই থাকিয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্তির পর রুক্মাবাই স্বামীর সহিত বাস করিতে অসম্মত হয় এবং দাদাজী বোম্বাই হাইকোর্টে তাহার স্বামিত্বের অধিকার লাভের জন্য মোকদ্দমা করে। দাদাজী মোকদ্দমায় জয়লাভ করে এবং রুক্মাবাইকে স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণের ও তাঁহাকে ২০০০৲ ক্ষতিপূরণের আদেশ দেওয়া হয়, অন্যথায় ছয়মাসের কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে এইরূপ আদেশ দেওয়া হয়। ইহা লইয়া য়ুরোপীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ এবং অন্যান্য শিক্ষিত য়ুরোপীয় ও দেশীয়গণ মহা আন্দোলন উপস্থিত করেন। অবশেষে চাঁদা তুলিয়া অর্থপ্রদান করত দাদাজীকে তুষ্ট করা হয় এবং রুক্মাবাইয়ের মোকদ্দমা আপোষে মিটমাট হয়, রুক্মাবাই স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিতে ক্ষমতালাভ করে। এই আন্দোলনের ফলে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট এইরূপ বিবাহের অনিষ্টকর প্রথা সম্বন্ধে একটি তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত করেন এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁহাদের মতে গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা ও আইনের সংস্কার করা উচিত কিনা। সামাজিক ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনায় অনেকে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ৬ই আগষ্ট আমার মাতৃষ্বসৃপতি মহারাজ কুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও তদীয় ভ্রাতা (পরে রাজা বাহাদুর) বিনয়কৃষ্ণ শোভাবাজার রাজবাটী একটী অসাম্প্রদায়িক সভা আহ্বান করত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণকে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিতে বলেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডাক্তার রাজা রাজে লাল মিত্র এই সভায় সভাপতির আসনগ্রহণ করেন। "হিন্দু খৃষ্টা সুপণ্ডিত জয়গোবিন্দ সোম প্রধান বক্তা ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার যাঁহারা আলোচনায় যোগদান করেন তাঁহাদের নাম ডাক্তার (পরে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমালোচক প্রবর চন্দ্রনাথ বসু, 'নবজীব সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ('বঙ্গবাসী' সম্পাদক বলিয়া বর্ণিত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি মনোমোহন বসু, (পরে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভা হিন্দুপরিণয়প্রথা সংস্কারে গবর্ণমেণ্টের ও মিশনারীদে হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয় মনে করেন। এই সভার কার্য্যবিবরণী লিপি আছে—

"নবজীবন" সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকা বি-এল, বলেন—



অক্ষয়চন্দ্র সরকার

"আজি কালি আমাদের দুর্দ্দশার দিকে, আমাদের সকলেরই দৃ পড়িয়াছে। দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ; দুর্দ্দশা যে হইয়াছে, সে বিষয়ে কাহার সন্দেহ নাই। এই দুর্দ্দশার কারণানুসন্ধানে আমরা সকলেই প্রবৃ হইয়াছি। প্রবৃত্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু কোন একটি বিষয়ের প্রকৃত কার স্থির করিতে হইলে, যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের প্রয়োজন, সেরূ বিচারশক্তি এবং তজ্জন্য যেরূপ ধীরতা এবং সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, তাহা কিছুই আমাদের নাই। অথচ দুর্দ্দশা যখন হইয়াছে, তখন তাহা

একটা কারণ স্থির করা চাই। অনেকেই স্থির করিয়াছেন যে, আমাদের শারীরিক দুর্ব্বলতাই আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রধান কারণ।

আমাদের সমস্ত আচারব্যবহার, রীতিনীতিই আবার এই শারীরিক দৌর্ব্বল্যের কারণ বলিয়া স্থির হইয়াছিল। আমাদের অশন, বসন, শয়নোপবেশন—সকল প্রকার রীতিনীতিই আমাদের শারীরিক দুর্ব্বলতার কারণ বলিয়া আমরা মনে করিয়া থাকি। আমাদের অশন পুষ্টিকর নহে; তাই আমরা দুর্ব্বল। আমাদের বসন শরীরের তাপ-রক্ষণকর নহে; তাই আমরা দুর্ব্বল। আমাদের উপবেশনভঙ্গী শয়নপ্রথায় আমাদের অলস করিয়া তুলে; তাই আমরা দুর্ব্বল। আমাদের অন্য সকল রীতিনীতি আমাদের শারীরিক দৌর্ব্বল্যের হেতুভূত বলিয়া যেরূপ আক্রান্ত হইয়াছে, আমাদের বিবাহ পদ্ধতিও সেইজন্য সেইরূপ আক্রান্ত হইয়াছে।

আমাদের সকল আচারব্যবহারই যখন আমাদের শারীরিক দুর্ব্বলতার কারণ, তখন আমাদের বাল্যবিবাহ প্রথা অবশ্যই দুর্ব্বলতার কারণ। অর্থাৎ বাল্যবিবাহে দুর্ব্বলবংশ সৃষ্টি হয়। এইরূপ যুক্তিবাদে এইরূপ ধারণা অনেকেরই হইয়াছে। এই ধারণার বিরুদ্ধে আমার মনে যে খট্‌কা আছে, তাহা আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করা আমি কর্ত্তব্য মনে করি।

পশ্চিম পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে বাল্যবিবাহ আছে, অথচ ঐ সকল দেশের লোক দুর্ব্বল নহে এবং পূর্ব্বকালে বাল্যবিবাহ ছিল, অথচ তখন লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মহাবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—এ সকল কথার আভাস পূর্ব্বে আপনারা পাইয়াছেন; আমি এই সময়ের এই বঙ্গদেশের দুইটা কথা বলিতে চাহি।

বাঙ্গালার ছাগগবাদি পশুসকল বেহার প্রভৃতি প্রদেশের ছাগ-গবাদি অপেক্ষা দুর্ব্বল। কাজেই আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়,—যে ভাল, আমরা যেন বাল্যবিবাহ দোষে গোল্লায় যাইতেছি—উহারাও কি, সেই বাল্যবিবাহনিবন্ধন উৎসন্ন যাইতেছে?

দ্বিতীয় কথা—গোপ বাগ্‌দি প্রভৃতি বাঙ্গালার নিকৃষ্ট জাতি মধ্যে বাল্যবিবাহ অত্যন্ত প্রবল। তাহাদিগকে পাঁচ সাত বৎসরের বালিকা পাঁচ সাত শত টাকা ব্যয় করিয়া ঘরে আনিতে হয়। অথচ দেখা যায় যে নদে শান্তিপুরের গড়ো গোয়ালা, এবং হুগলি বর্দ্ধমানের বাগ্‌দি ডোম—বাঙ্গালার ডাকাতের ডাকাত, সর্দ্দারের সর্দ্দার এবং লাঠিয়ালের লাঠিয়াল। বাঙ্গালার নিকৃষ্ট জন্তুতে দেখা গেল যে, তাহাদের মধ্যে বাল্য সহবাস অসম্ভব হইলেও তাহারা দুর্ব্বল, এবং বাঙ্গালার নিকৃষ্ট জাতিতে দেখা গেল, যে তাহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ থাকিলেও তাহারা সবল। তবে কোন্ মুখে আর বলিতে পারি,—যে বাল্যবিবাহ আমাদের শারীরিক দুর্ব্বলতার একটি নিশ্চিত কারণ?

এখন যেন মনে করাই যাউক, যে ঐ সকল খট্‌কার মীমাংসা হইয়া স্থিরই হইয়াছে যে, বাল্যবিবাহ আমাদের শারীরিক দৌর্ব্বল্যের অন্যতম কারণ। বলি, তাহা হইলেই কি স্থির হইবে, যে বাল্যবিবাহ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া উচিত?

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে অনেকেই মনে করেন, আমাদের শারীরিক দৌর্ব্বল্য আমাদের দুর্দ্দশার প্রধান কারণ। আবার অনেক বিজ্ঞ লোক মনে করেন যে, আমাদের চরিত্রগত দুর্ব্বলতাই আমাদের দুরবস্থার মুখ্য কারণ। যাহা হউক, দুর্দ্দশার কারণ বিচারে, চরিত্রের দুর্ব্বলতা যে উপেক্ষণীয় পদার্থ নহে, তাহা বলিতেই হইবে। অনেকে বিবেচনা করেন যে, বাল্যবিবাহে কিয়ৎপরিমাণে চরিত্র রক্ষা হয়। তাহা হইলে একটি কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইল। বিশ্বাস করিয়া লইলাম যে বাল্যবিবাহে ক্রমে শারীরিক বলক্ষয় হয়—বিশ্বাস করিয়া লইলাম যে, বাল্যবিবাহে চরিত্রবল পোষণ বা রক্ষণ হয়। তবে এখন করিব কি? বাল্যবিবাহে চরিত্রবলের দিকে লাভের অঙ্ক এবং শারীরিক বলের দিকে ক্ষতির অঙ্ক ইহার কোনটি বেশী—তাহা কেমন করিয়া গণনা করিব? চরিত্রবলের সহিত শারীরিক বলের তুলনা করিবার জন্য বাটখারা কোথায় পাইব? আমি এই সমস্যা মীমাংসা করিতে অপারগ? আমি বলি,—এই সকল কথা ভাবিবার বিষয়—কেবল বক্তৃতার বা হাততালির বিষয় নহে।

কন্যা নির্ব্বাচনের কথা। আমার বন্ধুবর বাবু চন্দ্রনাথ বসু বিশদ ভাষায় বুঝাইয়াছেন যে, হিন্দুর বিবাহ—বা কুলে-কন্যা-আনয়ন কেবল বরের সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য নহে। একটি সমস্ত পরিবারের সুখ স্বচ্ছন্দাদির জন্য। আমি অধিকন্তু আরও বলি যে, হিন্দুর বিবাহে একটি পরিবার কেন, একটি সমাজের সুখ-দুঃখ, অল্প হোক, বিস্তর হোক, নির্ভর করে। একটি কন্যার উপর যখন কতকগুলি লোকের বা একটি সমাজের সুখ দুঃখ নির্ভর করে, তখন সেই কন্যা নির্ব্বাচনের ভার, কোন্ যুক্তিতে কোন্ বুদ্ধিতে একজনের খেয়ালের উপর দিব? কেমন করিয়া সেই গুরুতর কার্য্যের ভার একজন রূপ-লোলুপ যুবকের উপর ন্যস্ত করিব? এই জন্য হিন্দুর বিবাহে পাত্রী নির্ব্বাচন, কতকগুলি সামাজিক নিয়ম অনুসারে কুলপতি কর্ত্তৃক হইয়া থাকে। কুলপতিও আপনার খেয়াল মত পাত্রী নির্ব্বাচন করিতে পারেন না। কেন না পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিবাহ একটি সামাজিক কার্য্য।

আমি হিন্দু-বিবাহ প্রথার সমর্থন করিতেছি বলিয়া মনে করিবেন না যে, আমি এখনকার কালে এই বঙ্গদেশে হিন্দুর বিবাহ প্রথা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে—তাহা ভাল বলিতেছি। পবিত্র বিবাহ প্রথার আমরা বঙ্গদেশে অতি লজ্জাকর পরিণতি করিয়াছি। কুলীন ব্রাহ্মণদিগের কথা বলিব না—আমি আপনার অস্থি মজ্জার কথা বলিব।

আমি সন্মৌলিক কায়স্থ—আমার তিনটি কন্যাসন্তান আছে। সুতরাং কায়স্থের বিবাহ প্রথা—আমার কাছে কেবল বক্তৃতার কথা নহে; আমার অস্থিমজ্জার কথা। বলিতে ঘোরতর লজ্জা হয়, আপনাকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতে মাথা হেঁট করিতে হয়—বঙ্গের কায়স্থ জাতি বিবাহ প্রথাকে নিদারুণ ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছেন। বিবাহ আধ্যাত্মিক ব্যাপার, বিবাহ ধর্ম্ম সংস্কার, বিবাহ কৌলিক অনুষ্ঠান—এ সকল আমাদের কাছে উপহাসের উপকথা হইয়াছে। কায়স্থ বরকর্ত্তা মহাশয় সুলক্ষণা পাত্রীর অনুসন্ধান করেন না। বৈবাহিকের বংশ ব্যবহার দেখেন না—কেবল

খুঁজিয়া বেড়ান যে কোন্ পাত্রীর পিতা পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিবে। তাহাতেই বলিতেছি—যে হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে তখন কি ছিল তাহা মনে করিয়া উচ্চদিকেই দৃষ্টি করিব? না আমরা কি করিতেছি—সেই নিম্নদিকেই দৃষ্টি করিব? বলিতে কি, আমি মৌলিক কায়স্থ, আমার পক্ষে হিন্দু বিবাহের পূর্ব্বতন গৌরবের কথা ভাবনা করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এই কায়স্থজাতি, সর্ব্বদাই আপনার জাতি গৌরব করিয়া থাকেন—ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হইবার জন্য—যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া সকলের অবশ্য নমস্য হইবার জন্য কখন কখন বড় ব্যগ্র হন। কিন্তু পবিত্র বিবাহ কার্য্যকে জঘন্য পণ্যব্যবসায়ে পরিণত করিয়া যে তাঁহারা দিন দিন নীচাদপি নীচ হইতেছেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখেন না। আবার বলি, আমাদের কায়স্থ কুলাঙ্গারদের কৃতকার্য্যের জন্য লজ্জায় আমাদের হেটমুণ্ড হইতে হয়, ঘৃণায় মাটীতে মিশাইতে ইচ্ছা করে। আমি কায়স্থ, এ সকল আমার মর্ম্মকথা—আমি কন্যাত্রয়ের পিতা, এ সকল আমার অতি মর্ম্মের কথা। মর্ম্মের কথা বলিয়াই আমি—এই কায়স্থ গোষ্ঠীপতিগণের ভবনে দণ্ডায়মান হইয়া কুলীন কায়স্থ-কুলোজ্জ্বলকারী সভাপতি মহাশয়ের সমক্ষে বলিতেছি—যে আপনাদের মধ্যে যাঁহারা কায়স্থ আছেন তাঁহারা পাস করা পুত্রপৌত্রাদির বিবাহ সময়ে যেন স্মরণ করেন যে—হিন্দুর বিবাহ অতি গৌরবের প্রথা, —ইহার অতি পবিত্র উদ্দেশ্য—হিন্দুর বিবাহ একটি কৌলিক অনুষ্ঠান—একটি ধর্ম্মসংস্কার। বিবাহকে অর্থাগমের উপায় বলিয়া মনে করিলে, বিবাহ বৈদেশিক চুক্তির অপেক্ষাও শত গুণে অপবিত্র হয় এবং বিবাহ সময়ে বরকর্ত্তা প্রকারান্তরে কন্যাকর্ত্তার সময়ে ব্যবস্থা করিলে, আপনারই কুলগৌরব কমিয়া যায়। পণ্যপ্রার্থী বরকর্ত্তারা এই সকল কথা স্মরণে রাখিবেন—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।"

কবি নবীনচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী

রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এ

আমাদের ছাত্র-জীবনে এবং তার পরেও নবীনচন্দ্র সেন পলাশীর যুদ্ধের কবি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন! প্রসিদ্ধ সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির বাড়ীতে যখন তাঁহাকে দেখি, তখন তিনি ছিলেন যশের তুঙ্গমণিমন্দিরে, আর আমরা সেই মন্দির দুয়ারে দর্শনলোলুপ যাত্রীর দল। পলাশীর যুদ্ধ বোধ হয় আধুনিক ধরণে লিখিত প্রথম ঐতিহাসিক কাব্য। 'মেঘনাদবধের' পরে এই ঐতিহাসিক কাব্য বাংলাসাহিত্যে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। একটি কারণে বাঙালীর মন অভাবনীয় ভাবে অভিভূত হইয়াছিল এবং তাহা হইতেছে স্বদেশ প্রেমের আহ্বান। এই সময়ে বাঙালীর অবসন্ন মনে যে আত্মপ্রতীতি ধীরে ধীরে জন্মিতেছিল, তাহারই প্রতিচ্ছবি সে দেখিতে পাইল—পলাশীর যুদ্ধে। পলাশীর যুদ্ধের কবি যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী কল্পনার সূত্রে গাঁথিয়া কাব্যমালিকা গ্রথিত করিলেন, তাহা কাব্যহিসাবেও যেমন বিস্ময়কর হইল, তেমনি বিস্ময়কর হইল ইহার কঠোর সত্যপূর্ণ আবেদন। স্বাধীনতা-লোপের যে মর্মভেদী আর্তনাদ মোহনলালের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, তাহারই তরঙ্গ শুধু বঙ্গদেশ নয় সারা ভারত তোলপাড় করিয়া তুলিল। আমার মনে হয় এই হিসাবে 'পলাশীর যুদ্ধ' বাংলাসাহিত্যে এক অমর সৃষ্টি বলিয়া চিরদিন আদৃত হইবার যোগ্য। সেকালেও ইহার বিদ্রোহী সুর কাহারও কাহারও নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইয়াছিল। 'পলাশীর যুদ্ধ' যখন পাঠ্যপুস্তক করিবার চেষ্টা হয়, তখন টেক্স্‌ট্ বুক কমিটির সদস্যদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন যে ছাত্রদের মধ্যে এইরূপ মনোবৃত্তির আবির্ভাব হইলে ব্রিটিশ রাজত্ব স্থির রাখা কঠিন হইবে! আমার মনে হয় বাঙালীর অবচেতনায় এই মনোভাবের অঙ্কুর সুদৃঢ়রূপে প্রোথিত হইয়া সমালোচকের আশঙ্কা সার্থক করিয়াছে।

রাজকার্যের অবসরে নবীনচন্দ্র যে অক্লান্তভাবে ভগবতী বীণাপাণির সেবা করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার যথেষ্ট বাহাদুরী। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় নবীনচন্দ্রের সাধনাও যে জয়যুক্ত হইয়াছিল, ইহাই বাঙালীর পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এই দুই প্রতিভাবান সাহিত্যস্রষ্টার মধ্যে দুই এক বিষয়ে আশ্চর্য সাদৃশ্যের কথা আমাদের মনে পড়ে। ইঁহাদের মধ্যে যে ভাবের আদানপ্রদান হইয়াছিল, 'আমার জীবন' হইতে তাহার উপভোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। বাঙালীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ইঁহারা উভয়ে ইঁহাদের চিত্রফলকে উজ্জ্বলতম রূপে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরাধীনতা সকলপ্রকারেই গুণরাশিনাশী। আমরা যে হেয়, আমাদের আচার ব্যবহার অশ্রদ্ধেয়, আমাদের সাহিত্যদর্শন যে অপাংক্তেয়, ইহাই ছিল বিজেতাদের ঘোষণা, এবং বাঙালীও ভাবিতে শিখিতেছিল যে, 'সত্যই বা হবে'! যে যুগে আমরা পোষাক পরিচ্ছদ, আহারবিহার এমন কি মাতৃভাষা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করি নাই, যে যুগে বাঙালী বিদেশী সাজিতে, বিদেশী ভজিতে শ্লাঘা বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই যুগে ভাগবদ্গীতার অমোঘ বাণী এই জাড্যপ্রাপ্ত জাতির কর্ণে ধ্বনিত হইল: ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ। ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না, অলস, অসাড় হইও না। তোমাদের দুঃখ কি? একবার ফিরিয়া চাহিয়া দেখ, তোমাদের যাহা আছে, সে ঐশ্বর্য সে সম্পদ্ বিশ্বে কোন জাতির নাই। এই বাণী যাঁহাদের মর্মে মর্মে প্রবেশ করিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে বঙ্কিম নবীনের নাম সর্বাগ্রে করিতে হয়। এই যুগকে বিশেষভাবে ভগবদ্গীতার যুগ বলিলে অন্যায় হয় না। যাহারা ভাবিতে শিখিয়াছিল, বিদেশী সভ্যতার চাকচিক্যে যাহাদের চক্ষু একেবারে অন্ধ হইয়া যায় নাই, তাহারা গীতার উপদেশ উপলব্ধি করিয়া আশ্বস্ত হইল। এখানে

বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে ভগবদ্‌গীতার আদর্শ আত্মপ্রত্যয়ের আদর্শ, কর্মযোগের আদর্শ এবং সেই সঙ্গে স্বদেশ-প্রেমেরও আদর্শ। সেই যে আমরা শুনিয়াছিলাম যে স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ,—সে কথা আমাদের মর্মে মর্মে গাঁথিয়া গিয়াছিল। সেইজন্য স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বোমার উপাদানের সঙ্গে ভগবদ্‌গীতাও অপরাধের প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইত।

এই গীতার দীক্ষায় যেমন এই দুই উদগ্রপ্রতিভাশালী কবিমানবকে দীক্ষিত করিয়াছিল, সেইরূপ অগস্ত কোমতের মতও অনেকটা প্রভাবিত করিয়াছিল। কোম্‌ৎ প্রচার করিলেন মনুষ্যত্বের পূজা—মানুষ সমষ্টি হিসাবে বিরাট্, মানুষের সেবাই শ্রেষ্ঠধর্ম। এই বিরাটের পরিকল্পনা গীতার বিশ্বরূপের সঙ্গে মিশিয়া এক অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল। মানুষ কোথায়? এ যে বিশ্বরূপে ভগবান্। ধর্ম কি? মানুষের সেবা। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই—এই কবিবাক্য সার্থক হইল আদর্শ-রচনায়। বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র উভয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন স্বাধীনভাবে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণচরিত্র হইতে নবীনচন্দ্রের আদর্শ আসিয়াছিল। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ঐ সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন। ফলতঃ যে চিন্তাপ্রণালী লইয়া উভয়ে যাত্রা শুরু করিয়াছিলেন, উভয়ে যেরূপ আদর্শের সন্ধানে ধাবিত হইয়াছিলেন, তাহাতে উভয়ক্ষেত্রে যে একই পরিণতি হইবে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে আমরা যে আদর্শের পরিকল্পনা দেখিতে পাই, তাহা বর্ত্তমান যুগোপযোগী এক মহিমময় আদর্শ। সে আদর্শে মানব সৃষ্টির শীর্ষবিন্দুতে স্থান লাভ করিয়াছে। নবীনচন্দ্র কুরুক্ষেত্রে বলিয়াছেন :

এই মনুষ্যত্ব-গতি কি অনন্ত সিন্ধুমুখে!
সিন্ধু—চিদানন্দ নারায়ণ!
অনন্ত এ মনুষ্যত্ব, অনন্ত মানব-সুখ,
মোক্ষ সেই সাগর সঙ্গম।— কুরুক্ষেত্র

এই মনুষ্যত্বই মানুষের চিরন্তন ধর্ম, ইহার উপর আর ধর্ম নাই।

যে অনন্ত নীতি-চক্র মানুষের মনুষ্যত্ব
করিতেছে ধারণ বর্দ্ধন
তাহাই মানব ধর্ম ;— কুরুক্ষেত্র

আমরা জাতি হিসাবে যখন এই মনুষ্যত্বের মর্যাদা ভুলিতে বসিয়াছিলাম তখন বঙ্কিম ও নবীনচন্দ্র আমাদের মনে আনিলেন সাহস, বাহুতে দিলেন শক্তি এবং হৃদয়ে দিলেন আশা। আজ সেই আশাহত যুগের কথা স্মরণ করিয়া বলি, কবি তোমার শিক্ষা নিষ্ফল হয় নাই। বাঙালীর জাতীয়তা-গঠনকারী মনীষীদের মধ্যে তোমার স্থান বহু উচ্চে। একথা আজ তোমার জন্মশতবার্ষিক উৎসবে কৃতজ্ঞচিত্তে বাঙালী স্মরণ করিবে।

মহাভারতের নবদ্বৈপায়ন রূপে নবীনচন্দ্র কল্পনার সুবর্ণদ্বীপের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। রামায়ণকে রূপান্তরিত করিয়া মধুসূদন পূর্ব্বেই পুরাণের নবকলেবর দানের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। সংস্কৃত কবিদের মধ্যেও ইহার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। কাজেই নবীনচন্দ্রের পক্ষে মহাভারতকে নবরসায়নের দ্বারা রূপায়িত করিবার চেষ্টা সমর্থনের অযোগ্য হইতে পারে না। 'মহাভারত'-নামই তাঁহাকে প্রেরণা যোগাইয়াছিল। ঋষি এই অপূর্ব নামটি কিরূপে আবিষ্কার করিলেন তাহা ভাবিলে আমরা বিস্মিত না হইয়া পারি না। এখনকার মত সে সময়ে দেশকালের ব্যবধান ঘুচাইবার ব্যবস্থা ছিল না বলিলেই হয়, তথাপি তিনি গান্ধার হইতে সিংহল, শ্বেতদ্বীপ হইতে কাম্বোজ পর্যন্ত কবি টানিয়া এক বিরাট মানচিত্র কি করিয়া নির্মাণ করিলেন, তাহা সত্যই আমাদের বুদ্ধির অগোচর। এই ভূভারতের নাম দিলেন ঋষি 'মহাভারত'। বর্ত্তমান যুগের মহাভারতকার যে চিত্র আঁকিলেন, তাহাও আধুনিক জগতে কম বিস্ময়ের বস্তু নহে। মহাভারত হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র ; পুরাণ পাঠ ও ধর্ম-ব্যাখ্যা বা কথকতার পূর্বে মহাভারতকে সংক্ষেপে 'জয়' এই আখ্যায় অভিহিত করা হয়।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

এখানে জয় অর্থে মহাভারত (এবং ধর্মশাস্ত্র)। এই মহাভারত হইবে এক বিরাট্ ধর্মক্ষেত্র—যেখানে আর্য্য অনার্য সকলে মিলিয়া সপ্রীতির সঙ্গে মনুষ্যত্বের পবিত্র মন্দির গঠন করিবে। এই বিশ্ব-প্রেমের মহিমা রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বিশাল পরিকল্পনা যে সম্পূর্ণ অভিনব ও মাহাত্ম্যে অতুলনীয় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নবীনচন্দ্র তাঁহার কবি-মনের ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করিয়া এই মহালক্ষ্মী প্রতিমা উদ্ধার করিয়াছিলেন :

মহাভারতের মূর্ত্তি,—
ত্রিভুবন আলো করি
মাতা রাজ রাজেশ্বরী।
নব ধর্ম বেদীমূলে বসিয়া দেবতাগণ—
আর্য অনার্যের ধ্যানে, বেদীবক্ষে নিরুপম
নিষ্কামের মহামূর্ত্তি—তদুপরি বিরাজিতা
জননী আনন্দময়ী, অতুলা প্রতিভান্বিতা।

এই নবীনচন্দ্রের নব মহাভারত। পুরাতনের সঙ্গে ইহার বিরোধ নাই। ইহার মধ্যে যে নূতনত্ব আছে, তাহা ঋষির পরিকল্পিত মহাভারতেরই ভাষ্য। বাঙালী কবির এই কল্পনা কোনও দিন সার্থক হইবে কি না জানি না। তবে মাঝে মাঝে এই দুর্ভিক্ষ-দগ্ধ, হিংসা-বিষাক্ত যুগে মনে হয় যে, যদি কোনও দিন কেহ বিশ্বের মানব কল্যাণের জন্য কামনা করে, তবে এই মহাভারতই হইবে তাহার শিক্ষক, শাস্তা ও শান্তি।

আজাদ হিন্দ ফৌজের অঙ্কুর

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

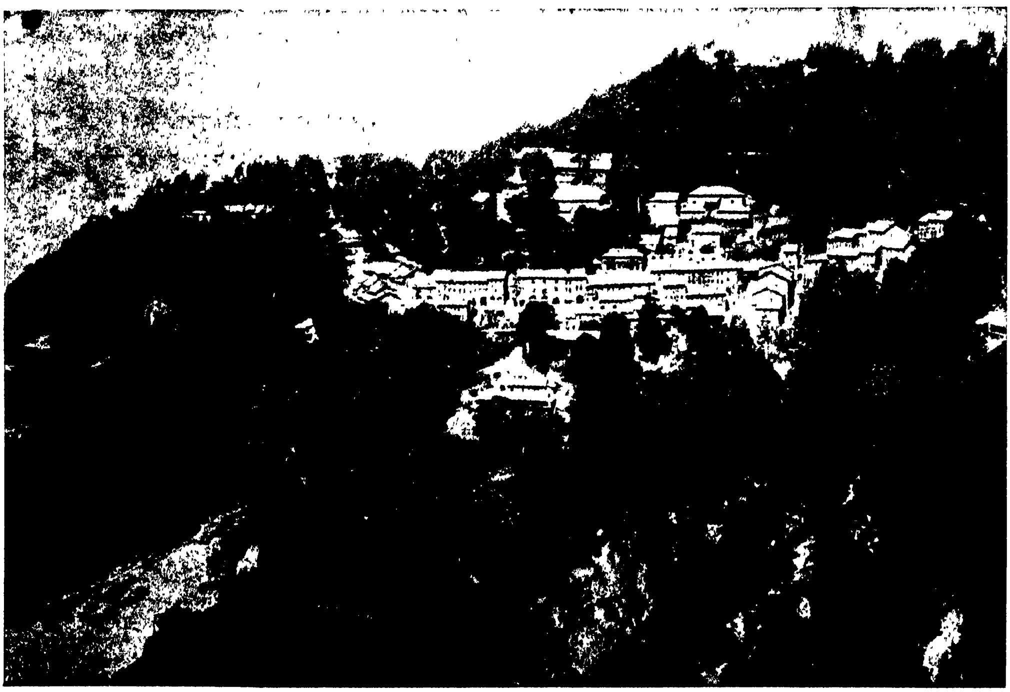
নারী-সঙ্ঘ

পঞ্চনদীর সংযোগ-স্থল পাঞ্জাবকে যোদ্ধার দেশ ও 'পঞ্চ নদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে' যে মানুষ বসতি করে তাহাকে যোদ্ধার জাতি বলা হয়। এই আখ্যা আদৌ অসঙ্গত নহে; বরং বর্ণে বর্ণে ও অক্ষরে অক্ষরে সত্য। পাঞ্জাব প্রদেশের মানুষের শরীর ও শরীরের গঠন, দীর্ঘোন্নত দেহ, সুপুষ্ট ও সুগঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সাহস, শৌর্য্য, কষ্ট-সহিষ্ণুতা সমস্তই তাহার আখ্যার অনুকূল। শুধু পুরুষেরই নহে, পঞ্চনদের তীরবাসিনী প্রকৃতি সুন্দরী তাঁহার দুহিতৃগণকেও স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে, সাহসে ও সুগঠিত দেহে সুসমৃদ্ধ করিয়া তাহাদিগকেও সিংহের যোগ্য সিংহিনী করিয়াছেন। সেদিন সকালে, আমরা যখন প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম, এক দল পাঞ্জাবী কোমলাঙ্গীর একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রা আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। আমরা পথের ধারে দাঁড়াইয়া, পথ ছাড়িয়া দিলাম। শোভাযাত্রা বাজারের দিকে গেল, সুভাষচন্দ্র ও আমি বাসার দিকে ফিরিলাম। মনে হইল, পাঞ্জাবী তরুণীরা গার্ল-গাইড অথবা ঐ রকম কোন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। যে সকল মহাজন, কবি কিম্বা রসিক ব্যক্তি নারীর বিশেষ্য-বিশেষণে কোমলাঙ্গী শব্দটির বিধান দিয়াছেন, তাঁহারা বোধ করি পঞ্চনদের তটভূমি দর্শন করেন নাই। কোমলাঙ্গীর ছড়াছড়ি, হুড়াহুড়ি, হুলাহুলি আমাদের বঙ্গদেশে।

"কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলে
দল্‌তে হয় রে দুর্ব্বা কোমল?"

—উত্তর, বঙ্গদেশ। তেমনই যদি প্রশ্ন করা যায় যে, কোন্ দেশের কোমল শব্দের অর্থ, ভঙ্গুর, 'বোধ করি' উত্তরে বঙ্গদেশের নামই শুনিতে হইবে। 'বোধ করি' কথাটা বিনয়বশতঃ ব্যবহার করিলাম। বিনয় বড় সদগুণ; একটু বিনয় থাকা ভাল। আশা করি পাঠিকা-সমাজ ক্ষুণ্ণ হইবেন না। আমি শুদ্ধমাত্র দর্পণ ধারণ করিয়াছি। পাঞ্জাবের কোমলাঙ্গী-শোভাযাত্রা যখন চলিয়া গেল, মনে হইল (অন্ততঃ আমার মনে হইল), এক দল 'ম্যানোয়ারি' গোরা বিপক্ষের কেল্লা অভিযানে গেল।

সুভাষচন্দ্র প্রসন্ন নয়নে চাহিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, আমাদের কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবিকারা তৈরী হয়েছে বটে, কিন্তু এমন স্বচ্ছন্দ



স্মরণীয় ডালহাউসী পাহাড়

(free) ও সাবলীল এখনও হতে পারে নি। আমার কংগ্রেস হাউসের নারী-বাহিনীকে আমি চেষ্টা করবো ঠিক এই রকম ক'রে গড়তে ! এক মুহূর্ত্ত থামিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, আবার বলিলেন, বছর পাঁচেক আগেও দেখা যেতো, মেয়েরা যেন পায়ে পায়ে জড়িয়ে পড়তো ; বেশ মাথা উঁচু সোজা চোখ ক'রে চলছে, হঠাৎ একজনের মনে একটু লজ্জা এসে পড়লো, হয়ত কোনও চেনা লোকের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেছে কিম্বা ঐ ধরণের একটা কিছু হলো,অমনি সঙ্গে সঙ্গে নারীর চিরভূষণ লজ্জা এসে পড়লো—সঙ্গে সঙ্গে তাল ভাঙ্গলো, বেখাপ্পা পা পড়ে গেলো, আর সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্ত্ত মধ্যে শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে গেলো, সামঞ্জস্য (harmony) নষ্ট। এখন এতখানি খারাপ যদিও হয় না, তবু, মনে হয় নিখুঁত হতে আরও কিছু সময় লাগবে। ক্ষিতীশ চাটুয্যেকে বলেছি, কর্পোরেশনের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশে (Rally) ছাত্রীদের দিকে যেন বেশী মনোযোগ দেয়। জানেন দাদা, আমাকে সবাই নারীদের দিকে বেশী পক্ষপাতিত্বের দোষে দোষী করে ?

আমি হাসিলাম : এ কথার উত্তর অন্য সময়ে দিতে হইয়াছে ; সে কথা সেই সময়ে বলিব।

এখন কথা বলিয়া তাঁহার পরিকল্পনার প্রকাশের গতি ভঙ্গ করিবার ইচ্ছা আমার হইল না ; নীরবে পথ চলিতে লাগিলাম। সুভাষ কহিতে লাগিলেন, আমার কংগ্রেস হাউসের এক লক্ষ জাতীয় সৈন্যের মধ্যে অন্ততঃ দশ হাজার নারী সৈন্য করতে হবে। অবশ্য মুস্কিলও আছে। আমাদের দেশের বাপ-মায়েরা অত্যন্ত রক্ষণশীল (conservative), বিষম গোঁড়া ; ভারি ভয়—মেয়েরা নষ্ট হয়ে যাবে ; বয়ে যাবে। কিন্তু ক্রমশঃ, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক্ তাঁদের হাল ছেড়ে দিতে হচ্ছে। ছেলেমেয়েদের সায়েস্তা করতে গিয়ে তাঁরা দেখেছেন, ফল ভাল না হয়ে খারাপ হয়। তাঁরা জোর করতে গেলে এরা বেশী অবাধ্য হয়ে ওঠে। কলকাতা কংগ্রেস একজিবিসনে দেখেছিলেন ত, ঢের মেয়ে স্বেচ্ছাসেবিকা হয়েছিল ; সে প্রায় দশ বছর আগের কথা ; এখন সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দিক থেকে (from our point of view) অবস্থা খুবই আশাপ্রদ। সেই জন্যেই মনে হচ্ছে, দশ হাজার নারী সৈন্য অনায়াসেই পেয়ে যাবো।

রঙ্গ ভরেই কহিলাম, মোটে দশ হাজার ?

সুভাষ কৃত্রিম কোপসহকারে কহিলেন, রহস্য হচ্ছে বুঝি ?

রহস্য ব'লে মনে হবার কি কারণ ঘট্‌লো বলুন তো।

ভুলবেনা দাদা, সেটা বাঙ্গলা দেশ। কোন্ বাপ-মা না তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইবেন ? আপনি পারবেন—আপনার মেয়েদের বিয়ে না দিয়ে—ওহ্- আপনার ত ও পাটই নেই—দায় নেই (no liability) আপনার সমস্তই লাভ (all assets) তিনটিই ছেলে—ভাগ্যবান লোক।

আমি কহিলাম—সন্ন্যাসী উদাসী লোক, সংসারীর ভাগ্য অভাগ্য বিচার করতে পারে কি ?

জাতীয় বাহিনীর নারী শাখা ভাল ভাবেই গড়বো এতে সন্দেহমাত্র নেই।

সে সন্দেহ আমারও ছিল না। কলিকাতা সহরে, পরিকল্পিত কংগ্রেস-ভবনটি গঠিত হইবার সুযোগ হয় নাই ; নানা বিপাকে ও দুর্ব্বিপাকে অস্থিপঞ্জরের উপরে মেদ ও মাংসের সঞ্চার আজও হইল না সত্য ; কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাঁহার কল্পনার চিত্রখানিতে, মানসের প্রতিমাখানিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর ঝাঁসীর রাণী ব্রিগেডের কাহিনী আজ কাহার অজ্ঞাত আছে ? কে না জানে, কে না শুনিয়াছে যে সুদূর বিস্তৃত দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়া খণ্ডে বহুধা-বিক্ষিপ্ত শতধা-বিচ্ছিন্ন ভারতীয় নারী অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত চর্ম্মে বর্ম্মে অলঙ্কৃত শৌর্য্যে বীর্য্যে বিমণ্ডিত হইয়া পুরুষের সঙ্গে, পৌরুষ সহকারে দুর্দ্মদ দুরন্ত রণরঙ্গে মাতিয়াছিল ? পুরুষের সহিত সমান দুঃখ, সমান কাঠিন্য, সমান ক্লেশ, সমান কৃচ্ছ্র-কঠোরতা, সমান লাঞ্ছনা—সমান হাসিমুখে বরণ করিয়া ভারত-নারী সম্পর্কে



পার্ব্বত্যপথ—ডালহাউসী

সদাপ্রযোজ্য 'আহা অবলা' অভিধানের বিলোপ সাধন করিয়াছিল, এ কথা আজ কি কাহারও অবিদিত আছে ? এ দেশের নারী 'দশ হাত (হ্যাঁগা, বারো হাত বলিব কি ?) কাপড়ে উলঙ্গ', 'এ দেশের রমণী ফুলের আঘাতে মূর্চ্ছা যাইতে অভ্যস্ত', 'পথি নারী বিবর্জ্জিতা', 'এ দেশের মেয়ে সজীব পুলিন্দা' (লিভিং লগেজ)—কত কথাই ত কত কাল ধরিয়া শুনা গিয়াছে। কিন্তু সুভাষ যখন পরাধীন ভারতের পরাধীনতার পাশ বিমোচনজন্য এসিয়া খণ্ডের কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া নবীন গীতা রচনায় উদ্যোগী হইলেন, তখন ভারতের এই যুগ-যুগনিন্দিত নারী স্ফীত উন্নত বক্ষে, সাহসপ্রোজ্জ্বল নয়নে নেতাজী-সকাশে উপনীত হইয়া তির্য্যক কণ্ঠে কহিল, আমরা কি অপরাধ করিয়াছি ? ভারতবর্ষ কি আমাদের মাতৃভূমি নহে ? আমরা কি দুঃখিনী জননীর কন্যা নহি ? হে বিপ্লবী, হে বীর, আমাদের হাতে অস্ত্র দিন, আমাদের উপরে কার্য্যের ভার দিন ; বিপ্লব সুসম্পূর্ণ করুন।

নখদর্পণে দেখিতে পাইলেন। তদ্দণ্ডে প্রার্থনা পূর্ণ হইল। ঝান্সীর রাণী বাহিনী গঠিত হইতে বিলম্ব হইল না। সারা জীবন, সুভাষচন্দ্র বিপ্লব সাধনা করিয়াছেন। মাত্র রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটাইয়াই তুষ্ট থাকিবার লোক তিনি নহেন; সামাজিক বিপ্লব না আনিতে পারিলে, স্বাধীনতাও পাকা ভিত্তির উপরে গঠিত প্রাসাদের মত ভঙ্গুর হইতে বাধ্য। এই সত্য সুভাষচন্দ্র না জানিবেন ত কে জানিবে? সারাজীবন সাধনা করিয়া যিনি বিপ্লবসিদ্ধ হইতে চলিয়াছেন, এই শাশ্বত সত্য অস্বীকার তিনি কেমন করিয়া করিবেন? সংস্কারের বিরুদ্ধে, প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে, সনাতনী নীতির বিরুদ্ধে, লোকাচারের বিরুদ্ধে প্রতি পদবিক্ষেপে বিদ্রোহ করিয়া যিনি বিপ্লবের সেরা বিপ্লব ঘটাইতে উদ্যত, তিনি জনসমাজের অর্দ্ধাংশকে অবজ্ঞা অথবা উপেক্ষা করিলে,



হাটবাজার—ডালহাউসী

তাঁহার বিপ্লব-দর্শনই ভুয়া হইয়া যাইত! সুভাষ কখনই সে ভুল করিতে পারেন না।

ডালহাউসী-প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া আমি অনেকদূর চলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু অপরাধ করিয়াছি বলিয়া মনে করি না। আমার স্নেহশালিনী পাঠিকাকে আরও দূরে লইয়া যাইতে আমার অভিলাষ। পাঠক তাঁহার পশ্চাদনুসরণ না করিলেই বিস্ময়ের বিষয় হইবে; স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে। আমি জানি, পাঠককেও অবশ্যই অনুসরণ করিতে হইবে। সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যক্রমতঃ এই লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের গমনক্ষম। তাই আমি এক্ষণে ভারতবর্ষের বাহিরে, দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়ায় যাত্রা করিতেছি। বৃটিশ—যে বৃটিশ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, যাহার সাম্রাজ্য মধ্যে সূর্য্য কখনও অস্ত যায় না, মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের উপরেও যে ব্রিটানিয়ার শাসন অপ্রতিহত ও অব্যাহত, সেই বৃটিশ লজ্জা ঘৃণার মাথা খাইয়া, নবারুণরাগরঞ্জিত জাপানের ভয়ে ত্যক্ত পেণ্টলুনে, শ্বেতপ্রাণগুলিকে করতলপুটে আবদ্ধ করিয়া কোথায়, কোন্ চুলায় পলায়ন করিয়াছে—কোথায় রাজ্য, কোথায় সাম্রাজ্য, কোথায় দম্ভ, কোথায় দর্প, শার্দ্দূলাশঙ্কায় শৃগালের মত পশ্চাদপদদ্বয়ে নিবদ্ধলাঙ্গুল অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! বর্ব্বর জাপান লালসাসম্প্রসারিত করে বৃটিশ পরিত্যক্ত রাজ্য, ধন, সম্পৎ, প্রাণ লুণ্ঠনোদ্যত, যখন এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে শাসনের চেয়ে অশাসনের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, শৃঙ্খলার পরিবর্ত্তে বিশৃঙ্খলার তাণ্ডব নর্ত্তন, জীবনের আশা সন্ধ্যারবির মত দিগন্তরালে অস্তমিত, আতঙ্কে, আশঙ্কায়, অনিশ্চয়তায় বেতসপত্রের মত কম্পান্বিত, যখন সর্ব্বস্বের বিনিময়েও প্রাণটুকু রক্ষা পাইলে জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, সেই সময়ে সেই ভূখণ্ডের নারী নেতাজীর নিকট নিবেদন করিতেছে, তীর্থযাত্রায় আমাদের সহযাত্রী করো! যিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচি মেয়েদেরও অবহেলা করেন নাই, তিনি—সেই বীর সাধক বীর নারীর আকুল আবেদন উপেক্ষা করিতে পারেন না। সে ধাতুতে তাঁহার গঠন হয় নাই।

তীর্থযাত্রা? তাই বটে! তীর্থযাত্রাই বটে। মৃত্যুর চেয়ে বড় তীর্থ, পবিত্র তীর্থ আর আছে না কি? বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ঢুকিলে ক্ষণেকের তরে জ্বালার উপশম, অশান্তির শান্তি হয়, জানি; পুরুষোত্তমের সম্মুখে দাঁড়াইলে শোক তাপ দুঃখ গ্লানি তখনকার মত নিবারিত হয়, তাহাও মানি; প্রাণ শীতল হয়, হৃদয় জুড়ায়, তাহাও স্বীকার করি, কিন্তু কয় দণ্ড? কয় মুহূর্ত্ত? সংসার, রোগ, শোক, দুঃখ, অভাব, দৈন্য, হিংসাদ্বেষ, কলহবিবাদ মন্দির পথের ভিখারীর মত, রাজপথে পুলিশ প্রহরীর মত, কারাগারের শাস্ত্রীর মত সারি দিয়া, কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে? ছার সংসারী মানবের কি সাধ্য যে অতিক্রম করিয়া যায়? আর মৃত্যু? জ্বালার চির অবসান; সন্তাপের চির বিলোপ; অশান্তির নিঃশেষ শেষ! 'মরণ রে তুঁহু মোর শ্যামের সমান।' আর সেই মৃত্যু যদি দেশের দন্ড, জন্মভূমির জন্য, মাতৃভূমির জন্য, দেশের আহ্বানে, জন্মভূমির আমন্ত্রণে, মাতৃভূমির আহ্বানে যায়, সে কি মহাতীর্থযাত্রা নহে? সেই মহাতীর্থযাত্রায় পুরুষ চলিয়াছে, নারীর সে মহাতীর্থযাত্রায় অধিকার নাই? স্বতঃ অভিমানিনী নারী এই অনাদর—এই হতাদর সহ্য করিবে? তীর্থযাত্রায় নারী সকলের আগে পুঁটলী বাঁধে! চিরদিন বাঁধিয়াছে, আজও বাঁধিবে! কাহার সাধ্য বাধা দেয়?

সুভাষচন্দ্র অকৃতদার। আকুমার ব্রহ্মচারী বলিয়া একটা সাধু ভাষা চলিত আছে। সুভাষচন্দ্র সেই আখ্যায় আখ্যাত হইতে পারেন কি না তাহা লইয়া শিরোবেদনা ঘটাইবার আমার কোনই প্রয়োজন নাই। আমি যাহা দেখিয়াছি তাহাতে এই মাত্র বলিতে পারি যে একটি ক্ষুদ্র

আবেষ্টনীর মধ্যে, দারাসুত লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার উপকরণের নিদারুণ অভাবই তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইত। পত্নীপ্রেম, অপত্যস্নেহ কামনার বস্তু সন্দেহ নাই জানি, আমি আপনারা তাহার প্রশান্ত, সুশান্ত বসন্ত লইয়া আমরণ সুখবিব্রত থাকিতেই চাই তাহাও ঠিক, কিন্তু যে উদ্দাম প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বজনীন প্রবৃত্তির সহিত সত্তা সংস্থাপিত করিতে জন্ম লভিয়াছে, তাহার পক্ষে ক্ষুদ্র গণ্ডীর কল্পনাও সহনাতীত। দুই যুগাধিক কালপূর্ব্বে, পূর্ণ থিয়েটারে "বঙ্গবালা" চিত্র-উদ্বোধনে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, যে কথা শুনিয়াছিলাম (ভারতবর্ষ, পৌষ) নারী-জাতির প্রতি যে মমত্ব, দৃপ্ত মর্য্যাদাবোধের পরিচয় প্রদীপ্ত হইয়াছিল, দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এসিয়াখণ্ডে ভারতীয় অবলার কোমল করকমলে খর্পর প্রদান তাহারই পূর্ণাহুতি !

সুভাষচন্দ্র যে অক্ষম করে তরবারি অর্পণ করেন নাই এবং যে দানবদলনী বীর নারীর নামে তাঁহার প্রমীলা সৈন্যবাহিনীর নামকরণ করিয়াছিলেন, সেই নারীরা সেই মহিয়সী নামের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, ভারতীয় নারীর গৌরব বৃদ্ধি করতঃ ইতিহাসের পৃষ্ঠা সুবর্ণ প্রভায় প্রভাসিত করিয়াছেন, বহুদূর সুদূরে থাকিয়াও আমরা তাহা জানিতে পারিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। সদ্যঃমুক্তিপ্রাপ্ত জাতীয় বাহিনীর সৈনিকপ্রদত্ত বিবরণ বারান্তরে শুনাইবার ইচ্ছা রহিল। সুভাষ-গঠিত ভারতীয় জাতীয় বাহিনীকে ধর্ম্মবর্ণসম্প্রদায়গত বিভেদবিমুক্ত ও পঙ্কিলতাবর্জ্জিত করিতে পারিয়া সুভাষচন্দ্র যে অশ্রুতপূর্ব্ব অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন, যে কীর্ত্তিস্তম্ভের পানে বিস্ময় বিমোহিত ভারতবাসী স্তব্ধহৃদয়ে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে ইহাও যেমন প্রত্যক্ষীভূত সত্য, অবলা ভারতবালাকে বীরনারীর ভূষণে বিভূষিত করিয়া নারীত্বের মর্য্যাদার মহোচ্চশিরে যশোমুকুটবিশোভিত করিয়া যে অপরিসীম দুঃসাহসিকতার পরিচয় তিনি দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বীরহৃদয়ের পরিপূর্ণ আলেখ্যতলে তলে নারীর শ্রদ্ধার্ঘ্য যুগযুগান্ত-কাল পর্য্যন্ত উৎসর্গীকৃত হইতে থাকিবে, ইহাও তেমনই অবিসম্বাদিত সত্য ! আমার এই উক্তি সমস্ত নারীর অন্তরেই প্রতিধ্বনি ধ্বনিত করিবে, ইহাই আমার অন্তরের অনুভূতি।

আমার উক্তির সত্যতার প্রমাণ পাইয়াছি, ২৩এ জানুয়ারী ১৯৪৬, সুভাষচন্দ্রের জন্মতিথি উৎসবে। বৃটিশের মহাসাম্রাজ্যের মধ্যমণি কলিকাতা মহানগরীতে বৃটিশের লাট, বৃটিশের কেল্লা, বৃটিশের কামান, বন্দুক, গোলাগুলি বারুদ, বৃটিশের ট্যাঙ্ক, বোমারু, বম্বার, বিমান, লাল কাল শ্বেত নীল সৈন্যসামন্ত অপ্রতিহতপ্রতাপ পুলিশ সুরক্ষিত কলিকাতায় এমন একখানি গৃহ ছিল না, যে গৃহশিরে না ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল ! এমন গৃহ ছিল না সন্ধ্যায় যাহার অলিন্দ আলোকমালায় বিভূষিত না হইয়াছে ! ভূমিকম্পে পৃথিবী ধ্বংসকবলিত হইতে চাহিলেও এত শঙ্খনিনাদ হয় কি না বলা কঠিন, যত শঙ্খ সেইদিন দীপ্ত মধ্যাহ্নে নারীর মুখে মুখে ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। পুরুষ তখন কোথায় ?—অফিসে গিয়াছে, আদালতে গিয়াছে, খাদ্যান্বেষণে বাহির হইয়াছে। পুরনারী—পুরবালা পতাকা উড্ডীন করিয়াছে ; শঙ্খধ্বনি করিয়া পঞ্চাশবর্ষ পূর্ব্বেকার একটি শুভক্ষণকে অভিনন্দিত করিয়াছে ; মঙ্গলকরে প্রদীপ সজ্জিত করিয়াছে। বাল্যকালে, জন্মাষ্টমী নিশীথে, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে 'জন্মাষ্টমী' নাটকাভিনয় দেখিয়া যে পুলকপ্রবাহে স্নান করিতাম, আজ এ জীবন অপরাহ্নে, ২৩এ জানুয়ারী সুভাষ-ষষ্ঠিতে সেই পুলকের প্লাবনপ্রবাহিত হইতে দেখিলাম। মনে হইল—আহা ! কি দেখিলাম ! আর কি এমন দেখিব !

বিলাসে ব্যসনে, বিদেশীর অনুকরণে, বিজাতিয় আচরণের প্রভাবে ভারতীয় নারী যেন আপনার সত্তা, আপনার মর্য্যাদা, আপন অধিকার ভুলিতে বসিয়াছিলেন, আজ অনেককাল পরে, মহাভাগ্যবান মহামানবের জন্মলগনে বিস্মৃতির অতল তল হইতে লুপ্ত রত্নোদ্ধার হইয়াছে। নারী আপনার হাতে পূজার ডালা সাজাইয়াছে, চন্দনপিঁড়িতে চন্দন ঘসিয়াছে,



পসারিণী—ডালহাউসী

তুলসীমূলে প্রদীপের মালা গাঁথিয়াছে। মাঘের এই বিগতশীত মলিনধূসর অলস শান্ত দিবস ও সন্ধ্যা সুভাষের আজাদ হিন্দের সুরভিতবসন্তমলয়া-নিলান্দোলনে নিখিল ভারতবর্ষের অঙ্গে যে শিহরণ, ভাষার নিক্তিতে তাহার পরিমাপ করিতে চেষ্টা করাও ধৃষ্টতা মাত্র।

২৩এ জানুয়ারীর এই অভিনব দৃশ্য বৃটিশ দেখিয়াছে, পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যবৃন্দও দেখিয়াছে, আমেরিকাও চাক্ষুষ করিয়াছে, হয় ত বা বিজয়ী মিত্রপক্ষীয় অন্য দেশের লোকও প্রত্যক্ষ করিয়াছে। ভারতের তমসাচ্ছন্ন

চনা করিতেছে, তাহাকে প্রসন্নচিত্তে বন্দনা করিবার মত উদারতা কি াহাদের আছে? অস্ত্র নাই—নিরস্ত্র, হিংসাদ্বেষঅসূয়াবিবর্জ্জিত আনন্দ-রিপ্লুত জয় হিন্দ ও বন্দেমাতরম্ ধ্বনি কি সাম্রাজ্যবাদীর কর্ণে কামানের র্জ্জন বলিয়া অনুভূত হইতেছে না? জানি না, জানিতে চাহি না। ামার সাড়ে তিন বৎসর বয়সের নাতনী রত্না মজুমদার অলিন্দে অলিন্দে ্রদীপের পলিতা উস্কাইয়া দিতেছে, আর আপনার মনে আপনি বলিতেছে, ়য় হিন্দ! জয় হিন্দ! একটি প্রদীপও সে নিবিতে দিবে না; নির্ব্বাণ-ায় দীপে স্বহস্তে তৈল দান করিতেছে; আর বলিতেছে, জয় হিন্দ!

সুভাষ জন্মতিথি পালন করিয়া জাতি ধন্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই; ক‍ন্তু আমার বড় আশা ছিল, ঐ পুণ্য দিবসে সুভাষ-পরিকল্পিত মহাজাতি-দনের অসম্পূর্ণতা বিলোপের সঙ্কল্পও গৃহীত হইবে। ভারতবর্ষে—কলিকাতায় সুভাষের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র কলিকাতায় তাঁহার শেষ আরব্ধ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, যে দেশে সুভাষচন্দ্রের জন্ম, যে জাতির মধ্যে তাঁহার অভ্যুদয়, আমরা সেই দেশের সেই জাতির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিব। আইনের বাধা থাকে, থাক্; অর্থাভাব থাকে, থাক্! যে দেশের, যে জাতির অন্তরের অন্তরে সুভাষচন্দ্র দাবাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া গিয়াছেন, সেই দেশ ও সেই জাতির সম্মিলিত বাসনার বাষ্পমাত্রেই সমস্ত বাধাবিঘ্ন ব্যাত্যা বিতাড়িত তৃণ খণ্ডের মত নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। অর্থাভাব? পথিক, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধরিয়া পথ চলিবার সময় মহাজাতি সদনের কঙ্কাল দেখিয়া কি তোমার মনে লজ্জার উদয় হয় না? চল্লিশ লক্ষ নর নারীর কলিকাতা মহাজাতি সদন-দ্বারে একটি বার, একটি করিয়া টাকা অর্ঘ্য প্রদান করিয়া যাইতে সত্যই ক্লেশ বোধ করিবে? সুভাষচন্দ্রের শেষ-শবদানের মর্য্যাদার প্রতি আমাদের মমত্ব কি এতই অসার, এতই ভঙ্গুর? ইচ্ছা করে অন্তরের সমস্ত আকুলতা, হৃদয়ের শ্রদ্ধা-প্রীতি-স্নেহ-প্রেম আমার এই ক্ষীণ ও দুর্ব্বল কণ্ঠ-নিম্নে একত্রিত করিয়া বলি—

দাঁড়াও পথিকবর
জন্ম যদি তব বঙ্গে

মহাজাতি সদনের সম্মুখে মুহূর্ত্তের তরে দাঁড়াও; পলকের জন্য চিন্তা করো, স্বদেশে, সুভাষচন্দ্রের এই ছিল শেষ বাসনা! শেষ অভিলাষ।

বন্দেমাতরম্
জয় হিন্দ

অসীমের তৃষ্ণা

শ্রীপ্রমথনাথ কুমার

গোধূলির স্বর্ণ রেণু বিলাইয়া শ্যাম শষ্প শিরে
ধীরে, অতি ধীরে,
দিনান্তের ক্লান্ত রবি বাজাইয়া বিদায় বিষাণ
দিগন্তে মিলায়ে যায়—দিবসের হ'ল অবসান।
মৌন মূক স্তব্ধতায় পরিপ্লুত বনানী-বীথিকা
নীলিমা নভের বুকে আঁকে যেন কিসের লিপিকা!—
তরু শ্রেণী দোলাইয়া বেণী
আঁখির পল্লবে মাখি বিস্ময়ের রেখা,
বাসর শয়ানে জাগে একা।
ধ্যানমগ্ন মহোর্ম্মির টুটিল স্বপন;
গাহে অনুক্ষণ,
ফেনিল কিরীটি পরি' জলোচ্ছ্বাস মরণের গান।
সৃষ্টির জড়িমা নাশি' প্রতিধ্বনি বাজে অফুরাণ।
ওগো ভয়ঙ্কর!
মূরতি তোমার? সে যে, ভয়াল সুন্দর!
মনের অঙ্গনে মোর আঁকিয়াছে মধু আলিপনা
তাই ত উন্মনা!
তাই ত বসিয়া তব বাত্যাক্ষুব্ধ বালুকা-বেলায়
নিজেরে হারায়ে ফেলি,—অন্তহীন তোমার খেলায়।
সহসা চমক ভাঙ্গে চিত্ত মোর হয় সুচঞ্চল
ব্যাকুল ব্যথার ভারে অবিরাম বহে অশ্রুজল।
অবজ্ঞায় ব্যর্থতায় দিবা বিভাবরী
কণ্ঠে দোলায়েছে মোর কণ্টকের শত সাতনরী।
তোমার চাঞ্চল্য মাঝে আছে সুপ্তি, শান্তি ম্লানহীন,
অহর্নিশ বাজে যেন পরিপূর্ণ আনন্দের বীণ
সৃষ্টিরে সরস করি যুগ যুগ ধরি'।
আমারে কে দিবে সমাধান?
বিশ্বের কর্ম্মের স্রোতে মোর শেষ গান
ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারিয়া পলে অনুপলে
সমাপ্ত করিব শুধু। হৃদয়ের রক্ত শতদলে
দু'হাতে অঞ্জলি দিয়া বিশ্ব দেবতায়
চলি যাব অসীম যাত্রায়।

ডাক্তার। মায়ের কৃপায় সব মধুরেণ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে মাণিক। আমাকে পেয়ে সাহেবের Thanks আর থামে না। যেন কি দয়াই করতে গিয়েছি, আমার প্রাণ কিন্তু তখন টেথিস্‌কোপের ফোঁকরে পড়ে আছে! বললুম—"আগে আপনার বুকটা দেখব সার।"

শুনে ভারী খুশি। আবার সেই 'সাইড্‌রুম্‌' আর একজামিনের ধুম! টেথিসকোপটাও যেন মুকিয়ে ছিল। যেখানে ঠ্যাকাই, হাতুড়ির আওয়াজ! তখন আর আমাকে পায় কে! বলে' ফেললুম—Pardon me sir, yours is a Torpedo-Proof chest কোনো রোগই ওখানে প্রবেশ পথ পেতে পারে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। 'সেরিডন' আনিয়েছেন দেখছি—ফেলে দিন। ও সব ইণ্ডিয়ানদের জন্যে। আপনার কেনো যে ও সন্দেহ হয়েছিল বুঝতে পারি না।

সাহেব। ইণ্ডিয়ায় এসেছি কিনা, তাই সাবধান হতে হয় ডাক্তার।

বললুম—সেটা খুব ভালো কথা।

সাহেব। কেনো বল দেখি এখানে এই রোগ?

বললুম—সে আর আপনার শুনে কাজ নেই। যারা দু'বেলা খেতে পরতে পায়, তাদের রোগ থাকবে কেনো? আপনাদের সে দুর্ভাবনা নেই। থাক সার্‌।

কি বুঝলেন জানি না। একটু নীরব থেকে বললেন—চলো অনেক কথা আছে।

ঘর বদলে বসা গেল। ওঁদের ঘেঁষে বেশীক্ষণ থাকা অস্বস্তিকর। আবার অনেক কথা কি রে বাবা!

"Infected area (ছোঁয়াচে-পল্লীর) খবর কি?"

তাঁকে সব ঠিক কথাই বললুম—"রোগ কমে এসেছে। নূতন আক্রমণ আর দেখছি না। কয়েকটি পুরাতন রোগী—এক ডজন হবে—তারাও সেরে উঠছে। সব কয়টিই বাঁচবে বলে' আশা করি সার।"

বললেন—Good news সুখবর। তাদের perfect recovery—সেরে ওঠা, দেখা চাই।"

"আমাকে অল্পদিনের জন্য—দু'মাসের কড়ারে, পাঠানো হয়েছে সার। সেটা শেষ হতে যে আর কয়েকদিন মাত্র বাকি।"

Nonsense, it is question of life, not time—you can't go having your patients to dogs—এটা জীবন মরণের কথা—সময়ের কথা নয়। তাদের না সারিয়ে যেতে পার না।

"কিন্তু কর্ত্তারা যদি"—আমাকে আর এগুতে হল না, তাঁর মুখ চোখ লাল হতে দেখেই থেমেছিলুম।

কড়া কণ্ঠেই বললেন—"কর্ত্তাটা কে? Could they dare order, while I am here with my regiments?"

আমাদের চাকরির প্রাণ নাড়ী যে কতো পল্‌কা, সে কথা সাহেব তো জানেন না, স্বরাজের তাড়ায় একটু নাড়াতেই সে ছাড়া পায়! মা বাপ মলে, মুখ-অগ্নিটা রবিবারে করলেই কর্ত্তাদের ধর্ম্মসম্মত হয়। না মানলে চাকরির মুখ-অগ্নি হয়েও যেতে পারে!

তাঁর পরিবর্ত্তন দেখে ধীর হয়ে বললুম—"আপনার ইচ্ছা জানলেই তাঁরা দিন বাড়িয়ে দেবেন, তার ওপর তাঁরা কি আর কথা কইতে পারেন? আপনি এক লাইন লিখে দিলেই যথেষ্ট হবে সার্‌।"

শুনতে শুনতেই তাঁর সে লালিমাটা লোপ পেলে। "Oh! alright, ক'দিন লিখি বলো দিকি? আমার তো ইচ্ছা—যে কয়দিন আমি এখানে আছি"—বলে' হাসলেন, বললেন—"তুমি থাকলে আমি ভালো থাকি?"

"কথার মধ্যেই সব হে—rather তার accountএর মধ্যেই সব—গিরিশ ঘোষের সাজানো বাগান শুকিয়ে গিয়েও চির-সবুজ হয়ে রইল। মধু ও বিষ পাশাপাশি থাকে। কথাকে শক্তি দেয় তারাই। কর্ত্তাদের একটি ভাল কথা শুনলে দাসেরা দুনিয়া ভুলে যায়, তাও তাদের

ভাগ্যে জোটে না। কেবল—"হুকুম, চড়া কথা আর জল্‌দি!" মাথা, মন, প্রাণ ওই ঢাকের বাদ্দির কাছেই বাঁধা। সামান্ত একটি 'কিন্তু' আরম্ভ না করতেই shut-up, do what I order—চুপ্, যা বলছি—কর' গে। শুনতে হয়। যাক্—

সাহেবের কথা শুনে আমার চোখে জল এসেছিল। বললুম—"দাসের প্রতি আপনার অসীম দয়া। আপনার কাছে থেকে কাজ করবার ভাগ্য আমি আর কি করে পাব। আমাকে এই চাকরি করেই খেতে হবে হুজুর, আপাতক আপনি না হয় সপ্তাহ দুয়ের জন্তে লিখে দিন।"

তিনি বোধ করি আমার কণ্ঠস্বরে আর্দ্র হয়েছিলেন, বললেন—Cheer up Doctor, don't be afraid, I may remain in India for sometime—writing for 3 weeks—ভয় কি, আমি এখন কিছুদিন এই দেশেই থাকবো।—আমি তিন সপ্তাহ লিখছি।

কথা কবার ক্ষমতা ছিল না, উচিতও হ'ত না। বললুম—"সেই ভালো সার, খুব ঠিক হয়েছে।"

তখন মন কিন্তু বলছে—"আপিস কর্ত্তারা ঠিক ভাববেন—আমিই সাহেবকে দিয়ে নিজের ইচ্ছা মত লিখিয়েছি। উপায় কি, আমার কথা কে বিশ্বাস করবে।"

মাণিক। তবে ভাবছেন কেনো? ও তো আছেই।

ডাক্তার। ওটা চাকরদের আপনিই আসে—ভাবতে হয় না মাণিক। ওটা দাস-মনোবৃত্তি, সে অন্তরেই কাজ করে। যাক্—মা আছেন।—হাঁা, বিনোদী সাহেবের কাছে গিয়েছিল। দেখে খুশি হয়েছেন। এক সপ্তাহ পরে কাজে join করতে বলেছেন।—তার কাছে নাকি শুনেছেন আমি নিজের পকেট থেকে রোগীদের পথ্যাদির জন্তে সাহায্য করি, তাতেই অনেকে বাঁচে।

বললুম—"আমার কতটুকু সামর্থ্য সার, আপনার টাকাতেই কাজ করেছি।"

"না, আমি ভাল লোকের কাছে শুনেছি—তুমিও সাহায্য করেছ। সে তো ভালই করেছ।"

"থাক্ Sir, I feel ashamed—তাদের ভাল হওয়ার সঙ্গে যে আমার স্বার্থ জড়ানো রয়েছে—তাতে আপিসে যদি একটু ভালো record থাকে—ভালো remark পাই"—

"ভেবনা, তার ব্যবস্থা আমি করব।"

এই সময় একটি গোঁফ কামানো লম্বা—অফিসারই হবেন—এলেন। আমি ঝুঁকে উভয়কে সেলাম ঠুকে পালিয়ে এসে বেঁচেছি। অন্তায় করেছি কি মাণিক?

মাণিক। আগন্তুক চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছেন কি?

ডাক্তার। হাঁা, আসার সঙ্গে সঙ্গেই তা করেছেন, সাহেবের ইঙ্গিতের অপেক্ষা করেন নি।

মাণিক। তবে ঠিক হয়েছে।

ডাক্তার। ত্মাখো মাণিক, কর্ত্তাদের হুকুমের মধ্যে থাকাই ভালো। তাতে চাকরির বাঁধন বজায় থাকে। নরম গরমেই আমরা অভ্যস্ত, তাই একটুতেই ভয় হয়।—নাঃ চাকরি আর করতে পারব না, দেখছি—কেবল ভয় আর মিথ্যা কথা—

মাণিক। কই একটাও তো মিথ্যা কথা পেলুম না, সবই তো ঠিক বলেছেন।

"কথার মধ্যে যে উদ্দেশ্য গা ঢেকে থাকে! নিরাকার চৈতন্ত হে।"

মাণিক। যতক্ষণ পাঁচজনকে নিয়ে থাকা—সংসারে থাকা, ততক্ষণ সে থাকবেই। সে কাকেও বলে দিতে হয় না, চেষ্টা করেও বলতে হয় না হুজুর। ভুলে যাচ্ছেন কেনো—আপনার কাছেই তো শুনেছি—Self preservation (আত্মরক্ষা) জিনিসটির ওটি ধর্ম্ম।

"কে জানে, কখন কি বলি, মনে থাকে না। তা বটে সে বেচারা অতশত ভাববার সময়ও পায় না। কিন্তু—"

মাণিক। মাপ করবেন, ওর মধ্যে আর "কিন্তু" আনবেন না। তা হলে গেরুয়া নিতে হয়। সংসারে ওটা রোকে না, রাজ্যে তো নয়ই। রাজকার্য্যে বরং diplomacy বলে খ্যাতি পায়।

ডাক্তার। তা দেখছি, কোর্ট আর কাটগড়াই ও সত্যের মর্য্যাদার মহাপীঠ। থাক্ মাণিক। একটু চা খেলে হোতো—

"নিন না, এখনি।" "আসছি" বলে মাণিক চলে গেল। মিনিট পাঁচ সাতের মধ্যেই চা এসে গেল।

ডাক্তার। এগুলো কি ওরা সাধে রেখেছে—হাঁপ ছেড়ে বাঁচবার উপায়—মুস্কিলাসান।—দেখনা কেবলি মনে হচ্ছে—"বলে' এলেই ভালো ছিল।"—কি পাপ বল দিকি!

এ তো শুধু দাসত্ব নয়—আত্মবিক্রয়। এই সব করতে হবে কিনা তাই বুড়ো ভীষ্ম মুড়ো মেরে নজির রেখে গেছেন, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সভায় টু শব্দটিও তাঁর মুখ থেকে বেরয়নি। শেষে বল্লেন কি না—"আমি যে দুর্য্যোধনের অন্ন খেয়েছি—অন্নদাস!" তাই বোধ হয় মহাভারত কথাটার সু-প্রয়োগ মাঝে মাঝে শুনতে পাই—যার বাংলা মানে—"আরে ছি"! ওতে বড়দের দোষ হয় না, বড়বাবু সাহেবের ঘরে 'hopeless' প্রভৃতি মিষ্ট কথা শুনে—বাইরে এসে বলেন—"আজ খুব জমেছিল হে—অনেক (রিলিজাস্ টক্) religious talk হোলো তাই দেরী হয়ে গেল, ইত্যাদি।"

মাণিক হাসতে হাসতে বললে—"আপনি এ বিষয়টা কিন্তু মিছে ভাবছেন। না চলে এলে ওরা ভাবতো—ওদের এটিকেট্ আপনি জানেন না। ঠিক করেছেন, আর কি দাঁড়াতে আছে?"

তাই না কি? আমাদের উপ-কর্ত্তারা কিন্তু আলাপি এলে অবান্তর কথায় দু'ঘণ্টা কাটিয়ে তারপর ঠিক্ ডাকতেন। দেখতে না পেলে—কৈফিয়ৎ তলব হতই। ভাবি কি মিছে! তাঁদের কর্ত্তামির দাবী যে দরাজ! আমরা কি কেবল কাজ করবার জন্যে আছি, ওঁদের কর্ত্তামী দেখাবার উপায় হয়ে থাকাই যে আমাদের প্রধান কাজ হে।—যাক্, আর ভাববো না। রোগের যেমন উপসর্গ থাকে, এ সবও চাকরির উপসর্গ।—

"দেখ না আজ খুব ভালো মন নিয়েই সাহেবের কাছ থেকে বেরিয়ে এসেছিলুম। কোথা থেকে ওই একটা খটকা এসে সব বিগড়ে দিয়েছিল। এখানকার দিন ফুরিয়ে এলো দেখে, আর c/o'র মেজাজটাও ভালো দেখে, অনেক কথাই কয়ে' ফেলেছি। তোমার কথা, যুধিষ্ঠিরের কথা, বিনোদীর কথা, সবই হয়ে গেছে। কিছু ফল হবে বলেই আশা করি।"

মাণিক। আমাদের কথা আবার কি বললেন?

ডাক্তার। ওই যে সাহেব তখন বলেছিলেন—"আমি ভালো লোকের কাছে শুনেছি"। সে ভালো লোকটি আর কেউ নয়—তোমার ওই যুধিষ্ঠির। লোকটা সত্যিই পাকা লোক। বোধ হয় কামিজবাবুকেও হাত করে রেখেছে।

মাণিক। এটা ঠিক্ ঠাউরেছেন। তার কাজ (supply) শেষ হয়ে আসছে, সে ছটফট্ করছে। শুধুই তো তার ওই কই-মাছের করবার নয়, আর কেবল এখানেই নয়, ওর সঙ্গে অনেক কিছু আছে। 'কই' বাদ দিলে, সবই যে বাদ পড়ে, লেখাপড়া নাকচ হয়ে যায়। তা না তো কি এক কইয়ে অত টাকা ছাড়ে? আপনার বংশের কথা শুনে, সব কথা ভাঙেনি।

"আমিও ভাবতুম হে—একমাত্র 'কই' নিয়ে থই পায় কি করে! আমরা চার পায়ে সামলাতে পারছি না, খোল্‌গুলো যে ঢোল হয়ে উঠলো।"

মাণিক। আরো কত কি জড়িয়েছে জানি না।

ডাক্তার। জেনে কাজ নেই। ও রাজা হোক্, তাতে দুক্ষু নেই। কিন্তু আমার আর ভালো লাগছে না

মাণিক। আবার ওর একটু কাজের (কনট্রাক্টের) জন্যেও সাহেবকে আভাস দিয়েও এলুম হে!

মাণিক বললে—"ভালই করেছেন"।

ডাক্তার। যাক্ ওর কথা—ওর অদৃষ্টে যা আছে হবে। এখন তুমি বড় ছেলেটিকে কম্পাউণ্ডারীটা শিখিয়ে পড়িয়ে নাও না। সহজেই তার কাজ হয়ে যাবে।

মাণিক। আপনার দয়া কোনোদিনই বুঝতে পারব না। ওইটুকু থাকলেই সব হয়ে যাবে হুজুর। কিন্তু, মাপ করবেন—চাকরিতে আর…

ডাক্তার। বস্ বস্, বুঝেছি। লাখ টাকার কথা কয়েছ—ভারী খুশি হলুম। সে যদি মাথায় করে পাট ব্যাচে, তাকে আমি লাট ভাববো। ওটা দেশের মেয়েরা বুঝলেই আমাদের সুদিন আসবে। তাঁরা বুঝতে আরম্ভও করেছেন। যাক্, তোমার একটু উন্নতির উপায় হতে দেখলেই, আমি নিজের কথা ভাববো—যা হয় করব।

মাণিকের কণ্ঠ ভারী হয়ে এসেছিল। সে হাতজোড় করে' বললে—ও-কথা এখন নয় হুজুর, কুমারের মঙ্গল কামনাই এখন প্রধান—

ডাক্তার। কুমার আবার কে হে?

মাণিক। যিনি আসছেন—ভুলে যান কেনো?

ডাক্তার। ওঃ that ফ্যাসাজি fellow, যিনি ঋণ পরিশোধের তাগাদায় আসছেন! ভালো কথা মনে

মাণিক। বলেন—"আমার সঙ্গে চলো ডাক্তার, তোমার ভালো হয়ে যাবে। আপাতক Three times fifty and allowance, পরে আমি দেখব কতটা কি করতে পারি।" কী বিপদেই পড়েছিলুম—তাঁকে সবই বলতে হ'ল—আগন্তুক ইমিনেন্ট—আসন্ন সার। শুনে একটু থমকে গেলেন, খুশি হলেন। বললেন—"আচ্ছা,—বাচ্ছা হবার পর, আমাকে জানিও, ইত্যাদি। সেই ফাঁকে তিন দিনের ছুটির কথাও বলেছি I mean—সাধের হাঙ্গাম সারা চাই তো।"

মাণিক মাথা চুলকে বললে—"ছুটির কথাটা কেবল ওঁকে বললেই হবে না কিন্তু।"

ডাক্তার। না—আপিসে জানাব বই কি—ঘরের দেবতা আগে। মনটা কিন্তু বড় বিচলিত করে' দিয়েছেন o/c—লোভে নয়, ওঁর অহেতুক ভালবাসায়।

মাণিক। পূর্ব্বেই বলেছি সার—যিনি আসেন তিনি ভাগ্য নিয়েও আসেন। এ সব কুমারের ভাগ্যের পরিচয়—

ডাক্তার হাসি মুখে—"কিন্তু"—

"দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়"।

মাণিক। ওটি জ্ঞানের কথা, ওর 'ফুট্ নোট' থাকা দরকার—অর্থাৎ পঞ্চান্নর পর। আপনি তো বলেন—"জ্ঞান আর চাকরি—বিরুদ্ধ বাক্য। অজ্ঞান আর চাকরি এক ঘরে থাকে।"

ডাক্তার। ওঁদের ভালবাসার মোহ মাঝে মাঝে বড় ঘুলিয়ে দেয় হে—বড় ভয়ের জিনিস। যাক্ সে পরের কথা। তুমিও ভেবো—বুঝতে পেরেছ?"

মাণিক। আজ্ঞে তা তো বুঝেছি, কিন্তু খুড়োকে যে মনে পড়ে! তাঁদের যে 'পথপ্রান্তে'র দুর্ভাবনা নেই।

ডাক্তার। যাক্, এখন কোথায় কি?

(ক্রমশঃ)

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

প্রথম অধিকরণ—বিনয়াধিকারিক

গূঢ়পুরুষোৎপত্তি—সপ্তম প্রকরণ

একাদশ অধ্যায়

মূল :—উপধা-সমূহ-দ্বারা পরিশুদ্ধ অমাত্যবর্গসহায়ে (রাজা) গূঢ়পুরুষগণকে উৎপাদিত করিবেন।

সঙ্কেত :—উপধা-সমূহ—(১) ধর্ম্মোপধা, (২) অর্থোপধা,(৩) কামোপধা, (৪) ভয়োপধা। উপধা—ছল। গূঢ়পুরুষ—চর। উৎপাদিত করিবেন—নিযুক্ত করিবেন—চর-কার্য্যের শিক্ষা দিবেন।

মূল :—কাপটিক-উদাস্থিত-গৃহপতি-বৈদেহ-কতাপস-চিহ্নধারী সত্রি-তীক্ষ্ন-রসদ-ভিক্ষুকী প্রভৃতিকে (উৎপাদিত করিবেন)।

সঙ্কেত :—কাপটিক প্রভৃতির লক্ষণ মূলেই পাওয়া যাইবে। মূলে আছে—'চ'—গঃ শাঃ উহার অর্থ করিয়াছেন—অনুক্ত-সমুচ্চয়—কুব্জ-বামন-কিরাত-মূক-বধির-জড়-অন্ধ-নট-নর্ত্তক-গায়ন-বাদন-বাগ্‌জীবন-কুশীলব

মূল :—পরমর্ম্মজ্ঞ প্রগল্‌ভ ছাত্র কাপটিক। তাঁহাকে অর্থ ও মান দ্বারা উৎসাহিত করিয়া মন্ত্রী বলিবেন—'রাজা ও আমাকে প্রমাণ (-রূপে স্থির) করিয়া যাহার যাহা অকুশল দেখিবেন তাহা তখনই বিজ্ঞাপিত করিবেন'।

সঙ্কেত :—মর্ম্ম—অন্তর, আন্তরিক ভাব। গঃ শাঃ—পরচ্ছিদ্রবেদী। কিন্তু পরমর্ম্মজ্ঞ কেবল পরচ্ছিদ্রবিৎ নহেন; পরের মনের কথা যিনি বুঝিতে পারেন—তিনিই পরমর্ম্মজ্ঞ—capable of guessing the mind of others (SH)। প্রগল্‌ভ—সাহসী, মুখচোরা নয়; শ্যামশাস্ত্রী—skillful বলিয়াছেন—forward বলা ভাল। কাপটিক—কপটাচারী; বাহিরে ছাত্রের বৃত্তি অবলম্বনে বাস করেন—অথচ ভিতরে ভিতরে গুপ্তচর; fraudulent disciple (SH); student informer বলা যায়। রাজা ও আমাকে প্রমাণরূপে স্থির করিয়া—কাপটিক একমাত্র রাজা ও আমাকে (মন্ত্রীকে) মানিবে—অপর কাহাকেও মানিবে না; একমাত্র রাজা ও মন্ত্রীর কথামত সে কাজ করিবে—তাহার আনীত গোপনীয় সংবাদ সে কেবল রাজা ও মন্ত্রীকেই জানাইবে; sworn to the king and myself (SH); knowing the king and myself

to be the (sole) authority—এইরূপ বলা উচিত। অকুশল—নিন্দনীয় ব্যাপার, দোষ, ছিদ্র—wickedness (SH); fault, vice—বলা ভাল। তদানীমেব (মূল)—শ্যামশাস্ত্রী এই অংশের অনুবাদ করেন নাই।

মূল :—প্রব্রজ্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত প্রজ্ঞা-শৌচ-যুক্ত উদাস্থিত। সে বার্ত্তাকর্ম্মের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে প্রভূত হিরণ্য ও শিষ্যসহ কর্ম্ম করাইবে। আর কর্ম্মফল হইতে সকল প্রব্রজিতের গ্রাসাচ্ছাদন-বাসাদির সংবিধান করিবে। বৃত্তিকামগণকে মন্ত্রণা দিয়া বশীভূত করিবে—'এই বেশেই রাজার প্রয়োজন সাধন করিতে হইবে, আর খাদ্য ও বেতন (গ্রহণ-) কালে (এস্থলে) আসিতে হইবে'।

সঙ্কেত :—প্রব্রজ্যাপ্রত্যবসিতঃ (মূল)—গঃ শাঃর পাঠান্তর—প্রব্রজ্যা-প্রত্যপসৃতঃ; শ্যামশাস্ত্রীর পাঠান্তর—প্রবৃজ্য প্রত্যবগ্রতঃ। গঃ শাঃ অর্থ করিয়াছেন—প্রব্রজ্যা (অর্থাৎ সন্ন্যাস) গ্রহণ করিবার পর উক্ত চতুর্থাশ্রম (অর্থাৎ সন্ন্যাস) হইতে প্রতিনিবৃত্ত—সন্ন্যাসভ্রষ্ট—ইহাই তাৎপর্য্য। এ সন্ন্যাস হিন্দু সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসও হইতে পারে, আবার বৌদ্ধ, জৈন, শৈব ভিক্ষুগণের গৃহীত সন্ন্যাসও হইতে পারে। শ্যামশাস্ত্রী উল্টা অর্থ করিয়াছেন—initiated in asceticism. কিন্তু মনে হয় গঃ শাঃর অর্থই ঠিক; কারণ সন্ন্যাসভ্রষ্ট না হইলে তাহার প্রভূত হিরণ্য, শিষ্য ও ভূসম্পত্তি কিরূপে থাকিতে পারে? প্রজ্ঞা—তীক্ষ্ণধী, দূরদৃষ্টি; foresight (SH); keen intelligence বলা উচিত। শৌচ—বাহ্য ও আভ্যন্তর শুচিতা। বাহ্য শৌচ—জলাদি দ্বারা দেহের নৈর্ম্মল্য সম্পাদন; আভ্যন্তর শৌচ—ভাবশুদ্ধি। উদাস্থিত—recluse (SH)—সন্ন্যাসীর বেশধারী। বার্ত্তা-কর্ম্মপ্রদিষ্ট ভূমিতে—বার্ত্তা-কর্ম্মের নিমিত্ত উপকল্পিত ভূমিতে। বার্ত্তাকর্ম্ম-কৃষি-বাণিজ্য-পশুপালন। কৃষি-বাণিজ্য-পশুপালনের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে 'উদাস্থিত' বহু স্বর্ণ ও বহু শিষ্যযুক্ত হইয়া স্বীয়শিষ্যগণের দ্বারা বার্ত্তা-কর্ম্ম করাইবে—ইহাই তাৎপর্য্য। প্রভূত স্বর্ণ—বার্ত্তাকর্ম্মের উপযোগী মূলধন। প্রভূত শিষ্য—বার্ত্তাকর্ম্মের উপযোগী কর্ম্মকরগণ। শ্যামশাস্ত্রী মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন—'May we not trace the origin of modern Bairagis to this institution of spies'? হওয়া সম্ভব। কর্ম্মফল—বার্ত্তাকর্ম্মকরণের ফল—শস্য, পশু ও অর্থ; কৃষির ফল—শস্য, পশুপালনের ফল—পশুবৃদ্ধি ও বাণিজ্যের ফল—অর্থলাভ। এই ত্রিবিধ ফল হইতে সকল শ্রেণীর সন্ন্যাসীর গ্রাসাচ্ছাদন-বাসস্থানের ব্যবস্থা উদাস্থিত করিবে। সর্ব্বপ্রব্রজিতানাং (মূল)—পাঠান্তর সর্ব্ব-বেষধারিণাং; এই সকল সন্ন্যাসী উদাস্থিতের কর্ম্মকর শিষ্যবর্গ হইতে পৃথক্ (গঃ শাঃ)। আবসথ—বাসস্থান, lodging. প্রতিবিদধ্যাৎ—ব্যবস্থা উদাস্থিত কেন করিবে? ইহার উত্তরে গণপতি শাস্ত্রী বলিয়াছেন—উদাস্থিত সন্ন্যাসিমাত্রকেই গ্রাসাচ্ছাদন-বাস দেয়—ইহা দেখিলে নিত্য নূতন নূতন সন্ন্যাসীর তথায় আগমন হইবে; তাহাদিগের মধ্য হইতে দুই চারিজন উদাস্থিতের শিষ্যত্ব স্বীকারও করিতে পারে—এইরূপে উদাস্থিতের শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, আর তাহাদিগের দ্বারা চরের কার্য্য উদাস্থিত করাইতে পারিবে। বৃত্তিকাম—জীবিকাপ্রার্থী—দেহযাত্রা-নির্ব্বাহের উদ্দেশ্যে কর্ম্মপ্রার্থী। উপজপেৎ—কানে মন্ত্রণা দিয়া নিজের বশে আনিবে (উদাস্থিত)। এই স্থলে মূলের পাঠভেদ আছে—"এতেনৈব দোষেণ রাজার্থশ্চরিতব্যঃ"—send on espionage such among those under his protection as are desirous to earn a livelihood, ordering each of them to detect a particular crime committed in connection with the king's wealth (SH)। ইহা মূলানুগ নহে—শ্যামশাস্ত্রীর নিজের কল্পিত বহু কথা ইহাতে আছে। 'দোষেণ' পাঠ থাকিলে অর্থ হইবে—'এইরূপ দোষ (নির্ণয়) দ্বারাই রাজার প্রয়োজন সাধন করিতে হইবে'। দোষেণ—দোষদর্শনেন; রাজার্থঃ—রাজার প্রয়োজন; চরিতব্যঃ—সাধনীয়। কিন্তু পাঠান্তর আছে—বেষেণ। উহার অর্থ ভাল—এই বেশেই রাজপ্রয়োজন সাধনীয়। অর্থাৎ উদাস্থিত জীবিকার্থী শিষ্যচরবর্গের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিক্ষুর বেশ প্রদান করিবে—যথা, কাহাকেও বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ, কাহাকেও পাশুপত সন্ন্যাসীর বেশ ইত্যাদি। বেশদানের পর উদাস্থিত প্রত্যেক বেশধারীকে বলিবে—'যে বেশ তোমাকে দিলাম, এই বেশ ধারণ করিয়াই তোমাকে রাজার প্রয়োজন সাধন করিতে হইবে। পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্রে কোথায় কি হইতেছে তাহার সন্ধান রাখিবে। কোন নূতন সংবাদ পাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা জানাইতে চলিয়া আসিবে না—কারণ তাহা হইলে তোমার উপর সন্দেহ জন্মিতে পারে। তবে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমার নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য বা বেতন ত লইতে আস—সেই সময়ে জ্ঞাত বৃত্তান্ত জানাইয়া যাইবে'। ভক্তবেতনকালে চোপস্থাতব্যম্ (মূল)—and to report of it when they come to receive their subsistence and wages (SH)—ইহা তাৎপর্য্য হইলেও মূলানুগ অনুবাদ হয় নাই। Report শব্দটির অনুরূপ শব্দ মূলে নাই। ভক্ত—ভাত, অন্ন, খাদ্য—ধান্য, তণ্ডুল, যব ইত্যাদি। বেতন—জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযুক্ত অর্থ। 'খাদ্য ও অর্থ গ্রহণকালে আমার নিকট আসিবে ও সেই অবকাশে তোমার জ্ঞাত বৃত্তান্ত আমাকে জানাইয়া যাইবে, আর অন্য সময় দূরে থাকিবে'—ইহাই তাৎপর্য্য।

মূল :—আর সকল প্রব্রজিত নিজ নিজ বর্গকে উপজাপিত করিবে।

সঙ্কেত :—উদাস্থিত সকল শ্রেণীর সন্ন্যাসীর গ্রাসাচ্ছাদন-বাসের ব্যবস্থা করিবেন—ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ঐ সকল সন্ন্যাসীর মধ্যে কেহ বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, কেহ বা শৈব ইত্যাদি। তাহারা প্রত্যেকে আবার নিজ নিজ বর্গ অর্থাৎ স্বশ্রেণীভুক্ত সন্ন্যাসিবর্গকে পরামর্শ দিয়া বশীভূত করিবে ও চরের কার্য্যে নিযুক্ত করিবে—ইহাই তাৎপর্য্য। বর্গ-শব্দের অনুবাদে শ্যামশাস্ত্রী বলিয়াছেন—followers. বর্গ অর্থে—অনুচর নাও হইতে পারে—বর্গ—সম্প্রদায়, শ্রেণী—নিজ নিজ শ্রেণীভুক্ত সন্ন্যাসী। উপজপেয়ুঃ—shall send on espionage (SH)—এ অনুবাদও বিশুদ্ধ নহে। উপজাপ করা অর্থে কান-ভাঙানি দেওয়া—চুপি চুপি পরামর্শ দিয়া নিজের বশে আনা।

মূলঃ—বৃত্তিক্ষীণ কর্ষক—প্রজ্ঞা-শৌচযুক্ত গৃহপতিক-ব্যঞ্জন। সে কৃষিকর্ম্মের উদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে ইত্যাদি—পূর্ব্বের সহিত সমান।

সঙ্কেত :—বৃত্তিক্ষীণ—কৃষি-বৃত্তি-দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত—গণপতি শাস্ত্রীর অর্থ। শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ—fallen from his profession. 'বৃত্তি' অর্থে জীবিকা; বৃত্তিক্ষীণ—জীবিকা যাহার ক্ষীণ হইয়াছে—অর্থাৎ কৃষি-কার্য্যরূপ জীবিকা-দ্বারা যাহার চলে না—কৃষি-জীবিকা যাহার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে—'কৃষি-ব্যবসায়ে ফেল' বলা চলে। কর্ষক—চলিত বাঙ্গালায় কৃষক, কৃষিজীবী। গৃহপতিক ব্যঞ্জন—গৃহপতি অর্থাৎ গৃহস্থের চিহ্নধারী চর—householder spy (SH)। ব্যঞ্জন—অভিব্যক্তি-চিহ্ন, লক্ষণ। পূর্ব্বের সহিত সমান—উদাস্থিত-সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, এস্থলেও সেই সকল কথাই উহনীয়। কেবল তথায় উদাস্থিত যেমন সন্ন্যাসি-বেশধারীদিগকে অন্ন-বস্ত্র-বাস যোগাইবে, এক্ষেত্রে গৃহপতিক-ব্যঞ্জনও তেমনই—সকল গৃহপতি-চিহ্নধারীর গ্রাসাচ্ছাদন-বাসের ব্যবস্থা করিবে ও স্বজাতীয়বর্গকে ভাঙ্গাইয়া নিজের বশে আনিবে—ইহাই বৈশিষ্ট্য।

মূল :—বণিক্—বৃত্তিক্ষীণ—প্রজ্ঞা-শৌচ-যুক্ত—বৈদেহক-ব্যঞ্জন। সে বণিক্‌কর্ম্মের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে ইত্যাদি—পূর্ব্বের সহিত সমান।

সঙ্কেত :—বাণিজকঃ (মূল)—বণিক্, trader (SH), merchant. বৃত্তিক্ষীণ—ধনাভাববশতঃ বাণিজ্যবৃত্তিচ্যুত (গঃ শাঃ); বাণিজ্য করিতে করিতে ক্ষয়প্রাপ্ত—বাণিজ্যে বহু লোকসান দিয়া 'ব্যবসায়ে ফেল'। বৈদেহক—পাঠান্তর বৈদেহিক—বণিক্। বৈদেহকব্যঞ্জন—বণিকের বেশধারী চর—merchant spy (SH); বস্তুতঃ—a spy with the characteristics of a merchant—বলা উচিত। পূর্ব্বের সহিত সমান—বণিগ্‌বেশী চর—অন্যান্য বণিগ্‌বেশীর গ্রাসাচ্ছাদন বাসের ব্যবস্থা করিবে ও স্ববর্গকে ভাঙ্গাইবে—এইটুকু বৈশিষ্ট্য।

মূল :—মুণ্ড বা জটিল বৃত্তিকামী তাপস-ব্যঞ্জন। সে নগর-সন্নিকটে প্রভূত মুণ্ড-জটিল-শিষ্যযুক্ত হইয়া প্রকাশ্যে এক মাস অথবা দুই মাস অন্তর অন্তর শাক অথবা যবসমুষ্টি ভোজন করিবে—(আর) গোপনে যথেচ্ছ আহার (করিবে)।

সঙ্কেত :—মুণ্ড—মুণ্ডিতমস্তক। জটিল—জটাযুক্ত। বৃত্তিকামী—জীবিকার্থী। তাপসব্যঞ্জন—তাপস-বেশী চর। উদাস্থিত—ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীর বেশধারী। তাপস—তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত। উদাস্থিত কোন তপস্যার আচরণ করার ভাণ দেখাইবে না—কেবল বেশ ধরিবে সন্ন্যাসীর। পক্ষান্তরে, তাপসকে কৃচ্ছ্র সাধনের ভাণ দেখাইতে হইবে। গণপতি শাস্ত্রী 'মুণ্ড' বলিতে বুঝিয়াছেন—শাক্যভিক্ষু-জৈনক্ষপণকাদি—যাঁহারা মাথা কামান; আর 'জটিল' অর্থে—শৈব-পাশুপতাদি—যাঁহারা জটা ধারণ করেন। শাক—নিরামিষ ব্যঞ্জনের উপাদান—উহা দশবিধ—

১। মূল (মূলা, ওল, কচু, আলু ইত্যাদি);
২। পত্র বা পাতা (ন'টে, পুঁই, প্রভৃতির পাতা);
৩। করীর বা কোঁড় (কচি বাঁশের কোঁড়);
৪। অগ্র বা আগা (বেতের আগা, খেজুর গাছের আগা বা 'মাথি');
৫। ফল (বেগুন, লাউ, কুমড়া, পটল, উচ্ছে, ঝিঙে, কাঁচা পেঁপে, কাঁচা আম, লঙ্কা ইত্যাদি);
৬। কাণ্ড বা ডাঁটা বা গুঁড়ি (ন'টে, ডেঙ্গো প্রভৃতির ডাঁটা)
৭। অধিরূঢ়ক বা প্ররূঢ় বা অঙ্কুর (ছোট ছোট শাকের চারা, বাঁশের কোঁক ইত্যাদি;
৮। ত্বক্ বা ছাল (সজিনার ছাল, আলু, পটল, কুমড়ার খোসা ইত্যাদি);
৯। পুষ্প বা ফুল (কুমড়ার ফুল, সজিনার ফুল, মোচা ইত্যাদি);
১০। কণ্টক বা কাঁটা (কাঁটা ন'টে ইত্যাদি);

অথবা কবক (পাঠান্তর)—যথা পাতালফোঁড়—এ্যাস্‌প্যারাগাস্ ইত্যাদি)।

এই দশ প্রকার শাক—vegetables যবসমুষ্টি—তৃণমুষ্টি—a handful of meadowgrass (SH)।

মাসদ্বিমাসান্তরং (মূল)—এক মাস বা দুই মাস অন্তর অন্তর একমুষ্টি শাক বা একমুষ্টি তৃণ ভোজন করার উদ্দেশ্য—'তপস্বী আহারজয়ী'—ইহাই প্রচার করা। গূঢ়ম্ (মূল)—গোপনে—নিজ বিশ্বস্ত শিষ্য ব্যতীত অন্যের অজ্ঞাতে—সর্ব্বসাধারণের অগোচরে। ইষ্ট আহার (মূল)—যে সকল খাদ্য তাহার ভাল লাগে।

স্মৃতি

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

অনাদি কালের এই বাধাহীন গতি দুর্ব্বার
জন্মমৃত্যু সৃষ্টি-লয় সাধে অনিবার।
যে-জন চলিয়া যায়, শুরু হয় জীবনের গীতি,
মাটীর-জননী-বুকে কেঁদে ফিরে তা'রি দীন স্মৃতি।

মানুষের বুক হ'তে মুছে যায় মানুষের নাম;
বিগতের স্মৃতি ধরি মৃত্তিকাই কাঁদে অবিরাম।
পথহারা পথিকের বেদনার অশ্রুকণা নিয়া,
বিনিময় দানে প্রেম ধরণীর ধূলিময় হিয়া।

নঞতৎপুরুষ

বনফুল

পরদিন সকালে পুরন্দরবাবু যুগলের প্রতীক্ষা করছিলেন, তাকে নিয়ে ভবেশবাবুর ওখানে যেতে হবে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তিনি। সিগারেট ধরালেন একটা। একটা কথা কিন্তু কিছুতে ভুলতে পারছিলেন না—মনে হচ্ছিল কাল রাত্রে তাঁর গালে কে যেন চড় মেরে গেছে একটা।

"হুঁ···সব জানে, বুঝতে পেরেছে সমস্ত। পাপিয়ার ওপর দিয়ে শোধটা তুলবে" কথাটা ভেবেই ভয় হল তাঁর। পাপিয়ার সুন্দর মুখখানি ভেসে উঠল মনের উপর—বিষাদ-মাথানো মুখখানি। একটু পরেই আবার তাকে দেখতে পাবেন মনে হবামাত্র হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। পাপিয়া তাঁরই যে।

"না, তর্কের কোন অবসর নেই এতে। পাপিয়া আমারই। ওই এখন আমার জীবন এবং জীবনের লক্ষ্য। অতীতের স্মৃতি নিয়ে কি হবে, গালে চড় মারলেই বা কি এসে যায়। জীবনে কি করলাম এতদিন? জঞ্জাল আর জ্বালা ছাড়া কি বা পেয়েছি! কিন্তু এইবার সব ঠিক হয়ে যাবে, সব বদলে গেছে এর মধ্যেই"

একটু পুলকিত হবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু একটা ছায়া ঘনিয়ে আসতে লাগল ক্রমাগত। "বেশ বুঝতে পারছি পাপিয়াকে দিয়েই ও জব্দ করতে চায় আমাকে। পাপিয়াকে কষ্ট দিচ্ছে সেই জন্যে। এই ভাবেই প্রতিশোধ নেবে। হুঁ···। না, কাল যা করেছে তা আর করতে দিচ্ছি না অবশ্য"—মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল তাঁর—"বারোটা বাজে···এখনও পর্য্যন্ত পাত্তা নেই তার—ব্যাপার কি"

প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সাড়ে বারোটা বাজল। অধীর হয়ে উঠলেন শেষে। এল না। হঠাৎ একটা কথা মনে হল—অনেকক্ষণ থেকেই মনে হচ্ছিল—যুগল হয়তো ইচ্ছে করে' আসছে না। পরে এসে কাল রাত্রের মতো আবার একটা নাটক করবে হয় তো। রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠল তাঁর। "সে ভাল করেই জানে যে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করছি—এও জানে পাপিয়া তার আশা পথ চেয়ে আছে। তাকে সঙ্গে না নিয়ে যাবই বা কি করে' আমি···আঃ"

আর অপেক্ষা করতে পারলেন না, একটা বাজতেই যুগলের বাসার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। সেখানে গিয়ে শুনলেন যুগল কাল রাত্রে বাড়ি ফেরেনি, সকালে ন'টার সময় এসেছিল, পনর মিনিট থেকেই আবার বেরিয়ে গেছে। পুরন্দরবাবু বন্ধ দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে চাকরের কথাগুলো শুনলেন, তার পর তালাটা ধরে' অকারণে টানলেন দু'একবার অন্যমনস্কভাবে। তার পর সহসা সচেতন হয়ে লজ্জিত হলেন একটু। বাড়ির মালিক তে-তলায় থাকেন। চাকরটাকে বললেন তাঁকে একবার ডেকে দিতে।

বাড়ির মালিক লোকটি ভালই। ভদ্রলোক। পাপিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলেন; তার পর সব শুনে বললেন, "পাপিয়ার জন্যেই আমি এতদিন কিছু বলিনি মশাই। তানাহলে এতদিন ওরকম লোককে দূর করে' দিতাম। উনি প্রথমে একটা হোটেলে এসে উঠেছিলেন—ওঁর রকম সকম দেখে হোটেলওলা দূর করে' দিলে। কি বলব মশাই—অত বড় মেয়ে সঙ্গে রয়েছে—একদিন এক মাগী এনে হাজির! চীৎকার করে বলছে আবার—"আমি যদি ইচ্ছে করি—এই তোর মা হতে পারে" —আর সে মাগী কি বললে শুনবেন? বললে—'ঝাঁটা মারি আমি অমন মেয়ের মুখে। মেয়ের বাপের মুখেও'···সে যে কি কাণ্ড মশাই—"

"সত্যি?" পুরন্দরবাবু সত্যিই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

"আমি স্বকর্ণে শুনেছি। লোকটা মাতাল অবশ্য খুবই হয়েছিল—জ্ঞানগম্যি কিছুই ছিল না, কিন্তু নিজের মেয়ের সামনে ও রকম বেলেল্লাপনা করাটা উচিত কি, মেয়েটা ভাববে কি, নিতান্ত ছেলেমানুষ তো নয়। মেয়েটা খালি কাঁদত, কি আর করবে। আর ও ইচ্ছে করে' কাঁদাত মেয়েটাকে। সেদিন আবার এক কাণ্ড হয়েছিল সামনের বাড়িতে। এক কেরাণী গলায় দড়ি দিয়েছিল। দলে দলে লোক দেখতে গেল। চারদিকে ভীড়। যুগলবাবু বাড়ি ছিলেন না, মেয়েটা ভীড়ে মিশে চলে গেছে সেখানে, দেখলাম মড়াটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে। কি দৃষ্টি চোখের। আমি তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে এলাম। ভয়ে ঠক ঠক করে' কাঁপছিল, শাদা মূর্ত্তি—এসেই শুয়ে পড়ল —দেখি মূর্চ্ছা গেছে। মুখে জলের ঝাপটা দিতে জ্ঞান হল। তারপর থেকেই মেয়েটা কেমন যেন হয়ে গেছে। যুগলবাবু বাড়ি এলেন—এসে মেয়েটাকে ধামচাতে লাগলেন। ও মারে না কখনও—কেবল ধামচায়। তার পর থেকে মদ খেয়ে যখনই বাড়ি ফেরে মেয়েটাকে ভয় দেখায় কেবল—আমিও গলায় দড়ি দেব। তোর জ্বালাতেই গলায় দড়ি দিতে হবে আমাকে। এই দেখ দড়ি এনেছি। সত্যি সত্যি একটা দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে দেখায়—আর মেয়েটা ভয়ে চেঁচাতে থাকে—দুহাত দিয়ে বাপের গলা জড়িয়ে কেবলই বলতে থাকে 'কিছু করব না, তুমি যা বলবে শুনব, গলায় দড়ি দিও না বাবা।' অত্যন্ত করুণ দৃশ্য মশাই। যাচ্ছেতাই—"

যদিও পুরন্দরবাবু এমনই কিছু একটা প্রত্যাশা করেছিলেন, কিন্তু যা শুনলেন তা এতই বীভৎস যে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হল না তাঁর।

বাড়ি-ওলা আরও অনেক কিছু বললেন। বললেন—পাপিয়া দোতলার জানলা থেকে ঠিক লাফিয়ে পড়ত একদিন তিনি যদি না থাকতেন সে সময়।

পুরন্দরবাবু দোতলা থেকে নেবে গেলেন—পা টলছিল তাঁর।

"ব্যাটাচ্ছেলেকে ধরে' চাবকাব আমি"…এই কথাটাই মনে হচ্ছিল কেবল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই একটা কথাই বারম্বার আবৃত্তি করতে লাগলেন তিনি মনে মনে।

তাঁকে একলাই যেতে হল শেষ পর্য্যন্ত ভবেশবাবুর ওখানে। কিছুদূর গিয়ে গাড়িটা একটা চৌমাথায় দাঁড়াল, সারিসারি অনেক গাড়ি দাঁড়িয়েছে, শোভাযাত্রা চলেছে একটা। প্রচুর ভীড়। হঠাৎ পুরন্দরবাবুর চোখে পড়ল একটা গাড়িতে যুগল রয়েছে! গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে তাঁর দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে হাসলে একটু। বেশ স্ফূর্ত্তিতে আছে মনে হ'ল—তাঁকে ইসারা করে' ডাকতেও লাগল। পুরন্দরবাবুর গাড়ী থেকে নেমে ভীড় ঠেলে, পুলিশ ঠেলে, প্রায় উর্দ্ধশ্বাসে তার গাড়ির কাছে গিয়ে হাজির হলেন এবং চীৎকার করে বললেন "কি ব্যাপার কি? আপনি এলেন না যে! এখানে কি করছেন"

"ঋণ শোধ করছি। চেঁচাবেন না অত, ঋণ শোধ করছি মশাই" চোখ মটকে মুচকি হেসে বলল—"বন্ধুবর পূর্ণ গাঙ্গুলীর শবানুগমন করছি—ঋণ—ঋণ শোধ"

ভয়ানক রাগ হল পুরন্দরবাবুর।

"আঃ—কি যা তা বলছেন। আবার মদ খেয়েছেন না কি। আসুন, নাবুন গাড়ি থেকে, আসুন আমার সঙ্গে,"

"ক্ষমা করবেন, পারব না। মহৎ কর্ত্তব্য এটা—"

"জোর করে টেনে নাবিয়ে নেব"

"আমি চেঁচাব তাহলে, ঠিক চেঁচাব"—গাড়ির ওদিককার কোনে সরে' গেল। যেন ভারি একটা মজার রসিকতা হচ্ছে। পুরন্দরবাবু মনে মনে গাল দিতে দিতে নিজের গাড়িতে ফিরে গেলেন।

"যাক্‌গে। ওরকম লোককে নিয়ে যাওয়াও যায় না ভদ্র পরিবারে" এই ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু মনটা বিরক্তই হয়ে রইল।

নীলিমাকে গিয়ে সব বললেন। বাড়ী-ওলার কাছ থেকে যা যা শুনেছিলেন সব, তাছাড়া শবানুগমনের কথাও। শুনে তিনি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

"আপনার জন্যে ভয় হচ্ছে আমার। ওর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখবেন না"

"ও কি করবে আমার। একটা হতভাগা মাতাল বই তো নয়"—পুরন্দরবাবু যেন চটেই গেলেন কথাটা শুনে, একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলে' উঠলেন—"আমি কি ভয় পেয়েছি ভাবলে না কি। তাছাড়া সম্পর্ক তো রাখতেই হবে এখন পাপিয়ার জন্যে, পাপিয়ার কথাটা ভেবে দেখ!"

পাপিয়ার এদিকে অসুখ করেছিল। কাল থেকেই জ্বর হয়েছে। কোলকাতা থেকে একজন বড় ডাক্তারকে ডেকে পাঠানো হয়েছে, যে কোন মুহূর্ত্তে তিনি এসে পড়তে পারেন।

ষোল-কলা পূর্ণ হ'ল যেন। পুরন্দরবাবু অত্যন্ত মুষড়ে পড়লেন। নীলিমা তাঁকে পাপিয়ার কাছে নিয়ে গেলেন।

"কাল সমস্তক্ষণ ওর কাছেই ছিলাম"—ঘরের বাইরে একটু থেমে নীলিমা বললেন—"মেয়েটি খুব চাপা স্বভাবের, আত্মসম্মানও খুব। এখানে আছে সেজন্যে যেন লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। ওর বাবা যে ওকে এমন ভাবে ত্যাগ করেছে এইটে ওর প্রাণে বড্ড লেগেছে। আমার মনে হয় এই ওর অসুখের আসল কারণ"

"ত্যাগ করেছে মানে? ত্যাগ করেছে বলছ কেন"

"সম্পূর্ণ অচেনা বাড়িতে এমন ভাবে পাঠিয়ে দেওয়া মানেই তো—বিশেষত এমন লোকের সঙ্গে যে…যে লোকটাও সম্পূর্ণ অচেনা"

"কি বিপদ, আমি তো ওকে জোর করে' নিয়ে এসেছি—আমি তো এতে কোন—কিন্তু পাপিয়া কি তাই মনে করেছে—ওইটুকু মেয়ে এতটা বোঝে?—এতটা বোঝবার ক্ষমতা আছে ওর! যুগল আসবে না এখানে কি করব বল"

পুরন্দরবাবুকে একা দেখে পাপিয়া বিস্মিত হ'ল না, একটু ম্লান হাসি হেসে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুল সে। পুরন্দরবাবু অপটুভাবে একটু আদর করবার চেষ্টা করলেন, ভয়ে ভয়ে গায়ে মাথায় হাত দিলেন—পাপিয়া নিস্পন্দ হয়ে রইল। একবার ফিরে চাইলে না পর্য্যন্ত। বাইরে বেরিয়ে এসে পুরন্দরবাবু কেঁদে ফেললেন হঠাৎ।

সন্ধ্যার সময় ডাক্তারবাবু এলেন এবং সব দেখে শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন আমাকে আগেই খবর দেওয়া উচিত ছিল। মাত্র কাল থেকে জ্বর হয়েছে একথা বিশ্বাসই করতে চাইলেন না তিনি প্রথমে।

"আজ রাতটা কি ভাবে কাটে তারই উপর নির্ভর করছে সব"—অবশেষে এই সিদ্ধান্তে এসে অনেক রকম 'ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শনস্‌' (ব্যবস্থা) দিয়ে বলে গেলেন যে কাল আবার আসবেন সকালেই। গতিক ভাল মনে হচ্ছে না তাঁর।

পুরন্দরবাবু রাতটা থাকতেন কিন্তু নীলিমা দেবী বললেন, "ওর বাপকে আর একবার আনবার চেষ্টা করুন। একথা শুনেও আসবেন না এমন পাষণ্ড কি হতে পারে মানুষ"

"চেষ্টা!"—পুরন্দরবাবু হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন যেন—"হাত পা বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসব তাকে, যদি না আসতে চায় এবার!" যুগল পালিতকে হাত-পা বেঁধে নিয়ে আসার দৃশ্যটা ফুটে উঠল তাঁর মনে—হঠাৎ রোখ চড়ে গেল। হাত-পা বেঁধেই আনতে হবে, যা থাকে কপালে।

"কাল আমার দুঃখ হচ্ছিল—ভাবছিলাম অন্যায় করেছি লোকটার প্রতি। এখন কিছু দুঃখ হচ্ছে না—ও মানুষ নয়, একটা পশু—!"

ফেরবার ঠিক আগে নীলিমাকে এই কথাগুলি বলে' পাপিয়ার ঘরে আবার ঢুকলেন তিনি।

পাপিয়া চোখ বুজে চুপ করে' শুয়েছিল, যেন ঘুমুচ্ছে। মনে হল একটু ভাল আছে। পুরন্দরবাবু একটু ঝুঁকে আস্তে আস্তে মাথার উপর হাত রাখলেন, চুমু খাবার চেষ্টা করলেন একবার—পাপিয়া ফিরে তাকাল হঠাৎ, যেন সে তাঁরই অপেক্ষায় ছিল এতক্ষণ।

"আমাকে নিয়ে চলুন এখান থেকে"

অতিশয় করুণ সুরে সে বললে কথা ক'টি, শান্ত মৃদু মিনতিভরা সুরে। পুরন্দরবাবু যে তার অনুরোধ রাখবেন না এও যেন সে বুঝতে পেরেছিল—তার বলবার ভঙ্গী থেকেই বোঝা যাচ্ছিল তা। পুরন্দরবাবু অনেক করে' বোঝাতে লাগলেন তাকে।

নীরবে চোখ দু'টি বুজে সে পাশ ফিরে শুল, একটি কথাও আর বললে না। পুরন্দরবাবুর কোন কথা সে যে শুনতে পাচ্ছে তা মনে হল না।

কোলকাতায় পৌঁছে পুরন্দরবাবু সোজা যুগলের বাসায় গেলেন। তখন রাত্রি দশটা, যুগল তখনও বাড়ি ফেরে নি। পুরন্দরবাবু পুরো আধঘণ্টা তার জন্যে অপেক্ষা করলেন, অধীর চিত্তে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন তার বাসার বারান্দায়। বাড়ি-ওলা বললেন, ভোরের আগে সে ফিরবে না কেন বৃথা অপেক্ষা করছেন।

"বেশ ভোরেই আসব তাহলে"—পুরন্দরবাবু আর বেশী কিছু না বলে' বাড়ি ফিরে এলেন। তাঁর সমস্ত শরীরের রক্ত টগবগ করে' ফুটছিল যেন।

বাড়ি ফিরে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর চাকর বললে "কাল যে বাবু এসেছিলেন তিনি আজও এসেছেন আবার। অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন। তাঁকে চা করে' দিলাম। আজও মদ আনবার জন্তে টাকা দিলেন। এনে দিয়েছি এক বোতল"

(ক্রমশঃ)

মিশরের ডায়েরী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

১লা অক্টোবর—১৯৪৪

ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল, মিশরের আর ভারতবর্ষের সময়ে প্রায় পাঁচ ঘণ্টার ব্যবধান। তখনও ওয়াই-এম-সি-এর কেউ ঘুম থেকে উঠে নি। আমি দিনের আলোয় সমস্ত বাড়ীখানা দেখে নিলাম; বাড়ীর দেয়ালে বিভিন্ন দেশীয় এবং বিভিন্ন প্রকারের চিত্র অঙ্কিত র'য়েছে। এটা পূর্ব্বে একটি ইতালীয় চিত্র-বিদ্যালয় ছিল এবং দেশ বিদেশ থেকে শিক্ষার্থী এসে এখানে শিক্ষালাভ ক'রত। যুদ্ধের সময় এই অট্টালিকা শত্রু সম্পত্তি ব'লে ইংরেজদের অধীনে আসে এবং ভারতীয় সৈন্যদের অবকাশ-বিনোদনের জন্য ওয়াই-এম-সি-এ পরিচালিত "ইণ্ডিয়ান সোলর্জাস ক্লাব" নামে পরিচিত হয়। প্রতি প্রকোষ্ঠের সম্মুখে লম্বিত পরিচয়-ফলক পাঠ ক'রে "ইণ্ডিয়ান সোলর্জাস ক্লাবের" কার্য্যাবলীর কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গেল; যথা—কানৃটিন, মিউজিক হল, অফিসার্স রেষ্ট রুম, ষ্টোর্স, বেড্ রুম, অফিসার্স বাথ, অফিসার্স ডাইনিং রুম, মেন্স ডাইনিং রুম, সেক্রেটারির রুম ইত্যাদি। আমি সাতটার মধ্যে স্নান শেষ ক'রে এসে দেখি বেড্-টি দিয়ে গেছে। সাড়ে আটটায় মিঃ মালবিয়া ও মিঃ সিল্‌ভরাজ শুভ প্রাতঃ-সম্ভাষণ জানিয়ে ব্রেক-ফাষ্টের আহ্বান ক'রলেন—চা, মাখন, রুটি, পোরিজ, ডিম আর কিছু ফল পরিতৃপ্তির সঙ্গে সদ্ব্যবহার করছি এমন সময় গত রাত্রির সহৃদয় বন্ধু কাপ্তেন করিম সাহেব এসে উপস্থিত হ'লেন। দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাঙ্কের দিকে চল্লাম। কাপ্তেন করিম ব্যাঙ্কে পৌঁছে আমাকে মানেজারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তার কাজে চ'লে যাবেন। তার আফিস সহর থেকে দশ মাইল দূরে। তিনি বল্লেন যে, পথে দুমিনিট দাঁড়ালেই মিলিটারী ট্রাক তাঁকে তু'লে নেবে। মিলিটারীদের ভারী একটা সুন্দর নিয়ম এই যে, কোন অফিসার অথবা সৈন্য হাত তু'লে ইঙ্গিত করলেই চলতি ট্রাক থামে এবং তাকে তু'লে নেয়। পথে যে স্থানে ইচ্ছামত সে নেমে যেতে পারে। যাত্রী আর মোটর-ড্রাইভারের সঙ্গে পরিচয়ের কোন প্রয়োজন নাই। তাদের সামরিক চিহ্নই পরিচয়ের সূত্র। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক অফিসারের মোটর রাখবার প্রয়োজন হয় না। এইভাবে সামরিক কর্ম্মচারিদের ভিতরে একটা "কমরেড্‌সিপের" ভাব গ'ড়ে উঠে। কাপ্তেন করিম রাস্তায় দাঁড়াবা মাত্রই একটি চলমান "ট্রাককে" ইঙ্গিত ক'রে থামালেন এবং তা'তে উঠে আমাকে সম্ভাষণ জানিয়ে বল্লেন—রাত্রে আবার ওয়াই-এম-সি-এতে দেখা ক'রবেন।

আমেরিকান এক্সপ্রেসের এজেণ্টের সঙ্গে দেখা ক'রে পাসপোর্ট দেখিয়ে কলিকাতা আফিসের এক্সচেঞ্জ ড্রাফট্-

খানি দিলাম। তিনি আমার কাগজ পরীক্ষা ক'রে আমার পরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বল্লেন—কলিকাতা থেকে এয়ার মেলে টাকা পাঠান সত্ত্বেও টাকা আসে নি। আমাকে প্রয়োজন অনুসারে দশ পাউণ্ড অগ্রিম দিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—কোন ভারতীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে কিনা। পাশেই মিঃ জেট্‌মল নামক একজন ভারতীয় মুক্তা-ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যাঙ্কের একজন বেয়ারা সঙ্গে দিয়ে তিনি আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

বিরাট রাজপথের উপরেই মেসার্স জেট্‌মল এণ্ড সন্স। আমাকে দেখেই একজন কর্ম্মচারী ইংরেজী ভাষায় ব'ল্লেন,—কাকে চাই? আমি উত্তর না দিতেই একজন গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহ, অতি পরিচ্ছন্ন পোষাকপরিহিত ভদ্রলোক এসে অভিবাদন জানিয়ে বল্লেন—আপনি বোধ হয় প্রফেসার চৌধুরী। আমেরিকান এক্সপ্রেস থেকে টেলিফোন পেলাম—আপনি আসবেন। আমেরিকান এক্সপ্রেসের এই ভদ্রতাটুকু অতি মনোরম। তিনিই মিঃ জেট্‌মল ব'লে পরিচয় দিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনি আমার পরিচয় এবং মিশরে আগমনের উদ্দেশ্য জেনে একটু বিস্মিত হলেন এবং আমি হিন্দু, অথচ মুসলমান সংস্কৃতির অধ্যাপক,—আল্‌-আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জেনে অনেকটা অপ্রতিভ হলেন। কারণ কোন হিন্দুর আজ পর্য্যন্ত আল্‌-আজহরে আসার কথা শোনেন নি। মিঃ জেট্‌মলকে আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, মিশরে ভারতীয় কোন সমিতি আছে কিনা এবং তাদের সাহায্যে আমার বাসস্থানের কোন সুবিধা হ'তে পারে কিনা।



ভারতীয় সম্মিলন—কায়রো

তিনি বললেন—"ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান" ব'লে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, তার সেক্রেটারী মিঃ দয়াল দাস এবং মিঃ ফারোকিকে টেলিফোন ক'রলেন যে, একজন ভারতীয় অধ্যাপক এসেছেন, তিনি মিশরে কিছুকাল থাকবেন। এই সময় তিনি আরও পাঁচ ছয়জন প্রতিষ্ঠাপন্ন ভারতীয়কে আমার আগমনবার্ত্তা সগর্ব্বে ও সানন্দে জানিয়ে দিলেন। মিঃ গণেশী লাল এবং মিঃ শোভরাজ নামক দু'জন বিখ্যাত মণিকারকে বল্লেন যে, একজন "ইন্টারেস্‌টিং ইণ্ডিয়ান" (Interesting Indian) এসেছেন। মিঃ জেট্‌মল অত্যন্ত ভদ্র এবং সরল। প্রথম পরিচয়ে বুঝলাম যে, এঁরা ভারতবর্ষের বাহিরে এসে ভারতে প্রত্যেক নবাগতকে অতি প্রিয়জ্ঞানে আপ্যায়িত করেন। আমাকে তিনি বাঙ্গালী জেনে বল্লেন—মহিউদ্দীন নামে আর একজন বাঙ্গালী আছেন—আল্‌-আজহরে পড়াশুনা শেষ ক'রে মিশরের রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। তাঁর খোঁজ মিঃ দয়াল দাস দিতে পারবেন। তারপর আমাকে একটু কফি খাইয়ে তাঁর একজন কর্ম্মচারী সঙ্গে দিয়ে ওয়াই-এম-সি-এতে পাঠিয়ে দিলেন। আমি অনেকটা আশ্বস্ত হলাম যে, মিশরে একেবারে নির্বান্ধব হ'ব না। প্রায় বারটার সময় ওয়াই-এম-সি-এতে ফিরেএসে একখানা চিঠি লিখলাম।

দুপুরে মিঃ মালবিয়া জিজ্ঞাসা করলেন—প্রফেসর, আপনি কি বিবাহিত? আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার কি সন্দেহ আছে? তিনি বল্লেন—নিশ্চয়ই। মিঃ সিল্‌ভরাজ অবিবাহিত হয়েও ভারতে আজকে ভোরেই তিনখানি টেলিগ্রাম করেছেন। আর আপনি একখানাও করেন নি—সুতরাং আপনি নির্বান্ধব। তারপর একটু রহস্যালাপের ভিতর দিয়ে স্থির করা গেল যে, মিঃ মালবিয়া কালকে মার্‌কণি ওয়ারলেস সাহায্যে ভারতবর্ষে আমার

পক্ষ থেকে একখানি "কোড" টেলিগ্রাম ভাগলপুরে পাঠিয়ে দেবেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে প্রতি সপ্তাহে সুদীর্ঘ পত্র লিখে তাঁর প্রবাসের বহু সময় আনন্দ মুখরিত ক'রে তোলেন। তাঁর অহেতুকী সহৃদয়তা উপভোগ করলাম।

বিকাল চারটার সময় আমি মিঃ শোভরাজের সঙ্গে দেখা ক'রলাম। তিনি মেসার্স পোহোমলের আফ্রিকাস্থিত সমস্ত মণিমুক্তা ব্যবসায়ের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। তিনি ৪২ বৎসর পূর্ব্বে সাত বৎসর বয়সে মিশরে আসেন এবং কর্ম্মক্ষমতায় পোহোমল কোম্পানীর উচ্চতম কর্ম্মচারী ও অংশীদার হন। তিনি অতি বিশুদ্ধ হিন্দু, আমার ইসলাম-সংস্কৃতি-প্রীতির সংবাদ শুনে একটু আশ্চর্য্য হ'লেন। তিনি ইণ্ডিয়া ইউনিয়নের সহকারী সভাপতি। তিনি মিঃ দয়াল দাসের নিকট ফোন ক'রে জানিয়ে দিলেন যে, প্রফেসর চৌধুরী তাঁর কাছে যাচ্ছেন, তাঁর একটি কর্ম্মচারীকে সঙ্গে দিয়ে আমাকে মিঃ দয়াল দাসের নবপ্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়া নামক দোকান গৃহে পাঠিয়ে দিলেন। ইণ্ডিয়া নাম শুনেই বুঝলাম যে প্রবাসী ভারতবাসী ভারতের নাম প্রচারের জন্য যে কোন সামান্য উপায় গ্রহণ ক'রতে প্রস্তুত। আমি প্রায় পনের মিনিটের মধ্যেই মিঃ দয়াল দাসের দোকানে উপস্থিত হলাম। দূর থেকেই দেওয়ালের উপরে বুদ্ধ মূর্ত্তি দেখে আভাস পেলাম যে ভারতের স্থপতি কি প্রকারে পরিচিত হ'য়েছে।

মিঃ দয়াল দাস নাতিদীর্ঘ, অত্যন্ত গৌর বর্ণ, পঞ্চবিংশতি বর্ষের যুবক, সদাহাস্যময়। তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেই তিনি অত্যন্ত পরিচিতের মত হাত ধ'রে বল্লেন—আপনাকেই আমরা চেয়েছিলাম। আমি বুঝতে পারলাম, এই লোকটি কথার ব্যবসায়ী এবং কথাকেই বোধ হয় মণিমুক্তা ক'রে ব্যবসা করেন। আমার সঙ্গে কথা ব'লতে ব'লতেই তিনটি গ্রাহকের সঙ্গে বিনা প্রয়োজনে আমাকে পরিচিত ক'রে দিয়ে তাঁর নব প্রতিষ্ঠিত দোকানের বিজ্ঞাপন রূপে আমাকে ব্যবহার ক'রলেন। লোকটি বুদ্ধিমান বটে! তিনি সহর থেকে ১৫ মাইল দূরে হালুয়ান উপকণ্ঠে মিঃ ছোটেলালকে ফোনে বল্লেন—মিঃ মহিউদ্দীনকে যেন তিনি একজন বাঙ্গালী অধ্যাপকের আগমন বার্ত্তা জানিয়ে দেখা ক'রতে অনুরোধ করেন। তার সেখানে কফি সদ্ব্যবহার ক'রে ভারতের অন্যান্য বিষয়ে—বিশেষ বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ ও অনাচার সম্বন্ধে কথা ব'লে বিদায় নিলাম। তিনি একটি কর্ম্মচারীকে সঙ্গে দিয়ে আমাকে ওয়াই-এম-সি-এতে পাঠিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই কাপ্টেন করিম ডিনারের বহু পূর্ব্বে আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। তাঁর ইচ্ছা—তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে তাঁর বাড়ী ঘুরে আসি। আমি পরিশ্রান্ত হ'লেও তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান ক'রতে পা'রলাম না। কাপ্টেন করিমের বাড়ী গিয়ে দেখি, তিনটি আরবদেশীয় ছাত্র উপস্থিত। তিনি হেসে বল্লেন—এরা আল্-আজ্‌হরের ছাত্র—একটির বাড়ী মক্কা, আর দুইটি ইয়ামননিবাসী—আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য ফোন ক'রে এনেছি। আপনি এদের কাছ থেকে আল্-আজ্‌হরের সমস্ত খবর পাবেন। কাপ্টেন করিমের সহৃদয়তা অসীম। তাদের সঙ্গে আল্-আজ্‌হরের বিষয় আলোচনা ক'রে জানলাম, আল্-আজ্‌হরের ছুটি এখনও শেষ হয় নি। আমার ভালই হ'ল। নিজের স্থান ও স্থিতির ব্যবস্থা করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

তার পর সাড়ে আটটার সময় ক্যাপ্টেন করিম আমাকে নিয়ে এলেন "ইণ্ডিয়ান মুসলীম এসোসিয়েশনের" অফিস ঘরে। কয়েকজন ভারতীয় ও মিশরীয় ভদ্রলোক সেখানে বসেছিলেন। তার মধ্যে দীর্ঘতম দেহ, কৃষ্ণতম বর্ণ, শ্বেত-কৃষ্ণ-শ্মশ্রু-বিভূষিত মুখমণ্ডল, ইউরোপীয় পোষাক পরিহিত একজনকে দেখে বুঝলাম, ইনি সভার মধ্যমণি। কাপ্টেন করিম সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ ফারোকী সাহেব হেসে বল্লেন যে, মিঃ দয়াল দাস, মিঃ জেঠমল, মিঃ শোভরাজ প্রত্যেকেই তাঁর কাছে ফোন ক'রে আমার আগমন বার্ত্তা জানিয়েছেন। তিনি ভেবেছিলেন যে কাল আমার সঙ্গে দেখা ক'রবেন। ফারোকী সাহেবের চেহারা দেখে তার ভিতরটা বুঝা যায় না। তিনি স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় কথাও বলতে পারেন না, অথচ প্রত্যেকটি কথা খুব সরল ও আন্তরিকতা পূর্ণ। ফারোকী সাহেবের সঙ্গে এই অপ্রত্যাশিত দেখা—সেটা খুব ভাল লা'গল। তিনি এক পেয়ালা চা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। বড় সুন্দর চা—এলাচির গন্ধে ভরপুর। আমি চা না খেয়ে ঘ্রাণই নিচ্ছিলাম, ফারোকী সাহেব আলমারী থেকে এক কৌটা

জাফ্রাণ বের ক'রে আমার নাকের কাছে ধ'রলেন। এলাচি আর জাফ্রাণের গন্ধ মিশিয়ে ভারি সুন্দর আমেজ। তিনি বল্লেন—এ আমার তৈরী চা, চা-বাগানে ব্লেণ্ড করা নয়, আমি আমার টেবিলে ব্লেণ্ড করি। অতি সহজ নিয়ম; একটু কাপড়ে এলাচি আর জাফ্রাণের গুঁড়া বেঁধে কৌটার ভেতরে রাখুন। দেখবেন "এলাচ-চা" হয়ে গেছে। কেমন সুন্দর ব্লেণ্ড বলুন ত!

সরল ফারোকী সাহেব নিজের কৃতিত্বে নিজে মুগ্ধ। এমন সময় একটি যুবক—বয়স তার ২৪।২৫, ক্ষীণকায়, শ্যামবর্ণ অর্দ্ধগোঁফসমন্বিত—কারো দিকে না দেখে ফারোকী সাহেবকে বল্লেন—ভারতবর্ষ থেকে একজন প্রফেসর এসেছেন, মিঃ ছোটেলাল আমাকে এই খবর দিয়েছেন। মিঃ দয়াল দাস তাঁকে ফোন ক'রে জানিয়ে ছিলেন, তাঁর খবর পাওয়া যায় কি? কাপ্টেন করিম বল্লেন—হাঁ প্রফেসরের খবর আমি দিতে পারি, যদি আমাকে ডিনার খাওয়ান হয়। ফারোকী সাহেব বল্লেন,—আমি দিতে পারি খবর, যদি আমার এখানে তুমি ডিনার খাও। এই বলেই তিনি আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, আর বল্লেন—এবার বাঙ্গালী-বাঙ্গালী মিলে যাবে। সেই যুবক আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে বল্লেন—আপনি প্রফেসর চৌধুরী,বাঙ্গলা দেশ থেকে এসেছেন? অনেক দিন বাঙ্গলায় কথা কই নি। আপনার সঙ্গে বাঙ্গলায় কথা কইব। আর একজন বাঙ্গালী আছেন বটে আল্-আজ্‌হর-এ, তিনি বাঙ্গলায় কথা ক'ন না। মুর্শিদাবাদে বাড়ী; উর্দ্দুতেই কথা ক'ন। এই যুবকটির নাম মহীউদ্দিন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার বাড়ী? তিনি বল্লেন—নোয়াখালী; গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করে জানলাম—ঠিক আমারই পাশের গ্রাম। মহীউদ্দিন এবার নোয়াখালীর ভাষায় আমার সঙ্গে কথা আরম্ভ ক'রলেন। অন্যান্য ভদ্রলোক ছিলেন—তাদের উপস্থিতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই কথা ব'লছিলেন। আমারও খুব ভাল লেগেছিল। প্রথমতঃ বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ—তার পর আমার পাশের গ্রামের, বিশেষতঃ তার বাঙ্গলায় কথা বলার আগ্রহ দেখে খুবই আনন্দ লেগেছিল। আমরা প্রায় সাড়ে নটার সময় সভা ভঙ্গ ক'রে চ'লে এলাম। ফারোকী সাহেব ব'লে দিলেন যে, কালকেই আমার পাশপোর্ট ব্রিটিশ কন্‌সলটে নিয়ে রেজেষ্ট্রী করে নিতে হ'বে; তিনি আমাকে কাল এগারটার সময় নিয়ে যাবেন। মহীউদ্দিন বল্লেন যে, তিনি কাল পাঁচটার সময় এসে মিঃ দয়াল দাসের "ইণ্ডিয়া"তে নিয়ে যাবেন; আমার কাগজপত্র দেখে তিনি অধ্যয়নের এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করবেন।

আমার খুব আনন্দ হ'চ্ছিল, এই অপরিচিত, নির্বান্ধব দেশে কয়েকজন সহৃদয় ভারতবাসীর সাক্ষাৎ পেলাম। এরা হিন্দু নয়, মুসলমান নয়—ভারতবাসী। ক্রমশঃ

আহ্বান

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শোন শোন ঐ পূর্ব্ব গগনে প্রভাতের আহ্বান—
"জাগ্রত হও কৃষ্ণ রাতের মুদিত-কমল প্রাণ।"
নিশার বক্ষ বিদারি প্রভাত
করেছে জ্যোতির খর শরাঘাত,
আকাশে বাতাসে বাজিয়া উঠেছে আলোকের জয়গান
"জাগ্রত হও হে ভীরু হৃদয়", প্রভাতের আহ্বান।
জাগ জাগ তুমি পূর্ব্বের মত রূপ রস শোভা লয়ে
চপল ভ্রমর রহুক তোমার কপোল সঙ্গী হয়ে,
ভুবন ভরুক তোমার গন্ধে
নাচুক নিখিল হরষ ছন্দে,
বিধির আশীষ শিশির ধারায় কর তুমি পূত স্নান
জাগ্রত হও অতীত গর্ব্ব, প্রভাতের আহ্বান।

ভাঙা হৃদয়ের কানে কানে আজ প্রভাত কহে কি বাণী!
"যুগে যুগে আমি নবীন জীবন ভীরু বুকে দিই আনি।
আমি সত্যের দীপ্ত আলোক
আমার পরশে মুছে দুখ শোক,
বন্দিল ঋষি যোগী মোরে কত রচি' বন্দনা গান
সত্যম্ শিব সুন্দর আমি রূপময় কল্যাণ"।
"মোর জয়গান ধরণী প্লাবিয়া বহে যায় নব নৃত্যে
পরাধীন যারা লভুক তাহারা স্বাধীনতা-সুখ চিত্তে।
জাগ জাগ তুমি ভারত কমল
আমি যে আশার প্রভাত উজল
আসিয়াছি আজি মুক্তি অমৃত তোমারে করিতে দান
জাগ্রত হও হে চির সত্য", প্রভাতের আহ্বান।

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(১২)

কলেজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে—

কিন্তু অমলের যাওয়া হয় নাই। রমলা ও তাহার ভ্রাতা প্রভৃতি পশ্চিমে চলিয়া গেলে তবে অমলের ছুটি। রমলার পিতা সন্ধ্যার সময়ে নিয়মিতভাবে অনুপস্থিত থাকিতেন কাজেই রমলা পরোক্ষ ভাবে খোকার অভিভাবক হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন পড়াইবার সময়ে রমলা আসিয়া বলিল—আমাদের পুরী যাওয়া ঠিক হয়ে গেছে। পরশু রওনা দেব সকলে।

এই নিষ্কর্ম্মা দিনগুলি ও টিউসনি অমলের কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল, তাই একটা স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—বেশ ত, সকলেই যাচ্ছেন ত?

রমলা বলিল—হ্যাঁ,—কিন্তু আপনার কথার ভাব দেখে মনে হচ্ছে আমরা গেলেই যেন আপনি বাঁচেন।

অমল হাসিয়া বলিল—কথাটার কদর্থ ক'রলে ও রকম বলা যায়, কিন্তু ছুটি পেয়ে বাড়ীতে মার কাছে যাবো এটাও ত আনন্দের। সেটা আপনার কেন মনে হ'ল না?

—ও, সেটা মনের বিকার, স্বীকার ক'রতে লজ্জা নেই। কিন্তু বাবা বলেছেন, আপনিও আপনার পুঁথি-পত্র ও কবিতার খাতা নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলুন। পঠন-পাঠন চ'লবে, আর অবসর সময়ে সমুদ্র তীরে আমরা ঘুরে ঘুরে কাব্য চর্চ্চা ক'রবো—

অমল বলিল—ব্যাপারটা লোভনীয়—অত্যন্ত লোভনীয় কিন্তু মা যে আমারই পথ চেয়ে চেয়ে দীর্ঘদিন অতিবাহিত ক'রছে, সেটার কি করা যায়? আমরা ত কেবল আমাদের জন্যেই নয়, অন্যকে সুখী করাও আমাদের জীবনের একটা অনিবার্য্য অঙ্গ।

রমলা কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ দুইটি বিস্ফারিত করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বিলোল নারীসুলভ আঁখি ভঙ্গির সঙ্গে বলিল,—আপনার মুখে এমন রাম নাম! পরের জন্যে ভাবনা, তার সুখ দুঃখের সঙ্গে এমন অনিবার্য্য

অমল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—অপরাধ নেবেন না। আপনার তিরস্কারের প্রবৃত্তিকে আমি প্রশংসা ক'রতে পারছি না। আমার দ্বারা যা সম্ভব তা ক'রতে আমি কার্পণ্য কোন দিন করি না। পুরী গেলে কে কতটা সুখী হবে জানি না, তবে বাড়ী গেলে মা যে খুব সুখী হ'বে এটা জানি—এবং—

রমলা বাধা দিয়া বলিল—পুরী গেলেও ত দু'একজন নগণ্য ব্যক্তি খুসী হ'তে পারে। তারাও হয়ত আপনার মায়ের মত দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষা ক'রে আছে—

অমল দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—আপনি জানেন না, কেমন ক'রে আমসত্ব, আচার, আমসি শাক কলা মুলো খুঁটে খুঁটে সঞ্চিত ক'রে রেখে মা প্রবাসী ছেলের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করে—সে আগ্রহ, সে ব্যাকুল প্রতীক্ষার কোন তুলনা নেই। যত বড় প্রলোভনই থাক্, এই দুঃস্থ মায়ের নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও স্নেহের মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ ক'রার মত হৃদয়হীন আমি হ'তে পারি নি। তার যে কোন কদর্থের জন্য আমি প্রস্তুত আছি কিন্তু—

রমলা কহিল—আপনার এই মাতৃভক্তি ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার আন্তরিক প্রশংসা করি, কিন্তু তারপরে কি আর কারও দাবী নেই—বন্ধনটাকে ভাগ ক'রে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা দেখাবার মত?

—এখনও তেমন কোন দাবী উপস্থিত হয় নি—আর সেটা মায়ের পরেই—

রমলা কি যেন একটু ভাবিয়া বলিল—আজ অপর্ণা যদি এমনি নিমন্ত্রণ ক'রতো তবে কি এই উত্তরই দিতেন?

অমল অত্যন্ত কঠিনকণ্ঠে জবাব দিল—অপর্ণা কেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরীও যদি আজ এমনি ব'লতো, কি গ্রেটা গার্ব্বোও যদি সম্পদ ও রূপের ভার নিয়ে আস্তো তবে তাকেও এই জবাবই দিতাম—অত্যন্ত নির্ভীক ভাবেই।

রমলা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আপনার কথার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় তবে শুনে সুখী হ'লাম। আপনার মা এ দিক থেকে ভাগ্যবতী—

অমল কহিল—আমার মত দুর্ভাগ্য-সন্তানের মাতা বলে?

—দুর্ভাগ্য নয়, মাতৃভক্ত সন্তানের মা বলে।

রমলারা পুরী যাইবার পরে কয়েকদিন শূন্য রাজপথে ও অর্দ্ধশূন্য লাইব্রেরী কক্ষে অকারণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া অমল বাড়ী যাইবার দিনস্থির করিয়া ফেলিল। কাল সে যাইবে, অতএব অপর্ণার অনুরোধ মত যদি তাহাকে দেখা করিতে হয়, তবে আজই সেখানে যাওয়া প্রয়োজন। অপর্ণাদের বাড়ীতে যাইবার জন্য আগে যেমন সে একটা দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ অনুভব করিত আজ সে ঠিক তেমনি একটা শূন্যতা অনুভব করে, বার বার মনের মাঝে কাতরকণ্ঠে কে যেন আর্ত্তনাদ করে—লাভ নাই, কোন লাভ নাই, সবই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

তবুও যাইতেই হইবে, দুঃখ হোক্ তবুও তাহাই আজ দুর্নিবার আকর্ষণে তাহাকে ডাকিয়া যায়। অমল ট্রামে উঠিয়া কেবল তাহাই ভাবিতেছিল। এই অপর্ণা দু'টি দিনের জন্যে তাহার অন্তরকে আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া চির অন্ধকারে অবলুপ্ত করিয়া দিয়াছে—সে যদি তাহাকে ভুলিতে না পারে তবে জীবনের প্রতিক্ষণে সে কেবল আহত স্বরবিদ্ধ বিহঙ্গের মত একান্ত নিরালায়, অপরিসীম বেদনায় ছটফট্ করিবে—উল্কা দহনের আলোকে অকস্মাৎ অন্তরাকাশ আলোকিত হইয়া চিরতরে চির অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে, অন্ধের মত সে কেবল পথ হাতড়াইয়া ফিরিবে!

অপর্ণাদের বাড়ীর ঠিক সাম্‌নেই নতুন একখানা গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল,—গেটটিকে প্রায় অবরুদ্ধ করিয়া। অমল সেটাকে লক্ষ্য না করিয়াই পাশ কাটাইয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল। বাহিরের ঘরের কলকণ্ঠ অনেক লোকের অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিয়া দিল। অমল কোন কিছুকেই মনে না করিয়া সোজা ঘরের দ্বারে উপস্থিত হইল। গৃহে অপর্ণার মাতা, অপর্ণা, তার বোন এবং আর একটি ভদ্রলোক—অপরিচিত।

অপর্ণার মাতাই ডাকিল—এসো বাবা অমল, অনেক দিন আসো নি।

অপর্ণা একটু স্মিতহাস্যে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল—ব'সো, অমন ঝড়ো কাকের মত চেহারা হ'য়েছে কেন? অসুখ ক'রেছে?

অমল সংক্ষেপে 'না' বলিয়া একটা খালি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। মাতা পরিচয় করিয়া দিলেন, এই অপরিচিত ভদ্রলোক অজিত বাবু। অমল নমস্কার করিল। অজিত-বাবু একটু পিঠ চাপড়াইবার ভঙ্গিতে হাসিয়া বলিলেন—ও অমলবাবু, নমস্কার। মিস্ রয়এর মুখে শুনেছি—আপনি কবি এবং ফাষ্ট' হবার চান্স আপনারই—না!

অমল হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিল—এ সব মিস্ 'রয়ে'র অনুমান—তাই আপনাকে হয়ত জানিয়েছেন। আপনি বিশ্বাস ক'রলে ঠক্‌তে হবে।

অজিতবাবু অকারণে ক্ষণিক হাসিয়া বলিলেন—আমারই মত, একজামিনে ভাল রেজাণ্ট ক'রতে পারলুম না কক্ষণও। তাই বিলেত থেকে কেবল ব্যারিষ্টারী ডিগ্রিই নিয়ে এলাম।

অমল একটু হাসিয়া কহিল—কম কি? এইত প্রচুর বিদ্যা আয়ত্ত ক'রেছেন।

কথাটার মধ্যে যে একটু ব্যঙ্গ ছিল তাহা অপর্ণা লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু অজিতবাবু প্রশংসাবাদ মনে করিয়া হয় ত খুসী হইয়াছিলেন তাই হাসিলেন মাত্র।

অনেকক্ষণ অবান্তর আলাপের পর অজিতবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—মিস্ রয়, তা হ'লে গাড়ীটা নিয়ে কি আজ ফিরেই যাবো। ভেবেছিলুম আপনাকে নিয়েই একটু চালিয়ে আসবো।

অপর্ণা যেন একটু বিব্রত হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। মাতা বলিলেন—আচ্ছা আজ থাক্, অমল বহুদিন পরে এসেছে—হয়ত দেশে চলে যাবে। তখন ত—

—হ্যাঁ, সেই ভাল। আচ্ছা আসি, নমস্কার, মিস্ রয় নমস্কার।

অজিতবাবু বাহির হইয়া গেলেন, ক্ষণকাল পরেই তীব্র ইলেকট্রীক হর্ণের আওয়াজ তাহার প্রস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। অপর্ণা যেন একটা চাপা নিশ্বাসে অস্বস্তিকে মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল—দেশে যাবে কবে?

অমল বিমনা ভাবেই উত্তর দিল,—কাল।

—ও তাই বুঝি, দেখা ক'রতে এলে? এতদিন এসো নি কেন? আর শরীর খারাপ হ'য়েছে কেন?

অমল শেষ প্রশ্নের জবাব দিল আগে,—শরীর কিছু খারাপ হয় নি—অসুখ ত নয়ই, তবে ঘুমিয়ে উঠে এসেছি তাই একটু উস্কখুস্ক দেখাতে পারে বটে। এতদিন আসি নি তার কারণ কিছু নেই, আসা হয় নি।

মাতা বলিলেন—অপর্ণা একটু চা নিয়ে এসো; অপর্ণা জানিত তাহার মাতা তাহার অনুপস্থিতিই চাহিতেছেন তাই দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল। মাতা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—কালই যাবে বাবা!

—হ্যাঁ, কালই। মা বার বার লিখেছেন।

—যে ছেলেটি এসেছিল তার সঙ্গে অপর্ণার বিয়ে হ'লে কেমন হয় বল ত? ছেলেটি তোমার পছন্দ হয়?

অমল একটু হাসিয়া বলিল—এ সম্পর্কে আমার মতামত, পছন্দ অপছন্দের কি মূল্য আছে? অপর্ণাই এ সম্বন্ধে সব চেয়ে ভাল জানাতে পারবে—

—তোমরা দু'টিতে যেমন মেলামেশা ক'রেছ, তাতে ত তুমি অনেকটা বুঝ্‌তে পারো। আর তোমারও হয়ত এ সম্বন্ধে ব'লবার কিছু থাক্‌তে পারে—

অমল অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে ঋজু দৃষ্টিতে মাতার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—অপর্ণা এম-এ পড়ছে, বড় হ'য়েছে; শুধু তাই নয় নিজের ভাল মন্দ সে ভালই বোঝে, এ ক্ষেত্রে আমার যদি ব'লবার কিছু থাকেই তবে তার পরিণতি একমাত্র তার উপরই নির্ভর করে। তাকে প্রশ্ন ক'রলেই সে খাঁটি জবাব দিতে পারবে—

অপর্ণা চা লইয়া ফিরিল এবং প্রসঙ্গটা আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া গেল। অপর্ণা কি যেন একটা অনুমান করিয়া বলিল—এমন চুপচাপ কেন? তোমার মত লোক চুপ ক'রে থাক্‌লেই ভয় হয়—কি ব'লছিলে—

অমল ব্যঙ্গ করিল—তোমার একটা ভাল বিয়ের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা ক'রছিলাম, কিন্তু সে সম্বন্ধে তোমার কোন প্রশ্ন করা ঠিক হবে না।

—সেও ভাল। পড়াশুনো ছেড়ে ঘটক-গিরি আরম্ভ ক'রেছ তা জানি না তাই—ক্ষমা ক'রো। তবে—

অমল চা'য়ের কাপ তুলিয়া লইয়া বলিল—উঃ চা'এর তেষ্টায় প্রাণ কণ্ঠাগত হ'য়ে উঠেছিল আর কি। যা হোক্—

অপর্ণা বলিল—ও তেষ্টাটা ত দিনরাতই সমানভাবে থাকে, তার জন্যে আর কি? তবে ও তেষ্টাটা বেশী ভাল নয়।

—না হোক তবে, তোমার কি রকম ঘটকালিটা ক'রছি তা বলা দরকার।

অপর্ণা কৃত্রিম ক্রোধে কহিল—সে কথা তোমার কাছে শুন্‌তে চাই না। ছ্যাবলামি ছেড়ে অন্য কথা বল—

উভয়ের হাস্যপরিহাসে মাতা হাসিতেছিলেন, হয়ত মনে করিয়াছিলেন এই দু'টিতে যদি এমনি ক'রিয়া চিরদিন লঘুভাবে সংসারের উপর দিয়া চলিতে পারিত, তবে হয়ত বড়ই সুখের হইত। একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন—তোমাদের দুটিতে মিলেছে বেশ,—কথায় কেউ কম নয়।

অপর্ণা কহিল—ওই কথা পর্য্যন্তই, তার বেশী নয়। এ কদিন ত ক'লকাতায়ই ছিল, একবার ত খোঁজ নিতেও এল না। এমন কি কাজ ছিল—

—মোটর গাড়ীতে গেট যে অবরুদ্ধ থাকে, আসি কেমন ক'রে—

কথাটার মাঝে যে ইঙ্গিত ছিল তাহা মাতা না বুঝিলেও কন্যা ভাল করিয়াই বুঝিল এবং কহিল—যারা কাপুরুষ তাদের অজুহাতের অভাব হয় না। যারা সাহসী, তারা জয় করে, পালিয়ে যায় না—

(ক্রমশঃ)



মৃত্যুঞ্জয়ী

(নাটক)

শ্রীযামিনীমোহন কর

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

রেজা। পুলিশরা কেন এসেছে? সন্দেহ করবার কোন কারণ আছে কি?

প্রতুল। বোধ হয় আছে।

রেজা। আমারও সব সময়েই মনে হ'ত কোথাও কিছু গণ্ডগোল আছে।

প্রতুল। তবে জেনে শুনে এর মধ্যে এলে কেন? এখন এখানে আসাটা খুবই বিপজ্জনক বুঝতে পারছ তো?

রেজা। তা পারছি। কিন্তু যদি স্তর, ওরা আপনাদের ধরে নিয়ে যায় তখন আমার টাকাটা—

প্রতুল। বটেই তো! নিশ্চয়ই!

রেজা। ভাবলাম যদি সেটা এখন দেন—তা ছাড়া পুলিশের খবরটাও দেবার ছিল।

প্রতুল পা টেনে টেনে দেরাজযুক্ত টেবিলের কাছে গেল

গিরীন। বাইরে পুলিশ থাকলে আমরা কি করে পালাব?

প্রতুল। রেজা, গলির দিকে কেউ আছে?

রেজা। না স্তর, ওদিকে তো কাউকে দেখিনি।

গিরীন। তা হলে ওদিক দিয়ে পালানো যেতে পারে।

নিরঞ্জন। প্রতুল—এখন কি রকম ফীল করছ?

প্রতুল। এই একরকম! পুলিশ বাড়ীর ওপর নজর রেখেছে শুনে একটু রী-অ্যাকশান হয়েছিল। (দেরাজ খুললে)

নিরঞ্জন। এখন কি করবে?

প্রতুল। প্রথমে গিরীনবাবুর একটা বন্দোবস্ত করতে হবে।

নিরঞ্জন। ওঁকে আর আটকে রাখার প্রয়োজন নেই?

প্রতুল। না, আর কোন প্রয়োজন নেই। কাল থেকে পুলিশ বাড়ী পাহারা দিচ্ছে। (দেরাজ থেকে একগাদা নোট বার করলে)

গিরীন। এরকম জানলে আমি কখনও এ কাজে হাত দিতুম না।

প্রতুল। স্থির হয়ে থাকুন। আমি আপনাকে নির্ব্বিঘ্নে পার করিয়ে দেব। রেজা, তুমিও এবার যাও। আর দেরী করা উচিত হবে না।

রেজা। আমার যাবার পথ ঠিক আছে। কেউ দেখতে পাবে না।

গিরীন। আমাকেও সঙ্গে নাও না।

রেজা। বাড়ীর ছাদ টপকে পালানো অনেক দিনের অভ্যাসের কাজ।

প্রতুল। আপনি বাড়ীর পিছন দিক দিয়ে যাবেন। এই নিন্ যৎসামান্ত কিছু—(নোটের তাড়া গিরীনের হাতে গুঁজে দিয়ে) আটশ' টাকা আছে।

গিরীন। আমি তো টাকা আনতে পারিনি—

প্রতুল। সে আপনার দোষ নয়, দোষ আমার অদৃষ্টের। আমার হাতে আর নেই। থাকলে যা কিছু থাকত' সবই দিতুম।

গিরীন। (ধরা গলায়) ধন্যবাদ! (রেজা জানলার কাছে গেল)

প্রতুল। খুব দূর দেশে গিয়ে কিছুদিন থাকবেন। পারেন তো সেখানে একটা দোকান করবেন, তা হলে আর পুরোনো ইতিহাস ঘাঁটতে হবে না। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

রেজা। (জানলা দিয়ে বাহিরে দেখে) আরও একটা জুটেছে স্তর—

প্রতুল। আসছে?

রেজা। পানওয়ালার দোকানের কাছে যে বেটা ছিল তার সঙ্গে কথা কইছে।

প্রতুল। আচ্ছা। যান, আর দেরী করবেন না।

গিরীন। কিন্তু আপনার?

প্রতুল। আমার কথা ভাবতে হবে না। সে সময় এখন নেই। আপনার নতুন নাম নতুন পরিচয় যেন ভুলবেন না।

গিরীন। আজ্ঞে না। সব মুখস্থ আছে।

রেজা। (জানলা থেকে সরে এসে) একজন বাড়ীর পিছন দিকে যাচ্ছে—

গিরীন। তা হলে উপায়?

রেজা। পট্টি ঝাড়বেন।

গিরীন। সে আবার কি?

রেজা। গুল। বলবেন আপনি একজনদের বাড়ী খুঁজতে খুঁজতে ভুল রাস্তায় এসে পড়েছেন।

গিরীন। (চশমা পরে, টুপি লাঠি হাতে নিয়ে) আচ্ছা, তা হলে চলি। নমস্কার।

প্রতুল। নমস্কার। গুড লাক!

গিরীন চলে গেল। সকলে গলির জানলা দিয়ে দেখতে লাগল

নিরঞ্জন। এইবার রেজার বন্দোবস্ত করে ফেল।

প্রতুল। হ্যাঁ। রেজা, এই নাও তোমার টাকা।

রেজাকে একগাদা নোট দিল

রেজা। ধন্যবাদ স্তর। (নোট গুণে) এ কি স্তর! এত কেন? এতো আমার পাওনার চেয়ে অনেক বেশী।

প্রতুল। তা হোক। নাও।

রেজা। ধন্যবাদ স্তর। আপনার কি আর গ্ল্যাণ্ডের প্রয়োজন নেই?

প্রতুল। প্রয়োজন আছে রেজা, কিন্তু সময় নেই।

নিরঞ্জন। (জানলা দিয়ে বাইরে দেখে) ঐ গিরীন যাচ্ছে।

প্রতুল ও রেজা বাইরে দেখতে লাগল

রেজা। পুলিশটাও এসে পড়েছে।

নিরঞ্জন। ওকে কি জিজ্ঞেস করছে?

রেজা। গিরীনবাবু খুব রেগেছেন। ঠিক মনে হচ্ছে সত্যকারের রাগ। পুলিশ সরে গেল—

নিরঞ্জন। এগিয়ে চলেছে।

রেজা। পুলিশটা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সোজা চলে যাচ্ছেন, গটমট করে। একবার ফিরেও তাকাচ্ছেন না।

নিরঞ্জন। আর ভয়ের কিছু নেই।

রেজা। ঐ তো মোড় বেঁকে চলে গেলেন।

প্রতুল। গেছে! চলে গেছে! গুড লাক! গুড লাক!!

জানলা থেকে ধুঁকতে ধুঁকতে ফিরে এল। কোমর বেঁকে যাচ্ছে।

নিরঞ্জন। তোমার কি করবে?

প্রতুল। কি করতে পারি?

নিরঞ্জন। তোমার এখানে থাকা চলতে পারে না।

প্রতুল। আমি এখন যাব না—

নিরঞ্জন। কিন্তু প্রতুল, ওরা যে তোমার জন্যই আসছে!

রেজা। (বড় রাস্তার দিকের জানলা থেকে দেখে) স্যর, একটা পুলিশ ভ্যান এসেছে। (প্রতুল জানলার কাছে গেল) ঐ দেখুন—দেখেছেন? আমি চললুম।

প্রতুল। যাও। কিন্তু কি করে যাবে?

রেজা। ঐ জানলাটার ধারে জলের পাইপ আছে। তাই বেয়ে ছাদে উঠে পাশের বাড়ী দিয়ে নেমে যাব। বড় ফ্ল্যাট সিষ্টেমের বাড়ী। কেউ সন্দেহ করবে না।

প্রতুল। তা হলে যাও, আর দেরী কোরো না।

রেজা। (জানলার ওপর পা রেখে) এদিককার পুলিশটা গলির মোড়ে গেছে। এই ঠিক সময়—কিন্তু আপনার স্যর?

প্রতুল। আমার কোন ভয়ের কারণ নেই।

রেজা। বিলক্ষণ কারণ রয়েছে।—(বাইরে দেখে) এই যাঃ—

প্রতুল। কি হ'ল? (জানালার কাছে গেল)

রেজা। এদিকেও একটা পুলিশের গাড়ী এসে দাঁড়াল। বাড়ীটা ঘেরাও করেছে।

প্রতুল। গিরীনবাবু খুব সময়ে পালিয়েছেন। জানালা থেকে নেমে এস, ওরা দেখতে পাবে।

রেজা। এদিক দিয়ে আর যাওয়া চলবে না। (জানলা থেকে নেমে দরজার কাছে গিয়ে) আপনিও আমার সঙ্গে আসুন না স্যর।

প্রতুল। তা হয় না রেজা।

রেজা। কিন্তু এখন না গেলে ওদের হাতে পড়তে হবে যে?

প্রতুল। তা জানি। রেজা তুমি যাও। যাবার সময় সামনের আর পিছনের দরজার ভেতর থেকে তালা দিয়ে যেতে পারবে?

রেজা। পারব স্যর। তাতে কি কোন লাভ হবে?

প্রতুল। হবে।

রেজা। আচ্ছা স্যর চলি। পিছনের দরজায় চাবী দিয়েই এসেছিলুম। এই নিন চাবী। ধন্যবাদ। নমস্কার। (রেজার প্রস্থান)

নিরঞ্জন গলির দিকের জানালায় গেল

নিরঞ্জন। পুলিশরা গাড়ী থেকে নামছে।

প্রতুল। নামুক। ওপরে আসতে এখনও অনেক সময় লাগবে।

নিরঞ্জন। কিন্তু তুমি পালাবে কি করে?

প্রতুল। পালাব না। পালিয়ে কি হবে? হাতে একটা কাণাকড়িও নেই। কিন্তু নিরঞ্জন আমার ভয়ের কোন কারণ নেই।

নিরঞ্জন। মানে? তুমি কি করবে?

প্রতুল। আমি ওদের ফাঁকী দেব।

নিরঞ্জন। কি করে? (হঠাৎ ওষুধ মেশানো গেলাসের ওপর নজর পড়তে) ওর সাহায্যে? (গেলাস দেখালে)

প্রতুল। না বন্ধু। তারা আসবে, আমায় ধরে নিয়ে যাবে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধরে রাখতে পারবে না। ভুলে যেওনা আমার বয়স পঁচাশীর ওপর হওয়া উচিত ছিল। হয়ত' আমার নায্য পরমায়ু আমি ছাড়িয়ে গেছি। তাই যে মুহূর্ত্তে আমি দুর্ব্বল হয়ে যাব, জরামৃত্যু ছুটে আসবে তাদের পুরোণো দাবী আদায় করতে—কড়ায় গণ্ডায়, কিছু ছেড়ে দেবে না। কিন্তু তুমি যাও নিরঞ্জন—

নিরঞ্জন। আমি যাব না। শেষ পর্য্যন্ত তোমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকব।

প্রতুল। তুমি আমায় সাহায্য করেছ বলে বিপদে পড়বে।

নিরঞ্জন। সে আমি সামলে নিতে পারব।—তুমি বন্ধে যাবে কি করে?

প্রতুল। আমি বম্বের চেয়েও আরও অনেক দূরে যাব।

নিরঞ্জন। কবে?

প্রতুল। শীগ্‌গিরই!

দেরাজ থেকে পাণ্ডুলিপি, নোট-বই ইত্যাদি বার করল

নিরঞ্জন। এগুলো কি করবে? সঙ্গে করে নিয়ে যাবে?

প্রতুল। না। কিছু কি সঙ্গে যায়! (হেসে) এগুলো বে ভারী লাগছে। (একটা আলমারি খুলল)

নিরঞ্জন। তুমি ক্রমেই দুর্ব্বল হয়ে পড়ছ প্রতুল।

প্রতুল। বুঝতে পারছি নিরঞ্জন। (কোমরের পিছন দিক চে ধরে) এই খানটায়—গ্ল্যাণ্ডগুলো বড্ড তাড়াতাড়ি শক্তিহীন হয়ে পড়ছে—দেখছ, আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

নিরঞ্জন। যদি একটা ইঞ্জেকশন নাও—

প্রতুল। না, দরকার নেই। হারাণো বছরগুলি ফিরে আসছে—আসুক— (আলমারি থেকে বই বার করতে করতে) আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। তুমি ঠিকই বলেছিলে—আমি যে মানুষ সৃষ্টি করেছি তারা খায় দায়, কথা কয়, বেঁচে থাকে, কিন্তু তবু তারা মৃত যন্ত্রচালিত পুতুল—মানুষ নয়। এই সব (খাতা বই ইত্যাদি দেখিয়ে) এই সব আমার জীবনব্যাপী গবেষণার ফল—ফাঁকা, অর্থহীন, নিষ্ফল!

নিরঞ্জন। তুমি কি তোমার সাধনা অসম্পূর্ণ রেখে যাবে?

প্রতুল। তার চিহ্নমাত্রও রাখব না। সব ধ্বংস করে দেব।

নিরঞ্জন। ভবিষ্যতের জন্য কিছু রাখবে না?

প্রতুল। না। এমন কোন জিনিষই রাখব না, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এই পথে আসতে পারে।

নিরঞ্জন। তাই হোক বন্ধু, কিন্তু এ জ্ঞানভাণ্ডার—

প্রতুল। বিস্মৃতির সমুদ্রে লুপ্ত হবে। ডাক্তার—এই আমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত! (বাহিরের দরজায় খট খট ধ্বনি)

নিরঞ্জন। ঐ—ওরা এসে পড়েছে।

প্রতুল আরও বই খাতা বার করতে লাগল

প্রতুল। আসুক।

নিরঞ্জন। প্রতুল, ওগুলো এ ভাবে নষ্ট কোরো না। তোমার এ এক্সপেরিমেণ্ট জগতে অতুলনীয়, অদ্বিতীয়।

প্রতুল। (মল্লিকার ছবির দিকে দেখিয়ে) মিলি বলেছিল আমি যা করছি সব নিষ্ফল। প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ধৃষ্টতা মাত্র। মেয়েরা অতি সহজেই বুঝতে পারে—

নিরঞ্জন। তা পারে—

প্রতুল। অথচ এই সহজ কথা বুঝতে আমার এতদিন লেগেছে। (বই খাতা সব তুলে নিয়ে) আমি যাচ্ছি ল্যাবরেটরীতে। যে বাথটাবে গিরীনের অস্তিত্ব লুপ্ত হ'ত তাতে আমার জীবনব্যাপী গ্লানিপূর্ণ নিষ্ফল সাধনার মূক সাক্ষীরা লুপ্ত হবে।

প্রতুল ল্যাবরেটরীর মধ্যে চলে গেল। নিরঞ্জন মল্লিকা বসুর ছবির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে জোরে দরজায় ধাক্কার আওয়াজ। হঠাৎ একটা জানলার কাঁচ ভেঙ্গে একজন কনষ্টেবল ঘরে ঢুকল। নিরঞ্জনকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

কনষ্টেবল। আপনি আমাদের দরজায় ধাক্কার আওয়াজ শুনতে পান নি?

নিরঞ্জন। পেয়েছিলুম।

কনষ্টেবল। খোলেন নি কেন? যাক্, আমি গিয়ে খুলে দিচ্ছি।

কনষ্টেবলের প্রস্থান। নিরঞ্জন ল্যাবরেটরীর দরজার কাছে গেল।

নিরঞ্জন। প্রতুল, ওরা এসে পড়ছে।

প্রতুল। (নেপথ্যে) আমিও আসছি—

খগেন দত্ত, লোকেন চাটুজ্যে ও দু'জন কনষ্টেবলের প্রবেশ

খগেন। মিষ্টার চৌধুরী কোথায়?

প্রতুল। (নেপথ্যে) এই যে, আসছি।

ল্যাবরেটরীর দরজা খুলে প্রতুল ঢুকল। লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ, পিঠ বেঁকে গেছে, চোখ বসে গেছে, গাল তুবড়ে গেছে। দেখে চেনা যায় না

প্রতুল। আমায় খুঁজছিলেন?

সকলে বিস্মিত হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল

প্রতুল। আমায় খুঁজছিলেন?

লোকেন। আমরা মিষ্টার চৌধুরীকে খুঁজছি।

প্রতুল। আমিই প্রতুল চৌধুরী।

খগেন। কিন্তু আপনি বৃদ্ধ—

প্রতুল। গ্ল্যাণ্ডের ডিজেনারেশন কত তাড়াতাড়ি হতে পারে দেখছ নিরঞ্জন!

খগেন। ওহে, তুমি ঐ ঘরটা দেখ।

একজন কনষ্টেবল ল্যাবরেটরীতে ঢুকল

লোকেন। আপনি স্বীকার করছেন যে আপনিই প্রতুল চৌধুরী?

প্রতুল। নিশ্চয়ই।

খগেন। আপনাকে অ্যারেষ্ট করবার ওয়ারেণ্ট আছে, অপরাধ—

প্রতুল। কষ্ট করে বলতে হবে না, আমি জানি।

পড়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি টেবিল ধরে নিজেকে সামলে নিল

লোকেন। (নিরঞ্জনের প্রতি) ওঁর কি শরীর খারাপ?

প্রতুল। না। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।

খগেন। গিরীন পাত্র নামে আর একজন লোককেও আমাদের অ্যারেষ্ট করবার ওয়ারেণ্ট আছে—

প্রতুল। তিনি এখানে নেই।

লোকেন সুটকেশের কাছে এগিয়ে গেল

খগেন। তিনি কোথায়?

ল্যাবরেটরী থেকে কনষ্টেবল বেরিয়ে এল

কনষ্টেবল। ওঘরে কেউ নেই হুজুর।

খগেন। ছাদে দেখ। আরও কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়ে যেও।

কনষ্টেবলের প্রস্থান। লোকেন সুটকেশ খুলল

লোকেন। খগেনবাবু, এই দেখুন মাল মজুত রয়েছে।

খগেন। তা হলে আমাদের ভুল হয় নি!

প্রতুল। (নোটগুলো দেখিয়ে) এসব আপনাদের কাজ?

লোকেন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রতুল। আপনারা জানতে পেরেছিলেন গিরীনবাবু এখানে আসেন—

লোকেন। হ্যাঁ।

প্রতুলকে আরও বুড়ো দেখাতে লাগল। প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি একটা সোফায় বসে পড়ল।

প্রতুল। কি করে জানলেন?

লোকেন। জনার্দনকে চেনেন? আপনার চাকর। তাকে আমরা টাকা দিয়ে হাত করেছিলুম। সেই সব খবর দিয়েছে।

খগেন। তার চেয়েও বেশী কিছু আমরা জানতে পেরেছিলুম—আপনার কার্য্য প্রণালী!

লোকেন। ক্রিমিন্যাল মাত্রেরই একটা অভ্যাস আছে। আপনি দিল্লীতে, করাচীতে, লাহোরে অন্যান্য স্থানে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন কলকাতায় ও ঠিক তাই করলেন। আমরা আগে থেকেই সতর্ক হয়েছিলুম। ব্যাঙ্কের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে কাজটা অতি সহজেই সুসম্পন্ন হ'ল। খগেন বাবু, আঙুলের ছাপ কখনও ভুল হয় না!

খগেন। তবে মিষ্টার চৌধুরী বড্ড ভাবিয়েছেন—কিহে, গিরীনবাবুর সন্ধান পেলে? (কনষ্টেবলের প্রবেশ)

কনষ্টেবল। আজ্ঞে না।

খগেন। আমি নিজে একবার দেখি—

ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এমন সময় মিষ্টার বসুর প্রবেশ

দ্বিজেন। আপনাদের টেলিফোন পেয়ে—

লোকেন। (প্রতুলকে দেখিয়ে) আসামী আপনার সামনে বসে।

দ্বিজেন। (বিস্মিত হয়ে) এই প্রতুল—প্রতুল চৌধুরী!

লোকেন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

দ্বিজেন। আশ্চর্য্য!

খগেন। ডাক্তার গুপ্ত, আপনাকেও একবার আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

নিরঞ্জন। কেন? অ্যাম আই আণ্ডার অ্যারেষ্ট?

খগেন। না, ঠিক তা নয়—

প্রতুল। (ক্ষীণ কণ্ঠে) ডাক্তার

নিরঞ্জন। কি বলছ' প্রতুল? (প্রতুলের কাছে গেল)

প্রতুল। (হাঁফাতে হাঁফাতে) ওঁদের একবার কাছে ডাক।

(সকলে কাছে সরে গেল)

দ্বিজেন। কি বলছ বল।

প্রতুল। মিষ্টার বসু, আপনাদের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে—জীবনের শেষ নিবেদন—

মল্লিকাকে আমার কথা কিছু বলবেন না। যে প্রতুল চৌধুরীকে সে চিনত আমি আর সে লোক নই। আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে বলবেন যে প্রতুল চৌধুরী মরে গেছে, আমার অপরাধ ও অপমানের কাহিনী তাকে শোনাবেন না।

দ্বিজেন। তাই হবে।

লোকেন। এইবার আপনাকে যেতে হবে মিষ্টার চৌধুরী।

প্রতুল। বেশ চলুন—

উঠতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিল, নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি ধরে ফেলে সোফায় শুইয়ে দিলে।

নিরঞ্জন। প্রতুল, প্রতুল!

প্রতুল। নিরঞ্জন, বিদায়। আমি যাচ্ছি এদের ফাঁকী দিয়ে দূরে অনেক দূরে—মানুষের ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। মরজগতে অমরত্বের সন্ধান দুরাশা বন্ধু, দুরাশা মাত্র!

প্রতুলের কথা থেমে গেল। তার প্রাণহীন দেহের দিকে চেয়ে সকলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ক্রমশঃ

নতুন হোলি

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মর্ত্তে অবতীর্ণ হয়ে মানবরূপে বৃন্দাবনে
রং খেলেছি গোপীর সাথে সে যুগ ছিল স্বপ্নে ভরা,
সেই লীলাকে আজও সবাই সঙ্গী করে' সঙ্গোপনে
রং খেলা আর হিন্দোলাতে ভুলতে চাহে দুঃখ-জরা।
পিচকারীর এই রং মিছে আজ রং নাহি যে বক্ষে কারো'
হিন্দোলা সে দুলছে বটে তার দোলে যে ছন্দ নাই,
দোল লীলা আজ কারো প্রাণে দেয় না দোলা একটিবারও
পঞ্জিকারি পাতার মাঝে কাঁদছে সে আজ যন্ত্রণায়।
তাই আজি মোর মনের মাঝে হঠাৎ খেয়াল উঠলো জেগে
নতুন হোলি খেলবো আমি, নতুন হবে সে কুঙ্কুম,
রক্ত দিয়ে রং গুলে' আজ এমনি করেই ছাড়বো বেগে
পিচকারী আর কুঙ্কুমেতে আওয়াজ হবে—গুড়ুম্ গুম্।
সে পিচকারী কুঙ্কুমেরি আঘাত যারা সইবি ওরে
আয় তারা আজ আমার সাথে খেলবি হোলি ছন্দে ভাই,
এই হোলি যে খেলবে তারে বাঁধবো আমি বক্ষডোরে
ক্ষুধার লাগি' বিশ্বে তারা কাঁদবে না আর যন্ত্রণায়।
প্রতিজ্ঞা আর আগুন দিয়ে আজকেরি এই দোললীলাতে
জীবন দিবে আমায় যারা—খেলবে তারাই হোলির রণ।
জিত্‌বে যে বীর দখল তারই আমার কোলের হিন্দোলাতে
এ দোল শেষে আসবে যে দোল সে দোল হবে চিরন্তন।
সেই পুরাতন দোলের রাতের গান ছিল রে সুরবাহার
সঙ্গী ছিল গোপাঙ্গনা কোকিল এবং পূর্ণচাঁদ,
আজকেরি এই দোলের গীতি বীরসেনাদের হুঙ্কার
সঙ্গী হবে সত্যাগ্রহীর মৃত্যুপণের সিংহনাদ।
ঝঞ্ঝা ভূমিকম্প মড়ক এই দোলেরি সঙ্গী ওরে
অত্যাচারের সঙ্গে লড়াই এই দোলেরি নৃত্য ভাই,
মৃত্যুহোলির রক্তে যারা বাঁধবে মোরে শক্ত-ডোরে
আজকেরি এই হোলির রণে তাদের কভু মৃত্যু নাই।
এই হোলিতে জিতবে যারা অজর তারাই বিশ্বেরে।
অমর হবে মর্ত্তে তারাই জীবন তাদের বৃন্দাবন,
ভবিষ্যতের বিশ্ব তারাই গড়বে স্বরগ দৃশ্যেরে
তাদের লাগি' থাকবে বাঁধা সকল ভোগের আলিঙ্গন।
আয় তবে আয় খেলবি কে আজ জীবন-মরণ নৃত্য-হোলি
ভক্তেরি হৃদ্‌রক্ত-আবীর মৃত্যুঞ্জয়ের এ কুঙ্কুম,
হাততালি দে দুঃখজয়ের জীবনজয়ের এ অঞ্জলি
নতুন হোলির বাজাই বাঁশী গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্।

স্বাধীনতার রূপান্তর—শ্যাম বা থাইল্যাণ্ড

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪৬ সালের শুভ নববর্ষে বৃটীশ গভর্ণমেন্ট শ্যামরাজ্যের সঙ্গে শান্তিচুক্তি নিষ্পন্ন করেন। এই চুক্তিতে বৃটেনের পক্ষে স্বাক্ষর করেন লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের রাজনৈতিক উপদেষ্টা মিঃ এম-ই-ডেনিং, ভারতের পক্ষে মিঃ আনে ও শ্যামের তরফ থেকে স্বাক্ষর করেন প্রিন্স বিবতানার জয়ন্ত। এই চুক্তির প্রধান দুটী সর্ত্ত হচ্ছে: শ্যামকে অবিলম্বে সমস্ত উদ্বৃত্ত চাল (উর্দ্ধপক্ষে ১৫ লক্ষ টন) বৃটেনের হাতে সমর্পণ করতে হবে এবং আগামী ২১ মাসের মত উদ্বৃত্ত চাল বৃটেনের কাছেই বিক্রয় করতে হবে। এ বিষয়ে তদারক করবার জন্য বৃটীশ গভর্ণমেন্ট একটী বিশেষ কমিশন নিযুক্ত করবেন। দ্বিতীয়তঃ, শ্যাম উপসাগর ও ভারত মহাসাগরের মাঝখানে শ্যামের যে সঙ্কীর্ণ ভূভাগ আছে বৃটেনের অনুমতি না নিয়ে শ্যাম সেখানে খাল কেটে এই দুই জলরাশির মিলন ঘটাতে পারবেন না। ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বরের পর থেকে শ্যাম বৃটেনের যে সকল ভূভাগ বা সম্পত্তি দখল করেছে তা ফিরে দিতে হবে এবং যে সকল সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

শ্যাম বাধ্য হয়ে এই সকল সর্ত্তে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছে এবং প্রাণে প্রাণে ইংরাজদের কূটনীতির মর্ম্ম অনুভব করেছে। ইন্দোনেশিয়া বা ইন্দোচীনের তুলনায় শ্যামের ঘটনাবলী স্বতন্ত্রধারায় চলেছিল। তাই খাল কেটে কুমীর ডেকে আনবার পর তাদের নতি-স্বীকার ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। কিরূপ শুভবুদ্ধি নিয়ে ইংরাজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘাঁটী পেতেছে, শ্যামের ব্যাপারে তার একটা সুন্দর চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর যেখানেই শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন সেইখানেই বৃটীশ সৈন্য কেন? তার উত্তরও শ্যামের ঘটনাবলী থেকেই পাওয়া যাবে।

ইন্দোনেশিয়ায় বৃটীশবাহিনী জাপানী সৈন্যদের সহিত একযোগে স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করে' শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করছে। গ্রীসে ও তাদের প্রয়োজন; মিঃ চার্চ্চিলের আমলে রাজতন্ত্রীদের পক্ষ নিয়ে গণতন্ত্রীদের দমনে বৃটীশ সৈন্যই অগ্রসর হয়ে এসেছে। তাঁবেদার গভর্ণমেন্ট খাড়া করেও বৃটীশ সৈন্য গ্রীস ত্যাগে ভরসা পায় না। মিশরের ইচ্ছা না থাকলেও সেখানের শান্তিরক্ষার জন্য তাদের থাকা প্রয়োজন হয়। শ্যামেও এই কাজে তাদের প্রয়োজন হয়েছিল এবং আজ তাই শ্যামকে তার মূল্য দিতে হচ্ছে নিজের স্বাধীনতা বিপন্ন করে'।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার এই অঞ্চলে শ্বেতজাতিগুলি কি ভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার করে, ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনের ইতিহাস পর্য্যালোচনাকালে তার বিবরণ এর আগেই দিয়েছি। শ্যামরাজ্যের প্রতিও ইঙ্গ-ফরাসীর লোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল সেই যুগেই। ইন্দোচীনে ফরাসীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রায় সমসাময়িককালে বৃটীশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয় ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত ভূভাগের উপর। এই দুই দেশের মাঝখানে শ্যামরাজ্য ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রাচীর রূপে পরিণত হয়। এর পর থেকে প্রায় শতাব্দীকাল শ্যামের রাজন্যবর্গ এই উভয় শক্তির উদ্ধত দংশন থেকে আত্মরক্ষা করে চলতে [illegible] কাছ থেকে তাঁদের আঁচড় খেতে হয়েছে বহুবার। ফ্রান্স শ্যামের অঙ্গ থেকে কাম্বোডিয়া ও লাওস রাজ্য বিচ্ছিন্ন করে ইন্দোচীনের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। বৃটেন টেনাসেরিম ও অন্যান্য ভূভাগ মালয়রাজ্যের এলাকাভুক্ত করে। এ সত্ত্বেও শ্যামরাজ্য নিজের সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষা করে চলতে থাকে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার একমাত্র স্বাধীন দেশ বলে গর্ব্ববোধ করতে থাকে।

১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত শ্যামে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। শ্যামের রাজা আনন্দমহীদল তখনও নাবালক। রাজ্যের শাসনভার পরিচালনার জন্য এক রিজেন্ট নিযুক্ত করা হয়। এইরূপ অবস্থার মধ্যে ১৯৩২ সালে এক রক্তপাতহীন আকস্মিক বিপ্লব ঘটে। এর ফলে যে শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয় তাতে জনগণের প্রতিনিধিমূলক এক পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদের শতকরা ৫০ জন সদস্য নির্ব্বাচিত ও শতকরা ৫০ জন সরকারের মনোনীত হয়ে থাকে এবং প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে ১৯৪২ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রবর্ত্তন করা হবে। বিদ্রোহের পরবর্ত্তীকালে শ্যামে সামরিক রাজত্ব চলতে থাকে। রাজনৈতিক দলগঠন নিষিদ্ধ করা হয় এবং পরিষদের নির্ব্বাচনও সরকারের হুকুম মতই চলতে থাকে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনী গঠিত হয়। সামাজিক বিধিব্যবস্থারও কিছু কিছু সংস্কার করা হয় এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা হয়। ১৯৩৬ সালে শ্যাম অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সমস্ত চুক্তি বাতিল করে দেয় এবং নূতন করে চুক্তি নিষ্পন্ন করে। বৃটেনের সঙ্গে এই সময় এক বাণিজ্যচুক্তি ও মৈত্রীচুক্তিতে শ্যাম আবদ্ধ হয়। বৃটেন দীর্ঘকাল ধরে ব্যাঙ্ককের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে; কিন্তু এই সময় সেখানে জাপানের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। শ্যামের বেশীর ভাগ বাণিজ্যই বৃটেন, জাপান, বৃটীশমালয় ও হংকংয়ের সঙ্গে চলে। শ্যামরাজ্যের সরকারী নাম "মোয়াং-থাই" অর্থাৎ স্বাধীন লোকেদের দেশ। বৃটীশ গভর্ণমেন্ট শ্যাম নামটা সহ্য করতে পারেন না বলে তাঁরা নাম দিলে "থাইল্যাণ্ড"।

বৃটেন যখন এইভাবে শ্যামরাজ্যের উপর প্রায় একাধিপত্য বিস্তার ক বসেছে এমন সময় প্রশান্ত মহাসাগরে ১৯৪১ সালের জাপ অভিযান আ হল। ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি করে জাপান ইন্দোচীন অধিকার কর এর পর থেকেই শ্যামের ভাগ্যেও ওলটপালট দেখা দিল। জাপা প্রভুত্ব তাদের মেনে নিতে হল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা স্বাধী পুনরুদ্ধারের আয়োজন করে যেতে লাগল। আমেরিকা এই বি শ্যামবাসীদের যথেষ্ট সহায়তা করে। জাপানের পরাজয়ের পর শ্যাম সার্ব্বভৌম রাষ্ট্ররূপে বৃটেনের সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধন যাচ্ঞা করল, বৃটেন কি ভাবে শ্যামকে গ্রাস করবে তারই ফিকির খুঁজতে লাগল। সে নিকট যে একুশ দফা সর্ত্ত উত্থাপন করল তাকে শ্যামের স্বাধীনতা চেষ্টা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। শ্যাম কোনদিন ফ্রান্সের যুদ্ধঘোষণা করে নাই। তথাপি ফ্রান্স এখন বিজয়ী রাষ্ট্ররূপে নিকট দাবী পেশ করল। চীনও দখলদার সৈন্য পাঠাতে

এই দুর্দ্দিনে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র শ্যামকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। ফলতঃ আমেরিকার হস্তক্ষেপের ফলেই বৃটেন শ্যামকে কুক্ষীগতকরণে ব্যর্থকাম হয়।

জাপানের পরাজয়ের পরে শ্যামের রাজনীতিকগণ মিত্রপক্ষের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হন। যুদ্ধকালীন প্রধান মন্ত্রী ও ডিক্টেটর মার্শাল বিপুলসংগ্রামকে তাঁরা গদীচ্যুত করেন। রিজেন্ট লুয়াং প্রাদিৎ আগাগোড়াই জাপানের সহিত মৈত্রীর বিরোধী ছিলেন এবং তিনিই গোপনে গোপনে আমেরিকার সাহায্যে রাজ্যে জাপানের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা করেন। তিনিই এখন রাজ্যের ভার নিলেন। একজন নূতন প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করা হল। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হল। পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করা হ'ল। গভর্ণমেন্ট গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে শাসন ব্যবস্থার ঘোষণা করলেন। শ্যামের যুদ্ধের জন্য যারা দায়ী, তাদের বিচার করবার জন্য যুদ্ধাপরাধ-কমিশন গঠন করলেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সর্ব্বাধিনায়ক লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের নিকট শান্তি আলোচনার জন্য দূত প্রেরণ করলেন।

শ্যামের রাজনীতিতে রাতারাতি এরূপ আমূল পরিবর্ত্তনাদির ইতিহাসের পশ্চাতে আছে শ্যামের দুই রাজনীতিকের সংঘর্ষের কাহিনী। ১৯৩২ সালের রক্তপাতহীন বিদ্রোহের পর এই দুই নেতা শ্যামের রাজনৈতিক জীবনে গভীর ছাপ অঙ্কিত করেছেন। এই দুই নেতার জীবনেতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে দুইটী বিপরীতধারা দেশের প্রয়োজনে এক হয়ে আবার ভিন্নমুখী হয়েছে।

এই দুই নেতা হচ্ছেন—মার্শাল বিপুলসংগ্রাম ও লুয়াং প্রাদিৎ। প্রাদিৎ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আইনে ডিগ্রী পান। দেশের শাসন সংস্কারকামী যুবকদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন এবং এই সময়েই তাঁর বিপুলসংগ্রামের সঙ্গে পরিচয় হয়। বিপুলসংগ্রাম তখন ফরাসী সেনানীদের কাছ থেকে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত করেছেন। প্যারিসে প্রাদিৎ এসিয়ার বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। বর্ত্তমানে জাভা, ইন্দোচীন, চীন, ব্রহ্ম ও ভারতের যাঁরা রাজনীতি পরিচালনা কচ্ছেন তাঁদের অনেকের সঙ্গেই তিনি এই সময় পরিচয় করেছিলেন। ১৯৩২ সালে যে রক্তপাতহীন বিদ্রোহের ফলে শ্যামে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হয় প্রাদিৎই ছিলেন তার নেতা। ১৯৩৩ সালে যে পাল্টা বিদ্রোহ সংঘটিত হয় মার্শাল বিপুল সংগ্রাম তা দমন করেন এবং প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাদিৎ হলেন তাতে প্রধানমন্ত্রী। প্রাদিৎ ও বিপুল উভয়ে মিলে স্বাধীন শ্যামরাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা কল্লেন। শ্যামের বাণিজ্যে বিদেশীদের একাধিপত্য দেখে তাঁরা এমন কতকগুলি আইন প্রবর্ত্তন করলেন যাতে করে' বাণিজ্যে বিদেশীদের প্রভাব লোপ করা হয়।

শ্যামের দেড়কোটী অধিবাসীর মধ্যে চীনা ছয়লক্ষ। তন্মধ্যে এক ব্যাঙ্ককেই প্রায় একলক্ষ চীনার বাস। প্রাদিৎ-বিপুলের শাসন সংস্কারের যুগে শ্যামের পেট্রল, টিন ও রবারের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করত, চীনা, ইংরাজ, মার্কিণ, জার্ম্মাণ ও জাপানীরা। তার মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ বাণিজ্যই ছিল চীনাদের হাতে। প্রাদিৎ ও বিপুল উভয়ের শিরা উপশিরাতে চীনা রক্ত প্রবাহিত হলেও তাঁরা শ্যামের বাণিজ্যে চীনা প্রভাব লোপের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনে পশ্চাৎপদ হলেন না। লৌহ, কয়লা, টিন, মাংগানিজ প্রভৃতি খনিজ এবং চাল গম প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যে প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী শ্যাম আত্মস্থ হয়ে অচিরেই বিশেষ উন্নতিলাভে কৃতকার্য্য হ'ল। ১৯৩৭ সালে শ্যাম গভর্ণমেন্ট বিদেশীদের প্রভাব লোপে সমর্থ হয় এবং পূর্ণ সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। বিদেশীয়দের শ্যামের বিধান মেনে চলতে বাধ্য করা হয়।

এই সময় প্রাদিৎ ও বিপুল সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। প্রাদিৎ বিচক্ষণ রাজনীতিক হলেও সামরিক বিভাগের সম্পূর্ণ ভার থাকে মার্শাল বিপুল সংগ্রামের হাতে। শ্যামের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিপুলসংগ্রাম প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হলেন। প্রধান সেনাপতি হবার পর থেকেই তিনি স্বীয় শক্তিবৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করলেন। এর ফলে ১৯৩৮ সালে বিপুলসংগ্রাম প্রধান মন্ত্রী ও দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী হলেন। শাসন-ব্যবস্থার প্রগতির পথ রুদ্ধ হ'ল।

বিপুলসংগ্রামের সামরিক দক্ষতা থাকলেও রাজনীতির সূক্ষ্ম বিষয় সমূহে পারদর্শিতার অভাব ছিল। এ সমস্ত ব্যাপারে প্রাদিতের পরামর্শ ব্যতীত কোন কিছু করা তাঁহার সাধ্যাতীত ছিল। তাই তিনি মন্ত্রি-সভায় প্রাদিৎ যাতে স্থান পান তৎপ্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। প্রাদিৎ ব্যতীত মন্ত্রিসভায় তিনি অন্যান্য সংস্কারপন্থীদের বাদ দিয়ে স্বীয় অনুচরদের স্থান করে দেন। নিজ দলের শক্তিবৃদ্ধির জন্য তিনি ফ্যাসিস্ত নীতি অবলম্বন করলেন। যাতে তাঁর বিরুদ্ধে বিপক্ষ দল মাথা তুলতে না পারে তজ্জন্য তাঁর গোয়েন্দারা রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘোরাফেরা করতে লাগল। শ্যামের সরল অধিবাসীরা এতে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল।

এমন সময় একটা ঘটনায় বিপুলের জনপ্রিয়তা আকস্মিক ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হল। ইন্দোচীন রাজ্যের থেকে তিনি কাম্বোডিয়া পুনরায় শ্যামের অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হলেন। জার্ম্মানীর হাতে ফ্রান্সের পতনের পরও ইন্দোচীন ফ্রান্সের আনুগত্য স্বীকার করে চলতে থাকে। ভিসি গভর্ণমেন্টের সঙ্গে চুক্তি করে জাপান ইন্দোচীনকে জাপ ঘাঁটিতে পরিণত করে। জাপসেনারা অবাধগতিতে ইন্দোচীনের ভিতর চলাচল করতে থাকে এবং বহির্জ্জগতের সঙ্গে চীনের সংযোগ ছিন্ন করে দেয়। জাপান এই সময় ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য 'এশিয়াবাসীদের জন্য এশিয়া' রব তুলে শ্যামের সহানুভূতি প্রার্থনা করে। বিপুল-সংগ্রাম এই সুযোগে ফ্রান্সের অধিকার থেকে পশ্চিম কাম্বোডিয়াকে মুক্ত করে শ্যামের অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হন। ভিসি গভর্ণমেন্টের সঙ্গে তিনি এ সম্পর্কে এক চুক্তি করেন এবং সামান্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে কাম্বোডিয়া ফিরিয়ে আনেন। (আগামীবারে সমাপ্য)

সাময়িকী

বাঙ্গালায় নির্ব্বাচন

বাঙ্গালা দেশে ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচন আরম্ভ হইয়াছে। বিনাবাধায় কংগ্রেস পক্ষে যে ১৬ জন প্রার্থী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও নির্ব্বাচন কেন্দ্রের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল। হিন্দুমহাসভার প্রার্থী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্বেতাঙ্গ কেন্দ্রের ২৩জন, মুসলীম লীগদলের ৫জন এবং স্বতন্ত্র দলের একজনও বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কংগ্রেস সদস্যদের নাম—(১) বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী—২৪ পরগণা মিউনিসিপ্যাল (২) কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল—মেদিনীপুর মধ্য সাধারণ পল্লী তপশীল (৩) মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী—প্রেসিডেন্সি বিভাগ জমীদার (৪) আনন্দীলাল পোদ্দার—শিল্প বাণিজ্য (৫) আশালতা সেন—ঢাকাসহর নারী (৬) কমলকৃষ্ণ রায়—বাঁকুড়া পূর্ব্ব সাধারণ পল্লী (৭) সুকুমার দত্ত—হুগলী দক্ষিণ-পশ্চিম সাধারণ পল্লী (৮) ভূপতি মজুমদার হুগলী হাওড়া মিউনিসিপ্যাল (৯) প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী—রাজসাহী সাধারণ পল্লী (১০) সিতাংশুকান্ত আচার্য্য—ঢাকা বিভাগ জমীদার (১১) কিরণশঙ্কর রায়—পূর্ব্ববঙ্গ মিউনিসিপ্যাল (১২) নরেন্দ্র সিং সিংঘী—রাজসাহী বিভাগ জমীদার (১৩) দেবীপ্রসাদ খৈতান—ভারতীয় বণিক সমিতি (১৪) অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল—বর্দ্ধমান উত্তর পল্লী (১৫) প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মেদিনীপুর দক্ষিণপশ্চিম পল্লী (১৬) ঈশ্বর চন্দ্র মাল—মেদিনীপুর দক্ষিণ পূর্ব্ব পল্লী। বাঙ্গালার কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানপ্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য দেশবাসী সকল ভোটদাতাকে নিবেদন জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বিনাবাধায় নির্ব্বাচন ব্যাপারে যেমন মুসলমান লীগ অপেক্ষা কংগ্রেসের প্রতি দেশবাসীর অধিকতর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, ভোট যুদ্ধেও সেইরূপ হইবে বলিয়া সকলে আশা করেন।

কুচবিহার কলেজ মামলার রায়—

১৯৪৫ সালের ২১শে আগষ্ট কুচবিহার কলেজের ছাত্রদের উপর সৈন্যদল আক্রমণ ও প্রহার করিয়াছিল। ঐ ঘটনার মামলায় ২ জন অফিসার ও ৪৬ জন সৈনিকের দণ্ড হইয়াছে। একজন আসামী এখনও পলাতক। কাপ্টেন কুমার পূর্ণেন্দু নারায়ণের ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। সুবেদার নবীন সিংএর ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ শত টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। মামলায় প্রমাণ হইয়াছে অপরাধীরা কুচবিহার ভিকটোরিয়া কলেজের, জেঙ্কিন্স স্কুল ও নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হোটেলের ছাত্র ও শিক্ষকগণকে এবং নিকটস্থ অন্যান্য লোকজনকে মারপিট করিয়াছিল। আহতদের মধ্যে কয়েকজন বালিকাও ছিল। আসামীরা সকলেই কুচবিহার রাজ্যের সৈন্য দলভুক্ত।



কলিকাতায় সর্ব্বদলীয় পতাকার একত্র মিলন ফটো—পান্না সেন

ডায়মণ্ড হারবারে গঙ্গাসাগর যাত্রী—

গত ১২ই জানুয়ারী ডায়মণ্ডহারবারে দুইবার জেটী ভাঙ্গিয়া গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রীদের মধ্যে ১৪২ জন নিহত ও



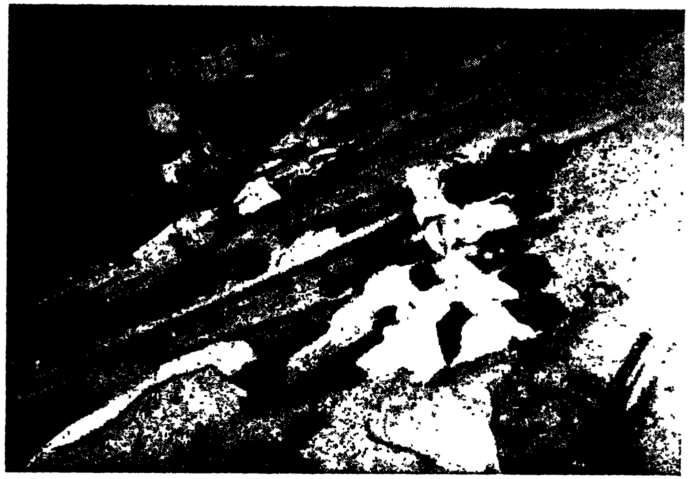
ডায়মণ্ডহারবারে সাগরযাত্রীদের মৃত্যুলীলার একটি করুণ দৃশ্য
ফটো—ডি-রতন



ডায়মণ্ডহারবারে জেটী ভাঙ্গিয়া সাগরযাত্রীদের অবস্থা
ফটো—ডি-রতন

বহু লোক আহত হয়। খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর নেতৃত্বে ঐ দুর্ঘটনা সম্বন্ধে যে তদন্ত কমিটী গঠিত হইয়াছিল, তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তীর হইতে জাহাজে যাইবার জেটী নির্ম্মাণের অব্যবস্থার ফলে এইরূপ দুর্ঘটনা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া রিপোর্ট সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশ, জিলাবোর্ড হইতেও তদন্তের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার সিদ্ধান্ত এখনও জানা যায় নাই। এই সকল তদন্তের উপর নির্ভর করিয়া ক্ষতিগ্রস্তদিগের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। আর

যাহাতে ঐরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, তাহার ব্যবস্থাও স্থির হওয়া প্রয়োজন।



সাগরযাত্রীদের মৃতদেহ
ফটো—ডি-রতন

বাঙ্গালায় রেশনের পরিমাণ কমিল—

২০শে ফেব্রুয়ারী বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি সপ্তাহে চাউল ও আটা প্রভৃতি মোট ৪ সেরের স্থানে অতঃপর ২ সের ১০ ছটাক করিয়া দেওয়া হইবে। যাহারা দৈহিক পরিশ্রম করে শুধু তাহারাই সপ্তাহে ৪ সেরের স্থলে সাড়ে ৩ সের খাদ্য পাইবে। বর্তমানে সপ্তাহে যে ৪ সের খাদ্য দেওয়া হয়, তাহাই সকলের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। তাহাও আবার এইভাবে কমাইয়া দেওয়া হইল। অতঃপর লোকজনকে পেটভরা না খাইতে পাইলে মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া তাহাদের অন্য উপায় থাকিবে না।

সৈন্যবিভাগে দুর্নীতি—

মহাযুদ্ধের সময় সামরিক উইমেন্স (মহিলা) অকজিলিয়ারী কোরে বহু ভারতীয় মহিলাকে চাকরীতে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে একশত জন মহিলা সম্প্রতি এক পত্র লিখিয়া তাঁহাদের প্রতি নানাপ্রকার দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। পত্রের নকল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণের ও বৃটীশ পার্লামেন্টের সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। পত্রে জাতিগত বৈষম্য, অযোগ্যতা ও নির্লজ্জ দুর্নীতির অনেক বিবরণ আছে। বাসস্থান, আহার ও পরিচর্য্যার ব্যবহার খুব খারাপ ছিল। গভর্ণমেণ্ট এখন ঐ নারী সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দিবেন। চাকরী কালে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করায় সৈন্যদলের শতকরা ৫০ জনের পক্ষে এখন গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকিবে না। এখন এই সকল নির্য্যাতীত মহিলাকে পরবর্ত্তী জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ও তাহাদের ক্ষতিপূরণ করার জন্য সকলের চেষ্টিত হওয়া প্রয়োজন।



কলিকাতার হাঙ্গামায় মৃতব্যক্তিগণ
ফটো—পান্না সেন



ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সর্ব্বদলীয় জনগণের সমাবেশ ফটো—পান্না সেন

মিঃ জিন্নার সুবুদ্ধি—

এতদিন পরে মিঃ জিন্নার সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে। তিনি ২৩শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা হইতে বড়লাটকে এক তার করিয়া জানাইয়াছেন যে কাপ্তেন আবদার রসিদের দণ্ড মঞ্জুর করা হউক ও আজাদ-হিন্দ-ফৌজের বিচার বন্ধ করা হউক। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত তিনি ইহা যে বুঝিয়াছেন তাহাও ভাল কথা।

প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে জন্য এখন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের কয়েকজন সদস্য লইয়া ঐ পুস্তিকার কথা কতটা সত্য সে সম্বন্ধে তদন্তের দাবী করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ঐরূপ তদন্তে অসম্মত হইয়াছেন। ঐ পুস্তিকায় যে মিথ্যা কথা প্রচার করা হইয়াছে তাহা বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক সংগৃহীত আগষ্ট হাঙ্গামার বিবরণে প্রকাশ পাইয়াছে।



শ্রীরামপুর ষ্টেশনে জনগণ কর্ত্তৃক ট্রেণ অবরোধ ফটো—তারক দাস

বেসরকারী তদন্তে অসম্মতি—

১৯২৫ সালের আগষ্ট হাঙ্গামার পর ভারত গভর্ণমেণ্ট আগষ্ট হাঙ্গামায় কংগ্রেসের দায়িত্ব শীর্ষক এক পুস্তিকা

আজাদ-হিন্দ-ফৌজ নেতার দণ্ড—

আজাদ-হিন্দ-ফৌজের অন্যতম নেতা ক্যাপ্টেন বারহান-উদ্দীন সামরিক আদালতের বিচারে যাবজ্জীবন প্রাণদণ্ডের

আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; জঙ্গীলাট তাহা কমাইয়া ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও তাঁহার প্রাপ্য সকল টাকা বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দিয়াছেন। সুবেদার সিঙ্গারা সিং ও জমাদার ফতে সিংএর বিচারও শেষ হইয়াছে—তাহাদের দোষী সাব্যস্ত করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। যখন প্রথম তিনজন আজাদ-হিন্দ নেতা বিচারের পর মুক্তিলাভ করেন, তখন সকলেই আশা করিয়াছিল যে বিচারে অপর সকলেও মুক্তিলাভ করিবেন—কিন্তু সে আশা বিফল হইল, দেখা যাইতেছে।

চাউল রপ্তানীর হিসাব—

ভারত গভর্ণমেণ্টের খাদ্য-সচিব মিঃ বি-আর সেন এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ১৯৪৫ সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বর মাসে সিংহলে প্রেরিত ৪২৩০২ টন সহ মোট ৪২৮৬০ টন চাউল ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী করা হইয়াছে। উহার উত্তরে কলিকাতা মাড়োয়ারী বণিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুত এম-এন-খেমকা জানাইয়াছেন যে ১৯৪৫ সালের মে হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যে শুধু কলিকাতা বন্দর হইতে ৬১৭৯৭ টন চাউল রপ্তানী হইয়াছে



হাঙ্গামার সময় এসপ্লানেডে একটি লরীর প্রজ্জ্বলিত অবস্থা ফটো—তারক দাস

—তাহার মূল্য ২৪৬৯৮৪৬৭ টাকা। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা হইতে কলম্বোতে ১১ টন চাল রপ্তানী হইয়াছে। এই উভয় হিসাবে এত পার্থক্যের কারণ বুঝা যায় না। কাহার হিসাব সত্য, ভারত গভর্ণমেণ্টের তাহা প্রকাশ করা উচিত।

লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিবে—

গত জানুয়ারী মাসে বৃটীশ পার্লামেণ্ট ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে সরজমীনে তদন্ত করিবার জন্য ভারতে যে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিয়াছিলেন অধ্যাপক রিচার্ডস্ সেই দলের নেতা ছিলেন। তিনি বিলাতে ফিরিয়া গিয়া প্রধান মন্ত্রীকে বলিয়াছেন—"আমাদের এখনই ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা উচিত। আমরা যদি তাহা না করি, তাহা হইলে আমাদের লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইবে।"

সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং—

নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতি পাঞ্জাবের খ্যাতনামা নেতা সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং কবিশেরকে গত ১৯৪২ সালের ৯ই মার্চ্চ গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা

হইয়াছিল। তিনি গত ২২শে জানুয়ারী মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্রের সহকর্ম্মী বলিয়া জেলে তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করার ভয় পর্য্যন্ত দেখান হইয়াছিল।

বড়লাট ও খাদ্য-সমস্যা—

ভারতের আসন্ন দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বড়লাট দেশনেতাদের সহিতও আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার প্রাইভেট



হাঙ্গামার সময় বড়বাজারের উপর দিয়া একদল ফৌজের মার্চ্চ করিয়া গমন ফটো—তারক দাস

সেক্রেটারী পুনায় যাইয়া মহাত্মা গান্ধীকে গভর্ণমেণ্ট পক্ষের প্রস্তাব জানাইয়া আসিয়াছেন। খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা মিঃ আফল আলি কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে বড়লাটের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী কংগ্রেস সভাপতি মৌলনা আবুলকালাম আজাদও বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী যে প্রস্তাব করিয়াছেন, বড়লাট বা বৃটীশ সরকার তাহাতে সম্মত হইলে দেশ হয়ত রক্ষা পাইবে। গান্ধীজি বড়লাটের শাসন পরিষদ নূতন করিয়া গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের শাসন পরিষদের সদস্যরূপে গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। ঐ ভাবে দেশবাসীর বিশ্বাস উৎপাদন করা না হইলে সরকার পক্ষের কথায় কেহ কর্ণপাত করিবে বলিয়া মনে হয় না।

পাঞ্জাবে নির্ব্বাচনের ফল—

পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। বিভিন্ন দলের সদস্য সংখ্যা এইরূপ—মুসলীম লীগ—৭৫, কংগ্রেস—৫১, আকালী শিখ—২২, ইউনিয়নিষ্ট—২০ মোট ১৭৫ জন। এখন কংগ্রেস আকালী ইউনিয়নিষ্ট দল মিলিত হইয়া সম্মিলিত দল গঠন করিয়াছেন ও মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। কংগ্রেস—২ ইউনিয়ানিষ্ট—৩ ও আকালী—১—৬ জন মন্ত্রীসভায় স্থান পাইয়াছেন।

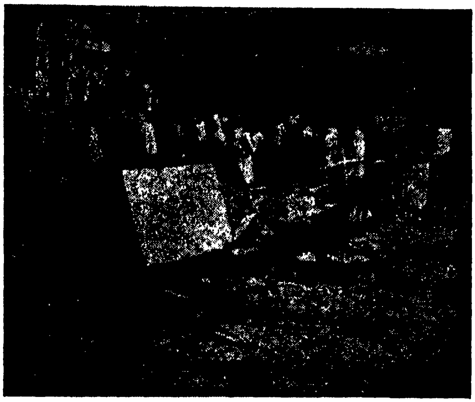
ভারতীয় সমস্যার আপোষ চেষ্টা—

ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও দেশীয় রাজ্য সমস্যার সমাধানের উপায় স্থির করিবার জন্য মহামান্য আগা খাঁ ও ভারতের নরেন্দ্র মণ্ডলের চ্যান্সেলার ভূপালের নবাব গত ২৫শে ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী পুনায় মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। প্রতিদিন গান্ধীজি ২ ঘণ্টা করিয়া এ বিষয়ে কথা বলিয়াছেন। মহামান্য আগা খাঁ ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু। তাঁহার চেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হউক, সকলেই ইহা কামনা করিবে।

গান্ধীজি ও রাজাজী—

মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত সি-রাজা গোপালাচারী মহাত্মা গান্ধীর বৈবাহিক। মাদ্রাজে বর্ত্তমান

বঙ্গাপরিষদ সদস্য নির্ব্বাচনে একদল কংগ্রেসকর্ম্মী রাজাজীর নির্ব্বাচন পছন্দ না করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিল। গান্ধীজি মাদ্রাজে যাইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে এক বিবৃতি প্রকাশ করায় অবস্থা আরও জটিল হয়। এখন সে জন্য রাজাজীকে মাদ্রাজের নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে সরিয়া যাইতে হইয়াছে ও গান্ধীজি শেষ পর্য্যন্ত সে ব্যবস্থায় সম্মতি দিতে বাধ্য হইয়াছেন।



হাঙ্গামার সময় চিত্তরঞ্জন এভেনিউ—গিরীশ পার্কের নিকট ডাষ্টবিন ও অবর্জ্জনার দ্বারা রাস্তা আটক ফটো—তারক দাস

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যা—

দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়গণের সম্বন্ধে সে দেশের গভর্ণমেণ্ট অন্যায় আইনের ব্যবস্থা করায় তাহার প্রতিবাদে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতীয় হাই-কমিশনারকে ফিরাইয়া আনিয়া অর্থনীতির দিক দিয়া তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা হইবে—ভারত গভর্ণমেণ্টের বৈদেশিক বিভাগের সদস্য ডক্টর এন-বি-খারে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভারত স্বাধীনতা লাভ না করা পর্য্যন্ত বিদেশে ভারতীয়গণকে এইরূপ অপমান সহ্য করিতে হইবে—আমরা তাহার প্রতিকারের কোন কঠোর ব্যবস্থাই করিতে পারিব না। ডক্টর খারে এক সময়ে কংগ্রেস নেতা ছিলেন—দেখা যাউক ভারতগভর্ণমেণ্টের উপর জোর দিয়া এ বিষয়ে কি করিতে পারেন।

ডাক ও তার বিভাগে ধর্ম্মঘট—

নিখিল ভারত পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্ম্মীসংঘ সমিতি কর্ত্তৃপক্ষকে নোটীশ দিয়াছেন যে, তাঁহাদের দাবী পূর্ণ করা না হইলে আগামী ২৪শে মার্চ্চ হইতে তাঁহারা সকলে একযোগে ধর্ম্মঘট করিবেন। যে সকল সংঘ পূর্ব্বেই ধর্ম্মঘট করিবে বলিয়া নোটীশ দিয়াছিল তাহাদিগকে ঐ তারিখ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলা হইয়াছে। ইতিমধ্যে যদি কর্ত্তৃপক্ষ দাবী পূরণের ব্যবস্থা না করেন, তবে দেশের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা চিন্তা করিয়াই আমরা শঙ্কিত হইতেছি।



কলিকাতার এক সভায় ক্যাপ্টেন শা নওয়াজকে অভিনন্দন জ্ঞাপন ও শা নওয়াজ কর্ত্তৃক প্রত্যভিনন্দন ফটো—নীরেন ভাদুড়ী

মহাত্মা গান্ধীর প্রবন্ধ—

মহাত্মা গান্ধী হরিজন পত্রে একটি প্রবন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন। আমরা দেশবাসীর চিন্তার জন্য একথা কয়টি উদ্ধৃত করিলাম—"আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্মোহনী শক্তি আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়াছে। নেতাজীর নাম যাদুমন্ত্রবৎ কার্য্য করে। তাঁহার দেশ-প্রেমের তুলনা নাই। তাঁহার সমস্ত কাজের মধ্যে বীরত্ব উদ্ভাসিত রহিয়াছে। তাঁহার লক্ষ্য অতি উচ্চ ছিল। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন। আমি জানি যে তাঁহার কার্য্য ব্যর্থ হইতে বাধ্য। নেতাজী ও তাঁহার সেনাবাহিনী আমাদিগকে আত্মত্যাগ, শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ঐক্য ও নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের এই সদগুণত্রয় নিষ্ঠার সহিত অনুকরণ করিব—কিন্তু ঐরূপ নিষ্ঠার সহিতই আমাদিগকে হিংসা ত্যাগ করিতে হইবে। বিদ্বেষে সকলের মন ভরপুর। ধৈর্য্যহীন স্বদেশ-প্রেমিকরা সুবিধা পাইলেই স্বাধীনতা অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে সাদরে হিংস

উপায়ের সুযোগ গ্রহণ করিবে। আমার মনে হয়, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে এই পথ ভ্রান্ত। কিন্তু যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধৃবৃন্দ সত্য ও অহিংসাকে তাহাদের নীতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, ইহা তাহাদের পক্ষে অধিকতর ভ্রান্তিজনক ও অশোভন।"

মিসেস্ নিকোল্ দেড়শত বৎসরব্যাপী বৃটীশ শাসনের পরও ভারতের জনগণের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া শাসকগণের নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

ব্রহ্ম ও মালয়ে ভারতবাসীর দুর্দ্দশা—

ভারতগভর্ণমেণ্ট ব্রহ্ম ও মালয়ে ভারতবাসীদের অবস্থার



কলিকাতার ব্লাডব্যাঙ্কে পণ্ডিত জহরলালের রক্তদান

ফটো—পান্না সেন

কথা জানিবার জন্য যে বেসরকারী প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিয়াছিলেন শ্রীযুত পি-কোদণ্ড রাও তাহাদের একজন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছেন—মালয়ে ভারতবাসীদের ভাত, কাপড় বা চিকিৎসার ব্যবস্থা কিছুই নাই। ব্রহ্ম-শ্যাম রেলপথ নির্ম্মাণ করিতে যাইয়া যে সকল ভারতীয় শ্রমিক শ্যামদেশে মারা গিয়াছে তাহাদের স্ত্রীপুত্রাদির দুর্দ্দশা বর্ণনাতীত।—ইহার পরও পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে ঐ দেশে যাইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকদিগকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতে দেওয়া হয় না—ইহাই আশ্চর্য্য।

পার্লামেণ্ট প্রতিনিধিদের অভিমত—

বৃটীশ পার্লামেণ্ট যে প্রতিনিধি দলকে ভারতের অবস্থা জানিবার জন্য ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভারত ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ৯ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন। মিঃ নিকোলসন বলিয়াছেন—ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দানের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করা সঙ্গত হইবে না। মেজর ওয়াট বলেন—ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দানের কোন অর্থ হয় না—কারণ জাতিগত সাম্য না থাকিলে উপনিবেশ করা চলে না। মিঃ সোরেনসেন বলেন—ভারতে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা করা চলিবে না—কারণ এখানে খৃষ্টান, ইহুদী, পার্শী, মুসলমান ও হিন্দু সকল জাতিই বাস করে। মিঃ রিচার্ডস্ বলেন—আমি কোন মন্তব্য প্রকাশ করিব না—আমরা বিলাতে যে বিবরণ দাখিল করিব, তাহার উপর নির্ভর করিয়া বৃটীশ মন্ত্রিসভা তাহাদের সিদ্ধান্ত স্থির করিবে।

আসামে নূতন মন্ত্রিসভা—

আসামে ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচনে কংগ্রেস দলের সদস্যসংখ্যা অধিক হওয়ায় কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত গোপীনাথ বরদলুইকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া আসামে মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী ছাড়া নিম্নলিখিত ৬ জন মন্ত্রীনিযুক্ত হইয়াছেন—(১) বসন্তকুমার দাস (২) বিষ্ণুরাম মেধী (৩)

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (৪) রেভারেণ্ড নিকলাস রায় (৫) রামনাথ দাস ও (৬) মিয়াদলর মতলিব মজুমদার। একজন আদিবাসী ও এক জন মুসলমানকে শীঘ্রই পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করা হইবে। গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে আহ্বান করিব। গভর্ণমেণ্ট যেন সে জন্য এখন হইতে সাবধান থাকেন।"—মানুষ কিরূপ নিরুপায় হইলে এরূপ কথা বলিতে পারে, তাহা বুঝিবার শক্তি কি বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের আছে?



চট্টগ্রামবাসীদের মর্ম্মন্তুদ অবস্থা
ফটো—পান্না সেন



চট্টগ্রামের একটি গৃহের ভস্মাবশিষ্ট তৈজসপত্র
ফটো—পান্না সেন

জনগণকে বিদ্রোহে আহ্বান—

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এক জনসভায় বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন "যদি ভারতের খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা খারাপ হয় ও তাহার ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে। জনগণ সরকারী অব্যবস্থা সহ্য করিয়া তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করিবে না। আমিই জনগণকে

বালেশ্বর জেলায় আগষ্ট হাঙ্গামা—

উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের ফলে ৪২ জন লোক নিহত ও ২৪৫ জন আহত হইয়াছিল। দুইটি ছোট থানায় মোট ৩ শত লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। উহার ঠিক পূর্ব্বে বালেশ্বর জেলায় জাপানী আক্রমণের ভয়ে সাইকেল, ফেরীবোট ও অন্যান্য

যানবাহন হস্তগত করা হয়, ছোট পুলগুলি ধ্বংস করা হয় ও সমুদ্রোপকূলের ২০ মাইলের মধ্যে যে চাল ছিল তাহা সরাইয়া লওয়া হয়। ঐ সময়ে বালেশ্বরে এক শ্বেতাঙ্গ পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন ; তিনি এক রাত্রিতে বিবাহ বাড়ীর বাজীর শব্দকে বোমা-পতনের শব্দ মনে করিয়া ধুতি পরিয়া গ্রামে এক গৃহস্থের বাড়ীতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। গভর্ণমেণ্টের পক্ষের এরূপ অবস্থাই আগষ্ট আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষা—

ল্যাণ্ড একুইজিসন আইন অনুসারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলিকাতা জোড়াসাঁকোস্থ পৈতৃক বাসভবন শীঘ্রই নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতির হাতে দেওয়া হইবে। এ বিষয়ে বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর মিঃ কেসী স্মৃতি রক্ষা সমিতিকে আবশ্যক মত সাহায্য করিয়াছেন। সমিতি এপর্য্যন্ত ১৩ লক্ষ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন। এ বিষয়ে



সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের যত্ন ও চেষ্টা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

ভারতে তিন জন মন্ত্রী প্রেরণ—

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী বিলাতে ঘোষণা করা হইয়াছে, ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের সহিত আলোচনার জন্য বৃটীশ মন্ত্রিসভা নিম্নলিখিত ৩ জন মন্ত্রীকে শীঘ্রই ভারতে প্রেরণ করিবেন—(১) ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স (২) বাণিজ্য পরিষদের সভাপতি সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস (৩) নৌসচিব মিঃ আগষ্ট আলেকজাণ্ডার। মার্চ্চমাসের শেষ ভাগে মন্ত্রীরা ভারতে আসিয়া পৌছিবেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে এ বিষয়ে বড়লাট ও ভারত সচিব যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, মন্ত্রীত্রয় তাহা কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা করিবেন। তাঁহারা বড়লাটের শাসন-পরিষদ নূতন করিয়া গঠন করিবেন ও নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য গণপরিষদ গঠন করিবেন। দেখা যাউক, কতদূর কি হয়।

সিন্ধুপ্রদেশে নূতন মন্ত্রিসভা—

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী সিন্ধুপ্রদেশে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে মোট সদস্য সংখ্যা—৬০—তন্মধ্যে ৩৫ মুসলমান। মুসলেমলীগ দলের নির্ব্বাচিত সদস্যের সংখ্যা—২৭ জন। বাকী ৮ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জন জাতীয়তাবাদী ও ৪ জন মিঃ সৈয়দের দলভুক্ত। ৩ জন শ্বেতাঙ্গ, বাকী ২১ জন হিন্দু ও ১ জন শ্রমিক। গভর্ণর বে-আইনি ভাবে শ্বেতাঙ্গদিগকে লীগ দলের সহিত মিলিত করিয়া লীগনেতা দ্বারাই মন্ত্রিসভা গঠন করাইয়াছেন—নিম্নলিখিত ৪ জন মন্ত্রী হইয়াছেন—(১) সার গোলাম হোসেন হিদায়েতুল্লা—প্রধান মন্ত্রী (২) খাঁ বাহাদুর এম-এ-খুরো (৩) মীর গোলাম আলি খাঁ তালপুর ও (৪) পীর এলাহি বকস্। কংগ্রেস ৮

জন মুসলমান ও ১ জন শ্রমিককে লইয়া ৩০ জনে সম্মিলিত দল গঠন করিয়াছিল—গভর্ণর শ্বেতাঙ্গদিগকে সে দলে যোগদান করিতে বলিলে স্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠিত হইতে পারিত। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভাকে স্থায়ী করা সম্ভব হইবে না। ঐ দলের একজন সভাপতি হইলেই ঐ দলের সদস্যসংখ্যা ২৯ ও বিরুদ্ধ দলের সদস্যসংখ্যা ৩০ হইবে। সভাপতির নিরপেক্ষ থাকা উচিত—কিন্তু এখন সর্ব্বদা তাঁহাকে নিজের ১টি ভোট ও সভাপতির অতিরিক্ত ভোট প্রদান করিয়া মন্ত্রিসভাকে বাঁচাইতে হইবে। গভর্ণর এইভাবে সিন্ধুদেশে বেআইনি কার্য্য করিয়া যে লীগ-প্রীতি দেখাইলেন, তাহাই এদেশে ভারত শাসন ব্যাপারে—বিবাদ বাধাইবার নীতি কি না কে জানে।

প্রবাসী বাঙ্গালীর কৃতিত্ব—

শ্রীমান উষানাথ চট্টোপাধ্যায় এ বৎসর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর-অফ-সায়েন্স উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ডক্টর-অফ-ফিলজফি ডিগ্রিও পাইয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একমাত্র তিনি এই দুইটি ডিগ্রিই পাইলেন। উদ্ভিদের শ্বাসক্রিয়ার রাসায়নিক বিশ্লেষণ তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল। তাঁহার গবেষণা লাভ করিয়াছে। তিনি একণে নিউ দিল্লীস্থিত ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ্চের বৈজ্ঞানিক পত্রিকাগুলির অন্যতম সম্পাদক। শ্রীমান উষানাথ এলাহাবাদ প্রবাসী শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র।



শ্রীমান উষানাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রধান মন্ত্রী ইউ-স—

ব্রহ্মদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ইউ-স রেঙ্গুনে প্রত্যাবর্ত্তন করায় জাতীয়তাবাদীদের শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। পার্ল হারবারের পতনের সময় ইউ-স ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং ১৯৪২ সালে জাপানীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের অভিযোগে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া উগাণ্ডায় আটক করিয়াছিলেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন তন্মধ্যে একটি কথা বিশেষ স্মরণযোগ্য—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দিবার নির্দ্দিষ্ট দিন স্থির করিয়া দিতে পারে, তবে বৃটেনই বা ব্রহ্ম সম্পর্কে তাহা করিয়া দিবে না কেন ?

পরলোকে অনাথগোপাল সেন—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কাসিমবাজারের মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী অনাথগোপাল সেন মহাশয় গত ১লা পৌষ অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি মৈমনসিংহ অষ্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন ও প্রথম জীবনে মৈমনসিংহে ওকালতী করেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে ওকালতী ছাড়িয়া দেন। বাঙ্গালা ভাষায় অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার 'টাকার কথা' 'যুদ্ধের দক্ষিণা' 'গান্ধী অর্থনীতি' প্রভৃতি গ্রন্থ সর্ব্বজনসমাদৃত হইয়াছিল।



অধ্যাপক অনাথগোপাল সেন

শিশুশিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী—

মিউজিয়াম হলে একটি শিশুশিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ও পরিষদ-সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের চেষ্টায় উহা সাফল্যমণ্ডিত হয়। মফঃস্বলে সর্ব্বত্র এইরূপ শিক্ষা-প্রচারক প্রদর্শনীর আয়োজন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পরলোকে তারিণীচরণ লাহা—

কলিকাতার সুবিখ্যাত লাহা পরিবারের তারিণীচরণ লাহা গত ৩রা ফেব্রুয়ারী ৬৬ বৎসর বয়সে কলিকাতা ৩৭নং



তারিণীচরণ লাহা

বাদুড় বাগান রোডস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ত্রিপুরা জেলার কাদবা গ্রামে একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ও কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশু চিকিৎসা বিভাগে ২৫ হাজার টাকা দান করেন। তিনি তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহারের জন্য পল্লীতে সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন।

ঢাকুরিয়া রামকৃষ্ণ আশ্রম—

বেলুড় মঠের স্বামী নির্লেপানন্দজীর চেষ্টায় কলিকাতার উপকণ্ঠে ঢাকুরিয়া গ্রামে একটি রামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। আশ্রমে দাতব্য চিকিৎসালয়, দরিদ্রভাণ্ডার ও সাধারণ পাঠাগার আছে। ঐ সঙ্গে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও কুটীর শিল্প শিক্ষাদানের চেষ্টা চলিতেছে। সে জন্য পরিচালকগণ সর্ব্বসাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

নিখিল বঙ্গ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা—

হুগলী জেলার উত্তরপাড়া হরিভবনে হরিনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে সম্প্রতি উক্ত প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হইয়াছে। নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় সভায় পৌরহিত্য করেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যাল, শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত সুমথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীযুক্ত বিমল দত্ত, শ্রীযুক্ত কালীধন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ বিচারকের কার্য্য করেন। সভারম্ভে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত অমরনাথ মুখোপাধ্যায় সুস্বাগত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। বিচারকগণের বিচারে কুমারী উমা মুখার্জ্জি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী বিবেচিত হন এবং রায় বাহাদুর সত্যকিঙ্কর সেন প্রদত্ত স্বর্ণখচিত রৌপ্য পদক পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। বিভিন্ন বিভাগে প্রথম হইতে তৃতীয় স্থানাধিকারীকে রৌপ্য সম্পুট, পদক, মানপত্র এবং পুস্তক পারিতোষিক দেওয়া হয়।

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে দান—

খ্যাতনামা ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় (১৭নং হরিশ মুখার্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা) যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে তাঁহার পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে চল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী সতী দেবী চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়।

পরলোকে অমরেন্দ্রনাথ—

সুসাহিত্যিক অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল সম্প্রতি ৪৩ বৎসর বয়সে টাইফয়েডে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসের এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন এবং বি-এল পাশ করিয়া সরকারী হিসাব বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। বহু মাসিক পত্রে তিনি গল্প লিখিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুলীলা, গ্রহচক্র, শোণিতাঞ্জলি, পারুল ইত্যাদি কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সুখচরে রাজবন্দী সম্বর্দ্ধনা—

গত ২৭শে জানুয়ারী রবিবার সন্ধ্যায় ২৪ পরগণা সুখচরে স্থানীয় বিভিন্ন সংঘের উদ্যোগে এক বৃহৎ জনসভায় সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দী অধ্যাপক শ্রীযুত সাতকড়ি মিত্র মহাশয়কে



শুকচরে রাজবন্দী সম্বর্দ্ধনা

সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। সভায় শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান শ্রীযুত সুশীলকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় কর্ণেল লক্ষ্মীস্বামীনাথম্—

আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ঝান্সীর রাণী সৈন্যদলের অধ্যক্ষা কুমারী লক্ষ্মী স্বামীনাথম্‌কে বিমানযোগে রেঙ্গুন হইতে কলিকাতায় আনিয়া গত ৩রা মার্চ্চ রবিবার বিকালে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তিনি দমদম বিমান ঘাঁটি হইতে সংবাদ দিয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বাটীতে একরাত্রি বাস করেন ও পরদিন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সহিত সাক্ষাতের পর দ্বিপ্রহরে বিমানযোগে দিল্লী চলিয়া গিয়াছেন। জনসাধারণ বা সংবাদপত্রগুলিকে কোন সংবাদ দেওয়া হয় নাই—কাজেই তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনার কোন ব্যবস্থাও হয় নাই।

কলিকাতায় হাঙ্গামা—

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী সোমবার সন্ধ্যা হইতে ১৫ই শুক্রবার পর্য্যন্ত এবং পুনরায় গত ২১, ২২ ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী ছাত্রদের শোভাযাত্রা প্রভৃতি লইয়া কলিকাতায় হাঙ্গামা ও পুলিসের গুলীবর্ষণ হইয়া গিয়াছে। কয়দিন ট্রাম বাস প্রভৃতি এবং দোকানপাট বন্ধ ছিল। বহু নিরীহ লোক গুলীতে হতাহত হইয়াছে। ২৩শে ফেব্রুয়ারী শনিবার বি-এ রেলের কর্ম্মীরা হরতাল করায় উক্ত রেলের ট্রেণ চলাচল বন্ধ ছিল।

শ্রীযুত মাণিক ভট্টাচার্য্য সম্বর্দ্ধনা—

গত ১১ই ফেব্রুয়ারি সোমবার সন্ধ্যায় কলিকাতা সাহিত্য বাসরের উদ্যোগে শ্রীযুত সুধাংশু কুমার রায় চৌধুরীর আহ্বানে ৩৩।১ মদন মিত্র লেনে এক সভায় খ্যাতনামা কথাশিল্পী শ্রীযুত মাণিক ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। মাণিক বাবু গয়া জেলার ঔরঙ্গাবাদে প্রধান



প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য্যের সম্বর্দ্ধনায় সমবেত সুধীবৃন্দ

ফটো—নীরেন ভাদুড়ী

শিক্ষকের কার্য্য করেন—কয় দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কবি শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং শ্রীযুত সরোজকুমার রায়চৌধুরী, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মাণিক বাবুর রচিত গ্রন্থ সমূহের আলোচনা করিয়াছিলেন।

শান্তিপুরে ভারতমাতার পূজা—

গত ২৬শে জানুয়ারী হইতে তিনদিন শান্তিপুরে (নদীয়া) যুবকগণের উদ্যোগে ভারতমাতার পূজা হইয়াছিল। পূজার



শান্তিপুরে ভারতমাতার পূজা ফটো—কামাক্ষ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

পর চতুর্থ দিনে প্রতিমা লইয়া বিরাট মিছিল বাহির হয়। ভারতের স্বাধীনতা কামনা করিয়া দেবীর অর্চনা এই নূতন। শান্তিপুর দত্তপাড়ার শ্রীযুক্ত কামাখ্যা ভট্টাচার্য্য এ কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন।

ইনষ্টিটিউট অফ আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রী—

ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যসংক্রান্ত পণ্যসম্ভারকে চারুশিল্পের সাহায্যে জনসাধারণের সহিত পরিচয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে গঠিত এই বিশিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক অধিবেশন বাঙ্গালার গবর্ণর-পত্নী মিসেস কেসীর নেতৃত্বে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমানের প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তু প্রস্তুত করিয়াই নিরস্ত থাকিলে চলিবে না—এমনভাবে সেগুলিকে জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা সহজেই আকৃষ্ট হয়। ইহার একমাত্র উপায় হইতেছে সুকৌশলে সততার ভিত্তিতে মনোজ্ঞ চিত্রকলাদির সাহায্যে প্রতি দ্রব্যটির বিশিষ্ট গুণ প্রকাশ করিয়া তোলা। এ সম্পর্কে এই প্রতিষ্ঠানটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইঁহাদেরই গঠনমূলক উন্নত পরিকল্পনায় ব্যবহারিক বাণিজ্যশিল্পের সহিত প্রচারমূলক চারুশিল্পের এক মধুর সমন্বয় হইয়াছে।



গত হাঙ্গামায় বালিগঞ্জ ষ্টেশনে একখানি অগ্নিদগ্ধ ট্রেনের অবস্থা

ফটো—পান্না সেন

দক্ষিণ শ্রীপুর সাহিত্য সম্মেলন—

গত ৮ই ও ৯ই পৌষ খুলনা জেলার উক্ত সম্মেলন কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবি শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্তের পৌরহিত্যে সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উভয় দিনই কলিকাতা ও জেলার বহু স্থান হইতে সাহিত্যিক, সাহিত্যরসিক, শিক্ষাব্রতী ও কৃষি-শিল্পানুরাগীদের সমাগম হইয়াছিল। সঙ্গীতসুধাকর শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক 'বন্দেমাতরম্' এবং 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' গান দুইটি উভয় দিন গীত হইবার পর সভার কার্য্যারম্ভ হয়। বিশাল সভামণ্ডপের চারিপার্শ্বে সুসজ্জিত হলের মধ্যে কৃষিশিল্পপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকে। কৃষিজাত কতকগুলি ফসল এবং শিল্পসংক্রান্ত নানাবিধ চিত্তাকর্ষক বস্তু দর্শকগণের কৌতূহল ও বিস্ময় উদ্রিক্ত করে। বিভিন্ন পল্লীর গৃহস্থ মহিলাদের শিল্প-প্রতিযোগিতায় যোগদান এবং অনেকগুলি অনুন্নত শ্রেণীর মহিলার এ ব্যাপারে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পল্লী মহিলাদের শিল্পপ্রীতি ও তাহাতে কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সাহিত্য সম্মেলনেও 'রচনা'

প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সাহিত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শ্রীমতী তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায়ের রচনা সর্বাধিক প্রশংসা পায়। শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরীর শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে সরস প্রবন্ধ পাঠ ও উদ্বোধনী বক্তৃতার পর স্থানীয় শিক্ষাব্রতী নির্মলচন্দ্র বসু, দেবনাথ চক্রবর্ত্তী, অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী বিভাষিণী দেবী, সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, পরিতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির বক্তৃতা ও প্রবন্ধ এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সভাপতি শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্তের অভিভাষণ বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়।

জলন্ধরে বাঙ্গালীদের বাণীবন্দনা—

বিগত ২৩শে মাঘ শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দুশেখর দত্ত ও শ্রীযুক্ত ধনগোপাল গাঙ্গুলীর পরিচালনায় পাঞ্জাব জলন্ধর প্রবাসী বাঙ্গালীদের বসন্তোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও পরিকল্পনা করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত বাদল ধর।

সন্ধ্যায় আরতি ও জলসার আয়োজন করা হইয়াছিল। নৃত্যশিল্পী ললিতকুমারের নৃত্য, প্রভাত ঘোষের কমিক, সবিতা গুপ্তা, বীণা দেবী ও অনন্ত বড়ালের সঙ্গীত এবং মাখন দাসের তার-সানাই অনুষ্ঠানকে সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিল।

কিরণশশী সেবায়তন—

গত ১৭ই মার্চ্চ সন্ধ্যায় কলিকাতা বীডন ষ্ট্রীটের দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডারের পরিচালিত কিরণশশী সেবায়তনের নূতন গৃহের ভিত্তি স্থাপন উৎসব ১০৫।২ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে বিচারপতি শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাশ মহাশয়ের পৌরহিত্যে সম্পাদিত হইয়াছে। বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পড়িবে তন্মধ্যে মাত্র ৫০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ কাগজব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত্ত এখন বাকী টাকা দিয়া বাড়ীটি করিয়া দিবেন—পরে ঋণ শোধ করা হইবে। যক্ষারোগ নিবারণ ও তাহার চিকিৎসার জন্য এই সেবায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সভায় ঘোষণা করা হয় যে, কাঁকুড়গাছিতে আর একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ পাল তাঁহার পত্নীর নামে ১ বিঘা ১৬ কাঠা জমী ও নগদ ৫ হাজার টাকা দিয়াছেন ও মাসিক ৫০ টাকা সাহায্য করিবেন।

পরলোকে সুশীলচন্দ্র সেন—

কলিকাতার খ্যাতনামা এটর্ণী, কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার সুশীলচন্দ্র সেন মহাশয় গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী



জলন্ধর প্রবাসী বাঙ্গালীদের বাণীবন্দনা

মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। তিনি পাঠ্যাবস্থা হইতেই অপূর্ব্ব মেধা ও ধীশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কর্ম্মজীবনেও তিনি অসামান্য সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যরূপে ও ভারত সরকারের সলিসিটাররূপে তাঁহার কার্য্য দেশবাসী চিরদিন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। তাঁহার পিতা সতীশচন্দ্র সেন মহাশয়ও সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী ছিলেন এবং সহরের সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। সুশীলচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে পরোপ-

কারী, সহৃদয় ও আচারনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার মত কৃতী, উদীয়মান ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হইলে দেশ প্রকৃতই লাভবান

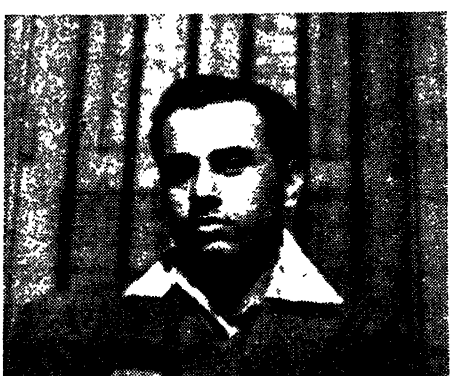


সুশীল সেন

হইত। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা জানি না। শ্রীভগবান তাঁহাদের মনে শান্তি দান করুন।

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়—

ভারতবর্ষের লেখক ও বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতা



শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। সাংবাদিক মহলেও তিনি সুপরিচিত। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ অধুনা সকল শ্রেণীর পাঠকের নিকট আদৃত হইয়া থাকে।

দিল্লীর বাণী বন্দনা—

নব-দিল্লীর মিণ্টো রোডস্থ ব্যায়াম সমিতির সভ্যগণ শ্রীযুক্ত অমিয়লাল দত্তের সুপরিচালনায় বাণী বন্দনার সহিত



নূতন দিল্লীর মিণ্টো রোড ব্যায়াম সমিতির বাণীপূজা

ব্যায়াম প্রদর্শনী ও খেলাধূলা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য, খগেন মিত্র, নান্দু মিত্র, সত্য দাস, মণি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনুষ্ঠানকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছিলেন।

নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর রাধাবিনোদ পাল মহাশয়ের কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২ই মার্চ্চ হইতে নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ইতিমধ্যে বঙ্গীয়

ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ও বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের অন্যতম মন্ত্রীরূপে কার্য্যক্ষমতার পরিচয় দান করিয়াছেন। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। তিনি



শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্গত পুরুষসিংহ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় জামাতা। তিনি শিক্ষাব্রতী—কাজেই তাঁহার নিয়োগে দেশবাসী সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদ—

রায় বাহাদুর শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৫ বৎসরের জন্য ১লা মার্চ্চ হইতে ঐ পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। শ্রীকুমার বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। খগেন্দ্রবাবুকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সম্মানিতঅধ্যাপক' পদ দান করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহাকে সংশ্লিষ্ট রাখারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুত প্রিয়দারঞ্জন রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা তিনজনই লেখকরূপে 'ভারতবর্ষে'র সহিত সংশ্লিষ্ট।



ডক্টর শ্রীযুত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়

কবি নবীনচন্দ্র শতবার্ষিক—

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে তাঁহার জন্মভূমি চট্টগ্রাম জেলার নোয়াপাড়া গ্রামে কয়দিন ধরিয়া বিপুল উৎসব হইয়া গিয়াছে। মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ উৎসবে পৌরোহিত্য করেন এবং শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা যোগদান করেন। কলিকাতা সিনেট হলেও সার যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠান হয়। সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষ এক বৎসর ধরিয়া সহরে ও সহরতলীতে নবীনচন্দ্র স্মৃতি-উৎসব করিবেন—গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার মহাবোধী সোসাইটী হলে তাঁহাদের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে ঐ সভায় রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র সভাপতি ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য্য প্রধান অতিথি হইয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র জাতীয়তার কবি—ভক্ত কবি—তাঁহার কাব্য যত অধিক আলোচিত হইবে, দেশ ততই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

রবীন্দ্র ভাণ্ডারে সাহায্য—

রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারের সাহায্যকল্পে জব্বলপুরে রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে রায় বাহাদুর পি-সি-বসুর সভাপতিত্বে স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ কর্ত্তৃক নানাবিধ নৃত্য ও গীতাভিনয় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা হেনা হালদার ও শ্রীদুর্গাদাস বকসীর পরিচালনায় 'শাপমোচন', "পল্লীর মায়া ও যন্ত্রের ডাক" নৃত্যাভিনয় ও তৎসহ নানাবিধ প্রাচ্যনৃত্য ও

রবীন্দ্রনাথের "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" অভিনয় সকলের প্রশংসা লাভ করিয়াছে। শ্রীশিবসাধন চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায়

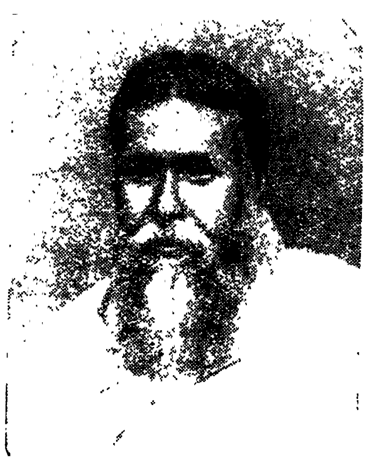


জব্বলপুর রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি

'অর্কেষ্ট্রা' ও কুমারী সর্ব্বাণী সিংহের ও কুমারী ছায়া দাশ-গুপ্তার রবীন্দ্র সঙ্গীত অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। রবীন্দ্র-স্মৃতি ভাণ্ডারে ১২৫৲ টাকা প্রেরিত হইয়াছে।

পরলোকে দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী—

পাবনার খ্যাতনামা উকীল দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি ৮৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৮৫ সালে



দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী

এম-এ পাশ করিয়া তিনি মৈমনসিংহ সিটি কলিজিয়েট স্কুলে কিছুকাল প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পরে উকীল হইয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। পাবনা জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর মধ্য দিয়া তিনি বহু বৎসর জনসেবা করিয়াছিলেন।

কুমারী চিত্রা সেনগুপ্ত—

কলিকাতা বৌবাজারের শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান গত ১০ বৎসর ধরিয়া পাড়ার মেয়েদের অন্যান্য খেলার সহিত



কুমারী চিত্রা সেনগুপ্ত

সাইকেল-চড়া শিক্ষা দিয়া থাকেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্তের কন্যা কুমারী চিত্রা ঐ প্রতিষ্ঠানের সাইকেল প্রতিযোগিতায় কয়েকবার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। টালা পার্কে সাইকেল প্রতিযোগিতায়ও চিত্রা চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করে। তাহার দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়।

বাঁকুড়া কেন্দুয়াডিহি আশ্রম—

ভারত সেবাশ্রম সংঘের কর্ম্মীরা বাঁকুড়া জেলার কেন্দুয়াডিহি গ্রামে সম্প্রতি এক নূতন হিন্দু-মিলন-মন্দির আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে ধর্ম্মপ্রচার, জনসেবা, পার্ব্বত্যজাতিদের উন্নতি বিধান, উপজাতিগুলির সহিত হিন্দু সমাজের মিলন সাধন প্রভৃতি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানগুলিতে ঔষধ, পথ্য, দুগ্ধ ও বস্ত্রাদি বিতরণ করা হইতেছে। চাউল বিতরণেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। শুধু বাঁকুড়া জেলায় ৪০টি মিলন মন্দির ও ৪৫টি রক্ষীদলের মারফত কাজ হইতেছে।

শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সেন—

বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিটিকাল ওয়ার্কস্ লিমিটেডের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সেন মহাশয়

ইণ্ডিয়ান কেমিকেল ম্যানুফাক্চারার্স দলের প্রতিনিধিরূপে সম্প্রতি ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যাইয়া সে সকল দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমাদের



শ্রীযুক্ত এস-পি-সেন

বিশ্বাস, তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা তিনি দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন।

শ্রীযুত দিলীপকুমার রায়—

সাহিত্যিক ও সঙ্গীত কুশলী শ্রীযুত দিলীপকুমার রায়ের ৫০ তম জন্মদিবস উপলক্ষে গত ২৫শে মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যায় কলিকাতা কালীঘাট 'কালিকা থিয়েটারে' শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হইয়াগিয়াছে। দিলীপকুমারের পিতা স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারত আমার' সঙ্গীতের দ্বারা সভার উদ্বোধন হইয়াছিল। দিলীপকুমার নিজে উহা গান করেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র দিলীপের মুখে ঐ গান শুনিতে ভালবাসিতেন। দেশবাসীর পক্ষ হইতে দিলীপকুমারকে ২৩ হাজার টাকার একটি তোড়া দেওয়া হয়। শ্রীযুত নির্মলেন্দু লাহিড়ী কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' কবিতা ও অধ্যাপক সোমনাথ মৈত্র কর্ত্তৃক দিলীপকুমারের 'পরম প্রার্থনা' কবিতা আবৃত্তি হইয়াছিল। দিলীপকুমার সভায় ঘোষণা করেন যে তাঁহার বিশ্বাস, সুভাষচন্দ্র জীবিত আছেন। অভিনন্দনের উত্তরে বক্তৃতা করার সময়ও দিলীপকুমার বার বার সুভাষচন্দ্রের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। সভাপতি শরৎচন্দ্র বসু তাঁহার ভাষণে বলেন—শ্রীঅরবিন্দের আশীর্ব্বাদ যে দিলীপকুমারের উপর পড়িয়াছে তাহা দিলীপকুমারের বর্ত্তমান চেহারা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের বাঙ্গালা বাঁচিয়া আছে। দিলীপকুমারের বাঙ্গালাও বাঁচিয়া থাকিবে। ঐ উৎসবের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে লালগোলার রাজারাও শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় যে ভাষণ দেন, তাহাতে বলেন—"কাব্যে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে দিলীপ বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে



শ্রীদিলীপকুমার রায়

প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বিশ্বমানবতার দুয়ারে তার উদার উজ্জ্বল রূপ চির ভাস্বর হয়ে থাকবে—এ আমাদের গৌরবের ও গর্ব্বের কথা। মনোময় চিৎস্বরূপের সন্ধানী উদাসী দিলীপকে—শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের চরণ তলে সমাসীন ধ্যানগম্ভীর পূজারী দিলীপকে আমরা ভালবাসি। আপন সাধনায় তুমি যে অনন্ত আলোকের ইঙ্গিত পেয়েছ, তোমার স্নেহবন্দী, অনুরাগীজনকে তুমি সেই আলোর সন্ধান দাও।"

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

১৯৪৬-৪৭ সালের কেন্দ্রীয়-বাজেট

যুদ্ধের মধ্যে ভারতের অর্থব্যবস্থাকে সকল দিক হইতে বিপর্য্যস্ত করিয়া ভারতসরকার যুদ্ধের খরচ চালাইয়াছিলেন। এই সময় পৃথিবীর সকল সভ্যদেশ যুদ্ধোত্তর সমস্যাগুলির উপর বিশেষ মনোযোগ দিলেও ভারত-সরকারের কিন্তু এদিকে তেমন কোন আগ্রহ দেখা যায় নাই। ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে যুদ্ধের দরুণ দৈনিক দেড় কোটি টাকা সংগ্রহের প্রশ্নই যে এই নিশ্চেষ্টতার মূল তাহা বলা বাহুল্য। তবে ভারতের আর্থিক স্বার্থ সম্পর্কে ভারতসরকারের চিরাচরিত ঔদাসীন্যও ইহার অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের বাজেট বক্তৃতায় অর্থসদস্য স্যার জেরেমী রেইসম্যান স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে,—'Post-war development must mean and continue to mean Post-war development and by no magic or optimism can be made to mean wartime development' এবং এইরূপ নিরুৎসাহজনক বাণী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাজেটে তিনি যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও পুনঃসংস্থাপনের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন ব্যয়বরাদ্দ করেন নাই।

স্যার জেরেমীর উত্তরাধিকারী হিসাবে স্যার আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস ১৯৪৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, কাজেই স্যার আর্চিবল্ড এই বৎসরের বাজেটে যুদ্ধোত্তর সমস্যা সমাধানের কোন ব্যবস্থার সন্ধান না পাইলেও তাঁহাকে ১৯৪৫-৪৬ সালের আর্থিক বৎসরের ৭ মাস যুদ্ধোত্তর সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। গত ছয় মাস যা হোক করিয়া জোড়াতালি দিয়া চলিয়াছে; এবার নূতন বাজেট প্রস্তুত করিতে বসিয়া স্যার আর্চিবল্ডকে বাধ্য হইয়া কতকগুলি যুদ্ধোত্তর সমস্যা লইয়া আলোচনা করিতে হইয়াছে।

অর্থসদস্য স্যার আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪৬-৪৭ সালের প্রাথমিক বাজেট পেশ করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে ১৯৪৫-৪৬ সালের সংশোধিত বাজেটও পরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত হইয়াছে। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে ১৯৪৫-৪৬ সালের প্রাথমিক বাজেট পেশ করিবার সময় আয় ধরা হইয়াছিল ৩৫৩ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ধরা হইয়াছিল ৫১৭ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা, সুতরাং ১৬৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিবে অনুমান করা হইয়াছিল। বাজেট বৎসর সুরু হইবার মাত্র ৫মাস পরেই যুদ্ধ শেষ হয়, সুতরাং এই বৎসর অনুমিত খরচ অপেক্ষা অনেক কম খরচ হওয়া উচিত ছিল। ১৯৪৫-৪৬ সালের সংশোধিত বাজেটে দেখা যায়, প্রাথমিক বাজেটে অনুমিত ৩৯৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার স্থানে ১৯৪৫-৪৬ সালে ৩৭৬ কোটি টাকার মত সামরিক বিভাগের জন্য খরচ অনুমান করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সাত মাস যুদ্ধ চালাইতে না হওয়া সত্ত্বেও এই শতকরা মাত্র ৫ভাগ ব্যয় হ্রাস কর্ত্তৃপক্ষের দিক হইতে খুব কৃতিত্বের কথা নয়। সংশোধিত বাজেটে এবৎসরের ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে ১৪৪ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। অর্থসদস্য ১৯৪৬-৪৭ সালের যে প্রাথমিক বাজেট পেশ করিয়াছেন তাহাতে আয় ও ব্যয় যথাক্রমে ৩০৭ কোটি টাকা ও ৩৫৫ কোটি টাকা অনুমান করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, এই বৎসর ৪৮ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। এবারের ব্যয়ের মধ্যে ২৪৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা সামরিক বিভাগের ব্যয় ধরা হইয়াছে। আমরা যতদূর জানি, ভারতসরকার চলতি-আর্থিক বৎসরের মধ্যেই অস্থায়ী লোকজনদের অধিকাংশকে কর্মচ্যুত করিয়া ব্যয়ভার হ্রাস করিতে দৃঢ়সংকল্প, এ অবস্থায় সামরিক খাতে ব্যয়ভার এত বেশী করিয়া ধরা হইল কেন? যুদ্ধের আগে ভারতের সামরিক বিভাগের ব্যয় ছিল গড়ে ৪৬ কোটি টাকা, এই ব্যয়কেই অনেকে বাহুল্য মনে করিতেন; এবার যুদ্ধ থামিবার এক বৎসর পরে যুদ্ধের আগের তুলনায় ৬গুণ টাকা সামরিক বিভাগের জন্য বরাদ্দ করার সঙ্গত কারণ কি? ভারতের দুরবস্থা সর্ব্বজনবিদিত, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের চাপে ভারতবর্ষ নিঃস্ব এবং ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, এখন ভারতের স্কন্ধ হইতে সামরিক ব্যয়ের এই পর্ব্বত অন্ততঃ আরও কতকটা অপসারণ করা ভারতসরকারের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল বলিয়াই আমরা মনে করি। তাছাড়া আমাদের মনে হয় সামরিক বিভাগের প্রতি এই অবাঞ্ছিত সরকারী অতি-দৃষ্টি ভারতের অসামরিক স্বার্থ বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। যুদ্ধাবসানে জাতীয় পুনর্গঠনের বহু সমস্যা দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের মধ্যে এদেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিকে সরকার মোটেই নজর দেন নাই, এই সকল বিষয়ে বাড়তি মনোযোগ এখন অত্যাবশ্যক। এ অবস্থায় ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে ২৪৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা সামরিক ব্যয়বরাদ্দ করিয়া মাত্র ১১১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা অসামরিক ব্যয়বরাদ্দ করা সঙ্গত হইয়াছে কি?

পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থসদস্য স্যার জেরেমী রেইসম্যানের ন্যায় স্যার আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস্‌ও ঋণসংগ্রহ করিয়াই বাজেটের ঘাটতি পূরণ করিবার সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য ভারতের সাধারণ বাজারের উপর হইতে ফাঁপাই টাকার জুলুম বন্ধ করিতে মুদ্রাসঙ্কোচের বিশেষ আবশ্যকতা আছে এবং সে হিসাবে অর্থসদস্যের এই ঋণপত্র বিক্রয়নীতি কতকটা ফলপ্রসূ হইবে বলিয়াই মনে হয়। তবে ইহার আর একটি দিক আছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া হইতে ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ভারত-সরকার ঋণ সংগ্রহ করিয়াছেন ১১৭৮ কোটি টাকার। এই ঋণের উপর সুদ হিসাবে কয়েক কোটি টাকা প্রতি বৎসর অবশ্যই দিতে হইবে। ইহার উপর নূতন ঋণপত্র বিক্রয় করিলে সরকারকে নূতন আর্থিক

দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে পুনর্গঠনের পক্ষে এই দায়িত্ব অবশ্যই প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে। কিছুদিনের মধ্যেই ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার বিশেষ সম্ভাবনা আছে, গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার ভার-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় গভর্ণমেণ্টকে ঋণ পরিশোধের দায়িত্বও গ্রহণ করিতে হইবে। সেদিক হইতে ভারতে সরকারী ঋণবৃদ্ধির পরিকল্পনা দেশবাসীর নিকট অস্বস্তিকর বোধ হওয়া স্বাভাবিক।

স্যার আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস বর্ত্তমানে এম্পায়ার ডলার পুলে ভারতের অংশ গ্রহণের নীতি চালু রাখিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছেন। সকলেই জানেন, এই পুলের কল্যাণে সাম্রাজ্যিক দেশগুলির উদ্বৃত্ত ডলার সম্পদ স্বদেশের কাজে লাগাইয়া ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের সময় ব্রিটেনের অর্থ-নীতিক ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছিলেন এবং ইহারই ফলে মার্কিন পণ্যে বঞ্চিত হইয়া ভারতাদি দেশ যুদ্ধের মধ্যে বহু দুঃখভোগ করিয়াছে। এই ডলার পুল অন্ততঃ ভারতের দিক হইতে কল্যাণকর নহে, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। অর্থসদস্য বলিয়াছেন, এবার ভারতের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের যন্ত্রপাতি ষ্টার্লিং এলাকার বাহির হইতে কিনিবার জন্য ২ কোটি ডলার বা ৬ কোটির কিছু বেশী টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ভারতের পুনর্গঠনের পক্ষে মার্কিন যন্ত্রাদির প্রয়োজন এখন অসামান্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানী ক্ষমতাও প্রচুর, সুতরাং এখন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যন্ত্র আমদানীর জন্য মাত্র ৬ কোটি টাকার সমপরিমাণ ডলার বরাদ্দ আমরা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করি।

অর্থসদস্য তাঁহার এবারের বাজেট বক্তৃতায় ১৯৪৬-৪৭ সালের যুদ্ধকালীন কয়েকটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখার কথা বলিয়াছেন। ভারতের সরকারী বিভাগে দুর্নীতির অন্ত নাই, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য যদিও কল্যাণকর হয় তথাপি তদ্বারা দেশবাসী আশানুরূপ উপকৃত হয় নাই। বিশেষ করিয়া শিল্পসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণাদি ভারতের যুদ্ধকালীন সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখার উপর জোর দেওয়া অর্থসদস্যের খুব সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। অর্থসদস্য বলিয়াছেন, পুনর্গঠন কার্য্যে সাহায্য করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এ বৎসর প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অর্থ সাহায্য করিবেন এবং কেন্দ্রীয়-সরকার-স্বয়ং রেল উন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন জনহিতকর পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবেন। তাছাড়া ভারতীয় শিল্পগুলিকে দুর্দ্দিনে সাহায্য করিবার জন্য তিনি একটি ন্যাশনাল ইনভেষ্টমেণ্ট বোর্ড বা জাতীয় অর্থ-ভাণ্ডার স্থাপনের কথা বলিয়াছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, এ সকল পরিকল্পনার গুরুত্ব এবং মূল্য অসাধারণ। কিন্তু ভারতের স্বার্থ সম্বন্ধে ভারতসরকারের মনোভাব আমাদের অজ্ঞাত নহে বলিয়াই এসব আশ্বাসবাণীর উপর আস্থা স্থাপন করা আমাদের পক্ষে সত্যই কঠিন। কথা অনুসারে লোকদেখানোভাবে কাজ আরম্ভ হইলেও কর্ত্তৃপক্ষীয় চক্রান্তে তদ্বারা শেষ অবধি ভারতবাসীর সত্যকার মঙ্গল কতটা হইবে সে সম্বন্ধে আমাদের গভীর সন্দেহ আছে।

এবারের বাজেটে অর্থসদস্য অতিরিক্ত মুনাফাকর বাতিল করিয়া দিয়াছেন এবং আয়করের নিম্নস্তরের করের হার সামান্য হ্রাস করিয়াছেন। এই কর হ্রাসের জন্য ১৯৪৫-৪৬ সালের স্থলে ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারত-সরকারের ৭০ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা আয় কম হইবে। বলা বাহুল্য, অতিরিক্ত আয়কর একান্তভাবে যুদ্ধকালীন কর এবং এখন ইহা বাতিল হওয়াই স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত আয়কর তলার দিকে কিছুটা হ্রাস পাওয়ায় মধ্যবিত্ত দেশবাসীর উপর চাপ কতকটা কমিবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতসরকার শিল্প সম্পর্কিত উদারনীতি গ্রহণ করিলে অতিরিক্ত মুনাফা-কর বাতিলের ফলে ভারতে শিল্প সম্প্রসারণের আরও সুযোগ আসিত, কিন্তু এদিক হইতে তাঁহারা আগ্রহশীল না হওয়ায় অতিরিক্ত মুনাফাকর বাতিল হওয়ার জন্য উদ্বৃত্ত টাকা শিল্পপতিগণ সামান্য সুদে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিতে বা সরকারী ঋণপত্রে খাটাইতে বাধ্য হইবেন। যুদ্ধ শেষ হইলেও আমদানী রপ্তানী ব্যবস্থা এখনও যুদ্ধের সময়ের মতই চলিতেছে, এখনও এদেশে শিল্প সংগঠনের সুযোগ আছে যথেষ্ট; আমাদের মনে হয় ভারতসরকার এ বিষয়ে অবহিত হইলে আসন্ন বেকার সমস্যার মুখে তাঁহারা ভারতের বহু কল্যাণ করিতে পারিতেন।

অর্থসদস্য এ বৎসর সাধারণের ব্যবহার্য্য কয়েকটি জিনিষের উপর নির্দ্ধারিত করের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। পেট্রোলের উপর গ্যালন পিছু ১৫ আনা হইতে ১২ আনা ডিউটি বসাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রতি গ্যালন কেরোসিনের উপর সাড়ে চারি আনার স্থলে এ বৎসর ৩ আনা ৯ পাই হিসাবে ডিউটি বসাইবার কথা বলা হইয়াছে। এই দুইখাতে গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর ভারতসরকারের ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আয় হ্রাস পাইতে পারে। প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, এ বৎসর আমদানী সুপারীর উপর ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি করিয়া পাউণ্ড পিছু সাড়ে পাঁচ আনা করা হইবে। মোট কথা বাজেটে নানাবিধ কর হ্রাস বৃদ্ধির যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে কার্য্যতঃ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল সম্প্রদায় উপকৃত হইবেন, কিন্তু দরিদ্র দেশবাসীর তজ্জন্য বিশেষ উপকার হইবে বলিয়া মনে হয় না। শিল্পাদি সম্প্রসারণের ব্যাপারে অর্থসদস্যের লক্ষণীয় ঔদাসীন্য আসন্ন বেকার সমস্যার চিন্তায় আকুল ভারতবর্ষের আশা ভঙ্গ করিয়াছে বলা চলে।

কেন্দ্রীয় বাজেটে কলকারখানার জন্য আমদানী নূতন ও পুরাতন যন্ত্রপাতির উপর এ বৎসর অপেক্ষাকৃত কম কর নির্দ্ধারিত হইবার কথা ঘোষণা কর হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির বিবেচনায় এই নীতি বিশেষ যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

অর্থসদস্য স্যার আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস জানাইয়াছেন যে, ভারতের করনীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানাদির জন্য শীঘ্রই একটি কর-তদন্ত কমিটি নিযুক্ত হইবেন। বাজেটে যুদ্ধকালীন করহারের বিশেষ পরিবর্ত্তন না দেখিয়া যাঁহারা দুঃখিত হইয়াছেন, এই ঘোষণায় তাঁহাদের কতকটা আশ্বস্ত হওয়া স্বাভাবিক। তবে এ কথা ঠিক যে, ভারতের সরকারী কমিটি কমিশনের ইতিহাস যাহারা জানেন, তাঁহারা এই কমিটির পরামর্শ কার্য্যকরী না হওয়া পর্য্যন্ত শুধু কমিটি নিয়োগের প্রস্তাবেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না।

ভারতের সমস্ত যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনই ব্রিটেনের নিকট ভারতের পাওনা ১৮ শত কোটি টাকার উপর নির্ভর করিতেছে। অর্থসদস্য এই পাওনা আদায় সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট কোন প্রতিশ্রুতি না দেওয়ায় আমরা দুঃখিত

হইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতের পাওনা আদায়ের ব্যাপারে কথাবার্ত্তা চালাইবার সম্পূর্ণ অধিকার ভারতেরই থাকিবে। এই স্বাধীনতার বাস্তবমূল্য বর্ত্তমান সময়ে সত্যই কতখানি সে বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ আছে। ভারতের সর্ব্বস্বত্যাগের বিনিময়ে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডন শাখায় সঞ্চিত ১৮ শত কোটি টাকার ষ্টার্লিং পাওনার একাংশ বাতিলের জন্য আজ ইংলণ্ড ও আমেরিকায় নানা জঘন্য চক্রান্ত চলিতেছে। এ সময়ে ভারতসরকারের অর্থসদস্য হিসাবে স্যার আর্চিবল্ড যদি সম্পূর্ণ পাওনা আদায়ের প্রতিশ্রুতি দিতেন, তাহা হইলে আমরা সত্যই সুখী হইতাম।

মোটের উপর, যুদ্ধোত্তর বাজেট হিসাবে যতটা আশা করা হইয়াছিল ততটা অগ্রসর না হইলেও স্যার আর্চিবল্ডের ১৯৪৬-৪৭ সালের প্রাথমিক বাজেট আমাদের খুব বেশী হতাশ করে নাই। ভারতের আর্থিক স্বার্থ ভারতসরকার চিরকাল উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সে হিসাবে এবারের বাজেটে যুদ্ধোত্তর সমস্যা সম্পর্কে যে মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে তাহা আশাপ্রদ সন্দেহ নাই। যুদ্ধবিরতির পর প্রথম বৎসরের বাজেট রচনার অসুবিধা অনেক, কাজে কাজেই ১৯৩৮-৩৯ সালের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটকে বিচার করিয়া লাভ নাই। স্যার আর্চিবল্ড নিজেই অনুমান করিয়াছেন যে, এই বাজেটই তাহার শেষ বাজেট; আমরাও আশা করি আগামী বৎসরের বাজেট ভারতের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের অর্থসদস্য রচনা করিবেন। সে হিসাবে এ বৎসরের বাজেটে বিদেশী কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গির যে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে তজ্জন্য ভারতবাসীর আশাবাদী হইবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি। (১. ৩. ৪৬)

ভারতসরকারের রেল বিভাগের বাজেট

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ভারতসরকারের যানবাহন সদস্য স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪৬-৪৭ প্রাথমিক রেল বাজেট পেশ করিয়াছেন। এই সঙ্গে পরিষদে ১৯৪৪-৪৫ সালের চূড়ান্ত বাজেট এবং ১৯৪৫-৪৬ সালের সংশোধিত বাজেটও উপস্থিত করা হইয়াছে। চিরাচরিত প্রথানুসারে স্যার এডওয়ার্ড এবারও বাজেট সম্পর্কে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সরকারী কার্য্যে পরিষদ সদস্যদের সমর্থন আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের শুইয়া ঘুমাইবার ব্যবস্থা হইতে ভারতে রেলইঞ্জিন তৈয়ারী পর্য্যন্ত বহু আশার কথা শুনাইতে কসুর করেন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শেষ পর্য্যন্ত রেলসদস্যের আশা পূর্ণ হয় নাই, অর্থাৎ তাঁহার ফাঁকা বুলি শুনিয়া সদস্যগণ বিশেষ খুসি হন নাই। এবারের বাজেটের ত্রুটি বিচ্যুতি লইয়া জাতীয়তাবাদী সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবেই যথেষ্ট বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন।

স্যার এডওয়ার্ড বেন্থলের এবারের বাজেট যুদ্ধোত্তর প্রথম বাজেট। যুদ্ধের মধ্যে যে সকল অভাব-অসুবিধা ঘটিয়াছিল, যুদ্ধবিরতির পর সেগুলি দূরীভূত হইবে, ভারতবাসীর দিক হইতে এরূপ আশা করাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু যুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনের দোহাই দিয়া ভারতসরকার অসামরিক দেশবাসীকে যেরূপ চূড়ান্ত দুর্ভোগ সহ্য করিতে বাধ্য করিয়াছেন, এবারও তেমনি বিপুল আয় হ্রাসের আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া দেশের লোকের সুখ-সুবিধা বিধানের প্রশ্নটি রেলসদস্য সযত্নে এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্যার এডওয়ার্ড তাহার বক্তৃতার মধ্যে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এদেশের রেলভাড়া অত্যন্ত সুলভ এবং তাহার পরই তিনি ভারতসরকারের অধীনস্থ সমস্ত রেলপথের ভাড়ায় সমতা সাধনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছেন। ১৯৪০ সালের রেলভাড়া বৃদ্ধির পর হইতে এদেশের যাত্রীসাধারণের কিরূপ কষ্ট হইতেছে সে সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই, তবু শ্বেতাঙ্গ রেলসদস্য পরম ঔদাসীন্যের সহিত রেলভাড়া সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাতে এ বৎসর রেলভাড়া পুনরায় বৃদ্ধি পাইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই থাকিবে না।

রেলবিভাগের বাজেটে দেখা যায় ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতের সরকারী রেলপথসমূহের মোট আয় হয় ২১৬ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা এবং কার্য্য পরিচালনার জন্য মোট ব্যয় হয় ১৪৫ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। মূলধন খাতের সুদের দরুণ ২৭ কোটি ৪৫ টাকা বাদে রেলবিভাগের যে ৪৯ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়, তাহা হইতে রেলওয়ে মজুত তহবিলে ১৭ কোটি ৮৯ টাকা এবং ভারতসরকারের রাজস্ব তহবিলে ৩২ কোটি টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে। গত বৎসর পরিষদে বাজেট উপস্থিত করিবার সময় রেলসদস্য অনুমান করেন, ১৯৪৫-৪৬ সালে ভারতের সরকারী রেলপথ সমূহের আয় হইবে ২২০ কোটি টাকা। ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাজেট পেশ হইবার ৫ মাসের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়। যুদ্ধ শেষ হইবার পর সমরকালীন অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটা স্বাভাবিক এবং সে হিসাবে রেলবিভাগের আয় কমিয়া যাওয়াও কতকটা স্বাভাবিক ছিল। প্রকৃত পক্ষে স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল দেশ যুদ্ধকালীন অবস্থা হইতে শান্তিকালীন অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে বলিয়া ১৯৪৫-৪৬ সালের তুলনায় ১৯৪৬-৪৭ সালে রেলবিভাগের ৪৮ কোটি আয় কমিবে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে যাহাই হউক, যুদ্ধবিরতির জন্য ১৯৪৫-৪৬ সালে ভারতীয় রেলবিভাগের আয় কিছুই কমে নাই, বরং ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রাথমিক বাজেটে অনুমিত ২২০ কোটি টাকার স্থলে সংশোধিত বাজেটে এই বৎসর ২২৫ কোটি টাকা আয় ধরা হইয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সালের প্রাথমিক বাজেটে এই বৎসরের আয় ধরা হইয়াছে ১৭৭ কোটি টাকা। ১৯৪৫-৪৬ সালের সংশোধিত বাজেটে রেলবিভাগের কার্য্য পরিচালনার ব্যয় ধরা হইয়াছে ১৬৬ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা এবং সুদের দরুণ ২৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা বাদ দিয়া মোট উদ্বৃত্ত ধরা হইয়াছে ৩২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। রেলবিভাগের উদ্বৃত্তের অধিকাংশই রেলযাত্রী ও রেলকর্ম্মীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত, কিন্তু ভারতসরকার রেলবিভাগের উদ্বৃত্তের একটি বৃহৎ অংশ নির্লজ্জভাবে গ্রহণ করিয়া যাত্রী ও কর্ম্মীদের ন্যায্য-প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করেন। ১৯৪৪-৪৫ সালে ৪৯ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের মধ্যে তবু ৩২ কোটি টাকা ভারতসরকারের তহবিলে গ্রহণ করার কতকটা যুক্তি ছিল, কিন্তু ১৯৪৫-৪৬ সালে উদ্বৃত ৩২ কোটি ৭ লক্ষ টাকার মধ্যে ভারতসরকারের ৩২ কোটি গ্রাস করিবার কি যুক্তি

থাকিতে পারে ? ১৯৪৬-৪৭ সাল হইতে রেলসদস্য ভারতসরকারের রাজস্ব তহবিলে সাহায্য প্রক্রিয়ায় পরিবর্ত্তন সাধনের ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে সরকারী বিভিন্ন রেলপথের হেফাজতে নিয়োজিত মূলধনের শতকরা ১ ভাগ এবং রেলবিভাগের নিট লাভের অর্দ্ধেক ভারতসরকার পাইবেন। বলা বাহুল্য, এই ব্যবস্থাও দেশবাসীর স্বার্থে সরকারের তহবিল বাড়াইবার ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। ১৯৪৬-৪৭ সালে মাত্র ১২ কোটি ২২ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত অনুমিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ভারতসরকারের রাজস্ব তহবিলে যাইবে। আশা করা হইয়াছে, এই বৎসর রেলবিভাগের মজুত তহবিলে দেওয়া যাইবে ১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। রেলবিভাগে যাহারা কাজ করেন তাঁহাদের সুখসুবিধা বিধানের জন্য রেলসদস্য এবার একটি বেটারমেণ্ট ফাণ্ড খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং এই উন্নয়ন তহবিলের অর্থ বাস্তবিক ঠিক কি ভাবে খরচ হইবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন কথা না বলিয়াও প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই ফাণ্ডে ১৯৪৬-৪৭ সালের উদ্বৃত্ত হইতে ৩ কোটি টাকা দেওয়া হইবে।

কর্ম্মচারীদের ও রেলপথের উন্নতির জন্য বেটারমেণ্ট ফাণ্ড খুলিবার কথা ছাড়াও যাত্রীদের সুখের জন্য কি ব্যবস্থা করা হইবে, স্যার এডওয়ার্ড সে সম্বন্ধে এক ফিরিস্তি দিয়াছেন। ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রী-গাড়ীতে প্রচুর জলের ব্যবস্থা ও এই দুই শ্রেণীর যাত্রীদের বসিবার, এমন কি ঘুমাইবার ব্যবস্থা করা। উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য অধিকতর সংখ্যক 'এয়ার কনডিশনড' গাড়ীর ব্যবস্থা করিবার কথাও রেলসদস্য বলিয়াছেন। ভারতে রেলইঞ্জিন ও ওয়াগন তৈয়ারী সম্বন্ধে পরিষদের জাতীয়তাবাদী সদস্যবৃন্দকে আশ্বাস দিতেও স্যার এডওয়ার্ড ভুলেন নাই।

অবশ্য আশ্বাসানুসারে কবে যে এই সব কল্যাণমূলক কার্য্যসূচী ফলবতী হইবে সে সম্বন্ধে রেলসদস্য তাঁহার উর্দ্ধতন মনিব ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মতই মৌনীভাব অবলম্বন করিয়াছেন। তবে এ সব যে শীঘ্র হইবে না তাহা একরূপ স্পষ্ট, কারণ, স্যার এডওয়ার্ড তাঁহার বক্তৃতায় পরিষ্কারই বলিয়াছেন যে, এই সব ব্যবস্থা রাতারাতি করা যায় না। ভারতে ইঞ্জিন ও ওয়াগন নির্ম্মাণের কথা শুনিয়া শুনিয়া কান আমাদের বধির হইয়া গেল ; এবারও রেলসদস্যের বক্তৃতায় এই সম্বন্ধে আশ্বাসবাণী শুনিয়াছি। অবশ্য অনেক কাঠ খড় পুড়িবার পর এখন হয়তো ভারতে রেলইঞ্জিন তৈয়ারী হইতে পারে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই বিদেশে এত বেশী ইঞ্জিন ও ওয়াগনের অর্ডার দিয়া বসিয়া আছেন যে, অর্ডার মত মাল আসিলে সম্ভবতঃ শেষ পর্য্যন্ত ভারতে তৈয়ারী ইঞ্জিনাদির প্রয়োজন আছে বলিয়া স্বীকারই করা হইবে না। শ্বেতস্বার্থ পোষণের জন্য ভারতীয় স্বার্থহানির দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসে বিরল নহে। ১৯৩৭ সালে রেলপথ সম্পর্কে তদন্ত করিতে বসিয়া ওয়েজউড কমিশন বলিয়াছিলেন যে, ভারতে প্রয়োজনাতিরিক্ত রেলইঞ্জিন আছে। ১৯৩৯ সালে অর্থাৎ যুদ্ধ বাঁধিবার ঠিক আগে রেলবিভাগের হাতে মোট ইঞ্জিন ও ওয়াগন ছিল যথাক্রমে ৭ হাজার ২৮৯খানি ও ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮০৫খানি। বর্ত্তমানে ব্রিটেন, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশের অর্ডারী মাল আসিয়া পড়িলে ইঞ্জিন ও ওয়াগনের সংখ্যা দাঁড়াইবে যথাক্রমে ৮ হাজার ৫৪১ ও ২ লক্ষ ৩৯ হাজার। এ অবস্থায় ভারতে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের কারখানা চালু হইলেও ওয়াগন নির্ম্মাণের কারখানা প্রসারিত হইলে তখন ওয়েজউড কমিশনের সুরে সুর মিলাইয়া কর্তৃপক্ষের দিক হইতে ভারতে ইঞ্জিন ও ওয়াগনের প্রাচুর্য্যের কথা বলা অস্বাভাবিক কি ?

গত বৎসরের ভারতীয় রেলবাজেটে ভারতের জনস্বার্থ মোটেই রক্ষিত হয় নাই, তবু শ্বেতাঙ্গ রেলসদস্য এই বাজেটকে জোর করিয়া 'unorthodox' আখ্যা দিয়াছিলেন। এবারের বাজেটকেও যুদ্ধোত্তর বাজেট হিসাবে ভারতীয় স্বার্থসংরক্ষক বলা চলে না এবং ফাঁকা বুলিতে ভরিয়া এই বাজেটকে স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। আমরা সত্যই আনন্দিত হইয়াছি যে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে জাতীয়তাবাদী সদস্যগণ এবারের রেলবাজেটে খুসী হন নাই এবং নানাদিক হইতে জনস্বার্থ উপেক্ষাকারী এই বাজেটের কঠোর সমালোচনা করিয়া কিছু কিছু বরাদ্দ পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদেও গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ভারতীয় রেলবিভাগের চীফ কমিশনার স্যার আর্থার গ্রিফিন রেলবাজেট পেশ করেন। বাজেটের প্রশংসাসূত্রে একজায়গায় স্যার আর্থার বিশেষ গর্ব্বের সহিত বলিয়াছেন যে, সম্মিলিত সমর প্রচেষ্টায় ভারতীয় রেলবিভাগ নিজেদের সর্ব্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছে। কথাটির সার্থকতা আমরাও অস্বীকার করিতেছি না, তবে এই সর্ব্বস্ব নিয়োগের পশ্চাতে ভারতীয় জনস্বার্থ নিষ্করুণভাবে পদদলিত করিবার যে লজ্জাকর করুণ ইতিহাস আছে, তাহা স্মরণ করিয়া আমরা বাস্তবিক ভাবিয়া পাই না যে, এইজন্য মানুষ হিসাবে স্যার আর্থার গ্রিফিন কি করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতে পারেন ? ১৯৪৩ সালের মহামন্বন্তরে বাংলার যে ৩৫ লক্ষ অসহায় হতভাগ্য নরনারী অনশনে মৃত্যুবরণ করিয়াছে, ভারতীয় রেলবিভাগ কর্ত্তব্যপালনে অক্ষমতা না দেখাইলে ইহাদের কত লক্ষ বাঁচিতে পারিত তাহা কি স্যার আর্থার গ্রিফিন একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন ?

ভারতীয় রেলপথে যাহারা পয়সা দিয়া কুকুর বিড়ালের মত ব্যবহার পায়, তাহাদের স্বার্থে নির্দ্দিষ্ট বা প্রত্যক্ষভাবে রেলসদস্য এবারের বাজেটে উল্লেখযোগ্য কিছুই করেন নাই। এ ছাড়া যাহাদের কুশলতা ও নিষ্ঠার উপর রেলবিভাগের কার্য্যকারিতা নির্ভর করিতেছে, সেই রেলকর্ম্মচারীদের সম্বন্ধেও স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল এবারের বাজেট বক্তৃতায় লক্ষণীয় উদাসীন্য দেখাইয়াছেন। অল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে মেনস্ ফেডারেশন রেলবিভাগের ছাঁটাই বন্ধ না হইলে এবং কর্ম্মচারীদের বেতনের হার সংশোধিত না হইলে ধর্ম্মঘট করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। দেশে রেল ধর্ম্মঘটের ফলে অনিবার্য্য বিপর্য্যয় অনুমান করা রেলসদস্যের পক্ষে কঠিন বলিয়া আমরা মনে করি না। রেলবিভাগের বিপুল বাজেট উদ্বৃত্তের হিসাবে ছাঁটাই বন্ধ বা বেতনের হার সংশোধন—কিছুই রেলসদস্যের পক্ষে কঠিন নহে। তবু স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল বিষয়ের জটিলতার মামুলী দোহাই দিয়া বহু নিষ্ঠাবান রেলকর্ম্মীর জীবিকা ও সমগ্র দেশবাসীর চূড়ান্ত অসুবিধা সংক্রান্ত এই দাবীগুলি এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ১৯৪৫-৪৬ সালের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের মনে হয় যে, ১৯৪৬-৪৭ সালে রেলসদস্যের অনুমানের তুলনায় রেলবিভাগের আয় উল্লেখযোগ্যভাবেই বৃদ্ধি পাইবে। এ অবস্থায় সকল দিক বিচার করিয়া রেলসদস্য স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল যদি রেলওয়ে মেনস ফেডারেশনের দাবী সম্বন্ধে আশানুরূপ সহানুভূতি দেখাইতেন তাহা হইলে শুধু দেশবাসীর উদ্বেগই কমিত না, কর্ম্মীদের কর্ম্মোৎসাহের ভিতর দিয়া এ বৎসরের রেলবিভাগের শ্রীবৃদ্ধিরও নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকিত। ১।৩।৪৬

খেলা ধুলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

জোনাল কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট ঃ

সাউথ জোন ঃ ৩৬৯ ও ১৬৭

ওয়েষ্ট জোন ঃ ৩৩৪ ও ৯২

জোনাল কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট টুর্ণামেণ্টের সাউথ জোন বনাম ওয়েষ্ট জোনের তিন দিনের খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছিল কিন্তু সাউথ জোন একাদশ প্রথম ইংনিসে অগ্রগামী থাকায় তারা ফাইনালে নর্থ জোনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার অধিকার লাভ করেছে।

সাউথ জোনের প্রথম ইনিংসে বেশী রান করলেন এ-জি রামসিং নট আউট ১২৫, প্রফেসর ডি-বি দেওধর ৮৯, এস সোহোনী ৫১। দ্বিতীয় ইনিংসে দলের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ৫৮ রান করলেন প্রফেসর দেওধর।

ওয়েষ্ট জোনের প্রথম ইনিংসে বিনু মানকদ দলের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ৬৮ রান করলেন। এ ছাড়া ইব্রাহিমের ৫৬, ডি ফাদকারের ৪৬ এবং ভি-এস-হাজারীর ৪৫ রান। উল্লেখযোগ্য।

অল্‌ইণ্ডিয়া অলিম্পিক গেম্‌স ঃ

১১শ অল্‌ইণ্ডিয়া অলিম্পিক প্রতিযোগিতা বাঙ্গালোরে সুসম্পন্ন হয়েছে। এবারের বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় পাতিয়ালার দল ৮৭ পয়েণ্ট ক'রে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে এবং স্যর দোরাবজি টাটা ট্রফি বিজয়ী হয়েছে। বোম্বাই দল ৪৬ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় এবং পাঞ্জাব ৩২ পয়েণ্ট ক'রে তৃতীয় স্থান পেয়েছে। বাঙ্গলা প্রদেশ পঞ্চম স্থান পেয়েছে মাত্র ১৬ পয়েণ্ট ক'রে। মহিলাদের প্রতিযোগিতায় মহীশূর ৩৭ পয়েণ্ট ক'রে প্রথম স্থান পেয়েছে। বোম্বাই ২৩ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় এবং বাঙ্গলা প্রদেশ ১৩ পয়েণ্ট পেয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।

৬ই ফেব্রুয়ারী ২০,০০০ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে মহীশূরের মহারাজা ১১শ ভারতীয় অলিম্পিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বাঙ্গালোরের সাম্পাঙ্গি ট্যাঙ্ক বেডে নতুন অলিম্পিক ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ৮০০ শত এ্যাথলেট অনুষ্ঠানে যোগদান করে। গত বছরের চ্যাম্পিয়ান পাতিয়ালাদল পুরোভাগে অবস্থান করে।

এবারের প্রতিযোগিতায় ৪টি বিষয়ে নতুন রেকর্ড হয়েছে। হামার থ্রো—সোমনাথ (পাতিয়ালা) ১৫৩ ফিট ৮ ইঞ্চি দূরত্বে বল নিক্ষেপ ক'রে নতুন রেকর্ড করেছেন। পূর্ব্বের ১৪৭ ফিট ১০ ইঞ্চির ভারতীয় রেকর্ড করেছিলেন পাতিয়ালার কিষেণ সিং।

৫০ মিটার দৌড় (মহিলাদের)—বোম্বাইয়ের বায়ো গজদার ৬·৫ সেকেণ্ডে উক্ত দূরত্ব অতিক্রম ক'রে ১৯৩৬ সালে বাঙ্গলার মিস স্মিথের ৬·৬৬ সেকেণ্ডের রেকর্ডের তুলনায় বেশী সাফল্যলাভ করেছেন।

১১০ মিটার হার্ডলস—জে ভিকার্স (বোম্বাই) সময় ১৫·২—নতুন ভারতীয় রেকর্ড।

৫,০০০ মিটার ভ্রমণ—সাধু সিং (পাতিয়ালা); সময় ২৬ মিঃ ১৩ সেকেণ্ড।

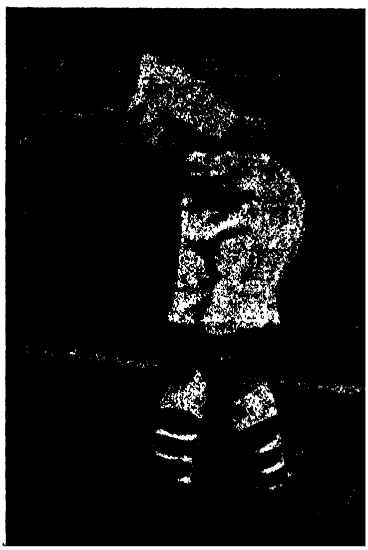
বোম্বাইয়ের বলদেব সিং, ব্রড জাম্প, জাভেলিন থ্রো, ডিসকাস থ্রো, ২০০ মিটার দৌড়, এবং ১৫০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছেন; এ ছাড়া পেণ্টাথলোনে ২৬৪৮ পয়েণ্ট ক'রে প্রথম স্থান পান।

বোম্বাইয়ের ৬৭ বছর বয়সের অম্বুনগর ম্যারাথোন রেসে যোগদান ক'রে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। এই পথ অতিক্রম করতে তাঁর ৪ ঘণ্টা ৫০ মিনিট সময় লাগে।

প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দেশের স্থান ঃ

পুরুষদের বিভাগে—১ম পাতিয়ালা ৮৭ পয়েন্ট, ২য় বোম্বাই ৪৬, ৩য় পাঞ্জাব ৩২, ৪র্থ মহীশূর ১৮, ৫ম বাঙ্গলা ১৬, ৬ষ্ঠ যুক্তপ্রদেশ ১৫, ৭ম মাদ্রাজ ৯, ৮ম দিল্লী ৭; ৯ম কোলহাপুর ৫, রাজপুতানা ৪, মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার ৩, বেলুচিস্থান ১, বরোদা, বিহার এবং উড়িষ্যা—০ পয়েন্ট।

মহিলাদের বিভাগে—১ম মহীশূর ৩৭ পয়েন্ট, ২য় বোম্বাই ২৩, ৩য় বাঙ্গলা ১৩, ৪র্থ যুক্তপ্রদেশ ৪, ৫ম মাদ্রাজ ৩, মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার ১ পয়েন্ট।



বুক এবং পেট দিয়ে বল আয়ত্বের কৌশল

ন্যাশানাল হকি চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

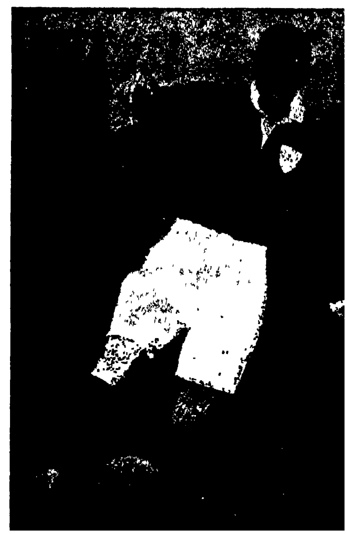
দীর্ঘ সাত বছর পর পুনরায় ন্যাশানাল হকি চ্যাম্পিয়ানসীপের খেলার ব্যবস্থা এ বছর হয়েছে। তেরটি প্রদেশ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে। ইতিপূর্ব্বে এত বেশী দলকে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে দেখা যায় নি। বাঙ্গলা প্রথম রাউণ্ডে সি পি এবং বেরার প্রদেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে।

ডেভিস কাপ ঃ

আন্তর্জাতিক টেনিস ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা যুদ্ধের দরুণ ১৯৩৯ সাল থেকে বন্ধ ছিল। দীর্ঘদিন পুনরায় ডেভিস কাপের খেলা আরম্ভ হয়েছে। খেলা হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়ায়। গত ২৬ বছরের মধ্যে এই প্রথম অষ্ট্রেলিয়ায় ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার খেলা হ'ল। মোট ২০টি দেশ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে। তালিকা প্রস্তুতের সময় প্রথম নাম উঠেছিল স্পেনের। স্পেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে।

খেলার তালিকা :

ইউরোপীয়ান জোন—স্পেন বনাম সুইজারল্যাণ্ড; গ্রেটবৃটেন বনাম ফ্রান্স; চেকোশ্লোভাকিয়া বনাম টার্কি; যুগোশ্লোভিয়া বনাম ঈজিপ্ট; ডেনমার্ক বনাম চীন;



পায়ের ইন্‌সাইড দিয়ে বল ড্রিবলিংয়ের কৌশল

বেলজিয়াম বনাম মোনাকো; সুইডেন বনাম দি নেদারল্যাণ্ড; বাই বনাম আয়ার। আমেরিকান জোন : মেক্সিকো বনাম ক্যানাডা; ফিলিপাইন বনাম ইউনাইটেড ষ্টেট।

অলইণ্ডিয়া ওয়েট লিফ্‌টিং ঃ

অলইণ্ডিয়া ওয়েট লিফ্‌টিংয়ের বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলা এবং বোম্বাই একযোগে ১৬ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। মহীশূর ৭ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় এবং মাদ্রাজ ৫ পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় স্থান পেয়েছে। মাদ্রাজের ডি পি মাণি কেদার ওয়েটের তিনটি অনুষ্ঠানে, প্রেস, স্ন্যাচ এবং ক্লিন এবং জার্কে মোট ৫৫৮½ পাউণ্ড

ভার তুলে নতুন রেকর্ড করেছেন। পূর্ব্বের ৫৩০ পাউণ্ডের রেকর্ড করেছিলেন বাঙ্গলার শঙ্করকুমার খাঁ।

রোসার মেমোরিয়াল লীগ ঃ

রোসার মেমোরিয়াল হকি লীগ প্রতিযোগিতায় পোর্ট কমিশনার ('এ' গ্রুপ বিজয়ী) ৪—১ গোলে মোহনবাগানকে ('বি' গ্রুপ বিজয়ী) হারিয়ে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে।

ইন্দো-সিলোন এ্যাথলেটিক ঃ

বাঙ্গালোরে ইন্দো-সিলোন এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ ১০১ পয়েণ্ট পেয়ে উপর্য্যুপরি দু'বার চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করলো। সিলোন এই প্রতিযোগিতায় ৬১ পয়েণ্ট পেয়েছে। এই দ্বিতীয় ইন্দো-সিলোন এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় একাধিক নতুন রেকর্ড হয়েছে। মোট ১৬টি অনুষ্ঠানে ১১টিতে নতুন রেকর্ড হয়েছে; তার মধ্যে সিলোন একাই ৭টি বিষয়ে নতুন রেকর্ড করেছে। এই স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় সিলোনের আর ই কিট্টো সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্প্রিণ্টার হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছেন। কিট্টো ১০০ মিটার দৌড়ে ১০·৫ সেকেণ্ডে উক্ত দূরত্ব অতিক্রম করেন। অল্‌ইণ্ডিয়া প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার দৌড়ে পাঞ্জাবের জে হার্ট যে ভারতীয় রেকর্ড স্থাপন করেছেন তার থেকে ১ সেকেণ্ড কম সময়ে কিট্টো ১০০ মিটার পথ অতিক্রম করেন।

নিম্নলিখিত বিষয়ে নতুন রেকর্ড হয়েছে।

১০০ মিটার হার্ডলস—জে ভিকার (ভারতবর্ষ) সময় ১৫·২ সেকেণ্ড। ইন্দো-সিলোন এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় এই সময়ই নতুন রেকর্ড বলে গণ্য হয়েছে। পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ড ছিল ১৯৪০ সালে ভারতবর্ষের এস আমেদের ১৬·১ সেকেণ্ডের। ২০০ মিটার দৌড়—আর ই কিট্টো (সিলোন); সময় ২২·২ সেকেণ্ড। এই প্রতিযোগিতায় এই সময় নতুন রেকর্ড বলে স্বীকৃত হয়েছে। পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ড ২২·৯ সেকেণ্ড, সিলোনের ষ্টানলি লিভিয়ারা করেছিলেন। সর্টপুট—এম-জি-বেগ (ভারতবর্ষ); দূরত্ব ৪৪ ফিট ৫ ইঞ্চি। পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ড ৪৪ ফিট ২ ইঞ্চি (১৯৪০) ভারতবর্ষের জাহুর আমেদ করেছিলেন।

১০০ মিটার দৌড়—আর ই কিট্টো (সিলোন) সময় করেছিলেন সিলোনোর ষ্টানলি লিভিয়ারি। ভারতীয় রেকর্ড ১০·৬ সেকেণ্ড। জাভেলিন থ্রো—বলদেব সিং (ভারতবর্ষ) পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ড ১৫৫ ফিট ৭ ইঞ্চি, সিলোনের ডি সি ডেসিলভা করেন।

পোলভল্ট—এ সি দীপ (সিলোন); ১১ ফিট ৮ ইঞ্চি উচ্চতা; ৪ × ৪০০ মিটার রিলে—ভারতবর্ষ; সময় ৩ মিঃ ২৩·৪ সেকেণ্ড। পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ড ৩ মিঃ ২৭·২ সেকেণ্ড, সিলোন করে।



পায়ের আউট সাইড দিয়ে বল ড্রিবলিংয়ের কৌশল

রঞ্জি ট্রফি ঃ

বোম্বাই ঃ ৬৪৫
বরোদা ঃ ৪৬৫

রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনালে বরোদা বনাম বোম্বাই দলের খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। টসে বরোদা দল জয়লাভ ক'রে। বরোদা মূল প্রতিযোগিতার সেমি ফাইনালে দক্ষিণ পাঞ্জাব দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। টস করে খেলার ফলাফল নির্ণয় রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এই প্রথম।

কার ১৩২, এইচ অধিকারী ১২৬, ভি-এস-হাজারী ৮৫, এম-এম-নাইডু ৪০।

অল-ইণ্ডিয়া ক্রিকেট দল ঃ

আগামী গ্রীষ্মকালে ইংলণ্ডে যে ভারতীয় ক্রিকেট দল খেলতে যাবে তার খেলোয়াড় মনোনয়ন শেষ হয়েছে। ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সিলেক্‌সন কমিটি নিম্নলিখিত খেলোয়াড়দের দলভুক্ত করেছেন (১) পাতৌদীর নবাব (দক্ষিণপাঞ্জাব) ক্যাপটেন (২) ভি-এম-মার্চ্চেণ্ট (বোম্বাই) ভাইস-ক্যাপটেন (৩) এল-অমরনাথ (দক্ষিণ পাঞ্জাব) (৪) এস মুস্তাক আলী (হোলকার) (৫) সি এস নাইডু (হোলকার) (৬) ডি ডি হিন্দেলকার (৭) এস এন ব্যানার্জি (বিহার) (৮) ভি এস হাজারী (বরোদা) (৯) আর এস মোদী (বোম্বাই) (১০) আবদুল হাফিজ (উত্তর ভারত ক্রিকেট এসোঃ) (১১) ভিনু মানকার (গুজরাট) (১২) সিটি সারভাতে (হোলকার) (১৩) এস সোহানী (মহারাষ্ট্র) কিম্বা ডি ফাদকার (বোম্বাই) (১৪) আর নিম্বলকার (বরোদা) কিম্বা ই ইরানী (সিন্ধু) (১৫) সি সিন্ধে (মহারাষ্ট্র) (১৬) গুল মহম্মদ (বরোদা)।

এই ষোলজন খেলোয়াড়ের মধ্যে ভি এম মার্চ্চেণ্ট, লালা অমরনাথ, মুস্তাক আলী, সি এস নাইডু, ডি ডি হিন্দেলকার এবং এস ব্যানার্জি ইতিপূর্ব্বে ১৯৩৬ সালে ভারতীয় দলের পক্ষে ইংলণ্ডে খেলেছিলেন। ভি এস হাজারী ১৯৩৮সালে রাজপুতানা দলের হয়ে ইংলণ্ডে খেলে এসেছিলেন।

জাহাজে স্থান না পাওয়ার দরুণ এই দলটি এপ্রিল মাসের শেষ দিকে করাচী থেকে ইংলণ্ড অভিমুখে রওনা হবে। ইংলণ্ডে ৪ঠা মে তারিখে ওরসেষ্টার দলের সঙ্গে ভারতীয় দলের ম্যাচ খেলার কথা আছে। এই দলের সমস্ত ব্যয়ভার প্রায় ছ' লক্ষ টাকার মত হবে। এ রকম প্রকাশ যে, বোর্ডের অনুমান ৪০ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে। এক্ষেত্রে ধার এবং দান সংগ্রহ ক'রে ব্যয় বহন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

রঞ্জি ট্রফি ঃ

হোলকার ঃ ৯১২

মহীশূর ঃ ১৯০ ও ৪০৬ (৬ উইকেট)

রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে মহীশূর দলকে এক ইনিংস ও ২১৩ রানে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে।

হোলকার দল প্রথমে ব্যাট ক'রে প্রথম ইনিংসে ৯১২ রান তুলে। এই রান ১৯৪১-৪২ সালে মহারাষ্ট্র দলের ৭৯৮ রানের রেকর্ড ভেঙ্গে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে। এ ছাড়া হোলকার দলের এক ইনিংসে মোট ৭টা সেঞ্চুরী হওয়ায় তারা আর এক নতুন রেকর্ড করেছে। পূর্ব্বে বোম্বাই দলের এক ইনিংসে চার সেঞ্চুরী রেকর্ড ছিল। সেঞ্চুরী করেছেন ভাণ্ডারকার ১৪২, সারভাতে ১০১, জগদ্দল ১৬৪, বি-নিম্বলকার ১০১, সি-এস নাইডু ১৭২, আর-সিং ১০০।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "নেতাজী সুভাষচন্দ্র"—১৷০

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "মৃত ও অমৃত"—২৷০

শ্রীচারুচন্দ্র রায় প্রণীত "শরৎ সমালোচনা—শেষ প্রশ্ন"—৷০

শ্রীশান্তশীল দাশ প্রণীত স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত নাটিকা "সভ্যতার অভিশাপ"—৷০

শ্রীরণজিৎ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "জন্মভূমি" (শ্রীপঞ্চমী, ১৩৫২ সংখ্যা)—১৷

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩৷১৷১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



বৈশাখ—১৩৫৩

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

সমতটের রাত রাজবংশ

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-আর-এস, পিএচ-ডি

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ও. এম. মার্টিন আই-সি-এস মহোদয় চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার ছিলেন। তিনি ঐ অঞ্চলের একখানি প্রামাণিক ইতিহাসের উপাদানসংগ্রহে ব্রতী ছিলেন। বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিভাষার অধ্যাপক স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয় এবং "যুক্তিদীপিকা"র খ্যাতনামা সম্পাদক শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী চট্টগ্রাম বিভাগে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। কয়েকমাস পূর্ব্বে তাঁহারা ত্রিপুরা জেলার সদর থানার অন্তর্গত কইলান গ্রামের জনৈক মুসলমান কৃষকের নিকট হইতে একখানি প্রাচীন তাম্রশাসন সংগ্রহ করিয়াছেন। গত নবেম্বর মাসে আমি সংবাদ পাই যে, অধ্যাপক বড়ুয়ার হস্তগত তাম্রশাসনখানি সুপ্রসিদ্ধ মহারাজাধিরাজ বৈন্যগুপ্তের সময়কালীন। বহুদিন পূর্ব্বে ত্রিপুরা জেলার গুণাইঘর গ্রামে ১৮৮ গুপ্তাব্দ অর্থাৎ ৫০৭ খ্রীষ্টাব্দের তারিখ সংবলিত বৈন্যগুপ্তের রাজত্বের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে উহা ঢাকা যাদুঘরের কুক্ষীগত আছে। ষোল বৎসর পূর্ব্বে ঐ শাসনের একটা মোটামুটি পাঠ প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্যবহারার্থ ঐ তাম্রপট্ট বা উহার কোন উত্তম প্রতিলিপি পণ্ডিতগণের পক্ষে সুলভ নহে। গুণাইঘর লিপির প্রকৃত পাঠ নির্ণীত হইবার আপাততঃ কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই কারণে অধ্যাপক বড়ুয়া কর্ত্তৃক বৈন্যগুপ্তের নূতন শাসন আবিষ্কারের সংবাদে আমরা উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম। বিগত জানুয়ারী মাসের অন্তিমভাগে অধ্যাপক মহোদয় কইলান লিপির পাঠোদ্ধারের কার্য্যে আমার সাহায্য প্রার্থনা করেন। তদনুসারে ৬ই ফেব্রুয়ারী সরস্বতী পূজার দিন প্রাতঃকালে তাম্রপটখানি তাঁহার গৃহ হইতে লইয়া আসি। দেখিলাম, উহা সম্যকরূপ পরিষ্কৃত করা প্রয়োজন। নানা স্থানে অক্ষরের উপর ময়লা জমিয়া রহিয়াছে; কোন কোন অংশে ক্ষয়ধরার ফলে অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পটখানি পরিষ্কার করিয়া উহা হইতে ব্যবহারোপযোগী প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতে সচেষ্ট হইলাম। আনন্দের বিষয়, এই কার্য্যে ইতিমধ্যে অনেকখানি সফলতা লাভ করিয়াছি।

কইলান তাম্রশাসন সম্পর্কে সর্ব্বপ্রথম বক্তব্য এই যে, ইহা বৈন্যগুপ্তের রাজত্বকালীন নহে। কিন্তু পূর্ব্ব-দক্ষিণ বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের পক্ষে এই লিপি অত্যন্ত মূল্যবান্। ইহা হইতে সুপরিচিত সমতটদেশের অর্থাৎ আধুনিক নোয়াখালি-ত্রিপুরা অঞ্চলের একটি অজ্ঞাতপূর্ব্ব রাজবংশের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই বংশটিকে রাত রাজবংশ বলা যাইতে পারে।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধটিকে সুদীর্ঘ করিতে চাহি নাই। কারণ ইতিপূর্ব্বে গোবিন্দচন্দ্রের পাইকপাড়া লিপির আলোচনাকালে দেখা গিয়াছে যে, আমাদের দেশে দীর্ঘ ঐতিহাসিক আলোচনায় অসহিষ্ণু পণ্ডিতেরও অভাব নাই, তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিবার উপযুক্ত ঐতিহাসিকও আছেন। এস্থলে আমরা কইলান লিপির সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ অংশমাত্র উদ্ধৃত করিব। উদ্ধৃত অংশে মূলের সামান্য রকমের ভাষাগত ত্রুটিগুলি সংশোধন করিয়া দেওয়া হইবে।

কইলানের তাম্রপট্টখানি দৈর্ঘ্যে ১০.৮৫ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ৮.১৫ ইঞ্চি। ইহার বামদিকে প্রায় ৬ ইঞ্চি স্থান জুড়িয়া ভারী একটি পিত্তল নির্ম্মিত সীলমোহর সংযুক্ত আছে। সীলমোহর সমেত পট্টখানির ওজন প্রায় পৌনে চারি সের। সীলটি বৃত্তাকার; কিন্তু ইহার মাথায় একটি ঝুঁটি আছে। সীলের বহির্ব্বৃত্তের ব্যাস প্রায় ৪।৹ ইঞ্চি; ইহার মধ্যে যে গোলাকার মুদ্রা অঙ্কিত আছে উহার ব্যাস ৩।৹ ইঞ্চি। এই মুদ্রাটির সহিত ত্রিপুরাতে প্রাপ্ত লোকনাথের তাম্রশাসনসংযুক্ত মুদ্রার আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য দেখা যায়। কারণ উভয় মুদ্রারই উর্দ্ধাংশ জুড়িয়া প্রস্ফুটিত পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা গজলক্ষ্মী মূর্ত্তি। লক্ষ্মীর উভয়পার্শ্বে—উর্দ্ধভাগে অভিষেচনকারী গজমূর্ত্তি, গজের উন্নত শুণ্ডে ধৃত কলসী; নিম্নভাগে জলসেচনকারী উপাসক মূর্ত্তি। গজলক্ষ্মীর নিম্নে দুই পংক্তিতে "শ্রীমৎ সমতটেশ্বরপাদানুধ্যাতস্য কুমারামাত্যাধিকরণস্য" লিখিত রহিয়াছে। লক্ষ্মীর দক্ষিণ পার্শ্বে উর্দ্ধাধঃক্রমে অপর একটি পংক্তি দেখা যায়; উহাতে "শ্রীশ্রীধারণরাতস্য" মুদ্রিত আছে। পূর্ব্বনির্ম্মিত সীলমোহর বর্ত্তমান তাম্রশাসনে সংলগ্ন করিবার কালে উহার গাত্রে এই পংক্তিটি অঙ্কিত করা হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা অবগত আছেন যে, লোকনাথের শাসনসংলগ্ন মুদ্রাতেও অপেক্ষাকৃত প্রাচীন অক্ষরে "কুমারামাত্যাধিকরণস্য" এবং তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ আধুনিক অক্ষরে "লোকনাথস্য" লিখিত দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই মুদ্রা সমতটদেশীয় কুমারামাত্যগণ ও তদীয় অধিকরণসমূহ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইত। শ্রীধারণরাত এবং লোকনাথ রাষ্ট্রপতি হিসাবে উহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ কিন্তু পূর্ব্বনির্ম্মিত সীলমোহরে এই প্রকার নূতন নাম সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায় না। গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের সামন্তগণের শাসনকালীন মেদিনীপুরে আবিষ্কৃত তাম্রপট্টদ্বয়ে তাবীরমণ্ডলের অধিকরণমুদ্রা সংযুক্ত আছে; কিন্তু উহাতে গৌড়েশ্বর কিংবা তাঁহার সামন্ত বা কর্ম্মচারীর নাম চিহ্নিত করা হয় নাই। সম্ভবতঃ যাঁহারা নামে সামন্ত নৃপতি, কিন্তু কার্য্যতঃ স্বাধীন নরপতির ন্যায় রাজ্য পরিচালনা করিতেন, তাঁহারা কখনও কখনও অধিস্বামীর অনুমোদন পরোক্ষে উপেক্ষা করিয়া উল্লিখিত পন্থা অবলম্বন করিতেন। রাজবংশীয় কুমারদিগের সমান রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদার অধিকারী অমাত্যগণকে কুমারামাত্য বলা হইত। এস্থলে কুমারামাত্য জনৈক প্রাদেশিক শাসক। অধিকরণ অর্থে মোটামুটি শাসনসভা বুঝা যাইতে পারে।

কইলান তাম্রপট্টের প্রথম পৃষ্ঠে ২৮ পংক্তি এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ২১ পংক্তি লেখ উৎকীর্ণ আছে। ইহার তারিখ "পিতৃচরণপ্রসাদাদবাপ্তস্য সমতটাদ্যনেক দেশাধিরাজ্যস্যাষ্টমে সংবৎসরে শ্রাবণমাসস্য তিথৌ সিতসপ্তম্যাং," অর্থাৎ রাজা শ্রীধারণরাতের ৮ম রাজ্যবর্ষ। ইহা হইতে লিপির কালনির্ণয় সম্ভব নহে; সুতরাং প্রত্নলিপিবিদ্যার সাহায্য লওয়া আবশ্যক। কইলান লিপির অক্ষরের সহিত শশাঙ্কের (আনুমানিক ৬০০-২৫ খ্রীষ্টাব্দ) সময়কালীন শাসনমালা, লোকনাথের ত্রিপুরা শাসন, খড়্গরাজগণের লেখাবলী প্রভৃতির অক্ষর তুলনা করা যাইতে পারে। প্রত্নলিপিবিদ্যার প্রমাণ অনুসারে কইলান শাসনটিকে শশাঙ্কের সময়ের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তীকালের বলা যায়; কারণ বর্ত্তমান লিপির শ (দ্বিতীয় পৃষ্ঠের দুই এক ক্ষেত্র ব্যতীত) জ প্রভৃতি কতিপয় অক্ষরের আকার শশাঙ্কের লিপিসমূহের অক্ষরের তুলনায় কিছু আধুনিক। কিন্তু এই লিপির আকার, ঔকার, জ প্রভৃতি আকারে পালবংশীয় ধর্ম্মপালের (আনুমানিক ৭৬৯-৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ) লিপিমালার অক্ষর অপেক্ষা প্রাচীন। কইলান শাসনের দাতাকে খড়্গবংশীয় রাজগণের এবং ত্রিপুরা লিপির লোকনাথের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। যাঁহারা খড়্গদিগের লেখাবলীকে ৭ম শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ও ৮ম শতাব্দীর প্রথমভাগে স্থান দান করেন, তাঁহাদের মত সমীচীন। যাহা হউক, ৭০০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে কইলান লিপির কাল নির্দ্দেশ করিলে অসঙ্গত হয় না। এই সিদ্ধান্তের পরিপোষক আরও কিছু প্রমাণ আছে।

বর্ত্তমান লিপির দাতা শ্রীধারণরাতের পিতার নাম জীবধারণরাত। ত্রিপুরা শাসনে উল্লিখিত লোকনাথের সমসাময়িক জীবধারণ নামক নরপতি এই জীবধারণরাত ব্যতীত অপর কেহ নহেন। ত্রিপুরা লিপিতে শাসন দানের তারিখ লিপিবদ্ধ ছিল। দুঃখের বিষয়, উহার শতাঙ্ক বোধক অংশ পড়া যায় নাই; কিন্তু উহার পরে "* অধিকে চতুশ্চত্বারিংশৎ সংবৎসরে" স্পষ্ট বুঝা যায়। শ্রীযুক্ত দেবদত্ত ভাণ্ডারকর এবং স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের মতে তারিখটি হর্ষসংবতের ১৪৪ বর্ষ অর্থাৎ ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ। বাংলার পূর্ব্বদক্ষিণ অঞ্চলে হর্ষের অধিকার বিস্তারের এবং তদীয় সংবৎ ব্যবহারের কোন প্রমাণ নাই; কিন্তু এই পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছিলেন যে, লোকনাথের সমসাময়িক জীবধারণ মগধের উত্তরকালীন গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ত ব্যতীত অপর কেহ নহেন। এই সিদ্ধান্তের অসারতা বর্ত্তমান কইলান লিপিদ্বারা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হইবে; কিন্তু পূর্ব্বেও কেহ উহাকে গ্রহণীয় মনে করেন নাই। কারণ, পূর্ব্বদক্ষিণ বাংলায় জীবিতগুপ্তের অধিকারের কোন প্রমাণ নাই। যাহা হউক, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক অনুমান করেন যে, লোকনাথের ত্রিপুরা শাসনের তারিখ গুপ্তসংবতের ৩৪৪ বর্ষ অর্থাৎ ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দ। আমার বিবেচনায় এই মত সমীচীন। তাহা হইলে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর তৃতীয়পাদে লোকনাথের সমসাময়িক জীবধারণের স্থান নির্দ্দেশ করিলে অসঙ্গত হয় না। সুতরাং জীবধারণের পুত্র শ্রীধারণের শাসনকাল আনুমানিক ভাবে ঐ শতাব্দীর শেষপাদে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

কইলান শাসনের রচনা প্রথম শ্রেণীর নহে। ইহার অনেক স্থলে অনাবশ্যক শব্দাড়ম্বর দেখা যায়। শাসনের আরম্ভ এইরূপ:—

স্বস্তি ॥

বিলসন্তি যস্য শশ্বদ্দিতিসুতদমনেন বিক্রমোদ্‌গারাঃ ।

স জয়তি হরিরেকার্ণবমধ্যোদ্ধৃতমেদিনীভারঃ ॥

প্রজ্ঞাতিশয়বিশোধিতগুণরাশৌ দুগ্ধসিন্ধুবদ্ধৌতা ।

যস্য শ্রীরপি সশ্রীঃ স শ্রীশ্রীধারণো জয়তি ॥

প্রথম শ্লোকে ভগবান্ হরির এবং দ্বিতীয়টিতে বিষ্ণুভক্ত রাজা শ্রীধারণের জয় উচ্চারণ করা হইয়াছে। মুদ্রা এবং শাসনের গদ্যাংশ হইতে জানা যায় যে, নরপতির পূর্ণ নাম শ্রীধারণরাত। লিপি হইতে এই বংশের আর যে দুই ব্যক্তির নাম জানা যায় তাঁহারা সমতটেশ্বর জীবধারণরাত এবং যুবরাজ বলধারণরাত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লোকনাথের শাসনে জীবধারণরাতকে কেবল জীবধারণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, জীবধারণ, শ্রীধারণ এবং বলধারণ রাত-বংশীয় ছিলেন।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের পর প্রকৃত শাসনের আরম্ভ—"অথ মত্তমাতঙ্গ-শতসুখবিগাহ্যমানবিবিধতীর্থয়া নৌভিরপরিমিতাভিরুপরচিতকূলয়া পরি-কৃতাদভিমতনিম্নগামিন্যা ক্ষীরোদয়া সর্ব্বতোভদ্রকাদ্দেবপর্ব্বতাচ্ছ্রীমৎ-সমতটেশ্বরপাদানুধ্যাতাঃ কুমারামাত্যা অধিকরণঞ্চ গুপ্তীনাটনপটলায়িকা-দের্ব্বিষয়পতীন্ অধিকরণঞ্চ বোধয়ন্তি।" দেখা যাইতেছে, রাজাজ্ঞাটি দেবপর্ব্বত নামক স্থানের কুমারামাত্য (গৌরবার্থক বহুবচনান্ত) এবং তদীয় অধিকরণ কর্ত্তৃক গুপ্তীনাটন ও পটলায়িক সংজ্ঞক অঞ্চলস্থিত বিষয়পতি ও অধিকরণসমূহের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল; কারণ প্রদত্ত ভূমি ঐ অঞ্চল-দ্বয়ে অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ দেবপর্ব্বত একটি গিরিদুর্গ; ইহা চতুর্দ্বার-সমন্বিত ছিল বলিয়াই হয়ত ইহাকে সর্ব্বতোভদ্রক বলা হইয়াছে। কুমিল্লার প্রায় ২৮ মাইল পূর্ব্বোত্তরে পার্ব্বত্যত্রিপুরা মধ্যে দেবতার মুড়া নামক পর্ব্বত আছে। উল্লিখিত নামের শৃঙ্গটির উচ্চতা ৮১২ ফুট। রাজমালা (৩৩ পৃষ্ঠা) অনুসারে, আরাকানের মগ সৈন্য কর্ত্তৃক রাঙ্গামাটিয়া বা উদয়পুর আক্রান্ত হইলে ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্য (১৫৯৭-১৬১১) দেওঘাট নামক স্থানে পলায়ন করেন। এই দেবমুণ্ড ও দেবঘট্টের সহিত আমাদের দেবপর্ব্বতের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, তাহা বিবেচ্য। দেব-পর্ব্বতের চারিদিক পরীখার ন্যায় বেষ্টন করিয়া ক্ষীরোদা নদী প্রবাহিতা হইত। ক্ষীরোদার ঘাটগুলিতে হস্তিসমূহ ক্রীড়া করিত এবং উভয়কূলে নৌশ্রেণী শোভা পাইত। এস্থলে বাণিজ্যতরণী কি রণপোতের ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। যাহা হউক, দেবপর্ব্বতে সমতটের অন্তর্গত প্রদেশবিশেষের শাসনকেন্দ্র অবস্থিত ছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

অতঃপর শাসনপ্রদাতা সমতটেশ্বরের আদেশের উল্লেখ করা হইয়াছে—"বিদিতমস্তু বো নিরুপমগুণগণৌঘশালিনি জগদুদয়স্থিতিনিরোধবিবিধ-প্রপঞ্চধামনি বিবুধসত্তমে শতমখশক্রশাতনব্যসনবিলসিতায়তৌ ভগবতি পুরুষোত্তমে পরময়া বিনিবেশিতাশয়শ্রদ্ধয়া শব্দবিদ্যাদিবিবিধসময়পরিগম-জনিতস্বকস্বকগুণবিশেষঘনঘটিতবুদ্ধিরবিকলশক্তিত্রিতয়সম্পদুদ্‌গতো যথারুচি-প্রবর্ত্তিতষাড়্গুণ্যগোচরশ্চাপচক্রনিপীড়িব ইব গতঃ কলাসু কৌশলমনতিশয় সুন্দরমতিমধুরচিত্রগীতেরুৎপাদয়িতা কবিরপরিমিতগোহিরণ্যভূমিপ্রদান-পুণ্যকীর্ত্তেরসমসমপ্রতাপোপনতসামন্তচক্রস্য সুগৃহীতনাম্নো দেবস্য সমতটেশ্বর-শ্রীজীবধারণরাতভট্টারকস্য সুমুরুদিতোদিতকুলায়ামপরিমিতপ্রজাধারিণ্যাং সাক্ষাদিব বসুন্ধরায়ামগ্রমহিষ্যামুৎপন্নঃ শ্রীবন্ধুদেব্যাং প্রসাদাতিশয়সুমুখেন পিত্রা স্বয়মর্পিতাধিরাজ্যঃ পিতেব পালয়িতাপগতো বুদ্ধিনিগ্রহাদনভিমত-প্রাণনিগ্রহে মনুরপর ইব পরমকরুণাশ্রয়ঃ কুলবসতিরিব সত্ত্বসম্পদো জন্ম-ভূমিরিব প্রিয়বচনজাতস্য গজতুরগসততপীড়নক্রমোচিতশ্রমবলিততনু-বিভাগরম্যদর্শনঃ পরমবৈষ্ণবোনেকপ্রাধিকোটীশতসহস্রজীবিতস্য প্রদায়কতয়া পরমকারুণিকো মাতাপিতৃপাদানুধ্যাতঃ প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দঃ সমতটেশ্বরঃ শ্রীশ্রীধারণরাতদেবঃ কুশলী পিতৃচরণশুশ্রূষণৈকশীল স্য বিজিত-চক্ষুরাদিকরণারামতয়া বিনয়স্যেব মূর্ত্তিমতো হস্ত্যশ্বপ্রহরণবিদ্যাভিরনুগতশব্দ-বিদ্যাপরিশ্রমস্তাপযাপিতপিতামহাক্রামোচিতপ্রবয়সঃ শ্রিয়েব নায়কগুণসম্পদা সুসমাপূর্য্যমানসন্ততেরাজ্ঞাশতপ্রাপিণো যুবরাজ-প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দ-শ্রীবলধারণ-রাতভট্টারকস্য মুখেন স্ফুটচিত্রবস্তুভাষিণা সমাদিশতিস্ম।"

উদ্ধৃত অংশ হইতে দেখা যায়, শাসনদাতা সমতটেশ্বর শ্রীধারণের পিতা ছিলেন সমতটপতি জীবধারণ এবং মাতা জীবধারণের প্রধানা মহিষী বন্ধুদেবী। ইঁহারা মহারাজ, মহারাজাধিরাজ ইত্যাদি রাজোপাধি ব্যবহার করেন নাই; কিন্তু ইঁহারা সমতটেশ্বর। রাজা শ্রীধারণকে "প্রাপ্তপঞ্চ-মহাশব্দ" (অর্থাৎ অধিস্বামী কর্ত্তৃক মহাপ্রতীহার, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাশ্বশালাধিকৃত মহাভাণ্ডাগারিক, মহাসাধনিক এইরূপ কর্ম্মস্থানমূলক পঞ্চউপাধিতে ভূষিত) বলিয়া তাঁহার সামন্তত্ব সূচিত হইয়াছে; আবার তাঁহার আধি রাজ্যেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, রাতবংশীয় রাজগণ মূলতঃ অপর কোন সুপ্রতিষ্ঠিত রাজ-বংশের অধীন সামন্ত ছিলেন; কিন্তু এই সময়ে কার্য্যতঃ তাঁহারা প্রায় স্বাধীনভাবে সমতটের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ জীবধারণ এই বংশের প্রথম পরাক্রান্ত নরপতি। কিন্তু রাতবংশীয়েরা কোন অধিরাজবংশের সামন্তত্ব স্বীকার করিতেন, তাহা বর্ত্তমানে নির্ণয় করা কঠিন। শশাঙ্কের (আনুমানিক ৬০০-২৫ খ্রীষ্টাব্দ) পরবর্ত্তীকালীন গৌড়ের ইতিহাস এবং ভাস্করবর্ম্মার (অনুমানিক ৬০০-৫০ খ্রীষ্টাব্দ) পরবর্ত্তী কামরূপের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সঙ্কীর্ণ। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সমতটে কামরূপ অপেক্ষা গৌড়ের প্রভাব থাকারই অধিক সম্ভাবনা। তবে এই প্রশ্ন তুলিবার পূর্ব্বে সমসাময়িক এবং একই অঞ্চলের শাসক খড়্গবংশীয় রাজগণের সহিত রাত রাজাদিগের সম্পর্ক নিরূপণের চেষ্টা করা প্রয়োজন।

ঢাকার ৩০ মাইল পূর্ব্বোত্তরবর্ত্তী আশরাফপুরে এবং কুমিল্লার ১৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত দেউলবাড়ীতে খড়্গাদিগের রাজত্বকালীন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই বংশের খড়্গোদ্যম, তৎপুত্র জাতখড়্গ, তৎপুত্র দেবখড়্গ এবং দেবখড়্গপুত্র রাজরাজ বা রাজরাজভট সংজ্ঞক নৃপতিদিগের নাম জানা গিয়াছে। রাতরাজের একখানি ভূমিদানপত্রে তাঁহার পিতার সীলমোহর দেখা যায়; উহাতে "শ্রীমদ্দেবখড়্গঃ" লিখিত আছে। এই লিপিতে উদীর্ণখড়্গ নামক অপর একব্যক্তি কর্ত্তৃক ভূমিদানের ইঙ্গিত

পাওয়া যায় ; ইনি দেবখড়্গের অন্যতম পুত্র হইতে পারেন। যাহা হউক, খড়্গবংশীয় রাজগণ আপনাদিগকে সমতটেশ্বর বলেন নাই ; কিন্তু কর্ম্মান্ত নামক স্থানে ইঁহাদের রাজধানী অথবা অন্যতম রাজধানী ছিল। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় কুমিল্লার ১২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বড়-কামতাকে প্রাচীন কর্ম্মান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সম্ভবতঃ খড়্গেরা ঢাকা-ত্রিপুরা অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা স্বাধীন নৃপতি ছিলেন, কি কোন অধিরাজবংশের স্বাধীন-প্রায় সামন্ত ছিলেন, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। সত্য বটে, দেবখড়্গমহিষী প্রভাবতীর লিপিতে খড়্গোদ্যমকে "নৃপাধিরাজ" বলা হইয়াছে ; দেবখড়্গের লিপিতে এই রাজাকে বলা হইয়াছে "অশেষক্ষিতিপালমৌলিমালামণি-দ্যোতিতপাদপীঠ"। ইহাতে তাঁহাদের স্বাধীন-নৃপতিত্ব সূচিত হয়। কিন্তু লিপিগুলির উল্লিখিত অংশ পদ্যে লিখিত ; সুতরাং রাতবংশের তথাকথিত অধিরাজ ও "প্রতাপোপনতসামন্তচক্র" রাজাদিগের ন্যায় খড়্গাদিগেরও সামন্তসুলভ কোন উপাধি ছিল কিনা, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। দেবখড়্গের নিজস্ব সীলমোহরেও কিছু প্রমাণ হয় না ; কারণ সামন্ত-দিগেরও স্বকীয় মুদ্রা ব্যবহারের প্রমাণ আছে। উদাহরণ স্বরূপ মল্লসাকল-লিপির সীলমোহরের উল্লেখ করা যায়। আবার রাজরাজের লিপিতে জনৈক বৃহৎপরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভূমির উল্লেখ আছে ; ইনি খড়্গবংশীয়গণের অধিস্বামী ছিলেন কিনা তাহাও বিবেচনার বিষয়। আমার মনে হয়, পূর্ব্বদক্ষিণ বাংলার খড়্গ ও রাতবংশীয় রাজগণের পক্ষে তৎকালীন গৌড়-রাজ্যের স্বাধীন সামন্ত থাকা একেবারে অসম্ভব নহে। কারণ, শশাঙ্কের পরবর্ত্তী গৌড়েশ্বরদিগের প্রতাপের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে গৌড়ের রাজা মগধেরও অধীশ্বর ছিলেন, বাক্‌পতি-রাজের "গৌড়বধ" গ্রন্থে তাহার প্রমাণ আছে। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কনৌজ ও কামরূপের নিকট গৌড়ের পরাজয়কে যাঁহারা গৌড় সাম্রাজ্যের ধ্বংস বলিয়া স্থির করেন, তাঁহারা ঠিক এই যুগেরই বাতাপিপুর এবং কাঞ্চীপুরের অত্যাশ্চর্য্য ইতিহাস স্মরণ করিবেন। হর্ষ এবং ভাস্করবর্ম্মার পরেই তাঁহাদের বংশদ্বয়ের অধিকার বিলুপ্ত হয়, তাহাও মনে রাখিতে হইবে।

খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে (সম্ভবতঃ ৬৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে) চীন-দেশীয় পরিব্রাজক হিউএন-সং সমতট দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেশের বর্ণনায় তিনি কোন রাজার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার শিক্ষাগুরু নালন্দা বিহারের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক শীলভদ্রের প্রসঙ্গে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে, এই পণ্ডিত সমতটের ব্রাহ্মণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিউএন-সঙের সমতট বর্ণনায় ঐ দেশের রাজার অনুল্লেখে তাঁহার পরাধীনতা সূচিত হয় কিনা, তাহা বিবেচ্য। যাহা হউক, সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সমতটে যে রাজবংশ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিত, উহা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল না। তাহা হইলে বৌদ্ধ পরিব্রাজক অবশ্যই তাহার উল্লেখ করিতেন ; রাজপরিবারকে ব্রাহ্মণ বলিতেন না। এদিকে খড়্গবংশীয় দেবখড়্গ অবশ্যই বৌদ্ধ ছিলেন ; তদীয় বংশকে বৌদ্ধ রাজবংশ বলিলে অসঙ্গত হয় না। শীলভদ্র সমতটের যে ব্রাহ্মণ রাজবংশে জন্মিয়াছিলেন, উহাই কি কইলান লিপির রাত রাজবংশ? কেহ কেহ শীলভদ্রের নামের শেষাংশ হইতে সপ্তম শতাব্দীতে সমতটের সিংহাসনে ভদ্রবংশীয় রাজগণের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন। এই মত ভ্রান্ত ; কারণ স্পষ্টই বুঝা যায়, বৌদ্ধত্ব গ্রহণের পর পূর্ব্বনাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই ব্যক্তি "শীলভদ্র" এই খাঁটি বৌদ্ধ নামটি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ই-সিং নামক চীনদেশীয় পরিব্রাজক সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে চীনদেশ হইতে ৫৬জন বৌদ্ধ পরিব্রাজক ভারত ভ্রমণে আসেন। তন্মধ্যে শেং-চি নামক ভ্রমণকারী রাজভটসংজ্ঞক নরপতিকে সমতটের সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, এই রাজভট খড়্গবংশীয় বৌদ্ধ রাজা দেবখড়্গের পুত্র রাজরাজ বা রাজরাজভট ব্যতীত অপর কেহ নহেন। এই ধারণা সত্য হইতে পারে। কারণ ই-সিঙের বর্ণনা অনুসারে রাজভট বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধমতের প্রবল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে সমতট রাজধানীতে ৪০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু রাজসৎকার লাভ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। অথচ ই-সিঙের ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে হিউএন-সং ঐ স্থানে মাত্র ২০০০ ভিক্ষু দেখিতে পাইয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সমতটে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী খড়্গবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এই ভিক্ষুসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে অপর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ই সিঙের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, মহারাজ শ্রীগুপ্ত নামক জনৈক প্রাচীন নরপতি নালন্দার পূর্ব্বদিকে গঙ্গাতীর ধরিয়া ৪০ যোজন অর্থাৎ প্রায় ২২৮ মাইল পূর্ব্বে চীনদেশীয় ভিক্ষুদিগের জন্য চীনবিহারসংজ্ঞক একটি বিহার নির্ম্মাণ করেন ; উহা মৃগশিখাবন স্তূপের নিকটে অবস্থিত ছিল। গঙ্গাতীর ধরিয়া নালন্দার ২২৮ মাইল পূর্ব্বে পৌঁছিলে বর্ত্তমান মালদহ বা মুর্শীদাবাদ জেলার কোন স্থানে উপস্থিত হইতে হয়। একাদশ শতাব্দীর একখানি পুঁথিতে সত্যই মৃগশিখাবন স্তূপকে বরেন্দ্র দেশের অর্থাৎ উত্তর বাংলার অন্তর্গত বলা হইয়াছে। তবে চীনবিহারটি বরেন্দ্রের সীমামধ্যে কি উহার বাহিরে অপর কোন প্রদেশ মধ্যে অবস্থিত ছিল, তাহা জানা যায় না। যাহা হউক, ই-সিঙের ভারত ভ্রমণকালে উক্ত চীনবিহারটি পূর্ব্বভারতপতি দেববর্ম্মার রাজ্যভুক্ত ছিল। কেহ কেহ এই দেববর্ম্মাকে দেবখড়্গের সহিত অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু মালদহ-মুর্শীদাবাদ অঞ্চলে খড়্গপ্রভুত্ব বিস্তারের সিদ্ধান্ত বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত গ্রহণ করা যায় না। ই-সিং-বর্ণিত পূর্ব্বভারতপতি দেববর্ম্মা কনৌজরাজ যশোবর্ম্মার গৌড়ীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর কোন পূর্ব্বপুরুষ এবং শশাঙ্কের পরবর্ত্তী কোন গৌড়েশ্বর হইতে পারেন। লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগের এই পূর্ব্বভারতপতিকে কামরূপের রাজা বলা যায় না।

দেখা যাইতেছে, রাতবংশীয় জীবধারণ ও তৎপুত্র শ্রীধারণ এবং খড়্গবংশীয় দেবখড়্গ ও তৎপুত্র রাজরাজ সকলেই সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা হইলে অনুমান করা যাইতে পারে যে, মূলতঃ রাতবংশ সমতটে এবং খড়্গবংশ বঙ্গে প্রভাব বিস্তার

করিয়াছিল এবং ই-সিঙের সমতট আগমনের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে খড়্গবংশীয় বৌদ্ধ রাজা দেবখড়্গ রাতবংশ দমন করিয়া সমতটে আধিপত্য স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমপাদে উভয় বংশই পরাক্রান্ত গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের বশ্যতা স্বীকার করিত; কিন্তু শশাঙ্কের মৃত্যুর পর ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে হর্ষবর্দ্ধন ও ভারস্করবর্ম্মার হস্তে গৌড়েশ্বরের পরাজয় ঘটিলে বঙ্গ ও সমতটের খড়্গ ও রাতবংশীয় সামন্তগণ কার্য্যতঃ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন।

এই প্রসঙ্গে জীবধারণের সহিত সামন্তরাজ লোকনাথের সম্পর্কের উল্লেখ করা প্রয়োজন। লোকনাথের বৃদ্ধপ্রপিতামহ জনৈক "অধিমহারাজ" ছিলেন; কিন্তু এই ব্যক্তির পুত্র ছিলেন "মহান্ সামন্ত"। এ বংশের অপর কাহারও স্বাধীন নরপতির উপাধি ছিল না। আবার ত্রিপুরাশাসনের উল্লিখিত অংশ পদ্যে লিখিত; সুতরাং রাতবংশীয়দিগের ন্যায় উক্ত অধিমহারাজের সামন্তত্বসূচক কোন বিরুদ ছিল কিনা, তাহা বুঝা যায় না। যে ভারদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশে করণ লোকনাথের জন্ম হইয়াছিল, উহা কোন্ অঞ্চলে ক্ষমতালাভ করে, তাহাও নির্ণয় করা সম্ভব নহে। তবে লোকনাথের শাসন ত্রিপুরাতে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং সমতটেশ্বর জীবধারণের সহিত তাঁহার সম্পর্কের বিষয় উল্লিখিত আছে; সুতরাং তিনি ত্রিপুরা অঞ্চলেই শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন, ইহা বলা যায়। লোকনাথ সম্ভবতঃ শৈব ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, জয়তুঙ্গবর্ষ নামক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে লোকনাথের পরমেশ্বর অর্থাৎ অধিস্বামীর বহু সৈন্য ধ্বংশ হয়; কিন্তু লোকনাথ ঐ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এই কারণে জীবধারণ নামক রাজা যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীপট্টপ্রাপ্ত করণকে অর্থাৎ অধিস্বামীর নিকট হইতে সামন্তের পদ প্রাপ্ত লোকনাথকে একটি বিষয় ও কতকগুলি সৈন্যের আধিপত্য দান করেন। বলা আবশ্যক যে, আমরা ত্রিপুরা লিপির ৭—৯ম শ্লোকত্রয়ের ব্যাখ্যায় "যস্মিন্" শব্দ "সমরে" শব্দের সহিত এবং "[স]:" শব্দ "জীবধারণনৃপ:" শব্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছি। যাহা হউক, উল্লিখিত শ্লোকত্রয় হইতে মনে হয়, জয়তুঙ্গবর্ষ এবং জীবধারণ লোকনাথের অধিস্বামীর স্বাধীনতাপ্রয়াসী সামন্ত ছিলেন। লোকনাথকর্ত্তৃক জয়তুঙ্গবর্ষের দমন সাধিত হইলে, তাঁহাকে জীবধারণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। জীবধারণকে সম্পূর্ণরূপে দমন করা সম্ভব হয় নাই, কিন্তু তিনি রাজ্যের কিয়দংশে লোকনাথের অধিকার স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তদানীন্তন গৌড়েশ্বর লোকনাথের অধিস্বামী ছিলেন, এইরূপ অনুমান অসম্ভব না হইতে পারে। তবে নূতন আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত এই সমস্যার সম্যক্ সমাধান হইবে না। যদি খড়্গদিগকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে রাতবংশীয়েরা তাঁহাদেরও সামন্ত হইতে পারেন। তাহা হইলে দেবখড়্গকর্ত্তৃক সমতট অধিকারকে রাতবংশীয় রাজগণের স্বাধীনতালাভের ব্যর্থ চেষ্টার পরিণাম বলা যায়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে লোকনাথকে খড়্গদিগের সামন্ত মনে করিতে হয়।

বলা হইয়াছে, শ্রীধারণ স্বীয় পিতার নিকট হইতে আধিরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয়, জীবধারণ জীবদ্দশায় পুত্রের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীধারণ ভগবান্ পুরুষোত্তমের ভক্ত পরমবৈষ্ণব ছিলেন। তিনি শব্দবিদ্যাপ্রভৃতি নানাশাস্ত্রে এবং কলাবিদ্যায় সম্যক্ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহাকে কবি এবং অতিমধুর চিত্রগীতির রচয়িতা বলা হইয়াছে। মধুধুর শব্দটিকে মনোহর অর্থে গ্রহণ করিলে, শ্রীধারণকে চিত্রকার ও গীতিকার বলা হইয়াছে, ইহাও মনে করা যায়। বাংলার প্রাচীন রাজগণের মধ্যে এই সম্মান অনন্যসাধারণ। রাজমালাকার লিখিয়াছেন (পৃষ্ঠা ১৮), ত্রিপুরেশ্বর ধনমাণিক্য (১৪৭৯-১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দ) মিথিলা হইতে গীতবাদ্যবিশারদ ব্যক্তিবর্গকে আনাইয়া স্বীয় প্রজাগণকে গান্ধর্ব্ববিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন এবং গ্রন্থকারের সময়েও ত্রিপুরার রাজবংশধরদিগের মধ্যে কাহাকেও গীতবাদ্যে অনভিজ্ঞ দেখা যায় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, এস্থলে সপ্তম শতাব্দীর একজন ত্রিপুরাপতিকে সঙ্গীত রচয়িতারূপে পাওয়া যাইতেছে। শ্রীধারণের অপর একটি আশ্চর্য্য বিশেষণ হইতে জানা যায় যে, হস্ত্যশ্বপীড়নমূলক ব্যায়ামের ফলে তাঁহার পেশীসমূহের পরিপুষ্টি তদীয় দেহের রমণীয়তার কারণ হইয়াছিল। তিনি অগণিত প্রাণীর প্রাণদান করায় পরমকারুণিকরূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে এই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী নৃপতিকে পশুবলি-রহিতকারী মনে করিতে হইবে কিনা, তাহা বিবেচ্য।

যুবরাজ বলধারণকে প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দ এবং ভট্টারক বলা হইয়াছে। তাঁহার সহিত শ্রীধারণের সম্বন্ধ স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয় নাই; কিন্তু তাঁহার পিতা ও পিতামহের ইঙ্গিত হইতে মনে হয়, তিনি শ্রীধারণের পুত্র ছিলেন। বলধারণের সন্ততির উল্লেখ এবং অপর একটি বিশেষণ হইতে তাঁহাকে প্রৌঢ়বয়স্ক বুঝা যাইতে পারে। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, তিনি মুখ্যতঃ শব্দবিদ্যা এবং গৌণতঃ হস্তী, অশ্ব ও অস্ত্রবিষয়ক বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে, রাতবংশীয়েরা শব্দবিদ্যা অর্থাৎ ব্যাকরণ ও অভিধানের উৎসাহী ছাত্র ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের সাহিত্যানুরাগই ইহার কারণ।

শাসনের পরবর্ত্তী অংশ হইতে জানা যায়, শ্রীধারণের মহাসন্ধিবিগ্রহাধিকৃত অর্থাৎ সমরবিভাগের মন্ত্রী জয়নাথ একটি বৌদ্ধবিহারের এবং কতিপয় কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে দান করিবার জন্য রাজার নিকট কিঞ্চিৎ ভূমির প্রার্থনা জানাইয়া আবেদন করেন। ইহার উত্তরে নরপতি পঞ্চবিংশতি পাটক ভূমি দান করেন। তন্মধ্যে কতিপয় পাটক বৌদ্ধবিহারের জন্য এবং কয়েক পাটক ব্রাহ্মণদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। আমরা পূর্ব্বে কুল্যবাপের ভূমি পরিমাণ আলোচনা করিয়াছি; এক পাটক ভূমি পাঁচ কুল্যবাপের সমান। আধুনিক মাপে এক পাটক ভূমির পরিমাণ ১৯০ বিঘার কম হইবে না। এস্থলে একই ব্যক্তিকে বৌদ্ধধর্ম্ম এবং পণ্ডিতব্রাহ্মণবর্গের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল দেখা যাইতেছে। ইহা হইতে প্রাচীন বাংলার ধর্ম্মবিষয়ক উদারদৃষ্টি ও সমন্বয়ের চেষ্টা সূচিত হয়।

প্রদত্তভূমির সীমার প্রসঙ্গে বহু স্থানাদির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ত্রিষ্‌থলিকা ও আম্রাগঙ্গা নামক নদী এবং দশগ্রাম নামক স্থান উল্লেখযোগ্য। এপ্রসঙ্গে বিল্ল (বিল), নৌদণ্ড (নাও-দাঁড়া বা নৌপথ), নৌপৃথ্বী, নৌস্থিরবেগা, নৌশিবভোগা, সব্যজন প্রভৃতি স্থানীয় শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আধুনিক ত্রিপুরা বা পার্ব্বত্য ত্রিপুরার অধিবাসী কোন অভিজ্ঞ পাঠক যদি শাসনে উল্লিখিত স্থান, নদী ও পর্ব্বতের অবস্থান এবং স্থানীয় শব্দের অর্থ নির্ণয়ে সাহায্য করেন, তাহা হইলে আমরা অত্যন্ত উপকৃত হইব।

কিশলয়

শ্রীমোহিতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পার্কে চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম।

বৃদ্ধ বয়সে এই এক নেশা আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। কোলাহলহীন নির্জ্জন স্থান নয়; এধারে ওধারে প্রাণবন্ত ছেলের দল দাপাদাপি করে। ঐ দিকে চাহিয়া নিজের কিশোরবয়সের নানা কথা নূতন করিয়া মনে পড়িতে থাকে; ক্ষণকালের জন্য বয়সের দীর্ঘ ব্যবধান যেন ভুলিয়া যাই।···

অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিব মনে করিতেছিলাম, হঠাৎ কোথা হইতে একটী বছর নয়েকের ছেলে আমার বেঞ্চের একধারে আসিয়া বসিল। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম কেহ কোথাও নাই, উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করিলাম—'তোমার সঙ্গে কেউ আসে নি, খোকা?'

ছেলেটী মুখ ফিরাইয়া আমাকে একবার দেখিয়া লইয়া বলিল—'কি রকম ইরেসপন্‌সিব্‌ল দেখুন তো! দাদার সঙ্গে খেলা দেখতে এসেছিলাম, তা ইয়ারদের নিয়ে কোন দিকে যে হাওয়া হয়ে গেল।'

তাহার বাক্‌চাপল্যে একটু বিরক্ত হইলাম। আমাদের কালে এই জাতীয় প্রগল্‌ভতা কল্পনার বাহিরে ছিল। তবুও বলিলাম—'তোমার বাড়ী কোথায়?'

'ভবানীপুরে।'

'বাড়ী চিনে যেতে পারবে না?'

প্রশ্ন শুনিয়া ছেলেটী যেন রুষ্ট হইয়া উঠিল; 'কিন্তু কহিল—'যাই কি করে। ট্রাম ফেয়ারও যে দিয়ে যায় নি।'

অগত্যা কহিলাম—'চলো, আমি পৌছে দিচ্ছি, আমি ঐ দিকেই থাকি।'

ছেলেটী তৎক্ষণাৎ মাথা ঝাঁকা দিয়া বলিল—'না যাবো না; ভেবে মরুক সব। দেখবেন পরশু ঠিক বিজ্ঞাপন বেরুবে—দুলাল, ফিরে আয় বাবা। যতো সব, বোগাস্‌।'

দুলাল রাগ করিল। হাত দুইটা আড়াআড়ি ভাবে বগলে চাপিয়া মুখ গোঁজ করিয়া রহিল।

রাগে অভিমানে তাহাকে সুন্দর মানাইয়াছিল। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে বলিয়া মনে হয়, কেশ বেশ কথা কোনোটাই বয়সোপযোগী না হইলেও কৌতুক বোধ করিতেছিলাম। তাহার স্ফুরিত ওষ্ঠে, দৃঢ়সন্নিবদ্ধ বাহুযুগলে চিরন্তন কিশোরের রূপ ফুটিয়া উঠিতেছিল।

হাসিয়া বলিলাম—'রিক্সা বা গাড়ীতে করে যাও না কেন? বাড়ী যেয়ে ভাড়া দেবে।'

দুলাল উত্তর করিল—'রিক্সা? 'সোল্‌জার' চড়িয়ে ওদের নজর উঁচু হয়ে গেছে, মশাই। গাড়ীটা হয় তো কোনো আড্ডায় নিয়ে যেয়ে হাজির করবে।'

এও জানে দেখিতেছি। চাবুক খাইয়া আমার হাসি বন্ধ হইয়া গেল। সারা মন বিরূপ হইয়া উঠিল। সত্যই তো, আমার কি দায়। যে বালক অগ্রজের দায়িত্ব-হীনতার প্রশ্ন তুলিতে পারে, নিজের দায়িত্ব লইবার বয়স তাহার যথেষ্ট। নব্য যুগের বালক, জানে না কি!

আর অপেক্ষা করিলাম না।

পথ চলিতে চলিতে মন আবার কোমল হইয়া উঠিতে লাগিল। বালকটী অকালপক্ক, দাম্ভিক, কিন্তু তাহাকে যে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া আসিলাম।

ফিরিতে হইল। কিছু দূর হইতেই শুনিলাম, কে যেন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে।

বেঞ্চের কাছে আসিয়া আমার সকল ক্ষোভ মিটিয়া গেল। অবোধ বালক বেঞ্চের উপরে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে এবং ছন্দোহীন ভাষায় তাহার উদ্বেলিত অভিমান বাহির হইয়া আসিতেছে।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

মূল :—আর বৈদেহকান্তেবাসিগণ ইহাকে সমিদ্ধ-যোগ-দ্বারা অর্চ্চিত করিবে।

সঙ্কেত :—এই অংশ ও ইহার পরবর্ত্তী অংশের অর্থ অতি দুরূহ। বৈদেহকান্তেবাসিগণ—(ক) তাপসের নানা শ্রেণীর শিষ্য চর থাকিবে—তাহাদিগের কেহ কেহ বৈদেহক অর্থাৎ বণিক্—বণিগ্‌জাতীয় শিষ্যবর্গ ; (খ) অথবা, বৈদেহকব্যঞ্জন চরের শিষ্যবর্গ—ইহারাও তাপসের ভক্ত ; (গ) শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ—Merchant spies pretending to be his disciples—তাপসের শিষ্য বলিয়া ভাণ করে এমন বণিগ্‌জাতীয় চর। সমিদ্ধ যোগ—এই শব্দটির অর্থ বুঝা যায় না। গঃ শাঃ দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন—সমৃদ্ধ যোগ, ইষ্টার্থলাভ ; তাৎপর্য্য—অভীষ্ট অর্থ প্রদান দ্বারা তাপসকে পূজা করিবে ; (ঘ) অথবা—'তাপস-প্রসাদে আমরা সমৃদ্ধ হইয়াছি'—ইত্যাদি প্রকার কপট উক্তি করিয়া ধন-মানাদি দ্বারা তাপসকে পূজা করিবে। শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ—may worship him as one of preternatural powers. আমাদিগের মনে হয়—এ অর্থ অনেকটা মূলানুগ—সমিদ্ধ—প্রদীপ্ত ; যোগ—বিভূতি, অলৌকিক শক্তি ; তৃতীয়া (সমিদ্ধযোগৈঃ) উপলক্ষণে—সমিদ্ধ-যোগ-বিশিষ্ট বলিয়া (অর্থাৎ অতি সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান অলৌকিক শক্তিযুক্ত বলিয়া) তাপসকে পূজা করিবে।

মূল :—আর ইহার শিষ্যগণ প্রচার করিবে—'উনি সিদ্ধ সামেধিক'।

সঙ্কেত :—এই শিষ্যগণ—তাপসব্যঞ্জন শিষ্য। আবেদয়েয়ুঃ—আবেদিত করিবেন—জনসমাজে প্রখ্যাপিত করিবেন—shall proclaim (SH)। সিদ্ধ—সিদ্ধপুরুষ। সামেধিক—ইহার অর্থ-বোধ করা কঠিন। গণপতিশাস্ত্রীর মতে—'সমেধা' শব্দের অর্থ 'ভাবিনী সম্পত্তি,' সামেধিক—তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ—ভাবি-সম্পৎ-পরিজ্ঞানে অভিজ্ঞ। শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ—accomplished expert of preternatural powers. সম্ভবতঃ সমিদ্ধযোগ ও সামেধিক—সমানার্থক বলিয়া শ্যামশাস্ত্রী অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। পরবর্ত্তী বাক্যে 'সমেধাশাস্তিভিঃ' পদ আছে, আর উহার অনুবাদে লিখিয়াছেন—desirous of knowing their future. অতএব, সামেধিক ও সমেধা পদের অর্থ অলৌকিক শক্তি নহে। গঃ শাঃ যে 'ভাবিনী সম্পত্তি' অর্থ করিলেন—এ সম্বন্ধেও কোন প্রমাণ দেন নাই। কোন অভিধানেও 'সামেধিক' শব্দ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, 'মেধ' শব্দের অর্থ যজ্ঞ। মেধের সহিত বর্ত্তমান—এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে 'সমেধ'—অর্থাৎ যজ্ঞকারী যজমান। সামেধিক—যিনি যজমানের ঋত্বিগ্‌রূপে যজ্ঞানুষ্ঠান করে। সিদ্ধ সামেধিক—বহু যজ্ঞানুষ্ঠাতা অভিজ্ঞ যাজ্ঞিক—এরূপ অর্থ করা চলে। তাহা হইলে সমেধাশাস্তি—যজ্ঞানুষ্ঠানে অভিলাষী এরূপ অর্থও করা চলে; কিন্তু তাহাতেও পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তিগুলির সহিত ঠিক অন্বয় হয় না। এ কারণে—'সামেধিক' বলিতে 'ভবিষ্যদ্-বেত্তা' ও 'সমেধা' বলিতে 'ভবিষ্যৎ' এইরূপ একটা অর্থ অনুমান করিয়াই নিরস্ত হইতে হইল। এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করা গেল না।

মূল :—ভবিষ্যৎ (জানিবার) আশায় সমাগত (জনগণের) বংশে নিষ্পন্ন কর্ম্মসমূহ অঙ্গবিদ্যা ও শিষ্য-সংজ্ঞা দ্বারা বলিবেন—অল্প লাভ, অগ্নিদাহ, চোরভয়, দূষ্যবধ, তুষ্টিদান, বিদেশবার্ত্তা-জ্ঞান—'ইহা আজ বা কাল হইবে, অথবা ইহা রাজা করিবেন'।

সঙ্কেত :—সমেধাশাস্তিভিশ্চাভিগতানাং (মূল)—ভাবি সম্পদ্-বিজ্ঞানের অভিলাষে উহার বিষয়ে প্রশ্ন করিতে সমাগত জনগণের (নিকট বলিবেন), regarding those persons who, desirous of knowing their future, throng to him (SH). অঙ্গবিদ্যা—শরীরাবয়বসমূহ প্রশ্ন করিবার সময়ে যেরূপে চালিত হয়, তাহা হইতেই শুভাশুভ সূচিত হইয়া থাকে—এইরূপ শুভাশুভ-জ্ঞান জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অঙ্গ ; এই বিদ্যার নাম অঙ্গবিদ্যা ; কাহারও কাহারও মতে 'পুষ্পশকটী'—ইহার নাম—পরন্তু গণপতি শাস্ত্রী 'পুষ্পশকটী' 'আকাশবাণী'র নামান্তর বলিয়াছেন। আমাদিগের মনে হয়—অঙ্গবিদ্যা—শরীরের নানা অঙ্গ দর্শনে শুভাশুভ বলিবার বিদ্যা—সামুদ্রিক। শ্যামশাস্ত্রী palmistry বলিয়াছেন ; কেবল palmistry নহে—অন্য অঙ্গ দর্শনেও ভাবী শুভাশুভ বলা যায়—উহাই অঙ্গবিদ্যা। শিষ্য-সংজ্ঞা—অঙ্গবিদ্যার সাহায্যে শুভাশুভ বলা ত শক্তির পরিচায়ক। পক্ষান্তরে, শিষ্যগণের চক্ষুর ইঙ্গিত, ভ্রূ-কুঞ্চনাদি দ্বারাও চতুর গুরু আগন্তুকের নানাবিষয়ক শুভাশুভ অনুমান করিয়া বলিতে পারেন—যাহাতে প্রশ্নকারী আগন্তুক স্তম্ভিত হইয়া যায়। শিষ্যেরা একজনকে গোণাইতে আসিল। তাহারা পূর্ব্ব হইতে তাহার সম্বন্ধে নানা সংবাদ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। গুরুকে চক্ষুর ইঙ্গিতে, হস্তপদাদির সঞ্চালনে বা অন্য কোনরূপ ভাবপ্রকাশক সাঙ্কেতিক অঙ্গভঙ্গী দ্বারা গুরুকে তাহাদের জ্ঞাত তথ্য জানাইয়া দিল। গুরু ও শিষ্যের এই মূক ভাব-বিনিময় এভাবে নিষ্পন্ন হইল যে তাহা আগন্তুকের দৃষ্টিতে পড়িল না—অথবা পড়িলেও এই সকল আপাততঃ স্বাভাবিক অঙ্গ-সঞ্চালনে আগন্তুক কোন সন্দেহের আভাস পাইল না। তখন গুরু তাপস আগন্তুকের বংশে সঙ্ঘটিত অতীত ঘটনাবলী এমন বিশুদ্ধভাবে বলিয়া দিলেন যে সে ব্যক্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িল।

ভবিষ্যৎ জানিবার আশায় সমাগতগণের নিকট তাপস অঙ্গবিদ্যা ও শিষ্যগণের ইঙ্গিতের সাহায্যে নানা কর্ম্মের কথা বলিবেন—যে সকল কর্ম্ম উহাদিগের (জিজ্ঞাসুগণের) বংশে পূর্ব্বে পূর্ব্বে সঙ্ঘটিত হইয়াছে—কর্ম্মাণি অভিজনে অবসিতানি (মূল)—ইহা গণপতি শাস্ত্রীর ব্যাখ্যা।

শ্যামশাস্ত্রী 'অভিজন' অর্থে আগন্তুকের নিজ বংশ বুঝেন নাই—বুঝিয়াছেন—'উচ্চ বংশে জাত অভিজাত-বংশোদ্ভব—concerning the works of high-born people of the country. কিন্তু আমাদের মনে হয়—ঐরূপ বলায় কোন কৃতিত্ব নাই। দেশের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের বংশে সঙ্ঘটিত অতীত ঘটনাবলী অনেকেরই জানা থাকা সম্ভব—উহা বলায় কৃতিত্ব কতটুকু! পক্ষান্তরে, জিজ্ঞাসুর বংশে সঙ্ঘটিত অতীত ঘটনাবলী সকলের পক্ষে জানা সম্ভব নহে—উহা বলাই কঠিন। আদিশেৎ—নির্দ্দেশ করিবেন—বলিবেন (গঃ শাঃ) ; foretell (SH) —ইহা ঠিক নহে—অতীত ঘটনাকে foretell করা যায় কি? শ্যামশাস্ত্রী আরও বলিয়াছেন—foretell such future events—ইহাও মূলানুগ নহে। মূলে আছে—কর্ম্মাণ্যভিজনে অবসিতানি—বংশে যে সকল কর্ম্ম সমাপ্ত (নিষ্পন্ন—সঙ্ঘটিত) হইয়া গিয়াছে—অর্থাৎ বংশে সঙ্ঘটিত অতীত ঘটনাবলী (বলিয়া দিবেন)। অতীত বলিয়া প্রশ্নকর্ত্তার মনে বিশ্বাস জন্মাইলে—তিনি তখন ভবিষ্যৎ জানিতে চাহিবেন—ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক; আর সে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী কিরূপ হইতে পারে, দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহার একটা তালিকা দেওয়া হইতেছে—অল্প লাভ—কিঞ্চিৎ ধনপ্রাপ্তি। দূষ্যবধ—যাহারা দোষকারী (রাজদ্রোহী)—তাহাদিগের বধের কথা বলিবেন—'তোমার বংশে অমুক অথবা তুমি এই দোষে বধদণ্ড প্রাপ্ত হইবে'। তুষ্টদান (পাঠান্তর তুষ্টিদান)—সন্তোষ নিমিত্ত অর্থদান (গঃ শাঃ) ; reward for the good (SH) ; reward by the pleased (king)—বলা উচিত। বিদেশ প্রবৃত্তিজ্ঞান—প্রবৃত্তি অর্থে বার্ত্তা, সংবাদ, খবর, news—ইহাও নির্দ্দেশিত করিতে হইবে। আর প্রত্যেকটি ভবিষ্যদ্‌বাণী কি ভাবে তাপস বলিবেন, তাহারও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে—'ইহা আজ বা কাল হইবে,—ইহা আজ বা কাল রাজা করিবেন'—ইত্যাদি প্রকার বাক্য বলিয়া ভবিষ্যদ্‌বাণী করিবেন।

মূল :—উঁহার গুপ্তসত্রিগণ ইহার যথার্থতা সম্পাদন করিবে।

সঙ্কেত :—তৎ—তাপসের সেই নির্দ্দেশ বা ভবিষ্যদ্‌বাণী—যথা, অল্প লাভ, অগ্নিদাহ, চোরভয় ইত্যাদি। অস্য—তাপসের। গূঢ় সত্রিগণ—সত্রীর লক্ষণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে। সংবাদয়েয়ুঃ—মিলাইয়া দিবে—তাপসের বাক্যের সত্যতা সম্পাদন করিবে; কিরূপে?—প্রচ্ছন্নভাবে কিছু অর্থ তাহার গৃহে রাখিয়া দিবে—তাহাতে স্বল্পলাভ সিদ্ধ হইল;—গোপনে ঘরে আগুন লাগাইয়া দিবে—ফলে অগ্নিদাহ সফল হইল ইত্যাদি। শ্যামশাস্ত্রী—shall corroborate (by facts and figures). পাঠান্তর—সম্পাদয়েয়ুঃ—সম্পাদিত করিবে। উভয় পাঠের তাৎপর্য্য একই। ভবিষ্যদ্‌বাণী মিলাইতে হইলে গোপনে ঐ সকল কার্য্য সম্পাদিত করিতে হইবে। Jollyও বলিয়াছেন—"The sense remains the same."

মূল :—সত্ত্ব-প্রজ্ঞা-বাক্য-শক্তিসম্পন্নগণের (সম্বন্ধে) রাজসমীপে প্রাপ্য (ধনমানাদি পুরস্কার) ও মন্ত্রি-সংযোগের বিষয় বলিবেন। আর মন্ত্রী ও ইহাদের সম্বন্ধে বৃত্তি-কর্ম্ম (-প্রদানাদি-) দ্বারা বিশিষ্ট যত্ন করিবেন।

সঙ্কেত :—সত্ত্ব—ধৈর্য্য (গঃ শাঃ) ; সারবত্তা, দৃঢ়তা, personality শ্যামশাস্ত্রী অনুবাদ করেন নাই। প্রজ্ঞা—বুদ্ধি ; foresight (SH) talent or intelligence বলা উচিত। বাক্য—বাগ্মিতা, eloquenc (SH)। শক্তি—প্রভুশক্তি (গঃ শাঃ) ; শারীরিক শক্তিরও প্রয়োজন Bravery, (SH) ; strength, valour. তাৎপর্য্য—যে সকল প্রশ্নকর্ত্ত সত্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট তাহাদিগের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিবেন (তাপস ব্যঞ্জন)—'শীঘ্রই রাজার নিকট হইতে ধনমানাদি পুরস্কার লাভ ঘটিবে ও মন্ত্রীর সহিত মিলন হইবে'। রাজভাব্য (মূল)—রাজসমীপে লভ্য ধনমানাদি ; rewards...likely to receive at the hands of the king (SH)। মন্ত্রিসংযোগ—মন্ত্রিসমাগম, মন্ত্রিবর্গের সহিত মিলন, মন্ত্রিগণের সহিত পরিচয় ; শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ মূলানুগ নহে—probable changes in the appointments of ministers—এই প্রকরণ হইতে এরূপ অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বরং—probable connexion with ministers—বলা চলে। আর মন্ত্রীও ভবিষ্যদ্‌বাণী যাহাতে সফল হয়, সে বিষয়ে অবহিত থাকিবেন। এই সকল ব্যক্তির বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা ও কর্ম্ম যাহাতে লভ্য হয়, তদ্বিষয়ে বিশিষ্টভাবে যত্ন করিবেন—ইহাদের সত্ত্ব-প্রজ্ঞা-বাক্য-শক্তির অনুরূপ বৃত্তি-কর্ম্মের ব্যবস্থা করিবেন—ইহাই তাৎপর্য্য। শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ উচ্ছৃঙ্খল—বৃত্তি-কর্ম্মের কোন কথাই উহাতে নাই।

মূল :—আর যাহারা কারণবশতঃ অভিক্রুদ্ধ, তাহাদিগকে অর্থ ও মান দ্বারা শান্ত করিবেন ; অকারণ-ক্রুদ্ধ ও রাজদ্বেষিগণকে গুপ্তদণ্ডের দ্বারা প্রশমিত করিবেন।

সঙ্কেত :—কারণবশতঃ অভিক্রুদ্ধ—যাহারা রাজকৃত অপকারহেতু ক্রুদ্ধ বলিয়া কাপটিকাদি চর-মুখে মন্ত্রী জানিতে পারিবেন, তাহাদিগকে অপকারের ক্ষতিপূরণ স্বরূপে অর্থ-মান প্রদান করিবেন, যাহাতে তাহারা শান্ত হয় (অর্থাৎ অন্তঃস্থিত ক্রোধ পরিত্যাগ করে)। অকারণ-ক্রুদ্ধ—যাহারা বিনা কারণে রাজার উপর ক্রুদ্ধ। রাজদ্বিষ্টকারিণঃ—যাহারা রাজার বিদ্বেষী—যাহারা রাজার প্রতি বিদ্বিষ্ট আচরণ করে ; plotting against the king (SH)। দ্বেষ—অপকার। তূষ্ণীং দণ্ডেন—উপাংশুবধ (গঃ শাঃ) ; গোপনে বধাদি-দণ্ড-প্রয়োগ-দ্বারা ; punishments in secret (SH)।

মূলঃ —নৃপকর্ত্তৃক অর্থ-মান (প্রদান) দ্বারা পূজিত হইয়া (গূঢ়পুরুষগণ) রাজোপজীবিগণের শুচিতা-পরিজ্ঞানে সমর্থ যাহাতে হইতে পারেন—এতদর্থে এই পঞ্চসংস্থা প্রকীর্ত্তিত হইল।

সঙ্কেত :—রাজোপজীবিনাম্—রাজার পরিজনবর্গের—অমাত্যাদির। শুচিতা—শুদ্ধি, purity (SH)। পঞ্চসংস্থা—কাপটিক, উদাস্থিত, গৃহপতি, বৈদেহক ও তাপস—এই পঞ্চবিধ চার (চর) বা গূঢ়পুরুষের শ্রেণী। সংস্থা—কর্ম্মস্থান, শ্রেণী, বর্গ, institute (SH)।

"ইতি শ্রীকৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বিনয়াধিকারিক-নামক প্রথম অধিকরণে গূঢ়পুরুষোৎপত্তি-নামক সপ্তম প্রকরণে একাদশ অধ্যায়॥

১৩

কয়েকদিন কাজে অকাজে কাটছে। আপিস থেকে মঞ্জুর হয়েও এসেছে। o/cর সঙ্গে দেখা করে ক্তারের ধোঁকাও মিটেছে—মাণিকের কথাই ঠিক্।

সামরিক সারভিস্ সম্পর্কে কথা আবার উঠেছিল, ক্তার তাতে বলেন—"আমার প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে, পনি নিজের (position) মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করবেন না। মার পক্ষে ওটা আশাতীত unexpected boon াও, আমার deplomaয় যে কুলুবে না হুজুর—alificationএ বাধবে।—Practically না বাধলেও র্টিফিকেট যে সায় দেবে না। আপনাকে আমি সে াস্থায় ফেলতে চাই না সার্।" শুনে তিনি Pooh ালেন। বললেন—ও সব peace timeএর 'সেফ্-ার্ড'। কাজ কর্ম্ম না থাকলে ওই সব নিয়েই লোক াকে—কাজ চাই তো!" বলে' হাসলেন। ও সব ন্তা রেখ না, তুমি আমার personal staffএ থাকবে, ামার হোমিওপ্যাথী বইগুলো পড়বে। কাজকর্ম্ম ামার asst সহকারী করবে। অস্ত্রোপচার দরকার লে তুমি করবে। ভয়ের কোনো কারণ নেই, ইত্যাদি। ামার সহকারী কে—বুঝেছ তো?

মাণিক বড় ভাবছিল, বললে—"তবে আর খুড়োর কথা াবব না।—এখন ছুটিটা কবে নেওয়া হবে? কাজ তো াসছে শুক্রবার"—

"হ্যাঁ হে—তাও তো বটে! সে আর কটা দিন? দেখো দিকি, বেশ ছিলুম, কি হাঙ্গামের কথা আবার লেলে!"

"একদিন তো করতেই হোতো হুজুর! পুষে রাখলেই ন্তা, সেরে ফেললেই শান্তি।"

"তা ঠিক্ বটে! আচ্ছা, এটা তো আমার উপনয়ন য়—আমি নাই গেলুম।"

"তা কি হয় সার্! এ আমার মায়ের কাজ, তাঁর াথে বাদ সাধা হবে। মন নিয়ে কথা, তিনি কি ভাববেন বলুন দিকি! বাড়িতে মেয়েরা আসবেন, তিনি মুখ তুলে কথা কইতে পারবেন না।—এমন বিভ্রাট বাধাবেন না।"

"আমি না গেলে বেশ সুশৃঙ্খলে সব হয়ে যেত, তুমি বুঝচো না মাণিক।"

"কিছু কিছু বুঝছি সার্", বলে মাণিক মৃদু হাসলে। —কাজের দিকে আমি থাকবো, আপনাকে কিছু করতে হবে না—আপনার যাওয়াটি কেবল চাই।

ডাক্তার মাথা চুলকে বললেন—"বেশ, কিন্তু আমাকে কিছু বলতে বা দোষ দিতে পারবে না।"

মাণিক। আপনি কেবল বাড়িতে থাকবেন। "গোল্ড ফ্লেক্" এক ডজন এনেছি। সে কাজে তো দোষের কিছু নেই। তবে রিপোর্টের মালিকদের নিজে গিয়ে বলে' আসবেন।

ডাক্তার। তা পারবো।

মাণিক কাজে গেল, কথা থেমে গেল। ডাক্তার পোষ্টকার্ডের প্যাকেট নিয়ে বসলেন।

বুধবার সন্ধ্যার পর গা-ঢাকা অবস্থায় ডাক্তার বিনোদ নিজের পূর্ব্ব আস্থানায় এসে পড়েছেন—বাড়ীতে ঢুকতে ইতস্ততঃ করছেন—যেন পরের বাড়ী! বাইরেই পা-ঘষছেন। উৎসাহ নেই। এদিক উদিক চেয়ে—

"ওহে মাণিক—তারপর?"

মাণিক। তারপর আবার কি মশাই? ভেতরে যান দেখাশোনা করুন,খবর নিন্। আমি বাইরের ঘরেই আছি।

ডাক্তার। হ্যাঁ, কোথাও যেও না, এক সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া। তবে যাই?

মাণিক। যাবেন বইকি, অতো 'কিন্তু' হচ্ছেন কেনো? কি করতে তবে এলেন?

ডাক্তার। তুমিই তো আনলে। এখন কি মুস্কিল বলোদিকি!

মাণিক। মুস্কিলটে আবার কি? মাকে তবে আমিই ডাকি?

"না, না, আমিই যাচ্ছি।"

"টুপিটে খুলে যাবেন" বলে মাণিক নিজে নিজেই হাসলে।

ইতস্তত করা আর ভালো দেখায় না! বিনোদ সবেগে অন্দরে ঢুকে পড়লেন। রাণী দালানেই দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন, তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে পালালেন।

বিনোদ। ওগো আমি—পালাচ্ছ কেন?

রাণী। রান্নাঘরে পিসিমা আছেন। যাও, আগে তাঁর সঙ্গে…

"হ্যাঁ. ঠিক্ বলেছ" বলে' রান্নাঘরের দিকে গেলেন।

রাণী অঠিক বলেন নি। মেয়েদের রকমারি লজ্জার মধ্যে প্রথম সন্তানের বিজ্ঞাপন হওয়াটাও একটা। রাণীর ঠিক কথাটির পশ্চাতে সেটাও (ক্ষণিকের হলেও) ঠিক ছিল। যাক্—

ওদিকে বিনোদকে পেয়ে পিসিমার আশীর্ব্বাদ ও আনন্দ আর শেষ হতে চায় না।

বিনোদ কি বলবে খুঁজে না পেয়ে বললে—"অ্যাতো রান্না আজ কেনো পিসিমা?"

"সে কি কথা বাবা—তোমরা আসছো…"

"আজ আসব—জানতে নাকি!"

"পাগল ছেলে—চিঠি লিখেছ জান না?

"ও: আমার কম্পাউণ্ডার মাণিক লিখে থাকবে। ভালই করেছে। সেও এখানেই থাবে।"

"তা জানি। বউমার সঙ্গে দেখা করেছ?"

"আগে তোমার সঙ্গে দেখা না করেই?"

শুনে খুব খুশি হলেন, অন্তরটা জুড়িয়ে গেল। এমন মধুর কথা তাঁকে শোনাবার তো কেউ নেই। বললেন—"যাও বাবা, দেখা কর গে। মেয়েদের এ অবস্থায় মন যাতে প্রসন্ন থাকে তা করতে হয় বাবা। যাও, দেখা করগে। বেঁচে থাকো, ভালো থাকো।" ইত্যাদি—

বিনোদ নিজের ঘরে ঢুকে দেখলেন—মেঝেয় মাদুর পেতে, একটা ছোট বালিস নিয়ে, একখানা সবুজ রংয়ের র‍্যাপার গায়ে, হাতে "নীলদর্পণ"—রাণী শুয়ে। বিনোদ ঘরে ঢুকতেই র‍্যাপার সামলাতে সামলাতে রাণী তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন। গোল্ড কলারের ঢাকন দেওয়া জুয়েল্ ল্যাম্পের আলোয় বিনোদ যেন প্রতিমা দর্শন করলেন। স্বাস্থ্যে বর্ণে—রাণী কানায় কানায় পূর্ণ—নত চক্ষে নীরব।

কথায় পণ্ডিত হলেও বিনোদ কথা না পেয়ে বললেন—"কেমন আছ?"

একটু সলজ্জ হাসি টেনে মৃদুকণ্ঠে রাণী বললেন—"দেখতেই তো পাচ্ছ মোটা হয়েছি, নড়তে চড়তে কষ্ট হয়।"

"সে শুধু মোটা হবার জন্যে নয়।"

রাণী একটি ছোট্টো "যাও" বলে', গায়ের কাপড় টানলেন।—"ডাক্তারি করতে কেউ বলছে না। নন্দবাবু বলে' গেছেন—সেখানে তোমার খাবার শোবার বড় কষ্ট। সে দেশে কি মানুষ থাকবার মত ঘর মেলে না? আমি সব শুনেছি।"

বিনোদ। দিন তো কেটে গেছে রাণী।

রাণী। বেশী দূর তো ছিল না, এর মধ্যে কি একবার আসতে নেই!

"বোধ হয় আসতুম, কিন্তু পিসিমার পত্রে খোলসা সুখবরটা পেয়ে, সে রোগের রাজ্যি থেকে—ইচ্ছা করেই আসিনি। এখন যে আর একজনের কথাও"—

"যাও, কেবল ডাক্তারি। আর কাজ নেই, এখন মুখ হাত ধোও তো।"

"ও:, তাও তো বটে। মাণিক বাইরের ঘরে একা বসে' আছে। চা-টা যে আগে দরকার—ইস্!"

"যাও না, নিজেই দেরী করছ।"

"হ্যাঁ—সে এখানে খাবে"—

"আ:—সে জানি। কেবল বাজে কথা।"

"আজ যেন দোলপূর্ণিমে—দেহে স্বর্ণাভা, গায়ে সুন্দর সবুজ, হাতে নীল (দর্পণ), পায়ে আলতা, কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে—"

রাণী রাগতঃ ভাবে—"তবে তিনি একাই বাইরে বসে' থাকুন!"

বিনোদ। না—এই যে চললুম। চা-টা—

"বাইরে 'বটুয়া' আছে, শীগগির ডেকে দাও তাকে।"

"সে আবার কে?"

"আ: চাকর গো! একটা boy রেখেছি।"

"বাঁচালে—বড় ভালো কাজ করেছ" বলতে বলতে বিনোদ বাইরে গেলেন।

*   *

বিনোদ। বড় দেরী হয়ে গেল মাণিক। তাই তো বাড়ী ঢুকতে চাচ্ছিলুম না।—

মাণিক। কই, দেরী তো হয়নি।

বিনোদ। দেখছি আজ আমাদের আসবার কথাটা তুমি এঁদের জানিয়েছ, কই আমাকে তো বলনি।

মাণিক। আপনি যে এখানকার কোনো কাজ করবেন না বলেছেন।

বিনোদ। তা তো এখনো বলছি। আমার ওপর ভার থাকলে চিঁড়ে খেয়ে থাকতে হ'ত। এইবার হাত মুখ ধুয়ে ফ্যালো, আমিও ধুই। জলটা আনি···

মাণিক। বটুয়া (boy) একবালতি জল, লোটা, সাবান,তোয়ালে দিয়ে—চা আর জলখাবার আনতে গেছে।

বিনোদ। ওহো, আমাকে যে তাকে শীগগির পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। ইস্—বড় ভুল হয়ে গেছে—

মাণিক। ভুল আর হয়েছে কই, সবি তো এসে গেছে।

বটুয়াকে দেখে বিনোদ অবাক—এমন expert ছেলে পেলেন কোথা।

মাণিক। পাবেন আর কোথা—তাঁর trainingএ হয়েছে। সংসারের লক্ষ্মী যে ওঁরাই, আমরা তো অসারের ঝক্কি।

বিনোদ। কেনো—চাকরিটে বুঝি··

মাণিক। থাক মশাই, সে বিরাট পর্ব্ব আর আরম্ভ করবেন না, চা জুড়িয়ে যাবে।

চা ফেলে জলযোগ চললো। সেই ফাঁকে বটুয়া বাইরের ঘরের তক্তপোষে ধপ্ ধপে শয্যা রচনা করে', মশারি খাটিয়ে রেখে গেল।

মাণিক। দেখছেন, অনেকদিন পরে আজ পা ছড়িয়ে শুয়ে বাঁচবো। আজ আর বাদুড়-ঝোলা নয়।

বিনোদ। সব রকম অভ্যাস থাকা ভালো হে, কখন কি অবস্থায় পড়া যায়। নেপোলিয়ন ঘোড়ায় বসে ঘুমুতেন! আবার যুদ্ধের সূচনা ঝুলছে।

মাণিক। আজ তো ঘুমিয়ে বাঁচি মশাই।

বিনোদ। ভোরে উঠতে হবে কিন্তু।

মাণিক। আপনাকে তো নয়!

বিনোদ। কর্ত্তাদের সঙ্গে দেখাটা যে আমার ওপর রেখেছে।

মাণিক। হ্যাঁ, সেটা আপনাকেই করা চাই।

কথাবার্ত্তায় রাত দশটা হ'ল। খাবার জন্যে ডাক পড়লো। পিসিমার আদরে, যত্নে, আহারও প্রচুর হ'ল।

মাণিক বললে—"বিদেশে বেরিয়ে পর্য্যন্ত ব্যঞ্জনের এ আস্বাদ আর ভাগ্যে জোটেনি।"

শুনেছি মেয়েরা নাকি রান্নার খুৎ বা অপর মেয়ের রূপের সুখ্যাতি উপভোগ করতে পারেন না। মাণিকের কল্যাণে আজ পিসীমার আশীর্ব্বাদ আদায় করে সব উঠলেন। শেষ তিনি বললেন—"কাজটি যাতে ভাল হয় তাই কোরো বাবা।"

মাণিক—"কিছু ভাববেন না মা, আপনার আশীর্ব্বাদে সব ভালই হবে," ইত্যাদি। বাইরে এসে ডাক্তারকে বললে—"মাপ করবেন, আমি আজ আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না—শুয়ে পড়বো—ধপ্ ধপে বিছানা আমাকে অনেকক্ষণ টানছে। আবার ভোরে উঠতে হবে। আপনিও শুয়ে পড়ুন গিয়ে।"

বিনোদকে সে দাঁড়াতে দিলে না।

মন্বন্তরের পুনরাবির্ভাব

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

কথাটা হইল "মন্বন্তর" অর্থাৎ এক মনুর কাল অন্তে অপর মনুর আগমনের সূচনায় দেশের মধ্যে আকাল, অন্নাভাব, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দেখা দিত। প্রকৃতপক্ষে ঠিক এই সন্ধিক্ষণে এইরূপ বিপদ ঘটিত কি না তাহার স্থিরতা নাই; তবে এক এক মনুর 'কাল' বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া বিবেচিত হইত বলিয়া এবং এত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দুঃখ-দুর্দ্দশার আবির্ভাব স্বাভাবিক বলিয়া 'মন্বন্তর' দুর্ভিক্ষের সহিত সমার্থক হইয়া আছে।

কিন্তু এটা সভ্যতার যুগ, জলযান, স্থলযান, আকাশযান সকলেরই গতি বৃদ্ধি পাইয়াছে, এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে প্রতি ঘণ্টায় দুই হাজার মাইল বেগে বিমানপোত চলিবে।

স্থান ও কালের দূরত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছে এবং এ ব্যবধান আর থাকার সম্ভাবনা নাই। এই সকল কথা বিবেচনা করিলে মনে হয় 'মন্বন্তর'—যাহা ভারতের প্রায় একচেটিয়া সম্পত্তি,—তাহার বাহনের গতি দ্রুত করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইঁহার নাম বা রূপ আমার জানা নাই, কিন্তু প্রচলিত বাহন সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান আছে অর্থাৎ, হস্তী, বৃষ, গর্দ্দভ, গরুড়, ময়ুর, পেচক, মীন, মকর, মূষিক, মার্জ্জার প্রভৃতি জীব তাহারা যে কেহ দুর্ভিক্ষ দেবকে মাঝে মাঝে সাহায্য করিত তাহা বলা যায় না। দুর্ভিক্ষ দেবতার গতির বিষয় অনুধাবন করিলে মনে হয় শম্ব, শামুক, হয়ত বা কূর্ম্ম, কমঠ তাহার বাহন। সে সকল তত্ত্ব আমার জানা নাই; বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও পি, আর, এস্, বা পি, এচ্.ডি—ডিগ্রীলোভী ছাত্র এ বিষয়ে গবেষণা করিলে শুভ ফললাভ করিবেন, সে বিষয় নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আমার এ ধারণা দৃঢ় হইবার গুরুতর কারণ রহিয়াছে। ভারতের উন্নতির সকল চেষ্টায় বিফল হইয়া এক সহৃদয় আমেরিকান ভারতের গো-যানের উন্নতিকল্পে মন দিয়াছেন। তিনি মনে করেন বর্ত্তমানের গোযান অত্যন্ত ভারি বিধায় ভারতের সভ্যতার গতি অতি মন্থর, সুতরাং আমেরিকা হইতে ধাতু গঠিত (all-metal) নবপরিকল্পিত গোযান আনিয়া তাহাতে রবারের চক্র যোগ করিয়া দিলে দেখা যাইবে কয়েক শতাব্দীতে যাহা হয় নাই, কয়েক দশকের মধ্যে ভারতের সভ্যতা সেরূপ গতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। জানি না, আকালদেব পূর্ব্ব হইতেই এরূপ যান আরোহণ করিয়াছেন কি না, কারণ ইংরেজ আমলে সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষের গতি প্রাগ্-ব্রিটিশ যুগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাইলেও মাত্র তিন বৎসরের ব্যবধানে এত বড় বিরাট দুর্ভিক্ষ ইতোপূর্ব্বে হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ১৮৯৭ সাল হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ এবং অভাব দুয়ে মিলিয়া ভারতের বক্ষে নৃত্য করিয়াছে। আর তাহারই আদর্শ অনুসরণ করিয়া ১৯৪৩ হইতে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ চলিতেছে। দুয়ের পার্থক্য এই—১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩ সালের তুলনায় "অন্নকষ্ট" মাত্র, আর সেবার ১৮৯৯ সাল হইতে অন্নকষ্ট দূর হইয়াছিল, আর এবার ১৯৪৬ সালের দুর্ভিক্ষ ভারতব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে।

রোগে জর্জ্জরিত স্বল্পায়ু ভারতবাসীর যন্ত্রণা দূর করিবার একটা বিশেষ উপায় প্রয়োজন। ইংরেজ শাসনে কলহ বিবাদ দূর হইয়াছে, যুদ্ধ করিয়া অকারণ প্রাণক্ষয় আর নাই, শান্তিতে লোক বাস করিয়া ইংরেজের জয় গান করিতেছে। কয়েকজন নিমকহারাম ভারতবাসী এ সুখ সত্ত্বেও মাঝে মাঝে বেতালা সুর ধরিয়া ইংরেজের সুখ নিদ্রার ব্যাঘাত করে। (ইংরেজের কি হয় জানি না, বার্দ্ধক্যে যাহাদের অতি কষ্টে নিদ্রাকর্ষণ হয় এবং স্বল্পকালে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে তাহাদের পক্ষে ভোর রাত্র হইতে গভীর নিশীথ পর্য্যন্ত পল্লীর, হয়ত বা ঘরের কিশোর, এমন কি অস্ফুট উচ্চারণশক্তিসম্পন্ন শিশুর মুখে 'জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম্, দিল্লী চলো,' ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ চীৎকার শুনিয়া যে দারুণ বিব্রত হইতে হয়, তাহা অভিজ্ঞতা হইবে বলিতে পারি)। মাঝে মাঝে যুদ্ধ দ্বারা লোকক্ষয় না কি সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত; তাই লোকের মন হইতে হিংসাভাব কখনই দূর হয় না (মহাত্মাজীর কথা বর্ত্তমানে না হয় ছাড়িয়াই দিলাম)। সে সকল যখন নাই, তখন ভারতবাসীর উদ্ধারের একটা পথ খোলসা রাখিতে হইয়াছে। তাহা না হইলে তাহাদেরই বিপদ সমধিক। হিসাবে প্রমাণিত হইয়াছে, ভারতবাসী অসংখ্য সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়, সুতরাং চিকিৎসাবিহীনভাবে সাধারণ রোগ হইতে অকালমৃত্যুর ব্যবস্থা আছে, তাহার উপর দ্বিতীয় পন্থা রোগ—মহামারী ওলাওঠা, বিসূচিকা, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতির পথ খোলা রাখিতে হইয়াছে। ইংরেজ এমন কি সমস্ত ইউরোপ, আমেরিকা ও অপরাপর স্বাধীন সভ্য দেশ এই সকল রোগ প্রায় জয় করিয়াছে; ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য তাহা করা হয় নাই। এই সকল রোগে না মরিলে তাহারা করিবে কি? তাহাতেও যদি কোনও ভুল থাকে, সেইজন্য মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষের পথ মুক্ত করিয়া দিতে হয়। ইহাতেও রাজসরকার ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ১৯০০ সাল হইতে দুর্ভিক্ষ বন্ধ থাকায় প্রচুর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে; সেই কারণে ১৯৪৩ সালে যে পথ উন্মুক্ত করা হয়, ১৯৪৬ পর্য্যন্ত তাহা বন্ধ করা প্রয়োজন হয় নাই।

দেশের লোকবৃদ্ধি যদি সুশাসনের পক্ষে একটা প্রমাণ বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে তাহা ইংরেজের প্রাপ্য; উহাই যে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা এবং সুখসমন্বিত সরল সহজ জীবনযাত্রার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য ভারতসরকার মাত্র আমেরিকায় বৎসরে ভারতবাসীর অষ্টাধিক লক্ষ টাকা ব্যয় করে; অপরাপর দেশে কি করে, তাহা জানা নাই। আর যখন উহা দেশের দারিদ্র্য, রোগ, নিরক্ষরতা, অকালমৃত্যুর কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন সে অপরাধ নিশ্চয়ই ভারতবাসীর। (কিন্তু একটা প্রশ্ন মনে জাগে। ইংলণ্ডে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপায়ের জন্য "রয়াল কমিশন" বসিয়াছে, তাহারা ভারতবর্ষের উদ্বৃত্ত লোকসংখ্যা ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে ত সকল ল্যাঠা চুকিয়া যায়। সাদা কালার আপত্তি এ সময়ে উঠে না, কারণ আমরা সকলেই এক মহান্ বৃটিশ সাম্রাজ্যের সন্তান। তাহা ছাড়া সাদা-কালা এবং কালা-সাদা বিবাহ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করার উদাহরণ বিরল নহে। সুতরাং ইংলণ্ড তথা বৃটিশ সাম্রাজ্যের এই দারুণ বিপদের সময় এই তুচ্ছ পার্থক্য স্মরণ না করাই উচিত। অন্ততঃ কিছু ভারতবাসী ইংলণ্ডে পালন করিলে ইংলণ্ডেশ্বরের দুশ্চিন্তা দূর হইবে; ভারতের লোকসংখ্যাবৃদ্ধি-ক্ষমতাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ)।

ভারতবাসী না খাইয়া মরিলে দোষ কোথায়? কারণ তাহাদের জমির ফসল বৃদ্ধি পায় নাই, অথচ লোক বাড়িয়াছে। রাজার কাজ রাজস্ব সংগ্রহ করা, দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা। প্রজা যে নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে, জমির উন্নতি সাধনের সমস্ত শক্তি লোপ পাইতেছে, তাহার জ্ঞান যে বৃদ্ধি পায় নাই, এমন কি উপায়ও নাই, তাহাতে রাজার মনোযোগ দিবার সুযোগ সুবিধা কোথায়? তাহারা ভারতের "স্বাধীনতা" রক্ষা করিবার জন্য রুশ ভল্লুকের আগমন প্রতিরোধ করিবে; তাই বহুকাল ধরিয়া তাহারা ভারতের সমস্ত রাজস্বের দুই তৃতীয়াংশ কেবল

ইংরেজ অধ্যুষিত সেনাকটকে ব্যয় করিয়াছে। প্রবল জনমতের চাপে দয়াপরবশ হইয়া ভারতসরকার এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়াছে। আত্মীয় বিচ্ছেদবিধুর সাহেব লোক ঠাণ্ডা দেশ হইতে আসিয়া আমাদের দেশে যে অমানুষোচিত কষ্ট সহ্য করে, তাহার জন্য জগতের সর্ব্বাপেক্ষা ধনী জাতিরা তাহাদের কর্ম্মচারীদের যে বেতন দেয়, তাহা অপেক্ষা ভারতবাসী এই ত্যাগী মহাপুরুষদের বেশী দিয়া নিজেদের সুবিধা করিয়া লইয়াছে। ইহা তাহার ন্যায্য প্রাপ্য। তাহাতে যদি দেশ দরিদ্র হইয়া পড়ে, দেশবাসী নিঃস্ব হয়, তাহাতে ইংরেজের অপরাধ বলা ভারতবাসীর মিথ্যা স্বভাবের একটা প্রধান পরিচয়। কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রসারের কাজ ভারতবাসীর ; সেচ ও পয়ঃপ্রণালীর উন্নতিসাধন, বন্যা নৈসর্গিক বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার কাজ ভারতবাসীর। তাহারা সোণা পুতিয়া রাখে, অথচ নিজেদের উন্নতির কিছুই করে না—এ কথা সত্যবাদী সাহেবরা যখন বলেন, তখন অবিশ্বাস করা অন্যায়।

সাধারণতঃ কৃষি ছাড়া শিল্প মানুষের একটি অর্থাগমের প্রধান পন্থা। আমরা কেবল চীৎকার করিয়াই ক্ষান্ত, 'আমাদের বিরাট শিল্প ছিল, তাহা হইতে প্রচুর আয় হইত, লোকে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিত।' ইংরেজ আগমনে তাহা গিয়াছে—বলিয়া আমরা ইংরেজকে দোষারোপ করি এবং তাহাদের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া নিজেরা দারিদ্র্য ভোগ করি ; শিল্পের উন্নতি করিতে আমরা পরাঙ্মুখ, কারণ ইংরেজের দুর্ণাম রটনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। প্রমাণ করিতে পারা যায় যে ইংরেজ এ দেশের শিল্পীদের প্রতি বাধা নিষেধ স্থাপন করিয়াছে, কোথাও কোথাও দারুণ অত্যাচার করিয়াছে, আমাদের রপ্তানীর উপর তাহার দেশে বিরাট করভার স্থাপন করিয়াছে এবং আমাদের দেশে তাহাদের শিল্পজাত দ্রব্যাদি একপ্রকার জোরপূর্ব্বক নামমাত্র শুল্কে প্রবিষ্ট করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে ইংরেজের দোষ দেওয়া অন্যায়। আত্মরক্ষার্থে অপরকে খুন করিলে অপরাধ হয় না এবং আত্মোন্নতি জগতের চরম কাম্য। এই দুই বাণীর প্রয়োগ করিতে গিয়া যদি হতভাগা ভারতবাসী কষ্ট পায়, তাহা হইলে দোষ কাহার? তাহা ছাড়া দৈহিক শক্তি সকল দাবীকে ন্যায্যত্ব প্রদান করে ; সুতরাং ইংরেজ যাহাই করুক, সমস্ত "সভ্য" জগৎ তাহা মানিয়া না লইবে কেন?

নদ নদী শুকাইয়া অস্বাস্থ্যতার কেন্দ্র হইতেছে, জমির ফলন হ্রাস পাইতেছে, শিল্প লোপ পাইয়াছে, দেহের শক্তি ক্ষয় পাইয়াছে, মনের শক্তি হ্রাস হইয়াছে। জীবন যুদ্ধের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী শিক্ষা পাইয়া সর্ব্ব প্রকারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়া আমরা সর্ব্বদাই দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসিয়া আছি। ইহার পর বড় বড় সাহেব যাহা বলেন, যাহা করেন, তাহা আমাদের পক্ষে বোঝার উপর শাকের আঁটি ছাড়া আর কিছুই নহে।

সর্ব্বদাই অন্নাভাবের মধ্যে বাস করিতে হইতেছে ; উপরন্তু অপর কতগুলি কারণ জুটিয়া অবস্থার গুরুত্ব সৃষ্টি করে। দেশে অজন্মা হইলেও খাদ্য শস্যের রপ্তানী আছে ; ১৯৪৩ সালে যাহা ছিল ১৯৪৬ সালে পরিবর্ত্তন হয় নাই—এমন কি গত সকল দুর্ভিক্ষেই এই প্রক্রিয়া চলিতে থাকে। ইংরেজ অকৃতজ্ঞ নয় ; তাহার সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যাহারা তাহার সহায়তা করে, তাহাদের খোরাক যোগাইবার ভার ইংরেজ লইয়াছে, সুতরাং কয়েক লক্ষ ভারতবাসী যদি অন্নাভাবে মরিয়াই যায়, তাহা হইলেও ইংরেজ নামে কোনও কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে না। একটা বড় মঙ্গলের জন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অমঙ্গল সৃষ্টি করা নীতিশাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া সকলেই জানে। সত্যবাদী ভারত (ইংরেজ) সরকার "ভদ্রলোকের" নীতি অনুসরণ করিয়া বরাবরই 'তণ্ডুল রপ্তানি নাই' বলিলেও কোনও কোনও দুষ্ট লোক সরকারী নথিপত্র হইতে প্রমাণ করে যে রপ্তানী আছে। যেহেতু ইহারা দুষ্ট লোক, সেই কারণে তাহাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অন্নাভাবে মরার প্রমাণ যদি শেষোক্তদের স্বপক্ষে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, আয়ু ফুরাইলে মানুষ মরে ; নচেৎ নহে।

১৯৪৬ সালের দুর্ভিক্ষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুর্ভিক্ষের তুলনায় একটু স্বতন্ত্রভাব দেখা যাইতেছে। হাজারে হাজারে যখন লোক অন্নাভাবে মরে, তখনও সরকার বাহাদুর প্রচার করেন, দেশে অন্নাভাব নাই। এবার এখনও ততলোক মরিতেছে না। তবে সাধারণতঃ ভারতের দুর্ভিক্ষের নিজরূপ এখনও সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই, তাহাতেই যা পার্থক্য। সাধারণতঃ এপ্রিল মে মাসে দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় ; জুন-জুলাই হইতে লোক অধিকতর সংখ্যায় মরিতে আরম্ভ করে ; আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসের মহামারী অক্টোবর-নভেম্বর হইতে হ্রাস পাইয়া অনাহারজনিত রোগ, বর্ষায় ভেজা এবং শীতের প্রকোপে লোক-মরা চলিতে থাকে। সেই হিসাবে দুঃসময় আসিবার আরও কিছু বিলম্ব আছে, অথচ ভারত সরকার পূর্ব্বাহ্নেই চীৎকার করিতেছে যে দুর্ভিক্ষ আসন্ন।

ইহা ভারত সরকারের পক্ষে নূতন প্রথা ; কিন্তু দুর্ভিক্ষ যাহাতে রোধ করা যায়, তাহার প্রকৃত চেষ্টা হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। দয়ালু সরকার বাহাদুর পল্লী অঞ্চল হইতে ধান চাউল সরাইয়া লইতেছে, সম্ভবতঃ দরিদ্র লোকে নগদ টাকা পাইয়া গভর্ণমেণ্টকে আশীর্ব্বাদ করিবে বলিয়া। কিন্তু দরিদ্রের হাতের টাকা বেশী দিন থাকিবে না। তাহা ছাড়া হাতের ধান ছাড়িয়া পরে কিছুই কিনিতে পাইবে না। সহরের লোকের অন্ন যোগান থাকিবে; কেবল যে সকল অঞ্চল হইতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গভীর নিশীথে চোরের মত চাউল অপসারিত হইতেছে সেই সকল স্থলে অন্ন থাকিবে না ; লোকে মরিবে। বারুইপুর, মজিলপুর, বরিশালে এই কাণ্ড হইতেছে, বাধ্য হইয়া সরকার একথা স্বীকার করিয়াছে।

এরূপ মরার হয়ত যুক্তির অভাব নাই। অসভ্য পল্লীবাসী বাঁচিয়া লাভ কি? যাহারা ইংরেজের সহিত যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করে না, তাহাদের জীবনের দাম যুদ্ধে সাহায্যকারী একদল ভারবাহী পশু অপেক্ষা কম। পল্লীর স্বার্থ কি ভাবে উপেক্ষিত হয়, তাহা দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিটীর রিপোর্টে সার মণিলাল নানাভাতি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন। সহরে সাহেব লোক থাকে, সরকারী কর্ম্মচারী থাকে, গভর্ণমেণ্টের সহায়ক বা তাহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন লোক বাস করে, আর বাস করে তাহারা অল্পপরিসরের স্থানের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়া গভর্ণমেণ্টকে যাহারা অধিকমাত্রায় রাজস্ব দান করে। তাহাদের না বাঁচাইলে চলিবে না। কেহ কখনও চোখে দেখিয়াছেন, কাণে শুনিয়াছেন, কেবল শ্বেতাঙ্গ

ইংরেজ নয়, এমন কি মিশ্রিত বর্ণের ফিরিঙ্গী দুর্ভিক্ষে মরিয়াছে? তাহার পর যাহারা মনে করেন ইংরেজ ও ইংরেজসম্পর্কিত জনগণের প্রতি আমাদের কেবল স্নেহ, শ্রদ্ধা, প্রীতি থাকিবে, তাঁহারা মনুষ্য চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করিতেছেন।

খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হেতু দুর্ভিক্ষের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়; এমন কি ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ চাউলের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য ঘটিয়াছে বলিয়া দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিটি মত দিয়াছেন; তাহাতে কাহারও কিছু আসে যায় না। ঐ তদন্ত কমিটির মধ্যে অধিকাংশ ভারতীয় ছিলেন, সেই জন্য মূল্য চড়া রাখার কারণ তাহারা বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমরা শিখিয়াছি যে আমরা অতি কম দামে জিনিষ বিক্রয় এবং ক্রয় করি, তাহা হইতে আমাদের জীবনযাত্রার মান অতি নীচু। তাহা চড়াইয়া রাখিতে পারিলে ইংরেজ শাসনে জাতির শ্রীবৃদ্ধি প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে। কৃষক-কুল অতিরিক্ত অর্থ পাইবে। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত তণ্ডুল ক'জনের থাকে, সেই হিসাব করিবার প্রয়োজন নাই। দ্রব্য মূল্যের হ্রাস হয় নাই, অথচ দুর্ভিক্ষ রোধ করিবে বলিয়া গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস।

লোকের ক্রয় শক্তি বৃদ্ধি পায় নাই, খাদ্য দ্রব্যের মূল্য সমান চড়া দরে চলিতেছে। "রাজার নন্দিনী প্যারি, যা কর তাই সাজে"—তণ্ডুল ক্রয় বিক্রয়ে ১৯৪৩ সাল হইতে গভর্ণমেণ্ট যে লাভের স্বাদ পাইয়াছে, তাহা ভুলিতে পারে নাই; উত্তরোত্তর লাভের পরিমাণ বাড়াইয়া চলিয়াছে। ১৯৪৩ সালে যত লোকের এবং যে পরিমাণ আয়, যুদ্ধের কল্যাণে ছিল, সেই অনুপাতে ১৯৪৬ সাল অত্যন্ত দুর্ব্বৎসর। অথচ চাউলের দর এবং সেই সঙ্গে অপরাপর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দর বাড়িয়া চলিয়াছে। গরীবের কথা ভাবিয়া কেরাসিন তেলের উপর আমদানী শুল্ক হ্রাস করা হইয়াছে, এখন বিলাতী বিশেষজ্ঞ আনিয়া গবেষণাগার খুলিয়া প্রমাণ করা হউক, বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের পক্ষে কেরোসিন তেল অতীব পুষ্টিকর। চাউল, ডাল, তৈল, লবণ, চিনি, কাপড়, কয়লা, কাঠ প্রভৃতি কোনও দ্রব্যের দাম কমিল না, অথচ দুর্ভিক্ষ রোধ করা যাইবে এই বিশ্বাস!

তাহা ছাড়া লোকের অন্যান্য ব্যয়ের পথগুলির জন্য উচ্চ মূল্যের দাম ধার্য্য রহিয়াছে, তাহাতেও কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। দিয়াশলাই, ডাক টিকিট, রেল ভাড়া প্রভৃতি যাহা হ্রাস করিবার শক্তি সরকারের হাতে, তাহার হ্রাস করিবার কোনও চেষ্টা নাই; চেষ্টা আছে অতিরিক্ত মুনাফা শুল্ক উঠাইয়া দিয়া ধনী কারবারীকে ধনবত্তর করা। যাহাতে সকল দিকে লোকের ব্যয় হ্রাস হয় তাহার কোনও চেষ্টা নাই, চেষ্টা কেবল খাদ্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি করিয়া জগতের মাঝে চীৎকার করিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টা। প্রতি একরে সেচের জলের দাম বাড়িয়াছে, তিন টাকা হইতে সাড়ে পাঁচ টাকা। জলের দামের সঙ্গে কি জমির চাষও বাড়িবে?

১৯৪৩ সালে সরকার পক্ষ দোষ চাপাইতে চাহিলেন নৈসর্গিক উৎপাত, যুদ্ধ, সাধারণ মুনাফাখোর এবং সাধারণ পুঁজিপতি লোকদের উপর। এবার আরও বুদ্ধিমানের মত কাজ করিতেছে—এবারে চায় সমস্ত জগৎকে দায়ী করিয়া নিজেরা খোলসা থাকিতে। 'আমরা চাহিয়া পাই নাই, কি করিব?" প্রোপাগাণ্ডা বা প্রচার দ্বারা এই জবাব এখন হইতে তৈয়ারী হইতেছে। কিন্তু দেশের মধ্যে যাহা করা উচিত ছিল, তাহা হয় নাই কেন?

না হইবার কারণ আছে। কারণ, কেহ জানে না সত্য প্রয়োজন কত। কেহ বলিল ৩০ লক্ষ টন, আবার কেহ বলিল, তিন চার মাসের মধ্যে ৭০ লক্ষ টন দাঁড়াইবে।—শেষ পর্য্যন্ত ৬০ লক্ষে স্থির হইয়াছে। যেন ৩০ বা ৬০ বা ৭০ লক্ষ টনের মধ্যে পার্থক্য যৎসামান্য। ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি হইতে ১৯৪৬ সালের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা হইতেছে দেশে এবং বিদেশে। সরকারী ভাণ্ডার যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা না কি উল্লেখযোগ্য কিছুই নয়। না হইবারই কথা; কর্ম্মকর্ত্তারা "ফাইল" লইয়া এবং মাহিনার "বিল" প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত, সুতরাং খাদ্য তণ্ডুল জমা না হইলে তাহারা দায়ী হইতে যাইবে কেন?

১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ মহামারী গিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত শস্য উৎপাদনের জন্য খালবিল সংস্কার, সার-সরবরাহ প্রভৃতি কি কাজ হইয়াছে তাহা দূরবীক্ষণ অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে আবিষ্কার করিতে হয়। নিন্দুক যাহারা, তাহারা নিন্দা করিবেই, কিন্তু সরকারপক্ষ যে এতবড় পরিকল্পনা খাড়া করিতেছেন, তাহার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ। এই পরিকল্পনার জন্য ব্যয় করাই ত সরকারের কাজ, পরিকল্পনা কাজে না লাগিলে তাহা জনসাধারণের দোষ।

মিথ্যাবাদী ভারতবাসী তাহাদের দোষে কষ্ট পাইতেছে—একথা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেবল সত্যবাদী ইংরেজে ইংরেজে যখন কলহ হয়, তখন আমাদের সমস্যা। ফেব্রুয়ারীর মাঝে যখন একজন মাতব্বর কর্ম্মচারী মিঃ উইলিয়াম্‌স্‌কে এক সাধারণ বৈঠকে বাঙ্গালায় চাউলের হঠাৎ মূল্য বৃদ্ধির কথা বলা হইল, তখন তিনি উহা নির্জ্জলা মিথ্যা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। পরের সপ্তাহে মিঃ হার্টলি বলিলেন, "খুড়ি"—চাউলের দর আশঙ্কাজনক ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, অতএব "খুড়ি"। উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেবের সামান্য একটু ভুল হইয়াছে। তোমাদের সামান্য ভুল, আমাদের প্রাণান্তকর সমস্যা।

মোট কথা দুর্ভিক্ষ নিবারণের যে চেষ্টা চলিতেছে তাহাতে সুফল আশা করা যায় না। বোধ হয় ভারতবাসীকে তিতীক্ষা শিক্ষা দিবার জন্য ভাণ্ডারে খাদ্য জমা থাকিতেও খাইতে দেওয়া হয় নাই, আর পরে তাহা জলে জঙ্গলে মাঠে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখনও সেই কাজ চলিতেছে এবং দরদের অভাব বলিয়া এই ব্যাপার চলিতে থাকিবে। আমাদের দেশের উপর আবার মহামারী হইবে; এবার ৫০ লক্ষ নয়, এক কোটী লোকের জীবনাবসান হইবে বলিয়া অনুমান হয়। ১৯৪৩ সালের প্রায় সকল পাপই বর্ত্তমান। প্রধান সুবিধা, খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থা নানাস্থানে প্রবর্ত্তিত আছে; কিন্তু ১৯৪৬ পর্য্যন্ত দশ ভাগের এক ভাগ লোককে স্পর্শ করে নাই। সেবারকার ভুল এবারে সংশোধিত হইবার চেষ্টা হইতেছে; আশা করা যায় ১৯৫০ সালের দুর্ভিক্ষে তাহা কাজে লাগিতে পারে। আমরা নিরুপায়; অনেকের পরমায়ু ফুরাইয়াছে, সুতরাং তাহাদের বাঁচাইবার বাজে চেষ্টা করিয়া অযথা সরকারী অর্থ নষ্ট করা বিধেয় নহে।

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

১৩

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল—

ঘরের মাঝে আলো জ্বলিলেও বাহিরে তখন অন্ধকার-আলোর একটা অস্পষ্টতা ছিল। বাহিরের বারান্দায় সে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল—গৃহের আলো ও রাস্তার আলোর কোনটাই সেখানে পৌছায় নাই। অমল বিদায় নমস্কার করিয়া আসিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণাও তাহাকে আগাইতে আসিয়াছে।

এই নিরুদ্ধ অন্ধকারটা যেন স্তব্ধ নিশ্বাসে ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া আছে। অমল চলিতে চলিতে হাতে একটা আকর্ষণ পাইয়া থামিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণা কহিল—দাঁড়াও—

এই একটুখানি স্পর্শ, এমনি অন্ধকারে অকস্মাৎ অমলের সমস্ত রক্তপ্রবাহকে বিদ্যুৎগতিতে প্রবাহিত করিল। সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিল না।

অপর্ণা কম্পিতকণ্ঠে কহিল—আর যাই কর, আমায় ভুল বুঝো না—

অন্ধকারে এমনি ভাবে অমলের হাতটাকে স্বেচ্ছায় আকর্ষণ করিয়া অপর্ণা যে একটা অপরাধ করিয়াছে তাহা সে এতক্ষণ ভাবিতে পারে নাই কিন্তু সেটাকে অকস্মাৎ উপলব্ধি করিয়া অত্যন্ত লজ্জিতভাবে আত্মগোপন করিতেই সে যেন দ্রুতপদে চলিয়া আসিল। তাহার প্রশ্নের জবাব শুনিবার অবকাশ বা সুযোগ হইল না।

অমল বিবশ হাতখানিকে উঠাইয়া অপর্ণাকে ধরিতে চাহিল কিন্তু পারিল না। অন্ধকারে একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া, অশোভনতা এড়াইবার জন্য পুনরায় সে চলিতে লাগিল। যে ভাবিয়া আসিয়াছিল শুধাইবে—পত্র লেখা উচিত হইবে কিনা—কিন্তু তাহা জানা হইল না, কোন জবাব দেওয়া হইল না। সে একান্ত নিঃশব্দে রাস্তায় আসিয়া রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিল।

অন্ধকার দৃশ্যপটের মাঝে আলোকোজ্জ্বল কয়েকটি জানালা দীর্ঘ আঁখি মেলিয়া চাহিয়া আছে কিন্তু তাহার কোথায়ও অপর্ণা নাই।

অমল বাড়ীতে পৌচেছিল রাত্রিতে।

সকালে উঠিয়া মা'য়ের ভাণ্ডার অনুসন্ধান করিয়া সে জানিল—গৃহে সবই আছে কিন্তু জ্বালানি কাঠের অভাব। মা হয়ত নিত্য সকালে কাঠ কঞ্চি নারিকেলের পাতা সংগ্রহ করিয়া একবেলার কাজ সারিয়া ফেলেন। অমল কিছু কাষ্ঠ আহরণ মানসে নিজেদের বাগানে যাইবে স্থির করিয়াছিল। মা চা ও জলখাবার তৈয়ারী করিয়া তাহাকে ডাক দিলেন।

অমল চা পান করিতে করিতে কিসের জন্য একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল—চিন্তা করিয়া দেখিল, মনের নিভৃত কোনে সে গৌরীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। অপর্ণার নিকট হইতে বিদায় লইয়া নতুন একটি কিছুর চারিপাশে নিজের মনকে জড়াইতে চাহিতেছিল। কিন্তু গৌরী আসিল না।

সমগ্র সকাল নিজেদের বাগানে ঘুরিয়া কাঠ কঞ্চি কাটিয়া সে দুইটি-ভার তৈয়ারী করিয়াছিল এবং একটি ভার রাখিয়া অন্যটি আনিবার সময় মা নানা অভিযোগ করিলেন—কয়েক দিনের জন্য বাড়ী আসিয়া এ পরিশ্রম সহ্য হইবে না, এখন উত্তপ্ত রৌদ্রে কাজ করা অস্বাস্থ্যকর প্রভৃতি; কিন্তু অমল হাসিয়া কেবল বলিল—কাঠ কেটে রেখে এলাম, আর একজনে নিয়ে যাক্ আর কি!

দ্বিপ্রহরে মায়ের কাছে বসিয়া নিরামিষ তরকারী খাইতে খাইতে সে কলিকাতার নানা কথা বলিতেছিল—রমলা, তৎপ্রসঙ্গে খোকা, অপর্ণা সকলই।

তথাপি বার বার সে গৌরীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং মাঝে মাঝে মায়ের প্রশ্নের অনুপযুক্ত উত্তর দিয়া নিজেই লজ্জিত হইতেছিল, কিন্তু গৌরীর সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতে সে পারিল না—কেমন যেন একটা দ্বিধা ও

লজ্জা তাহার কণ্ঠরোধ করিয়াছিল। ভাবিয়া সে আপনি হাসিয়া উঠিল—কয়েকদিন পূর্ব্বে অপর্ণার প্রসঙ্গে তাহার মন কি বেদনার্দ্র দিনই না কাটাইয়াছে, আজও তাহাকে স্মরণ করিয়া তাহার হৃদয় গোপন কাঁটার ক্ষতে রক্তাক্ত হইয়া উঠে তথাপি গৌরীকে একবার দেখিবার জন্য এত প্রলোভন কেন তার? আপনার অন্তরের অস্থৈর্য্যতায় এবং নিষ্ঠাহীনতায় সে লজ্জিত হইল না, বরং ভাবিল এই বিচিত্র মানব মন। এমনি করিয়াই মানুষের ব্যভিচারী মন জীবন-সঞ্চয় পথপ্রান্তে ফেলিয়া আপনার গতিতে আপনি চলে!

মা অকস্মাৎ প্রশ্ন করিলেন—কিরে গৌরী? বাটীতে কি?

—মাছের ঝোল।

অমল ফিরিয়া দেখে গৌরী, কিন্তু কিছুদিন আগে যে সুন্দর সুডোল লীলা-চঞ্চল মেয়েটিকে সে দেখিয়া গিয়াছিল এ তাহার ভগ্নাবশেষ মাত্র। অমল প্রশ্ন করিল—এত কাবু হ'য়ে গেলে কি ক'রে?

গৌরী জবাব দেওয়ার পূর্ব্বেই মাতা কহিলেন—পনরদিন পরে এইত সেদিন পত্তি করেছে।

—কি হ'য়েছিল?

—জ্বর।

—অমল চাহিতেই গৌরীর চোখেচোখ পড়িয়া গেল এবং গৌরী ঈষৎ লজ্জিত আনত চোখের দৃষ্টিকে অবনত করিয়া কহিল—আপনার শরীর খারাপ কেন?

—কই, খারাপ ত নয়, বরং আগের থেকে ভালই বলে মনে হয়।

মাতা বলিলেন, শরীর তাহার সত্যই খারাপ হইয়াছে। গৌরী গম্ভীরভাবে বলিল—শরীর অবশ্য খারাপ হ'য়ে গেছে আমার কিন্তু চোখটা ত হয়নি বলেই জানি।

অমল চাহিয়া দেখে গৌরী মুখ টিপিয়া হাসিতেছে—হাসিতেছে কিনা তাহাও বোঝা যায় না, মুখখানা তার সদাই অমনি সহাস্য রহস্যময় থাকে। মুখে মনের ভাব ফুটিয়া উঠে না। গৌরী আর কিছু কহিল না, নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল—যাই জেঠিমা, মার খাওয়া হয়নি এখনও।

মাতা বলিলেন—এস। বিকেলে এসো কিন্তু।

গৌরী মাথা নাড়িয়া আসিবে জানাইয়া চলিয়া গেল।

মাতা একটু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—মেয়েটা কেমন হাসিখুশী, চঞ্চল ছিল—আজকাল একেবারে মনমরা হ'য়ে গেছে।

অমল চমকাইয়া উঠিয়া কহিল—কেন?

—কে জানে? শরীর ত এখন খারাপই, কিন্তু তার আগেই ওর অমনি পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। আগে এসে কত খুনসুড়ি ক'রতো, এখন এসে এমনি চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে চলে যায়। কতদিন কতবার জিজ্ঞাসা ক'রেছি—ও কেবল বলে, কই কিছুইত হয়নি। কিন্তু আমি ত বুঝি—

—কি বোঝো?

এ প্রশ্নের কোন জবাব মা দিলেন না, তবে এইটুকু তিনি জানাইলেন যে তাহাদের মত প্রবীণার কাছে কিশোরীর মনকে ঢাকিয়া রাখা সম্ভব নয়—অপ্রকাশ্য বেদনার মাঝেই তাহার মন প্রকাশিত হইয়া পড়ে—এমনি তাহার বিচিত্রতা।

দুপুরে একটু ঘুমাইয়া উঠিয়া অমল কয়েকখানা পত্র লিখিয়া অবশেষে পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠা উল্টাইতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু মনটা অপর্ণাকে ঘিরিয়া বিষণ্ণ হইয়া উঠিতেছিল—আষাঢ়ের শেষে কলিকাতা পৌছিয়া সে হয়ত দেখিবে, অপর্ণা অজিতবাবু ও তাহার নতুন মোটরের নিকটে আত্মনিবেদন করিয়াছে, হয়ত নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া পড়া ছাড়িয়া দিবে—হয়ত এই বিদায়ই তাহার নিকট হইতে শেষ বিদায় হইয়াছে।

মাতা অন্য খাটে বসিয়া কি যেন একটা সেলাই করিতেছিলেন। বাহিরে উত্তপ্ত পৃথিবী তখনও শীতল হইয়া আসে নাই। অমল শুষ্ক পত্রাচ্ছন্ন সম্মুখের বনশ্রেণীর পানে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছিল। কখন নিঃশব্দে গৌরী আসিয়া মায়ের পাশে বসিয়াছে সে লক্ষ্য করে নাই। অমল প্রশ্ন করিল—কখন এলে গৌরী?

গৌরী মুখ না তুলিয়াই বলিল—এই ত এখনই।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পত্র, কবিতার খাতা, পুস্তকাদি কোন বিষয়েই সে কোন প্রকার কৌতূহল প্রকাশ করিল না এবং চলিয়াও গেল না। মায়ের পাশে বসিয়া আনত-দৃষ্টিতে মায়ের সূচ চালনার মাঝে কি যেন নিগূঢ় অর্থ

আবিষ্কার করিবার জন্য সে নিবিষ্ট মনে চাহিয়া আছে। সেই ছিন্নবসন সমষ্টির মাঝে এত যে কি দেখিবার আছে সেই কেবল তাহা জানে—

অকস্মাৎ একবার মুখ তুলিয়া চাহিতেই অমলের সঙ্গে চোখোচোখি হইয়া গেল। অমল এই অত্যন্ত প্রগল্‌ভা কিশোরীটির চোখের প্রশান্ত বিষাদ-ক্লিষ্ট দৃষ্টির মাঝে যে গভীর বেদনার ছায়া পড়িয়াছে আজ তাহা স্পষ্টই বুঝিয়া ফেলিল। কিন্তু এ বেদনা সে কোথা হইতে আহরণ করিয়া হৃদয়ের গোপন প্রদেশে কাঁটার মত সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে এবং কেনই বা তাহার ক্ষতের রক্তক্ষরণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে?

অমল প্রশ্ন করিল—অপর্ণার কথা ত জিজ্ঞাসা ক'রলে না গৌরী?

গৌরী তেমনি একটু হাসিয়া কহিল—বলুন না।

—তার যে বিয়ে ঠিক হ'য়েছে প্রায়?

—তা হ'লে আপনি চ'লে এলেন কেমন ক'রে! বিয়েটা দেখবেন না?

অমল কহিল—বড়লোকের বিয়ে দেখাটা বড় খরচের ব্যাপার, না দেখাটাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ—তাই—

—পালিয়ে এলেন?

—বল্‌লে নেহাত ভুল হবে না।

গৌরী কেমন একটু চাহিয়া, ওষ্ঠটাকে একটু বাঁকাইয়া যেন ব্যঙ্গচ্ছলেই কহিল—কিন্তু কাপুরুষের মত কাজ হ'ল না কি? যাবার পরে অনুশোচনা ক'রতে হবে হয়ত!

—অনুশোচনা করাটা ত আর ব্যয়-সাপেক্ষ নয়, তাই।

অমল নানা প্রশ্নে নানা প্রসঙ্গে গৌরীর মাঝে আগের গৌরীকে সঞ্জীবিত করিতে চাহিল, কিন্তু গৌরী মৃদু হাসিয়া করুণ নেত্র সম্পাতে বার বার তাহার প্রচেষ্টাকে একান্তই ব্যর্থ করিয়া দিল।

মা চুপ করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে কাঁথার ধামাটা নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন—বেলা ত প'ড়ে এল। তোমাদের বাড়ীতেই যেতে হবে গৌরী—ঢেঁকিতে ডালক'টা 'কাঁড়িয়ে' নিয়ে আসি—

গৌরী সোৎসাহে কহিল—চলুন জেঠিমা, আমি 'পাড়' দিয়ে দেব।

—না না, ও আমি একাই পারবো।

কুলা ধামা প্রভৃতি লইয়া তাহারা রওনা দিলেন। জীর্ণ জানালার ফাঁক দিয়া অমল তাহাদের গমন পথের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মাতার শীর্ণ দীঘল দেহের চলন-ছন্দের সহিত অপর্ণার যেন কোথায় একটা সাদৃশ্য আছে—কিন্তু গৌরীর পদক্ষেপ মন্থর এবং দ্রুততাবিহীন।

গৌরী পিছন ফিরিয়া প্রশান্ত দৃষ্টি মেলিয়া কি যেন খুঁজিল, কিন্তু কাহাকেও না দেখিয়া আবার চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ

কন্যাকুমারী দর্শনে *

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

কতদিন ধরি মাতা কুমারীর বেশে
আছ তুমি দাঁড়াইয়া পুষ্পমাল্য হাতে,
আরো কতদিন তুমি থাকিবে এ ভাবে
মহাদেব সাথে শুভ-মিলনের আশে।
নিত্য উঠে রবিশশী নিত্য ফোটে তারা
ঋতুগণ চলে যায় আসে পুনরায়,
হাজার বছর ধরি করে যাতায়াত,—
তুমি থাক দাঁড়াইয়া স্থির নির্বিকার।
বিশ্বের দুখিনী যত বধূ বা জননী।
হারাইয়া স্বামী পুত্র রহে প্রতীক্ষায়
আবার মিলন তরে—তাহাদের হৃদে
পুঞ্জীভূত যত ব্যথা, সকলের ভার
তোমার হৃদয় মাঝে ধর গো জননী
দাও শিক্ষা সকলেরে ধৈর্য্য ধরিবারে,—
"ভাল কিছু বড় কিছু চাহ যদি তুমি
তপস্যা করিতে হবে তাহার লাগিয়া
তারপর ধৈর্য্য ধরি হইবে থাকিতে
ফল লভিবার তরে বিভুর কৃপায়"
হবে অবসান তপঃ কোন শুভক্ষণে
ধন্য হবে সব ক্লেশ পবিত্র মিলনে।

* কন্যা কুমারীতীর্থে দেবীর কুমারী মূর্ত্তি,—পুষ্পমাল্য হাতে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রবাদ এই যে, সত্যযুগের আগমনে শুভ মুহূর্ত্তে মহাদেবের সহিত পরিণয় হইবে এই আশায় দেবী অপেক্ষা করিতেছেন।

প্রাচীর-চিত্র প্রদর্শনী

শ্রীসুবোধকুমার রায়

বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে গত স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে যে প্রাচীরচিত্র-প্রদর্শনটী হয়ে গেল তা সত্যই প্রশংসনীয়। জাতির এই জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে গণমনে রাজনৈতিক চেতনা জাগানোর সঙ্গে সঙ্গে এমন আকর্ষণীয় উপকরণের সাহায্যে ভারতের নব-জাগরণ ও মুক্তিসংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার চেষ্টা যে সফল হয়েছে, তা যে কেউ একবার প্রদর্শনী-মণ্ডপে প্রবেশ করেছেন তিনিই স্বীকার করতে বাধ্য। চিত্রের সাহায্যে আকৃষ্ট করে মানুষকে কোন বিষয়ে শিক্ষাদান করার পদ্ধতি ভারতবর্ষের কাছে নূতন জিনিস নয়; বৌদ্ধধর্মের সব কিছুই যে প্রথম প্রচারিত হয়েছিল চিত্রেরই সাহায্যে—তার প্রমাণ আজও বিদ্যমান; তবে আধুনিক জগতে এই প্রাচীরচিত্রের যথেষ্ট অভিনবত্ব আছে। পুরাকালের অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতির সঙ্গে এই চিত্র প্রদর্শনীর তুলনা করা হলে ভুল করা হবে এবং এক্ষেত্রে সেই তুলনামূলক সমালোচনা করাও সমীচীন হবে না।

প্রাচীরচিত্রের সাহায্যে মানুষের মন জয় করা, মানুষকে প্রকৃত চেতনাসম্পন্ন ও শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা আজকাল প্রায় প্রত্যেক সভ্য-দেশে সুরু হয়েছে। বিশেষতঃ গত মহাযুদ্ধে যুদ্ধরত দেশগুলির মধ্যে এই চেষ্টা প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে এবং যে উদ্দেশ্যে এই সকল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় সেই উদ্দেশ্য যে সফল হয়—সে কথা বলাই বাহুল্য। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, সিনেমা, থিয়েটার এই সবগুলি শুধু কল্পনা-বিলাস বা আমোদ প্রমোদের উপকরণ নয়, এইগুলি যেমন জাতীয় চরিত্র গঠন ও সমাজ গঠনে সহায়ক, চিত্রও তাই। অতুল আনন্দের মধ্য দিয়ে কোন কিছুকে নবকলেবর দান করাই শিল্পীর কাজ। ভারতের সর্ব্বজন-মান্য শিল্পী নন্দলাল বসুর পরিচালনায় এই প্রাচীর চিত্রগুলি ভারত-ইতিহাসের কতকগুলি খণ্ড পর্য্যায়কে নবকলেবর দান করে—এক অখণ্ড সংহতির সৃষ্টি করেছে। এই প্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার যা কিছু গৌরব তা সমস্তই এই শিল্পীর। তাই প্রথমেই জন-সাধারণের পক্ষ থেকে তাঁকে আমরা সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

যে পলাশী প্রান্তরে ভারতবর্ষে ইংরাজ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়েছিল চিত্র আরম্ভ হয়েছে সেই পলাশীর যুদ্ধ থেকে। ছবিখানি দেখলেই মনে পড়ে যায়—সেই কলঙ্কজনক ইতিহাস—দেশবাসীরই হীন ষড়যন্ত্রে সিরাজের কি বিরাট আয়োজন পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হোলো! যে যুদ্ধে ইংরাজের পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী, সেই যুদ্ধেই ভারতে পত্তন হোলো ইংরাজ সাম্রাজ্যের।

এই জয়ের পর থেকেই ইংরাজের শ্যেনথাবা গিয়ে পড়তে লাগল একটীর পর একটী নবাব বাদশাদের ওপর। দুটী মুসলমানী ফেজের ওপর প্রকাণ্ড এক শ্যেনপক্ষী থাবা হেনেছে, এই সামান্য ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে বুদ্ধিমান শিল্পী সাফল্যের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন সেই সময়ের প্রকৃত অবস্থা।

একদিকে ইংরাজ কায়েম করছে তার সাম্রাজ্য, আর অন্যদিকে দিনে দিনে দেশের মধ্যে কৃষকদের দৈন্য ও অর্থকষ্ট বেড়ে উঠছে। তাদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হ'তে হ'তে একদিন ফেটে পড়ল বিদ্রোহের আকারে। বাংলাদেশ এবং বিহারে—বিশেষ করে বাংলা দেশে একদল মুসলমান ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সুরু করে দিল যুদ্ধ। ওয়াহাবি আন্দোলনের যে ছবিখানি আছে এই আন্দোলনই সেই ওয়াহাবি আন্দোলন। ওয়াহাবি নেতা তিতুমীরের বাড়ী ছিল ২৪ পরগণা জেলায়। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কামান থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য—তৈরী করেছিলেন একটী বাঁশের কেল্লা। চারিদিকে প্রচুর বাঁশের বেড়া দিয়ে তার মধ্যে মাটি কাদা ইত্যাদি ভর্ত্তি করে—এক অভিনব উপায়ে—এমন একটী কেল্লা তৈরী করেছিলেন যা পাথরে গাঁথা কেল্লার চেয়েও শক্ত এবং দুর্ভেদ্য। পাথরে গাঁথা কেল্লা গোলায় ফেটে পড়ে, কিন্তু তাঁর এই কেল্লায় মাটি কাদা এবং বাঁশ থাকার ফলে গোলা গুলি গেঁথে যেত সেই বাঁশের বেড়ায়। এই কেল্লার মধ্যে আত্মরক্ষা করে বেশ কিছুদিন বীরবিক্রমে তিনি যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। এই কেল্লাটীই ইতিহাসে "তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা" নামে প্রসিদ্ধ। এই সঙ্গে আর একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে আন্দামানে আবদুর রহমন্—যিনি হত্যা করেছিলেন লর্ড মেয়োকে—তিনিও ছিলেন একজন ওয়াহাবি।

তারপর এলো সিপাই যুদ্ধ। ভারতের স্বাধীনতার এই প্রাণপণ চেষ্টা ও সংগ্রাম শেষ হোলো পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। সেই সংগ্রামের চিত্র শিল্পীর তুলিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সিপাই যুদ্ধের পর আঁকা হয়েছে নীলকর আন্দোলনের ছবি। ইংরাজ ব্যবসায়ীরা বাংলার সুদূর পল্লীতে পল্লীতে নীলের কারখানা স্থাপন করে—নীল-চাষীদের ওপর যে অত্যাচার ও শোষণ চালিয়েছিল তার প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠেছিল বাঙ্গালী সাহিত্যিক দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' পুস্তকে। শিল্পীকে ধন্যবাদ যে তিনি ছবি আঁকতে বসে সাহিত্যিকের সেই অমর সৃষ্টির কথা ভোলেন নি। দীনবন্ধু মিত্র যে সময়ে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিলেন সে সময় বাংলা দেশে এসেছে এক নবজাগরণের ঢেউ। কালীপ্রসন্ন সিংহ, বিদ্যাসাগর, শ্রীমধুসূদন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলার প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীগণ সে সময়ে বাংলা দেশকে নূতন করে গোড়ে তোলার চেষ্টায় নব যুগের সূচনা করে গিয়েছেন। তাঁদের চিত্রগুলি প্রদর্শনীর গৌরব বাড়িয়েছে। সেই যুগে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠের মধ্যে যে বন্দেমাতরম্ গান দেশবাসীকে শোনালেন আজও সেই গান আমাদের জাতীয় সঙ্গীত।

দেশে যখন জাগরণ আসে তখন তা বিকশিত হয়ে ওঠে নানা দিক দিয়ে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হিউম প্রভৃতি কতিপয় ইংরাজ ও ভারতবাসী ইংরাজের কাছে সুখ সুবিধা আদায়ের আশায় প্রতিষ্ঠিত করলেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন তার প্রথম সভাপতি—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে—ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অঙ্কুরোদ্গম হোলো এইখানেই। তবে বেশ কিছুদিন শুধু আবেদন নিবেদনের মধ্যেই কংগ্রেসের কাজ সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। পরিবর্ত্তন আনলেন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সুরাট কংগ্রেসে লোকমান্য তিলক। তিনি আবেদন নিবেদনের পালা ঘুচিয়ে প্রস্তাব আনলেন সক্রিয় আন্দোলনের; ভারত যাতে মুক্তির পথে এগোতে পারে তিনি চাইলেন তারই জন্যে সক্রিয় সংগ্রাম।

ঠিক সেই সময়েই বাংলা দেশের অগ্নিযুগের বীর বিপ্লবীরা শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে জেগে উঠেছেন মুক্তির আশায়। তাঁরা দিকে দিকে সুরু করে দিয়েছেন সংগঠন। একদিকে বিপ্লবী বীরগণের অগ্নিমন্ত্রের বাণী—আর অন্যদিকে লোকমান্য তিলকের মত বুদ্ধিমান ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন নেতার কংগ্রেস পরিচালনায় ভারতবর্ষে এলো যেন মুক্তি আন্দোলনের প্রবল বন্যা। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, সত্যেন প্রভৃতি বীরগণ ফাঁসীকাঠে প্রাণ দিলেন। কলিকাতা মাণিকতলায় ধরা পড়ল বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের আস্তানা, বোমার কারখানা। ইংরাজ তাদের কঠোর শাস্তি দিয়ে সংগঠনকে চূর্ণ করে দেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু যে দেশ একবার জেগে ওঠে, মুক্তির নেশায় একবার যাকে পেয়ে বসে কোন শাস্তিই তাকে দমাতে পারে না।

১৯১৪ সালে ইউরোপে লাগল মহাযুদ্ধ। সেই সময় ভারতের বিপ্লবীদল আবার দাঁড়াল মাথা খাড়া করে; তাঁরা যোগসাজস করলেন জার্ম্মানীর সঙ্গে। লালা হরদয়াল, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, রাসবিহারী বসু প্রভৃতি বিপ্লবীগণ জার্ম্মানীর সাহায্যে ভারতবর্ষ থেকে ইংরাজ শাসনের বিলোপ সাধনের চেষ্টা করতে লাগলেন। এই উদ্দেশ্যে বার্লিনে একটী কমিটীও গড়া হোলো, কিন্তু তাঁরা সফলকাম হতে পারলেন না, ইংরাজ সেই ষড়যন্ত্র ধরে ফেল্লে। রাসবিহারী বসু সরে পড়লেন জাপানে। বহু বীর বিপ্লবী পেলেন কঠোর শাস্তি।

ঠিক যে সময় ভারতের চরমপন্থী বিপ্লবীদল ইংরাজ রাজত্বের অবসান কল্পে এই ধরণের পরিকল্পনা করছিলেন সেই সময়ে যুদ্ধের পরই ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসন দেবার আশা দেখিয়ে ইংরাজ চেষ্টা করছিল যুদ্ধে ভারতবাসীর সহযোগিতা পাবার। মহাত্মা গান্ধী সেই আশায় যুদ্ধে সহযোগিতার পক্ষপাতী হয়ে সৈন্য সংগ্রহের কাজে আপ্রাণ পরিশ্রম করেন; কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার পর ইংরাজ সরকার তার প্রতিশ্রুতি পালন না করে—পাশ করলেন রাউলট্ বিল;—ভারতকে আরও দৃঢ় শাসনের নাগপাশে বদ্ধ করলেন। মহাত্মা গান্ধী এই বিলের বিরুদ্ধে সুরু করলেন অহিংস আন্দোলন। জনসাধারণ সেই আন্দোলনে নির্ভিকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্থানে স্থানে পুলিশের গুলি চললো, পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগে ঘ'টল ডায়ারের নৃশংস হত্যাকাণ্ড, যার প্রথমেই প্রতিবাদ জানালেন কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাইট্ উপাধী ত্যাগ করে।

আবার আর একটী ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমানগণের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হোলো। তুর্কীর সুলতানের বিরুদ্ধে ইংরাজের অভিযান ও খলিফাকে সিংহাসনচ্যুত করার বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানগণ সুরু করলেন খিলাফৎ আন্দোলন। সৌকৎ আলি ও মহম্মদ আলি গ্রহণ করলেন সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব।

সেই সময়েই সুরু হোলো মোব্লা বিদ্রোহ। তার নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করলেন খাঙ্গাল। কিন্তু এই মোব্লা বিদ্রোহকে ইংরাজ সরকার দৃঢ় হস্তে দমন করলেন।

খিলাফৎ আন্দোলনকে কিন্তু অত সহজে দমন করা গেল না। মহাত্মা গান্ধী খিলাফতের প্রতি অবিচার ও পাঞ্জাবের অত্যাচার প্রধানতঃ এই দুটি ব্যাপার উপলক্ষ করে কংগ্রেস ও খিলাফৎ কমিটীর একযোগে অসহযোগ আন্দোলন করতে মনস্থ করলেন। কলিকাতা কংগ্রেসে স্থির হোলো—অসহযোগ আন্দোলন শুধু ঐ দুটি ব্যাপার উপলক্ষ করে সুরু হ'তে পারে না; কাজেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবীকে প্রধান দাবী বলে মেনে নিয়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সুরু হোলো অসহযোগ আন্দোলন। পূর্ণ একবৎসর আন্দোলন চল্লো পুরোদমে। কিন্তু চৌরি-চৌরা নামক স্থানে জনসাধারণ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠে হিংসামূলক নীতি অবলম্বন করায় গান্ধীজী সেই আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। আন্দোলন বন্ধ করার পরই তিনি হলেন বন্দী এবং ১৮ই মার্চ্চ ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আহমদাবাদ বিচারালয়ের বিচারে তিনি ছয় বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় বহুদিন আবদ্ধ ছিলেন কারাগারে। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন স্বরাজ্য-পার্টি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নূতন রূপ দান করলেন। সারাভারত মুক্তির আশায় আবার অধীর হয়ে উঠল।

ব্যারাকপুর সাবডিবিসন, শ্রীরামপুর, হাওড়া, উলুবেড়ে প্রভৃতি স্থানে সমস্ত পাটকলে সুরু হোলো ব্যাপক ধর্ম্মঘট। এই সময় যে রকম ব্যাপক ধর্ম্মঘট হয়েছিল, পাটকলসমূহে আর কখন সে রকম হয়নি। জুটষ্ট্রাইকের চিত্রখানি সেই ধর্ম্মঘটের অতীত-স্মৃতিই মনে করিয়ে দেয়।

তারপর এলো সাইমন কমিশন। সারাভারত সমস্বরে রব তুলল—গো-ব্যাক্ সাইমন।

এরপরই গান্ধীজীর লবণ আইন ভঙ্গের আন্দোলন। সারাভারতে সুরু হোলো আইন অমান্য ও আবগারি দোকানে পিকেটিং। বাংলাদেশে যেদিন লবণ আইন ভঙ্গ করা হোলো সেদিন চট্টগ্রামে ঘটল এক অভাবনীয় ঘটনা। বিপ্লবী সূর্য্যসেনের নেতৃত্বে একদল চরমপন্থী বিপ্লবী চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার আক্রমণ করে—দখল করে নিলেন, কিন্তু তাঁদের সেই বিপ্লব স্থায়ী হোলো না; ইংরাজ সরকার কিছুদিনের মধ্যে দমন করে ফেল্লেন। সূর্য্যসেনের ফাঁসী হোলো। আজও অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি বাংলার সেই বীর-বিপ্লবী সৈনিকদের অনেকেই রয়েছেন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

এর কয়েক বছর পরে গান্ধীজী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করলেন। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সুরু হোলো আর এক নব অধ্যায়।

অন্যান্য আন্দোলনের সঙ্গে ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনও দিন দিন বেশ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল। অলইণ্ডিয়া ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। সুভাষচন্দ্র বসু হলেন তার সভাপতি।

ঠিক সেই সময়েই পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে যুক্তপ্রদেশে আরম্ভ হোলো কিষাণ আন্দোলন।

অচ্যুত পটবর্দ্ধন, আচার্য্য নরেন্দ্র দেও, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন নেতৃবৃন্দ প্রতিষ্ঠিত করলেন কংগ্রেস সোসিয়্যালিষ্ট পার্টি।

হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র নির্ব্বাচিত হলেন কংগ্রেসের সভাপতি। ছবিতে দেখা গেল ত্রিপুরী অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র উপস্থিত হয়েছেন অসুস্থ শরীরে। কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের সংগ্রাম-বিমুখতা সহ্য করতে না পেরে—সুভাষচন্দ্র সমস্ত বামপন্থী দলগুলিকে একতাবদ্ধ করে চাইলেন ইংরাজের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রাম সুরু করতে। কংগ্রেসের মধ্যে সমস্ত বামপন্থী দলগুলি মিলিত হয়ে গঠিত হোলো ফরোয়ার্ড ব্লক।

ইউরোপে হিট্‌লার ও দূরপ্রাচ্যে জাপানের দাপটে ইংরাজ সরকার বেকায়দায় পড়ে ভারতবর্ষের নেতাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার উদ্দেশ্যে স্যর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌সের মারফৎ একটী প্রস্তাব পাঠালেন, কিন্তু ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দ প্রস্তাব মেনে নিতে পারলেন না।

১৯৪২ সালে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটী গান্ধীজীর 'কুইট্-ইণ্ডিয়া' বা 'ভারতছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, কিন্তু দেশবাসীকে কোন রকম নির্দ্দেশ দেবার আগেই তাঁরা সকলেই হলেন বন্দী। দেশে দেখা দিল এক স্বতস্ফূর্ত্ত আন্দোলন। 'Do or die' 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' এই বাণী গ্রহণ করে জনসাধারণ ঝাঁপিয়ে পড়ল আন্দোলনে। ইংরাজও কঠোর হস্তে চেষ্টা করল তা দমন করবার। দমিতও হোলো। কিন্তু দেশের মধ্যে অশান্তি বেড়ে উঠল বহুগুণে।

১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে দেখা দিল এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। অন্নের অভাবে সারা বাংলায় সুরু হোলো যেন কঙ্কালের মিছিল। সহর ও পল্লীগ্রাম ভরে গেল অনাহারক্লিষ্ট মৃতের শবে।

ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র কোন এক অজ্ঞাত উপায়ে ভারতবর্ষ থেকে উধাও হয়ে যোগ দিলেন চক্রশক্তিতে। জাপানের সাহায্য নিয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করাই ছিল তাঁর সঙ্কল্প। চিত্রে দেখানো হয়েছে—ব্যাঙ্ককে কন্‌ফারেন্স বসেছে, তার মধ্যে সুভাষচন্দ্র, রাসবিহারী বসু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ আলোচনা করছেন। তার পরই দেখানো হয়েছে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের গোড়াপত্তন এবং কোহিমা ও ইম্ফলের পথে লরীর ওপরে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে মহোল্লাসে চলেছে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈন্যগণ।

ডাঃ সুকর্ণ ও ডাঃ হাত্তার ছবি দিয়ে দেখানো হয়েছে বৃহত্তর ভারতের জাগরণ। বৃহত্তর ভারত যে আজ স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য বদ্ধপরিকর এই চিত্রখানিতে সেই কথা বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

পরিশেষে রূপায়িত হয়েছে সেই হৃদয়-বিদারক ছবি যা ঘটেছিল ২১শে নভেম্বর ১৯৪৫ সালে কলিকাতার রাজপথে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বন্দী ক্যাঃ শানাওয়াজ, ধীলন প্রভৃতির মুক্তি দাবীতে নিরীহ ছাত্র মিছিলের ওপর উন্মত্ত পুলিশের গুলিবর্ষণ। সেদিন ছাত্রগণের রক্তে কলিকাতার রাজপথে যে লিপিলেখা হয়েছে সেই মুক্তি ও একতার বাণী যুগে যুগে ভারতবাসীর বুকে সাহস যোগাবে।

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সেই বাণী—আজ সমস্ত ভারতবাসীর বুকে গুমরে উঠছে—"Life is impossible without Swaraj." কিন্তু কোনপথে কতদিনে তা সম্ভব হবে! এই প্রশ্নই আজ সকলের মনে। তাই সকল ছবির পরে' শিল্পী এঁকেছেন একটী জিজ্ঞাসার চিহ্ন। এই একটীমাত্র চিহ্নতেই যেন প্রকাশ হয়ে পড়েছে সমস্ত ভারতবাসীর মনের ভাব। ধন্য শিল্পীর পরিকল্পনা।

এইভাবে সুদীর্ঘ ইতিহাস চিত্রের সাহায্যে রচনা করা যে শিল্পীর কতখানি কৃতিত্বের পরিচয় তা বর্ণনা করা যায় না। সেক্‌স্‌পিয়রের নাটক যেমন ইংরাজ জাতির চরিত্র গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল, এই চিত্রগুলিও তেমনি আমাদের দেশবাসীর চরিত্র গঠনে সক্ষম হবে। ভারতবর্ষ যেদিন স্বাধীন হবে সেদিন শিল্পীর এই সার্থক সৃষ্টি পাবে উপযুক্ত দক্ষিণা।

রূপ

শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মরুভূ-আকাশে জ্বলে যে তারকা শত,
তোমার নয়নে আধ-জাগা আধ-ঘুমে
হাসিছে তাহারা ম্লানালোকে অবিরত
আঁখির পাতায় শিথিল আবেশ চুমে।
বাসন্তিকার রক্ত-গোলাপ কুঞ্জ
তোমার গণ্ডে করে লাবণ্য বৃষ্টি,

লুব্ধ লোলুপ কামনা ভৃঙ্গ পুঞ্জ
বিভোল আবেশে টেনে আনে অনাসৃষ্টি।
আননে তোমার সরল মধুর-হাস্য
আত্ম-ভোলা এ জীবনের বৈভব,
রূপায়িত তব প্রেম-বিমদির আস্য
এ তিন ভুবনে হ'লো তাই দুর্লভ।

বিয়ের পদ্য

(নাটিকা)

শ্রীজয়ন্তকুমার চৌধুরী

প্রথম দৃশ্য

কবি জ্ঞানাঞ্জন সান্যালের শোবার ঘর। প্রকাণ্ড একটা সেকেলে ছত্‌রিওয়ালা খাটে কবি-জায়া অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। কবির চোখে কিন্তু আজ ঘুম নেই। তিনি শয্যায় শুয়ে কেবল এপাশ-ওপাশ করছিলেন। ক্রমে ঢং ঢং করে মোড়ের গির্জের ঘড়িটাতে চারটে বেজে গেল। কবি আর থাকতে পারলেন না—উঠে বসলেন বিছানার উপর। তারপর……

জ্ঞানাঞ্জন। (নিদ্রিতা স্ত্রীকে ঠেলা দিয়া) বলি শুনছো! নাঃ বলিহারি তোমাদের ঘুমকে বাবা—কুম্ভকর্ণকেও হার মানিয়েছ। বলি, দয়া করে একবার ওঠোই না ছাই!

কাত্যায়নী। কি আপদ! ঠেলাঠেলি করছ কেন? যা বলবার মুখে বল্লেই ত হয়।

জ্ঞানাঞ্জন। বলছিলুম কি, পিসিমাকে একবার ডেকে তুলতে পার?

কাত্যায়নী। এত রাত্তিরে পিসিমাকে আবার কি দরকার হোলো শুনি?

জ্ঞানাঞ্জন। পিসিমার কাছ থেকে আফিমের কৌটোটা চেয়ে আনতে হবে।

কাত্যায়নী। (সবিস্ময়ে) আফিমের কৌটো! কেন আত্মহত্যে করবে না কি?

জ্ঞানাঞ্জন। সব তাতেই তোমাদের ঠাট্টা। এদিকে কত বড় বিপদ মাথার ওপর ঝুলছে তাতো জান না।

কাত্যায়নী। না বল্লে কি করে জানবো শুনি?

জ্ঞানাঞ্জন। জানো সবই, কেবল খেয়াল কর না এই যা দুঃখু। কাল রাত্তিরে মিত্তিরদের বাড়ীতে যে খানাতল্লাস হয়ে গেল, বল সে খবরও জানি না।

কাত্যায়নী। তা জানবো না কেন! কিন্তু তাই বলে আমাদের আফিম্ খেয়ে আত্মহত্যে করতে হবে না কি?

জ্ঞানাঞ্জন। আহা, আত্মহত্যে করতে যাবো কেন। আফিমের কৌটোটা চাই ফেলে দিতে।

কাত্যায়নী। (সবিস্ময়ে) ফেলে দিতে!—কেন আফিমের কৌটোর অপরাধ কি?

জ্ঞানাঞ্জন। তবে বলি শোনো। আজ দুপুর বেলায় আবার ঘোষেদের বাড়ী খানাতল্লাস হয়েছে শুনেছ?

কাত্যায়নী। শুনেছি, কিন্তু তার সঙ্গে পিসিমার আফিমের কৌটোর সম্বন্ধটা যে কি তাতো বুঝলাম না।

জ্ঞানাঞ্জন। একটু ভাবলেই বুঝতে পারতে। মিত্তিরদের বাড়ী খানাতল্লাস হোলো কেন বল দেখি?

কাত্যায়নী। মিত্তিররা নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে কোকেনের ব্যবসা করতো, তাই পুলিস সন্দেহ করে ওদের বাড়ী……

জ্ঞানাঞ্জন। হরিশ মিত্তির আর তার দুই ছেলেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে তা জানো?

কাত্যায়নী। তাও জানি। কিন্তু তার সঙ্গে পিসিমার আফিমের কৌটোর সম্বন্ধটা ত' বোধগম্য হ'চ্ছে না।

জ্ঞানাঞ্জন। সম্বন্ধ যথেষ্ট আছে। বলি, আমাদের বাড়ীতেও যে পুলিস কোন দিন খানাতল্লাস করতে আসবে না, তা কে বলতে পারে?

কাত্যায়নী। আমাদের অপরাধটা কি শুনি?

জ্ঞানাঞ্জন। ঘোষেরা কি অপরাধ করেছিল, যার জন্তে তাদের বাড়ী খানাতল্লাস হোলো?

কাত্যায়নী। তারা যে মিত্তিরদের আত্মীয় গো! আর তাছাড়া ওদের বাড়ী যে একেবারে গায়ে-গায়ে। আমাদের বাড়ী তো আর তা নয়। আর খানাতল্লাস করলেই বা ক্ষতি কি শুনি? আমাদের বাড়ীতে তো আর সত্যিই কোকেন লুকোনো নেই, যে ভয় পেতে হবে।

জ্ঞানাঞ্জন। আহা, কোকেন তো নেই, কিন্তু আফিম্‌টাও তো আবগারির মধ্যে পড়ে গো!—কি দরকার বাপু হাঙ্গামায়! পিসিমার কাছ থেকে আফিমের কৌটোটা চেয়ে নিয়ে কোথাও ফেলে দিলেই তো সব গোল চুকে যায়।

কাত্যায়নী। (বিরক্তভাবে) তোমার ইচ্ছে হয় তুমি নিজে গিয়ে দরজা ঠেলাঠেলি করগে যাও। আমার দ্বারা ওসব হবে না। বুড়োমানুষকে এই শীতে, শেষ রাত্তিরে……

জ্ঞানাঞ্জন। (সক্রোধে) যা খুসি কর তবে। চুলোয় যাক্ সব! আমারই বা কি কচুটা! না হয় হাতে হাতকড়া দিয়ে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে; না হয় দশ বছর জেল খাটবো; না হয়…

কাত্যায়নী। ভয় নেই! তোমাকে ধরতে নেহাতই যদি কেউ আসে তো সে পুলিসের লোক নয়, আসবে পাগলা গারোদের লোকেরা। যাক্ রাত্তির শেষ হয়ে এলো, দয়া করে একটু ঘুমোতে দাও দেখি।

(ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজলো)

শুনলে তো ৫টা বেজে গেল। দোহাই তোমার একটু ঘুমোতে দাও।

জ্ঞানাঞ্জন। তা ঘুমোবে বৈকি!—স্বামী যাচ্ছে জেলে—ঘুমোবার উপযুক্ত সময়ই ত এই! ঘুমোও, ঘুমোও, আরামসে ঘুমোও!

কাত্যায়নী। না, সারারাত জেগে পাগলের সঙ্গে পাগলামি করতে হবে। (দরজায় টোকা-মারার শব্দ)

জ্ঞানাঞ্জন। শুনছো! দরজায় কে টোকা মারছে না?

কাত্যায়নী। স্বপ্ন দেখছো না কি? দেখ,. জ্বালিও না—আমাকে ঘুমোতে দাও! ভোর হয়ে এলো।

(আরও জোরে জোরে দরজায় টোকা-মারার শব্দ)

জ্ঞানাঞ্জন। এখন বিশ্বাস হল ত! এইবার ঠ্যালাটা বোঝো!

কাত্যায়নী। এর মধ্যে আর ঠ্যালা সামলাবার আছেটা কি শুনি? নিশ্চয়ই গদাই ডাকছে। কে রে, গদাই বুঝি!

গদাই। আজ্ঞে হ্যাঁ, গিন্নীমা।

কাত্যায়নী। এখন হোলো ত?

জ্ঞানাঞ্জন। হোলো আমার মাথা আর মুণ্ডু। গদাই ডাকছে তা তো বুঝলুম, কিন্তু কেন ডাকছে সেটা একবার খোঁজ নিয়েছ? নিশ্চয়ই পুলিস এসে বাড়ীতে হানা দিয়েছে। নৈলে এই দারুণ শীতে ভোর বেলায় ও দরজা ঠেলতে যাবে কেন শুনি?

কাত্যায়নী। তক্কোয় দরকার কি বাবু! ওকে জিজ্ঞেস করলেই ত গোল চুকে যায়।—কি চাই রে গদাই?

গদাই। আজ্ঞে বাবুকে একজন ভদ্দরলোক খুঁজতে এসেছেন।

জ্ঞানাঞ্জন। শুনলে ত?

কাত্যায়নী। দরজাটা খুলে বাইরে গিয়ে দেখই না ছাই কে ডাকছে। ঘরের ভেতর বসে বসে আন্দাজে ভয়ে মরছ কেন?

জ্ঞানাঞ্জন। নাঃ জ্বালালে দেখছি। এই নাও খুলছি—(দরজা খুলিয়া) হয়েছে ত?

কাত্যায়নী। এখন দয়া করে নীচে গিয়ে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে এস দেখি।—এমন ভীতু লোকও ত কখন দেখিনি বাবা!

জ্ঞানাঞ্জন। আহা যাচ্ছি গো যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে একটু খোঁজখবর নিয়ে তৈরি হয়ে যাওয়া দরকার। ভদ্দরলোকের চেহারাখানা কি রকম বলতে পারিস গদাই?

গদাই। পেল্লায় চেহারা বাবু! যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। আবার তেমনি কালো।

জ্ঞানাঞ্জন। হুঁ বুঝেছি!—খুব জবর গোঁফ আছে ত?

গদাই। ঠিক ধরেছেন বাবু!

জ্ঞানাঞ্জন। যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই! পোষাক কি রকম বলতে পারিস?

গদাই। এ্যাজ্ঞে হেঁটু অবধি ঝুল কালো রংএর একটা মোটা আলখেল্লা গায়ে, গলায় গলাবাধা, মাথায় কানঢাকা টুপি।

জ্ঞানাঞ্জন। একেবারে পুলিসের পোষাক।—গলার আওয়াজ খুব বাজখাই গোচের ত?

গদাই। এজ্ঞে ঠিক ধরেছেন। গলা নয় ত যেন ভাঙ্গা কাঁসর। আবার হুমকি কি!—যেন এই মারে কি এই মারে!

জ্ঞানাঞ্জন। এখন শুনলে ত?

কাত্যায়নী। (একটু সন্দিগ্ধ ভাবে) কি জানি বাবু, কিছু ত বুঝতে পারছি না। যাই হোক্, দেখে এলেই ত চুকে যায়।

জ্ঞানাঞ্জন। (টিটকারির সুরে) কেন, বড় যে ঠাট্টা করা হচ্ছিল এতক্ষণ! বলি এখন যে আর মুখ দিয়ে কথাটি বেরুচ্ছে না।

কাত্যায়নী। পুলিস না হতেও ত পারে!

বাইরে জোরে জোরে কড়া নাড়ার শব্দ এবং তার সঙ্গে কর্কশ বাজকণ্ঠে—

—"অবিনাশ বাবু বাড়ী আছেন?—অবিনাশ বাবু!—বলি ও অবিনাশ বাবু!"

জ্ঞানাঞ্জন। (ভীত কণ্ঠে) গলার আওয়াজখানি শুনলে ত? এ পুলিস না হয়ে যায় না। গদাই, তুই শীগ্‌গির গিয়ে বলগে যা, বাবু এখুনি এলেন বলে। খুব খাতির করে বলবি, বুঝেছিস্?

গদাই। সে আর বলতে হবে না হুজুর। প্রস্থান

কাত্যায়নী। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে বড়?

জ্ঞানাঞ্জন। যাবার আগে মাথা ঠাণ্ডা করে একটু ভেবে যেতে হবে তো! নৈলে শেষকালে জেরার মুখে হঠাৎ কি বলতে কি বলে ফেলবো।—হ্যাঁ, আর একটা কথা, পিসিমার আফিমের কৌটোটা……এই যে পিসিমাও উঠে পড়েছেন।

ব্যস্তভাবে পিসিমার প্রবেশ

পিসিমা। কি হয়েছে রে গেনু, কি হয়েছে গা বৌমা? ভোর না হতেই এ্যাত চেঁচামেচি কিসের?

জ্ঞানাঞ্জন। সব কথা এখন বলবার সময় নেই পিসিমা। ওদের কাছে শুনতে পাবে।—আমি চল্লুম। প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

জ্ঞানাঞ্জন সান্যালের বাড়ীর সদর-দরজায় দাঁড়িয়ে বাড়ীর চাকর গদাইয়ের সঙ্গে কথা কইছিলেন পূর্ব্বোক্ত আগন্তুক ভদ্রলোকটি।

আগন্তুক। কৈ হে, তোমার বাবুর যে দেখাই নেই!—

গদাই। এজ্ঞে এলেন বলে! ঐ যে কত্তা এসে পড়েছেন।

জ্ঞানাঞ্জনের প্রবেশ

জ্ঞানাঞ্জন। নমস্কার, আস্তে আজ্ঞে হোক্!

আগন্তুক। থাক্ ঢের হয়েছে, আর আপ্যায়িতে কাজ নেই! তিনঘণ্টা ধরে চেঁচাচ্ছি, নামবার নামটি নেই।

জ্ঞানাঞ্জন। আজ্ঞে শুনতে পাই নি। মানে, ঘুমুচ্ছিলুম কিনা।

আগন্তুক। তবেই আর কি, মাথা কিনেছেন। বলি বাইরের ঘর-টর কিছু আছে, না সবটাই অন্দরমহল করে রেখেছেন?

জ্ঞানাঞ্জন। আজ্ঞে, সে কি কথা! সবটা অন্দরমহল করে রাখতে যাবো কেন বলুন! এর মধ্যে লুকোচুরির ত কিছু নেই।

আগন্তুক। তবে বাইরের ঘরটা খুলে দিতে বলুন আপনার চাকরকে। বাড়ীতে ভদ্দরলোক এলে বসতে দিতে হয়, তাও জানেন না নাকি?

জ্ঞানাঞ্জন। আজ্ঞে, তা জানবো না কেন? বাবা গদাই, বাইরের ঘরের চাবিটা ঝট্ করে নিয়ে আয় ত!

আগন্তুক। সেই সঙ্গে ওকে বলে দিন আসবার সময় যেন দোয়াত-কলম আর খানকতক লেখবার সাদা কাগজ নিয়ে আসে।

জ্ঞানাঞ্জন। শুনলি ত? আসবার সময় তোর গিন্নীমার কাছ থেকে আমার ফাউন্টেন পেনটা, আর খানকতক সাদা কাগজ নিয়ে আসবি—বুঝলি।

গদাই। এজ্ঞে!

প্রস্থান

আগন্তুক। দেখুন, কবিদের ওপর কোনদিন ভাল ধারণা না থাকলেও ঠিক খারাপ ধারণাও ছিল না; কিন্তু সম্প্রতি একটা কেস্ দেখে আপনাদের ওপর অশ্রদ্ধা এসে গেছে।

জ্ঞানাঞ্জন। আজ্ঞে, আমাদের ওপর শুধু শুধু সন্দেহ করছেন। নিশ্চয়ই কেউ আপনাকে ভুল সংবাদ···

আগন্তুক। ভুল কি ঠিক সেটা একটু পরেই বোঝা যাবে। এখন ঝট্পট্ ঘরটা খুলে ফেলুন দেখি। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? যেমন বাবু, তেমনি চাকর। তুই ব্যাটা হাঁ করে দেখছিস কি! বাবুর হাতে চাবি দে না।

জ্ঞানাঞ্জন। ও যে কখন চুপি চুপি পেছনে এসে দাড়িয়েছে, টের পাই নি স্যার!—এখুনি ঘর খুলে দিচ্ছি।

(চাবি খুলিয়া উভয়ের ঘরের মধ্যে প্রবেশ)

আগন্তুক। এই তো দিব্যি টেবিল-চেয়ার রয়েছে। এখন বসুন দেখি। আহা, আমার জন্তে ব্যস্ত হতে হবে না। আমি ঠিক আছি। এইবার যা বলি লক্ষ্মী ছেলেটির মত লিখে যান দেখি।

জ্ঞানাঞ্জন। (সভয় কম্পিত-স্বরে) আজ্ঞে···

আগন্তুক। আজ্ঞে, কি আবার? লিখে যান না মশাই!

জ্ঞানাঞ্জন। আজ্ঞে, ভেতর থেকে একবার।

আগন্তুক। কি আপদ। ভেতরে গিয়ে কি করবেন শুনি?

জ্ঞানাঞ্জন। আজ্ঞে, যাবো আর আসবো।

আগন্তুক। আচ্ছা যান্, দেরী করবেন না কিন্তু।

জ্ঞানাঞ্জন। আজ্ঞে না, এখুনি আসচি।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

জ্ঞানাঞ্জন সান্যালের বাড়ীর অন্দরমহল। কবি এবং কবিজায়ার কথোপকথন

কাত্যায়নী। হ্যাঁ গা, কি রকম বুঝলে?

জ্ঞানাঞ্জন। বুঝলুম আমার মাথা আর মুণ্ডু। যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই। আবার বলে কি জান? বলে, বাড়ীর সবটাই অন্দরমহল করে রেখেছেন না কি? অর্থাৎ সবটাই লুকোচুরির ব্যাপার নাকি? বোঝো ঠ্যালাটা! শুধু কি তাই? আবার বলে কি না, কাগজ-কলম নিয়ে যা বলি তাই লিখে যান। আমার তো মাথা গুলিয়ে গেছে। এখন তুমি একটা পরামর্শ দাও দেখি কি করি।

কাত্যায়নী। কি লেখাতে চায়, সেটা না জেনে আগে থাকতে···

জ্ঞানাঞ্জন। নাঃ, তোমাদের নিয়ে আর পারলুম না। কি লেখাতে চায় বুঝতে পারছো না? আমাদের বাড়ী থেকে আবগারী মাল পাওয়া গেছে, এইটে আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে চায় আর কি।

কাত্যায়নী। তা, তুমি না লিখে দিলেই পারো।

জ্ঞানাঞ্জন। যদি জোর করে লিখিয়ে নেয়।

কাত্যায়নী। তুমি বোলো, পাড়ার দু-চারজন ভদ্দরলোককে ডেকে আনা হোক।—যা লেখবার তাদের সুমুখেই লিখবো। পাঁচজন ভদ্দরলোক থাকলে ত আর যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে না।

জ্ঞানাঞ্জন। ঠিক বলেছ! ভাগ্যিস তোমাকে না জিজ্ঞেসা করে হঠাৎ কবুল হইনি। হ্যাঁ ভাল কথা, পিসিমার আফিমের কি করলে? ফট্ করে বাড়ী সার্চ করলেই ত গেছি।

কাত্যায়নী। ঐ তো পিসিমা আসছেন। (পিসিমার প্রবেশ) কি হোলো পিসিমা?

পিসিমা। তোরা কিচ্ছু ভাবিস্ নি বাছা, আমি সে এমন যায়গায় লুকিয়েছি যে কারুর বাপের সাধ্যি নেই খুঁজে বার করে।

জ্ঞানাঞ্জন। কোথায় লুকোলে শুনি?

পিসিমা। একরত্তি আফিম্ ছিল বৈত নয়, সে আমি কোঁৎ করে গিলে ফেলেছি। মর্ আবাগের ব্যাটারা সারা বাড়ী খুঁজে।

কাত্যায়নী। এই নিশ্চিন্ত হয়েছ ত!

জ্ঞানাঞ্জন। হ্যাঁ, কতকটা। আমি তাহলে ঐ কথাই বলিগে যাই।

'আগামীবারে সমাপ্য'

যুদ্ধের আড়ালে

অধ্যাপক শ্রীশিবনাথ চক্রবর্ত্তী এম-এ

নেপোলিয়ন বোনাপার্টি তাঁহার রুশীয় অভিযানের অভিজ্ঞতার ফলে বলিয়াছিলেন—'যুদ্ধ বর্ব্বরের ব্যবসায়'। একটু প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিলেই যুদ্ধ-বিশারদ নেপোলিয়নের উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। শত্রুকে যে কোন প্রকারে হউক পরাজিত করিয়া তাহার নিকট হইতে সুবিধাজনক সর্ত্ত আদায় করা যুদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত নরহত্যা অপরিহার্য্য ও বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠে। এক একটী যুদ্ধের হত, আহত ও বন্দীদের সংখ্যা দেখিলে মনে হয় না যে তথা-কথিত সভ্যতা-গর্ব্বী মানুষ ও অসভ্য নরখাদকদিগের মধ্যে বিশেষ

কোন পার্থক্য আছে। শুধু মারণকৌশল ও অস্ত্র শস্ত্রের বৈষম্য ছাড়া সভ্য ও অসভ্য মানুষে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান যুদ্ধে অসামরিক নাগরিকদিগেরও নিস্তার নাই। বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধকালে সামরিক ও অসামরিক নাগরিকদিগের বিভেদ এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। অবশ্য অতীত যুগেও যে ইহাদিগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল, তাহা নহে। সৈন্য ও সাধারণ নাগরিক বিজেতা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া অনেক স্থলে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইত। তবে কয়েকটী বিষয়ে বর্ত্তমান যুদ্ধ অধিকতর ভয়াবহ ও মারাত্মক হইয়া পড়িয়াছে। নূতন নূতন মারণাস্ত্রের আবিষ্কারের ফলে আহতদের যন্ত্রণা ও ক্লেশের মাত্রাও অধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। অবশ্য সেই সঙ্গে ইহাও মানিয়া লইতে হইবে যে আহতদের ক্লেশ লাঘব করিবার নিমিত্ত চিকিৎসা শাস্ত্রের ও শুশ্রূষা ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে। তবে পূর্ব্বাপেক্ষা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। বড় বড় কামানের গোলা ও দুর্দ্ধর্ষ বোমারু বিমান দ্বারা যেরূপ ব্যাপকভাবে ধ্বংস কার্য্য সাধিত হইতেছে, পূর্ব্বে ইহা সম্ভবপর ছিল না। লুঠ তরাজ ও অগ্নি সংযোগ করিয়া পূর্ব্বে ধ্বংস কার্য্য সাধন করা হইত, তাহাতে ক্ষতির পরিমাণ এত বেশী হইত বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যুদ্ধরত মানুষ অনেক সময় তাহার মানবোচিত ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া পশুত্ব বরণ করিয়া লয়। তাহার হৃদয়ের সমস্ত কোমল-বৃত্তি সাময়িকভাবে অন্ততঃ মৃতপ্রায় হইয়া যায়। নতুবা কি করিয়া মানুষ তাহার স্বজাতির ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে? ইহা গেল যুদ্ধরত মানুষের একটা দিক। শুধু এই প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক দিকটী দেখিলে মানুষের প্রতি অবিচার করা হইবে। মানুষ ভাল ও মন্দের সংমিশ্রণে গঠিত। সাময়িকভাবে হয়ত তাহার অন্তর্নিহিত পশু মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইতে পারে,—তাহার জাতীয় স্বার্থের খাতিরে বা অর্থ ও পদবীর মোহে সে জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি জলাঞ্জলি দিয়া মহা-আহবের তাণ্ডব নৃত্যে যোগদান করিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহার মানবোচিত গুণাবলী একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায়, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। যুদ্ধের জন্য দেশের শাসনতন্ত্র দায়ী, সাধারণ সৈনিক নহে। সাধারণ সৈনিক শাসনতন্ত্রের ক্রীড়নক মাত্র। সুতরাং মারণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও সময়ে সময়ে সাধারণ সৈনিকের মধ্যেও মনুষ্যত্ব জাগিয়া উঠে, সে বিরোধ ভুলিয়া গিয়া শত্রুকেও কোল দিতে পারে। বিশ্বব্যাপী ধ্বংস লীলার মধ্যে এইটুকু কোমলতা না থাকিলে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বোধ হয় এতদিনে মানুষ জাতি লুপ্ত হইয়া যাইত।

বর্ত্তমান কালে সাংবাদিকগণ অনেক সময় খাস যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধের তথ্য ও কাহিনী বহির্জগতে প্রকাশ করিতেছেন। অবশ্য এজন্য সাংবাদিকগণের অনেক সময় অনেক বিপদের সম্মুখীন হইতে। হয়। শত্রুর হস্তে পড়িলে প্রায়ই তাহাদের নিগৃহীত হইতে হয়, গোলাগুলির আঘাতে অসাবধানতাবশত তাহাদের প্রাণ হারাইতে হয় ইহা সত্ত্বেও যে সাংবাদিকগণ যুদ্ধের বার্ত্তাসমূহ বহির্জগতে প্রকাশ করিয়া দেন, সে জন্য তাঁহারা সকলের ধন্যবাদার্হ। বিভিন্ন দেশে যুদ্ধকালে উপস্থিত থাকিয়া সাংবাদিকগণ যুদ্ধরত সৈনিকদের উদারতা, মহানুভবত ও স্নিগ্ধচিত্ততার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে যুদ্ধকালে মানুষের সদ্‌গুণাবলী একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় না। নিম্নে কয়েকটী ঘটনার সংক্ষেপে অবতারণা করা যাইতেছে।

বিগত প্রথম মহাসমরের সময় যখন জার্ম্মাণ সৈন্য বেলজিয়ম দেশে নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়া দুর্ব্বার বেগে ফরাসী দেশ অভিমুখে ধাবি হইতে থাকে তখন বেলজিয়মের একটী ক্ষুদ্র গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। মি সৈন্য প্রবল বেগে শত্রুকে বাধাদান করিয়া তাহাদের অগ্রগতির বে কমাইয়া ফেলিয়াছে। উভয়পক্ষ মাত্র একশত গজ ব্যবধানে মাটীতে গ খুঁড়িয়া ইঁদুরের মত বাস করিতেছে ও পরস্পরের প্রতি মারণাস্ত্র নিক্ষে করিতেছে। একদিন সমস্তদিনব্যাপী বৃষ্টির পর সন্ধ্যার অন্ধকা উভয় পক্ষের সৈন্যগণ দেখিতে পাইল যে কয়েকটী বলিষ্ঠদেহ শূকর ছান পথহারা হইয়া উভয় সৈন্যশ্রেণীর মধ্যস্থিত মালিকহীন ভূখণ্ডের (N man's land) উপর আসিয়া পড়িয়াছে। যুগপৎ উভয় পক্ষের গুলিতে পশুগুলি নিহত হইল। কিন্তু সাহস করিয়া কোন পক্ষের কোন সৈনিক মাংসের লোভেও গর্ত্তের বাহির হইল না। হঠাৎ জার্ম্মাণ পক্ষের গর্ত্তে ভিতর হইতে সজোরে ক্ষুদ্র একখণ্ড ইষ্টক মিত্র শক্তিবর্গের গর্ত্তের ওপা পতিত হইল। দেখা গেল লম্বা একটা দড়িতে একখণ্ড ইটের সহিত একা ক্ষুদ্র চিঠি বাঁধা আছে। লেখা আছে—কয়েক মিনিটের জন্য যুদ্ধবিরতি সর্ত্ত ও শূকর মাংস বণ্টন। অমনি মিত্রশক্তির গর্ত্ত হইতে প্রত্যুত্ত লইয়া রজ্জুবদ্ধ ইষ্টক শত্রুর গর্ত্তের দিকে ছুটিল! একটু পরেই দুইটী লৌ শিরস্ত্রাণ গর্ত্ত হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া নিহত শূকরের দিকে ধাবি হইল। মিত্রশক্তির গর্ত্ত হইতেও দু'জন যোদ্ধা বাহির হইয়া শত্রুর সহি মিলিত হইল। বলা বাহুল্য, উভয় পক্ষের যোদ্ধৃগণ নিরস্ত্র ছিলেন পরস্পর করমর্দ্দন হইল, তারপর যথারীতি পশুর দেহ হইতে পরস্পরে সহায়তায় চামড়া ছাড়ান হইল। একজন সৈনিক দৌড়াইয়া গি নিজেদের গর্ত্ত হইতে একটী ভাঙ্গা কাঠের বাক্স লইয়া আসিল। তদ্দ্বা আগুন জ্বালাইয়া মাংস সেকিয়া লওয়া হইল। তৎপরে উভয় পক্ষে সৈন্যগণ মাংস বণ্টন করিয়া পুনরায় করমর্দ্দন করিয়া পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানাইয়া হৃষ্টচিত্তে নিজেদের গর্ত্তের দিকে চলিয়া গেল। দশ মিনি পরেই আবার কলের বন্দুকের খটাখট আওয়াজ আরম্ভ হইল।

স্পেন দেশের বিগত গৃহবিবাদের সময় জনৈক সংবাদদাতা একটী চিত্তাকর্ষক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। স্পেন দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে ম্যালাগার যুদ্ধক্ষেত্রে ঘটনাটি ঘটে। একদিন অপরাহ্নে মালিকহী ভূখণ্ডের ওপারের সরকার পক্ষের গর্ত্ত হইতে হঠাৎ তারস্বরে জনৈ সৈনিক বিদ্রোহী-বাহিনীর সৈন্যদের সম্বোধন করিয়া বলিল—ভ্রাতৃ বৃন্দ, আমার রুগ্না স্ত্রীকে ফেলিয়া রাখিয়া আমি যুদ্ধে যোগ দিয়াছি তাহার বাসস্থানের ঠিকানা জানাইতেছি, তোমরা কেহ অনুগ্রহ করিয় যদি আমাকে তাহার সংবাদ আনিয়া দাও তাহা হইলে আমি কৃতজ্ঞ থাকিব—তোমাদের ওস্থান হইতে আমার স্ত্রীর বর্ত্তমান বাসস্থান খু বেশী দূরে নয়। বিদ্রোহী সৈন্যগণ সকলেই তাহাদের সেনানায়কে

দিকে তাকাইল। তিনি মৃদু হাসিয়া অপর পক্ষের সৈনিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, উক্ত সৈনিক ইচ্ছা করিলে নিজে আসিয়া তাহার স্ত্রীর খোঁজ লইতে পারে। তাহার জীবনের বা স্বাধীনতার কোন হানি হইবে না। সৈনিক কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া নিরস্ত্রভাবে স্বপক্ষের গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া শত্রু গর্ত্তের দিকে চলিল। শত্রুর গর্ত্ত হইতে দু'জন বিদ্রোহী সৈনিক তাহার সঙ্গ লইল। প্রায় ২।৩ ঘণ্টা পরে তিন বন্ধু আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে ফিরিল। স্ত্রীর অবস্থা অনেকটা ভাল। সৈনিক আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় বিদ্রোহীবাহিনীর নেতাকে সামরিক অভিবাদন জানাইয়া নিজের গর্ত্তে ফিরিল।

গত রুশ-জর্ম্মান যুদ্ধের সময়ও এইরূপ কয়েকটা ঘটনার বিষয় বহির্জগতে প্রকাশ পাইয়াছে। জার্ম্মান বাহিনী তখন ষ্ট্যালিনগ্রাদের মহাযুদ্ধে পরাজিত হইয়া রুশ দেশ হইতে ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একদিন পশ্চাদ্ ধাবমান একটা রুশ বাহিনীর সহিত পলায়মান একটা জার্ম্মান দলের সংঘর্ষ হয়। উভয় পক্ষেই যুদ্ধে কয়েকটা ট্যাঙ্ক ব্যবহৃত হয়। জর্ম্মান দল শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হইয়া নিকটস্থ তাহাদের প্রধান ঘাঁটীতে আশ্রয় লয়। রুশ সৈন্যের জনৈক নায়ক পরদিবস কি প্রকারে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান চালনা করিয়া তাহাদের বর্ত্তমান ঘাঁটি হইতে বিতাড়িত করিবেন তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত নিকটস্থ গুল্ম-লতা-সমাচ্ছন্ন ভূখণ্ড পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। কিছু দূরে জার্ম্মান সৈন্যদের কাঁটা তারের প্রাচীর মধ্যে মধ্যে তাহার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। হঠাৎ নিকটস্থ একটা ঝোপের ভিতর হইতে কাতর কণ্ঠে ভাঙ্গা রুশীয় ভাষায় কে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিল। রুশ যুবক অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, মাথার উপর একটা হাত উঠাইয়া জনৈক জর্ম্মান সৈনিক অপর হস্ত তাহার দিকে প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছে! তাহার নিকটস্থ হইয়া যুবক দেখিল যে সে অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। সৈনিকের অবস্থা দেখিয়া রুশ যুবকের দয়া হইল। জার্ম্মান সৈনিক সংক্ষেপে যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই :—সে ও তাহার অপর দুজন বন্ধু একটা ট্যাঙ্কের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিল। রুশীয়দের গুলিতে ট্যাঙ্কটিতে আগুন লাগে ও তাহার অপর দুজন সঙ্গী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়ে কিন্তু রুশীয়দের হস্তে নিহত হয়। সে বাহির হইবার সময় হঠাৎ ট্যাঙ্কটীর ঢাক্‌নি সজোরে তাহার মাথায় পতিত হওয়ায় কিছু সময়ের জন্য সে সংজ্ঞাহারা হয় ও প্রায় অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় কোনমতে ট্যাঙ্ক হইতে বাহির হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে এই ঝোপে আশ্রয় লইয়া মৃত্যু অথবা বন্দী জীবনের অপেক্ষায় আছে। বাড়ীতে তার একমাত্র সন্তান মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সে কাঁদিতে কাঁদিতে রুশ যুবকের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল যে তাহাকে কোনমতে টানিয়া লইয়া কিছুদূরে যদি জর্ম্মান সৈন্যরেখার সীমায় রাখিয়া আসে, তাহা হইলে তাহাকে হয়ত চিকিৎসার জন্য জর্ম্মানীতে পাঠান হইবে, কেননা রুশ দেশ হইতে জার্ম্মান অভিযান তুলিয়া লইবার শেষ আদেশ আসিয়াছে। তাহা হইলে সে হয়ত তাহার সন্তানের মুখ দেখিতে পাইবে। রুশ সৈনিক সম্মত হইল না, গম্ভীর মুখে জর্ম্মান সৈনিককে বলিল যে, সে তাহাদের শিবিরে তাহাকে লইয়া তাহার চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবে ও যুদ্ধ মিটিলে সে স্বদেশে চলিয়া যাইতে পারিবে। একথা শুনিয়া জর্ম্মান সৈনিক কাঁদিতে লাগিল ও বলিল যে তার চেয়ে বরং তাহাকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হউক। হঠাৎ রুশ যুবক নীচু হইয়া তাহার পরম শত্রু জর্ম্মান সৈনিকের দেহ নিজের পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া শত্রুর সৈন্য রেখার দিকে অগ্রসর হইল। কিছুদূর চলিবার পর হঠাৎ কাহারা আদেশের সুরে তাহাকে থামিতে বলিল। রুশ যুবক নির্ভয়ে আদেশ পালন করিল। উদ্যত-সঙ্গীণ তিন জন জর্ম্মান সৈনিক তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া পৃষ্ঠে আহত জর্ম্মান সৈনিক দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। আহত জর্ম্মান সৈনিক যখন তাহার প্রাণদাতার পরিচয় দিল, তখন যুগপৎ তিনজন জর্ম্মান সৈনিকই বন্দুক ফেলিয়া দিয়া রুশ যুবকের দিকে কর প্রসারণ করিল। তারপর কত কথা, যেন আর ফুরায় না! কতদিনের পুরাতন বন্ধু! জর্ম্মান সৈনিকগণ থলিয়া হইতে বিস্কুট ও সিগারেট বাহির করিয়া রুশ যুবককে দিল। রুশ যুবক তার ভিতরের পকেট হইতে এক বোতল 'ভড্‌কা' বাহির করিয়া জর্ম্মান বন্ধুদের দিল। হঠাৎ দূরে 'বুম' শব্দে সকলে সচকিত হইয়া উঠিল। দ্রুত করমর্দ্দন ও বিদায় গ্রহণ।

যাহারা মানুষকে মানুষ হইতে দেয় না, নানারূপে মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া মানুষকে ধাপে ধাপে পশুত্বে নামাইয়া আনিয়া তাহাদের স্বার্থ সিদ্ধি করে, তাহারা স্বজাতি হউক অথবা বিজাতীয় হউক, সমগ্র মানুষ জাতির শত্রু। যে বৈজ্ঞানিক শক্তির সদ্ব্যবহারে জগতের জনসমূহের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, স্বাস্থ্যে, ধনে, সম্পদে মানুষ প্রকৃত সুখী হইতে পারে, সেই বৈজ্ঞানিক শক্তির অপব্যবহারে পৃথিবী ধ্বংসোন্মুখ। মানুষ বুদ্ধিজীবী প্রাণী বলিয়া নিজের পরিচয় দেয়, কিন্তু কবে তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হইবে?

যত দোষ নন্দ ঘোষ

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম্-এ, বি-টি, (ক্যাল) ডিপ্-এড, (এডিনবরা ও ডাবলিন)

আমাদের এই অধঃপতিত দেশে, "যত দোষ নন্দ ঘোষ" এই নীতি অনুসারে অন্ততঃ শিক্ষা বিষয়ে যাবতীয় দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে কথা বলিতে গেলেই বেচারা শিক্ষককেই প্রায় প্রথম আঘাত করা হয়। 'ঐ মাষ্টার সারাদিন টিউশনি করে বেড়িয়ে স্কুলে এসে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমায়। আর শান্ত ছেলেরা হয়ত তাঁর নাকে শুঁয়াপোকা ধরে দিবার পরিকল্পনা করে।' ইহাই আমাদের বিদ্যালয়ের সমগ্ররূপ বলিয়া ধরিয়া তোলা একটি

পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোথায় কে কি করিয়া বসিল বা কি বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, অমনি দোষ হইল বিদ্যালয়ের শিক্ষার। ছেলে বা মেয়ে পরীক্ষায় টুকিল, অমনি দোষ হইল মন্দভাগ্য মাষ্টারের। স্কুল কর্তৃপক্ষ মর্ণিং স্কুল দিলেন অমনি দোষ দেওয়া হইল, 'এবার মাষ্টারগুলার বাড়ী গিয়ে দুপুরে ঘুমাবার খুব যুত হল; কোন একটি সভায় শিক্ষা সংস্কারের প্রস্তাবে গুরুদের বেতন বৃদ্ধির কথা যেমনই বলা অমনি একজন খদ্দর-পরা প্রধান ও বিদ্বান স্বদেশী নেতা বলিয়া উঠিলেন, 'মাষ্টাররা যতদিন শিক্ষাদানকে অর্থকরী ব্যবসায় হিসাবে দেখিবেন ততদিন এ জাতির কল্যাণ কোথা?' বেশ কথা, তবে মাষ্টার মহাশয়ের কাজ কেবল ত্যাগ স্বীকার ও আর আর সকলের কাজ হইল মোটরে চড়িয়া মোড়লি করা। এই আক্রাগণ্ডার দিনে সকলেই পেটের চিন্তা করিবার অধিকারী, আর মাষ্টার বেচারী পেটের জ্বালা ভুলিয়া 'হরিমটর' ভক্ষণ করিয়া জীবন ধরিয়া রহিবেন। সর্বসাধারণ, ধনীজন, মহাজন, পৌরসভা, সরকার সকলেরই ত্যাগে ও সাধনায় শিক্ষার বনিয়াদ গড়িয়া তুলিতে হইবে। বিদ্যালয় সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের একাংশমাত্র, যদিও খুব প্রয়োজনীয় সে অংশটুকু। বিদ্যালয়ের উন্নতি বলিতে বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতিও বুঝায়। প্রতিমা গঠনে কাঠামোর উপর খড়মাটি দেওয়া হইলে দোমেটে করার পর রং ফলান বা চিত্র করা হয়। শিক্ষাতেও সেই কথা। শান্ত ও সুস্থ শরীর ও মন হইল শিক্ষার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। ছাত্র পেট ভরিয়া খাইতে পায় কি না, পরিধানে তার কাপড় আছে কি না, তাহাদের ঘরের চালে খড় আছে কি না, জুতা পরার সঙ্গতি আছে কি না, অসুখে ঔষধ ও পথ্য জোটে কি না এ সকলই যাঁহারা শিক্ষা লইয়া মাথা ঘামাইয়া থাকেন তাঁহাদের ভাবিবার ও করিবার বিষয়। এ ক্ষেত্রে বক্তৃতাটা শুধু গরীব মাষ্টার বেচারীর উপর ঝাড়িলেই বা চলিবে কি প্রকারে? জীর্ণ শীর্ণ নিরানন্দ শিশুর শিক্ষার সংস্কারে শুধু প্রণালীর খেলা দেখাইলে চলিবে না, অথবা দিন দিন তাহার পুঁথির বোঝা বাড়াইয়া চলিলে তাহার মঙ্গলের পথ প্রশস্ত করা হইবে না। আর গুরুদের ট্রেনিং সার্টিফিকেটের বা নবপ্রণালী সম্মত কাজের বোঝা বাড়াইয়া লাভ কি? সুতরাং শিক্ষার উন্নতি সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির অপেক্ষা করে। অভিনব মনোরম শিক্ষা প্রণালী তাদৃশ সরসক্ষেত্রের অভাবে মরিয়া যায়। সমগ্রজাতির জীবনের মূলে রস সঞ্চারে শিক্ষা প্রণালী সজীব হইয়া উঠে। উল্টা প্রণালীতে গোড়া বাদ দিয়া আগার দিকে জল ঢালিলে শুধুই পণ্ডশ্রম; গাছ বাঁচিলে তবে ফুল-ফলের কথা। পীড়িত; ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসিতকে কি শুধু উপদেশামৃত দিয়া সঞ্জীবিত করা যায়? তাই মনে হয় যে কোন শিক্ষা পরিকল্পনাকে সফল করিতে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার উন্নতি অগ্রে সাধনীয়।

চাঁদু যে দিন দাদু বলা ভুলিল

শ্রীজনরঞ্জন রায়

বিদেশে গিয়াও কেবল চাঁদুর কথাই মনে পড়ে।··· তার সেই দাদু দাদু বুলি···কোলে নিলে আহ্লাদের সেই নাচ···সেই দোলা দেওয়া···সেই অস্ফুট মধুর কাকলি—প্রাণটা যেন ভরপুর হইয়া যায় তার কথা ভাবিলে।

চাঁদু আমার নাতি···পৌত্র। এই পৌষ মাসে এক বৎসরে পড়িয়াছে। বিদেশে গিয়াছিলাম···একটি বন্ধু-পুত্রের বিবাহে। কাটিয়া গেল কয় দিনই। একদিন সকালে চাঁদুর জন্য প্রাণটা যেন কাঁদিয়া উঠিল···সেই দিনই বাড়ি ফিরিলাম। ফিরিতে রাত হইল। আসিয়াই চাঁদুকে দেখিতে দৌড়িলাম···সে তখন ঘুমাইয়াছে। তার মুখখানি দেখিলাম···পদ্মফুলের মতো মুখখানি।···লাল ঠোঁট দুটি মাঝে মাঝে নড়িতেছে···সে বুঝি দেয়ালা করিতেছে।·· স্বপ্নে হাসিতেছে···কাহাকে দেখিয়া?··· নিশ্চয় সে তার দাদুকে স্বপ্নে দেখিয়া হাসিতেছে!

সকালে উঠিয়া কান খাড়া করিয়া আছি···আমার দাদু-বলা ভোরের পাখি কৈ আমাকে আজ ডাকিতেছে না তো?···কি বলিতেছে?···দাইদা···দাদা-দাদা—বলিতে বলিতে সে যে হাঁপাইয়া ওঠে!···আমি কোলে করিয়া কত আদর করি···চুমা খাই···তবুও তার দাদা বলা বন্ধ হয় না!·· কিন্তু আজ সে কি বলিতেছে—কঃকা···কঃকা··· কাকা!···সে তো দাইদা বলিতেছে না···দাদা বলা সে কি ভুলিয়া গেছে এই কয় দিনে?

প্রাণটা কেমন যেন গুমরিয়া উঠিল!···উঠিয়া গেলাম তার ঘরে। চাঁদু কি একটা হাতে নিয়া খুব হাত ছুঁড়িতেছে···আর বলিয়া চলিয়াছে—কঃকা···কঃকা··· কাকা। আমি বলিলাম—চাঁদু রাগ করেছ···আমি চলে গিয়েছিলাম বলে' রাগ করেছ···এই যে আমি এসেছি··· এইবার বলো দাইদা···দাইদা···দাদা। চাঁদু মুখ তুলিয়া চাহেই না···এতই আপন খেয়ালে মত্ত। থাকিতে পারিলাম না···তাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম···অভ্যাস মতো তাকে নিয়ে সকালে ছাদে বেড়াইতে যাইব, এমন সময় নীচের বৈঠকখানা হইতে ভায়াদের ডাকাডাকির শব্দ কানে গেল। আমার কয় দিনের অনুপস্থিতিতে বৈষয়িক অনেক কাজ জমিয়া গিয়াছে···তার ফয়সালা করিতে তারা ডাকিতেছে। সে সব বিচার-নিষ্পত্তি করিয়া, আহারাদির পর চাঁদুর যখন খোঁজ করিলাম, তখন দেখি—তার মা তাকে ঘুমাইবার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করিতেছে···দামাল ছেলে কিছুতেই ঘুমাইতে চাহিতেছে না। তাই তখন তার ঘুম ভাঙাইবার চেষ্টা করিলাম না। আমারও চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল। বিছানার আশ্রয় নিতেই বেশ ঘুম আসিল।

ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছি—চাঁদু বড় হইয়া গিয়াছে··· বড় হইয়া আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছে···কোনো খোঁজ খবরই রাখে না আমাদের।···আমার কিন্তু প্রাণ পড়িয়া আছে চাঁদুর কাছে···চাঁদু ছাড়া আর কাহারও কথা ভাবিতে পারি না।···ইহার মধ্যে যেন একটা যুগ কাটিয়া গিয়াছে ···চাঁদু আমার বুকের সঙ্গে আরো গাঁথিয়া গিয়াছে।··· আমার অন্তরের অবলম্বন চাঁদু।···আমি তখন একটি গোপাল মূর্ত্তি তৈয়ার করিয়া নিয়াছি···সেটি অবিকল চাঁদুর সেই শিশু মূর্ত্তি।··আমি তাকে ক্ষীর-ননী খাওয়াই···তিলক পরাই···পোষাক পরাই···বুকে নিয়া বেড়াই···তার কানের কাছে বলি—দাইদা··· দাইদা···দাদা!···শরীর আমার পুলকে ভরিয়া ওঠে।

এ কাহার স্পর্শ···কাহার?···আমায় ধরিয়া কে এ নাচিতেছে যেন···কে যেন ডাকিতেছে—দাইদা···দাইদা ···দাদা! স্ত্রীর উচ্চ হাস্যে ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি বলিলেন—তুমি স্বপ্নে ডাকিতেছিলে—দাইদা···দাইদা··· দাদা, আর দাদু তোমার কাছে বসিয়া ডাকিতেছে— দাইদা, দাদা···কত যে প্রাণের মাখামাখি এই দুই দাদুর মধ্যে দেখে অবাক হচ্ছি! উঠিয়া বসিলাম। তাইতো, এই যে আমার স্বপ্নের গোপাল··আমার চাঁদু! তাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম।···তখনো সে নাচিতেছে···আর মুখে বলিতেছে—দাইদা···দাইদা···দাদা।

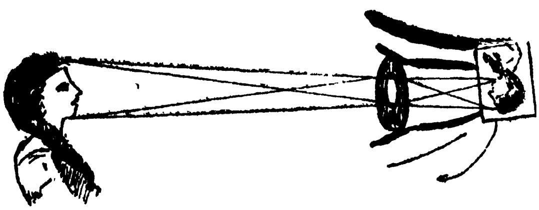
টেলিভিশন

শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও শ্রীঅশোককুমার মিত্র

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাহলে মোটামুটি কথাটা দাঁড়াল এই। যে ছবিটা পাঠাতে হবে তার উপরে সন্ধানী আলো বারবার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়ে আনতে হবে। এই কাজটি করতে হবে খুবই তাড়াতাড়ি। এক সেকেণ্ডের ভিতরে অন্ততঃ বারো-তেরোবার তাকে গোটা ছবিটার উপর দিয়ে ঘুরে আসতে হবে। আর সন্ধানী আলো ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ছবিটার বিভিন্ন জায়গা থেকে যেমন যেমন আলো ঠিকরে পড়বে সেই ঠিকরে-পড়া আলোকে তখন তখনই চালান করে আনতে হবে দর্শকের পর্দ্দার উপরে। এই পর্দ্দা আর দর্শকের মাঝখানে রয়েছে একটি ফুটো-ওয়ালা ডিস্‌ক। ফুটোটি যখন যেখানে থামবে তখন শুধু তার ভিতর দিয়ে পর্দ্দার সামান্য একটু অংশমাত্র দেখা যাবে—অন্য কোনও জায়গা দিয়ে পর্দ্দাটি একদম দেখা যাবে না। এই চাকতিটি অর্থাৎ ফুটোটিকে আবার যেমন তেমনভাবে ঘুরালে চলবে না। সন্ধানী আলোটা আসল ছবির যখন যে জায়গায় পড়বে, এই ফুটোটিকেও তখন পর্দ্দার সামনে ঠিক সেই রকম জায়গায় এনে দাঁড়করাতে হবে। সন্ধানী আলো যখন ছবির বাঁ-চোখের তারার উপর পড়বে, তখন সেখান থেকে যে আলো ঠিকরে

বেরোবে তাকে চালান করা হবে দর্শকের সামনে পর্দার উপরে। পর্দার সামনে যদি ডিস্কটা একদম না থাকে তাহলে সমস্ত পর্দাটি জুড়েই দেখা যাবে একটি বিরাট চোখের তারা। কিন্তু তাহ'লে তো চলবে না। তাই দরকার ফুটোটির। তার ভিতর দিয়ে শুধু চোখের তারার মত ছোট একটু অংশই দেখা যাবে। সেই জন্যই দেখা দরকার ফুটোটি কোথায় এসে তখন দাঁড়াল। কারণ সে যেখানে দাঁড়াবে, তার ভিতর দিয়ে পর্দার সেই জায়গাটিতেই শুধু চোখের তারা দেখা যাবে, অন্য কোথাও নয়। তাই তাকে দাঁড়াতে হবে সেইখানেই যেখানে, বাঁ-চোখের তারা থাকা উচিত। যেখানে চিবুক দেখা উচিত সেখানে যদি ফুটোটির খামখেয়ালীর দরুণ চোখের তারা দেখতে হয় তাহ'লে ছবি যা হবে তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। তাই আমাদের দেখতে হবে ফুটোটি চলবার সময় থেকে খামখেয়ালি না করতে পারে। বাঁ-চোখের পরে সন্ধানী আলো পড়ল আসল ছবির নাকের গোড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার ঠিকরে পড়া আলো চলে এলো পর্দার উপরে। সামনের ফুটোটিও সঙ্গে সঙ্গে একটু সরে এলো এমন জায়গায় যেখানে পর্দার উপরে নাকের গোড়া থাকা উচিত। তাই



চোখের ভিতরকার পর্দা
(বড়ো করে দেখানো)

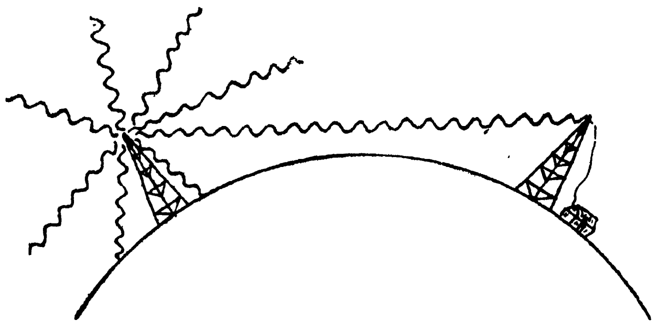
মানুষের চোখের মধ্যে বাহিরের জিনিষের কিরূপ ছবি পড়ে
তাহাই এখানে দেখানো হইয়াছে

পর্দার উপরে প্রথমে দেখছি বাঁ-চোখ, তারপরে নাকের গোড়া, তারপরে ডান চোখের খানিকটা, তারও পরে ডান চোখের তারা—এই রকম। তাহ'লে কথা হ'ল এই যে, আসল ছবিটাকে যেন খুব ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হয়েচে। তারপর সেই অংশগুলোকে একটার পর একটা করে তাড়াতাড়ি পর্দার উপরে এনে ফেলা হচ্ছে। ছবির এক নম্বর অংশ এসেই মিলিয়ে গেল, তার পাশেই এসে দাঁড়াল দু'নম্বর অংশ। সে মিলিয়ে যেতেই এলো তিন নম্বর। এই করে সমস্ত অংশগুলি শেষ হয়ে যেতেই ফের সুরু হ'ল এক নম্বর থেকে, যেমন আসল ছবির উপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সন্ধানী আলো, বারবার। সব অংশগুলি পর পর পর্দার উপর এসে পড়তে যদি এক সেকেণ্ডের বারো-তেরো ভাগের বেশী সময় না নেয় তাহলেই দর্শক আর বুঝতে পারবে না যে ছবিটাতে খণ্ড খণ্ড করে পর পর পর্দার উপর এনে ফেলা হচ্ছে। কারণ এই বেঁটে ছবির অংশগুলি এসে পড়লে এক নম্বর অংশের ছাপ চোখ থেকে মিলিয়ে যাবার আগেই আর সব অংশগুলিও পর-পর এসে-পড়া শেষ হয়ে গিয়ে প্রথম অংশটি আবার পর্দার বুকে ফুটে উঠবে।

কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। আসল ছবিটাকে স্থির আলোতে না দেখে ওই রকম সন্ধানী আলোতে দেখবার প্রয়োজন কী? আমরা আগেই বলেছি আমাদের চোখ অনেকটা ক্যামেরার মত। তার ভিতরে রয়েছে স্নায়ু দিয়ে তৈরী একটা পর্দা যার উপর ছবি এসে পড়ে। চোখের সামনে যদি কোনও মানুষ এসে দাঁড়ায় তার ছবি চোখের পর্দায় পড়বে—খুব ছোট্ট একটি ছবি। এই ছবি হবে দৃষ্টবস্তুর প্রতিকৃতি। তাই, মানুষটির চুল থেকে পর্দার উপরে যেখানটিতে আলো পড়বে সেইখানে ছবি পড়বে চুলের ও যেখানে আলো গিয়ে পড়চে হাত থেকে, সেখানে পাওয়া যাবে হাতের ছবি। এমনি চোখের পর্দায় ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের ছবি পড়ছে। না হ'লে তো সব একাকার হ'য়ে যেত। কিছুই আর আলাদা করা যেত না। যেখানে মুখের ছবি পড়বে তারই উপরে যদি বুকের ছবিও গিয়ে পড়ে তাহলে মুখ বা বুক এদের কাউকেই বোঝা যাবে না। আমরা জানি টেলিভিশনের বেলায় আসল ছবির বিভিন্ন অংশের (অর্থাৎ বিভিন্ন অংশ থেকে ঠিকরে পড়া আলো—একই কথা) চালান করা হচ্ছে দর্শকের পর্দার উপর। যদি আসল ছবিটার উপরে একটা স্থির আলো ফেলা হ'ত তাহ'লে সমস্ত অংশগুলি থেকেই একই সময় একই সাথে আলো ঠিকরে পড়ত। কপাল থেকে যখন আলো ঠিকরে পড়চে, অন্য যে কোন অংশ থেকেও তখন আলো ছিটকে আসচে। এই সব ভিন্ন ভিন্ন অংশ থেকে ঠিকরে-পড়া আলো যদি পর্দার উপরে ঠিক ঠিক জায়গায় এনে ফেলতে হয় তাহলে একজন বিশ্বাসী বাহক চাই। এই বাহকের কাজ হ'ল ছবির কপাল থেকে যে আলো আসচে তাকে নিয়ে আসতে হবে পর্দার উপরে যেখানে কপালের ছবি ফোটা উচিত। আবার চোখ থেকে আলো এসে পড়া চাই পর্দার উপরে যেখানে চোখ থাকবার কথা। তাই দেখতে হবে বিভিন্ন অংশ থেকে যে সব আলো আসচে তারা যেন আসবার পথে কেউ কারুর সাথে মিশে একাকার হয়ে না যায়। চোখের আলো কপালের আলোর সাথে মিশে গেলে চোখও নষ্ট হবে কপালও ভাঙবে। একজন বাহকের উপর এই দায়িত্বের কাজ দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। তাই বিভিন্ন অংশের আলো বয়ে নেবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাহক খোঁজা হ'ল। সন্ধানী আলোতে এই সুবিধা। এক মুহূর্ত্তে মাত্র একটি জায়গাতেই আলো পড়চে। আর সেই জায়গা থেকে ঠিকরে-আসা আলোকে একটি বাহকের মাথায় চাপিয়ে চালান করা হচ্ছে। সন্ধানী আলোটা একটু একটু চলে বেড়াচ্ছে ছবিটার উপর, আর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অংশ থেকে ঠিকরে-আসা আলো এক একটি কুলির মাথায় চেপে চলে আসচে পর্দার উপরে। যাতে অংশগুলি ঠিক ঠিক জায়গায় দেখা যায় পর্দার উপরে, সেজন্য রয়েছে দর্শকের সামনে ফুটো-ওয়ালা ডিস্ক। ছবির অংশগুলি পর-পর চালান হচ্চে ব'লে কারুর সাথে কারুর মিশে যাবার ভয় নেই। অথচ অংশগুলি এত তাড়াতাড়ি একটার পর আর একটা আসতে থাকে যে আমাদের চোখের সাধ্য নেই যে বুঝতে পারে—ছবিটা আসলে টুকরো-টুকরো ভাবে ভাগ হয়ে আসচে।

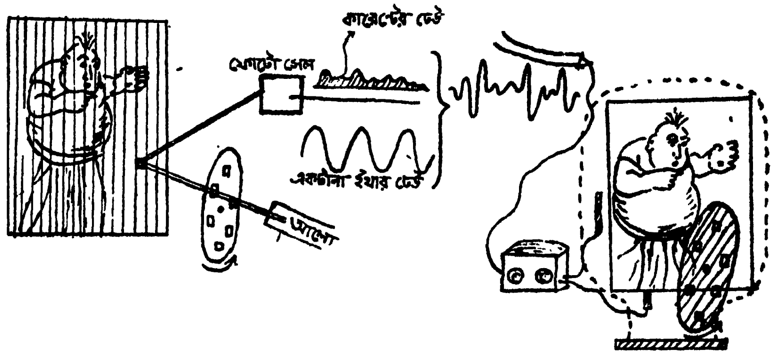
এখন কথা হ'ল এই বাহকেরা কারা? এরা হ'ল ইথার ঢেউ।

কিন্তু এখানে একটা কথা আছে। সন্ধানী আলোটাকে কে অত তাড়াতাড়ি ছবির উপর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বারবার ঘুরিয়ে আনবে? আর কেই বা দর্শকের সামনের ফুটোটিকে সন্ধানী আলোর সাহায্যে ঠিক ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে? ধীরে ও অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এ কাজ করার জন্তে একটু কৌশলের দরকার। কৌশলটি কিন্তু বেশ মজার। যেখানে ছবি পাঠানো হচ্ছে সেখানে চলন্ত টর্চ্চকে বাতিল করে দিয়ে একটা ফুটো-ওয়ালা ডিস্ক এবং একটা স্থির আলো দিয়েই এই কাজ চলতে পারে। ছবিটার উপর আলো পড়চে ফুটোর ভিতর দিয়ে, অন্য কোথাও দিয়ে নয়। তাই ফুটোটি যদি নড়তে থাকে তাহলে তার ভিতর দিয়ে যে আলো যাচ্ছে সেও নড়তে থাকবে। অতএব এতেই টর্চ্চবাতির মত কাজ হবে। এই কাজের জন্য নিতে হবে গোল একটা ডিস্ক, তার উপরে বৃত্তাকারে ত্রিশটা ফুটো। ফুটোগুলি চৌকো এবং সবগুলিই আকারে সমান। তবে এরা ক্রমেই কেন্দ্রের



টেলিভিশনের জন্য ব্যবহৃত ইথার ঢেউ দৈর্ঘ্যে অতি ছোট—তাই সে সরল রেখায় চলে। পৃথিবীর পিঠ-বাঁকা বলিয়া তাহাদের যাত্রাপথ কি রকম সীমাবদ্ধ হইয়া যায় তাহা এইখানে দেখানো হইয়াছে

দিকে সরে গেছে। প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টি একটু ভিতরের দিকে। দ্বিতীয়টি থেকে তৃতীয়টি আরও একটু কেন্দ্রের দিকে সরানো। এই ভিতরের দিকে সরে-যাওয়ার পরিমাণ হ'ল একটা ফুটো যতখানি চওড়া ততটুকুই। এক একটা ফুটো এমন পরিমাণ চওড়া হওয়া চাই, যাতে ত্রিশটা ফুটো পাশা-পাশি বসালে ছবির প্রস্থের মত হয়। আবার পরিবৃত্তের দিক (Circumferentially) দিয়ে দেখতে গেলে একটা ফুটো থেকে তার পরের ফুটোটার দূরত্ব সব সময়ই সমান। আর এইটুকুই ছবির লম্বা দিকের মাপ। এই ডিস্কের পিছনে রইল আলো, সামনে রইল ছবি। আলোটাকে আবার এমন ভাবে চাকা দিয়ে বসাতে হবে যাতে যে কোনও সময় একটি মাত্র ফুটো দিয়েই আলো গিয়ে পড়ে ছবির উপর।

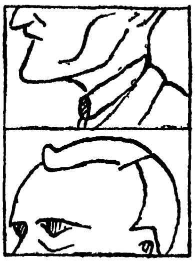


কি করিয়া ছবির উপর ডিস্কের ফুটা হইতে আলো পড়িয়া তাহা কারেন্টের ঢেউএ পরিণত হইতেছে এবং তাহাই আবার একটানা ইথার ঢেউয়ের মাথায় চাপিয়া দর্শকের কাছে যাইতেছে, তাহাই এখানে দেখানো হইয়েছে

ধরে নিই ডিস্কটা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ঘুরচে। আর প্রথম ফুটোটা অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে একেবারে বাইরের ফুটোটা রয়েছে একেবারে ডান দিকে। আলোটা এমন ভাবে বসানো হল যাতে ওর ভিতর দিয়ে আলো যেতে পারে। আলো গিয়ে পড়ল ছবির একেবারে ডানদিককার তলায়। ডিস্কটা এইবারে ঘুরতে সুরু করল। প্রথম নম্বর ফুটোটি একটু উপরে উঠে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতর দিয়ে আলোর ফালিটাও ছবির গা বেয়ে একটু উপরে উঠে গেল। এই রকম করে প্রথম নম্বর ফুটো দিয়ে আলো যখন ছবির ডান দিকের মাথায় গিয়ে উঠল তখন তার ভিতর দিয়ে আলো যাওয়াও বন্ধ হ'ল। এবারে আলো পড়তে সুরু করল দ্বিতীয় ফুটোটির ভিতর দিয়ে। প্রথম ফুটোটি যেখান থেকে যাত্রা সুরু করেছিল দ্বিতীয়টি এখন সেই লেভেলে এলো বটে, কিন্তু প্রথমটির চেয়ে একটু বাঁ দিকে সরে। কারণ দ্বিতীয় ফুটোটি তো একটু কেন্দ্রের দিকে সরানোই ছিল। এই জন্য এর ভিতর দিয়ে আলো এসে পড়ল ছবির তলায়, ডানদিকেই, তবে সেইটুকু জায়গা বাদ দিয়ে যতটুকুর উপর প্রথম ফুটো দিয়ে আলো পড়েছিল। বইএর উপর যেমন একটার পর একটা লাইনের উপর দিয়ে চলন্ত টর্চ্চের আলো ফেলা হচ্ছিল এখানেও তেমনি একটার পর একটা ফুটো দিয়ে আলো ছবিটার উপর দিয়ে আলোর লাইন টেনে যাচ্ছে। বইএর লাইনগুলি বাঁ দিক থেকে ডান দিকে আর এখানে নীচে থেকে উপরে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। ছবিটাকে যেন উপর-নীচে কতগুলি লাইন (অনুভূ) দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। সব ছেড়ে ডানদিকের লাইনের উপর আলো

পড়বে শুধু প্রথম ফুটো দিয়ে (কারণ সেই তো রয়েছে কেন্দ্রের সব থেকে দূরে—ডান দিকে) তার বাঁ পাশের লাইনে আলো পড়বে দু নম্বর ফুটো দিয়ে—এই রকম করে শেষ ফুটোটি দিয়ে আলো পড়বে একেবারে বাঁ দিকের লাইনে। ডিস্ক এদিকে ঘুরচেই; তাই ফের প্রথম ফুটো দিয়ে প্রথম লাইনে আলো পড়া সুরু হবে। কোন ফুটো ছবির কোন জায়গায় আলো ফেলবে তা একেবারে বাঁধা। একটু অন্যথা হবার জো নেই।

এদিকে দর্শকের সামনের ডিস্কটিকেও কায়দা মত চলতে হবে। আসল ছবিতে সন্ধানী আলো যখন যেখানে পড়বে, সেখানকার ডিস্কের ফুটোটিকে



তখন সেই রকম জায়গায় যেতে হবে। তাই সুবিধার জন্য সেখানেও একটি ফুটো-ওয়ালা ডিস্কের বদলে এখানকার মতই ত্রিশটি ফুটোওয়ালা ডিস্ক নিলে ভাল হয়। কোন হাঙ্গামাই আর থাকে না। দু জায়গায় ডিস্কই যদি একই গতিতে একই দিকে এবং এক তালে ঘুরতে থাকে তাহলেই আর কোনও অসুবিধা থাকবে না। যে রকম জায়গায় আলো রাখা হবে দর্শকের ডিস্কের সামনে চোখ রাখতে হবে সেই রকম জায়গায়। পাঠানোর যন্ত্রের কাছে আলো যখন এক নম্বর ফুটোর ভিতর দিয়ে ছবির উপর গিয়ে পড়বে এখানে দর্শকও এক নম্বর ফুটোর ভিতর দিয়েই শুধু দেখবে। ওখানে যেমন পনেরো নম্বর ফুটোর ভিতর দিয়ে ছবির মাঝখান ছাড়া অন্য কোথাও আলো পড়তে পারে না, এখানেও তেমনি পনেরো নম্বর ফুটোর ভিতর দিয়ে পর্দার মাঝখান ছাড়া আর কোন জায়গা দেখা যাবে না। তাই ছবির বিভিন্ন অংশ ঠিক মত ফুটোর ভিতর দিয়ে দেখা হচ্ছে বলে ঠিক মত জায়গাতেই দেখা যাবে। নাকের জায়গায় চোখ, চোখের জায়গায় নাক—এ সব হবার জো নেই।

আসলে ছবির উপর চলন্ত আলো ফেলবার বন্দোবস্ত হ'ল। দর্শকের সামনে সেখানকার ডিস্কের ফুটোটি ঠিক সময় মত আনবার ব্যবস্থাও হ'ল। এখন বাকী রইল একটি জিনিষ। সন্ধানী আলো যেমন ছবির বিভিন্ন অংশের উপর পড়তে থাকে তেমনি সেই সেই অংশ থেকে বিভিন্ন পরিমাণ আলো ঠিকরে আসে। তখন সেই ছিটকে-পড়া আলোকে এনে ফেলতে হবে পর্দার উপরে। আমরা, বলেছি, এই আলো আসে ইথার ঢেউএর মাথায় চেপে। কিন্তু তার মাথায় চাপানো হবে কী করে? এক রকম যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যার নাম হ'ল ফোটো-ইলেকট্রিক সেল। এর একটা বড়ো অদ্ভুত গুণ আছে। এর উপর আলো পড়লে ইলেকট্রিক কারেন্ট বইতে সুরু করে। বেশী আলো পড়লে বেশী কারেন্ট আর কম আলো পড়লে অল্প কারেন্ট। ছবির বিভিন্ন অংশ থেকে যেমন আলো ছিটকে পড়চে তেমন তারা এসে পড়ে সেলের উপর। ভিন্ন ভিন্ন অংশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ আলো এসে সেলের উপর পড়ার দরুণ কারেন্টও কম বেশী হতে থাকে ক্রমাগতই। সাদা কথায় বলা যেতে পারে, কারেন্টের ঢেউ উঠতে থাকে। আমরা দেখেছি মাইক্রোফোনের সামনে কথা বললে সেখানে কারেন্টের ঢেউ উঠতে থাকে। এখানেও তাই। তবে সেখানে শব্দ থেকে কারেন্টের ঢেউ, আর এখানে আলো থেকে।

সাধারণ টেলিফোন রিসিভারে শব্দ আনে ইথারের ঢেউ, আর তা থেকে কারেন্টে ঢেউ তুলে তাকে চালান করা হয় লাউডস্পীকারের ভিতরে। তাই কথা শুনতে পাই। এখানেও অবিকল ঐ রকম একটি রিসিভার বসিয়ে কারেন্টের ঢেউ বানাতে হবে। সেই কারেন্ট দিয়ে তখন পর্দাটাকে আলোকিত করতে হবে। প্রথমেই মনে হবে, এই কারেন্টে বিজলীবাতি জ্বালিয়ে তাই দিয়ে পর্দা আলো করলেই তো হ'তে পারে। হ'লে অবশ্য খুবই ভাল হ'ত। কিন্তু এর মস্ত একটা অসুবিধা হ'ল এই যে, খুব তাড়াতাড়ি কারেন্টের কম বেশী হ'লে বাতির জোর তার সঙ্গে তাল রেখে উঠতে পারে না। অর্থাৎ বাতির জোর অত তাড়াতাড়ি কম বেশী হ'তে পারে না। তাই নতুন রকমের বাতি খুঁজতে হবে। শেষটায় পাওয়া গেল "নিয়নল্যাম্প"। রাস্তায় আলোর অক্ষরে অনেক বিজ্ঞাপন আমরা দেখেছি। সে হ'ল এই নিয়নল্যাম্প দিয়ে। এটি দেখতে সাধারণ বিজলী বাতির মতই। তবে অনেক রকম আকারেরই আছে। এর ভিতরে থাকে নিয়ন গ্যাস, যার ভিতর দিয়ে কারেন্ট পাঠাতে হবে। এক প্রান্ত দিয়ে কারেন্ট ঢুকবে, আর বেরুবে আর এক প্রান্ত দিয়ে। যে প্রান্ত দিয়ে বেরুবে সেটা হ'ল একটা ধাতুর প্লেট। কারেন্ট যেতে সুরু করলে ওই প্লেটটি আলোকিত হয়ে ওঠে। কম কারেন্ট গেলে কম আলো হয়, আর বেশী কারেন্ট গেলে আলো হবে বেশী। এই প্লেটটিকেই আমাদের পর্দার মত ব্যবহার করতে হবে। এরই সামনে ঘুরতে থাকে সেই ফুটো-ওয়ালা ডিস্ক, আর তার সামনে বসে আমাদের দর্শক। এই হ'ল টেলিভিশনের মোটামুটি কথা।



আচার্য্য স্বামী-প্রণবানন্দ

স্বামী অদ্বৈতানন্দ

বঙ্গদেশ এ যুগে সত্য সত্যই রত্নপ্রসূ। বিগত শতাব্দীকাল ধরিয়া একে একে কতজন ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক আবির্ভূত হইলেন বাংলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। বাংলার সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে রামমোহন, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ, বিজয়কৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন, প্রভু জগদ্বন্ধু প্রভৃতি সাধকগণের আবির্ভাবের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দের ন্যায় অলোকসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এবং তাহারই অত্যল্পকাল মধ্যে আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দের ন্যায় একজন ধর্ম্ম ও কর্ম্মবীরের আবির্ভাব—বর্ত্তমান যুগে বাংলার সৌভাগ্য গর্ব্বের পরিচায়ক। যুগনিয়ন্তার এক মহান্ আশীর্ব্বাদ ও নির্দ্দেশ এবার বাংলার উপর। আচার্য্য প্রণবানন্দের ৫০শ তম জন্মতিথি উপলক্ষে সেই কথাটি আজ সর্ব্বাগ্রে আমাদের প্রাণে উদিত হইতেছে।

আচার্য্য প্রণবানন্দের জীবন, বাণী ও কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে এক অনুপম বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইত। সু-উচ্চ অধ্যাত্ম অনুভূতির সহিত দেশ ও সমাজ সেবার সুতীব্র অনুরাগের এক অপূর্ব্ব সমন্বয় তাঁহার ব্যক্তিত্বকে মহিমা-মণ্ডিত করিয়াছিল। তাঁহার দীর্ঘকেশ, গৈরিক বসন, দণ্ড কমণ্ডলু-যুক্ত বিরাট তেজঃপুঞ্জ কলেবরের মধ্যে বজ্রদৃঢ় মন, অদম্য কর্ম্মশক্তি, অসামান্য সংগঠন প্রতিভা ও বিশাল হৃদয়বত্তা লক্ষ্য করিলে মনে হইত যেন প্রাচীন ভারতের এক মহান্ ঋষি যুগোপযোগী এক বিশাল ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য এক অভিনবরূপ পরিগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান ভারতে আবির্ভূত হইয়াছেন। বস্তুতঃ সেই বৈদিক যুগের আদর্শ ও বর্ত্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য লইয়া এক নূতন পন্থায় তাঁহার প্রবর্ত্তিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে তিনি দেশ ও জাতির পুরোভাগে দাঁড় করাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বেদান্তের "ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা" রূপ মহাবাক্যের বিকৃত অর্থকারী বর্ত্তমানের লক্ষ লক্ষ সাধুসন্ত ও মোহান্তগণের ইহবিমুখ নৈষ্কর্ম্ম্যবাদের আদর্শ তাঁহার হৃদয়ে কোনও মুহূর্ত্তের জন্য স্থান পায় নাই। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই বিশ্বের সমস্ত কিছুই ব্রহ্মময়—এই মহাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বভূতের সর্ব্বপ্রকার সেবা করাকেই তিনি সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রকৃত আদর্শ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন।

এই পৌরুষ মূর্ত্তি, দৃঢ়চেতা কর্ম্মবীর সন্ন্যাসী "মুক্তি" বলিতে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক মোক্ষ বুঝিতেন না, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে সমষ্টিগত যে মহামুক্তি তাহাকেই তিনি সর্ব্বোচ্চ মোক্ষবাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। তিনি সদর্পে বলিতেন "যে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার সহিত সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধ সম্পর্ক নাই, যে ধর্ম্ম ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনকে সর্ব্ববিধ সমস্যার কবল হইতে মুক্তি দিতে পারে না তাহা ধর্ম্ম নামের অযোগ্য। ধর্ম্মের প্রয়োজনই হইতেছে সমাজ ও জাতির উত্থান, উন্নতি ও সর্ব্বতোমুখী কল্যাণবিধানের জন্য।"

বাল্যকাল হইতেই সুগভীর ধ্যানশীলতা ও সুকঠোর বিবেক বৈরাগ্যের অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য বালক ও যুবকগণের সহায়তায় তিনি বিবিধ সেবাব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন। সতের বৎসর বয়সে যোগীরাজ গম্ভীরনাথের নিকট হইতে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী ছয়টি বৎসর যাবৎ সম্পূর্ণরূপে জিতনিদ্র হইয়া যখন তিনি সুকঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হন তখনও দেশের ছাত্র ও যুবকসমাজের নৈতিক দুর্গতি তাঁহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিত এবং তিনি তাঁহার সেই অবস্থাতেও সুযোগ সুবিধা মত নানাবিধ আদেশ নির্দ্দেশ দিয়া তাহাদিগকে চরিত্রগঠনের সহায়তা করিতেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মাঘীপূর্ণিমার পুণ্য রজনীতে বাজিতপুর গ্রামের (ফরিদপুর) বহির্দ্দেশস্থ একটি বৃক্ষলতাসমাচ্ছন্ন জঙ্গলের মধ্যে তিনি পরিপূর্ণ যোগসিদ্ধিলাভ করেন; ঐ সময় তাঁহার কণ্ঠে যে আশা ও আশ্বাসের বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল তাহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ আদর্শ ও কর্ম্মপরিকল্পনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—"এ যুগ মহাজাগরণের যুগ, এ যুগ মহামিলন ও মহাসমন্বয়ের যুগ, এ যুগ মহামুক্তির যুগ। ভারত আবার জাগিবে, আবার উঠিবে, আবার স্বীয় স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের পুনরুদ্ধার করিয়া সে জগদগুরুর বরেণ্য আসন অধিকার করিবে।"

ভাগবত নির্দ্দেশলাভ করিয়া ব্রহ্মচারী বিনোদ (স্বামীজির পূর্ব্ব নাম) সম্পূর্ণ দ্বিধাবিমুক্ত চিত্তে নির্দ্দিষ্ট সেবাব্রতে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু এই কালে তিনি একা নিঃসম্বল ও কপর্দ্দকহীন ছিলেন। বিধাতার আশীর্ব্বাদ ও স্বীয় অদম্য আত্ম-বিশ্বাসমাত্র সহায় করিয়া তিনি গ্রামবাসীর নিকট খড় কুটা ভিক্ষা করিয়া তাঁহার সেই সাধনাস্থলে একটি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ মহাসঙ্ঘের ভিত্তি স্থাপনা করেন। নেতৃত্বে তাঁহার সহজাত সংস্কার ছিল। তাঁহার বিশাল বলিষ্ঠ দেহ ও তপস্যা স্ফুরিত গুরু-গম্ভীর অথচ স্নিগ্ধ-মধুর ভাবের নিকট আবাল বৃদ্ধবনিতা সহজেই শ্রদ্ধাবনত হইয়া পড়িত। এই অমোঘ ব্যক্তিত্ব প্রভাবে ব্রহ্মচারী সহজেই অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মাদারীপুর ঘূর্ণীবাত্যা ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে খুলনা জেলার ভীষণ দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য্যে তিনি যে কর্ম্মনৈপুণ্য প্রদর্শন করেন তাহাতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এবং বাংলার সমস্ত সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ তাঁহার গুণগ্রাহী হইয়া তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করিতে থাকেন। এই সময় দেশের বিপদে আপদে সর্ব্বত্র অস্থায়ী সেবাকার্য্যের আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন জেলায় স্বামীজি কয়েকটি স্থায়ী সেবাকেন্দ্র ও শিক্ষাশ্রম স্থাপন করেন।

ইহার পরে একটি আকস্মিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া তিনি আর একটি নূতন আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করেন। গয়াতীর্থে পাণ্ডাগণ অর্থলোভে

একটি মহিলা যাত্রীকে হত্যা করায় সেখানকার বাঙ্গালী অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তিনি তীর্থ যাত্রীগণের নিরাপত্তা বিধানের জন্ত সেখানে একটি স্থায়ী যাত্রী নিবাস স্থাপন করেন। অচিরে তাঁহার এই কার্য্য এতদূর সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠে যে তিনি অনুরূপ উদ্দেশ্য লইয়া কাশী, পুরী, প্রয়াগ প্রভৃতি ভারতের কতিপয় তীর্থে সেবাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া ব্যাপক প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। এই তীর্থসংস্কার কার্য্য তাঁহার এক মহান্ কীর্ত্তি।

শত-সমস্তা-বিড়ম্বিত দেশবাসীর সেবা করিতে করিতে স্বামীজি বুঝিলেন—কেবলমাত্র আর্ত্ত বিপন্নের সেবা শুশ্রূষার দ্বারা এই দুর্গত



আচার্য্য স্বামী-প্রণবানন্দ

দেশের পরিপূর্ণ কল্যাণসাধন অসম্ভব। যে দাসসুলভ পরাণুকরণমোহ, দুর্বিত চরিত্র গ্লানি ও আদর্শহীনতা জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে তাহার পুনরুদ্ধার করিতে না পারিলে কিছুতেই কিছু হইবার নহে। তাই জাতির দৈহিক ও নৈতিক স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিয়া তাহার দেহ মনে শক্তির বিদ্যুদ্বীর্য্যের সঞ্চার করিবার জন্ত তিনি দেশব্যাপী এক ব্রহ্মচর্য্য আন্দোলন সৃষ্টি করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। এই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, গুজরাট, আসাম ও উড়িষ্যায় সহস্র সহস্র ছাত্র ও যুবকগণের মধ্যে অপূর্ব্ব সাড়া আনয়ন করেন।

স্বামীজির অন্তিম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান তাঁহার প্রবর্ত্তিত জাতিসংগঠন আন্দোলন। এই আন্দোলনে তিনি সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়া দিবারাত্র এত অধিক পরিশ্রম করেন যে অত্যল্পকাল মধ্যে তাঁহার সেই বজ্রদৃঢ় শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বলেন—"জাতিগঠন আমার আবাল্য স্বপ্ন, আমি এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু করিয়াছি তাহার একমাত্র মূল লক্ষ্য জাতিসংগঠন। সহস্র বৎসরের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন এই হিন্দু সমাজকে আমি পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়া গঠন করিতে চাই। যে হিন্দু-সংস্কৃতির প্রচার প্রতিষ্ঠার উপর আজ বিশ্ব-জগতের শান্তি ও কল্যাণ নির্ভর করে সেই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এই হিন্দুজাতি আজ ভেদ বিবাদে উচ্ছন্নপ্রায়। আমি তাই সর্ব্বাগ্রে হিন্দু-সমাজের এই ভেদ-বিবাদ দূরীভূত করিয়া তাহাকে এক মহামিলনের গ্রন্থিতে সংগঠিত করিতে চাই এবং সেই সঙ্ঘবদ্ধ হিন্দুজাতির দ্বারা জগতের সর্ব্বত্র হিন্দু-সংস্কৃতির উদার মহাবাণী প্রচার করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার এই আন্দোলনের সহিত সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্পর্ক নাই। আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস, সবলে-দুর্ব্বলে কোলাকুলী কখনও সম্ভবপর নয়। সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিশালী মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সহিত সত্যিকার মিলন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্ত সর্ব্বাগ্রে চাই হিন্দুসংগঠন। হিন্দুর সমস্তা আজ দুইটি—একটি মিলনের, দ্বিতীয়টি আত্মরক্ষার। এই সমস্তা সমাধানের জন্ত আমার মিলন-মন্দির ও রক্ষীদলের কর্ম্মপদ্ধতি।"

বাংলার এক সঙ্কটকালে যখন সাম্প্রদায়িক অত্যাচার অনাচারে বাংলার হিন্দুসমাজ একান্ত বিপন্ন ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, যখন হিন্দুর স্বার্থ ও অধিকারের উপর পদে পদে আঘাত আক্রমণ আসিতেছিল তখন তাঁহার বীর্য্যসম্ভার, আত্মরক্ষার বাণী, সময়োপযোগী এই সংগঠন পরিকল্পনা ত্রস্ত সন্ত্রস্ত হিন্দু-নরনারীগণকে অশেষ আশা ও আশ্বাসদান করিয়াছিল। নানাপ্রকার বিপদ আপদ বরণ করিয়া তিনি বরাভয় হস্তে এই কালে বাংলার নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে পুনঃ পুনঃ সদলবলে পরিভ্রমণ করেন। সম্ভবতঃ এই আন্দোলনের মধ্য দিয়া হিন্দুজাতির দরদী মরমী ব্যথার ব্যথী স্বামী প্রণবানন্দ হিন্দু সমাজের হৃদয়ে আপনার আসন চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। দুর্গত হিন্দুসমাজ তাঁহার মহান্ অভয় আশ্বাস কদাপি ভুলিতে পারিবে না।

বীরত্বের চির উপাসক ছিলেন তিনি। বীরত্ব, পুরুষত্ব, বীর্য্য, বিক্রমকে তিনি এ যুগের ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতেন। দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতাই ছিল তাঁহার দৃষ্টিতে মহাপাপ। বক্তৃতা অপেক্ষা কর্ম্মের মর্য্যাদা তাঁহার নিকট উচ্চ ছিল। কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তর গ্রহণই ছিল তাঁহার মতে বিরাম, বিশ্রাম। সমাজে অনাদৃত অস্পৃশ্যরাই ছিল তাঁহার প্রাণের প্রাণ। উচ্চ নীচ সকলের ঘরেই তিনি সমভাবে আসন পাতিয়া বসিতেন। বাংলার শক্তিশালী নমঃশূদ্র সমাজ তাঁহার চির আদরের ছিল। কতিপয় বৎসরের চেষ্টায় তিনি এই সমাজের মধ্যে এক বিপুল সাড়া আনয়ন করিয়াছিলেন। হিন্দুর বিলুপ্তপ্রায় ক্ষাত্রশক্তির পুনরুদ্ধারের জন্ত তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এই জন্ত নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে তিনি ব্যায়ামশালা স্থাপন ও রক্ষীদল গঠনের উপর অত্যন্ত জোর দিতেন। দীর্ঘকালের নিঃশস্ত্র দেশবাসীর হস্তে পুনরায় অস্ত্র প্রদানের জন্ত তিনি গুরুগোবিন্দের ন্যায় ত্রিশূল ধারীগণের প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে ব্রতী হন। হিন্দুর পূজোৎসবকে সার্ব্বজনীন ও জাতীয় রূপ দিবার জন্ত তিনি তাঁহার সঙ্ঘ ও মিলনমন্দিরগুলির মধ্য দিয়া দেশের নানাস্থানে বিরাট বিরাট

যজ্ঞ ও উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। হিন্দুর দেবদেবীর কোমল ও মধুর ভাব অপেক্ষা অস্ত্রশস্ত্রধারী বীর্য্যভাবের পূজা প্রবর্ত্তনের তিনি একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। সুদীর্ঘ কাল পরে তিনি সর্ব্বপ্রথম আত্মবিস্মৃত হিন্দুজাতিকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন—অসুর-দানব-ধ্বংসকারী বিবিধ অস্ত্রায়ুধধারী দেবদেবীগণের পূজার্চ্চনা শুধু পুষ্প বিল্বদলে সুসম্পন্ন হয় না। বীর্য্যমূর্ত্তি দেবদেবীর প্রকৃত প্রসন্নতালাভ হয় শক্তি ও বীর্য্য-প্রদর্শন দ্বারা।

স্বহস্ত-নির্ম্মিত 'ভারত সেবাশ্রম' সঙ্ঘের শিরে তিনি নিজের অক্ষয় আশীর্ব্বাদ ও দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। অশরীরীরূপে অদ্যাপি তিনি চিরজাগ্রত। তাঁহার অমর আশ্বাস ও প্রেরণা আমাদিগকে তাঁহার আরব্ধ, অসমাপ্ত ব্রত উদ্‌যাপনে উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করুক—ইহাই তাঁহার রাতুল চরণে প্রার্থনা।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস এম-এস সি

সকলেই জানেন বর্ত্তমান-লিখিত বাংলাভাষার বয়স বেশী নহে। অথচ এই অত্যল্প কালমধ্যে রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র প্রমুখ মনীষীর অসাধারণ প্রতিভা প্রভাবে এই ভাষা যেরূপ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষা এত দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় না। বাংলাভাষা এখন বিশ্বের দরবারে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে—অথচ দুঃখের বিষয় এই যে আধুনিক বিজ্ঞানের বাহনরূপে এই ভাষার এখনও কোনও স্থান নির্ণীত হয় নাই। ইহার একটি প্রধান কারণ আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা আমাদের দেশে অনেক বিলম্বে আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহার ভিত্তি বিদেশীয় বলিয়া এই বিজ্ঞানের পঠন পাঠন সমস্তই বিদেশী ভাষার সাহায্যে সম্পন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। যদিও আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই পদ্ধতি সমীচীন নহে বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের আবিষ্কৃত গবেষণার বিচারক বিদেশী বিধায় তাঁহাদের মূল্যবান্ গবেষণাগুলি তাঁহারা বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করিয়া বিশ্বের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সম্মুখে পেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোনও ভাষায় মৌলিক গবেষণা প্রচুর পরিমাণে প্রকাশিত হইলে সেই ভাষার গৌরব যে অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পায় তাহা অনেকেই জানেন। আমরা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি তিনি যখন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন, প্রায় সেই সময় রুশিয় বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেলিফের যুগান্তকারী গবেষণা সম্বলিত পুস্তকাদি রুশ ভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বহু উৎসাহী রাসায়নিক ঐ তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইবার জন্য রুশ ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। গত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে জার্মান বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে—বিশেষতঃ রসায়নশাস্ত্রে যে অমূল্য গবেষণা করেন তাহার ফলে পৃথিবীর সকল সভ্য দেশের প্রকৃত জ্ঞানান্বেষী ঐ ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুবিখ্যাত ইংরাজ-মনীষী এইচ, জি, ওয়েলস তাঁহার সুপরিচিত 'পৃথিবীর ইতিহাস' গ্রন্থের একস্থলে লিখিয়াছেন—"By the latter half of the nineteenth century German Scientific worker had made German a necessary language for every Science-student, who wished to keep abreast with the latest work in his department."—অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জার্মান বৈজ্ঞানিকগণ জার্মান ভাষাকে এরূপ সমৃদ্ধ অবস্থায় উন্নীত করিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞানের যে সকল ছাত্র তাহাদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সদ্যপ্রকাশিত তথ্যের সহিত পরিচয় লাভে উৎসুক তাহাদের পক্ষে জার্মান ভাষা শিক্ষা করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না।"

আমাদের দেশেও যদি সত্যিকারের মৌলিক গবেষণা বহুল পরিমাণে হইতে আরম্ভ করে এবং তাহার অধিকাংশই যদি বাংলাভাষায় প্রকাশের ব্যবস্থা হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের মূল গীতাঞ্জলি পড়িবার জন্য যেমন বহু বৈদেশিক সাহিত্যরসিক বাংলাভাষা শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ বাঙালীর আবিষ্কৃত মূল্যবান্ তথ্যের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়লাভের নিমিত্ত পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বহু উৎসাহী বৈজ্ঞানিক আমাদের ভাষা শিক্ষা করিতে যত্নবান্ হইবেন। একথা সর্ববাদিসম্মত যে বর্ত্তমান সভ্য জগতে সাহিত্যের অপেক্ষা বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ অধিক। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বর্ত্তমান সভ্যতা প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির ব্যবস্থা একমাত্র বিজ্ঞানের সাহায্যেই হইয়া থাকে। এই কারণে কোনও বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কি প্রকারে তাহা কার্য্যকরী করা যায়—জনকল্যাণে বা মারণাস্ত্র নির্ম্মাণে!—সভ্য জগতের বিভিন্ন অংশে তাহার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া যায়। কোনও অখ্যাত ভাষাতেও যদি মূল্যবান্ মৌলিক গবেষণার সন্ধান কেহ পায় তবে তাহার খুঁটিনাটি জানিবার বৈজ্ঞানিক মহলে সাড়া পড়িয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমানে বিজ্ঞানে উচ্চস্তরের মৌলিক গবেষণা কোনও ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত না হইলে সে ভাষার দ্রুত গৌরব বৃদ্ধি বা প্রসার লাভ সম্ভবপর নহে। কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে উচ্চতর বিজ্ঞানের অনেক শাখায় উচ্চাঙ্গের গবেষণা আশানুরূপ হইতেছে না। সরকারের মুক্তহস্তে অর্থদান

ব্যতীত নিম্নলিখিত কারণে উহার গতি ব্যাহত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। অধিকাংশক্ষেত্রেই বয়স অনুসারে বড় অধ্যাপক নিয়োগ করা হয় বলিয়া প্রকৃত মেধাবী ও প্রতিভাবান্ গবেষকগণ নিরুৎসাহ হইয়া কর্মস্পৃহা হারাইয়া ফেলিতেছেন, অধ্যাপকগণ অধ্যাপনা এবং ছাত্রদের পরীক্ষা কার্য্যে অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করায় মৌলিক বিষয়ের চিন্তা করিবার সময় তাঁহারা কম পাইতেছেন, জার্মানি প্রভৃতি দেশের মত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে পি-এইচ, ডি কোর্স না থাকায় অধ্যাপকদের অধীনে অধিকসংখ্যক অভিজ্ঞ ছাত্র মৌলিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেছেন না, এদিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস-সি ডিগ্রী লাভ এত অধিক সময়সাপেক্ষ যে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী ছাত্রেরা এম-এস-সি পাশ করিবার পর আর্থিক সঙ্গতির অভাবে তাহার জন্ম চেষ্টা করিতে পারেন না। তারপর বিদেশ হইতে যাঁহারা সত্যসত্যই কিছু শিখিয়া আসেন বা স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় সাফল্য প্রদর্শন করেন তাঁহাদিগকে গবর্ণমেন্ট উচ্চ বেতনে গবেষণাহীন উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ করিয়া দেন। এই সব কারণে বাংলাদেশে উচ্চতম বিজ্ঞানমন্দির ২৫ বৎসরের অধিককাল স্থাপিত হইলেও দেশে উচ্চাঙ্গের মৌলিক গবেষণার পরিমাণ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ফলিত-বিজ্ঞান বিভাগের অবস্থা আরও শোচনীয়। এই সুদীর্ঘকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত বিজ্ঞান বিভাগ হইতে কয়টি বৈজ্ঞানিক সত্য কার্য্যকরী হইয়া জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত হইয়াছে তাহা দেশের লোকে খোঁজ লইয়া দেখিয়াছেন কি? সুতরাং মাঘের 'ভারতবর্ষে' শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ সরকার 'বাঙ্গালীর শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধের পরিশিষ্টে যাহা বলিয়াছেন এক্ষেত্রেও তাহাই প্রযোজ্য—"এই ধ্বংসলীলা শেষ হওয়ার পর নতুন করে গড়ার যুগ এসেছে, চারিদিকে পুনর্গঠনের পরিকল্পনা হচ্ছে। আমাদের শিক্ষাপ্রণালী আমূল পরিবর্ত্তন করে স্বাভাবিক করে গড়ে তোলার সময় কি এখনও হয় নি?"

উচ্চতর মৌলিক গবেষণার সহিত ভাষার উন্নতি কিরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল। এখন লোকশিক্ষাকল্পে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুগুলি বাংলাভাষায় লেখার আবশ্যকতা ও কি উপায়ে উহার সম্প্রসারণ সম্ভবপর তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে দেশরক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষি, জনস্বাস্থ্য, রোগমুক্তি, অশন, বসন, ভ্রমণ, প্রসাধন, আমোদ-প্রমোদ সকলই বিজ্ঞানের দানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বৈজ্ঞানিক তথ্য মোটামুটি জানিবার জন্ম সকলেরই কৌতূহল হইয়া থাকে। সাধারণ শিক্ষিত লোকের বোধগম্য ভাষায় ইংরাজীতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের অসংখ্য বই আছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত বাংলাভাষায় ঐরূপ পুস্তকের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। এরূপ পুস্তকপাঠে কেবল যে সাধারণ লোকেই উপকৃত হন তাহা নহে; পরন্তু কোনও বিষয়ের উচ্চতর জ্ঞানলাভেচ্ছুও মাতৃভাষার সাহায্যে প্রাথমিক জ্ঞান সংগ্রহ করিলে ঐ বিষয়ের উচ্চতর জ্ঞানলাভ তাহার পক্ষে সহজ হইয়া পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ, কলেজের কোনও ছাত্র তাঁহার এম-এস-সি ক্লাসে প্রোটিনের অধ্যায় আরম্ভ হইবার পূর্বে যদি তিনি খাদ্যসম্বন্ধীয় বাংলা কোনও ভাল বই হইতে বিষয়টি পড়িয়া লন, তাহা হইলে ক্লাসে ঐ অধ্যায়টি তিনি অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারিবেন। কারণ মাতৃভাষায় লিখিত কোনও বিষয় যত সহজে মনে গ্রথিত হইয়া যায় বিদেশী ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকিলেও উহা তত সহজে হয় না।

এক্ষণে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান অনুশীলনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিজ্ঞান রহস্য' বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রথম সোপান স্বরূপ মনে করা যাইতে পারে। অতঃপর আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও জগদানন্দ রায় মহাশয় তাঁহাদের গ্রন্থগুলিতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের বিষয়বস্তু প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিয়া ইংরাজী অনভিজ্ঞ এবং স্বল্প-ইংরাজীশিক্ষিত বাঙালী পাঠকের চিন্তানুশীলনের পথ অনেকটা প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশ-চন্দ্রের 'অব্যক্ত', আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'নব্য রসায়নীবিদ্যা' এবং রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার সম্ভাব্যতা ও সফলতার উজ্জ্বল নিদর্শন। অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার,' স্বর্গীয় চুনীলাল বসুর 'খাদ্য', শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসুর 'ভারতের খনিজ', রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাণতত্ত্ব' এবং লেখকের 'খাদ্যবিজ্ঞান' প্রভৃতি পুস্তকও উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ অগ্রদূত, কিন্তু কি কারণে জানি না তাঁহারা এ বিষয়ে আর অধিক দূর অগ্রসর হন নাই। কয়েক বৎসর হইল বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সহিত সর্বসাধারণের পরিচয় সাধন উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী ব্রতী হইয়াছেন। ইঁহাদের প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ও লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা বাঙালীর যথার্থ গৌরবের ও আদরের বস্তু। এই গ্রন্থমালা প্রকাশ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় যাহা বলিয়াছিলেন এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা হইল—"শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলা দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদনুসারে ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জ্জিত হবে এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না, সেও আমাদের চিন্তার বিষয়। দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই। এমন বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনোই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে না। বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান চর্চার। আমাদের গ্রন্থপ্রকাশ কার্যে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।"

বাংলা ভাষাকে প্রাথমিক বিজ্ঞানের বাহনরূপে প্রবর্ত্তিত করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে মহৎ প্রচেষ্টার সূত্রপাত করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই। প্রাতঃস্মরণীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও তদীয় সুযোগ্য পুত্র ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের আন্তরিক প্রেরণাই এই প্রচেষ্টার প্রধান উৎসস্বরূপ। কিন্তু যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রারম্ভে পরিলক্ষিত হইয়াছিল এখন যেন তাহার প্রবাহ অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হইয়াছে।

নতুবা এতদিন উচ্চতর বিজ্ঞানের পঠনপাঠনও ক্রমশঃ বাংলা ভাষায় আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল। সম্ভবতঃ পরিভাষার জটিলতা ও বাংলা ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন বৈজ্ঞানিকের অভাব বশতই এই মহৎ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। ইতিমধ্যে ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণীর জন্য বাংলা ভাষায় প্রাথমিক বিজ্ঞানের যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলিও সর্বাংশে প্রশস্ত হয় নাই। অনেক প্রতিপত্তিশালী স্বল্প-অবসর অধ্যাপক তাড়াতাড়ি বিদেশী কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ জাতীয় পুস্তক হুবহু অনুবাদ করায় পুস্তকগুলি জড়তা ও জটিলতাদুষ্ট হইয়াছে। ইঁহারা যদি বিশেষ চিন্তা করিয়া ধীরে সুস্থে আমাদের দেশের ছেলেদের পরিবেশের প্রতি মনোযোগ দিয়া লিখিতেন তাহা হইলে পুস্তকগুলি অধিকতর সুপাঠ্য ও কল্যাণদায়ক হইত। তদ্ভিন্ন কোনও নির্দিষ্ট পুস্তকের জন্য যদি অধিকসংখ্যক বাংলা ভাষায় ব্যুৎপন্ন বৈজ্ঞানিককে আহ্বান করা হইত, তাঁহাদের সংকলিত পাণ্ডুলিপি নির্বাচন করিবার ভার কয়েকজন নিরপেক্ষ শিক্ষাব্রতীর উপর ন্যস্ত করা হইত এবং অনুমোদিত পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয় নিজব্যয়ে প্রকাশের ব্যবস্থা করিতেন তাহা হইলে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাধু প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় অনেক উপযুক্ত লোকও অর্থ এবং প্রতিপত্তির অভাববশতঃ বিজ্ঞানের কোনও বিশেষ বিভাগে তাঁহাদের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও বাংলা ভাষার উপর অসামান্য অধিকার থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের প্রতিভা দেশের কল্যাণে নিয়োজিত করিতে পারিতেছেন না—ফলে দুর্বোধ্য বাংলায় লিখিত বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক পাঠে ছেলেদের সময় ও শক্তির শোচনীয় অপচয় হইতেছে।

পক্ষান্তরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানের পরিভাষা সম্বন্ধেও পুনরালোচনা এবং পুনর্বিচার করিবার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করিতেছেন। যদিও শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু মহোদয়ের পরিকল্পনায় এবং তাঁহার ও অপর কতিপয় বিশেষজ্ঞের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ফলে এই পরিভাষার সৃষ্টি, তথাপি ইহার সংকলন ব্যাপারে আর একটু উদার মতাবলম্বন বাঞ্ছনীয় ছিল। যে সময় ব্ল্যাক আউট, রেশনকার্ড, ট্রেঞ্চ, কনট্রোল, সাইরেন, ইঞ্জিনিয়র, সিনেমা, রেডিও হইতে আরম্ভ করিয়া 'অ্যাটম বম' পর্য্যন্ত অবাধে আমাদের ভাষায় স্থান করিয়া লইতেছে এবং অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান সাহিত্যিকের ভাবাবেগে বাংলা দেশ আরব পারস্যের পানে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, তখন বহু যুগ বিলুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবের কঙ্কালের মত শব্দসমূহ সংগ্রহের নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষার গহন খনির পঙ্কিল তলদেশ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান না করিলেই বোধ করি ভাল হইত। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রে ভারতবর্ষের দান অতি উচ্চস্তরের এবং যাহাদের উচ্চাঙ্গের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে বিদ্যমান ছিল, সেই সব শাস্ত্রের সংস্কৃতমূলক পরিভাষা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না; কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের যে সকল বিভাগে আমাদের দানের বিন্দু বিসর্গও প্রায় নাই, তাহাদের পরিভাষার জন্য দেবভাষার দ্বারস্থ না হইয়া আন্তর্জাতিক শব্দ হুবহু গ্রহণ করাই সমীচীন মনে হয়। ইহাতে উচ্চতর বিজ্ঞানশিক্ষার্থীদের সুবিধার সঙ্গে দেশে মৌলিক গবেষণার পথও সুগম হয়। একই কথা বার বার কণ্ঠস্থ করায় জাতীয় শক্তির বিরাট অপচয় হয় মাত্র। পরন্তু যে সব ছাত্র বেশী দূর অগ্রসর হইবে না আন্তর্জাতিক শব্দ শিখিলে তাহারা বরং লাভবানই হইবে। আমাদের ম্যাট্রিকুলেট-দিগকে আর খোকা বলিয়া ভাবিলে চলিবে না। মানুষের গতিবেগ হাজার গুণ বাড়িয়া যাওয়ায় পৃথিবী স্বল্পপরিসর হইয়া পড়িতেছে; ফলে, বিভিন্ন জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সংঘর্ষ ও সংস্পর্শ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের কর্মক্ষেত্রের সুদূর প্রসারের সম্ভাবনাও যথেষ্ট। সুতরাং ভাষার শালীনতা রক্ষার জন্য আমাদের ম্যাট্রি-কুলেটদিগকে চলতি আন্তর্জাতিক শব্দসমূহ হইতে বঞ্চিত করিয়া কতকগুলি অপ্রচলিত কথা শিখান লাভজনক মনে হয় না। সাহিত্যের শালীনতা ও আভিজাত্যরক্ষা সর্বথা প্রশস্ত হইলেও বিজ্ঞান শিক্ষার বেলায় ইহার ব্যতিক্রম জাতির প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যের পরিচায়ক-রূপেই গণ্য হইবে। আমাদের ল্যাবরেটরিতে নিরক্ষর বাঙালী ছেলেরাও ইথর, অ্যালকহল, ব্লিচিং পাউডার, ভ্যাকুয়ম ডিসটিলেশন, বুনসেন বার্নার, টেষ্টটিউব প্রভৃতি স্পষ্টভাবেই বলে এবং অল্প দিনেই চিনিয়া লয়। পক্ষান্তরে, জাপানের উচ্চাঙ্গের গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও পত্রিকাদি যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, অনেক ক্ষেত্রেই জাপানী বৈজ্ঞানিকগণ বস্তু ও বিষয়ের নাম রোমান অক্ষরে আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার সাধারণতঃ জার্মান ভাষায় প্রবন্ধের শেষে সন্নিবেশ করিয়া দেন। ইহাতে নিজেদের ভাষা ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হইতে থাকে এবং এইরূপ গবেষণা বাস্তবিক মূল্যবান্ মনে হইলে বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকগণ ক্রমশঃ ঐ ভাষা শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। আশা করি, জাতির প্রকৃত উন্নতিকামী সুধীজন মাত্রই আমাদের পক্ষেও এই পদ্ধতি অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবেন।

শ্রীনীলাম্বর চট্টোপাধ্যায়

জানি জানি আঘাত দিয়ে হবে তোমার জয়
মিলনে যা' দিয়ে গেলে বেদনা তা' নয়।
তোমার অভিসারে এসে পেলেম অপমান
তোমার লাগি' যে-সুর সাধি' পেলো না সম্মান।

তোমার লাগি' পেরিয়ে এলেম বহু ঝড়ের রাতি,
দুর্য্যোগের এই অন্ধকারে কোথায় তুমি সাথী!
মিনতি মোর একটি শুধু—হে ছলনাময়,
কলঙ্কে শেষ না হয় যেন সকল পরিচয়।

ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

মনুষ্যগোষ্ঠি—কৃষ্ণ এবং পীত ও পীতাভকায়

কোন একটি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদিগের বা নির্দ্দিষ্ট গোষ্ঠিভুক্ত মনুষ্যসমাজের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ এবং নিকট বা দূরবর্ত্তী অঞ্চলের বা ভিন্ন গোষ্ঠিভুক্ত জাতির সহিত তাহাদের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে হইলে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিতগণ কিরূপ পদ্ধতিতে কাজ করেন প্রথম প্রবন্ধে (ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩৫২) অতি সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ঐ আলোচনা প্রসঙ্গে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে বিভিন্ন জাতিতে (Races) ভাগ করা হইয়াছে এবং নৃতত্ত্ববিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে নির্দ্ধারিত দৈহিক লক্ষণসমূহের ভিত্তিতে এইরূপ ভাগ করা হইয়াছে। এখন দেখা যাইতে পারে দৈহিক লক্ষণের ভিত্তিতে পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে কি ভাবে ভাগ করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী আলোচনা যাহাতে স্বচ্ছন্দে অগ্রসর হইতে পারে সেজন্য এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা দরকার।

যে সকল দৈহিক লক্ষণের ভিত্তিতে পৃথিবীর মনুষ্যগোষ্ঠীকে বিভিন্ন জাতিতে ভাগ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে মস্তকের গঠন, নাসিকার গঠন, চক্ষুর গঠন ও বর্ণ, কেশের বর্ণ ও প্রকৃতি, মুখমণ্ডলের গঠন, গাত্রবর্ণ ও দেহের দৈর্ঘ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল লক্ষণের মধ্যে গাত্রবর্ণ, মস্তকের গঠন ও কেশের প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত প্রধান। সুতরাং প্রথমে এই লক্ষণগুলির কথা বলা হইবে।

গাত্রবর্ণ অনুসারে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন যথা ; শ্বেত (Leucodermic), পীত (Xanthodermic) ও কৃষ্ণবর্ণ (Melanodermic) ; বলা বাহুল্য এই তিন শ্রেণী ছাড়া মিশ্রবর্ণের মনুষ্যের সংখ্যা কম নহে। মিশ্রবর্ণের উৎপত্তির কারণ ভিন্ন বর্ণের দুইটি বা ততোধিক গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হইতে পারে, আবহাওয়া প্রভৃতির দরুণ মূল বর্ণের ক্রমিক পরিবর্ত্তনও হইতে পারে। মানুষের গাত্রবর্ণ প্রথমাবধি সাদা, কাল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ছিল অথবা উহা প্রথমে এক রকমের ছিল এবং আবহাওয়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থান, দেহের অভ্যন্তরীণ কোষসমূহের পরিবর্ত্তনের ফলে বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে—ইহা লইয়া অনেক আলোচনা চলিয়াছে ও চলিতেছে এবং অনেক প্রকার মতবাদের প্রচার হইয়াছে। সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে শরীরবিজ্ঞানের কোন অভূতপূর্ব্ব উন্নতির ফলে এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাইবে। এখানে এ সম্বন্ধে কল্পনা জল্পনার বিস্তারিত উল্লেখ অবান্তর। আবহাওয়া, পারিপার্শ্বিক ইত্যাদির প্রভাবে চর্ম্মের রংয়ের পরিবর্ত্তন হয় ইহা মানিয়া লইলে সংমিশ্রণ ছাড়াও যে মানুষের গাত্রবর্ণের পরিবর্ত্তন হইতে পারে ইহা স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে দাঁড়ায় যে বিভিন্ন মনুষ্যগোষ্ঠির বর্ত্তমানে যে প্রকার গাত্রবর্ণ দেখা যায় পূর্ব্বে তাহাদের যে সেই প্রকার গাত্রবর্ণই ছিল তাহা সন্দেহের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে গাত্রবর্ণ অনুসারে মানুষকে বিভিন্ন জাতিতে (races) ভাগ করিবার ব্যাপারে কোনরূপ সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় কিনা এই প্রশ্ন উঠে। সে যাহা হউক, আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে গাত্রবর্ণ অনুসারে মনুষ্যগোষ্ঠির যে জাতি বিভাগ করা হয় তাহার অর্থ এই নয় যে একপ্রকারের গাত্রবর্ণের পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের সকল অধিবাসী এক জাতি, গোষ্ঠি বা শ্রেণীভুক্ত। নৃতত্ত্ববিজ্ঞান মতে দৈহিক লক্ষণ অনুসারে যে জাতি বিভাগ করা হয় তাহার একমাত্র অর্থ যাহা চোখে দেখিতে পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহার বর্ণনা করা।

ভারতবর্ষের কথা পরে বলা হইবে। ভারতবর্ষ বাদে কৃষ্ণবর্ণের মনুষ্যগোষ্ঠি দেখিতে পাওয়া যায় প্রধানতঃ ভারতবর্ষের দক্ষিণে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। পূর্ব্বদিকে আরও অগ্রসর হইলে পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বা দ্বীপময় ভারতে, মালয় উপদ্বীপে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে, মাইক্রোনেশিয়ায়, নিউগিনিতে, মেলানেশিয়া নামে পরিচিত পশ্চিম-প্রশান্ত-মহাসাগরীয় দ্বীপগুলিতে এবং অষ্ট্রেলিয়ায়। নিউজিলণ্ড ও তাসমেনিয়ার আদিম অধিবাসী এই গোষ্ঠিভুক্ত। ভারতবর্ষের পশ্চিমে নীলনদের উপত্যকার উত্তর অঞ্চল, সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে মধ্য আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিস্তৃত অঞ্চল কৃষ্ণবর্ণের মনুষ্যগোষ্ঠির বাসভূমি। মোটামুটি দেখা যায় যে একদিকে নিউগিনি অষ্ট্রেলিয়া এবং মেলানেশিয়া ও অন্যদিকে আফ্রিকা এই দুইটি অঞ্চলের অভ্যন্তর ভাগে কৃষ্ণবর্ণের মনুষ্যগোষ্ঠির বাসভূমি অবস্থিত। অবশ্য অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষ্ণবর্ণ আদিম অধিবাসী দ্রুত ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণের জাতিগুলির মধ্যে পড়ে নিগ্রো, নিলোট, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার বাণ্টু গোষ্ঠীগুলি ও উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকার হ্যামাইট বা হাবসী গোষ্ঠিসমূহ। দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপসমূহে, দক্ষিণ-পূর্ব্বে মধ্য ও দক্ষিণ মালয়ে, পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সুমাত্রায় ও আরও পূর্ব্বে নিউগিনি, অষ্ট্রেলিয়া ও পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের কতকগুলি দ্বীপ পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণের মনুষ্যগোষ্ঠির অধ্যুষিত অঞ্চল অবস্থিত। পূর্ব্ব দিকে এই অঞ্চল মেলানেশিয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে। ভারতবর্ষের পশ্চিমে এই অঞ্চল আফ্রিকার গিনি উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রশ্ন উঠে বহুদূরব্যাপী ও বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত এই দ্বীপগুলিতে উহারা কোথা হইতে আসিয়াছিল? এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে কোন না কোন প্রধান ভূভাগ হইতে সরিয়া আসিয়া ইহারা এই সকল অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেখা যায় পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া, নিউগিনি ও মেলানেশিয়া লইয়া কৃষ্ণবর্ণের

মনুষ্যগোষ্ঠির অধ্যুষিত একটি অঞ্চল ও পশ্চিমে আফ্রিকা আরেকটি প্রধান অঞ্চল। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে হয়ত এই দুইটি প্রধান ভূভাগই উঁহাদের আদিম বাসভূমি ছিল। এই অনুমানের অন্ত কোন ভিত্তি আছে কিনা পরে দেখা যাইবে।

গাত্রবর্ণ অনুসারে যাহাদিগকে মোটামুটি একশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে, কেশের প্রকৃতি ও মস্তকের গঠন অনুসারে তাহাদিগকে পুনরায় বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। মানুষের মস্তকে কেশের প্রকৃতি অনুসারে উহাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে যথা, ulotrichy বা পশমের মত ও ঘন গুটি পাকান (wooly hair ও pepper corn hair) কেশ; leitotrichy বা সরল কেশ (straight hair) এবং cymotrichy বা মসৃণ, কুঞ্চিত বা ঢেউতোলা চুল (wavy or curly hair)। মস্তকের গঠন অনুসারে মনুষ্যগোষ্ঠিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে যথা, dolichocephalic বা লম্বা মুণ্ড, brachy cephalic বা গোলমুণ্ড ও mesocephalic বা মধ্যমাকৃতি মুণ্ড। পশমের মত চুল সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় খর্ব্বকায় গোল বা কতকটা মধ্যমাকৃতির মুণ্ড বিশিষ্ট আন্দামান, মালয় ও পূর্ব্ব সুমাত্রার কতকগুলি জাতির ভিতরে ও নিউগিনির তাপিরো (Tapiro) দিগের মধ্যে। ইহাদিগকে নেগ্রিটো (Negrito) বলা হয়। আফ্রিকার নিরক্ষ অঞ্চলের অরণ্যে নেগ্রিলো (Negrillo), কালাহারি মরুভূমির বুশম্যান ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার হোটেনটটদিগের মধ্যে পশমের মত চুল দেখা যায়। ইহাদের মস্তক মধ্যমাকৃতির, কিন্তু গায়ের রং পীতাভ। স্বর্ণ উপকুলের নিরক্ষ অঞ্চলের নিগ্রোদিগের মধ্যে (Nigritan, পশ্চিম সুদান) এবং পূর্ব্ব সুদান ও উত্তর নীলনদের উপত্যকার নিলোট (Nilote) এবং বাণ্টুভাষাভাষী নিগ্রোয়েডগণের চুল ঐরূপ কিন্তু তাহাদের মধ্যে খর্ব্বকায় ও দীর্ঘকায় লোক আছে। তাহাদের রং কাল, কিন্তু মস্তক লম্বা। পূর্ব্ব আফ্রিকার হামাইট গোষ্ঠীর বর্ণ সাধারণতঃ কাল বা শ্যাম, কিন্তু তাহাদের চুল তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ কুঞ্চিত বা ঢেউ তোলা। এই পর্য্যায়ের কেশ সমগ্র ককেশীয় গোষ্ঠীভুক্ত জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

দেখা যাইতেছে যে কেশের প্রকৃতি বিচার করিয়া যাহাদিগকে এক গোষ্ঠিভুক্ত করা যায় মস্তকের গঠন বিচার করিলে তাহাদিগকে ভিন্ন গোষ্ঠিতে ফেলিতে হয়। গাত্রবর্ণ ও দেহের দৈর্ঘ্য অনুসারে বিচার করিলে এইরূপ পৃথক গোষ্ঠির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী সর্ব্বাধিক সংখ্যক সমান লক্ষণ যুক্ত গোষ্ঠিগুলিকে একদলে বা শ্রেণীতে ফেলিতে পারেন, ইহার অধিক কিছু তিনি বলিতে পারেন না।

পীতকায় (Xanthodermic) ও সরল কেশ (leitotrichous) মনুষ্য গোষ্ঠীর অধ্যুষিত অঞ্চল বহু বিস্তৃত। এই পীতকায় সরল কেশ মনুষ্য গোষ্ঠিভুক্ত বিভিন্ন দলের মধ্যে রংয়ের তারতম্য আছে। বিভিন্ন অঞ্চলে পীতবর্ণের সঙ্গে সাদা, শ্যাম, জলপাইয়ের রং (olive), দারুচিনির রং (cinnamon) মিশিয়াছে। এশিয়ার একটি অতি বৃহৎ মনুষ্য গোষ্ঠীর মধ্যে পীত গাত্রবর্ণ ও সরল কেশের সঙ্গে আরও কতকগুলি দৈহিক লক্ষণ এক সঙ্গে দেখা যায়। এই গোষ্ঠিভুক্ত জাতিগুলির যাহাদের মধ্যে এই লক্ষণগুলি পাওয়া যায় তাহাদিগকে সাধারণভাবে মোঙ্গলীয় বলা হয় এবং এই সকল লক্ষণকে মোঙ্গলীয় লক্ষণ (Mongolian characters) বলা হয়। এই সকল লক্ষণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কেশ, মুখমণ্ডলের গঠন, চোখের গঠন ও নাসিকার গঠন। ইহাদের চুল কাল ও সরল, মুখে ও গায়ে চুল কম। গণ্ডাস্থি উচ্চ, মুখের গঠন চ্যাপ্টা (euryprosopic), নাকের গোড়া নীচু (platyopic), মধ্যভাগ মোটা (platyrrhine or mesorrhine) ও নাকের পাটা চওড়া (broad nostrils), চোখ টেঁরচা (oblique) এবং চোখের উপরের পাতায় একটি চামড়ার ভাঁজ থাকে (epicanthic-fold) এবং এই ভাঁজ সময়ে সময়ে এমনভাবে ঝুলিয়া পড়ে যে চোখের লোম ঢাকা পড়ে (mongolian eyelid)। প্রকৃত মোঙ্গল গোষ্ঠির মস্তক গোল, কিন্তু অনেক গোষ্ঠি আছে যাহাদের অন্যান্য মোঙ্গলীয় লক্ষণ থাকিলেও মস্তকের গঠন ভিন্ন প্রকারের। যাহা হউক, মোটামুটি যাহাদের গাত্রবর্ণ পীত বা পীতের সহিত অন্য বর্ণের মিশ্রণ আছে এবং উপরের বর্ণিত দৈহিক লক্ষণগুলির কোন কোনটি আছে তাহাদিগকে সমগোষ্ঠিভুক্ত মানিয়া লইয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে এশিয়ার অধিকাংশভাগে এই গোষ্ঠির বিভিন্ন শাখা বাস করিতেছে। কতকগুলি শাখা বহুপূর্ব্বে ইউরোপের অভ্যন্তরে নানা অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং কোন কোন শাখা আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে অগ্রসর হইয়াছে।

ভারতবর্ষের পূর্ব্ব ও উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলগুলিতে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলের কোন কোন স্থানে উপরে বর্ণিত গোষ্ঠির সমগোষ্ঠিভুক্ত যে সকল জাতি বাস করে তাহাদের কথা পরে বলা হইবে। ভারতবর্ষের বাহিরে উহাদের সমগোষ্ঠিভুক্ত জাতি দেখিতে পাওয়া যায়; উত্তরে তিব্বতে এবং উত্তর-পূর্ব্বে চীনে (চীনা, লোলো, লিহু, ও কোয়াংসী প্রদেশের অধিবাসী), এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব ব্রহ্ম অঞ্চলের শ্যাম, ইন্দোচীন, উত্তর মালয় ও পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদিগকে মোটামুটি সমগোষ্ঠিভুক্ত বলা যায়। এশিয়া ভূভাগের কোরিয়া ও জাপ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী (আইনুবাদে) এই গোষ্ঠিভুক্ত। মাঞ্চুরিয়ার অধিবাসী ও ট্রান্স-বৈকালিয়ার টুঙ্গুজগণ মোঙ্গল গোষ্ঠির। টিয়েনশান পর্ব্বতমালার উত্তরে জুঙ্গেরিয়া ও মোঙ্গলীয়ার কালমুখ, তারাঞ্চি, তোরগোদ, তেলেঙ্গেত মোঙ্গলগোষ্ঠির। তাকলামাকান ও লপ মরুভূমির হামি, তুরফান, অক্সু ইত্যাদি ও তারিম অববাহিকার কাশগর, খোটান, ইয়ারখণ্ড ইত্যাদির অধিবাসীদিগের মধ্যে মোঙ্গলীয় লক্ষণ দেখা যায়। আফগানিস্থানের হাজারা জাতিও মোঙ্গলীয় লক্ষণাক্রান্ত।

মোঙ্গল বা মোঙ্গলীয় বলিতে মাঞ্চু, টুঙ্গুজ, বুরিয়াত (বৈকালহ্রদে দক্ষিণাংশের পূর্ব্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসী) এবং জুঙ্গেরিয়া মোঙ্গলিয়ার কালমুখ, তারাঞ্চি, তোরগোদ ইত্যাদি বুঝিতে হইবে কোরিয়ার অধিবাসী মাঞ্চু গোষ্ঠিভুক্ত। এইরূপ বলা হয় যে সংযুক্ত মোঙ্গল শাখা হইতে মোঙ্গলীয়ান কথাটি আসিয়াছে।

আসলে টুঙ্গুজ। তাতার কথাটি সাধারণভাবে বিভিন্ন তুর্কী গোষ্ঠির সম্বন্ধে ব্যবহার করা হয়।

সাইবেরিয়ার লেনা নদীর অববাহিকার ইয়াকুট ও তাতার নামে পরিচিত গোষ্ঠিগুলি, পশ্চিম তুর্কীস্থানের খিরগিজ, কাজাক ও উজবেগ, কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলের তুর্কম্যান এবং এশিয়া মাইনর ও ইউরোপীয় তুর্কীর ওসমানালী তুর্কগণ বৃহৎ তুর্কী গোষ্ঠিভুক্ত। প্রাচীন উগুজ (Oghuz or Ukghuz) ও উইগুর (Uignr) তুর্কী গোষ্ঠির। তুর্কী গোষ্ঠিতে কিছু পরিমাণ মোঙ্গলীয় লক্ষণ দেখা যায়। এই গোষ্ঠিকে Asona Hun দিগের একটি শাখা বলিয়া বর্ণনা করা হয়। হাঙ্গেরীর Magyar ও বুলগার জাতি এই গোষ্ঠিভুক্ত।

এই গোষ্ঠির একটি সংখ্যাকে প্যালীয়ার্টিকাস (Palæartious) বা উগ্রিয়ান নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহারা অতি প্রাচীনকালে সাইবেরিয়ার পথে ইউরোপের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, কেহ কেহ সাইবেরিয়ার পূর্ব্ব সীমান্তে উপস্থিত হয়। পূর্ব্ব, মধ্য ও পশ্চিম সাইবেরিয়ার বিভিন্ন জাতি, স্তামোয়েদ ও ল্যাপ জাতি, আমুর নদ অঞ্চলের গিলিয়াক ও উত্তর শাখালিনের অধিবাসী এই গোষ্ঠিভুক্ত। এই গোষ্ঠিভুক্ত পারমিয়াক (Permiyak) মর্ডভিন (Mordvin) প্রভৃতি শাখা রুশিয়ার অভ্যন্তরে ও ল্যাপগণ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। বল্টিক ফিন,এস্ত লিত্তোনিয়ান প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয়ান জাতি সমূহ এই গোষ্ঠি হইতে উদ্ভূত।

টুঙ্গুজ, মাঞ্চু, কালমুখ প্রভৃতি মোঙ্গল গোষ্ঠির বিভিন্ন শাখার কথা বলা হইয়াছে। এই গোষ্ঠির একটি দলকে দক্ষিণ মোঙ্গলীয় নাম দিয়া অন্যান্য শাখা হইতে পৃথক করিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহাদের বর্ণ পীত হইতে জলপাই ও তামাটে রংয়ের মধ্যে। তিব্বত, দক্ষিণ চীন, ইন্দোচীন, জাপানের অধিবাসীদিগকে এই দক্ষিণ মোঙ্গলীয় দলভুক্ত বলা হয়। এই দলভুক্ত যে শাখার লোক পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হয় তাহাদিগকে প্রোটো মালয় (Proto Malay) নাম দেওয়া হইয়াছে। কেহ কেহ Oceanic Mongols এই নাম দিয়াছেন।

হাওয়াই হইতে নিউজিলাণ্ড ও সামোয়া হইতে ইষ্টার দ্বীপ পর্য্যন্ত অঞ্চলকে পলিনেশিয়া বলা হয়। পলিনেশিয়ার অধিবাসীদিগের মধ্যে নানা জাতির সংমিশ্রণ হইয়াছে। মোটামুটি তাহাদিগকে প্রোটো মালয়-বংশীয় মনে করা হয়। কেহ কেহ এই দলের নাম দিয়াছেন Nesiot এবং এই মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে শ্বেতকায় (leucodermous) মনুষ্য গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত, যদিও কোন কোন অঞ্চলে ইহারা পীতকায় মনুষ্য গোষ্ঠির সহিত মিলিয়া গিয়াছে।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগকে (Amerinds) পীতকায় বা পীতাভ সরলকেশ মনুষ্য গোষ্ঠির সঙ্গে উল্লেখ করা চলে কিনা এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। পণ্ডিতগণের মত এইরূপ যে প্রাচীনকালে বিভিন্ন সময়ে কতকগুলি জাতি এশিয়া হইতে উত্তর পূর্ব্ব সাইবেরিয়ার পথে আমেরিকার উপকূলভাগে উপস্থিত হয় ও ক্রমে আমেরিকার বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়ে। প্রথমে যাহারা আমেরিকায় উপস্থিত হয় তাহাদিগকে Palaeo-Amerind নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাদিগকে পীতকায় (xantho dermous) গোষ্ঠির বলা হইয়াছে কিন্তু ইহারা মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত নহে। ইহাদের মস্তক লম্বা। উত্তর আমেরিকার কতকগুলি জাতিকে Northern Amerind নামে এক গোষ্ঠিভুক্ত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে এই গোষ্ঠি পরবর্ত্তীকালে মধ্য এশিয়া হইতে রওনা হইয়া আমেরিকায় উপস্থিত হয়। ইহারা সাইবেরিয়ার সরল কেশ, পীতাভ জাতিগুলির সমগোষ্ঠির। উত্তর আমেরিকার মালভূমি, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার ও উপকূলভাগের কতকগুলি শাখাকে (Neo-Amerind ও North coast Amerind) এক গোষ্ঠিভুক্ত মনে করা হয়। ইহারা সরল কেশ, গোলমুণ্ড ও পীত বা পীতাভকায়। এইরূপ বলা হইয়াছে যে আমেরিকার আদিম অধিবাসী এশিয়ার মোঙ্গল গোষ্ঠি হইতে উদ্ভূত এই মত ঠিক নহে ; এশিয়ার একটি মূল গোষ্ঠি হইতে বিভিন্ন শাখা গোষ্ঠির উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই সকল শাখা গোষ্ঠির একটি মোঙ্গলীয় ও অন্য একটি আমেরিকান। ব্রিটিশ গায়েনার ওয়াবান, আরাওয়াক, ওয়াপিয়ানা, ক্যারিব জাতিগুলির মধ্যে মোঙ্গলীয় লক্ষণ দেখা যায়।

এখানে বলা প্রয়োজন যে শুধু গাত্রবর্ণ (yellowish) ও চুলের প্রকৃতির (straight hair) প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় দেখা যায় এইরূপ একটি অতি বৃহৎ মনুষ্য গোষ্ঠির বিভিন্ন শাখার নাম উল্লেখ করা হইল। মস্তকের গঠন ও অন্যান্য দৈহিক লক্ষণের দিক দেখিলে ইহাদের সকলগুলিকে একসঙ্গে বা এক গোষ্ঠিভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করা চলে কিনা সন্দেহ। তবে পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিবার প্রণালী ও তাহার ফল সম্বন্ধে মোটামুটি একটা স্পষ্ট ধারণা করিয়া লওয়া আমাদের উদ্দেশ্য। এজন্য চ্যাপ্টা মাথার ল্যাপ ও স্তামোয়েদ, গোল মাথার তুর্কী ও টুঙ্গুজ, লম্বা মাথার এস্কিমো, মধ্যমাকৃতি মস্তকের চীনা, বাদামি রংয়ের আমেরিকার আদিম অধিবাসী ও পলিনেশিয়ার অধিবাসী যাহাদিগকে কেহ কেহ শ্বেতকায় মনুষ্য গোষ্ঠির মধ্যে ফেলেন—ইহাদের সকলকেই একত্র উল্লেখ করা হইল। অন্ততঃ এই পর্য্যন্ত বলা চলে যে ইহাদের অধিকাংশ সরল কেশ (leitotrichous) এবং ইহাদের রং পীত হইতে শ্যাম বর্ণের মধ্যে। ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ গোষ্ঠিগুলির অল্পবিস্তর মোঙ্গলীয় লক্ষণ দেখা যায়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষের বাহিরে পূর্ব্বে আসাম সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্ম, শ্যাম, ইন্দোচীন, দক্ষিণ-পূর্ব্বে পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, উত্তর-পূর্ব্বে তিব্বত ও চীন হইতে মোঙ্গলীয়া, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া ও জাপান পর্য্যন্ত মোটামুটি সমগোষ্ঠিভুক্ত বিভিন্ন জাতির বাসভূমি অবস্থিত। পামীর পর্ব্বতমালার পূর্ব্বদিকে মোঙ্গলীয়ায়, দক্ষিণ-পূর্ব্বে পূর্ব্ব তুর্কীস্থানে ও ঐ পর্ব্বতমালার পশ্চিমে পশ্চিম তুর্কীস্থান হইতে তুর্কম্যানিস্থান পর্য্যন্ত বিভিন্ন তুর্কী গোষ্ঠির বাসভূমি। এই অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমে উরল পর্ব্বত শ্রেণী হইতে পূর্ব্বে বেরিং প্রণালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাইবেরিয়ায় সরলকেশ পীতাভ রংয়ের মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠি দেখিতে পাওয়া যায়। বেরিং প্রণালীর অপর কূলে অবস্থিত আমেরিকা মহাদেশের উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ অংশে, ব্রিটিশ গায়েনা ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপগুলিতে এই বৃহৎ গোষ্ঠির সম্পর্কিত বিভিন্ন জাতি প্রবেশ করিয়াছে। *

* মনুষ্য গোষ্ঠির শ্রেণী বিভাগ ও শ্রেণীগুলির নামকরণে প্রধানতঃ Dr. Haddon-এর অনুসরণ করা হইয়াছে।

গল্প নয়

শ্রীশান্তিসুধন দাশগুপ্ত বি-এ

বীরেশ্বরবাবু রতনগাঁয়ের চৌধুরী বাড়ীতে মেয়ের বিয়ের তত্ত্ব পাঠিয়েছেন। অনেকগুলি হাড়ীতে ক্ষীরের পুলি, সরভাজা, বুঁদে, রসগোল্লা, আরও অনেক রকমের মিষ্টি। তাছাড়া দুটো বড় রুই মাছ, চিনি পাতা দই, মেয়ে জামাইয়ের পোষাকী জামা-কাপড়, নানা রকমের প্রসাধন দ্রব্য। জিনিষ বোঝাই একটা গোরুর গাড়ি বেলা প্রায় এগারটায় চৌধুরী বাড়ীর দরজায় এসে থাম্‌লো।

বীরেশ্বরবাবুর বাড়ি রতনগাঁয়ের চার ক্রোশ দূরে। তাঁর অবস্থা বরাবরই ভালো। তার উপর মিলিটারী কণ্ট্রাক্টরীর কাজে তিনি নাকি মস্ত একটা দাঁও মেরে এসেছেন। বাড়ির কাছেই চৌধুরীদের মেজবাবুর ছোট ছেলের উপর তাঁর বরাবরই লোভ ছিল। লক্ষ্মীও হঠাৎ প্রসন্ন হ'য়েছেন। তাই যুদ্ধের বাজার গ্রাহ্য না ক'রে তিনি মেয়ের বিয়েতে যথেষ্ট টাকা খরচ ক'রেছেন। বিয়ের তত্ত্বও তিনি এমনভাবে পাঠিয়েছেন, যাতে চৌধুরীদের মান বজায় থাকে।

গাড়ি দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ভিড় জমে গেল। বাড়ির চাকরবাকর ও ছেলেপিলেরা কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে গাড়ি ঘিরে দাঁড়াল। তত্ত্ব এসেছে জেনে মেজবাবু পাড়ার সব বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অনেকেই তত্ত্ব দেখতে এসে পৌঁছল। চাকরেরা ধরাধরি ক'রে জিনিষগুলি মেজবাবুর দালানের বারান্দায় রাখতেই মেজগিন্নি সিন্দুক খুলে অনেকগুলি থালা নামিয়ে নিজের হাতে সব মিষ্টি থালায় সাজাতে লাগলেন। এর মধ্যে পাড়ার পুরুষ-মেয়েতে বাড়ি ভ'রে গেছে। জিনিষ দেখে সবাই একবাক্যে ব'লতে লাগ্‌ল—হ্যাঁ, চৌধুরীদের উপযুক্ত তত্ত্ব বটে। তাদের মধ্যে বেশি বুদ্ধিমান যারা, তারা দু একটা মিষ্টি চেখে তারপর রায় দিল—খাসা মেঠাই!

গাড়ি পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি মেয়ে এসে বাইরে দাঁড়িয়েছিল একটি ছেলে কোলে ক'রে। মেয়েটির বয়স আর, আঠারো উনিশ হবে। কিন্তু দারিদ্র্য তার দেহের প্রতি অঙ্গের রক্ত শুষে নিয়ে তাকে এক কঙ্কালে পরিণত করেছে। তার কাঠের মত পা দুখানা যেন শরীরের খাঁচাটাকে ধ'রে রাখতে পারছিল না। ছেলেটির বয়স বছর তিনেক হবে। হাঁটতে পারে, কিন্তু হাঁটবার শক্তি নেই। প্রাণপণ শক্তিতে মায়ের বুক আঁকড়ে কোন্‌ রকমে ঝুলে র'য়েছে। নইলে মেয়েটির হাত পা যেমন ক'রে কাঁপছিল,তাতে ছেলে কোলে রাখা অসম্ভব। এরকম চেহারা ও ছেঁড়া-ময়লা কাপড় দেখেও মনে হচ্ছিল মেয়েটি যেন ঠিক পথের সাধারণ ভিখারিণী নয়। ওর ভাব সঙ্কুচিত,দৃষ্টি ভীরু।

বাইরে দাঁড়িয়ে মেয়েটি বারান্দার জিনিষগুলির দিকে তাকিয়েছিল। দুদিন ওর পেটে জল ছাড়া কিছু পড়েনি। সাম্‌নেই সে দেখ্‌ছে নানা রকম খাবার, তার পেটের নাড়ীগুলো যেন কেউ মুচড়ে ছিঁড়ে ফেল্‌ছে? আগের দিন কেউ দয়া ক'রে একটু ফেন দিয়েছিল। তখনও তার চলবার শক্তি থাকায় ফেনটুকু সে ছেলেকে খাইয়েছে। তার পেটে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা; আর তার চোখের সামনে কেউ বারান্দায় ব'সে মিষ্টি খাচ্ছে, কেউবা পুঁটলী বেঁধে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে, কাড়াকাড়ি, হুড়াহুড়ি, ছড়াছড়ি চল্‌ছে। কর্ম্মব্যস্ত মেজ-গিন্নির এক দুষ্টু নাতনী চুপি চুপি দিদিমার আঁচলে এক মুঠো বুঁদে আর দুটো রসগোল্লা বেঁধে দিল, তারপর তাকে চুরির অপবাদ দিয়ে নাতি-নাতনীরা ঠাট্টা করতে লাগল। তাদের টানাটানিতে আঁচল থেকে সবগুলি মেঝের ছড়িয়ে পড়ল। মেজগিন্নি সেগুলো কুড়িয়ে তাদের কুকুরটাকে দিয়ে দিলেন। মেয়েটি বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবছিল—আহা ওগুলি যদি আমায় দিত! কিন্তু সে মিষ্টি চায় না। সে চায় পেটে দেওয়ার মত যা হোক একটা কিছু। মেজবাবুর দৃষ্টি মেয়েটির দিকে পড়তেই তিনি ভ্রূকুটি ক'রে ব'ললেন—এই, কি চাস এখানে? মেয়েটি কেবল ঘাড় নেড়ে একটু দূরে গিয়ে বস্‌ল, কিছু চাইবার সাহস তার হ'ল না, মুখেও কথা যোগাল না।

মিষ্টিগুলি ভাগ-বাটোয়ারা হ'য়ে গেছে। বাকি যা ছিল, মেজগিন্নি আলমারিতে তুলে রাখলেন। একে একে বাইরের সকলে চ'লে গেছে। হঠাৎ মেজগিন্নির দৃষ্টি পড়ল দূরে রোয়াকের উপর উপবিষ্টা মেয়েটির ওপর। কি ভেবে তিনি মেয়েটিকে কাছে ডাকলেন। এরমধ্যে তার কোলের ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত শিশুটিকে রোয়াকের উপর নামিয়ে রেখে মেয়েটি দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই মেজ-বাবু ব'লে উঠলেন—আরে না না, খেতে হ'লে কাজ করতে হবে। যাও, বাসনগুলি সব ভাগ ক'রে ধুয়ে নিয়ে এস গে। মেয়েটির শুক্‌নো মুখ আর কঙ্কালসার চেহারার দিকে তাকিয়ে গিন্নি ব'ল্লেন—চাকরেরা র'য়েছে তো। কর্ত্তা রুখে উঠলেন—ঐতো তোমাদের দোষ। কাজ না ক'রেই তো এদের এরকম অবস্থা হ'য়েছে, কুড়েমির উৎসাহ দিতে আমি রাজী নই।

ধীরে ধীরে মেয়েটি বাসনগুলি গুছিয়ে কয়েক বার ক'রে খিড়কির পুকুরে নিয়ে গেল। তারপর ঘর থেকে বেরুতে লাগল দুধের কড়াই, কর্ত্তার বৃন্দাবনী হুঁকো, গিন্নির পিকদানি, আরও কত কি!

বাসন মাজা যখন শেষ হ'য়েছে, মেয়েটির তখন আর চলবার শক্তি নেই। সে চোখে অন্ধকার দেখছে, কোন রকমে টল্‌তে টল্‌তে সে এসে দাঁড়াল। গিন্নি খুশি হ'য়ে কয়েকটা মিষ্টি ও কিছু ভাত তরকারী এনে দিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য মেয়েটির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। তার আর দেরি সইল না, ছেলের কথা পর্য্যন্ত সে ভুলে গিয়ে খাবার মুখে তুল্‌তে লাগল।

হঠাৎ বাইরে একটা গোলমাল উঠল—গেছে গেছে! ইঃ, এ কার ছেলে গো? ব্যস্ত হ'য়ে বাড়িসুদ্ধ লোক সদর দরজায় ছুটল। মেয়েটির সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে খেয়েই চলেছে। মেজগিন্নি ছুটে এসে মেয়েটিকে ব'ল্লেন—রাক্ষুসী, ছেলের মাথা খেয়েও পেঠ ভরেনি, আবার গোগ্রাসে ভাত গিলছিস্! চকিতে মেয়েটি একবার গিন্নির দিকে তাকাল, তারপর আবার খেয়ে চ'ল্‌লো। খাওয়া শেষ ক'রে সে যখন উঠে দাঁড়িয়েছে, তখন কে একজন মৃত ছেলেটাকে তার কাছে এনে ফেলে দিল।

স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটি ছেলের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে অশ্রু নেই, মুখে কাতরোক্তি নেই। তারপর অতি সন্তর্পণে মরা ছেলে বুকে ক'রে অভাগিনী ধীরে ধীরে কোথায় চ'লে গেল।

মেয়েটি যখন খিড়কির পুকুরে বাসন মাজছিল, ছেলে তখন জেগে উঠে নেংচিয়ে নেংচিয়ে মা'কে খুঁজতে সদর দরজার দিকে যায়। সেখানে কখন দীঘির শীতল জল তাকে ডেকে নিয়েছে।

মেয়েটি চ'লে গেল, কিন্তু এক বাড়ি লোকের মুখে তার আলোচনা চ'লতে লাগল বহুক্ষণ। কেউ বল্‌লে—রাক্ষুসী, কেউ বল্‌লে—ডাইনী, কেউ বা বল্‌লে—নষ্টা মেয়ে। সকলেই অবাক হ'য়ে ভাবল, ছেলের মরার খবরেও যে মুখে খাবার তুল্‌তে পারে, সে কেমনধারা মা!

আগের দিন ভিক্ষা ক'রে ফেনটুকু পেয়ে যে মা নিজে না খেয়ে ছেলেকে খাইয়েছিল, পরদিন সেই মারই পক্ষে কেমন ক'রে যে এটা সম্ভব হ'য়েছিল, তা একমাত্র তিনিই জানেন, যিনি মায়ের বুকে পুত্র-স্নেহ দিয়েছেন।

চিরসত্য

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

খুঁজে ফিরি দেশে দেশে সাগরে শিলায়
কে মোর আপন আছে এই দুনিয়ায়।
যাহারে আত্মীয় করি বক্ষে ধরি চাপি
সেই সে আঘাত হানে ওষ্ঠ ওঠে কাঁপি।
স্বার্থান্ধের পদক্ষেপ সারা বিশ্বময়
আপনার মত বিশ্বে কেউ প্রিয় নয়।

আমার 'আমি'র দিকে চাহিলাম ফিরে
দেখিলাম বসি আছে স্তব্ধ নত শিরে।
ব্যথাতুর দৃষ্টি তুলি কহিল কাতরে—
'তোমার বেদনা যত ব্যথিছে অন্তরে।
তোমার যা কিছু সুখ সেও দিই আমি
আমিই তোমার প্রিয়, তব অন্তর্যামী।'

ভারতচন্দ্রের

শ্রীসুধীরকুমার বসু রায়চৌধুরী

সংস্কৃত ভাষায় রসমঞ্জরী নামে একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ আছে। আচার্য্য ভানুদত্ত মিশ্র উহার রচয়িতা। এই ভানুদত্ত গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিদেহের অধিবাসী ছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে তিনি বিদর্ভের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি রসমঞ্জরীর সর্ব্বশেষ পত্তে স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিদেহের অধিবাসী ছিলেন। ভানুদত্তের পিতার নাম গণেশ্বর বা গুণেশ্বর। ভানুদত্ত খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দের শেষ ভাগে অথবা ১৪শ শতাব্দের প্রথম দিকের লোক। তিনি রসতরঙ্গিণী নামে অপর একখানি অলঙ্কার পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে রসমঞ্জরী রচনা করিয়া পরে রসতরঙ্গিণী রচনা করেন। ভানুদত্তের এই উভয় গ্রন্থই বাংলা দেশে অপ্রচলিত।

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী ও ভানুদত্তের রসমঞ্জরী এই দুই বইয়ের প্রথম হইতে কিছুদূর পর্য্যন্ত প্রায় একরূপ। এই উভয় পুস্তকে সাদৃশ্য এত অধিক যে মনে হয় ভারতচন্দ্রের পুস্তক ভানুদত্তের পুস্তকের অনুবাদ। প্রথম দিকে উভয় পুস্তকের বিষয়বস্তু যে কেবল এক তাহা নহে, ক্রমানুসারে ঐ সকল বিষয়বস্তুর তালিকাও এক। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে উভয় পুস্তকের তুলনা করা গেল। যথা—

ভানুদত্ত—তত্র রসেষু শৃঙ্গারস্যাভ্যর্হিতত্বেন তদা-
লম্বন বিভাবত্বেন নায়িকা তাবন্নিরূপ্যতে।

ভারতচন্দ্র—আদ্য রস সকল রসের ম'ধ্য সার
নায়িকা বর্ণিব অগ্রে তাহার আধার।

ভানুদত্ত—সাচ ত্রিধা, স্বীয়া পরকীয়া সামান্যাচেতি।

ভারতচন্দ্র—স্বীয়া পরকীয়া আর সামান্য বণিতা
অগ্রে এই তিন ভেদ পণ্ডিত বর্ণিতা।

ভানু—তত্র স্বমিন্সেবানুরক্তা স্বীয়া

ভারত—কেবল আপন নাথে অনুরাগ যার
স্বকীয়া তাহার নাম নায়িকার সার।

ভানু—গতাগত কুতূহলং নবনয়োরপাঙ্গাবধি
স্মিতং কুলনত ভ্রুবামধর এব বিশ্রাম্যতি।
বচঃ প্রিয়তম শ্রুতেরতিথিরেব, কোপক্রমঃ
কদাচিদপিচেত্তদা মনসি কেবলং মজ্জতি॥

ভারত—নয়ন অমৃত নদী সর্ব্বদা চঞ্চল যদি
নিজ পতি বিনা কভু অন্য পানে চায় না
হাস্য অমৃতের সিন্ধু ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু
কদাচ অধর বিনা অন্য দিকে ধায় না।
অমৃতের ধারা ভাষা পতির শ্রবণে আশা
প্রিয় সখা বিনা কভু অন্য পানে যায় না।

* * * *

ক্রোধ হ'লে মৌনভাব কেহ টের পায় না।

ভানু—স্বীয়াতু ত্রিবিধা মুগ্ধা মধ্যা প্রগলভা চেতি।

ভারত—মুগ্ধা মধ্যা প্রগলভা তাহার ভেদ তিন।

ভানু—তত্রাঙ্কুরিত যৌবন-মুগ্ধা

ভারত—মুগ্ধা বলি তারে যার অঙ্কুর যৌবন।

ভানু—সৈব ক্রমশো লজ্জা ভয় পরধীনরতির্নবোঢ়া।

ভারত—এ যদি রমণে হয় লাজে ভয়ে স্তব্ধা
নবোঢ়া তাহাকে বলি প্রশ্রয় বিশ্রব্ধা॥

ভানু—হস্তেধৃতাপি শয়নে বিনিবেশিতাপি
ক্রোড়ে-কৃতাপি যততে বহিরেব গন্তুং।
জানীমহে নববধূরথ তস্য বশ্যা
যঃ পারদং স্থিরয়িতুং ক্ষমতে করেন॥

ভারত—হস্তেতে ধরিয়া শয্যায় আনিয়া
যদ্যপি কোলেতে বসায়
নানা বাক্য ছলে যত্নে কলে বলে
বাহিরে যাইতে চায়।
নবোঢ়াকে বশ করণ কর্কশ
সে রস কহিব কায়।
যেই পারা করে স্থির করে ধরে
সেজন ব্যমোহ পায়॥

প্রথম হইতে কিছুদূর পর্য্যন্ত উভয় রসমঞ্জরীতে এই প্রকার সাদৃশ্য দেখা যায়। তাহার পর হইতে এইরূপ সাদৃশ্য আর দেখা যায় না। তবে মনে হয় যে ভারতচন্দ্র যেন স্থানে স্থানে ভানুদত্তের রসমঞ্জরী হইতে সাহায্য লইয়াছেন।

ভারতচন্দ্র যে ভানুদত্তের রসমঞ্জরীর সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত ছিলেন তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তবে তিনি তাঁহার পুস্তকের নাম রসমঞ্জরী রাখিলেন কেন? তিনি কি ভানুদত্তের রসমঞ্জরীর অনুবাদ নিজের মৌলিক রচনা বলিয়া চালাইতে চাহিয়াছিলেন? আমার মতে তাহা নহে। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুজ্ঞায় রসমঞ্জরীর অনুবাদ আরম্ভ করেন। পরে পুস্তকের বিষয়বস্তুর জটিলতা ও কাব্যাংশের নিকৃষ্টতার বিষয় বুঝিতে পারিয়া অনুবাদ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে

পুস্তকখানি সমাপ্ত করেন ও সময় সময় প্রয়োজন মত ভানুদত্তের রসমঞ্জরীর সাহায্য গ্রহণ করেন। তিনি যে রাজার আজ্ঞায় রসমঞ্জরীর অনুবাদ আরম্ভ করেন তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। নিম্নলিখিত কবিতাংশ পাঠ করিলে একথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরীর মুখবন্ধেই এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

রসমঞ্জরীর রস ভাষায় করিতে বশ
আজ্ঞা দিল রসে মিশাইয়া ॥

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে অনেকেই বলেন ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর "চোর, পঞ্চাশৎ" অবলম্বনে রচিত, একথা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না—তবে তাঁহার রসমঞ্জরী যে ভানুদত্তের রসমঞ্জরী অবলম্বনে রচিত তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

এই প্রবন্ধ রচনায় আমি নিম্নলিখিত পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি। আমি এই সকল গ্রন্থের রচয়িতা ও প্রকাশকদের নিকট ঋণ স্বীকার করিতেছি।

	পুস্তক	রচয়িতা
১।	History of Sanscrit Alankar Literature	Mr, P. V. Kane.
২।	রসমঞ্জরী (সুরভি ব্যাখ্যাসহ)	ভানুদত্ত মিশ্র (Benares Edition)
৩।	ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী	দে ব্রাদার্স'এর সংস্করণ।

বান্ধবী

শ্রীকল্যাণী চট্টোপাধ্যায়

মুকুল ফরেষ্ট-অফিসার হয়েছে, থাকতে হবে রাঁচিতে। কথাটি শুনে পর্য্যন্ত আমার আনন্দের সীমা নেই। উইলিয়াম সাহেবের সুপারিশের জোর আছে বলতে হবে, তা না হলে এ বাজারে ঐ চাকরী পরীক্ষায় তার পয়লা নম্বর হওয়া সত্ত্বেও পাওয়া দুষ্কর হত। সাহেবকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম মনে মনে, কিন্তু মুকুলকে এখনও কিছু লেখা হল না, কারণ তারই চিঠি আমি আগে আশা করি।

এ আর কতদিন হবে। আমি যখন বিয়ের কনে, এ বাড়ীতে প্রথম এসেছি, তখন মুকুলের বয়স জোর বছর বার, সুন্দর স্বাস্থ্যবান বালক, শান্ত ভীরু চোখ। তার মারবেল ও ঘুড়ির খরচ যোগাতাম আমি, সেইজন্য আমার সঙ্গে ভাবটা একটু চটু করে হয়ে গেছল। মুকুলের একদিন সে কি কান্না; তার নানা রঙের অঙ্কিত যে ঘুড়িগুলি গোয়ালঘরে শাশুড়ি-ঠাকরুণের ভয়ে সে সরিয়ে রেখেছিল সেগুলি সব উই ধরে নষ্ট করে দিয়েছে। কাউকে সে কিছু বলতে পারে না, সমস্ত দিন নাওয়া-খাওয়া ছেড়েছে, এমন কি মাষ্টার মহাশয়ের হোম টাস্কের দশটি অঙ্ক সব ভুল করে ফেলল একসঙ্গে। অনেকগুলি ঘুড়ি আবার পরের দিন সেই জায়গায় দেখে মহা খুসি সে, বুঝতে বাকি রইল না কার এই কীর্ত্তি।

যখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র, আমাকে সে লুকিয়ে মধ্যে মধ্যে তার ছন্দ মেলান পদ্য দেখাত, আর প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিত—আমি যেন এ বিষয় কাউকে না বলি। একদিন তার একটি ছোট্ট প্রেমের কবিতা, যেখানে সকালে মেয়েদের মজলিশ বসে, আটা দিয়ে জুড়ে দিয়েছিলাম। বাড়ীতে হাসির ফোয়ারা; মুকুল সমস্তদিন পড়ার ঘর থেকে বার হতে পারল না, সব রাগ পড়ল আমার উপর। সন্ধ্যে থেকেই আমার মাথার কাঁটাগুলি দিন কয়েকের জন্য আর পাওয়া গেল না। পরের দিন আবার তার গুপ্ত ডাইরি চুরি, তাতে চড়েছে—"বউদি ইজ ট্রেচারস্—চুক্‌লিখোর।" রাষ্ট্র হল সমস্ত কথাটা বাড়ীতে। ছোট একটি কাগজে "সাবধান বাণী" এল—দাদাকে লেখো, আমার প্রত্যেক চিঠিটি নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। "কম্‌প্রোমাইজ"।

আমার মামাতো বোন সতী রায় অর্থশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে এক সঙ্গেই ভর্ত্তি হল মুকুলদের কলেজে। ছেলেদের কাছে সে একটা আইডিয়াল, কিন্তু মুকুল তাকে দেখতে পারত না একটুও, কারণ প্রফেসররা তাকে নম্বর দিত তার চেয়েও বেশী। সতীর সঙ্গে কথা বলতো না সে। বাড়ীতে আসলে তাকে পাওয়া যেতো না। আমরা সতীকে নিয়ে

অনেক কিছু বলতাম—সতীর ফটো তার ক্লাস রুটিনের পাশে ঢুকিয়ে রাখতাম; সতীও জানত তাদের শেষ পর্য্যন্ত সম্পর্কটা কি রকম দাঁড়াবে। তার পিছনে বেশী লাগলে ধমক দিত আমাকে। এও তো সেদিন।

বিকেলের ডাকে মুকুলের চিঠি পেলাম। অনেক কিছু লিখেছে। রাঁচি থেকে আট মাইল দূরে নাম্‌কুমের কাছে আছে। জায়গাটা খুব পরিষ্কার, খোলা পাথুরে। আমাকে পত্রপাঠ নিশ্চয় করে যেতে হবে আমার সাত বছরের মেয়ে সুনীতিকে নিয়ে। কারুর যদি ছুটী না থাকে, পুরাণ ভৃত্য রামশরণের স্মরণ নিতে বলেছে। বাংলোটি তার এক বান্ধবীর, পরিচয় হয়েছে হুড্রু ফল্‌সে বেড়াতে গিয়ে। মুকুল নাকি পা পিছলে পড়ে সেখানে জখম হয়েছিল, সেই থেকে তার বান্ধবী তাকে ছাড়েনি। জাহাজডুবি হয়ে তার সম্পর্কীয় সকলেই শেষ হয়েছেন। একলা থাকতে হয় এই মস্ত বাংলোতে। মুকুল তার এখন একমাত্র সহায়, ঈশ্বর পাঠিয়েছেন। এমন কাজের সে এবং এমন যত্নশীলা, মানুষ কৃতজ্ঞ না হয়ে থাকতে পারে না তার কাছে। যিশুর দলের লোক হলেও কালীপূজায় সে আলো দেয়; শাড়ি পরতে তার খুব ভাল লাগে। আমাকে আনবার কথা লেখা হয়েছে শুনে,লক্ষ্মৌ থেকে ভাল জরদা আনিয়ে রেখেছে, "আরমি নেভি" থেকে হলাণ্ডের সেরা তাসের হুকুম দিয়েছে চার জোড়া। সুনীতির জন্য শেলাই করছে নিজেই নানা রকমের ফ্রক্, তার খেলাঘরের নির্দ্দিষ্ট স্থানে হাজার রঙের নুড়ি ও পাথর দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে।

চিঠি পড়ে আমার গা জ্বলে গেল। সতীর কপাল মন্দ, তা না হলে কোথাকার এক অজ্ঞাতকুলের মেমী বান্ধবী তার ঘাড়ে পড়বে কেন? আমার উপর আবার দরদ দেখিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আবার সুনীতিকে নিয়েও টানা-টানি। মুকুলকে ভাল মানুষটি পেয়ে ফাঁদে ফেলেছে, বৌদি গলবার পাত্রী নয়। ঠিক করলাম এর একটা বিহিত করতে কালই রামশরণকে নিয়ে রওনা হব।

রাঁচি ষ্টেশনে গাড়ী নিয়ে মুকুল অপেক্ষা করছিল। সুনীতিকে পেয়ে সমস্ত রাস্তা আমার সঙ্গে কথাই বললে না। বাড়ীতে ঢুকে বান্ধবীকে দেখতে পেলাম না। জিজ্ঞাসা করতে বললে, সে নিজেই কিছু টাটকা ফল আর সবজি আনতে মার্কেটে গেছে। তার ছিমছিমে পরিষ্কার সাজান ঘরগুলি দেখে ঈর্ষা হল, সব কিছু যেন সুনিপুণ হাতের আঁকা ছবি।

বসে গল্প করছিলাম, হঠাৎ এক শীর্ণকায়া বুড়ী ঘরে ঢুকলো। তার লম্বা চেহারা বয়সের জন্য ঝুঁকে পড়েছে। সমস্ত শরীরটা একটা ঢিলে ড্রেসিং গাউনে ঢাকা। পায়ে একজোড়া ঘাসের চটি। সাদা ধব্‌ধবে চুলগুলি পরিপাটি করে আঁচড়ান। চসমা সরে গেছে নাসিকারন্ধ্রের উপর। এক হাতে বেঁকান ছড়ি ও অপর হাতে ফলের সাজি। তার ফোগ্‌লা মুখে হাসি আর ধরে না। বুড়ী সুনীতির কাছে সাজিটি এগিয়ে দিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। মুকুল উঠে বললে—বৌদি ইনি আমার বান্ধবী—সকলেরই দিদা অর্থাৎ দিদিমা—

আর দিদা, ইনি বৌদি—আর এই ছোট্ট মেয়েটি সুনীতি—

গান

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় সঙ্গীতসুধাকর

বেদনা দিয়েছ তুমি-যে আমারে
ভুলিতে কি পারি তায়।
মন-মন্দিরে যে ছবি এঁকেছি
তারে কি গো ভোলা যায়।
তব সাথে ওগো কত মধুরাতে
স্বপন-মগন ছিনু দুজনাতে
জলভরা চোখে বলেছিলে তুমি
পরাণ তোমারে চায়।

কে জানিত ভুল, তুমি নহ চাঁদ
ওগো মোর মরমিয়া।
স্মরণে তোমার মুখখানি তাই
কাঁদি আমি বুকে নিয়া।
তুমি সাথে নাই, গিয়াছ সুদূরে
কে জাগাবে হাসি মোর হৃদিপুরে!
মোর প্রেম তাই আঁখিজল হয়ে
আঁখিতে শুকায় হায়!

শরীর ও মন

ডাক্তার শ্রীদুর্গারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এম্-বি

শরীর ও মন এতদ্ উভয়ের মধ্যে অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিভমান রহিয়াছে। দেহের বেদনা বা ব্যাধির ফলে মনে ক্লেশের উদয় হয়। বেদনাই-মনকে উতলা করে। মনের উত্তেজনা, চাঞ্চল্য বা দৌর্ব্বল্য দেহের স্বাভাবিক কার্য্য সংসাধনে বিঘ্ন উৎপন্ন বা আনয়ন করে। ক্ষণকালের জন্য একবারও মনের অস্থিরতা উপস্থিত হইলে, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বিব্রত হইয়া পড়ে। বারংবার এইরূপ ঘটিলে, দেহ ও মন উভয়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। একটার প্রভাবে অপরটী, এইরূপে উভয়ে উভয়কে, দৌর্ব্বল্যের পথে সরাসরি নামাইয়া লইয়া যাইতে থাকে। (১)

মানসিক দৌর্ব্বল্য হইতে ক্রমে অগ্নিমন্দা, অজীর্ণ, রক্তস্বল্পতা, অনিদ্রা, ও পরে কফ, পিত্ত, ও বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে স্নায়বিক



প্রাণায়াম

দৌর্ব্বল্য ও "নলবিহীন গ্রন্থী"গুলির কার্য্যের বিশৃঙ্খলতা পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে ক্রমে অধিক রক্তের চাপজনিত লক্ষণ, অকাল বার্দ্ধক্য ও অকালে হৃতযৌবন প্রভৃতি নানারূপ ব্যাধির লক্ষণের বিকাশ হয়। কাহারও কাহারও নানাবিধ মানসিক ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ হয়, যথা স্নায়ুবিক দৌর্ব্বল্যতা, আলস্য, অনিদ্রা, উদ্‌ভ্রান্তচিত্ততা, মূর্চ্ছা, এমন কি বিভিন্ন প্রকার উন্মাদনা। (২)

শরীরের ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য সম্পন্ন করার প্রয়োজন হেতুই মানবের কামাদির মনস্কামনা। স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়াদির বাসনা ও সম্ভোগফলে, অস্থির চিত্ত মূঢ় মানব বিচারশক্তি হারাইয়া উহাকেই সুখ বলিয়া কল্পনা করিয়া লয়। ক্রমে আশক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ও নিজে অভ্যাসের দাস হইয়া পড়ে। এইরূপে অপরিমিত ভোগলালসা জাগিয়া উঠে। দেহের ভোগের শক্তির সীমা থাকিলেও মনের প্রভাবে, উহার স্বাভাবিক সীমা লঙ্ঘন করা, অন্ততঃ কিয়ৎকালের জন্য সম্ভব হয়। মনের লিপ্সা একবার প্রজ্জ্বলিত হইলে, শ্রান্ত দেহের একান্ত অনাবশ্যক এমন কি



ধ্যান

অতিশয় বেদনাদায়ক হইলেও, দেহের অভাব বলিয়াই অনুমিত হয়। এইরূপে মনের সম্ভোগলালসা দেহের কাল্পনিক বা ভ্রান্ত সুখভোগের, বিকৃত সহ্যশক্তি, কিঞ্চিৎকালের জন্য হয়তো বর্দ্ধিত করে; কিন্তু দীর্ঘকাল এইরূপ

(১) The Indian Medical Record, Calcutta Vol LXIV no 4 Page 101 (the mind & the body by Dr. D. R. Mnkherji M. B. April 1944)

(২) The Chikitsa-Jagat, Cal. Vol XV no 7 page 145 (চিকিৎসা জগৎ—বৈশাখ—১৩৫১—(যোগ শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা By D. R. Mukherji M. B.)

অস্বাভাবিক অপরিসীম সহ্যাতীত ক্লেশে মানুষ বিশেষ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। রাজসিক গুণসম্পন্ন সুস্থকায় ব্যক্তি ইন্দ্রিয়লিপ্সু ভোগবিলাসী হইয়া সত্বর তমঃগুণ সম্পন্ন হইয়া পড়ে। উহার ফলেই চিত্ত বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অসুস্থ দেহে অস্থির মন, একজোটে মানবকে পশু অপেক্ষাও হীন করিয়া তুলে, কারণ পশুরাও স্বভাবের নিয়ম শৃঙ্খলার সহিত মানিয়া চলে (৩)। আধুনিক পাশ্চাত্য যৌন-বিজ্ঞান নরনারীকে ধ্বংসের প্রশস্ত পন্থা দেখাইয়া দিতেছে (৪)। দেহ অকর্ম্মণ্য হইলেও, বিকারগ্রস্ত মনের লিপ্সার নিবৃত্তি ঘটে না। মনের চাঞ্চল্যে দেহের উত্তেজনা, ও দেহের বিকারে মনের চাঞ্চল্য; বিভিন্ন মানবে, উপরোক্ত কারণদ্বয়ের মধ্যে অন্ততঃ একটী কারণ অবশ্যই থাকে। ইহার জন্যই প্রত্যেক মানবের ভিন্ন রুচি বা প্রবৃত্তির বিকাশ হয়। (চিকিৎসা-জগৎ—বৈশাখ ১৩৫১, ১৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) প্রবৃত্তির বিশেষত্বের আমরা কতকগুলি হেতু জানি যথা,—জন্মগত, শিক্ষাগত, কালগত, (পারিপার্শ্বিক ও কালানুযায়ী)

দুর্ব্বল বিকারগ্রস্ত মন, বেদনা ব্যাধিগ্রস্ত দেহে প্রাধান্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়া ইন্দ্রিয়াদির সুখভোগে ব্যর্থকাম হইলে জীবন ব্যর্থ বলিয়া প্রতীত হয়। কলুষিত চিত্ত নিরাশায় আশা আনিতে যত্নবান হয়। (দি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল রেকর্ড—এপ্রিল ১৯৪৪—১০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এই অসৎ প্রবৃত্তির মূলোৎপাটন করিবার কোনও সুগম পন্থা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা আজও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই (৫)। এ মহাযুদ্ধলিপ্সু বৈজ্ঞানিকদের লিপ্সার ফলে জগতের ধ্বংসের মহা তাণ্ডবলীলা ঘটাইতেছে।

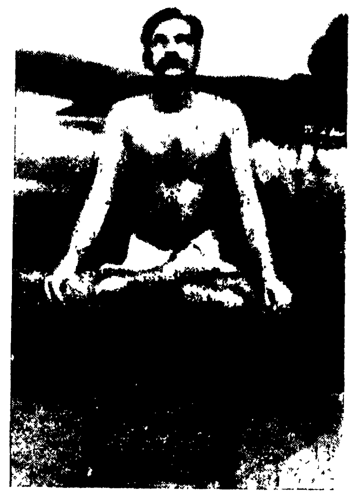
সভ্য মানব-সমাজ তাই চিরদিনই প্রতিটী নরনারীকে সংযম শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়া আসিতেছে।

চিন্তাশীল, স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি, বিচার ও অভিজ্ঞতায়, ইন্দ্রিয় সুখসম্ভোগ ও তৎচিন্তা বেদনাদায়ক জ্ঞানে উহা উপেক্ষা করিয়া সংযম দ্বারা ত্যাগমার্গ দিয়া স্বাস্থ্য ও শান্তি উপভোগ করেন। উহার ফলে কেবল যে সমাজ ও রাজ্যের কল্যাণ হয় তাহাই নহে, সমগ্র জগৎবাসীই উপকৃত হয়েন। খৃষ্ট ধর্ম্মের নীতিও তাহাই।

সংযম শিক্ষার ফলেই মানব সুস্থ মন ও দেহে জগতে শান্তি পাইয়া, সুস্থ অবস্থায় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া প্রকৃত সুখে কালাতিপাত করেন।



শাম্ভবী মুদ্রা



ঘোর মুদ্রা (তন্দ্রাবস্থা)

আর্য্য ঋষিগণের নিয়ন্ত্রিত ধর্ম্মজীবনে দেহ ও মন এতদ্ উভয়ের উৎকর্ষ সাধন ঘটে। দেহ মন সুস্থ রাখিয়া শান্তি ভোগ করিবার নিমিত্ত যোগ একটী প্রকৃষ্ট পন্থা। যোগ সাধন করিলে শরীর ও মনের কি অবস্থা হয় তাহা বুঝাইবার জন্য ৪খানি ফটো এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইল। ঐগুলি গত আষাঢ় ১৩৫১ ভারতবর্ষে প্রকাশিত যোগ প্রবন্ধটীর চিত্রগুলির সহিত বিচার্য্য। (৬)

(৩) The Journal of Ayurveda Cal, Sex Phenomenon May 1937

(৪) Sin & Crime. April 1937 (Do ; Do)

(৫) The Journal of the Indian Medical Association, Cal, Vol XIII no 3 Page 77, (1944 December Yoga—The Method of Psycho-Physical culture by D. R. M.

(৬) The Bharatvarsha, Cal. Vol 32 no 1 Asarh 1351 Page 57.

সমাজে সকল মানবকেই কতকগুলি বিষয় অবশ্যই শিক্ষা করিতে হয়। জীবিকা অর্জ্জন হেতু শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। বিশ্ব জগতে শিক্ষার ক্ষেত্র অসীম। দেহ মনের গঠনবিধানও শিক্ষার অন্তর্গত। বিশেষ বিষয়ের ব্যুৎপত্তি অর্জ্জনই উচ্চশিক্ষার একমাত্র মোক্ষ উদ্দেশ্য নহে। চিন্তাশীল একাগ্রচিত্তই কাম্য বস্তু। রোগজীর্ণ বিকলদেহে সৎচিন্তার প্রস্রবণ বহে না। আদর্শ বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যও সুস্থদেহে সংযত মনে একাগ্র-মুখী চিত্তের গঠন করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য ও মানসিক দৌর্ব্বল্যের জন্য শিক্ষাপ্রণালীই দোষণীয় বলিতে হইবে। সৎচিন্তা-স্রোতের ধারায়, বিক্ষিপ্ত মনকে সৎমার্গে একাগ্রমুখী করিয়া ধাবিত করিবার পন্থা না শিখানর ফলেই শারীরিক দৌর্ব্বল্যের উদ্ভব হয়। একমাত্র শরীরচর্চ্চায় দেহ নীরোগ হয় না। মূর্খ ব্যক্তির শরীরচর্চ্চায় শরীর বলশালী হইলেও এ যুগে উহাতে বিশেষ কোনও ব্যক্তি বিশেষের বাঞ্ছনীয় কল্যাণ হয় না। চরিত্রগঠন ও সমাজ সেবাও শিক্ষার উদ্দেশ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীগণও ছাত্রদিগের ন্যায় একই শিক্ষা অর্জ্জনের হেতু জীবনের সুদীর্ঘকাল নষ্ট করিয়া ও নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য হয়েন। অধিক বয়সে হঠাৎ পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনে অনভ্যস্ত অবস্থায় তাঁহারা বিব্রত হইয়া পড়েন। হিন্দুনীতি অনুযায়ী তাহারা আদর্শ নারীজীবন যাপন করিতে ক্লেশ পান। ফলে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া মানসিক পীড়া ভোগ করেন। নারীর স্বামী অনুরাগিনী ও সৎ এবং সুস্থকায় পুত্রকন্যার জননী হওয়া অপেক্ষা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি সর্ব্বক্ষেত্রে সকলের পক্ষে আদরণীয় হওয়া উচিত? জাতি গঠন করিতে হইলে বালক-বালিকাদিগের শিক্ষানীতি ও পদ্ধতিগুলির পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ আর্য্য-সন্তানসন্ততিগণ, পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষা দ্বারা লাভবান হইতে পারিবেন কি? গুরুগৃহে (টোল পদ্ধতি) শিক্ষা কালানুযায়ী নহে, তাই উঠিয়া যাইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও ঠিক দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী নহে। ইহার ফলেই বিকারগ্রস্ত মনের সৃষ্টি হওয়ায় শরীর অকর্ম্মণ্য হইতেছে। অধিকন্তু বিদ্যালয়গুলিতে দুর্ব্বল ও অমনস্ক ছাত্রদিগের জন্য কোনও বিশেষ শিক্ষার পন্থা অবলম্বন করা হয় কি (৭)?

দুর্ব্বল, অমনস্ক, স্মৃতিশক্তিবিহীন, অসৎমার্গগামী মানবকেও যোগ মার্গের পথে, সত্বর কর্ম্মঠ করিয়া তুলা যায়। ঐ সকল গোপন সাধনবিজ্ঞানগুলির তথ্য অনুসন্ধান করিলে জাতির মঙ্গল হইবার আশা রহিয়াছে। যোগমার্গে ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে দেহ মনের কতদূর উৎকর্ষ সাধন করা যায় তাহা প্রকাশিত চিত্রগুলি প্রমাণ করিয়া দেয়। সুপরিচ্ছদ, সাবান, প্রলেপ ও সুগন্ধ প্রভৃতি পরিপাটীতে, দেহের কান্তি ও পরমায়ু কি সত্যই বর্দ্ধিত হয়? পাশ্চাত্য মনীষীদিগের লিখিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলেই কি জ্ঞানের চরম সীমায় আরোহণ করিয়া, মৌলিক গবেষণার শক্তি সর্ব্বক্ষেত্রে আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে? আজিও কি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে, রোগ নিবারণ ও আরোগ্য বিষয়ে পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছেন? তাঁহাদের সর্ব্ববিষয়ে মতামত কি অভ্রান্ত? প্রকৃত সুস্থ ব্যক্তির দেহলাবণ্য প্রকাশ ও সৌম্যভাবের বিকাশের জন্য কি শিল্প প্রসাধনের প্রয়োজন হয়? প্রকৃত স্থির একাগ্রমনা চিন্তাশীল, শিল্প বা বিজ্ঞান সাধকের কি অপরের পদাঙ্ক অনুসরণ একান্ত বাঞ্ছনীয় কার্য্য মনে হয়?

আমরা পরাধীন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয়। আজ আমাদিগের শাক অন্নেরও অভাব। আমাদের সংস্কৃতি অতি প্রাচীন তাই দৃঢ়মূল। বিধর্ম্মী বা ভিন্নধর্ম্মী, স্বাধীন, শীতপ্রধান দেশীয়, নির্ম্মম পেষক, মাংসাশী, মদ্যপায়ী, বিলাসী, পরশ্রীকাতর, পাশ্চাত্যবাসীদিগের অনুকরণে, আমাদের কি বিশেষ সুফল ফলিবে মনে হয়?

এই কঠোর অবস্থার মধ্য দিয়া মনের বল ও দেহের শক্তি কেবল রক্ষা করিলেই চলিবে না, পরন্তু আত্মোৎকর্ষ সাধন দ্বারা অদূরের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে। ইহা নহে কি?

(৭) The Health Madras Vol XXI no 5 Page 99 May 1943. Pranayam by Dr. Durga Ranjan Mukherji M. B, Cal.

গান

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

ওই বাজে—মন্দিরেতে সন্ধ্যারতির শঙ্খ বাজে।
দলে দলে যায় সকলে নবীন সাজে॥
পিছিয়ে যারা ছিল প'ড়ে,
তা'রাই গেল আগিয়ে মোরে।
আমিই শুধু রইনু হেথা একলাটি এই পথের মাঝে॥

সবার মত নাইকো আমার পূজার ডালি, ফুলের মালা।
শুষ্ক মরু-বুকের মাঝে আছে শুধু গরল জ্বালা।
নাইক আমার কোনই পুঁজি,
তাই ত তোমার চরণ খুঁজি;
তাই তোমারে বারে বারে ডাকি আমি সকল কাজে॥

শিল্পী শ্রীযুক্ত সুনীলমাধব সেন

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

বাংলা দেশ শিল্পীপ্রধান দেশ। এখানকার মাটীর স্পর্শে শিল্পীমন সহজেই সাড়া দেয়। তাই, সাহিত্যক্ষেত্রে সহ-



প্রেরণা

জাত প্রতিভার বলে যেমন বহু কবি সাহিত্যিক আমরা দেখিতে পাই, তেমন ললিত কলাক্ষেত্রেও এমন বহু শিল্পী আছেন, যাঁহারা সহজাত সংস্কার লইয়া অঙ্কন বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। শিল্পী শ্রীযুক্ত সুনীলমাধব সেন ইহাদের অন্যতম। ইনি প্রকৃতপক্ষে আইন ব্যবসায়ী হইলেও শিল্প-ক্ষেত্রে ইঁহার প্রতিষ্ঠা সমধিক। কখন কোন স্কুলে, অথবা কোন শিল্প শিক্ষকের নিকট ইনি শিক্ষালাভ করেন নাই। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, রঙের খেলায় ইনি বর্ত্তমানে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরে একাডেমী অফ্ ফাইন আর্টস্ একজিবিশনে ইঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলির বিশেষ প্রশংসা হইয়াছে। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁহার অঙ্কিত কয়েকটী রঙিন্ তৈল চিত্রের পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে।



শিল্পীপত্নী—অরুণা দেবী



অঙ্কনরত শিল্পী—সুনীলমাধব সেন

প্রথম চিত্রটীর নামকরণ করা হইয়াছে প্রেরণা। মেয়েটী যেন কবিতা লেখার পূর্ব্বে ভাব-বিহ্বল অবস্থায় চিন্তা করিতেছেন। তৈল চিত্র হইতে গৃহীত ফটো দেখিয়া মনে হয় যেন কোন জীবন্ত মানুষের ফটোগ্রাফ্। মাত্র তিনটী রঙের সাহায্যে ছবিটী আঁকা হইয়াছে। দ্বিতীয় চিত্রটী শিল্পীর সহধর্ম্মিনীর প্রতিকৃতি। পাঁচটি রঙের সাহায্যে অঙ্কিত। তৃতীয় চিত্রটী শিল্পী একটী মেয়েকে সম্মুখে রাখিয়া আঁকিতেছেন। গত মাঘ মাসের ভারতবর্ষের শিল্পীর অঙ্কিত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ছবিটী প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত চিত্রটী দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছে।



শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্গের দক্ষিণ দ্বারে মন্বন্তর-মুক্ত লক্ষ লক্ষ নরনারী মহামুক্তির স্রোতে হঠাৎ থমক্ খাইয়া কিলবিল করিতেছে।

দক্ষিণ দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ।

দক্ষিণ স্বর্গের 'চীফ্ অফ্ দি ষ্টাফ্' শ্রীল চিত্রগুপ্ত একে একে সব কয়টি বিভাগে 'ফোন্' করিতেছেন···

"ধর্ম্মরাজ জয়তু। আপনি 'তামিস্র' বিভাগের অধ্যক্ষ? আচ্ছা, কোনও জরুরী অবস্থার জন্য আপনার কি ব্যবস্থা আছে? পনর বিশ লক্ষ মানবকে আপনি এখনই স্থান করে দিতে পারেন না?—"

'তামিস্রে'র অধ্যক্ষ জানাইলেন তিনি অক্ষম। বহুদিন হইল স্বর্গের কোনও সংস্কার করা হয় নাই—সুতরাং এরূপ জরুরী অবস্থার জন্য সেখানে কোনও ব্যবস্থাই সম্ভবপর নহে।

দক্ষিণ দ্বারের কলরব বাড়িতেছে।

জনৈকা নারী পার্শ্বসঙ্গীকে বলিতেছে—"হ্যাঁগা! বলেছিলে যে সহরে গেলেই ভাত পাওয়া যাবে—কত সহর তো দেখনু—আর যে পারি না—"

রুক্ষকণ্ঠে সহানুভূতি বাজিল—"ভগবান মরেছে, দেখতে পায় না—"

নারী বলিল—"চুপ! ও কথা বলতে নেই—"

দক্ষিণ স্বর্গের বিভাগের পর বিভাগে 'ফোন' বাজিয়া উঠিল।

অন্ধতামিস্র?

রৌরব?

মহা রৌরব?

কুম্ভীপাক?······

স্থান নাই—জরুরী অবস্থার জন্য কোথাও কোনও ব্যবস্থা নাই। গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া শ্রীল চিত্রগুপ্ত 'বৈতরণী' বিভাগে 'ফোন' করিলেন—দরকার নেই—এদের 'ইনডোর' প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিয়ে। জরুরী অবস্থায় আইন পরিবর্তন অশাস্ত্রীয় বা অস্বর্গীয় নয়। সুতরাং যদি 'আউট ডোরে' বৈতরণীতে একবার কোরে এদের নামিয়ে ছেড়ে দেওয়া যায় তো সমস্যার সমাধান হয়।

'ফোনে'র উত্তর আসিল—'হ্যাঁ, বৈতরণী বিভাগে স্থান যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু সেখানে তো এদের প্রবেশাধিকার নেই। ব্রহ্মার আদেশে কেবলমাত্র যারা যুদ্ধ করে বা যুদ্ধ করায়, তাদেরই এখানে প্রবেশাধিকার আছে। কারণ তাদের যে সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিতে হবে। ওদিকে পৃথিবীতে আবার লড়াই করার লোক চাড্ডি তৈরী করতে হবে তো।'

দক্ষিণ দ্বার এখনও বন্ধ।

কাতর কণ্ঠ ভাসিয়া আসিতেছে—"কোলকাতা কতদূর গা? তোমরা তো পুরুষ মানুষ, বল না গা আর ক'কোশ? ছেলেটা যে নীল প্যাকাশে হোয়ে যাচ্ছে—আর তাকে, আমার দেড় বছরের সোনাকে আমার মাণিককে কোথায় ফেলে এলুম গো! ওগো শুনছ—তোমরা কি পাষাণ? কোলকাতা আর কতদূর বল না গা?"

রুক্ষকণ্ঠ ধমক দিল—"চুপ কর।"

নারী গুমরিয়া উঠিল। সমবেত পুরুষকণ্ঠ গর্জ্জিয়া উঠিল—"ভাঙো দ্বার—না হয় এক লক্ষ মরব, দশ লক্ষের অন্ন তো মিলবে।"

ওদিকে জরুরী অবস্থার কথঞ্চিৎ একটা সমাধান হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়াছেন—চিত্রগুপ্তের বুদ্ধিমত্তার উপর তাঁর যথেষ্ট আস্থা আছে। সুতরাং স্বর্গীয় বিধির জরুরী 'এমেণ্ডমেণ্ট্' (পরিবর্ত্তন) হইল—পরে অবশ্য ধর্ম্মরাজ আপন 'রেকমেন্ডেশনে' (খাতিরে?) ব্রহ্মার কলম হইতে পাশ করাইয়া লইবেন।

স্থির হইয়াছে বৈতরণীর জল পানেই ইহাদের যথেষ্ট 'প্রায়শ্চিত্ত' হইবে।

দক্ষিণদ্বার উন্মুক্ত হইল।

'চীফ অফ্ দি ষ্টাফ' শ্রীল চিত্রগুপ্তের হেড কোয়াটারের অঙ্গন মুহূর্ত্তেই উর্ম্মিমুখর হইল। উত্তর স্বর্গে দেবরাজের খাস্ কামরায় আলোক মারফৎ সংবাদচিত্র পৌছিল। পৃথিবীর মানুষের ব্যাপার—সুতরাং দেবরাজকে জানাইয়া উত্তর স্বর্গের দপ্তরে একটা রেকর্ড রেখে দেওয়া দরকার। পরমুহূর্ত্তেই উত্তর স্বর্গের সংবাদপত্রে প্রচারিত হইল—

"দক্ষিণ স্বর্গের বিশেষ আকর্ষণ—মর্ত্ত্য হইতে আগত ভুখাহঁ মিছিল!!!

চিত্রগুপ্তকে জরুরী ক্ষমতা অর্পণ—"

অবস্থার গুরুত্ববোধে দেবরাজ দক্ষিণ স্বর্গ পরিদর্শনের ইচ্ছা করিলেন। ইন্দ্রাণীও প্রস্তুত হইলেন।

সারা উত্তর স্বর্গে চাঞ্চল্য উঠিল—এত বড় ভুখাহঁ মিছিল দেখিবার সৌভাগ্য বহুদিন স্বর্গবাসীদের হয় নাই। এদিকে মন্বন্তর-মুক্ত নরনারী ঝাঁকিয়া বসিয়াছে—জল তাহারা অনেক খাইয়াছে—নাড়ীতে আর জল তলাইবে না। এখন শুকাইয়া বরং দুদণ্ড বাঁচিবে, তবু জল খাইবে না।

শ্রীল চিত্রগুপ্তের সম্মুখে আবার নূতনতর সমস্যা! 'ফেন দাও' কলরবে চিত্রগুপ্তের চিত্তও বুঝি টলিয়া উঠিল। ক্ষুধাকাতর করুণ কণ্ঠে নারী যখন সন্তানের মুখ চাহিয়া বিরাট স্বর্গ প্রাসাদের অন্তঃপুরচারিকাকে উদ্দেশ করিয়া ডুকরিয়া বলিল—"একটু ফেন দাও মা!"

চিত্রগুপ্তের চক্ষু সত্য সত্যই ছলছল করিয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে দেবরাজ ও ইন্দ্রাণী আসিয়া পৌছিয়াছেন। একে একে স্বর্গবাসিনীর সাথে স্বর্গবাসী মহাত্মাগণও আসিতেছেন।

চিত্রগুপ্ত চোখ মুছিয়া অভ্যর্থনায় ব্যস্ত হইলেন। সম্মুখে একটি অল্পবয়স্কা মেয়ে আগাইয়া আসিল। বলিল—'এক মালসা ফেন দাও না মা! স্বামীপুত্তুরকে একবারও অন্ততঃ খাইয়ে যাই। দেবে মা? তোমার সংসারের কাজ কোরে দোব—যা বলবে কর্ত্তে, পরাণটুকু থাকা পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই কোরে দোব—'

সর্ব্বনাশ! এ মেয়েটা বলে কি? স্বর্গবাসিনীর পরিচারিকা হোতে চায় মানবিনী হোয়ে। ইন্দ্রাণী বলিলেন—'না গো মেয়ে—তার দরকার নেই—বরং তুমি—'

দেবরাজকে লুকাইয়া ইন্দ্রাণী আপনার ভূষণ খুলিয়া মেয়েটিকে দিতে গেলেন।

মেয়েটি শিহরিয়া পিছাইয়া আসিল—'ও নিয়ে আমি কি কর্ব্ব মা। ওসব আমরা ভুলে গেছি। পায়ে পড়ি ম ফেন দাও একটু।'

একে একে স্বর্গবাসিনীরা আপনাদের করুণার দানে প্রত্যাখ্যাত হইলেন। ভূষণ তাহারা চাহে না।—বস্ত্র ভুখাহঁর নগ্ন মিছিল বিকারের হাসি হাসিয়া ওঠে।

দেবরাজ চিন্তামগ্ন। পাশে চিত্রগুপ্ত। দেবরাজ ভাবিতেছেন, এক পারিজাতের ফুল মানুষের কামনা। কিন্তু এরা তা চায় বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়, কল্পতরুর ফল কিন্তু কল্পতরু বৃদ্ধ হোয়ে এসেছে। তার ফলে স্বর্গেরই কুলায় না। ঘরের রাখিয়া তবে তো দান করিতে হইবে অমৃত'র কথা তো ওঠেই না। এক ছিল বৈতরণীর জল তাও এরা —

দেবরাজ মিছিলকে প্রশ্ন করিলেন—"বৈতরণীর জল তোমরা পান কর্ত্তে চাও না?"

এক উত্তর—'জল আর পেটে তলাবে না—' দেবরাজ জনান্তিকে বলিলেন—'মূর্খ!'

চিত্রগুপ্ত হাসিলেন। কিন্তু এখন উপায় কি? দেবরাজের লক্ষ্য হইল দূরে মিছিল হইতে বিচ্ছিন্নভাবে একটি পরিবার তাঁহার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি হানিয়া বসিয়া আছে।

স্বর্গাধিপতি তিনি। মুহূর্ত্তেই বুদ্ধি পড়িয়া লইলেন। ইঙ্গিতে সেই পরিবারের নায়ককে আহ্বান করিতে সে



'পায়ে পড়ি মা—ফেন দাও একটু'

আসিল—কিন্তু ভিক্ষা চাহিল না। দেবরাজ তাহাকে বলিলেন—

—"তুমি শিক্ষিত বুদ্ধিমান—তোমার চোখে প্রতিভা রয়েছে। স্বর্গকে দায় হতে যদি রক্ষা করতে পার এই জনমিছিলকে বুঝিয়ে, তাহ'লে যথাযোগ্য পুরস্কার পাবে।"

সে জানাইল, পারিবে। পরে বিশাল ভুখার্ত্ত মিছিলকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল—"তোমরা বল তো এখনও ক্ষুধা আছে কিনা? ভেবে দেখ—"

সমবেত রুক্ষ পুরুষকণ্ঠে স্বর্গ পুরী কম্পিত হইল—"ক্ষুধা নেই! এ লোকটা বলে কি! মরতে বসেছি ক্ষুধায়, তবু তোমার কথায় হাসি পাচ্ছে বাবু—"

লোকটি পুনরায় বলিল—"তোমরা যে মৃত—ভাল করে ভেবে দেখ দিখি—"

ক্ষণেক বিবেচনার পর বিশ্বাস হইল। তারপর পুরুষের বুকফাটা অট্টহাসি ভয়াবহ রূপে সহসা ধ্বনিয়া উঠিল। স্বর্গললনারা অঞ্চল দৃঢ় করিলেন।

লোক পুনরায় বলিল—"এ স্থান হোল স্বর্গ। তোমরা স্বর্গে এসেছ—"

সমবেত নারী কাঁদিয়া উঠিল—"আমরা পাপী তাপী লোক—আমরা কি স্বর্গে আসতে পারি? আরও যে পাপ বেড়ে যাবে। আস্‌ছে ফসলে আমার সাড়ে তিন বিঘের ধান যে বারভূতে খাবে। সে সইতে পারব না, না কিছুতেই না। হ্যাঁগা তোমরা বুঝি স্বর্গের ঠাকুর? তোমাদের পায়ে পড়ি, ব্যাগরতা করি ঠাকুর, দুটি খাইয়ে, প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরিয়ে দাও আমাদের সেই ঘরকে। আমরা বাঁচতে চাই ঠাকুর।"

দেবরাজ বলিলেন—"বেশ। এখন তো শান্ত হও। বৈতরণীর জল তোমাদের পান কর্ত্তে হবে না—আর ক্ষুধা বলেও এখন তোমাদের কিছু নেই। সুতরাং এখানে কিছুদিন বিশ্রাম কর। আমরা ইতিমধ্যে দেখি তোমাদের জন্য কি কর্ত্তে পারি।"

একটি রুক্ষকণ্ঠ উত্তর করিল—"হ্যাঁ বাবু, সেই বেশ ভাল। ও স্বর্গ টর্গ আমরা বুঝি না—আমরা বুঝি মোদের খেতখামার, আর ঘর—সেই মোদের স্বর্গ—সোনার স্বর্গ।"

* * * *

স্বর্গীয় 'কমিশন' প্রস্তুত হইল। নায়ক—চিত্রগুপ্ত এবং বিশেষজ্ঞ—শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকটি। সভ্যগণ—(১) উত্তরস্বর্গের প্রতিনিধি, (২) বুভুক্ষু পুরুষদের প্রতিনিধি, (৩) বুভুক্ষু নারীদের প্রতিনিধি। যথাকালে দেবরাজের শুভেচ্ছা নিয়ে স্বর্গীয় কমিশন মর্ত্ত্যপথে যাত্রা করিলেন।

* * * *

কলিকাতা সহরের বিশিষ্ট নাট্যমঞ্চে সাহায্যরজনী। দুর্গতদের জন্য অবশ্যই। প্রথমেই কুমারী অমুকার বুভুক্ষু নৃত্য।

বলাবাহুল্য নাট্যালয়টি সাহায্যকারী ও দাতৃবৃন্দের কল-কোলাহলে মুখরিত। আরম্ভের শেষ ঘণ্টা বাজিল, পর্দা উঠিল। 'বুভুক্ষুর নৃত্য' ভঙ্গিমা পুর্ণরূপায়নের পুর্ব্বেই প্রশংসা বর্ষিত হইতে লাগিল। নৃত্যরতা কুমারী সত্যই কলাকুশলা—আপন প্রতিভায় সক্ষম হইয়াছে মৌলিকের রূপায়নে। তাহার স্মরণে ভাসিতেছে তাহাদের দুয়ারের সম্মুখে এমনই করিয়াই ভিখারিণী হাত পাতিত—কিছু দিয়ে যাও বাবা! একটু ফেন দাও মা…

স্বর্গীয় কমিশন অলক্ষ্যে থাকিয়া নৃত্যঠাম দেখিতেছিল। অকস্মাৎ নৃত্যকুশলার ভঙ্গিমা স্তব্ধ হইয়া গেল—তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া সেই ভিখারিণী যেন তাহাকে শিখাইতেছে—গলায় সোনার হার দেখলে কি কেউ ভিক্ষা দেয়মা—ওটাকে লুকিয়ে ফেল।…

নৃত্যকুশলা মূর্চ্ছা গেল।…ফিট্ নাকি তাহার মাঝে মাঝে হয়…

বিখ্যাত গবেষক ও অধ্যাপক একজন আপনার লাই-ব্রেরীতে বসিয়া একান্তচিত্তে হিসাব কষিতেছিলেন—দুর্ভিক্ষে কতজন মরিয়াছে, তাহাদের শতকরা কতজন কোন্ শ্রেণীর।

স্বর্গীয় কমিশন চারিপাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার গবেষণার ফল লক্ষ্য করিতেছিল। অধ্যাপক লিখিতেছেন—

তপশীল—শতকরা এত জন—

বর্ণ হিন্দু—শতকরা—

কমিশনের সভ্য বুভুক্ষুদের প্রতিনিধি 'ফু' করিয়া আওয়াজ করিল—ম'রে ভূত হোয়ে গেছে—আকারও নেই, বর্ণও নেই, তার আবার বর্ণ হিন্দু!

স-চেয়ার অধ্যাপক পতিত হইলেন।…অধ্যাপক পত্নী ছুটিয়া আসিলেন। অধ্যাপকের নাকি ব্লাডপ্রেসার আছে…

(শৌখিন্) সৌখীন্ ভদ্রলোক কর্ম্মব্যস্ত দিনের অবসরে (নাকি পাবলিক্-ম্যান্) মন্বন্তরের স্বরূপ উপলব্ধি করিতেছেন মহাকবির কাব্যে। মন্বন্তর বিষয় দুই একছত্র কবিতাও তাঁহার এদিক ওদিকে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি কাব্যরসিক, সুতরাং আবৃত্তি করিয়া পড়িতেছেন—

—"নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে,নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি।
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি আপনার কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া—

সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে—"

স্বর্গীয় কমিশনের বিশেষজ্ঞ জানে, কাব্যে বুভুক্ষুর ক্ষুধা উপলব্ধির স্বার্থকতা কি ও কতদূর। জানালার কপাটটিকে সে সশব্দে বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া আসিল—ক্ষুধার তাড়নার অভাবের অপমানে যে পরিবার শুদ্ধ আত্মহত্যা করিয়া ধনিকতন্ত্রবাদকে অঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াছে তাহার সম্মুখে কিনা লজ্জাহীনের এই কাব্য আবৃত্তি!

কাব্য-রসিক কেমন যেন চমকিয়া উঠিলেন। কাহাকে উদ্দেশে ডাকিয়া বলিলেন—ওগো আমার ডিপোজিট বইটা তুলে রেখেছ তো?…

নিখিল ভারত শিল্পকলার প্রদর্শনী হইতেছে। মন্বন্তর-শিল্পকলার আকর্ষণই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কত মহারাজা মহারাণীর পদধূলি এবারে পড়িয়াছে। স্বর্গীয় কমিশন কলাপ্রদর্শনীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন—হ্যাঁ, সত্যই আকর্ষণের যোগ্য বটে। ভুখাহ্‌'র এমন পট-রূপায়ন শিল্পকলায় যুগান্তর আনিবে এ আর বিচিত্র কি।

স্বর্গে এমন রূপলিপিকা দেবপ্রতিনিধি দেখিয়াছেন কি? কই, তাঁহার তো স্মরণ হয় না। চিত্রগুপ্তের গোপন চিত্রশালাতেও এমন লিপিকা বড় বেশী নাই—হয়ত এমন সুন্দরও নাই। বুভুক্ষুদের দুই প্রতিনিধি—একটি পুরুষ আর একজন নারী, উভয়েই বিস্মিত হইলেন—সত্যই তাহারা মরিয়াছেন বলিয়াই তো এ যুগান্তরধর্ম্মী প্রদর্শনী সম্ভব হইয়াছে—আহা! ভিক্ষা চাওয়াও এত সুন্দর হয়!… বুভুক্ষুর মরণও এত অপরূপ! কি রঙের নেশা—কি তুলিকার চাতুর্য্য!…

কমিশনের বিশেষজ্ঞ টিপ্পনী কাটিলেন—মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ—

* * * *

আরও অনেক দেখিয়া শুনিয়া স্বর্গীয় কমিশন দেবরাজের সকাশে উপনীত হইলেন।

সমস্ত রিপোর্ট শুনিয়া দেবরাজ মন্তব্য করিলেন—"তাহোলে যাদের মরণে জাতির কৃষ্টির যুগান্তর সম্ভব

হোয়েছে, তারা যদি নব জাতকের রূপে ফিরে যেতে চায়, তাদের আদর হবে নিশ্চয়ই—"

বুভুক্ষুদের প্রতিনিধিদ্বয় বলিলেন—"কিন্তু ঐযে কি বোম্বাই প্ল্যান্ না কি শুনে এলাম, ওতে তো আমাদের জন্য কোনও বিশেষ আশ্বাস নেই—"

বিশেষজ্ঞ ধমকাইয়া উঠিল—"মৃতের আবার অপমৃত্যুর ভয় কি ?"

দেবরাজ বলিলেন—"তাহোলে ?"

বিশেষজ্ঞ বলিলেন—"কিছু ভয় নেই—বিরাট ষ্টারলিং ব্যালান্স রয়েছে—আপনি ওদের ফিরে যাবার হুকুম দিন—"

চিত্রগুপ্ত বলিলেন—"ওটা আবার কি ?"

বিশেষজ্ঞ বলিলেন—"প্রায়শ্চিত্ত আর নরক বিধান করতেই আপনার প্রতিভা সার্থক—ওটা আপনি বুঝবেন না—"বলিয়া ইন্দ্রের প্রতি বিজ্ঞের হাসি নিক্ষেপ করিলেন। দেবরাজ জহুরী। হাসির বিনিময় হইল।...

এতক্ষণে দেবরাজ অনুমতি দিলেন সমস্ত মিছিলকে—"তোমরা মর্ত্ত্যের পথে যাত্রা কর—"

* * * *

বিশেষজ্ঞ রহিয়া গিয়াছেন। দেবরাজ বুঝিয়া প্রশ্ন করিলেন—"পুরস্কার বুঝি ? আচ্ছা, কি চাও তুমি ?"

বিশেষজ্ঞ কহিল—"স্বর্গ চাহি না—ওদের মাঝে জন্মে ওদের জন্যই সাহিত্য-স্রষ্টা হোতে চাই।"

দেবরাজ—"তথাস্তু !

এস সুভাষ

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

বাংলার শিশু আজ হাঁকি বলে—হ'ব স্বাধীন।
বালক বালিকা চাহে স্বরাজ, চাহে সুদিন।
যুবক যুবতী উচ্চে তুলিছে জয়-নিশান।
প্রৌঢ় বৃদ্ধ বৃদ্ধা চাহিছে মুক্ত প্রাণ।
গান্ধী আনিল মহা জাগরণ নাশি' আলস।
সুভাষ আনিল বীর-বিক্রম, তেজ, সাহস।
গান্ধী জাগায়, গান্ধী দেখায় মুক্তি পথ।
সুভাষ জাগায়, সুভাষ ছোটায় মুক্তি রথ।
বাংলার বুকে অপরূপ তেজী মেদিনীপুর।
বাংলার ঘরে ঘরে বাজে আজ দীপক সুর।
বাংলার নর-নারী-বুকে আজ ওঠে আহ্বান—
এস সুভাষ, নেতাজী এস হে, জাগাও প্রাণ।

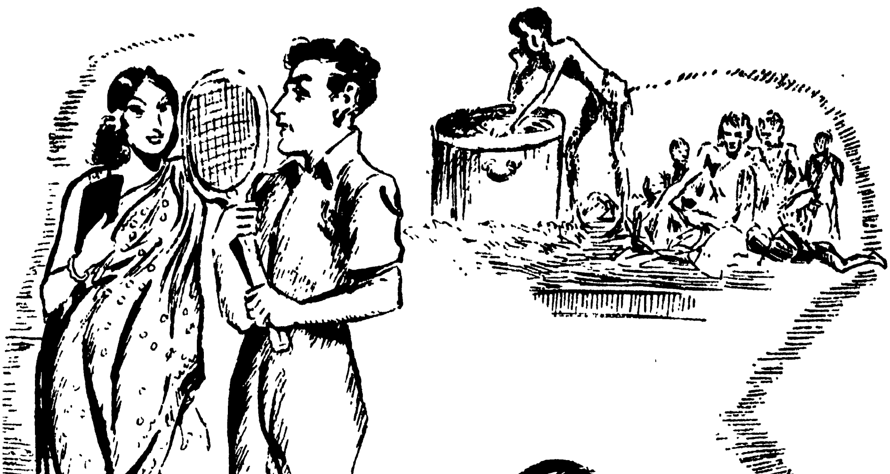
এস সুভাষ, এস আত্মীয়, এস দুলাল !
বাংলার নিধি, বাংলার বীর, এস ভয়াল !
এস ভয়াল, ত্রিশূল-হস্তে হে ভৈরব !
প্রলয় নৃত্যে ত্রিপুর বিনাশি' জুড়াও সব।
অসহ দুঃখে, অসহ পেষণে ধুকিছে দেশ।
এস তুমি, তারে উঠাও পরায়ে যুদ্ধ বেশ।

শিবাজীর তেজে এস নব বীর, নব গঠক।
প্রতাপের দুখদহন লইয়া এস চালক।
যুবক সিরাজদ্দৌলার তেজে জাগাও সব।
পিছনে ছুটিবে বাঙ্গালী করিয়া বিজয় রব।

বাংলার বুক-সরোবরে তুমি নীলোৎপল।
বাঙ্গালীর আশা, বাঙ্গালীর ভাষা, তুমি উজল।
কোথায় গোপনে, কোথায় আঁধারে কাটাও কাল ?
তব দুখ স্মরি' হৃদয়ে পীড়িছে চিন্তাজাল।

আমাদের দুখ নিবারিতে তুমি দুঃখ লও।
আমাদের ব্যথা বিদূরিতে তুমি বেদন বও।
এস হে বেদনবিজয়ী কর হে পেষণ জয়।
বাঙ্গালী কাঁদিছে, বাঙ্গালী ডাকিছে হে প্রেমময় !

ফিরে এস তুমি আমাদের মাঝে, এস দুলাল !
দীক্ষা লইব তোমারি মন্ত্রে অতি ভয়াল।
এস সুভাষ, এস সুভাষ, মোদের বীর !
দাঁড়াও তোমার স্বদেশের বুকে সৌম্য ধীর।



ভুলের ফসল

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

একাকী কলিকাতার জনবহুল পথে বিভ্রান্তমনে হাঁটছি, এমন সময় কোনও মন্দিরের ভিতর হতে ধর্ম্মসঙ্গীতের রেশ কানে ভেসে এল—

বাহিরের ভুল জান্‌বে যখন
অন্তরের ভুল ভাঙ্গবে কি !
বিষাদ বিষে জ্বলে শেষে
তোমার প্রসাদ মান্‌বে কি !

সত্যই ত? একি আমারি ব্যথার বাণী আমারই অলক্ষিতে আমাকে জানান হচ্ছে? এই সুন্দর ভুবনে এতদিন কি. কলুর বলদের মতন ভুলের ফসলই কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি? মনে প্রাণে সত্য-সুন্দরের দুনিয়ার উপরে অশ্রদ্ধা জন্মে গেছে, কিন্তু একি হল, এতদিনের প্রোষিত অভিজ্ঞতা কি ভুল, আমি কেবল বাইরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় "অভিমানের কালো মেঘের বাদল হাওয়ায়" উড়ে বেড়াচ্ছি, পিছনের জীবনের দিকে — দৃষ্টি যায়, তাকিয়ে তাকিয়ে চোখে শুধু ধাঁধাঁ যাইত, আজ কোন "বর্ষাধারায় আমার এতদিনের হ হলো সারা" জানিয়ে দিবে কি? ব্যাপারটা আপনাদের জানাতে হ'লে খুলে বলা দরকার।

ছেলে বেলায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিশুশিক্ষায় "লেখাপড়া করে যেই, গাড়ীঘোড়া চড়ে সেই" পড়ে একটা মাদকতা মনের অগোচরে স্বপ্ন রচনা করে। পাড়ায় দেখি দুপুর না হতেই মৈত্রমশায়ই বেশ ফিটফাট সেজে ঘোড়ার গাড়ী চড়ে রোজই কোথায় যান, আর বিকেল না হতেই সেই গাড়ীতে চড়ে বাড়ী ফেরেন। ছেলেবেলা থেকেই ধারণা হোল মৈত্রমশাই বোধহয় মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন তাই এই আরাম ভোগ করছেন, আমারও তাই মনোযোগ বেশ বেড়ে গেল এবং তন্ন তন্ন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কটা সিঁড়ি পার হয়ে যখন হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়লুম তখন ভাবলুম, তাই তো। এরকম ত কথা ছিল না। শেষে অনেক জায়গায় ঢুঁ দেওয়ার পরে অগ্রজমশাই নিয়ে গেলেন এক বাড়ীতে, তাঁর কাছেই শুনেছিলাম বাঙ্গালী হ'লেও তিনি সাহেব, কাজেই কথা বার্ত্তায় যেন গ্রাম্যতা দোষ না থাকে। আমি প্রাণপণে আধুনিকতার সকল স্পর্শ লাগিয়ে সেই সাহেব-বাবুর সকল কথার জবাব দিলুম। তিনি একসঙ্গে আমার মতন আরও দুই তিন জনের কথা শুনছিলেন, অপর দিকে নরসুন্দর তাঁকে সভাসুন্দর বানিয়ে দিচ্ছিল। আমি

বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে ছিলুম। সত্যই এরা কত বড়, বড় না হলে আমারই মতন বাঙ্গালী হয়ে সাহেব হতে পারেন। তিনি জলদ-গম্ভীর স্বরে বললেন, বেশ এসো—কাল এসো, হয়ে যাবে। এই রকম কাল হতে কালান্তরে, বৎসর ঘুরে এল, কিন্তু মহাপুরুষের একই বাণী, অনড় অচল, শেষে আমার চর্ম্ম-পাদুকা ব্যথায় কাতর হয়ে কিম্বা পঞ্চম বাহিনীর যুক্তিতে সাহেবের গালভরা অভয়বাণী শুনতে অসম্মত হওয়ায় বাধ্য হয়ে এক দেশী ভদ্রলোকের নিকটে হাজির হলাম। ইনি একেবারে বিপরীত, নরসুন্দরের কোনও বালাই নাই, দেখেই বুকে এক কীল বসিয়ে দিয়ে বল্লেন "ঠিক আছে। তোকে দিয়ে হবে, এই চিঠি দিলুম, গেলেই হয়ে যাবে।" ঢুকে পড়লুম। এখানে সকলেই দেশী। দেশী বললেও ঠিক হবে কি না জানি না, "ধুতির উপরে সার্ট", তাতে আবার পাঞ্জাবী হাতা। মন খারাপ হ'য়ে গেল, এ আবার কি! গাড়ী ঘোড়ার চিহ্ন কোথাও নাই, বরং রাস্তা এমন ঋজু যে গাড়ীই অনেক সময়ে মানুষের উপর দিয়ে যায়। কোনও রকমে সুখে দুঃখে দিন কেটে যাচ্ছে, এমন সময় বিদ্যাসাগর মশায়ের দ্বিতীয় ভুল আমার চাকুরী জীবনে অমাবস্যা এনে দেয় আর কি!

কাজদিব্যি করছি,কিন্তু মফঃস্বলের লোক সহরের হালচাল ঠিক রপ্ত হয় নি। একদিনকাজ প্রসঙ্গেশাদাকে শাদা বলায় মহা হুলস্থুল। শেষে বাঙ্গালীর সনাতন পন্থা "আজ্ঞে হাঁ" বলে কোন রকমে ফাঁড়া কেটে যাওয়ায় এখন অনন্যমনা হয়ে কাজ কর্ম্ম করছি। সহরের ঘোলাটে ধোঁয়ায় আর পা দিই না, অবসর সময়ে খবরের কাগজ পড়ি, বিশ্ব-রাজনীতির পোষাকী চর্চ্চা করি। মহাযুদ্ধের প্রথম অধ্যায় শেষ হয়েছে! সারা দুনিয়ায় ন্যায়ের সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। বিশ্বজাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জেনিভার বুলেটীন পড়ি। সারা জগতের নারীহরণ ও নারী-দেহ-ব্যবসা বন্ধের জন্য দুনিয়াময় তোলপাড় ও প্রচেষ্টা, শিশুমৃত্যুর হার কমান, সামাজিক দুষ্টব্যাধির বংশ ধ্বংস, শ্রেষ্ঠজাতির ক্ষুদ্র জাতির উপরে অত্যাচারের যবনিকাপাত। আমার গ্রাম্য শাদা মন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো, মনে হোল এই ত "নামিয়া আসিছে ঐ ন্যায়ের দণ্ড, রুদ্র দীপ্ত মতিমান," দেহ ব্যাপৃত রইল আমার ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর ক্ষুদ্র কাজে, কিন্তু মন তখন উইলসনের চৌদ্দ দফা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়্‌লো, ক্রমে ক্রমে ক্লেমেসোঁ, লয়েড জর্জ্জ, হিণ্ডেনবার্গ, মার্শাল ফচ্‌, দাদাদিয়ের কথা মনে এল। ভার্সাইল, জেনিভা, লোকার্ণ, লোকার্ণর জলে ডুবে গেল। সামনে ভেসে উঠল রুজভেল্ট, হিটলার, ষ্টালিন, মুসোলিনি, চার্চ্চিল ও তোজো। ঘটনা প্রবাহে হোহেনজোলার্ণ, হাপ্‌সবার্গ, আলফান্সো ও অটোমান বংশ ভেসে গেল। ফটোগ্রাফীর মতন প্রতি পরদার ঘাত-প্রতিঘাতে নূতন এসে পুরাতনকে নিয়ে গেল। মিথ্যা এসে আদর্শকে পরাভূত করল। নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা নিষ্ঠাকে বিসর্জ্জন দিল।

এর পরের দৃশ্য সে এক জীবন্ত স্বপ্ন! দানবীয় মায়ার খেলা, মানুষ কি করে অমানুষ হ'য়ে যায়—১৯৪৩ সালের মায়াময়ী কলিকাতায় তা দেখতে হল।

শোনা যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যত লোক মারা গিয়েছে তার দেড়গুণ লোক বিনা যুদ্ধে খেতে না পেয়ে কাব্যের ধনধান্যপুষ্পেভরা শস্য শ্যামলা বাংলাদেশে কুকুর শেয়ালের মতন মৃত্যুর ক্রোড়ে ঢ'লে পড়ল, চোখের সামনে দেখছি—ক্ষীণ কটিদেশে বস্ত্রশূন্য উলঙ্গপ্রায় লক্ষ মৃত্যু-পথ-যাত্রী "দুটিভাত" "ভাতগো" করে রাজপথে চীৎকার করে বেড়াচ্ছে। বলতে লজ্জা হয়, তারই পাশ দিয়ে, উপর দিয়ে সুবেশ সুবেশা নরনারী হাস্যলীলাময় কৌতুকচ্ছন্দে সিনেমা থিয়েটারে যাতায়াত করছে—কিম্বা ফুটপাথের পাশেই আলোকোদ্ভাসিত ভোজনালয়ে দলে দলে ঢুকছে, বেরুচ্ছে। সামনেই বিনা প্রশ্নে, বিনা চিকিৎসায়, বিনা খাদ্যে লোক মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়ছে। কোনও সুসভ্য দেশ কি এমনটা কল্পনা করতে পারেন? তবুও এরা বাক্যে, ভাবে এবং সর্ব্ববিধ উপায়ে অহিংস রয়েছে। সহস্র সহস্র বৎসরের তামসিক অহিংসা প্রচারের চরম পরিণতি এই দৃশ্যে। এর অপর দিক আরও জঘন্য। লোক-সেবার নামে নানা প্রতিষ্ঠান গড়া হল—আর সেবাভাণ্ডারের অন্ধ ছিদ্রপথে সা প্রদত্ত আহার্য্য কালা বাজারে আশ্রয় পেলে, ধনী হাজার মণ চাউল গুদামজাত রেখে দুই দশ ২।৩।৪।৪ টাকা লঙ্গরখানা খুলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও সস্তায় দাতাকর্ণ সাজবার ফিকির এই দেশেই সম্ভব করে তুলল। বন্ধু

বান্ধবকে দশগুণ দামে চাউল বেচে দুর্দিনে অর্থ বিনিময়ে আহার্য্য দিয়ে সাহায্য করবার ভান দেখাল। এরাও মানুষ এবং সমাজের উচ্চস্তরে আজও এরা আনন্দ করে বেড়াচ্ছে। অন্য দেশে এর শতাংশর একাংশ হলেও রক্তবন্যা বয়ে যেত।

চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে লঘু বিশ্বাসী মন আবার নেচে উঠল। সমুদ্রের অপর পার হতে খবর এল—অ্যাটল্যান্টিক চার্টার এবং V. N. R. R. A। U.N.R.R.A. যুদ্ধের সর্ব্বহারাদের ক্ষুধায় অন্ন দেওয়ার প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে এবং পৃথিবীতে সমানাধিকার ও ন্যায়ের বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আটলান্টিক চার্টার স্বাক্ষরিত হয়েছে। তামসিকতায় সুপ্তদেহও রোমাঞ্চিত হল। ভাবলাম বুঝি বিড়ালের ভাগ্যে এবার সত্যিই শিকা ছিঁড়ল। অবশেষে জানা গেল, আটল্যান্টিক চার্টার একেবারে মায়া—হয় নাই স্বাক্ষরই। আর U.N.R.R.A. ভারতের কালা-আদমীদের জন্য নহে। সবই মায়া, মায়া প্রপঞ্চে, অদৃষ্টে সবই মায়ার খেলা। ধন্য শঙ্করাচার্য্য, মায়াবাদ শুধু আমাদেরই দাও নাই—পাশ্চাত্য দেশও মায়াবাদী। আজ সানফ্রানসিস্কোতে নূতন রাষ্ট্র সংঘের বনিয়াদ নাকি গড়া হচ্ছে, নূতন সংঘ নাকি সমস্ত পৃথিবী হতে অন্যায় অত্যাচার দূরীভূত করে, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবে। সারা পৃথিবীর রেডিয়ো যখন এই নূতন আদর্শ বিঘোষিত করছে তখন ক্ষীণকণ্ঠে এক ভারতীয় নারীর আকুল ক্রন্দন শোনা গেল, অর্দ্ধ পৃথিবীকে অন্ধ তমসায় আবৃত রাখলে এই মিথ্যার মুখোস তৃতীয় মহাযুদ্ধ খুলে দেবে। তবে কি—তাই ভাবতে ভাবতে পথ চলছিলাম—বিদ্যাসাগরই কি মায়া! আদৌ আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মশায়ের জন্মই কি হয়নি? না তাঁর শিশুশিক্ষার সকল শিক্ষাই মায়া-কাজলে ভরা? গ্রামের কোণে যে শিক্ষা তাঁর এই ক্ষুদ্র পুস্তক দিয়েছিল—"সদা সত্য কথা বলিবে" বোধ হয় ইহাই মায়া, গ্রাম্য ছেলেকে মায়াজীবন ধরে এই মায়ার পিছনে দৌড় করিয়ে শেষ করে ছাড়ল।

বিয়ে

শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী

বিয়েটা ভেঙে গেল!

অথচ রাধারাণী নিজে থেকেই এক রকম পেড়েছিলো কথাটা সেদিন।

বিকেলে বেড়াতে এসেছিলো শান্তিলতা বন্ধুর বাড়ী। রাধারাণী অভ্যর্থনা করলে—এসো ভাই, এসো। ঘরের কাজ-কর্ম সব মিটলো?

মেঝের উপর ব'সে পড়ে হাসতে হাসতে শান্তিলতা উত্তর দেয়—সংসারে কাজের কি আর শেষ আছে ভাই? ভালো লাগছিল না, তাই পালিয়ে এলুম একটু তোমার কাছে।

[illegible]য়িত হ'য়ে রাধারাণী বলে—তা বেশ করেছো। [illegible], বসো।

তারপর এ কথা সে কথায় এসে প'ড়ে—ছেলে মেয়ের বিয়ের কথা। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রাধারাণী অভিযোগ করে বন্ধুর কাছে—নীলুটা তো দিন দিন বড় হ'য়ে উঠছে। বিয়ের কোন ব্যবস্থা হ'লো না এখনও পর্য্যন্ত। আমারই হ'য়েছে যতো দায়।

সান্ত্বনা দেয় শান্তিলতা—ওর জন্যে ভেবো না। নীলিমা তোমার কতো গুণের মেয়ে, রূপও আছে। ওর আবার বিয়ের ভাবনা।

—তাই ব'লে হাত-পা গুটিয়ে ব'সে থাকলে তো চলবে না। চেষ্টা তো করা দরকার। নয় কি ব'লো?

—তা তো বটেই। আমার বিনু তো এবার আবার একটা পাশ ক'রলে। ভাবছি ওকে আর পড়াবো না। এবার একটা বিয়ে থাওয়া ক'রে সংসার করুক। কি ব'লো?

রাধারাণী শান্তিলতার আরো কাছে সরে এসে উৎফুল্ল হ'য়ে বলে—বেশ তো, তাহ'লে আমার নীলিমাকেই নাও

না কেন তুমি! ও তোমার বিনয়ের কিছুমাত্র অনুপযুক্ত হবে না একথা আমি জোর ক'রেই ব'লতে পারি। নীরু আমার কতো কাজের মেয়ে দেখেছো ত তুমি?

—তুই কি পাগল হ'লি রে রাধু! নীলু কেমন মেয়ে, তাকি আমার জানতে বাকী আছে! সাহস ক'রে কথাটা তোর কাছে এ্যাদ্দিন ব'লতে পারিনি, কী জানি কি বলবি সেই ভয়ে। মুখটা তো তোর ভাল নয়। রসিকতা ক'রে হাসে শান্তিলতা।

খুশীতে ঝলমলিয়ে ওঠে রাধারাণী। শান্তিলতার পিঠে দুম্ দুম্ ক'রে কয়েকটা কীল মেরে ব'লে—ওঃ, আমি যেন রাত দিন লোকের সংগে কেবল কোমর বেঁধে ঝগড়া ক'রে বেড়াই না? দেখো বেয়ান, এ সব কথা ভবিষ্যতে আর কোন দিন বললে ভাল হবে না ব'লে রাখছি।

—ইস্! খারাপটাই বা কি এমন হবে শুনি? দু'মাস ফাঁসী আর তিন মাস জেল, না দ্বীপান্তর?

—না ভাই, ছেলে মানুষী ক'রো না। গম্ভীর হ'য়ে ওঠে রাধারাণী। কথায় ব'লে জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে……… বিয়ের কথা নিয়ে রসিকতা করা উচিৎ নয়। দেনা পাওনার কথাটা সেরেই ফেলা যাক্, কি ব'লো?

—দেনা পাওনা আবার কিসের? তোমার মেয়ে-জামাইকে তুমি যা দেবে আমি তাতেই খুশী। এটা চাই, ওটা চাই, এ সব বায়না আমার নেই।

—তা হ'লেও একটা……

বাধা দিয়ে শান্তিলতা ব'লে—না রাধু না—আর কোনও কথা নয়। আগামী সোমবার পাকা দেখার ব্যবস্থা ক'রো।

রাধারাণী খুশী মনেই রাজী হ'য়ে যায়।

* * *

কিন্তু আজ হঠাৎ আবার বেঁকে বসে রাধারাণী।

দরজার কাছ থেকে চীৎকার ক'রতে ক'রতে শান্তিলতা বাড়ী ঢোকে।—বলি ও বেয়ান, বেয়ান ঠাকরুণ……

ঝাঁঝাল সুরে উত্তর দেয় রাধারাণী—কি? বলি আমি কালা না কি, যে অমন ষাঁড়ের মতন চেচাচ্ছো?

শান্তিলতা দু'পা পেছিয়ে ব'লে—বাবা, এ যে একেবারে মিলিটারী মেজাজ!

—হ্যাঁ, সব সময় ন্যাকামী আমার ভাল লাগে না অতো। সঙ্কুচিতভাবে শান্তিলতা বলে—কিন্তু আজ যে আশীর্ব্বাদের দিন খেয়াল আছে সে কথাটা?

গম্ভীর হ'য়ে রাধারাণী উত্তর দেয়—না এ বিয়ে হবে না।

আকাশ থেকে পড়ে শান্তিলতা—মানে?

—মানে তোমার ছেলের সংগে আমার মেয়ের বিয়ে আমি দোব না। বুঝলে? ঝাঁঝিয়ে ওঠে রাধারাণী।

—তার তো একটা কারণ আছে কিছু! আম্‌তা আম্‌তা ক'রে শান্তিলতা।

—কারণ আবার কি! তুমি বিয়ে দেওয়ার নাম ক'রে সকলের পুতুলগুলোকে মেরে দাও। ফেরত দাও না আর কোন দিন। আমার সুন্দর পুতুলটা তোমাকে বিলিয়ে দেওয়ার জন্যে কিনে দেননি বাবা। বুঝলে? সুতরাং আমি তোমার সংগে বিয়ে দোব না। ভাগ্যিস্ অনুটা ঠিক সময় ব'লেছিলো তাই রক্ষে। নইলে……কি চোর মেয়েরে বাবা। বিচিত্র একটা মুখভঙ্গি ক'রে অন্যত্র প্রস্থান করে রাধারাণী।

গুম্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে শান্তিলতা। এত বড় অভি-যোগের বিপক্ষে একটা কথাও বার হয় না তার মুখ দিয়ে।

ঋতু-সন্ধি

শ্রীভাস্কর দেব

ফাগুনের আলাময় ছন্দে
প্রাণ ওঠে নাচিয়া আনন্দে;
বসন্ত রসে ছল ছলকি
নব-যৌবন মন-বনে এলো কি?
মলয়ার মালতীর গন্ধে!
মনে বনে কোন রঙে রাঙ্‌লো
কোন অজানার হিল্লোল লাগ্‌লো
উচ্ছ্বাস বাঁধ বুঝি ভাঙ্‌লো
দুর্ব্বার উছল তরঙ্গে।
নীপ-শাখে বাঁধো সখি হিন্দোল
ওরে কবি বীণা তোর বেঁধে তোল্
পৌষালি ফাল্গুন বন্ধে।

দেবদত্ত

শ্রীপূরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

প্রত্নতত্ত্ববিভাগের শ্রীপূরাপ্রিয় রায়
কর্তৃক লিখিত ভূমিকা

সে আজ অনেক দিনের কথা—যখন আমি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগে কার্য করিতাম—তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের কোনও স্থানে একটি ক্ষুদ্র বিহারের ও তৎসন্নিকটস্থ একটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আমাদিগের বিভাগের বড়কর্ত্তা হিউবার্ট সাহেবের নজরে পড়ে। তিনি এই স্থান যে খনন করা আবশ্যক তাহার যৌক্তিকতা দেখাইয়া খননের আদেশ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে দু-একটি নিদর্শন, যাহা তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা একটা বিশাল ধ্বংসের সামান্য চিহ্নমাত্র। তিনি স্বয়ং এইস্থানের খনন কার্যের তত্ত্বাবধানে চলিলেন। আমি তাঁহার খাস-সহকারী বা Personal Assistant এবং প্রাচীন-লিপিবিৎ অর্থাৎ Epigraphist সুতরাং আমাকেও তাঁহার সঙ্গে যাইতে হইল।

পথের কষ্টের কথা আর বলিয়া কাজ নাই—আর সব কথাও ঠিক মনে নাই—আমাদের ব্যক্তিগত সেই সকল ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের কাহিনী পাঠকের বড় ভালও লাগিবে না।

আমাদের কার্যক্ষেত্রের অদূরে, একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী তীরে আমাদের বাসোপযোগী পটমণ্ডপসমূহ রচিত হইল। আমাদের কুলি, কেরানি, ওভারসিয়ার, ফোটোগ্রাফার, অধ্যক্ষ, সহকারী অধ্যক্ষ, সকলেই জুটিলেন। বিজন প্রান্তর এই বিপুল জনসমাগমে পুরশ্রী ধারণ করিল।

আমি বড় সাহেবের খাস-সহকারী—অনেক কাজ আমাকেই করিতে হয়। তবে লিপিতত্ত্ব সম্বন্ধে কার্যাদি এবং উৎখাত ও আবিষ্কৃত নিদর্শন সমূহের বিচার করিবার সময় আমাকে মাঠে ঘুরিয়া, রৌদ্রে পুড়িয়া ও বৃষ্টিতে ভিজিয়া সাধারণ খনন কার্যের তত্ত্বাবধান হইতে অব্যাহতি পাইতাম। প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের লিপিতত্ত্ব আমার জানা আছে—প্রাচীন লিপি আমি পড়িতে জানি—প্রাচীন ইতিহাস আমার আলোচ্য—এবং প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের ভাষাতত্ত্বের সহিতও আমি পরিচিত। এই সব ব্যাপারের আলোচনায় আমার শ্বেতাঙ্গ প্রভু তাঁহার সম্মান খর্ব করা আবশ্যক মনে করেন না। আমি যখন তাঁহার ক্ষুদ্র সহকারী তখন তাঁহার মনে হয় যে এই ক্ষুদ্র বিষয়সমূহে আমার কর্ত্তব্য সীমাবদ্ধ। আমাদের বিদেশী কর্ত্তাদের জ্ঞানের পরিধি যতই স্বল্পপরিসর হউক না কেন, সমুদ্র পারে আসিয়া তাহা হঠাৎ বাড়িয়া যায়। সপ্ত সমুদ্র পার হইয়া উৎকর্ষ লাভ করে—এইরূপ একটা প্রবাদ আছে। বিদেশ হইতে আগত শ্বেতাঙ্গদের জ্ঞান ও বুদ্ধি সম্বন্ধেও বোধ হয় তাহা প্রযোজ্য। ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় পদার্পণ করিলেই এই সকল ভেকার্ভকের লাঙ্গুল খসিয়া যায়।

এই খনন কার্য আরম্ভের কিছুদিন পরে, একদিন অপরাহ্নে আমার তাঁবুর মধ্যে বসিয়া উৎখাত ভাস্কর্য্যের কয়েকটি নিদর্শন পরীক্ষা করিতেছিলাম, এমন সময় সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

আমি তাঁহার তাঁবুতে গিয়া দেখিলাম যে তিনি খনন কার্য সম্বন্ধীয় একরাশি আলোকচিত্র পরীক্ষা করিতেছেন। আমি আসিলে তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন। আমি একখানা চেয়ার টেবিলের ধারে টানিয়া আনিয়া বসিলাম।

আমি বসিলে সাহেব সেই আলোকচিত্রগুলি টেবিলের একদিকে সাজাইয়া রাখিয়া বলিলেন "দেখ রায়, বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বিশদভাবে আলোচনার যোগ্য অনেক বস্তু ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। ঐ দুই নম্বর টেবিলটার উপর যে সকল দ্রব্য দেখিতেছ তাহার সবই এই ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত।"

আমরা উভয়ে ঐ টেবিলের সম্মুখে গেলাম। টেবিলে যে সকল দ্রব্য সজ্জিত ছিল তাহার মধ্যে একটি প্রস্তর রত্নাধারের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন—

"এই রত্নাধারটি বোধ হয় সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। ইহার উপরে একটি লেখা আছে। তাহা তোমার আলোচ্য। এই উপরের প্রস্তরাচ্ছাদনের মধ্যে একটা স্ফটিকের আধার—তন্মধ্যে একখানি ভূর্জ্জপত্রের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। উপরের এই লেখা এবং পুঁথির লিপি ও ভাষা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ যদি এখন দিতে পার, তাহা হইলে তাহা আমি আমার প্রাথমিক অনুষ্ঠান তালিকায় নিবদ্ধ করিতে পারি। এই রত্নাধারটি আবিষ্কৃত কক্ষের মৃত্তিকার নিম্নে এই পিতলের পেটিকা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হইয়া প্রোথিত ছিল। পিতলের আচ্ছাদনটি বোধ হয় পুঁথিখানিকে জল ও বায়ু হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছিল কোনও রূপে বায়ুনিষ্কাশন করিয়া উপরের এই ধাতব আচ্ছাদনটি দেও

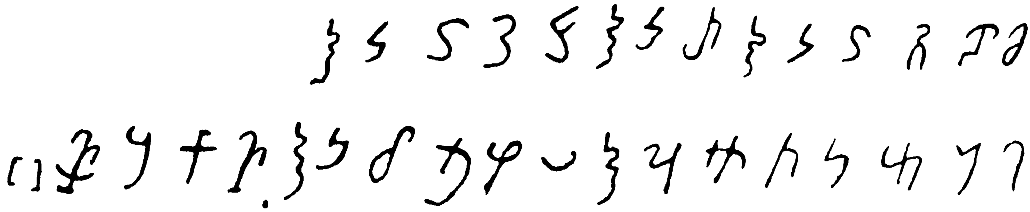
হইয়াছিল। কারণ, যখন আমি এই উপরের আচ্ছাদনটি খুলিতে চেষ্টা করিতেছিলাম তখন ইহাতে ছিদ্র করিবামাত্রই বায়ু প্রবেশের শব্দ হইয়াছিল। এইরূপ সাবধানতার সহিত বন্ধ করিয়া রাখিবার জন্যই বোধ হয় সেই সুপ্রাচীন কাল হইতে এই পুঁথিখানি জল এবং বায়ুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া আসিতেছে।"

আমি সেইখানে বসিয়া সেই রত্নাধার ও পুঁথিখানির একটা প্রাথমিক পরীক্ষা আরম্ভ করিলাম। পিতলের বহিরাবরণে কোনও প্রকার চিহ্ন বা লিপি নাই। পিতলের আচ্ছাদনের নিম্নে প্রস্তরের রত্নাধারের উপর কোনও প্রকার চিত্র বা কারুকার্য্য নাই। ইহা চতুষ্কোণ, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ও গম্ভীরতায় এক ফুট। ইহার গাত্রে একটি খোদিত লিপি আছে। আধারটি মর্মর প্রস্তরে নির্মিত। উপরের লিপিটি সীমান্ত প্রদেশের প্রাকৃত ভাষায়, খরোষ্ঠী অক্ষরে, দুই ছত্রে লিখিত। যথা* :—

দিন, অনেক স্থানে, বহুগ্রন্থ ঘাঁটিয়াছি ; অতীতের এমন সাক্ষ্য, এমন সুসৌষ্ঠবসম্পন্ন অবস্থায় আর কখনও আমার নয়নগোচর হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে উত্তর সীমান্তে রচিত খরোষ্ঠী অক্ষরে লিখিত কোনও সম্পূর্ণ গ্রন্থের সহিত কেহ পরিচিত ছিলেন না। লিপিতত্ত্ব ও প্রত্নবিজ্ঞানের দিক হইতে ইহা যেমন অপূর্ব্বদৃষ্ট, তেমনি সমসাময়িক আখ্যায়িকার হিসাবে ঐতিহাসিক জগতে এই অমূল্য নবীন অভ্যুদয় সত্যের আলোকে প্রোজ্জ্বল ও ভাস্বর।

গ্রন্থারম্ভ

যিনি অতুল রাজ্যসম্পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক জগতের মঙ্গলকল্পে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি জগতের দুঃখে ব্যথিত হইয়া আষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা জনসমাজে প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, সত্যের আলোক যাঁহার

১
২


ইহা আমি এইরূপ পাঠ করিলাম :—

১ উষভদাতস পুতস দেবদাতস

২ অরখিত পটিএস মগবিয়ুতস কথানকং

অর্থাৎ "ঋষভদত্তের পুত্র অরক্ষিতপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মচ্যুত দেবদত্তের কাহিনী।" সমগ্র গ্রন্থখানি এই এক ভাষায় ও অক্ষরে লিখিত। লেখক দেবদত্ত তাঁহার আত্মজীবনী বিবৃত করিতেছেন। বাহ্লিক বা বাক্‌ট্রিআনায় যবন রাজ্যের অবসানসময়ে বা তাহার অব্যবহিত পরে যোনরাজ হের্মাইঅসের রাজত্বকালের শেষপাদে বা তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল। এবং উক্ত রাজ্যের পতনের সমসাময়িক কাহিনী এই গ্রন্থে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

সাহেবকে এই কথা জানাইলাম। তিনি তাঁহার আসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন এবং পুঁথিখানি লইয়া একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া বলিলেন—

"ইহা ছাপান যাউক—তুমি ইহার একটা রোম্যান্ † লিপ্যন্তর প্রস্তুত কর।"

লিপ্যন্তর করিবার সময় আমি ইহার একটা বঙ্গানুবাদও প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলাম। সাহেবের অনুমতিক্রমে তাহা এখন প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিলাম। এই অনুমতি প্রদানের জন্য আমি সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞ।

পুঁথিখানির অনেক বিশেষত্ব আছে। ভূর্জ্জপত্রে লিখিত এত দিনের পুঁথি এমন সুরক্ষিত অবস্থায় আর কখনও আমি দেখি নাই। অনেক

হৃদয়কে প্রথম উদ্ভাসিত করিয়াছিল, সেই লোকনাথ, সম্যক্ সম্বুদ্ধ ভগবান্ সিদ্ধার্থ গৌতমকে স্মরণ করিয়া আমার পাপমলিন ক্ষুদ্র জীবনের সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছি।—যাহা লিখিতেছি তাহা সত্য—জ্ঞাতসারে কখনও তাহার অপলাপের চেষ্টা করি নাই। আমার ঘৃণিত জীবনের সকল লজ্জার ও হীনতার কাহিনী জনসমাজে প্রচারিত হইয়া আমার অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করুক।

গন্ধার রাজ্যের পুরুষপুরনগরে যোনরাজ হেরময়ের প্রথম সংবৎসরে বৈশাখের শুক্লাষ্টমীর প্রথম যামার্দ্ধে আমার জন্ম হইয়াছিল। আমার পিতা একজন সমৃদ্ধিশালী গৃহপতি * ছিলেন। তিনি অতি ধার্ম্মিক বৌদ্ধ ছিলেন এবং যথানিয়মে উপসোথাদি † পালন করিতেন।

নির্ম্মলসলিলা কপিষা আমাদের সৌধপাদ ধৌত করিয়া প্রবাহিতা হইত। নিদাঘ সূর্য্যাস্তের তরল পীত রশ্মি কপিষার স্নেহধারা উচ্ছ্বসিত বক্ষে তাহার দিনান্তের শয়ন রচনা করিত, আমরা তাহা বাতায়নে বসিয়া দেখিতাম। সুদূর দিগন্তের পর্ব্বতমালা হইতে মুক্ত বায়ু আসিয়া দেবতার আশীষের ন্যায় আমাদের ললাট স্পর্শ করিয়া যাইত—পরপার হইতে বনফুলের সংবাদ লইয়া আসিত। কতদিন আমরা দুইজনে—আমি এবং

* দক্ষিণ হইতে বামে পাঠ করিতে হয়।— সঙ্কলয়িতা।

† ভারতীয় বর্ণমালার সমশব্দজ্ঞাপক সমাত্র ইংরাজী অক্ষর

* গৃহস্থ।

† বৌদ্ধধর্ম্মানুমোদিত উপবাস। বৌদ্ধগণ প্রতিমাসে চারিদিন উপবাস করিয়া থাকেন।

আমার ভগ্নী চিত্রলেখা—সেই বাতায়নে বসিয়া নিদাঘের প্রদোষছায়ায় ম্লানায়মান দূরের ক্ষুদ্র পার্ব্বত্যপল্লীটির দীপজ্বালা দেখিয়াছি—কতদিন দেখিয়াছি পল্লীবাসী সদ্ধর্ম্মীগণ কর্ত্তৃক সেই কপিবার পরপারে তটভূমির পল্লীস্তূপটি আরত্রিক আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে—চিত্রলেখা ও আমি—সেই বাতায়নে বসিয়া দেখিতাম—কত কথাই আমরা কহিতাম!—সেদিন চলিয়া গিয়াছে—দিন চলিয়া যায়, কিন্তু স্মৃতি রাখিয়া যায় কেন? বলিতে পার?—যদি চলিয়া যায় ত' সব লইয়া যায় না কেন? সুখ চলিয়া গেলে তাহার পদরেখা মুছিয়া যায় না কেন?

আমার পিতা বৌদ্ধ হইলেও, দৈবজ্ঞ আমাদের গৃহে আসা-যাওয়া করিতেন। "মিথ্যা দৃষ্টি" সম্বন্ধে সম্যক্ সম্বুদ্ধের নিষেধ থাকিলেও গন্ধারের গৃহপতিগণ শুভমুহূর্ত্ত গণনা হইতে বিরত হইতেন না। শ্রমণগণও ভগবান্ বুদ্ধের উপদেশ বিস্মৃত হইয়া ফলিত জ্যোতিষের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও অর্হৎগণ বৌদ্ধগৃহীদিগের নিকট একই রূপে সমাদৃত হইতেন। আমার জন্মমুহূর্ত্তের শুভাশুভ নির্দ্ধারণের জন্য পুরুষপুরবিহারের অর্হৎপাদ আর্য্য মহাস্থবির স্বয়ং খড়ি পাতিয়াছিলেন। আমার জন্মনক্ষত্রাদি পর্য্যালোচিত হইয়া একখানি জন্মপত্রিকাও রচিত হইয়াছিল।—সে গণনা যদি আজ আমার বাস্তব জীবনে ফলিয়া যাইত তাহা হইলে শকস্থান হইতে সাগরবিধৌত কেরল-গিরি পাদমূল এবং পূর্ব্বে শস্যশ্যামলা বিহগকুজিতা সামতটিকার শেষপ্রান্ত অবধি বিশাল সাম্রাজ্য আমার করতলগত হইত। কিন্তু আমার ভাগ্য-গণনাকালে আর্য্য অর্হৎপাদের সুতীক্ষ্ণ ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি বোধ করি কিঞ্চিৎ আবিল হইয়া পড়িয়াছিল। হয়ত তাহাতেই আমার ভাগ্যের সব কথা ফলিল না। আজ আমি অদৃষ্টচক্রের উপরে উঠিতে গিয়া নিম্নে পড়িয়া গেলাম।—জগতের রথচক্র ঘুরিয়া গেল—আমি নিষ্পেশিত হইলাম। মহাস্থবির মহাশয় নাকি পিতাকে বলিয়াছিলেন যে আমার মত সুলক্ষণ-সম্পন্ন জাতকের ভাগ্যগণনা আর কখনও তিনি করেন নাই। আমি নাকি দেশপূজ্য হইব—আমার দ্বারা সদ্ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে—আমি নাকি যবনের অত্যাচার দূর করিয়া এক বিশাল শান্তিময় রাজ্য স্থাপনে সফলকাম হইব। আমার পিতামাতাও আর্য্য মহাস্থবিরের কথায় একেবারে দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছিলেন। কিরূপে তাঁহারা এত বড় অত্যুক্তিদুষ্ট কথাটায় যে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহা আজ আমি আমার জীবনের এই নিরাশ রৌদ্রতপ্ত মরুপথে দাঁড়াইয়া অনেকবার চিন্তা করিয়া থাকি—বুঝিতে পারি না—কেবল তাঁহাদের সেই অচিন্তিত সারল্যের কথা ভাবিয়া মনে মনে হাসিয়াছি।

ভগ্নী চিত্রলেখা আমার অপেক্ষা প্রায় তিন বৎসরের ছোট। পিতামাতার আদর ও যত্নে আমাদের দিন বেশ কাটিয়া যাইতে লাগিল। [illegible]টা বেশ সুখের এবং বড় সহজ ও সরল বলিয়া মনে হইত। আমার বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখন হইতে আমার শিক্ষা আরম্ভ হইল। আমার সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার ভার একজন শ্রমণ ও একজন যবনের হস্তে অর্পিত হইল। আমার পিতা এবং তাঁহার বন্ধু ও আমাদের প্রতিবেশী পালক শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তাঁহারা উভয়ে আমায় শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিলেন। পিতৃবন্ধু পালকের একটি পুত্র ছিল প্রজ্ঞাবর্দ্ধন, সেও আমার সহিত শস্ত্রশিক্ষা করিত। তাঁহাদের শিক্ষকতায় আমি চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সে স্বদেশের ও বিদেশের ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ও শস্ত্রবিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলাম। যাবনিক ভাষায়, সাহিত্যে ও দর্শনে আমার ব্যুৎপত্তি অসাধারণ ছিল এবং অনেক যবনের অপেক্ষাও যে প্রগাঢ়তর ছিল তাহা অনেকে স্বীকার করিতেন। ভগ্নী চিত্রলেখা বড় হইলে তাহার সাধারণ শিক্ষার ভার মাতা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেবল চিত্রকলা ও সঙ্গীত শিক্ষার জন্য একজন যবনীকে রাখিতে হইয়াছিল।

আমার বয়স যখন অষ্টাদশবর্ষ এবং চিত্রলেখা যখন পঞ্চদশবর্ষ অতিক্রম করিতে যাইতেছে, তখন একদিনের ঘটনা আমার মনের উপর একটা গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। হিমঋতুর পুঞ্জীভূত কুয়াশা যেমন তুষার-পাতের সূচনা করে, তেমনি এই সামান্য ঘটনায় আমাদের ভাগ্যবিপর্য্যয় আনয়ন করিয়াছিল। সেইজন্যই বোধ হয় তাহা আমার স্মৃতিফলকে এমন সুস্পষ্ট ভাবে আজও খোদিত আছে। ভগ্নী চিত্রলেখা রূপলাবণ্যে ও শিক্ষায় অসামান্যা ছিল। আমার যাবনিক শিক্ষক ডেমিট্রিঅস্ চিত্রলেখাকে যাবনিক ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে ও অধ্যয়নে অনেক সময়ে সাহায্য করিতেন এবং তাহার অধ্যয়নে সাহায্য করিতে ডেমিট্রিঅসের বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত।

সেদিন সন্ধ্যার সময়ে পিতা আমার সহিত আমাদের বাটীর প্রাঙ্গণে পাদচারণ করিতেছিলেন। প্রাঙ্গণটি বেশ প্রশস্তই ছিল এবং নদীতীরে অবস্থিত বলিয়া প্রাতঃসন্ধ্যায় এ স্থানের বায়ু বড় স্নিগ্ধ ও মধুর অনুভূত হইত। পিতা ও আমি কথা কহিতে কহিতে ইতস্ততঃ বেড়াইতেছিলাম, এমন সময়ে আমাদের একজন ভৃত্য আসিয়া পিতাকে সংবাদ দিল—

শিক্ষক ডেমিট্রিঅস্ আপনার সহিত নির্জ্জনে দেখা করিতে চাহেন।

—বেশ, এইখানে আসিতে বল।

ভৃত্য বিদায় হইল। ক্ষণকাল পরে ডেমিট্রিঅস্ ধূমকেতুর মত সশরীরে আসিয়া দেখা দিলেন।

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন "কি সংবাদ, ডেমিট্রিঅস্?'

পিতার সহিত আমি আছি দেখিয়া ডেমিট্রিঅস্ তাঁহার বক্তব্য বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। পিতা তাহা বুঝিয়া বলিলেন—

দেবদত্তকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইবার কোনও কারণ নাই। যে কথা তুমি আমাকে বলিতে পার, তাহা দেবদত্তকে শুনাইতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।

ডেমিট্রিঅস্ দুই-চারিটা ঢোক্ গিলিয়া, মুখ তুলিয়া একবার পিতার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর চক্ষু নামাইয়া লইয়া বলিলেন—

"আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সকল সুখ দুঃখ আপনার একটি কথার উপর নির্ভর করিতেছে। আমি—আ—মি আপনার কন্যা চিত্রলেখাকে বিবাহ করিবার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি।"

পিতা যেন একটু চমকিত হইলেন—নিমেষের জন্য তাঁহার নয়নে

যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল—কিন্তু পরক্ষণেই আপনাকে সংযত করিয়া যবনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

বিবাহের আবেদন?—অনুমতি প্রার্থনা?—তবে কি চিত্রলেখাকে এ বিষয় ইতিপূর্ব্বে জানাইয়াছ?—তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছ?

—না, তাঁহার মত লওয়া হয় নাই—তবে তাঁহার অমত হইবে না—ইহা নিশ্চয়।

—কেন অমত হইবে না?—কি করিয়া তাহার মন জানিতে পারিলে?—অমত না হইবার এমন কি কারণ থাকিতে পারে?—তোমার প্রার্থনা অনুমোদনের কোনওরূপ আভাষ তাহার নিকট পাইয়াছ?

—না।

—তবে?

—আপনি আপনার কন্যার জীবনের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন—ইহাতে তাঁহার কি অমত হইতে পারে? আপনাদের দেশের গৃহপতিগণ পুত্র-কন্যার বিবাহ বিষয়ে তাহাদের মতামত গ্রহণ করা অনেক সময়ে কর্ত্তব্য মধ্যে গণনা করেন না।

—কিন্তু, অনেক সময়ে তাহা তাঁহারা করিয়া থাকেন। আমার কন্যা বয়স্থা—আমি এ বিষয়ে তাহার মতামত গ্রহণ না করিয়া কিছু বলিতে বা করিতে পারি না।—তাহার পর আর কি?—আর কিছু কি তোমার বলিবার আছে?

—আর আমি গ্রীক্—হেলেনীয়।

পিতা দৃপ্ত নেত্রে একবার ডেমিট্রিঅসের মুখের দিকে চাহিলেন। বলিলেন—

"হ্যাঁ, আর তুমি গ্রীক্—হেলেনীয়! কিন্তু মনে পড়ে গ্রীক্?—পুরুষপুরের রাজপথ যখন তোমার গৃহ ছিল—দুইটি অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া অবশেষে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলে—সেদিনের কথা কি ইহার মধ্যেই ভুলিয়া গিয়াছ? সে দুর্দ্দিনে কে যবনকে আপনার গৃহে স্থান দিয়াছিল?—কে তাহার মুখে অন্ন দিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছিল?—সেদিনের কথা আজ স্মরণ নাই? না? গ্রীক্ কি এত শীঘ্রই উপকার ভুলিয়া যায়? যখন এক্‌বাতানার কারাগার হইতে পুরুষপুরে পলাইয়া আসিয়াছিলে তখন যদি আমার গৃহে আশ্রয় না পাইতে—আমার অন্ন তোমার ভাগ্যে না জুটিত—তখন কোথায় যাইতে?—কি হইত?—তাহা কি কখনও একবার মাত্রও ভাবিয়াছ গ্রীক্?—হাঃ—হাঃ—হাঃ—তুমি গ্রীক্। গ্রীক্ হইলেই কি তুমি মনে কর যে তুমি আমার কন্যার উপযুক্ত হইবে?—আমি যবনের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব না।—আমার কন্যাকে বিবাহ করিবার মত তোমার কি আছে? যে অর্থ আজ তুমি উপার্জ্জন করিতেছ তাহা তোমার আপনারই পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে—তবে আবার আর একজনকে জুটাইতে চাহ কেন? আর মনে আছে কি গ্রীক্,রাজদ্বারে এই কর্ম্ম আমিই তোমাকে করিয়া দিয়াছিলাম?—বিবাহ করিতে চাহ? বেশ, তুমি গ্রীক্—নগরে যবনীর অভাব নাই—একটা দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিয়া ফেল—কেহ বাধা দিবে না। হাঃ—হাঃ—হাঃ—গ্রীক্!"

—না, উপহাস করিবেন না—গ্রীক্—হেলেনীয়—কখনও বর্ব্বরের উপহাসের পাত্র হইতে পারে না।—আপনি বর্ব্বর—হেলট্*—গ্রীক্ সাম্রাজ্যের প্রজা মাত্র—তবুও আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক—আমি তাহাকে ভালবাসিয়াছি।

—কেন? বর্ব্বরের নিকট—হেলেটের নিকট—একদিন যে উপকার পাইয়াছিলে তাহার প্রত্যুপকারস্বরূপ বোধ হয়?—রক্ষা কর, আর তোমার অত কৃতজ্ঞতায় কাজ নাই। বর্ব্বর তোমার সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিবে না।

—কিন্তু, আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন যে আপনি গ্রীক্‌রাজ্যের একজন বর্ব্বর প্রজা; আর আমি হেলেনীয়—গ্রীক্। আপনার কন্যাকে যে আমি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, ইহা ত আপনার সৌভাগ্য বলিতে হইবে।—আর উপকারের কথা যাহা আপনি বলিতেছেন, সে ত আপনার কর্ত্তব্য আপনি করিয়াছেন।—প্রত্যেক রাজভক্ত প্রজার উচিত যে রাজকীয় জাতির সকল প্রকার অসুবিধা দূর করা। আপনার গৃহে আমি দিন-কয়েকের জন্য অবস্থান করিয়াছিলাম,তাহা আপনার ভাগ্যের কথা নয় কি?

—ভাগ্যের কথা বই কি!—দূর হইয়া যা যবন আমার সম্মুখ হইতে!—পথের কুক্কুর!—নীচ!—অকৃতজ্ঞ! ওরে কে আছিস্? এই বিদেশী কুক্কুরটাকে গলা টিপিয়া আমার গৃহ হইতে বাহির করিয়া দে!

পিতা ডাকিবামাত্র আমাদের একজন ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। ডেমিট্রিঅস আর সেখানে দাঁড়াইয়া পিতার সহিত তর্ক করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি নিষ্ফল আক্রোষে, রোষকষায়িত লোচনে একবার পিতার মুখের দিকে চাহিলেন, পরে ধীরে ধীরে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। ভৃত্যও তাঁহার অনুসরণ করিল।

তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘন হইয়া আসিতেছিল। দিনান্তের শেষ রশ্মি ম্লানায়মান আকাশের গায়ে অনেকক্ষণ মিলাইয়া গিয়াছিল; কিন্তু দিগন্তের রক্তিমরাগ তখনও সম্পূর্ণ নিভিয়া যায় নাই। কপিশার ধূসর দেহলতা তখন মলিন হইয়া আসিতেছিল। নিদাঘের স্বল্পক্ষণস্থায়ী প্রদোষের স্বর্ণাভা নিশিথিনীর ঘননিবিড় ছায়ায় তখন ধীরে ধীরে ঢাকিয়া যাইতেছিল।

আমরা আর বেড়াইলাম না। পিতা আমাকে ডাকিয়া লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে যবন সংবাদ নামক প্রথম বিবৃতি।

[ক্রমশঃ

* গ্রীক্‌গণ বিদেশীয়গণকে বর্ব্বর ও গ্রীক্‌ভিন্ন প্রজাবর্গকে হেলট্ আখ্যা দিতেন।

মিশরের ডায়েরী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

(৬)

২রা অক্টোবর—১৯৪৪

ফারোকী সাহেব আজ এগারটার সময় ওয়াই-এম-সি-এতে এসে আমাকে ব্রিটিশ কনসালের অফিসে নিয়ে গেলেন। পথে তিনি তাঁর জীবন-কাহিনী ব'লে গেলেন। তিনি রাজপুতানার অধিবাসী এবং বিগত যুদ্ধের সময় ব্রিটিশের আর্ম্মিতে যুদ্ধ করেছিলেন ও সেই অবধি তিনি পারস্যে র'য়ে গেছেন। পারস্যে তিনি একটি ভারতীয় সমিতি স্থাপন করেছিলেন, এখনও তেহেরাণে সেই সমিতি রয়েছে। তিনি অত্যন্ত তীব্র ভারতীয়। তিনি বল্লেন—১৯৪২ সালে তিনি হায়দ্রাবাদ থেকে বকরতউল্লা স্বাক্ষরিত একখানি আমন্ত্রণ পত্র পেয়েছিলেন—ইণ্ডিয়ান মুসলিম এসোসিয়েসনের সম্পাদকরূপে তিনি যেন মিশরে পাকিস্থান সমর্থক মুসলীম লীগ স্থাপন করেন। ফারোকী সাহেব উত্তরে বকরতউল্লাকে পাকিস্থানের উদ্দেশ্য এবং পাকিস্থানের পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেন। তারপর বকরতউল্লা ফারোকী সাহেবের সঙ্গে আর পত্রালাপ করেন নি। ফারোকী সাহেব বল্লেন—বকরতউল্লার পত্রখানি এখনও তাঁর কাছে আছে।

আমরা প্রায় সাড়ো এগারটার সময় ব্রিটিশ কন্‌সালের অফিসে এলাম। যথারীতি আমার পাশপোর্ট রেজেষ্ট্রী হ'ল। ফারোকী সাহেবকে ব্রিটিশ কন্‌সাল অফিসের প্রায় সকলেই চেনে। কারণ তিনি প্রবাসী ভারতবাসীর কন্‌সাল সংক্রান্ত সমস্ত কাজেই উৎসাহের সঙ্গে সাহায্য করেন। আমার পাসপোর্ট রেজেষ্ট্রীর পর কন্‌সালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। ভারতবর্ষে যেমন বিরাট অফিস, সাজসজ্জা, বিলাস-বিভ্রম বিলাতী সাহেবেরা উপভোগ করেন, এখানে তার এক চতুর্থাংশও নয়। কন্‌সাল, আমার পরিচয় পেয়েই বল্লেন,—তিনি আমার আগমনের সংবাদ পেয়েছেন। ভারতবর্ষের অতি সূক্ষ্মাতিতম সংবাদও বৈদেশিক বিভাগের জালে ধরা পড়ে। আমার মত নগণ্য শিক্ষার্থীর আগমনবার্ত্তা কন্‌সাল দপ্তরের বন্ধন থেকে অব্যাহতি পায় নি। তিনি আমাকে অতি শান্ত এবং সুমিষ্ট ভাষায় আমার আগমনের উদ্দেশ্য এবং বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা ক'রলেন। আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে আমার পরিচয় দিয়ে, আমার একটি বাসস্থানের সন্ধান দেওয়ার জন্য অনুরোধ ক'রলাম। তিনি বুদ্ধিমানের মত ঈষৎ মস্তক সঞ্চালনের পর মন্তব্য করলেন যে, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত। কোন মুখ্য ভারতবাসীর সঙ্গে তিনি আমার পরিচয় করিয়ে দিতে অপারগ। কারণ মিশরে ভারতবাসীরা একাধিক দলে বিভক্ত। যদি আমাকে প্রফেসর নারু-দি পামিষ্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, তবে মিঃ গণেশিলাল দি-জুয়েলার অসন্তুষ্ট হবেন। অবশ্য একটু পরেই বল্লেন—আমি যেন তাঁর সংস্পর্শে থাকি। তাহলে তিনি আমার বাসস্থানের জন্য চেষ্টা ক'রবেন। ফারোকী সাহেবের মুখের দিকে লক্ষ্য করলাম, কারণ বিদেশে ভারতীয়দের এই বিবাদ বিসম্বাদের সংবাদ একজন ইংরেজের মুখে শ্রুতিমধুর নয়। আমি কন্‌সালের অফিস ত্যাগ ক'রে বাইরে এসে ফারোকী সাহেবকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—এই ভদ্রলোক কি কখনও ভারতবর্ষে ছিলেন? উত্তর পেলাম—ব্রিটিশ ভদ্রলোক জাপান কর্ত্তৃক মালয় থেকে বিতাড়িত, অধুনা মিশরস্থিত ভারতীয়দের, তথা তৎসম জাতীয়দের ভাগ্যবিধাতা ব্রিটিশ কন্‌সাল; অধিক বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

বিকাল পাঁচটার সময় মিঃ মহীউদ্দিন আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন, তাঁর কাছে ভারতীয়দের সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পেলাম। তিনি বল্লেন—বিদেশে ভারতবাসীরা ভারতীয়দের নিরাশ্রয়তা ও পরাধীনতার গ্লানি অত্যন্ত বেশী অনুভব করে এবং যে সব ভারতবাসী ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বিদেশে আসেন, তাদের অর্থ স্বাচ্ছল্য এবং বিলাস জীবন দেখে বিদেশীরা মনে করে ভারতের ঐশ্বর্য্য প্রচুর। অনেক সময়ই তারা অনেক গ্লানিকর কাজ করেন, যার বিবরণ অত্যন্ত অপমানকর—বক্তা এবং শ্রোতার উভয়ের পক্ষে।

আমরা সাড়ে পাঁচটার সময় মিঃ দয়ালদাসের 'ইণ্ডিয়াতে' এলাম। তিনি তাঁর উপরের ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরখানা অতি মাত্রায় ভারতীয়। সম্মুখে বুদ্ধদেবের ধ্যান মূর্ত্তি, পার্শ্বে ক্ষুদ্রাকৃতি আগ্রার তাজমহল, প্রাচীরগাত্রে অজন্তার চিত্রাবলী। বিক্রয়ের জন্য সুসজ্জিত রয়েছে ঢাকা, বেনারেস, মোরাদাবাদ, মহীশূর, সিংহল প্রভৃতি বিখ্যাত স্থানের দেশীয় উপাদানে, দেশীয় হস্তে প্রস্তুত দ্রব্যাবলী। মনে হ'ল ভারতের কোন বিখ্যাত নগরীর সুসজ্জিত বিপণিতে ভারতের খণ্ডিতাংশ স্থানান্তরিত হয়েছে। মিঃ দয়ালদাস হিন্দি বলতে পারেন না। তাঁর ভাষা ফরাসী, আরবী, গ্রীক এবং ইংরাজী। তিনি একজন গ্রীক মহিলার পাণিগ্রহণ ক'রছেন। তাঁর বিরাট

ব্যবসায়ের শাখা আফ্রিকার বহু নগরীতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু তিনি মনে প্রাণে এবং কার্য্যে ভারতীয়। কিছুক্ষণ স্বাগত সম্ভাষণ ও আলাপ আলোচনার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম,—প্রফেসর নারু-সি পামিষ্টের পরিচয়। তিনি সন্দিগ্ধনেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলেন—আপনি তাকে কি করে চেনেন? আমি তখন ব্রিটীশ কন্‌সালের সঙ্গে আলাপের বিবৃতি দিলাম। তিনি কন্‌সালের সম্বন্ধে যা বল্লেন, তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। নারুর সম্বন্ধে ব'ল্লেন,—ক্রমশঃ এই ভারতীয় বীরের পরিচয় পাবেন। মিঃ দয়াল দাস খুব চতুর এবং বয়সের তুলনায় যথেষ্ট অভিজ্ঞ। আমরা আটটার সময় বাংলার দুর্ভিক্ষের কিঞ্চিৎ আলোচনা ক'রে সুবিশাল রাজপথ দিয়ে আলোর খেলা উপভোগ ক'রতে ক'রতে ওয়াই-এম-সি-এর পথ ধরে চল্লাম। অনেক দিন পরে কলকাতার অন্ধকারের রাজত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে কায়রোর আলোর মন্দিরে এসে বেশ অভিনবত্ব ভোগ ক'রলাম। সাড়ে আটটার সময় ওয়াই-এম-সি-এতে ফিরে এলাম। মিঃ মহীউদ্দীন বল্লেন—আল্-আজহর বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে এখনও দেরী আছে। তিনি আমাকে পরের দিন রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডাঃ হাসানের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দেওয়ার জন্য কায়রোর উপকণ্ঠে গির্জাতে নিয়ে যাবেন। তারপর তিনি বিদায় নিলেন।

৩রা অক্টোবর, '৪৪

সাড়ে আটটার সময় মিঃ মহীউদ্দিন আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ হাসানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য এলেন। আমরা ট্রাম ধ'রে চলেছি; আমার কায়রোতে ট্রাম চড়ার এই প্রথম অভিজ্ঞতা। এখানকার ট্রামে একটি, দুইটি অথবা তিনটি গাড়ী। প্রতি গাড়ীতে প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণী আছে, মহিলাদের জন্য পৃথক কেবিনের বন্দোবস্ত র'য়েছে, অবশ্য তাঁরা ইচ্ছা ক'রলেই পুরুষের কেবিনে আসতে পারেন। কিন্তু বিপরীত নীতি নিয়মবিরুদ্ধ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পুরুষ, নারী এক সঙ্গেই বসেন। প্রথম শ্রেণীতে অতি সূক্ষ্ম বেতের কাজ করা কুশান। কোন পাখার বন্দোবস্ত নাই, প্রয়োজনও হয় না। কতকগুলো দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী রয়েছে কুলীগাড়ীর মতন। পাশে কোন আবরণ নাই, ছারপোকা অত্যন্ত শক্তিশালী, অতি পুরু গরম কাপড়, গরম জামা সত্ত্বেও তা'দের দংশনের তীব্রতা অনুভব করা যায়। কণ্ডাক্টরের বাঁশী দ্বারা যাত্রা এবং স্থিতি নিয়ন্ত্রিত হয়। ট্রামে ভীড়। আমাদের দেশ অপেক্ষাও অনেক বেশী, কিন্তু কলিকাতার ট্রাম মিশরের ট্রাম অপেক্ষা সুন্দর এবং সুপরিচালিত। ট্রামের কণ্ডাক্টর বেশী অভদ্র নয়, কিন্তু প্রায়ই বিদেশীয়দিগকে পয়সার বিনিময়ে প্রতারণার চেষ্টা করে। টিকিটের মূল্য কলকাতার চতুর্গুণ। সহরের কেন্দ্রস্থল থেকে গিজার উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর ভাড়া (যাতায়াতের) ১।৴৹, দূরত্ব ৮ মাইল। টিকিট পাঞ্চ করার নিয়ম নাই। এক ফার্লং দূরে দূরে লেখা রয়েছে, "মাহত্‌তাতা—ষ্টেশন।" এখানকার যানবাহনের গতি দক্ষিণমুখী (বাই-দি-রাইট)। অবশ্য পৃথিবীর সব জায়গায়ই যানবাহন নিয়ন্ত্রিত হয়—বাই দি রাইট—একমাত্র ব্রিটীশ সাম্রাজ্য ছাড়া। এখানে ড্রাইভারের পাশে যাত্রীরা প্রায়ই ভীড় ক'রে দাঁড়ায়; অনেক সময় স্কুলের ছেলেরা ট্রামের ছাদে বসে। মহিলাদের সম্মানার্থ প্রায় কেহই তার আসন ত্যাগ করে না। অবশ্য বৃদ্ধাকে দেখে কেহ কেহ ভদ্রতা করেন, কিন্তু তরুণীকে দেখে শিভাল্‌রি দেখাবার প্রথা এখানে অচল।

আমরা চ'লেছি সহরের সর্ব্বাপেক্ষা সুবিশাল রাজপথ শারাহ্ ফোয়াদ দিয়ে (শারাহ্ শব্দের অর্থ পথ)। দুই পাশে অতি উচ্চ অট্টালিকা—বৈজ্ঞানিক স্থপতির নিয়মানুসারে নির্ম্মিত, সুরুচিপূর্ণ সজ্জায় বিভূষিত। প্রায়ই বিপণিশ্রেণীর দ্রব্যসম্ভার ইচ্ছুক এবং অর্দ্ধ-ইচ্ছুক ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং লোভ জন্মায়। আমি দুই পাশের পথ ও বিপণিশ্রেণী লক্ষ্য ক'রে চ'লেছি, মাঝে মাঝে মিঃ মহীউদ্দিন অট্টালিকার ইতিহাস অথবা বিশেষত্ব জানিয়ে দিচ্ছিলেন। অকস্মাৎ আমাদের ট্রাম একটি স্বল্পসলিলা স্রোতস্বিনী অতিক্রম ক'রে চ'ল্ল। মিঃ মহীউদ্দিন ব'ল্লেন,—এই নীল নদের শাখা। আমি চমকিত হ'লাম—এই নীল নদ! নীল নদের জল মোটেই নীল নয়, অত্যন্ত বালুকাপূর্ণ, তরঙ্গচিহ্ন মাত্র নাই। আমার হঠাৎ মনে প'ড়ল, মিঃ এ-এন-মিত্র (চানু বাবু) আমাকে ক'লকাতায় বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর মিশর ভ্রমণের সময় নীলনদ দেখে সব চেয়ে বেশী নিরাশ হ'য়েছিলেন। নীলের নামের সঙ্গে একটু রোমান্স জড়িয়ে আছে, কিন্তু এই অ-নীল, অ-স্বচ্ছ, নিস্তরঙ্গ, জলধারা সম্পূর্ণ বৈচিত্র্য-বিহীন। আমি বিশেষ চিন্তা করার পূর্ব্বে নীলের শাখার সেতু অতিক্রম ক'রে এলাম। শাখার পাশ দিয়ে চ'লেছে মিউনিসিপাল পার্ক। দেখলাম আমরা,—স্বাস্থ্যবান সুস্থ, জীবন্ত শিশুর দল খুব উৎসাহের সঙ্গে পার্কে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাছেই বিরাট বৃক্ষশ্রেণী, সমস্ত পথের এক দিকটাকে ছায়াচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।

আমরা প্রায় ন'টা কুড়ির সময় ডাঃ হাসানের বাড়ীর কাছে এলাম; মিঃ মহীউদ্দিন ব'ল্লেন—ডাঃ হাসান অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের সাড়ে নয়টায় সাক্ষাতের সময় নির্দ্ধারিত হ'য়েছে। সুতরাং আমরা একটু পরেই যাব। মিঃ মহীউদ্দিন আমাকে নিকটবর্ত্তী বিরাট প্রাসাদগুলি ও গৃহস্বামীদের কিছু কিছু পরিচয় দিচ্ছিলেন। একটু দূরেই তিনি মিশরের একজন প্রাক্তন

রাজদূতের অট্টালিকা দেখিয়ে ব'ল্লেন,—ইনি পূর্ব্বে বম্বেতে মিশরের রাজদূত ছিলেন। তাঁর গৃহে একটি মিউজিয়ম র'য়েছে—তার সমস্তই ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থপতি, শিল্প, চিত্র, মুদ্রা এবং পুস্তকাবলী। তিনি গর্ব্ব করেন যে, ভারতীয় মুসলমানগণ তাঁকে এই সমস্ত ভারতের সম্পদ বিদায়ের দিনে স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ উপহার দিয়েছেন। মিঃ মহীউদ্দিন অত্যন্ত দুঃখ করে বললেন যে, এই আতিথ্য ও সৌজন্ত ভারতীয়তার পরিপন্থী। ভারতের গর্ব্বের জিনিষ, ভারতের বাহিরে আতিথ্যের চিহ্নস্বরূপ দান করাও অত্যন্ত গ্লানিকর। মিশরীয়গণ এভাবে ভারতের প্রাচীন নিদর্শনগুলি স্থানান্তর করাকে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় মনে করেন। মিঃ মহীউদ্দিন ব'ল্লেন,—বিগত যুদ্ধের পর একজন ইংরাজ মিশরে অবস্থানকালেই বহু শিল্পসামগ্রী সংগ্রহ করেন। কিন্তু তিনি যখন ইংলণ্ডে ফিরে যেতে চাইলেন, মিশর-রাজ তাঁর সংগৃহীত মিশরের গৌরবসূচক প্রত্যেকটি জিনিষ মিশরে রেখে দিলেন। সেই সংগ্রহাবলী বর্ত্তমানে "করাৎলী-পাশা" মিউজিয়ম নামে বিখ্যাত। মিঃ মহীউদ্দিন বেশ উৎসাহী ভারতবাসী এবং তাঁর আত্মসম্মানজ্ঞান আছে। তিনি বল্লেন—ভারতের মুসলমানরা যদি কোন লোক আরবী ভাষায় কথা বলতে পারে এবং নিজেদের আরব বংশধর, অন্ততঃ বহির্ভারতের মুসলমান ব'লে পরিচয় দিতে পারে, তবে কোন কোন মুসলমান ভারতবর্ষের সম্পদ আতিথ্যের চিহ্ন স্বরূপ তার হস্তে অর্পণ ক'রতে দ্বিধা বোধ করেন না। তিনি কয়েকটি বহির্ভারতীয় মুসলমানের অতি উচ্চ পদে নিয়োগের উদাহরণ আমাকে দিলেন। তার মধ্যে বোধ হয় হায়দারাবাদ এবং কল্‌কাতা মাদ্রাসারও উদাহরণ দিয়েছিলেন।

আমরা ঠিক সাড়ে ন'টার সময় ডাঃ হাসানের গৃহে এলাম। ইলেকট্রিক লীফ্‌টে উঠে তিন তলায় উঠ্‌লাম। অটোমেটিক লিফ্‌টে কোন কণ্ডাক্টর থাকে না। ভিতরে প্রবেশ করে চাবি টিপে যথা ইচ্ছা যাওয়া যায়। তারপর আবার দরজা বন্ধ করে চাবি টিপে দিলেই লীফ্‌ট নীচে গিয়ে যথাস্থানে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে অটোমেটিক লীফ্‌টের প্রচার খুব কম। আমরা কলিং বেল টিপে দাঁড়াতেই একজন হাবসী বেয়ারা এসে সেলাম ক'রল এবং "আই-ওয়া" ব'লে আহ্বান ক'রল। ডাঃ হাসানের অভ্যর্থনাগৃহ অতি পরিপাটি সজ্জিত। লাউঞ্জ, গালিচা, টেলিফোন, পিয়ানো, বৈদ্যুতিক ঝাড়, প্রাচীর চিত্র ইত্যাদি সামগ্রী গৃহস্বামীর অর্থ-স্বাচ্ছল্যের পরিচয় দেয়। ডাঃ হাসান মিঃ মহীউদ্দিনের কাছে আমার পরিচয় পেয়ে আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। তিনি বেশ ইংরাজী বলেন এবং বহু বৎসর লণ্ডনে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর পাঠাগারে এলাম। পুস্তকের বাহুল্য নাই, বহিরাবরণ দেখে মনে হ'ল পুস্তকগুলি কথঞ্চিৎ বিলাসের সামগ্রী। তিনি আমাদের জন্ত "কাহোয়া" অর্থাৎ কফির আদেশ করলেন। পনর মিনিটের মধ্যেই রূপার ট্রেতে ক'রে চিত্রিত চীনামাটীর পেয়ালায় অতি স্বচ্ছ, পুরু গ্লাসে জল সমেত কফি নিয়ে হাবসী ভৃত্য আমাদের অভ্যর্থনা করল। আমরা প্রায় দেড় ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় আলোচনা করলাম, তিনি এই সময়ের মধ্যে অন্ততঃ দশ বার বার টেলিফোন কল পেলেন। তখন কায়রোতে নিখিল আরব কন্‌ফারেন্সের ধুম চলেছে। সমস্ত আরবদেশীয় প্রতিনিধি কায়রোতে উপস্থিত হয়েছেন। নাহাস পাশার মন্ত্রিত্বে ডাঃ হাসান একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহুবার আলোচনার অভ্যন্তরে উঠে যেতে বাধ্য হ'লেন। তিনি বল্লেন - শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রীর অফিস থেকে তিনি আমার মিশর আসার সংবাদ পেয়েছিলেন। আলেকজেন্ড্রিয়ার ভারতীয় ট্রেড কমিশনার মিঃ এনামুল হক্ আমার বিষয় মিশর গভর্ণমেন্টের সঙ্গে পত্রালাপ করেছেন। তিনি আমার বাসস্থান সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং বল্লেন—আমি যদি রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হই, তবে আমার লাইব্রেরী ব্যবহার করা, বাসস্থান এবং আরবী শিক্ষা করার সুযোগ সুবিধা বেশী হবে। তিনি জানালেন,—একটি প্রাচ্য ছাত্রাবাস "বায়েৎ-উৎ-তালাবৎ-উস্-সারকি-ইন্" নামে রয়েছে, আমি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিই তবে আমার বাসস্থানের আর কোন অসুবিধা হবে না। আমি কোন সুনিশ্চিত উত্তর না দিয়ে ডাঃ হাসানের কাছে বিদায় নিলাম, কারণ এই ছাত্রাবাস দরিদ্র বিদেশী ছাত্রদের জন্ত নির্দ্ধারিত।

প্রায় এগারটার সময় আমরা ওয়াই-এম্-সি-এ উদ্দেশ্যে ট্রাম ধরতে এলাম। অন্ত রাস্তা দিয়ে চলেছি। মিঃ মহীউদ্দিন বল্লেন—এবার আমরা সত্যিকারের নীলের উপর দিয়ে যাব, দশ মিনিট পর ইংলিশ ব্রীজের পাশ দিয়ে চ'লেছে আমাদের ট্রাম—দূরে দেখছি, নীলের বুক চিরে উঠেছে সোনালি ফসল। মিঃ মহীউদ্দিনের ব'ল্লেন—ঐ দেখা যাচ্ছে জজিরাৎ-উজ জাহাব (সোনার দ্বীপ); নীলের বুকে স্থলবিশেষে এই সোনালী ফসল জমে উঠে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলিতে গম, ইক্ষু অন্তান্ত প্রকার সজী চাষ করা হয়, অপর পার্শ্বে আছে খর্জ্জুর বৃক্ষ-শ্রেণী। সমস্ত গাছের মাথায় র'য়েছে সোনার টোপর, মাঝে মাঝে ঝ'রে প'ড়ছে দু'চারটি মুক্তাফল। এদেশের খেজুর ভারতবর্ষের খেজুরের তুলনায় অতি বৃহৎ; খেজুর গাছ কেউ কাটে না, তার রসও তুলে নেয় না। সুতরাং গাছগুলি খুব সবল এবং ফলগুলি খুব বড়।

পুনর্নব

বাণীকুমার

(রূপিকা)

চৈত্রের রজনী-শেষে জাগে মধুমাধবের বাণী,
আগ্রহে আকুল চিতে পুরাতন ক্ষুব্ধ অভিমানী,—
মরণের পথে যাত্রা জীবনের অস্তাচল-পানে,—
পুনর্নব রূপে তা'র উদ্বোধন জাগ্রত বিমানে।···

—পুরাতন বর্ষ ধরণীর সঙ্গে সকল খেলা শেষ ক'রে জীর্ণবেশে তুষার-শুভ্র জটাজালে মুখ ঢেকে এবার চলেছে মরণের উপকূলে। বিদায়-বেলায় ঘূর্ণি-ঝড়ে ধূলিজালে আকাশ-জল-স্থল ভ'রে দিয়ে সে শান্তিরমাধুরীকে করেছিল হরণ···তা'র রাজত্বে আলোক-চোরা ক্লিষ্ট অন্ধকারের শাসন জেগে উঠেছিল। এখন তা'র দিন ফুরিয়েছে। বসুন্ধরার বুকের মধ্যে কম্পন তুলেছে চিরঞ্জীব নবযৌবনের বিজয়-রথের ঘর্ঘর-ধ্বনি।—ঐ চেয়ে দেখো : প্রাচী-দিগঞ্চল থেকে ধীরে ধীরে স'রে যাচ্চে মুক্তিকুণ্ঠ পরবশতার আঁধার-আবরণ। পূর্ব্ব-ভুবনের দ্বারে এসে পৌঁচেছে নবজাগরণের বার্ত্তা। প্রাণঘাতী বিষ-বাষ্পে প্রাচীর বন্দীযৌবন এতোদিন হতচেতন হ'য়েছিল, আকাশে লেগেছিল তন্দ্রার ঘোর। কিন্তু প্রাচীনের বিদায়-মুহূর্ত্তে ভুবনের মর্ম্মে মর্ম্মে জেগে উঠেছে নবীন প্রাণের স্পন্দন।

মানস। সে সংবাদ পৌঁছে গেছে আকাশে-বাতাসে, গ্রামে, বনে বনান্তরে, ভবনে ভবনে। জরাজীর্ণ পুরাতনের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে নবীনের হবে আবির্ভাব। জয়ধ্বজা উড়িয়ে শঙ্খনিনাদে সে আসবে এই পূর্ব্ব-ধরণীর প্রাঙ্গণে।

কবি। দেখো—দেখো : হাতে একটি আলোর দীপ নিয়ে কে এগিয়ে আস্‌ছে ?

মানস। কে বলো তো ? যেন পথ চল্‌তে দিশাহারা হ'য়ে পড়েছে ঐ নবাগতা ! অঞ্চলে আবৃত দীপ-হাতে প্রাণলক্ষ্মীর আগমন।

কবি। কোথায় চলেছ গো তুমি ? এই আলো-ছায়ায় অস্পষ্ট পথে কি এগিয়ে চল্‌তে পারবে ? হাতে রয়েছে একটি প্রদীপ—তা'ও দুর-দুরাশার ধোঁয়ায় মলিন···এই ক্ষীণ আলোতে পথ চিনবে কেমন ক'রে ?

প্রাণলক্ষ্মী। আমার পথের খোঁজ আমি জানি। তবে আমার দুঃখ এই যে : আমার আলো গেছে হারিয়ে, সেই স্মৃতিটুকু বুকের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখ্‌বো ব'লে এই দীপ জ্বালিয়ে রেখেছি—এই দীপের শিখায় ঘরে ঘরে জ্বলে' উঠ্‌বে মঙ্গল-দীপালী।

কবি। তোমার পরিচয় কি ?

প্রাণলক্ষ্মী। আমি প্রাণলক্ষ্মী।

মানস। প্রাণলক্ষ্মী : তুমি যে আপন লুপ্তসত্তা ফিরে পাবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছ—সে-বার্ত্তা দিকে দিকে পৌঁছে গেছে। কিন্তু এ-কি তোমার বেশ ! তোমার কালো চোখ দু'টি রুক্ষচুলে আড়াল ক'রে রেখেছ কেন ! তোমার ললাটের চন্দ্রলেখা অযত্নে যেন ম্লান হ'য়ে গেছে। তোমার কেমন যেন একটা বিহ্বলভাব অনুভব করছি।

প্রাণলক্ষ্মী। আমার এই কুণ্ঠা কেন—কেন আমার এই বিহ্বলতা—তা' কি জানো না ? প্রাচীনকাল তা'র সাক্ষী। আমি কেবল জানি—আমার যাত্রা-পথ আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত বহুদূর। নূতন ক'রে এই তো আমার যাত্রা শুরু হোলো···হিমালয়-বাসিনী আমি—সেখানে আমার সন্তানদের অন্তরে চেতনা জাগাবার জন্যে নিত্য তপস্যা করি—কিন্তু হিমালয়ের সে ডাক সকলের মর্ম্মে গিয়ে সাড়া তোলে না। সেই সঞ্চিত তপঃক্ষেত্র হেমাদ্রি থেকে আমি আসছি কালচক্রের আবর্ত্তনে প্রাচী-ধরিত্রীকে প্রাণ-সম্পদে উজ্জীবিত করবো ব'লে।

কবি। তোমার এ কল্যাণ-কাজ সফল হোক্—প্রাণলক্ষ্মী ! কিন্তু তোমার কণ্ঠের বাণী অশ্রু-ব্যথায় ভ'রে রয়েছে···নিজেকে ক'রে রেখেছ কুণ্ঠিতা···তোমার রুক্ষ কেশপাশ অতৃপ্তির বিদ্রোহী বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে ··তোমার বন্ধুরপথে পায়ে পায়ে লাগ্‌ছে প্রস্তর-কঙ্করের বাধা। তুমি তো অন্নপূর্ণা-রূপিণী, তবু নবীনের বোধন-দিনে তুমি অন্নপূর্ণার বেশে দেখা দিলে না কেন ?

প্রাণলক্ষ্মী। এখন এই আমার সাজ···এই দৈন্যের সাজই আমার অঙ্গে তুলে দিয়েছে আমার সন্তানরা। তবে জেনো কবি : এ সাজ আমার চিরদিনের নয়। স্বর্গলোককে ম্লান ক'রে আমার জয়মন্ত্রের গুণে সুভাস-শালী নববর্ষ নায়ক-রূপে ধরার বৈভব প্রকাশ ক'রে তুলবে—বাড়িয়ে দেবে দরিদ্রের গৌরব। আমার সোনার নূতন কালে অমরার স্বর্ণবৃষ্টি করবো ধরার এই অঙ্গনে।

কবি। কি মধুর তোমার অন্তর ! আপনার দৈন্যের ছল ক'রে নিজেই নিজের দানে পূর্ণ হ'য়ে রয়েছ। কি অপূর্ব্ব মহিমা।

ওগো পূজারিণী—আসিয়াছ তুমি ক্ষুধার বার্ত্তা পেয়ে—
শোণিত-সিক্ত পথে—যেথা' রয় শুষ্ক-পাত্রায় ছেয়ে।
তাপসীর বেশে এসেছ যে তুমি সাজি' দুখিনীর সাজে,
দুঃখের শতদল 'পরে তব লক্ষ্মী-মুরতি রাজে।
বিষাদ-দিগ্ধ নয়নে তোমার জ্বলৎ অগ্নি হেরি,
রুক্ষ তোমার কুন্তলভার বিছানো গগন ঘেরি'।
শূন্যের ঐ অঞ্জন 'পরে জ্বালায়েছ দীপালিকা,
ভবনে ভবনে জ্বেলে দিক্ দীপ তারি' মঙ্গলশিখা।

প্রাণলক্ষ্মী। এই প্রতিষ্ঠার জন্যেই তো চিত্ত-রাজ্যে নবজীবনের অভিসার আরম্ভ হয়েছে। অতি-সাবধানে অন্তর-প্রদীপ জ্বালিয়ে আমি এগিয়ে চলেছি কঙ্কর-বিকীর্ণ পথে নিজেকে সঙ্গোপনে রেখে—তাই আমার

চারিধারে সংশয়-তমসার ঘন আবরণ। শত দুঃখেরি সাধনায় সোনার ফসল ফলে' ওঠে—তাই তো আমার এই তপস্যা। এই তপস্যায় ভগবান্ আকৃষ্ট হ'য়ে শূন্য, রিক্তকে পূর্ণ ক'রে তোল্‌বার শক্তি দেন।

মানস। সে শক্তি তোমার সহজাত—সৃষ্টিকর্ত্তার অমিত দান···সেই পরম দানের কোনো অংশ তুমি নিজের জন্যে রাখো না—সমস্তই নিঃশেষ ক'রে দিয়ে যাও বসুন্ধরার কল্যাণে। কিন্তু তুমি লোভের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ—লালসার যেন তৃপ্তি নেই—যাদের তুমি যতো বেশী দিয়েছ—তাদের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা দিনে দিনে বেড়ে উঠ্‌ছে। এমনি ক'রেই তুমি নিজেকে নিঃস্ব ক'রে তুলেছ—তাই তোমার ভিখারিণীর সাজ, অথচ তোমার অন্তরে অধিষ্ঠিতা অন্নপূর্ণা।

প্রাণলক্ষ্মী। মানসঃ স্বেচ্ছায় আমি যা' দান করেছি—সে দানে গ্রহীতা সন্তুষ্ট না হ'য়ে আমার ভাণ্ডার লুণ্ঠন করছে। সেইজন্য আমার দীনতা ফুটে উঠেছে। এর শেষ আনতে চাই। তাই তো আমি পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নবীনের প্রতীক্ষা ক'রে বসে আছি। সে আসুক্ নব-গৌরবে নব-পৌরুষের উদ্বোধনে—এই অন্যায়ের সে উচ্ছেদ করুক। আমি জগতের মঙ্গল এনে দিই—কিন্তু আমার ঘরে এ কি অভাব, অমঙ্গলের হাহাকার জেগে উঠেছে।

কবি। প্রাণলক্ষ্মী : দুঃখের দিন হয়তো অবসান হবে। তোমার মঙ্গলময়ী মূর্ত্তিখানি আবার সকলে দেখতে পাবে। এই অন্ধকার-সমুদ্রের মধ্যে তুমি শুধু জ্বালিয়ে রাখো একটা আশার পুণ্যশিখা। এই জ্যোতিঃপ্রদীপ অঞ্চলে ঢেকে আধো-আলো আধো-আঁধার-বিলীন জীবন-নদীর তীরে তীরে তোমার গতি—নিদ্রা-মগ্ন ঘরে ঘরে তোমার অচঞ্চল পদধ্বনি বেজে উঠুক্। পথ-দৈত্যের বাধা তোমার অগ্রগতিকে স্তব্ধ করতে পারবে না। রিক্তা ধরিত্রীকে তুমিই করো পরিপূর্ণা নানা দানে। এমনি তোমার দাক্ষিণ্য। তাই তো তোমাকে এই পৃথিবী বরণ ক'রে নিতে উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে।

প্রাণলক্ষ্মী। ধরণী আমাকে চিনেছে আভাসে, কল্পনায়···তাই সে তুলেছে সমবেদনার সুর। কিন্তু এ সমবেদনা আমার পক্ষে অবমাননার নামান্তর। আমার ইচ্ছা—আমার সন্তানরা এই নবীনের অভ্যুদয়ে নূতন পণ নিয়ে প্রাণের অঞ্জলি ভ'রে তুলুক—সেই অঞ্জলিতে আমি প্রীতিমুগ্ধ হবো।···কে আসে বনের ঐ শূন্যপথে? কে ঐ কামিনী? মানস : তুমি ওকে চেনো?

মানস। বোধ হয় আস্‌ছে দিগঙ্গনা—ক্ষুধার অন্ন চাইতে!

প্রাণলক্ষ্মী। দিগঙ্গনা এসেছে ভিক্ষার সন্ধানে?

ভিক্ষা-পাত্র হাতে দীনবেশা দিগঙ্গনার প্রবেশ

দিগঙ্গনা। কোথায় গো—অন্নপূর্ণা : কোথায় তুমি?

প্রাণলক্ষ্মী। কা'কে খুঁজ্‌ছ তুমি?

দিগঙ্গনা। আমি খুঁজ্‌ছি প্রাণলক্ষ্মীকে দিকে দিকে—ভিক্ষার পাত্র হাতে নিয়ে, তিনি পুরিয়ে দেবেন এই শূন্যপাত্র। এই আশা নিয়ে ফির্‌ছি।

প্রাণলক্ষ্মী। আমিই প্রাণলক্ষ্মী। বসুন্ধরার কাছে যাওনি কেন? আমার কাছে তুমি ভিক্ষা চাও? কিন্তু আমাকে যে রিক্ত ক'রে দিয়ে সর্ব্বনেশে দৈত্যের দল।

দিগঙ্গনা। সে কি কথা! তুমিই তো বৎসরে বৎসরে ধরা শূন্য ভাণ্ডার ভ'রে দাও। আর আজ বল্‌ছ কি-না—তুমি রিক্তা! তবে কি তুমি ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দেবে না?

প্রাণলক্ষ্মী। তুমি ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছ কেন? অন্ন পাবে পুরাতনের রাজ্যভার নবীনের হাতে তুলে দেবার আয়োজন হয়েছে।

দিগঙ্গনা। কিন্তু অপেক্ষা কর্‌বার তো আর সময় নেই—প্রাণলক্ষ্মী তোমার দানে ধরণীর প্রাণ বাঁচে। প্রাণের কান্না তুমিই শান্ত করো এখন প্রাচী-রমণীর ভাণ্ডারের দিকে একবার প্রসন্ন চোখে চেয়ে দেখো—করুণাময়ী! ক্ষুধিতকে অন্ন বিলাবার ভার তুমি নাও চিরদিন—আজ তুমি নাও সেই ভার। সকলে বাঁচুক। আমরা আবার কা'র কাছে হাত পাততে যাবো মাথা নীচু ক'রে?

প্রাণলক্ষ্মী। নবীনের আগমন আসন্ন হ'য়ে উঠেছে, আর দেরী নেই হয়তো কিছুক্ষণ কষ্ট পাবে—তবু সইতে হবে সুদিনের প্রত্যাশায়। ক্ষুধা অন্ন ঘরে ঘরে ঠিক সময়েই গিয়ে পৌঁছুবে। তুমি ভেবো না।

দিগঙ্গনা। তোমার দান যতই গোপন হোক্—সকলেই জানবে সে দান প্রাচী-ধরণীকে ক'রে তুল্‌বে সঞ্জীবিত। চারিদিকে উঠ্‌বে তৃপ্তির উল্লাস। আসুক্ নবযৌবনে উদ্দীপ্ত নবীন।

প্রাণলক্ষ্মী। এই নবীনের অভ্যুদয়-কালে ধরিত্রীদেবীর কাছ থেকে জনে জনে পাবে ধান্য-ধন—সে-ই বিশ্বের ক্ষুধা মেটাবে।

দিগঙ্গনা। বুঝেছি—প্রাণলক্ষ্মী : তোমার দান-কার্য্য আরম্ভ হ'য়ে গেছে। ভূমিগর্ভে তোমার দাক্ষিণ্যের প্রসাদ-সুধা ঢেলে দিয়েছ অত্যন্ত সাবধানে অকৃপণের মতো। তোমার মায়ামন্ত্রের কি গুণ। বসুন্ধরার সম্পদ্ তুমি প্রকাশ করো—দরিদ্রকে দাও মান। আমাদের বসুমতী হোক্ স্বর্ণময়ী। এই আশাতেই বেঁচে থাক্‌বো। প্রস্থান

কবি। এই তিমির-রুদ্ধ ধূলার ঘরে তোমার অমৃত-স্নিগ্ধ হাসি ভারে ভারে সঞ্চিত ক'রে দাও, শুরু হোক্ তোমার অমৃত নৃত্য, সেই নৃত্যের তালে তালে তোমার সন্তানরা নব-প্রাণে জেগে উঠুক্, সকল দৈন্য-দুঃখ খ'সে পড়ুক।

প্রাণলক্ষ্মী। তা'হ'লে চেয়ে দেখো : তোমাদের অন্তরে-বাইরে আজ কিসের গোপন অভিসার! সে অপরিচিত নয়—পূর্ণতার আনন্দ তা'র রূপ। পুনর্নবরূপে তা'র আবির্ভাব।—ঐ শোনো : অদূরে বেজে উঠেছে জাগরণের শঙ্খনাদ বৈশাখের প্রথম দিনে।

কবি। প্রাণলক্ষ্মী—দেখো—দেখো : আকাশের পূর্ব্বদিগন্তে অরুণ-আলো উঁকি মার্‌ছে। অসুরেরা তোমার যাত্রাপথে কত বিঘ্ন রচনা করেছে, এবার সেই বিঘ্ন করো দূর। ওগো কল্যাণী : জগতের কল্যাণে দুঃস্বপ্নের মতো কালো-দৈত্যের হোক্ পরাজয়—তুমি দাও শক্তি নূতন কালকে। আকাশ-পথে তমিস্রার আবরণ ভেদ ক'রে সূর্য্যোদয়ের জ্যোতিঃ জ্বলে উঠুক্—ঘরে ঘরে সেই জ্যোতির প্রসন্ন আলোর হোক্ প্রকাশ। ঐ বুঝি—তা'রি সুরের আবেদন।

গীতবাণী আজি গগন ভ'রে উঠ্‌লো বেজে পরঞ্জয়ের গান

ডেকেছে আজ দিকে দিকে যৌবনেরি বাণ।

ডাক দিয়েছে নবীন জীবন,

অবসাদ আজ লভুক্‌ মরণ,

জাগো প্রাচীর ছেলে-মেয়ে—

জাগো তরুণ-প্রাণ॥

পাগল ক'রে গেছে যা'রা তিমির-দ্রোহীর দল।

নূতন হ'য়ে বাঁচ্‌বে তাদের তপস্যারি ফল।

জীর্ণ এবার বিদায় লবে,

দৃপ্ত নবীন জাগবে ভবে,

শুনিয়ে আলোর বিজয়-বাণী

জাগ্‌বে জ্যোতিষ্মান্‌॥

প্রাণলক্ষ্মী। আমার মন যে চঞ্চল হয়ে উঠলো! জ্যোতির্ম্ময় নবীনের কি অভিগ্রহ আরম্ভ হয়েছে? এখনো তো দৈত্য-প্রবর্ত্তিত পুরাকল্পের প্রভাব শিথিল হয়নি! তা'র কঠিন শাসন অবনত শিরে মেনে নিয়ে আমাকে বৈরাগিনী সাজ্‌তে হয়েছে। তা'র কাল-বৈশাখীর দৌরাত্ম্যে আমার বুক কেঁপে কেঁপে উঠেছে বারংবার। আমার মাঠে মাঠে, গাছের শাখায় শাখায় সব-হারাবার কান্না গুমরে রয়েছে।

কবি। কিন্তু লক্ষ্মী: এ কান্না হাসির উল্লাসে ভেঙে যাবে। তুমি কি জানো না—প্রাচীনের বিদায় নেবার সংবাদ যখন আসে—নবীনের আগমন-বার্ত্তা আকাশে-বাতাসে, ফুলে-ফলে, পাখীর কূজনে প্রচারিত হয়ে থাকে?

প্রাণলক্ষ্মী। আর কতদিন ঝঞ্ঝাহত শূন্য প্রাণ নিয়ে পূর্ণকে পাবার আশায় ব'সে থাক্‌বো—কবি? এ যে ব্যর্থ-জীবনের আশা-পিশাচিকা!

কবি। এ চঞ্চলতা তো তোমাকে শোভা পায় না—প্রাণলক্ষ্মী? সময় যখন আস্‌বে—প্রসাদ-পবন বইবে—পুরাতন কি তখন ব'সে থাক্‌বে তা'র রাজ্যপাট নিয়ে?

প্রাণলক্ষ্মী। আমি সমস্ত জেনেও যেন মনকে বোঝাতে পারি না। পুরাতনের প্রতাপ আমার প্রকৃতিকে শঙ্কায় আকুল ক'রে তুলেছে। আমি তার এই নির্ম্মমতা, এই শূন্যতা দেখ্‌তে পারি না। পুরাতনের রাজ্য-চালাবার রীতি যেন আত্মকেন্দ্রী জীবধর্ম্ম-বিরোধী। একি তা'র স্বার্থান্ধ কঠোর নিয়ম! তা'র কি কিছুতেই মন ওঠে না। অট্টহাসি হাস্‌তে হাস্‌তে কাল-বৈশাখীর ঝড় বইয়ে সমস্ত প্রকৃতিকে স্তব্ধ ক'রে দিয়ে সকল সাজ-সজ্জা দূর ক'রে দেবার নির্ম্মম লীলায় মেতে উঠেছে সে—যাবার সময়!

কবি। এই তো পুরাতনের করুণা-হীন রীতি। কিন্তু এ কঠোর রীতিরও কালের আবর্ত্তনে একদিন ব্যতিক্রম আসে। সেই অদূরভবিষ্যতের জন্যে তুমি প্রস্তুত থাকো—প্রাণলক্ষ্মী! কান পেতে শোনো শান্ত হ'য়ে এসেছে ডাক—নবজীবনের ডাক।

প্রকৃতির প্রবেশ

প্রকৃতি। প্রাণলক্ষ্মী: তুমি এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছ এখানে? তোমার ঘরে যে নবীনের আবির্ভাব হ'চ্চে, তবুও আনন্দ উৎসব থেমে থাক্‌বে?

প্রাণলক্ষ্মী। প্রকৃতি: এখনো পরিপূর্ণ আনন্দ করবার সময় আসেনি। পুরাতনের শাসনকে তুচ্ছ ক'রে উল্লাসের কলরোল তুলুক্‌ দিকে দিকে ধরার ছেলে-মেয়েরা।

প্রকৃতি। তা' হ'লেও কি আর নিরানন্দ থাকা সাজে? জানি—পুরাতন খুলে দিয়েছে তোমার সকল সাজ, আমাকেও হ'তে হয়েছে সর্ব্বস্বান্ত। আস্‌ছে সেই নবীন দুর্জ্জয় প্রাণ বৈশাখের প্রথম দিনে—সে এসে সমস্ত পূর্ণ ক'রে দেবে—সেই আশাতেই প্রাণ ধ'রে রয়েছি।

প্রাণলক্ষ্মী। বুঝেছি প্রকৃতি: আজ সকলের নিরানন্দ মনে কোন্‌ নবীন অতিথির আসার প্রতীক্ষায় পুলকের আভাস জেগে উঠেছে।

প্রকৃতি। তাইতো আমার অন্তর-লোকে আর বহির্লোকে পুরাতনের শেষ কুকীর্ত্তি কালবৈশাখীর মৃত্যু-তাণ্ডবেও অকারণ পুলকের নৃত্য জেগে উঠেছে। তারি ধ্বনি ছন্দে ছন্দে লীলায়িত…শুন্‌তে পাচ্চো না?

প্রাণলক্ষ্মী। পুরাতন যাবার আগে মরণ-নৃত্যে মেতে উঠেছে—সমস্ত লণ্ড ভণ্ড ক'রে দিতে চায়। আসন্ন আনন্দের এই কি পূর্ব্বরঙ্গ?

মানস। হ্যাঁ: সর্ব্বহারার প্রাণে তপের আসন পাতা রয়েছে।—পুরাতনের মুখ, তা'র বিদায়কালীন কার্য্য-রীতি দেখেও কি বুঝতে পারোনি—তা'র বুকে মৃত্যুবান বেজেছে? প্রাচীনের মৃত্যুর অঞ্জলিতে অমৃতের ধারা পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে।

প্রাণলক্ষ্মী। তাই যদি সত্য হয়—মানস: তবে এতোদিন ধ'রে পুরাতন আমার এই মজ্জার মধ্যে যৌবনকে বন্দী ক'রে রেখেছে কেন? কবি: তুমিই বলো?

কবি। তা'র কারণ—সাধনা-ভ্রষ্ট প্রকৃতি—নিষ্ঠাহীন—ব্রাত্য-দোষে সে অধঃপতিত। কিন্তু আশা হয়—এবার তোমার মধ্যে বন্দী যৌবন মুক্তি পেয়ে বিচিত্র রঙে-রসে অপরূপ বেশে প্রকাশ পাবে নবীনের অভ্যুদয়ে।

মানস। প্রাণলক্ষ্মী: তোমার এই ত্যাগের গৌরবেই তোমার ধান্যের ধন সর্ব্বস্বকে আরো নিবিড় ক'রে পাবে। তোমার তপস্যার ঐ শ্বেত-বাসের পরে রঙীণ বসন-ভূষণ তোমার অঙ্গে অপূর্ব্ব মানাবে। নবসৃষ্টির বেদনা তো তোমাকে সইতে হবেই—প্রাণলক্ষ্মী!

প্রাণলক্ষ্মী। আমার এ ব্যথা মধুর হ'য়ে উঠেছে! বিগত বৎসরের পুঞ্জ পুঞ্জ গ্লানি, শত আবর্জ্জনা, ক্লান্তি, প্রমাদ সমস্তই বৈশাখ সম্মার্জ্জনায় দূর ক'রে দেবে।

কবি। পরিপূর্ণতা সফল হ'য়ে উঠবে ব'লেই এই শূন্যের সৃষ্টি। এই তামসী-যামিনী ভেদ ক'রে প্রসন্নের হাসি ফুটে উঠবে দিকে দিগন্তরে, সেইজন্যে এই বৃহৎ ত্যাগের আয়োজন। তাই তুমি অন্তরে অন্তরে ভোগ করতে পারবে পাওয়ার পরম তৃপ্তি।—নবীন ধরণীর দ্বারে আগতপ্রায়, সে এসে সমস্ত জীর্ণ-দীর্ণ পুরাতনকে ঝরিয়ে দিতে এতটুকুও কৃপণতা করবে না। জরা যাবে দূরে। জীর্ণতার সকল মোহের বাঁধন ছিন্ন করবার বাণী তা'র নিঃশঙ্ক শঙ্খ নিনাদে শুনতে পাচ্চি। অন্তমন

পুরাতন ঐ চ'লে যায়—নবীনকে আবাহন করবার সময় এসেছে। প্রকৃতির স্বপ্ন এবার বাস্তব হ'য়ে উঠবে।

প্রাণলক্ষ্মী। যা' শ্রীহীন হয়েছে, যা' হারিয়েছে তা'র দীপ্তি—আমার নবীন এসে সমস্তই জ্যোতির্ময় ক'রে দিক্। মূক চিত্ত গেয়ে উঠুক্ গান। মোহন বর্ণচ্ছটায় আকাশ, বন, গিরি, সমুদ্র উজ্জ্বল হোক্। কিন্তু নবীন অতিথির আসন কোথায় পেতে দোবো? স্থান কোথায় আমার অঙ্গনে? আর কিছু কি বাকি রেখেছে পুরাতন—সবই তো ধ্বংস হ'য়ে গেছে কালবৈশাখীর ঝড়ে।

কবি। নবীন তা'র স্থান নিজেই ক'রে নেবে, মিথ্যা তোমার কুণ্ঠা। তা'র পায়ের ধ্বনি বেজেছে, প্রকৃতি অভ্যর্থনার আয়োজন সম্পূর্ণ ক'রেই রেখেছে। তা'র হাসিতে সমস্ত বিষণ্ণ সুর ঝ'রে যাবে। নবজাগরণের আলোর জয়-বাণী উঠবে দিক্‌বালাদের কণ্ঠে।

শঙ্খ ও ভেরী

প্রকৃতি। ঐ শোনো নবীন বর্ষের আবাহন—ধরণীর বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে উঠেছে ঝঙ্কার। ঐ অসীম নীলাম্বরে উড্ডীন হয়েছে সুবিমল আলোক ধ্বজা।

প্রাণলক্ষ্মী। হে অনির্বচনীয়, হে ধ্যানসুন্দর ও চিরজীবিত নবীন—পূর্ণ করো আমার তপস্যা।

প্রকৃতি। উদয়-দিগন্তে বেজে উঠেছে আলোর শঙ্খ। আর বৈশাখের এই প্রথম দিনে আলোকদূত যেন কানে কানে শুনিয়ে দিচ্ছে: "জাগো-জাগো—অগ্রসর হও—এসেছে সেই নবীন। তোমাদের যা দান আছে—সমস্ত সমর্পণ করবার জন্যে প্রস্তুত হও।"

প্রাণলক্ষ্মী। মধুমাধব বৈশাখের এই প্রথমদিনে সুস্বাগত নবীন—সে যে রূপকথার রাজপুত্র, নবজীবনের সোনার কাটি ছুঁইয়ে আমার অন্দর মহলে ঘুমন্ত রাজকন্যা স্বাধীনতাকে জাগিয়ে দিক্—মাতিয়ে দিক্ উৎসবে আনন্দে নৃত্যে গীতে। এই ভুবনের ভবনে ভবনে নবপ্রেরণার আবেগে রুদ্ধদ্বার খুলে যাক্।...

কবি। বৈশাখের এই প্রথম দিনে পূর্ব্ব দিগঞ্চলে বেজে উঠুক্—নব-জাগরণের তরুণ-আলোর মহাশঙ্খ, চিত্তে চিত্তে সেই শঙ্খ ঘোষে উঠুক্—রক্তে লাগুক্ দোলা। জটিল সঙ্কট পথে যা'রা চলেছে নিরুদ্বেগে—মৃত্যু পথে ছুটেছে অমর মুক্তি সাধনার নির্ভীক সন্ধানে, সেই কাল চিত্ত-বিজয়ীদের বিজয়-শঙ্খ বেজে উঠেছে বৈশাখের এই প্রথম দিনে। ঘর-ছাড়ানো ডাক দিয়েছে নবীন—'মাভৈঃ' বাণী মহানির্ঘোষে করছে ঘোষণা: পরাধীনতার দৈন্য-গ্লানি ভার অবনত মাথা থেকে ফেলে দিতে হবে আত্মজয়ী হ'য়ে। উন্নতশির ঊর্দ্ধে তুলে দাঁড়াতে হবে, নব জাগ্রত প্রাণে নবীনের অভিবন্দনা গাইতে গাইতে উচ্চারণ করতে হবে বৈশাখের এই প্রথম দিনে অমৃত-সন্তানের সেই অমোঘবাণী: ছাড়ো লোভ, ছাড়ো ক্ষোভ, পায়ে দলো এতোকালের পরিপুঞ্জীত মোহ-ভ্রান্ত লালসাকে। এতোদিন যা' হারিয়ে গেছে—আজ তা' পুনর্ন্ব-রূপে বিরাজ করুক্। প্রাচী-গগনে নূতন সূর্য্যোদয়ের দিকে চলো সম্মুখ-পথে সম্মেলন কণ্ঠে জাগিয়ে গান:—

গীতবাণী

গাহো নবজীবনের জয়-গান
জাগো নব-উন্মেষে জন-গণ-প্রাণ।
কলুষ-ক্লিষ্ট মোহ-রাত্রি
ভেদ করো জ্যোতিঃ-পথযাত্রী,—
চলো তীর্থে সে সার্থকতার,
তুলে নাও সত্যের তরবার—
করো মিথ্যা-দানবে খান্‌খান্।
অধিনেতা নবীনের আকাশ বাণী:
—"এগিয়ে চলো সাথী—এসেছে সময়,
করো শত্রুর দুর্গ জয়!"
তোলে ধ্বনি কানে কানে জড়তা হানি।'
গভীর চিত্তে আনে চেতনা
মুক্তিকামীর শুভ প্রেরণা,
কেঁপে ওঠে প্রাণের সে চঞ্চলতা
পূর্ব্ব দিগন্তে মহাবারতা,
শোনো ঐ নবীনের আহ্বান।

যে রাত্রি পোহায় আজি!

বন্দে আলি

চেয়েছিনু মালাখানি দিলে মোরে আঁখি জল
মাধবী নিশীথে আজি তাই মেঘ ছল ছল।
দখিন সমীর কাঁদে বলো কার অপরাধে!
শুকায় কুসুম তব ক্ষণে ক্ষণে ঝরে দল।

যে রাত্রি পোহায় আজি কাল তাহা ফেরে কিগো!
[illegible] মনে ফিরিবে না কামনার মায়া-মৃগ।
ছিঁড়ে গেছে তব মালা জানো প্রিয় কি এ জ্বালা,
কাঁটা আছে নাহি হায় স্বপনের শতদল।

নঞ্‌তৎপুরুষ

বনফুল

৯

যুগল পালিত বেশ জুৎ করে' বসেছিল। আগের দিন যে চেয়ারটায় বসেছিল সেই চেয়ারেই বসে' মহানন্দে মদ খাচ্ছিল সে—হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। তৃতীয় গ্লাস শেষ করে' চতুর্থ গ্লাস সুরু করেছিল। টি-পটটা আর আধকাপ চা পড়েছিল টেবিলের একধারে। গায়ের কোট খুলে বেশ বাগিয়ে বসেছিল যুগল। সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত।

"আসুন, আসুন, আপনার অপেক্ষাতেই বসে আছি"—পুরন্দরবাবুকে দেখেই বলে উঠল সে—"গরম লাগছিল কোটটা খুলে ফেলেছি, আশা করি আপত্তি নেই আপনার তাতে"

পুরন্দরবাবুর মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হয়ে উঠল।

"বোতলে আর কতটা আছে? ভদ্রভাবে আলাপ করবার মতো অবস্থা আছে কি আপনার এখন?"

যুগল একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল।

"না, ঠিক নেই। মৃত বন্ধুর স্মৃতিতর্পণ করছি, তবে ঠিক--"

"আমার কথা শুনবেন?"

"সেই জন্যেই তো এসেছি"

"তাহলে শুনুন—প্রথমেই বলছি আপনি অতি অপদার্থ লোক, বুঝলেন"

"আপনি যদি এই ভাবে সুরু করেন কি ভাবে শেষ করবেন তাতো বুঝতে পাচ্ছি না! বাবা!"

যুগল ব্যাপারটাকে যদিও লঘু পরিহাস ভরে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে কিন্তু মনে মনে একটু ভীত হয়ে পড়ল সে।

"আপনার মেয়ে মরছে, ভয়ানক অসুখ তার, আপনি কি তাকে ত্যাগ করেছেন না কি"

"সত্যি মরছে?"

"অসুখ, অসুখ—ভয়ানক অসুস্থ সে…"

"ফিট টিট?"

"ভাঁড়ামি করবেন না। ভ—য়া—ন—ক অসুখ, হয়তো বাঁচবে না। আপনি গেলেন না কেন? যাওয়া উচিত ছিল না আপনার?"

"কেন, তাঁরা আমার মেয়েকে দয়া করে' স্থান দিয়েছেন বলে' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার জন্যে! উচিত ছিল। পুরন্দরবাবু, দরদী বন্ধু আমার"—হঠাৎ সে পুরন্দরবাবুর হাত দুটো জড়িয়ে ধরলে নিজের হাতের মধ্যে—"রাগ কোরো না দাদা, রাগ করে' কষ্ট পেও না। আমি যদি মরে যাই, কিম্বা মদের ঝোঁকে গঙ্গায় লাফিয়ে পড়ি দুনিয়ার কি এসে যায় তাতে—কিস্যু না! ভবেশবাবুর বাড়ি যাওয়ার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে ভবিষ্যতে…যথেষ্ট…সময়ের অভাব কি!"

যুগলের অবস্থা দেখে আত্মসম্বরণ করলেন পুরন্দরবাবু।

"আপনি মদের ঝোঁকে কি বলছেন যা তা! আপনার সঙ্গে একটা দরকারি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই—আপনি যদি এরকম করেন তাহলে কি করে' হবে তা'। এ রকম করলে কিন্তু ভয়ানক রাগ করব বলে' দিচ্ছি—শুনুন, আজ রাত্রে থাকুন আপনি এখানে। সকালে দু'জনে যাওয়া যাবে একসঙ্গে। সোজায় যদি না যান বেঁধে নিয়ে যাব, বুঝলেন? বেঁধে নিয়ে যাব! ওই সোফাটায় শুতে আপনার কষ্ট হবে কি—"

যে সোফাটায় তিনি নিজে শুতেন সেইটে দেখিয়ে বললেন "ওটাতে চলবে আপনার?"

"খুব চলবে। যেখানে হোক শুলেই হ'ল"

"এই নিন চাদর, তোষক বালিশ" পাশের ঘর থেকে পুরন্দরবাবু নিজেই বয়ে আনলেন সব এবং যুগলের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন—"বিছানা পেতে শুয়ে পড়ুন। এখুনি শুয়ে পড়ুন"

বিছানার বোঝা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে' ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যুগল ইতস্তত করতে লাগল। মুখে মাতালের হাসি। পুরন্দরবাবু আর একবার ধমক দিতেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে টেবিলটা সরিয়ে ভয়ে ভয়ে বিছানা পাততে লাগল সে। পুরন্দরবাবুও সাহায্য করতে লাগলেন। লোকটার উপর আর রাগ হচ্ছিল না, তার ভীত ত্রস্তভাব দেখে করুণাই হচ্ছিল বরং।

"গ্লাসে যে মদটুকু ঢেলেছেন খেয়ে ফেলুন সেটা। খেয়ে শুয়ে পড়ুন" আদেশের ভঙ্গীতে বললেন পুরন্দরবাবু।

"মদ আপনিই আনতে দিয়েছিলেন, না?"

"হ্যাঁ…আপনি যে আর আনিয়ে দেবেন না তা বুঝেছিলাম আগেই"

"বুঝে ভালই করেছিলেন। আর একটা কথাও শুনুন, আপনার কোনরকম মাতলামি আর সহ্য করব না আমি। কালকের মতো যে বলবেন—চুমু খাব—সে সব আর চলবে না, বুঝলেন"

"বুঝেছি। ও সব কি আর বারবার হয়"—হঠাৎ ফিক করে' হেসে ফেললে সে। হাসিটা পুরন্দরবাবু দেখতে পেলেন না। তিনি ঘরের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ সুরু করেছিলেন। উত্তরটা শুনে হঠাৎ থেমে গেলেন এবং যুগলের সামনে এসে গম্ভীরভাবে বললেন—"সরলভাবে ব্যাপারটা খুলে বলুন না সব। আপনাকে তো চিনি আমি—লোক তো আপনি খারাপ নন—ভুলপথে চলছেন কেন এ ভাবে। সরলভাবে সমস্ত কথা অকপটে খুলে বলুন; আমি কথা দিচ্ছি আমাকে যা জিগ্যেস করবেন আমিও অকপটে তার উত্তর দেব"

যুগল নীরবে সমস্ত দন্তগুলি বিকশিত করে' তাঁর দিকে চেয়ে রইল। পুরন্দরবাবুর মাথার শিরগুলো দপ দপ করে' উঠল আবার।

"ও কি!"—চীৎকার করে' উঠলেন তিনি প্রায়—"ওরকম করে'

চেয়ে আছেন কেন! কি দরকার এ রকম লুকোচুরির? আমি কিছু বুঝতে পারছি না ভাবছেন? শুনুন, খুলে বলুন দেখি সব। আমি কথা দিচ্ছি—ওয়ার্ড অব অনার—আপনি যা জিগ্যেস করবেন আপনার প্রতিটি প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর পাবেন আমার কাছে। অসঙ্গত আজগুবি—যা খুশী জিগ্যেস করুন—যা খুশী। আমার যে কি হচ্ছে তা যদি বুঝতেন তাহলে এ রকম করতেন না কক্ষনো। কি জানতে চান বলুন"

যুগল পালিত ধীরে ধীরে এগিয়ে এল তাঁর দিকে।

"এতই যখন প্রসন্ন হয়েছেন তাহলে একটা কথার জবাব দিন দিকি। কালরাত্রে যে বললেন—নিরীহ স্বামী—তার অর্থটা কি"

পুরন্দরবাবু আবার পরিক্রমণ সুরু করলেন।

"রাগ করলেন? রাগ করবেন না। ওই কথাটার মানে জানবার ভারী কৌতূহল হচ্ছে—অত্যন্ত। সত্যিকথা বলতে কি—ওইটে জানবার জন্যেই বিশেষ করে' আমি আজ⋯দেখুন সব কথা গুছিয়ে বলবার ক্ষমতা আমার নেই। বেফাঁস যদি কিছু বলে বসি মাপ করবেন। জুলুমবাজ মানেই বা কি! পূর্ণ গাঙ্গুলী কোন টাইপ?"

জুলুমবাজ স্বামী পূর্ণ গাঙ্গুলীর খাবারে বিষ মেশাত কিম্বা তার বুকে ছুরি বসাত—তার শবানুগমন করত না, আপনি যেমন করলেন আজ। আচ্ছা ওই মড়াটার পিছু পিছু আপনি গেলেন কেন! কোন মতলব ছিল না কি। ছি, ছি, এ কি জঘন্য প্রবৃত্তি আপনার—

ক্রোধে আত্মহারা হয়ে বলে ফেললেন পুরন্দরবাবু।

"হ্যাঁ যাওয়াটা উচিত হয় নি, তা ঠিক। কিন্তু আপনি বড় বেশী চটেছেন দেখছি—"

"এমন করে' বেড়ানো কি পুরুষমানুষের সাজে? নিজের দুঃখের কাহিনী বিনিয়ে বিনিয়ে চারদিকে বলে' বেড়ানো, একই কথা ভ্যানভ্যান করে' বারবার বলা আর তাই নিয়ে লোকের গায়ে পড়ে' নানা রকম ঢং করা—এসব কি ব্যাটাছেলের কাজ? আপনি গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিলেন না কি?"

"মদ খেলে অনেক রকমই করে থাকি—কি করেছিলুম মনে নেই। আচ্ছা, কারও খাবারে বিষ মেশানোটা কি ঠিক? ছুরি মারাটাও কি খুব পৌরুষের লক্ষণ? কি জানি! দেখুন, পুরন্দরবাবু একটা কথা আপনার মনে রাখা উচিত। আমি মোটা মাইনের চাকরি করি, বিষয় আশয়ও আছে কিছু, বিয়েও করতে পারি আমি আবার।"

"তার চেয়ে চুলোয় যাওয়া ভাল নয়?"

"তা-ও বটে। একটা গল্প শুনবেন? আজ গাড়িতে যেতে যেতে গল্পটা মনে পড়ল, তখনি আপনাকে বলব ভেবেছিলাম। আপনি এখুনি লোকের গায়ে পড়ার কথা বলছিলেন না?—অশোক সেনকে মনে আছে আপনার? আপনি যখন বর্দ্ধমানে ছিলেন তখন সেও আসতো আমাদের বাড়ীতে প্রায়। তার এক ছোট ভাই ছিল—সে ছোকরাও খুব চালিয়াৎ—সেও গভর্ণমেন্টের চাকরি করত। হঠাৎ সে এক বড় অফিসারের সঙ্গে ঝগড়া করে' বসল। বড় অফিসারটি বেশ জাঁদরেল গোছের ব্যাচিলার ছিলেন। তিনি কি করলেন জানেন?—তিনি একদিন এক সভায় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকদের সামনে অশোককে অপমান করে' বসলেন, সেখানে অশোকের হবু-স্ত্রী সবিতাও ছিল। শুধু তাই করেই ক্ষান্ত হলেন না; সবিতার বাপের কাছে গিয়ে সবিতাকে বিয়ে করতে চাইলেন—এবং যেহেতু তিনি অশোকের চেয়ে ঢের উঁচুদরের অফিসার সবিতার বাপ মা এমন কি সবিতা নিজে পর্য্যন্ত অশোককে ত্যাগ করে' তাঁকে বরণ করতে রাজী হয়ে গেলেন। অথচ আমরা শুনেছিলাম সবিতা না কি প্রেমে পড়েছে অশোকের! আর অশোক কি করলে জানেন? সে সেই বিয়েতে বরযাত্রী গেল, তারপর, মানে বিয়ের পর, একদিন খুন চেপে গেল তার—অফিসারটার পেটে ছুরি বসিয়ে দিলে সে হঠাৎ। বসিয়ে দিয়েই কিন্তু হাহাকার করে' উঠল—আঃ এ কি করলাম। কেঁদেই ফেললে। লোকের এমন কি স্ত্রীলোকেরও গায়ে পড়ে' বলে বেড়াতে লাগল ক্রমাগত—ছি ছি একি করে' ফেললাম। হি—হি—হি—খুব দেখালে একচোট অশোক। অফিসারটা অবশ্য ম'ল না, বেঁচে গেল শেষ পর্য্যন্ত, ছুরিটা ভাল করে' ঢোকেনি!"

"আমাকে এ গল্প বলার অর্থ তো বুঝতে পারছি না" পুরন্দরবাবু ভ্রূ-কুঞ্চিত করে' বললেন।

"আপনার কথাতেই মনে পড়ল গল্পটা। আপনার টাইপের সঙ্গে ঠিক মিলল কি? এ লোকটা ছুরিও মারলে, আর ঢং করে' লোকের গায়ে পড়ে' পড়ে' হাহাকারও করে' বেড়াল। শেষটা ভুলেছিল কিন্তু ঠিক—অ্যাঁ কি বলেন আপনি!"

"আকার-ইঙ্গিতে আপনি কি বলতে চান?" ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল পুরন্দরবাবুর। চীৎকার করে' উঠলেন তিনি—"আপনি কি ভেবেছেন আমি ভয় পেয়ে যাব? একটা শিশুকে যন্ত্রণা দিচ্ছেন আমাকে ভয় খাওয়াবার জন্যে, পাজি নচ্ছার হারামজাদা কোথাকার"

"কি বললেন?"

"হারামজাদা, হারামজাদা, হারামজাদা—"

যুগলের ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল।

"আপনি, আপনি পুরন্দরবাবু—হারামজাদা বলছেন আমাকে!"

পুরন্দরবাবু আত্মস্থ হলেন। বুঝলেন যে বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

"মাপ করুন আমাকে, রাগ সামলাতে পারি নি। আপনি এমন বাঁকা চোরা পথে চলছেন কেন! যা বলবেন, বলুন না সোজাসুজি—"

"ক্ষমা চাইলেন তাহলে"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় শুধু এর জন্য নয় সমস্তর জন্য ক্ষমা চাইছি। সব চুকে বুকে যাক"

"ও—মানে—"

"আর মানে টানে নয়, মদটুকু শেষ করে' শুয়ে পড়ুন এবার"

"ও মদটুকু⋯" যুগল ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল, তারপর চোঁ চোঁ করে' খেয়ে ফেললে মদটা। খানিকটা জামায় পড়ে গেল। হাত কাঁপছিল তার। সসম্ভ্রমে গ্লাসটা টেবিলের উপর রেখে শুতে গেল সে। কামিজটা খুলে ফেললে। তারপর একটা জুতো খুলে হঠাৎ সে বললে—"এখানে রাতটা কাটানো কি ভাল হচ্ছে"

পুরন্দরবাবু আবার পরিক্রমণ সুরু করেছিলেন, ঘাড় না ফিরিয়েই তিনি উত্তর দিলেন—"খুব ভাল হচ্ছে"

যুগল শুয়ে পড়ল। মিনিট পনের পরে পুরন্দরবাবুও আলো নিবিয়ে শুলেন। একটা দুশ্চিন্তা নিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। অপ্রত্যাশিতভাবে নূতন যে কাণ্ডটা ঘটল তাতে সমস্ত ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে পড়ল তো, মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। নিজের অক্ষমতা যেন প্রকট হয়ে পড়ছিল নিজের কাছেই। একটা খস খস শব্দ শুনে হঠাৎ তন্দ্রাটা ভেঙে গেল তাঁর। ঘাড় ফিরিয়ে যুগলের বিছানার দিকে চেয়ে দেখলেন। অন্ধকার ঘর, তবু কিন্তু পুরন্দরবাবুর মনে হল যুগল বিছানায় উঠে বসেছে।

"কি হ'ল"—পুরন্দরবাবু জিগ্যেস করলেন।

"ভূত"—চুপি চুপি যুগল বললে।

"ভূত! কোথা?"

"ওই যে পাশের ঘরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাচ্ছি"

"কার ভূত"

"অপর্ণার"

পুরন্দরবাবু উঠে বসলেন তাড়াতাড়ি। পাশের ঘরের দরজাটা খোলা ছিল, চেয়ে দেখলেন সেদিকে কিছুই চোখে পড়ল না তাঁর।

"কই, কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো! ভূত নয়, হুইস্কি—শুয়ে পড়ুন আপনি"

পুরন্দরবাবু শুয়ে আপাদমস্তক চাদর দিয়ে ঢাকা দিলেন।

যুগলও শুয়ে পড়ল, আর কোন উচ্চবাচ্য না করে'।

"ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ভূত দেখেছেন আপনি?" মিনিট দশেক পরে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন পুরন্দরবাবু।

"একবার দেখেছি বোধ হয়" ক্ষীণকণ্ঠে যুগল উত্তর দিল।

নীরবতা ঘনিয়ে এল আবার।

পুরন্দরবাবু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কি না কে জানে, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ আবার পাশ ফিরলেন তিনি…কোন খস খস শব্দ শুনেই তাঁর ঘুম ভেঙে গেল না কি? নির্ণয় করতে পারলেন না ঠিক—কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলেন তাঁর বিছানার কাছে ঘরের মাঝখানে শাদা কি একটা যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিছানায় উঠে বসে পুরো একটি মিনিট চেয়ে রইলেন তিনি সেদিকে।

"যুগলবাবু না কি"—স্খলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

অন্ধকারে নিজের কণ্ঠস্বরই অদ্ভুত শোনাল। কোন উত্তর নেই। কিন্তু কেউ যে একজন দাঁড়িয়ে আছে তাতেও সন্দেহ নেই কোন।

"কে—যুগলবাবু না কি"—আর একবার, আর একটু জোরে জিগ্যেস করলেন। এত জোরে যে যুগল ঘুমিয়ে থাকলেও জেগে উঠে সাড়া দেওয়া উচিত ছিল তার। কিন্তু এবারও কোন উত্তর এল না, কিন্তু মনে হল সাদা অস্পষ্ট মূর্ত্তিটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। এর পরই যা হল তা অদ্ভুত, পুরন্দরবাবুর মাথার মধ্যে একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল যেন—উন্মাদের মতো ভীষণ তারস্বরে চীৎকার করে উঠলেন তিনি সমস্ত শালীনতা বিস্মৃত হয়ে—

"ব্যাটাছেলে মাতাল আমাকে ভয় দেখাবে ভেবেছ। আমি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে সমস্ত রাত শুয়ে থাকব—একবারও ফিরব না তোমার দিকে…দাঁড়িয়ে থাক সমস্ত রাত… থোড়াই কেয়ার করি আমি…ব্যাটা মাতাল কোথাকার—থুঃ—থুঃ—থুঃ—"

উন্মাদের মতো থুতু ফেলতে লাগলেন তার দিকে। তারপর বিছানায় শুয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে অনড় হয়ে রইলেন। আবার নীরবতা ঘনিয়ে এল চারদিকে। মূর্ত্তিটা এগিয়ে আসছে, না একজায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তা বুঝতে পারছিলেন না, যদিও কিন্তু বুকের ভিতরটা ধড়াস্ ধড়াস্ করছিল। পুরো পাঁচটি মিনিট কেটে গেল। তারপর বিছানার ঠিক পাশেই শোনা গেল যুগলের বিনীত মিনতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর—"আমি দেশলাইটা খোঁজবার জন্যে উঠেছি। টেবিলে নেই, ভাবলাম আপনার বিছানার তলায় যদি থাকে"

"আমি যে এত চেঁচালাম আপনি একটি কথা বললেন না—এর মানে কি" একটু পরে প্রশ্ন করলেন পুরন্দরবাবু।

"আপনি এত জোরে চীৎকার করে' উঠলেন যে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম"

"আপনার বিছানার পাশেই কুলুঙ্গিতে দেশলাই আছে। আলো জ্বালবেন?"

"না, সিগারেট ধরাব একটা। আলোর দরকার নেই। ছি, ছি, আপনার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলুম। সরি—"

কুলুঙ্গিটার দিকে ধীরে ধীরে সরে' গেল সে।

পুরন্দরবাবুও আর কথা কইলেন না। তখনও দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়েছিলেন তিনি এবং সমস্ত রাত তেমনি ভাবেই শুয়ে রইলেন। যুগলকে বলেছিলেন বলেই যে শুয়ে রইলেন, না অন্য কোন কারণ ছিল, তা নিজেও বুঝতে পারছিলেন না। তাঁর মানসিক অবস্থা এমন হয়েছিল যে যেন বিকারের ঘোরে আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইলেন, কখন যে ঘুমিয়ে পড়লেন তা জানতেও পারলেন না। সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন ন'টা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন বিছানায়, যেন কে ঠেলে তুলে দিলে তাঁকে। উঠে দেখলেন যুগল পালিত নেই—খালি বিছানা পড়ে আছে। "এ আমি আগেই জানতাম"—বলে' কপালে হাত দিয়ে বসে রইলেন তিনি।

১০

ডাক্তারবাবু যা ভয় করছিলেন তাই হল শেষকালে। পাপিয়ার অবস্থা দেখতে দেখতে খারাপ হয়ে গেল, হঠাৎ এমনটা যে হবে তা নীলিমা দেবী বা পুরন্দরবাবু একটুও বুঝতে পারেন নি আগের দিন। পুরন্দরবাবু সকালে এসে দেখলেন জ্ঞান আছে, এমন কি তাঁকে দেখে সে যেন হাত দুটি তাঁর দিকে বাড়িয়েও দিলে তাঁর মনে হ'ল। সত্যি বাড়িয়ে দিয়েছিল, না নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে পুরন্দরবাবু অজ্ঞাতসারে এটা কল্পনা করেছিলেন তা অবশ্য নিজেও তিনি ঠিক করতে

পারছিলেন না পরে। সন্ধ্যার দিকে ক্রমশ সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। শেষ পর্য্যন্ত অজ্ঞানই ছিল। ভবেশবাবুর বাড়িতে আসবার ঠিক দশদিন পরে মারা গেল সে।

পুরন্দরবাবু এত বিচলিত হয়ে পড়লেন যে তাঁর জন্তে ভবেশবাবুদের চিন্তা হল। পাপিয়ার শেষ সময়টা তিনি তাদের বাড়িতেই ছিলেন দিনরাত। ঘরের কোণে চুপ করে' বসে থাকতেন অসাড় হয়ে। কারও সঙ্গে কথা কইতে পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি হত না, নীলিমা দেবী নানা কথা পেড়ে তাঁর মনটা অন্তদিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু কোন ফল হত না, কোনও উত্তরই দিতেন না তিনি। পাপিয়ার জন্তে যে পুরন্দরবাবু এতটা ভেঙে পড়বেন তা ভাবতেই পারে নি কেউ। বাড়ির ছেলেমেয়েরা এসে নানাভাবে ভোলাতে চেষ্টা করত, তাদের সঙ্গেই যা' দু'একবার হেসে কথা কইতেন তিনি। কিন্তু প্রায়ই পা টিপে টিপে উঠে যেতেন পাপিয়ার বিছানার পাশে। চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাকতেন। মাঝে-মাঝে মনে হত পাপিয়া যেন চিনতে পারছে তাকে। পাপিয়া যে বাঁচবে এ আশা তিনি করেন নি, কেউ করে নি, কিন্তু পাপিয়াকে ফেলে রেখে কিছুতেই চলে যেতে পারতেন না। পাশের ঘরটায় বসে থাকতেন চুপ করে'।

হঠাৎ একদিন কোলকাতা চলে গেলেন। সমস্ত বড় বড় ডাক্তারদের ডেকে নিয়ে এলেন। ডাক্তারদের আলোচনা সভা বসল। পুরন্দরবাবু পাগলের মতো রোজ আসতে অনুরোধ করতে লাগলেন সবাইকে। আর একবার এবং সেই শেষবার এসেছিলেন তাঁরা, পাপিয়ার মৃত্যুর আগের দিন। নীলিমা দেবী বললেন—ওর বাবাকে একবার খবর দেওয়া দরকার। কারণ, যদি কিছু হয়—শ্মশানে নিয়ে যাওয়া যাবে না তিনি না এলে। পুরন্দরবাবু আমতা আমতা করে' বললেন—"আচ্ছা, চিঠি লিখছি একটা। কিন্তু চিঠি লিখলে কি আসবে?" ভবেশবাবু একথা শুনে বললেন "বলেন তো পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে আনাবার ব্যবস্থা করি, অনায়াসেই করা যায় তা। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।" পুরন্দরবাবু চিঠিই লিখলেন শেষে একটা এবং সেটা নিয়ে নিজে চলে গেলেন তার বাসায়। যুগল বাসায় ছিল না, থাকবে না তা অনুমানই করেছিলেন পুরন্দরবাবু—চিঠিখানা রেখে এলেন বাড়িওলার কাছে। তিনি স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো কর্ত্তব্য করে যাচ্ছিলেন যেন।

অবশেষে পাপিয়া মারা গেল। সন্ধ্যাবেলা সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল তখন। একটা রূঢ় আঘাতে তাঁর আচ্ছন্নভাবটা চুরমার হয়ে গেল—হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন তিনি। নীলিমা দেবী সুন্দর একটি শাড়ি পরিয়ে ফুল দিয়ে চমৎকার করে' সাজিয়ে দিলেন পাপিয়াকে। পুরন্দর-বাবুর চোখ দুটো জ্বলে উঠল হঠাৎ—দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে' বলে' উঠলেন—"খুনেটাকে যেমন করে' পারি ধরে' আনব আমি।" কারও বারণ না শুনে তৎক্ষণাৎ কোলকাতার দিকে ছুটলেন।

যুগলকে কোথায় পাওয়া যাবে তার আভাস তিনি একটা পেয়ে-ছিলেন। যখন ডাক্তার ডাকতে গিয়েছিলেন তখন যুগলকেও খুঁজেছিলেন তিনি। কারণ তাঁর আশা ছিল যে যুগল এলে যুগলকে দেখলে পাপিয়া হয়তো ভাল হয়ে যাবে। সুতরাং যুগলকে খুঁজেছিলেন তিনি প্রাণপণে। যুগল বাসা বদলায়নি, কিন্তু বাসায় গেলে পাওয়া যেত না তাকে। বাড়িওলা প্রতিবারই এক কথা বলত—"গত তিন দিন তিনি বাসাতে ফেরেন নি। আজ যদি ফেরেনও মাতাল হয়েই ফিরবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, আর ঘণ্টাখানেক থেকেই বেরিয়ে যাবেন আবার। একেবারে গোল্লায় গেল মশাই, কি আর বলব"

চাকরটা চুপি চুপি বললে তিনি সোনাগাছিতে পড়ে থাকেন। ঠিকানা চান তো জোগাড় করে' দিতে পারি আমি।

কোলকাতায় এসেই পুরন্দরবাবু সোনাগাছির ঠিকানাটা জোগাড় করলেন। সেখানে গিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষুস্থির হয়ে গেল। ডাকিনীর মতো দুটো মাগী যুগলকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে রাস্তা দিয়ে, যুগল এত মদ খেয়েছে যে আর দাঁড়াতে পারছে না, আর তাদের পিছনে পিছনে বলিষ্ঠকায় ভীষণদর্শন একটা লোক অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিচ্ছে তাকে। শুধু গাল দিচ্ছে নয়, টাকা না দিলে জুতিয়ে লম্বা করে' দেবে বলে' ভয়ও দেখাচ্ছে। পুরন্দরবাবুকে দেখেই যুগল আর্ত্তকণ্ঠে বলে' উঠল—গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচান আমাকে।

পুরন্দরবাবুকে দেখেই গুণ্ডাটা সরে' পড়ল, যুগল তার দিকে মুষ্টি আস্ফালন করে' চীৎকার করে' উঠল বিজয়-উল্লাসে। পুরন্দরবাবু সোজা গিয়ে যুগলের কোটের কলারটা ধরে' ঝাঁকাতে লাগলেন তাকে, ক্রমাগত ঝাঁকাতে লাগলেন, তাঁর যেন খুন চেপে গিয়েছিল। যুগলের চীৎকার থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে, আতঙ্ক ফুটে উঠল চোখের দৃষ্টিতে, দাঁতে দাঁতে ঠক ঠক শব্দ হতে লাগল। ফুটপাথের উপর বসে পড়ল সে। একটা মাগী তাড়াতাড়ি ঝুঁকে ধরলে তাকে। "পাপিয়া মারা গেছে," পুরন্দর-বাবু বললেন অবশেষে। ফ্যাল ফ্যাল করে' চেয়ে রইল যুগল। মনে হল যেন বুঝল কথাটা, চিবুকটা ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল একবার।

"মারা গেছে···" অদ্ভুত স্বরে ফিস ফিস করে' বললে সে। সমস্ত মুখখানা কেমন যেন কুঁচকে গেল, একটা দন্ত-সর্ব্বস্ব হাসি ফুটে উঠল মুখে। খানিকক্ষণ বসে' রইল, তারপর মাগীটার কাঁধের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চলতে সুরু করল সোজা—যেন পুরন্দরবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নি।

"যাচ্ছেন কোথা, আপনি না গেলে যে তার সৎকার হবে না এটা মাথায় ঢুকছে না, মাতলামিরও একটা সীমা থাকা উচিত"

"আমি না গেলে সৎকার হবে না কেন"—ঘাড় ফিরিয়ে যুগল বলল।

"আপনি আইনত তার বাবা"

"না আমি নই, সেই পুলিশ অফিসারটি। মনে নেই আপনার তাকে? আপনি চলে আসবার ঠিক আগে যে এসেছিল—সেই যে বিলেত ফেরৎ ছোকরা"

"তার মানে"—চীৎকার করে' উঠলেন পুরন্দরবাবু, সমস্ত বুকটা মুষড়ে উঠল যেন—"কি বললেন?"

"ঠিকই বলেছি, সেই ওর বাবা। সৎকারের জন্তে তার খোঁজ করুন গিয়ে"

"মিছে কথা! আমার উপর শোধ তোলবার জন্তে এই মিছে কথাটা তৈরি করেছেন আপনি। পাষণ্ড কোথাকার—"

যুগলকে মারবার জন্তে তিনি ঘুঁসি তুললেন, হয় তো মেরেই ফেলতেন তাকে, কিন্তু পারলেন না—মাসী ছুটো চীৎকার করে উঠল তার-স্বরে। যুগল কিন্তু এক-পা নড়ল না। খানিকক্ষণ নির্নিমেষে তাঁর দিকে চেয়ে থেকে সঙ্গিনী দুটির কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে অদৃশ্য হয়ে গেল গলির মোড়ে। পুরন্দরবাবু আর তার অনুসরণ করলেন না। করতে প্রবৃত্তি হল না।

তার পরদিন একটি ভদ্রগোছের গভর্ণমেন্ট ক্লার্ক ভবেশবাবুদের বাড়িতে নীলিমা দেবীর হাতে একটি খামের চিঠি দিলেন। যুগল নাপিতের চিঠি। খামের ভিতর পাঁচশ টাকার একটা চেক এবং পাপিয়ার শবদাহ করবার আইনসঙ্গত অনুমতি ছিল। ভবেশবাবু অবশ্য শবদাহের ব্যবস্থা আগেই করেছিলেন, সেজন্ত অসংখ্য ধন্তবাদও জানিয়েছিল যুগল। লিখেছিলেন—"আপনার স্নেহের ঋণ শোধ করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই। তার অসুখের জন্ত এবং শবদাহ প্রভৃতির জন্ত যে খরচ হয়েছে সেই বাবদ সামান্ত কিছু পাঠালাম। যদি কিছু বাঁচে কোন সৎকার্য্যে তা খরচ করে' দেবেন। আমার শরীর খুব খারাপ বলে' যেতে পারলাম না। এজন্ত ক্ষমা করবেন। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন।"

যে ভদ্রলোক চিঠি এনেছিলেন তিনি আর বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না। যুগলবাবুর অনুরোধে তিনি চিঠিটা বহন করে' এনেছেন শুধু বোঝা গেল। টাকা পাঠিয়ে দেওয়াতে ভবেশবাবুরা ক্ষুণ্ণ হলেন খুব। চেকটা ফেরত দিচ্ছিলেন কিন্তু নীলিমা দেবী বললেন—কাঙালী ভোজন করানো হোক। শেষে তাই ঠিক হল।

সব শেষ হয়ে যাবার পর পুরন্দরবাবু যাদবপুর থেকে চলে এলেন। সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন অন্তমনস্কভাবে, গাড়ীচাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন একদিন। কখনও বা নিজের বাসায় চুপ চাপ শুয়ে থাকতেন দিনের পর দিন, কোথাও বেরুতেন না, দৈনন্দিন কর্ত্তব্য করতেন না কিছু। ভবেশবাবুরা মাঝে মাঝে আসতেন, যাবার জন্তে নিমন্ত্রণ করে' যেতেন, তিনি যাব বলে' প্রতিশ্রুতি দিতেন—কিন্তু সে কথা আর মনে থাকত না। নীলিমা দেবী নিজে এসেছিলেন কয়েকবার, কিন্তু দেখা পান নি। তাঁর উকীলও তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্তে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর মকোদ্দমার বেশ সুরাহা হয়েছে, শত্রুপক্ষ মিটমাট করতে চাইছে, পুরন্দরবাবুর সম্মতি পেলেই ব্যাপারটা নির্ব্বিঘ্নে চেপে যায়, কিন্তু কিছুতেই তাঁর নাগাল পাচ্ছিলেন না তিনি। অবশেষে নাগাল যখন পেলেন তখন তাঁর উদাসীন্ত দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর মতো দুঁদে মামলাবাজ মক্কেল যে হঠাৎ কি করে' এতটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে তা ভেবে পেলেন না তিনি।

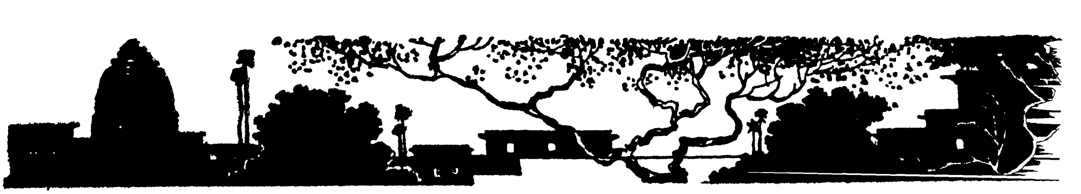
অসহ্য গরম পড়েছিল, কিন্তু পুরন্দরবাবুর খেয়াল ছিল না কিছু দার্জ্জিলিং যাবার কথা মনেই ছিল না আর। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অহরহ ভোগ করছিলেন তিনি, একটা প্রকাণ্ড ফোড়া যেন খর নিয়ে বেড়ে উঠছিল ক্রমশ। তাঁকে ভালো করে' জানবার পূর্ব্বেই, তিনি যে এত অল্প সময়ে তাকে ভালোবেসেছিলেন—তা না বুঝেই পাপিয়া জন্মের মতো চলে' গেল—এইটেই তাঁকে কষ্ট দিচ্ছিল সব চেয়ে বেশী। যে আনন্দময় জীবনের সামান্ত আভাসমাত্র তিনি পেয়েছিলেন, হঠাৎ তা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল চিরকালের মতো। জীবনের একটা অবলম্বন খুঁজে পেয়েছিলেন, হারিয়ে গেল সেটা। চুপ করে' ভাবতেন কেবল বসে'—আমার এই ছন্নছাড়া অপবিত্র জীবনটা পাপিয়াকে ভালবেসে শুদ্ধ করে নেব ভেবেছিলাম, সারাজীবনের ক্লেদ আর বিষ অমৃতে রূপান্তরিত হয়ে যেত, ওই পবিত্র নিষ্পাপ জীবনের সংস্পর্শে এসে। তাকে মানুষ করে গেলে বেঁচে থাকার অর্থ থাকত একটা, আর তাহলে ভগবান আমার সমস্ত দুষ্কৃতিও ক্ষমা করতেন বোধহয়"

একদিন ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ শ্মশানে গিয়ে হাজির হলেন। জায়গায় তার চিতাটা সাজানো হয়েছিল সেখানে গিয়ে বসলেন খানিকক্ষণ হেঁট হয়ে চুপ থেকেলেন। অনেকটা শান্তি পেলেন যেন। সূর্য্য ডুবে যাচ্ছিল, পশ্চিম দিগন্তে মেঘস্তূপে আগুন জ্বলছে, সার বেঁধে পাখী উড়ে চলেছে, অন্ধকার নামছে ধীরে ধীরে। সমস্ত মনটা শান্ত হয়ে গেল অনেকদিন পরে। সমস্ত অন্তর পূর্ণ করে' একটা আশ্বাস জেগে উঠল ধীরে ধীরে। মনে হল—পাপিয়াই বোধহয় কাছে এসে আশ্বাস দিচ্ছে আমাকে।

শ্মশান থেকে যখন উঠলেন তখন বেশ অন্ধকার হয়েছে। শ্মশানের কাছেই চায়ের দোকান ছিল একটা। তাঁর মনে হল সেই দোকানের একটা জানলায় যুগল বসে আছে এবং তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে নির্নিমেষে। তিনি সেদিকে আর না চেয়ে চলতেই লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে মনে হল কে যেন তাঁর অনুসরণ করছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন যুগল। কিছু বললেন না, দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু। কাছাকাছি এসে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে যুগল হাসল একটু। মাতালের হাসি নয়, ভদ্রলোকের হাসি। যুগল সত্যিই মদ খায় নি তখন।

"নমস্কার"

"নমস্কার"



সাময়িকী

কংগ্রেসের আদর্শ—

গত ২৬শে মার্চ্চ দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে লীগ দলের ডেপুটী-লীডার নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া বক্তৃতা করিলে কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভারতবাসী সকলের মনের কথা বলিয়া আমরা মনে করি। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন—কংগ্রেস ভারতের কোন সম্প্রদায় বা দলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চাহে না বা কাহাকেও উপেক্ষা করিতে চাহে না। কংগ্রেস প্রত্যেকের স্বাধীনতা কামনা করে এবং স্বার্থপুষ্ট সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে। কংগ্রেস মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন কাহাকেও এড়াইয়া চলিতে চাহে না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্ম কংগ্রেস অতীতেও চেষ্টা করিয়াছে, বর্ত্তমানেও চেষ্টা করিতেছে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্ম আজ ভারতকে পরাধীন রাখিবার ষড়যন্ত্রেই লিপ্ত আছে। একমাত্র ঐক্য দ্বারাই ভারত এই ষড়যন্ত্র হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে।

বিপ্লব দমন ব্যবস্থা—

প্রকাশ, ভারতের প্রাদেশিক গভর্ণরগণ মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে মন্ত্রি-মিশনের সহিত সাক্ষাতের জন্ম দিল্লীতে সমবেত হইয়া ভারতের ভবিষ্যৎ বিপ্লব দমন ব্যবস্থা সম্বন্ধেও ভারত সরকারের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী প্রভৃতি স্থানে সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে উদ্বিগ্ন হইয়া ভবিষ্যৎ-অশান্তির সময় কি ভাবে শান্তি রক্ষা করা হইবে, সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা ও পরামর্শ করা হইয়াছে। মন্ত্রি-মিশনের কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত না হইলে দেশে যে ব্যাপক বিপ্লব দেখা দিবে, তাহার সম্ভাবনায় গভর্ণমেণ্ট চিন্তান্বিত হইয়াছেন। সে জন্ম এখন হইতে সকল বেসরকারী লোকের বন্দুক ও রিভলভার কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। আরও কত কি করা হইবে কে জানে?

সিন্ধুদেশের রাজনীতি—

সিন্ধু প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ বন্দে আলি খান তালপুরী হঠাৎ এক দিন লীগ দল ত্যাগ করিয়া বিরোধী দলের সহিত যোগদান করায় সেদিন পরিষদে লীগ মন্ত্রীদল পরাজিত হন। তখন বিরোধী দলের সদস্য সংখ্যা বাড়িয়া গেলে বিরোধী দলের নেতা মিঃ সৈয়দ মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের জন্ম আমন্ত্রিত হন, কিন্তু আলোচনার পূর্ব্বেই লীগ প্রধান মন্ত্রী মিঃ তালপুরীকে পঞ্চম মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করায় তিনি আবার লীগ দলে ফিরিয়া যান। এই ভাবে আপাততঃ মন্ত্রিমণ্ডল সমস্যা সমাধান হইয়াছে বটে, কিন্ত গভর্ণর নাকি তথায় স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা ন দেখিয়া তথায় ৯৩ ধারা প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতেছেন তথাপি জাতীয়তাবাদী দলকে স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করিতে দেওয়া হইবে না। জল কতদূর গড়ায়, তাহা লক্ষ্য করিবা বিষয়।

খাদ্য বরাদ্দ হ্রাস—

রেশন অঞ্চলে খাদ্য বরাদ্দ হইতে চাউল ও আটা পরিমাণ ইতিপূর্ব্বেই কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সপ্তাহে ৪ সের চালআটার পরিবর্ত্তে এখন সাধারণ লোকে জন্য সপ্তাহে মাত্র ২ সের ১০ ছটাক চাল আটা দেওয়া হ ও শ্রমিকদিগকে সাড়ে ৩ সের দেওয়া হয়। তাহাতে বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ লোকের দিন চলে না। এই দুঃখের কথায় কর্ণপাত করে? তাহার উপর এপ্রিল হইতে সাপ্তাহিক চিনির বরাদ্দ ১ পোয়ার স্থলে ছটাক করা হইল। ২ বেলা ২ কাপ চা খাইতে কাহারও ৩ ছটাক চিনিতে চলে না। দরিদ্র দেশের যে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্ম চা পান করিবে তাহারও আর উ রহিল না। এই অবস্থায় আমাদের বাঁচিয়া থাকিতে



সপরিজনে মহাত্মা গান্ধীজীর পাণিহাটী যাত্রা ফটো—তারক দাস



শহীদ সন্তোষকুমার দত্তের শবানুগমন ফটো—তারক দাস

...জীব সম্বর্দ্ধনা—

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ৯৭তম জন্মদিবস উপলক্ষে গত ৩রা মার্চ্চ রবিবার সন্ধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কলিকাতা ২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ গৃহে সিঁথি-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর উদ্যোগে এক সম্বর্দ্ধনা সভা হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য সভায় পৌরহিত্য করেন এবং রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় সভার উদ্বোধন করেন। সভায় এত লোকসমাগম হইয়াছিল, যে বহু লোককে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। পণ্ডিত বিদ্যাভূষণের এই বয়সে যে স্মৃতিশক্তি, দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি দেখা যায়, তাহা তাঁহার পবিত্র



রসিকমোহন জন্মোৎসবে সমবেত ব্যক্তিগণ

ফটো—শ্রীনীরেন ভাদুড়ী

ধর্ম্মজীবনেরই পরিচায়ক। তাঁহাকে দর্শন করিলে এ যুগে দেবদর্শনের পুণ্য হয়। তিনি ব্যবসায়ে চিকিৎসক হইয়াও সাংবাদিক এবং রাজনীতিকের ক্ষেত্রে বহু দিন কার্য্য করিয়াছিলেন। দেশবাসীর সম্মুখে এই প্রাণবন্ত আদর্শ যেন বাঙ্গালীকে নূতন জীবন পথের সন্ধান দেয়, আমরা ইহাই কামনা করি। বিদ্যাভূষণ মহাশয় এইরূপ সুস্থদেহে দীর্ঘজীবন লাভ করুন, তাহাই আমরা ভগবৎ চরণে প্রার্থনা জানাই।

নবীনচন্দ্র সেন শতবার্ষিক—

গত ১২ই মার্চ্চ মঙ্গলবার কলিকাতা মহাবোধী সোসাইটী হলে সিঁথি-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর উদ্যোগে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের শতবার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। সম্মিলনীর কর্ম্মীরা আগামী ১ বৎসরকাল কলিকাতা ও সহরতলীর বিভিন্ন কেন্দ্রে এই উৎসব সম্পাদন করিবেন স্থির করিয়াছেন। সেদিনের সভায় রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র পৌরহিত্য করেন ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য সভার উদ্বোধন করেন। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে সকলকে সম্বর্দ্ধনা করিলে, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, কবি অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, কবি প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী প্রভৃতি কবিবর নবীনচন্দ্রের কাব্যালোচনা করিয়া বক্তৃতা করিয়া-



নবীনচন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবে উপস্থিত সাহিত্যিকবৃন্দ

ফটো—শ্রীনীরেন ভাদুড়ী

ছিলেন। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র যাহাতে আগামী এক বৎসর ধরিয়া নবীনচন্দ্রের সাহিত্য আলোচিত হয়, সেজন্য দেশের সকলকে ব্যবস্থা করিতেও অনুরোধ করা হইয়াছে।

অর্থসচিবের ঘোষণা—

গত ২৭শে মার্চ্চ দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভায় অর্থসচিব কয়েকটি প্রয়োজনীয় ঘোষণা করিয়াছেন—(১) আগামী ১লা জুলাই হইতে পোষ্টকার্ডের মূল্য কমাইয়া ৩ পয়সা স্থলে ২ পয়সা করা হইবে, তাহার ফলে গভর্ণমেণ্টের আয় কমিবে—১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা (২) কেরোসিন শুল্ক গ্যালন প্রতি ৯ পাইএর পরিবর্ত্তে ৬ পাই কমান হইবে—ফলে সরকারের ক্ষতি হইবে ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা (৩) দিয়াশলাইএর বাক্সের দাম ৩ পয়সা স্থলে ২ পয়

হইবে—ফলে সরকারের আয় কমিবে দেড় কোটি টাকা। সুপারীর শুল্ক ২ আনা স্থলে ৬ পয়সা করা হইবে—আয় কমিবে ৫৫ লক্ষ টাকা (৫) সুপারী ক্রয় বিক্রয় ও উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট ৩ লক্ষ টাকা স্থলে বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন (৬) কাঁচা ফিল্মের শুল্ক ৬ পাই হইতে কমাইয়া ৩ পাই করা হইবে—ফলে সরকারের আয় কমিবে ২৫ লক্ষ টাকা।

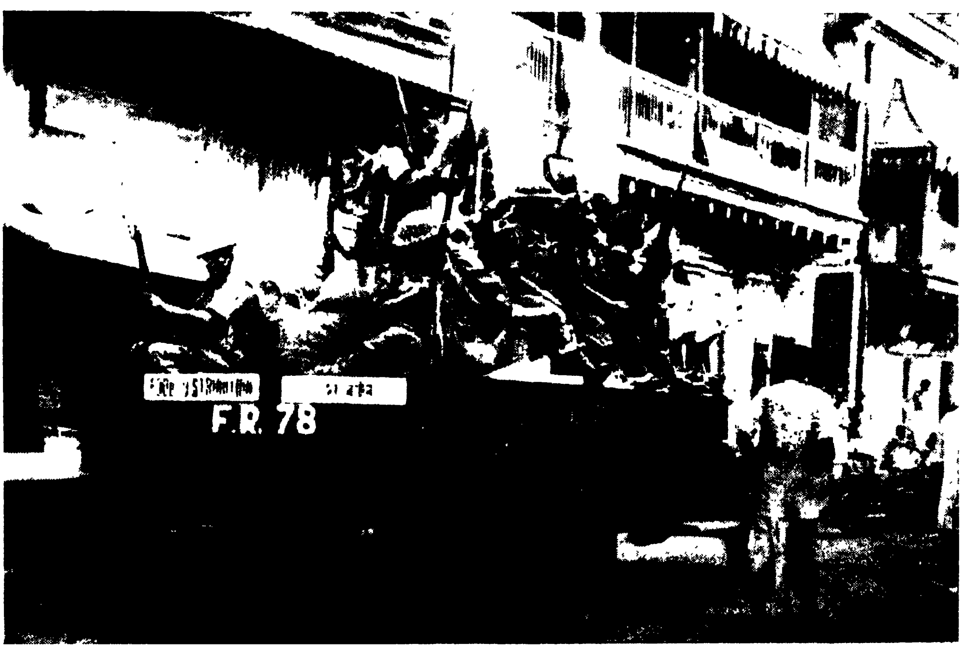
ঐ দিন ভারত গভর্ণমেণ্টের অর্থবিল পরিষদে ৬৭—৫৯ ভোটে গৃহীত হয়। মুসলেম লীগদল গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ভোট দেন—কংগ্রেসদল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন।

কমিশনে ভারতীয় নিয়োগ—

সম্প্রতি যে নূতন সম্মিলিত জাতিসংঘ (U. N. O.) গঠিত হইয়াছে তাহার অর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের প্রথম অধিবেশনে নিম্নলিখিত ভারতীয়গণকে সদস্য করা হইয়াছে—(১) মানবের অধিকার সম্পর্কিত কমিশন—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী (২) সংখ্যাতত্ত্ব সংক্রান্ত কমিশন—অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ (৩) যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সংক্রান্ত কমিশন—সার গুরুনাথ বেউর। এই সকল পদ-লাভ ভারতের পক্ষে সম্মানজনক সন্দেহ নাই—সংঘ কি ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় কোন প্রকার সা করিবে না ?

বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি—

সম্প্রতি ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশ সভাপতি, শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষকে সাধারণ সম্প ও শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিতকে কোষাধ্যক্ষ করিয়া নি ভারত বঙ্গ ভাষা প্রসার সমিতিকে ১৮৬০ সালের আইনে রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। ১৩৪৫ সালে হী নাথ দত্ত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, গুরুসদয় দত্ত, কুমার সরকার প্রভৃতির চেষ্টায় সমিতি তাহার আন্দো আরম্ভ করিয়াছিল। বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালার বাহিরে ভারতে ও বিশ্বে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বহুল প্রচা উদ্দেশ্যে এই সমিতি স্থাপিত। সমিতি বহু সাধু উ লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এ বিষয়ে দেশব সকলের সহযোগিতা ও সাহায্য পাইলে সমিতির কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হইবে।



রেশনের খাদ্যাদির পাহারায় সশস্ত্র ফৌজ ফটো—পান্না সেন

শ্রীযুক্ত পি-সি-সরকার—

সুপ্রসিদ্ধ যাদুকর পি-সি-সরকার মহাশয় সম্প্রতি আমেরিকার যাদুকর সম্মিলনীর ভারতীয় সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া তাঁহাদের পদক পুরস্কার পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সরকার ইতিপূর্ব্বে ১৯৩৬ সালে ইংলণ্ডের যাদুকর সম্মিলনীর



পি-সি-সরকার

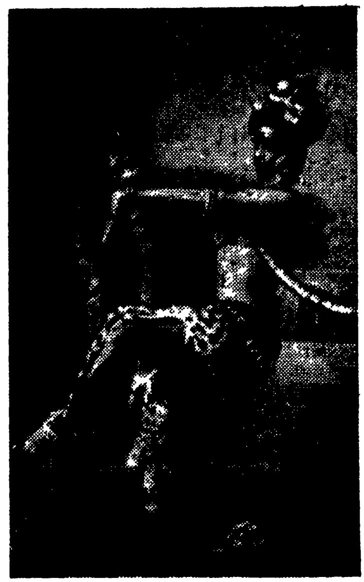
'সম্মানিত সদস্য' ও তৎপর ১৯৩৭ সালে জাপানে অবস্থান-কালে টোকিও যাদুকর সম্মিলনীর (সমগ্র এসিয়া ও ইউরোপবাসিদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম) 'সম্মানিত সদস্য' নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

বিক্রয়-করবৃদ্ধির প্রতিবাদ—

বাঙ্গালা দেশে বিক্রয়-কর বর্দ্ধিত করিয়া ৩ পয়সার স্থলে ৪ পয়সা করা হইলে কলিকাতা ও সহরতলীর প্রায় ১৫ হাজার বিক্রেতা গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৮ দিন হরতাল করিয়া নিজ নিজ দোকান বন্ধ রাখিয়াছিলেন। ক্রমে ঐ হরতাল মফঃস্বলের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার গভর্ণর বলেন—আপাততঃ কর বাড়ান হইবে না —যাহা ছিল তাহাই কষ্টকর। এই ব্যবস্থার ১৮ দিন পরে গত ৫ই মার্চ্চ হইতে সহরের দোকানপাট খুলিয়াছে। এ বিষয়ে সকলের একতা ও ত্যাগস্বীকার প্রশংসনীয়।

নৃত্যশিল্পী শ্রীবিমলেন্দু বসু—

ভারতীয় নৃত্যের গবেষক শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু বসু গত ১৮ বৎসর ধরিয়া প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধে আলোচনা



শ্রীবিমলেন্দু বসু

করিতেছেন। তিনি নিজে নৃত্যশিল্পী—হিন্দু দেবদেবী নৃত্যে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা বর্ত্তমান।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর স্মৃতিরক্ষা—

খ্যাতনামা দেশসেবিকা কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী স্মৃতিরক্ষা কল্পে কলিকাতায় এক কমিটি গঠিত হইয়াছে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাহার সভানেত্রী এবং কলিকা ১৫ চিত্তরঞ্জন এভেনিউর আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্সের শ্রীযু সুরেশচন্দ্র রায় কমিটির সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হইয়াছেন শ্রীযুক্তা নাইডু এই কমিটির অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে বি উদ্যোগী হইয়াছেন—বাঙ্গালী মাত্রেরই এ বিষয়ে উৎসা হওয়া উচিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার ডক্টর হাস লক্ষ্ণৌয়ে ট্রেণ দুর্ঘটনায় আহত হইয়া দীর্ঘকাল ছুটী লওয় ডক্টর শ্রীযুত নলিনীমোহন বসু উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থা ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ঢাকা বি বিদ্যালয়ের গণিতের প্রধান অধ্যাপক।

কসৌলী সহরে সরস্বতী পূজা—

পাঞ্জাবের কসৌলী সহরে মাত্র ৪ ঘর স্থায়ী বাঙ্গালী পরিবার বাস করেন। মধ্যে মধ্যে ২।১টি মিলিটারী বাঙ্গালী পরিবার তথায় গমন করেন। স্থানীয় স্বাস্থ্য-নিবাসের বাঙ্গালীদের সহযোগিতায় সকলে মিলিয়া এবার সারস্বত উৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। সকালে ও সন্ধ্যায় গীতবাদ্য, আবৃত্তি ও হাস্যকৌতুকের ব্যবস্থা হইয়াছিল। উৎসবে হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল বাঙ্গালী যোগদান করিয়াছিলেন।



প্রবাসী বাঙ্গালী সারস্বত সম্মেলন—কসৌলী

পরলোকে নন্দরাণী ঘোষ—

বিহার ভাগলপুরনিবাসী জমীদার ও এডভোকেট রায় সাহেব শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ ঘোষের পত্নী নন্দরাণী ঘোষ সম্প্রতি ৪৩ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা আহিরীটোলার অপূর্ব্বকৃষ্ণ মিত্রের কন্যা—বাল্যে পিতৃহীন হইয়া সময় সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের নিকট প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণ-ভামিনী দাসের ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া আদর্শ চরিত্র ও কার্য্যশক্তি লাভ করিয়াছিলেন।



নন্দরাণী ঘোষ

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিরোধ সংগ্রাম—

দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেণ্টে ভারতীয় নাগরিক অধিকার বিরোধী বিল পেশ করার প্রতিবাদে গত ২৬শে মার্চ্চ হইতে ঐ দেশের সর্ব্বত্র ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান-সমূহ বন্ধ রাখা হইয়াছে। ট্রান্সভালের ভারতীয়গণ পূর্ণ হরতাল ঘোষণা করিয়াছেন। ট্রান্সভালের বি কেন্দ্রে সভানুষ্ঠান করা হয় ও জোহান্সবার্গে বহু সিটি হলে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হয়। তথায় এক বি জনসভায় এসিয়াবাসী ভূমি ব্যবস্থা বিলের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থ ও সম্মিলিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আহ জানান হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী—

খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী গত ২ মার্চ্চ মঙ্গলবার প্রেসিডেন্সি জেল হইতে মুক্তি করিয়াছেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা আশঙ্কাজনক হ ছিল। বহুদিন হইতে তিনি জেলে বহু রোগে ভুগিতেছে এখন স্বগৃহে কিছুকাল বিশ্রাম গ্রহণ করিলে হয় ত তাঁ স্বাস্থ্য ভাল হইতে পারে। আমরা তাঁহাকে স্বাগত সম্ভ জ্ঞাপন করি

জমাদার জামান খান—

আজাদ-হিন্দ-ফৌজের নেতা জমাদার জামান খা দিল্লীতে সামরিক আদালতে বিচার হইয়াছিল। বি তিনি মুক্তিলাভ কারিয়াছেন। সহকারী জঙ্গীলাট ঐ অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

পরলোকে অঘোরনাথ অধিকারী—

খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী রায় বাহাদুর অঘোর অধিকারী সম্প্রতি ৮০ বৎসর বয়সে বালীগঞ্জ হিন্দু পার্কস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯২৩ স

অবসর গ্রহণের পর হইতে তিনি বহু জনসেবা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি



অঘোরনাথ অধিকারী

হু গ্রন্থেরও রচয়িতা ছিলেন। শিক্ষকতা করার সময় তনি আদমসুমারী সম্পর্কিত কাজ করিয়া বিলাতের রয়াল নথ্‌পলজিকাল সোসাইটির সভ্য হইয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমার সম্বর্দ্ধনা—

গত ৩০শে মার্চ্চ সন্ধ্যায় কলিকাতা কর্পোরেশনের মার্সিয়াল মিউজিয়াম হলে খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীযুত ালকান্তি বসুর সভাপতিত্বে সাহিত্য বাসরের উদ্যোগে নুষ্ঠিত এক সভায় বিখ্যাত ব্যবসায়ী, সাহিত্যিক ও দেশ-র্ম্মী শ্রীযুত অক্ষয়কুমার নন্দীর ৬৬ তম জন্মতিথি উপলক্ষে াহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। শ্রীযুক্তা প্রভাবতী বী সরস্বতী, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কবিরাজ যুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, শ্রীযুক্ত মৃণালচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, যুক্ত শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার য়চৌধুরী অক্ষয়কুমারের প্রতিভা সম্বন্ধে সভায় বক্তৃতা রিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন সাহা—

নয়া-দিল্লীর সরকারী সরবরাহ বিভাগের কেমিকেলের পুটী ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন সাহা সম্প্রতি বেলজিয়াম ব্রুসেলসে আন্তর্জাতিক ক্ষতিপূরণ এজেন্সিতে কেমিকেল বিভাগের ডেপুটী ডিরেকটার নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। সাহা মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। তিনি আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র



শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন সাহা এম-এস-সি

রায়ের গবেষণাগারে কাজ করিয়াছেন। তিনি চাকরী করার সময় যোধপুর রাজ্যে সোডিয়াম সালফেটের আবিষ্কার করিয়া ভারতের চাহিদা মিটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি ভারতের বাহিরে ভারতীয়ের সম্মান বৃদ্ধি করিবেন, সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষাসমিতি—

নিখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় জানাইয়াছেন যে, গত ২৫শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সমিতির ভাণ্ডারে মোট ১২ লক্ষ ১৯ হাজার ১শত ১৬ টাকা ৯ আনা ১০ পাই সংগৃহীত হইয়াছে। কবিগুরুর আগামী জন্মদিবসের পূর্ব্বে ২৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। সেজন্য দেশবাসী

সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে—অর্থাদি ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন বা ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীটে পাঠাইতে হইবে।

পরলোকে নীহারকণা দত্ত—

দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত মধুবনী রামকৃষ্ণ কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীমান অরুণকুমার দত্তের সহধর্ম্মিণী নীহারকণা দত্ত পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের কনিষ্ঠা পৌত্রী ছিলেন।

বোম্বায়ে নাট্য পরিষদ—

জানা গিয়াছে বোম্বাইপ্রবাসী বাঙ্গালীগণ "প্রবাসী নাট্য পরিষদ" নামে একটী সৌখিন নাট্যসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরের জন্ত নিম্নলিখিত নাট্যামোদীদের লইয়া একটী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। সভাপতি—শ্রীনরেশচন্দ্র ঘটক, সহ-সভাপতি—শ্রীতারু মিত্র, সম্পাদক—শ্রীরেবতীমোহন ভদ্র, সহ-সম্পাদক—শ্রীকল্যাণ সেন এবং বিনয় চ্যাটার্জ্জী, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীপান্না বোস। ইহা ছাড়া শ্রীঅশোক সরকার, শ্রীকেষ্ট গুপ্ত, শ্রীসুকুমার দাশগুপ্ত, শ্রীউপেন রায়, শ্রীমনীশ মুখার্জ্জী শ্রীখগেশ ব্যানার্জ্জী, শ্রীসুকু দাশগুপ্ত ও শ্রীনিতাই ঘোষ প্রভৃতি উক্ত সমিতিতে আছেন।

নূতন ডি-এস্-সি :—

সিটি কলেজের রসায়নের অধ্যাপক শ্রীযুত কানাইলাল মণ্ডল শুদ্ধ রসায়নের গবেষণার জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের ডি-এস্-সি ডিগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর এম্-এস্-সি ও বৈজ্ঞানিক হিসাবে সাধারণের নিকট সুপরিচিত।

মহিলার সম্মান—

ডক্টর রমা চৌধুরী এম্-এ, ডি-ফিল্ (অক্সন) রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটী অফ্ বেঙ্গলের ফেলো নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এ সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। ডক্টর চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের কৃতী ছাত্রী; তিনি আই-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় এবং বি-এ অনার্স এবং এম-এ পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বর্ত্তমানে তিনি লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপিকা এবং "প্রাচ্যবাণী" গবেষণাগারের যুগ্ম-সম্পাদিকা। তি[ni] ৺আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের পৌত্রী এবং প্রেসিডে[ন্সি] কলেজের অধ্যাপক ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর পত্নী।



কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে পণ্ডিত জহরলালের বক্তৃতা

ফটো—পান্না

মহাজাতিসদন—

"ভারতবর্ষ" চৈত্র সংখ্যায় "আজাদ হিন্দের অ[...] শীর্ষক প্রবন্ধের শেষাংশে লেখক শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজু[মদার] কলিকাতা, তথা বঙ্গ ও ভারতবাসীকে ভারতে নে[তাজী] সুভাষচন্দ্রের শেষ অবদান মহাজাতি সদন সম্পর্কে অ[...] হইবার জন্ত যে আকুল আবেদন করিয়াছেন, অ[...] তাহার সহিত সম্পূর্ণ একমত। বিজয়রত্নবাবুর [...] আমরাও মনে করি যে সুভাষচন্দ্রের আরব্ধ কার্য্যটি আমরা সম্পূর্ণ করিতে না পারি তাহা হইলে নেত[াজীর] প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের ভিতরে আন্তরি[কতার] অভাব বলিয়াই বিবেচিত হইবে। আজ বাঙ্গলা[র] ঘরে ঘরে নেতাজীর প্রতিকৃতি, আজ আবালবৃদ্ধব[নিতার] কণ্ঠে কণ্ঠে 'জয় হিন্দ' ধ্বনি! কি ভারতের রাষ্ট্রে সমাজে নেতাজীর প্রভাব আজ মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের [ন্যায়] প্রদীপ্ত। কিন্তু মহাজাতি সদন সম্পর্কে জাতির নি[...]

দেখিয়া লেখক যে দ্বিধাভরে প্রশ্ন করিয়াছেন "আমাদের মমত্ব কি এতই অসার, এতই ভঙ্গুর?"—তাহার উত্তরে আমরা কি বলিতে পারি? বহু পাঠক পাঠিকা এই প্রশ্ন করিয়া আমাদের পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায় যে দেশ বা জাতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন নহেন। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে সচেতন হইলে দেশের লোকের উৎসাহ ও সহায়তার অভাব হইবে না বলিয়াই আমাদের মনে হইতেছে। এ বিষয়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাথমিক দায়িত্ব আছে। যে ভূমিখণ্ডের উপরে নেতাজীর মহাজাতি সদনের কঙ্কাল অবস্থিত, কলিকাতা কর্পোরেশন সেই ভূমিখণ্ডের অধিকারী। সুভাষ-অনুরাগী কাউন্সিলারগণ উদ্যোগী হইলে, মহাজাতি সদন রাহুগ্রাসমুক্ত হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে বাঙ্গলার আইন সভাদি গঠিত হইবে, প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট প্রদেশের অধিবাসীদিগের হাতেই আসিবে। আইনগত অসুবিধা যদি থাকে, আইন সভার চেষ্টায় তাহাও বিদূরিত হইতে পারিবে। বিজয়রত্নবাবুর সহিত আমরাও বিশ্বাস করি যে, যে-চল্লিশ লক্ষ নরনারী কলিকাতা সহরে বাস করেন, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়া মহাজাতি সদনের সম্মুখ দিয়া যাঁহারা গতায়াত করেন, মাসে একটি করিয়া টাকা পূজার থালায় রাখিয়া গেলে, অল্পকাল মধ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে। একটি উৎসাহসম্পন্ন উদ্যোগী কর্ম্ম-পরিষদ গঠিত হইলে অত্যল্পকাল মধ্যেই নেতাজীর সাধনার মন্দিরটি গঠিত হইতে পারে। দেশের তরুণ-তরুণী সম্প্রদায়কে আমরা এ বিষয়ে অবিলম্বে অবহিত হইতে দেখিতে চাই।

লক্ষ্যায় মিলন মন্দির উৎসব—

গত ২৮শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল থানার অন্তর্গত লক্ষ্যা গ্রামে ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে এক বিরাট মিলন উৎসব হইয়া গিয়াছে। ঐ অঞ্চলের ২৫ হাজার লোক ঐদিন তথায় সমবেত হইয়া যজ্ঞে আহুতি দান ও প্রসাদগ্রহণ করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট মিলন সভা হয় ও তাহাতে শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রধান বক্তা হইয়া জাগরণ আন্দোলন ও বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের প্রয়োজন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সংঘের সভাপতি স্বামী সচ্চিদানন্দজী তথায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি দেবেন্দ্রবাবু স্বাধীনতা আন্দোলন ও দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রেল-ষ্টেশন হইতে



লক্ষ্যার সভার পথে সভাপতি ও প্রধান অতিথি

২৮ মাইল দূরে এক গ্রামে এরূপ বিপুল উৎসব সত্যই অসাধারণ। সংঘের কর্ম্মীরা ১৯৪২ সালে ঝড়ের সময় ঐ অঞ্চলে সাহায্যদান করিতে যাইয়া দুইটি স্থানে ঐরূপ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া জন-জাগরণের আন্দোলন চালাইতেছেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণের চেষ্টা, যত্ন ও উৎসাহ প্রশংসনীয়।

সাহিত্যিক রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী—

খ্যাতনামা কবি ও কথাসাহিত্যিক রাধাচরণ চক্রবর্ত্তীর বাসস্থান রাজসাহী জেলার নাটোরের অধিবাসীরা গত ২২শে মার্চ্চ শুক্রবার নাটোর রিক্রিয়েসন ক্লাবহলে তাঁহার



নাটোর সাহিত্য সভায় স্থানীয় ব্যক্তিগণসহ সভাপতি ও প্রধান অতিথি

জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। রাধাচরণের মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরেও এই অনুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ উৎসবে পৌরোহিত্য করেন এবং "তরুণ সাহিত্যিক সংঘের" সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রণজিৎ মুখোপাধ্যায় সভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। স্থানীয় কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, কবি শ্রীগজেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার প্রভৃতির উৎসাহে নাটোরে রাধাচরণবাবুর স্মৃতি স্থায়ীভাবে রক্ষা করার ব্যবস্থা হইতেছে।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসস্থান ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণেশ্বর গ্রামে। ঐ গ্রামের তরুণবৃন্দ গত ৪ বৎসর তাঁহার বাসগৃহের



শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২৩শে মার্চ্চ গৃহীত) ফটো—নীরেন ভাদুড়ী

প্রাঙ্গণে কেদারনাথের জন্মোৎসব সম্পাদন করিতেছিলেন। এবার গত ২৩শে মার্চ্চ শনিবার তথায় তাঁহার ৮৪ তম জন্মদিবস বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এবার কেদারনাথ নিজে আসিয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। ঐ উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত এক মণ্ডপে সভার অধিবেশন হয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী সভায় স্বস্তিবাচন করেন ও স্বরচিত এক সংস্কৃত কবিতায় কেদারনাথকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সভায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ও শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী বক্তৃতা ও কবিতা পাঠ করিয়া কেদারনাথকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেন। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কানাই বসু, শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী প্রমুখ বহু লেখক ও কবি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেদারনাথ এক চমৎকার লিখিত-ভাষণ পাঠ করিয়া তাঁহার সাহিত্য সেবার ইতিহাস সভায় বিবৃত করেন ও সভাপতি মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া কেদার-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সকলকে জানাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উদ্যোক্তাদের পক্ষ হইতে সকলকে সাদর সম্বর্দ্ধনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সম্বর্দ্ধনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের যত্ন ও চেষ্টায় উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

৩১শে মার্চ্চ হুগলী-চুঁচড়ায় মহসীন কলেজে বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভায় কেদারনাথ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—কেদারনাথ সে উৎসবেও যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় রবিচক্র ও মিতা সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কেদারনাথকে মানপত্র দান করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুবোধ রায়ের উদ্যোগে এই উৎসবও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছিল।

সীমান্তপ্রদেশে নূতন মন্ত্রিসভা—

সীমান্ত প্রদেশে গত ৭ই মার্চ্চ নূতন কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। ডাক্তার খানসাহেব নূতন প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন এবং কাজি আতাউল্লা খাঁ, লালা মেহেরচাঁদ খান্না ও খাঁ মহম্মদ ইয়াহা জান মন্ত্রী হইয়াছেন।

ভীষণ রেল দুর্ঘটনা—

গত ৪ঠা মার্চ্চ সোমবার লক্ষ্ণৌ হইতে ৪৮ মাইল দূরে বাঘালি নামক স্থানে রেল দুর্ঘটনায় মোট ৪০জন লোক নিহত ও ৫৬জন আহত হইয়াছে বলিয়া রেল কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। ডাউন ডেরাডুন এক্সপ্রেসে ইহারা সকল যাত্রী ছিলেন। ভাঙ্গা গাড়ীর মধ্যে আরও মৃতদেহ আছে কিনা জানা যায় নাই।

পরলোকে ডাঃ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—



যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

অবসর প্রাপ্ত সিভিল-সার্জ্জন ও দয়ালবাগের প্রধানতম চিকিৎসক ডাঃ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার ৬৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল। যতীন্দ্রবাবু অমায়িক, সদালাপী, ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। ইঁহার পুত্রদের মধ্যে ডাঃ সুধামাধব সেনগুপ্ত অন্যতম।

দিল্লীতে বিজয় উৎসব—

গত ৭ই মার্চ্চ দিল্লীতে গভর্ণমেণ্টপক্ষ হইতে বিজয়-উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। সেইদিন একদল লোক উক্ত উৎসবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবার জন্য পথে বাহির হইলে পুলিশ তাহাদের উপর গুলীবর্ষণ করে ও তাহার ফলে ৫ জন লোক নিহত ও ২০ জন আহত হয়। ফলে সহরে হরতাল রক্ষিত হয় ও ২।৩ দিন সব দোকান বন্ধ থাকে। বিজয়-উৎসবের জন্য পথে পথে যে সকল তোরণাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেগুলিও বিক্ষোভকারীরা পুড়াইয়া দিয়াছিল।

যুক্তপ্রদেশে মন্ত্রিসভা—

গত ১লা এপ্রিল হইতে যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছে—পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন এবং রফি আমেদ কিদওয়াই, ডাক্তার কৈলাসনাথ কাটজু, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, হাফিজ মহম্মদ-ইব্রাহিম ও শ্রীসম্পূর্ণানন্দ মন্ত্রী হইয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম ১১জন আটক বন্দীর মুক্তির আদেশ দান করিয়াছেন।

রাণাঘাটে সাহিত্য সভা—

গত ১০ই চৈত্র রবিবারে রাণাঘাট মিলন সঙ্ঘের প্রাঙ্গণে সাহিত্য বিভাগের উদ্বোধন উৎসব হয়। খ্যাতনামা কথা-শিল্পী ও নাট্যকার শ্রীযুত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। চিত্র পরিচালক শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডিঃ জিঃ), কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন, মৃণাল



রাণাঘাটে সাহিত্য সভায় উপস্থিত সুধীবৃন্দ

সেন প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রথমে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত দেবনারায়ণ গুপ্ত তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন ও সভাপতি মহাশয়কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

সভাপতি শ্রীযুত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতার পর শ্রীযুত সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় একটী প্রবন্ধ ও শ্রীযুত অনাদিনাথ চক্রবর্ত্তী একটী কবিতা পাঠ করেন। তাহার পর প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রধান বিচারকের আসন গ্রহণ করেন।

বিহারে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা—

গত ২রা এপ্রিল বিহারে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, বাবু অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ ডাক্তার সৈয়দ মামুদ ঐ দিন মন্ত্রিত্বের শপথ গ্রহণ করিয়া তখনই শ্রীযুক্ত জগলাল চৌধুরীর কারামুক্তির ব্যবস্থা করেন ও তাঁহাকে চতুর্থ মন্ত্রিপদ প্রদান করেন। চৌধুরী মহাশয় আগষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন ও কারাগারে থাকিয়াই ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নূতন মন্ত্রীরা বলিয়াছেন—তাঁহারা সকল কাজ ফেলিয়া রাখিয়া দেশবাসীর খাদ্য ও বস্ত্র সমস্যা সমাধানের উপায় স্থির করিবেন।



শান্তিনিকেতনে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ফটো—তারক দাস

বাঙ্গালায় খাদ্য-সম্ভার বিনষ্ট—

লণ্ডনের 'ডেলী-মিরর' পত্রে ৩রা এপ্রিল প্রকাশিত এক সংবাদ হইতে জানা যায়—কলিকাতাস্থ মার্কিণ সৈন্যগণ কয়েক হাজার টন খাদ্য জাহাজে করিয়া মার্কিণে ফেরত পাঠানো অপেক্ষা নষ্ট করিয়া ফেলা ভাল মনে করিয়া সেই সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করিয়াছে। কাঁচড়া-পাড়ায় তাহারা বহু বেতার যন্ত্র, কম্প্রেসার প্রভৃতি ইচ্ছা ভারতের অর্দ্ধেক লোক অনাহারে দিনযাপন করিতে সে সময়ে কয়েক হাজার টন খাদ্য নষ্ট করিয়া ফে কিরূপ বুদ্ধির পরিচায়ক, তাহা পরাধীন ভারতবাসী পক্ষে বুঝা কঠিন।



উত্তরায়ণে পণ্ডিত জহরলাল ফটো—তারক দাস

পাঞ্জাবে নূতন মন্ত্রিসভা—

গত ১১ই মার্চ্চ পাঞ্জাবে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে তথায় লীগ সদস্যরামন্ত্রিসভায় যোগদান করেন নাই। কংগ্রে ও আকালী দল মিলিয়া মোট ৪জন সদস্য লইয়া মন্ত্রিসভ হইয়াছে—(১) নবাব মালিক সার খিজির হায়াৎ খাঁ প্রধান মন্ত্রী (২) সর্দ্দার বলদেব সিং (৩) নবাব সা মজঃফর আলি খাঁ (৪) লালা ভীমসেন সাচার।

কনভোকেসন ও পণ্ডিত নেহরু—

গত ৯ই মার্চ্চ শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেসন উৎসব হইয়া গিয়াছে, তাহার সর্ব্ব প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর ভাষণ। গ কয় বৎসর যাবৎ ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কন ভোকেসন উৎসবেই কোন না কোন পণ্ডিত ব্যক্তিকে ভাষ দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হইতেছে। পণ্ডিত নেহরু





কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন-
ভোকেশনে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ
মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত জহরলাল,
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং
বাঙ্গালার গভর্ণর সার
ফ্রেডরিক বারোজ
ফটো—পান্না সেন

দক্ষিণে—
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে
ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চান্সেলার ডক্‌টর
রাধাবিনোদ পাল
ফটো—পান্না সেন

বামে—
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন-
ভোকেশনে পণ্ডিত জহরলাল
ফটো—পান্না সেন



দিয়া উল্লেখযোগ্য। উৎসবে যথারীতি গভর্ণর মিঃ বারোজ সভাপতিত্ব করেন এবং ভাইস চ্যান্সেলার ডক্টর রাধাবিনোদপাল বক্তৃতা করেন। ডাঃ পাল ছাত্রগণের শৌর্য্য ও বীর্য্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতজীর ভাষণে একটুও উত্তেজনা ছিল না। তিনি ধীরভাবে এশিয়ার নব



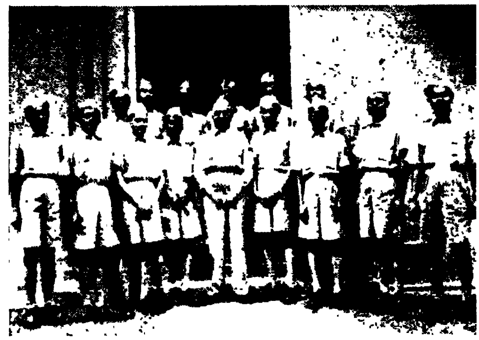
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে সার বারোজের বক্তৃতা

ফটো—পান্না সেন

জাগরণ ও ভবিষ্যৎ এশিয়ার রাষ্ট্রসংঘের কথা বিবৃত করেন। বাঙ্গালা দেশের সুমধুর বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করিতে তাঁহার অক্ষমতার জন্য তিনি সর্ব্বপ্রথমেই দুঃখ প্রকাশ করেন। প্রায় ৪০ মিনিট ধরিয়া তিনি বক্তৃতা করেন, কোন লিখিত ভাষণ ছিল না। জহরলাল শুধু রাজনীতিক নেতা নহেন, একজন বিরাট ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি, তাহা তাঁহার ভাষণ শুনিয়াই বুঝা গিয়াছিল। তিনি স্বাধীন ভারতের গঠন কার্য্য পরিচালনার উপযুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তি তৈয়ার করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।

মালয়গামী মেডিকেল মিশন—

গত ১লা এপ্রিল কলিকাতায় বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানার গুদামে কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মালয়গামী কংগ্রেস মেডিকেল মিশনের সদস্যবৃন্দকে এক সভায় সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। আজাদ সাহেব বলিয়াছেন, আপনারা শুধু তাহাদের চিকিৎসায় সাহায্য করিবেন না, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকে সেবা



কংগ্রেস মেডিকেল মিশনের সভ্যাগণ—ডিরেক্টর সহ

ফটো—তারক দাস

করিবেন ও সকলের প্রতি ভারতের গভীর সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিবেন। মিশনের উদ্যোক্তা ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বলেন—মিশনের জন্য ১লক্ষ ৩০ হাজার



কংগ্রেস মেডিকেল মিশনের সভ্যাগণের সহিত
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ফটো—তারক দাস

টাকা প্রয়োজন, তন্মধ্যে মাত্র ৬০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ৩জন সদস্য এই মিশনের সহিত মালয়ে যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের যাওয়ার অনুমতি দেন নাই। ৩৯২ মণ ঔষধ পত্র মিশনের সহিত মালয়ে গিয়াছে। ডাক্তার এস-আর-চোলকার মিশনের পরিচালক হইয়া গিয়াছেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র—

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রচার-সম্পাদক মিঃ কে-ই-গণপতি গত ৪ঠা এপ্রিল মাদ্রাজে প্রকাশ করিয়াছেন যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু মাঞ্চুরিয়াতে আছেন ও তিনি ভালই আছেন। মালয়ের মাতৃভাষায় প্রকাশিত 'সেবিকা' নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে বেতারে সুভাষ-চন্দ্রের মাঞ্চুরিয়া হইতে প্রদত্ত বক্তৃতা শোনা গিয়াছে। আবার ৩রা এপ্রিল নেত্রকোণায় আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ক্যাপ্টেন মীর সুলতান বলিয়াছেন যে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস নেতাজী ২৬ হাজার আজাদ-হিন্দ-ফৌজ লইয়া বর্ত্তমানে রুশিয়ায় আছেন। পাতিয়ালায় ৩রা এপ্রিল ডাক্তার একরাম হোসেন বলিয়াছেন যে, নেতাজীর ব্যক্তিগত উপদেষ্টার নিকট হইতে তিনি সংবাদ পাইয়াছেন যে সুভাষচন্দ্র জীবিত আছেন ও কোন নিরাপদ স্থানে বাস করিতেছেন। লাহোরের 'সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট' নামক সংবাদপত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে যে নেতাজী গত ১৯শে ডিসেম্বর মাঞ্চুরিয়া হইতে বেতারে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বোম্বায়ে নূতন মন্ত্রিসভা—

বোম্বায়ে ৩রা এপ্রিল হইতে নূতন কংগ্রেস মন্ত্রিসভা দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত বি-জি-খের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন এবং মোরারজী দেশাই, ডাঃ এম-ডি-ডি-গিল্‌ডার, দিনকর রাও দেশাই, বৈকুণ্ঠলাল মেহতা, এল-এম-পটিল, গুলজারিলাল নন্দ, এম-পি-পটিল, গোবিন্দ-দাস বার্ত্তক ও জি-ডি-তাপাসে (হরিজন) মন্ত্রী হইয়াছেন। এখনও মুসলমান মন্ত্রী স্থির হয় নাই।

বাঙ্গালায় নির্ব্বাচন প্রহসন—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচনে জয়-লাভের জন্য মুসলিম লীগের গুণ্ডামি ও নানাপ্রকার অসাধু উপায় অবলম্বনের কথা উল্লেখ করিয়া রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। উহা ৪ঠা এপ্রিল দিল্লী হইতে প্রচারিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—বাংলা দেশে নির্ব্বাচন একটি প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। নির্ব্বাচন বলিতে সাধারণত যাহা বুঝায় প্রকৃত পক্ষে সে অর্থে বাঙ্গালা দেশে কোন্ নির্ব্বাচনই হয় নাই। বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে সরকারী কর্ম্মচারীরা প্রকাশ্য-ভাবে লীগ পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য যদি একটি নিরপেক্ষ ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়, তাহা হইলে উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের পক্ষপাতিত্ব, বাধাদান, কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা ও লীগকে সাহায্য করার বহু দৃষ্টান্ত ধরা পড়িয়া যাইবে।

মিলিটারী মোটর ও জনগণ—

গত কিছুদিন হইতে কলিকাতা সহরে মিলিটারী লরী কোন পথিককে চাপা দিলে তৎক্ষণাৎ জনসাধারণ সে গাড়ী আটক করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া লরী জ্বালাইয়া দিতেছে। এইরূপে কয়েকটি স্থানে মিলিটারী



উত্তেজিত জনতা কর্ত্তৃক একটি মিলিটারী লরীতে অগ্নি সংযোগ

ফটো—পান্না সেন

লরী ও মোটর সাইকেল জ্বালাইয়া দেওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। যুদ্ধ বহুদিন থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও প্রায় প্রত্যহ কোন না কোন স্থানে লোক মিলিটারী লরী চাপা পড়িয়া মারা যাইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ ইহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করেন না।

প্রতিনিধিদলের পরিকল্পনা—

গত ১লা এপ্রিল দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মিলনে সার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স বলিয়াছেন—বৃটিশ মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিগণ শাসনতান্ত্রিক সমস্যার মীমাংসার জন্য কোন পরিকল্পনা স্থির করিয়া আসেন নাই। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ নিজেরাই একটা পরিকল্পনা স্থির করিয়া লইবেন, ইহাই প্রতিনিধিদল কামনা করেন। কোন এক সিদ্ধান্তে উপনীত

হওয়া সম্পর্কে বৃটীশ মন্ত্রিসভা প্রতিনিধিদলকে চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়াছেন।

কংগ্রেস ও পাকিস্থান—

সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল গত ৪ঠা এপ্রিল দিল্লীতে রয়টারের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে কংগ্রেস পাকিস্থানের প্রশ্নে কোন প্রকার আপোষ করিবে না। ভারতবর্ষ যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে, তবেই তাহা একটি প্রথম শ্রেণীর শক্তিরূপে গণ্য হইতে পারে। বিভক্ত ভারতকে অনিশ্চিত অবস্থায় এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয়ে সদাই শঙ্কিত থাকিতে হইবে। ভারতবর্ষ যদি বিভক্ত হয় তবে অর্থনীতির দিক দিয়াও তাহা পাকিস্থান ও হিন্দুস্থান উভয়ের পক্ষেই সমান সর্ব্বনাশকর হইবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হইয়া থাকিবে।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়—

গত ১১ই মার্চ্চ সন্ধ্যায় কলিকাতা যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে সাংবাদিকগণের এক সভায় বিদ্যালয়ের পরিচালক কমিটীর সভাপতি বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস বিদ্যালয়ের ও হাসপাতালের জন্য অর্থের আবেদন করেন। গত ৩০ বৎসর ধরিয়া বিদ্যালয়ের কাজ চলিলেও এখনও তথায় দারুণ অর্থাভাব আছে। বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিতরূপ কাজ হয়—(১) ১২৫জন রোগী রাখার মত হাসপাতাল—তৎসঙ্গে অস্ত্রোপচার ও মাতৃমঙ্গল ব্যবস্থা আছে, (২) বিভিন্ন বিভাগের আউট-ডোর হাসপাতাল, (৩) কলেজ, মিউজিয়াম ও লেবরেটারী, (৪) দেশীয় ভেষজ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য গবেষণা বিভাগ, (৫) পাতিপুকুরে ৫০জন রোগী রাখার মত যক্ষ্মা হাসপাতাল। প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয় ৬০ হাজার টাকা—কিন্তু বর্ত্তমান ব্যয় প্রায় লক্ষ টাকা। জনসাধারণ ও ধনীদিগের অর্থসাহায্য ব্যতীত এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা সম্ভব নহে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদ—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ২৫০। এবার নির্ব্বাচনে বিভিন্ন দলের সদস্য সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে—কংগ্রেস—৮৭, (একজন জেলে আছেন), মুসলেম লীগ—১১৩, হিন্দু মহাসভা—১, কম্যুনিষ্ট—৩, জাতীয়তাবাদী মুসলমান—৫, (তন্মধ্যে মিঃ এ-কে-ফজলল হক ২টি আসন দখল করিয়াছেন), স্বতন্ত্র মুসলমান—৪, ভারতীয় খৃষ্টান—২, স্বতন্ত্র হিন্দু—১, স্বতন্ত্র তপশীলভুক্ত—৪, তপশীল ফেডারেশন—১, এংলো ইণ্ডিয়ান—৪ ও শ্বেতাঙ্গ—২৫। এ অবস্থায় গভর্ণর সংখ্যা-গরিষ্ঠ লীগদলের নেতা মিঃ এচ-এস-সুরোবর্দ্দিকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আহ্বান করিয়াছেন।

সৈন্য ধর্ম্মঘট ও পণ্ডিত নেহরু—

জব্বলপুরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত সিগন্যাল দলের লোক ও অন্যান্যদের ধর্ম্মঘট সম্পর্কে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—"সেনাবাহিনীতে আমরা সকলেই নিয়মানুবর্ত্তিতা কামনা করি। কারণ নিয়মানুবর্ত্তিতা ব্যতীত কোন সেনাবাহিনী থাকিতে পারে না। কিন্তু নিয়মানুবর্ত্তিকাকে আজ নূতন পটভূমিকায় রাখিয়া দেখিতে হইবে। বিগত দিনের দাসসুলভ নিয়মানুবর্ত্তিতার দৃষ্টিতে আজ আর দেখিলে চলিবে না। এই সমস্যা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের সমস্যার ও স্বাধীনতার দৃষ্টিতে আমাদের অসামরিক ও সামরিক কাঠামো নূতন করিয়া গঠনের প্রশ্নের সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছে। পুরাতন পন্থায় কেবল দাবাইয়া রাখিয়া ও শাস্তি দিয়া কোন লাভ হইবে না। ইহা দ্বারা ভারতবর্ষকে দাবাইয়া রাখা ও শাস্তি দেওয়ার সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না। কারণ সমগ্র অবস্থা জটিলতর মাত্র করা হইবে। এই পন্থায় সকল সমাধান অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।"

মেজর জেনারেল চট্টোপাধ্যায়—

আজাদ হিন্দ-ফৌজের অন্যতম মন্ত্রী মেজর জেনারেল এ-সি-চট্টোপাধ্যায়কে গত ৯ই মার্চ্চ শনিবার রাত্রিতে রেঙ্গুন হইতে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। পরদিন রবিবার সকালে তাঁহাকে কলিকাতা হইতে বিমানযোগে দিল্লী লইয়া যাওয়া হইয়াছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লাহোরের সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ও পূর্ব্বে বাঙ্গালার সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেকটার ছিলেন। তাঁহার মুক্তির জন্য সারা বাঙ্গালায় আন্দোলন হইয়াছে।

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

কেন্দ্রীয় পরিষদে উত্তরাধিকার-কর বিল

লণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি প্রগতিশীল দেশে অর্থবান কোন ব্যক্তির ত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তির উপর বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তাঁহার পত্তির অংশের উপর গভর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট হারে কর বসাইয়া থাকেন। ষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারে এইভাবে লব্ধ বিপুল পরিমাণ অর্থ যে সরকারের ভূত সুবিধা করিয়া দেয় তাহা বলাই বাহুল্য। প্রথমে যাহাই হইয়া কুক, বিধান চালু হইয়া গিয়াছে বলিয়া এবং গভর্ণমেণ্টের আর্থিক গতি সম্বন্ধে জনসাধারণের দায়িত্ববোধ আছে বলিয়া এই করের জন্ত সকল দেশের অধিবাসী কোনরূপ গণ্ডগোল করেন না। ভারত-রকারের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, সাধারণ সময়েই এখানকার ভর্ণমেণ্ট অর্থাভাবের অজুহাতে জনস্বার্থমূলক কোন কাজে হাত তে ভরসা পাইতেন না, যুদ্ধের মধ্যে অবস্থা আরও হতাশজনক হইয়া ড়িয়াছে। যুদ্ধের ছয় বৎসরের মধ্যে নানাভাবে টানিয়া বাড়াইয়া ভর্ণমেণ্ট কিছু কিছু আয়বৃদ্ধি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ব্যয়, বিশেষ রিয়া সামরিক বিভাগের ব্যয় সেই অনুপাতে এত বেশী বাড়িয়া গিয়াছে , প্রতি বৎসরই বাজেটে প্রভূত পরিমাণে ঘাটতি দেখা দিয়াছে। যুদ্ধ শেষ ইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধোত্তর বাজেট হইলেও ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটেও র্ব্বসমেত সরকারের প্রায় ৪৯ কোটি টাকা ঘাটতি অনুমান করা হইয়াছে। যুদ্ধের মধ্যে সমরপরিচালনার নামে ভারতসরকার শিক্ষা, াস্থ্য প্রভৃতি অসামরিক বিভাগগুলির প্রতি মনোযোগ দেন নাই, বপন্ন সরকারকে এজন্ত কোন চাপ না দিয়া জনসাধারণ নীরবেই সমস্ত অসুবিধা সহ্য করিয়াছে ; কিন্তু এখন যুদ্ধ শেষ হইবার পর সকলেই আশা করে যে, ভারতসরকার এইবার অন্তত: দেশবাসীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন। দুঃখের বিষয়, আয়ের অভাবে নূতন কোন প্রয়োজনীয় পরিকল্পনায় ভারতসরকার হাত তো দিতে পারেন নাই, অধিকন্তু পুরাতন অবহেলিত অনেক সমস্তাও এখন তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবেই এড়াইয়া যাইতে চাহিতেছেন।

বলা নিষ্প্রয়োজন, বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় ভারতসরকারের আয়বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। বিশেষ করিয়া শীঘ্রই ভারতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিতেছে বলিয়া এই জাতীয় সরকারকে জনপ্রিয় হইবার মত অর্থস্বাচ্ছন্দ্য যোগাইবার দায়িত্বও দেশবাসীকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। বিদেশী সরকারকে দাবী জানাইলে সেই দাবী তাহারা নানাভাবে উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু জনগণের ন্তায্য প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া জাতীয় সরকারের পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা কিছুতেই সম্ভব নয়। বর্ত্তমান অবস্থায় গভর্ণমেণ্টের আয়বৃদ্ধির প্রধান উপায় নূতন কর সংস্থাপন, কারণ শিল্পবাণিজ্য সম্প্রসারিত হয় নাই বলিয়া এখন শুল্কাদি হইতে আয়বৃদ্ধির তেমন কোন আশা করা যায় না। এদিকে ভারতসরকার অতিরিক্ত আয়কর প্রভৃতি যে সব করসংস্থাপনের দ্বারা যুদ্ধের সময় অর্থাগমের আয়োজন করিয়াছিলেন, যুদ্ধবিরতির পর সাধারণ নিয়মেই সেগুলি তুলিয়া দিতে হইতেছে। কাজেকাজেই এখন কর বসাইতে হইলে নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে পরিস্থিতির বিবেচনা করিতে হইবে। দেশ এখন যুদ্ধোত্তর ভয়াবহ বেকার-সমস্তার সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে, যুদ্ধ শেষ হইলেও যুদ্ধের মাশুল হিসাবে চড়াবাজারের জুলুম এখনও আমাদের পুরোপুরী সহ্য করিতে হইতেছে, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত দেশবাসীর এখন কষ্টের আর শেষ নাই। এ সময় গভর্ণমেণ্ট যদি এমন কোন কর বসাইবার ব্যবস্থা করেন, যাহা দেশের সর্ব্বশ্রেণীর স্বার্থে আঘাত করিবে, তাহা হইলে গরীব ও মধ্যবিত্ত দেশবাসী আহত হইবার ফলে অন্তর্দ্দেশীয় ভগ্নপ্রায় অর্থব্যবস্থা একেবারেই অচল হইয়া যাইবে। এইরূপ সার্ব্বজনীন কোন কর সংস্থাপন বর্ত্তমান অবস্থায় বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। কাজেকাজেই এখন এমন কর বসাইবার কথা বিবেচনা করিতে হইবে, যাহাতে আয়ও লক্ষণীয়ভাবে বাড়িতে পারে, অথচ যাহা গরীব দেশবাসীকে স্পর্শ করিবে না।

মৃত্যুকর বা উত্তরাধিকার কর এই ধরণের। এই কর সর্ব্বত্রই সম্পদশালী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থায় এতদিন এই কর প্রবর্ত্তনের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কতকটা ধনীদের স্বার্থসংরক্ষক সরকারের ঔদাসীন্তে এবং কতকটা প্রচলিত শাসন আইনের সমর্থনের অভাবে এ পর্য্যন্ত এই কর এদেশে চালু হয় নাই। আগেও এই কর ভারতে প্রবর্ত্তনের জন্ত আলাপ আলোচনা হইয়াছে। ১৯২৫ সালে Taxation Enquiry Committee বা কর সম্পর্কিত অনুসন্ধান কমিটি ভারতবর্ষে মৃত্যুকর প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করেন, কিন্তু সেই সুপারিশ সরকারী উৎসাহের অভাবে কার্য্যকরী হয় নাই। ১৯৩৫ সালে ভারতশাসন আইনের যখন সংস্কার হয়, তখন কর্ত্তৃপক্ষের কতকটা অমনোযোগিতার জন্তই শাসন আইনের ধারায় ভারতসরকারের এই কর প্রবর্ত্তনের প্রত্যক্ষ অধিকার সন্নিবেশিত হয় নাই। কেন্দ্রীয় পরিষদে ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট উপস্থাপিত করিবার সময় অর্থসদস্ত স্তার জেরেমী রেইসম্যান ভারতে উত্তরাধিকারকর প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেই প্রস্তাবে ভারতশাসন আইনের সমর্থন থাকিলে উত্তরাধিকার কর সহজেই চালু হইয়া যাইত, কিন্তু আইনগত সমর্থনের অভাবে সেবারেও ইহা চাপা পড়ে। ফেডারেল কোর্টে ভারতসরকারের এই কর প্রবর্ত্তনের বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা হয় ; ফেডারেল কোর্টের বিচারপতিগণ অনেক বিচার বিবেচনার পর অধিকাংশের অভিমতক্রমে রায় দেন যে, ভারতসরকারের এই কর প্রবর্ত্তন করিবার কোন

অধিকার নাই। অতঃপর অধিকার লাভের আশায় ভারতসরকার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দ্বারস্থ হন। পার্লামেণ্ট হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভারতশাসন আইনের সংস্কার সাধন করিয়া ভারতসরকারের হাতে এই কর প্রবর্ত্তনের অধিকার প্রদান করা হইয়াছে।

এতদিনে আইনগত অসুবিধা দূরীভূত হইবার পর এইবার ভারতসরকারের অর্থসদস্য স্যার আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস পরিষদে মৃত্যুকর প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। এই প্রস্তাব উত্থাপন অপ্রত্যাশিত নয়; কিন্তু বাস্তবিক এই বৎসরই যে ইহা ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত হইবে, এখন কোন আশা ছিল না। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী বাজেট বক্তৃতার মধ্যে স্যার আর্চিবল্ড মৃত্যুকর সম্পর্কে কোন কথা উচ্চারণ করেন নাই। তারপর গত ১৯শে মার্চ্চ যখন ফাইনান্স বিল সমালোচনাপ্রসঙ্গে কংগ্রেসী সদস্য দেওয়ান চমনলাল ভারতসরকারের সম্ভাব্য আয়বৃদ্ধির কথা আলোচনা করিতে করিতে মৃত্যুকর প্রবর্ত্তনের দ্বারা সরকারের বৎসরে ৩ শত কোটি টাকা আয়ের কথা বলেন, তখন সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে বাধা দিয়া অর্থসদস্য পরিষদকে জানান যে, সরকার ইতিমধ্যে মৃত্যুকর প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে মতস্থির করিয়াছেন এবং দুই একদিন মধ্যেই তিনি পরিষদে এ সম্পর্কে বিল উপস্থাপিত করিবেন। ইহার পর ২১শে মার্চ্চ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে উত্তরাধিকার কর বিল উপস্থিত করা হয়।

বর্ত্তমানে পরিষদে মৃত্যুকর সম্পর্কিত যে বিলটি উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা মোটামুটি ব্রিটেনের সম্পত্তি কর আইনের (Estate Duty Acts) অনুকরণে রচিত। এখন পর্য্যন্ত মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর কি ভাবে কর নির্দ্ধারণ হইবে তাহা অবশ্য জানা যায় নাই, তবে অর্থসদস্য বলিয়াছেন যে, এই কর অকৃষি-সম্পত্তির উপরেই প্রযোজ্য হইবে এবং এক লক্ষ টাকার কম মূল্যের সম্পত্তি ইহার আওতায় আসিবে না। কৃষিক্ষেত্রের হিসাবে যে সম্পত্তি ব্যবহৃত হয় তাহা প্রাদেশিক সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত বলিয়া এই করের এলাকা হইতে কৃষি-সম্পত্তি বাদ দেওয়া হইয়াছে।

আগেই বলা হইয়াছে, দেশে নিত্যনূতন সমস্যার উদ্ভবে সরকারকে ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয়ভার বহন করিতে হইতেছে, কাজেই এখন যদি গভর্ণমেণ্টের আয় বাড়াইবার জন্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে রেহাই দিয়া নূতন কর প্রবর্ত্তিত হয় এবং যদি এই করের অনুরূপ কোন কর নির্ব্বিরোধে পৃথিবীর সভ্যদেশসমূহে চালু থাকে, তাহা হইলে এদেশবাসীরও তজ্জন্য আপত্তি করা উচিত নয়। স্যার আর্চিবল্ড রোলাণ্ডস্ পরিষদে বিল উত্থাপন করিবার সময় বলিয়াছেন যে, এই কর হইতে প্রাপ্ত অর্থ জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে ব্যয় করা হইবে। স্যার আর্চিবল্ডের এই প্রতিশ্রুতি এখনই হয় তো পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইবে না, তবে ভারতে যদি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে এই করের দরুণ লক্ষ টাকায় গভর্ণমেণ্টের সুশৃঙ্খল পরিচালনায় অবশ্যই যথেষ্ট সহায়তা হইবে। এই কর ধনীসম্প্রদায়কে আঘাত করিবে, কিন্তু সুখের বিষয় মৃত্যুকরের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া ভারতের একশ্রেণীর ধনী ইতিমধ্যেই এই কর সমর্থন করিয়াছেন। টাটা-বিরলার ন্যায় বিখ্যাত কোটিপতি পর্য্যন্ত তাঁহাদের রচিত বোম্বাই পরিকল্পনায় এই কর হইতে প্রাপ্তব্য অর্থ হিসাবের মধ্যে ধরিয়াছেন। এ অবস্থায় আমরা আশা করি, সরকারের দায়িত্ব ও জনসাধারণের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করিয়া দেশবাসী এই বিলটি আইনে পরিণত হইতে দিতে বাধা দিবেন না। শুধু সরকারী কার্য্যাদি পরিচালনার সুবিধা হইবে বলিয়া নয়, সামাজিক দিক হইতেও এদেশে এই কর প্রবর্ত্তনের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। ভারতের মত এত অসম ধনবণ্টন পৃথিবীর প্রায় কোন দেশেই দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে মুষ্টিমেয় ধনীপরিবারের ধনসম্পদ বংশানুক্রমে স্বাভাবিকভাবে বাড়িয়া যাইতেছে, অথচ লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত দেশবাসী গভীর হতাশার মধ্যে দিনযাপন করিতেছে। এই ধন-বৈষম্যের ফলে এদেশে মানুষে মানুষে চরম ভেদাভেদ দেখা দিয়া জাতির ভবিষ্যত অন্ধকার করিয়া দিতেছে। মৃত্যুকর প্রবর্ত্তনের দ্বারা ধনীদের সম্পত্তির ক্রমহ্রাস সম্ভব হইলে দেশে অর্থের অন্তর্দ্দেশীয় প্রচলনগতি বৃদ্ধি পাইয়া সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

বর্ত্তমানে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক লোক মৃতের সম্পত্তির উপর কর বসান সম্পর্কে ধর্ম্মশাস্ত্রের নিষেধাজ্ঞার দোহাই দিয়া এই বিল আইনে পরিণত হইবার পথে বাধার সৃষ্টি করিতেছেন। আমরা এই সম্প্রদায়কে আলোচ্য করের শুভাশুভ সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পরম জনকল্যাণমূলক কোন প্রয়াস ব্যর্থ করা বহু বিচিত্র সমস্যাপ্রপীড়িত বর্ত্তমান শতাব্দীতে অনুচিত বলিয়াই মনে হয়। তাছাড়া এই ধর্ম্মগত যুক্তি যে সর্ব্বজনস্বীকৃত নয়, তাহা মহম্মদ এম হক নামক আলিগড়নিবাসী জনৈক আইনজ্ঞ মুসলমান ৩০।৩।৪৬ তারিখে ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় লিখিত এক পত্রে পরিষ্কার প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

ধর্ম্মের কথা যাঁহারা বলেন তাহাদের অপেক্ষা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল নারী ও শিশুদের প্রশ্ন তুলিয়া যাঁহারা বিলের সমালোচনা করেন, তাহাদের সমালোচনার ব্যবহারিক মূল্য অবশ্যই বেশী। তবে অর্থসদস্য বলিয়াছেন যে, এই কর কেবলমাত্র অকৃষি সম্পত্তির উপর বসিবে এবং সেই সম্পত্তির মূল্য অবশ্যই ১লক্ষ টাকার কম হইবে না। বলাবাহুল্য এই ব্যবস্থায় কোন নাবালকের বা স্ত্রীলোকের এমন কোন ক্ষতি হইতে পারে না। কাজেই যে কাঠামোতে বিলটি পরিষদে উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে এদেশে প্রতিবাদ না হওয়াই আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি।

আলোচ্য উত্তরাধিকার কর বিল এইবৎসর এত দেরীতে পরিষদে উপস্থাপিত হইয়াছে যে, এবৎসর আলোচনাদি শেষ হইয়া ইহা আইনে পরিণত হওয়া ও কার্য্যকরী হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই মনে হয়। তবে এই বিলম্ব একটা আশার লক্ষণ, কারণ বিল পাশ হইতে দীর্ঘকাল বিলম্ব থাকায় জনসাধারণ তাঁহাদের এলাকার পরিষদ প্রতিনিধি মারফৎ সম্ভাব্য অসুবিধাগুলি পরিষদে আলোচনা করাইয়া লইতে পারিবেন। জনকল্যাণের প্রচুরসম্ভাবনা থাকিলেও, মৃত্যুকর প্রবর্ত্তনের ফলে অনেকের হয় তো

অনেক অসুবিধা হইবে। সময় থাকিতে সকলের সব অসুবিধা ধারাবাহিক ভাবে পরিষদে আলোচিত হইলে মুত্যুকর প্রথম হইতেই এদেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতি

যুদ্ধ শেষ হইবার পর বর্ত্তমানে সারা জগতে অন্নসঙ্কট দেখা দিয়াছে। মধ্য ইউরোপের দেশগুলি, জাপান, চীন, ভারতবর্ষ এবং মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে খাদ্য পরিস্থিতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এখন খাদ্যের দিক হইতে পৃথিবীতে সত্যকার উদ্বৃত্ত দেশের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। যুদ্ধের আগে ব্রহ্মদেশে এত বেশী ধান্য উৎপন্ন হইত যাহা হইতে ব্রহ্মবাসীর অভাব মিটাইয়াও শুধু ভারতবর্ষে ২০ লক্ষ টন চাউল রপ্তানী করা হইত, এবার সেই ব্রহ্মদেশই ঘাটতি দেশ রূপে পরিগণিত হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, শ্যাম, রাশিয়া প্রভৃতি যে কয়টি দেশে এবার কিছু কিছু খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, তদ্বারা জগদ্ব্যাপী অন্নাভাব পূরণ সম্পূর্ণভাবে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

ভারতবর্ষের অবস্থা এবৎসর সত্যই করুণ। ১৯৪৩ সালের মহামন্বন্তরের পর আশা করা গিয়াছিল যে, দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা হইতে সরকার অন্ততঃ এমনভাবে সাবধান হইবেন যাহা দ্বারা ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে পুনরায় দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দেখা দিবে না। বিগত দুর্ভিক্ষের পর গ্রেগরী কমিটি এবং দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনও ভারতসরকারকে ভবিষ্যত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের অনেক মূল্যবান পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতসরকার জনস্বার্থ-রক্ষায় তাঁহাদের চিরাচরিত ঔদাসীন্যে সেই অভিজ্ঞতা বা উপদেশ কাজে লাগাইবার তেমন কিছু চেষ্টা করেন নাই। ইহার ফলে গ্রেগরী কমিটির উপদেশমত ১৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য মজুতের ব্যবস্থা না করিয়া ভারতসরকার ১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত উর্দ্ধপক্ষে মাত্র ১ লক্ষ টন খাদ্য মজুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতে গত বৎসরই অন্নাভাব দেখা দিয়াছিল, কিন্তু ১৯৪৩ সালের মত এবারও ভারতসরকার সময় থাকিতে দেশবাসীকে সাবধান না করিয়া খাদ্যস্বচ্ছলতা সম্পর্কে অবিরাম আশার বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন। তারপর গত ১৫ই জানুয়ারী ভারতসরকারের খাদ্যসদস্য স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব যখন স্বীকার করিলেন যে ভারতে এবার খাদ্যপরিস্থিতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তখন প্রকৃতপক্ষে মহীশূর, তাঞ্জোর, পুণা প্রভৃতি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ শুরু হইয়া গিয়াছে। এই খাদ্য সঙ্কট ক্রমে দেখিতে দেখিতে মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ এবং বাঙ্গলার পশ্চিম অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ভারতসরকারের আকস্মিক উদ্বেগপ্রকাশের ফলে রেশনহীন অঞ্চলের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় উদ্বিগ্ন দেশবাসী বর্ত্তমানে খাদ্যমজুতের জন্য ব্যাকুলতা দেখাইতেছে বলিয়া ইতিমধ্যেই এই সকল এলাকায় খাদ্যের বাজারে চোরাবাজারের উপদ্রব শুরু হইয়া গিয়াছে এবং খাদ্যমূল্য চাহিদার চাপে বৃদ্ধি পাইয়া সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে।

প্রথমে বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের মুখেই আমরা শুনিয়াছিলাম যে, ভারতে এবার ৩০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি হইবে। এই ঘাটতি পূরণের দৈনিক ১৬ আউন্সের স্থলে ১২ আউন্স করিবার কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু পরে ভারতসরকারের খাদ্যবিভাগের সেক্রেটারী জানাইয়াছেন যে, ৩০ লক্ষ টন নয়, ভারতে এবার ঘাটতি পড়িবে ৭০ লক্ষ টন খাদ্য। ভারতে বৎসরে ৬ কোটি ১০ লক্ষ টন আন্দাজ খাদ্যশস্য প্রয়োজন। সে হিসাবে ৭০ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি মারাত্মক সন্দেহ নাই। তবু এই খাদ্য সুবণ্টিত হইলে প্রাণহানির আশঙ্কা অন্ততঃ থাকিত না, কিন্তু ভারতের সরকারী মহলের দুর্নীতি ও স্বচ্ছল দেশবাসীর অবিবেচনার ফলে শতকরা দশভাগ খাদ্যাভাবই দরিদ্রের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে শতকরা ৮০।৯০ ভাগে গিয়া ঠেকিবে। ভারতের সর্ব্বত্র রেশানিং প্রথা চালু থাকিলে গভর্ণমেণ্ট শতকরা ২৫ ভাগ খাদ্য কমাইবার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে কাজ অবশ্যই হইত। কিন্তু এই বিশাল দেশের অতি নগণ্য একাংশে রেশনব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় এইভাবে সম্পূর্ণ ঘাটতি পূরণ কিছুতেই আশা করা যায় না। ভারতসরকার রেশন এলাকায় মাথাপিছু যে ১২ আউন্স খাদ্য বরাদ্দ করিয়াছেন, তাহাতে উর্দ্ধপক্ষে মাত্র ১২ শত ক্যালোরী খাদ্যপ্রাণ থাকিবে, চিকিৎসকগণের মতে এত অল্প পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়; তবু যদি এই ব্যবস্থায় দেশে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকিত, রেশনিং কমাইবার ফলে বর্ত্তমানে দেশ-জোড়া যে অশান্তির বান ডাকিতেছে, সমস্যার প্রতি দেশবাসীর মনোযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া তাহা অবশ্যই কতকটা প্রতিরোধ করা যাইত। দুঃখের বিষয়, রেশন এলাকার অধিবাসীরা গত কয়েক বৎসরে সরকারী অকর্ম্মণ্যতার বহু পরিচয় পাইয়াছে, তাহারা জানে যে রেশন এলাকার পরিধি সারা দেশের তুলনায় কিরূপ নগণ্য, কাজেই সমস্যার সমাধানের অতি অল্প সম্ভাবনা থাকায় জনসাধারণ খাদ্যাভাবে ভগ্নস্বাস্থ্য হইতে রাজী হইতেছে না।

রেশন কমাইয়া খাদ্য সঞ্চয়ের চেষ্টা ছাড়া ভারত সরকার শেষ সময়ে ভারতের বাহির হইতে খাদ্য আনাইয়া দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। ভারত হইতে একটি খাদ্য মিশন লণ্ডন ও ওয়াশিংটনে পাঠান হইয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল, এই মিশন সম্মিলিত খাদ্য বোর্ডের নিকট হইতে খাদ্য সাহায্য চাহিবে। স্যার রামস্বামী মুদালিয়র এই মিশনের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। আমেরিকায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় এজেণ্ট জেনারেল স্যার গিরিজা শঙ্কর বাজপেয়ী এই মিশনকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। মিশন সম্মিলিত খাদ্য বোর্ডকে স্পষ্টই জানাইয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ বোর্ডের নিকট হইতে ১৯৪৬ সালের প্রথম ছয় মাসে ২০ লক্ষ টন ও শেষ ছয় মাসে ২০ লক্ষ টন খাদ্য সাহায্য না পাইলে ভারতে এবার এককোটি লোক মারা যাইবে। মিশনের আবেদনে শুধু সম্মিলিত খাদ্য বোর্ড নহে, মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এবং ব্রিটিশ খাদ্যসচিব স্যার বেন স্মিথও গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান জগৎজোড়া খাদ্য সঙ্কটে বোর্ডের দায়িত্ব অনেক, বিশেষ করিয়া জাপান, জার্ম্মানী ও চীনের খাদ্যপরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয়

সম্মিলিত খাদ্য বোর্ড অন্যান্য নানা দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া ১৯৪৬ সালের প্রথম ছয় মাসের হিসাবে ভারতে ১৪ লক্ষ টন গম ও ভুট্টা এবং ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টন চাউল প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আশা করা যায়, আগামী মে মাসের অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৪৬ সালের শেষার্দ্ধেও বোর্ডের নিকট হইতে কিছু সাহায্য পাওয়া যাইবে। সম্মিলিত খাদ্যবোর্ড ব্যতীত ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে রাশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, শ্যাম প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল দেশগুলি হইতে পৃথক হিসাবে চাউল ও গম আনাইবার চেষ্টা করিতেছে। খাদ্যশস্য ছাড়া ইহার অনুকল্প হিসাবে ভারত সরকার নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১০ হাজার টন মিল্ক পাউডার বা গুড়ো দুধ এবং যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১০ কোটি ভিটামিন ট্যাবলেটের অর্ডার দিয়াছেন।

বলা বাহুল্য দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধপীড়িত ভারতের দুর্দ্দিনে পৃথিবীর স্বচ্ছলতর দেশগুলির সহানুভূতি দেখানো খুবই স্বাভাবিক এবং ভারতবর্ষে বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানীরও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তবে একথা ঠিক যে, বর্ত্তমান পৃথিবীজোড়া অন্নসঙ্কটের দিনে এই আমদানীর পরিমাণ এমন কিছু বেশী হইতেই পারে না, যাহাতে ভারতের সব অভাব মিটিতে পারে। এইজন্য ভারত সরকারের উচিত ভারতে খাদ্য উৎপাদন, আমদানী, সংরক্ষণ ও বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা। দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে যেরূপ ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের উপর এদিক হইতে বিশেষ আশা করিতে স্বতঃই সঙ্কোচ হয়। অধিকতর ফসল ফলাইবার আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে সহরের বক্তৃতামঞ্চে আর সংবাদপত্রে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, প্রয়োজনীয় খাদ্য আমদানীর ব্যাপারে ভারত সরকার হতাশজনকভাবে ব্যর্থকাম হইয়াছেন, খাদ্য সংরক্ষণে তাঁহাদের অকর্ম্মণ্যতার জন্য যে পরিমাণ শস্য নষ্ট হইতেছে তাহা বন্ধ হইলে বর্ত্তমান উৎপাদন দ্বারাই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ অনায়াসে সম্ভব হইতে পারে। ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য শুধু রক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটিতে কীটপতঙ্গাদির পেটে যায়। বর্ত্তমান অন্ন-সঙ্কটের সময়ও প্রায়ই নানা স্থান হইতে অখাদ্য পচা চাউল ও আটা জমিয়া থাকিবার সংবাদ আসিতেছে। কয়েক দিন আগেও খবর আসিয়াছে যে বাঁকুড়ার সরকারী গুদামে প্রায় ১লক্ষ ৬০ হাজার মণ চাউল অখাদ্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। বণ্টন ব্যবস্থার ত্রুটিও মারাত্মক। মাত্র কয়েকটি সহরে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করিয়া ভারত সরকার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে চাহিতেছেন, অথচ লক্ষ লক্ষ গ্রামের অসংখ্য অধিবাসীর সম্বন্ধে তাঁহারা আশানুরূপ মনোযোগ দিতেছেন না। সরকারের দিক হইতে কর্ত্তব্য সম্পাদনে এই অপটুতা দেখা না গেলে সমস্যা যে এত ভয়াবহ হইত না তাহা সহজেই অনুমেয়। এখন চূড়ান্ত সর্ব্বনাশের দিন আসিয়াছে; তবু এখনো যে, ভারত সরকার ত্রুটি সংশোধনে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাহাদের ভাবভঙ্গি দেখিলে সেকথা মনে হয় না। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল খাদ্যসঙ্কটের দায়িত্ব ভাগ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্নার সহযোগিতায় একটি খাদ্যবোর্ড গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। আমলাতান্ত্রিক ভারত সরকারের সহিত কাজ করিলে দেশসেবার প্রয়োজনীয় সুযোগ পাওয়া যাইবে না, এই আশঙ্কায় মহাত্মা গান্ধী এই খাদ্যবোর্ডে যোগ দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। তবে এই খাদ্যবোর্ড গঠিত না হইলেও মহাত্মা গান্ধী এবং মিঃ জিন্না উভয়েই জনসাধারণকে গভর্ণমেণ্টের সহিত খাদ্যের ব্যাপারে অকারণে অসহযোগিতা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কংগ্রেস এবং গান্ধীজী বাহির হইতে নানা উপদেশ দিয়া সরকারকে খাদ্য সমস্যা সমাধানের যে সুযোগ দিতেছেন তাহাও ভারত সরকারের পক্ষে নিঃসন্দেহে অমূল্য। গান্ধীজী সঙ্কট দূরীকরণে ৮ দফা একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন এবং ইহাতে খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, অনুকল্প খাদ্য ব্যবহার এবং সামরিক ও অসামরিক বিভাগে সমবণ্টন সম্বন্ধে মূল্যবান উপদেশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও ভারতে খাদ্যসঙ্কট সম্বন্ধে ১৫ দফা পরামর্শ সম্বলিত এক পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, ভারত সরকার এই সব মহামূল্য পরামর্শ অনুসারে কাজ করিলে সমস্যা সমাধানে অবশ্যই মোটামুটি সাফল্যলাভ করিবেন।

যুদ্ধবিরতির পর ছাঁটাই নীতি শুরু হওয়ার ফলে ভারতে ভয়াবহ বেকার সমস্যা দেখা দিতেছে। গত ২৭শে মার্চ্চ বাঙ্গালোরে এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্সের ডিরেক্টর এবং ভারতের কারীগরী শিক্ষায়তনসমূহের অধ্যক্ষ সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি ডাঃ সার জে-সি-ঘোষ বলিয়াছেন যে, যুদ্ধাবসানের ফলে ভারতে ৮০ লক্ষ লোকের কর্ম্মচ্যুত হইবার সম্ভাবনা আছে। যৌথ পারিবারিক প্রথা প্রচলিত থাকায় এই দারুণ দুর্য্যোগে ভারতের আর্থিক বনিয়াদ কিরূপ বিপন্ন হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এসময় ভারতবাসীকে খাদ্য জোগাইবার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণে ভারত সরকার উদাসীনতা দেখাইলে তাহার পরিণামে দেশে শান্তি রক্ষিত হইতে পারে না। অবশ্য ভারত সরকার যদি সমস্যা সমাধানে আন্তরিক চেষ্টা করেন এবং তাঁহাদের আন্তরিকতা সত্ত্বেও দেশবাসীকে যদি দুঃখবরণ করিতে হয়, তাহা হইলে নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় জনসাধারণ সম্ভবতঃ চুপ করিয়াই থাকিবে ও পারতপক্ষে সহানুভূতির সহিত সরকারকে সাহায্য করিতেই আগ্রহ দেখাইবে, কিন্তু বর্ত্তমান দুঃসময়ে সরকার তাঁহাদের কর্ত্তব্য-পালন না করিলে অনশনক্লিষ্ট দেশের লোকের পক্ষে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করিবার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ২।৪।৪৬



খেলাধূলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ক্রিকেটে পৃথিবীর রেকর্ড ঃ

ইন্দোরে রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতায় মহীশূর দলের বিপক্ষে হোলকার দল প্রথম ইনিংসের ৮ উইকেটে ৯১২ রান করে এবং তাদের এক ইনিংসে ৬টি ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী হয়। রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, এক ইনিংসে ৬টি সেঞ্চুরী পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নি। ১৯০০-০১ সালে সিডনীতে সাউথ অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নিউ-সাউথ-ওয়েলসের এক ইনিংসের মোট ৯১৮ রানে প্রথম শ্রেণীর পাঁচটি সেঞ্চুরী হ'য়েছিল। এক ইনিংসে ১,০০০ হাজার রান দু'বার হয় এবং এই দু'বারই ভিক্টোরিয়া মেলবোর্ণ মাঠে করে। ১৯২২-১৯২৩ সালে টাসমানিয়ার বিপক্ষে তারা ১০৫৯ রান করে এবং চার বছর পর নিউ সাউথ ওয়েলসের বিপক্ষে তাদের ১,১০৭ রান উঠে।

হোলকার ৮৮ রানের জন্যে হাজার রান করতে পারে নি। তাদের অবিশিষ্ট হাতে ২টো উইকেট ছিল।

রঞ্জি ট্রফি ঃ

সাউথ পাঞ্জাব ঃ ১৬৭ ও ১৪৬

বরোদা ঃ ১০৬ ও ২০৭

রঞ্জি ট্রফির সেমি-ফাইনালে উভয় দলের রান সংখ্যা সমান হওয়ায় খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। টসে বরোদা জয়লাভ করে।

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি খেলা ঃ

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি খেলা প্রথম আরম্ভ হয় ১৯২৮ সালে কলকাতায়। ১৯৩৮ সালে কলকাতার খেলায় বাঙ্গলা প্রদেশ হকি চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রথম পায়। দীর্ঘ সাত বছর পর আবার এবছর ক'লকাতায় আন্তঃ-প্রাদেশিক হকি খেলা হয়ে গেল। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউণ্ডের দ্বিতীয় দিনের খেলায় বাঙ্গলা প্রদেশ ২-০ গোলে পাঞ্জাব দলের কাছে হেরে গেছে। ১৯৩২ সালেও পাঞ্জাব ফাইনালে বাঙ্গলা দেশকে এখানে হারিয়ে যায়। প্রতি-যোগিতার ফাইনালে দিল্লী এবং পাঞ্জাব দল উঠে। দিল্লী ০-০, ৮-০ গোলে হায়দ্রাবাদকে, ২-১ গোলে ভূপালকে, ৩-০ গোলে মধ্যভারতকে হারিয়ে ফাইনালে যায়। ওদিকে পাঞ্জাব ৩-০ গোলে সিন্ধুকে, ১-১, ২-০ গোলে বাঙ্গলাকে এবং ১-০ গোলে এন-ডবলিউ-এফ প্রভিন্সকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে। ১৯৪২ সালের ফাইনালে পাঞ্জাব দল লাহোরে দিল্লী দলের কাছে হেরে যায়। এবার পাঞ্জাব সেবারের প্রতিশোধ নিয়েছে, দিল্লীকে ফাইনালে ১-০ গোলে হারিয়ে। ফাইনাল হকি খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড কিন্তু ভারতীয় হকি খেলার সুনাম রাখতে পারে নি।

পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ী দল :—১৯২৮—ইউ পি (কলকাতায়), ১৯৩০—রেলদল (লাহোরে), ১৯৩২—পাঞ্জাব (কলকাতায়), ১৯৩৬—বাঙ্গলা (কলকাতায়), ১৯৩৮—বাঙ্গলা (কালকাতায়), ১৯৪০—বোম্বাই (বোম্বাই), ১৯৪২—দিল্লী (লাহোর), ১৯৪৪—বোম্বাই (বোম্বাই), ১৯৪৫—ভূপাল (গোরখপুর)

ইণ্টার কলেজ ক্রিকেট ঃ

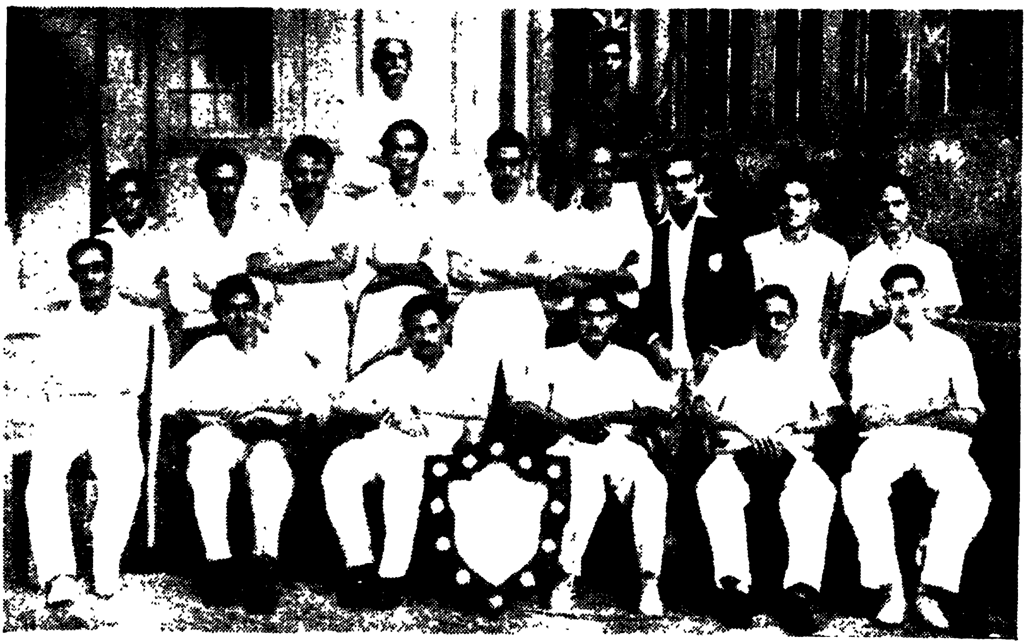
ইণ্টার কলেজ ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতার ফাইনালে বিদ্যাসাগর কলেজ প্রথম ইনিংসের ফলাফলে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর কলেজ ১৯৪১ এবং ১৯৪২ সালে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছিল।

বিদ্যাসাগর কলেজ প্রথম দিনের খেলার প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেটে ৩৩৯ রান করে। পুলিন মিত্র ১৫৪ রান করে নট আউট থাকেন। দ্বিতীয় দিনে ৪৫০ রানে বিদ্যাসাগর কলেজ দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। পুলিন মিত্র ২১৬ রান ক'রে নট আউট থাকেন। ইতিপূর্ব্বে রঞ্জি ট্রফি এবং বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ছাড়া এত অধিক রান উঠতে দেখা যায়নি। 'ভারসিটি ক্রিকেট' খেলায় পুলিন মিত্রের নট আউট ২১৬ রান একদিক থেকে রেকর্ড হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে,

পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ী দল:—১৯৩৯—প্রেসিডেন্সি কলেজ, ১৯৪০—ঐ, ১৯৪১—বিদ্যাসাগর কলেজ, ১৯৪২—ঐ, ১৯৪৩—খেলা হয় নি, ১৯৪৪—ল' কলেজ এবং ১৯৪৫—পোষ্ট গ্রাজুয়েট।

ইণ্টার রেলওয়ে হকি টুর্ণামেণ্ট ঃ

ছ' বছর পর পুনরায় ইণ্টার রেলওয়ে হকি টুর্ণামেণ্টের খেলা আরম্ভ হয়েছে। জি আই পি রেলদল এবার ফাইনালের অতিরিক্ত সময়ে ২-১ গোলে এম এণ্ড এস এম রেলদলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে।



ইণ্টার কলেজ লীগ চ্যাম্পীয়ান বিদ্যাসাগর কলেজ ক্রিকেট টিম

চেয়ারে ডানদিক থেকে—দিলীপ ঘোষ, পি মুস্তফি, পুলিন মিত্র (ক্যাপ্টেন), পি রায়, এস বসু, এ সেন

দণ্ডায়মান ডানদিক থেকে—এস সরকার, বি সেন, রমেন চ্যাটার্জ্জী, বি রায়, এ বাগচী, জে মিত্র, এস রায়, এ রায়, শৈলেন দাস

১৯২৬-২৭ সালে ইণ্টার কলেজ ক্রিকেট ল্যাজ-ডাউন শীল্ড ফাইনালে গণেশ বসু ২৭২ রান করে আউট হ'ন। পুলিন মিত্র ধৈর্য্য সহকারে উইকেটে থেকে সর্ব্বসমেত ৩৩টা বাউণ্ডারী করেন। দ্বিতীয় দিনের খেলায় সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ৬ উইকেটে ১৬৮ রান করে। তৃতীয় দিনে পি-রায় ৬ রানে ৪টে উইকেট পান এবং 'হ্যাট ট্রিক' করেন।

বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

বাঙ্গলার এক নম্বর ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় সুনীল বসু সিঙ্গলস, ডবলস এবং মিক্সড ডবলসের ফাইনাল বিজয়ী হয়ে পূর্ব্ব সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসের ফাইনালে দার্জিলিঙের কুমারী প্রীতি বসু ১১-৬ এবং ১১-৭ পয়েণ্টে আসানসোলের মিস ম্যাককোরীকে পরাজিত করেন। বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে

কুমারী প্রীতি বসুই এই প্রথম চ্যাম্পিয়ানসীপ পেলেন। এছাড়া মিক্সড ডবলসে তিনি এবার বিজয়িনী হয়েছেন।

পুরুষদের ডবলসে সুনীল বসু ও প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে মনোজ গুহ ও বিশু ব্যানার্জির জোর প্রতিযোগিতা চলে। মনোজ গুহ ও বিশু ব্যানার্জি মন্দভাগ্যের জন্যই শেষ পর্য্যন্ত খেলায় জয়ী হ'তে পারেন নি।

ফলাফল—

পুরুষদের সিঙ্গলসে—সুনীল বসু ১৫-৬ ও ১৫-৭ পয়েণ্টে মনোজ গুহকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলসে—অমৃতবাজার পত্রিকার সুনীল বসু ও প্রফুল্ল ঘোষ ৯-১৫, ১৫-৫ এবং ১৭-১৬ পয়েণ্টে মনোজ গুহ ও বিশু ব্যানার্জিকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে—মিস্ প্রীতি বসু (দার্জিলিঙ) ১১-৬ এবং ১১-৭ পয়েণ্টে মিস ম্যাক্‌কোরিকে (আসানসোল) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলসে—মিস ম্যাক্‌কোরি এবং মিসেস ম্যাক্‌কোরি ১৫-১২ ও ১৫-১১ পয়েণ্টে মিসেস হজেস ও মিসেস ফ্রান্সিসকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে—মিস প্রীতি বসু ও সুনীল বসু ১৫-৮ ও ১৫-৫ পয়েণ্টে মিস নমিতা বসু ও মনোজ গুহকে পরাজিত করেন।

রঞ্জি ক্রিকেট ফাইনাল ঃ

হোলকার ঃ ৩৪২ ও ২৭৩

বরোদা ঃ ১৯৮ ও ৩৬১

হোলকার ৫৬ রানে রঞ্জি ক্রিকেট ট্রফি বিজয়ী হয়েছে। ইন্দোরে যশবন্ত ক্লাব গ্রাউণ্ডে ২২শে মার্চ্চ রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল খেলা আরম্ভ হয়। হোলকার টসে জিতে প্রথম ব্যাট ক'রে প্রথম দিনের শেষে ৬ উইকেটে ৩৩৪ রান করে। সি কে নাইডু ১১৬ রান করে নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় হোলকার দলের প্রথম ইনিংস ৩৪২ রানে শেষ হ'ল। কর্ণেল নাইডু ২০০ রান করে আউট হলেন।

বরোদার প্রথম ইনিংসের ১ ঘণ্টার খেলায় ৫৭ রানে ৪টে উইকেট পড়ে গেল। ভি এস হাজারী নেমে খেলার অবস্থা অনেক ফিরিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিনের শেষে দেখা গেল ৫টা উইকেট পড়ে ১০৫ রান উঠেছে।

তৃতীয় দিনের মোট ২২৫ মিনিট খেলার পর বরোদা দলের প্রথম ইনিংস ১৯৮ রানে শেষ হ'ল। ভি এস হাজারী ৮৭ রান ক'রে নট আউট রইলেন। সি এস নাইডু ৬৬ রানে ৫টা উইকেট পেলেন।

১৪৪ রানে অগ্রগামী থেকে হোলকার দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো এবং দিনের শেষে ৭ উইকেটে ১৩৭ রান উঠলো। নিম্বলকার করলেন ৪০ রান; সি কে নাইডু ৩৩ রানে নট আউট রইলেন।

চতুর্থ দিনে ভিজে উইকেটের দরুণ প্রায় ৭০ মিনিট দেরীতে খেলা আরম্ভ হ'ল। লাঞ্চের সময় ৭ উইকেটে ১১১ রান দাঁড়াল। হোলকার দল মোট ৪০৫ মিনিট ব্যাট ক'রে দ্বিতীয় ইনিংসে ২৭৩ রান করলো। সি কে নাইডু করলেন ৫০ রান। গিকওয়াড় ৭৯ রান করে নট আউট রইলেন। হাজারী ৪৯ রানে উইকেট পেলেন ৪টে। হোলকার ৪১৭ রানে অগ্রগামী রইলো।

বরোদা দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৩-৪৫ মিনিটে আরম্ভ হ'ল এবং একটা উইকেট পড়ে দিনের শেষ ৮৭ রান উঠলো। আর বি নিম্বলকার নট আউট ৫৭ রান রইলেন।

খেলার পঞ্চম দিনেও ভিজে উইকেটের দরুণ খেলা দেরীতে আরম্ভ হ'ল, লাঞ্চের সময় বরোদা দলের ২ উইকেটে ১৭৪ রান দেখা গেল। লাঞ্চের পর খেলা মন্দের দিকে গেল, ১০০ রানে ৬টা উইকেট পড়লো। আর প্রধান এস স্বামীর ৯ উইকেটের জুটী হয়ে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। দিনের শেষে ৯ উইকেটে ৩৪. রান উঠলো।

৬ষ্ঠ দিনে ৩৬১ রানে বরোদা দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে গেল। স্বামী ৯১ রান ক'রে নট আউট রইলেন। তিনি ১১টা বাউণ্ডারী করেন। এ ছাড়া হোলকার দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে সাফল্য লাভ করলেন আর নিম্বলকার ৭৩, এইচ অধিকারী ৬০ রান, ভি এস হাজারী ৬৪ রান। সি এস নাইডু ১৪৮ রানে এবং গিকওয়াড ৭৬ রানে ৪টে উইকেট পেলেন।

ফুটবল খেলোয়াড়দের দল বদল ঃ

জানা গেছে এ বছর ২০৫ জন ফুটবল খেলোয়াড় দল পরিবর্ত্তনের জন্য আই এফ এ অফিসে আবেদন জানিয়েছিলেন। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ১৯৯। প্রথম বিভাগের যে সকল নামকরা খেলোয়াড় এ বছর

পরিবর্ত্তন করলেন তার তালিকা দেওয়া হ'ল। বর্ত্তমানে তাঁরা কোন দলে খেলবেন তা নামের পাশে উল্লেখ করা হ'ল।

মহাবীর প্রসাদ (মোহনবাগান), সুশীল ভট্টাচার্য্য (ঐ), টি কর (ঐ), মেওয়ালাল (ঐ), ডি পাল (ঐ), কে আর (ঐ), ভূপাল দাশ (ঐ); স্বরাজ ঘোষ (স্পোর্টিং ইউনিয়ন); সুশীল ভট্টাচার্য্য (পোর্ট কমিশনার); পি মুস্তাফি (ইষ্টবেঙ্গল), বি সেন (ঐ), নজর মহম্মদ (ঐ); কে দত্ত (মাড়োয়ারী ক্লাব); নিমু বসু (ভবানীপুর), এস তাহের (ঐ), এ ভৌমিক (ঐ); নোজামল হক (কালীঘাট); নির্ম্মল মুখার্জি (কাষ্টমস);

দেখা যাচ্ছে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব থেকে এবার তাদের অনেক নামকরা খেলোয়াড় অন্য দলে যোগদান করেছে। এবার থেকে লীগে উঠানামা হবে, সুতরাং সকলেই দলকে শক্তিশালী করতে চেষ্টার ত্রুটি করছে না। এবার বাহির থেকে খেলোয়াড় আমদানী যথারীতি হবে কিনা তা এখনও জানা যায় নি।

খেলোয়াড়দের এসোসিয়েশন ঃ

আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের অনেক অভাব অভিযোগ আছে। সেই সবের প্রতিকার উদ্দেশ্যে খেলোয়াড়দের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার প্রয়োজন তাঁরা অনেক দিন থেকেই অনুভব করে আসছেন কিন্তু তা এতদিন কাজে সম্ভব হয় নি। সম্প্রতি আই এফ এর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ এইচ নর্টনের সভাপতিত্বে ক'লকাতার বহু বিশিষ্ট খেলোয়াড় একত্র মিলিত হয়ে তাদের একটি এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সভায় তাঁরা তাঁদের অভাব অভিযোগ এবং তাঁদের উপর ক্লাব পরিচালকবৃন্দের দুর্ব্যবহারেরও উল্লেখ করেছেন। আমাদের দেশের খেলোয়াড়রা প্রকাশ্যভাবে সকলেই সখের খেলোয়াড়, খেলার জন্য তাঁরা কোন পারিশ্রমিক পান না কিন্তু ষোল আনা দুর্ব্যবহার পান। করুণা এবং দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর খেলোয়াড়দের থাকতে হয়। বাঙ্গালোরে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান অলিম্পিকে যোগদানের জন্য যে বাঙ্গলা দল গিয়েছিল তার ক্যাপটেন মিঃ গডফ্রে এখানকার এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষের অদ্ভুত আচরণের সংবাদ সভায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, বাঙ্গালোরে আটজন বাছাই খেলোয়াড়ের সঙ্গে সাতাশজন এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যক্তিকে পাঠানো হয়েছিল। এই সব 'অফিসিয়েলস' সেকেণ্ড ক্লাসে ভ্রমণের সুবিধা পায় কিন্তু খেলোয়াড়দের যাতায়াতের জন্য থার্ড ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যাপারে বাঙ্গলা দেশের এ্যাথলেট পরিচালকগণ কেবল ভারতীয় রেকর্ডই করেন নি পৃথিবীর রেকর্ড স্থাপন ক'রেছেন। ইণ্ডিয়ান অলিম্পিকে বাঙ্গলা এবার পঞ্চম স্থান পেয়েছে—বাঙ্গলা প্রদেশের সে লজ্জা এ রেকর্ড নিশ্চয় মোচন করবে। যাদের ভাঙ্গিয়ে পশার এবং সুখ সুবিধা তাঁরা এতদিন ভোগ ক'রে এসেছেন আজ যদি সেই লাঞ্ছিত সম্প্রদায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে পাতায় ছাই নিক্ষেপ করে তা হলে তাদের প্রতি দোষারোপের কোন প্রশ্ন উঠবে না। খেলোয়াড়রা যে সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এসোসিয়েশন তৈরী করতে যাচ্ছেন তা আমরা পূর্ব্বেও যেমন আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছি বর্ত্তমানেও সেইরূপ করছি।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "গল্পাঞ্জলি" (২য় পর্ব)—১৷৷০
শ্রীসনৎকুমার চৌধুরী ও শ্রীমনতোষ বিশ্বাস প্রণীত "ভারত-কেশরী সুভাষচন্দ্র"—১৲
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "যুদ্ধ যখন হ'য়ে গেল শেষ"—৷৷০
প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত উপন্যাস "সমাধান"—২৲
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "উনিশে আষাঢ়"—২৷০, "প্রথম প্রণাম"—২৲
শ্রীস্বর্ণা গোস্বামী প্রণীত উপন্যাস "স্রষ্টা"—৩৲
শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত "নেতাজী সুভাষচন্দ্র"—১৲
শ্রীমতী সুজাতা ঘটক প্রণীত "মহাভারতের কথা"—৷৵০
শ্রীগৌতম সেন প্রণীত উপন্যাস "ধারাবাহিক"—২৲
অজয় ভট্টাচার্য্য প্রণীত গীতি-সংগ্রহ "আজো ওঠে চাঁদ"—১৷৷০
শ্রীঅনলকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "রক্ত-তৃষা"—১৲
শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "তবলা শিক্ষা প্রণালী"—১৷০
ডাঃ অজিতশঙ্কর দে প্রণীত "Quit India Explained"—১৲
দিলীপ দাশ গুপ্ত ও মনসা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ "বন্ধনহীন গ্রন্থি"—৷৵০
অতুল্য ঘোষ প্রণীত "অহিংসা ও গান্ধী"—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত





ভারতবর্ষ



দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

রাসায়নিকের দৃষ্টিতে যুদ্ধোত্তর পৃথিবী

শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন

গত কয়েক মাস ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণে আমার যে সামান্য অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে সে সম্বন্ধে নানাস্থান হইতে অনেক প্রশ্ন আসায় সেই প্রসঙ্গে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। যদিও এ বিষয়ে বহু মনীষী বহুবার তাঁহাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন তথাপি আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ঐ সব দেশের জনসাধারণের যে সব হৃদয়গ্রাহী ও মনোজ্ঞ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, তাহার প্রতি সজাগ সশ্রদ্ধ মনোভাব জাগাইয়া তোলা আমাদের আগামীকালের জাতীয় ভিত্তি গঠনে অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়। মানুষমাত্রেই মানুষের মত সম্মানের অধিকারী—ছোট হউক বড় হউক, প্রভু হউক ভৃত্য হউক, সবাই যে মানুষের মানদণ্ডে সমান—এই ধারণা ওদেশের সকলেরই মজ্জাগত সংস্কার। পরিচিত-অপরিচিত, দেশী-বিদেশী, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেরই সুখসুবিধার জন্য সকলেই সর্বদা উন্মুখ। এই নিবিড় স্বতস্ফূর্ত্ত মমত্ববোধ-বশতই জাতির বনিয়াদ এত সুদৃঢ় হইয়াছে যে সদ্যসমাপ্ত দ্বিতীয় মহাসমরের প্রবল সংঘাতও ইহারা অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়াছে। এই সর্বধ্বংসী সমরে দেশের যতটা ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল তাহা হইতে পারে নাই এবং যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের মধ্যে শীতান্তে বসন্তের আবির্ভাবের মত নবজীবনের সজীবতা ও নবীন প্রেরণার অবাধ প্রবাহ পরিলক্ষিত হইতেছে।

রাস্তা ঘাটে, ট্রামে বাসে, রেলওয়ে ও রেস্তোরায় ছোটখাট ঘটনা বা দৃশ্য হইতে আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে মানুষের অধিকারে তাহারা সর্বদা সজাগ।

আমাদের দেশে পুলিশ সাক্ষাৎ বিভীষিকাস্বরূপ, কিন্তু ওদেশের পুলিশ জনসাধারণের অনুগত ভৃত্যের মত, তাহাদের সুখ সুবিধার প্রতি সর্বদা মনোযোগী। পথচারী কেহ পথ হারাইয়া ফেলিলে বা নূতন লোক কোনও ঠিকানা অনুসন্ধান করিলে পুলিশ অতিশয় ভদ্রতার সহিত ঠিক জায়গায় পৌঁছাইয়া দিয়া থাকে। অবশ্য এরূপক্ষেত্রে সাধারণ লোকেও নিজেদের সময় নষ্ট হইলেও তাহাকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইংলণ্ডের পুলিশ অধিকাংশস্থলেই নিরস্ত্র ; অথচ জনসাধারণের অস্ত্র রাখার কোনও বাধা নাই। দেশের লোকের আত্মসম্মানজ্ঞান এত জাগ্রত যে রেলগাড়ী বা ট্রামে-বাসে কেহ বিনা টিকিটে ভ্রমণের কথা ভাবিতেও পারেন না। অনেক সময় টিকিট-কালেক্টর আসিয়া উপস্থিত না হইলে বাসের মধ্যে রক্ষিত একটি বাক্সের মধ্যে টিকিটের মূল্য রাখি

লোকে নামিয়া যায়। সময় অভাবে রেলের টিকিট কিনিতে না পারিলে লোকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে প্লাটফরম টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়ে এবং ট্রেনের ভিতরে গন্তব্যস্থানের টিকিট কাটিয়া লয়। লণ্ডনে ট্রেনে দুইটীমাত্র শ্রেণী আছে—প্রথম এবং তৃতীয় শ্রেণী। অবশ্য ভারতের প্রথম শ্রেণীতে যেরূপ সুখ সুবিধার ব্যবস্থা আছে—বৃটেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতেও প্রায় সেইরূপ ব্যবস্থা। তৃতীয় শ্রেণীর প্রত্যেক কামরায় পায়খানা, পড়িবার জন্য অতিরিক্ত আলো এবং ঘর-গরম করিবার ব্যবস্থাও আছে। কলেজের প্রফেসর, কারখানার ম্যানেজার প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিরাও সাধারণতঃ তৃতীয় শ্রেণীতেই ভ্রমণ করিয়া থাকেন। এত বড় যুদ্ধ চলিয়া গেল, অথচ তাহার জন্য জনসাধারণের অনর্থক অসুবিধা কিছুমাত্র ভোগ করিতে হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। ট্রেনের সংখ্যাও কমান হয় নাই। লণ্ডন সহরে সহরতলী এবং মফঃস্বল হইতে প্রত্যহ ২০ লক্ষ লোক অফিস করিতে আসে, অথচ অফিস টাইমেও ঐ দেশের ট্রেনে ভিড় হইতে দেখি নাই। ট্রেনের যে কামরায় ১০ জন লোকের বসিবার কথা সেখানে ৫।৬ জন লোক বসিলেই উঁহারা ভিড় বলিয়া মনে করেন এবং রেল কোম্পানীর অব্যবস্থায় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অথচ আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের দূরে থাকিয়াও যুদ্ধকালে এবং এখন পর্য্যন্ত ট্রেনের অভাবে অসহ্য দুর্দশা ভোগ করিতেছি। ট্রেনের পা-দানীতে ঝুলিয়া যাওয়া এবং গাড়ীর ছাদের উপর চড়িয়া যাওয়াও আমাদের দেশে নৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। ইহাতে কত হতভাগ্য যে প্রাণ হারাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ফলতঃ মানুষ যে এত অবজ্ঞাত হইতে পারে, ওদেশের লোকে তাহা ধারণা করিতেও অসমর্থ। ওদেশের সাধারণ অধিবাসীরা ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাঁহাদের অনেকের মুখেই শুনিয়াছি, বেন্থল সাহেব বিলাতের এক সভায় বলিয়াছেন—ভারতের তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রীদিগের শীঘ্রই যথেষ্ট সুযোগসুবিধাদানের ব্যবস্থা হইতেছে। তাঁহাদের ধারণা, ভারতের তৃতীয় শ্রেণী বুঝি তাঁহাদের দেশের তৃতীয় শ্রেণীর মতই হইবে। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ওদেশের রিটার্ণ-টিকিট সমভাবেই চলিতেছে এবং উহার মেয়াদও কোন কোন স্থলে একবৎসর পর্য্যন্ত থাকে।

যে লণ্ডনের উপর যুদ্ধের এত বড় ধাক্কা চলিয়া গেল সেখানে জনসাধারণের অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া কোনও পার্ক বা রাস্তার মোড় সাধারণের প্রবেশ নিষেধ করিয়া কেবলমাত্র মিলিটারির জন্য সংরক্ষিত হয় নাই। পক্ষান্তরে আমাদের দেশের বহু ভাল ভাল পার্ক এবং রাস্তার ব্যবহার হইতে জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া মিলিটারির জন্য আবদ্ধ করা হইয়াছে। আর একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে লণ্ডন সহরের ত্রিসীমানায় আমরা কোনও জিপগাড়ী দেখিতে পাই নাই। অথচ যুদ্ধ সমাপ্তির এত পরেও জিপগাড়ীর দৌরাত্ম্যে আমাদের নিরীহ জনসাধারণের পথ চলা দায় হইয়াছে। যদিও আমরা যুদ্ধ শেষের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওদেশে গিয়াছি, তথাপি কোথাও 'ব্যাফ্‌ল' প্রাচীর বা জানালার কাচ অপসারণ প্রভৃতি আমাদের চোখে পড়ে নাই। অথচ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে ঐ সব পন্থা

আর একটি ব্যবস্থার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহা হইতেছে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর জন্য রাস্তার মাঝে মাঝে বড় বড় তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে, গরম ও ঠাণ্ডা জল সংযুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের প্রতিষ্ঠা। এখানে এক সঙ্গে বহুলোক শৌচক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে। হাত মুখ প্রক্ষালনের পর মুখ হাত মুছিবার জন্য পরিষ্কার তোয়ালেও রাখা হয় এবং সে গুলি একবার ব্যবহারের পর পুনরায় পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য স্বতন্ত্রস্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়। জনসাধারণের দায়িত্ব এবং আত্মসম্মানজ্ঞান এত পরিস্ফুট যে কদাচ এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না বা কোন তোয়ালেও খোয়া যায় না। আজকাল কলিকাতা সহরের জনসংখ্যার প্রায় এক দশমাংশ মহিলা ও বালিকা প্রত্যহ কাজকর্ম বা পড়াশুনা ব্যপদেশে রাস্তায় বাহির হইয়া থাকেন, কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহাদের শৌচাদির কোনও ব্যবস্থার প্রতিই কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষগণ এখন পর্য্যন্ত মনোযোগ দিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহা জাতির শিষ্টাচার ও চিন্তাশীলতার শোচনীয় অভাবেরই পরিচায়ক। অবশ্য আমাদের জনসাধারণেরও যতদিন পর্য্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান না জন্মিবে এবং জাতীয় দায়িত্বজ্ঞান পরিস্ফুট না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত ইহার ব্যবস্থা করিলেও আমরা নিজেরাই তাহার উদ্দেশ্যের পথে বাধা সৃষ্টি করিব।

তারপর খাদ্যাদির কথা। আমাদের দেশে অনাহারে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইল, এখনও রেশনের অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া আমরা মরণের পথে আগাইয়া চলিয়াছি এবং আসন্ন ভীষণতর দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছি—অথচ ওদেশে যুদ্ধের প্রচণ্ডতার মধ্যেও উপযুক্ত খাদ্যের অভাব ঘটে নাই। বৃটেনের দরিদ্রশ্রেণীর খাদ্যের মান বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বড়লোকদের খাদ্যপানীয়ের রাজসিকতার কিঞ্চিৎ হ্রাস পাওয়ায় সর্বশ্রেণীর জীবনযাত্রার মান একটা নির্দিষ্ট ও স্বাস্থ্যসঙ্গত পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। উঁহারা যে খাদ্য গ্রহণ করেন তাহা আমাদের নিকট মুখরোচক না হইলেও বিভিন্ন খাদ্যোপাদানের সুষ্ঠু সমাবেশের দরুণ উহা অতিশয় পুষ্টিকর। বৃটেনবাসীর গো-সেবা আদর্শস্থানীয়। স্বর্গত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মুখে উঁহাদের গো-সেবার কথা শুনিয়াছিলাম এবার তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। ওদেশে গরু জন্য উপযুক্ত পরিমাণে উৎকৃষ্ট সারপ্রয়োগে নেপিয়র ও অন্যান্য ঘাসে চাষ করা হয়। গ্রীষ্মকালীন অপর্য্যাপ্ত ঘাস বৈজ্ঞানিক উপায়ে শু করিয়া শীতকালের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত হয়। সযত্নবর্দ্ধিত সতে সবুজ ঘাসের মাঠে যখন অল্প কয়েকটি সুপুষ্ট সুন্দর গরু স্বেচ্ছায় বিচ করিতে থাকে—তখন সেদৃশ্য বাস্তবিক অতিশয় মনোরম বোধ হয়।

বৃটেন ও আমেরিকায় জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বদা সুতীক্ষ্ণ রাখিতে হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে যদি মাত্র তিনজন লোকও মারা য তবে গবর্ণমেণ্ট চঞ্চল হইয়া ওঠে, দেশবাসীও এজন্য গবর্ণমেণ্টকে প্র চাপ দিতে থাকে। রোগের কারণ ভালভাবে অনুসন্ধান করিয়া উ দমনের নিমিত্ত সংশ্লিষ্টবিভাগের গবেষকদিগের উপর গবর্ণমেণ্ট প্র চাপ দিয়া প্রতিষেধক আবিষ্কারের ব্যবস্থা না করিয়া ক্ষান্ত হন ন

লোক আক্রান্ত হয় এবং তাহার মধ্যে অন্ততঃ ২০ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জনসাধারণ অদৃষ্টের দোহাই দিয়া অনায়াসে এই মৃত্যু ও কষ্ট বরণ করিয়া লইতেছে, গবর্ণমেণ্টও এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। কারণ গবর্ণমেণ্ট ইহা নিঃসন্দেহে জানেন যে একটি অভুক্ত, রোগখিন্ন নিস্তেজ জাতিকে পদানত করিয়া রাখা যত সহজ, উপযুক্ত খাদ্যপানীয়পুষ্ট, নীরোগ, বীর্যবন্ত জাতিকে বশে রাখা তাহার চেয়ে বহুগুণে কষ্টসাধ্য। তাই দেশে ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ ঔষধ কুইনাইনের চাষের উপযুক্ত জমি থাকিতেও উহার সম্প্রসারণের চেষ্টা হয় নাই বা জার্মান বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কৃত ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক অ্যাটেব্রিন নামক ঔষধ প্রস্তুতের কোনও ব্যবস্থাই এখন পর্য্যন্ত অবলম্বিত হয় নাই। বৃটেনে রোগের প্রাদুর্ভাব কম থাকা সত্ত্বেও সেখানে প্রতি হাজার জন অধিবাসীর জন্য একজন ডাক্তার আছেন, আর আমাদের দেশে প্রতি ছয় হাজার অধিবাসীর জন্য একজন ডাক্তার। তারপর ওদেশের প্রত্যেক পল্লীর জন্য গবর্ণমেণ্টের বেতনভুক্ত কয়েকজন ডাক্তার একটি নির্দ্দিষ্টস্থানে উপস্থিত থাকেন (panel system)। ইঁহারা উপস্থিতি বা রোগী দেখা বিষয়ে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখাইতে পারেন না, কারণ তাঁহাদিগকে তাঁহাদের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট সর্ব্বদা জবাবদিহি করিতে হয়।

কোনও পল্লীতে রোগীর সংখ্যা কমিয়া গেলেও তাঁহাদের বেতন কমে না, বরং ইহার জন্য তাঁহারা প্রশংসাভাজন হইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এরূপক্ষেত্রে তাঁহারা গবেষণাদি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার অধিকতর অবসর পাইয়া থাকেন। কলকারখানার আবর্জনা নদী বা খালের জলে পড়িয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্যহানি না হয় সেদিকেও গবর্ণমেণ্টের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিদ্যমান। ফলে, কলের মালিকগণ আবর্জনার সদ্ব্যবহারের জন্য বৈজ্ঞানিকের শরণাপন্ন হন। অনেকেই জানেন, কাগজের কলের আবর্জনা হইতে আজকাল 'ফুডইষ্ট', অ্যালকহল ও অন্যান্য উপকারী দ্রব্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতেছে।

শিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দ্বিতীয় মহাসমরে জয়লাভের মূলে বৃটেন ও আমেরিকার ব্যাপক ও অসম্ভব শিল্পোন্নতি। আমাদের দেশের বড় বড় সহরে যে সব কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে বৃটেনের নগণ্য ছোট সহরেও তদপেক্ষা বহুগুণে বড় বড় কারখানা আছে। ওদেশে লোকের অত্যন্ত অভাববশতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের পরিবর্ত্তে যন্ত্রের সাহায্যে কারখানার কাজ চালান হইয়া থাকে। দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসী সর্বদা সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত। স্বদেশী শিল্পজাত সামগ্রী উঁহারা সর্বাগ্রে ব্যবহার করেন। এমন কি, যে ঔষধ দেশে প্রস্তুত না হয় চিকিৎসকগণ তাহার ব্যবস্থা করেন না; তাহার অনুকল্প বা সমগুণবিশিষ্ট দেশে-তৈরী ঔষধের ব্যবস্থা করেন। আমাশয়ের ঔষধ এনটারোভায়োফরম সুইজারল্যাণ্ডে প্রস্তুত বলিয়া আমরা লণ্ডনের বহু ডাক্তারখানায় খোঁজ করিয়াও ঐ ঔষধ পাই নাই। ইহা হইতেই আমরা এই বিষয় উত্তমরূপে বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছি। ওদেশের শিল্পপতিগণের ধারণা যে শিল্পের গোপন তথ্য ভারতবাসীরা অবগত হইলে তাহাদের ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাঁহাদের এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসনকল্পে আমরা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলাম যে ভারতবর্ষের ৪০ কোটি লোকের জীবনযাত্রার মান যদি বৃদ্ধি পায় তবে তাহাদের ক্রয় ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং ভারতে শিল্পের উন্নতি হইলেও তাহার চাহিদা পুরাপুরি মিটাইতে বৃটেনের দ্রব্যসম্ভার ক্রয় করিতেই হইবে। পক্ষান্তরে, জাতীয় শিল্প গঠনে ও তাহার চালনার জন্য যন্ত্রপাতি এবং বিবিধ কাঁচামাল বৃটেন বা অন্য দেশ হইতে লইতে হইবেই। আমাদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পগঠনে উঁহারা সহযোগিতা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট স্বদেশের শিল্পোন্নতিকল্পে মুক্তহস্তে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। অথচ আমাদের দেশে এতদিন এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্যই পরিলক্ষিত হইয়াছে। সম্প্রতি এদিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িলেও উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রশিল্পীর অভাবে সত্যকারের শিল্পোন্নতি হইতেছে না।

ওদেশের কারখানা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। প্রত্যেক কারখানায় কাঁচামাল এবং উৎপন্নদ্রব্যের পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটারি ছাড়া, চলতিমালের উন্নতিসাধন ও নূতন নূতন বিষয়ে গবেষণার জন্য উচ্চবেতনে গবেষক রাখিয়া আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত সুসজ্জিত রিসার্চ ল্যাবরেটারির ব্যবস্থা আছে। অবৈজ্ঞানিক পরিচালক দ্বারা ইঁহাদিগকে অযথা উত্যক্ত করা হয় না। তারপর সকলেরই কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও দায়িত্বজ্ঞান এত প্রবুদ্ধ যে তাঁহারা প্রাণ ঢালিয়া স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল, তথা দেশের গৌরববৃদ্ধিকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। আর একটি চমৎকার বিষয় এই যে কারখানার বাহিরে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ মানুষের সহিত মানুষের সহজ হৃদ্যতাপূর্ণ অমায়িক ব্যবহারে আত্মপ্রকাশ করে। ভোজনাগারে বা রাস্তায়— কারখানার ম্যানেজারও তাঁর 'বয়ের' সহিত পারিবারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিষয় গল্প করিতে ইতস্ততঃ করেন না। অবশ্য আমাদের দেশে এরূপ ব্যবহারে অসুবিধাও আছে। কারণ আমাদের আত্মসম্মানজ্ঞানের অভাববশতঃ অতি পরিচিত স্থলে আমরা অন্যায় আবদার করিতে সঙ্কোচ বোধ করি না। আশা করি, জাতীয় চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ক্রমশঃ আমাদের দোষ ত্রুটি দুর্বলতা পরিহার করিয়া মানুষের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিব।



দাগ

শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়

দিনের নিমন্ত্রণ বলেই ভিড়টা একসংগে জমে নি। পরিবেশকদেরও তাড়াহুড়া ছিল না। তাছাড়া, দীপকরা ছিল পরিচিত বন্ধুবান্ধবের দল; তাই আদর আপ্যায়নে ত্রুটি না হয়, সেদিকেই ছিল সকলের নজর। সমরেশ এসে মাঝে মাঝে লৌকিক বিনয় দেখিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে যাচ্ছিল। বন্ধুরা ঠাট্টায় জর্জরিত করে তাকে ভাগিয়ে দিচ্ছিল।

খাওয়া শেষ হল। এবার বান্ধবী দেখার পালা।

সমরেশই অগ্রণী হয়ে নিয়ে গেল। দীপকরা সকলে ঘরে ঢুকলে সে দরজা বন্ধ করে দিলে।

চেয়ারে বসে সমরেশের বৌ। বছর কুড়ি বয়েস হবে, সুসজ্জিতা তরুণী—পরণে নীল রংয়ের জর্জেট শাড়ি, গায়ে ব্লাউজ, পায়ে সরু রেখায় আলতা, মুখে হেজলিন পাউডারের আভাস, চোখ-মুখ সুন্দর, রংটিও ফর্শা, মাথার চুল দীর্ঘ কালো, হাতে চার গাছা ক'রে চুড়ি, গলায় একগাছি সরু হার, কানে দুল।

হাসিঠাট্টার মধ্যে দিয়ে সমরেশ একে একে সকলের পরিচয় দিতে লাগল প্রিয়ার কাছে। সংগে সংগে উপহার দেওয়াও চলতে লাগল—টাকা, বই, কাস্কেট প্রভৃতি। এক-জোড়া ফুলদানিতে দুটি ছোট টাটকা ফুলের তোড়া এনেছিল দীপক···দিলে।

দীপক আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই দু' তিনটে বাড়ির পরেই থাকে। কাব্যি করে বেড়ায়। দেখছ না, চেহারা আর জামাকাপড়ের শ্রী।—পরে দীপকের দিকে ফিরে সমরেশ বললে, কী আর বলব তোকে, তুই আর মানুষ—

বাইরে থেকে ডাক পড়ল, ওরে সমর, দরজা খোল্। মেশোমশাই চলে যাচ্ছেন, গীতাকে একবার দেখবেন।

সমরেশ একটু যেন বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দিলে। সমরেশের দিদি অতসী মেশোমশাইকে নিয়ে ঢুকলেন। বললেন, এরা ত সব পাড়ারই ছেলে, সন্ধ্যের পর না হয় আর একবার আসবে এখন। কিছু মনে কোর না ভাই তোমরা।

দীপকরা বেরিয়ে পড়বার উদ্যোগ করতে লাগল। অতসী বললেন, সন্ধ্যের পর তোমরা এসো কিন্তু আবার।

তাহলে আর একবার ভুরি-ভোজনের আশা করতে পারি কি আমরা?—দীপক বলে উঠল পেছন থেকে।

অতসী দীপককে দেখেই বলে উঠলেন, আরে দীপু? বেশ ছেলে বাবা, তিনদিন এসেছি, একবারও দেখা নেই।

কাজের বাড়ি, আসি কি করে বলুন?

মেশোমশাই, বৌ দেখেছ?—অতসী অবহিত হলেন।

হ্যাঁ, বেশ হয়েছে, খাশা হয়েছে···চল্—মেশোমশাই উত্তর দিলেন।

দীপকরা ততক্ষণে ঘরের বাইরে গিয়ে পড়েছে।

দীপু!—অতসী ডাকলেন।

ফিরে দাঁড়াল দীপক। মেশোমশাই এবং আরও কয়েকজন তখন নেমে গেছেন সিঁড়ি দিয়ে।

একটু যেন আন্‌মনা হয়ে গেলেন অতসী, পরক্ষণেই বললেন, তুই এখনো সেই রকমই আছিস।

কই, আপনার চেহারা ত ফেরে নি দিদি? লাহোর ত ভালো জায়গা। বছর কয়েক আগে শোনা গেছল, অতসীর যক্ষা হয়েছে।

একা মানুষ, সংসারের খাটা-খাটুনি—বললেন অতসী।

ছেলেপুলে ক'টি?

দুটি ছেলে, তিন—যাই রে, মা ডাকছে। আবার আসিস, দিন তিনেক আছি এখনো—বলেই অদৃশ্য হলেন অতসী।

দিন তিনেক পরে।

বেলা চারটে হবে। বৈঠকখানায় একটা জরুরি লেখায় ব্যস্ত ছিল দীপক, হঠাৎ কানে এল তার—আপনি দীপুমামা?

দীপক মুখ তুলে দেখলে, বছর ছয়েকের একটি সুশ্রী ছেলে দাঁড়িয়ে, কোট-প্যান্ট পরা, পায়ে ডার্বি।

বললে—হ্যাঁ, কেন বলো ত? কোত্থেকে আসছ তুমি?

আপনাকে একবার মা ডাকছে—সমরবাবু আমার মামা।

তাই নাকি, চলো চলো—বলেই কলম রেখে উঠে পড়ল দীপক। অত্যন্ত লজ্জা হচ্ছিল তার, এই তিনদিন দিদির সাথে দেখা করার কথা একেবারেই ভুলে গেছল সে। ছি, ছি!

দোতলার কোণের ঘরে অতসী বিছানা-বাক্স গোছাচ্ছিলেন। আট-নয় বছরের একটি মেয়ে সাহায্য করছিল হাতে হাতে। আর বছর দুয়েকের একটি ছেলে দুষ্টুমির জন্যে ধমক খাচ্ছিল মাঝে মাঝে।

একি, আজই চললেন নাকি?—বলতে বলতে সাহায্য করতে গেল দীপক।

থাক থাক। বাঁধা-ছাঁদা সবই হয়ে গেছে, গুণে রাখছি শুধু।—হ্যাঁ, আজই যাচ্ছি ভাই। উনি বেশি দিন ছুটি পেলেন না কিনা।

কোথায় জামাইবাবু? সেই পনের বছর আগে আপনাকে বিয়ে করে নিয়ে পালালেন, আর দেখা নেই। মাঝে একবার আপনি এসেছিলেন, শুনেছিলাম। সে সময় ছিলাম না আমি কলকাতায়।

নীচেই কোথায় আছেন কি সমরের সংগে গাড়ী ডাকতে গেছেন বোধহয়।

এ দুটি আপনারই নিশ্চয়? বলতে বলতে টপ্ করে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলে দীপক।

কারা? দীপকের মুখের দিকে তাকালেন অতসী, তারপর বললেন—ও, হ্যাঁ।

মেয়েটি মুখ টিপে হাসল একবার।

একটি ত আমায় খবর দিয়ে পালালো দেখছি। আর দুটি কোথায়?

বোধহয় কোন কারণে উন্মনা হয়ে পড়েছিলেন অতসী, হঠাৎ সচেতন হয়ে জবাব দিলেন, এঁ্যা, আর দুটি বোধহয় মার কাছে।

পোঁটলা-পুঁটলির মত ওদেরকেও কিন্তু গুণে গুণে সংগে রাখবেন গাড়িতে।—হেসে উঠল দীপক।

অতসী নিরুত্তর।

অতসীর মা এসে ডাকলেন, ওরে অ অতু। আয় না বাপু, ঠাকুর প্রণাম সেরে নিবি।

অতসী ফিরে তাকিয়ে জবাব দিলেন, আসছি মা, তুমি যাও।

দীপু কখন এলি?—মা জিজ্ঞেস করলেন।

এই একটু আগে, দিদিকে সাহায্য করছি।

খুব হয়েছে।—অতসী বললেন, আমি ডেকে পাঠাতে তবে এসেছে। মাকে উদ্দেশ করে বললেন, তুমি ও দুটোকে নামিয়ে দাও ত কোল থেকে মা। সারাদিন জ্বালিয়ে খাচ্ছে তোমাকে।

মার দু' কোলে দুটি মেয়ে ঝুলছিল। জবাব না দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

আবার চুপচাপ কিছুক্ষণ।

সীমা!—সহসা বলে উঠলেন অতসী, ওঘরে সন্দেশ আছে। চারটে সন্দেশ আর জল এনে দে ত মামাকে।

সীমা চলে গেল।

আপত্তি করার সময় পেল না দীপক, অতসী বলে চললেন, ছোটবেলায় লুকিয়ে লুকিয়ে আমার কাছে পয়সা নিয়ে কত গল্পের বই কিনেছিস। সে কথা বুঝি মনে নেই, তাই দিদিকে আজ ভুলে গেছিস?—তোরঙ্গের ওপর উঠে বসলেন দীপকের দিকে মুখ করে।

বেদনা ও লজ্জায় মিথ্যে বলে ফেলল দীপক, এ ক'দিন একটা কাজে বড় ব্যস্ত ছিলাম, সত্যি বলছি।

বিয়ে ত করিস্ নি, শুনলাম।

না।

কেন?

খেতে পাই না—

ওই যে এসেছে, খা—হেসে উঠলেন অতসী।

সীমা জল-খাবার নিয়ে এসেছে। এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল দীপক। অতসীর বোধ হয় খেয়াল ছিল না তাই বসতে বলেন নি। এবার নিজেই বসে খেতে আরম্ভ করে দিলে দীপক।

তোর লেখা দেখতে পাব বলে প্রায় সব কাগজই রাখি। এত কম লিখিস কেন?

ভালো লাগে না।

ওই যাঃ, তোর গান ত শোনা হল না।

ছেড়ে দিইছি—বললে দীপক।

আবার আন্‌মনা হয়ে পড়লেন অতসী।

হঠাৎ ডাক আরম্ভ হ'ল, গাড়ি এসেছে, গাড়ি এসেছে।

খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিল, উঠে পড়ল দীপক।

ঠাকুর প্রণাম সারা হল। সকলে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। অতসীর মার চোখে জল, অতসীরও। দীপকদের বাড়ি থেকে দীপকের মাও আগেই বেরিয়ে এসেছেন। অতসী প্রণাম করলেন দীপকের মাকে।

সকলেই বিদায় পর্বে ব্যস্ত ছিল। গাড়িতে ওঠবার সময় অতসী একফাঁকে ইশারায় ডাকলেন দীপককে।

দীপক কাছে যেতেই মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, সমীরদা ভালো আছে ত? শুনেছি, বিয়ে করেছে—ছেলে-পুলে হয়েছে।—বলেই চোখ দুটি নত করলেন। দীপক দেখল, মুখখানি তার আরক্ত হয়ে উঠেছে।

সংগে সংগেই জবাব দিতে পারল না দীপক। নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, ভালোই আছে, আপনাদের ওদিকেই ত থাকে, লায়ালপুরে।

গাড়ি ছেড়ে দিলে। অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত চোখ ফেরাতে পারল না দীপক।

দীপকের দাদা সমীর আর অতসী একদা দুজনেই দুজনকে মনেপ্রাণে চেয়েছিল।

আজাদ হিন্দ সরকার

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গগনে সুভাষচন্দ্রের উদয় ধূমকেতুর উদয়ের সহিত তুলিত করিতে ইচ্ছা হয়। ধূমকেতু শব্দটির আভিধানিক অর্থ উদ্ধৃত করিতেছি।

> "আকাশমণ্ডলে কখনও কখনও যে জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সুবৃহৎ লাঙ্গুলের ন্যায় অংশ বিস্তার পূর্ব্বক উদিত হয়, লোকসমাজে তাহাই ধূমকেতু বলিয়া পরিচিত।"

আবার—

> "সৌরজগতের অন্তবর্ত্তী জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ বিশেষ।"

আরও এক অর্থ—

> "অগ্নি।"

আবার ইহাও কথিত আছে যে,

> "ধূমকেতু স্থায়ী হয় না। আকাশমণ্ডলে জ্যোতির্ম্ময় রূপ ও আলোক বিস্তার করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।"

উল্লিখিত অর্থগুলির যেটিই গ্রহণ করা যাক্ না কেন, সুভাষচন্দ্রের আকৃতি, গতি ও প্রকৃতির সহিত অপরূপ সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। তবে ধূমকেতু শব্দটির সহিত আমাদের সংস্কারগত বিদ্বেষও অনস্বীকার্য্য।

অভিধানেও আছে,

> "শাস্ত্রে ধূমকেতুর উদয় অনিষ্টজনক বলিয়া লিখিত হইয়াছে।"

ইহা ভয়ের কথা বটে। সুভাষ উদয়ে দেশের অনিষ্ট হইয়াছে, একথা কেহই বলিবে না। দুর্ম্মুখ, দুঃসাহসী ভারতীয়-কমিউনিষ্টরাও ততখানি সাহস পোষণ করে বলিয়া মনে হয় না। অনিষ্ট হয় নাই, অপিচ ইষ্ট হইয়াছে ইহাই যদি জনমত হয়, তবে ধূমকেতুর সহিত তুলনা দোষাবহ হইয়া পড়ে না কি? মা ভৈঃ! শাস্ত্রে কাটানও স্পষ্ট।*

> "যে ধূমকেতুর দেহ হ্রস্ব ও প্রসন্ন এবং জ্যোতির্ম্ময়, তাহা অনিষ্টকর নহে।"

* অঙ্কুর, বৃক্ষে—মহামহীরুহে রূপান্তরিত হইয়াছে। আজাদ হিন্দ ফৌজ অত্যল্প কাল মধ্যে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। এই গভর্ণমেণ্ট দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই, অতীব দুঃখের কথা সন্দেহ নাই; তথাপি বর্ত্তমান বিশ্বে ইহা অভিনব এবং অভাবনীয়। মেয়েলি ভাষায় একটা কথা আছে, এই বিড়ালই বনে গিয়া বন-বিড়াল হয়। আমাদের সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এসিয়াখণ্ডে গিয়া একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; স্বয়ং সেই রাষ্ট্রের সর্ব্বাধিনায়ক হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রগঠন ও রাষ্ট্রপরিচালনের শক্তিসামর্থ্যের পরিচয়—সামান্য হইলেও, দেশে থাকিতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই সংগঠন ও সঙ্ঘটনশক্তির পর্য্যায়ক্রমে বর্দ্ধন ও ক্রমোন্নতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে বাসনা। তাই "অঙ্কুর" ছাড়িয়া "সরকার" ধরিলাম। "ভারতবর্ষের" পাঠিকা ও পাঠকগণের নিকট আমার "অঙ্কুর" পরম সমাদর লাভ করিয়াছিল; ভরসা করি "সরকার"ও তাঁহাদের প্রীতিলাভে বঞ্চিত হইবে না। আর একটি কথা, "আজাদ হিন্দ সরকারের" প্রথম পর্য্যায় যখন আমার স্নেহশালিনী পাঠিকা ও ভদ্র পাঠকের হস্তগত হইবে, নেতাজীর "আজাদ হিন্দের অঙ্কুর"ও পুস্তকাকারে তাঁহাদের সুকরকমলে স্থান পাইয়া ধন্য হইবার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষিত থাকিবে বলিয়াই মনে করিতেছি।—লেখক।

সুতরাং লেখক দায়দোষমুক্ত। ধূমকেতুর সহিত সুভাষকে তুলিত করায় রুষ্ট বা ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ কাহারও আর রহিল না। সেই ধূমকেতু অতীব প্রসন্ন এবং সুবিমল জ্যোতির্ম্ময়, বাঙ্গলাদেশের লোক কি কোনও দিন তাহা ভুলিতে পারিবে? ভারতবর্ষও কি এমন, ভুলো'?

কিন্তু কেন এই উপমা আর উপমার জন্য কেনই বা এই দীর্ঘ মল্লিনাথকৃত' টীকা, সে কৈফিয়ৎ আমি দিব না। মল্লিখিত কাহিনী পাঠ করিয়া যদি কেহ উপমাটি অসঙ্গত বিবেচনা করেন এবং অস্বীকার করেন তাহাতে আমার দুঃখিত হইবার কারণ নাই। সেই সুবিখ্যাত হাতীর গল্পটী কি আপনাদের মনে নাই? করিশুণ্ডে হাত বুলাইতে বুলাইতে কেহ কহিল, এটা অর্থুক; কেহ বা গোদা পায়ের মাপ লইয়া বলিল, উঁহু, এটা তুথুক! আমি বলিব, তথাস্তু।

আমাদেরও তখন পঠদ্দশা। প্রেসিডেন্সী কলেজের আকাশে অকস্মাৎ এক ধূমকেতুর উদয় হইয়াছে সংবাদ পাওয়া গেল। খাস গভর্ণমেন্টের কলেজ, লালদীঘির রাইটার্স বিল্ডিঙের মত মাননীয় প্রতিষ্ঠান, অধিকন্তু, অবিসম্বাদিতরূপে প্রথম শ্রেণীর কলেজ, কিন্তু ধূমকেতুর আবির্ভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। এই কলেজের পিছনে প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ গভর্ণমেন্টের অমিত তেজ, দুর্জ্জয় দম্ভ ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, সদা সতর্ক প্রহরীসম দণ্ডায়মান, তবু বিপর্য্যয় রোধ হইল না। বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদ সুরক্ষিত এই দুর্গাভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ ওটেন সাহেব ধূমকেতুর পুচ্ছাঘাতে পপাত ধরণীতলে! চিরাচরিত নিয়মে ধূমকেতু তাহার জ্যোতির্ম্ময় পুচ্ছসমেত অদৃশ্য হইয়া গেল। কিছুকাল পর্য্যন্ত আর দর্শন নাই। হ্যালির ধূমকেতু পৃথিবীতে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল, শুনিয়াছি; সুভাষ ধূমকেতু ছাত্রসমাজে কি বিপ্লব যে ঘটাইল, তাহার তুলনা নাই।

কয়েকবৎসর পরে আবার একবার ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটিল। বিলাতে, ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (I. C. S.) পরীক্ষায় সসম্মানে—চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া মাত্র কয়েকদিন পরে, ঐ ব্যক্তি ইণ্ডিয়া অফিসে ঢুকিয়া সেক্রেটারী অফ ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়ার হাতে সিভিল সার্ভিস পাঞ্জাখানা প্রত্যর্পণ করিয়া আর একবার যে আলোড়ন ঘটাইল তাহাতে শুধু ভারতসমুদ্রই নহে, পৃথিবীতে যে সাতটা মহাসমুদ্র আছে সেই সাতসমুদ্রই উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল। সিভিল সার্ভিসের উৎপত্তি হেভেন্-এ—স্বর্গে, সেই জন্য এই সার্ভিসকে হেভেন-বরন্ সার্ভিস বলা হইয়াছে। এই চাকরীতে যাহারা প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে আমরা পৌত্তলিকগণ ঈশ্বর-জানিত বলিয়া বিবেচনা করি, আর অন্য সর্ব্বত্র এই ঠাকুরিয়াদিগকে ঈশ্বরের সমতুল্য ডেমি-গড্ রূপে পূজার্চ্চনা করা হয়। ইংলণ্ডের রাজার মুকুটের কোহিনূরের যে মর্য্যাদা, এই সার্ভিসেরও তাদৃশ সম্মান। বঙ্গ সমাজে (শুধুই বঙ্গ?) আই-সি-এসের সুগলে যে কন্যা মাল্য দান করিতে পারে, পাঞ্চালের রাজা দ্রুপদের সভায় যে কন্যাকুমারী অর্জ্জুনের গলে মাল্য দান করিয়াছিল তাহার তুল্য যশঃস্বিনী। ধূমকেতু তাহার পুচ্ছ তাড়নে নীল সমুদ্রের নির্ম্মলনীল জলও ঘোলা করিয়া দিল।

ইহার কিছুদিন পরে আর একবার ধূমকেতুর দর্শন মিলিল। ঘটনা ক্ষুদ্র, নাটকের কুশীলবগণও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, কিন্তু আলোড়ন নিতান্ত তুচ্ছ ছিল না। আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করিয়া, মরুস্থানে কুসুমকানন রচনা করিয়া যে ব্যক্তি বিশ্বে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে, সংগঠনশক্তির প্রাথমিক পরিচয় হিসাবে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের এ্যাডমিনষ্ট্রেসন রিপোর্ট—শাসন-বিবরণীর উপক্রমণিকায় লিখিত থাকিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি।

১

উত্তর বঙ্গে ভীষণ প্লাবন। সমগ্র উত্তর বঙ্গ ভাসিয়া গিয়াছে। এমনটি নাকি আর কখনও হয় নাই। লোক যে কত মরিয়াছে, বাড়ীঘর যে কত ভাসিয়াছে তাহার হিসাব নাই। গবাদি পশু নিশ্চিহ্ন; গ্রামকে গ্রাম উজাড়; পল্লীকে পল্লী অদৃশ্য; লোক গাছের ডালে উঠিয়া বসিয়া আছে; ভাসমান চালের মটকায় উঠিয়া দিনপাত করিতেছে। খাদ্য নাই, পরিবার বস্ত্র নাই, মাথা গুঁজিবার ঠাঁই নাই।

কলিকাতায় বন্যার্ত্তদিগের দুঃখবিমোচন জন্য ফাণ্ড গঠিত হইয়াছে। সংকীর্ত্তনের দল বাহির হইয়াছে—নূতন নূতন গান, নূতন নূতন সুরে গীত হইতেছে—থলিতে চাল ডাল, ঝুলিতে টাকা পয়সা, বাঁকে কাপড় জামা ভরিয়া উঠিয়াছে। সমাজের এবং সমাজের বাহিরের নারীরাও রাজপথ আলোকিত, পথিক-চিত্ত বিমোহিত করিয়া বন্যাক্লিষ্টের ক্লেশ নিবারণে পরম যত্নবতী হইয়াছেন। সুরের ঝঙ্কারে, বিলোল কটাক্ষের প্রহারে, নীরব করুণ আবেদনে মানুষের মনে ও পকেটে তুমুল দ্বন্দ্ব চলিতেছে। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করিয়া অর্থ, খাদ্যদ্রব্য, কাপড়জামা, ঔষধপথ্য সংগ্রহ করিয়া উত্তর বঙ্গে পাঠাইতেছেন।

গভর্ণমেন্ট নীরব, নিশ্চল, গম্ভীর ও স্তব্ধ। বোধ করি চোখেও দেখে না, কানেও শুনে না, কথাও বলে না। লোক যখন বড় বেশী হল্লা করে, চেঁচামেচি করে তখন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলে, গভর্ণমেন্ট কি চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী (ইনষ্টিটিউসন?) যে ফুকা কাচের শিশি হস্তে জানালায় দাঁড়াইলেই দাওয়াই মিল্ যায় গা!

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় নিজে মাতিয়াছেন, সারা দেশের যুব সম্প্রদায়কে মাতাইয়া তুলিয়াছেন। ছাত্র-সমাজে ঋষিকল্প ও পূতচরিত্র ব্যক্তিটির অসামান্য প্রভাব। ছাত্র সমাজের উৎসাহ ও উদ্দীপনার প্রবল বন্যা বাঙ্গলার যুবসমাজকেও সংক্রামিত করিয়াছে। বেকার, নিষ্কর্ম্মা ও নিষ্ক্রিয় যুব সম্প্রদায়েও শিহরণ অনুভূত হইতেছে।

ইহার অত্যল্পকাল পূর্ব্বে, স্বামী বিবেকানন্দ বাঙ্গলার যুব সমাজের সম্মুখে সেবা ব্রতের উচ্চাদর্শ স্থাপিত করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম বাঙ্গালার জনগণমনে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অমৃতের আস্বাদ জাগাইয়াছে। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে স্বামীজীর সেই সাহসপ্রোজ্জ্বল দৃপ্ত দিব্য মূর্ত্তি; বাঙ্গালীর শিয়রে শিয়রে স্বামীজীর গ্রন্থ; মুখে মুখে স্বামীজীর বাণী। যে পাঠ করিয়াছে—আর যে পাঠ না করিয়াছে লোকের মুখে শুনিয়া, সেও মুগ্ধ বিমোহিত হইয়াছে। আতুরের সেবা, আর্ত্তের

উপকার—মানব হৃদয়ের সুপ্ত তারে, অতি সঙ্গোপনে অতি সূক্ষ্ম ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হইতে সুরু করিয়াছে! বিবেকানন্দের মূর্ত্তির পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেই সম্মোহন আসে।

এমন সময়ে উত্তর বঙ্গে প্লাবন! বাঙ্গলার শিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগী যুবসমাজ উত্তরবঙ্গের নামে ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল, তাহাদের মন সেইদিকে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। সংসর্গ দোষ মন্দেও আছে, ভালোতেও আছে; মন্দেরও সংক্রামতা আছে, ভালরও আছে। অনুপাত—রেসিয়ো-র হারে ইতর বিশেষ থাকিতে পারে কিন্তু ছোঁয়াচ যে খারাপেরই লাগে, ভালোর লাগে না—এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। যাঁহারা,অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশের ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন, তাঁহারা, সৎসঙ্গে কাশীবাস এ কথাও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। নতুবা, আমাদের যে ক্লাবে মা সরস্বতীর সম্মুখে নো-ভেকেন্সী নো-এ্যাডমিসান লিখিয়া টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট নিষেধ সত্ত্বেও প্রবেশের চেষ্টা করিলে বীণাপাণির বীণাটি কাড়িয়া চোরা বাজারে বিক্রমপুরে প্রেরণ এবং দেবীর বাহনটিকে ধরিয়া ডাক্ রোষ্ট বানাইয়া ভক্ষণ করা হইবে জানাইয়া দিতেও কসুর হয় নাই, সেই গোলোকের বিশ পঁচিশ জন সদস্য উত্তর বঙ্গে ছুটিবে কেন? ক্লাবটির সবিশদ পরিচয় দিতে পারিব নাবলিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত। গোলোকের গোলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। নীতিজ্ঞানীরা বলেন, মৃতের সম্বন্ধে মন্দ কিছু বলিও না (দি মরট্যুইস্ নিহিল নিসি বোনাম্)। কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিব, কাজ কি! তবে একটা কথা না বলিলেই নয়। গোলোক গতাসু হইয়াছে ভালই করিয়াছে; নহিলে সদস্যগণ শুলুতি প্র্যাকটিশে যেরূপ পোক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, তাহাতে কেবল ঢিলাইয়াই ব্রিটিশকে কুইট ইণ্ডিয়া করিয়া তবে ছাড়িতেন! ক্লাবটির অবস্থিতি ছিল, দর্জ্জিপাড়ায়। ইদানীংকালে আমাদের শরৎদা দর্জ্জিপাড়াকে স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। "শ্রীকান্ত"র দর্জ্জিপাড়ার নতুন দা ও তস্য পাম্পশু জুতা কি ভুলিবার? শরৎদা বোধ হয় আমাদের গোলোককে দেখিয়াছিলেন, কি হয়ত বা সভ্যই ছিলেন, কে জানে! গোলোকে পাইকিরী দরেই নতুনদা'রা থাকিতেন।

গোলোকের সাতাশজন সদস্য উত্তর বঙ্গে গিয়াছিলেন। একদিন তিনজনের প্রত্যাবর্ত্তন ঘটিল। তাহারা বলিল, নর্থ বেঙ্গলের উপর তাহারা হাড়ে চটিয়াছে। আর যাইবে না; পি-সি-রায় মাথার দিব্য দিলেও, না।

নাকে খৎ, কান মোচড়া
আর যাব না বাগাচড়া।

শুনিলাম—শুনিলাম কেন, বুঝিলাম, সেই ধূমকেতু! ধূমকেতুর আবির্ভাবে সমস্তই বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তাহারা ফার্ষ্ট ব্যাচের—একেবারে গোড়ার কালের ভলান্টিয়ার, পাকা ঘুঁটিরও অধিক। 'কাল্কা যোগী দীর্ঘ জটা' সুভাষ বোস তাহাদের নিকট (১) চাল ডালের হিসাব চাহিয়াছে (২) ক্যাম্প কমাণ্ডান্টের বিনানুমতিতে নৈশ ভ্রমণ (বিহার?) করিয়াছে (৩) মুখের কাছে নাক আনিয়া মিছামিছি কিসের গন্ধ পাইয়া সসপেণ্ড করিবার হুমকী দিয়াছে (৪) একটা নোটিশ বোর্ডে হ য ব র ল যা-ইচ্ছে-তাই লিখিয়া সকলকে তাহা মুখস্থ করিতে বলিয়াছে (পাকা ঘুঁটিরাও বাদ নহে) ইত্যাদি এবং প্রভৃতি। পরবর্ত্তীকালে পৃথিবীতে, এবম্বিধ আচরণ, নাৎসিজম, ফ্যাসিজম বলিয়া 'প্রসিদ্ধি' অর্জ্জন করিয়াছিল।

আর শুনিলাম—শুনিলাম কেন, বেশ আতঙ্কিত হইলাম যে, এই ফ্যাষ্ট ব্যাচে যে কয়জন উড়িষ্যা-নন্দন সুপকার লইয়া গিয়াছিল তাহারাও কর্ম্মে ইস্তফা দিয়াছে; পাওনা গণ্ডার জন্য ধর্ণা দিতেছে; প্রাপ্য বুঝিয়া পাইবামাত্র শিয়ালদহের রেলের টিকিট কিনিবে। ফলে এই যে শত শত স্বেচ্ছাসেবক সেবা কার্য্য করিতেছে তাহাদের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার বন্ধ হইবেই হইবে। তাহাদের চার্জ্জও সামান্য নহে। উড়িয়া ঠাকুরকে পাণ গুপারী-দোক্তা, অভাবে পয়সা দিতে হয় এ কথাটা না জানে কে? না দেয় কে? কিন্তু নবীন ক্যাম্প কমাণ্ডেণ্ট কড়া আইন করিয়াছেন, একটি কাণাকড়িও না! চাকর মহলেও বিদ্রোহের আশঙ্কা গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে ক্যাম্পের ঝাঁপ গুটাইতে না হয় যদি, তবে ইহাদের অর্থাৎ (গোলোকের গোলোকবাসিদের) নাম মিথ্যা, ধাম মিথ্যা, জন্ম মিথ্যা, তাহাদের পিতা মাতা ইত্যাদি সমস্তই মিথ্যার বেসাতি মাত্র।

আজ, প্রায় দুই যুগ পরে এই কথাগুলি যখন লিখিতেছি তখন নিজের মনে হাসি সম্বরণ করিতে পারিতেছি না; কিন্তু সত্য বলিতেছি, তখন একটা আশু বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত না হইয়া পারা যায় নাই। দর্জ্জিপাড়ার এই হরিদ্রা বর্ণের কনকপোতগুলিকে সাজাইয়া মানসে গুছাইয়া, অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যতের মুনিজনমনোলোভা চিত্রাঙ্কন করিয়া আমিই আগু বাড়িয়া উত্তর বঙ্গে পাঠাইয়াছিলাম! বিবেকানন্দকে তাহারা থোড়াই কেয়ার করিত। পি-সি-রায় নামধারী ব্যক্তিটিকে আমাদের গোলোক-বাসিদিগের চিত্তে পরিচিত করাইতে যে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল তাহা আমি বলিতে প্রস্তুত থাকিলেও পাঠকসমাজের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না। 'মাতুলালয়ের' সংবাদ তাহাদের নখদর্পণে; স্থল পথেও অসীম অভিজ্ঞতা! জলে ও স্থলে যাহাদের অবাধ আধিপত্য, অন্তরীক্ষেও পিছাইয়া পড়িবার লোক তাহারা নহে। আঁচলে বাঁধা চাবির রিঙের শব্দে তাহারা অঞ্চলাধিকারিণীর সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় গদ্যে পদ্যে বর্ণনা করিয়া কালিদাসের শৃঙ্গারাষ্টকমের মৌলিকত্ব নাশ করিতে পারে। তাহাদের সান্ধ্য বৈঠকের দাপটে দর্জ্জিপাড়ার অনেক বাড়ীর লোক রোয়াক ভাঙ্গিতে সুরু করিয়াছে। এই পিতৃ-তাড়িত মাতৃ-বিতাড়িত জনমর্দ্দগুলিকে প্রথম যেদিন অত্যন্ত কুণ্ঠাভরেই আচার্য্যদেবের নিকট লইয়া গেলাম, আচার্য্যদেব আনন্দে ডগমগ হইয়া বলিলেন, ইহারাই মুখ্যি কুলীন বটে! আচার্য্যদেব যে একটা সেতুবন্ধের পরিকল্পনা করিতেছেন নিঃসন্দেহে তাহা বুঝিতে পারিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। আচার্য্য কুলীনের কুল-মর্য্যাদা সম্বন্ধে এতই সচেতন যে সে আর কি বলিব? জামা, কাপড়, জুতা, সাবান

দিয়া দিলেন। প্রসঙ্গান্তরে এ কথাটাও বলা উচিত যে আমরা কয়েকজন আচার্য্যদেবের 'আদর' লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। 'অঞ্চলের নিধি' (অবশ্য জননীর) বলিয়া আমাদের রঙ্গ করা হইত!

সেদিনে আর আজিকার দিনে কি এতটুকু মিল হয় না! আজ একটা কাজের খবর কানে আসিতে যে বিলম্ব! আগে চল্ আগে চল্ রবে যুব সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়ে; আর সেদিন দশমগ্রহ পূজার আয়োজন করিতে হইত। অনিশ্চিতে এমন মোহ, বিপদে এত আনন্দ, মরণেও এমন ঔদাসীন্য সেদিন বুঝি কল্পনারও অতীত ছিল। পৃথিবী আজ যেন বর্ষার খরস্রোতা নদী জলে ভাসিয়া চলিয়াছে। জোয়ারেও আনন্দ, ভাঁটাতেও আনন্দ। প্রমোদেও অরুচি নাই, প্রমাদেও আকুল আগ্রহ। আজিকার যুব সমাজ (যুব সমাজ বলিতে যুবক যুবতী উভয় সম্প্রদায়কেই বুঝায়, তাহা বোধ করি বলিতে যাওয়াই ধৃষ্টতা) জীব-জন্মের সার মর্ম্ম পদ্ম-পত্রে জল নিশ্চিত অনুধাবন করিয়া "হেসে নাও দু'দিন বৈ ত নয়" আর "নাঃ জীবনটা কিছু নাঃ" করিয়া স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে। কূল মিলে ভাল, না হয় অকূলেও অকুতোভয়!

ইহার সূচনা ঐ সময়েই হইয়াছিল। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন; স্বামী বিবেকানন্দ বীজ বপন করিয়াছিলেন। গান্ধীজী দক্ষ কৃষক, সোনা ফলাইয়াছেন।

গোলোকের অধিবাসীগণ পি-সি-রায়ের নিকট ডেপুটেসনে যাইবে; রিলিফ ক্যাম্পের সমূহ বিপদ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবে কৃতসঙ্কল্প করিয়া আমাকে বলিল, ডেপুটেসন লীড করিতে হইবে। ধার্য্য দিবসে, নির্দ্ধারিত সময়ে প্রবল জ্বরাক্রমণে শয্যাশায়ী না হইলে কি যে বলিতাম আর কি যে করিতাম ভাবিতেও লজ্জা করে! কিন্তু জ্বর যে এমন হাত-ধরা ও বিপদভঞ্জন হইল কিরূপে, তাহা বলিতে গেলে সাতকাণ্ড রামায়ণ হইয়া পড়ে। পক্ষীরাজ গরুড়কে ধন্যবাদ। দেবরাজ ইন্দ্রের ডিকেণ্টার হইতে বড় বিক্রমবলে যে সুধা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারই একবিন্দু ছিপির ফাঁক দিয়া মর্ত্ত্যে পতিত হইয়াছিল। সেই সুধাবিন্দু হইতে উৎপন্ন মূল বগলে রাখিলে টেম্পারেচার হু হু করিয়া উঠিতে থাকে। ইহা পরীক্ষিত সত্য। পাঠিকা-সুন্দরী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। রশুনের গুটি কয়েক কোয়া কয়েক মিনিট বগলের তলে ধারণ করিয়া, ফলাফল আমাকে জানাইলে খুশী হইব।

আচার্য্যদেবকে পরে এ সকল কথা জানাইতে হইয়াছিল, রশুনের ক্রিয়া কলাপও বাদ পড়ে নাই। তিনি বলিলেন, সুভাষ দিগ্বিজয়ী ছেলে। এই দেখ না, লর্ড লিটন পর্য্যন্ত প্রশংসা করতে পথ পান্ নি।

লর্ড লিটন বোধ হয় তখন বাঙ্গলার গভর্ণর।

কিন্তু গোলোকে আমার যাওয়া ভার। নর্থ বেঙ্গলের রিলিফের জন্য বন্ধুবর্গের অন্তর ক্রন্দন করিতেছে, অথচ সুভাষ বোসের জুলুমবাজির প্রতিকার না করিয়া শোকোপনোদন করিতে যাইতেও পারে না। তাই আমাকে পাইলেই কবে ও কখন্ পি-সি-রায়ের কাছে লইয়া যাইব তাগাদার তাগাদায় 'বুঝি প্রাণ বাহিরায়'!

ধূমকেতু সম্বন্ধে গোলোক অজ্ঞান অচেতন থাকিলেও আমরা পুরা-মাত্রাতেই সচেতন ছিলাম। তখন চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য দল গঠিত হয় নাই; চিত্তরঞ্জন দাশের "ফরওয়ার্ড" পত্রও জন্ম গ্রহণ করে নাই; রাইটার্স বিল্ডিং তখনও কলিকাতা কর্পোরেশনকে কুক্ষিচ্যুত করিতে বাধ্য হয় নাই; জনগণমনে কংগ্রেস তখনও একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই; রাষ্ট্রপতিত্ব যে জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান সে জ্ঞান তখনও পূর্ণায়ত্ত হয় নাই; একটা কংগ্রেসকে দু'খানা করা অথবা নূতন কংগ্রেস গঠন করার কল্পনাও তখন জাগে নাই সুতরাং কদমে কদমে চলিতে চলিতে খুসী মনে গান গাহিতে গাহিতে তেপান্তরের মাঠে রাজ্য, রাজ সিংহাসন প্রতিষ্ঠা হইতে পারে এ সকলই স্বপ্নের সীমানারও বহির্ভূত ছিল। তথাপি মনে হইল, যে লোক—আমাদেরই বয়সী যে লোক লোকচরিত্র নখদর্পণে দেখিতে পাইয়াছে, সে ত সামান্য নহে! অসামান্য না হইয়া যায় না—যায় না! কুৎসা করিতে নাই। বন্ধুবান্ধবের কুৎসা করা অতীব গর্হিত কার্য্য। আমি সে সকল কাজ করিয়া নরকে যাইতে চাহি না। আমি শুদ্ধমাত্র এই বলি যে, দর্জ্জিপাড়ার নতুন দা'দের সুভাষ ঝটিতি চিনিয়া ফেলিল কি করিয়া?

কয়েকদিন পরে, গোলোকের অপর এক সদস্য এক সপ্তাহের ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। ঔষধাদির এক বিরাট ফর্দ্দ লইয়া আচার্য্য দেবের কাছে যাইতে হইল। শৈলেশ আজ আর এ পৃথিবীতে নাই! আচার্য্যের আশীর্ব্বাদ ও সুভাষের আন্তরিক স্নেহ ভালবাসা হতভাগা বেশী দিন সম্ভোগ করিতে পারিল না। যে দিন সে ল' পাশ করিয়া, আদালতে টাকা জমা দিয়া উকীল হইল, তাহার পরদিন কোন্ অজানা আদালতের ডাকে কোথায় চলিয়া গেল, এ পৃথিবীতে তাহার চিহ্নটুকুও লুপ্ত হইল।

আচার্য্য শৈলেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কষ্ট টষ্ট হচ্ছে না ত বাবা?

শৈলেশ ভ্যাকুম-মুক্ত ইঞ্জিনের মত ধক্ ধক্ করিয়া উঠিল; বলিল, কষ্ট কি বলছেন স্যার, কারও এতটুকু অসুবিধে পর্য্যন্ত নেই। ঘড়ির কাঁটা যেমন চলে, মিষ্টার বোসের আমলে তেরটা ক্যাম্প ঘড়ির কাঁটার মত চলছে। চিঠি পত্র আসা যাওয়া নিয়ে ভারি মুস্কিল ছিল, গত সপ্তাহ থেকে আমাদের নিজেদের পোষ্টাফিস হয়েছে; ক্যাম্প রাণার সিস্টেম্ খোলা হয়ে গেছে স্যার; সালতি ক'রে আমরা ডাক নিয়ে যাই, নিয়ে আসি—পোষ্টাফিসের লোকরা খুব খুসী। ক্যাম্পের অধীনে, তিনটে হাসপাতাল চল্‌ছে, এই ওষুধগুলো নিয়ে যেতে পারলে আর একটা ডাক্তারখানা খোলা হবে। রোগীর সংখ্যাও স্যার, ক্রমশঃ কমে আসছে।

আচার্য্য পরম সন্তুষ্ট মনে প্রশ্ন করিলেন, সুভাষ তোমাদের যত্ন টত্ন করে ত?

শৈলেশ লজ্জায় যেন রাঙা হইয়া উঠিল; অন্তরের পরিতৃপ্তি স্নিগ্ধ হাস্য-বিভায় তাহার সুকুমার আননখানিকে শ্রী বিমণ্ডিত করিল; সে নতাননে নম্রকণ্ঠে কহিল, করেন। বলিয়া সে একটু থামিল; তারপর, লজ্জাশীলা কিশোরী বালিকার মুখ একবার খুলিয়া গেলে যেমন বাক্যের ফোয়ারা ছুটিতে থাকে, তেমনই অবিরাম গতিতে বলিতে লাগিল, ক্যাম্পে খাবার ঘণ্টা পড়লে, সমস্ত ভলাণ্টিয়ারকে খেতে যেতে হয়, তিনিও সকলের সঙ্গে

সেইখানে মাটীতে পাতা পেতে বসে পড়েন। কেউ যদি কোনদিন না আসে, কেন এলো না, অসুখ হয়েছে কি-না, কেন খাবে না, নিজে গিয়ে যতক্ষণ না আনছেন—বলিতে বলিতে শৈলেশ থামিল। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে প্রেমে তাহার অন্তর প্লাবিত হইয়া যাইতেছিল ; দু'একটা তরঙ্গ যেন কণ্ঠ-তটে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িয়া কণ্ঠ রোধ করিয়া দিতেছিল। একটু পরে নতমুখে নম্রস্বরে বলিল, একদিন আমার মাথা ধরেছিল, অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছি, হঠাৎ দেখি হ্যারিকেন হাতে করে—শৈলেশ আর বলিতে পারিল না।

আজাদ-হিন্দ্ গভর্ণমেণ্ট দেখি নাই—চকিতে আসিয়াছিল, চকিতে চলিয়া গিয়াছে। যেন—ভুলে ভুলে দেখা, ভুলে ভুলে শোনা। ভুলে মনে রাখা, ভুলে—ভুলে যাওয়া। সেই অস্থায়ী রাজ্যের প্রজাদেরও এই রকম কথা বলিতে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া যায় ; অশ্রুস্রোতে কথা ভাসিয়া যায়। যখন বাকশক্তি ফিরিয়া আসে, কথা বলিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করে, বলে, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকার বন্দুকের মুখে রচিত হয় নাই ; কূটনীতি দিয়া তাহাদের গাঁথনি হয় নাই। দেশপ্রেম ও স্বজাতি স্নেহের উপরেই সেই বিশাল সৌধ—বিরাট অট্টালিকা গঠিত হইয়াছিল।

বন্দেমাতরম্

জয়হিন্দ্

দর্পণ

শ্রীঅনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ফুটবল খেলতে গিয়ে সুজিত এমন সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়ে পড়ে যে তাকে ধরাধরি কোরে মেসে আনতে হয়। ডাক্তার পরীক্ষা কোরে বলেন—কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচর—একমাস ত বিছানায় শুয়ে থাকতেই হবে—আরও বেশী হতে পারে। একমাস—? সুজিত এক মুহূর্ত্তে মনে মনে প্রথম দিন থেকে শেষ দিনটির পর্য্যন্ত একটা মোটামুটি ছবি এঁকে নিয়ে একেবারে হাঁপিয়ে ওঠে। ম্যানেজার বলে—সুজিতবাবু, আপনি বাড়ী গেলেই ভাল কোরতেন। ডাক্তার ঠিক এই অবস্থায় নাড়ানাড়ীর পক্ষপাতী নন। সুজিতেরও মত নেই। তাই শেষ পর্য্যন্ত অফিসের ছুটি, বন্ধুবান্ধবদের সহানুভূতি আর ডাক্তারের আশ্বাসবাণীর মধ্যে সুজিতের একমাস বা আরও বেশীদিনের অলস জীবনযাত্রা সুরু হয়।

সকাল সন্ধ্যাটা তার কাটে মন্দ নয়। বন্ধুবান্ধবরা আসে—হাসি, গল্প, তামাসা চলে—রাজ্যের বাজে জিনিস নিয়ে তর্ক ওঠে ঘনিয়ে—যোগ না দিলেও শুনতে ভালই লাগে। কিন্তু দুপুর বেলাটাই সুজিতের সব চেয়ে মুস্কিল—গরমের এত বড় দুপুর খাঁ খাঁ করে। প্রথম দু-চার দিন ঘুমোবার চেষ্টা কোরেছিল, তারপর তাও আর হল না। মেসের বাবুরা সবাই বেরিয়ে যায়—ম্যানেজার নীচের ঘরে তার বিরাট বপু নিয়ে মেঝেয় পড়ে ভোঁস ভোঁস কোরে ·নাক ডাকাতে থাকে। কেমন একটা ঝিমঝিমে ভাবের মধ্যে সমস্ত কোলকাতা সহরটা যেন মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে থাকে। সুজিত বিছানায় পড়ে এপাশ ওপাশ করে—কোন একখানা বই নিয়ে পাতা দু'তিন উল্টে আবার পাশে ফেলে দেয়। এমনিভাবে কিছুদিন চলে। তারপর যখন সমস্ত পরিস্থিতিটা একেবারে অসহ্য হ'যে ওঠে—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সুজিত একটা আশ্চর্য্য জিনিষ আবিষ্কার কোরে ফেলে।

সুজিত আবিষ্কার করে তার সামনের দেওয়ালে ঝোলান আয়নাটাকে। নীচের রাস্তার খানিকটা, ফুটপাথের একটু অংশ, গাড়ীবারাণ্ডার উপরে সাজান ফুলের টবগুলির একটুখানি কোন্—আয়নায় দেখা যায়—বাইরের গতিশীল জীবনের সামান্য একটু আভাস মাত্র। তার মনে হয়, এই আয়নাটার দিকে চেয়ে একটা মাস কেন, একটা জীবন বোধ করি কাটিয়ে দেওয়া যায়। ঐ ফ্রেমখানার মধ্যে বাইরের বৃহৎ জগতের একটা ছোট অংশ ধরা পড়েছে—তারা কোনটাই স্থায়ী নয়—অচঞ্চল নয়—দ্রুত সমাপ্তির ছন্দে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময়! ট্রামগুলো একটার পর একটা চলে যায়—তার তেতালার ঘরে শব্দটা কিছু ফিকে হয়ে আসে। পথযাত্রীর শেষ নেই—গাড়ী, ফেরিওয়ালা কত কি! তার আয়নার মাঝে তাদের কিছুটা ধরা দেয়—তারপর মিলিয়ে যায়। এক এক সময় তার মনে হয় আয়নাখানি নির্ব্বাক চিত্রের একটা পর্দ্দা। সব চেয়ে আশ্চর্য্য—ঐ

আয়নাখানি তার ভাল লাগার মর্য্যাদা দেয় না। যে সব দৃশ্য—যাদের দৃষ্টি দিয়ে একটি প্রান্ত থেকে আর একটি প্রান্ত পর্য্যন্ত মন অনুসরণ কোরতে চায়—তারা নিছক ঔৎসুক্য জাগিয়ে ফ্রেমখানার একটা দিক থেকে আর একটা দিকে মিলিয়ে যায়।

বেলা ১০টা থেকে আয়নাখানা সুজিতের সাথী—তার দৃষ্টি থাকে তার উপর যতক্ষণ না পাঁচটা বাজে—মেসের বাবুদের পায়ের শব্দ শোনা যায়। ও দেখে, কেমন আস্তে আস্তে বাস আর ট্রামের সংখ্যা কমে যায়—পথচারীরা সংখ্যায় বিরল হ'য়ে ওঠে। একটি সতেরো আঠেরো বছরের মেয়ে—স্নান সেরে এলো চুলে বেগুনি রংএর ভিজে কাপড়খানা বারাণ্ডার রেলিংএর উপর ঝুলিয়ে দেয়—তারপর নিছক কৌতূহলবশে রাস্তার এদিক ওদিক বারকতক দেখে বাড়ীর ভিতর চলে যায়। কাপড়খানা পতপত কোরে বাতাস লেগে ওড়ে। সুজিত বালিশের পাশ থেকে রিষ্টওয়াচটা টেনে নিয়ে দেখে সাড়ে বারটা। রোজই মেয়েটি আসে, আর রোজই সুজিত তার আগের দিনের চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হয়ে যায়। আশ্চর্য্য প্যানচুয়াল! ঠিক সাড়ে বারটায়! নেহাৎ যদি দু-পাঁচ মিনিট এদিক ওদিক হয়।

দুপুর যতই এগিয়ে আসে রাস্তাটা তত শূন্য হয়ে আসে—সহরটা কেমন যেন এলিয়ে পড়ে। শুধু বরফওয়ালার 'চাই মালাই বরফ' বলে একটা বিচিত্র টান মাঝে মাঝে ভেসে আসে। আরও একজন রোজই ভাঙ্গা গলায় চিৎকার কোরে যায়—'চার হাত কার এক পয়সা, চার হাত ফিতে দু পয়সা' আয়নায় তাদের ছায়া পড়ে না, বোধ হয় তারা সুজিতের নীচের ফুটপাথ দিয়ে যায়। যাত্রীবিরল ট্রাম বাসগুলো বাঁধা সময়ের ব্যবধানে আনাগোনা করে। তারপর বেলা যতই পড়তে থাকে বাড়ীগুলোর ছায়া পথের উপর নেমে আসে। চাপাকল খুলে রাস্তায় জল দিয়ে যায়। লোকদুটোকে দেখা যায় না, শুধু যে জলধারা তার আপন গতিবেগে উৎসারিত হচ্ছে—তারই একটা অংশ বারকয়েক আয়নায় প্রতিফলিত হয়। তারপর রুটীওয়ালা তার ডালার উপর নেকড়া চাপা দিয়ে চলে যায়—লোকজনের আনাগোনা, গাড়ীর ভীড় আসতে আসতে বাড়তে থাকে—শেষ পর্য্যন্ত মেসের সিঁড়িতে মেসবাসীদের পদধ্বনি শোনা যায়। সুজিতের নিঃসঙ্গ জীবনের পটপরিবর্ত্তন হয়।

এই বিচিত্র চলচ্ছবির মাঝে সব চেয়ে কুৎসিত, সব চেয়ে অচল বলে যেটা মনে হয় সেটা ফুটপাথের যে অংশটা দেখা যায় সেখানকার এক পাগলী ভিখারী বুড়ী, আর তার ছেঁড়া নেকড়া, কাঁথা, কাঠের টুকরা, ভাঙ্গা চিরুণী এমনি আরও অনেক আসবাব নিয়ে তার সংসার। এ বুড়ী ওখানকার কতকালের বাসিন্দা সুজিত জানে না, তবে সে আজ এই মেসে আছে প্রায় এক বছর, এর মাঝে বুড়ীটাকে একদিনও ঠাঁইনাড়া হতে দেখেনি। ফুটপাথ দিয়ে আসতে যেতে মাঝে মাঝে পয়সাটা আধলাটাও দিয়েছে। কিন্তু তার আয়নার গতিশীল ছবিগুলির মধ্যে—ঐ বুড়ীর অচল কদর্য্যতা ওর কাছে একেবারে সৃষ্টিছাড়া বলে মনে হয়। একটু সরে গিয়েও কি হতভাগী বসতে পারে না!

ছায়া পড়বার সাথে সাথে ও-দিকেও গাড়ীবারাণ্ডার উপর একটী সৌখীন যুবককে মাঝে মাঝে দেখা যায়—গায়ে পাতলা জালি গেঞ্জী। ভদ্রলোক টবের গাছগুলি কখনও কখনও দেখেন—নিজেই সময়ে সময়ে জল দেন—আবার কোনদিন বা হাত দুটি বুকের কাছে ভাঁজ কোরে ধরে বারাণ্ডায় পায়চারী কোরতে থাকেন। ওপারের পাগলীটা এর মাঝে কী এক পরমাশ্চর্য্যের সন্ধান পায়, ভগবানই জানেন—হাঁ কোরে চোখ দুটো বড় বড় কোরে চেয়ে থাকে।

সেদিনও বেলা চারটার সময় ভদ্রলোককে দেখা গেল গাড়ীবারাণ্ডায়—পাশে একটী বৌ—মাথায় অল্প একটু ঘোমটা—কোলে হৃষ্টপুষ্ট একটি শিশু। দুজনে হেসে হেসে আলাপ করে—ছোট ছেলেটিকে কোলে নেবার জন্য ভদ্রলোক হাত বাড়ান। ছেলেটি ঝাঁপিয়ে আসে। তারপর বৌটি আবার হাত বাড়ায়, ছেলেটি ভদ্রলোকের গলা জড়িয়ে ধরে, যেতে চায় না। মেয়েটি তর্জ্জনী তুলে শাসনের স্নেহসূচক ভঙ্গী করে, কি সব বলে, তবু আসে না। সুজিতের দেখতে বেশ লাগে। আলাপ কোরতে কোরতে যখন ওরা ওদিকের কোণে চলে যায়, সুজিতের আয়নার উপর তাদের ছায়া থাকে না, সে আগ্রহভরে প্রতীক্ষা করে আবার কখন তারা এদিকের কোণে আসবে।

ওদিকে বুড়ীটাকেও খুব সক্রিয় দেখা যায়—কখন দুহাতে তালি দিচ্ছে—কখন বারাণ্ডার দিকে চেয়ে কোলে ডাকবার ইঙ্গিত কোরে দুহাত বাড়িয়ে কি যেন বলছে। ভদ্রলোক আর বৌটী আবার এদিকের কোণে ফিরে আসে। বুড়ীকে দেখিয়ে মেয়েটিকে তিনি কি যেন বলেন, মেয়েটীও বুড়ীর দিকে চেয়ে হেসে লুটিয়ে পড়ে। ভদ্রলোক শিশুটিকে বুড়ীর দিকে বাড়িয়ে কি যেন বলেন—বুড়ীও উন্মত্তের মত রাস্তার উপর ছুটে আসে। সুজিতের বিস্ময় বেড়ে ওঠে। হঠাৎ বুড়ীর পাশেই মোটরের বাম্পার, হেডলাইটের মাথা আর উপরের ঢাকনির ধাতুমূর্ত্তি রৌদ্রে ঝকঝক কোরে ওঠে—তারপর আয়নার ক্ষেত্র থেকে ওরা সরে যায়, চারিদিক থেকে লোকজনকে ছুটে আসতে দেখা যায়—অনেকগুলো কণ্ঠের মিলিত একটা বিকৃত ধ্বনি উপরে ভেসে আসে। সুজিতের বুকটা ঢিপ ঢিপ করে কেমন একটা আশঙ্কায়। চাকর, ঠাকুর, ম্যানেজার সবাই মনে হয় ছুটে বেরিয়ে যায়—সিঁড়ির উপর তাদের পায়ের শব্দ জাগে। সুজিত চোখ দুটো বড় বড় কোরে আয়নার দিকে চেয়ে থাকে—কিন্তু সেখানকার দৃশ্য বাইরের ঘটনার একটা অংশকেও প্রতিফলিত করে না।

কিছুক্ষণ পরে ম্যানেজার হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে আসে। দম নিতে নিতে বলে—'বুঝলেন সুজিতবাবু—ফুটপাথের বুড়ী পাগলী হ'য়ে গেল। আহা বেচারা! ওর জীবনে অনেক দুর্ভোগই গেল—শেষটা মরল অপঘাতে।"

—"কি ব্যাপার ম্যানেজারবাবু?—ফুটপাথের পাগলী বুড়ীটা……"

বাধা দিয়ে ম্যানেজার বলেন—'স্রেফ এক্‌সিডেণ্ট, পাগলের খেয়াল—উটমুখো হ'য়ে রাস্তা চলছিল পেছন দিক থেকে মোটরটা ধাক্কা দিয়ে কাজ শেষ কোরে দিলে। ওর জীবনটাই অমনি!'

—'আপনি ওকে চেনেন নাকি?' সুজিত প্রশ্ন করে।

"ও হরি। ওকে এদিকের পুরানো লোকেরা চেনে না কে?—মোক্ষদা, তার ছোট বয়সে—ঐ যে রাস্তার ওপারে একটা গাড়ীবারাণ্ডাওয়ালা বাড়ী দেখেন নি?—ফুলগাছের টব লাগান—ভারী কতকগুলো রেয়ার কলেকসন্ আছে মশাই, আমায় চারা দোব বলেছিল,…… মোক্ষদা ওদের বাড়ীর ঝি ছিল, তখন কতই বা ওর বয়স,—এই ধরুন উনিশ-কুড়ি বা বড় জোর বাইশ-তেইশ—মেয়েদের বয়স, শিবের বাবার সাধ্যি কি বলে"—ম্যানেজার ঠোঁট উল্টোয়। "—ফিনফিনে বাবু গোছের ঐ যে একটী ছোকরা দেখেন নি……দুনিয়ায় কত কি যে হয় মশাই, ওকে হ'তে দেখলুম, নেংটো হ'য়ে খেলতে দেখলুম আজ একেবারে লায়েক হ'য়ে গেছে, বিয়ে হ'য়েছে, একটা ছেলে পর্য্যন্ত হ'য়েছে। ঐ ছোকরাকে ত মোক্ষদাই মানুষ কোরলে। ওর মা মারা গেল আঁতুড় ঘরে, কিন্তু তারপর ঐ মুক্ষী—শুনলে বিশ্বেস কোরবেন না মশাই—আপন মা'র চেয়ে দরদ দিয়ে ছেলেটাকে ছ-সাত বছরের কোরলে। আমি কতদিন বলেছি—মুক্ষী, পরের ছেলে—অতটা ভাল নয়রে, যা রয়সয় তাই কর। মুক্ষী বলত—কি যে বলেন দাদাঠাকুর, কে বললে পরের ছেলে, এ আমার নিজের ছেলে, বলে ছেলেটাকে বুকে চেপে ধরত। আমরা দেখে হাসতুম। ছেলেটাও ওকে মা মা বলে ডাকত।

তারপর, ভগবানের লীলা বোঝা ভার মশাই, মোক্ষদাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। নানা লোকে নানা কেচ্ছা কোরলে…কেউ বললে, মারা গেছে, আহা বেচারা—সে সব কথা ছেড়ে দিন,…মোক্ষদা চার পাঁচ বছরের মত উধাও। ফিরে যখন এলো, তখন ছেলেটা মা বলে দৌড়ে এলো কিন্তু কর্ত্তা বাধা দিলেন—মুক্ষীকে বললেন—'বেরিয়ে যাও, এখানে আর কাজ হবে না। বেচারা অনেক কান্নাকাটি কোরলে, কিন্তু কর্ত্তার মন ভিজল না। তারপর, মুক্ষী আবার কিছুদিন উধাও হ'ল—শেষবার যখন ফিরে এলো, একেবারে বদ্ধ পাগল।

ফুটপাথের এদিকে ওদিকে পড়ে থাকে, আর ও বাড়ীর ঐ ছোকরাটাকে দেখলে ফ্যাল ফ্যাল কোরে চেয়ে থাকে, কখনও কখনও বলে—কোলে আসবি না খোকা? ও ছোকরাও যে ওকে চিনতে পারে না তা নয়—হাজার হোক সাত-আট বছর কোলে-পিঠে কোরে মানুষ কোরেছে ত!—কিন্তু তা হলেও ওর একটা পজিসন্ আছে—তাই বাধ্য হ'য়েই না চেনবার ভাণ করে।

তারপর সে বছর ওর বিয়ে হ'ল। বৌটী, যাই বলুন মশাই, তেমন সুবিধের হয়নি। আর হবেই বা কি কোরে বলুন, কর্ত্তা কেবল—কথা শেষ না কোরে ম্যানেজার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর তর্জ্জনীর ঘর্ষণে টাকা বাজাবার সঙ্কেত করে, গলাটা

একটু নামিয়ে বলে—শুনেছি মশাই, কঞ্জুষ বুড়ো, অষ্ট হাজার টঙ্কা একেবারে কম্‌করে গুণে নিয়েছে। চুলোয় যাক, কি বলছিলুম, হ্যাঁ,ও ছোকরা বিয়ে করতে যাবে এমন সময় মুক্ষী পাগলী কোত্থেকে এসে মোটর আগলে বল্লে—কোথায় যাস খোকা, মার কাছে বলে যা যে, দাসী আনতে যাচ্ছিস। দেখুন দেখি মশাই মাগীর আস্পর্দ্ধা, চাকর দরওয়ানের কাছে খেলেও দুচার ঘা তেমনি। তারপর থেকে যেদিন ঐ ছোকরার একটা ছেলে হ'য়েছে—ওদিকের ফুটপাথে একেবারে কায়েম হ'য়ে বসেছে। মানুষজন দেখলেই বলবে—আমার নাতি হ'য়েছে। হ্যাঁগা, তোমরা কিছু দেবে না গো, আমি নাতির মুখ দেখব কি দিয়ে।

সুজিতের মনে হল এমনি ধরণের কথা সেও যেন শুনেছে। ম্যানেজার বলতে থাকে—আর আজ মরলও ঠিক অমনি কোরে। রাস্তা দিয়ে নাকি দৌড়োচ্ছিল—'আমার নাতি, আমার নাতি'—বলে। আহা! বেচারার কাছেই পড়ে রয়েছে দেখলুম, একটা বেনে পুতুল, আর অনেককালের শুকনো গোটা দুই খইয়ের মোয়া—বোধ হয় নাতির মুখ দেখতে যাচ্ছিল—সংসারটাই বিচিত্র মশাই—

সুজিত তার শেষ কথাগুলো শোনে না। সবাই যা দেখেনি তার আয়নার মাঝে সেটুকু ধরা পড়েছে। সে স্পষ্ট দেখেছে, ঐ জালী গেঞ্জি গায়ে ভদ্রলোকটীকে তার ছেলেকে বুড়ীর দিকে বাড়িয়ে তাকে প্রলোভন দেখাতে। সুজিত ভাবে এ কেমন কোরে হয়। মাতৃহারা শিশু তার সাত-আট বছর পর্য্যন্ত যাকে মা বলে জেনে এসেছে—লোকলজ্জা তার বর্ত্তমান সামাজিক সম্ভ্রম, তাকে প্রত্যক্ষে স্বীকার করবার বাধা সৃষ্টি করতে পারে, এটুকু না হয় বোঝা যায়—কিন্তু নারী হৃদয়ের যেখানে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাকে নিয়ে আর যে পারে পারুক—ও লোকটী কেমন কোরে কৌতুক করে। আয়নার মাঝে খালি বারাণ্ডার কোণ আর ফুলগাছের টব তেমনি দেখা যায়। অকস্মাৎ সুজিতের মনে হয়—সারা পৃথিবীটাই ফাঁকি। তারপরই কি ভেবে পাশের টিপয়ের উপর থেকে কাঁচের ভারী পেপার ওয়েটটা তুলে নিয়ে ঝাঁ কোরে আয়নাখানায় ছুঁড়ে মারে, সেখানা ঝনঝন কোরে ভেঙ্গে পড়ে যায়।

সেই সুরে সুর মিলিয়ে চীৎকার কোরে ওঠে সুজিত—সব ফাঁকি, সব ফাঁকি···

গঙ্গাতীরে

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্-এ, কাব্যরঞ্জন

এবার এসেছি মাগো ক্লান্ত হৃদয় ল'য়ে তটে তোর লো কেদারবাহিনী,
শান্ত করিয়া চল-ঊর্ম্মির কলভাষা শুনিবি কি মরমের কাহিনী?
এনেছি প্রাণের তাপ—
দেহভরা যত পাপ,
এনেছি এ বুক-ভরা বহ্নির সম ব্যথা নিশিদিন এ জীবনদাহিনী?
জলে তোর কত লোক কলুষের নির্ম্মোক পরিহরি' উঠিতেছে নাহিয়া,
স্নিগ্ধ শীতল হিয়া গৃহে তারা যায় নিয়া মা তোর মহিমা-গীতি গাহিয়া।
তবু হেথা মোর প্রাণ—
করে শুধু আনচান,
এ সুখের সৈকতে শোকের অশ্রু ঝরে অবিরল দু'কপোল বাহিয়া!
সন্ধ্যা ঘনায় ধীরে শুনি হোথা গম্ভীর আরতির নিঃস্বন মন্দিরে কালিকার,
আজি যেন ঘুরে ফিরে মনে পড়ে ছায়াসম সকরুণ মুখ এক বালিকার!

সবই যেন লাগে ফাঁকা—তিক্ত গরল-মাখা,
একটি কুসুম ঝরি' রিক্ত হ'য়েছে শোভা চিরতরে এ জীবন-মালিকার!
বিষাদ-জড়িত সুরে গাহিতে না পারি যদি পূত তোর মহিমার গীতি মা,
ক্রন্দন করি' যদি বন্দন করি' তোর উচ্ছল আঁখিজলে তিতি' মা—
ক্ষম্য কি অভাজন—
নহে কভু সে কারণ?
এ জগতে দুঃখীর আর যত আর্ত্তের পূজার এ শাশ্বত রীতি মা!
দিবি কি মা একবার দগ্ধ প্রাণের 'পর তুহিন-শীতল কর বুলায়ে?
করি' কুলু কুলু তান জুড়াইয়া এ পরাণ দিবি কি স্মৃতির জ্বালা ভুলায়ে?
নীড়ে-ফিরা পাখিপ্রায়—
উদাসী মনেরে হায়,
পারিবি কি ফিরাইতে বারেকের তরে মাগো, সংসার-কুলায়ে?

রামের সুমতি

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

আমাদের হিন্দুসমাজে পারিবারিক সম্বন্ধ বহুমুখী এবং বিচিত্র। এমনটা অন্য সমাজে নাই। প্রায় প্রত্যেকটি সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া শরৎচন্দ্র রসসৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন।

বাঙ্গালার একান্নবর্ত্তী পরিবারে অনেক ক্ষেত্রেই নিজে সন্তানবতী হইবার আগে এবং পরে রমণীকে পরের ছেলে মানুষ করিতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরের ছেলে নিজের ছেলের মতই স্নেহভাজন হইয়া উঠে। ছেলের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই মায়ের অভাবের পূরণ হয়।

মেজোদিদি গল্পে কেষ্ট করুণার পাত্র হইয়া হেমাঙ্গিনীর জায়ের আশ্রয়ে আসিয়াছিল। এখানে করুণাই ক্রমে বাৎসল্যে পরিণত হইয়াছিল। 'বিন্দুর ছেলে' গল্পে অমূল্যর জননী বর্ত্তমানই ছিল। অমূল্য বৈমাতুর সন্তান। রামের সুমতির রাম মাতৃমমতায় প্রতিপালিত মাতৃহীন সন্তান।

হিন্দুঘরের রমণীকে ভাই, বোন, ভাসুর, দেবর, ননদ ইত্যাদির সন্তানকে ত প্রতিপালন করিতেই হয়, সপত্নীর সন্তানের ত কথাই নাই; —পিতা ও শ্বশুরের সন্তানকেও প্রতিপালন করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের 'দিদি' গল্পে দিদি ছোট ভাইকে প্রতিপালন করিয়াছে—ছোট ভাইএর প্রতি দিদির মাতৃমমতা এমনই গভীর করিয়া দেখানো হইয়াছে যে তাহা লইয়া স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। আমাদের সমাজে মাতৃহীন শিশুদেবর জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর প্রতিপাল্য। রামের সুমতি গল্পে নারায়ণীর প্রতিপালিত রাম তাহার শিশুদেবর। রাম মাতৃহীন পিতৃহীন, তাহার সহোদর সহোদরাও নাই। শ্যামলাল তাহার বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। রামের মাসী পিসীরও সন্ধান পাওয়া যায় না—খুড়ী জেঠীত নাই-ই। কাজেই রামের পালন ভার স্বভাবতই হিন্দু পারিবারিক প্রথা অনুসারে নববধূ নারায়ণীর উপরই পড়িল। রাম করুণার পাত্র। কিন্তু করুণাবশেই নারায়ণী তাহাকে বুকে টানিয়া লয় নাই। সে তাহার মুকুলিত যৌবনের মাতৃহৃদয়ের উদ্ভিন্নমান বাৎসল্য-তৃষ্ণাই নিবৃত্ত করিয়াছিল। নিজের সন্তান হইবার আগে রাম নারায়ণীর অঙ্কে সন্তানের অনুকল্প রূপে আবির্ভূত। পরে নারায়ণীর সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু নারায়ণীর অঙ্কে রামের আসন অটল হইয়াই রহিল। সে তাহার জ্যেষ্ঠ সন্তানের স্থান অধিকার করিয়াছিল। অন্য সমাজের পক্ষে অস্বাভাবিক হইলেও ইহা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

নারায়ণীর সংসারে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নাই, পুরুষের সহিত নারীর দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ দেখানো শরৎচন্দ্রের কলাপদ্ধতি নয়—কাজেই রামকে লইয়া একটা দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ বাধিবার কোন সুযোগ ছিল না। শরৎচন্দ্র এখানে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের জন্য অন্য পদ্ধতি আশ্রয় করিয়াছেন। রামকে করিয়াছেন অত্যন্ত দুরন্ত, দুর্ললিত ও স্নেহের অযোগ্য। তাহার ফলে, রামের প্রতি নারায়ণীর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দুইএরই সৃষ্টি হইয়াছে। এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, অনুরাগ ও বিরাগের দ্বন্দ্বই হইয়াছে রামের সুমতির রসোপাদান।

নারায়ণীর ক্ষুদ্র সংসারে কোন দুঃখই ছিল না—তাহার শান্তিতেই ঘরকন্না করিবার কথা। তাহার যত দুঃখ রামকে লইয়া। এত দুঃখ যে দেয় তাহার প্রতি স্নেহ থাকিবার কথা নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় গোবৎস যেমন মাতৃস্তনে মুহুর্মুহু মস্তকের আঘাত করিয়া অধিকতর দুগ্ধ আদায় করিয়া লয়—রামও তেমনি নারায়ণীকে নানাভাবে পীড়ন করিয়া তাহার অধিকতর স্নেহ আদায় করিয়াছে।

আকর্ষণ ও বিকর্ষণের দ্বন্দ্বে বিকর্ষণ কিছুতেই জয় লাভ করিতে পারে নাই। রাম মাতৃহীন, পিতৃহীন, তিনকুলে তাহার সে ছাড়া কেহই নাই—সন্তানরূপে সে তাহার প্রথম যৌবনের আতপ্ত বক্ষে লালিত হইয়াছে। পরিবারের দাসদাসী হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের কোন লোকই তাহার দুরন্তপনার জন্য তাহাকে ভালবাসে না। ভালবাসার সমস্ত অভাবের ক্ষতিপুরণ করিবার জন্য নারায়ণীকে তাই চতুর্গুণ আগ্রহের সহিত রামকে বক্ষে টানিয়া লইতে হয়। লোকে যত রামের উপর বিরক্ত, হয়, নারায়ণী ততই ভালবাসার মাত্রা বাড়াইয়া দেয়। এজন্য যে জ্বালা-যন্ত্রণা অনিবার্য্য সবই সে নিজেই ভোগ করে। সন্তান যতই দুরন্ত হোক—মা'র স্নেহ হইতে সে কখনো বঞ্চিত হয় না। তাই নারায়ণী ডাক্তারকে বলে—"ও ছোঁড়া একদিন জেলে যাবে তা জানি, কিন্তু ঐ সঙ্গে আমাকেও যেতে না হয়।"

রাম সম্বন্ধে নারায়ণীর মনোভাব নিম্নোদ্ধৃত অংশে চমৎকার অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। বারো তের বছরের ছেলে রামকে কোলে বসাইয়া খাওয়াইয়া দিতে হয়। দাসী নেত্যকালী দোষ ধরিলে নারায়ণী বলে—"তোরা ওর বয়সই দেখিস্। বড় হলে বুদ্ধি হলে ওর আপনি ধারণা হবে। তখন আর কোলে বসতে চাইবে—না খাইয়ে দিতে বলবে?"

নেত্যকালী ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—"ভালর জন্যই বলি মা। নইলে আমার দরকার কি? বার তেরো বছর বয়সেও যদি ওর জ্ঞানবুদ্ধি না হয় তবে হবে কবে?"

নারায়ণী এবার রাগ করিলেন। বলিলেন, "জ্ঞানবুদ্ধি সকল মানুষের এক সময়ে হয় না নেত্য। আর হোক ভাল না হোক ভাল, তোদের বা এত দুর্ভাবনা কেন?"

নেত্য বলিল—"তোমার ঐ দোষ মা। ও যে কি রকম দুষ্টু হয়ে উঠেছে তা ত নিজেও দেখতে পাচ্চ। পাড়ার লোকে বলে তোমার আদরে ও—"

রুক্ষস্বরে নারায়ণী বলিলেন—"পাড়ার লোকে আদরটাই দেখে শাসনটা ত দেখে না…ঘরে বাইরে আমার অত গঞ্জনা সহ্য হয় না—

ত্য।" বলিতে বলিতে তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া দুই চোখ জলে ভরিয়া াসিল।

নারায়ণী চোখ মুছিয়া বলিলেন—"সকল মানুষকে ভগবান এক রকম ড়েন না। ও একটু দুষ্টু বলেই আমি যার তার কথা চুপ ক'রে সহ্য রি। কিন্তু আদর দেবার খোঁটা লোকে দেয় কি বলে? তারা কি র ওকে আমি কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসি। তাহলেই াদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়।"

ইহাকেই বলে অন্ধ মাতৃমমতা। নারায়ণী নিজে শাসন যথেষ্ট করে, ন্তু অন্যে কিছু বলিলে সহ্য করিতে পারে না। স্নেহাতিশয্যকে সংযত । গোপন করিয়া কি ভাবে পালন করিলে ফল হয়, অশিক্ষিতা পল্লীরমণী াহা জানে না।

রামের উপদ্রব চলিতে লাগিল—নারায়ণী দশ মিনিট শাসন করে ত -একঘণ্টা আদর করে। নারায়ণী প্রত্যাশা করে, একটু বয়স বাড়িলে ানবুদ্ধি হইলে রামের সুমতি হইবে।

নূতন একটা উপকরণের অবতারণা না করিলে গল্প আর াগায় না—বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় না, নারায়ণীর মাতৃমমতার কঠোর রীক্ষাও হয় না—রামেরও সুমতি হয় না, গল্পের প্লটে জটিলতারও সৃষ্টি য় না।

'বিন্দুর ছেলেতে' এলোকেশী যে কাজ করিয়াছে, রামের সুমতিতে ারায়ণীর মা দিগম্বরী সেই কাজ করিতে আসিল।

লক্ষ্মীশ্রীসম্পন্ন সংসারে বর্ষীয়সী মহিলা হয় অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী কিংবা াহামায়া—আর পল্লীগ্রামের অভাবের সংসারে বর্ষীয়সী নারীরা হয় লোকেশী কিংবা দিগম্বরী। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ামাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বেশ মিলে।

দিগম্বরীর মত পল্লী-বৃদ্ধা কখনও সহ্য করিতে পারে না—তাহার কন্যা ামাত্রের দেবরকে ছেলের মত আদর করিবে। ইহা তাহার চোখে মন অস্বাভাবিক, তেমনি অশোভন।

বাড়ীর উঠানে অশ্বত্থ গাছের ডাল পোতায় রামের দুরন্তপনা বা দুর্বুদ্ধি পেক্ষা বালকবুদ্ধিরই অধিকতর পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে নারায়ণীর গ হয় নাই—সে আমোদ পাইয়া হাসিয়াছে। কিন্তু দিগম্বরীর চোখে ইহা স্বরূপ ধরিয়াছে। এই ব্যাপারে নারায়ণী উহার মায়ের অন্তরের প্রথম রিচয় লাভ করিল। দিগম্বরী বলিল—বাড়ী কি ওর একলার যে, সে ন করলেই উঠানের মাঝখানে এক অশ্বত্থ গাছ পুঁতে দেবে? তোরা কেউ নস্? আমার গোবিন্দ কি কেউ নয়? মাগো, অশ্বত্থ গাছের ারে যত রাজ্যের কাক চিল শকুনি বাসা করবে। হাড়গোড় ফেলে ংরা করবে—আমি ত নারাণী তাহ'লে থাকতে পারব না—। ওকে াদের এত ভয়টা কি শুনি? আমার যদি বাড়ী হ'তো নারাণি, তা হলে খ্তুম, ও কত বড় বজ্জাত।" নারায়ণী মায়ের বুকের ভিতরটা যেন র্পণের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

এই অংশে দিগম্বরীর মুখের কথা অতি উচ্চশ্রেণীর আর্টের নিদর্শন। ার vitality অতুলনীয়। মূলহীন অশ্বত্থের ডাল একদিন বড় অশ্বত্থ বৃক্ষে পরিণত হইবে, তাহাতে চিল শকুনি বসিবে—হাড়গোড় ফেলিবে। বৃদ্ধা দিগম্বরী তখন আর এ বাড়ীতে থাকিতে পারিবে না। এই উৎকণ্ঠায় দিগম্বরী জীবন্ত হইয়া আমাদের যতটা বিরক্ত করিয়াছে—তাহার চেয়ে ঢের বেশী হাসাইয়াছে। রাম বলিয়াছিল—ঐ অশ্বত্থ গাছ বড় হইলে উহার ডালে গোবিন্দর জন্য দোলনা ঝুলাইয়া দিবে। এই রাম যে দিগম্বরীর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই দ্বন্দ্বে সকলেই কিন্তু দুরন্ত রামের পক্ষে। রামের দুরন্তপনা—দিগম্বরীর ইতরতার তুলনায় যথেষ্ট প্রীতিকর।

যাহাই হউক, দিগম্বরীর উপদ্রব রামের উপদ্রবকে ছাড়াইয়া গেল। নারায়ণীর জীবনে দারুণ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইল। একদিকে আশ্রিতা জননী—অন্যদিকে সন্তানকল্প রাম। রামের উপদ্রবকে সে শাসন করিত—দিগম্বরীর উপদ্রব সে নীরবে সহ্য করিত। একের বিদ্রোহ, অন্যের চক্রান্ত। এই ব্যাপার লইয়া নারায়ণীর স্বামীর সহিত দ্বন্দ্ব বাধিল। তাহার ফলে রামকে কঠিনতম দণ্ড দেওয়া হইল। কিন্তু রামেরই শেষে জয় হইল, দিগম্বরীকেই বিদায় লইতে হইল।

শরৎচন্দ্র শেষে বলিয়াছেন, রামের সুমতি হইল। কারণ, রাম নিজে বলিল—আমার সুমতি হইয়াছে। কিন্তু রামের সুমতি তাহার আচরণের দ্বারা দেখাইবার আর প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ফলে, উপন্যাসখানির নাম রামের সুমতি না হইয়া রামের দুর্মতি হইলেও দোষ হইত না। পুস্তকে রামের দুর্মতিরই বিবৃতি আছে—সুমতির বিবৃতি নাই। রামের দুর্মতির কাহিনীগুলি এমন চমৎকার করিয়া চিত্রিত যে সেই চিত্রপরম্পরাই পরম উপভোগ্য হইয়াছে—রামের সুমতি হোক বা না হোক সেজন্য আমরা ব্যস্ত নই। নিত্য নব নব উপদ্রব সত্ত্বেও সে যে তাহার বৌদিদির এবং শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি হারায় নাই—ইহাই সাহিত্যরস-সম্ভোগের পক্ষে যথেষ্ট।

উপদ্রবের বৈচিত্র্যে ও পরিমাণের হিসাবে রাম পনের ষোল বছরের ছেলের মত। কিন্তু বুদ্ধিতে সে আট নয় বছরের ছেলের মত। যে ছেলে বাড়ীর উঠানে অশ্বত্থের ডাল পুঁতিয়া প্রত্যাশা করে—ঐ গাছ বড় হইলে ডাল হইতে তাহার পাঁচ বছরের ভাইপোর জন্য দোলনা ঝুলাইবে, যে ছেলেকে মঙ্গলবারের নাম করিয়া অনায়াসে যাহার তীব্র রোষের উপশম ঘটানো যায়, বৌদিদির হাতে খাওয়ার প্রসঙ্গে বৌদিদির হাতকে যে পরের হাত মনে করে না, জমিদারের ছেলেকে প্রহার করিতেও যে ইতস্ততঃ করে না, চরম দণ্ড লাভ করিয়াও যে আচরণে কারুণ্যের বদলে হাস্যেরই উদ্রেক করে, তাহার উপদ্রব দিগম্বরীর বিরক্তি জাগাইতে পারে—তাহার কাহিনীর লেখক বা পাঠকের সহানুভূতি সে হারাইতে পারে না। দুরন্ত বালকের মনস্তত্ত্ব ও তাহার অভিব্যক্তি এমন চমৎকার করিয়া শরৎচন্দ্র এই গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন যে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। 'সমাপ্তি' গল্পে রবীন্দ্রনাথ একটি বালিকার দুরন্তপনার অপূর্ব্ব ইতিহাস রচনা করিয়াছেন—প্রেমের মায়াদণ্ডের স্পর্শে তাহার সুমতি হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাহার সুমতি-সম্পাদনে মায়াবিনী প্রকৃতির সহায়তা পাইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রকে রামের সুমতি সাধনে রীতিমত বেগ পাইতে

হইয়াছে—একটা অস্বাভাবিক ব্যাপারের সহায়তা লইতে হইয়াছে। বার তের বছরের ছেলেকে কয়েকটা ঘটি বাটির সহিত পৃথক করিয়া দিতে হইয়াছে। অবশ্য এই পৃথক করিয়া দেওয়ার অর্থ শুধু নারায়ণীর ভালোরূপই জানা ছিল।

নারায়ণীর অত্যাদর রামকে দুরন্ত না করিয়া আরও দুরন্ত করিয়া তুলিয়াছে—লোকে ইহাই বলিত। অতিরিক্ত আদরে অনেক সময় ছেলে নষ্ট হয়, তাহাতে তাহার জীবনীশক্তিও নষ্টই হয়। অতিরিক্ত আদর জীবনীশক্তি সঞ্চার করিতে পারে না। পিতৃমাতৃহীন রাম নারায়ণীর অতিরিক্ত আদরেই দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে—একথা বলা যায় না। দুরন্তপনা রামের প্রকৃতিগত। অফুরন্ত জীবনীশক্তি লইয়াই সে জন্মিয়াছিল—রামের উপদ্রব জীবনীশক্তির আতিশয্যেরই (Excess of vitality) অভিব্যক্তি। এই অফুরন্ত জীবনীশক্তি প্রকাশের কোন সুপথ না পাইয়া নানারূপ উপদ্রবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শাস্তি ও শাসন এই উপদ্রবের দমনের উপায় নয়—শরৎচন্দ্র তাহা এই গল্পে একাধিকবার দেখাইয়াছেন। শাস্তি ও শাসনের দ্বারা রামের সুমতি ঘটিবার কথা নয়—জীবনীশক্তির অভিব্যক্তির কোন বিশিষ্ট প্রশস্ত পরিখাত (Vicarious Channel) খুলিয়া দেওয়াই রামের সুমতি সাধনের উপায়। শরৎচন্দ্র রামের সুমতি সঞ্চারে বিজ্ঞানসম্মত স্বাভাবিক পন্থা অনুসরণ করেন নাই, করিতে পারিলে বোধ হয় উপসংহার চমৎকারই হইত।

রাম যত দুরন্তই হউক, সে হৃদয়হীন ছিল না। যদিও তাহার হৃদয় মুকুলিত,তবু একটু আধটু সৌরভের পরিচয়ও আমরা পাইয়াছি। নারায়ণীর স্নেহের প্রতিক্রিয়া রামের আচরণে মাঝে মাঝে প্রতিফলিত দেখা যাইত। সে তাহার বৌদিদির রোগে, দুঃখে, অনশনে, মৃত্যুকল্পনায় বেদনা বোধ করিত। রামের সুমতি সাধনে এই হৃদয়ের দিকে একটা প্রবল আবেদন করিলে কেমন হইত তাহা ভাবিবার বিষয়।

পুস্তকের নাম রামের সুমতি। এই নামটিকে 'পরমার্থতা' গ্রহণ না করিয়া রামের মুখের কথাটাকেই নামকরণে মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে মনে করিলে বোধ হয় আর ক্ষোভ থাকে না।

প্রবন্ধে রসবিশ্লেষণ অপেক্ষা অভিনব সৃষ্টির দ্বারা যে কোন রসসৃষ্টির ব্যাখ্যান অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী রসবোধনার সহায়ক। উপন্যাসের নাট্যরূপ দান অভিনব সৃষ্টির দ্বারা উপন্যাসের প্রকৃত রসব্যাখ্যান। শ্রীমান্ দেবনারায়ণ গুপ্ত রামের সুমতির সেইরূপ রসব্যাখ্যান করিয়াছেন। রামের সুমতির নাট্যরূপদান বিন্দুর ছেলের নাট্যরূপদানের মত সহজ হয় নাই। রামের সুমতির নাট্যরূপে নাট্যব্যাখ্যাতাকে অভিনয়োপযোগী করার জন্য নূতন নূতন দৃশ্য সংযোজন করিতে হইয়াছে। অপ্রধান চরিত্রগুলির স্বতন্ত্রভাবে উন্মেষ সাধন করিতে হইয়াছে। ফলে রামের সুমতি নাটকখানি অভিনব সৃষ্টির মতই দাঁড়াইয়াছে। ইহাকে রামের সুমতির dramatic interpretation বলা যায়। লেখক শরৎচন্দ্রের রচনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যটুকু এমনি বেমালুম আত্মসাৎ করিয়াছেন যে অভিনব সংযোজনাগুলির সঙ্গে মূল আখ্যানবস্তুর অঙ্গাঙ্গী সংযোগ ঘটিয়াছে। শরৎচন্দ্র রামের আচরণের মধ্যে কেবল উপদ্রবের ভাবটাই দেখাইয়াছেন—রামের চরিত্রের অন্যান্য দিকের প্রয়োজন তাঁহার ছিল না। নাট্যকার রামের চরিত্রটিকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। দুরন্ত ছেলের মধ্যে নিঃসম্পর্ক লোকেরও ভালবাসিবার উপাদান-বস্তু কিছু কিছু থাকে। যেখানে জীবনীশক্তির আতিশয্য সেখানে উপদ্রবের আতিশয্য ঘটিতে পারে, শাসনের আতিশয্যও তাহার ফলে অনিবার্য্য, কিন্তু ভাষণের আতিশয্য থাকে না। শরৎচন্দ্র তাই রামের মুখে বেশী কথা বসান নাই। এই বাক্‌সংযমের প্রয়োজন ছিল। নাট্যকার শরৎচন্দ্রের এই গূঢ় অভিসন্ধিটি ধরিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়। নাট্যকার সুরধুনীকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন—এবং তাহার সাহায্যে রামের সাময়িক সুমতিকে চিরস্থায়ী করিয়া তুলিবার ইঙ্গিত দিয়াছেন। ইহাতে মূল রচনার মর্য্যাদাহানি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

দিগন্ত কোথায় ?

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

এখন অনেক কাজ, সময় কোথায় বলো
কতটুকু অবসরক্ষণ ?
দেবদারু ঘন বনে ঈষৎ আকাশ কোণে
কোথা জাগে চাঁদের কিরণ ?
শিরশিরে হাওয়া বয় জীবনের সঞ্চয়
কতটুকু পরমায়ু তার ?
তোমার আমার ঘর কাঁপে ত্রাসে থরথর
চারিদিক ঘেরা অন্ধকার।
পৃথিবী অনেক বড় ; সমুদ্র গর্জন করে
লোনা জলে রক্তের দাগ,
সাগর পাখীরা গায় মরণের মহাভয়
রাঙা মেঘে রক্তের ফাগ।
তবুও তো ছোট ঘরে, ছোটখাটো পরিসরে
আমাদের কাটে না জীবন।

জ্বালিনাকো রঙ বাতি, রঙিণ খেলায় মাতি
গড়িনাকো রঙিণ-স্বপন !
তোমার হলুদে শাড়ি বিবর্ণ হয়েছে আজ
পৃথিবীর ধূসর ছায়ায়
চোখের কাজল রেখা জীবনের কালিমাখা
মালিন্যের গাঢ় দীনতায়।
তবুও পৃথিবী বড় ; আকাশ পড়ে না চোখে
দিগন্তের নাহিক সীমানা,
তোমার আমার মন নিপীড়িত অনুক্ষণ
যুগান্তের নব সম্ভাবনা।
সমুদ্র গর্জন করে ; পাখী ওড়ে কালো ঝড়ে
রক্ত ঝরে পাথায় পাথায় !
সময় কোথায় বলো ? ছোট ঘর ভেঙে গেল ;
এস দেখি দিগন্ত কোথায় ?

দেহ ও দেহাতীত

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

কর্ম্মকোলাহলহীন, ব্যস্ততাহীন নিবিড় নীরবতা ও দারিদ্র্যের গ্লানিমাভরা গ্রামের নিভৃত কোণে বৈচিত্র্যহীন শ্লথ দিনগুলি একে একে একই রকমে কাটিয়া গিয়াছে। মাতার উত্তপ্ত স্নেহবিগলিত বুকের মাঝে বাস করিয়া অমলের মনের অতৃপ্তি আস্তে আস্তে কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছে —মাঝে মাঝে একটা বেদনা তাহার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এই মাত্র। গৌরীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে কিন্তু ব্যবহার ও কথা-বার্ত্তার কোন উন্নতি হয় নাই। শীর্ণ শুষ্ক দেহে আবার যৌবনশ্রী দেখা দিয়াছে—শুভ্রগণ্ড রক্তাভ হইয়াছে, কিন্তু তেমনি করিয়া সে অমলের কাছে আসে না, নানা অজুহাতে ও উপায়ে তাহাকে বিব্রত করে না। প্রশ্ন করিলে কোনমতে অত্যন্ত শোভন ও সংযত উত্তর দিয়া আলাপকে অনাবশ্যকরূপে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলে। মাঝে মাঝে তাহার নতনেত্রসম্পাতে অমলের হৃদয় করুণা ও সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠে। সহানুভূতি প্রকাশ করাটা, বিশেষতঃ গৌরীর কাছে—অত্যন্ত অবান্তর ও বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হয়। অপর্ণা হইলে হয়ত অনেক কিছুই বলিয়া ফেলা চলিত কিন্তু গৌরীকে ভাষায় কিছু বলা চলে না, কেবলমাত্র গভীর করুণদৃষ্টির প্রশান্ততা দিয়া সমবেদনা জানানো চলে। সে এমনি—যে মুখের ভাষা সেখানে নীরব, চোখের ভাষাই নীরবে সব জানায়—

আষাঢ়ের মাঝামাঝি—আর কয়েকটী দিন পরেই অমলকে কলিকাতা যাইতে হইবে। সেদিন দুপুরের পরে মাতাপুত্র গৃহের মাঝে বসিয়াছিল, হঠাৎ একখানা কালো ছেঁড়া মেঘের বুক হইতে অজস্র ধারায় জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। উঠানের স্রোতের উপর বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়িয়া ফাটিয়া যাইতেছে—জীর্ণ দালানের নোনা-ধরা ক্ষয়িষ্ণু ইঁটের উপর পড়িয়া চট্‌পট্ শব্দ করিতেছে। অমলের কবি-মন নানা কথা ভাবিতেছিল—এক একবার অপর্ণার প্রসঙ্গে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল।

অকস্মাৎ দেখিল মা তাহারই পাশে আসিয়া বসিয়াছেন। মা প্রশ্ন করিলেন, কবে—কবে যাবি?

—সামনের বুধবার ভাল দিন আছে। কলেজও ত খুলে এল—

—তুই ছেলে পড়াস্ কখন?

—সন্ধ্যার পরে।

—পড়াশুনোর ত ক্ষতি হয়, এবার ত পরীক্ষার বছর। অত পরিশ্রম ক'রে কি পারবি, এই ক'মাসেই শরীর যা হ'য়েছে। খাওয়া দাওয়ারও কষ্ট হয়।

মা ইচ্ছা করিয়াই কখনও এই সমস্ত দুঃখদায়ক প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই, আজ তাঁহাকে স্বেচ্ছায় এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে দেখিয়া অমল আশ্চর্য্য হইয়াছিল। বলিল, —চ'লে যাবে, কষ্ট ত একটু হবেই। তুমি ভেবো না।

মা কি যেন একটা বলিতে যাইয়া ইতস্ততঃ করিলেন। ক্ষণেক পরে বলিলেন—তোর মনে পড়ে, তোর ছোট কালে সংসারের কাজ ক'রে আমি সময়ই পেতাম না, গৌরীর মায়ের কাছেই তুই প্রায় থাক্‌তিস্?

অমল মনে মনে একটা কিছু আশঙ্কা করিয়াছিল, একটু হাসিয়া কহিল—মনে থাক্‌বার ত কথা নয় মা, তবে তা আমি শুনেছি।

—গৌরী ঠিক ওর মার মতই। ওর মাও কেন যেন তখন তোকে নিয়ে টানাটানি ক'রতো, আমার কত সাহায্য ক'রতো, আজ গৌরীও তেমনি না ডাক্‌তেই এসে আজ আমাকে জল-পত্তি দিচ্ছে। পূর্ব্বজন্মে ওরা নিশ্চয়ই আমার আপনার জন ছিল—

মাতার চোখ দুইটি কৃতজ্ঞতায়, স্নেহে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বাহিরের বৃষ্টিধারার প্রতি ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—ক'লকাতায় না জানি তোর কত কষ্টই হয়—ওরা কি ব'লছিল জানিস্?

—কারা?

—গৌরীর মা বাবা। তারা এ বছরটা তোর পড়ার খরচ চালিয়ে দেবে—আর গৌরীকে যদি আমার ঘরে

আনতে পারি তবেই ওদের গুণের কিছু মূল্য দেওয়া হয়। তোরও পড়ার সুবিধে হবে—অত পরিশ্রম ক'রলে শেষে পরীক্ষা হয়ত ভাল হবে না।

অমল কোন জবাব দিল না এবং বিস্মিতও হইল না, এমনি একটা আশঙ্কা সে বহুদিন হইতেই করিতেছিল। মাতা কোনও জবাবের জন্যে অপেক্ষা করিতেছিলেন কিন্তু জবাব না পাইয়া আবার বলিলেন—মার মন ত জানিস্ না, ছেলেকে কোথায়ও কারও হাতে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে না—এক বৌ'এর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। গৌরীর হাতে যদি তোকে দিয়ে যেতে পারতুম তবে আমার শান্তি হ'ত—

অমল জবাব দিল, পরীক্ষার আগে ও সমস্ত কথা ভেবো না মা। পরে যা হয় হবে—

মা একটু উৎসাহিত হইয়া বলিলেন—বিয়ে না হয় পরীক্ষার পরেই হবে কিন্তু এখন যদি ছেলে পড়াতে না হয় তবে ত—

অমল একটু দৃঢ়কণ্ঠেই বলিল—যদি পাশ করি মা নিজেই ক'রবো, কারও সাহায্য আর চাই না। এই পর্য্যন্ত ত এমনি ক'রেই দিন কেটেছে—একটা বছরের জন্যে পরের অন্নদাস আর কেন হব? পরীক্ষা ভাল হোক্ আর নাই হোক্, যতদিন দেহ একেবারে অচল না হয় ততদিন অন্যের কাছে হাত বাড়াবো না।

মা বুঝিলেন—একটা উত্তপ্ত অভিমান তাহার অন্তরকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। যাহারা সাহায্য করিতে পারিত, করা উচিত ছিল, তাহারা অসময়ে নিঃসহায় অবস্থায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছে বলিয়াই অমলের এই অভিমান। এ অভিমান মায়েরও ছিল কিন্তু তাহার জন্য অভিমান থাকিলেও উত্তেজনা ছিল না। মা তাই বলিলেন—অত পরিশ্রম করলে শেষে পরীক্ষার ফল হয় ত ভাল হবে না।

অমল ম্লান একটু হাসিয়া কহিল—সে দুর্ভাগ্যকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যখন নেই, তখন আনন্দে গ্রহণ করাই আমাদের উচিত।

মাতা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অমল মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিল, মা ব্যথিত হইয়াছেন কিন্তু অমলের সঙ্কল্পকে হয়ত অযৌক্তিক মনে করিতেছেন না। দ্বিধা ও অপ্রকাশ্য একটা বেদনায় তাহার মুখখানি বাদল দিনের অন্ধকারাচ্ছন্ন।

বাইরে তখনও অঝোরে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। ঘরের মাঝে স্বল্পান্ধকার পুঞ্জীভূত জয়হীন চেষ্টার নৈরাশ্যের মত নিথর নিষ্কম্প হইয়া রহিয়াছে। নিশীথ রাত্রের নীরবতার মত অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি উভয়ের মনকে উৎপীড়িত করিতেছে—

অমল সান্ত্বনার সুরে মাতাকে কহিল—এই ঘরে আজ আমাদেরই পেটের ভাত জুটছে না মা, তার মাঝে আর এক অভাগ্যকে সংগ্রহ ক'রে আমরা আনি কেন? যদি কখনও বাহুবলে বাঁচবার সংস্থান ক'রতে পারি তবে তখনই একথা ভাবা চলে—তুমি এজন্যে ব্যস্ত হ'য়ো না মা—

মাতা একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিলেন—কেউ কি কাউকে ভাত দিতে পারে? ভগবানই দেন।

প্রায় এক বৎসর পরের কথা।

বন্ধে কয়েকবার সে বাড়ী গিয়াছে, কিন্তু মা গৌরীর সহিত তাহার বিবাহের জন্যে আর অনুরোধ করেন নাই, সম্ভবতঃ পরীক্ষা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। গৌরী তেমনিভাবে আসিয়াছে গিয়াছে কিন্তু সেই প্রগল্‌ভতা ও প্রশ্নে অমলকে বিব্রত করে নাই, তবে অন্যত্র হাস্য-পরিহাসে তার সজীবতা প্রকাশ পাইয়াছে। অমল অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে—গৌরী তাহাকে ভালবাসে নাই। হয়ত, তাহার সহিত বিবাহের প্রস্তাব-সংক্রান্ত ব্যাপার সে অবগত আছে, তাই শোভন ব্যবহারে সে নিজেকে গোপন করে। কিন্তু মাতা একথা স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলেন নাই যে অমলকে গৌরীর মত মেয়ের হাতে অর্পণ করিতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্তে মরিতে পারেন। অমল শুনিয়াছে কিন্তু কোন জবাব দেয় নাই। কথা-প্রসঙ্গে মাতা একদিন দুঃখ করিয়াছিলেন—যদি অমল তাহার কথা শুনিত তবে বিদেশে আজ এমনিভাবে পরিশ্রম করিতে হইত না, হয়ত পরীক্ষার ফল আরও ভাল হইতে পারিত।

অপর্ণার সঙ্গে ব্যবহার তেমনিভাবে চলিয়াছে। তাহাদের সমিতির হাস্যকোলাহল কোন স্থানে ব্যাহত হয় নাই। অপর্ণার বাড়ীতে যাইয়া অমল কখনও পড়াশুনায়, কখনও

ন্ত পরিহাসে কাটাইয়া আসিয়াছে। তেমনি করিয়া ভয়েই মাঝে মাঝে আপনার হৃদয়কে ব্যক্ত করিতে যাইয়া, াশাহীন চেষ্টার নৈরাশ্যপূর্ণ অনিবার্য্য ভবিষ্যতের সম্মুখীন ইয়া থামিয়া গিয়াছে। অপর্ণা অত্যন্ত ভাল মেয়ের মত াপন ইচ্ছাকে বাপমার ইচ্ছার সহিত একীভূত করিয়া ায়িত্ব মুক্তির আনন্দ লাভ করিয়াছে কিন্তু অমলকে অত্যন্ত াবধানে নিজের অঞ্চলের নীচে বন্দী রাখিয়া তাহার ারিদ্র্যের কথা প্রকাশ করিতে দেয় নাই এবং মাকে ও াজিতবাবুকেও নিরাশ করে নাই। অপর্ণার কথাবার্ত্তার াঝে আজ আর অভিমান-ব্যঙ্গ তিরস্কার নাই, তাহা কেবল ামবেদনা ও সহানুভূতির করুণায় আর্দ্র! তাহার হৃদয়-্বরিত সুধাধারায় অমলের ক্ষত, অন্তরের জ্বালা মন্দীভূত ইয়া মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত মাথা নত করিয়া থাকে, কখনও উত্তেজিত হইয়া আপনাকে মুক্ত করিতে পারে না। ামলাও ঠিক আগের মত গভীর দীর্ঘশ্বাসে অপর্ণার কুশল প্রশ্ন করে—এই মাত্র।

পরীক্ষা আগতপ্রায়। অমল তেমনভাবে তৈরী হইতে পারে নাই—সে সময়ও ছিল না, পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাইবার অভিপ্রায়ও তেমনভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই। একটা আশাহীন উদাস উদ্যম ও অপ্রিয় কর্ত্তব্য জ্ঞানপ্রসূত বিবেকবুদ্ধির মন্থর শ্লথ উত্তেজনাহীন নিরুৎসাহের মধ্যে তাহার জীর্ণ দিনগুলি একটি একটি করিয়া কাটিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে একটা বেদনা তাহাকে সকল অপাঠ্য পাঠ্য কেতাবের উর্দ্ধে পরিচালিত করে—পরীক্ষার কয়েকটা দিনের পরে অপর্ণার সহিত সামান্য এই পরিচয়ের বাঁধন চিরদিনের মত ছিঁড়িয়া যাইবে, পৃথিবীর এই জনারণ্যে হারানো পথিকের মত তাহারা হয়ত উভয়কে খুঁজিয়া ফিরিবে, কিন্তু সারাজীবনে আর খুঁজিয়া পাইবে না। অন্তরের গভীর তলদেশে রক্তক্ষরণপ্রবণ একখানা ক্ষতের অপ্রকাশ্য গোপন ব্যথায় সমস্ত জীবন রুগ্ন শিশুর মত পঙ্গু হইয়া থাকিবে। গন্তব্য ষ্টেসনের কিছু পূর্ব্বে সামান্য একটা লাল সিগনালের আলোর মত রক্ত চক্ষু বিচ্ছুরিত জ্যোতিতে জীবনের সমস্ত গতি মুহূর্ত্তে থামিয়া যাইবে—গন্তব্য স্থানে পৌছিবে না। মনটা ব্যস্ত যাত্রীর মত সম্বল বাঁধিয়া অধৈর্য্য অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবে।

প্রায় পনর দিন সে অপর্ণাদের ওখানে যায় নাই—আজ অকস্মাৎ একখানা চিঠিতে অপর্ণা তাহাকে আহ্বান করিয়াছে এবং বৈকালে পাঁচটায় তাহাকে উপস্থিত হইতে অনুরোধ জানাইয়াছে। পত্র সংক্ষেপ—অত্যন্ত সংক্ষেপ, তাহাতে কেবলমাত্র অনুরোধই রহিয়াছে কিন্তু কোন কারণ নাই, কোন কুশল প্রশ্ন নাই। এই পত্রটুকু হাতে করিয়া অমল রাজ্যের পুঁথিপত্র সামনে খুলিয়া বসিয়া অনেক ভাবিল, কিন্তু আহ্বানের কারণ কিছু নিরূপণ করিতে পারিল না।

পাঁচটার কিছু পূর্ব্বে অমল অপর্ণাদের বাড়ীতে পৌছাইয়া দেখে, বাহিরে কেহ নাই। চাকর মারফতে সংবাদ দিয়া সে অপর্ণার আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল কিন্তু অপর্ণা আসিল না, অরুণা আসিল না, শুধু অপর্ণার মা একাকী নামিয়া আসিয়া বলিলেন—বসো বাবা অমল। কেমন আছ? পড়াশুনো কেমন হ'ল তোমার?

অপর্ণার মা'য়ের অত্যন্ত প্রশান্ত এবং ভদ্রতা-সুলভ কুশল প্রশ্নে সে চমকিয়া উঠিল। বলিল—ভাল আছি, কিন্তু পড়াশুনো ভাল হয়নি!

—ফার্ষ্ট ক্লাশ হবে ত?

—না।

মাতা বিষয়ান্তরে প্রশ্ন করিলেন—বাড়ীতে তোমার মা ভাল আছেন?

—হ্যাঁ।

—মায়ের অন্তর কি তাই ভাবি। ছেলে মেয়েদের কোন কথাই তার কাছে গোপন থাকে না। তোমরা যাই মনে কর, কিন্তু আমরা তোমাদের অন্তরের গোপন তলদেশ পর্য্যন্ত স্বচ্ছ পদার্থের মত দেখতে পাই। অপর্ণাকে দিয়ে খবর তোমাকে আমিই দিয়েছি—তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

অমল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মাতা কয়েকটি কথা যেন মনে মনে গুছাইতে একটু দেরী করিয়া কহিলেন,—আমার কাছে লজ্জা ক'রো না, আমাকে তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী বলে বিশ্বাস ক'রো। অপর্ণার সঙ্গে অজিতের বিয়ের সম্বন্ধ আজ প্রায় একবছর চ'লেছে কিন্তু অপর্ণা এখনও রাজী হয় নি। তোমাদের মধ্যে যে একটা

ভালবাসা গড়ে উঠেছে তা আর যার কাছেই গোপন ক'রতে পারো, আমার কাছে গোপন ক'রতে পারবে না। পরীক্ষার পরেই যেখানে হোক্ তার বিয়ে দেওয়া আমাদের ইচ্ছা। অপর্ণাকে প্রশ্ন আমি সবই ক'রেছি, তোমাকেও করা দরকার। আমাকে তোমার নিজের মা ব'লে মনে ক'রো, কোনো লজ্জা ক'রো না—

অমল চুপ করিয়া রহিল। কি বলিবে, বুঝিয়া পাইল না। এমনিভাবে অকস্মাৎ সে যে জীবনের বৃহত্তম পরীক্ষার সমীপবর্ত্তী হইবে তাহা ভাবে নাই। অমল জানালার ফাঁকে দূরের শীর্ণ নারিকেল গাছটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়াই ছিল—একটা দুর্জ্জয় অস্বস্তি ও অস্থিরতা সমস্ত অন্তর ও বাক্‌শক্তিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিয়াছে।

মাতা বলিলেন—লজ্জা ক'রো না অমল। অপর্ণার বিয়ে যদি গৌরীদান অনুসারে ক'রতাম তবে এসব কথার কোন প্রয়োজন ছিল না। তোমরা বড় হ'য়েছ, এখন তোমাদের ভালমন্দ বিচারশক্তি হ'য়েছে—তাই জিজ্ঞাসা করা দরকার এবং তোমাদেরও সমস্ত জানানো দরকার, বৃথা লজ্জায় জীবনে ভুল করা ঠিক হবে না—

অমল ব্যর্থতার অস্বস্তিকর বিড়ম্বনাকে আর যেন বহন করিতে পারিতেছিল না। আজ মরিয়া হইয়া সে সমস্তই বলিবে স্থির করিয়া ফেলিল। তাই কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া কহিল—আপনার অনুমান সত্য, অন্ততঃ আংশিক-রূপে—আমার দিক থেকে। অপর্ণার মনের কথা সম্পূর্ণ জানি না তবে সেও সম্ভবতঃ আমাকে একটু ভালবাসে। তবে বিবাহের দিক থেকে আমার মতামত সম্পূর্ণ অবান্তর—কারণ, আপনারা কি জানেন জানি না—তবে আমি গরীব। বাড়ীতে সামান্য জমিজমা পৈতৃক সম্পত্তি আছে তাতে মায়ের একবেলার হবিষ্যান্ন চলে, আমি ছেলে পড়িয়ে এখানে পড়াশুনো করি। অপর্ণা এ কথা বহুদিনই জানে, কিন্তু আপনাকে জানাতে বারণ ক'রেছিল। এর পরে, সম্ভবতঃ আমার আর কিছু ব'লতে হবে না। এখন অপর্ণা তার নিজের বিচারবুদ্ধিতে যা বোঝে তাই সে ক'রতে পারে এবং আপনাদের পক্ষেও—

অত্যন্ত উত্তেজনায় অমলের কণ্ঠ কাঁপিতেছিল—সে কথা কয়টিকে যেমন সুষ্ঠুভাবে বলিতে চাহিয়াছিল, তেমনি-ভাবে পারিল না বলিয়া, অকস্মাৎ থামিয়া গেল। অপর্ণার মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনের অবস্থা দেখিবার সাহস তাহার হইল না, তাই চেষ্টা করিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। নারিকেল গাছের ডালে একটা ভিজা কাক ক্লান্তভাবে বসিয়া আছে ঘন মেঘাবলুপ্ত আকাশের সাম্‌নে—মূর্ত্তিমান ক্লান্তির ছবির মত।

মাতা কহিলেন—এ সব কথা আমি শুনেছি—কাল—অপর্ণারই মুখে, তাই তোমাকে ডেকেছি। অবশ্য অপর্ণা, এখন বড় হ'য়েছে সে যদি সমস্ত জেনে-শুনেও তোমাকেই বিয়ে ক'রতে চায় তবে আমরা বাধা দেব না। যে ধরণের প্রাচীন লোকেরা এগুলোকে অত্যন্ত মূল্যহীন মনে করে আমরা ঠিক সে শ্রেণীর নয়। তবে তোমার দিক দিয়েও ভাববার আছে। তোমাদের মন আজ যা—পরে তা থাকবে না, তা তোমরা এখন না বুঝ্‌লেও পরে বুঝ্‌বে। তখন মনের সঙ্গে সঙ্গে জগতের আরও অনেক কিছু দরকার হয়। অপর্ণা যে ভাবে, যে সংসারে গড়ে উঠেছে সে ঠিক তেমনটি না হ'লে তৃপ্তি পাবে না, তুমিও হয়ত দেখ্‌বে সংসারের দৈন্যই সবচেয়ে বড় হ'য়ে উঠেছে, জীবনে তার সঙ্গে সঙ্গে আসবে অশান্তি-অতৃপ্তি। গৃহকে তারা ছিন্নভিন্ন ক'রে দেবে। এ সবকথা ভেবে দেখেছ—

অমল শঙ্কাহীন কণ্ঠে জবাব দিল—প্রয়োজন হয়নি এবং আমার দিক থেকে প্রয়োজন নেইও। একথা বরং অপর্ণারই ভেবে দেখবার কথা। দারিদ্র্যকে আমি জন্মাবধি চিনি, কিন্তু যে চেনে না তারই ভেবে দেখা দরকার।

কিন্তু সে যদি ভুল করে—যদি—

অমল একটু হাসিয়া কহিল—মানুষ জীবনে ভুল করেই। কারণ কোন্‌টা ভুল, কোন্‌টা ঠিক, তা আগেই বোঝা যায় না। যা ঠিক হবে ভাবি—তাই ত আমরা করি, তবুও ভবিষ্যতে পৌঁছে দেখি সেইটেই হাস্যকর একটা ভুলে পরিণত হ'য়েছে—

অমল চুপ করিয়া গেল। মাতা ক্ষণিক কি চিন্তা করিয়া কহিলেন—তুমি ভেবে দেখো, সেই জন্যেই তোমাকে ডেকেছি। পরীক্ষার পরে ত আবার দেখা হবে!

মাতা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কি যেন একটা বলিতে যাইয়া ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে কহিলেন—ব'সো, যেও না—চা না খেয়ে যেও না কিন্তু—

মাতা চলিয়া গেলেন। এতদিনকার অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের অস্বস্তিকর বোঝা নামাইয়া দিয়া অমল একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিল। এখন যাহা কিছু করিবার, যাহা কিছু বলিবার সমস্তই অপর্ণার—সে আজ মুক্ত, মুক্তির আনন্দে তাহার মন খুশীতে ভরিয়া গেল, কিন্তু তবুও যেন অস্বস্তিকর এই বিড়ম্বনার অন্ত নাই।

চা লইয়া আসিল অপর্ণা। চা ও সামান্য কিছু খাবার নামাইয়া রাখিয়া সে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। অমল চাহিয়া দেখিল—রুক্ষ এক বোঝা চুলের মাঝে দীপ্তিহীন পাংশু মুখে অপর্ণা বসিয়া আছে। ম্লান দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে, তাহার মুখের পানে চাহিবারও সাহস যেন আজ তাহার নাই। আজ অপর্ণাকে দেখিলে করুণা হয়। তাহাকে পীড়া দেওয়া আজ সম্ভব নয়।

অমল খাবার ও চা দ্রুত গলাধঃকরণ করিয়া যাইতেছিল। রুদ্ধ কণ্ঠ দিয়া তাহা যেন নামিতে চাহে না, অপর্ণা তেমনিভাবে স্তূপাকার জড়পদার্থের মতই বসিয়া আছে। রুমালে হাতটা মুছিয়া ফেলিয়া অমল অত্যন্ত অবান্তর প্রশ্ন করিল—পড়াশুনো কেমন হ'ল ?

অপর্ণাও বিমনাভাবে প্রশ্ন করিল—তোমার কেমন হ'ল ?

—আমার ত কিছুই হয়নি তা জানো।

অপর্ণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অমলের মুখের পানে গভীর সংযত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল—তুমি কি এই জিজ্ঞাসা ক'রবার জন্যই এতদূর এসেছ ?

অমল হাসিয়া উঠিল—এই অপ্রাকৃত মুমূর্ষুর হাসি দেখিয়া অপর্ণা বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিল। স্বপ্নাবিষ্টের মত বসিয়া শুনিল—অমল বলিতেছে—আমি কিছু জিজ্ঞাসা করতে আসিনি, তুমি চিঠি লিখেছিলে তাই এসেছিলাম। তোমার মা যা ব'লেছেন তা বোধ হয় তুমি জানো—কাজেই অকারণ—

—কি ব'ললে ?

—আমি কিছুই গোপন করিনি। এই অস্বস্তি ও নৈরাশ্যময় বৃথা চেষ্টার বোঝা নামিয়ে রেখে গেলাম। তোমাকে আমি এখনও বুঝিনি, আর বোঝবার চেষ্টা ক'রবো না। তোমার জীবনের ছায়াতলে বসে শ্রান্ত পথিকের মত ক্ষণকাল যে স্নিগ্ধতার স্বাদ গ্রহণ ক'রে গেলাম তা মনে থাকবে—উত্তপ্ত খর রৌদ্রতপ্ত দারিদ্র্যনিপীড়িত ধূসর মাঠ দিয়ে আবার চলবো—আশ্রয় হীন—

অমল উত্তেজনায়, কম্পিত কণ্ঠে কথাটা শেষ করিতে না পারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু চোখ দুইটি তার ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে, কথা বলিবার, চলিবার কোন শক্তি নাই, তাই সে কেবল দাঁড়াইয়াই রহিল—নিরুদ্ধ একটা যাতনা, একটা করুণ আর্ত্তনাদ, একটা তীব্র অভিমানকে দাঁতের মাঝে চাপিয়া রাখিয়া।

অপর্ণা তাহার মুখের পানে প্রশান্ত দৃষ্টি হানিয়া কি যেন বলিতে চাহিল কিন্তু অমলের কঠোর পাংশু বেদনার্ত্ত নিষ্প্রভ মুখের পানে চাহিয়া কিছুই বলিতে পারিল না। একটা শঙ্কা ও দ্বিধায় সান্ত্বনার কথাটা বা কোনও অনুরোধ হয়ত, কণ্ঠের নীচে বুকের তলায় মিলাইয়া গেল।

অমল একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া, অসংযত পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসিল। একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখে, অপর্ণা ঠিক তেমনি ভাবে চাহিয়া আছে। এক বোঝা রুক্ষচুল বাতাসে উড়িয়া তাহার ম্লানমুখের উপর আসিয়া পড়িতেছে। জড়ের মত সে বসিয়াই রহিল কোন কথা বলিল না—কোন বিদায় সম্ভাষণ জানাইল না।

ক্রমশঃ

সপ্ত নদীর বাঁকে

শ্রীকৃষ্ণনাথ মল্লিক

দিনান্তে ঐ সপ্ত-নদীর পারে,
কি সুর ওঠে বেজে বারে বারে—
চলার পথে পথে কেবল শুনি ডাকে
কে যেন ঐ সপ্ত নদীর বাঁকে।
কেই বা কেন ডাকে অমন দূরে
ব্যথা-ভরা করুণ সুরে সুরে !
বিয়োগ ব্যথায় কে সে এত দুঃখী

সব অজানা তবু চেয়ে দেখি—
হৃদয় আমার তাহার ডাকে ডাকে
কেঁদে ওঠে সকল কাজের ফাঁকে।
দিনের শেষে ছোটে তাহার পানে
কত কথা বলবে তাহার কানে !
সেথায় গিয়ে বিস্ময়েতে দেখি,
সপ্ত নদীর বাঁকে আমিই—একি !

কামালুদ্দিন বিহ্জাদ

শ্রীগুরুদাস সরকার

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

বায়জাদের যুগের দ্বিতীয় পর্ব্ব পারসীক শিল্পে দ্বিতীয় গৌরবের যুগ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। অদ্যাপি বিদ্যমান একখানি রাজকীয় আদেশপত্র হইতে জানা যায় যে সাহ ইস্‌মাইল ১৫২২ খৃঃ অব্দে বায়জাদকে তাঁহার কুতুবখানার (গ্রন্থশালার) কর্ম্মচারীদিগের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক রূপে নিযুক্ত করেন। সাহ ইসমাইল ছিলেন সাফাবী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার রাজত্বকাল ১৪৯৯ হইতে ১৫২৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত। পয়গম্বর মহম্মদের জামাতা ইমাম আলির বংশধরগণের প্রতি শিয়া-সম্প্রদায়ের ভক্তি চিরাগত, তাই ইমামবংশীয় এই নরপতি পারস্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শুধু শিয়া সম্প্রদায় বলিয়া নহে, সমগ্র পারস্যেরই লুপ্ত গৌরব যেন ফিরিয়া আসিয়াছিল। সফিদুদ্দিন নামক ইস্‌মাইলের জনৈক প্রসিদ্ধ পূর্ব্বপুরুষের নামানুসারেই এ বংশের সাফাবি নামকরণ হয়। ১৫১০ খৃঃ অব্দে সাহ ইসমাইল উজবেক্ তাতারদিগকে পরাজিত করিয়া খোরাসান অধিকার করেন এবং মহম্মদ খাঁ সৈবানী পরাভূত ও নিহত হন। ইহার পরেই হিরাট অধিকৃত হয়। বায়জাদ এই সময়েই বিজেতা ইস্‌মাইলের সহিত তাব্রিজে চলিয়া আসেন এবং ১৫২২ খৃঃ অব্দে রাজকীয় চিত্রশালার অধিনায়ক (Director of the Royal Academy of Painting) পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

প্রাচ্যদেশে শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও চিত্রকরেরা, শ্রেষ্ঠ বিদ্বজ্জনের ন্যায় যুদ্ধ বা বিপ্লবজনিত অশান্তি উপস্থিত হইলেও বিপন্মুক্ত হইবার অধিকার ভোগ করিতেন। বায়জাদকে সাহ ইস্‌মাইল যে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন তাহা "মেনাকিব-ই-হুনের ভেরাণ" (চিত্রকরদিগের প্রশংসাবাদ) গ্রন্থে বর্ণিত একটি ঘটনা হইতে অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থকার আলি এফেন্দি লিখিয়াছেন যে খৃঃ ১৫১৪ অব্দে সাহ ইসমাইলের সহিত তুর্কির সুলতান প্রথম সেলিমের চাল্ দেরাণে (Tohalderanএ) যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় তাহার পূর্ব্বাহ্নেই তাঁহার প্রিয় চিত্রকর বায়জাদ ও তাঁহার সুদক্ষ লিপিকার সা মহম্মদকে তিনি একটি গুহামধ্যে লুকাইত করিয়া রাখেন। যুদ্ধে পারস্যাধিপের পরাজয় ঘটে এবং তাব্রিজ শত্রু হস্তগত হয়। যুদ্ধান্তে, সাহ ইস্‌মাইল বায়জাদ ও সা মহম্মদের যে জীবনরক্ষা হইয়াছে এইজন্যই ভগবানকে বিশেষ করিয়া ধন্যবাদ দেন (১)।

সাহ ইস্‌মাইলের গ্রন্থশালায় লিপিকার (কাতিব), চিত্রকর (মুসব্বির), সোনালী হলকর (মুজেহিব্) প্রভৃতি অনেকগুলি অধস্তন কর্ম্মচারী বায়জাদের আদেশে পরিচালিত হইত। মনে হয় রাজকীয় গ্রন্থালয়ের ও চিত্রশালার ভার পাইয়া বায়জাদকে পরিদর্শন কার্য্যে এরূপ ব্যস্ত থাকিতে হইত যে স্বহস্তে পুঁথি চিত্রণের অবকাশ তাঁহার অধিক ঘটিত না। এই সময়কার কতকগুলি অসম্বদ্ধ ও পরস্পর সম্পর্কশূন্য চিত্রে বায়জাদের দস্তখত পাওয়া গিয়াছে। এ চিত্রগুলির অঙ্কনের বিশিষ্টতা ও বর্ণিকা-ভঙ্গের পদ্ধতি বায়জাদেরই অনুরূপ।

তাব্রিজে বাসকালে বায়জাদের চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতিতে যে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ কেন্দ্রের প্রথম অবস্থার শ্রেষ্ঠ উদাহরণগুলিতে দেখিতে পাই পুরাদস্তুর ত্রিমাত্রিক (Three Dimensional) প্রতিকৃতি ; মস্তক ও মুখাবয়ব সযত্নে অঙ্কিত—অঙ্গে উজ্জ্বল বর্ণের পরিচ্ছদ। ইহার মধ্যে একখানি উল্লেখযোগ্য চিত্র একজন উচ্চবংশীয় রাজবন্দীর। ইঁহার বাহু ও মস্তক পাহলং নামক যোয়ালের ন্যায় একপ্রকার কাষ্ঠখণ্ডে আবদ্ধ। সম্ভবতঃ এ ব্যক্তি কোনও তুর্কমান-উপজাতির সর্দ্দার হইবেন। অঙ্কন পরিপাট্য ও লাবণ্যযোজনার দিক দিয়া এ চিত্রটি বোধহয় আদর্শস্থানীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে এ চিত্রখানি বায়জাদ কর্ত্তৃক অঙ্কিত হইয়াছিল। পারসীক চিত্রকরেরা তাঁহাদের স্বভাবসুলভ রক্ষণশীলতাগুণে অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর ধরিয়া এ চিত্রের নকলের নকল আঁকিয়াছেন।

বায়জাদ যে প্রতিকৃতি অঙ্কনে পরাঙ্মুখ ছিলেন না তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তিনি মহম্মদ খাঁ সৈবানীর মূর্ত্তিতো অঙ্কন করিয়া-ছিলেনই, এ ছাড়া সুলতান হোসেন বাইকারার একখানি অশ্বারূঢ় প্রতিকৃতিও যে তাঁহারই অঙ্কিত ইহাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই। বিশেষ করিয়া এই শেষোক্ত তস্‌বিরখানিতে বায়জাদের দস্তখতও পাওয়া গিয়াছে। বায়জাদের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার কথা বিবেচনা করিলে পূর্ব্বোক্ত বহুবিশ্রুত দরবেশের মূর্ত্তিখানিও যে তাঁহারই তুলিকাপ্রসূত এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। তরুণ সাহ তামাস্পের যে ছবিখানি সে যুগের প্রতিকৃতিসমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহা বায়জাদের অঙ্কিত কি না তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। বায়জাদের দস্তখতযুক্ত একখানি নিসর্গচিত্রে (landscapeএ) একটি চেনার বৃক্ষের সম্মুখে পরিক্রমণরত যে অভিজাত চিহ্নসম্পন্ন মূর্ত্তিটি দৃষ্ট হয় তাহা সাহ তামাস্পের প্রকৃত মূর্ত্তি বলিয়াই ধারণা জন্মে। ইহার ঠিক নিম্নভাগেই একটি পরিচয়জ্ঞাপক লিপিতে সাহ তামাস্পের নাম লিখিত আছে। এ চিত্রের কথা পরে বলিতেছি।

একজন পাশ্চাত্য (১) লেখক বলিয়াছেন যে সাহ তামাস্পের যুগের বর্ণাঢ্য চিত্রগুলির ইতালীয় চিত্রকর টিন্‌টোরেটোর (২) বর্ণসমুজ্জ্বল পটের

(১) Sakisian, of cit, p-68.

(১) E. Blochet, Mussulman Painting 12th to 17th Century (translated by Cicely Binyon). p. 99,

(২) টিন্‌টোরেটোর (Tintoretto'র) প্রকৃত নাম ইয়াকোপো

কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বায়জাদের স্থায় টিন্‌টোরেটোও খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন তবে তাঁহার মৃত্যু হয় এ শতাব্দীর চতুর্থপাদে, আর বায়জাদের দেহান্ত ঘটে দ্বিতীয় পাদে, ৯৪২ হিজিরাব্দে (৩)। দুই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতিমূলক শিল্পের এরূপ তুলনায় সমালোচনা রসোপলব্ধির দিক দিয়া বিশেষ কার্য্যকরী হয় বলিয়া মনে হয় না। আমরা শুধু বলিব বর্ণবৈভবের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও বায়জাদের এ চিত্রগুলি শুধু ইতরজন মনোলোভা নয়।

বায়জাদের চিত্রে পাত্রপাত্রী হাস্তকৌতুকে মগ্ন থাকিলেও তাঁহাদের সম্ভ্রম কোথাও ক্ষুণ্ণ হইতে দেখা যায় না। বস্তুতঃ তাঁহার শিল্পে ইতরতার লেশমাত্র নাই। এই সম্পর্কে একখানি চিত্রের কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে। ইহা খাজু কিরমানি রচিত হুমাই-ই-হুমায়ুন নামক কাব্য-গ্রন্থের অন্তর্গত অন্যতম ক্ষুদ্রক চিত্র। এই প্রণয়মূলক কাব্যের নায়ক পারস্যের জামিন খাবর নামক প্রদেশের রাজকুমার হুমাই এবং নায়িকা ফাগফুরের অর্থাৎ চীনসম্রাটের দুহিতা হুমায়ুন। হুমাই চীনদেশে গমন করিলে পর রাজসকাশে নীত ও রাজসভায় সম্বর্দ্ধিত হন। দৈবযোগে কুমার হুমাই বাতায়ন পথে দণ্ডায়মানা সম্রাট-দুহিতাকে সন্দর্শন করেন। চারিচক্ষুর মিলন হইতেই প্রণয়ের উদ্ভব হয়। এ কাব্যখানি রচিত হয় ১৩৩১-১৩৩২ খৃঃ অব্দে। ইহার যে পুঁথিটি ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে তাহা লিখিত হইয়াছিল বোগদাদ নগরে, ১৩৯৫ খৃঃ অব্দে, তৈমুর-লঙ্গের জীবদ্দশায়। আর পারী নগরীর মুজে দেজ্ আর্টস্ ডেকোরেটিফস্ (Musee des Arts Decoratifs)চিত্রশালার অপর একখানি পুঁথি খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দির বলিয়া অনুমিত। বায়জাদের দস্তখতযুক্ত যে একখানি চিত্র পাওয়া গিয়াছে মনে হয় তাহা এই পুঁথিরই অন্তর্গত। চিত্রে হুমাই ও হুমায়ুন রাজসভার দুইজন কর্ম্মচারীসহ উদ্যান মধ্যে সমাগত উভয়ের চারিদিকে বৃক্ষগুল্মাদি নানা বর্ণের প্রসূনরাশিতে সমাচ্ছন্ন। এ দৃশ্যটি দেখিলে মনে হয় প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর যেন আর পৃথগস্তিত্ব নাই, তাঁহাদের পৃথগাত্মতা এই পরিদৃশ্যমান সুরভিত উদ্ভিদ রাজ্যেই নিমগ্ন। ইংরাজ কবির কথায় বলিতে গেলে তাঁহাদের সমক্ষে সমগ্র সৃষ্টি যেন হরিতের চিন্তায় হরিতের ছায়াতলেই লীন হইয়াছে (Annihilating all that is made in a green thought in a green shade.")। ম'সিয়ে মিজিয়' এ চিত্রে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই মতবাদের ছায়া দেখিয়াছেন। বায়জাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও কর্ম্মজীবন এরূপ ধারণার পরিপন্থী ছিল শুধু এই হেতুবাদেই তিনি ইহা গায়সুদ্দীন খলিল নামক চীনদেশ প্রত্যাগত জনৈক চিত্রীর চিত্র বলিয়াই অনুমান করিয়াছেন। বলাবাহুল্য এরূপ অনুমান সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য নয়। চিত্রখানি যে কোনও অদ্ভুত ক্ষমতাবিশিষ্ট শিল্পী কর্ত্তৃক অঙ্কিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা যে বায়জাদ-রচিত চিত্র নহে এরূপ সন্দেহ করিবার দুইটি মাত্র কারণ দৃষ্ট হয়—(১) ইহার অঙ্কনপদ্ধতি বায়জাদীয় পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, আর (২) ইহাতে যে স্বাক্ষর রহিয়াছে তাহা দেখিলে পরবর্ত্তীকালে বসাইয়া দেওয়া বলিয়াই মনে হয়। এ চিত্র যদি বায়জাদের তুলিকায় সমুদ্ভূত হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা তাঁহার প্রাথমিক যুগের রচনা—চীনা প্রভাবমুক্তি সাধিত হইয়াছিল উত্তর কালে। এ আলেখ্যের পরিপ্রেক্ষণা এসিয়া মহাদেশের চিরপ্রচলিত পদ্ধতিরই অনুগামী। বায়জাদের সুপটু তুলিকায় যে সুদৃশ্য উদ্যানাদিও অঙ্কিত হইয়াছে সে পরিচয় দিয়াছেন একজন বিশিষ্ট ফরাসী সমালোচক (১)। মনে হয় এরূপ দৃশ্যচিত্র রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত উদ্যানে দেখা যায় ফোয়ারা ছুটিতেছে, নহর বহিয়া জল চলিয়াছে, নহরের দুইধারে ফুটিয়া রহিয়াছে শ্রেণীবদ্ধ টিউলিপ (tulip) ও আইরিস্ (Iris) পুষ্প। উদ্যানের শষ্প সমাচ্ছন্ন অংশগুলিও পুষ্পসমাকীর্ণ, তাই চীনাসম্রাটের উপবনের এই চিত্রখানি যে বায়জাদের শিল্পনিদর্শন নয় এ কথা জোর করিয়া বলিতে ভরসা হয় না।

রায়জাদের পরিকল্পনার মৌলিকতা যে কতদূর ছিল তাঁহার চিত্রগুলিই তাহার প্রকৃষ্টতম প্রমাণ। খৃষ্টীয় ১৯৩১ অব্দের বার্লিংটন হাউস প্রদর্শনীতে বায়জাদের নামের পরিচয় দিয়া যে কয়খানি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল এ সম্পর্কে তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অবান্তর বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এগুলির মধ্যে দুইখণ্ডে সমাপ্ত চীনসম্রাটের বাগিচার চিত্রখানি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন। বাগিচার বাহিরে রাজদরবারে বাদকদল গীতবাদ্য লইয়া ব্যাপৃত, দূরে কে যেন একজন দাঁড়াইয়া আছে। চিত্রের ডাহিনদিকে বাগানের প্রাচীর, প্রবেশ পরদা টাঙ্গান। দৌবারিক দ্বার রক্ষা করিতেছে। চিত্রের মধ্যভাগে তিনটি মূর্ত্তি—দুই পার্শ্বে দুইজন পরিচারক, তাহাদের মধ্যে একজন কৃষ্ণাঙ্গ, হয়তো বা সে শুদ্ধান্তের কৃষ্ণকায় প্রহরীদিগেরই অন্যতম। সে একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীতে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, যেন নিজের দায়িত্ববোধ ও পদগৌরবে নিতান্তই স্পর্দ্ধিত। এই দুইয়ের মাঝখানে একটি সম্ভ্রান্তবংশীয় তরুণের মূর্ত্তি—মাথায় চীনা টুপি। তিনি দুই হাতে বস্ত্রখণ্ডের মত কি একটা যেন টানিয়া ধরিয়া আছেন। চিত্রের নিম্নভাগে শিল্পী দেখাইয়াছেন যে চড়িভাতির রন্ধনাদি পুরামাত্রায় চলিতেছে, বাগান-ভোজের আয়োজনের কোন ত্রুটীই হয় নাই। একজন

রোবুস্তি (Iacops Robusty)। তাঁহার পিতা ইংরেজের কাজ করিতেন বলিয়া তিনি টিন্‌টোরেটো নামে পরিচিত ছিলেন। এই বিখ্যাত ভিনিসিয় চিত্রকর যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার অনেকগুলিই বাইবেলোক্ত ঘটনা সম্পর্কিত। যীশুখৃষ্টের ক্রশারোহণ, বেলশাজারের ভোজোৎসব, স্বর্ণগোবৎসের আরাধনা, হেরোদ কর্ত্তৃক শিশু হত্যা (Slaughter of the Innocents), তাঁহার চিত্রের মধ্যে এই কয়খানি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। টিনটোরেটো (১৫১৮-১৫৯৪ খৃঃ অঃ) ৭৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দেহরক্ষা করেন।

(৩) Indian Art and letters, vol xvi (N. S.) No. 1. p. 6 ৯৪২ হিজিরাব্দ ১৫৩৫ খৃঃ অব্দের সমতুল্য। ব্রশে কথিত মৃত্যু-বৎসরের (১৫৩৩-৩৪ খৃঃ অব্দের) সহিত ইহার কিঞ্চিদধিক একবৎসর মাত্র তফাৎ দেখা যায়।

(১) Col. V. Goloubew in Ars Asiatica, Vol XIII, Avants propos.

পানপাত্র হাতে লইয়া, সুরা হউক, সরবৎ হউক, কোনও প্রকার বাদ্য পানীয় পানে নিরত রহিয়াছেন। আর একটু ভিতর দিকে, প্রাচীরের নিকটেই দাঁড়াইয়া আর একজন হাব্‌সী বেত্রধর। একজন পাশ্চাত্য সমালোচক বলিয়াছেন যে বায়জাদ তাঁহার প্রত্যেক চিত্রেই চিত্রার্পিত নরনারীর সুগৌর দেহবর্ণের জৌলুস ফুটাইবার জন্য প্রায় একজন করিয়া মিশ্‌কালো হাব্‌সী না আঁকিয়া ছাড়িতেন না। এ উক্তি সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও তাঁহার চিত্রে ও পরবর্তী চিত্রকরদিগের চিত্রমধ্যে দুই একজন হাব্‌সী দাসদাসী মাঝে মাঝে স্থান পাইয়াছে দেখা যায়। ইহাতে বর্ণ-বৈসাদৃশ্যহেতু প্রধান পাত্রপাত্রীগণের রূপসম্ভার বাড়াইয়া তুলিবার উদ্দেশ্য থাকুক বা না থাকুক, তখনকার অর্থশালী ও অভিজাতশ্রেণীর ব্যক্তিগণের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ কৃতদাস-রাখার প্রথা যে বিস্তৃতভাবে প্রচলিত ছিল তাহা স্পষ্টই সূচিত হইতেছে। এই উদ্যান চিত্রে দেখিতে পাই প্রাচীরের অগ্রভাগে উৎকীর্ণ এক সুবিস্তীর্ণ সুদৃশ্য লিপি। আরবীয় বর্ণমালার সমাবেশ কৌশলে উহা যেন একপ্রকার বিচিত্র প্রসাধক অলঙ্কার বলিয়াই মনে হয়। প্রাচীর বেষ্টনের অভ্যন্তরে পুষ্পবৃক্ষতলে উপবিষ্ট একটিমাত্র পুরুষ—ইনিই বোধ হয় সম্রাট হইবেন—আর সকলেই শুদ্ধান্তবাসিনী রমণী। সম্রাট হস্তে একটি পুষ্প ধারণ করিয়া আছেন। চিত্রটির উপরাংশে দুইজন নারী কার্পেটের উপর উপবিষ্টা, অপর একজন পুষ্পচয়ন করিতেছেন। উপবিষ্টা মহিলাদ্বয় ঝালর-দেওয়া বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় কি যেন একটা বিছাইতেছেন—বুঝিবা ইহা সতরঞ্চের ন্যায় কোনপ্রকার খেলার ছক্‌ই হইবে। আর তিনজন রমণী রহিয়াছেন চিত্রের মধ্যভাগটিতে—একজনকে তাঁহার সখী কিম্বা পরিচারিকা পিছনদিক হইতে ধরিয়া আছেন, অপর একজন তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া অভ্যর্থনা করিতেছেন—যেন কোনও নিমন্ত্রিতাকে আগু বাড়াইয়া লওয়া হইতেছে। সম্রাটের সম্মুখে পরিচারিকা শ্রেণীর তিনজন স্ত্রীলোক; একজনের হাতে পানপাত্র ও ডিকাণ্টারের ন্যায় একটি সুরাধার, অপরের হাতে কালক্রেমের মত কি একটা যন্ত্র—মনে হয় কোন প্রকার বাদ্য যন্ত্রই হইবে। হার্পের (harpএর) ন্যায় এক প্রকার তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার যে প্রচলিত ছিল তাহা পারসীক চিত্র হইতেই জানা যায়। তৃতীয়া পরিচারিকা কোনও আহার্য্য দ্রব্য যেন উপায়নস্বরূপ সম্রাটের দিকে আগাইয়া দিতেছে।

এ চিত্রে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় সামঞ্জস্যমূলক তিন তিনটি করিয়া মূর্ত্তিবিন্যাস। চিত্রখানির নিম্নাংশে, এক রমণীর মণিবন্ধে একটি পোষা বাজপাখী বসিয়া, দেখিয়া মনে হয় অন্তঃপুরিকাদের মধ্যেও তখন শিকারের সখ প্রবল ছিল। ইহারই সম্মুখভাগে দুইজন মাথা হেলাইয়া কি যেন দেখিতেছে, মূর্ত্তিগুলির সর্ব্বত্রই বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গী। ডাহিনে, বাগিচার একটি ক্রমনিম্নভূম্যংশে, দুইজন সুখে বিশ্রম্ভালাপে নিমগ্ন, তাহারা যেন আপনাদিগকে অপর ব্যক্তিগণের চক্ষু হইতে একটু আড়াল করিয়া রাখিতে চায়।

জয়তু সুভাষ

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, কাব্যভারতী

বঙ্কিম যার স্বপ্ন দেখিল মৃত বাংলার শীর্ণ বুকে
তুমি দিলে তার বাস্তবরূপ নির্য্যাতনের অশেষ দুখে।
বাংলার মাটী পেলব কোমল স্বপনবিলাসী কবির দেশ—
সন্ন্যাসী এই ভারতবর্ষ—বিদেশীর মুখে যেখানে শ্লেষ।
ভেঙে দিয়ে সেই বিদ্রূপ আজ তুমিই দেখালে কাজল মেঘে
বাজিছে অশনি, খেলিছে তড়িৎ দিগ্বিজয়ের বিপুল বেগে।
গড়িলে সেনানী অতি অদ্ভুত জগৎ কখনো শোনেনি যাহা
কালের বুকেতে অজর অমর জেনেছে জগৎ জানিবে তাহা।
থার্ম্মাপলির হলদীঘাটের জীবন-মরণ বিজয় গাথা
তাদের সাথেতে এক হ'য়ে রবে ইম্ফল মণিপুরের কথা।
মহাভারতের প্রতি ধূলিকণা প্রাণময়তায় ভরেছে আজ
শিবাজী, প্রতাপ, প্রতাপাদিত্য জেগেছে ভারত শোণিত মাঝ।
মহাভারতের মুক্তি সাধক, সংগ্রামী তুমি, বিজয়ী বীর
স্বাধীন-ভারত-হে-অধিনায়ক অটলোন্নত তোমার শির।
নির্ব্বাক আজি হেরিল জগৎ এ মহাভারত বীরের জাত
পরাধীনতার বন্ধনদশা সহিব না আর, কেটেছে রাত।
চল্লিশ কোটী কণ্ঠেতে তাই ধ্বনিছে সুভাষ নেতাজী জয়
জয়তু আজাদ-হিন্দের ফৌজ, জয়তু নেতাজী সুভাষ জয়!
তুমিই দেখালে নারী নয় শুধু পুরুষের হাতে খেলার সাথী
তারাও প্রমীলা চাঁদ-সুলতানা দুর্গাবতীর নিকট জ্ঞাতি।
তুমিই দেখালে নারী নয় আজ সংসারে তার একাকী রাণী
মহাশক্তির অংশ তাহারা বরাভয় সাথে খড়্গপাণি।
মহাভারতের মুক্তি সাধনে তারাও সাধিকা লভিবে আজ
পুরুষের পাশে তারাও চলিবে বীরাঙ্গনার পরিয়া সাজ।
তুমিই দেখালে মহাভারতের হিঁদু-মোসলেম একটা জাত
মহাভারতের সব জাতি আজ তব আহ্বানে মিলালো হাত।
স্বাধীন ভারত নিশান উড়ুক দূর হিমালয় শিখরদেশে,
ত্রস্ত জগৎ মহাভারতের দেখুক গরিমা আকাশে মেশে।
চল্লিশ কোটী জড়ের শিরায় বহালে শোণিত বহালে আজ
নিখিল মনের হে অধিনায়ক জয়তু সুভাষ রাজাধিরাজ।

ম্যাজিকের খেলা

পি. সি. সরকার

কয়েকমাস পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কতকগুলি ম্যাজিকের খেলা প্র[illegible] হইয়াছে। ইহার পর হইতে পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট হইতে প্রা[illegible] অনুরোধ আসিতেছে যাহাতে আরও কতকগুলি খেলা ভারতবর্ষে লিখি। পাঠকবর্গের আগ্রহাতিশয্যের জন্ত এবারেও কয়েকটি কৌশল প্রকাশ করিতেছি।

ম্যাজিক করা মোটেই কঠিন নহে। প্রথম প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস এবং সাহস। ইংরাজীতে যাহাকে 'ষ্টেজ ফ্রাইট' বলে অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইতেই পা কাঁপিয়া উঠে—ঐরূপ হইলে ম্যাজিক করা কখনও সম্ভব হয় না। চাই বুদ্ধি, সাহস, পরিচ্ছন্নতা এবং উপযুক্ত প্রদর্শনভঙ্গী। অবশ্য অভ্যাসের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বাড়ীতে বড় একটি আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অভ্যাস করিতে হয়। আয়নায় নিজের সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি দেখা গেলে সুবিধা এই যে নিজের হাবভাব এবং প্রদর্শনভঙ্গীর ভুল ত্রুটি সহজেই চক্ষুতে পড়ে। নিয়মিত অভ্যাস করিবার পর প্রদর্শন। কথাবার্ত্তায় পটু হওয়া চাই, উপস্থিত-বুদ্ধি যথেষ্ট থাকা প্রয়োজন, নতুবা হঠাৎ অপ্রস্তুত হইতে হইবে। যাঁহার উপস্থিতবুদ্ধি যত বেশী হইবে তিনি তত বড় যাদুকর হইতে পারিবেন, সঙ্গে কিছু বিভারও অবশ্য প্রয়োজন আছে।

আজকাল পৃথিবীতে যত বড় বড় যাদুকর আছেন প্রত্যেকেই পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গুণের অধিকারী। মার্কিন যাদুকর জন মূল-হল্যাণ্ড (John Mulholland) সাহেবের কথা সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। তিনি প্রথম জীবনে হোরেস ম্যান স্কুল (Horace Man School)এর শিক্ষক [illegible], কিন্তু পরে শিক্ষকতা ছাড়িয়া ব্যবসায়ী যাদুকর হন। তিনি স্কুলে এক [illegible] অদ্ভুত নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। তিনি প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন করিয়া স্কুলের ছাত্রদিগকে ম্যাজিক দেখাইতেন কিন্তু ইহার একটি মাত্র সর্ত্ত ছিল। ছাত্রগণ ক্লাশে ভালভাবে থাকিবে এবং সমস্ত সপ্তাহ কোনরূপ গণ্ডগোল



বিখ্যাত তাসের খেলা 'রাণী গেল কোথায়?'—যার পরিণতি হয় Fool জব্দ লেখাতে

করিতে পারিবে না। এই ভাবে জন মুল হল্যাণ্ডের ক্লাশ খুবই নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত চলিতেছিল, অপর সকলে বিস্ময়ের সহিত ইহা লক্ষ্য করিতেন। প্রতি সপ্তাহে যাদুকর জন মুলহল্যাণ্ড ছাত্রদের ব্যবহারে প্রীত হইয়া একদিন করিয়া খেলা দেখাইতে লাগিলেন। শুধুমাত্র একটি সপ্তাহ বাদ পড়িয়াছিল, কারণ একদিন ক্লাশে একটি ছেলে গণ্ডগোল করিয়াছিল। দুষ্ট ছেলেটি ইহার প্রতিফলও ভালভাবে পাইয়াছিল কারণ ছুটির পর সমস্ত ছাত্র মিলিয়া তাহাকে যথেষ্ট প্রহার করিয়াছিল। স্কুলে নিয়মানুবর্ত্তিতা আনিবার এই নবতম উপায় আবিষ্কারের জন্য জন মুল হল্যাণ্ড আমাদের ধন্যবাদার্হ। বর্ত্তমানে জন পৃথিবীতে যাদুবিদ্যার ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঐতিহাসিক এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাদুকর। তিনি মার্কিন যাদুকর সম্মিলনীর (Society of American Magicians) সহকারী সভাপতি এবং সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা The Sphinx এর সুযোগ্য সম্পাদক। পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক হিসাবে অপর একজন প্রথিতযশা যাদুকর তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়—তিনি সুপ্রসিদ্ধ যাদুকর জন ব্রন (John Braun) এবং বিখ্যাত 'লিং কিং রিং' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক (Editor, Linking Rings) ; ইণ্টারন্যাশানাল ব্রাদারহুড অব ম্যাজিসিয়ান্স নামক পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ যাদুকর সম্মিলনীর উহাই একমাত্র মুখপত্র। যাহা হউক বক্তব্য বিষয় ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছি। যাদুকরদিগের উপস্থিত বুদ্ধির এবং স্থান কাল সময় বুঝিয়া কথা বলিবার ও কাজ করিবার কথা সর্ব্বদা স্মরণে থাকা উচিত। গুইন (Jack Gwynne) সাহেব যিনি কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যাদুবিদ্যা প্রদর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন তিনি এক্ষণে আমেরিকায় যাইয়া ভারতীয় পোষাকে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিতেছেন এবং তাঁহার কোম্পানীর নাম দিয়াছেন "Out of this world Magic show." যাদুকর আর্ণোল্ড ফার্ষ্ট (Arnold Furst) ও যাদুকর জন প্লাট (John platt) উভয়েই আমেরিকায় ভারতীয় খেলা দেখাইয়া বেড়াইতেছেন। ইতিপূর্ব্বেই প্লাট সাহেব মাথায় ফেজটুপী পরিধান করিয়া মুসলমান সাজিতেন, এক্ষণে তিনি তাঁহার প্রবন্ধের নীচে 'সালাম' (Salam) কথাটা লেখা আরম্ভ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কতকগুলি আমেরিকান মাসিক পত্রিকায় ভারতীয় যাদুকরদিগের সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 'The Magicians I have seen in India' এই শিরোনামায় বহু বড় বড় সচিত্র প্রবন্ধ তিনি ওদেশে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহারা প্রত্যেকেই ভারতবর্ষে আসিয়া ছোট বড় সমস্ত যাদুকরদের খেলা দেখিয়াছেন এবং খেলা শিখিয়াছেন। খেলা শিখিবার জন্য ইহারা অর্থব্যয়ে কোনপ্রকার কার্পণ্য করেন নাই। একটি ভারতীয় খেলা শিখিবার জন্য যাদুকর জন প্লাট পঁচিশ হাজার টাকা ২৫,০০০ পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে রাজী হইয়াছিলেন। যাদুকর জ্যাক গুইনও একটি ভারতীয় খেলা শিখিবার জন্য ১৫,০০০ পনর হাজার টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন। আমেরিকা ধনকুবেরদের দেশ, ইহাদের কথায় কথায় লাখ টাকা কোটি টাকার দোহাই আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। সেদেশের মেয়েদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকরের নাম Dell O' Dell তিনি নিজে Delightful Dell O' Dell নাম সহি করেন এবং Lady Houdini নামে জগৎ-প্রসিদ্ধা। বর্ত্তমানে Queen of Magic বা যাদুজগতের রাণী বলিতে ঐ 'ডেল ও ডেল'কেই বুঝায়। সম্প্রতি আমেরিকার Good Housekeeping, Spot Magazine, Sunday Mirror Magazine, Liberty, Calling all Girls প্রমুখ সমস্ত বড় বড় পত্রিকাতে তাঁহাকে 'যাদুজগতের রাণী' বলিয়া অভিনন্দিত করিয়া প্রচারিত করিয়াছে। এই 'ডেল ও ডেল' তাঁহার প্রতি এক ঘণ্টা খেলার জন্য এক হাজার ডলার অর্থাৎ প্রায় তিন হাজার টাকা চার্জ্জ করিয়া থাকেন। সে দেশে টাকাটা যেমন সস্তা—গুণীর আদরও খুবই বেশী। মার্কিনবাসীরা যাদুবিদ্যাকে আজকাল যেন খুবই ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ যাদুকর (বর্ত্তমান বয়স ৮৪ বৎসর) আমেরিকা হইতে



তখন হক সাহেব বাংলার প্রধান মন্ত্রী। যাদুকর সরকারের অনুরোধে হক্ সাহেব একটি কাগজে লিখে নাম সই ক'রে তাঁকে দেন। আর সব মন্ত্রীরাও লেখাটিতে নাম স্বাক্ষর করেন। পরে দেখা গেলো কাগজে লেখা রয়েছে যে যাদুকর সরকারকে প্রধানমন্ত্রীর পদের যোগ্য ভেবে তাঁরা সবাই একযোগে পদত্যাগ করেছেন! যাদুকরের কারসাজি বটে!—এই লেখাটিকে বলে 'Force writing'

'ভারতীয় যাদুবিদ্যা' সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি (অর্থাৎ ডাক্তার হেনরী ইভান্স— Dr. Henry R. Evans) লিখিয়াছেন যে, বহু প্রথম শ্রেণীর যাদুর খেলার জন্য আমেরিকা ভারতবর্ষের নিকট ঋণী। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন খেলাটিও (যাহা মার্কিনবাসীগণ অদ্যাপি রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সহিত প্রদর্শন করিয়া থাকেন) এই ভারতবর্ষ হইতে সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই জন্যই ওদেশের যাদুকরগণ মুখে কালি মাখিয়া কৃষ্ণকায় সাজিয়া ভারতীয় নাম লইয়া যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আজকাল আমেরিকা ও ইউরোপের যাদুকরদিগের মধ্যে ভারতীয় নাম লইয়া ভারতীয় খেলা করিবার একটা প্রবল আগ্রহ দেখা যাইতেছে। আমি বহু মার্কিন যাদুকরদের কথা জানি যাহারা আসলে শ্বেতকায় হইয়াও কৃষ্ণকায় সাজিয়া ওদেশে খেলা দেখাইয়া বেড়াইতেছেন। ওদেশে তাঁহারা খেলার নাম, যাদুকরের নাম, আসবাব, যন্ত্রপাতি, সিন-সিনারী সমস্তই ভারতীয়দের অনুকরণে করিতেছেন। ভারতীয়দের সৌন্দর্য্যে একটা বিশিষ্টতা আছে, যাহা বিদেশীয়দের চক্ষুতে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়। ইহাতে ঐশ্বর্য্যের ও বিলাসের বাড়াবাড়ি নাই। উহার গতি সহজ, সরল এবং স্বচ্ছ। ইহা বুঝিবার বিষয়, অনুভূতির বিষয়—লিখিয়া বুঝান কষ্টকর! কয়েকখণ্ড সাধারণ কাপড়ের টুকরাকে বিভিন্ন রংএ রঞ্জিত করিয়া সেলাই করিয়া যখন জাতীয় পতাকার রূপ দেওয়া যায়—উহা যেমন তখন আর ছেঁড়া কাপড়ের ফালি থাকে না, জোর করিয়া আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, ইহাও সেইরূপ। ভারতীয় কৃষ্টির একটা বিশিষ্ট ধারা আছে—ইহা হিন্দু, মুসলমান বা অপর কোন বিশেষ জাতির নিজস্ব নহে—সকলের সংমিশ্রণে এক নবতম প্রাচ্যের ধারা। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীও বহু বলিয়াছেন। কংগ্রেস অধিবেশনের সমস্ত ঘরবাড়ী যখন বাঁশের ও মাটির তৈয়ারী হইয়াছিল তখন ইংরেজদের পত্রিকাতে উহাকে—"সমস্তই অসংস্কৃত রুচিবিরুদ্ধ......বাঁশের সহর" বলিয়া উপহাস করা হইয়াছিল; কিন্তু একবৎসর পর হরিপুরা অধিবেশনের সময় ঐ বাঁশের সহরকেই আবার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে হইয়াছিল। যে জন্য আমাদের নিকট অজন্তার ছবি ভাল লাগে, যে জন্য নন্দলালকে আমরা বড় শিল্পী বলিয়া স্বীকার করি, যে জন্য আমরা ভারতীয় ক্লাসিকাল গানবাজনা পছন্দ করি, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভাল লাগে, ঘরবাড়ী ইণ্ডিয়ান আর্ট পেইণ্টিং দ্বারা সাজাইয়া থাকি—ভারতীয় যাদুবিদ্যাও ঠিক সেইজন্যই পৃথিবীর অপর দেশের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমেরিকার ঐশ্বর্য্যবিলাসীরাও যেমন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের মাটির ঘর 'শ্যামলী' দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যায় [illegible] বিদেশী সিল্কের পরিধেয় বস্ত্রাদিও যেমন খদ্দরের নিকট সূচিতায় পরাস্ত হয়, এও অনেকটা সেইরূপ। এখানে ঐশ্বর্য্যের বাড়াবাড়ি নাই কিন্তু মানুষের মনলোকে করে অব্যর্থ শরসন্ধান। ড্রেসস্যুট পরিধান করিয়া লোকেরা রাজনীতি ক্ষেত্রে যায়, পোষাকী ব্যবহার ও কথাবার্ত্তাই সেখানে প্রধান, কিন্তু মিশনারীরা সাদা ঢালাঢিলা একটা জামা পরেন মাত্র। এটা



চিকাগোর প্রসিদ্ধ যাদুকর জন প্লাট (John Platt)
পি-সি-সরকার (P.C.Sorcar)

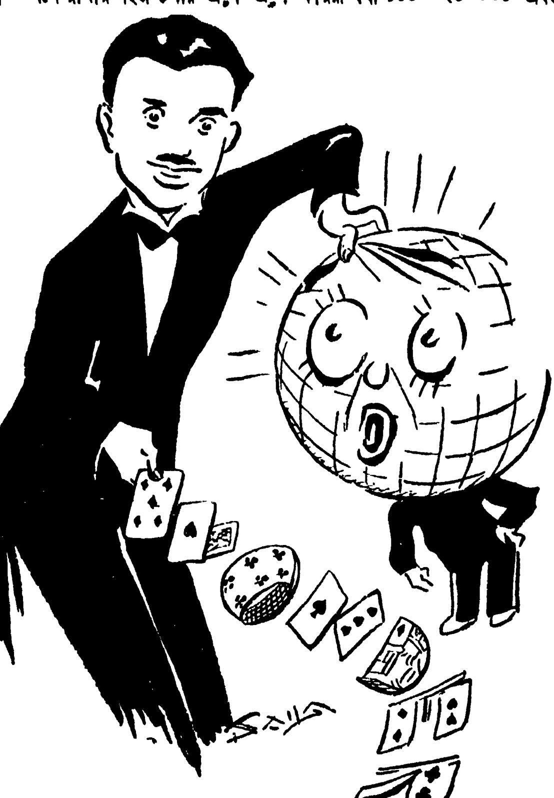
শুভ্রতা, সত্য, ধর্ম ও সৌন্দর্য্যের রূপ। এটা আধ্যাত্মিক বিষয়—অনুভূতির বিষয়, বিশ্লেষণ করিলে ইহার সৌন্দর্য্য উড়িয়া যাইবে ঠিক রামধনুরই মত। প্রতীচ্যের চক্ষুকে প্রাচ্যের এই সহজ সরল রূপটি চিরকাল মুগ্ধ করিয়া আসিয়াছে। তাহারা ভালবাসে বাহ্যিক জগৎ, আর প্রাচ্যদেশ চিরকালই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ধ্যানী। প্রতীচ্য সাধনা করিয়াছে অর্থের, প্রাচ্য চাহিয়াছে পরমার্থকে। এই মূল পার্থক্যের জন্যই প্রাচ্য চিরকাল—প্রতীচ্যকে চমক লাগাইয়া দিয়াছে।

যাহা হউক এইবার কয়েকটি খেলা লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে। ও দেশের খেলাতে কারসাজী খুবই বেশী। যেমন একটি খেলা দেখান হইতেছে যাদুকরকে রঙ্গমঞ্চে চক্ষুবদ্ধ করিয়া বসাইয়া রাখা হইল। দর্শকগণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী কি বার ছিল?" প্রতীচ্যের যাদুকর চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে শেষে বলিয়া উঠিলেন—রবিবার। সকলেই অবাক হইলেন। কিন্তু কি ভাবে এইটি হইল তাহা কেহই জানেন না। যাদুকর নিজে কিছুই জানেন না তিনি চক্ষুবদ্ধ অবস্থায় বসিয়া আছেন। তাঁহার চেয়ারে ছোট একটি রেডিওর শব্দগ্রাহক যন্ত্র ফিট করা আছে এবং শব্দপ্রেরক যন্ত্রটি রহিয়াছে গ্রীণরুমে যাদুকরের সহকারীর নিকট। যাদুকর একজন অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত লোককে নিজের কোম্পানীতে চাকুরী দিয়াছেন। দর্শকগণ যেই বলিলেন "২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৩ সাল" উহা যাদুকর যেমন শুনিতে পাইলেন যাদুকরের সহকারীও ঠিক তেমনই শুনিতে পাইলেন। যাদুকর মিছামিছি মুখ বিড় বিড় করিতে করিতে হিসাব করিতে লাগিলেন ইহার উদ্দেশ্য গ্রীণরুমে অবস্থিত সেই অঙ্কের ছাত্রকে সময় দেওয়া। সে কাগজ পেন্সিল লইয়া হিসাব করিয়া বাহির করিতেছে অথবা পুরাতন পঞ্জিকা বা ক্যালেণ্ডার খুঁজিয়া উহা জানিয়া লইল 'রবিবার' এবং রেডিও যোগে জানাইয়া দিল। যাদুকর উহা শুনিয়াই বলিয়া দিলেন—রবিবার। এই খেলা সাফল্যের সহিত প্রদর্শিত হইল। কিন্তু ইহাতে বাহাদুরী দিতে হয় কাহাকে—প্রথমতঃ ঐ বেতারযন্ত্র আবিষ্কারককে, তারপর ঐ অঙ্কের ছাত্রটিকে। ছাত্রটির নির্ভুল গণনা এবং বেতার যন্ত্রের ঠিকমত ক্রিয়ার উপরই যাদুকরের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। যাদুকর যাহা করিতেছেন একটি ছোট ছেলেও এই খেলা দেখাইতে পারিবে। টাকার প্রয়োজনমাত্র, ঐ যন্ত্রপাতি কিনিলেই হইল।

এই গেল প্রতীচ্যের কথা। প্রাচ্যের যাদুকরগণ হইলে কিভাবে এইটি করিতেন তাহাই এক্ষণে বলা যাইতেছে। ইহাকে 'Sorcar's Method' নামে অভিহিত করিলাম এবং ভারতবর্ষে এই খেলাটির সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত করা হইল।

এক্ষণে খেলাটির মূল কৌশল বলিয়া দিতেছি। কয়েকজন মার্কিন যাদুকর আমার এই খেলা শিখিয়া যাইয়া আমেরিকায় বর্ত্তমানে সাফল্যের সহিত প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহাদের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা এই খেলা দেখাইবার পূর্ব্বে আমার নাম বলিয়া লন এবং পি-সি-সরকারের প্রণালী স্বীকার করিয়া লন। ভারতীয়দের মধ্যে এই গুণের অভাব আছে। কাজেই অনুরোধ তাঁহারা যেন এই নিয়মের ব্যতিক্রম না করেন।

প্রথমে কয়েকটি ইনডেক্স নম্বর মনে রাখিতে হইবে যেমন:—জানুয়ারী ১, ফেব্রুয়ারী ৪, মার্চ্চ ৪, এপ্রিল ০, মে ২, জুন ৫, জুলাই ০, আগষ্ট ৩, সেপ্টেম্বর ৬, অক্টোবর ১, নভেম্বর, ৪, ডিসেম্বর ৬ এবং এইগুলি মনে রাখার সহজ উপায় 'গ্রুপ' 'গ্রুপ' করিয়া যথা ১৪৪ ০২৫ ০৩৬ এবং



যাদুকর সরকার মিষ্টার পৃথিবীর ঝুঁটি ধরে তাসের WONDER দেখাচ্ছেন। বেচারা পৃথিবী একেবারে বোকা বনে গেছে, চোখ কপালে তুলে হাঁ ক'রে দেখছে আর ভাবছে—মাথাটা ঠিক আছে তো!

১৪৬। এইবার মনে করুন দর্শকগণ দিলেন ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৩ অর্থাৎ ২৩।২।১৩, তারিখ ২৩, মাস ২, বৎসর ১৩ এইবার ফর্মুলা—

প্রথমে লিখুন	...	...	...	১৩
ইহার এক-চতুর্থাংশ যোগ দিন			...	৩
তারিখ যোগ দিন ...		...	...	২৩
মন হইতে মাসের ইনডেক্স সংখ্যা				
ফেব্রুয়ারীর ৪ যোগ...				৪

সাত দিয়া ভাগ দিন ৭) ৪৩ (৬
৪২
১ বারের সংখ্যা

অর্থাৎ এক নম্বর বার—রবিবার।

মনে করুন অপরে বলিলেন ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪৫

এক্ষেত্রে প্রথমে লিখুন	...	৪৫
চতুর্থাংশ	...	১১
তারিখ	...	৩১
মাসের ইনডেক্স	...	৬

এক্ষণে সাত দিয়া ভাগ　৭) ৯৩ (
　　　　　　　　　　　　৯১
　　　　　　　　　　　　২　নং বার

উত্তর হইবে দুই নম্বর বার অর্থাৎ সোমবার

এক্ষেত্রে বলা নিষ্প্রয়োজন যে রবিবার ১, সোমবার ২, মঙ্গল ৩, বুধ ৪, বৃহস্পতি ৫, শুক্র ৬ এবং শনি ৭ অর্থাৎ ০, কারণ ৭ দ্বারা ভাগ করিলে ৭ কখনও অবশিষ্ট থাকিবে না শূন্য থাকিবে। বাড়ীতে কয়েকবার করিলে দেখা যাইবে এই অঙ্ক মনে মনে বাহির করিতে মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার; অভ্যাস হইয়া গেলে কয়েক সেকেণ্ড মধ্যে ইহা বলিয়া দেওয়া যাইবে, মোটেই কঠিন নহে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের খেলায় পার্থক্য উপরোক্ত খেলা হইতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন। আমাদের দেশে রেডিওর শব্দ-প্রেরক ও শব্দ-গ্রাহক যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না—শুধু হাতে, বিনা সহকারীর সাহায্যেও ইহা প্রদর্শনযোগ্য। আমার মতে এদেশীয় খেলা বিলাতী কায়দায় দেখাইলে আরও ভাল হয়। কারণ দিন দিন বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে—বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্য লইলে অনেক নূতন নূতন প্রথম শ্রেণীর খেলা আমরা দেখাইতে পারিব।



ডাক্তার হেনরি ইভান্স (Dr. Heury R. Evans)

ভারতের সিন্ধুতটে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ভারতের ভাগ্যাকাশে অদৃষ্ট দেবতা তব হাস্যপরিহাসে
সুদীর্ঘ শতাব্দী ধরি মহামারী মন্বন্তরে বিভীষিকা-ত্রাসে
দীর্ঘশ্বাসে যাপিয়াছি দিন।

মেঘে মেঘে গেছে বেলা, নামিয়াছে বিভাবরী অশ্রুধারাসনে
সহস্র কঙ্কালভরা শ্মশান-প্রান্তর পথে, বাদলের ক্ষণে
সঙ্গোপনে পরিচয়হীন
দুর্য্যোগের মৌন অভিসার।
অবসন্ন মানুষের পত্রঝরা অরণ্যের মর্ম্মে অনিবার
হাহাকার শুনিয়াছি কত!

নব নব যাত্রী মাঝে রাত্রি এসে প্রভাতের দেয়নি সন্ধান,
গোপনে গোপনে তুমি এ জাতির উদরান্নের সর্ব্বসংস্থান
দেশের ঐশ্বর্য্য দূরে যত
পাঠায়েছ দিনে দিনে। তব বাহু বরদান মুষ্টিভিক্ষা রূপে
লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত্তেরে করেছে বঞ্চিত, তাই প্রতি রোমকূপে
যন্ত্রণায় তীব্র উত্তেজনা!

বিপ্লবের সুরে সুরে ভয়াতুর বিষণ্ণতা করে অন্যমনা
তোমারে যে অদৃষ্ট দেবতা!
শীতের দুঃস্বপ্নসম বঙ্কিম নিঃশ্বাস তব কম্পিত ছায়ায়;
যাবার সময় হোলো, ক্লান্তির উপরে মৃত্যু নীরবে ঘনায়
কণ্ঠে কেন নাহি কোন কথা!
নব শতাব্দীর ডাকে জীবন-সেনানী জাগে করি' তূর্য্যনাদ;
তোমার চক্রান্ত আজি পারিবে কে প্রতিহত করিতে প্রভাত
ভারতের এই সিন্ধুতটে!
ক্ষুদ্র হয়ে ছিল যারা বাজায় বিজয় বীণা রুদ্রছায়া নটে।
ভেবেছিলে চিরদিন সর্ব্ব আবরণ হরি' নিঃস্ব করি দেশ
দুর্গমের দুর্গে বসি মোর এই স্বজাতিরে শুনাইবে শেষ
নিত্য ক্লেশ কোটি বক্ষে দেবে, হবে নাক কভু ভাগ্যজয়!
নবাগত সুদিনের দুর্জ্জয় আশ্বাসে তব আশা দীপ নিভে,
মুক্তিমন্ত্রে জাগিছে বিস্ময়।
এবার রচিতে হবে ক্রুশচিহ্ন রেখে দিয়ে নব ইতিহাস
তোমার সমাধিক্ষেত্রে জনগণ মিলনের হবে অধিবাস।

পরীক্ষা

অধ্যাপক শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ এম-এ, পি-এচ্-ডি

এপ্রিল মাস। ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার ধুম লাগিয়া গিয়াছে। পরীক্ষাসাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য ছাত্রদিগের আপ্রাণ চেষ্টা। এই সময়ে পরীক্ষার্থীদিগের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে বাস্তবিক সহানুভূতির উদ্রেক হয়।

অধ্যাপক সেন যখন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পরীক্ষাকেন্দ্রে তত্ত্বাবধানের কার্যোপলক্ষে উপস্থিত হইলেন তখন মাত্র আটটা বাজিয়াছে। পরীক্ষা আরম্ভ হইবে নয়টায়। কিন্তু ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াই যেন কাহার অনুসন্ধান করিতেছেন। অধ্যাপক সেনকে দেখিয়াই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া রেজিষ্ট্রার সাহেব বলিলেন, "দেখুন, ডক্টর সেন, আপনার জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলাম।"

ডক্টর সেন জিজ্ঞাসুনেত্রে রেজিষ্ট্রার সাহেবের দিকে তাকাইলেন।

রেজিষ্ট্রার বলিলেন, "লালা হরসুখলাল এখানকার একজন প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদার। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে অনেক অর্থ সাহায্য করেছেন। তাঁর বড় ছেলে এবার বি-এ পরীক্ষা দিচ্ছে, পরশু থেকে সে খুব জ্বরে পড়েছে, কাল তার ১০৪ জ্বর ছিল। আজ তার পরীক্ষার শেষ দিন। সে পরীক্ষা শেষ করে দেবে বলে জেদ ধরেছে।"

অধ্যাপক সেন বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "তার পরীক্ষা দেবার জন্য এত ঝোঁক কেন? আসছে বছর দিলেই হ'ত। বড় লোকের ছেলের এ তো সখের পরীক্ষা!"

রেজিষ্ট্রার সাহেব উত্তর দিলেন, "আজকের পরীক্ষা ছাড়া সবগুলিই নাকি সে ভাল দিয়েছে, পাশ করবে আশা আছে, তাই আজকেরটাও সেরে ফেলতে সে চাইছে। একান্ত পাশ না হলেও কম্পার্টমেণ্ট পাবার নিশ্চয়তা আছে।"

অধ্যাপক সেন ঈষৎ হাসিয়া টিপ্পনী করিলেন, "তা ছাড়া এ দেশের লোকের বি-এ পাশের দিকে খুবই আগ্রহ হয়েছে।"

রেজিষ্ট্রার সাহেব বলিলেন, "নূতন মোহ কিনা, এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি।"

অধ্যাপক সেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে আমায় কি করতে হ'বে বলুন।"

রেজিষ্ট্রার সাহেব উত্তর দিলেন, "আপনি একজন প্রাচীন অধ্যাপক ডক্টর সেন, আপনার উপর আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি। লালাজীর ছেলের পরীক্ষার ভার আপনাকে নিতে হ'বে।"

অধ্যাপক সেন বলিলেন, "আমি এখনই প্রস্তুত, কি করতে হ'বে বলুন।"

"বিশেষ কিছু নয়, লালাজীর মোটর হাজির আছে, আপনাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যাবে। এই বড় খামে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, উত্তরের খাতা, ব্লটিং পেপার সবই দেওয়া আছে। ন'টার সময়ে ওকে প্রশ্নপত্র ও খাতা দেবেন, তারপর বসে বসে খবরের কাগজ পড়ে তিন ঘণ্টা কাটিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, একটা কথা, উত্তরের খাতাগুলি ডাক্তার দিয়ে শোধন করিয়ে তবে খামে ভরবেন, লালাজীকে সব ব্যবস্থা করবার জন্য বলা হয়েছে।"

লালাজীর প্রকাণ্ড মোটর অধ্যাপক সেনকে লইয়া দিল্লীর প্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া ছুটিল; রোশেনারা বাগের পাশ দিয়া মোরি গেট ছাড়াইয়া মোটরটি যখন এক প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন অধ্যাপক সেন সোজা হইয়া বসিয়া চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এই বাগান-বাটীর গেট পার হইয়া মোটর কতদূর আসিয়াছে, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না, তবে এইমাত্র তিনি বুঝিলেন যে সহরতলীতে এই নির্জ্জন স্থানে জনকোলাহলের বাহিরে বেশ একটা শান্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। দুই পার্শ্বে ইউক্লিপটাস গাছের ছায়ায় ঘেরা পথ দিয়া মোটর লালাজীর বাটীর বৃহৎ দ্বারে আসিয়া থামিল। লালাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অধ্যাপক সেনকে অভ্যর্থনা করিয়া দ্বিতলের বসিবার ঘরে লইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে লালাজী আসিয়া অধ্যাপক সেনকে

নমস্কার করিয়া বলিলেন, "প্রফেসারজী, আপকো বহুৎ তক্‌লিফ হুয়া।"

অধ্যাপক সেন প্রতিনমস্কার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলেন, "নেই, নেই, কুচ তক্‌লিফ নেই হুয়া।"

অধ্যাপক সেন লালাজীর অনুসরণ করিয়া একটি প্রশস্ত কক্ষের মোটা পর্দ্দা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ঘরের দরজা জানালায় মোটা পর্দ্দা থাকায় দিনের আলো প্রবেশ করিতেছিল না, দুই ধারে দেয়াল সংলগ্ন দুইটি উজ্জ্বল ইলেক্‌ট্রিক বাতি জ্বলিতেছিল। অধ্যাপক সেন ঘরের ভিতর একটা বিষণ্ণ আবহাওয়া অনুভব করিলেন। তিনি দেখিলেন কক্ষটিকে অর্দ্ধগোলাকৃতি খিলান দিয়া দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এক ভাগ ঘরের প্রায় তৃতীয়-চতুর্থাংশ, এই বড় অংশটিতে দুইখানি সোফা, কয়েকটি সুদর্শন টেবিল ও চেয়ার একখানি মূল্যবান্ কার্পেটের উপর বিরাজ করিতেছে। দেয়াল গাত্রে দুই তিনটি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক চিত্র এবং গৃহস্বামীর একটি বড় প্রতিকৃতি ঝুলিতেছে। কক্ষের ছোট অংশে একখানি সুদৃশ্য পালঙ্কে একটি যুবক অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় বসিয়া রহিয়াছে; পার্শ্বে কয়েকখানি গ্রন্থ বিক্ষিপ্ত, তাহাদের একটির উপর যুবকের দৃষ্টি নিবদ্ধ। এই যুবকই অসুস্থ পরীক্ষার্থী।

পিতার আহ্বানে পুত্র আসিয়া একটি টেবিলের সম্মুখস্থ স্প্রিংএর চেয়ারে বসিল। ঘড়িতে নয়টা বাজিতে তখনও দশ মিনিট বাকী ছিল। অধ্যাপক সেন যুবকের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে নিশ্চিন্ত মনে পরীক্ষা দিতে উপদেশ দিলেন এবং সেই সঙ্গে লালাজীর নিকট জানিয়া লইলেন যে জ্বরের প্রকৃতি দেখিয়া চিকিৎসক মহাশয় পরীক্ষা দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু যুবক পরীক্ষা শেষ করিয়া দিবে বলিয়া জেদ ধরিয়াছে।

নয়টা বাজিবার দুই মিনিট পূর্ব্বে অধ্যাপক সেন পরীক্ষার্থীকে প্রশ্নপত্র ও উত্তরের খাতা দিয়া সরিয়া আসিলেন। ঘরের বিষাদময় আবহাওয়া তাঁহার পছন্দ হইতেছিল না, তিনি কক্ষসংলগ্ন বারান্দার এক কোণে আসিয়া একখানি সোফায় উপবেশন করিলেন। ইলেকট্রিক পাখা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। পরীক্ষার্থীর হস্তও উত্তরের খাতায় অগ্রসর হইল।

অধ্যাপক দৈনিকসংবাদপত্রে মনঃসংযোগ করিলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে ঘরের মধ্য হইতে দুর্ব্বল রোগক্লিষ্ট পঞ্জরের আর্ত্তশ্বাস তাঁহার কর্ণে আসিয়া পৌঁছাইতে লাগিল। দেয়াল-ঘড়িতে দশটা বাজিল, পরীক্ষার্থীর নিকটে মাতৃহস্তে পথ্য আসিল। বাটীর ভৃত্য অধ্যাপক সেনের নিকট একগ্লাস লেমনেড রাখিয়া গেল। ঘড়ির কাঁটার টিক্ টিক্ শব্দের সহিত একটা করুণ ধ্বনি যেন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন যে, রেজিষ্ট্রার সাহেবের অনুরোধে তিনি এখানে না আসিলেই ভাল করিতেন।

সময় বহিয়া চলিল। অধ্যাপক সেন মাঝে মাঝে ঘরের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিতেছিলেন। পরীক্ষার্থীর করুণ নিশ্বাসে তিনি যেন একটা অজানা আতঙ্ক অনুভব করিতেছিলেন। লালাজী ও তাঁহার পত্নী ঘণ্টায় ঘণ্টায় পুত্রকে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন এবং ঔষধ পথ্যও সময় মত ব্যবস্থা করিয়া দিতেছিলেন। এইরূপে প্রায় বারোটা বাজিবার উপক্রম হইল।

অধ্যাপক সেন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পরীক্ষার্থী যুবক ধীরে ধীরে লিখিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু তাহার মুখের করুণ রোগক্লিষ্ট ভাব যেন বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে। দেখিয়া অধ্যাপক সেনের বড় দুঃখ হইল।

কিয়ৎক্ষণের জন্য অধ্যাপক সেনের দিকে মুখ তুলিয়া পরীক্ষার্থী বলিল, "প্রফেসারজী এবার আমি নিশ্চয়ই পাশ করবো; গত বৎসর ইংরাজিতে নম্বর কিছু কম হ'য়েছিল।"

অধ্যাপক সেন কিছু না ভাবিয়াই উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, তা তো হ'বেই।"

যুবক বলিল, "পাশ করবার জন্য এবার আমি খুব চেষ্টা করেছি। পাশ হ'বো তো; কি বলেন?"

অধ্যাপক সেন উৎসাহপূর্ণস্বরে বলিলেন, "হ'বে না কেন? নিশ্চয়ই হবে।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যুবক বলিল, "তা হ'লেই বাঁচি, বড় ইচ্ছা পাশ করি।"

ঘড়িতে বারোটা বাজিল। বৃহৎ বাটীর সংলগ্ন বাগানের একটি উচ্চ বৃক্ষ হইতে একটা প্রকাণ্ড পাখী বিকট চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল। অধ্যাপক সেন এক অজানা আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিলেন। পরীক্ষার্থী যুবক করুণ স্বরে বলিল, "প্রফেসারজী, I have finished, ইস্তাহান খতম

হো চুকা।" অধ্যাপক সেন তাহাকে ধীরে ধীরে গিয়া শয্যাগ্রহণ করিতে বলিলেন। যুবক উঠিবার উপক্রম করিল, একপা দুইপা যাইতে না যাইতে মাটীতে পড়িয়া গেল। পিতামাতা ছুটিয়া আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখা গেল, যুবক জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। লালাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাক্তারকে ফোন করিতে ছুটিল। এমন সময়ে এক কিশোরী আলুলায়িত বেশে দ্রুতবেগে কক্ষে প্রবেশ করিল। আর্ত্তনাদে কক্ষ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অধ্যাপক সেন বুঝিলেন, এই কিশোরীই যুবকের সদ্যোবিবাহিতা পত্নী। ডাক্তার আসিয়া যুবককে পরীক্ষা করিয়া গম্ভীরমুখে বলিলেন, যুবকের মাথার শিরা ছিঁড়িয়া মৃত্যু হইয়াছে। বাটীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। কিশোরী লজ্জা ভুলিয়া অধ্যাপক সেনের নিকট ছুটিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, "প্রফেসারজী, এ ক্যায়া ইম্‌তাহান ?"

অধ্যাপক সেন উত্তর দিতে পারিলেন না, তিনি ভাবিতেছিলেন, একজন ত পরীক্ষা দিয়া চলিল—আর একজন যে সারা জীবন পরীক্ষা দিবার জন্ত রহিয়া গেল। হায় রে পরীক্ষা !

সূপকার

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মতি নাম তার সুঠাম গঠন,
সহজ সরল লোক,
কার্য্য তাহার রন্ধন করা
রাধা-মাধবের ভোগ।
ষণ্ট সুক্ত রসা রাঁধে নিতি,
শিখরিণী, পুলি, পিঠা—
গড়ে মালপোয়া, পায়স, মিঠাই
অতি উপাদেয় মিঠা।
অপূর্ব্ব পাক, ধন্ত ভিয়ান,
ধন্ত তাহার হাত—
কোথা হতে আনে সকল দ্রব্যে
অমৃতের আস্বাদ।
একটী চিন্তা কিছু ভাবিবার
নাহি আর অবসর,
ভোজ্য দ্রব্য রাধামাধবের
কিসে হবে প্রীতিকর।
শুনিতে পায় না ভাগবৎ পাঠ,
রস কীর্ত্তন গান,
রাধামাধবের সেবায় সতত
তন্ময় তার প্রাণ।
সন্ধ্যাহ্নিক নাহিক তাহার,
ভগবানে নাহি ডাকে,
রন্ধনই বড়, রন্ধন তার
তাই নিয়ে সদা থাকে।

রাঁধুনী বলিয়া করে উপহাস
রটায় কুৎসা তার,
সমাজে তাহার মর্য্যাদা নাই
বস্তু উপেক্ষার।
কত বিনিদ্র নিশীথে তাহার
চোখ ভরে আসে জল
জানায় বেদনা রাধামাধবেরে
সেই তার সম্বল।

* * *

একদা স্বপ্নে দেখে মতি তার
সম্মুখে রথ রাখি
নারদ বলেন গোলোকেতে চল
প্রভু পাঠালেন ডাকি'।
মতি ভয়ে ভয়ে কহে হে ঠাকুর
করি নাই জপ ধ্যান,
পূজা আরাধনা কিছুই জানিনে
অতি বড় অজ্ঞান।
স্বরগে যাবার নাহি যে আমার
বিন্দুমাত্র দাবী
রাধামাধবের এ এক রঙ্গ,
বুঝিতে পেরেছি ভাবি।
নারদ বলেন তুমি চিরদিন
রসের ভিয়ানে দড়

'রস বৈ সঃ' সে প্রেমের ঠাকুর
রসেই তৃপ্ত বড়।
ভোগের অন্ন ব্যঞ্জনে দিলে
ভক্তি প্রেমামৃত—
তব গুঞ্জন ভোগ আরতির
বেশী আনন্দ দিত।
করেন ভক্ত শিল্পী কবিও
রস লয়ে কারবার
সার্থক সেই রসসৃষ্টি
যাহা ভাল লাগে তাঁর।
নিখিলনাথের তুমি সূপকার
তুচ্ছ ভাবা যে ভ্রম,
রন্ধন নয়, জীবন ধরিয়া
করিতেছ তুমি হোম।
মতি নও তুমি মহামতিমান
না জেনেও তুমি জ্ঞানী
এসো হে রসিক রসস্রষ্টা,
এসো লই আহ্বানি।

* * *

ভাঙিল তন্দ্রা মতি কেঁদে বলে
হৃদিভরা অনুরাগে—
'জানিনা কিছুই, জানি ঠাকুরের
কখন কি ভাল লাগে।'

বাঙলার গ্রহশান্তি

শ্রীজনরঞ্জন রায়

গ্রহশান্তি করিতে হয় সকলকেই—কি ব্যক্তিকে, কি রাষ্ট্রকে—সকলকেই। ঠিক সময়ে তাহা করিলে জীবন বাঁচে—না করিলে বাঁচে না। বাঙলাকে বাঁচিতে হইলে তাহা করিতে হইবে।

বাঙলার এই নিগ্রহের কারণ কে?—কে এইসব গ্রহ-উপগ্রহ?

বাঙলার কেন্দ্রে শোষণপর সাম্রাজ্যবাদী গ্রহরাজ। আর তার চারিদিকে যেন নয়টি উপগ্রহ! তাহারা কে-কে? সংশোধন সাপেক্ষ-ভাবে বলিতেছি তাঁহারা বাঙলার নয়টি বনিয়াদী জমিদারবংশ।

এই নয়টি ভূস্বামী বাঙলা-সরকারকে বার্ষিক এক কোটি টাকা রাজস্ব দেন অর্থাৎ গড়ে বাঙলা সরকারের মোট রাজস্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

বর্দ্ধমানপতি মহারাজাধিরাজ—তাঁহার আয় সকলের চেয়ে বেশি—বার্ষিক ৫০ লাখ টাকার কাছাকাছি। ময়মনসিংহপতির বার্ষিক আয় প্রায় ১০ লাখ টাকা হইবে। নাটোরের কমবেশি প্রায় ৪ লাখ টাকা বার্ষিক আয়…। অথচ ইঁহাদেরই এক-একটি কৃষক প্রজার মাথাপিছু গড়ে আয় বার্ষিক ৪৩৲ টাকা মাত্র (বাংলার চাষী—শান্তিপ্রিয় বসু)।

বাঙলায় মোট ৬ লক্ষ পরিবার খাজনাভোগী। এই ৬ লক্ষের অধিকাংশেরই বার্ষিক আয় কমবেশি ১৫০৲ টাকা মাত্র। প্রধানভাবে নয়টি পরিবারই সিংহভাগের অধিকারী।

এবারকার কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী-ইস্তাহারে এই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের কথা ছিল। আমরাও বলিতেছি এই জমিদারীপ্রথা উচ্ছেদ না করিলে বাঙলায় গ্রহশান্তি হইবে না। তারপর দেশের লোকের হাতে দেশের পরিচালনভার আসা চাই।

ইংরাজ আসার আগে জমির ভোগদখল স্বত্ব ছিল কৃষকের। তখন কেহ তাহা কাড়িয়া লইতে পারিত না…কেহ মর্জ্জিমতো খাজনা বাড়াইতে পারিত না। তখন জমির তত্ত্বাবধান করিত গ্রাম্য মণ্ডল। নবাব বা রাজা, জলসেচন প্রভৃতি প্রধান উন্নতিকর ব্যবস্থাদির দিকে দৃষ্টি রাখিতেন।

এই সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে—অতি প্রাচীনকালে ভাগীরথীর খাল কাটা হয়—জহ্নু পর্ব্বতের বিরাট অবরোধ ভেদ করিয়া সুলতানগঞ্জের নিকটে গঙ্গাপ্রবাহ হইতে। এখনও গঙ্গামধ্যে ঐখানে জহ্নু পাহাড় রহিয়াছে। এক সময়ে ভাগীরথীর জলধারা বাঙলার লোককে বাঁচাইয়াছিল। যদিও এখন ভাগীরথীর খাল, পদ্মানদীর বর্ষাকালীন একটি শাখানদীতে পরিণত হইয়াছে কেবল সংস্কারের অভাবে। গঙ্গার আগে ছিল ভৈরব নদ। চিত্রা, মহেশ্বরী, নবগঙ্গা, ইচ্ছামতী, কপোতাক্ষ প্রভৃতি ভৈরবের শাখা। ইহাদের প্রায় সবগুলিই পূর্ব্ববর্ত্তী অসাধারণ বুদ্ধিমান ও বীর্য্যবান বাঙলার হিন্দুগণ নিজেদের সুবিধা ও প্রয়োজন অনুযায়ী খনন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদেরই বংশধরগণ পরাধীন ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়ায় ঐগুলিকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা হারাইয়াছেন। যদি প্রাণ বা জীবন বলিয়া নদনদীগুলির কিছু থাকে—তাহা হইলে মধ্য ও পশ্চিম বাঙলার কোন নদনদীই আজ জীবিত বা প্রাণবন্ত নাই ('হিন্দুস্থান' ১৩৫২ পূজাসংখ্যা—শ্রীশৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়)। আজ এই সমস্ত নদনদী মজিয়া গিয়াছে।

জমিদারীপ্রথা সৃষ্টি করে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী। ১৭৮০ সালে তাহাদের ইংলণ্ডকে দিতে হইত ১ লক্ষ টাকা। তাহা ছাড়া তাহাদের যুদ্ধবিগ্রহ করিতেও খরচ ছিল। তখন তাহারা কৃষকদের কাছে রাজস্ব আদায় ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝে নাই। তাহারা ছিল ব্যবসাদার, প্রধানভাবে ব্যবসার দিকটাই বেশি করিয়া দেখিত। তাই যেন ছ'কড়া-ন'কড়ায় তখন এইসব জমিজমাগুলো বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে তাহারা। তখনকার দিনের ধনিক সম্প্রদায় ঐসব কিনিল। বৃটিশরাজ ভারতে তাহার সাম্রাজ্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কৃষকদের জমি কাড়িয়া লইয়া জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছে (মুক্তির পথে বাংলা—ভবানী সেন)।

স্মরণীয় ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাঙলার স্বাধীনতা সূর্য্য ডুবিল। ১৭৯৩ সালে লাট লর্ড কর্ণওয়ালিস, জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। জমিদারদের রাজস্বের বাঁধাবাধি বন্দোবস্ত হইল ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা।

এখন বাঙলার জমি কৃষকদের নয়। তাহা বাঙলা সরকারের ও জমিদারদের। সরকার বাহাদুর বা জমিদারগণ বুঝেন শুধু জমির আয়। গোচরের দায়িত্ব, বীজ সরবরাহের দায়িত্ব, সার দিবার দায়িত্ব—তাঁদের নয়, তাহা নির্ধন কৃষকদের।

বাঙলার চাষের জমির পরিমাণ ২ কোটি ৮৯ লক্ষ একারের কাছাকাছি। জমিদারগণ গত ১৫০ বৎসরে তাহাতে সেচের ব্যবস্থা করিয়াছেন মোটামুটি ১৭ লক্ষ একারে। সরকার করিয়াছেন খুব বেশি প্রায় ১ লক্ষ একারে। এখনও পতিত জমি আছে প্রায় ৩৭ লক্ষ একারের মত (ফ্লাউড কমিশন রিপোর্ট)।

বড় বড় জমিদাররা কি করিলেন এই দেড়শত বৎসর ধরিয়া? প্রতিষ্ঠার জন্য দানধ্যান যতই করিয়া থাকুন, প্রধানভাবে বিলাসিতায় মগ্ন থাকিলেন কলিকাতায় বসিয়া। ১৭০৬ সালে কলিকাতায় না'কি, ৮ খানি পাকাবাড়ী ও ৮ হাজার খড়ের-ঘর ছিল। কিন্তু আজ? তাহা আজ কত বাড়িয়াছে। সবই কিন্তু জমিদারদের কৃপায় হয় নাই। হইলে তবুও তাঁহাদের আখেরের ভাল হইত। এমনভাবে কোর্ট অব-ওয়ার্ডে জমিদারী যাইত না। আমরা জানি—কাহারও মদের দেনায় কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্‌এ জমিদারী যায়, কাহারও গণিকামহলের দেনার দায়ে কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্‌এ যায়, কাহারও বা

খেতাব কিনিতে কোর্ড-অব-ওয়ার্ডস্এ যায়। প্রজার উন্নতি বা শিল্পোন্নতি-রূপ আসল কাজে (Constructive workএ) কে কতটুকু দৃষ্টি দিয়াছেন—আজ দেশের লোক তাহার হিসাব-নিকাশ করিতেছে।

বাঙলায় এখন সেচের ব্যবস্থা আছে—সরকারী ও বেসরকারীভাবে, কেবল ৬ ভাগ জমিতে। সরকার বাহাদুর সেচ বাবত ব্যয় করেন বৎসরে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা মাত্র।

গত ৩০ বৎসরে বাঙলার লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে প্রায় শতকরা ২০ জন। কিন্তু আবাদী জমির পরিমাণ বাড়িয়াছে শতকরা একভাগ। ফসলের পরিমাণ বাড়ে নাই। সরকার একদিকে বলিতেছেন—'ফসল বাড়াও'...আর অন্যদিকে বলিতেছেন 'জন্মনিয়ন্ত্রণ কর'। কি পরিহাস!

বাঙলার মধ্যসত্বভোগীরা (জমিদার প্রভৃতি) কৃষকের নিকট বার্ষিক খাজনা পান ১৬½ কোটি টাকা। রাজস্ব ও সেচ বাবত তাঁহারা আদায় দেন ৩½ কোটি টাকা। তাঁহাদের বাঁচে কমবেশি ১৩ কোটি টাকা। তার মধ্যে খাজনা আদায় বাবদ খরচ-খরচা ৩ কোটি টাকাও যদি যায়, তবে মুনাফা থাকে প্রায় ১০ কোটি টাকা। বাজে আদায় আগে অনেক হইত। এখন আইন-কানুন হইয়া তাহা কমিয়াছে। তবুও নায়েব-গোমস্তা জোর-জুলুম করিয়া অনেক নেয়। তার কিছু ভাগ জমিদারও পান। সেই বাজে আদায় ঐ পাকা মুনাফার মধ্যে ধরিলাম না।

বাঙলায় বৎসরে ফসল জন্মায় গড়ে ১৪৩৩ কোটি টাকার। বর্গা-চাষ হয় এক-পঞ্চমাংশ জমিতে। ফসলের অর্দ্ধেক লয়েন জমিদার। এইভাবেও মধ্যস্বত্বভোগীরা পান প্রায় ১৫০ কোটি টাকা (ফ্লাউড কমিশন, ১৯৩৮)।

যা'ক, আমি না-হয় ধরিতেছি বাঙলার জমিদাররা শুধু ঐ ১০ কোটি টাকাই পান। কিন্তু এই ১০ কোটির প্রায় সবটা ঐ ৯টি জমিদার ভোগ করেন। বাঙলায় ৬ লক্ষ পরিবারের সংসার চলে না'কি জমিদারীর আয়ে। কিন্তু তাঁরা 'নামে জমিদার' ছাড়া আর কিছুই নহেন। কারণ এই ছয় লক্ষ মধ্যসত্বভোগীকে যদি এই উদ্বৃত্ত টাকাটা সমানভাবে বাঁটিয়া দেওয়া যাইত, তাহাতে প্রত্যেকে বৎসরে ১৫০৲ টাকার বেশি পাইতেন না। অর্থাৎ তাঁদের মাসিক আয় গড়ে ১২৷৷০ টাকার বেশি পড়িতেছে না। তাই বলিতেছিলাম বাঙলার কংগ্রেসদল ও নূতন মন্ত্রিসভা এবং এই নামে-জমিদারবর্গ একযোগে এই জমিদারীপ্রথা উঠাইয়া দিতে সাহায্য করুন। তাহাতে এই মধ্যবিত্ত নামে-জমিদারদের সুবিধা ছাড়া কোন অসুবিধা হইবে না। কেন?—তাহা পরে বলিতেছি।

১৭৯৩ সালের পর আবাদী জমি বাড়িয়াছে। বাড়ার কারণ সরকার বাহাদুরের বা জমিদারের দ্বারা সেচ বৃদ্ধি প্রভৃতি কোন উন্নতির জন্য নয়। ইহার মূলে আছে অন্য কথা। ইংরাজের ব্যবসার প্রসারের কূট-কৌশলে দলে-দলে দেশী কারিকর বেকার হইল। সেই সব বেকার কারিকরের দল পেটের দায়ে চাষী হইল। তাহারা অনাবাদী ঢিপি-জোল-ব্রহ্মডাঙ্গা চাষের জমিতে পরিণত করিল।

১৯২১-১৯৩১—এই দশ বৎসরে হুহুশব্দে ইংরাজের ব্যবসা বাড়িতে থাকে। তাহাতে দেশী কারিকর সংখ্যা কাজ হারায় প্রায় দুই লক্ষ। এদেশের শিল্প ইংরাজের হাতে চলিয়া যায়। অথচ তার আগে ১৮১৭ সালে এক কোটি ৫২ লক্ষ টাকার মসলিন কাপড় একা ঢাকা হইতে ইংলণ্ডে চালান যাইত (বৃহৎবঙ্গ—দীনেশচন্দ্র সেন)। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে আরও বহু দেশীয় ব্যবসা ইংরাজের হাতে যায়, সঙ্গে সঙ্গে কারিকর শ্রেণী পথে আসিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হয়।

১৮৯১-১৯২১—এই ৩০ বৎসরে চাষীর সংখ্যা বাড়িয়াছে এক কোটি। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ অধিকাংশই ছিল কারিকর। ১৯২১-১৯৪১—এই ২০ বৎসরে আরও প্রায় একলক্ষ চাষী বাড়িয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এইসব বেকার কারিকরের দল চাষী হইয়া আবাদী জমি পায় নাই। অনাবাদী পতিত জমিগুলিকে তাহারা 'উঠিত্' করিতে প্রাণপণ করিল। কিন্তু সে সময়ে তাদের পেটের দানা-পানির জন্য সরকার বা জমিদার সাহায্য করেন নাই। তাহারা কর্জ্জ করিল। অনাহারের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে যে-সে সুদে কর্জ্জ করিল। এইভাবে গ্রাম্য কৃষকদের ঋণের বোঝা ১৯৩১ সালে ১০০ কোটি টাকা ছিল (ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্ট)।

এখন গড়পড়তা চারি একার বা তারও কম জমি আছে শতকরা প্রায় ৬৬ জন চাষীর। তাহাতে যাহা উৎপন্ন হয়, সে আয়ে তাহাদের পেটের ভাত হয় না। তাই বৎসরে বৎসরে তাহাদের দেনা বাড়ে।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পর নিঃস্ব মজুরদের সংখ্যা হয় প্রায় ২৭ লক্ষ, নিঃস্ব চাষীর সংখ্যা হয় প্রায় ১৫ লক্ষ। নিঃস্ব কারিকরের সংখ্যাও হয় প্রায় ১৫ লক্ষ ও বেকার স্কুলশিক্ষকের সংখ্যা হয় প্রায় ২৫ হাজার (পিপলস্ রিলিফ্ কমিটির রিপোর্ট)। আবার ১৯৪৩ হইতে জন্মের অপেক্ষা মৃত্যুর হার এতো বাড়িয়াছে, যে ভয় হইতেছে বুঝি বাঙালী জাতি আর বেশিদিন বাঁচিবে না।

কাহার দোষে ইহা হইতেছে? সমস্বরে উত্তর আসিবে—ইংরাজসরকার বাহাদুর ও জমিদারগণের হৃদয়হীনতা ও কর্ত্তব্যের ত্রুটীতে। জমিদারী প্রথা রদ হইয়া গেলে এই অবস্থা একেবারে বদলাইয়া যাইবে। গত ১০ বৎসর অন্তর বাঙলায় যে দুর্ভিক্ষ হইতেছে তাহাও চিরদিনের মত বন্ধ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে এককোটি লোক অনাহারে মারা যায়। পঞ্চাশের মন্বন্তরেও ৩৫ লক্ষ লোক অন্নাভাবে মারা যায় ও ১৫ লক্ষ লোক সর্ব্বহারা হইয়াছে (ঐ বিবরণ)। ভারতে ইংরাজ আমলে না'কি বাইশবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছে (সরকারী রিপোর্ট মতে)। আবার এবারও দুর্ভিক্ষ হইবে খাদ্যমন্ত্রী বহুবার শুনাইয়াছেন। অথচ বাঙলায় দুর্ভিক্ষ হইবার কথা মোটেই নয়। ইহা আমরা হাতে কলমে দেখাইতেছি।

হিসাব মত বাঙলার চাহিদা বৎসরে ২৭ কোটি মণ চাউল। কিন্তু এখনও বাঙলায় গড়ে ২৩ কোটি মণ চাউল জন্মায় (ফেমিন কমিশন রিপোর্ট—১নং পুস্তকের এপেনডিক্স ২)। দেখা যাইতেছে এভাবে বৎসরে ৪ কোটি মণ চাউল কম হয়। বাঙলার দরিদ্র চাষীমজুর পেট ভরিয়া ভাত পায় না, ইহার দ্বারা তাহাই প্রমাণ হয়।

বাঙলার ধান বাড়ে নাই অথচ ১৯৪৩এর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লোক বাড়িয়াছে। না খাইয়াও লোক বাড়ে—এমন অদ্ভুত দেশ এই বাঙলা! ১৯১১-১৯২১

—এই দশ বৎসরে শতকরা লোক বাড়িয়াছে ৩ জন হিসাবে। ১৯২১-১৯৩১—এই দশ বৎসরে শতকরা ৭ জন হিসাবে এবং ১৯৩১-১৯৪১ এই দশ বৎসরে শত ২০ জন হিসাবে লোক বাড়িয়াছে (ঐ রিপোর্ট)।

বাঙলায় মোট ২ কোটি ৮৯ লক্ষ একার জমিতে চাষ আবাদ হইতেছে। আবাদ যোগ্য ৩৭ লক্ষ একার জমি পতিত আছে। গড়ে যদি (সরকারী হিসাবে) প্রতি একারে ১২ মণ ১৬ সের হিসাবে চাউল হয়, তবে এই ৩৭ লক্ষ একার পতিত জমিতে চাষ হইলে বৎসরে আরও ৪½ কোটী মণ বেশি চাউল উৎপন্ন করা চলে। ইহাতে আমাদের বৎসরে ঘাটতি পড়ে য ৪ কোটিমণ তাহা পুরণ করিয়াও অর্দ্ধকোটি মণ চাউল বাড়তি হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে পেট ভরিয়া বাঙালীর খাইতে পাইবার ফসলের ক্ষেত আছে, কিন্তু চাষ হয় না। কেন চাষ হয় না ?

বাঙলার জমিতে এখন আর ১২ মণ ১৬ সের হিসাবেও প্রতি একারে চাউল হয় না—হইতেছে শুধু ১০ মণ করিয়া (প্রাদেশিক ব্যাংকিং তদন্ত-কমিটীর রিপোর্ট)? অথচ পৃথিবীর অন্য সব দেশেই তিন গুণ বেশি ফসল হইতেছে!

ইহার উত্তর দিতে গেলে অনেক কথা মনে আসে। প্রথমতঃ সেচের অব্যবস্থা, শতকরা ৬·২ ভাগ চাষের জমিতে এখন সেচ আছে মাত্র। অথচ ভারতেরই যুক্তপ্রদেশে ৩৩·৭ ভাগে, মান্দ্রাজের ৩৩·৫ ভাগে ও পাঞ্জাবের ৪৪ ভাগে সেচ আছে। সেচের অভাবে বাঙলার কৃষির সর্ব্বনাশ হইতেছে। এই সেচ বৃদ্ধির কথা যে কিরূপ গুরুতর তাহা কাহাকে বুঝান যাইবে? জমিদারীপ্রথা বজায় থাকিতে ইহার প্রতিকার নাই। এই প্রথা বজায় থাকিলে চিরদিনই মাল-খাজনার দায়ে জমিদারের পেয়াদা সরকারী পুলিসকে আনিয়া, চাষীর যথাসর্ব্বস্ব ক্রোক করিতেই থাকিবে। অথচ দায়িত্বহীন জমিদার শহরে বসিয়া চিরদিন ফূর্ত্তি করিবেন। এদিকে ঋণ-ভারনত কঙ্কালসার চাষী হাল-গরু বেচিয়া নির্ব্বংশ হইয়া যাইবে। সেচ বা সারহীন জমি ক্রমে-ক্রমে একেবারে অনুর্ব্বর হইয়া যাইবে। বাঙলা ধ্বংস হইবে। আর এই প্রথার উচ্ছেদ হইলে—জমিদারীর মুনাফা এই ১০ কোটি টাকা দেশের বিশ্বস্ত প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা গঠিত সরকারের হাতে আসিবে। প্রতি বৎসর এই টাকা কৃষির উন্নতি ও বাঙলার উন্নতির জন্য ব্যয় হইবে। ট্রাকটরের দ্বারা চাষ হইবে। মজিয়া যাওয়া নদী সজলা হইবে। বাঁধ দিয়া বিলখাল বাঁধা হইবে। বন্যার জল বা লোনা-জল ঢুকিয়া ফসল নষ্ট হইবে না। নূতন নূতন সেচের ব্যবস্থা হইবে। ভাল বীজ সরবরাহ হইবে। ভালভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা হইবে। শিক্ষার প্রসার হইবে। রাস্তাঘাটের সুব্যবস্থা হইবে। প্রতি চাষী পরিবার পাইবে অন্ততঃ ৫ একার হারে মালিকানীস্বত্ববিশিষ্ট জমি। পতিত ৩৭ লক্ষ একার জমির দ্বারা ৭½ লক্ষ নূতন চাষী বাড়িবে।—বাঙলা হইবে সুজলা-সুফলা।—বাঙালী বাঁচিবে। এইভাবে ৩ কোটি ২৭ লক্ষ একার জমি চাষ হইলে বাঙালীর পর্য্যাপ্ত অন্নসংস্থান ছাড়া, মুগ কলাই আখ তুলা তামাক পাট লঙ্কা তিল সরিষা গম যব প্রভৃতি সবই অধিকভাবে উৎপন্ন হইবে, গরুর খাদ্যও বাড়িবে এবং গোচারণের মাঠও বাড়িবে।

তখন মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ পেট ভরিয়া খাইতে পাইবেন, ভালভাবে দেশের কাজ করিতে পারিবেন। কারণ সর্ব্বপ্রকার পরিবর্দ্ধন ও পর্য্য-বেক্ষণের কাজে তাঁহাদেরই সাহায্য প্রয়োজন হইবে। নূতন-নূতন রাস্তাঘাটের জন্য ওভারসিয়ার ইঞ্জিনিয়ার লাগিবে। কর আদায়ের জন্য ম্যানেজার তহশিলদার লাগিবে। সমবায় পদ্ধতিতে বাঙলার তাঁতশিল্প, রেশমশিল্প, শাঁখের ও বেতের এবং অন্যান্য কুটীর-শিল্প চালাইবার বিশেষজ্ঞ এবং হিসাব পরীক্ষক লাগিবে। কাগজশিল্প এবং কাঁচ, টিন কাঁসা-পিতলের বাসনশিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষজ্ঞ লাগিবে। স্বাস্থ্যো-ন্নতির জন্য ডাক্তার, কবিরাজ, শিক্ষাদি বিস্তারের জন্য কৃতবিদ্যলোক, দেশের গতপ্রায় ব্যায়াম চর্চ্চার জন্য বিশেষজ্ঞ যুবকদল—কত কাজে কত শত লোক যে লাগিবে তাহার ইয়ত্তা নাই। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজন হইবে। তাহাতে বিবাহ-সমস্যাও বিদূরিত হইবে। সবিস্তারে কত বলিব এসব কথা?

ইহার দ্বারা মুসলমান সম্প্রদায় ও তপশীলী সম্প্রদায়ের সঙ্গে বর্ণ-হিন্দুদের ক্রমবর্দ্ধমান আত্মকলহ বন্ধ হইয়া যাইবে। কারণ কলহের উৎপত্তি যে মনোবাদ হইতে, তাহা চিরতরে তিরোহিত হইবে। সমালোচনা করিলে দেখা যায় এই দুঃসহ মনঃক্ষোভ একটা কাল্পনিক অভিমানের ভাব হইতে আসিয়াছে। বর্ণহিন্দুরা খাইতে পায় ভাল, লেখা-পড়ায় ভাল, তাহারা অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করে মুসলমান ও তপশীলীদের—এই ধরণের মনোভাব হইতে। কিন্তু যখন ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে জমি-বণ্টন, শিক্ষাদান, চিকিৎসা ও সর্ব্ববিধ সুখসুবিধা সমভাবে বিতরিত হইবে—তখন আর কোন বিবাদ, কোন ঈর্ষা, কোন বৈষম্য থাকিবে না বাঙালীতে বাঙালীতে। সমাজপতিদের অদূরদর্শিতার ফলে, এতদিন তিলে-তিলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুতর প্রাচীর মাথা তুলিয়াছিল।···যাহা দুর্লঙ্ঘ্য করিয়া দিতেছিল বণিক শাসকগণ ভেদাভেদের দ্বারা—নিজেদের কায়েমী স্বার্থের বনিয়াদ পাকা করিয়া রাখিতে। এই সম্মিলিতপ্রাণ সন্তুষ্ট জাতি তখন দারুণ আক্রোশে সেই সব পোক্ত প্রাচীর হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া দিবে। সেদিন শুধু বাঙলার নয়—ভারতেরও একটা সুদিন। ভারতের কাছে বাঙলা দেখাইবে তার মিলনের আদর্শ। আমার মন যেন আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে সেই সুদিনের স্বপ্ন দেখিয়া। আজ আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি তাঁহাদের, যাঁহারা "মুক্তির পথে বাংলা"র শুভবার্ত্তা জানাইয়াছেন। বাঙলার নিগ্রহের শান্তিমন্ত্র উদ্গাতাদের আমি অভিনন্দিত করিতেছি।

নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের সর্ব্বত্র জয়ঘোষিত হইয়াছে। তাই মনে হইতেছে বাঙলার গ্রহশান্তির সুদিন অতি নিকটে আসিয়াছে।



কেদার-প্রসঙ্গ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালী কিছুদিন হইতে দেশের বরেণ্য সন্তানগণের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে অবহিত হইয়াছেন। ইহা শুভলক্ষণ এবং আত্মবিস্মৃত জাতির জাগরণের নিদর্শন। জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইহাতে আশার সঞ্চার হয়।

দক্ষিণেশ্বরে 'রামকৃষ্ণ পাঠগোষ্ঠীর' কর্মীবৃন্দ কয়েক বছর ধরে বর্ষীয়ান সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জয়ন্তী-উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন সন্দেহ নাই; তাঁহাদের এই প্রচেষ্টাকে আমি সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করিতেছি।

সাহিত্যেকের জীবন—বয়স সন তারিখ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে না; তাঁহার রচনা, তাঁহার কল্পনা, তাঁহার ভাবধারা তাঁহার জীবনকে অভিব্যক্ত করে, তাহাতেই সাহিত্যিকের সত্যকার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কোন কবিতায় বলিয়াছেন—'কবিরে পাবে-না খুঁজে তাহার জীবনে।'

কথাটা অতি সত্য হইলেও কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বন্ধে ইহার কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। যাঁহারা কেদারবাবুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারা স্বীকার না করিয়া পারিবেন না যে, জীবনের অভিজ্ঞতা যাহা কিছু তিনি সঞ্চয় করিতে পারিয়াছেন—সেগুলি সমস্তই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ও সহজসাধ্য এক অপূর্ব রসের সংস্পর্শে রূপায়িত হইয়া কথা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ এবং সাহিত্যরসিক সমাজকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে। জীবনে তিনি যাহা দেখিয়াছেন এবং যাহা সম্যকরূপে অনুভব করিয়াছেন, স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর কল্যাণের জন্য নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা সহকারে তাহাই তিনি সাহিত্য-ভাণ্ডারে দান করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন; যাহা তিনি দেখেন নাই—অন্তরে কখন অনুভব করেন নাই—সে সম্বন্ধে তাঁহার লেখনীও কোনদিন সাড়া দেয় নাই। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই—তাঁহার সাহিত্য-সাধনার উপাদান ও বিষয়-বস্তু বিস্তৃত ও ব্যাপক নয়; সুনির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে অবাস্তবের পথে তিনি তাঁহার কোন কল্পনাকে ছুটিবার সুযোগ দেন নাই। কেদারবাবুর রচনার বৈশিষ্ট্যই এইখানে।

রস-সাহিত্যিক বলিয়া কেদারবাবুকে সাহিত্য রসিক-সমাজ অভিহিত করিয়া থাকেন; যেহেতু—তাঁহার রচনা নির্ম্মল হাস্যরসের উৎস স্বরূপ। কিন্তু এই হাস্যরসের অন্তরালে জাতির ও সমাজের দৈন্য ও দুর্বলতার বেদনাদায়ক দিকটা রূপায়িত করিবার অসামান্য ক্ষমতাটিই তাঁহার রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ সম্বন্ধে তাঁর বিভিন্ন রচনা থেকে এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়—রাজনীতি ও সমাজনীতি সংশ্লিষ্ট জটিল সমস্যাও যাহাদের মধ্যে জড়িয়ে আছে। আমি শুধু একটিমাত্র পারিবারিক প্রসঙ্গই উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করিতেছি—যেটি একশ্রেণীর এঁচোড়েপাকা আত্মস্বার্থ ও সুবিধাবাদী বাড়ীর কর্ত্তারূপী কোন কোন স্বামীর আচরণের দর্পণ স্বরূপ যাঁহারা প্রচুর পণের সঙ্গে কোন ভদ্রকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সংসার ঘানিতে জুড়িয়া দিয়া পত্নীর সপ্ত পুরুষকে উদ্ধার করিয়াছেন ভাবিয়া গর্ববোধ করেন।...

"রাত সাড়ে এগারটা—পাড়া নিস্তব্ধ; বাড়ীর মধ্য থেকে স্পষ্ট শোনা গেল—প্রফুল্ল বলচে—চট্ ক'রে খানকতক কড়াইশুঁটির কচুরি আর পাঁচ কাপ চা বানিয়ে ফেল।

অপেক্ষাকৃত নীচু সুরে বলা হ'ল—আর তাওয়া-দার এক ছিলিম তামাক; বৈঠকখানার দোরগোড়ায় রেখে এলেই আমি নিয়ে-নেব'খন। এইটে আগে—বুঝলে।

ব'লে প্রফুল্ল বাইরের ঘরে তাসের আসরে এলেন। একটু পরেই ইশারা পেলেন। "ওঃ" ব'লেই প্রফুল্ল ভেতর দিকের দোরটা খুলে তাওয়া-দার গুড়ুকের সঙ্গে গড়গড়াটা আর পানের ডিপে, আসরে হাজির করে দিলে।

খুড়ো বললেন—ঝি মাগী এত রাত অব্ধি রয়েছেন না কি! আগে বলেছি—প্রফুল্লর সময় ভাল!

প্রফুল্ল—ঝি আবার কোথায় দেখলেন! সে-বেটি বেলাবেলি সন্ধ্যে জ্বেলেই—নিজের আলো নিবিয়ে দেয়!

খুড়ো,—তুমি ত বাবাজি বৈঠকে বসে;—তবে তামাক সাজলে কে?

প্রফুল্ল—কেন, আর কেউ সাজতে পারে না নাকি! সাধে বলেচি—খুড়োর মাথা খারাপ হ'তে আরম্ভ হয়েছে।

একটা বড় রকমের হাসি পড়ে গেল। তরঙ্গটা মিলিয়ে এলে, অবিনাশ বল্লে—কথাটা ভুলে গিছলুম, হ্যাঁহে প্রফুল্ল, তখন জিজ্ঞেস করলুম—এত রাত পর্য্যন্ত সদর দোরটা অমন খোলা রয়েছে, অথচ চারদিকে চোরের উপদ্রব চলেছে—শোননি কি? তুমি বললে—'শুনে ফল।' তার মানে কি?

প্রফুল্ল,—এমন কিছু নয়। একদিন রাত্রে বেড়িয়ে এসে ডাকলুম। দু মিনিট হয়ে গেল উত্তর নেই—দোর খোলাও নেই! রাত তখনো সাড়ে বারোটা হয়নি হে! রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে গেল। সজোরে একটা লাথী মারতেই খিলটা কোথায় ছটকে গেল!

খুড়ো—এক লাথিতে, অ্যাঁ? মায়ের দুধ খেয়েছিলে বটে? তার পর?

প্রফুল্ল,—দেখি, লাঠান্ নিয়ে ছুটে আসচেন! খুকিটে চিল চেঁচাচ্ছে,—বরদাস্ত করতে পারলুম না,—লাঠানটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম।

খুড়ো—আমিও ঠিক তাই ভাবছিলুম,—ও সময়ে ও-ছাড়া আর কিছু আসতেই পারে না,—fit ও করে না। আমি নিজে না পারলেও,

তোমাকে দুষ্‌তে পারি না! দাব্‌ থাকা চাই বই কি! তা নয় ত' স্ত্রী পুরুষে প্রভেদ থাকে কোথায়?

প্রফুল্ল—শুনুন, তারপর সাড়ে তিন মাস হয়ে গেল, আজো দোরের খিলটে হ'ল না! সেটাও কি…

খুড়ো—তাইত, অবাক করলে যে বাবাজি! তুমিই ভাঙবে আবার সারাতেও হবে তোমাকেই। তা'হলে ত যার অসুখ তাকেই ডাক্তার ডাকতে—তাকেই ওষুধ আনতে যেতে হয়! এ ত সংসার নয়, এ যে শাঁখের করাত! তোমার ত তাহলে বাঁচোয়া নেই দেখচি।

অবিনাশ—জানোনা—ও জাতই ঐ রকম।

প্রফুল্ল বললে—অদেষ্ট খুড়ো—অদেষ্ট; টাকা রোজগারও করব, আবার ছুতোর খুঁজতেও ছুটবো!

প্রসঙ্গটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও সংলাপ হইতে একটু চেষ্টা করিলেই আমরা অনেক বাস্তব প্রফুল্লকে দেখতে পাইব সন্দেহ নাই।

সাহিত্যক্ষেত্রে কেদারবাবুর রহস্যময় প্রকাশ এবং সাহিত্য রচনা-সূত্রে তাঁহার সহিত আমাদের যে পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছিল, আমাদের স্মৃতিপথে তাহা এখনও যেন জ্বল্‌ জ্বল্‌ করিতেছে। সেই কৌতুকাবহ কাহিনীটি সংক্ষেপে এক্ষেত্রে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে করি না।

সে প্রায় আড়াই যুগ আগেকার কথা সালটা ১৩২৬এর শেষাশেষি। স্থানটি মুক্তিতীর্থ বারাণসী। তখন কাশীতে বাঙ্গালীর সংস্থা বা সাহিত্য সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান বলিতে কতিপয় নাট্য-সমাজকেই বুঝাইত। 'বান্ধব' 'মিত্র' 'হরিহর' এই তিনটি সমিতিই সে সময় কাশীবাসী বাঙ্গালীর আদরের আলোকে প্রতিষ্ঠার পথ করিয়া লইয়া জাতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি কোন রকমে বজায় রাখিয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি শাখা তথায় স্থায়ী থাকিলেও দলাদলির ব্যাপারে শুখাইয়া পড়ে। অতিমাত্রায় রক্ষণশীল কতিপয় প্রাচীনপন্থী এমনভাবে তাহার জীর্ণ দরজাটি চাপিয়া বসিয়াছিল যে, নব্যপন্থীদের সেখানে প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না। না আসিত নূতন যুগের কোন বই, না হইত সাধারণ জনগণকে লইয়া কোন সভা বা আলোচনা। শেষে দরজাটি আপ্‌না আপ্‌নাই বন্ধ হইয়া গেল।

মুক্তিতীর্থে বাস করিলেও নব্যদল কিন্তু ভোগ মুক্ত হইয়া বর্তমানকে ভুলিতে পারেন নাই; সাহিত্য-চর্চার প্রেরণা তাহাদিগকে তাতাইতেছিল। সেই সূত্রে ক্ষেত্রও অন্তের অলক্ষ্যে প্রস্তুত হইতেছিল। বর্তমানের সুপরিচিত কর্মী সাহিত্যিক শ্রীমান সুরেশ চক্রবর্তী তখন অতি তরুণের দলে। সেই বয়সেই হাতে লেখা এক মাসিক পত্র অবলম্বন করিয়া সে সাহিত্য সাধকের সন্ধানে কাশী তোলপাড় করিতেছিল। রাজার আইনের দিক দিয়া সুরেশ তখন সাবালক হইয়াছে; কিন্তু সাধারণের মাপ কাটিতে তখনও সে নাবালক; তথাপি সেই কিশোর বয়সেই কাশীর বিস্তীর্ণ বাঙ্গালী-সমাজে সুরেশ সুপরিচিত; শুধু সুপরিচিত বলিলেই তাহার



১৯২৭ বঙ্গাব্দে কাশীধামে বিশ্বনাথ পাঠাগারের বাসন্তী উৎসবে কেদারনাথ

বামদিক হইতে—(১ম [illegible] কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(২য় সারি) উত্তরা-সম্পাদক [illegible] চক্রবর্তী ও প্রবন্ধ-লেখক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্বন্ধে কথাটি [illegible]ক খুলিয়া বলা হইবে না, বরং এটুকু বলিলেই উপল করা যাইবে যে—[illegible] কোন উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালী সে সময় কাশী ছিলেন কিনা জানি না, যাঁহার গৃহদ্বার সুরেশের নিকট আবৃত (বাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক গৃহস্বামীকে পাকড়াও করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত! তা তিনি যত বড় নামী বা প্রতিপত্তিশালী রাসভ মানুষ হউন না কেন!

সাহিত্যের তপোবন হইতে বিদায় লইয়া আমরা তখন বাণিজে উপবনে প্রবেশ করিয়াছি—লক্ষ্মীর সাধনায়। সেই সময় তার্ রকমের যে সকল লক্ষ্মীর বরপুত্রদের সহিত সর্বক্ষণ মেলামেশা হ

তাঁহারা পণ্য হইতে রৌপ্য-রস আহরণ করিয়া তহবিল ভারী করিতেই পটু। সাহিত্য-রস তাঁহাদের নিকট ঔষধবিশেষের মতই কটু। বলা বাহুল্য, এমন পরিবেশ যেখানে, মাতৃভাষা পর্য্যন্ত সেখানে সদাগরী ভাষার চাপে শুখাইয়া পড়িবার কথা; কিন্তু সেটা হইতে পারে নাই শ্রীমান সুরেশের কল্যাণেই। সাহিত্যের নেশা কাটাইলেও সুরেশের প্রভাব কাটাইতে পারি নাই। নিবিষ্ট মনে কাজ করিতেছি, ঝড়ের মত সহসা সুরেশ আসিয়া উপস্থিত, হাতে তাহার হাতে লেখা মাসিক, নয় ত লাইব্রেরীর খাতা।

আপনারা হয়ত ভাবিতেছেন, আমরা কেদারবাবুর কথা শুরু করিয়া সুরেশের কথা অযথা আনিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু কেদারবাবুর কথা—তথা, তাঁহার সাহিত্য-জীবনের প্রকাশ-কাহিনী-সম্পর্কে ইহাও প্রাসঙ্গিক। সুরেশের কথা না বলিয়া কেদারবাবুর কথা বলিবার উপায় নাই।

সাহিত্য-পরিষদ-শাখার দরজা বন্ধ হওয়ায় সুরেশই উদ্যোগী হইয়া বিশ্বনাথ লাইব্রেরীর দরজা খুলিয়া বসিয়াছিল। সুরেশ সেক্রেটারী, আমরা ছিলাম প্রেসিডেণ্ট। জঙ্গমবাড়ীর বড় রাস্তায় বাঙ্গালীটোলা ডাকঘরের সম্মুখে সে লাইব্রেরী অনেকেই দেখিয়াছেন। পরে অনেক সাহিত্যরথী তাহার বাসন্তী উৎসবে সেখানে পদধূলিও দিয়াছেন।

এই লাইব্রেরী হইতেই সুরেশের মাসিক বাহির হইত। হাতের লেখা মাসিক পত্রিকাখানাকে গল্পে, প্রবন্ধে, অতিশয় সুখপাঠ্য করিয়া বাহির করিতে সুরেশের উদ্যম ও নৈপুণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতাম। যাঁহাদের লিখিবার সখ আছে, তাঁহারা সাগ্রহে সুরেশকে লেখা দেন। যাঁহাদের সখ নাই অথচ শক্তি আছে, সুরেশ তাঁহাদের কাছে ধর্ণা দিয়া লেখা আদায় করে—কাহারও অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই।

এইভাবে লেখা খুঁজিতে খুঁজিতে সুরেশ হঠাৎ একদিন কেদারবাবুকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। রামাপুরার রাস্তায় 'দেবকী নন্দন হাবেলী'র সান্নিধ্যে ছোট একখানি দোতলা বাড়ী ভাড়া লইয়া কেদারবাবু তখন সস্ত্রীক কাশীবাস করিতেছিলেন। পাছে শান্তি ভঙ্গ হয়, বা কথা প্রসঙ্গে কোন ফ্যাসাদে পড়িতে হয়—এই আশঙ্কায় সকলের সহিত মিশিতে চাহিতেন না। অবাধ মেলামেশাটা তখন কাশীর ন্যায় আনন্দ-কাননেও আনন্দদায়ক বা নিরাপদ ছিল না। ভদ্রবেশী গোয়েন্দারা নানা ছলে আলাপ জমাইয়া নিরীহ সমাজকে ত্রস্ত করিয়া তুলিত। সুতরাং কেদারবাবু প্রায় সর্বক্ষণই বাড়ীর গণ্ডীবদ্ধ হইয়াই থাকিতেন। যে অনাবিল রসসাহিত্যের ধারায় রসিক-সমাজ বিমোহিত, তাহা তখনও সম্যক উপচিত হয় নাই, কাশীর বাঙ্গালী-সমাজও জানিতে পারেন নাই যে, এক অফুরন্ত প্রাণবন্ত রসের উৎস, তাঁহাদের সান্নিধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। অদ্ভুত এই মানুষটি! নাম প্রচারে স্পৃহা নাই, যশের জন্য চিত্ত নিরুদ্বেগ। পেনসনের কটিকয়েক টাকার উপর নির্ভর করিয়া কাশীবাস করেন এবং নিজের চিত্তবিনোদনের জন্য Recreation হিসাবে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে কিছু কিছু লিখিয়া থাকেন—তাহাও সংগোপনে। এমন কি, বিখ্যাত 'কাশীর কিঞ্চিৎ' নামক গ্রন্থের সরস কবিতাগুলি যখন অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং গ্রন্থে প্রকৃত প্রণেতার নাম না থাকায় জনসাধারণ নাট্যাচার্য রসরাজ অমৃতলাল বসুকেই তাহার রচয়িতা সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছিল—তখনও আসল গ্রন্থকার ধরা দেন নাই। যাঁহারা উক্ত রস-কবিতাগুলির রস আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারা ভাল করিয়াই জানেন, সেগুলি রস-সাহিত্যে কি অপূর্ব্ব রসই পরিবেশন করিয়াছে। অথচ সে সময় পর্য্যন্ত কাশীর বাঙ্গালী-সমাজ জানিবার অবকাশ পান নাই যে 'কাশীর কিঞ্চিৎ'এর রচয়িতা ৺নন্দী শর্মা ওরফে শ্রীযুত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

একদিন সুরেশ সবেগে আসিয়া কহিল—'দাদা মস্ত এক লোককে ধরে ফেলেছি, আপনাদেরই দেশের লোক।' দক্ষিণেশ্বরের সন্নিহিত আরিয়াদহ গ্রামের সঙ্গে আমার সংস্রব ও ঘনিষ্ঠতা সুরেশের অবিদিত ছিল না। আরিয়াদহের সংস্রবেই নামটি শুনিয়াছিলাম, চেনা-শুনা অবশ্য ছিল না, তখনও তিনি 'সবচিন্' নহেন। শুনিয়াছিলাম—এই অঞ্চলের দুই কৃতবিদ্য সুসন্তান অকালে সরকারী কাজ হইতে অবসর লইয়া কাশীবাস করিতেছেন। একজন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যজন দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। একজন আশৈশব সাহিত্যরসিক, অন্যজন নবীন যৌবনেই বৈরাগ্য পথের পথিক।

যাহা হউক ইহার পর আর কেদারবাবুর গুপ্ত থাকা সম্ভব হইল না। বাঙ্গলার এই গুপ্ত রত্নটিকে বাহির করিয়া কাশীবাসী বাঙ্গালীদের চোখের উপর ধরিতে তখন আমাদের আগ্রহ ও উৎসাহ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। সুরেশের মুখে কথার খই ফুটে, আর আমরা পাবলিশিটি লইয়া থাকি, কলমের কায়দায় প্রাণহীন বস্তুকেও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে হয়। সুতরাং কাশীর লোক অবিলম্বেই কেদারবাবুকে চিনিল এবং অবাক হইয়া শুনিল, ৺নন্দী শর্মা অমৃতবাবুও নয়, ললিত বাঁড়ুয্যেও নয়, তিনি সশরীরে 'বর্ণচোরা আমটির মত' কাশীতেই বিরাজমান। তখন কেদার-বাবুর সহিত আলাপ করিবার কি আগ্রহ তাঁহাদের।

কেদারবাবুকে পাইয়া বীণাপাণি প্রতিষ্ঠানের বৈঠক গুলজার হইয়া উঠিল। তাঁহার কলম যেমন রস সৃষ্টি করে, মুখ দিয়াও তেমনই মধু ঝরে। বালকবালিকারা আর উপরে থাকিতে চায় না, নিচে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে দাদু সম্পর্ক পাতাইয়াছে। অজাত শত্রু, মুখে হাসিটি লাগিয়া আছে, যেন আনন্দের জীবন্ত উৎস, অতি বড় অনিষ্টকারীর প্রতিও দ্বেষ কোনদিন দেখি নাই, কাহারও কুৎসা উঠিলে চোখদুটি মুদিত করেন। মুখখানি মুষড়াইয়া পড়ে অমনি। অথচ মুখের সরস বাণী তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যটুকু যেন চোখে আঙুল দিয়া মানুষটিকে চিনাইয়া দেয়। কথায় কথায় একদিন জানিতে পারিলাম, কোন বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় একটি ছোট গল্প লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু 'অচল' মন্তব্য লইয়া সেটি ফেরৎ আসে। তাহার পর লেখা আর কোন কাগজে পাঠান নাই।

আমাদের আগ্রহাতিশয্যে একদিন সেই অচল লেখাটি পড়িয়া শুনাইলেন। গল্পটির নাম 'কালী ঘরামী।' গল্পের বিষয়বস্তু আমাদিগকে সত্যই অভিভূত করে। বুঝিতে বিলম্ব হইল না, আবাল্যের পরিচিত জন্মভূমি দক্ষিণেশ্বর পল্লীর একটি বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিয়া তিনি সেকালের পল্লী-জীবনের সহিত কর্মসূত্রে সংশ্লিষ্ট অনুন্নতশ্রেণীর এক

শ্রমজীবী তরুণের সহানুভূতি ও সমবেদনাশীল অন্তরের উজ্জ্বল অংশ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই সঙ্গে পল্লী মাতব্বরদের স্বেচ্ছাচারপ্রসূত তমসাচ্ছন্ন আর একটা দিকও উদ্ঘাটিত করিতে সঙ্কুচিত হন নাই।

কেদারবাবুকে পাইয়া হাতের লেখা কাগজে আর সুরেশের মন নিবিষ্ট হইতে ছিল না। আমাদেরও মনে একটা জিদ আসিল—যেমন করিয়া হউক এই গল্পকে ছাপার অক্ষরে রূপায়িত করা চাই-ই। ইহার ফলেই কাশীধামে ছাপা মাসিক পত্রের প্রথম প্রকাশ সম্ভব হইয়া উঠে। কেদারবাবু নিজেই কাগজখানির নামকরণ করিলেন—'প্রবাস-জ্যোতি'। আমরা তাহার প্রবর্ত্তক এবং প্রকাশক হইলেও তিনিই তাহার সম্পাদক ও প্রধান লেখকের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন, সুরেশ হইল তাঁহার সহকারী।

১৩২৬ সালের আশ্বিন মাসে 'প্রবাস জ্যোতি' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে এবং সেই 'অচল' লেখা 'কালী ঘরামী' গল্পটি তাহার অঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়া সাহিত্যের দরবারে উচ্চপ্রশংসিত হয়। পরে কেদারবাবুর অধিকাংশ ছোট গল্প, রস-কবিতা এবং চীন ভ্রমণ প্রভৃতি 'প্রবাস-জ্যোতি'তে প্রকাশিত হইয়া সাহিত্য-রসিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। কাশীবাসীর সৌভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময় কাশীধামে হয় মরমী ও দরদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। শরৎ-কেদার সংযোগে মুক্তিক্ষেত্রে যে রসধারা উপচাইয়া উঠে, সেদিনের রসলিপ্সু সুধীবৃন্দের অন্তরে তাহার স্মৃতি এখনো পুলকের শিহরণ জাগায়।* কবি অতুলচন্দ্র ছিলেন 'প্রবাস-জ্যোতি'র অন্যতম শুভানুধ্যায়ী লেখক। তাঁহার প্রসিদ্ধ গান 'আমার বঙ্গভাষা' 'প্রবাস-জ্যোতি'র প্রথম সংখ্যা অলংকৃত করে। কেদারনাথের রচনা তাঁহাকে মুগ্ধ করে এবং রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্ণৌএ তাঁহার আলয়ে আসিয়া কেদারনাথের রস-রচনায় প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য উদগ্রীব হন। অতুলপ্রসাদ সুরেশকে তার করেন—কবি কেদারবাবুর সঙ্গে আলাপ করিতে ইচ্ছুক। ইহার ফলে লক্ষ্ণৌ সহরে অতুলপ্রসাদের আলয়ে রবীন্দ্রনাথের সহিত কেদারনাথের হয় প্রথম সাক্ষাৎ ও শুভ সংযোগ।

সাহিত্যাকাশে কেদারবাবুর প্রকাশের ইহাই সুপরিচিত কাহিনী ও ইতিহাস। সেই সূত্রে 'কালী ঘরামী' তাঁহার রচিত ছাপার অক্ষরে প্রথম ছোট গল্প বলিয়া দাবী করিতে পারে।

---

* ভারতবর্ষ পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে সে কাহিনী 'কাশীধামে শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে।

[illegible]য় পর্ব

নাটিকা

শ্রীজয়ন্তকুমার চৌধুরী

চতুর্থ দৃশ্য

জ্ঞানাঞ্জন সান্যালের বাইরের ঘর

আগন্তুক। নিন, আর দেরি করবেন না, আমার আবার আপিস্ আছে। আপনাদের মতন ত আর কবিতা লিখে পেট ভরে না। দস্তুর মত খেটে পয়সা রোজগার করতে হয়।

জ্ঞানাঞ্জন। তা তো বটেই। অনেকটা দূর যেতেও হবে—সেই লালবাজারের মোড়!

আগন্তুক। আমার কর্ম্মস্থল আপনি কি করে জানলেন।

জ্ঞানাঞ্জন। আজ্ঞে জানি বৈকি!

আগন্তুক। যাক্, জানুন তাতে ক্ষতি নেই, এখন ঝট্‌পট্ লিখে ফেলুন দেখি যা বলি।

জ্ঞানাঞ্জন। আজ্ঞে, একটা কথা বলছিলুম। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে…

আগন্তুক। কি বলবার আছে চট্ করে বলে ফেলুন মশাই; দেরী করবেন না কিন্তু।

জ্ঞানাঞ্জন। বলছিলুম কি, দু-চারজন সাক্ষী না রেখে কোন কিছু [illegible]

আগন্তুক। [illegible] সাক্ষী রেখে কবিতা লেখা? আপনি অবাক করলেন যে মশাই।

জ্ঞানাঞ্জন। আজ্ঞে, কবিতা লেখা, আর পুলিসের কাছে কবুল হয়ে কিছু লিখে দেওয়াটা ঠিক এক জিনিষ হোলো কি?

আগন্তুক। পুলিস! পুলিস আপনি পেলেন কোথায়?

জ্ঞানাঞ্জন। আজ্ঞে ছদ্মবেশে এলেও…

আগন্তুক। ছদ্মবেশে! আপনার কথা ত কিছুই বুঝতে পারছি না। ব্যাপারখানা কি খুলে বলুন ত!

জ্ঞানাঞ্জন। আপনি লালবাজার-থানা থেকে আসছেন ত?

আগন্তুক। লালবাজার-থানা! লালবাজার-থানা থেকে আসতে যাবো কেন?

জ্ঞানাঞ্জন। এই ত কিছুক্ষণ আগে স্বীকার করলেন স্যার।

আগন্তুক। কখন স্বীকার করলুম মশাই?

জ্ঞানাঞ্জন। কিছু মনে করবেন না স্যার; একটু আগেই স্বীকার করলেন, লালবাজারে আপনার কর্ম্মস্থল।

আগন্তুক। আহা তা স্বীকার করবো না কেন; সত্যিই ত' লালবাজারে আমার আপিস, কিন্তু তা বলে লালবাজার-থানা আমার কর্ম্মস্থল হতে যাবে কেন শুনি? আপনি কি বলিতে চান লালবাজার অঞ্চলে যত আপিস আছে সব লালবাজার-থানার ব্র্যাঞ্চ আপিস্?

জ্ঞানাঞ্জন। আপনি তা হলে?

আগন্তুক। আমি কাজ করি রাইটার্স বিল্ডিংএ।

জ্ঞানাঞ্জন। তা হলে আমার কাছে?

আগন্তুক। আপনার কাছে এসেছি কবিতা লেখাতে। বিয়ের কবিতা।

জ্ঞানাঞ্জন। সত্যি বলছেন স্যার?

আগন্তুক। সত্যি নয় ত কি মিথ্যে বলছি! কি আপদেই পড়া গেছে!

জ্ঞানাঞ্জন। আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দোবো দাদা। আপনি আমাকে···ওরে গদাই, তোর গিন্নীমাকে বলগে যা শীগ্‌গির এক কাপ গরম চা···

আগন্তুক। কিছু দরকার নেই, আপনি এখন কবিতা লিখতে বসুন দেখি।

জ্ঞানাঞ্জন। আজ্ঞে, ভেতর থেকে একবার···দেরী করবো না, যাবো আর আসবো।

আগন্তুক। কি আপদ। ভেতরে আপনার কি আছে বলুন ত?

জ্ঞানাঞ্জন। আজ্ঞে, ঐ গিন্নীকে···

আগন্তুক। গিন্নী তো সকলেরই আছে মশাই, কিন্তু ঘণ্টায় চারবার করে বাড়ীর ভেতর গিয়ে হাজরে দিয়ে আসতে হবে, এমন কড়ার করে কাউকে ত কখনো গিন্নী ঘরে আনতে শুনি নি।

জ্ঞানাঞ্জন। আজ্ঞে, যাবো আর আসবো।

আগন্তুক। যাক্, কি আর বলবো, হাজরে দিয়ে আসুন তবে। দেরী করবেন না কিন্তু।

জ্ঞানাঞ্জন: আজ্ঞে না, এখুনি আসছি। প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

জ্ঞানাঞ্জনবাবুর অন্দরমহল

কাত্যায়নী। কি গো খবর কি?

জ্ঞানাঞ্জন। খবর খুব ভালো। তুমি ঝট্ করে এক কাপ গরম চা বানিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দাও দেখি।

কাত্যায়নী। সব কথা খুলেই বল না ছাই।

জ্ঞানাঞ্জন। বলছি গো বলছি। অত ব্যস্ত হবার কি আছে?

কাত্যায়নী। আসল কথা, লোকটা পুলিস নয়, এই তো? সে তো আমি আগেই বলেছিলুম।

জ্ঞানাঞ্জন। পুলিস নয় কি রকম, একবারে খাস্ সি-আই-ডি পুলিস। অন্য কারুর বাড়ী হলে এতক্ষণে···নেহাত পরিচয় বেরিয়ে পড়লো তাই, নইলে···

কাত্যায়নী। কি পরিচয় বেরুলো শুনি? ভগ্নীপতি নাকি?

জ্ঞানাঞ্জন। কি যে ঠাট্টা কর তার ঠিক নেই। তোমরাই কেবল মান না। নৈলে বাইরে কবি হিসেবে আমার নামটা ত আর বড় কম নয়।—দিলুম নিজের পরিচয়। বাস্ একেবারে জল! বল্লে—আপনিই কবিবর অমুক চন্দ্র অমুক!—আগে বলতে হয় মশাই!—আপনার যে আমি একজন পরম ভক্ত-পাঠক। কিছু মনে করবেন না! না জেনে অনেক অপরাধ করে ফেলেছি। বল্লুম—না না কিছুই মনে করিনি, আপনি ব্যস্ত হবেন না। হাজার হোক পুলিসের লোক, একটু হাতে রাখা দরকার। কখন কি কাজে লেগে যায়!—তাই বলছিলুম—এক কাপ চা বানিয়ে ঝট করে বাইরে পাঠিয়ে দাও দেখি।

পিসিমা। সাধে বলি বৌমা, গেনুকে আমাদের যা-তা ভেবো না। কত বড় কবি ও। তোমার ভাগ্যি যে অমন সোয়ামী পেয়েছ।

জ্ঞানাঞ্জন। আবার বলে কি জান? বলে, আলাপ হোলো যখন আপনার সঙ্গে, তখন আপনাকে ত সহজে ছাড়ছি না। শিগ্‌গীরই আমার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, আপনাকে ভাল দেখে একটি কবিতা লিখে দিতে হবে। বল্লুম, বেশ তো, এ আর এমন শক্ত কাজটা কি! পুলিসের লোক, হাতে রাখা ভালো,—কি বল? যাক্ তুমি এখন এক কাপ গরম চা বাইরে পাঠিয়ে দাও দেখি। আমি চল্লুম!

প্রস্থান

জ্ঞানাঞ্জনবাবুর বাইরের ঘর

আগন্তুক। যাক্! আপনার বাড়ীর ভেতরের কাজ চুকেচে ত! এইবার আমার কাজটা চুকিয়ে দিন দেখি। এখুনি কবিতা লিখে ফেলতে হবে কিন্তু। এখন হোলো গিয়ে আপনার···ঐ তো দেয়ালেই ঘড়ি রয়েছে। এইতো সবে সাতটা পঁইত্রিশ।—যথেষ্ট সময় রয়েছে। আট্‌টার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে নিশ্চয়ই।

জ্ঞানাঞ্জন। বলেন কি মশাই!

আগন্তুক। ঐ তো আপনাদের রোগ। সাধে বলি কবিদের মতন এমন অপদার্থ জীব আর দুটি নেই। কাল রাত্তিরে গেলুম, ঐ যে কি নামটা—আহা মনেও যে ছাই আসে না। পেছনে আবার একটা কবিকেশরী না ঐ ধাঁচের কি একটা টাইটেল আছে। নামটা ঠিক মনে পড়ছে না যে ছাই। কি মিত্তির যে গো।

জ্ঞানাঞ্জন। সুহাস মিত্তির?

আগন্তুক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সুহাস মিত্তির, সুহাস মিত্তির! বল্লুম, সময় নেই—পরশুদিন মেয়ের বিয়ে। ঝাঁ করে আধঘণ্টার মধ্যে একটা কবিতা লিখে দিন দেখি! বল্লে কি জানেন? বল্লে—আধঘণ্টার মধ্যে কি কখন কবিতা হয় মশাই! বল্লুম—কেন হয় না শুনি? বল্লে—অত শত জবাবদিহি করবার আমার সময় নেই। বল্লুম—কতদিন কবিতা লিখছেন? বল্লে—তা প্রায় কুড়ি বছর হোলো। বল্লুম—এখনো কবিতা লিখতে দেরি হয়? বল্লে—তা হয় বৈ কি! বল্লুম, তার মানে এখনো

় হয় নি বলুন। আরে মশাই, আমরা যখন প্রথম কেরাণীগিরি ়তে ঢুকি, তখন রূপি-আনা-পাইয়ের একটা ছোটোখাটো যোগ কসতে ।-বারো মিনিট কেটে যেতো। তারপর এক বছর পরে দেখি, তার ়ে বড় বড় যোগ তিন-চার মিনিটের মধ্যেই দিব্যি কসে ফেলছি। চ বছর পরে দেখি, ইয়া লম্বা লম্বা যোগ দু-তিন মিনিটেই মেরে ়েছি। এখন, শুনলে বিশ্বাস করবেন না, তিন-চার পাতা লম্বা যোগ ক্ষর নিমেষে টোট্যাল দিয়ে ফেলি। এখন কি আর গুণে গুণে যোগ সতে হয়? এখন স্রেফ্‌ কেবল ফিগারগুলোর ওপর দিয়ে আঙুল লিয়ে যাই, আর অঙ্ক কসা হয়ে যায়। কি করে পারি বলুন ত? স্রেফ্‌ ্যাক্‌টিস বৈ ত নয়। আপনারাই বা পারবেন না কেন? কুড়ি বছর ্যাক্‌টিস করার পরও যদি কবিতা লিখতে দেরি হয়, তাহলে বলতে হবে, াপনাদের মতন অপদার্থ আর দুটি নেই। কেমন, ঠিক বলছি কি না াপনিই বলুন?

জ্ঞানাঞ্জন। না ঠিকই বলেছেন আপনি। তা কবিতাটা লিখছে ক বলুন ত?

আগন্তুক। কে আবার লিখবে? আপনি লিখবেন।

জ্ঞানাঞ্জন। না না, সে কথা বলছি না। বলছি কার নাম দিয়ে কবিতাটা লেখা হবে?

আগন্তুক। ও, তাই বলুন। কবিতা লিখছে মেয়ের মা, অর্থাৎ কিনা আমার স্ত্রী।

জ্ঞানাঞ্জন। বেশ, বেশ, আপনার কবিতা এখুনি পাবেন। আমি কিন্তু একবার ভেতর থেকে......

আগন্তুক। আবার ভেতর? দেখুন, আপনার ভেতরটিকে বরং বাইরে নিয়ে এসে সুমুখে বসিয়ে দিন। নইলে ভেতর-বার করতে করতেই আপনার দম্‌ ফুরিয়ে যাবে। তা সে যা খুসী হয় করুন, আমার কবিতা কিন্তু পনের মিনিটের মধ্যে চাই।

জ্ঞানাঞ্জন। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—সেই জন্যেই ত একবার ভেতরে যেতে চাই। আপনি বসুন। আমি এখুনি আপনার কবিতা লিখে এনে দিচ্ছি।

আগন্তুক। আপনি ফাউন্টেন পেন নিয়ে চল্লেন যে? কবিতাও তাহলে ভেতর থেকে আসবে বসুন? ভালো, ভালো;—আমার পক্ষে অবশ্য দুই-ই সমান। ভেতর থেকেই আসুক, আর বাইরে থেকেই আসুক ও একই হোলো।

জ্ঞানাঞ্জন। আমি এখুনি আসছি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

জ্ঞানাঞ্জনবাবুর অন্দরমহল

জ্ঞানাঞ্জন। বলি, গেলে কোথায় তোমরা?

কাত্যায়নী। চা তৈরী করছি।

জ্ঞানাঞ্জন। চা পরে হলেও চলবে। তার আগে আমার একটা কাজ কর দেখি।

কাত্যায়নী। কি কাজ আবার?

জ্ঞানাঞ্জন। তোমার দাদার মেয়ে পটলীর বিয়েতে যে কবিতাটা লিখে দিয়েছিলুম, তার ছাপা কপি তোমার কাছে দু-চারখানা আছে ত? ঝট্‌ করে একখানা বের করে দাও দেখি।

কাত্যায়নী। কেন কি হবে?

জ্ঞানাঞ্জন। পরে শুনবে। এখন বার করে দাও দেখি ঝট্‌পট।

কাত্যায়নী। দিচ্ছি, দাঁড়াও একটু।

জ্ঞানাঞ্জন। আমি বরং তোমার চা দেখছি, তুমি ঝাঁ করে কবিতাটা বার করে ফেল, লক্ষ্মীটি!

কাত্যায়নী। যাচ্ছি বাপু যাচ্ছি? সব তাতেই তাড়াতাড়ি।

প্রস্থান

জ্ঞানাঞ্জন। যাক্‌ বাবা বাঁচা গেল। যা ভয়টা হয়েছিল। কবিতা লেখা ত সহজ কাজ, এখন যদি কেউ একঘণ্টা ধরে ওট-বোস করতে বলে তাতেও রাজি আছি। তাও আবার কবিতা লিখতেও হচ্ছে না, কেবল টুকে দিলেই হোলো। ভাগ্যিস পটলীর বিয়ের কবিতাটা রাখা হয়েছিল। পটলীর মার নামে কবিতা, কাজেই দিব্যি মিলে যাবে।

অষ্টম দৃশ্য

জ্ঞানাঞ্জনবাবুর বাইরের ঘর

জ্ঞানাঞ্জন। এই নিন্‌ আপনার কবিতা।

আগন্তুক। অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। এই ... চাই। নাঃ আপনি যথার্থ-ই কবি বটে। আর ...ে কি নামটা ছাই, যার কাছে কাল রাত্তিরে গেছলুম, ঐ যে নামটা বল্লেন...

জ্ঞানাঞ্জন। সুহাস মিত্তির।

আগন্তুক। হ্যাঁ হ্যাঁ সুহাস মিত্তির; সুহাস মিত্তির—ও আবার একটা কবি নাকি মশাই!—ঘোঁড়ার ডিমের কবি। ছেলেবেলা থেকে কবিতা লিখছিস্‌, আজও হাত পাকলো না? বিশ বছর আগেও একটা কবিতা লিখতে যে তিন ঘণ্টা লাগতো, আজও যদি সেই তিন ঘণ্টাই লাগে তবে এই কুড়িটা বছর কি ঘাস্‌ কেটেছিলি? আপনিই বলুন মশাই! লিখিস ত বাবা কবিতা। যার কোন মূল্যই নেই। এক বিয়ের সময় যা একটু কাজে লাগে। তাও যদি তিন ঘণ্টা লাগাস্‌, তাহলে লোকে তোদের গায়ে থুতু দেবে না ত করবে কি বলুন ত? এই তো আপনিও একজন কবি। কতক্ষণ লাগলো কবিতা লিখতে? প্র্যাক্‌টিসের একটা ফল আছে বৈ কি! নইলে যে যোগটা কসতে একদিন আধঘণ্টা লেগে যেতো, আজ সেটা তিন মিনিটে কসে ফেলছি কি করে? কবিতা লেখাও ঠিক তাই। ছেলেবেলায় যে কবিতা লিখতে আপনার তিন ঘণ্টা লাগতো, আজ সেটা লিখতে আপনার লাগবে বড় জোর দশ মিনিট। এইটেই ত স্বাভাবিক। যত প্র্যাক্‌টিস্‌

করবেন ততই স্পিড্ যাবে বেড়ে। জানি না রবিঠাকুরের কি রকম স্পিড্ ছিল! আমার ত বিশ্বাস আপনাদের যে কবিতা লিখতে পাঁচ ঘণ্টা লাগে, তাঁর কাছে সেটা ছিল পাঁচ মিনিটের মামলা। কেমন ঠিক কি না? নৈলে তিনিই বা নোবেল প্রাইজ পেলেন কেন, আর আপনারাই বা ভ্যারেণ্ডা ভাজছেন কেন? তফাত নিশ্চয়ই আছে। আপনিও কোশে প্র্যাক্‌টিস্ করুন, আপনারও রবিঠাকুরের মতন স্পিড্ হবে। সাধনায় কি না হয় মশাই!

জ্ঞানাঞ্জন। আপনার চা কিন্তু জুড়িয়ে গেল।

আগন্তুক। হ্যাঁ খাচ্ছি! আপনাকে কিন্তু কাল আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিতে হচ্ছে। না গেলে কিন্তু ভারি দুঃখিত হবো।

জ্ঞানাঞ্জন। কালই আপনার মেয়ের বিয়ে বুঝি? যেতে পারলে খুবই আনন্দ হোতো, কিন্তু যাবার তো উপায় নেই দাদা। কাল আমার এক বন্ধুর ছেলের বিয়ে।—যেতেই হবে।

আগন্তুক। না না, কোন ওজর-আপত্তি শুনতে চাই না। আরে মশাই, আমিও তো আপনার বন্ধু; সুতরাং জোর করবার অধিকার আমারও তো আছে। হ্যাঁ কিনা বলুন না।

জ্ঞানাঞ্জন। নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! কিন্তু সেখানে যে আমাকে যেতেই হবে। না গেলে কিছুতেই চলবে না।

আগন্তুক। তবে আর কি বলবো বলুন! গেলে কিন্তু ভারি আনন্দ হোতো। সত্যি বলতে কি, আপনার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে কবিদের সম্বন্ধে আমার ধারণা অনেক বদলে গেছে। আর এ কথাও আপনাকে বলে গেলুম, রবীন্দ্রনাথের পর যদি কোন বাঙ্গালী কবিতা লিখে নোবেল প্রাইজ পায়, তাহলে আপনি ছাড়া আর কেউ পাবে না। আচ্ছা নমস্কার! অনেক বিরক্ত করলুম, কিছু মনে করবেন না। প্রস্থান

জ্ঞানাঞ্জন। কিছুমাত্র না, কিছুমাত্র না—আঃ বাঁচা গেল! বাপ্। কি পাল্লায় পড়া গেছলো।

নবম দৃশ্য

বিয়ে-বাড়ী। সানাই বাজছে। কিন্তু সানাইয়ের আওয়াজকে ছাপিয়ে একটা এলোমেলো কোলাহল বাতাসকে তুলেছে ঘুলিয়ে।

জনৈক কন্যাপক্ষীয়। বর এসেছে, বর এসেছে, শাঁক বাজা, শাঁক বাজা! রাধুমামা গেল কোথায়?—বর নামাতে হবে যে!

রাধুমামা। আহা চেঁচাও কেন, এই তো রয়েছি। আরে পরামাণিক গেল কোথায়? এসো বাবা এসো। আরে টোপোরটা যে মাথা থেকে খসে পড়লো, তুলে দাও না হে। একটু দাঁড়াও বাবাজি! টোপোর মাথায় দিয়ে নামতে হয়। আহা, তোরা ভিড় ছেড়ে দাঁড়া না ছাই। পথ আগলে দাঁড়ালি কি করতে? বর তো আর পালাচ্ছে না রে বাপু! একটু পরে সভাতেই ত দেখতে পাবি। এসো বাবাজি এসো!

জনৈক কন্যাপক্ষীয়। আহা, কন্যাকর্ত্তা গেল কোথায়? মণ্টু, তোর বাবাকে পাঠিয়ে দেনা শীগ্‌গির করে।

মণ্টু। ঐ তো বাবা আসছেন।

জনৈক কন্যাপক্ষীয়। পা চালিয়ে আশু-দা, পা চালিয়ে! বরযাত্রীরা যে দাঁড়িয়ে রইলেন! খাতির করে তাদের নিয়ে যাও!

কন্যাকর্ত্তা। ভিড়ের মধ্যে আটকে পড়েছিলুম। কিছু মনে করবেন না আপনারা। আসুন, আসুন! বলি, মালাগুলো গেল কোথায়? আর তোদের কবিতেগুলো? (হঠাৎ)—কি সৌভাগ্য আমার, কি সৌভাগ্য আমার! আপনি এসেছেন! সাধে বলে ভক্তের ভগবান! প্রাণের টান মশাই, প্রাণের টান! আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই বেয়াইমশাই;—ইনি হচ্ছেন কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানাঞ্জন সান্যাল। মস্ত বড় কবি উনি। পাঁচ মিনিটে গোটা একটা কবিতা লিখে ফেলতে পারেন। কি দারুণ স্পীড্ বুঝুন একবার!

বরকর্ত্তা। আমাদের গেনুকে চিনলেন কি করে বেয়াইমশাই?

কন্যাকর্ত্তা। আপনাদের গেনু? আপনার সঙ্গেও তাহলে ওঁর পরিচয় আছে?

বরকর্ত্তা। পরিচয় মানে? ও হচ্ছে আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু।

কন্যাকর্ত্তা। তাই নাকি জ্ঞানাঞ্জনবাবু? কাল যে আপনি বলেছিলেন, বন্ধুর ছেলের বিয়েতে যেতে হবে, সে বন্ধুটি তাহলে আমাদের বেয়াইমশাই?

জ্ঞানাঞ্জন। তাই তো দেখছি এখন।

কন্যাকর্ত্তা। তাহলে আজ থেকে আপনিও আমার বেয়াই হলেন। ওরে, ছুছড়া ভালো দেখে মালা দুই বেয়াইমশায়ের গলায় পরিয়ে দেনা;—হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন! আমার আজ কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য!

প্রেম ও প্রিয়া

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যদি, ভুল কর তুমি, কর অপরাধ
সেও লাগে মোর ভালো;
লজ্জা-করুণ আঁখি দুটি দিয়ে
[illegible]।

যদি, অভিমান ভরে ভ্রূকুটি করিয়া
ভৎর্সনা কর প্রিয়া
অপর জনের স্তুতি-গীত হ'তে
সেও মোর বরণীয়া।

দেবদত্ত

শ্রীপুরা[illegible] রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

২

এই ঘটনার পক্ষান্তরে, একদিন প্রাত্যহিক প্রদোষ-বায়ুসেবনের পর, সন্ধ্যার মাঙ্গল্য গ্রহণের জন্য আমরা অন্তপুরাভিমুখে গমন করিলাম। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় একজন শ্রমণ পুরুষপুর বিহার হইতে আরত্রিক মাঙ্গল্য আমাদের পরিবারবর্গের কল্যাণকল্পে আনয়ন করিতেন। আমরা একত্র হইয়া জননীর হস্ত হইতে উহা গ্রহণ করিতাম। শ্রমণ প্রতি সন্ধ্যায় এই মাঙ্গল্য জননীর হস্তে দিয়া চলিয়া যাইতেন। কিন্তু অদ্য শ্রমণ বুদ্ধপালিত পিতার সহিত সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মাঙ্গল্য গ্রহণের পর পিতা প্রশস্ত গৃহচত্বরে উপবেশন করিলে বুদ্ধপালিত তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পিতা তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিয়া আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। বুদ্ধপালিত আসন গ্রহণ করিলে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কথা হইল। মহাস্থবিরের কথা—বিহারের কথা—আষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা—মারোপাসক* যবনের অনাচারের কথা—আরও কত কথা হইল—এখন আর সে সকল কথা আমার মনে নাই। পরে, উঠিবার সময়, শ্রমণ বলিলেন—

"আর্য্য মহাস্থবিরের আদেশে আমি অদ্য আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে আগামী বৈশাখী পূর্ণিমায় আপনার পুত্র দেবদত্তের দীক্ষা হইবে। অদ্য শুক্লা দ্বাদশী। নির্দ্ধারিত দিবসে দেবদত্তকে যথারীতি উপসোথাদি পালনের জন্য যত্নবান্ হইতে বলিবেন।"

পিতা বলিলেন "আর্য্য মহাস্থবিরকে বলিবেন যে তাঁহার নির্দ্দেশ মত সকলই অনুষ্ঠিত হইবে।"

যথারীতি অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদনের পর শ্রমণ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রমণ চলিয়া গেলে পিতা আমাকে ডাকিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিতে বলিলেন। আমি বসিলাম।

পিতা পুত্রে একত্রে বসিয়া অনেক বিষয়ের অনেক কথা হইল। মা এবং চিত্রলেখা আসিয়া আমাদের কথায় যোগ দিলেন। এরূপ সন্ধ্যার সময়ে আমরা সকলে একত্র বসিয়া সুখে ও আনন্দে নানা বিষয়ের আলোচনা করিতাম। পিতা-মাতার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ও শিক্ষায়, তাঁহাদের স্নেহ ও প্রীতিতে আমার প্রাণ ভরিয়া উঠিত, উচ্ছল আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইত। সেদিন একত্রে বসিয়া যে কত কথা হইয়াছিল—তাহার সব আর এখন আমার মনে নাই। আমার দীক্ষা লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছিল। প্রকৃত বৌদ্ধের জীবন কিরূপ হওয়া উচিত তাহা পিতা আমাকে সেদিন বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনেক কথা বলিয়াছিলেন,—ভগবান্ সম্যক্ সম্বুদ্ধের করুণার কথা—সম্যক্ দৃষ্টির কথা—দান, শীল, বিনয় ও চর্য্যার কথা—মারের প্রলোভনের কথা—জগতে মারের প্রভাবের কথা ;—কত অবদানের* কথা বলিয়াছিলেন—কত শিক্ষা দিয়াছিলেন ;—এতদিনের পর—জীবনের আকাশে যখন সকল আলোক নিভাইয়া দিয়া নিরাশার কুয়াসা আবিল অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিয়াছে—এখন আর সেই সুদূর অতীতের কথা—সেই আনন্দদিনের প্রীতিপূর্ণ উপদেশবাণী—এখন আর সে সব মনে পড়ে না।—তবে মনে আছে তাঁহার সেই স্নেহময় স্বর,—তাঁহার সেই গভীর জ্ঞানময় উপদেশবাণীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আমার হৃদয়ে এখনও জাগিয়া আছে। যেমন বর্ষার নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন আকাশে পূর্ণিমার বিমল উৎসবের স্বচ্ছ আভাস ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ আমার জীবনের তমসাও সেই স্মৃতির প্রোজ্জ্বল কিরণে এখনও কতকটা ভাস্বর হয়।

সেদিন যখন পিতার সহিত এই সকল বিষয়ের আলোচনায় আমরা ব্যাপৃত ছিলাম তখন সহসা আমাদের প্রতিবেশী পালকের গৃহে স্ত্রীকণ্ঠে ক্রন্দনের ধ্বনি ও তাহার সহিত ভৃত্যদিগের কোলাহল উত্থিত হইল। মাতা ও চিত্রলেখা ইতিপূর্ব্বেই ইহার কারণানুসন্ধানে গিয়াছিলেন। মাতার প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া পিতা আমাকে বলিলেন "দেবদত্ত, তুমিও যাও, দেখ ত' কি হইল! কে কাঁদিয়া উঠিল?—আবার কি নূতন বিপদ হইল?"

আমি উঠিয়া গিয়া দেখিলাম যে আমাদিগের প্রতিবেশী ও আত্মীয়োপম পিতৃবন্ধু গৃহপতি পালকমহাশয়ের পত্নী ও তাঁহার কন্যা মাধবিকা আমাদিগের অন্তপুরপ্রাঙ্গণে পড়িয়া কাঁদিতেছেন এবং মা ও চিত্রলেখা তাঁহাদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। গৃহপতি পালকের পত্নী আমার মাতার মতন ছিলেন, সেইরূপই আমি তাঁহাকে সম্মান করিতাম এবং তিনিও আমাকে তাঁহার পুত্রের মত স্নেহ করিতেন। আমি তাঁহাকে

* অবৌদ্ধদিগের দেবতাদিগকে বৌদ্ধগণ মার (প্রলুব্ধকারী, মদন, বা পাপের পথপ্রদর্শক) নামে সাধারণ ভাবে অভিহিত করিতেন। ইহার অপর ও বিশেষ প্রয়োগ পরে দ্রষ্টব্য।

* 'অবদান' কথার অর্থ মহৎ কার্য্য ইংরাজীতে যাহাকে heroic deed বা noble act বলে। "দানের" সহিত ইহার অর্থের কোনও সংস্রব নাই।

মাসীমা বলিতাম। তাঁহার পুত্র প্রজ্ঞাবর্দ্ধন আমার সহোদরোপম ছিল। মা মাসীমার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বসাইলেন। শুনিলাম প্রাতে পুরুষপুর প্রদেশের ক্ষত্রপের* হস্তিযূথ গৃহপতি পালকের উদ্যানে প্রবেশ করিয়া ফলবৃক্ষসমূহ নষ্ট করিয়াছিল; ইহাতে ক্ষত্রপের মাতঙ্গ রক্ষকগণের সহিত গৃহপতির ভৃত্যগণের কলহ হয় এবং ফলে ক্ষত্রপ ভৃত্যগণ প্রহৃত হয়। অপরাহ্ণে হস্তিশালাধ্যক্ষ নগরপালের শান্তিরক্ষক সৈন্যসহ আসিয়া সপুত্র পালককে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং গৃহের বহু মূল্যবান তৈজসাদি নষ্ট করিয়াছে।

পিতাকে সকল কথা জানাইলাম। তিনি অত্যন্ত অধীর হইলেন। পিতা গৃহপতি পালককে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং পালকও পিতাকে অত্যন্ত ভক্তি ও সম্মান করিতেন। পিতা মাসীমাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন "কোনও চিন্তা নাই—অদ্য রাত্রেই পালকও প্রজ্ঞাবর্দ্ধনকে নগরপালের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আনিব।" মা ও চিত্রলেখা মাসীমাকে বুঝাইয়া শান্ত করিলেন এবং তাঁহাকে প্রাঙ্গণ হইতে কক্ষে আনিয়া বসাইলেন।

পিতা ভৃত্যকে রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন এবং আমরা বেশ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক পিতাপুত্রে রথারোহণে নগরপালের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে প্রতিবেশিনী সংবাদ নামক দ্বিতীয় বিবৃতি।

৩

আমরা কতকদূর অগ্রসর হইলে পিতা সারথীকে পুরুষপুর বিহারে রথ লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। রথ বিহারাভিমুখে চলিল। নিদাঘের নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় ও বিপণির উজ্জ্বল দীপালোকে রাজপথ উদ্ভাসিত। রাত্রি তখন অধিক হয় নাই। বিপণিসমূহে তখন ক্রয়-বিক্রয় চলিতেছিল। পথচারীর অভাব ছিল না। কোথাও পথপার্শ্বের কোনও ভবন হইতে তরল উচ্ছলিত হাস্য-লাস্যে স্নিগ্ধসমীরণকে স্বপ্নময়ী মাধুর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিতেছিল। কোনও অট্টালিকা হইতে বিপঞ্চী, বীণা ও মৃদঙ্গের ধ্বনির সহিত সুসঙ্গত রমণীকণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত-ধারা নিশিথিনীর সেই উৎসবকে মুগ্ধ আবেশে আচ্ছন্ন করিতেছিল। কোথাও বা সান্ধ্য আরত্রিকের পর স্তোত্র পাঠ হইতেছিল।

যখন বিহারের দ্বারে আমাদের রথ আসিয়া উপস্থিত হইল তখন বিহার স্তোত্রগানে মুখরিত। আমরা রথ হইতে অবতরণ করিলাম এবং সারথীকে বিহার দ্বারপ্রান্তে রথ রক্ষা করিতে বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

অতিথিমণ্ডপ উত্তীর্ণ হইয়া ভিক্ষাবাসে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলাম যে আমাদের পরিচিত শ্রমণ প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিতেছেন। তিনি পিতাকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন এবং এরূপ অসময়ে আমাদের এখানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতা বলিলেন যে বিশেষ কোনও কারণবশতঃ তিনি সপুত্র আর্য্য মহাস্থবিরের পাদবন্দনা করিতে আসিয়াছেন এবং শ্রবণ মহাশয় এ সংবাদ আর্য্য মহাস্থবিরকে জ্ঞাপন করিলে আমরা অনুগৃহীত মনে করিব।

শ্রমণ আমাদিগকে তাঁহার কক্ষে বসাইয়া মহাস্থবিরকে আমাদের আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। শ্রমণের কক্ষটি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু একজন থাকিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত। ঘরের দ্রব্যাদি অতি সুবিন্যস্ত ছিল। একদিকে শয্যাধারে বিস্তৃত শয্যা—তাহাতে কোনওপ্রকার বাহুল্য নাই,—অথচ তাহা পরিচ্ছন্নতার আদর্শ—অপরদিকে কক্ষতলে একখানি কুশনির্ম্মিত আস্তরণ বিস্তৃত—তাহার একপার্শ্বে দীপাধারে একটি মৃৎপ্রদীপ জ্বলিতেছে এবং তৎসম্মুখে কয়েকখানি পুঁথি পড়িয়া আছে। বোধ হয় আমাদের আসিবার পূর্ব্বে শ্রমণ অধ্যয়নোদ্যোগ করিতেছিলেন। কক্ষের একপ্রান্তে একটি জলপূর্ণ ঝারি ও কয়েকটি ধাতুনির্ম্মিত পাত্র সুব্যবস্থার সহিত রক্ষিত আছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রমণ ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে আর্য্য মহাস্থবির আমাদের জন্য আস্থানমণ্ডপে অপেক্ষা করিতেছেন এবং শ্রমণ বুদ্ধপালিত আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইতে আদিষ্ট হইয়াছেন।

আমরা বুদ্ধপালিতের সহিত আস্থানমণ্ডপোদ্দেশ্যে প্রয়াণ করিলাম।

আস্থানমণ্ডপে চৈত্যপার্শ্বে একখানি প্রসারিত দর্ভাসনে আর্য্য মহাস্থবির অর্হৎপাদ সম্যক্ সম্বুদ্ধানুগৃহীত ধর্ম্মকীর্ত্তি উপবিষ্ট ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে আর্য্য মহাস্থবিরকে এত নিকট হইতে এবং এরূপ ভাল করিয়া দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তাঁহার পরিধানে সাধারণ পীত ভিক্ষুবাস ও তদুপযুক্ত উত্তরীয়। আসনপার্শ্বে চন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত পাদুকা-যুগল রক্ষিত ছিল। তাঁহার প্রশস্ত রেখাহীন ললাট ও সৌম্য মুখচ্ছবি একটা অচঞ্চল, উদার, নিস্তরঙ্গ প্রশান্তির আধার। তাঁহার উজ্জ্বল নয়ন দুইটি জ্ঞানগরিমায় বিকশিত ও করুণায় প্রফুল্ল।

তাঁহার সম্মুখে আরও দুইখানি দর্ভাসন বিস্তৃত ছিল। পিতাপুত্রে আমরা তাঁহার পাদ বন্দনা করিলে তিনি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। আমরা বসিলে, আমাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া এই অসময়ে আমাদের এখানে আসিবার কারণ তিনি জানিতে চাহিলেন।

শ্রমণ বুদ্ধপালিত ততক্ষণ কার্য্যান্তরে গিয়াছেন। পিতা গৃহপতি-পালক ও প্রজ্ঞাবর্দ্ধনের বিপদবার্ত্তা মহাস্থবিরের নিকট জ্ঞাপন করিলেন।

মহাস্থবির নিরবে সকল কথা শুনিলেন—কিয়ৎক্ষণ মৌন হইয়া নত নয়নে কি ভাবিতে লাগিলেন—পরে তাঁহার সেই করুণভাস্বর দৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্য ঋষভদত্ত, রথ আনিয়াছেন কি?"

—আজ্ঞা হাঁ, রথেই আমরা আসিয়াছি।

—তবে আর বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই; এখনই পুরুষপুরের ক্ষত্রপের সহিত সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন। প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া দুরূহ। আমিও আপনাদিগের সহিত যাইব। আপনাদিগের অনুরোধ তিনি না রাখিতে পারেন, কিন্তু আমার কথা হয়ত রাখিবেন; ক্ষত্রপ যবন হইলেও বৌদ্ধ এবং আমাকে তিনি যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন।

আমরা তিনজনে বিহারদ্বারে আসিয়া রথে আরোহণ করলাম এবং পিতা সারথীকে ক্ষত্রপের প্রাসাদাভিমুখে রথ লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। রথ গন্তব্য পথে চালিত হইল।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে মহাস্থবির সংলাপন নামক তৃতীয় বিবৃতি।

ক্রমশঃ

* প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা (satrap)।

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪

বিনোদ ঘরে ঢুকতেই রাণী একটু হাসি টেনে বললেন —"ইস্—এত শীগগির চলে এলে যে?"

মাণিকের বড় ঘুম পেয়েছে, বললে—দু-মাস পরে মশারী ফেলা বিছানা পেয়েছি, একটু ঘুমুতে দিন—

"খুব বুঝেছ তো!—সে তোমার কথাটাই বলেছে। ছিঃ একটু বসতে হয়। কেবল ডাক্তারিই পড়েছ"—

"আহা, সে যে দাঁড়াতে দিলে না গো—শুয়ে পড়লো। তার যে অনেক কাজ। সকল ভার একাই নিয়েছে, ভোরেই যে উঠতে হবে তাকে।"

"আচ্ছা বেশ করেছ, থাক।"

"আহা তুমি বুঝছ না!

"যাতে হাত দিচ্ছি তাতেই বুঝছি। এখন দয়া করে' শুয়ে পড়'।"

"কেনো, কি হোলো? আবার কি পেলে? আমি তো কিছুতে হাত দিইনি।"

"হাফ্ প্যাণ্টগুলো সিন্দুকে তুলে রাখতে বললে। ও কি পাট করা যায়? আগা গোড়া কাগজের কাঁড়িতে ভরা! কাগজ রাখবার আর জায়গা ছিল না?"

"ও কাগজ নয়—কাগজ নয়। ওর মধ্যে আমাদের মগজ রয়েছে। ও যেমন আছে তেমনি থাক, পাট করতে হবে না, কিন্তু সিন্দুকে বন্ধ রাখতে হবে। খবরদার বাইরে রেখ না।"

"আপিসের কাগজ বুঝি?"

"বড় আপিসের—ব্যাঙ্কের। মাণিক জানে।"

"তবে যেমন আছে থাকুক—তোমার সামনেই রাখছি। এইবার আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি,—পিসিমা আমার জন্যে বসে থাকবেন। তুমি শুয়ে পড়ো। বড় খেটেছ"—

বিনোদ বেলা সাতটার পর উঠে, বাইরে গিয়ে ছাখেন মাণিক নেই! কোথায় গেলো?

রাণীর কাছে শুনলেন—"তিনি তো ভোর পাঁচটায় বেরিয়েছেন।"

"অ্যাঁ—চা খেয়ে গেল না!"

"এতো বেলায় উঠে তোমাকে আর ভাবতে হবে না! সে সব হয়েছে, বটুয়া করে দিয়েছে।"

"আমাকে ডাকতে হয়।"

"তাও হয়েছিল মশাই—উত্তর দেবে কে? মাণিক-বাবুও বারণ করলেন।"

বিনোদ সহাস্যে বললেন—"সে ভুল করে না জানি। কিন্তু আমারো যে অনেক কাজ রয়েছে।"

"কেনো, আবার ঘুমুবে নাকি? কাজের লোকদের লম্বা rest নেওয়াই তো ভালো—তোমরাই তো বলো।"

বিনোদ একটু হেসে বললেন—"আমাকে একটু চা দেবে না?"

কথা শেষ না হতেই বটুয়া চা আর সিঙাড়া নিয়ে হাজির।

বিনোদ। আবার এখন সিঙাড়া কেনো? এত সকালে আবার পিসিমাকে ভোগালে কেনো?

"শুধু চাটা খাবে। স্টোভে ও সব বটুয়াই করে' এনেছে।"

"এমন ছেলেটিকে পেলে কোথায়? বটুয়া নয়, সকল কাজেই ওকে 'পটুয়া' দেখছি! খুব যত্ন করে' রেখো।"

"যে আজ্ঞে,—এখন খাও।"

"তুমি কিছু খাবে না?"

"থামো, অতো দয়ায় কাজ নেই। তোমার কাজ আছে বললে না?"

বিনোদ। সে যেমন কঠিন তেমনি বিষম—পরম শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে কি না।

রাণী। তবে সেটা আগে সেরে নিশ্চিন্ত হও। কথা কিন্তু বাড়িও না, চোখোচোখিও কোরো না।

রাণী স্বামীকে চেনেন, কথা মানবে না, চা খেতেই দশটা বাজাবেন। নিজে সরে' গেলেন।—বিনোদ তাড়া-

তাড়ি আধঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে, পা ঘসতে ঘসতে দুর্গা বলে' বেরিয়ে পড়লেন।—"মাণিককে তক্ষুণি বলেছিলুম আমাকে জড়িও না! শুনলে না—"

* * * *

হসপিটেল কম্পাউণ্ডেই তাঁর round সুরু হ'ল। বিনোদ জানতেন—বড়রা প্রায়ই সিভিল সার্জেনকে আপ্যায়িত করতে নিত্য আসেন, সব জঞ্জাল এক জায়গায় জড় হন। তাঁর ৭ বছরের ছেলে অনুরূপের বুদ্ধির প্রশংসা ও ভবিষ্যতের 'প্রোফেসি' চলে, কেবল 'কন্দর্প' কথাটি বলতে বাধে—পাছে সেটা উপহাসে দাঁড়ায়—ভগবানের মার! যাক্—

কেহ বলেন—"আর দেখুন—পরিবারের সেই মাথা-ধরাটা আর গেল না। বড় পিভিস্ হয়ে পড়ছেন—বড় খিট্ খিটে হয়েছেন।"

কর্ত্তা বলেন—"ও কিছু নয়—বয়সের সঙ্গে ওটা হয়। মেয়ের বিবাহের বয়স যতো বাড়ে, ওটাও ততো বাড়তে থাকে। বাড়িতে জামাই আনলেই কমে' যাবে। আমাদের ওঁরা তো আর এখন পত্নী বা প্রেয়সী নন—গৃহিণী!"

সকলের হাসির হল্লা পড়ে' যায়। আরম্ভ হয়—"ওরা ও সম্বন্ধে আমাদের উদাসীন ভাবেন, এই দুঃখু। মেয়ের বিবাহটা সেরে ফেলুন। ও মাথা ধরা ওষুধে সারে না।"

"বলেন কি? তবে যাই কোথা?

"কেনো—পাত্রানুসন্ধানে।"

"পর পর—সাতটি যে!"

"তবে যাবৎ জীবনম্!"

"তাই তো দেখছি মশাই। প্রথম পাঁচ বছর কি আরামেই ছিলুম। একটু দেরি হলেই বলতেন—এতো দেরি হ'ল যে, আমার ভয় করে না বুঝি। এখন রাত একটা হলেও কথা নেই, যেন কে এলো। খেয়েছি কি না, সে খোঁজও নেই!"

"জামাই এনে ফেলুন—জামাই এনে ফেলুন।"

"নগদ পাঁচ সাত হাজারের কমে কেউ যে কথা কয় না।"

"আরে ম্যান, সবগুলির জন্যে তো বাঁচতে হবে না—দু'তিনটিতেই দুর্গা বলা চলবে। এখন আশার মধ্যে তাই।"

"Exactly sir" বলে' সকলে হাসেন।

একজন বলেন—"আর ভাবতে হবে না—ভগবান, কুম্ভকর্ণ নন, জেগে আছেন। তার সঙ্গে বাংলায় তা' বড় তা' বড় মাথাও রয়েছে। দিন এসে গেছে। শুনছি কালা বাজার খুলেছে, প্রফেটিয়ারিংএর ক্রিয়ারিংও ঘুচেছে। নাওনা কতো জামাই চাই।"

ইত্যাদি ইত্যাদি কথার পর, বিনা পয়সার ওষুধ নিয়ে সব ওঠেন।

বিনোদের এসব জানা ছিল। গিয়েও তাঁদের এক মজলিসেই পেলেন। নমস্কার করে দাঁড়াতেই, কর্ত্তা-পদবাচ্যরা—"আরে—এসো এসো বিনোদ।"

চেয়ার-ম্যান দাঁড়িয়ে উঠে—"এসো এসো, বড় খুশি হয়েছি, আমার মুখ রক্ষা করেছ। O/C যা লিখেছেন, বুক আমার দশ হাত বেড়ে গেছে। কিন্তু ভাবনাতেও ফেলেছেন। এখন তোমাকে কিসের চার্জ দেব' ভেবেই পাচ্ছি না।"

বিনোদ বিনীত ভাবে বললে—"ও সব কি বলছেন! যেমন আছি—আপনাদের দয়ায় তাই থাকতেই চাই। আপনাদের দয়া ছাড়া আর কিছু চাই না হুজুর।"

একজন। তুমি চাইনা বললেই তো চলবে না। সাহেবে খুশি হলে স্বর্গপর্য্যন্ত সিঁড়ি বানিয়ে দেয়। ওঁর ভাবনার কথা বইকি। তোমাকে তো উনি খোঁড়রক্ষক করে দিতে পারেন না।

বিনোদ। কি বলছেন বুঝতে পারছি না। তিনি কি লিখেছেন, তাও জানি না। ও সব ফাইলের জিনিস ফাইলে ফেলে দিলেই চলবে।

দ্বিতীয়। আরে তাকি হয়। তোমার ভালোতে আমরা সকলেই খুশি সেটা তো জানো। একটা কথা শোনাই ছিল—"স্ত্রী ভাগ্যে ধন।" নিজেদের বেলায় তার প্রমাণ পাইনি, তোমার দৌলতে মিললো।

তৃতীয়। শুভদৃষ্টিটে নিখুঁৎ হবে বলে' 'ফোকাস্' ঠিক করবার জন্যে একটা চোখ বুজেছিলুম, ভাগ্যে 'বোগাস্' হয়ে গেল। সে দুর্ব্বুদ্ধির ফল এখন কাঁদি কাঁদি ফলছে। আবার তুমি একটা বাড়ালে। এখন কথায় কথায় তো সব উপমার বুলেটিন্ বেরুবে। সকলের হাস্য।

চতুর্থ। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী প্রতিমা ঘরে এনেছ বিনোদ। এ সব তাঁরি 'পয়ে'—সেটা মনে রেখো। তাঁর প্যাঁচাটা পেলেও বাঁচি। আমাদের এঁদের নিন্দে করছি না—

নিঃসন্তান রাখেননি, দয়া করে সাত মেয়ে দিয়েছেন। এখন প্রসবের পয়টি ক্ষয় হলে' যে বাঁচি।

পঞ্চমুখে—hear hear ও উচ্চ হাস্য।

সিভিল সার্জেন বাধা দিলেন—"থাক, ওসব কথা। (বিনোদের প্রতি) সব শুনেছি বিনোদ—কাল তাঁর কাজটি তাঁর ইচ্ছামত সমাধা করে' দিও। তোমার অনেক কাজ, সে সব সেরে ফ্যালো গিয়ে, আমাদের কিছু বলতে হবে না।"

সকলে। "হ্যাঁ, সেটা আগে, আমরা ঘরের লোক।"

বিনোদ বেচারা কথা কবার ফাঁক পাচ্ছিল না, যেন বাঁচলো। ঢোক গিলে বললে—"আমি এখন আপনাদের বাড়িতে বলে' আসতে যাচ্ছি—দয়া করে মেয়েদের পাঠিয়ে দেবেন। আমি একা মানুষ। নন্দকে অন্তত্রে বলতে পাঠালে—দোষ হবে কি?"

সকলে। দোষ আবার কি, বৃহৎ কাজে এতো করতেই হয়। তায় সমারোহের ব্যাপার শুনছি।

বিনোদ আর দাঁড়াল না। কর্তাদের হাসিখুশি ও কথার ব্যাঁকের মধ্যে যা ছিল তা সুস্পষ্ট না হ'লেও, বিনোদের কাছে তা অস্পষ্টও ছিল না। সে ভাবতে ভাবতে চললো—"মা দুর্গা আছেন।"

পথে যার সঙ্গে দেখা, যে হেসে কথা কয়েছে, তাঁর বাড়ির মেয়েদের না বলে পারেননি, অর্থাৎ extra বিশ পঁচিশ ঘর মাত্র!

বেলা প্রায় একটায়, ফেরবার পথে কয়েক দোকান ঘুরে যে কয়টা মোশারি মিলেছে—অর্থাৎ ডজনখানেক, নিয়ে ফিরলেন।—বাড়ির সামনে ৩।৪খানা গাড়ি দেখে—"এ সব আবার কি? মাণিক মজাবে দেখছি।" মাণিককে ভাড়াদিতে দেখে—"এতো গাড়ি কেনো, কারা আবার এলো?"

মাণিক। যাদের জন্যে পোষ্ট কার্ডের তাড়া নিয়ে বসেছিলেন, Sub-Divisionএর ডাক্তারপত্নীরা দয়া করে এসেছেন।

বিনোদ। এও কি সম্ভব? ১৮ মাইল, ২২ মাইল গরুর গাড়ির পথে, ভদ্রপরিবারেরা আসবেন তা কি করে জানবো! ছেলে-মেয়ে নিয়ে নাকি?

মাণিক। মেয়েরা তাদের আর কোথায় ফেলে

বিনোদ। মাথা খেয়েছে! বাঙালির যে সবই কলঙ্ক পরিচয় হে! কতগুলি?

মাণিক। এক কুড়ি আন্দাজ। যুধিষ্ঠির দু' বালতি দুধ আনতে ছুটেছে।

বিনোদ। যুধিষ্ঠির? তাকে আবার—

মাণিক। সে না এলে—ধর্ম্মরক্ষা করবে কে? ভাগ্যে বিনোদিকেও সঙ্গে এনেছে—

বিনোদ। তোমরা আমায় পাগল করবে দেখছি?

মাণিক। তারা না এলে আমাকেই তা হ'তে হোতো। আপনি ভাববেন না, কিছু মুখে দিন গে।

বিনোদ। মেয়েরা সব থাকবে কোথা, এই তো কোয়াটার!

মাণিক। সেটা ভাববার সময় আর নেই। লেডি ডাক্তারের কোয়াটার এ বাড়ির লাগাও। সেইখানে সব চালান হয়েছে, তিনি নিজেই তাঁদের নিয়ে গেছেন। জলখাবার আনিয়ে দিয়েছি, বটুয়া চা দিয়ে এসেছে। আপনার বগলে ও সব আবার কি?

বিনোদ। মশার মোচ্ছোব দেখছ তো? পরের বাচ্ছা-কাচ্ছাদের এক রাতেই হাড়িডসার করে' দেবে—খোসা নিয়ে ফিরতে হবে। হতভাগা জায়গা—বেশী পেলুম না। যা ডজনখানেক পেলুম, নিয়ে এসেছি—

মাণিক। বলেন কি—ডজনখানেক! থাক্ সব লাট্ করবেন না—আমাকে দিন।

বটুয়া চা আর কচুরি দিয়ে গেল।

পরে বাড়ি ঢুকে দেখেন—ঘিয়ের টিন্, চিনির বস্তা, চায়ের প্যাকেট, এঁচোড়, আলু, বালতি, বাসন, মশলা, পাঁচখানা বঁটি। কোথাও পা বাড়াবার পথ নেই!

রাণীর মুখ শুকিয়ে গেছে, কথা নেই। কেবল বললেন—"আমার মাথা ঘুরছে, দাঁড়াতে পারছি না। এ সব করতে তোমাকে কে বলেছিল!" ইত্যাদি—

যুধিষ্ঠির দু' বালতি দুধ রেখে প্রণাম করলে। বিনোদ বললেন—"আমার মাথার ঠিক নেই যুধিষ্ঠির, যা হয় তোমরা করো।"—"যে আজ্ঞে" বলে সে পাশ কাটালে।

মাণিক বললে—"মাথায় একটু জল দিন, আর পেটে দুটি অন্ন দিয়ে শুয়ে পড়ুন গে।"

বিনোদ। কোথায়? তাই তো ভাবছি। স্থান কই?

মাণিক বললে—"একটা 'ওয়ার্ড' পরিষ্কার করিয়ে বিছানা-পেতে রেখেছি।"

বিনোদ। আঃ বাঁচালে!—সত্যি বলে' নিও না'—মিথ্যাই হোক্—"তোমাকে পেলে আমার মরেও সুখ আছে! (কান খাড়া করে')—কে গায়?"

তখন লেডি ডাক্তারের কোয়াটারে, হারমোনিয়ম যোগে মেয়েদের মজলিস জমে উঠেছে—

—কত সুখেরি স্বপন করেছি বপন
রতন তরে,
সে আসিবে হাসিবে বেদনা নাশিবে—

আর যে শোনা গেল না হে—

মাণিক। সেটা দেখবার জন্যে রইল।

মাণিকের মাথা তখন অন্যত্র ঘুরছে। সে ডাক্তার-বাবুকে ভাল রকমই চিনতো। তার ভাবনা তখন পাবনা পৌঁচেছে—extra নিমন্ত্রিতের সংখ্যা কত বাড়াবে তাই ভাবছিল।

ডাক্তার। হ্যাঁ দেখো মাণিক—মায়ের কথা মনে আছে তো? রোগীদের আর গরীবদের ব্যবস্থা ভুলো না। So-called বড়দের dish আমিস হলেই যথেষ্ট, তাঁরা কেউ ভুখো নন।

"সব মনে আছে মশাই—আপনিও তো কম ভাবছেন না দেখছি। বড়দের নাড়ী রহমৎ চেনে। ভিন্ন গোয়ালের তরে tent (টেন্ট্) আনিয়েছি। তাঁরা তার মধ্যেই টাইট' হবেন। আপনি কেবল দুবার ঘুরে আসবেন। দুয়েকজন জোড়েও থাক্‌বেন—আপনি সঙ্কুচিত হবেন না।"

বিনোদ। জোড়ে কি হে!

মাণিক! সেইটিই তো সভ্যতার প্রথম সংস্কার—জোড়াকরণ। আপনিই তো বলেন—স্বাধীনতা মানেই ডানা বেরুনো—উড়তে শেখা। যাক্, রাত হয়েছে, হাঁসপাতালে বেড্ (bed) পাতাই আছে।—আমাদের এখন দিন রাত সমান।

বিনোদ কিছু মুখে দিয়েই সরে' পড়লেন।

আজ শুক্রবার। সকলেই সমান ব্যস্ত। বিশেষ পিসিমাকে যেন বীরবাতাস লেগেছে। বিনোদ পড়ে পড়ে কেবল দুর্গানাম করছে। লেডি-ডাক্তারের কোয়াটারে সুর সংযোগে সঙ্গীত চলছে। নানা সুগন্ধী একত্র হয়ে প্রজাপতিদের বিভ্রান্ত করে' ঘোরাচ্ছে। যার কেশে বসবার চেষ্টা করছে—ভীষণ হাসি তামাসার হল্লা উঠছে। সার্দ্ধশত সুন্দরীদের কলহাস্যে চারিদিক মুখরিত।

চল্লিশ—উত্তীর্ণারা আজ যেন—

"মুকুলিতা বালিকা বয়সী
—অনন্ত যৌবনা উর্ব্বশী।"
"উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক,
কবরী খসিয়া খুলিছে।"

জাফরানের সুঘ্রাণে Hospital compound ভরপুর!

* * * *

বেলা প্রায় একটা। মেয়েদের ডাক পড়লো। সকলেই আরসির দিকে ছুটলেন। সময় কম, তাড়াতাড়িতে চিরুণী বেচারির অঙ্গহানিও হল। নানা angleএ মুখ দেখার পর, মহিলারা এসে আসন নিলেন। রব উঠলো রাণী কোথা? সোনা ফেলে কাজ নাকি?

"এই যে গো" বলতে বলতে লেডি ডাক্তার কিরণশশী লজ্জানতমুখী রাণীকে নিয়ে প্রবেশ করলেন—যেন জীবন্ত প্রতিমা হাজির করে' দিলেন! পরণে সদ্যগর্ভমুক্ত কচি কলাপাতা রঙের স্বর্ণাভ বেনারসী।—আড়াই ইঞ্চি চওড়া উজ্জ্বল জরির পাড়। মাঝে মাঝে নাগকেশর পুষ্প ঘিরে মুগ্ধ মৌমাছির ঝাঁক! অ্যাকই বর্ণের ব্লাউসের উপর অভিনব একছড়া হার—পলকে পলকে বিজলী হানছে—রং বদলাচ্ছে!

মেয়েদের হাতের গ্রাস আর মুখে ওঠে না। সকলের দৃষ্টি সেইখানে আবদ্ধ। একজন বলে' ফেললেন—"হ্যাঁ, পছন্দ বটে বিনোদের! আমাদের এঁদের চোখে সেই সে-কেলে মেনকা-মার্কাই জোটে! যাত্রার সং সাজা। কখনো পরতে আর হল না!"

তপতী বলেন—"আবার বলা হয়—ওর জরি বেচলেও ষাট টাকা আসবে!" বলেছি—"বেচো আমার শ্রাদ্ধে!"

সকলের দৃষ্টিটা কিন্তু "হারের" ওপর। একবার উঠতে পারলে হয়—না দেখে স্বস্তি নেই। সূক্ষ্ম শিল্প সকলকেই আকর্ষণ করে। পুরুষদেরও শিল্পের টান অল্প নয়। প্রথম যেই গুবরেপোকা-গোঁফ উঠলো, আমরা তা ব্যবহারে

মিলেছে। ইকনমিকে প্রণমী। ভোজ শেষ হ'তে এক প্রকার অপরাহ্ণ। হাত মুখ ধুয়েই—হার। ওমা—শঙ্করচিলের লকেট! ডানায় কি আবার লেখা যে, "রেখা পড়্‌তো ভাই।" রেখা পড়ে' দিলে—"রাণী হার।"

সকলে বললেন—"হ্যাঁ—'রাণী হারই' বটে। কি সুক্ষ্ম কাজ" ইত্যাদি। রাণী দাঁড়াতে পারছিল না—কাঁপছিল। লেডি ডাক্তার তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন।

মেয়েরাই মেয়েদের চেনেন। কয়েকটি বুদ্ধিমতী বর্ষীয়সী গিন্নি পিসিমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে—রন্ধন ও ভোজনের বহু প্রশংসা করে' বললেন—"আপনাদের অবর্ত্তমানে রন্ধনের এ আস্বাদ আর জুটবে না। কি ছ্যাচড়াই আজ খেলুম, ঠাকুমার গঙ্গালাভের পর এ আস্বাদ আর জোটে নি, আজ সে সব কথা মনে হচ্ছে। কোন্‌টার কথা কইব; মোচার ঘণ্ট মুখ জুড়িয়ে দিয়েছে—ইত্যাদি ইত্যাদি। যে ভাবেই হোক—সব সত্য কথাই বেরিয়েছিল। পিসিমাকে তুষ্ট করে' তাঁরা তাঁর আশীর্ব্বাদ নিয়ে ফেরেন।

উল্লসিত পিসিমা শেষে বলেন—সকলে প্রাণখুলে আশীর্ব্বাদ করো মা—বিনোদ যেন সুখী হয়, রাণী নিব্বি পুত্রবতী হয়, ইত্যাদি। যাক্‌।

ভদ্র গৃহস্থ ঘরের মহিলাদের এই সুমধুর সৌজন্য বাংলার প্রকৃতিগত এবং এখনো চলে আসছে, তাই উ না করে পারলুম না।

* * * *

পুরুষদের ভোজের ব্যবস্থাটা মাণিক বাইরেই করেছি আর মহাপুরুষদের তাঁবুতে রহমান স্বয়ং বিদ্যমান ছি রাত ১২টার পূর্ব্বেই সব সুচারুরূপে সমাধা হয়ে গে জোড়-গিন্নিরা রাণীকে তাঁবুতে আনিয়ে দেখবার জিদ্ করেছিলেন, সিভিল সার্জেন রাণীর এরূপ ভরা অব তা হতে দেন নি। তাঁরা মুখ বেঁকিয়ে বলেছিলে "আমরা যেন বিউইনি।" যাক্, কর্ম্মবাড়ী ঠাণ্ডা রাত প্রায় তিনটে। পিসিমা ও মাণিক তখন গড়াতে গেলেন।

মাণিকের আর বটুয়ার ব্যবস্থায়, সকালে কফি মহিলারা সব স্বস্বস্থানে রওনা হলেন—গাড়ী হাজির লেডি ডাক্তারের ওপর অনেকেরই বিশেষ অনুরোধ —হারকার বা স্বর্ণকারের ঠিকানাটার জন্যে।

মিশরের ডায়েরী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

নীলের উপর দিয়ে চ'লেছে সারি সারি দেশীয় নৌকা; প্রায় নৌকাই দেখলাম শূন্য। কোথাও বোঝা নামিয়ে আসছে, অথবা বোঝা ভরে নিতে যাচ্ছে। মিঃ মহীউদ্দিন বল্লেন—এই যুদ্ধের সুযোগে মিশরের দেশীয় যানবাহনের চাহিদা একটু বেড়েছে। যুদ্ধের সময় অনেক কাজই এই উপেক্ষিত যানবাহন নিষ্পন্ন করে। পূর্ব্বে এই মিশরের মাঝি-মাল্লারাই ভূমধ্যসাগর, লোহিতসাগর, আরবসাগর ও পারস্যউপসাগর অতিক্রম ক'রে ভারতবর্ষের সঙ্গে আদান-প্রদান করত। বর্ত্তমানেও কোন কোন দেশীয় নৌকা করাচী পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। আমরা দুইটি সেতু অতিক্রম ক'রে প্রায় সাড়ে বারটার সময় ওয়াই-এম্-সি-এতে এলাম। মিঃ মহীউদ্দিন হালুয়ানের পথে ট্রেণ করে যাবেন—প্রায় ১৫ মাইল দূরে, তিনি একজন গ্রীক্ ভদ্রমহিলার পেন্সনে থাকেন।

৪ঠা অক্টোবর, ৪৪

আজকে বেলা দুইটার সময় ওয়াই-এম্-সি-এর মিলিটারি ভারতীয় সৈন্যেরা মিশরে দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখ্‌তে যাবে। প্রতি একদিন ক'রে ভারতীয় সৈন্যদের নগরভ্রমণের ব্যবস্থা আছে। মালবিয়া আমাকে ও সিলভরাজকে এই ভ্রমণের সঙ্গী হ'তে ব' আমাদের আজকের গন্তব্যস্থান হালুয়ান। কায়রো নগর থেকে পূর্ব্বদিকে প্রায় আটক্রোশ দূরে। নীলনদের পাশ দিয়ে আমাদের এবার নগরপ্রান্ত অতিক্রম ক'রেই পরিচয় পেলাম সত্যিকার নী এই নীল চ'লেছে সুদূর সুদান প্রদেশের এক পর্ব্বত গুহার থেকে প্রায় এক সহস্র ক্রোশ অতিক্রম ক'রে মরুভূমির বুক চিরে

শস্যশ্যামল ও উর্ব্বর ক'রে দিয়ে ভূমধ্যসাগরের দিকে। নীলনদের পাশে সজ্জ্ব খর্জ্জুরবৃক্ষশ্রেণী। প্রতি গৃহবাসী তার আবাসের অংশরূপে খর্জ্জুর-বীথি রচনা করেন। সর্ব্বত্রই মিশরীয় গৃহস্থের অনাড়ম্বর গৃহবাটিকার চতুর্দ্দিকে গ'ড়ে উঠেছে এই খর্জ্জুর-বনবীথি। কার্ত্তিক মাস। শীত খুব বেশী নয়। খর্জ্জুরের মরসুম। প্রত্যেক বৃক্ষেই শোভিত র'য়েছে স্তবক—সুপক্ক, সুন্দর।

নীলনদের অপর তীরে অতি দূরে অস্পষ্ট দৃষ্ট হ'চ্ছিল পিরামিড শ্রেণী। বহুদিনশ্রুত পিরামিডের অস্পষ্ট আভাস আমাকে মুগ্ধ ক'রে দিল। সম্মুখে যদি পিরামিডের পরিপূর্ণ স্পষ্ট আকৃতির দর্শন পেতাম, তবে বোধ হয় আমার এত আনন্দ হ'ত না। কারণ এ অস্পষ্টতার ভিতর রয়ে কল্পনার যথেষ্ট সুযোগ র'য়েছে। কল্পনায় যে জিনিষ বহুবার দেখেছি, এই অস্পষ্ট দৃষ্টির ভিতর দিয়ে তার রূপ আরও সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌ল। আমাদের পূর্ব্বপার্শ্বে আমাদের সাথে চ'লেছে অতি ক্ষুদ্র একটা পর্ব্বতমালা—চ'লেছে নীলনদের পাশে পাশে। বামদিকে মকওম পাহাড়। এই পাহাড়ের বুকের পাঁজর দিয়েই ফেরাউন সম্রাট নির্ম্মাণ ক'রেছিলেন পিরামিড। দক্ষিণে নীলধারা ব'য়ে চ'লেছে অবিশ্রান্ত স্রোতে—যেমন চ'লেছিল মিশর সৃষ্টির প্রথম দিনে। মাঝখান দিয়ে চ'লে গেছে পথ ভূমধ্যসাগরের সৈকত চুম্বন ক'রে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রান্ত শেষ সীমান্ত পর্য্যন্ত। কত স্মৃতি জড়িত র'য়েছে এই পথের ধারায়!

আমি ইতিহাসের তথ্য আর কবির কল্পনায় একেবারে বহুদূরে নিপাত ক'রলাম। কত যে চিন্তা, কত ঘটনা চলচ্চিত্রের ছবির মত ভেসে উঠ্‌ল, তার ইয়ত্তা নাই। আমাদের পথ আর নীলের ক্ষুদ্র প্রসরের ভিতরে সাধারণ গৃহস্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর, পথের দুপাশে কৃষ্ণচূড়া গাছ, প্রস্ফুটিত রক্তস্তবক, মাঝে মাঝে স্বর্ণাভ খর্জ্জুররাশি।

আমরা প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই হালুয়ানের উদ্যানে প্রবেশ ক'রলাম। উদ্যানটী সাধারণতঃ জাবানীজ উদ্যান ব'লে পরিচিত। আরবী ভাষায় 'প' নাই, সুতরাং জাপানীজকে জাবানীজ ক'রে রেখেছে। একজন সম্ভ্রান্ত মিশরীয় ভদ্রলোক সুমাত্রা, জাভা, জাপান পরিভ্রমণ ক'রে জাপানী উদ্যানের অনুকরণে কায়রোর উপকণ্ঠে হালুয়ান নামক স্থানে একটী উদ্যান রচনা করেন। আমরা একটা ক্ষুদ্র সেতুর উপর দিয়ে, কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী অতিক্রম ক'রে পাগোডার পার্শ্ববর্ত্তী বিশ্রামাগারে এলাম। এই পাগোডার প্রবেশপথে স্থাপিত হ'য়েছে বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি। মঙ্গোলিয়ান শিল্পের অনুকরণে ইষ্টকখণ্ড ও রক্তবর্ণ সিমেণ্ট দিয়ে নির্ম্মাণ করা হ'য়েছে এই বিরাটমূর্ত্তি। তার বাম পাশে জলের উপর ফুটে র'য়েছে অতিকায় শ্বেতপদ্ম। রক্তবর্ণ মূর্ত্তির পদপ্রান্তে প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম বৈষম্যের এক অভিনব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ক'রেছিল।

হঠাৎ দেখলাম, একটা বানর এসে আমাদের একজন সহযাত্রীর পা জড়িয়ে ধ'রে সামনে হাত বাড়িয়ে দিলে। পাশের মানুষটী ছোট্ট খঞ্জনী বাজিয়ে প্রার্থনা জানাল—বক্‌শিস্। দুই তিনটী ফেরিওয়ালা সালুজ (বারফ), কাজুজা (লেমনেড), চকোলাতা (চকোলেট) নিয়ে এল। আমরা কিছুক্ষণ বানর নাচ উপভোগ ক'রলাম। ভারতীয় বানর নাচের অনুরূপ। আমাদের পাশেই কয়েকটী মিশরীয় শিশু এসে দাঁড়াল বানর নাচ দেখবার জন্য। আমি সকলকে কিছু চকোলেট কিনে দিলাম। শিশুদের আনন্দ হঠাৎ বানর থেকে চকোলেটেই বেশী হ'ল। এই শিশুরা এসেছে তাদের মা-বোন ও অন্যান্য আত্মীয়ের সঙ্গে হালুয়ানের উন্মুক্ত প্রান্তরে, সুমিষ্ট বায়ু ও প্রকৃতির শোভা উপভোগ ক'রতে। শুনলাম প্রতিদিন এই হালুয়ান উদ্যানে শিশুসমাগম দেখতে পাওয়া যায়। শীতকালে অনেক সময়ে পিক্‌নিকের জায়গা পাওয়াই দুষ্কর হয়।



সূর্য্যাস্তে নীল নদ—কায়রো



কায়রো ওয়াই-এম-সি-এ হোষ্টেলের সম্মুখে দণ্ডায়মান লেখক

খানিকক্ষণ ছেলেদের সঙ্গে খেলা ক'রে আমরা হালুয়ানের উদ্যানে গেলাম। এই উদ্যানে র'য়েছে পাশাপাশি সাতচল্লিশটী ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি। বৃহত্তমটী ৩০ ফুট উচ্চ—মস্তকে সুবিস্তৃত কেশদাম, কর্ণে কুণ্ডল, নিমীলিত নেত্র, পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি এই মুসলমানের দেশে অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। একটী মূর্ত্তির পাশে হনুমান যুক্তহস্তে প্রার্থনার ভঙ্গীতে উপবিষ্ট। মুসলমান রাজ্য, মুসলমান ধর্ম্ম, মুসলমান

বসতির মধ্যে বুদ্ধদেবের এই মূর্ত্তিগুলি অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। বহু মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী এই সুন্দর মূর্ত্তি দর্শন অভিলাষে এখানে আসেন এবং আনন্দ উপভোগ করেন।

দুই ঘণ্টা পরে আমরা কায়রো ফিরব। পথে খানিকদূর এসে আমাদের গাড়ী একটী সুন্দর ছোট্ট বাড়ীর দরজায় থামল। সবাই নেমে গেল। তাদের দেখে আমিও নামলাম, ভাবলাম দর্শনীয় কিছু আছে। ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখলাম—একজন প্রৌঢ় ভারতবাসী আমাদের অভ্যর্থনা ক'রছেন। মিঃ মালবিয়া পরিচয় ক'রে দিলেন—মিঃ ছোটেলাল, নিবাস গুজরাট। টোকিও, পোর্ট সুদান এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় তাঁর ব্যবসা র'য়েছে। বর্ত্তমানে টোকিওর ব্যবসা তুলে কায়রোয় এসেছেন। বম্বেতে এঁর প্রধান অফিস। মিসেস ছোটেলাল এসে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন। একটী ভারতীয় পরিবারকে এই দূরদেশে সমৃদ্ধ অবস্থায় দেখে খুব আনন্দ হ'ল। প্রীতিসম্ভাষণের ও আলাপ পরিচয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের চা পান

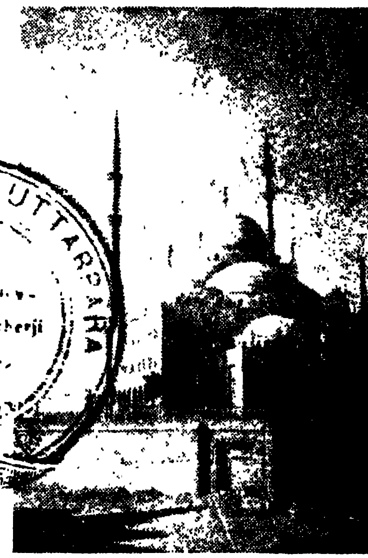


সূর্য্যাস্তের পরে নীল নদের দৃশ্য—কায়রো

শেষ হ'ল। মিসেস্ ছোটেলাল ব'লেছিলেন, আর একদিন আসবেন। আমরা পথে গন্ধকের উৎস (সালফার স্প্রিং) দেখে কায়রো ফিরলাম। এই সালফার স্প্রিং নবাবিষ্কৃত এবং মিশরের শিল্পবাণিজ্যে অনেক সহায়তা ক'রবে ব'লে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা আশা ক'রছেন।

সন্ধ্যার প্রাকালে আমাদের বাস থামল মোমের মিউজিয়ামের দরজায় (ওয়াক্স্ মিউজিয়াম)। একজন হাব্‌সী প্রহরী আমাদের কাছ থেকে পাঁচ পিয়াস্তার (সাড়ে বার আনা) দক্ষিণা নিয়ে প্রবেশ পথ উন্মুক্ত ক'রে দিল। জনৈক মিশরীয় শিল্পী ফরাসী দেশে মোমের কাজে দক্ষতা লাভ ক'রে মিশরীয় অতীত ইতিহাস মোম দিয়ে রচনা ক'রবেন, স্থির ক'রলেন। সেই শিল্পীর কল্পনা ও দক্ষতার প্রমাণ এই মোমের যাদুশালা। প্রথম কক্ষে র'য়েছেন খেদিব মহম্মদ আলি পাশা ও তাঁর ফরাসী মন্ত্রী জেনারেল সাইথ্। তার একটু দূরেই ভূমধ্যসাগরের উপপ্রান্তে বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মহম্মদ আলির মহিষী। প্রত্যেকটী মূর্ত্তি আকারে জীবন্ত মানুষের সমান; বসন-ভূষণ, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে রচিত হ'য়েছে

এবং সমস্ত জিনিষটাই মোম দিয়ে তৈরী। মোমের বর্ণ অত্যন্ত স্বচ্ছ মনে হয় যেন এইমাত্র শিল্পী তাঁর কাজ শেষ ক'রে অবসর গ্র ক'রেছেন। হাব্‌সী গাইড অর্দ্ধেক আরবী, অর্দ্ধেক ফরাসী ভা সমস্ত মূর্ত্তিগুলির ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ব'লে দিচ্ছিল। আমি সেইগুলি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ ক'রে সকলকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। ত পরের প্রকোষ্ঠে দেখ্‌লাম—নেপোলিয়ান, জোসেফিন ও তাঁহার ভগ্নী। ক্রমশঃ বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে প্রদর্শিত র'য়েছে খেদিব ইব্রাহি পাশার মহিষীগণ। ইতিহাসবিশ্রুত বহুখ্যাত ক্লিওপেট্রার জীব দৃশ্যাবলী, ইহুদী মোজেস ও ফেরায়ুন রামসিসের জীবনের বিভিন্ন ঘটন তারপর প্রাচীন মিশরীয় গ্রাম্য জীবনে একটি কাঠুরিয়ার দৈনন্দি কর্ম্মধারা ও একটি বিবাহের দৃশ্য; এরই সঙ্গে র'য়েছে এক অহিফেনসেবীর স্বর্গ ও নরকবাস। প্রতি মুহূর্ত্তেই এই স্বর্গের দৃশ্য



মহম্মদ আলি মসজিদ্—ইজিপ্ট্

চলচ্চিত্রের ঘটনার মত পটপরিবর্ত্তন করছিল; পূর্ব্বে প্রদর্শনী ব জানা না থাক্‌লে নরকের দৃশ্যে যে কোন মানুষকে ভীত ও সন্ত্রস্ত ক' তুলতে পারে। সর্ব্বশেষে দেখ্‌লাম ইহুদী সম্রাট সোলেমানের বিচ কাহিনী। মিশরে এই মোম যাদুশালা একটি অবশ্য দ্রষ্টব্য ব' পরিগণিত। যে জাতির শিল্পী পিরামিড সৃষ্টি ক'রেছিল, সহস্র স বৎসর মৃতদেহকে কালের হস্ত থেকে রক্ষা ক'রেছিল, তাদের পক্ষে মোম শিল্প কিছুই আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। কিন্তু তবু পৃথিবীর অন্য কে দেশের শিল্পী মিশরের এই মোমমূর্ত্তিগুলি অনুকরণ ক'রতে পারে কি।

রাত্রির ডিনারের পরে একজন বম্বে নিবাসী মিঃ প্রক আমার কা এসে জিজ্ঞাসা করলেন—মিঃ এলবার্ট নামক একজন ভারতীয় খৃষ্ট আমার হাত দেখ্‌তে চান। আমার কোন আপত্তি আছে কিন্

ারী কৌতূহল হ'ল। অপরিচিত লোক বিনা পারিশ্রমিকে হস্তরেখা রীক্ষা ক'রবেন। তাঁর উদ্দেশ্য কি? আমার সম্মতির অপেক্ষা না 'রেই মিঃ আলবার্ট ব'ল্লেন,—হালুয়ানে আপনার হাত আমি দেখেছি। রারো পাঁচ বছর পরে আপনার জীবনের গতির পরিবর্ত্তন হ'বে, এবং াপনার সম্বন্ধে বাইরের পৃথিবী খুবই কৌতূহল অনুভব ক'রবে। ারতবর্ষে গিয়ে আপনি একটু অসুবিধায় প'ড়বেন। আপনার ত্রু অনেক; কিন্তু শক্তিশালী মিত্র র'য়েছে। আরও অনেক কথা দ্রলোক ব'লে গেলেন। আমি ব'ল্লাম—আপনার হস্তরেখা



মিউজিয়ম—কায়রো

আমি একদিন পরীক্ষা ক'রব। মিশরে এলে সকলেই হস্তরেখাবিদ হ'য়ে উঠে।

৬ই অক্টোবর—৪৪

প্রাতে আটটার সময় মিঃ মহীউদ্দিন এলেন; তাঁকে প্রাতরাশে নিমন্ত্রণ ক'রলাম এবং পূর্ব্ব ব্যবস্থামত আল-আজ্‌হারএ চল্লাম। আল-আজ্‌হার প্রাচীন কায়রোর একপ্রান্তে অবস্থিত। একটি ক্ষুদ্র মসজিদকে কেন্দ্র করে যে কত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে, এই আজ্‌হারের ইতিহাসই তার সাক্ষ্য। ইসলাম সংস্কৃতিতে আজহারের দান সম্বন্ধে অনেক পুস্তকাদি পাঠ করেছি—এবার স্বচক্ষে তার কার্য্যাবলী দেখতে এসেছি। সুতরাং তার বিবৃতি আজ কিছুই লিখব না। পরে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে পুস্তকলব্ধ জ্ঞান যাচাই করে নেব।

বাইরের থেকে বর্ত্তমান আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীনত্বের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। অতি আধুনিক প্রাসাদ; যারদেশে প্রহরী প্রত্যেক কক্ষের সম্মুখে পরিচয় ফলকে খোদিত রয়েছে অভ্যন্তরের স্মারক। অফিস কর্ম্মচারী, টাইপ-রাইটার, ইলেকট্রিক লাইট, চেয়ার, টেবিল সোফা, টেলিফোন—সবই অতি আধুনিক। শুধু মাত্র শিক্ষার্থী এবং অধ্যাপকের পরিধেয় বস্ত্র দেখে নির্ণয় করা যায় যে এই প্রাসাদ ইউরোপীয় বিদ্যালয় নয়।

মিঃ মহীউদ্দিন আমাকে আজহারের ডেপুটি রেক্টর অর্থাৎ শেখ-উল আজহারের সহকারীর সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। তিনি আমাকে "আহ্‌লান ও সাহ্‌লান" বলে অভিনন্দন জানালেন। এই দুইটি শব্দ প্রায়ই মিশরীয়গণ ব্যবহার করেন। অভ্যাগতকে বলেন—আহ্‌লান অর্থাৎ আপনি আমাদেরই একজন; সাহ্‌লান—আমার গৃহ আপনার জন্য প্রসারিত হউক। এই কথা দুইটি অতি সুন্দর। প্রত্যুত্তরে অভ্যাগত বলেন, আহ্‌লান বিকুম—অর্থাৎ আপনিও আমাদের একজন। যথোচিত সুভাষা বিনিময়ের পর তিনি বল্লেন—আপনার পরিচয় পত্র এবং নির্দ্দেশাদি প্রফেসর হবীব আহম্মদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে; তিনি আপনার সমস্ত কাজের ভার নিয়েছেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে মিঃ মহীউদ্দিনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহগুলি দেখতে গেলাম। আজহারের গ্রন্থাগারে এসে আধুনিক কবি আসমারের সঙ্গে দেখা হল। মিঃ মহীউদ্দিন পরিচয় করে দিলেন যে, ভারতবর্ষ থেকে একজন হিন্দু অধ্যাপক আজ্‌হারের ইসলাম সংস্কৃতি চর্চ্চার জন্য এসেছেন। কবি আসমার তৎক্ষণাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন—হে ভারতীয় বন্ধু, যদিও আমার মুখে তোমার ভাষা নাই, তবু আমার বুকের অকথিত ভাষা তোমাকে বরণ করুক। তাঁর বিশুদ্ধ আরবী ভাষা আমি প্রথমে বুঝি নাই। মিঃ মহীউদ্দিন আমাকে অর্থ বুঝিয়ে দিলেন। আমিও আমার ভাষায় তাকে বরণ করলাম—"হে মিশরীয় বন্ধু, তোমার বাণী আমার অন্তরে পৌঁচেছে তুমি ভারতের শুভেচ্ছা গ্রহণ কর, তোমার কাব্যের রেশ সুদূর সমুদ্র অতিক্রম করে আমার দেশে প্রবেশ করুক।" এই সুমিষ্ট আলাপের মধ্য দিয়ে আমরা সমস্ত গ্রন্থাগারের বিশিষ্ট বিভাগগুলি দেখলাম ভারতবর্ষ বিষয়ক কি কি পুস্তক আছে এবং ভারতীয় মুসলিম লেখকের কোন গ্রন্থ আছে কিনা জানবার জন্য গ্রন্থাগারিককে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি বল্লেন, আজহারে খুব শ্রেণীবিভক্ত গ্রন্থতালিকা নাই, বিশেষ করে যুদ্ধের সময় মকওম পাহাড়ের গুহায় পুস্তক স্থানান্তরিত করা হয়েছে কাজেই আপনাকে প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থের সন্ধান দিতে পারব না তারপর আজ পর্য্যন্ত কোন ভারতীয় ছাত্র, এইরকম ভাবে কোন গ্রন্থের সন্ধান করেন নি। তবে মহিবুল্লা বিহারী ভারতবাসী প্রণীত একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ এখানে পাঠ্যতালিকাভুক্ত আছে, ভারতীয়দের লেখা কয়েকখানি কোরাণ তিনি দেখালেন; পরিশেষে বল্লেন—রওয়াক উল-হনুদ নামক হিন্দুস্থানী ছাত্রাবাসে দুইজন ভারতবাসী রয়েছেন, তাঁরা হয়ত এ বিষয়ে আপনাকে সন্ধান দিতে পারেন।

ক্রমশঃ



দণ্ডিত

শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকটির নিরীহ মুখ দেখে বিশ্বাস হয় না, সে নর-হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত। যুক্তকরে সে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে। আমার দিকে তার দৃষ্টি অবিচল।

আমি বিচারক, সে আসামী—হত্যাকারী।

আজ এক সপ্তাহ কেটে গেল। এই মামলার শেষ অঙ্ক চ'লছে, যবনিকা পতনে বিলম্ব নেই। এক পক্ষ চেষ্টা করে—হত্যাকারীর শাস্তি হোক। সাক্ষ্য প্রমাণের আড়ম্বর আয়োজন তাদের অপরিমেয়। প্রতিপক্ষ চায়—ন্যায় বিচার। মুখে যা বলে, মনের সায় পায় না ব'লে তাদের অজুহাত বড় দুর্ব্বল শোনায়। তবু তাদের স্বীয় মত সমর্থনে চেষ্টার শেষ নেই।

জুরীদের ঘটনাটি বুঝিয়ে বলা হ'য়ে গেছে—নিয়মানুযায়ী আনুপূর্ব্বিক আমিই বললাম পুনর্বার। চেয়েছিলাম নিরপেক্ষভাবে সব ব'লতে, কিন্তু আমার বক্তৃতা অনেকখানি অভিযোক্তাদের অভিমতের মতই শুনিয়েছে।

আসামী তার স্ত্রী আর দুটী নাবালক ছেলেকে হত্যা ক'রেছে। এই ঘোরতর দুর্দিনে প্রত্যহ সে প্রাণপাত রাখ্‌তে। আসামীর দীর্ঘ-দেহ দেখ্‌লেই তাকে শা ব'লে মনে হয়, যদিও খাদ্যাভাবের চিহ্ন তার শীর্ণ শরীরে পরিস্ফুট।

যে অবস্থায় সে মানুষ খুন ক'রেছে, সেটা স্বাভা পশুভাবে অনুপ্রাণিত। তার সন্দেহ ছিল—তার দুঃশীলা। সে যখন খাটতে যায়, তখন তার নষ্ট-চ পত্নী পর-পুরুষের কাছে অভিসারে যায়। যদিও কোনোদিন চাক্ষুষ কাউকে দেখ্‌তে পায় নি, তবু সন্দেহ এই রকমই। সে লক্ষ্য রাখতো তার স্ত্রীর ব্যবহ উপর। এই দারুণ দুর্দিনে খাদ্যাভাবে তার শরীরের পেশী যাচ্ছে শুকিয়ে, তার পুত্র-দুটি ক্রমে শীর্ণকায় উঠছে, অথচ এই মেয়েটির স্বাস্থ্য র'য়েছে অটুট। সে মনে হয়, খাদ্যাভাব তার নেই। কথায় কথায় সে সন্দেহের কারণ জানিয়েছিল, যার ফলে হ'য়েছে ঝগড়া- অবশেষে একদিন মেয়েটি কলহের ঝোঁকে স্বামীপু অস্বীকার ক'রে কোথায় চ'লে যায়। সেই রাত্রেই অ খোঁজাখুঁজির পর আসামী স্ত্রীর সন্ধান পায়—এ